"বই মনের খাদ্য।
বেশি বেশি বই পড়ুন,
মনকে সুস্থ রাখুন।।"

মোঃ কবিরুল ইসলাম
(DMC K-69)

www.facebook.com/kabiruldmc

kabirul.dmc@gmail.com

চিত্রবাণী

প্রথম বর্ষ ঃ ঃ ফাল্গুন, ১৩৫৫ ঃ ঃ ষষ্ঠ সংখ্যা

শ্চিমবঙ্গ সেন্সর বোর্ড

ভারতীয় চলচ্চিত্রশিল্প সরকারের দৃষ্টি লাভ করেছে বলমাত্র আমোদকর ও বিভিন্ন শুল্ক আদায়ের ব্যাপারে। ন ভারতেও এর ব্যতিক্রম দেখা যাচ্ছে না। মাঝে সরকারী মুখপাত্ররা পরিকল্পনার বিবৃতি পেশ করেন, রটা ওইখানেই মিটে যায়। গত এক বছর ধরে ম বঙ্গ সরকারের চলচ্চিত্রশিল্প সম্পর্কিত নীতি ও ভাব নিয়ে বিভিন্ন আলোচনা ও সমালোচনা হয়ে । চিত্রের কাহিনী, গান, প্রচারপত্র পুস্তিকাদি তাঁরা কয়েকমাস আগে যে সরকারী নিয়ন্ত্রণ ণের প্রস্তাব জানান তা নিয়েও বেশ বাদবিতণ্ডা ছিলো। তাঁদের সেই সব প্রস্তাবকে কার্য্যকরী করতে প্রাদেশিক সেন্সর বোর্ডটিকেও ঢেলে সাজানো দরকার ও একবাক্যে স্বীকৃত ও প্রতিধ্বনিত হয়েছিলো। তারপর এই বোর্ড পুনর্গঠন সম্বন্ধে কোন সরকারী কর্ম্ম-প্রচেষ্টার খবর পাওয়া যায়নি।

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৪৯এর মার্চ্চ মাস থেকে ১৯৫০এর ফেব্রুয়ারী মাস অবধি মেয়াদবিশিষ্ট ফিল্ম সেন্সর বোর্ডের সদস্য নির্ব্বাচনের ব্যাপার জানিয়েছেন। বর্ত্তমান ব্যবস্থায় এই বোর্ড গঠিত হয়েছে ৮২জন সদস্য নিয়ে। তার মধ্যে ৫জন হলেন সরকারী কর্মচারী আর বাকী ৭জন বেসরকারী, তার মধ্যে একজন মহিলাও আছেন। এই ব্যবস্থা জনসাধারণ কিংবা চিত্রব্যবসায়ে লিপ্ত ব্যক্তিদের সমর্থন লাভ করবেনা, এটা বলাই বাহুল্য। অবিভক্ত বাংলায় এবং বিভক্ত পশ্চিমবঙ্গেরও এতকাল সেন্সর বোর্ডে বলতে গেলে সরকারী আধিপত্যই ছিল বেশী আর তাঁদের সেন্সরের কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব পালনের ব্যাপারটাও ছিলো মর্জ্জিমাফিক। বেসরকারী দু একজন যারাও ছিলেন তাঁরাও

চিত্রবাণী

দেশী ও বিদেশী ছবি দেখার এবং তাদের গুণাগুণ সম্বন্ধে বোর্ডের সভায় বিস্তারিতভাবে আলোচনা করবার সময় এবং উৎসাহ পেতেন কিনা সন্দেহ। কাজেই আশা করা গিয়েছিলো স্বাধীনতা লাভের পর এই সব ব্যাপারে গতানুগতিক নিষ্ক্রিয় কর্ম্মপদ্ধতির পরিবর্ত্তন হবেই। বিশেষ করে সম্প্রতি ছায়াছবির অনুমোদন সংক্রান্ত বিষয়ের গুরুত্ব অনেক বেড়ে গেছে। কিন্তু সম্প্রতি ঘোষিত সেন্সর বোর্ডের গঠন ব্যবস্থা-সর্ব্বদিক দিয়েই আমাদের নিরাশ করেছে। কেননা চিরাচরিত ব্যবস্থা ও গঠন পদ্ধতির কোন পরিবর্ত্তনই লক্ষ্য করা গেল না। আগের মতই বর্ত্তমান সেন্সর বোর্ডেরও সভাপতি থাকলেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার। তাছাড়া আরও কয়েকজন সরকারী কর্ম্মচারী ত আছেনই।

কলকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানের একজন প্রতিনিধিও রয়েছেন। আর থাকবেন দু একজন চেম্বার অব কমার্সের তরফ থেকে মনোনীত সদস্য। কর্পোরেশন বা চেম্বার অব কমার্সের সঙ্গে ছায়াছবি সেন্সারের কাজের কী এবং কতটুকু যোগাযোগ তা সাধারণ বুদ্ধির অগম্য। তারা এমনিতেই ত নিজেদের কাজকর্ম্ম নিয়ে রীতিমত ব্যস্ত, কাজেই তাঁরা ছবি প[illegible] দেখবেনই বা কখন আর নিয়মিতভাবে বোর্ডের সভায় হাজির হয়ে আলোচনাতে বা যোগ দেবেন কী করে, এর উত্তর আমরা ত খুঁজে পাইনা। তবে এই সদস্যদের দায়িত্বটাকে যদি বোঝার ওপর শাকের আঁটি বলে ধরে নেওয়া হয় সেকথা স্বতন্ত্র। অনাবশ্যকভাবে নিষ্ক্রিয় সদস্যের সংখ্যা বাড়িয়ে, কর্ম্মতৎপরতার পরিচয় না দিয়ে বরং সদস্যসংখ্যা কমিয়ে যোগ্যতম এবং যথার্থ উৎসাহী সদস্য গ্রহণ করলে শুধু যে আন্তরিক নিষ্ঠার পরিচয় দেওয়া হোত তাই নয়, চলচ্চিত্রশিল্পেরও কল্যাণ সাধিত হবে।

আরও কয়েকটী বিষয় বাদ পড়ে গেছে দেখা গেলো। বঙ্গ প্রেস এ্যাডভাইসরী কমিটি থেকে পশ্চিম বঙ্গ সরকারকে অনুরোধ করা হয়েছিলো এই ফিল্ম সেন্সর বোর্ডে একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাংবাদিককে গ্রহণ করার জন্য। কিন্তু এরকম কোন ব্যবস্থাই করা হয়নি। ইংরেজ আমলে সাংবাদিকের মর্য্যাদা স্বীকৃত না হওয়ার কারণ ছিল, বিশেষ করে ছবির সেন্সরের ব্যাপারে সাংবাদিকের মতামত বা উপদেশ-পরামর্শ গ্রহণ করার কথা তৎকালীন শাসক কর্ত্তৃপক্ষের চিন্তারও অগোচর ছিল। কিন্তু জাতীয় সরকারেরও কী এ বিষয়ে সেই একই মনোভাব বলে ধরে নিতে হবে। সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার হলো যে প্রযোজক, বা প্রদর্শক ছায়াচিত্রশিল্পের কোন প্রতিনিধি এই বোর্ডে স্থান পেলেন না। বিভিন্ন ছবি দেশের জনসাধারণের নিকট প্রদর্শিত হবার অনুমোদন এবং ছাড়পত্র দেবার কোন ব্যাপারের সঙ্গেই জড়িত থাকবেন না শিল্প সংশ্লিষ্ট কেউই।

সেন্সর বোর্ড নিয়ে বাদবিতণ্ডা যখন চলছিলো তখন একটী প্রস্তাব সব মহল থেকেই উত্থাপিত হয়েছিলো। হলো একজন বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতীকে এই বোর্ডের সদস্যশ্রেণীভুক্ত করে নেওয়া। কিন্তু এই প্রস্তাবেরও কোন মূল্যই দেওয়া হয়নি। শিক্ষাব্রতীরূপে থাকবেন সরকারিভাবে শিক্ষা দপ্তরের সেক্রেটারী। শিক্ষকতার সঙ্গে তাঁর কতটুকু সম্পর্ক তা বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না। ছাত্রসমাজের পক্ষে কোন নির্দ্দিষ্ট ছায়াছবির হিতাহিত পরীক্ষা করে দেখবার মত অভিজ্ঞতা এবং ছাত্রদের কাছে সে ছবির উপযোগিতা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান তাঁর থাকা সম্ভব কিনা তা আমরা জানিনা। বিশিষ্ট সাহিত্যিক এবং নারীকোন ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি এই বোর্ডে গ্রহণ সম্পর্কে অনেকে প্রস্তাব করেছিলেন। সে প্রস্তাবের উপযোগিতা সম্বন্ধেও আমাদের কোন সন্দেহ নেই। সরকারী প্রতিনিধি এই বোর্ডে যত কম থাকেন ততই ভালো। তাদের বিভিন্নমুখী কর্ম্মব্যস্ততার মাঝে এই রকম একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দায়িত্ব তাঁদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিলে তাঁরা যে সে দায়িত্বের প্রতি সুবিচার করতে পারবেন না, এটা বলা নিষ্প্রয়োজন। আর তার জন্যে তাঁদের দোষ দেওয়াও চলবে না।

চিত্রবাণী

আমোদকর বৃদ্ধির প্রস্তাব

পশ্চিম বঙ্গ সরকারের সাম্প্রতিক বাজেট অধিবেশনে ঘাটতি পূরণের পরিকল্পনার সংবাদ বাংলার চিত্রশিল্পকে সচকিত করে দিয়েছে। ঘাটতি পূরণের জন্য যে সব ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হলো আমোদকর বৃদ্ধি। এই আমোদকর বৃদ্ধির ফলে নাকি বিশ লক্ষ টাকা সরকারী তহবিলে জমা হবে।

এ প্রস্তাব কিছু বিচিত্র নয় আর পশ্চিমবঙ্গেই শুধু সীমাবদ্ধ নয়। ভারতীয় চলচ্চিত্রশিল্পের কপালে এই সৌভাগ্য এর আগেও অনেকবার দেখা গেছে। ঘাটতি বাজেট পূরণ করবার সময় ছাড়া আর কখনও বড় একটা সরকারী কৃপাদৃষ্টি ফিল্মশিল্পের ওপর পড়ে না। পশ্চিম বঙ্গ আমোদকর (সংশোধন) বিল সম্পর্কে এই যুক্তি দেখান হয়েছে যে প্রাদেশিক রাজস্বের জন্যে এই বিলের সংশোধন প্রয়োজন। বিহার গভর্ণমেণ্ট তো ইতিমধ্যেই এই প্রস্তাবকে কাজে পরিণত করেছেন। তার ফলে সেখানকার ছায়াচিত্রশিল্প বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে জানা যায়। টিকিট বিক্রয়লব্ধ অর্থের পরিমাণ শোচনীয়ভাবে হ্রাস পেয়েছে। মধ্যপ্রদেশ ও বেরার গভর্ণমেণ্টের এই জাতীয় প্রস্তাবে আতঙ্কিত হয়ে জব্বলপুরের অনেকগুলি চিত্রগৃহের মালিকই কিছুকালের জন্য ছবি দেখানো বন্ধ করে দেবেন বলে স্থির করেছেন।

এখানকার চিত্র ব্যবসায়ীরা ইতিমধ্যেই বিশেষ উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েছেন, আর সে উৎকণ্ঠা খুবই স্বাভাবিক। বেঙ্গল মোশান পিকচার এসোসিয়েসন্ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থসচিবের কাছে এক আবেদন জানিয়েছেন। এই আবেদনে তাঁরা বলেছেন :

গত যুদ্ধের পর থেকেই চিত্রগৃহে দর্শক সমাগম বেশ কমে আসছে। সেটা সরকারী কর আদায়ের নথিপত্তর থেকেই প্রমাণিত হয়। অথচ ছবি তৈরীর, প্রদর্শন ও পরিবেশন সংক্রান্ত যাবতীয় খরচপত্র যুদ্ধপূর্ব্বকালের চেয়ে শতকরা পঁচাত্তর থেকে একশো ভাগ বেড়েছে। এর ওপর দেশবিভাগের ফলে ছবির প্রদর্শনক্ষেত্র একান্তভাবে সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছে। দর্শকসাধারণের ব্যয়ক্ষমতাও ক্রমশঃই কমে আসছে। তাছাড়া এমনিতেই এদেশের চিত্রশিল্প যথেষ্ট করভারপীড়িত। আর অতিরিক্ত কর ধার্য্য করলে টিকিট বিক্রয়লব্ধ অর্থের পরিমাণ কমে আসবে এবং বাংলা ছবির দুর্দ্দিনেরই সূচনা করবে। তার ফলে ছায়াচিত্রশিল্পে নিযুক্ত অগণিত কর্ম্মীর বেকার হয়ে পড়ার সম্ভাবনা। পূর্ব্বপাকিস্থান গভর্ণমেণ্টও আমোদকর বৃদ্ধির প্রস্তাব তুলেছিলেন কিন্তু সেখানকার চলচ্চিত্রব্যবসায়ীদের অভাব অভিযোগ বিবেচনা করে এই বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রত্যাহার করেছেন। বিশেষে স্থানীয় চলচ্চিত্রশিল্পের দুর্য্যোগের আভাস পেয়ে সেখানে সরকারীভাবে এই শিল্পটিকে অর্থসাহায্যে পুষ্ট করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

নিখিল বাংলা বঙ্গীয় চলচ্চিত্র সমিতি আমোদকর বৃদ্ধির প্রস্তাবের বিরুদ্ধে এই যে যুক্তিগুলি দেখিয়েছেন তা এই শিল্পটির হিতকামী প্রত্যেকেরই সমর্থন লাভের যোগ্য। কিন্তু এই আবেদনের পরবর্ত্তী অংশে তাঁরা যা বলেছেন তা আমরা সমর্থন করতে পারলাম না। তাঁরা বলেছেন : তবে যদি গভর্ণমেণ্ট এইসব ব্যাপার বিবেচনা করার পরেও আমোদকর বৃদ্ধিই সাব্যস্ত করেন তো পরীক্ষামূলকভাবে মাস ছয়েকের জন্যে এই বৃদ্ধির প্রস্তাবে সায় দিচ্ছি। আর বৃদ্ধির হার হবে এই রকম :—

আট আনা থেকে দেড় টাকার আসনের ওপর ২৫% বৃদ্ধি।

দেড় টাকার উর্দ্ধ এবং তিন টাকার নিম্নতন আসনের ওপর ৩৩⅓% বৃদ্ধি।

তিন টাকার উর্দ্ধতন আসনের ওপর ৫০% বৃদ্ধি।

ছ'মাসের জন্যে পরীক্ষামূলকভাবে এই ব্যবস্থা চালু করার কোন অর্থ নেই। স্বল্পমূল্যের টিকিটের ওপর তো হস্তক্ষেপ করাই উচিত নয়। কারণ প্রকারান্তরে সমস্ত চাপটাই গিয়ে পড়বে সাধারণ দর্শকের ওপর। বর্ত্তমান অবস্থায় আসনের মূল্যবৃদ্ধি বিশেষ করে নিম্নতন শ্রেণীগুলির টিকিটের হার বাড়ানো কোন ক্রমেই সমর্থন করা চলে না।

চিত্রবাণী

বিদেশে ভারতের মর্য্যাদার নিদর্শন !

নিউইয়র্ক থেকে দেওয়া ইউনাইটেড প্রেস অফ আমেরিকার ২৭শে ফেব্রুয়ারীর এক সংবাদে প্রকাশ, নিউ ইয়র্কস্থিত ভারতীয় অধিবাসীবৃন্দ ব্রডওয়ের "রিয়াল্টো" থিয়েটারের সামনে সমবেত হয়ে সম্মিলিত প্রতিবাদ জানান "ইণ্ডিয়া স্পিক্‌স" বলে একখানি ভ্রমণচিত্র প্রদর্শনের বিরুদ্ধে। এই পূর্ণাঙ্গ ছবিখানি সম্বন্ধে "হিন্দুস্থান ষ্টুডেণ্টস্ এ্যাসোসিয়েশন্" এবং "ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল্‌স ওভারসিজ কংগ্রেস" বলেছেন, false and malicious, also mischievous and slanderous। "ইণ্ডিয়া লীগ অব্ আমেরিকা" থেকে সরকারীভাবে মার্কিন গভর্ণমেণ্টের কাছে প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। ঐ সঙ্ঘের জনৈক সদস্য জানিয়েছেন যে আলোচ্য ছবিটি ক্যাথারিন মেয়োর কুখ্যাত "মাদার ইণ্ডিয়া" বইয়ের চিত্ররূপ। আলোকচিত্র ও বর্ণনার সাহায্যে সমস্ত ছবিখানির মধ্যেই ভারতকে হেয় প্রতিপন্ন করারই চেষ্টা হয়েছে। কৃচ্ছ্রসাধন, মন্দিরে পূজা-অর্চনা, সিংহ শিকার, নদীতীরের নৈশ সজ্জা এবং ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজার প্রাসাদ উদ্যান ইত্যাদি চিত্রিত করা হয়েছে ঐ একই উদ্দেশ্য নিয়ে। ছবিখানি তোলা হয়েছিলো ১৯৪৩ সালে একটী মার্কিন চিত্র প্রতিষ্ঠানের প্রযোজনায় আর "পর্যটকের চোখে ভারত" এই বলেই ছবিটিকে অভিহিত করেছেন উক্ত প্রতিষ্ঠান।

এ জাতীয় সংবাদ অবশ্য কিছুমাত্র নতুন নয়। দৈনিক পত্রের পাতায় এ জাতীয় সংবাদ পড়ে চিরাচরিতভাবে কিঞ্চিৎ উষ্মা প্রকাশ করা ছাড়া অবশ্য আমাদের আর কিছু করবার নেই। কিন্তু ভাবলে বিস্মিত হতে হয় যে পণ্ডিতজী পরিচালিত ভারত সরকারের পররাষ্ট্র দপ্তরের কারো নজরেই কী এ সংবাদগুলি পড়ে না? এ জাতীয় ব্যাপার তাঁদের নজরে এসে থাকলে আগেই বা তারা কী ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন এবং এখনই বা কী ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন তা জানার আগ্রহ আমাদের খুবই স্বাভাবিক। এখনও যে এ জাতীয় ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি ঘটে এইটাই ত বিচিত্র।

ভারতে টেকনিকলার ছবি তৈরী ?

কয়েকমাস আগে আমরা খবর পেলাম, বোম্বাইতে উৎসাহী যন্ত্রকুশলীরা 'কালার প্রসেস' বা ছবি রঙীন করার বিজ্ঞান সম্মত প্রণালী নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন। আরো জানা গেল জনৈক ভারতীয় চিত্রপ্রযোজক বিলেত থেকে ফিরেছেন ভারতে রঙীন ছবি তৈরীর পরিকল্পনা নিয়ে। ঐ ছবিটির আনুমানিক খরচ পড়বে নাকি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা আর এই ছবিটি তৈরীর ব্যাপারে সহযোগিতা করবেন বৃটিশ চিত্রপ্রযোজক আর্থার র‍্যাঙ্ক। জানানো হয়েছিল ছবিটীর ব্যবসায়িক ব্যাপারে র‍্যাঙ্কের কোনো যোগাযোগ থাকবে না। শুধু ষ্টুডিও ভাড়া এবং টেকনিকলারের যন্ত্রপাতি ব্যবহার বাবদ ভাড়া তিনি নেবেন। প্রত্যেক বছর চারখানা টেকনিকলার ছবি করার নির্দিষ্ট বরাদ্দ বা Quota র‍্যাঙ্কের আছে। তার থেকে তিনি ভারতীয় প্রযোজককে একখানি ছবির Quota দেবেন। এখানে উল্লেখযোগ্য হোলো টেকনিকলারের সমস্ত কিছু Process বা প্রস্তুত পদ্ধতির স্বত্ব এর আবিষ্কারক দম্পতী ডক্টর হার্বার্ট ক্যালমাস ও মিসেস্ নাটালি ক্যালমাস কর্তৃক সংরক্ষিত। র‍্যাঙ্কের এই সহযোগিতার সংবাদ যদি সত্য হয় তবে তাঁর সদিচ্ছার প্রশংসা করতেই হবে। কিন্তু ভারতে এই জাতীয় ছবি তৈরীর ব্যাপারে তার কোনো স্বার্থ সংশ্লিষ্ট থাকে যদি তবে এতে ভারতীয় চলচ্চিত্রশিল্প জগতে র‍্যাঙ্কের প্রবেশ প্রচেষ্টারই সূচনা হবে। এই সন্দেহ অনেকেই একেবারেই উড়িয়ে দিতে পারেননি। কারণ, এই নতুন চিত্রপ্রস্তুতির সঙ্গে কাইলন থিয়েটার্স লিমিটেড বলে একটি প্রতিষ্ঠানের পরিচালক জনৈক মিষ্টার গার্ডেনারকে অন্তর্ভুক্ত করার কথা শোনা গেছে। এই প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গেও নাকি র‍্যাঙ্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।

গৌর চট্টোপাধ্যায়

অশোক কুমার

কানাই রায় বি এ

সেবারে বোম্বাই-এ গিয়ে ছিলাম ও সপ্তাহ দুই সেখানে ছিলাম। সেই সময়ে কয়েকটি বিখ্যাত চিত্র-প্রতিষ্ঠানের ষ্টুডিও দেখা এবং সেখানকার কর্মীদের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ আমার হয়েছিল। এই সময়ে জনপ্রিয় অভিনেতা অশোককুমারের সঙ্গেও আমার পরিচয় হয়। তাঁর সম্বন্ধে জানবার কৌতূহল আপনাদের নিশ্চয়ই আছে। সেজন্য আমি এ দুদিনের যাতায়াত ও আলাপ পরিচয়ে তাঁর সম্বন্ধে যেটুকু জানতে পেরেছি, আজ "চিত্রবাণী"র পাঠকদের সেটুকু আপনাদের জানাচ্ছি।

অশোককুমারের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেন আমার পূর্ব-সহপাঠী ও বন্ধু মানস পাল। ইনি চিত্র জগতে সুপরিচিত লেখক ও ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন পালের পুত্র। আমি যখন বোম্বাই এ যাই তখন তিনি "ফিল্মিস্থান" ষ্টুডিওর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সেই সময়ে এই ষ্টুডিওতে "শিকারী" চিত্রটি তোলা হচ্ছিল। অশোককুমার এই চিত্রে প্রধান চরিত্র "শিকারী"র ভূমিকায় তাঁর অপূর্ব অভিনয়-কৌশল দেখিয়ে বহু দর্শককে মুগ্ধ করেছেন। তাঁর পুরো নাম অশোক কুমার গঙ্গোপাধ্যায়। হ্যাঁ, যদিও আজ পর্য্যন্ত বরাবরই তিনি বোম্বাই-এ প্রস্তুত হিন্দি ছবিতেই অভিনয় করে এসেছেন (একমাত্র বাংলা "চন্দ্রশেখর" বাদে) তাহলেও তিনি আমাদেরই একজন, বাঙ্গালী। তাঁর জন্ম মধ্যপ্রদেশের খাণ্ডওয়া (Khandua) সহরে। জব্বলপুর রবার্টসন্ কলেজে প'ড়ে তিনি বি এ ডিগ্রি লাভ করেন। তারপর কলকাতায় এসে এম্ এ পড়তে থাকেন। সেই সময়ে কোন চিত্র প্রতিষ্ঠানে যোগ দেবার ইচ্ছা হওয়াতে তিনি তাঁর পিতৃবন্ধু সুপরিচিত চিত্র পরিচালক প্রফুল্ল ঘোষের সঙ্গে দেখা করেন। সে সময়ে প্রফুল্লবাবু বালীগঞ্জের ষ্টুডিওতে তাঁর নূতন ছবির কাজ আরম্ভ করেছিলেন। প্রফুল্লবাবু তাঁকে চিত্রপ্রতিষ্ঠানে কাজ নিতে বারণ করেন এবং অন্য কোন কাজ নিতে উপদেশ দেন। এর পরে অশোককুমার বোম্বাই এ যান এবং সেখানে ১৯৩৪ সালের জানুয়ারি মাসে বিখ্যাত চিত্রপ্রতিষ্ঠান "বম্বে টকীজের" ল্যাবরেটরিতে (laboratory) শিক্ষানবীশ বা অ্যাপ্রেন্টিস হিসাবে কাজ করেন। তখন বম্বে টকীজের প্রতিষ্ঠাতা হিমাংশু রায় সাহেব ছিলেন এবং তাঁর সহকর্মী ও অংশীদার ছিলেন নিরঞ্জন পাল। পাল মহাশয়ই অশোককুমারের ভাগ্যের মোড় ফিরিয়ে দেবার নিমিত্ত হয়েছিলেন। ১৯৩৬ সালে নিরঞ্জন পালের রচিত [illegible] চিত্রকাহিনী "জীবন নাইয়া"তে অশোককুমার প্রধান ভূমিকায় দেবিকারাণীর সহ-অভিনেতা রূপে প্রথম চিত্রাভিনয় করেন। ল্যাবরেটরি থেকে টেনে এনে তাঁকে ক্যামেরার সামনে দাঁড় করানোর জন্য দায়ী নিরঞ্জন পাল। এরপরেই আবার ১৯৩৬ সালের শেষ দিকে পাল মহাশয়ের রচিত "অচ্ছুৎ কন্যা"র চিত্ররূপেও অশোককুমার নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন। এরপরে অশোককুমারের জীবন কাহিনী [illegible] অভিনয়ের ইতিহাস। বম্বে টকীজের বাইরে তিনি [illegible] চিত্রে অভিনয় করেন- সেগুলি হোল "[illegible]" ([illegible] পিকচার্স) "আঙুঠী" (জনক পিকচার্স) "[illegible]" ([illegible] পিকচার্স) এবং এই [illegible] চুক্তিপত্র তিনি প্রায় একই সময়ে [illegible] নিষ্পন্ন করেন। ১৯৪৩ সালে তিনি বম্বে টকীজ ছেড়ে শশধর মুখোপাধ্যায় ও রায় বাহাদুর চুনিলালের সঙ্গে অংশীদার হিসাবে যোগ দিয়ে 'ফিল্মিস্তান' ষ্টুডিও গঠন করেন। এখানে তিনি "এইট ডেজ্ বা আট দিন" "শিকারী" প্রভৃতি চিত্রে অভিনয়ও করেন। পরে ফিল্মিস্তান ত্যাগ করে এস্ ভাচার সঙ্গে তিনি বম্বে টকীজে প্রধান কর্মকর্তা ও প্রযোজক (producer) রূপে ফিরে আসেন। তাঁর প্রযোজনায় এখানে প্রথম চিত্র হয় "মজবুর"।

ব্যক্তিগত ভাবে আমার যেটুকু পরিচয় তাঁর সঙ্গে

হয়েছিল তা থেকে এ কথা মুক্তকণ্ঠে বলতে পারি যে অশোক কুমারের সৌজন্য ও অমায়িক ব্যবহাব আমাকে মুগ্ধ করেছিল। একদিন কথাপ্রসঙ্গে তিনি জানতে পারেন যে আমি একজন অ্যামেচার মুষ্টি যোদ্ধা, তাই শুনে তিনি বলেন যে মুষ্টিযুদ্ধ শেখবার ইচ্ছা তাঁর প্রবল এবং আমার কাছে শেখবার প্রস্তাবও করেন; কিন্তু বিশেষ কারণে আমাকে খুব শীঘ্রই বোম্বাই ত্যাগ কবে চলে আসতে হলো। সেজন্য এ বিষয়ে আমরা আর অগ্রসর হতে পারিনি। তাঁর আব একটি বিশেষ সখের কথাও আমি জানতে পাবি, তা হোলো জ্যোতিষ শাস্ত্র চর্চা। তাঁর অনেক বন্ধু বান্ধব তাঁর কাছে সুবিধা পেলেই ভাগ্য-গণনা করিয়ে নেন, আমিও যে একটু আধটু করাইনি এমন কথা বলতে পারিনা।

আমি যখন বোম্বাই এ যাই সে সময়ে অশোককুমার থাকতেন সমুদ্রের ধাবে "মহালক্ষ্মী" ব'লে মনোরম পল্লীতে অবস্থিত একটি দ্বিতলের ফ্ল্যাটে। এ বাড়ীখানি ছিল মহালক্ষ্মী রেস্কোর্স বা ঘোড়দৌড়ের মাঠের পাশেই, এর আব এক পাশে ছিল বরোদার মহারাজার প্রাসাদ। প্রসঙ্গতঃ বলে বাখি যে বরোদারাজ অশোক কুমাবের একজন গুণমুগ্ধ বন্ধু।

শিল্পীর চোখে অশোককুমাব
এঁকেছেন রেবতীভূষণ ঘোষ

নতুন বাংলা নাটক ও ছায়াছবি সম্বন্ধে 'চিত্রবাণী'র পাঠক ও গ্রাহকবৃন্দের মতামত আগামী সংখ্যা থেকে 'আপনি কি বলেন?' বিভাগে প্রকাশিত হবে। নাটক এবং ছবির উদ্বোধনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা যেন এই মতামত পাঠান। রচনা সংক্ষিপ্ত এবং যুক্তিপূর্ণ হওয়া একান্ত প্রয়োজন এই কথাটি তাঁরা যেন মনে রাখেন।

আপনাদের প্রমোদ আমাদের প্রমাদ

ক্যারি উইলসন

[illegible] ছবিখানি অনেকেই হয়ত দেখেছেন। কিন্তু এই ছবি তৈরীর ভিতরকার বিভিন্ন ও বিচিত্র সমস্যা ও তার সমাধানের চিত্তাকর্ষক কাহিনী পর্দার অন্তরালেই রয়ে গেছে। আমরা সেই অজানা কাহিনী ও রহস্য 'চিত্রবাণী'র পাঠকমণ্ডলকে উপহার দেবার উদ্দেশ্য নিয়ে ঐ ছবির প্রযোজক ক্যারি উইলসনকে অনুরোধ জানিয়েছিলাম। তিনি আমাদের অনুরোধ রক্ষা ক'রে এই সরস বিবরণটি পাঠিয়েছেন। আশা করি আমাদের সৌখীন প্রযোজকরা এই কাহিনীর মধ্যে জ্ঞাতব্য কিছু খুঁজে পাবেন।

—চিত্রবাণী-সম্পাদক

নিউইয়র্ক আমার আদি বাসভূমি। তবুও কাজের ভীড়ে সেখানে যাওয়া হয়ে ওঠেনা মোটেই। কিন্তু একবার গেলে আর ফিরে আসতে পারি না। মনটা যেন কেমন করে। তার কারণ হয়তো বাল্যকাল আমার কেটেছে সেখানে। সারা সহরময় ছড়িয়ে আছে শৈশব স্মৃতির সুষমা। যাই হোক বছর দুই আগে এক রাত্তিরের জন্যে সেখানে গিয়েছিলাম। গিয়ে, আমার যা অভ্যেস—প্রচার বিভাগের জনৈক বন্ধুকে জুটিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম হৈ হল্লায়,—অলিতে গলিতে, খাদ্য আর পানীয়ের সন্ধানে।

এইভাবে এখানে মদ আর ওখানে স্যাণ্ডউইচ্ গিলতে গিলতে ষ্টর্ক ক্লাবে গিয়ে যখন পৌঁছোলাম তখন তাদের দোর

প্রায় বন্ধ হয় হয়। সবাই প্রায় চলে গেছে। থাকবার মধ্যে ছিল শুধু ওয়াল্টার উইন্‌চেল আর আমাদের প্রিয় বন্ধু ড্যামন রানিয়ন্‌। ড্যামন ব্যাচারা তখন ভালো ক'রে কথা কইতে পারতো না। যে রোগ একদিন তার জীবনের কাল হোল সেই রোগের জন্যেই তখন তার গলা অপারেশন করা হয়েছিল। আহা! তার ফলে ব্যাচারীর সেই জমাটী গলা ক্ষীণ হয়ে যেন মিইয়ে গেছে। কিন্তু হ্যাঁ, আমি জানি, সবাই জানে, উইন্‌চেলের কি অদ্ভুত বন্ধু প্রীতি! এই সময় সে থাকতো ড্যামনের পাশে পাশে, দিনরাত।

উইন্‌চেলকে আমি এর আগেও দেখেছি এবং ভালোও ওকে আমার লাগে। বেশী ভালো লাগে তার কারণ ও নামকরা হয়েও একবার সোজা অভিনয় ক'রে আমার একখানি অপরিণত ছবিকে সাফল্যমণ্ডিত করেছিল। তাই ও যখন আমায় বসতে বললে তখন আমি বেশ একটু কৃতজ্ঞভাবেই বসে পড়লাম ওদের মাঝে।

কথায় কথায় ও আমাকে প্রশংসা করলে আমার সাম্প্রতিক ছবিখানার জন্যে,—"দি পোষ্টম্যান অল্‌ওয়েজ রিঙ্‌স্ টোয়াইস্‌।" তবে এও অবশ্য বললে যে সম্প্রতি আর যে সব ছবিগুলো ও দেখেছে সেগুলো কিন্তু তত ভালো হয় নি।

আমি বললাম—'ওয়াল্টার, তোমরা নিজে প্রযোজক না হোলে বুঝবে না ছবি তোলা কি ভয়ানক শক্ত কাজ—এমনকি একখানা বাজে ছবি তোলাও। মাঝে মাঝে কি মনে হয় জান? মনে হয় ভালো ছবি তোলা বুঝিবা অসম্ভব। তাছাড়া ভুলে যেও না—কেউই খারাপ ছবি তুলবে বলে কাজ সুরু করে না।'

উইন্‌চেল একটা দেঁতো হাসি হেসে বললে,—'এভাবে কোনদিনও ভাবিনি।'

খুব কম লোকেই ভাবে। তারা বোঝে না যে অনেক সময় ছবি তোলার সেই অমানুষিক কায়িক ও মানসিক পরিশ্রমের চাপে যারা কাজ করে তাদের, বিশেষ ক'রে প্রযোজকের—অভিনয়কলা, শিল্পবোধ এবং এই জাতীয় সব পদার্থগুলো বেমালুম উবে যায়। সবাই আমরা ভালো ছবি তোলবার জন্যেই মহরৎ করি, কিন্তু ভুলে যেওনা—এটা মর্ত, স্বর্গ নয়।

ছবি ভালোই হোক আর নাই হোক, তার নির্মাণের বাস্তব দিকটা কিন্তু যা তোমরা ভাবো মোটেই তা নয়। তার জন্যে কত যে সব খুঁটিনাটি হাঙ্গামা পোয়াতে হয় শোন বলি।

প্রথমেই তোমার মনে রাখতে হবে—ছবি তোলার কাজ প্রযোজকের জানালার পাশেই হয় না,—যেখানে তিনি দিব্যি আরামে তাঁর ডেস্কে বসে বসে আগাগোড়া সব দেখবেন। এখানে প্রশ্ন ওঠে দূরত্বের। এমনকি ছবির মহরতের আগে থেকেই ষ্টুডিওর এ-কোণ ও-কোণ ছোটাছুটি করে তোমায় বহু সময় ব্যয় করতে হয়। তোমার অফিস থেকে বেরিয়ে ছুটতে হোল,—লম্বা করিডর পেরিয়ে গেলে এলিভেটরে, তারপর আর একটা লম্বা করিডর পাড়ি দেওয়া, তারপর দু'শো ফিট লম্বা একটা কোণ পেরিয়ে পৌঁছুলে গিয়ে আইরীনের ঘরে। সেখানে তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করলে পোষাক-পরিচ্ছদের পরিকল্পনা নিয়ে। আবার ছুট। হাজির হলে গিয়ে পুরুষের পরিচ্ছদ বিভাগে—১৮৫০ সালে ব্রিটিশ নেভীর ইউনিফর্ম তদারক করতে। তারপর আবার সেই হিয়া সে হুঁয়া। তিন বাঁক সিঁড়ি ভাঙ্গার ধকল সামলে যেতে হোল আর্ট ডিরেক্টারের ষ্টুডিওতে। সেখানে তিনি হয়তো তাঁর অজস্র সহকারী পরিবৃত হয়ে আঁকাজোঁকা আর সেটের মডেল তৈরীর ব্যস্ততায় ডুবে আছেন।

তারপর এত কাজ সেরে একটু দম্‌ নিয়ে তোমার অফিসে ফেরবার জন্যে যেই পা বাড়িয়েছো অমনি হয়তো পাশের জানলা থেকে কেউ চেঁচিয়ে উঠলো,—"এই যে মিঃ উইল্‌সন্‌! আপনাকে যে ওরা গরু খোঁজা খুঁজছে। যান একবার এখনই মেক্‌আপে"। ব্যস্‌ আবার সেই ঘোড়দৌড়। ঝড়ের মতো ছুটতে হোল। "গ্রীন ডল্‌ফিন্‌ ষ্ট্রীট" ছবি

চিত্রবাণী

তৈরীর দু'বছর ন'মাসের মধ্যে এই ধরণের ঘোড়দৌড়ে আমায় যে ক'হাজার বার টানাপোড়েন করতে হয়েছে তা' শুনতে গেলে তারা গোনার পাগলামীতে পড়তে হবে। ছবি প্রযোজনা আরাম কেদারার বিলাসিতা নয়, রীতিমতো টেঙ্‌রীর জোর চাই।

একখানি চিত্র নির্মাণের পেছনে শিল্প ও যান্ত্রিক ক্রিয়া কলাপের দিকটা লক্ষ্য করলে দেখা যায় ১০৫টি বিভিন্ন বিভাগ কাজ করে এবং • এম্, জি, এম্-এ প্রায় ৬০০০ লোক দিনরাত ব্যস্ত থাকে কাজে। তাদের মধ্যে তোমার ছবিতে হয়তো আংশিক ভাবে কাজ করছে ৫০০০ লোক। এত সব বিচার করলে দেখবে আসলে ক্যামেরায় ফিল্ম চাপানোর আগে ছবি তৈরীর,—বিশেষ করে কোন আড়ম্বরপূর্ণ বড় ছবির প্রস্তুতির হাঙ্গামাই এক ভীষণ ব্যাপার। কারণ, কাগজে গোটাকতক কালির আঁচড় থেকে সুরু করে ধাপে ধাপে ক্যামেরায় পৌছোনো অবধিই সব চেয়ে বেশী কাজ এবং যথেষ্ট শ্রমসাপেক্ষ।

হাসিও পায়, কান্নাও পায়,—অতি-প্রয়োজনীয়তার গাম্ভীর্য থেকে তুচ্ছতার হাসি, কিম্বা উল্টোটা—ছবির কাজ যেন স্বরগ্রামের পর্দা,—কড়ি থেকে কোমল, কোমল থেকে কড়ি। স্বরগ্রামের একদিক থেকে,—ধর 'সা' থেকে তুমি ছুটলে হন্তদন্ত হ'য়ে মিস্ লানা টার্ণারের সাজঘরে,—ছবি সুরু হওয়ার অনেক আগে—কিন্তু গিয়ে প'ড়লে হাসির 'নি'তে। কেন? না, তুমি খবর পেয়েছিলে লানা নাকি অনেক কষ্টে খুঁজেপেতে শেষটায় ম্যারিয়ানার ভূমিকায় অভিনয় করার মতো উপযুক্ত চুলের রঙ্ খুঁজে পেয়েছেন। কিন্তু গায়ের ঘাম ছুটিয়ে গিয়ে শুনলে কি? সে নাকি এমন রঙ্ যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। আর তার প্রয়োজনও নেই লানার, কারণ আজই সকালে তিনি তাঁর মেয়ে চেরিলের মাথা থেকে একগোছা চুল কেটে এনেছেন সেই অনির্বচনীয় রঙের নমুনা হিসেবে। এক্ষেত্রে অবশ্য রঙ্‌টি নিখুঁত বলেই মনে হোল, কিন্তু চিত্রনির্মাণের পর্বতপ্রমাণ দায়িত্ব ও পরিশ্রম এ জাতীয় ভাবপ্রবণতার প্রশ্রয় দেয়না। রঙ্‌টি পরীক্ষাসাপেক্ষ; পর্দায় গিয়ে কিভাবে দাঁড়াবে তা দেখতে হতে বৈকি।

যাই হোক বহু গবেষণার পর মিস্ টার্ণারের চুল সম্বন্ধে একটা স্থির সিদ্ধান্তে আসা গেল: ঐরঙে তাঁর চুল রঙ্‌করা হবে এবং সেই রঙ্‌করা চুল পরে তাঁর মুখখানি কেমন দেখায় তাও দেখা হবে। এ শুধু একবার নয়, এরকম পরীক্ষা আমাদের করতে হয়েছিল একত্রিশবার—লানার একত্রিশটি বিভিন্ন পোষাকে সে চুল কেমন মানায় তাই দেখবার জন্যে।

এ পর্ব মিটতে না মিটতে আবার তাল দিতে হোল স্বরগ্রামের আর এক দিকে,—অর্থাৎ একেবারে 'সা' থেকে 'নি'তে। স্পষ্ট মনে আছে আমাকে অন্ততঃপক্ষে বার কুড়ি যেতে হয়েছিল তিন নম্বর লটে—আমাদের ভূমিকম্পের দৃশ্য পরিদর্শন করতে এবং তার নানা বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা ক'রতে, যাতে তবহু প্রাকৃতিক ভূমিকম্পের মতো হয়। সেইজন্যে মাটিতে জায়গায় জায়গায় হাইড্রলিক র‍্যাম বসিয়ে মাটি ফাটানোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

যাক সে কথা,—ভূমিকম্পের ব্যাপারে যে আমাদের কি রকম হৃদকম্প উপস্থিত হ'য়েছিল সেইটাই আগে বলি। সট্ নেবার হপ্তা কয়েক আগে থেকেই আমাদের মাথায় ঘুরে কুকুর পাগল। রীতিমত চিন্তায় পড়লাম যখন মিস্ টার্ণার এসে অকপটে ও নিঃসঙ্কোচে জানালেন যে তিনি জীবনে কখনও আর্তনাদ করেননি এবং এর জন্যে গোপনে বাড়ীতে মহড়াও নাকি দিয়েছেন কিন্তু তবুও তাঁর আর্তনাদ সফল হয়নি। এখন ব্যাপারটা হোল এই—ভূমিকম্পের সব বীভৎসতা মূর্ত হয়ে উঠবে লানার উপর্যুপরি উৎকণ্ঠিত আর্তনাদে এবং তার ফলে সন্তানসম্ভবা লানার অকাল প্রসব ঘটবে। এবং শুধু যে তাঁর আর্তনাদেই আমাদের কাজ চ'লবে এমন নয়—সেই সঙ্গে তাঁর মুখে চোখে ভীতি ও বেদনার সুস্পষ্ট ছাপও ফুটে ওঠা চাই। কিন্তু তা' যদি না হয় তাহোলে সবই তো পণ্ডশ্রম! আমি তো ভীষণ ঘাবড়ে গেলাম। কিন্তু আমাদের পরিচালকমশায়,—

চিত্রবাণী

দৃশ্যের স্থান নির্বাচন একটা কম ঝামেলার ব্যাপার নয়। এর জন্যে তোমাকে ছুটতে হয় লাইব্রেরীতে। এ লাইব্রেরী অবশ্য তোমাদের পাঠাগারের মতোই তবে বইয়ের বদলে এখানে বিশেষ বিশেষ নির্বাচিত স্থানের হাজার হাজার রীল ফিল্ম্ থাকে। তা' থেকে বেছে নিয়ে পর্দায় প্রোজেক্ট করে তোমার ছবির উপযুক্ত স্থান পছন্দ করতে হয়। গ্রীন্ ডলফিন্ ষ্ট্রীটের জন্যে আমরা লাইব্রেরী তন্নতন্ন করে খুঁজেছি, কিন্তু খুঁজেছি তা' পাইনি। তাই আবার ছুটতে হোল। এবার আর ছোটা নয়, স্রেফ্ ওড়া, আমাদের মনোমত বিরাট মহীরুহ পরিবেষ্টিত স্থান নির্বাচনের খাতিরে কিছু না গোলেও অন্তত হাজার বারো মাইল এদিক্ ওদিক্ উড়তে হোয়েছে। উড়ে উড়ে শেষটায় ষ্টুডিও থেকে হাজার মাইল দূরে উত্তর কালিফোর্নিয়ার ক্ল্যামাথ্ নদীর ধারে পছন্দমত সেই বিরাট গাছওলা স্থানের সন্ধান পাওয়া গেল। কিন্তু সে এমন এক জায়গা যেখানে হুট্ ব'ল্তে যাবার উপায় নেই। মহা ঝঞ্ঝাটের ব্যাপার। বিমানে চেপে যাও সান ফ্রান্সিস্কোয়; সেখান থেকে বাস ধরে যাও আর এক জায়গায়, সেখান থেকে আবার বাসে উঠে যাও আর এক জায়গায়, তারপর ঠেলো নৌকো। হ্যাঁ সত্যি, একটুও বাড়িয়ে বলছিনা। রীতিমত বারকয়েক নৌকো ঠেলে তবে সেই বাঞ্ছিত স্থানে পৌঁচেছি, আর সেই নৌকোতেই কুড়ি মাইল দূরে আমাদের আস্তানা গাড়তে হোয়েছিল।

আর সব স্থান নির্বাচনে আমাদের যেতে হয়েছিল অনেক মাইল দূরে মনটারীতে, দক্ষিণের লাগুনাতে; এবং প্রশান্ত মহাসাগর উপকূলের ড়ু'টি জায়গায়—যাদের কোন সহুরে নামের পরিচয় নেই। কারণ তারা কোন সহরের ধারে কাছে নয়। তুমি হয়তো শুনলে অবাক হবে—ছবিতে যে গুহা দেখেছো আসলে ওটার কোন অস্তিত্বই নেই। মনটারী, লাগুনা ও ষ্টুডিও সেটের দৃশ্যের টুকরো টুকরো অংশ জুড়ে অমন করা হোয়েছে। সেই যে যেখানে বিরাট গর্জ্জন ক'রে জল এসে গুহা ভাসিয়ে নিচ্ছে, আর তার হাত থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্যে ডোনা রীড উঠছে পাহাড়ের বুক বেয়ে,—সেই জলপ্লাবনের একটি সটের জন্যে তিনটি বিভিন্ন গুহার তিনটি বিভিন্ন সট্ নিতে হোয়েছিল। আর, এক একটি সট্ নেওয়া মানেই ৩৫ ফুট উঁচু প্ল্যাটফর্মের ওপর ওঠা, নইলে তো জলের তোড়ে যন্ত্রপাতি শুদ্ধ আমাদের সবাইকে স্রেফ ভিজে বেড়াল বনে যেতে হবে! দেখোনা একবার, ডজনখানেক বার ৩৫ ফুট উঁচু মই বেয়ে ওঠা-নামা করতে টেঙ্রীর জোরটা কেমন লাগে!

ওদিকে তখন তিন নম্বর লটে তৈরী হ'চ্ছিল ইংলীশ চ্যানেলের বন্দর ও জল-বাঁধ সেণ্ট পিয়ারের সেট। এই ধরণের এত বড় সেট এম্, জি, এম্ এর ইতিহাসে আর কখনও হয়নি। যদিও আগে থেকে সব এঁকেজুঁকে সেটের মডেল তৈরী ক'রে নেওয়া হয়েছিল তবুও তৈরীর সময় প্রায় রোজই কিছু না কিছু অদল বদল করতে হোত। এই পরিবর্তন প্রধানত: পরিচালকের কাজ হোলেও এক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের, অর্থাৎ প্রযোজক ও পরিচালকের মধ্যে এমন সহযোগিতা ছিল যে সুটিঙের সময় রোজই আমি ও মিঃ স্যাভিল্ চট্ ক'রে দশ মিনিটে আমাদের লাঞ্চ সেরে বাকি সময়টুকু কাটিয়ে দিতাম সেণ্ট পিয়ারের সেট পরিদর্শনে। কখনও বাঁধে উঠছি, কখনও বা পাহাড়ে, ঢুকছি গিয়ে বড় বড় সালতি আর জাহাজের ভেতর, কিম্বা দড়ি বেয়ে নামছি মাটির নীচে, উঠছি গিয়ে ঝড়ে-পড়া গাছগুলোর ওপর। পেল্লায় এক একটা গাছ! গুঁড়িগুলো তা' প্রায় দশ ফুট চওড়া হবে।

এ ছাড়া জোয়ারের দৃশ্যে বিরাট ঢেউ দেখানোর মস্ত একটা হাঙ্গামা ছিল। তার জন্যে গভর্ণমেণ্টের ডিস্পোজাল থেকে ড়ুটো ১৫০০ হর্স পাওয়ারের অ্যালিসন এয়ারপ্লেন মোটর কিনতে হয়। সেগুলো খাটানো হয় ড়ু' নম্বর লটের এক কোণে। সেই বিরাট ঢেউ, যার নিষ্ঠুর আঘাতে উইলিয়ামের সাল্তি খড়কুটোর মতো তলিয়ে গেল,—তার যান্ত্রিক মহড়া দেখতে দেখতে আমার কেবলই মনে হ'চ্ছিল জীবনে এমন

চিত্রবানী

নিদারুণ ভয়াবহ বিপদের সম্মুখীন আর কখনও হইনি। আমরা তখন ছিলাম শূন্যে—রেলিং-বিহীন প্ল্যাটফর্মে, শেকল দিয়ে ঝোলানো ক্যামেরার পায়া আঁকড়ে। আর উইলিয়ামের ভূমিকায় ব্যাচারী রিচার্ড হার্টকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে দেখে প্রতি মুহূর্ত্তেই ভাবছিলাম এই বুঝি রাক্ষুসে ঢেউ আমাদেরও ভাসিয়ে নিয়ে যায়! যদিও সে ভীতি অমূলক। কারণ রিচার্ডকেই ভাসিয়ে নেবার কথা, আমাদের নয়। তাছাড়া তখন আমাদের পায়ে ছিল রবারের বুট, আর গায়ে ছিল তেলা চামড়ার জ্যাকেট। 'গ্রীন্ ডলফিন্ ষ্ট্রীটে'র রবারের বুট ও চামড়ার জামার জন্যে বিশেষ একটি বিভাগ খুলতে হয়েছিল এবং তার ভারপ্রাপ্ত কর্মীটিকে কম খাটুনী খাটতে হয় নি। কারণ কুলি মজুর থেকে সুরু করে পরিচালক, ক্যামেরাম্যান, অভিনেতা অভিনেত্রী, এমনকি ব্যাচারী প্রযোজক অবধি সবাইকেই সেটের পর সেট শুধু জল নিয়েই কারবার করতে হ'য়েছে।

ছবির সুটিং একবার আরম্ভ হোলেই যে প্রযোজকের কাজ ফু'রিয়ে গেল এমনটি ভেবো না। বরং তখন থেকেই তার দায়িত্ব আরও বাড়ে। বোজকার অগ্রগতির দিকে লক্ষ্য তো রাখতেই হয় তার ওপর আবার ভবিষ্যৎ দৃশ্য গুলোর সেট, সাজপোষাক, পরিবেশ এবং ঐ জাতীয় সব জিনিষগুলোর পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি নিয়েও রীতিমত মাথা ঘামাতে হয়। ছবির জন্যে হয়তো পঁচিশ কিম্বা তিরিশটি বড় বড় সেট জুটলো, তাও আবার সব এক জায়গায় নয়—এম্, জি, এম্, ষ্টুডিওর এক, দুই, তিন নম্বর লটে ছড়ানো। তার মানে দু'শো একর জমি জুড়ে। তিরিশ নম্বর ষ্টেজটি আমার অফিস থেকে প্রায় আধ মাইল দূরে, আর তিন নম্বর লট হোল পাঁচ মাইল দূরে। যদিও এই সব ঘোরাঘুরির জন্যে মোটর পাওয়ারই কথা এবং ইচ্ছে করলেই পাওয়া যায় কিন্তু তবুও অনেক ক্ষেত্রেই তা' হয়ে ওঠে না। বেশীর ভাগ সময়ই হয় হাঁটতে এবং তার চেয়েও বেশী হয় দৌড়োতে। ষ্টুডিওর সব কাজই তড়ি-ঘড়ি। সময়ই আমাদের কাছে সব চেয়ে মূল্যবান।

ছবির কাজে এমন অনেক প্রশ্ন ওঠে যেগুলো তোমাদের কাছে অতি তুচ্ছ হ'লেও আমাদের কিন্তু তা' নিয়ে মাথা ঘামাতে হয় যথেষ্ট। যেমন ধর: অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংলীশ চ্যানেলের কোন দ্বীপের ধনী ও অভিজাত ঘরের মেয়ে, হাই-হীল জুতো পরা যার অভ্যেস, সে কি নিউজিল্যাণ্ডের গ্রামের বৌ হয়েও তাই পরবে? রূপগরবিনী তরুণী কি ভীন্ গাঁয়ে গিয়ে তার চুল বাঁধার কায়দা বদলাবে? এই ধরণের নানা সমস্যার সমাধান করতে হয়েছিল আমাদের দিদিমা ঠাকুরমার চুলবাঁধার কায়দা নিয়ে গবেষণা ক'রে, পাছে "গ্রীন্ ডলফিন ষ্ট্রীটে"র সহর গাঁয়ে লানা টার্ণারের চুল নিয়ে কোন বিরূপ সমালোচনার উদ্ভব হয়।

কাহিনীতে মিস্ লানা টার্ণারকে চ্যানেল দ্বীপের একজন মস্ত বড় ধনীর দুলালী ক'রে আঁকা হয়েছে। তিনি তাঁর পোষাক পরিচ্ছদ, প্রসাধন সামগ্রী, সবই আনান খাস প্যারিস থেকে। সুতরাং কাহিনীকে অবলম্বন ক'রে আমরা দেখালাম টার্ণার এলেন তাঁর নিউজিল্যাণ্ডের নতুন বাড়ীতে—তাকে সুখময় ও সুন্দর ক'রে গ'ড়ে তোলবার জন্যে এবং সাধ্যমত নিজের রূপ ও আভিজাত্য ফুটিয়ে তোলবার জন্যে সঙ্গে আনলেন ট্রাঙ্ক আর সুটকেশ বোঝাই মালপত্তর। এ ছাড়া আরও অনেক জাহাজ বোঝাই মাল আমদানীর দৃশ্য দেখানো হোয়েছে—(মনে রেখো তাঁর বাবা আদারব্যাপারী নন, রীতিমত একজন জাহাজের ব্যবসায়ী)—ফলে আমাদের প্রতিপন্ন করার সুবিধা হ'য়েছে যে তাঁর আত্মসম্মান ও আভিজাত্যের উপযোগী সাজসজ্জাতে তিনি মোটেই বেমানান নন। স্বামীর ঘরে এসেই তিনি ক'রলেন কি, সব আগে সুরু ক'রে দিলেন সেই আদিমযুগীয় বাড়ীখানাকে নতুন ক'রে সাজাতে। আর যেই ভূমিকম্পের ধ্বংসলীলা শেষ হ'য়ে গেল ওমনি তিনি আবার তাঁর ট্রাঙ্কগুলো থেকে জিনিসপত্তর খুঁজে পেতে সাজাতে বসলেন তাঁর ভাঙাবাড়ী, তাঁর ভাঙা তোষাখানা।

যখন জোয়ার এসে গুহা ভাসিয়ে নিল ভুখন্-প্রাণ

বাঁচাতে পাহাড় বেয়ে ওঠা ডোনা রীডের পক্ষে একটা মহা সমস্যা হ'য়ে দাঁড়ালো। প্রশ্ন উঠ্লো,—তখনকার দিনের মেয়ের পক্ষে মখমলের জবরজঙ্ জামাকাপড় প'রে সেই [illegible] পাহাড় বেয়ে কতখানি ওঠা সম্ভব? এবং তার চেয়ে তাঁর দেহ ও পোষাকপরিচ্ছদেরই বা ক[illegible] হওয়া স্বাভাবিক? এতে অবশ্য সবাই এ[illegible] দিলেন,—আজকালকার স্বল্প পোষাক প[illegible] তুলনায় সেকালের মেয়েদের পক্ষে ওই ধরণের পোষাকে পাহাড়ে ওঠা মোটেই অসুবিধের ছিলনা। কারণ তাঁরা অভ্যস্ত এবং জীবন বাঁচাতে গিয়ে একশো বছর আগেকার মেয়ে মরিয়া হ'য়ে জবরজঙ্ পেটিকোট, স্কার্ট আর কাঁচুলীর হাজার বাধা সত্বেও যে অমানুষিক দৈহিক কষ্ট বরণে সক্ষম তার প্রমাণ পাওয়া যায় ইতিহাসের বহু বীরাঙ্গনার স্মরণ দৃষ্টান্তে।

তারপর দেখা দিল আর এক সমস্যা। প্রশ্ন উঠ্লো, ইতিহাসের বীর রমণীরা কি প্রয়োজন হ'লে নিজেদের বেশভুষার কিছু অংশ পরিত্যাগ ক'রতে কুণ্ঠা বোধ করেন? মতামত নিয়ে দেখা গেল,—হাঁ, সে যুগের মেয়েদের স্বভাবিক শালীনতাবোধ এত বেশী ছিল যে লজ্জা নিবারণের অবলম্বন পরিত্যাগের সামান্যতম চিন্তাও তাঁদের কাছে ভয়াবহ। যাই হোক শেষ পর্যন্ত অবশ্য দৃশ্যটির সট্ নেওয়া হোল। নেওয়া হোল এই তথ্যের ওপর নির্ভর ক'রে যে, প্রয়োজনের তাগিদে ভাবাবেগে সর্বকালের মেয়েরাই দৈহিক কার্যকারিতায় সমান।

কেউ কেউ বিস্ময় প্রকাশ করে ব'লেছিলেন—বিচার্ড কার্টের রণতরী 'ওরিয়ন্' আর 'গ্রীন ডলফিন্' জাহাজখানি একই সময়ে কি ক'রে 'চায়না কোষ্টে' আসে! কিন্তু তাঁদের এই বিস্ময় ভিত্তিহীন। তাদের জাহাজ দু'টিকে যাঁরা চেনেন এবং যাঁরা তখনকার দিনের প্রথা সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল তাঁরা কিন্তু এ সমালোচনাকে হেসেই উড়িয়ে দেবেন। উনবিংশ শতকে রচিত ঐতিহাসিক কিম্বা কাল্পনিক প্রায় প্রত্যেকটি কাহিনীরই সমুদ্রযাত্রার বর্ণনা দেখলে স্পষ্টই দেখা যায় যে একটি পরিচিত জাহাজের সঙ্গে পৃথিবীর কোন না কোন বন্দরে আর একটি পরিচিত জাহাজের সাক্ষাৎ হয়। কারণ সে সময়ে সমুদ্রপথ খুব বেশী ছিল না এবং সওদাগরী জাহাজগুলি বেশীর ভাগই যাতায়াত ক'রতো দু'একটি পরিচিত পথ ধ'রে। এক্ষেত্রে আমাদের ছবির জাহাজ দু'টি ইংলিশ চ্যানেলের বন্দর থেকে যাত্রা ক'রেছিল,—[illegible] বেশ, না হলেও অন্ততঃ একবারও যে তাদের [illegible] দেখা যেতে পারে এতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে?

এছাড়া আরও অনেক প্রশ্ন উঠেছিল। যেমন ধর,—ভ্যান হেফ্লিনের পরনে সাদা-জরী পোষাকপরিচ্ছদগুলো ঐতিহাসিক নির্ভুলতা সত্বেও কি আজগুবি ব'লে মনে হয় না? ইংলিশ চ্যানেলের জলের বড় গ্রীষ্মেই বা কি রকম হবে, আবার শীতেই বা কি রকম হবে? নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ায় ঘাসের ওপর, পাথরের ওপর, কাঠের ওপর, তুষার গল্তে কিরকম কি সময় লাগবে? এই তুষারের প্রশ্ন আমাদের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান। কারণ ছবিতে এক জায়গায় দীর্ঘক্ষণস্থায়ী আবেগময় একটি দৃশ্যে লানা টার্নার ও ডোনা রীডের অভিনয় আছে। দৃশ্যটির স্থান—গির্জার উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ। সেখানে ডোনা এসেছেন নতুন, ব্রহ্মচারিণীর ব্রতে দীক্ষিত হোতে। এখানে প্রশ্ন জুতো নিয়ে। ব্যাপার হোল—গির্জার উঠোনে তুষার প'ড়েছে এবং কয়েক মিনিট আগেই তা দেখানো হয়েছে, অতএব এমন অবস্থায় অন্দরের পাত্লা জুতো পায় দিয়ে কি বাইরে যাওয়া চলে? দৃশ্যটিকে রীতিমত মহড়া দিয়ে দেখে নেওয়া হয়, কারণ অনেক জিনিব তথ্য হিসাবে সত্য হোলেও বাস্তব ক্ষেত্রে চোখের কাছে মিথ্যা বলে ধরা প'ড়ে যায়। তাই সব সময় আমাদের প্রামাণিক হ'লেই চলে না, তাতে দর্শকের কাছ থেকে ফুলের তোড়ার বদলে ঢিলের ঝোড়াই এসে পড়ে। দর্শক যেখানে খুশি, সেখানে বুঝতে হবে আমরা ঠিকই করেছি!

এই যে এত সব প্রশ্ন আর সমস্যার উল্লেখ করলাম এর

'গ্রীন ডলফিন ষ্ট্রীট'এর কাহিনী

আঠারোশো চল্লিশ। চ্যানেল দ্বীপের বন্দর সেন্ট পিয়ারের শ্যামল পরিবেশে অর্থ আর আভিজাত্যের মধ্যে মানুষ হয় দুই বোন—ম্যারিয়ানা (লানা টার্নার) আর মার্গেরাইট (ডোনা রীড)। দিন যায় দিন আসে। এমনি ক'রেই একদিন আসে তাদের জীবনে রঙীন বসন্ত। আর হঠাৎ তার লীলাচপল মুহূর্তে যৌবনের বেলাভূমিতে এসে ঠেকে তরুণ উইলিয়ামের (রিচার্ড হার্ট) জীবন তরী। উইলিয়াম আসে তার বাবার সঙ্গে চ্যানেল দ্বীপে। অতনুর স্পর্শে মঞ্জরিত হয়ে ওঠে দুই বোনের মন। দুজনেই ভালোবাসে উইলিয়ামকে। কিন্তু উইলিয়াম যেন বেশী ভালোবাসে মার্গেরাইটকে,—শান্ত সমাহিতা মার্গেরাইটকে। ম্যারিয়ানার তা' বুঝতে দেরী হয়না একটুও। কিন্তু তবুও সেও তো ভালোবাসে উইলিয়ামকে! তাই উইলিয়ামের আজন্ম বাসনা, নৌ-বাহিনীতে যোগ দেওয়ার সুবিধা করে দিতে একটুও দ্বিধা বোধ করে না ম্যারিয়ানা।

এর পর কাহিনীর পটভূমি সরে যায় সুদূর চীন দেশে। সেখানে এক জলডাকাতির ষড়যন্ত্রের জটিলতায় জড়িয়ে একাধারে কাজ ও জাহাজ-হারা হয় উইলিয়াম। কিন্তু নিয়তির পরিহাস হয় আশীর্বাদ। হঠাৎ সে দেখতে পায় চ্যানেল দ্বীপের তার এক পরিচিত নাবিকের জাহাজ "গ্রীন ডলফিন"। তার দৌলতে ইংরাজ আইনের সীমানা পেরিয়ে পৌঁছে সে যায় অরণ্যময় নিউজিল্যাণ্ডে। সেখানকার এক অধিবাসী টিমথি হাসলামের (ভন হেফলিন) সহযোগিতায় ব্যবসা করে কাঠের। সুরু হয় উইলিয়ামের আরণ্যক জীবন। একমাত্র সঙ্গীরূপে আঁকড়ে ধরে সুরা।

আর তাই একদিন তার মত্ত-মনের মাতলামির সুযোগে কলমের মুখে দেখা দেয় নামের ভুল। তার ফলে কাহিনীর মোড় ঘুরে সৃষ্টি হয় মর্মান্তিক মনোবেদনার। মার্গেরাইটকে লিখতে গিয়ে উইলিয়াম লেখে ম্যারিয়ানাকে,—'তুমি এসো আমার জীবনের সঙ্গিনী হয়ে।'

একটি ভুলে চুরমার হয় দুটি বোনের স্বপ্নসৌধ। মার্গেরাইটের মন যায় ভেঙ্গে। ঘর ছেড়ে সে যায় ব্রহ্মচারিনীর ব্রতে দীক্ষিত হোতে। ওদিকে ম্যারিয়ানা ছোটে নিউজিল্যাণ্ডের ওয়েলিংটনে। টিমথির প্ররোচনায় উইলিয়াম কিন্তু কিছু ভাঙ্গেনা। দু'জনের বিয়ে হ'য়ে যায়। ম্যারিয়ানা কিন্তু কেমন যেন উইলিয়ামের অনুরাগের অভাব বোধ করে। তবুও মানিয়ে চলে, বুদ্ধি আর প্রেরণার প্রাবল্যে গুছিয়ে তোলে সংসার।

কিন্তু সেই সাধের সোনার সংসার একদিন ছারখার হয় ভূমিকম্পে। আর সেই বীভৎস মুহূর্তে আসে তাদের জীবনে প্রথম সন্তান। ম্যারিয়ানার মেয়ে হয়। কিন্তু কি নিষ্ঠুর পরিহাস! প্লাবনের মুখে প্রাণ বাঁচিয়ে উইলিয়াম পালিয়ে যায়। বাঁচায় তার পরিচিত সেই নাবিক ছাড়া "গ্রীন ডলফিনের" আর সব যাত্রীদের। তারপর মাওরী আর শ্বেতাঙ্গদের দ্বন্দ্বে ধরা পড়ে ম্যারিয়ানা আর সদ্যজাতা ভেরো'নিকা। কিন্তু টিমথি তাদের উদ্ধার করে।

তারপর? তারপর আবার তারা ফিরে যায় সেন্ট পিয়ারে। সেখানে গিয়ে ম্যারিয়ানা লক্ষ্য করে উইলিয়াম এতদিন শুধু মার্গেরাইটকেই ভালোবেসে এসেছে। তার শেষ সংশয় দূর হয়। ভেঙ্গে যায় তার আঘাতে তার এতদিনকার সযত্ন-লালিত 'হয়তো ভালোবাসে আমাকে'র ভিতে গড়া মনের প্রাসাদ। তাই সে দিতে চায় তার প্রেমাস্পদকে বোন মার্গেরাইটের হাতে সঁপে। কিন্তু মার্গেরাইট যে ওদিকে খুঁজে পেয়েছে শাশ্বত শান্তির স্থান গির্জার বেদীমূলে। উইলিয়ামও সরিয়ে দেয় সে প্রস্তাব। আবার বিয়ে করে ম্যারিয়ানাকে, সুরু করে নতুন ক'রে নতুন জীবন, নতুন প্রেমের তারে,—ফেলে আসা দিনে মার্গেরাইটের স্মৃতির রঙ মুছে।

মধ্যে এমন একটিও নেই যেখানে কায়িক, মানসিক ও শৈল্পিক শ্রমের প্রয়োজন হয় না। কারণ প্রযোজক কিম্বা পরিচালকের প্রত্যেকটি সিদ্ধান্তই নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তার উপদেশের ওপর এবং তথ্যের ব্যাখ্যার পর প্রশ্নের সন্ধান করে তবে তার বাস্তব সমাধান করতে হয়।

তবু এমনি অদ্ভুত মজা যে এর একটি কথারও কোন কিছু করবার নেই "গ্রীন্ ডলফিন ষ্ট্রীট" ছবিখানি ভাল হয়েছে কিনা প্রশ্নটির ওপর! এই যে এক হাজার এক সিদ্ধান্ত, এই যে হাজার হাজার মাইল ছোটাছুটি, অমানুষিক মানসিক ও দৈহিক পরিশ্রম, যার ফলে নিউমোনিয়া হোলেও হোতে পারতো, এই যে তুষার ঢাকা গির্জা প্রাঙ্গনে ঠাণ্ডা অসাড় পায়ে দাঁড়িয়ে লানা আর ডোনার অভিনয়,—এর তো কোনই দাম নেই দর্শকের কাছে! তাঁরা আসেন পর্দার প্রমোদের লোভে, কিন্তু তার পেছনকার প্রমাদের খোঁজ তো কই রাখেন না! যে আনন্দ আজ তাঁরা কিনলেন টাকার জোরে তার পেছনে যে রয়েছে প্রযোজক, পরিচালক আর তাঁদের পাঁচ হাজার সহকর্মীর বিরামহীন বিশ্রামহীন পরিশ্রম তা' কি তাঁরা জানেন?

[মূল ইংরাজী থেকে মনোজ সান্যাল কর্ত্তৃক অনূদিত]

ন্যাশনাল সাউণ্ড স্টুডিয়োর সদ্যমুক্ত
ছবি 'সন্দীপন পাঠশালা'য়
মীরা সরকার
পরিচালনা : অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়

চিত্র ও মঞ্চের অভিনয়

নটসূর্য্য অহীন্দ্র চৌধুরী

এই বিষয়ে 'চিত্রবাণী'র পাতায় আলোচনা করতে গিয়ে আগের পর্বে যে ছয় রকম কলাকৌশল মঞ্চশিল্পীকে আয়ত্ত করতে হয় বিশদভাবে তা বলবার চেষ্টা করেছি। সেগুলি হোলো—

(১) চরিত্রচিত্রণ

(২) স্বরনিক্ষেপের কারুকার্য্য

(৩) সময়জ্ঞান

(৪) স্থান-কাল-পাত্র জ্ঞান

(৫) গতি ও ভাববোধ

আর (৬) ব্যক্তিগত অনুভূতি

এর মধ্যে ছায়াছবির শিল্পীকে আয়ত্ত করতে হয় তিনটি বিদ্যে। তা হোলো—(১) চরিত্রচিত্রণ (২) স্থান-কাল-পাত্র জ্ঞান (৩) ব্যক্তিগত অনুভূতি—একথাও এর আগেই আলোচনা করেছি। এখন দেখা যাক্ চিত্র ও মঞ্চ অভিনয়ের কলাকৌশলের এই কমন ফ্যাক্টরগুলির কোনো তারতম্য বা প্রভেদ প্রয়োজন হয় কিনা।

প্রথম হোলো চরিত্রচিত্রণ ; একটি চরিত্রকে চিত্রিত করতে হলে তাকে দু'ভাগে ভাগ ক'রে নিতে হয়, অন্তর ও বাহ্য। চরিত্রের এই অন্তর চিত্রণে দরকার হয় বাচন ও গতিভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য আর বাহ্যদিকের রূপায়ণে লাগে রূপসজ্জা। অন্তর চরিত্র বিকাশে চলচ্চিত্র অভিনেতাকে শুধু চরিত্রগত বিশেষ বিশেষ বাচন ও গতিভঙ্গীর সাহায্য নিতে হয় অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট চরিত্রটি কি ভাবে কথা বলবে, চলবে, ফিরবে, বসবে তারই একটা খসড়া বা Blue print নিজের কল্পনায় এঁকে নিয়ে সেটাকে নিজের দেহযন্ত্রের সাহায্যে প্রকাশ করা। কল্পনার খসড়া থেকে বাস্তব রূপ দেওয়া পর্য্যন্ত অবশ্য বিভিন্ন প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয় ; এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে সড়গড় হওয়াটা অনুশীলন ও সময় সাপেক্ষ। চিত্রনির্ম্মাতারা আজকাল এই সময়টুকুও দিতে অনেকসময়ই অপারগ হন, তাই চরিত্রবণ্টন বা ভূমিকা নির্ব্বাচন ব্যাপারে তাঁরা Type-casting নীতি অবলম্বন করেন। তাতে একই অভিনেতাকে বিভিন্ন ও বিচিত্র চরিত্রের রূপদান করতে হয় না। এটা হোলো একমুখী অভিনয়। যেমন ধরুন, কোনো অভিনেতা স্নেহপ্রবণ বৃদ্ধ পিতার ভূমিকায়, কোনো শিল্পী বা আত্মভোলা পরোপকার-পরায়ণ চরিত্রে, কেউ আবার বদমেজাজী খেয়ালী চরিত্রে এইরকম একটি বিশেষ টাইপ বা ধরণের চরিত্রে একখানা ছবিতে ভালো অভিনয় করলেন, তার ফলে তাঁকে বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একের পর এক ছবিতে ঐরকম টাইপ অভিনয় ক'রে যেতে হয়—তাতে অভিনেতা এবং চিত্র-নির্ম্মাতা উভয়েরই শ্রম ও সময় বাঁচে।

কিন্তু মঞ্চে এটি হবার উপায় নেই। কারণ এক একটি মঞ্চের সঙ্গে নির্দ্দিষ্ট অভিনেতৃসম্প্রদায় জড়িত থাকেন—তাঁদের মধ্যেই অভিনেয় নাটকের চরিত্রগুলি সবই ভাগ ক'রে

দিতে হয়। এইরকম type-casting নীতির সুর ধ'রে 'এই ভূমিকায় অমুককে নিয়ে এলে ভাল হয়, অতএব তাকেই ঐ অংশ দাও'—এই জাতীয় আব্দার রঙ্গমঞ্চের বেলায় চলেনা। কেননা, যে অভিনেতা ঐ রকম টাইপ-অভিনয় করতে পারেন বা এই জাতীয় ভূমিকাভিনয়ে নাম আছে যাঁর—তিনি অন্য আর একটি মঞ্চের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। কাজেই আলোচ্য মঞ্চের সঙ্গে জড়িত শিল্পীদের মধ্যেই যাঁকে পাওয়া যায় তাঁকেই ঐ টাইপের স্বকীয়তা ও বৈশিষ্ট্যটুকু আয়ত্ত করে কাজ চালিয়ে নিতে হয়। এতে অবশ্য এই শিল্পীর একটি উপকার হয় এই যে, তাঁকে বিভিন্ন ধরণের ভূমিকায় অভিনয় করতে হ'লে, তার মধ্যে চরিত্ররূপায়ণের একটা নিজস্ব ধারা এসে যায়—বিভিন্ন রূপ নিতে নিতে রূপের অন্তরে প্রবেশ করাও বিশেষ কষ্টসাধ্য হয়না। অনেক সময় দেখা যায় সাধনা, অনুশীলন, ধৈর্য্য, বুদ্ধি না থাকা সত্ত্বেও শুধু বিভিন্ন চরিত্রের রূপান্তরের মধ্যেই কোন এক সময় অভিনেতা নিজের অজ্ঞাতসারেই বাহ্যরূপকে ভেদ ক'রে চরিত্রের অন্তরে প্রবেশ ক'রে ফেলেছে। যখন সে এইরকম অন্তর ও বাহিরের এই পূর্ণ রূপ নিয়ে বেরিয়ে এলো তখন অভিনেতা নিজেই নিজেকে চিনতে পারলে না—লোকে বললে, একটা অদ্ভূত সৃষ্টি।

এর পর আসে বাহ্য রূপ অর্থাৎ রূপসজ্জা। ক্যামেরার এমনি অদ্ভূত আচরণ যে অনেকসময় অল্প কারিগরিতে দেওয়া হাল্কা রূপ সে সহ্য করতে পারেনা। তার চোখে এই আয়োজন বা আন্তরিকতার অভাব স্পষ্ট ধরা পড়ে যায়। অথচ Putty, Gauze, Pad, Collodion, Flint., Horse-hair প্রভৃতির সাহায্যে যে সব গুরুত্বপূর্ণ রূপসজ্জা (Heavy make-up) হয় তা ক্যামেরার চোখ এড়িয়ে যায়। বরিস্ কার্লফ্, কিম্বা লন চ্যানির মেক্-আপ কৃত্রিম ব'লে ধরা শক্ত। কিন্তু হাল্কা মেক্-আপ-এ পঞ্চাশ বছরের প্রৌঢ়কে পঁচিশ বছরের যুবকে রূপান্তরিত করার ফাঁকি অতি সহজেই ধরা পড়ে। Sophisticated society girl যে শ্রমিক বা চাষার মেয়ে নয় তা' ভূমিকাভিনেত্রীর চলন ও কথাবার্ত্তা বাদ দিয়েও সহজেই ধরা পড়ে। সেই কারণেই নামকরা বিদেশী ছবিতে যখন অভিনেতা অভিনেত্রীদের এইরকম পরিবর্ত্তন সাধনের প্রয়োজন হয় তখন তাঁরা শুটিং আরম্ভ হওয়ার কিছুকাল আগে থেকেই অনুরূপ আবহাওয়া বা location-এ খাপ খাইয়ে নেবার তালিম দেন। আবার প্রয়োজনানুসারে চুল-দাড়ি ইত্যাদি কৃত্রিম ব্যবহার না ক'রে নিজেরাই আসল চুল-দাড়ি রাখার ব্যবস্থা করেন। এইরকম চুল-দাড়ি রাখার উদাহরণ অবশ্য এদেশেও বিরল নয়।

আঠাশ বছর আগের কথা বলছি। তখন আমরা প্রথম ছবিতে অভিনয় করতে এসেছি। ছবিটির নাম 'সোল অফ্ এ স্লেভ'। এই কাহিনীতে যে চরিত্র আমাদের অভিনয় করার কথা তাদের মাথায় বড় বড় চুল থাকা দরকার। প্রাক্-বৌদ্ধ যুগের ব্যাপার। অথচ আমাদের মাথায় সাধারণের মতই দশ-আনা-ছ' আনা-ছাঁট। চুল। কাজেই মঞ্চে আমরা যেমন পরচুলা পরতুম তেমনি পরচুলার সন্ধান করলাম। এই নতুন পরচুলা বিশেষ যত্নে তৈরী করবার নির্দ্দেশ দিলাম। আশঙ্কা ছিল যদি এই পরচুলার কৃত্রিমতা ক্যামেরার লেন্সে ধরা পড়ে। 'trial' দিতে গিয়ে দেখা গেল—অতি জঘন্য দেখাচ্ছে। সে কৃত্রিমতাকে কিছুতেই ঢাকার উপায় নেই। আরও মুস্কিল হোলো এই যে এর চেয়ে ভালো পরচুলা তৈরী করার ভরসা তখনকার দিনের নামকরা রূপসজ্জাকর কারিগরেরাও দিতে পারল না। অগত্যা চুল রাখার ব্যবস্থাই আমরা করলুম এবং শেষ পর্য্যন্ত নিজেদের চুলেই কাজ চালিয়ে নিলাম। নির্ব্বাক 'কপালকুণ্ডলা' ছবিতে কাপালিকের ভূমিকায় অভিনয়কালে সে যুগের স্বনামধন্য অভিনেতা ৺প্রবোধ বসু নিজের আসল চুল-দাড়ি রেখেছিলেন। এই চুল-দাড়ি আবার তিনি রোজ পাকিয়ে পাকিয়ে পাট করতেন। উদ্দেশ্য, যতটা বীভৎস এবং ভয়ঙ্কর দেখায় দেখাক্ না। ঐরকম রুক্ষ চুল-দাড়ি, তারওপর প্রবোধবাবু বড় বড় গোল চোখে দৃষ্টি হেনে যখন

(শেষাংশ ২৩ পৃষ্ঠায়)

ছায়াছবির গল্প

দেবী চৌধুরাণী

[সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস—'দেবী চৌধুরাণী'। এই গল্পের সঙ্গে পরিচয় নেই এমন লোক বাংলাদেশে নেই বললেই চলে। বঙ্কিমের এই সর্বজনপ্রিয় উপন্যাসের কাহিনী অবলম্বন করে রূপায়ণ চিত্র প্রতিষ্ঠান যে ছায়াছবি নির্মাণ করেছেন—তা' আত্ম-প্রকাশের দিন গুনছে। মূল কাহিনীর সঙ্গে যাদের আজও পরিচয় লাভের সুযোগ ঘটে ওঠেনি, তাঁদের জন্যই আমরা এখানে 'দেবী চৌধুরাণী'র মূল বিষয়বস্তু সংক্ষেপে বিবৃত করছি। —সম্পাদক 'চিত্রবাণী']

"ও পি—ও পিপি—ও প্রফুল্ল—ও পোড়ারমুখী।"

"যাই মা।"

মায়ের ডাকে মেয়ে কাছে এলো। মেয়েটির নাম প্রফুল্ল। বড় অভাবের সংসার তাদের। মায়ে-ঝিয়ে চেয়ে-চিন্তে কোনরকমে দিন কাটায়। কিন্তু পরের কাছে ভিক্ষে ক'রে দিন চালানো প্রফুল্লর আর সহ্য হয় না।

মায়ের দিকে তাকিয়ে প্রফুল্ল বলে—'আমি কি অপরাধ করেছি যে শ্বশুরের অন্ন থাকতে খেতে পাব না।' প্রফুল্ল বিবাহিতা, কিন্তু ভাগ্যদোষে পরিত্যক্তা। অসামান্যা সুন্দরী ব্রাহ্মণকন্যা দেখে ভূতনাথের জমিদার হরবল্লভবাবু তাকে পুত্রবধূ করেছিলেন। কিন্তু বিবাহ-আসরে ঘটনাচক্রে প্রতিবাসীরা তার মায়ের নামে মিথ্যা কলঙ্ক আরোপ করে। হরবল্লভবাবু সেই মিথ্যাকেই সত্য বলে মেনে নিয়ে ছেলে নিয়ে চলে যান। সেই থেকে প্রফুল্ল তার বিধবা মায়ের কাছে পড়ে আছে।

কিন্তু প্রফুল্ল আর সেভাবে পড়ে থাকতে চায় না। মাকে সঙ্গে নিয়ে সে শ্বশুরবাড়ি যাত্রা করে। হরবল্লভবাবুর স্ত্রী-র মায়া পড়ে প্রফুল্লর ওপর। তিনি তার হয়ে কর্তাকে রাজী করাতে যান, কিন্তু কর্তা বড় শক্ত লোক। তিনি কিছুতেই প্রফুল্লকে তাঁর বাড়িতে থাকতে দিতে রাজী হন না। প্রফুল্ল ক্রমশঃ জানতে পারে তার দুই সতীন সেই বাড়িতেই থাকে। একজনের নাম সাগর; অন্যজনের নাম নয়নতারা। সাগর প্রফুল্লকে আদর করে এবং কৌশলে স্বামী ব্রজেশ্বরের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দেয়। একরাত্রি ব্রজেশ্বরের কাছে প্রফুল্ল থাকে। পরদিন বাধ্য হয়েই তাকে বিদায় নিতে হয়।

প্রফুল্ল স্বামীর দিকে তাকিয়ে বলে—'স্ত্রী ব'লে স্বীকার কর না কর দাসী বলে মনে রেখো।' বিদায়ের আগে ব্রজেশ্বর তার নিজের হাতের বহুমূল্য হীরার আংটিটি প্রফুল্লর হাতে পরিয়ে দেয়।

এর কিছুদিন পরে প্রফুল্লর মা মারা যায়। প্রফুল্ল তখন সম্পূর্ণ অনাথা। তার কাছে রাত্রে এসে থাকে পাড়ার ফুলমণি নাপিতানী। এই ফুলমণির ষড়যন্ত্রে এক গভীর রাত্রে প্রফুল্লকে অপহরণ করে দুর্গাপুরের জমিদার-অনুচর দুর্লভ চক্রবর্তী। কিন্তু ঘটনাচক্রে পথে ডাকাতের ভয়ে পাল্কী বাহকেরা প্রফুল্লকে ফেলে রেখে পালিয়ে যায়। প্রফুল্লও নিজের মান বাঁচাতে জঙ্গলে আত্মগোপন করে।

পরদিন সকালে প্রফুল্ল সেই পরিত্যক্ত প্রান্তরের শেষে এক ভাঙ্গা দালান আবিষ্কার করে। সেখানে এক মুমূর্ষু ব্রাহ্মণের সেবা করে সে। সেই ব্রাহ্মণ মরবার আগে তাকে এক গুপ্তধনের সন্ধান দিয়ে যায়। প্রফুল্ল কালক্রমে সাত ঘড়া মোহরের অধিকারিণী হয়।

এদিকে ফুলমণির মিথ্যা রটনায় সকলে, এমন কি প্রফুল্লর শ্বশুরবাড়ির লোকেরাও জানতে পারে যে, প্রফুল্ল মারা গেছে।

মোহর হাতে নিয়ে প্রফুল্ল যায় তরি-তরকারী চাল-ডাল

চিত্রবাণী

কিনতে। পথে দেখা হয় এক বলিষ্ঠ পুরুষের সঙ্গে। আলাপে আলাপে প্রকাশ হয়ে পড়ে—বলিষ্ঠ পুরুষ আর কেউ নয়, সে অঞ্চলের ডাকাতের সর্দার ভবানী পাঠক। ভবানী পাঠক প্রফুল্লকে 'মা' ব'লে সম্বোধন করে এবং অনুচরদের ডেকে বলে—'এই বালিকাকে তোমরা চিনে রাখ। একে আমি মা বলেছি। একে তোমরাও মা বলবে আর মায়ের মতো দেখবে। তোমরা এর কোনো অনিষ্ট করবে না, আর কাউকে অনিষ্ট করতেও দেবে না।" সেই থেকে প্রফুল্ল ভবানী পাঠকের আশ্রয়ে রইলো। কালক্রমে তারই নাম হলো—'দেবী চৌধুরাণী'।

ব্রাহ্মণ ভবানী পাঠক সাধারণ দস্যু নয়। অত্যাচারী ধনী বা জমিদারের অর্থ লুণ্ঠন করে সে নিপীড়িত জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করে। প্রফুল্লকে সে দীক্ষা দেয়। প্রফুল্লর দুঃখময় জীবনকাহিনী শুনে, ভবানী পাঠক তাকে তার দলের নেত্রীপদে অধিষ্ঠিত করে। তার কঠোর পরীক্ষার মধ্য দিয়ে প্রফুল্ল নিজের দৃঢ় চরিত্র গঠনের সুযোগ পায়। গীতার নিষ্কামধর্ম শিক্ষা করে প্রফুল্ল তার দীক্ষাগুরু ব্রাহ্মণ-দস্যু ভবানী পাঠকের কাছ থেকে। তাছাড়া লেখাপড়ার দিক থেকেও সে শিখলো অনেকখানি—তার সহচরী নিশি ঠাকুরাণীর কাছে। প্রফুল্লর বুদ্ধি তীক্ষ্ণ—কাজেই, খুব অল্প সময়ের মধ্যে সে বিখ্যাত সংস্কৃত কাব্যগুলি এবং সাংখ্য, বেদান্ত ও ন্যায়ের কিছু কিছু আয়ত্ত করে ফেলল। এইভাবে পাঁচ বছর কেটে যায়।

প্রফুল্ল একদিন ভবানী পাঠককে বলে—আমার কাছে যে ধন আছে, কিছু আপনার কাছে থাক্। এই ধন নিয়ে আপনি ধর্মাচরণে প্রবৃত্ত থাকুন। দুষ্কর্ম থেকে ক্ষান্ত হোন।

ভবানী পাঠক বলে—ধনে আমারও কোনো প্রয়োজন নেই। ধনও আমার প্রচুর আছে। ধনের জন্যে আমি ডাকাতি করি না।

প্রফুল্ল বিস্মিত হয়। বলে—তবে কি ?

ভবানী পাঠক উত্তর দেয়—এ দেশে রাজা নেই। মুসলমান লোপ পেয়েছে, ইংরেজ সম্প্রতি প্রবেশ করছে। তারা রাজ্যশাসন করতে জানেও না, করেও না। আমি দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন করি।

প্রফুল্ল যেদিন শ্বশুরবাড়ি থেকে প্রত্যাখ্যাতা হয়ে বাড়ি ফেরে তারপর দশ বছর পার হয়ে গেছে। এর মধ্যে পরিবর্তন হয়েছে অনেক। ইজারাদার দেবীসিংহ আর ডাকাতদের অত্যাচারে হরবল্লভ বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন। দেবীসিংহের পাওনা প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা বাকী পড়ায় হরবল্লভ রায়ের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বের হয়। ব্রজেশ্বর যায় সাগরের বাপের বাড়ি—টাকা ধার করতে। কিন্তু শ্বশুরের কাছ থেকে সে বিমুখ হয়ে ফিরে আসে। সাগর বলে—আর একদিন থাক। কিন্তু ব্রজেশ্বর থাকতে রাজী নয়। সাগর পায়ে পড়ে। ব্রজেশ্বর পা টেনে নিতে গিয়ে সাগরের গায়ে অসাবধানবশে আঘাত করে। সাগর ভুল বোঝে। সে মনে করে স্বামী তাকে পদাঘাত করে অপমান করে। সে বলতে যায়—'আমি যদি ব্রাহ্মণের মেয়ে হই তা হ'লে আমার পা—।' তার কথার জের ধরে জানালা থেকে কে যেন বলে—'আমার পা কোলে নিয়ে চাকরের মত টিপে দেবে।' ব্রজেশ্বর অভিমানক্ষুব্ধ হৃদয়ে ফিরে যায়। সাগর দেখে জানালায় দাঁড়িয়ে এক স্ত্রীলোক। সে জিজ্ঞাসা করে—'তুমি, কে গা ?' সেই স্ত্রীলোক তখন সংক্ষেপে উত্তর দেয়—'আমি দেবী চৌধুরাণী।' সাগর বিস্মিত হয়, ভয়-ও পায়। কারণ যে নাম তার কানে গেল, সে নাম যে ভয়ানক ! 'দেবী চৌধুরাণী' ইতিমধ্যে সকলের ত্রাস হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ব্রজেশ্বর কিন্তু প্রফুল্লর কথা কিছুতেই ভুলতে পারে না। অনেক খোঁজাখুঁজি করেছে সে প্রফুল্লর। তার মৃত্যুর সংবাদও সে বিশ্বাস করেনি মনে প্রাণে। সাগরের বাপের বাড়ি থেকে সে তখন নৌকা করে ফিরছিল। পথে সে ডাকাতদলের হাতে পড়ে। ডাকাতরা তাকে নিয়ে গিয়ে হাজির করে—'দেবী চৌধুরাণী'র সামনে। ব্রজেশ্বর ও দেবী তাকিয়ে থাকে পরস্পরের দিকে। দেবী যেন ব্রজেশ্বরকে চিনতে পারে। অলক্ষিতে দেবীর চোখ জলে

ভরে যায়। ব্রজেশ্বর আটক থাকে দেবী চৌধুরাণীর বজরায়।

বজরায় একটি মেয়ে তাকে নিয়ে হাসি পরিহাস করে। ব্রজেশ্বর তার গলার স্বর শুনে বলে—'তোমার নাম কি? গলা মোটা করে কথা বলছ কেন? তুমি কি চেনা মানুষ?'

মেয়েটি বলে—'আমি তোমার মনিব—আমাকে 'আপনি,' 'মশাই' আর 'আজ্ঞে' বলবে। খানিক বাদে সে আবার ব্রজেশ্বরকে বলে—'আচ্ছা, একটা কাজ জান? পা টিপতে জান?' ব্রজেশ্বর তার সঙ্গে রসিকতা করতে গিয়ে বল্লে—'তোমাদের পা টিপব, সে তো ভাগ্য।'

ব্রজেশ্বর মেয়েটির পা তুলে নেয়। মেয়েটি ডাকে—'রাণীজি! এদিকে আসুন।' দেবী চৌধুরাণী আসছে শুনে ব্রজেশ্বর পা ছেড়ে দেয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে টের পায় মেয়েটি আর কেউ নয়—সাগর। সাগর হাসে। বলে—'থাক্ আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা হলো। তুমি আমার পা টিপেছ।'

ব্রজেশ্বরের সঙ্গে দেবী চৌধুরাণীর সাক্ষাতের দৃশ্য বড় করুণ অথচ মধুর। প্রফুল্লর মুখ বারবার ভেসে উঠলো ব্রজেশ্বরের সম্মুখে। একি সেই! দেবী তাকে এক ঘড়া মোহর দিয়ে বল্লে—'সাগরের মুখে শুনেছি, আপনার পঞ্চাশ হাজার টাকার বিশেষ প্রয়োজন।' ব্রজেশ্বর সে টাকা গ্রহণ করে। বলে—'টাকা জুটলে, আমি আবার ফেরত দিয়ে যাব।' বিদায়ের আগে দেবী তার আঙুল থেকে একটি আংটি খুলে ব্রজেশ্বরের হাতে পরিয়ে দেয়। ব্রজেশ্বরের বিস্ময়ের সীমা থাকে না।

সাগরকে নিয়ে ব্রজেশ্বর চলে যাবার পর নিশি এসে দেখে—দেবী নৌকার তক্তার উপর লুটিয়ে প'ড়ে কাঁদছে। দেবী চোখ মুছে নিয়ে বল্লে—এখন বজরা খুলে দিতে বল। তখন সেই জাহাজের মতো বজরা চারখানি পাল তুলে ছুটে চলে। সাগরের কাছে ব্রজেশ্বর জানতে পারে দেবী চৌধুরাণী আর কেউ নয়—প্রফুল্ল। অনেক ভেবে তার মুখ দিয়ে তখন শুধু বের হলো—'প্রফুল্ল ডাকাত! ছি!'

কালক্রমে হরবল্লভ রায় গোপনে ইংরেজ কলেক্টরের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে 'দেবী চৌধুরাণী'কে ধরিয়ে দিতে প্রস্তুত হলেন। কিন্তু ব্রজেশ্বর সে-সব জানে না। তার মনে তখন প্রফুল্লর চিন্তা। নির্দিষ্ট দিনে প্রফুল্লর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হলো নদীবক্ষে বজরার ভিতরে। তাদের সেই মিলন বড়ই করুণ। প্রফুল্লর চোখে শুধু জল।

তারপর ইংরেজ সিপাহীদের সঙ্গে দেবী চৌধুরাণীর দলের শুরু হলো সংগ্রাম। দেবীর বুদ্ধি ও কৌশলে ইংরেজরা পরাজিত হলো।

প্রফুল্লকে সঙ্গে নিয়ে ব্রজেশ্বর তখন চল্‌ল ভূতনাথ গ্রামে, তার বাড়িতে। হরবল্লভ রায় সব টের পেয়ে লজ্জিত হলেন। প্রফুল্ল নিজের সংসারে প্রতিষ্ঠিত হলো। তার বিচক্ষণ ও সুবিবেচনার ফলে সংসারের শ্রী ফিরে গেল। পঞ্চাশ হাজার টাকায় প্রফুল্ল তখন এক অতিথিশালা নির্মাণ করিয়ে দরিদ্র নারায়ণের সেবার ভার নিল। সেই অতিথিশালার নাম হলো—'দেবীনিবাস'।

চিত্র ও মঞ্চের অভিনয়

(২০ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

পদ্মায় অভিনয় চালালেন তখন মনে হোলো তিনি যেন দর্শকের সমস্ত চেতনাকেই নাড়া দিলেন সজোরে। ছবিটি নির্বাক হলেও তাঁর অনুচ্চারিত 'কপালকুণ্ডলে' ডাক যেন দর্শকের কানে এসে ধাক্কা দিল। মুণ্ডিত-মস্তক বা পাঁচ-সাত দিন না কামানো দাড়ি—এসব তো আমরা প্রায়ই ব্যবহার করতে দেখেছি। নির্বাক যুগে 'দেবী চৌধুরাণী' বা সরাকবরের 'ইন্সপেক্টর' ও অন্যান্য অনেক ছবিতে দেখা গেছে এই রকম ব্যবস্থা অবলম্বন করতে।

তবে সে যুগ কেটে গেছে। তখন শিল্পীরা একখানা ছবিতেই কাজ করতেন। যতদিন না এই একখানি ছবি শেষ হয় ততদিন অন্য ছবিতে কাজ করার উপায় ছিল না, তাগিদও ছিল না। কিন্তু এখন পরচুলা পরারও ফুরসৎ মেলেনা—কাজেই যা তোমার আছে তাই দিয়েই যতটা পার কাজ চালিয়ে দাও—এই হয়েছে বর্তমান ব্যবস্থা। তাছাড়া অবশ্য অজুহাতও একটা আছে। তা' হচ্ছে—'ক্যামেরায় ধরা পড়ার আশঙ্কা আছে যখন, অতএব আগাগোড়া continuity রাখারও ঝামেলা অতএব কাজ নেই ওতে,' ইত্যাদি ইত্যাদি।

আহিরনী

ফাল্গুন, ১৩৫৫

ভারতীয় ভাষায় রূপান্তরিত বিদেশী ছবির হাত থেকে ভারতীয় চলচ্চিত্রশিল্প সংরক্ষণের আবেদন

ভারতীয় ভাষায় রূপান্তরিত বিদেশী ফিল্ম সম্পর্কে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী (ও তথ্য ও বেতার বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী) মাননীয় সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের নিকট 'ভারতীয় চলচ্চিত্র প্রযোজক সম্মেলনের স্মারকলিপি :

ভারতীয় চলচ্চিত্রশিল্প গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছে যে, বিদেশী চিত্র প্রদর্শকেরা এদেশের ভাষায়, বিশেষ করে হিন্দুস্থানীতে রূপান্তরিত বিদেশী ছবি প্রদর্শনের চেষ্টা করছেন। বছর কয়েক আগে থেকেই তাঁদের এই চেষ্টা বাস্তব সত্যে পরিণত হতে দেখে, 'ভারতীয় চলচ্চিত্র প্রযোজক সঙ্ঘ (IMPPA) এবং 'ভারতীয় চলচ্চিত্র সমিতি' (MPSI) ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত বারবার এ বিষয়ে ভারত সরকারের কাছে আবেদন জানিয়ে, ভারতীয় চলচ্চিত্রশিল্পের উপর বিদেশীদের এই আঘাত বন্ধ করতে অনুরোধ করেছেন। কিন্তু তখন আমাদের গভর্ণমেন্ট এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। আমাদের শিল্পোন্নতি বিশেষ করে চলচ্চিত্রশিল্পের উন্নতি সম্পর্কে তাঁদের বিশেষ কোনো উৎসাহ বা আগ্রহ দেখা যায় নি। তাছাড়া, হিন্দুস্থানীতে রূপান্তরিত বিদেশী ছবি দেখাবার চেষ্টা তখন এতটা বেশী প্রসার লাভ করেনি যাতে আমাদের দেশীয় শিল্পের উন্নতির পক্ষে তা অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

কিন্তু অবস্থার এখন দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে। যুদ্ধোত্তর যুগে মার্কিন ও ব্রিটিশ চিত্র ব্যবসায়ীরা এটা স্পষ্টই লক্ষ্য করেছেন যে, আগের মত পৃথিবীব্যাপী তাঁদের আর ছবির বাজার নেই। কারণ, প্রায় সব দেশই (ভারতের মত একটি দেশ ছাড়া!) তাদের এই জাতীয় শিল্পের প্রসারের দিকে মন দিয়েছেন ও সর্বপ্রকার সহযোগিতা করছেন। এই জাতীয় শিল্প সংরক্ষণ ও তাকে অর্থ সাহায্যে পুষ্ট করবার জন্যে বিভিন্ন দেশেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে। এই স্মারকলিপিতে অন্যত্র সেই সব ব্যবস্থাও উল্লিখিত হয়েছে দেখা যাবে। বিভিন্ন দেশে ঐ সকল ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়ার ফলে পৃথিবীর বাজারে মার্কিন ও ব্রিটিশ ফিল্মের কাটতি দোলায়মান অবস্থায় এসে ঠেকেছে। তাই, এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক যে, ভারতবর্ষে যেখানে বর্তমানে বিদেশী ছবি সম্পর্কে কোনো বিধিনিষেধ নেই, সেখানে তাঁরা তাঁদের বাজার বাড়াবারই চেষ্টা করবেন। সেইজন্যই তাঁরা ভারতীয় ভাষায় ছবি রূপান্তরিত করবার পথ বেছে নিয়েছেন। কারণ, তাতে সেই সব ছবি এদেশের প্রায় সর্বত্রই সমানভাবে প্রদর্শিত হতে পারবে। ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত বোম্বাইতে যে-সব বিদেশী

চিত্রবাণী

ছবি (ভারতীয় ভাষায় রূপান্তরিত অথবা হিন্দুস্থানীতে বিবৃত) অনুমোদিত হয়েছে তার একটি তালিকা এই স্মারকলিপির 'ক'-পরিশিষ্টতে যুক্ত করা হলো। এই সব ছবির অনেকগুলি অবশ্য নানাকারণে এদেশের সর্বত্র প্রদর্শিত হতে পারেনি। সম্প্রতি বোম্বাই শহরের দুটি প্রধান চিত্রগৃহে ও ভারতের অন্যান্য প্রধান শহরে হিন্দুস্থানী ভাষায় রূপান্তরিত **'বাগদাদ কা চোর'** দেখানো হয়েছে। 'বক্স-অফিসে'র দিক থেকে এই ছবি যে বিরাট সাফল্য অর্জন করেছে তা থেকে এটা স্পষ্টই বোঝা যায় যে, দেশীয় ভাষায় রূপান্তরিত এই সব বিদেশী ছবির প্রদর্শন যদি রোধ করা না যায়, তাহলে আমাদের জাতীয় চলচ্চিত্রশিল্পের পরিণাম অত্যন্ত সঙ্কটজনক।

কি ভাবে ভারতীয় ভাষায় রূপান্তরিত বিদেশী ছবির প্রদর্শন জাতীয় শিল্প-কে আঘাত করছে :

(১) বর্তমানে ভারতীয় ইউনিয়নে প্রায় ২০০০ (স্থায়ী ও ভ্রাম্যমাণ) চিত্রগৃহ আছে। ভারতে যেখানে ত্রিশ কোটির বেশি অধিবাসী সেখানে তাদের আনন্দদানের পক্ষে ঐ সংখ্যা নিতান্তই অপ্রচুর। তাছাড়া, প্রতি বছর ভারতে প্রায় যে তিনশ' ছবি উঠে থাকে, তার প্রদর্শনের পক্ষেও ঐ চিত্রগৃহগুলি যথেষ্ট নয়। গত তিন বছরে যত ছবি উঠেছে আর যত ছবি দেখানো হয়েছে তার একটা হিসেব নিচে দেওয়া হলো। তা থেকে বর্তমানে এদেশে চলচ্চিত্র প্রদর্শনের অবস্থা শোচনীয় তা স্পষ্টই বোঝা যাবে :—

	ভারতের সর্বত্র যে-সব নতুন ছবি প্রদর্শনের ছাড়পত্র লাভ করেছে :	একই বছরে যে-সব ছবি উঠেছে ও ভারতের সর্বত্র দেখানো হয়েছে :
১৯৪৬	১৯৩	১১৫
১৯৪৭	২৮৩	১৪৫
১৯৪৮ (জুন মাস পর্যন্ত)	১৩৫	৬০

(**বিশেষ দ্রষ্টব্য :**—কতকগুলি ছবি হয়তো এক বছর আগে তোলা হয়ে পরবর্তী বছরে প্রদর্শিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, বেশির ভাগ প্রাদেশিক ভাষার ছবি-ই প্রদর্শনের সুযোগ লাভ করে, কিন্তু চিত্রগৃহের অভাবে হিন্দুস্থানী ছবি দেখাবার ব্যাপারে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়।)

গৃহনির্মাণের প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জামের ঘাটতি দেখে ভারত সরকার ও প্রাদেশিক সরকারসমূহ এই বলে এক আদেশ জারী করেছেন যে, যতদিন না আবাসিক গৃহ নির্মাণের প্রয়োজন মিটছে ততদিন আর নতুন করে চিত্রগৃহ নির্মাণের অনুমতি দেওয়া হবে না। কিন্তু আমাদের সুস্পষ্ট অভিমত এই যে, কোনো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রই জনসাধারণের আমোদপ্রমোদের প্রয়োজনীয়তাকে উপেক্ষা করতে পারেন না এবং সেই জন্যই প্রতিবছর কিছু সংখ্যক চিত্রগৃহ নির্মাণের অনুমতি দিতেই হবে। কারণ, চাহিদার তুলনায় এই শিল্পে সরবরাহ নিতান্তই নগণ্য। দিন দিন ছবি তোলার সংখ্যা ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে, অথচ চিত্রগৃহের অভাবে প্রদর্শনের অবস্থা সেই আগের মতই অচল। এর ফলে প্রতি বছর শতকরা যে পঞ্চাশ ভাগ ছবি ওঠে, বিশেষ ক'রে হিন্দুস্থানীতে, তা প্রধান প্রধান শহরে (যেমন, বোম্বাই, কলকাতা, মাদ্রাজ, দিল্লী, আমেদাবাদ প্রভৃতি) প্রদর্শিত হবার সুযোগ লাভে বঞ্চিত হয়ে দু'মাসের ওপর 'বাক্সবন্দী' হয়ে পড়ে থাকে। তার ওপরে গভর্ণমেণ্ট বর্তমান চিত্রপ্রদর্শকদের (Exhibitors) এমন একটা একচেটে অবস্থার সুযোগ দিয়েছেন, যাতে তাঁরা চিত্র প্রযোজক ও চিত্র পরিবেশকদের (Producers and Distributors) কাছে নিজেদের খেয়ালখুশি মতো দর হাঁকেন।

(২) এই রকম বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থার ফলে, এদেশের চিত্রগৃহে ভারতীয় ভাষায় রূপান্তরিত বিদেশী ছবিগুলি অনায়াসেই প্রদর্শনের সুযোগ লাভ করে। তার ওপরে ব্রিটিশ রাজত্বকালে ইংরেজী-ভাষা সরকারী

ভাষা হিসেবে চালু থাকায় ভারতবর্ষে ইংরেজী ছবির বাজারও খুব ভালো ছিল। ইতিমধ্যেই সংগৃহীত প্রদর্শনীমূল্যের শতকরা ১৫।২০ ভাগ মার্কিন ও ব্রিটিশ চলচ্চিত্র তুলে নিয়েছে। আন্তর্জাতিক শিল্প ও সংস্কৃতির কথা বিবেচনা করেই এদেশের জাতীয় চলচ্চিত্রশিল্প এ বিষয়ে এ পর্যন্ত কোনো প্রতিবাদ জানায়নি। কিন্তু দেশীয় ভাষায় রূপান্তরিত বিদেশী ছবির প্রদর্শন এদেশের চলচ্চিত্রশিল্পের মূলে নিশ্চিত কুঠারাঘাত করবে। ব্যবসার দিক থেকে বিদেশী ছবির ওপরে ভারতীয় চলচ্চিত্রের যে সুবিধা আছে, তা হলো ছবির ভাষা। জনসাধারণ বিদেশী ভাষা বোঝে না। সেইজন্য নিজেদের ভাষায় তোলা ছবি তারা স্বভাবতই পছন্দ করে। ভাষার এই বাধা যদি না থাকে, তাহলে বিদেশী ছবিগুলি এদেশের ভাষায় রূপান্তরিত হয়ে অতি সহজেই দেশীয় চলচ্চিত্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পারে।

(৩) ভারতীয় চলচ্চিত্রশিল্প এখন বিশেষ করে মার্কিন, ব্রিটিশ ও রাশিয়ান চলচ্চিত্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে গিয়ে ভয়াবহ অবস্থার সম্মুখীন। উৎকর্ষের দিক থেকে মার্কিন ছবি সব সময়েই পৃথিবীব্যাপী সুনাম অর্জন করে এসেছে। পৃথিবীতে ছবিরও ক্রমশঃ চাহিদা বাড়ছে। এর ফলে যেখানেই কোনো প্রদর্শনের বাধা নেই, সেখানেই ঐ দুই দেশের ছবি সমস্ত প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করে বিরাট সাফল্য লাভ করছে। এবিষয়ে রাশিয়ার ছবিও ক্রমশঃ পৃথিবীর বাজার অধিকার করতে আরম্ভ করেছে—তা শুধু আর্থিক সাফল্যের দিক থেকেই নয়, সোভিয়েট আদর্শ প্রচারের দিক থেকেও। আর, ভারতবর্ষের মতো দেশগুলিতে রাশিয়ার ছবি দেখাবার সর্বপ্রকার সুযোগ লাভের জন্য সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট কোনোরকম পরিকল্পনা তৈরী করবার ত্রুটিও করবেন না।

প্রতিবছর যতগুলি ছবি ওঠে তার হিসেব নিয়ে দেখা গেছে, সেদিক থেকে আমেরিকার পরেই ভারতের স্থান। কিন্তু ভারতীয় চলচ্চিত্রশিল্পের বাজার শুধু ভারতবর্ষেই সীমাবদ্ধ। নতুন চিত্রগৃহ নির্মাণ বন্ধ হওয়ায় এই বাজার আবার আরও সঙ্কুচিত হয়ে এসেছে। কোনো বিধি-নিষেধ আরোপ না করে যদি দেশীয় ভাষায় রূপান্তরিত বিদেশী ছবির প্রদর্শনে অনুমতি দেওয়া হয়, তাহ'লে নিজেদের বাজার থেকেও ভারতীয় চলচ্চিত্রশিল্প অনেকাংশেই বঞ্চিত হবে।

(৪) জাতীয় চলচ্চিত্রশিল্প সংরক্ষণের কথা ছেড়ে দিলেও, বৈদেশিক ছবি প্রদর্শনের ফলে আমাদের জাতীয় সম্পদের অপচয় ঘটতে বাধ্য। বৈদেশিক জিনিসপত্রের আদান প্রদানের ফলে যে সমস্যার উদ্ভব হয়েছে তা দূরীকরণের জন্য যখন গভর্ণমেণ্টের প্রচেষ্টায় জাতীয়-সম্পদ সংরক্ষণের ব্যবস্থা হচ্ছে, তখন আরও অধিক অর্থের অপচয় নিবারণের জন্য দেশীয় ভাষায় রূপান্তরিত বিদেশী ছবি প্রদর্শন বন্ধ করাই উচিত। যে-কোনো বিদেশী ছবি প্রদর্শনের মানেই হলো আমাদের জাতীয় সম্পদের ক্ষতিসাধন। দেশীয় ভাষায় রূপান্তরিত বিদেশী ছবি প্রদর্শনের ফলে এই ক্ষতি আরও ব্যাপক আকারে দেখা দেবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরা যেতে পারে—'বাগ্দাদ কা চোর' ছবিখানার কথা। ঐ ছবি যখন ভারতবর্ষের সর্বত্র প্রদর্শিত হয় তখন প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা আয় হয়, যেখানে এই সমপরিমাণ টাকা ওঠে ৪ খানা ভারতীয় ছবি থেকে। ঐ টাকার অর্ধেকই চলে যাবে ইংলণ্ডে ঐ ছবির প্রযোজকের কাছে। যদি এই রকম খান বারো বিদেশী ছবি এদেশে প্রদর্শিত হয়, তাহ'লে আমাদের দেশ ও শিল্প, তার প্রয়োজনীয় শিল্পের প্রাপ্য প্রায় এক কোটি টাকা থেকে বঞ্চিত হবে। তার ওপরে এই রকম দেশীয় ভাষায় রূপান্তরিত বিদেশী ছবি প্রদর্শিত হলে তা প্রায় ৫০খানা ভারতীয় ছবিকে এদেশে প্রদর্শনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করবে। অর্থাৎ, তার ফলে বর্তমান প্রদর্শন-শক্তির এক তৃতীয়াংশ-ই ঐ সব বিদেশী ছবি কেড়ে নেবে এবং দেশীয় শিল্পে ক্রমশঃ সঙ্কটজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হবে।

(৫) চলচ্চিত্র-কে ভাষান্তরিত করতে খরচ খুব বেশি

হয় না। এক লাক টাকারও কম খরচ পড়ে। এই অল্প টাকা খরচ ক'রে যদি তার পাঁচগুণ টাকা আয় হয়—তাহ'লে বিদেশী চিত্র-প্রযোজকেরা কেনই বা সে-পথ অবলম্বন করবেন না!

ওপরকার বিশ্লেষণ থেকে একথা স্পষ্টই বোঝা যাবে দেশীয় ভাষায় রূপান্তরিত বিদেশী ছবির প্রদর্শন আমাদের জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী এবং এই প্রদর্শন বন্ধ করতেই হবে।

দেশীয় ভাষায় রূপান্তরিত বিদেশী ছবির প্রদর্শনে কেন অনুমতি দেওয়া হবে ঃ

(১) অনেকে এই অজুহাত দেখান যে, বিদেশী জিনিসের সঙ্গে প্রতিযোগিতা থাকলে দেশী জিনিস উৎকর্ষের দিক থেকে উন্নত হবার সুযোগ লাভ করে। কথাটা তখনই সত্য হতে পারে যখন প্রতিযোগীরা সমপর্যায়ের বা সম-অবস্থার লোক হন। কিন্তু দুঃখের বিষয় মার্কিন বা ব্রিটিশ চলচ্চিত্রশিল্পের সঙ্গে এদেশের শিল্পের কোনো তুলনাই হয় না। ওদেশের ছবির জন্য আছে পৃথিবীর বিরাট বাজার। তাছাড়া, তাদের নিজেদের দেশে তাদের তোলা ছবির চাহিদাও খুব বেশি। বহু বছর সাফল্যের সঙ্গে ব্যবসায় চলার ফলে তাদের মূলধনও হয়েছে আজ অপর্যাপ্ত। এর ওপরে আছে তাদের যান্ত্রিক কলা কৌশলের উৎকর্ষ। নতুন করে ছবির বাজার বাড়াবার জন্যে তারা এই শিল্পের পেছনে খুসীমত টাকা খরচ করতেও পারে। আমাদের শিল্পের পক্ষে এই সব সুবিধা একেবারেই নেই। এর ওপরে যদি বিনা বাধায় এদেশে বিদেশী ছবির প্রতিযোগিতা চলে, তাহ'লে তার ফলে আমাদের এই দেশীয় শিল্প এগিয়ে যাবে ধ্বংসের পথে, ছবির উৎকর্ষও তাই কমবে বই বাড়বে না, আর শেষ পর্যন্ত এই বৈদেশিক প্রতিযোগিতার ফলে আমাদের শিল্পের হবে অপমৃত্যু।

বিদেশী ছবির কাছ থেকে যদি ছবির উৎকর্ষ সম্পর্কে জ্ঞান সঞ্চয় করতে হয় তাহলে তো বিদেশী ভাষায় বহু ছবি-ই আছে! কিন্তু তার বদলে দেশীয় ভাষায় রূপান্তরিত বিদেশী ছবির প্রতিযোগিতা চলতে থাকলে তা নিতান্তই অন্যায় হবে এবং তাতে আমাদের দেশীয় শিল্পের সুনিশ্চিত ধ্বংস সাধন-ই করা হবে।

(২) আর এক দলের অভিমত এই যে, কলাবিদ্যা ও সংস্কৃতি হলো আন্তর্জাতিক ব্যাপার—কাজেই, সেখানে ব্যবসায়গত কোনো প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হওয়া উচিত নয়। একথাও বলা হয়ে থাকে যে, দেশীয় ভাষায় রূপান্তরিত বিদেশী ছবির প্রদর্শনের ফলে সাধারণ দর্শক অনায়াসেই বিদেশের সামাজিক রীতিনীতি ও আচরণ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করবার সুযোগ পায়। একথা সত্য যে, চলচ্চিত্র হলো একটা কলাবিদ্যা, কিন্তু সেই সঙ্গে ওটা একটা শিল্প। সাধারণ শিল্পের সঙ্গে সাধারণতঃ যে-সব সমস্যা ও অসুবিধা জড়িয়ে থাকে—এই শিল্পের সঙ্গেও ঠিক তাই আছে। সমস্ত জাতি-ই একথা মেনে নিয়েছেন যে দেশীয় শিল্পের শ্রীবৃদ্ধি-ই বিশেষ ক'রে কাম্য; আর, সেজন্য যে কোনো ব্যবসার-নীতি অবলম্বন করাই রাষ্ট্রের কর্তব্য। যে-দেশেই কোনরকম জাতীয় স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে, সে দেশেই সংরক্ষণ-ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়েছে। বিদেশী ছবি দেখবার সুযোগ লাভের ক্ষেত্রে বিদেশী ভাষায় তোলা বহু ছবি-ই তো আছে (এখন যেমন দেখান হচ্ছে)—সেখানে দেশীয় শিল্পের ক্ষতিসাধন করে বৈদেশিক চিত্র প্রতিষ্ঠানগুলিকে অতিরিক্ত সুবিধা-দানের কোনো অজুহাতই থাকতে পারে না।

(৩) আর এক পক্ষের বক্তব্য হলো যে, কোনো দেশেই দেশীয় ভাষায় রূপান্তরিত বিদেশী ছবির প্রদর্শনের বিরুদ্ধে কোনরকম ব্যবস্থাই অবলম্বিত হয়নি। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, আমেরিকা, ব্রিটেন, রাশিয়া ও ভারতবর্ষ ছাড়া বেশির ভাগ দেশেই প্রদর্শনের মতো প্রচুর দেশীয় ছবি নেই। বেশির ভাগ দেশ-ই ছবি-র ব্যাপারে আমেরিকার ওপরেই নির্ভর করে। অথচ, এদেশের বর্তমান চিত্রগৃহের চাহিদার অনুপাতে ঢের বেশি ছবি তোলা হয়ে থাকে। যে-সব দেশের চলচ্চিত্র-শিল্প

এখনও তেমন করে উন্নতি লাভ করেনি, সেই সব দেশের সঙ্গেও ভারতবর্ষের কোনো তুলনা করা চলে না। অথচ, সেই সব দেশের বেশির ভাগই নানাভাবে তাদের জাতীয় চলচ্চিত্র-শিল্পকে সাহায্য করে থাকে।

জাতীয় চলচ্চিত্র-শিল্প সংরক্ষণের জন্য অন্যান্য দেশ যে-সব পন্থা অবলম্বন করেছে ঃ

ভারতীয় চলচ্চিত্র-শিল্পের কল্যাণের খাতিরে তার সংরক্ষণ ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা ও সেই সম্পর্কে বিরুদ্ধ মতামত নিয়ে এতক্ষণ যে-সব আলোচনা করা হলো — তা থেকে এইটুকু বলা যায় যে, জাতীয় চলচ্চিত্রশিল্পকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য অন্যান্য দেশ যে-সব উপায় অবলম্বন করেছে, আমরা অন্ততঃ ততটুকু করতে পারি, আর, করা দরকারও।

বহুদিন থেকেই আমেরিকা চিত্রজগতে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করেছে। ব্রিটেন ও রাশিয়াতেও এই চলচ্চিত্রশিল্পের যথেষ্ট প্রসার লাভ ঘটেছে। যুদ্ধের আগে এ ব্যাপারে জাপানও খুব এগিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু জাপানকে আবার তার বিনষ্ট শিল্প উদ্ধার করতে হবে। জনসাধারণের চিত্র-পিপাসা মেটাবার জন্যে বেশির ভাগ দেশকেই আমেরিকা ও ব্রিটেনের ওপরে নির্ভর করতে হয়। কারণ ঐ সব দেশের জাতীয় চলচ্চিত্রশিল্পের এখনও এমন অবস্থা আসেনি, যাতে তারা পৃথিবীর বাজারে পা বাড়াতে পারে। এমনকি তাদের নিজেদের বাজারও আমেরিকা ও ব্রিটেনের জন্য উন্মুক্ত।

ব্রিটেনে যদিও চলচ্চিত্র-শিল্পের যথেষ্ট প্রসার লাভ ঘটেছে, তবুও ব্রিটিশ-গভর্ণমেণ্ট সেখানে বরাদ্দ আইনে (Quota Act) সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন। ব্রিটেনে যতগুলি ছবি ওঠে, চিত্রগৃহের চাহিদার অনুপাতে তা যথেষ্ট নয়। চিত্র-প্রদর্শকদের প্রতিবাদ সত্ত্বেও গভর্ণমেণ্ট গত বছরে অনুমোদিত বরাদ্দ আইনের বলে চিত্র-প্রদর্শকদের শতকরা ৪৫ খানি ক'রে ব্রিটিশ ছবি দেখাতে বাধ্য করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছেন। জাতীয় চলচ্চিত্রশিল্পের উন্নতির জন্য সংরক্ষণ ও সহযোগিতামূলক ব্যবস্থা হিসেবেই এই নীতি অবলম্বিত হয়নি—এতে ও দেশের বহু ডলার বাঁচাবার পথও করা হয়েছে। এ ছাড়া ব্রিটিশ-গভর্ণমেণ্ট স্বাধীন প্রযোজকদের অর্থ সাহায্যের জন্য একটি 'ফিল্ম ফাইনান্সিং কর্পোরেশন' গঠন করবেন বলেও স্থির করেছেন।

যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে চলচ্চিত্রের চাহিদা বেড়ে গেছে খুব বেশি। জনসাধারণও আগের চেয়ে এই শিল্পের ঢের বেশি [illegible] করছেন। সেইজন্যই বিদেশী চলচ্চিত্রের আমদানি সীমাবদ্ধ করে, দেশীয় শিল্প সংরক্ষণের চেষ্টা চলেছে অনেক দেশে। আর এ বিষয়েও সন্দেহ নেই যে, সরকারী রাজস্ব নীতি হিসেবেও এইরকম ব্যবস্থা অবলম্বন করা সেই সব দেশের বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। Foreign Commerce Weekly (U. S. Department of Commerce Publication) এবং আমেরিকার Motion Picture Herald-এ প্রকাশিত বিবরণী থেকে জানা যায় যে, বহু মার্কিন ও ইউরোপীয় দেশে বরাদ্দ প্রথা অনুসারে বা আর্থিক বিধি-নিষেধের গণ্ডী টেনে বিদেশী ছবি দেখাবার সময় সীমাবদ্ধ করবার জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়েছে। ঐ সব দেশের কয়েকগুলিতে আবার সেখানকার গভর্ণমেণ্ট সোজাসুজি জাতীয় চলচ্চিত্র নির্মাণের ব্যাপারে সহযোগিতা করছেন। সুইডেনে মার্কিন ছবির প্রদর্শনী থেকে যে অর্থাগম হয়, তার তিনভাগের দু'ভাগই স্থানীয় চলচ্চিত্রশিল্পে বণ্টিত হয়ে থাকে। যদিও হল্যাণ্ডে কোনো সরকারী বিধিনিষেধ নেই, তবু সেখানে বছরে ২৮ সপ্তাহের বেশি মার্কিন ছবি দেখানো হয় না। সেখানকার 'বায়স্কোপ বণ্ড' এই ব্যবস্থা অবলম্বন করে থাকে। তারাই ছবির পরিবেশন ও প্রদর্শনের ব্যাপারেও পূর্ণ ক্ষমতা বিস্তার করে। আর, সেখানকার গভর্ণমেণ্ট ছবির প্রদর্শনী বাবদ মার্কিন প্রতিষ্ঠানগুলিকে বছরে মাত্র ১,৮০০,৯০০ পাউণ্ড দেবার অনুমতি দিয়ে থাকে। সম্প্রতি যদিও ফ্রান্সে

বিদেশী ছবির আমদানীর ওপরে শতকরা ২৫ ভাগ ট্যাক্স ধার্য করবার চেষ্টা অন্যের জন্যে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে, তবুও ফরাসী গভর্ণমেণ্ট বিদেশী ছবির আমদানীর ব্যাপারে বিধিনিষেধ আরোপ করবেন বলে স্থির করেছেন। 'মার্শাল প্ল্যান' গ্রহণকারী ইউরোপের ১৬টি দেশের মধ্যে একমাত্র বেলজিয়ামেই মার্কিন ছবির প্রদর্শন সম্পূর্ণ বিধি-নিষেধহীন। এমনকি দক্ষিণ আমেরিকাতেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ছবির আমদানী অথবা তার অর্থ বিনিময়ের ব্যাপারেও বিধিনিষেধ আরোপিত হয়েছে। ব্রিটেনের কথা বাদ দিয়েও আর একটি দেশের কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখকরা যেতে পারে। সেখানে চলচ্চিত্রশিল্পে প্রত্যক্ষ-ভাবে সরকারী সাহায্য পাওয়া যায়। সে দেশটি হলো—আর্জেন্টিনা। সেখানে চিত্রগৃহের প্রবেশ মূল্যের ওপরে এমন একটা অতিরিক্ত কর ধার্য করা হয়ে থাকে, যার শতকরা ৪০ ভাগ খরচ করা হয় জাতীয় চলচ্চিত্র নির্মাণে।

ওপরকার দৃষ্টান্তগুলি থেকে স্পষ্টই বোঝা যাবে কিভাবে বিভিন্ন দেশের গভর্ণমেণ্ট জাতীয় চলচ্চিত্রশিল্পের সহযোগিতা করে থাকেন। ভারতবর্ষের চলচ্চিত্রশিল্পও উল্লেখযোগ্য জাতীয় শিল্প। চিত্রগৃহের আয় কমে যাওয়া এবং সেই সঙ্গে খরচের হার বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য গত তিনটি বছর এই শিল্পের চরম দুর্দিন গেছে। তার ওপরে, দেশবিভাগের ফলে এর বাজারও সঙ্কুচিত হয়ে এসেছে। ওদিকে এই বাজার বাড়াবার পথও একরকম বন্ধ। কারণ নতুন কোনো চিত্রগৃহ নির্মাণ করাও সরকার নিষেধ করে দিয়েছেন। এইভাবে যদি দেশীয় চলচ্চিত্রশিল্পকে একদিকে আর্থিক ও নানারকম অসুবিধার বোঝা বইতে হয় এবং অন্যদিকে দেশীয় ভাষায় রূপান্তরিত বিদেশী ছবির প্রদর্শন অনুমতি দিয়ে একে তার ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করবার চেষ্টা চলে—তাহলে এই শিল্পের পরিণাম কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় তা' সহজেই অনুমেয়। দেশী ভাষায় রূপান্তরিত বিদেশী ছবির প্রদর্শন থেকেই সেই নিদারুণ বিপদের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। কাজেই, কোন রকম বিলম্ব না করে সেই বিপদের হাত থেকে দেশীয় চলচ্চিত্রশিল্পকে রক্ষার জন্য এগিয়ে আসাই হবে গভর্ণমেণ্টের প্রধান কাজ।

সংরক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে কয়েকটি অভিমত :

দেশীয় চলচ্চিত্রশিল্পকে সম্পূর্ণ রক্ষা করবার উদ্দেশ্যে গভর্ণমেণ্টের বিবেচনার জন্য এই প্রসঙ্গে কয়েকটি অভিমত উল্লেখ করা হচ্ছে :—

(ক) আইনকরে দেশীয় ভাষায় বিদেশী ছবির নির্মাণ বা প্রদর্শন সম্পূর্ণ বন্ধ করা যেতে পারে। এবিষয়ে 'চলচ্চিত্র অনুমোদন সমিতি' বা Board of Film Censors-কে নির্দেশ দেওয়া যেতে পারে, তারা যেন দেশীয় ভাষায় রূপান্তরিত কোনো বিদেশী ছবি অনুমোদন না করেন। অথবা,

(খ) ভারতীয় ছবির প্রদর্শনের জন্য বরাদ্দ-ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারে। ভারতবর্ষের চলচ্চিত্র নির্মাণের সংখ্যা খুব বেশি বলে, প্রদর্শকদের এই মতে লাইসেন্স দেওয়া যেতে পারে যে, তারা তাঁদের চিত্রপ্রদর্শনীর শতকরা নব্বই ভাগ সময় ভারতীয় চিত্র প্রদর্শনে ব্যয় করবেন। বাকী দশভাগ সময় তাঁরা দেশীয় ভাষায় রূপান্তরিত বা অন্য যে কোনরকম বিদেশী চিত্র প্রদর্শনে ব্যয় করতে পারবেন। কিন্তু ভারতীয় চিত্র প্রদর্শনের জন্যে ৯০-ভাগ সময় সংরক্ষিত না হলে এই উদ্দেশ্য সার্থক হবে না। অথবা,

(গ) যে-কোনো আমদানী করা অথবা দেশীয় ভাষায় রূপান্তরিত বিদেশী ছবির ওপর সংরক্ষণমূলক আমদানী-কর বসানো যেতে পারে। কিন্তু যথাযথভাবে এই 'কর' প্রয়োগ করাতেও অনেক রকম অসুবিধা আছে। কারণ, বিদেশী চিত্র প্রদর্শকেরা কোনো বিদেশী ছবির একটিমাত্র প্রতিলিপি আমদানী করে, ভারতবর্ষেই তাকে এ দেশের ভাষায় রূপান্তরিত করে নিতে পারেন। সেইজন্য, ভারতবর্ষে তোলা ভারতীয় ভাষায় রূপান্তরিত

ছবির সমস্ত প্রতিলিপির ওপরেও সংরক্ষণমূলক 'কর' বসানো প্রয়োজন। কতটা 'কর' ধার্য করলে দেশীয় চলচ্চিত্রশিল্প সংরক্ষিত হতে পারবে, সেই 'হার' ঠিক করে তা গভর্ণমেণ্টের কাছে যথাসময়ে পেশ করা হবে; অবশ্য, গভর্ণমেণ্ট যদি মনে করেন যে আমাদের শিল্প সংরক্ষণের পক্ষে এই পদ্ধতিই হবে বাস্তব সত্যের দিক থেকে সবচেয়ে কার্যকরী।

সরকারের বিবেচনাসাপেক্ষে এই কয়েকটি অভিমত উল্লিখিত হলো। আর যদি অন্য কোনো পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়, তাহ'লে চলচ্চিত্রশিল্পের পক্ষ থেকে তাকেও পূর্ণভাবে সমর্থন করা হবে। মোট কথা, দেশীয় ভাষায় রূপান্তরিত বিদেশী ছবির হীন প্রতিযোগিতার হাত থেকে দেশীয় চলচ্চিত্রশিল্পকে রক্ষা করবার উদ্দেশ্যে জরুরী ব্যবস্থা অবলম্বন করবার জন্যে সরকারকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

সারিপুত্ত ও মৌগ্যলায়ন—ভগবান তথাগতের প্রধান শিষ্যদ্বয়ের পূতাস্থি প্রত্যর্পণ উৎসব উপলক্ষ্যে আগত সিংহলের নৃত্য সম্প্রদায় কর্তৃক জাহাজে নৃত্য প্রদর্শন।

চিত্রবাণী

মস্কো আর্ট থিয়েটার

সোভিয়েট রঙ্গমঞ্চের ক্রমোন্নতির ইতিহাস পর্যালোচনা ক'রলে সর্বাগ্রে এবং উজ্জ্বলতম হয়ে যেটি নজরে পড়ে সেটি হোল মস্কো আর্ট থিয়েটার। কারণ এই মস্কো আর্ট থিয়েটারকে কেন্দ্র ক'রেই ওদেশে গ'ড়ে উঠেছে আর সব রঙ্গমঞ্চ এবং এরই মাধ্যমে বিকাশ লাভ ক'রেছে নাট্যাভিনয়ের সুকুমার কলা। এক কথায় বলতে গেলে মস্কো আর্ট থিয়েটারকে সোভিয়েট রঙ্গমঞ্চের জনক বলা যেতে পারে।

মস্কো আর্ট থিয়েটারের নাম পাঠকদের কাছে নিশ্চয়ই অবিদিত নয়। এই তো কিছুদিন আগে প্রতিষ্ঠানটির পঞ্চাশৎ বার্ষিক উৎসবে আমন্ত্রিত হয়ে ভারতের শ্রেষ্ঠ নৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্কর থেকে শুরু ক'রে পৃথিবীর বহু শিল্পী ও মনীষী সমবেত হয়েছিলেন এবং অনেকেই স্বীকার ক'রেছেন অভিনয় শিল্পের উন্নতিকল্পে এর দান ও স্থান বিশ্ব নাট্যশালার ইতিহাসে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

উদ্বোধনের প্রথম দিনটি থেকেই মস্কো আর্ট থিয়েটার জনসাধারণের চিত্ত জয় ক'রে এসেছে এবং প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক আদর্শের বাহক হিসাবে সম্মানও লাভ ক'রেছে প্রচুর। পঞ্চাশ বছর আগে অভিনয়ের প্রথম মহড়ার দিনে নবাগত তরুণ শিল্পীদের উদ্দেশ ক'রে এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতাদ্বয় স্ট্যালিনভস্কি ও দানচেন্‌কো বলেছিলেন,—'সর্বদাই আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে নিপীড়িত জনগণের তিমিরাচ্ছন্ন জীবনযাত্রাকে আলোকিত করাই হলো আমাদের মূল উদ্দেশ্য। সর্বগ্রাসী দারিদ্র্যের নিষ্পেষণের মাঝে অন্তত কিছুক্ষণের জন্যেও পরম সৌন্দর্যের আলেখ্য ফুটিয়ে তোলাই হবে আমাদের কাম্য।'

১৮৯৮ সালের ২৭শে অক্টোবর মস্কো আর্ট থিয়েটারের প্রথম যবনিকা ওঠে আর সেই সঙ্গে তার নাটমঞ্চ থেকে ধ্বনিত হয় প্রথম বাণী,—'এই আদর্শের প্রতি আস্থায় আমরা অবিচল!'

কথাগুলি হোল অ্যালেক্সি টলষ্টয় রচিত 'জার ফিডর ইভ্যানভিচ' নাটকের প্রারম্ভিক সংলাপ এবং এই বাণীর মধ্যে যে বিরাট এক অর্থপূর্ণ ভবিষ্যতের ইঙ্গিত ছিল তা বর্তমান সোভিয়েট জনগণ হৃদয়ঙ্গম করেন এর সফলতার পরিপূর্ণ প্রকাশ লক্ষ্য ক'রে। শুধু সাফল্যই নয় এর সুদীর্ঘ ইতিহাস পর্যালোচনা ক'রলে প্রতি পরিচ্ছেদে আদর্শের প্রতি এমন অবিচল নিষ্ঠা পরিলক্ষিত হয় যা যে কোন কলা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে উল্লেখযোগ্য এবং গৌরবের বস্তু। কি নাটক নির্বাচনে, কি নিত্যনতুন প্রতিভাবান শিল্পী আবিষ্কারে, কি অভিনয়শিল্পের নব নব ভাব প্রবর্তনে মস্কো আর্ট থিয়েটারের প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। এই কারণেই বোধ হয় এই রঙ্গমঞ্চটি আজও তার জনপ্রিয়তার মান পুরোপুরি বজায় রাখতে সক্ষম হ'য়েছে।

এই জনপ্রিয়তা কোন অংশেই শ্রেণী বিশেষে কিংবা কোন বিশেষ গণ্ডীর মাঝে সীমাবদ্ধ নয়। এর মঞ্চ পরিবেশিত রসধারা পরিব্যাপ্ত এবং তার পরিধির প্রান্ত যে একদিন শ্রমজীবী থেকে শুরু ক'রে মস্তিষ্কজীবী মনীষীদের মর্ম পর্যন্ত সমভাবেই স্পর্শ ক'রেছিল বা আজও করে তা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় লেনিনের একটি উক্তি থেকে। ১৯০১ সালে লেনিন বলেছিলেন,—'আর্ট থিয়েটারে এরা অপূর্ব অভিনয় করে। গত বছরে আমি দেখেছিলাম এবং আজও তার মধুর স্মৃতি আমার মনের কোণে অম্লান হ'য়ে র'য়েছে।'

১৮৯৮ থেকে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত আর্ট থিয়েটারের সংগঠনী কাল বলা যেতে পারে। কারণ ঐ সময়টুকুর মধ্যেই যাবতীয় গঠনকার্য সাধিত হয়। এবং এই সংগঠনের সঙ্গে নাট্যাভিনয়ের সংস্কারও চলে সমতালে। নাটকের বিষয়বস্তু, দৃশ্য-সংযোজনা ও ভাবব্যঞ্জনার প্রাচীন অচলায়তনটি ভেঙ্গে নব ভাবধারার প্রবর্তন বড় কম কথা নয়। জার শাসিত তদানীন্তন রাশিয়ার জনসাধারণের সংস্কারাচ্ছন্ন মনে বাস্তববাদী অভিনয়শিল্পের রসসাগরের চলমান ঊর্মিসংঘাত সৃষ্টি ক'রতে আর্ট থিয়েটারকে যে

অবিশ্রান্ত অধ্যবসায় ও ধৈর্য্যের প্রমাণ দিতে হয়েছিল তা' বলাই বাহুল্য।

কিন্তু এত প্রচেষ্টাও বুঝি বিফলে যায়। দেশ তখন রাজনৈতিক বঞ্চা-বিক্ষুব্ধ। আর সে ঝঞ্ঝার আঘাত এসে লাগলো আর্ট থিয়েটারে। তার টাল সামলাতে না সামলাতে আবার ভাঙন উঠলো [illegible] ১৯০৫ সালের বিদ্রোহের বিফলতার সঙ্গে সঙ্গে। আর সেই প্রতিকূল আবহাওয়ার সঙ্গে বিরোধের লিপ্ততার মাঝে অবশ্যই দেখা দিল আদর্শ-চ্যুতি। তখন এমন কতকগুলি নাটক মঞ্চস্থ হয়েছিল সেগুলির সঙ্গে গণজীবনের বাস্তব ও জটিলতার যোগ তো নেই বরং প্রত্যক্ষভাবে প্রতিক্রিয়া-শীলতার প্রশ্রয় ও প্রলোভনার সহায়ক। ফলে এইসময় কিছুদিনের জন্যে আর্ট থিয়েটারকে তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হোতে হয়েছিল এবং প্রচুর প্রতিবাদও উঠেছিল জনগণের মধ্য থেকে।

তারপর এলো অক্টোবর বিদ্রোহ। আর তার সফলতার দিনে এলো আর্ট থিয়েটারের ফসল তোলবার সময়। প্রাক বিপ্লব যুগে যে বীজ সে ছড়িয়েছিল তা দেখা দিল সোনার ফসল হয়ে। তাইতো প্রতিষ্ঠাতা দানচেন্‌কো বলেছিলেন,—'অক্টোবর বিদ্রোহ না হোলে আমরা কবে তলিয়ে যেতাম। এই সমাজতন্ত্রী বিদ্রোহ শুধু যে সামাজিক ও রাষ্ট্রিক পরিবর্তনই এনে দিয়েছে তাই নয় শিল্প জগতেও সৃষ্টি করেছে এক নতুন অভ্যুদয়ের।

আবার স্থাপিত হোল মঞ্চের সঙ্গে গণচেতনার যোগসূত্র গণনাট্যের মাধ্যমে। ডাক পড়লো গর্কী, শেকভ, টলষ্টয়, গগোলের। ডাক পড়লো সেইসব লেখকদের যাদের লেখনী সর্বহারাদের প্রতি সত্যিকারের সহানুভূতিশীল। যাঁদের লেখনী সামাজিক পরিবেশকে উপেক্ষা করে কল্পনার উর্ণজাল সৃষ্টিতে উন্মার্গে বিচরণ না করে শ্রেণীহীন সমাজ সংগঠনে মানুষের নবজীবনের ইঙ্গিত দিয়ে গেছে। 'দি ফিলিষ্টাইনস্,' 'দি লোয়ার ডেপ্‌থ্‌স্', 'চিল্‌ড্রেন অফ দি সান,' 'রেজারেকশন,' 'ডেড শোল' প্রভৃতি নাটকের সাফল্যময় অভিনয় দেখে লেনিন বলেছিলেন, 'যদি কোন প্রাক্ বিপ্লব যুগের পুরানো থিয়েটারকে বাঁচিয়ে রাখতেই হয় তাহোলে সবচেয়ে আগে, বাঁচিয়ে রাখতে হয় মস্কো আর্ট থিয়েটারকে।'

আর্ট থিয়েটারের পক্ষে এ উক্তি সবচেয়ে বড় গৌরবের এবং সে গৌরব আজও অক্ষুণ্ণ তো আছেই উপরন্তু আরও বর্দ্ধিত হয়েছে সোভিয়েট সরকারের পরিপোষকতায়। 'দি মস্কো অ্যাকাডেমিক আর্ট থিয়েটার' শুধু যে সোভিয়েট সংস্কৃতিরই একটা ইতিহাস নয় বরং সারা বিশ্ব সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রও এর দ্বারা বিশেষ প্রভাবান্বিত হয়েছে তা বললে অত্যুক্তি হয় না। এর একটি পরিচয় উক্ত কলাপ্রতিষ্ঠানের পঞ্চাশৎ বার্ষিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে বিশ্ব শিল্পী সম্মেলন।

—টাস্

আমেরিকার কমিউনিটি থিয়েটার

খুব বেশী দিনের কথা নয়—নিউইয়র্ক সহরের বাইরে যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যেকটি নাট্যশালাকেই সাধারণতঃ উপনা-ট্যশালা বা Tributary Theatre নামে অভিহিত করা হোত। এর কারণ তখন বড় বড় সহরের রঙ্গমঞ্চগুলির ওপর সহরতলীর অপর সব প্রতিষ্ঠান নির্ভর করতো তখন হয়তো এই নামকরণের সার্থকতা ছিল, কিন্তু আজ এ আখ্যা সম্পূর্ণ অপ্রযোজ্য। বর্তমানে প্রায় প্রতিটি রাষ্ট্রেই এক ধরণের নাট্যসম্প্রদায় গড়ে উঠেছে যেগুলি স্বকীয় ভাবধারা ও শিল্পসঞ্জীবতায় বৈশিষ্ট্যশীল এবং কোন অংশেই অপর প্রতিষ্ঠানের ওপর নির্ভরশীল বা মুখাপেক্ষী নয়।

অধুনা প্রচলিত কমিউনিটি থিয়েটার প্রথম মহাযুদ্ধের পর প্রবর্তিত "লিট্‌ল্ থিয়েটার" আন্দোলন থেকেই উদ্ভূত। তখন, ছোট ছোট রঙ্গমঞ্চে ইউজেন-ও-নিল, এডমণ্ড জেনিস্, লি সাইমনসনা প্রভৃতি বর্তমানের শ্রেষ্ঠ নাট্যকারদের নাটকের মধ্য দিয়ে নিউইয়র্কে নাট্যকলার পুনরুজ্জীবনের প্রচেষ্টা চলছিল। ওদিকে ঠিক সেই সময় ক্লিভল্যাণ্ড (ওহিয়ো) প্লে হাউস প্যাসেডা, (ক্যালিফোর্নিয়া) কমিউনিটি

চিত্রবাণী

প্লে হাউস, ডেট্রয়েট ও মিচিগানের আর্টস্ এ্যাণ্ড ক্র্যাফ্ট্ থিয়েটারও তাদের প্রথম পরিকল্পনা প্রস্তুতে ব্যস্ত। এইসব সখের দলগুলি গড়েছিলেন জনকয়েক আদর্শবাদী পুরুষ ও মহিলা। তাদের উদ্দেশ্য ছিল নাট্যশিল্পের উন্নতি সাধন করা ও অভিনয়কে পেশা হিসাবে গ্রহণ না করে ভাব প্রকাশের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা।

এই দুটি উদ্দেশ্য আজও বিদ্যমান আছে বর্তমানের কমিউনিটি থিয়েটারে। কমিউনিটি থিয়েটারগুলি গড়ে উঠেছে যুক্তরাষ্ট্রের এক একটি বিভিন্ন রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে। দলগত বিভিন্নতা সত্ত্বেও এদের মধ্যে কিন্তু আদর্শগত মিল আছে যথেষ্ট, বিশেষ করে পূর্বোক্ত উদ্দেশ্য দুটির। প্রায় সব দলই সৌখীন, যদিও অনেক ক্ষেত্রে বাহ্যতঃ অনেককেই পেশাদার বলে ভুল হয়। তার কারণ অভিনয়শিল্পের উন্নতি করতে গেলে অভিজ্ঞ পেশাদার পরিচালক নিয়োগের একান্ত প্রয়োজন। তাই দেখা যায় বহু দল পেশাদার পরিচালক, কারিগর, এমনকি অভিনেতা পর্যন্তও মাইনে দিয়ে রাখে। ফলে এই সব দলের সভ্যদের অভিনয়কলার অনুশীলন তো হয়ই, তারওপর রাষ্ট্রের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতি বিধানের মূল উদ্দেশ্যটিও সফল হয়।

আমেরিকার এইসব কমিউনিটি থিয়েটার ১৯২৫ সালে প্রতিষ্ঠিত ন্যাশনাল থিয়েটার কনফারেন্সের পৃষ্ঠপোষকতায় কাজ করে। শেষোক্ত প্রতিষ্ঠানটি কমিউনিটি ও ইউনিভারসিটি থিয়েটারগুলির পরিচালকদের নিয়ে গঠিত একটি সমবায় সংগঠন। এই সংগঠনের কাজে আবার সহায়তা করে ১৯৩৪ সালে স্থাপিত আইয়োয়া (Iowa) বিশ্ববিদ্যালয়ের আমেরিকান এডুকেশনাল থিয়েটার এ্যাসোসিয়েসান। যুদ্ধের সময় থেকে এর সভ্যসংখ্যা তিন গুণ বেড়ে গেছে এবং অনেক উচ্চ বিদ্যালয় ও জুনিয়ার কলেজ এর শ্রেণীভুক্ত হয়েছে। এই ধরণের প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যেটি গভর্ণমেণ্টের পৃষ্ঠপোষকতা লাভে সক্ষম হয়েছে সেটি হোল আমেরিকান ন্যাশনাল থিয়েটার অ্যাণ্ড অ্যাকাডেমী। ১৯৩৫ সালের কংগ্রেসের বিধান অনুযায়ী মার্কিন নাট্যশিল্পের প্রাচীন ও বর্তমান ঐতিহ্যকে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করবার জন্তে সরকার উক্ত প্রতিষ্ঠানটিকে সর্বরকমে সহায়তা করছেন। প্রতিষ্ঠানটির সংক্ষিপ্ত নাম আনটা (ANTA) এবং এর প্রধান দপ্তর ওহিয়োর ক্লিভল্যাণ্ডে অবস্থিত। ১৯৪৬-৪৭ সালে আনটা এক পরীক্ষামূলক নাট্য প্রযোজনার আয়োজন করে। পাঁচজন নতুন নাট্যকারের রচনা পাঁচটি নতুন নাটক মঞ্চস্থ করা হয়। শুধু তাই নয়, নতুন পরিচালক ও নতুন অভিনেতাদেরও দায়িত্বপূর্ণ অংশে অভিনয়ের যথেষ্ট সুযোগ দেওয়া হয়। এছাড়া আন্টা উটা (Utah) রাষ্ট্রের সঙ্গে সহযোগিতা ক'রে উটা নাট্যোৎসবের (Utah Drama Festival) ব্যবস্থা করে। ওয়াশিংটনের ক্যাথোলিক ইউনিভার্সিটির সঙ্গে যুক্ত হয়ে গত ১৯৪৭এর মে পর্যন্ত একটি নাটক রচনার উৎসব (Playwriting Festival) উদ্‌যাপন করে। ভার্জিনিয়া ষ্টেট থিয়েটারের পক্ষে একটি ভ্রাম্যমান জাতীয় নাট্যসংসদ গঠন করে। এই ভ্রাম্যমান নাট্যদল অ্যালেঘেনী পর্বতের পশ্চিমে প্রত্যেকটি রাষ্ট্রের ১৫,০০০ হাজারের কম অধিবাসী অধ্যুষিত সহরগুলি পরিভ্রমণ করে এবং যথেষ্ট সাফল্যের সহিত অভিনয়ও করে।

জাতীয় নাটাকলার পুনরুজ্জীবনে আন্টার সর্বাপেক্ষা বড় দান হোল প্রতিটি কমিউনিটি থিয়েটারে অভিনয়ের নব্যধারা প্রবর্তন। এই ধারা পাশ্চাত্যে নতুন হোলেও আমাদের দেশের প্রাচীন যাত্রাপদ্ধতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। তিন দিক ঘেরা মঞ্চের পরিবর্তে উন্মুক্ত স্থানে অভিনয় হয় এবং যাত্রার আসরের মতো দর্শকবৃন্দ অভিনয়স্থান ঘিরে বসে। এর ফলে দর্শকের সঙ্গে নাটকের ও অভিনেতার সম্পর্ক হয় ঘনিষ্ঠ এবং জনসাধারণের মনে জাতীয় অভিনয়ের ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠা সহজ ও সরল হয়।

ইউসিস

খ ব রা খ ব র

ভারত সরকারের নতুন অফিসার নিয়োগ

সম্প্রতি ভারত গভর্ণমেণ্টের ইনফরমেশন এণ্ড ব্রডকাষ্টিং দপ্তরের ফিল্ম বিভাগে কয়েকজন অফিসার নিয়োগের সংবাদ পাওয়া গেছে। এঁদের কর্মকেন্দ্র হবে বোম্বাইতে। বাদামী এবং ভাবনানী অনেক আগেই ডেপুটি কণ্ট্রোলারের পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। এছাড়া, খ্যাতনামা আলোকচিত্রশিল্পী ও পরিচালক কৃষ্ণগোপাল পরিচালকরূপে, ইন্দ্ররাজ ও নেইল চিত্রনাট্যরচয়িতারূপে, কুমার সেন সমর্থ এবং মোহন ওয়াদ্ওয়ানী সহকারী পরিচালকরূপে আর অল্ ইণ্ডিয়া রেডিওর সংবাদঘোষক মেলভিল ডি মেলো ও রাজ মেহরা কমেণ্টেটার নিযুক্ত হয়েছেন।

বোম্বাই গভর্ণমেণ্টের পরিকল্পনা

জনসাধারণের সেবায় গভর্ণমেণ্টের বিভিন্নমুখী ক্রিয়া-কলাপের প্রামাণিক চিত্র তোলার পরিকল্পনা নিয়ে বর্তমানে বোম্বাই গভর্ণমেণ্ট মাথা ঘামাচ্ছেন বলে আমরা জানতে পারলাম। যদি এই পরিকল্পনা কার্যকরী হয় তবে সমস্ত প্রদেশে ঘুরে ঘুরে এই সব প্রামাণিক ছবি দেখানোর ব্যবস্থাও করা হবে।

বৃটিশ শ্রমশিল্প প্রদর্শনী—১৯৪৯
সঙ্গীতরসিক ও নাট্যামোদীদের জ্ঞাতার্থে

ইংলণ্ডের অমর নাট্যকার সেক্সপীয়রের জন্মস্থান ষ্ট্র্যাটফোর্ড-অন এ্যাভনে প্রতিবৎসর এক নাটকোৎসবের অনুষ্ঠান হয়। এই উপলক্ষ্যে ষ্ট্র্যাটফোর্ডের সুবিখ্যাত মেমোরিয়াল থিয়েটারে সেক্সপীয়রের অনেকগুলি নাটক অভিনীত হয়। বৃটেন ভ্রমণকারীরা যদি ষ্ট্র্যাটফোর্ডের সুন্দর ছবির মত পথগুলিতে ভ্রমণ না করেন এবং এখানকার সেক্সপীয়রের নাটকাভিনয় না দেখেন তাহলে তাঁদের ভ্রমণ সার্থক হয় না।

এই বৎসরের উৎসব অনুষ্ঠিত হবে আগামী মে মাসে; ঠিক যে সময়ে লণ্ডন ও বার্মিংহামে বৃটিশ শ্রমশিল্প প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হবে (২রা মে থেকে ১৩ই মে পর্য্যন্ত)। বৈদেশিক দর্শকদের সাহায্য করবার জন্য বৃটেনে একটি সমিতি আছে; সমিতির নাম থিয়েটার হলিডে প্ল্যান; ঠিকানা—১১ গ্রীন ষ্ট্রীট, লণ্ডন W. 1, ইংলণ্ড। বিদেশাগত নাট্যামোদী ও সঙ্গীতরসিক ব্যক্তিরা যাতে বৃটেনের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতানুষ্ঠান ও নাট্যাভিনয়গুলি দেখার সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হন সেজন্য এই সমিতি তাঁদের সর্ব্বপ্রকার সাহায্য করেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি করে দেবার ভার গ্রহণ করেন।

বৃটিশ শ্রমশিল্প প্রদর্শনীর বৈদেশিক দর্শকদের মধ্যে যাঁরা সেক্সপীয়ার স্মরণোৎসবে যোগদান করতে ইচ্ছুক, তাঁরা সত্বর থিয়েটার হলিডে প্ল্যানের কাছে সে কথা জানাবেন। আগামী ১লা সেপ্টেম্বর থেকে ১৭ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত গ্লাসগোতে বৃটিশ শ্রমশিল্প প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হবে এবং ঠিক ওই সময়ে (২১শে আগষ্ট থেকে ১১ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত) স্কটল্যাণ্ডের রাজধানী এডিনবরায় তৃতীয় আন্তর্জাতিক সঙ্গীত ও নাট্যোৎসব অনুষ্ঠিত হবে। গ্লাসগো প্রদর্শনীর বৈদেশিক দর্শকদের মধ্যে যাঁরা এডিন-বরার উৎসবে যোগদান করতে ইচ্ছুক তাঁরাও 'প্ল্যানের' কাছে সর্ব্বপ্রকার সাহায্য পাবেন।

দর্শকরা সমিতির কাছ থেকেও উৎসব সম্পর্কীয় সমস্ত খোঁজখবর পাবেন। উৎসব স্থানে বাস সংগ্রহ করা, আকর্ষণীয় অনুষ্ঠানগুলির জন্য টিকিট সংগ্রহ করা প্রভৃতি কাজ সমিতির দ্বারাই সম্পন্ন হবে।

বৃটিশ চলচ্চিত্রশিল্প উন্নয়ন কল্পে সরকারী অর্থসাহায্য

বৃটিশ চলচ্চিত্রশিল্প উন্নয়ন কল্পে সরকারী অর্থসাহায্যের জন্য আনীত একটি বিল সম্প্রতি হাউস অব্ লর্ডস কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

হলিউডে নির্ম্মিত ছবির আমদানি হ্রাস এবং বৃটিশ ছবির রপ্তানি বাণিজ্যে সহায়তা করাই গভর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য।

—চিত্রবাণী—

বর্ত্তমানে ডলারের নিদারুণ অভাবের দরুন আমেরিকান ছবির আমদানি সম্পূর্ণ বন্ধ করবার জরুরী প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে এবং সিনেমা শিল্পের চাহিদা মেটাবার জন্য গভর্ণমেণ্ট বৃটিশ চলচ্চিত্রের উৎকর্ষ ও উৎপাদন বৃদ্ধি কল্পে এই শিল্পে [illegible] আর্থিক সাহায্য দান করবার সিদ্ধান্ত করেছেন।

[illegible] পাঁচ বৎসরের জন্য চলচ্চিত্র প্রযোজক ও পরিবেশকদের [illegible] উদ্দেশ্যে একটি ন্যাশনাল ফিল্ম ফিনান্স কর্পোরেশন গঠিত হবে। [illegible] বিশিষ্ট [illegible] প্রযোজকদের [illegible] এই বিলের উদ্দেশ্য।

চাক্ষুষ শিক্ষা পরিকল্পনা

লণ্ডন কাউন্টি কাউন্সিলের [illegible] চাক্ষুষ শিক্ষার জন্য চলচ্চিত্রের ব্যবস্থা করেছেন। [illegible] হবে ৪১,৬০,০০০ টাকা এবং এই ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করতে প্রায় পাঁচ বছর সময় লাগবে।

প্রত্যেকটি মাধ্যমিক স্কুলে সবাক ও নির্বাক ছবির জন্য কয়েকটি প্রোজেক্টর থাকবে কিন্তু প্রাথমিক স্কুলগুলিতে কেবল নির্বাক ছবির ব্যবস্থা থাকবে এবং সেখানে প্রয়োজনমত সবাক ছবি প্রদর্শনের জন্য মাধ্যমিক স্কুলগুলি থেকে সাউণ্ড প্রোজেক্টরের সাহায্য নেওয়া চলবে।

তাছাড়া কাউন্সিল স্কুলগুলিতে একটি ফিল্ম লাইব্রেরী গঠনের সিদ্ধান্ত করেছেন।

আন্তর্জ্জাতিক সঙ্গীত পরিষদ গঠন

সম্প্রতি প্যারিসে ইউনেস্কো (UNESCO)-র যে অধিবেশন হয়ে গেল তাতে ইউরোপ ও আমেরিকার বিশিষ্ট সঙ্গীতবিদদের একটি সম্মেলনও অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে একটি আন্তর্জ্জাতিক সঙ্গীত পরিষদ গঠনের পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। এই পরিষদের প্রধান উদ্দেশ্য হবে সারা বিশ্বের সঙ্গীত শিল্পীদের মধ্যে সহযোগিতা ও আদান প্রদানের সম্বন্ধ গড়ে তোলা। তাছাড়া নোবেল পুরস্কারের মতন একটি আন্তর্জাতিক পুরস্কারেরও ব্যবস্থা করবেন এই পরিষদ। [illegible] বছরের সেরা সঙ্গীতগ্রন্থ রচনার জন্য দেওয়া হবে এই পুরস্কার।

ইউনেস্কোর অনুরোধ

ইউনেস্কোর ফিল্ম বিভাগ সম্প্রতি ইউনাইটেড নেশনের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির গভর্ণমেণ্টকে এক অনুরোধ জানিয়েছেন, তারা যেন শিক্ষামূলক ছায়াছবির উপর থেকে আমদানী শুল্ক বা অন্য কর ভার সরিয়ে দিয়ে এই জাতীয় ছবির প্রচলন প্রচারে সাহায্য করেন। এছাড়া প্রত্যেক গভর্ণমেণ্টকেই নিজ নিজ দেশে ছায়াছবি নির্মাণ, প্রচার ও প্রসার সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সংবাদাদি [illegible] জন্য সংবাদ ও তথ্য বিভাগ স্থাপন এবং ফিল্ম লাইব্রেরী গঠনের অনুরোধ করা হয়েছে। এই ফিল্ম বিভাগের সদস্যগণ ইউনেস্কোকেও সুপারিশ করেছেন প্রয়োজনীয় অর্থাদি সংগ্রহ করবার জন্য যাতে শিক্ষামূলক ছায়াছবির বিভিন্ন স্থানীয় ভাষা সংযোজিত সংস্করণ তৈরী হতে পারে এবং টেকনিশিয়ানদের স্কলারশিপের ব্যবস্থা করা যায়। তিরিশটি দেশের অবস্থা ও ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করে এই সুপারিশ করা হয়েছে। এই দেশগুলির মধ্যে এশিয়া ইউরোপ ও ল্যাটিন আমেরিকার বহু দেশই আছে, প্রত্যেক দেশকেই এই বছরে শিশু ও কিশোর উপযোগী ছায়াছবি অন্ততঃপক্ষে একখানি তৈরী করার অনুরোধ জানানো হয়েছে। বিভিন্ন দেশে তৈরী এই সব ছবি বিভিন্ন দেশে দেখাবার বন্দোবস্ত করা হবে। নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য ষোল মিলিমিটার ছবির বহুল ব্যবহার ও প্রচলনের দিকেও ইউনেস্কোর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এই ফিল্ম বিভাগ।

সেফটি ফিল্মের প্রচলন

এতকাল যে কাঁচা ফিল্মে ছবি তোলা হয়েছে তা অত্যন্ত দাহ্য, এর রাসায়নিক নাম সেলুলোজ নাইট্রেট ফিল্ম। সম্প্রতি আমেরিকার রাসায়নিকরা এই কাজে এক নতুন ধরনের সেফটি ফিল্ম ব্যবহারের সন্ধান দিয়েছেন। এর ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে চালু হতে বছর পাঁচেক সময় লাগবে।

দিল্লী চলো

সুধীন্দ্র রাহা প্রণীত [illegible] "দিল্লী চলো"র অভিনয় সুরু হয়েছে গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী "ষ্টার" নাটমঞ্চে। নাটকখানি পরিচালনা করেছেন মহেন্দ্র গুপ্ত, সুর সৃষ্টি করেছেন ধীরেন দাস আর নৃত্য পরিকল্পনা করেছেন বাদলকুমার।

কোনও ঐতিহাসিক ঘটনাকে নাট্যরূপায়িত ক'রতে গিয়ে কতখানি বা কি ধরণের রং ফলানোর অধিকার নাট্যকার পেয়ে থাকেন কিংবা নাট্যবস্তুতে কোনও ঘটনা বিশেষের সংযোগ সাধনে তাঁর কতখানি অনুপাত জ্ঞান বা পরিবেশ বোধ থাকা প্রয়োজন সে সম্পর্কে আমাদের আজকের ব্যবসায়ী নাট্যরচয়িতাগণের অনেকেই যে একেবারে মাথা ঘামান না তার পরিচয় দিয়েছেন আমাদের "দিল্লী চলো"র নাট্যকার নাটকের কাহিনী, চরিত্র ও সংলাপ সন্নিবেশে। চন্দন পাহাড় ও কোহিমায় আজাদ হিন্দ ফৌজের যুদ্ধ বিবরণ থেকে নাট্যকার সংগ্রহ করেছেন তাঁর নাট্যবস্তু। কিন্তু সমগ্র যুদ্ধ কাহিনীকে বিশেষ নাটকে রূপদান সম্ভব নয়, বিশেষ ঘটনাকে রূপায়ণের ভেতর দিয়েই কাহিনীর সমগ্রতা উপলব্ধি ক'রতে হবে নাটকে। তাই চন্দন পাহাড়ের রাজা ইংরেজভক্ত যুধাজিত বর্মার আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগদানের বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রে গড়ে উঠেছে আলোচ্য নাটকখানি। কিন্তু এই ঘটনার নাট্যরূপকে শিল্পের পর্য্যায়ে উন্নীত করতে হ'লে এবং নাটকীয় [illegible] বিকাশ ও অনিবার্যতাকে প্রতিষ্ঠা করতে [illegible] বিক্ষোভ, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী [illegible] প্রয়োজন ছিল নাটকে, "দিল্লী চলো"র [illegible] আমাদের বঞ্চিত করেছেন। প্রিয়তম [illegible] ফৌজে যোগদান ও নির্ভীক [illegible] প্রতিনিধিদের আজাদী নাম অসির [illegible] যুধাজিতের মনে দোলা দিতে পারে সত্য; কিন্তু যার রাজভক্তির নিদর্শন নিরীহ প্রজাকুলের নিষ্ঠুর হত্যা, যার প্রজাশাসন হিটলারী স্বৈরাচার, তাকেই টেনে নিতে পেরেছে যে আজাদ হিন্দ ফৌজ তার সম্যক গুরুত্ব ও গৌরব আমরা উপলব্ধি করতে পারি না বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রধান স্তম্ভ বৃটিশ বাহিনীর সেনানায়কদের মহত্বের অনুপাতাতিরিক্ত প্রতিষ্ঠায়। অবশ্য পোলক চরিত্র ইতিহাস বিরোধী একথা আমরা বলতে চাই না, বরং ইতিহাস পোলকের উপযুক্ত স্থান নিশ্চয়ই সুরক্ষিত ক'রে দেবে। কিন্তু বিশেষ ক'রে যে নাটকে আজাদ হিন্দ ফৌজের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম প্রতিষ্ঠা লাভ ক'রবে আজাদী সৈনিকদের অপূর্ব্ব আত্মত্যাগে, সেখানে সাম্রাজ্যবাদের প্রতিনিধির অনন্যসাপেক্ষ ব্যক্তিগত মহত্বের গৌরবায়ন নাটকীয় শিল্প সৌন্দর্য্যই শুধু হানি করে না, নাটককে ক'রে তোলে ইতিহাসের কঙ্করময় বেলাভূমি। জানিনা নাট্যকাঠামোর অস্থিমজ্জায় ইতিহাসের ভিত্তির দৃঢ়তাই বা কতটুকু আছে। কিন্তু সে আলোচনা না তুলেই আমরা নিশ্চয় ক'রে বলতে পারি, কোনও দর্শকই "দিল্লী চলো" নাটকের অভিনয় দেখে আজাদী বাহিনীর দিল্লী

চিত্রবাণী

নাগাসর্দ্দার ভীমকে অনেকখানি জীবন্ত করে তুলেছে। স্থানে স্থানে অতি অভিনয় দুষ্ট হলেও বাসুকী নাগার ভূমিকাভিনেতাও (ব্যবস্থাপনার কল্যাণে এঁর নাম আমাদের জানার উপায় নেই) অভিনয়ে অনেকখানি শিল্পজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। নাট্যকারের সংলাপ কিবিঙ্গি অভিনয়ের উপযোগী না হলেও হুডসনের ভূমিকাভিনেতা দেবেন বন্দ্যোপাধ্যায় ও পোলকের ভূমিকাভিনেতা প্রবোধবাবু চরিত্রানুগ অভিনয়ে যথেষ্ট নিষ্ঠা দেখিয়েছেন। কিন্তু যুধাজিতের ভূমিকাভিনেতা সন্তোষ দাস যে কয়েকটি প্যাঁচ করতে চেষ্টা ক'রেছেন দ্বিতীয় অঙ্ক তৃতীয় ও পঞ্চম দৃশ্যে আর তৃতীয় অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্যে তা' ব্যর্থ হয়েছে তাঁর কণ্ঠস্বরের ঢেউখেলানো উন্নতি ও কথাশেষে অস্বাভাবিক জো'র এবং টানের জন্য। কেবলমাত্র শেষ দৃশ্যে তিনি আঙ্গিক অভিনয়ের সাহায্যে দোলা দিতে সমর্থ হয়েছেন দর্শকের মনে। অন্যান্য দৃশ্যেও তাঁর আঙ্গিক অভিনয় যথেষ্ট সুন্দর হয়ে উঠতে পারত, যদি তাঁর পদদ্বয়ের দৈর্ঘ্য হত সমান। মাঝে মাঝে পেছন ফিরে হেসে না ফেললে সুলতান খাঁর ভূমিকায় চোখ পাকানো শিল্পী সত্য পাঠকের অভিনয় নিতান্ত অসহ্য হত না। ইন্দ্রজিতের ভূমিকায় আমাদের হতাশ করেছেন মিহির ভট্টাচার্য্য। দ্বিজদাসের ভূমিকায় তাঁর অভিনয় যাঁরা দেখেছেন, অন্ততঃ সুরেশের ভূমিকাতে (রাজপথ—রঙমহল) তাঁর অভিনয়ের সঙ্গে কিছুমাত্র পরিচয়ও যাঁদের আছে ইন্দ্রজিৎকে দেখে তাঁরা ব্যথিত হবেন সন্দেহ নেই। স্বাভাবিক স্বরে কথা বলতে বলতে হঠাৎ অস্বাভাবিক গম্ভীর হয়ে নাক ফুলিয়ে চোখ স্থির করে কৃত্রিম স্বরে ভাবাবেগ প্রকাশের পেছনে সংলাপকারের কিছুটা দায়িত্ব থাকলেও, স্বরের ওঠানামার মাঝে এই অস্বাভাবিক পরিবর্ত্তন যে কোনও শিল্পজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির সৌন্দর্য্যবুদ্ধিতে আঘাত ক'রবেই। আমরা অবাক হয়ে যাই এই ভেবে যে "দিল্লী চলো"র পরিচালক এই অশৈল্পিক অভিনয় সহ্য করেছেন কি করে। বস্তুতঃ উপযুক্ত শিক্ষায় ও নিষ্ঠায় দ্বিজদাস একদিন যাঁকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল মঞ্চে, অশিক্ষায় ও নিষ্ঠার অভাবে ইন্দ্রজিৎ আজ তাঁকে কোথায় নিয়ে চলেছে তাঁর নিজেরও সে কথা আজ ভেবে দেখা কর্ত্তব্য। অভিনয়শিল্পী শ্রীমতী অপর্ণার অস্পষ্ট বাচনভঙ্গীযুক্ত বৈশিষ্ট্যহীন অভিনয় নাটকের অনেকখানি নাট্যরস নষ্ট করে দিয়েছে। পদক্ষেপে সময়জ্ঞান থাকলে দ্বিতীয় অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্যে জয়শ্রীর অভিনয়কে প্রশংসা করা যেত। আমার ব্যর্থতার সমস্ত দায়িত্ব পরিচালকের—একথা তাঁর মনে রাখা দরকার। স্বরূপদাসের গানখানা কোনও দর্শকেরই মনে দাগ কাটতে পেরেছে কিনা সন্দেহ অথচ ঐ গান শুনেই গ্রামের মেয়েরা ঘুমিয়ে পড়েছে গাছের তলায়। নির্ব্বাক সাধনা আর বলরাম সিং-এর কথা না তোলাই ভাল।

দৃশ্যসজ্জা কে করেছেন আমরা জানতে পারিনি। যুধাজিতের প্রাসাদের ছাদ বলে যে দৃশ্যটি দেখানো হয়েছে তাকে ছাদ বলে ভ্রমও হয় না কারও। শালবনি গড় ও যুধাজিতের প্রাসাদ দৃশ্যটি ভালই হয়েছে। গানগুলি সবই হয়েছে ঘুমপাড়ানি গান আর সুর অপ্রযুক্ততা দোষে দুষ্ট। বিশেষ ক'রে "আজ বাংলা বহু আসরে" গানটি সম্বন্ধে এই কথা নিঃসংশয়ে প্রযোজ্য। অথচ সুরের দিক দিয়ে এই গানটার সুরই উপভোগ্য হয়েছে। নৃত্য পরিকল্পনার মধ্যে এমন কোনও নূতনত্বের সন্ধান পাওয়া গেল না যা নিয়ে আলোচনা করা চলে।

মোটামুটিভাবে নেতাজীর নাম ভাঙিয়ে "দিল্লী চলো" নাটকের অনিপুণ ব্যবসায়ী রচনা এইভাবে প্রযোজক, পরিচালক ও শিল্পীদের চিন্তা, শিক্ষা ও প্রয়োগকৌশলের চরম দৈন্য প্রকাশ করেছে।

সুবোধ কুমার ঘোষ

আকাশবাণী
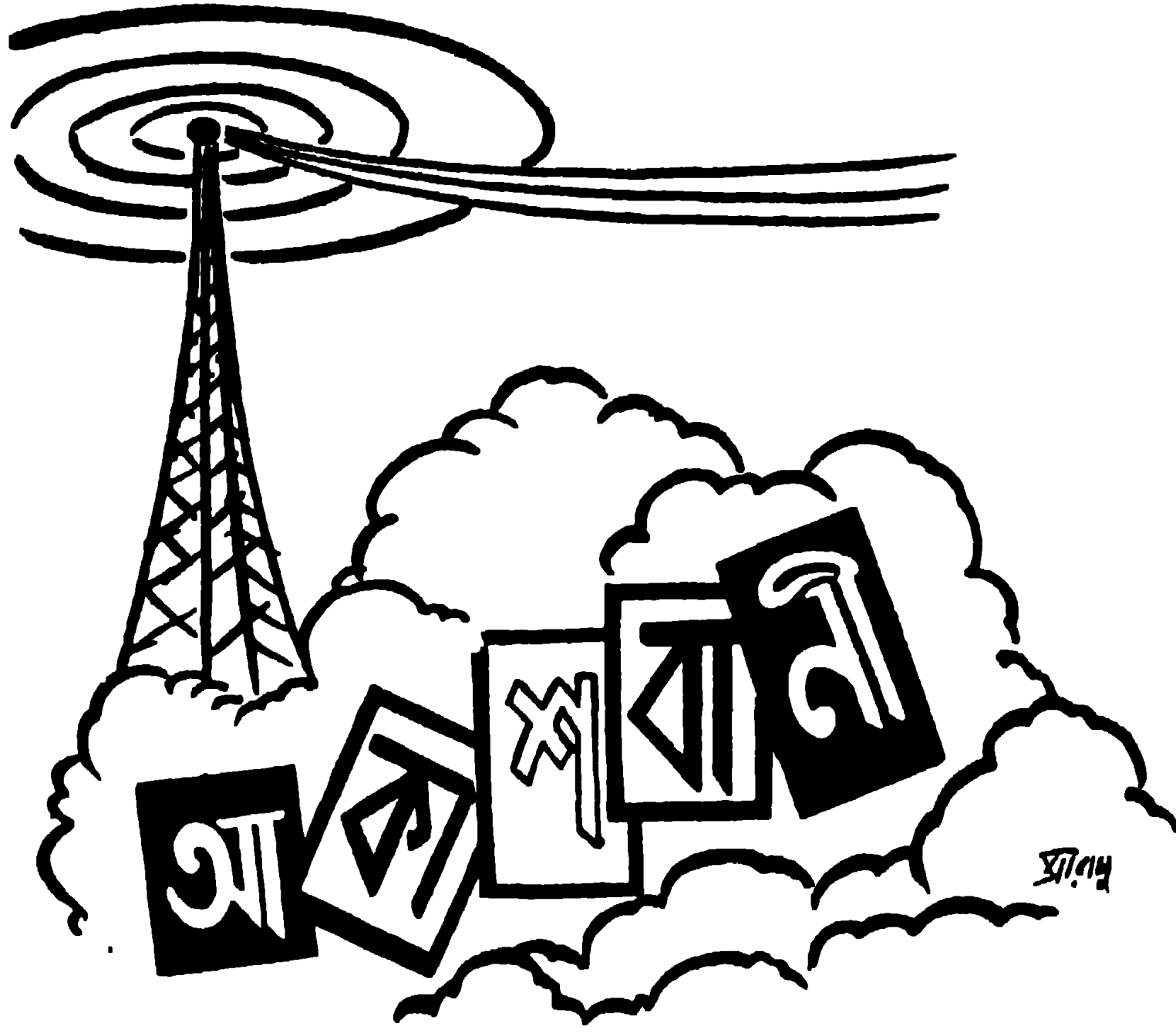
তীরন্দাজ

জনপ্রিয় শিল্পীদের গান

বেশ কিছুদিন ধ'রে জনপ্রিয় গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে (অন্ধগায়ক), ধীরেন্দ্র চন্দ্র মিত্র, চিন্ময় লাহিড়ী, জগন্ময় মিত্র, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্য প্রভৃতির গান শোনা থেকে বঞ্চিত হয়ে আছেন বেতার শ্রোতারা। শোনা যায় বেতার কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে গান গাওয়ার দক্ষিণার হার নিয়ে বনিবনার অভাব ও অন্যান্য কারণ থেকেই এই সব জনপ্রিয় শিল্পীর অনুপস্থিতি অনিবার্য্য হয়ে পড়েছে। আমাদের মনে হয় জনপ্রিয় এই সব সঙ্গীত শিল্পীদের সঙ্গে বেতার কর্ত্তৃপক্ষ যতশীঘ্র সম্ভব সম্মানজনক সর্ত্তে একটা মিটমাট করে ফেলুন। আর এ ব্যাপারে উক্ত শিল্পীরাও অবহিত হোন। তাঁদের গান বেতারে শোনার জন্য অসংখ্য শ্রোতা অধীর আগ্রহ নিয়ে আছেন এটা সবসময়ই তাঁদের মনে রাখা উচিত। কাজেই বেতার আসরে গান গাওয়ার ব্যাপারে তাঁদের অসুবিধা অভিযোগ সাধারণকে জানানোটাও কর্ত্তব্য ব'লে গণ্য হওয়া উচিত। এতে লজ্জা অপমান বা অগৌরবের কিছু নেই।

বেতারের নাটক অভিনয়

১৮৩১ সাল থেকে বাঙালী জাতি নাটক নিয়ে কারবার জমিয়ে আসছে। কলকাতা সহরে এতগুলি ছবিঘর থাকা সত্ত্বেও পাঁচটি স্থায়ী রঙ্গমঞ্চে নিয়মিত নাটক অভিনয় হচ্ছে। বাঙলার মাটিতে নাটকের জনপ্রিয়তা আরো বোঝা যায় এই দেখে যে, ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ অন্য বিষয়ে যথেষ্ট অগ্রসর হওয়া সত্ত্বেও আজ পর্য্যন্ত উল্লেখ-যোগ্য একটিও স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ কোথাও গড়ে তুলতে পারেনি। নাটকের সঙ্গে বাঙ্গালীর অন্তরের যোগ অবিচ্ছিন্ন—এটা অত্যুক্তির আশঙ্কা না ক'রেই বলা চলে। কলকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে সপ্তাহে তিন দিন এক ঘণ্টা, আধ ঘণ্টা ও পনের মিনিটের তিনখানি নাটক অভিনয়ের অনুষ্ঠান হয়। কয়েক বছর আগেও দেখেছি কলকাতা বেতার কেন্দ্রের অভিনীত নাটক শোনার জন্য রাস্তায় ভীড় জমে যেত। আর আজ নাটক অভিনয়ের নির্দ্দিষ্ট সময়ে অনেকে রেডিও বন্ধ করে বসে থাকেন। সেদিন

চিত্রবাণী

যে অভিনয় লোকে আগ্রহভরে শুনতো আজ কেন তার উপরে এত বিতৃষ্ণা এসে গেলো সেইটাই ভেবে দেখতে হবে। বেতার কেন্দ্রের নাট্য বিভাগের কর্তারা বলেন, আগেকার মত অত বেশী সময় ধরে শ্রোতারা আর নাটক শুনতে চান না। সেইজন্য তাঁরা অভিনয়ের সময়টা সংক্ষেপ করে এনেছেন। কিন্তু এই অল্প সময়ে বেতার কেন্দ্র থেকে যে সব নাটক অভিনীত হয় তার মধ্যে শতকরা বোধ হয় পাঁচখানি নাটকও উপভোগ্য হয় না। তার কারণ কি? বেতার নাট্য বিভাগের যখন যিনি পরিচালক হ'ন তাঁর মুখে ঐ এক কথা লেগে থাকে, 'কি করবো, ভাল নাটক যে পাইনা মশাই'। পাবেন কোথা থেকে? নামকরা নাট্যকারদের পিছনে যে অর্থ ও উৎসাহ ব্যয় করেন তার কিছুটাও যদি নতুন নাট্যকারের সন্ধানে প্রয়োগ ক'রে দেখতেন তবে এই পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টার সুফল ফলত বই কি! অথচ শুনতে পাওয়া যায় বেতারে অভিনয়ের জন্য তাঁরা বহু নাটক পান, আমাদের ধারণা এই সব নাটকের অধিকাংশ তাঁরা মোটেই পড়ে দেখেন না, মাঝে মাঝে দুই এক জন নতুন নাট্যকারের নাটক বেতার কেন্দ্র থেকে আমরা শুনতে পাই বটে, তবে শুনেছি, এই সৌভাগ্যটুকু লাভ করবার জন্য অনেক নতুন নাট্যকারদের বেতার নাট্যবিভাগের কর্তাদের তৈল প্রদানের কৌশলটি আয়ত্ত করতে হয়। বেতারে একখানি নাটক দিলে, অন্ততঃ ছ'মাসের আগে সেই নাটকটি অভিনয়ের যোগ্য কিনা তা' জানবার কোন উপায় নেই। নবীন নাট্যকারদের মধ্যে অনেকেই আমাদের কাছে এই ব'লে অভিযোগ করেছেন। নাটক নির্ব্বাচনের উপর অভিনয়ের সফলতা সম্পূর্ণ নির্ভর করে। বেতারের নাটক যারা নির্ব্বাচন করেন, নাটক সম্বন্ধে তাঁদের যে কিছুমাত্র জ্ঞান আছে, বেতার নাটকগুলির অভিনয় শুনে তা মনে হয় না। বেতারের নাটক অভিনয় নিয়ে দৈনিক পত্রিকায় ও বহু মাসিক পত্রপত্রিকায় নিয়মিত সমালোচনা চলে আসছে। বেতার নাট্য বিভাগের কর্ত্তারা বলেন, এঁরা সবাই ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে এই সব সমালোচনা করেন। কিন্তু তাঁরা ভুলে যান সমালোচনা যারা করেন তাঁরা শত্রুতা করেন না। বেতারের প্রতি নিতান্ত ভক্তি ও আসক্তি বশতঃ তারা সমালোচনার সাহায্যে বেতার অনুষ্ঠানকে উন্নত করার দুরূহ এবং অযাচিত চেষ্টা ক'রে অবিমৃষ্যকারিতার পরিচয় দেন। বেতারের প্রত্যেক বিভাগীয় কর্তারা জানেন, মাস কাবারে গৌরী সেনের মোটা টাকা যখন পকেটে আসছে, ওপর থেকেও কোন দিক দিয়ে যখন কোন আশঙ্কা নেই তখন কেন অনাবশ্যক চিন্তায় সুস্থ শরীর ব্যস্ত করা?

সম্প্রতি যে দুটি বেতার বিচিত্রা ও নাটক শোনা গেলো তা' থেকেই আমাদের উক্তির যাথার্থ্য প্রমাণিত হয়। বুধবার ২রা মার্চ্চ বাণীকুমার রচিত ও প্রযোজিত "বিদুষী প্রিয়ংবদা"র অভিনয় শুনলাম। তিনশ বছর আগের বাঙলার এক বিদুষীর জীবনী নিয়ে লেখা এই বেতার বিচিত্রাটি। বাণীকুমারের মত একজন কৃতী বেতারনাট্য-রচয়িতা ব্যঞ্জনার সাহায্য নিয়েও নাটকটি কোথাও জমিয়ে তুলতে পারেননি। কনোজ্ব ব্রাহ্মণ রঘুনাথকে প্রথম দর্শনেই শিবরাম সার্ব্বভৌম ঠিক করে ফেললেন তাঁর এক মাত্র স্নেহের নিধি প্রিয়ংবদাকে রঘুনাথের হাতে দেবেন। একবার খোঁজ নেওয়া প্রয়োজনও মনে করলেন না যে ছেলেটি সত্যই কনৌজী ব্রাহ্মণ না কোন ছদ্মবেশী জোচ্চর। সঙ্গে সঙ্গেই শুভ পরিণয়। দৃশ্যান্তর জ্ঞাপক সঙ্গীত না দিয়েই চলতে লাগল ব্যঞ্জনার মহিমা—"এইরূপে প্রিয়ংবদা স্বামীর সহিত শাস্ত্রালোচনা ক'রে অপূর্ব্ব কীর্ত্তি রেখে গেলেন"। কখন প্রিয়ংবদা স্বামীর সঙ্গে শাস্ত্রালোচনা করলেন—শ্রোতারা তা ঘুণাক্ষরেও জানতে পারলেন না। সেটা নাটকের ভিতর উহ্য থেকেই গেল। আর প্রিয়ংবদা যে কি এমন কীর্ত্তি রেখে গেলেন শ্রোতারা তারও কিছুই শুনতে পেলেন না। বরং সেটি শেষ হতে না হতেই তাঁরা শুধু শুনতে পেলেন "এবার দিল্লী থেকে খবর পড়ছেন—"। অভিনয়ের মধ্যে শিবরাম সার্ব্বভৌম ও সোমনাথ মন্দ করেন নি। আর সব একেবারে

অচল। প্রিয়ংবদার অভিনয় যিনি করলেন সংস্কৃত স্তোত্র পড়ার চেয়ে তাঁকে যদি জাপানী সনেট পড়তে শেখানো হোত তাহলে তাঁর পক্ষে উপযুক্ত হোতো। আরতির দৃশ্যে আনুষঙ্গিক সব বাদ্যই বাজলো, কেবল ঘণ্টাটি বাজলোনা। আরতির সময় যে ঘণ্টা বাজে একথা অন্ততঃ বাণীকুমারের খেয়াল রাখা উচিত ছিলো। গত ৪ঠা মার্চ্চ শুক্রবার 'কালোটাকা' মঞ্চনাটকের বেতারনাট্যরূপ 'অভিযান' অভিনীত হোল। রচনা শচীন সেনগুপ্তের আর প্রযোজনা করলেন শ্রীধর ভট্টাচার্য্য। চালের কালোবাজার নিয়ে নাটকটি গড়ে উঠেছে। তারপর বন্ধুর সঙ্গে বিবাদ, মারামারি, ইংরাজী কপচানী, ব্যর্থ প্রেম, দেশপ্রেমের বাণী, শেষে পুলিশ আমদানী করেও নাটকটি নাট্যকার জমাতে পারেন নি। এই নাটকটি বেতার কেন্দ্র থেকে পূর্ব্বেও অভিনীত হয়েছে। বেতারের নাট্যবিভাগের পরিচালক এই সহজ কথাটা বুঝতে পারেন না যে ১৩৫০ সালে দুর্ভিক্ষ সময় যা জমতো আজকে ১৩৫৫ সালে তা জমে না। অভিনয় শুনে মনে হোল বিদায় দেওয়ার ব্যাপার বেতার কেন্দ্র থেকে তুলে দেওয়া হয়েছে, তাই বিকাশ রায়, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, কল্যাণী মুখোপাধ্যায় আর নীলিমা সান্যাল সবাই প্রতিযোগিতা লাগিয়ে দিলেন কে আগে গড়গড় ক'রে পড়তে পারেন। ফলে এই অভিনয়ের সংলাপের মাহাত্ম্য যেমন ক্ষুন্ন হয়েছে তেমনি শিল্পীরাও হাস্যাস্পদ হ'য়ে উঠেছেন।

সাম্প্রতিক মঞ্চনাটক ও ছায়াছবি সম্বন্ধে দর্শকসাধারণের মতামত প্রকাশের আয়োজন করা হচ্ছে 'চিত্রবাণী'র পাতায়। আপনিও আপনার মতামত পাঠিয়ে দিন 'চিত্রবাণী' সম্পাদকের কাছে।

বাংলা রঙ্গালয়ের বিস্মৃত কাহিনী

বিপিনবিহারী রায় এম এ

পঞ্চম পর্ব্ব—নানাকথা

এর আগের পর্ব্বগুলিতে যতদূর সম্ভব আমি পাঠককে বাংলা রঙ্গালয়ের গত ৫০ বছরের একটা ধারাবাহিক বিবরণী দেবার চেষ্টা করেছি, বিশেষ করে নট, নাটক ও নাট্যকারের পরিচয়। তাছাড়া কলকাতার দেশীয় রঙ্গালয়ে বিদেশীয় বা অবাঙ্গালী, যথা ইংরেজ, পার্শী প্রভৃতি অভিনেতৃদলের বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে সব অভিনয় হয়েছিল তারও সংক্ষিপ্ত বিবরণী মাঝে মাঝে দিয়েছি। নাট্যাভিনয় ছাড়াও কলকাতার রঙ্গমঞ্চে মধ্যে মধ্যে কয়েকজন যাদুকর ও ব্যায়ামবীরের ক্রীড়াকৌতুক দেখান হয়, তার মধ্যে কতকগুলি লিপিবদ্ধ করে রাখার যোগ্য, সেগুলি সম্বন্ধে কিছু এই পর্ব্বে লিখবো। তাদের বিবরণ দেবার আগে আমি বাংলা থিয়েটারের প্রাথমিক যুগের কয়েকটি বিশিষ্ট অভিনেতা ও অভিনেত্রীকে রঙ্গমঞ্চে শেষবার যে যে তারিখে দেখি, তার একটি তালিকা দিচ্ছি। এই তালিকাটিকে আগের পর্ব্বগুলির পরিশিষ্ট বলে ধরা যেতে পারে।

(১) গিরীশ চন্দ্র ঘোষ—মিনার্ভা থিয়েটারে 'মৃণালিনী' নাটকে "পশুপতি" র ভূমিকায় অভিনয় করেন, ২০ এ আগষ্ট ১৯১০ (এঁর মৃত্যু হয় ১৯১২ সালে)। (২) অমৃতলাল বসু—ষ্টার থিয়েটারে ৯ই ডিসেম্বর ১৯২২ সালে বাংলা থিয়েটারের যে পঞ্চাশৎ-বার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়, তাতে দীনবন্ধু মিত্রের "সধবার একাদশী" নাটকের একটি নির্ব্বাচিত দৃশ্য অভিনয়ে অমৃতলাল "নিমচাঁদ" রূপে দেখা দেন। ১৯২৯ সালের ২রা জুলাই তাঁর মৃত্যু হয়। (৩) অর্দ্ধেন্দু শেখর মুস্তফি—মিনার্ভা থিয়েটারে ১৯০৫ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারী তারিখে গিরিশ ঘোষের "সিরাজদ্দৌলা" নাটকে "[illegible]" রূপে দেখি। (৪) অমৃতলাল মিত্র—ষ্টার থিয়েটারে ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদের "পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত" নাটকে "মিরকাশিম" এর ভূমিকায় অভিনয় করেন, ২০শে অক্টোবর ১৯০৬ সালে। যতদূর জানি, এর অল্পকাল পরেই তাঁর মৃত্যু হয়। (৫) অমরেন্দ্র নাথ [illegible] থিয়েটারে "বাজীরাও" নাটকে "বাজীরাও" রূপে অ[illegible]ন, ৬ই মার্চ ১৯১৪ সালে।

(৬) সুশীলাবালা—মৃণালিনী রূপে বিশেষ সুনাম অর্জ্জন করেছিলেন, তাঁকেও ষ্টার থিয়েটারে "বাজীরাও" নাটকে "গৌতমার" ভূমিকায় দেখি ৭ই মার্চ ১৯১৪। (৭) তারা সুন্দরী—"রঙ্গিনী" অভিনয়ে সুদক্ষা ছিলেন। ষ্টার থিয়েটারে ১৯২২ সালে অপরেশ মুখোপাধ্যায়ের "অযোধ্যার বেগম" নাটকে নিশ্চিতভাবে "বহু-বেগম" এর ভূমিকায় অভিনয় করেন। পরে মিনার্ভা থিয়েটারে ১৯২৯ সালের ১৮ই মে তারিখে "প্রতাপাদিত্য" নাটকের পুনরভিনয় এক রাত্রির জন্য হয়, তাতে ইনি "কল্যাণী" রূপে দেখা দেন। যতদূর জানি, এর পরে আর রঙ্গমঞ্চে তাঁর আবির্ভাব হয় নি।

এখানে পাঠককে বিশেষ করে বলে রাখি যে উপরোক্ত তারিখগুলিই যে এই সব নটনটীর রঙ্গমঞ্চে শেষ অবির্ভাবের

তারিখ, এমন কথা আমি বলছিনা, আমি নিজে তাঁদের অভিনয় ঐ সব তারিখে শেষবার দেখি, তার পরে হয় তাঁদের মৃত্যু হয়েছিল অথবা তাঁরা রঙ্গমঞ্চ ত্যাগ করেছিলেন।

এবারে কলকাতার রঙ্গমঞ্চে প্রসিদ্ধ যাদুকর, ব্যায়ামবীর প্রভৃতির আবির্ভাবের কথা কিছু বলবো। থার্ষ্টন্ নামে বিখ্যাত যাদুকর ১৯০৬ সালে প্রথমে ইংরেজ টোলায় "থিয়েটার রয়্যালে" তাঁর যাদুবিদ্যা প্রদর্শন করেন, তবে ১৯০৭ সালে "ক্লাসিক" রঙ্গমঞ্চে তাঁর খেলা দেখান, সেখানে তাঁকে আমি দেখি। নিকোলা নামক আর এক বিখ্যাত যাদুকরের খেলা ১৯১০ সালের ডিসেম্বর মাসে "গ্র্যাণ্ড অপেরা হাউসে" দেখি। ১৯০৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ষ্টার থিয়েটারে প্রফেসর গ্রসী (Grossi) ও তৎসঙ্গে রেনী নাম্নী মহিলা (Mlle Renee) তাঁদের খেলা দেখান, তাতে প্রধান অনুষ্ঠান ছিল "Thought reading" অর্থাৎ মনের কথা বা অগোচর বস্তুর বর্ণনা, যেমন, ষ্টেজে দাঁড়িয়ে কোন দর্শকের পকেটে কতটাকা বা কি জিনিষ আছে বলে দেওয়া, ইত্যাদি। এসব ছাড়া, দুটি বিখ্যাত ব্যায়াম-বীরের ক্রীড়া কলকাতা রঙ্গমঞ্চে দেখান হয়েছিল, একজন "স্যাণ্ডো" অপর জন প্রফেসর রামমূর্ত্তি। স্যাণ্ডোর নাম জগৎ বিখ্যাত, ধরতে গেলে তাঁর নাম ভাষার মধ্যে প্রবেশলাভ করেছে, কোন শক্তিমান পুরুষের কথা বলতে গেলে আমরা বলে থাকি, সে একটা "স্যাণ্ডো"। তিনি ১৮৬৭ সালে জার্মানীতে জন্মগ্রহণ করেন, পরে ইংলণ্ডে এসে স্থায়ীভাবে বাস করেন ও আইনতঃ (naturalised) ইংরেজ পদবী বাচ্য হয়ে যান। ইংলণ্ডেই ৫৮ বছর বয়সে এক মোটর দুর্ঘটনার ফলে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে তাঁর মৃত্যু ঘটে। তাঁর জীবন কাহিনীর পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন, তবে এটুকু বলা দরকার যে বাল্যে তাঁর শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল ও অপরিপুষ্ট ছিল। তিনি কোন জার্ম্মান ইউনিভার্সিটি থেকে ডাক্তারী পাশ করে ও শরীরতত্ত্বে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করে, একটি সহজসাধ্য ব্যায়াম-প্রণালী আবিষ্কারের চেষ্টায় তাঁর সকল বুদ্ধি ও শক্তি নিয়োগ করেন এবং নিজের উদ্ভাবিত ব্যায়াম অনুশীলন করে জগতের শ্রেষ্ঠ শক্তিমান পুরুষ হয়ে ওঠেন। একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে ইংলণ্ড, আমেরিকা যায় ভারতবর্ষে পর্য্যন্ত প্রচলিত প্রায় সবরকম ব্যায়াম প্রণালীর তিনি "জনক" ছিলেন। ১৯০৪ সালে তিনি তাঁর ব্যায়াম প্রণালীর বহুল প্রচার উদ্দেশ্যে পৃথিবী পরিভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন এবং কলকাতায়ও আসেন। ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটস্থ "কোরিন্থিয়ান" রঙ্গমঞ্চে আমি তাঁকে ১৯০৪ সালের ১৩ই নভেম্বর তারিখে দেখি। সেদিন স্যাণ্ডোর কসরৎ ছাড়া পার্শী থিয়েটার দল কর্ত্তৃক কয়েকটি নাটকের নির্ব্বাচিত দৃশ্য অভিনীত হয়েছিল এবং "বায়োস্কোপ" ছবিও দেখান হয়েছিল।

আমি অনেক শক্তিমান পুরুষ, ব্যায়ামবীর, কুস্তির পালোয়ান প্রভৃতিকে দেখেছি কিন্তু স্যাণ্ডোর মত সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর সুগঠিত দেহ আর দেখিনি। সেদিন তাকে দেখি তিনি প্রথমে রঙ্গমঞ্চে এলেন, ফ্রক্‌কোট ও ইজার-পরিহিত সাধারণ বেশ, বলিষ্ঠ গঠনের লোক বলে মনে হ'ল। এই বেশে এসে প্রথমে তাঁর ব্যায়াম প্রণালী সম্বন্ধে কিছু বক্তৃতা দিলেন। তারপরে আবার যখন এলেন, তাঁর দেহ সম্পূর্ণ অনাবৃত, কেবল কটিদেশ বাঘছালে ঘেরা ও পায়ে "রোমান স্যাণ্ডাল"। তখন দেখা গেল কি সুন্দরভাবে তাঁর দেহ পরিপুষ্ট। ষ্টেজের মাঝখানে একটা "চাক্তি"র ওপর তিনি দাঁড়ালেন, সেটা আস্তে আস্তে ঘুরে যেতে লাগলো, আর একটা উজ্জ্বল আলো (Spot light) তাঁর দেহের ওপর ফেলা হলো। চাক্তিটি ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে তিনিও ওপর থেকে নিচে পর্য্যন্ত শরীরের প্রত্যেক পেশী শক্ত করে একে একে দেখাতে লাগলেন। এর পরে তিনি তাঁর অনুচর ও শিষ্যবর্গ নিয়ে শক্তির পরিচায়ক কতকগুলি কসরৎ দেখালেন, সবগুলির বর্ণনা দিতে গেলে প্রবন্ধ দীর্ঘ হয়ে পড়বে, সবশেষে যে খেলাটি দেখালেন আমি কেবলমাত্র সেটির বর্ণনা দিচ্ছি। স্যাণ্ডো ষ্টেজের ওপর সটান লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লেন, তাঁর মাথা রইলো দর্শকের

চিত্রবাণী

দিকে পা রইলো ষ্টেজের পিছন দিকে। তারপর কেবলমাত্র হাত ও পায়ের ওপর ভর রেখে তাঁর দেহ ধনুকাকারে বাঁকিয়ে উঁচু করে তুললেন, যাকে "আর্চ" (arch) বা খিলান বলে। তখন তাঁর অনুচরবর্গ একটি প্রকাণ্ড কাঠের "বীম" প্রায় ২০ ফুট লম্বা, এনে তাঁর বুকের ওপর চাপিয়ে দিলো, এবং ওপাশে একজন ওপাশে একজন এইভাবে দুজন দুজন করে সেই বীমের ওপর চড়ে বসতে লাগলো, দেখা গেল এপাশে সাত ওপাশে সাত, চৌদ্দজন পুরুষ সেই বীমের ওপর চড়ে বসেছে। এখন সব সমেত ওজন, যা তিনি আর্চ হয়ে বুকের ওপর বহন করছিলেন, কম করেও অন্ততঃ ৩৪-৩৫ মণ হবে। তারপরে, আবার এপাশ ওপাশ থেকে একজন একজন করে নিচে লাফিয়ে পড়ে এবং সবশেষে বীমটিও তুলে নেওয়া হয়, তখন তিনি উঠে দাঁড়ালেন। মনে রাখতে হবে সমস্ত ব্যাপারটি, বীম চাপানো থেকে লোকজন ওঠা ও নামা নিয়ে বেশ কয়েক মিনিট সময় লেগেছিল এবং সমস্তক্ষণই তিনি আর্চ হয়ে ছিলেন। এরকম অমানুষিক শক্তির পরিচয় আমি আর কখনো দেখিনি।

এরপরে প্রফেসর রামমূর্ত্তির খেলার কথা বলবো। তাঁর পূর্ণ নাম ছিল রামমূর্ত্তি নাইডু, দক্ষিণ ভারতের ব্যায়াম বীর। তাকে মিনার্ভা থিয়েটারে ১৯০৯ সালের ১৭ই এপ্রিল তারিখে দেখি (সেদিন তাঁর খেলার পরে "মেবার পতন" নাটকের অভিনয় হয়েছিল)। তাঁর দেহ মধ্যমাকৃতি, কিন্তু খুব চওড়া, বলিষ্ঠ গঠনের, অনেকটা "কুস্তিগীর" পালোয়ান গোছের চেহারা। তিনি যে সব কসরৎ দেখালেন তার মধ্যে বুকের ওপর পাথর ভাঙ্গা এবং বুকের ওপর দিয়ে হাতি চলে যাওয়া, এই দুটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথমটিতে, তিনি ষ্টেজের ওপর শুয়ে পড়লেন, তাঁর বুকের ওপর একখানা প্রকাণ্ড চৌকো পাথরের "ব্লক্" চাপান হলো, তার ওপর আর একখানা পাথর রেখে সেটা তাঁর অনুচরবর্গ হাতুড়ির আঘাতে ভেঙে দিল। দ্বিতীয়টিতে, শোয়া অবস্থায় তাঁর বুকের ওপর আড়াআড়িভাবে একখানা প্রকাণ্ড চওড়া কাঠের তক্তা রাখা হলো, হাতি তাঁর দেহের এপাশ থেকে আস্তে আস্তে তক্তার ওপর পা দিয়ে দেহ অতিক্রম করে ওপাশে নেমে গেল। হাতিটি নিতান্ত ছোট নয়, বেশ পরিপুষ্ট এবং নিশ্চয়ই এক মুহূর্ত্ত-কাল যখন হাতিটি ঠিক রামমূর্ত্তির বুকের ওপর দিয়ে দেহ অতিক্রম করছিল, তখন তার সম্পূর্ণ ওজন রামমূর্ত্তির বুকের ওপর পড়েছিল। সুতরাং এ খেলাটিও অমানুষিক শক্তির পরিচায়ক, সন্দেহ নেই।

তারপর থাষ্টন, নিকোলা প্রভৃতি যাদুকরের খেলা সম্বন্ধে বলতে গেলে বলতে হয় যে তারা নানারকম খুব অদ্ভুত খেলা দেখিয়েছিলেন বটে, কিন্তু সবই নানারকমের বহুমূল্য যন্ত্র-সরঞ্জামের সাহায্যে দেখানো, সুতরাং সেগুলি বিস্ময়কর হলেও, চোখের ধাঁধাঁ ছাড়া আর কিছু বলা চলে না। এমন একটিও খেলা ছিল না যার রহস্য দর্শক ভেদ করতে পেরেছিলেন এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা চোখের সামনে যাদুকর অসম্ভবকে সম্ভব করিয়ে দেখিয়ে যাচ্ছিলেন, তবুও সে সবই ধাপ্পা বা ধাঁধাঁ মাত্র উদাহরণ দিলেই পাঠক বুঝতে পারবেন, থাষ্টন শূন্যে মানুষকে ভাসতে দেখালেন (যাকে levitation বলে)। দর্শকের চোখের সামনে ষ্টেজের ওপরে একটি সাধারণ লম্বা টেবিল রাখা হলো, তাতে একটি নারীকে শোয়ান হলো। যাদুকর নারীর শায়িত দেহের উপরে শূন্যে হাত চালনা করতে লাগলেন (pass), কিছু পরে দেহটি আস্তে আস্তে টেবিলের উপর থেকে প্রায় ২ ফুট উঁচুতে উঠে শক্ত, আড়ষ্ট-ভাবে ভাসতে লাগলো। যাদুকর একটি লম্বা ছড়ি নিয়ে দেহের উপরে, নিচে, আশেপাশে চালিয়ে দেখালেন যে কোনরকম তার বা অন্য কিছু যাতে দেহটি ভর করতে পারে এমন কোন দিকে কিছুই নেই। এ যে কি করে হলো তা আমি বলতে পারি না, স্বচক্ষে দেখলাম এই পর্য্যন্ত বলতে পারি। পয়সা দিয়ে যাদু বা ম্যাজিক্ দেখতে গিয়েছি, ম্যাজিক্ দেখলাম, এর বেশী আর জানবারও দরকার ছিল না।

রূপ ও কথা

মুক্তি-প্রতীক্ষায় 'দেবী-চৌধুরাণী'

রূপায়ণ চিত্র প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিক নিবেদন 'দেবী চৌধুরাণী'র মুক্তির দিন আসন্নপ্রায়। কলকাতার কয়েকটি বিখ্যাত ছবিঘরে ছবিটি একযোগে প্রদর্শনের ব্যবস্থা হয়েছে। সহরের পরিবেশন ব্যবস্থা চিত্র প্রযোজক রবিপ্রসাদ গুপ্ত কর্ত্তৃক সংরক্ষিত এবং মফঃস্বল ও সং[illegible] এবং বাংলার বাইরের সমুদয় ষ্টেশনে পরিবেশন করবেন মুভিস্থান লিমিটেড। সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের এই কাহিনীটি মহিমান্বিত মাতৃত্বের অপূর্ব মাধুর্য্যে বিমণ্ডিত। নাম-ভূমিকায় অভিনয় করেছেন সুমিত্রা দেবী। দু'টি কূট-চরিত্রে অবতীর্ণ হয়েছেন নবযুগের দুই শ্রেষ্ঠ চরিত্রাভিনেতা নীতিশ মুখোপাধ্যায় ও ছবি বিশ্বাস। গানগুলি রচনা করেছেন বিমল চন্দ্র ঘোষ এবং মোহিনী চৌধুরী। সর্ব্বজনপরিচিত প্রয়োগশিল্পী প্রফুল্ল রায় মহাশয়ের নির্দ্দেশে ছবিখানি গৃহীত হয়েছে। ছবিখানির ভারতীয় প্রচারকার্য্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রচারবিদ্ সুধীরেন্দ্র সান্যাল। গানগুলিতে সুরসংযোজনা করেছেন কালীপদ সেন।

ফিল্ম ট্রাষ্ট অফ্ ইণ্ডিয়া

কালী ফিল্মস্ ষ্টুডিওতে ফিল্ম ট্রাষ্ট অফ ইণ্ডিয়ার নতুন বাংলা ছবি '৪২'এর মহরৎ মাননীয় মন্ত্রীদ্বয় শ্রী ভূপতি মজুমদার ও শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ এবং অন্যান্য বিশিষ্ট জননায়কদের উপস্থিতিতে সুসম্পন্ন হয়েছে। ১৯৪২ সালের আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ছবিটি তোলা হবে। ছবিখানি পরিচালনা করবেন হেমেন গুপ্ত।

শুভ মহরৎ

গত ১১ই মার্চ্চ শুক্রবার ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে বোসার্ট প্রডাকসন্সের নতুন ছবি বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাধারাণী'র শুভ মহরৎ অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হয়েছে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সুপ্রসিদ্ধ পরিচালক দেবকী কুমার বসু এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন সুসাহিত্যিক সজনীকান্ত দাস। এছাড়া এই অনুষ্ঠানে অনেক প্রসিদ্ধ পরিচালক, মন্ত্রী, সাহিত্যিক, অভিনেতা এবং অভিনেত্রী উপস্থিত ছিলেন। ছবিটি পরিচালনার ভার নিয়েছেন সুধাংশ ঘটক। সঙ্গীত পরিচালনা করবেন অনিল বাগচি। 'রাধারাণী'র চিত্রনাট্য এবং সঙ্গীত রচনা করেছেন সজনীকান্ত দাস। প্রযোজনার ভার নিয়েছেন সুখেন্দু বসু।

গত শুক্রবার ১১ই মার্চ্চ সকালে ন্যাশনাল প্রোগ্রেসিভ পিকচার্সের দ্বিতীয় চিত্র 'পরিবর্ত্তন' এর শুভ মহরৎ ক্যালকাটা মুভিটোন ষ্টুডিওতে সম্পন্ন হয়েছে।

গত বৃহস্পতিবার ১০ই মার্চ্চ সকালে প্রেমেন্দ্র মিত্রের কাহিনী অবলম্বনে 'ভারত লোক চিত্রণে'র প্রথম ছবি 'দিক ভ্রান্ত'র শুভ মহরৎ রূপশ্রী ষ্টুডিওতে সম্পন্ন হয়েছে। চিত্রটি পরিচালনা করবেন সুশীল মজুমদার।

গত ৬ই মার্চ্চ রবিবার নবগঠিত 'রূপশ্রী ষ্টুডিও' চিত্রশ্রী লিমিটেডের প্রথম চিত্র 'চিতা বহ্নিমান'-এর শুভ মহরৎ সম্পন্ন করে দ্বারোদ্ঘাটন করেছে। এই ছবির কাহিনী লিখেছেন ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়, চিত্রনাট্য রচনা করেছেন মনুজেন্দ্র ভঞ্জ ('চন্দ্রশেখর') এবং প্রযোজনা ও পরিচালনা করবেন ধীরেন শীল। এই অনুষ্ঠানে শ্রীমতী সুপ্রভা মুখোপাধ্যায়ের চিত্র গৃহীত হয়।

চিত্রবাণী

নিউ থিয়েটার্স

পরিচালক হেমচন্দ্র চন্দ্রের পরিচালনায় নিউ থিয়েটার্সের 'বিষ্ণুপ্রিয়া'র চিত্রগ্রহণ দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। যে চরিত্রকে বাঙ্গালা তথা সমগ্র ভারতবাসী পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রীতির সঙ্গে স্মরণ করে নিউ থিয়েটার্সের এই নতুন ছবিতে তার পূর্ণ মর্য্যাদা এবং সৌন্দর্য্য রক্ষা করা হবে। সৌরেন সেন বিষ্ণুপ্রিয়ার দৃশ্যপটাদি নির্ম্মাণ করেছেন। নাম ভূমিকায় অভিনয় করেছেন শ্রীমতী মীরা মিশ্র। নিমাই চরিত্রে প্রদীপ বর্দ্ধন এবং শচীমাতার ভূমিকায় চন্দ্রাবতী অভিনয় করছেন।

শরৎচন্দ্রের 'রামের সুমতি'র হিন্দী চিত্ররূপ 'ছোটা ভাই' এর চিত্রগ্রহণ সম্পূর্ণ হ'য়ে গেছে। নিউ থিয়েটার্সের এই নতুন হিন্দী ছবিটি মুক্তি প্রতীক্ষায়। 'নারায়ণী বৌদি'র ভূমিকায় মলিনা দেবীর স্বভাবসিদ্ধ আবেগময় অভিনয় ছবিটিকে বিশেষভাবে মাধুর্য্য মণ্ডিত করেছে।

সুবোধ মিত্রের পরিচালনায় আর একখানি বাংলা ছবি 'মর্য্যাদা'র কাজ শীঘ্রই সুরু হবে। এর কাহিনী রচনা করেছেন বিনয় চট্টোপাধ্যায় এবং প্রধান কয়েকটি ভূমিকায় থাকবেন অসিতবরণ, ভারতী, চন্দ্রাবতী এবং ছবি বিশ্বাস।

চিত্র প্রতিষ্ঠান লিমিটেড

চিত্র প্রতিষ্ঠান লিমিটেডের প্রথম সামাজিক চিত্র "হেব ফের" আগতপ্রায়। মা হয়েও স্বেচ্ছায় সন্তানের কাছে আত্মগোপন থাকার এই বেদনাময় কাহিনীটি বাঙ্গলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি কাহিনী থেকে চিত্রনাট্যে রূপায়িত করা হয়েছে। ছবিখানির বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেছেন—চন্দ্রাবতী, দীপ্তি রায়, সমর রায়, অবনী, স্বাগতা চক্রবর্ত্তী, শ্যাম লাহা প্রভৃতি।

সুপ্রভাত ফিল্ম

এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম ছবি 'নিরক্ষর'-এর কাহিনী রচনা করেছেন চরণ দাস ঘোষ। ছবিটি পরিচালনা করবেন শুভময় বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গীত পরিচালনার ভার নিয়েছেন অনুপম ঘটক।

বহুব্রীহি

কল্পরূপায়নী লিমিটেডের প্রথম চিত্রনাট্য লব্ধপ্রতিষ্ঠ নাট্যকার জলধর চট্টোপাধ্যায়ের 'বহুব্রীহি'। পরিচালনা করেছেন নাট্যকার নিজেই। জটিল সমাজ সমস্যার অবতারণা করেই কাহিনীকার এইরূপ নামকরণ করেছেন ব'লে জানা গেলো। 'বহুব্রীহি' নাকি কাহিনীর নায়িকার নাম আর 'অব্যয়' এর নায়ক। সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন প্রদ্যোতনারায়ণ, চিত্রগ্রহণ করেছেন পঞ্চানন চৌধুরী, শিল্প নির্দ্দেশনার ভার নিয়েছেন মণি মজুমদার আর বিভিন্নাংশে অভিনয় করেছেন বাণীব্রত, ঝর্ণা রায়, মনোরঞ্জন, মিহির, সন্ধ্যা, লীলাবতী প্রভৃতি। ছবিটি আগামী ২৫শে মার্চ্চ বিভিন্ন চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করবে।

কর্ম্মফল

কালীপদ দাসের প্রযোজনায় ও পরিচালনায় ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে শ্রীগুরু পিকচার্সের কর্ম্মফল তোলা শেষ হয়েছে। এই চিত্রের কাহিনী লিখেছেন শ্রীমতী দুর্গাবতী দেবী। নারী হৃদয়ের অন্তর্নিহিত সুখ-দুঃখ হাসি-কান্নাকে কেন্দ্র করে কর্ম্মফলের কাহিনী গড়ে উঠেছে। বিভিন্নাংশে অভিনয় করেছেন মনোরঞ্জন, বাণীব্রত, বীরেন মিত্র, সুকুমার গুহ, তুলসী, প্রীতিধারা, অপর্ণা, স্বাগতা, রাজলক্ষ্মী (বড়) প্রভৃতি।

বিস্মৃতি

কৃষ্ণা প্রোডিউসার্সের বাংলা চিত্র 'বিস্মৃতি' ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে অতুল দাশগুপ্তের পরিচালনায় কিছুদূর অগ্রসর হতে না হতেই পরিচালকের মৃত্যুর জন্য সাময়িকভাবে বন্ধ থাকে। সমর ঘোষ এই চিত্রখানি পরিচালনা করবার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। ভূমিকায় আছেন—রেণুকা, অপর্ণা, নীতিশ, কানু, সন্তোষ, শৈলেন পাল, রবি রায় প্রভৃতি।

বিভা চিত্রণ

এই চিত্র প্রতিষ্ঠানের প্রথম ছবি বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজ মোহনের বৌ' এর চিত্ররূপ গ্রহণের কাজ ভালভাবেই এগিয়ে চলেছে। এর বিভিন্ন ভূমিকায় রূপদান করছেন জ্যোৎস্না গুপ্তা, রেবা, ঝর্ণা, গৌরী দেবী, দেবীপ্রসাদ প্রভৃতি।

চিত্রবাণী

দাসীপুত্র

দেবনারায়ণ গুপ্তের পরিচালনায় এবং সত্যাংশু কিরণ দালালের প্রযোজনায় 'দাসীপুত্রে'র কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ছবির কাহিনী রচনা করেছেন দেবনারায়ণবাবু নিজেই। সঙ্গীত পরিচালনার ভার নিয়েছেন বিভূতি দত্ত। চিত্রগ্রহণ ও শব্দগ্রহণ করেছেন যথাক্রমে অনিল গুপ্ত ও শিশির চট্টোপাধ্যায়। জানতে পারা গেছে, এই ছবিতে সরযূবালা অত্যন্ত প্রাণস্পর্শী অভিনয় করেছেন। অন্যান্য ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করেছেন অহীন্দ্র চৌধুরী, সন্তোষ সিংহ, শ্যাম লাহা, দীপক, নবদ্বীপ হালদার, আশু বসু, বাণীবালা।

এ যুগের মেয়ে

লক্ষ্মী প্রডাকসন্সের সর্ব্বপ্রথম সামাজিক ছবি 'এ যুগের মেয়ে' বন্ধন মোচনের অপেক্ষায় রয়েছে। পরিচালনায় আছেন কমল চট্টোপাধ্যায়, সঙ্গীত পরিচালনায় নির্বাণ চক্রবর্ত্তী এবং অভিনয়ে বিমান, মঞ্জুলিকা, বহ্নিশিখা, ইন্দু, স্বপ্রভা, অপর্ণা, লীলাবতী, চন্দ্রশেখর প্রভৃতি।

কালসাপ

অপরাধমূলক ছবি "কুহকিনী"র নাম পরিবর্ত্তন ক'রে 'কালসাপ' রাখা হয়েছে। ছবিটি খগেন রায়ের পরিচালনায় সমাপ্ত হয়ে মুক্তির দিন গুনছে। বিশিষ্ট অংশে অভিনয় করেছেন ছবি বিশ্বাস, ধীরাজ ভট্টাচার্য্য, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, প্রমীলা ত্রিবেদী প্রভৃতি।

রাঙারাখী পিকচার্স

অভিনেতা বেচু সিংহের পরিচালনায় 'বীরেশ লাহিড়ী'র কাজ বেশ কিছুটা এগিয়েছে। স্মৃতিরেখা বিশ্বাস, শান্তি গুপ্তা, বন্দনা, বেচু সিংহ, দেবকুমার, মণি মজুমদার প্রভৃতি শিল্পীরা এতে রূপদান করছেন। সঙ্গীত পরিচালনা করছেন সত্যদেব ঘোষ।

সুধা প্রোডাকসন্স

জহর মুখোপাধ্যায়ের প্রযোজনায় ও খগেন রায়ের পরিচালনায় 'প্রতিরোধ' চিত্রের কাজ সমাপ্তির পথে। এর বিভিন্ন ভূমিকায় রূপদান করছেন অহীন্দ্র চৌধুরী, ইন্দু মুখোপাধ্যায়, কমল মিত্র, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, জীবেন বসু, তুলসী চক্রবর্ত্তী, হরিধন, কৃষ্ণধন, মীরা সরকার, রেণুকা রায়, আরতি দাস, রেবা প্রভৃতি। সুর-যোজনা করছেন রবীন দাস।

রমা আর্ট প্রডিউসার্স

আশু বন্দোপাধ্যায় রচিত 'সংসার' সুধীরবন্ধুর প্রযোজনায় চিত্রে রূপগ্রহণ করছে। এর বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করছেন রবীন মজুমদার, সন্ধ্যারাণী, শান্তি গুপ্তা, জীবেন বসু, জ্ঞাননারায়ণ মুখোপাধ্যায়, রবি রায়, চিত্রা দেবী, বন্দনা, বেচু সিংহ, ইন্দু, প্রভা প্রভৃতি। সঙ্গীত পরিচালনা করছেন সুরকার সুবল দাশগুপ্ত।

সুধীর বন্ধু প্রডাকসন্স

সুধীর বন্ধু প্রডাকসন্সের দ্বিতীয় চিত্র নিবেদন 'দখনে বাঘ'-এর কাজ ইষ্টার্ণ টকিজ ষ্টুডিওতে সুরু হয়েছে। খ্যাতনামা চিত্রশিল্পী বিভূতি দাস 'দখনে বাঘ' চিত্রখানি পরিচালনা করছেন। পণ্ডিত কালীকিঙ্করের ওপর সংগীত পরিচালনার ভার দেওয়া হয়েছে। 'দখনে বাঘে'র কাহিনী রচনা করেছেন প্রবীণ সাহিত্যিক মণিলাল বন্দোপাধ্যায়।

বিদেশের ষ্টুডিয়োতে

আমেরিকা

'দি ফিল্ম ডেলী' পত্রিকা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যেক চলচ্চিত্র-সমালোচক ও বেতার-সমালোচকের কাছে কয়েকটি প্রশ্নের একটি তালিকা পাঠিয়েছেন। এই প্রশ্ন তালিকার একটি প্রশ্ন হচ্ছে, দর্শকরা বিদেশী ছবি দেখতে রাজী কিনা? উত্তরে শতকরা ৫৩ জন বলেছেন যে, তাঁরা ভালো বিদেশী ছবি দেখে বিশেষ আনন্দ লাভ করেন, বিশেষ করে বৃটিশ ছবি দেখে। বিদেশী ছবি বিশেষ করে বৃটিশ ছবি সম্বন্ধে তাঁরা বলেছেন যে, ভাল গল্প, আবেগময় অভিনয় ও উন্নত ধরণের শব্দগ্রহণের জন্যই ঐগুলি তাঁদের ভালো লাগে। মার্কিন দর্শকের এই বিদেশী ছবিপ্রীতি সত্যই বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

রাশিয়া

সোভিয়েট চলচ্চিত্র বিভাগের মন্ত্রী, এম বলসাকভ (M. Bolshakov) ১৯৪৬।৪৭ সালে তৈরী ছবির তালিকা তৈরী করিয়েছেন। এই তালিকা থেকেই বোঝা যায় রাশিয়ায় নতুন ধারায় ছবি উঠছে। ১৯৫৭ সালের অক্টোবর মাসে তোলা পাঁচটী ছবি থেকেই এটা বোঝা যায়। এই পাঁচটী হচ্ছে—(১) "দি ভাউ" ১৯২৪ সাল থেকে ১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত যে সব ঘটনা সোভিয়েটে ঘটেছে তার ইতিহাস। ছবিটী পরিচালনা করেছেন চিউরেলি। (Tchiaureli)। (২) সোভিয়েটে খনি জীবনের চিত্র "দি গ্রেট লাইফ," (৩) জার্মান অধিকারের বিরুদ্ধে যুগোশ্লাভ এবং রাশিয়ানদের যুক্ত সংগ্রামের ঘটনাবলী নিয়ে নির্ম্মিত চিত্র "দি নিউ যুগোশ্লাভিয়া, পরিচালনা করেছেন এ, রুম (A. Room)। (৪) "এ্যানিট" ছবিটি আমেরিকার একটি রূপকথা অবলম্বনে তোলা, (৫) "গ্লিঙ্কা" (Glinka) ছবিটী রাশিয়ার খ্যাতনামা সঙ্গীতজ্ঞের জীবনকাহিনী ভিত্তি করে তোলা। এটী রচনা এবং পরিচালনা করেছেন আর্নষ্টাম্। অন্যান্য যে সব ছবি সোভিয়েটে উঠেছে—"দি লিট্‌ল্ হাউস অফ কালটুস্কা", রাশিয়ান বৈজ্ঞানিক পাভলভ (Pavlov) এর জীবনী নিয়ে তোলা, "মিচুরিন"—এটিও একজন প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকের জীবনী, ডাক্তারী গবেষণার উপর তোলা—"ইন্ দি নেম্ অফ্ লাইফ্"। "দি এন চ্যান্টেড্ ডায়মণ্ড"—একজন সোভিয়েট ভূতত্ত্ববিদের জীবনকথা, "দি এডুকেশন্ অফ্ সেন্টিমেন্টস্"—একটি ছাত্রীর গল্প। ঐতিহাসিক চিত্র হিসাবে পুডোভকিন-এর "এডমিরাল নাখিমোভ" এবং ইজিমেন্ট-এর "দি সঙ্গ অফ্ দি ভারিয়াগ" বলে রুশ-জাপান যুদ্ধের ছবিটি সম্প্রতি তোলা হয়ে গেছে। এছাড়া গত মহাযুদ্ধের ওপর ভিত্তি করে বহু ছবি, নাচ গানের ছবি, রোমান্টিক ছবি, রূপকথার চিত্ররূপ—বহু রকমের ছবি তোলা হয়েছে। এই ছবিগুলি ছাড়া, দুই সোফারের জীবনকে কেন্দ্র করে "মেসিন ২২১২" নামে লেনফিল্ম একটী ষ্টিরিওস্কোপিক ছবিও তৈরী করেছেন।

পর্টুগাল

পর্টুগাল গভর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে ছায়াচিত্রশিল্প পুনর্গঠনের চেষ্টা চলেছে। এই উদ্দেশ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট পর্টুগীজ ছবির জন্য "ইন্‌ফরমেশন এণ্ড কালচার" দপ্তর থেকে পুরস্কারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। লিসবনের একটী অনুষ্ঠানে জাতীয় শিক্ষা বিভাগের মন্ত্রীর সভাপতিত্বে ও বহু চিত্র প্রযোজক, পরিবেশক, প্রদর্শক এবং সাংবাদিকের উপস্থিতিতে পুরস্কার দেওয়া হয়। সবচেয়ে ভাল তথ্যমূলক ছবি এবং সবচেয়ে ভাল অভিনয়ের জন্যও পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল। পর্টুগীজ চলচ্চিত্রের ক্রমোন্নতির জন্য সরকারীভাবে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে এবং চিত্রশিল্পকে রক্ষা করবার জন্য আইনও তৈরী করা হয়েছে।

হাঙ্গেরী

গত মহাযুদ্ধের পর বুডাপেষ্টে 'ফিল্ম আর্ট কলেজ' নামে একটী চলচ্চিত্র বিষয়ক শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হয়েছে। এই কলেজের অধ্যক্ষ চিত্রপরিচালক ভিক্টর গার্টলার একজন নামকরা শিল্পী। প্রথম বছরে ছায়াছবি সংক্রান্ত কলা কৌশল শেখবার জন্য এখানে প্রায় ষাটজন ছাত্র যোগ দেয়।

এখানকার শিক্ষা শেষ করতে তিন বছর সময় লাগে, এখানে ছাত্রদের চলচ্চিত্র শিল্প বিষয়ে হাতে কলমে শিক্ষা দেওয়া হয়।

ইটালী

যুদ্ধোত্তর কালে ইটালীয় ছবির পুনরভ্যুত্থান ঘটেছে। বহু চিত্র প্রদর্শন উৎসবে এটাই স্পষ্ট দেখা গেছে যে ইটালীয় ছবি যে কোনো ভাল ইউরোপীয় ছবির সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। ইটালীতে এক নতুন প্রতিভাশালী পরিচালকগোষ্ঠীর আবির্ভাব হয়েছে।

চীন

চীন দেশের পুনর্গঠনের কাজে চলচ্চিত্রকে একটা বিশিষ্ট স্থান দেওয়া হয়েছে। সোস্যাল এফেয়ারস্ বিভাগ এবং শিক্ষাবিভাগ যুক্তভাবে এই মীমাংসায় উপস্থিত হয়েছেন যে দেশের জনগণের বৃহত্তর অংশের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ রক্ষার কাজে চিত্রশিল্প অত্যন্ত ফলপ্রসূ। এই উদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষ উন্নত ধরণের ছবি তুলবেন বলে স্থির করেছেন। তার মধ্যে শিক্ষামূলক চিত্রই বেশী থাকবে এবং এর দ্বারা জনসাধারণকে এই শিক্ষাই দেওয়া হবে যে আধুনিক যন্ত্র মানুষের চেয়ে অনেক শক্তিশালী। এক একটি নির্দ্দিষ্ট বিষয় নিয়ে প্রত্যেকটি ছবি তৈরী হবে, এতে সংলাপ খুব কম থাকবে এবং হাবভাব ও ভঙ্গীর দ্বারা বিষয়বস্তুকে ফুটিয়ে তোলা হবে। চীনে প্রায় আটশো চিত্রগৃহ আছে। এই চিত্রগৃহগুলিতে তিনশো থেকে আড়াই হাজার লোক ধরে। চলচ্চিত্রের উন্নতির জন্য যে সকল উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতির দরকার হবে সরকারীভাবে তার বন্দোবস্ত করা হবে। এইজন্য সাংহাই-এর একটা যন্ত্রপাতির কোম্পানীকে চলচ্চিত্র বিষয়ক বহুপ্রকার যন্ত্রপাতির জন্য পাঁচ লক্ষ ডলার দেওয়া হয়েছে।

মেক্সিকো

আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র শিল্পের বাজারে মেক্সিকোর ছবিকে চালু করবার চেষ্টা হয়েছে। কেনাসের বিশ্ব চলচ্চিত্র প্রতিযোগিতায় মেকসিকান ছবি 'মেরিয়া ক্যানডি-লারিয়া' ভাল ক্যামেরার কাজের জন্য পুরস্কার পেয়েছে। কিছুদিন আগে মেকসিকোর চলচ্চিত্র প্রযোজক সঙ্ঘের সভাপতি রাউল ডি এনডি (Raoul De Ande)

মার্কিন ছবির কিশোরী অভিনেত্রী মারগারেট-ও ব্রিয়ান

বলেছিলেন,—বিক্ষিপ্তভাবে ছবি তুললে কোন রকম লাভ হয় না, অথচ সুসংবদ্ধভাবে একটি ধারা অনুসরণ করে ছবি তুললে ভাল লাভের সম্ভাবনা আছে। এখন মেক্সিকো বিদেশে তার চিত্র দেখাবার আশা নিয়ে ছবি তোলার কাজে নেমেছে। এই ছবি তোলার সুবিধার জন্যে আধুনিক সাজসরঞ্জামযুক্ত নতুন ষ্টুডিও, "চুরু বাসকো ষ্টুডিও" তৈরী হয়েছে। এই ষ্টুডিওতে ১৪টি ফ্লোর আছে, এতে প্রায় পঁয়তাল্লিশ লক্ষ ডলার খরচ হয়েছে। অন্যান্য ষ্টুডিওগুলি ফ্লোর এবং ল্যাবরেটারির সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে নতুন যন্ত্রপাতিও আনিয়েছে। পৃথিবীর বাজারে ছবি চালু করবার জন্য স্পেনীয় এবং ইংরাজী দুই ভাষাতেই ছবি তৈরী হচ্ছে। হলিউডের অভিজ্ঞ চিত্রতারকাদের মধ্যে যারা এই দু'টি ভাষাই জানেন যেমন ডলরেস ডেল রিও, আরটুরো ডি করডোভা, বাষ্টার কিটন্, ডেভিড্ সিলভা, র্যাফেলষ্টরম্ এই সব ছবিতে অভিনয় করে থাকেন।

চেকোশ্লোভাকিয়া

নিয়মিতভাবে ছবি তোলার জন্যে প্রয়োজনীয় সকল তোড়জোড় এখানে সমাপ্ত হয়েছে। "ষ্টেট ফিল্ম মনোপলি"র তত্ত্বাবধানে পাঁচটি চিত্র প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। বছরে পঁচিশটি ক'রে পূর্ণাঙ্গ ছবি তৈরীর কর্ম্মসূচী প্রস্তুত করা হয়েছে। দেশের সব জায়গায় যাতে আরোও বেশী সংখ্যক ছবি দেখান যায়, তার সবরকম ব্যবস্থাও করা হয়েছে। দেশের দূরতম স্থানে ছবি দেখাবার জন্য ভ্রাম্যমান সিনেমার বন্দোবস্তও করা হয়েছে এবং এর জন্যে আড়াই হাজার ভ্রাম্যমান সিনেমার দরকার হবে। এছাড়া খোলা জায়গায় ছবি দেখাবার জন্য বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী যন্ত্রপাতিসমেত তিনটি ভ্রাম্যমান সিনেমা দরকার। এইগুলি প্রাগ সহরে, মোরাভিয়ার রাজধানী ব্রনো সহরে এবং শ্লোভাকিয়ার রাজধানী ব্রাটিশ্লাভাতে বসানো হবে। চেকোশ্লোভাকিয়াতে ব্রিটিশ ছবির সমাদরই বেশী।

নতুন ছবি

সন্দীপন পাঠশালা

'সন্দীপন পাঠশালা'র সীতারাম পণ্ডিতের মধ্য দিয়ে তারাশঙ্কর বাংলাদেশের যে দরিদ্র অবজ্ঞাত গ্রাম্য শিক্ষকদের দুঃখময় জীবনের বর্ণনা দিয়েছেন, তার বাস্তব রূপ সেলুলয়েডের ফিতায় ফুটিয়ে তোলা সহজসাধ্য নয়, বাংলাদেশের চিত্র প্রযোজকদের কাছে তা দুঃসাহসও বটে! 'সন্দীপন পাঠশালা'র চিত্ররূপ দেখে আমরা খুশি হয়েছি। ন্যাশনাল সাউণ্ড স্টুডিয়োর কর্তৃপক্ষের উদ্যম আর পরিচালক অর্ধেন্দুবাবুর প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জানাই।

'সন্দীপন পাঠশালার'র কাহিনী আমরা 'চিত্রবাণী'র পৌষালী সংখ্যায় বিবৃত করেছি ব'লে, এখানে আর তার পুনরুল্লেখ করলাম না। তারাশঙ্করের সেই মূল কাহিনীকে যথাসম্ভব অবিকৃত রেখে অর্ধেন্দুবাবু তাঁর চিত্রনাট্য রচনা করেছেন। মূলের সঙ্গে কয়েকটি ঘটনার পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল। মূল উপন্যাসে আছে সীতারাম বার বার চেষ্টা করেও নর্মাল পাশ করতে পারেনি। কিন্তু চিত্রে দেখা গেল—সীতারাম ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাশ করেছে। মূল উপন্যাসে দেশ স্বাধীন হবার প্রসঙ্গ আসেনি। কিন্তু চিত্রে তা দেখানো হয়েছে। এই পরিবর্তন দু'টিতে অবশ্য চিত্ররূপের আবেদন বেড়েছে। কিন্তু মূল উপন্যাসে সীতারাম পণ্ডিতের মৃত্যু দেখানো হয়নি। সেখানে আছে যে, দৃষ্টিশক্তিহীন অকালবৃদ্ধ পণ্ডিত সীতারাম বিধবা কন্যা রত্নার তত্ত্বাবধানে কোনরকমে জীবনের দিনগুলি গুণে যাচ্ছে আর অপেক্ষা করছে কবে তার শ্রেষ্ঠ বন্ধু জমিদারবাড়ির বড়ছেলে ধীরানন্দবাবু আসবেন তার কাছে, লিখবেন তার জীবনকাহিনী তার খেরো-বাঁধা রোজনামচা থেকে। তারপর ধীরানন্দবাবু যেদিন এলেন, সেদিন তাঁর মুখে মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে সীতারামের দুচোখ ঝাপসা হয়ে আসে—সে দেখতে পায় না তার বন্ধুর মুখ। এক করুণ মুহূর্তে দুই বন্ধুর মিলন হয়, ধীরে ধীরে সেখানেই হয় কাহিনীর শেষ। সাহিত্য রসবিচারে এই পরিসমাপ্তিই সুদক্ষ শিল্পীর রচনানৈপুণ্যের পরিচয় দেয়। কিন্তু চিত্ররূপে সীতারামের মৃত্যু পর্যন্ত দেখানো হয়েছে। ধীরানন্দবাবু ও শ্রেষ্ঠ ছাত্র জলধরের হাত বুকে রেখে পণ্ডিত সীতারামের শেষনিশ্বাস ত্যাগ—চিত্রসমাপ্তির দিক থেকে প্রশংসনীয়! কিন্তু সীতারামের শবাধার নিয়ে শোকযাত্রার দৃশ্যটি যোগ

প্রযোজনা	:	ন্যাশনাল সাউণ্ড ষ্টুডিও
কাহিনী	:	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
চিত্রনাট্য ও পরিচালনা	:	অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়.
চিত্রগ্রহণ	:	প্রবোধ দাস ও রামানন্দ সেনগুপ্ত
শব্দগ্রহণ	:	সত্যেন চট্টোপাধ্যায়
গীত রচনা	:	রবীন্দ্রনাথ
সঙ্গীত পরিচালনা	:	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়
ভূমিকায়	:	সাধন সরকার, মীরা সরকার, প্রদীপ বটব্যাল, সিধু গাঙ্গুলী, অমিতা বসু, সুপ্রভা মুখোপাধ্যায়, কিশোর-অভিনেতা নিরঞ্জন ও আরো অনেকে
দেখানো হচ্ছে	:	মিনার, বিজলী ও ছবিঘর

চিত্রবাণী

করার কোনো প্রয়োজনীয়তাই ছিল না। কারণ পণ্ডিত সীতারামের সকরুণ মৃত্যুদৃশ্যই দর্শকচিত্ত আন্দোলিত, উদ্বেলিত করার পক্ষে যথেষ্ট। দর্শক তারপরে আর কিছু আশা করে না বা দেখতেও চায় না। সীতারামের মৃত্যুর পর—গ্রামের ইংরাজী স্কুলের ব্রিটিশ পতাকা অবনমিত হলো, তার জায়গায় উঠলো স্বাধীন ভারতের ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা—সীতারামের স্মৃতিরক্ষার জন্যে সেই স্কুলের নাম হলো 'সন্দীপন পাঠশালা'—চিত্রপরিসমাপ্তির দিক থেকে এই সংযোজনার বিশেষ প্রয়োজন না থাকলেও ছবিকে জনপ্রিয় করার জন্য হয়ত এতদূর টানতে হয়েছে। কিন্তু শোকযাত্রার দৃশ্যটি বাস্তবানুগ হওয়া সত্ত্বেও বাদ দেওয়া উচিত ছিল। তাতে চিত্রের উৎকর্ষই বৃদ্ধি পেত। শেষের দিকে ধীরানন্দবাবুর মুখে আঁকুর পরিণামের যে বর্ণনা দেওয়া হ'য়েছে তার মধ্যে ধর্মতলা স্ট্রীটের ঘটনার উল্লেখ শুধু অপ্রাসঙ্গিকই নয় ছবির মর্যাদাকেও ক্ষুণ্ণ ক'রে দিয়েছে। আঁকু যে নির্ভিকভাবে ব্রিটিশ বুলেটের সামনে বুক পেতে দিয়েছে শুধু এইটুকু বললেই তার চরিত্রের সমস্ত মাধুর্য এবং সীতারাম পণ্ডিতের কাছে তার অতি আদরের আঁকুর কৃতিত্ব অনায়াসেই ফুটে উঠতো। তারজন্য প্রত্যক্ষ কোন সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ঘটনার সাহায্য নেবার প্রয়োজন ছিল না।

পরিচালনার দিক থেকে মূল উপন্যাসের মাধুর্য অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য অর্দ্ধেন্দুবাবুকে অভিনন্দিত করি। তাঁর পরিচালিত ছবিগুলির মধ্যে 'সন্দীপন পাঠশালা'ই শ্রেষ্ঠ ব'লে বিবেচিত হবে। চিরাচরিত আমোদ-প্রমোদমূলক ছবি তিনি তোলেন নি কোনদিনই। তবু, অন্যান্য ছবির বেলায় box office-এর দিকে তাঁর যে পরিমাণ দৃষ্টি ছিল—এ ছবিতে তা নেই। তিনি আন্তরিকভাবে কাহিনীর মর্মকথাকেই ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। 'সন্দীপন পাঠশালা'র পরিবেশ অত্যন্ত বাস্তব। সীতারামের বাবা রামধনের চরিত্র চিত্রণ এবং সেই সঙ্গে কৃষক পরিবারের পটভূমিকা রচনায় পরিচালকের সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় মেলে। সীতারাম যেখানে ধীরানন্দবাবুকে আনবার জন্যে ট্রেণে করে যাত্রা করলো, সেখানকার গ্রাম্যদৃশ্যের চিত্রগ্রহণও চমৎকার। এর জন্যে চিত্রশিল্পীকেও ধন্যবাদ। পাঠশালার ছেলেদের প্রত্যেকটি ভূমিকাই সুঅভিনীত। পরিচালক অর্দ্ধেন্দুবাবু প্রমাণ করে দেখালেন যে, উপযুক্ত শিক্ষা পেলে, এদেশের কিশোর অভিনেতারাও সাগর পারের যে-কোনো প্রথমশ্রেণীর কিশোর অভিনেতার মতো দক্ষতার পরিচয় দিতে পারে। 'সন্দীপন পাঠশালা'র আঁকু ও নেত্যো-ই তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

সুরশিল্পে হেমন্তবাবু তাঁর পূর্বগৌরব অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে' গানটির সঙ্গে মৃদু যন্ত্রসঙ্গীত সংযোজনার জন্যে তাঁকে ধন্যবাদ। তাঁর নিজের কণ্ঠে গাওয়া 'জাগো আলস শয়ন বিলগ্ন' গানখানিও সুগীত। ছেলেদের গানখানি উপভোগ্য। আবহসঙ্গীতও পরিবেশ-অনুরূপ।

'সন্দীপন পাঠশালা'য় যে জিনিসটির অভাব বারবার আমাদের কাছে অনুভূত হয়েছে—তা হলো উৎকৃষ্ট যান্ত্রিক শিল্প-নৈপুণ্য। বহু জায়গায় ছবির tone-এর গরমিল দেখা গেছে। দিনের ও রাতের ছবি নেওয়ার ব্যাপারেও বহু অসঙ্গতি আছে। শব্দগ্রহণেও জায়গায় জায়গায় সমতা রক্ষিত হয়নি। চিত্রের পরিচয়লিপিতে অভিনবত্ব থাকলেও চিত্রগ্রহণের ফলে তা অত্যন্ত অস্পষ্ট হয়েছে। পাঠশালার ছেলেরা যেখানে পুলিশ সাহেবকে কবিতা দিয়ে অভিনন্দিত করলো, শব্দগ্রহণের ত্রুটির জন্যে সেই কবিতা অত্যন্ত অস্পষ্ট হয়েছে—সব কথা বোঝা যায়নি। ছবির শিল্পনির্দেশ ভালো।

প্রধান চরিত্রে সাধন সরকার অপূর্ব অভিনয় করেছেন। তাঁর ভাবাভিব্যক্তিতে চাষার ছেলে পণ্ডিত সীতারামের চরিত্র যথার্থ রূপ লাভ করেছে। তার বাহন গ্রাম্য চাষাটিও নিখুঁত। তার চলায়, বলায় ও অভিব্যক্তিতে সে বাস্তবের চরিত্র হয়ে উঠেছে। সীতারামের বাবা রামধনের ভূমিকায়

চিত্রবাণী

পঞ্চানন ভট্টাচার্যেরও অকুণ্ঠ প্রশংসা করি। সীতারামের রূপাভিক্ষার্থী বৃদ্ধ পণ্ডিতমশাই-ও এক কথায় চমৎকার। তাঁর রূপসজ্জাও প্রশংসার যোগ্য। ধীরানন্দের ভূমিকায় প্রদীপ বটব্যাল আমাদের খুশি করতে পারেননি। তাঁর অভিনয়ে যথেষ্ট আড়ষ্টতা আছে। তাঁর পরিণত বয়সের রূপটিও যথাযথ হয়নি। স্কুল-ইন্সপেক্টর রজনীবাবুর ভূমিকাও ভূপেন চক্রবর্ত্তীর অভিনয়ে যথার্থ রূপলাভ করেনি। সিধু গাঙ্গুলীর—শিবশঙ্কর কিন্তু চলনসই। জ্যোতিষ সাহার ভূমিকায় মণি শ্রীমানীও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। স্ত্রী-ভূমিকায়—মীরা সরকারের 'নীলিমা', সুপ্রভা মুখোপাধ্যায়ের—'মা' ও অমিতা বসুর 'মনোরমা' প্রশংসনীয়। অমিতার অভিনয়গুণে চাষার বৌ মনোরমা জীবন্ত হয়ে উঠেছে। সর্বশেষে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করি—আঁকুর ও লেত্তোর ভূমিকাভিনেতা দুই কিশোরকে। এরা অভিনয়ের পরীক্ষায় একশো নম্বরের মধ্যে একশো নম্বর পাবারই উপযুক্ত। আঁকুর বিদায় দৃশ্যে লেত্তোর বিষাদ মলিন মুখখানি দর্শকচিত্তকে অভিভূত করে।

'সন্দীপন পাঠশালা'র প্রচার ও প্রচারচিত্রণে যথাক্রমে বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় ও ষ্টুডিয়ো মিত্র কৃতিত্বের দাবী রাখেন। শিল্পী আশু বন্দ্যোপাধ্যায় অঙ্কিত প্রচারপুস্তিকা নতুনত্বের সৃষ্টি করেছে।

—চিত্রভানু

কামনা

বাংলাদেশের এক সন্তানহীনা নারীর দুঃখময় জীবনকে কেন্দ্র ক'রে গ'ড়ে উঠেছে 'কামনা'র কাহিনী।

রাজীবের স্ত্রী উৎপলা। স্বামী, শাশুড়ী আর তিন ননদকে নিয়েই তার সংসার। বড় ননদ রমা বিধবা। মেজননদ বেবা বিবাহিতা। আর ছোট ননদ রেখা এখনও কুমারী। সাতবছর হলো এই সংসারের বধূ হয়ে এসেছে উৎপলা—কিন্তু এখনও সে সন্তানহীনা। শাশুড়ীর তাই ক্ষোভের অন্ত নেই। বন্ধ্যা বধূর প্রতি তাই তার বিষময় দৃষ্টি। সর্বক্ষণ অশান্তি লেগেই আছে বাড়িতে। শাশুড়ীর সঙ্গে বড় আর মেজ ননদও যখন তখন নানাভাবে লাঞ্ছনা করে উৎপলা-কে। উৎপলার এতটুকু ত্রুটি কেউ সহ্য করতে যেন রাজী নয়।

উৎপলা কিন্তু প্রতিবাদ করেনা কিছুতে। নীরবে সহ্য করে যায় সকল অত্যাচার ও অপমান। তবু তার একমাত্র সান্ত্বনা ছিল—ছোট ননদ রেখা। বৌদিদির দুঃখ-কষ্টে তার চোখ দিয়েও জল ঝরে। সে তাকে গানে ও হাসি-তামাসায় ভুলিয়ে রাখতে চেষ্টা করে।

কিন্তু বেশিদিন আর এইভাবে নীরবহয়ে থাকা যায় না। উৎপলা বোঝে তাকে লুকিয়ে বাড়িতে একটা ষড়যন্ত্র চলছে—রাজীবকে আবার বিয়ে দেবার জন্যে। উৎপলার এই আশঙ্কা সত্য বলে মনে হয়, যখন হঠাৎ একদিন মেজ ননদ বেবার ভাসুরঝি ইলাকে এই সংসারে এনে রাখা হয় কিছুদিনের জন্যে। ইলা আর রাজীবকে নিয়ে সংসারে ছোটখাটো এমন কতকগুলি ঘটনা ঘটে যায়, যার ফলে, উৎপলার অন্তর বিদ্রোহ ক'রে ওঠে। এ সংসারে আর কোনমতেই থাকা চলে না। অভিমানক্ষুব্ধ বধূ তাই একদিন চলে গেল স্বামীর ঘর ছেড়ে দিল্লীতে তার দাদার কাছে।

রাজীব কিন্তু স্থিরপ্রতিজ্ঞ। বিয়ে আর সে কিছুতেই করবে না, তাতে ছেলে হোক আর নাই হোক। সে তার গ্লাস ফ্যাক্টরী নিয়ে মেতে থাকে, শ্রমিকদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের চেষ্টা করে সব রকমে।

ইতিমধ্যে দিল্লী থেকে অপ্রত্যাশিতভাবে এক চিঠি এসে হাজির। উৎপলার দাদা লিখেছে—উৎপলা সন্তানসম্ভবা। এই সংবাদে সমস্ত সংসারে আনন্দের হিল্লোল বয়ে যায়। এমন কি শাশুড়ী-ননদরা পর্যন্ত ঘটা করে বধূর সাধের তত্ত্ব পাঠাবার আয়োজন করে। কিন্তু পাঠান আর হয় না। কয়েক দিন পরেই ছেলে কোলে করে উৎপলা এসে হাজির হয়।

কিন্তু এই আনন্দ কলরবের মধ্যেও উৎপলা যেন দুঃখী

চিত্রবাণী

প্রযোজনা	ঃ	কীর্ত্তি পিকচার্স
কাহিনী ও সংলাপ	ঃ	ব্যোমকেশ হালদার
চিত্রনাট্য ও পরিচালনা	ঃ	নবেন্দু সুন্দর
চিত্রগ্রহণ	ঃ	মুরারী ঘোষ
শব্দগ্রহণ	ঃ	সত্যেন ঘোষ
গান রচনা	ঃ	রবীন্দ্রনাথ, সুনির্ম্মল বসু ও নবেন্দু সুন্দর
সঙ্গীত পরিচালনা	ঃ	দ্বিজেন চৌধুরী
ভূমিকায়	ঃ	উত্তম, ছবি রায়, জহর গাঙ্গুলী, রাজলক্ষ্মী, ফণী রায়, তুলসী চক্রবর্ত্তী, ৺অমর চৌধুরী, উমা গোয়েঙ্কা ও আরো অনেকে
দেখানো হচ্ছে	ঃ	পূর্ণশ্রী, আলেয়া, যোগমায়া, শ্রীরামপুর টকিজ ও রূপায়ণ চিত্রগৃহে

নয়। কোথায় যেন একটা কাঁটা বিঁধে থাকে। উৎপলা তাই সর্বদা অস্থির। কোন্ অজানা আশঙ্কায় মাঝে মাঝে সে ভয় পেয়ে আর্তনাদ করে। বধূর এই মানসিক চাঞ্চল্য কিন্তু বিধবা বড় ননদের দৃষ্টি এড়ায় না। সে একদিন লক্ষ্য করে, উৎপলা যেন কোন একটি লোকের সঙ্গে বাগানে গোপনে কথাবার্তা বলে, কি যেন সে দেয় লোকটির হাতে, লোকটিও পালিয়ে যায় মুহূর্তের মধ্যে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সংসারে আবার অশান্তির আগুন জ্বলে ওঠে। উৎপলা পড়ে অসুখে। বিকারের ঘোরে সে কেবল বলে —'আমি অসতী নই, বিশ্বাস কর আমি অসতী নই।'

ঘটনাক্রমে বাগানের সেই লোকটি ধরা পড়ে। একাধারে সে অবাকজলপানওয়ালা, মাতাল, কাবুলীর দেনাদার, সমাজসেবী ও পরোপকারী যুবক। উৎপলার ছেওয়া গলার হার নিয়ে পালাবার সময় সে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। তার কাছ থেকেই জানা যায় উৎপলার মানসিক বিকারের কারণ ও সন্তান রহস্য।

রাজীবকে সে বলে যে, উৎপলা যখন দিল্লীতে তার দাদার বাড়িতে ছিল, তখন সে-ও তার বৌকে নিয়ে তাদেরই বাড়ির পাশে থাকতো। তার একটি ছেলে হয়। ছেলের জন্ম দিয়েই প্রসূতি মারা যায়। তখন উৎপলার দাদার পরামর্শে সে তার ছেলেকে তুলে দেয় উৎপলার হাতে। মাঝে মাঝে টাকা-পয়সার জন্যে সে আসতো উৎপলার কাছে এবং উৎপলাও তাকে সাহায্য করতো ছেলের বিনিময়ে।

সমস্ত কাহিনী শুনে রাজীবের চোখ জলে ভ'রে ওঠে। শাশুড়ি-ননদ সকলেই তাকিয়ে থাকে রোগশয্যায় শায়িতা বধূর দিকে। কিন্তু ক্রমাগত মনের সঙ্গে যুদ্ধ করে উৎপলার দেহযন্ত্র তখন বিকল হয়ে এসেছে। স্বামীকে তার সন্তানের ভবিষ্যৎ দায়িত্ব অর্পণ ক'রে, সে চিরতরে বিদায় নেয় সংসার থেকে।

কাহিনী নিতান্তই মামুলি, চিত্রনাট্য রচনার মধ্যে দর্শকচিত্ত আকৃষ্ট করে রাখবার যে চেষ্টা আছে, তা একেবারে ব্যর্থ হয়নি। এই অসাফল্যের প্রধান কারণ—কলাকুশলী অভিনেতা ও অভিনেত্রীর অভাব, দুর্বল আলোকচিত্রণ ও যান্ত্রিক ত্রুটিবিচ্যুতি।

পরিচালনার দিক থেকে নবেন্দুবাবুর যে বৈশিষ্ট্যটি আমাদের চোখে ধরা পড়েছে—তা হলো ছবির বাস্তব পরিবেশ রচনা। বাড়িঘরের স্বাভাবিক আবহাওয়া; শাশুড়ি-ননদ, ভাই-বোন, দেওয়ান-মনিব, শ্রমিক সাধারণ সকলের কথোপকথনের বাস্তবতায় আমরা খুশি হয়েছি। কিন্তু সেই সঙ্গে আবার ক্ষুণ্ণ হয়েছি নিম্নলিখিত কয়েকটি কারণে—

(১) 'এই করেছ ভালো নিঠুর' গানটি আরম্ভ হওয়ার আগে রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতিকে close-up করিয়ে দেখানোর কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই।

(২) রাজীবের ছদ্মবেশে শ্রমিক সাধারণের কল্যাণ-

সাধনের কৌশলটি দর্শকসাধারণের উপভোগ্য হলেও—অবাস্তব।

(৩) গুপের চরিত্রটি-কেও বড় বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। মূল কাহিনীর সঙ্গে তার অবাক-জলপানের ছড়া, জঙ্গল পরিষ্কারের গান, দুর্বৃত্তদের হাত থেকে একটি মেয়েকে উদ্ধার করারও বড় বেশি যোগ নেই। যে ভাবে গুপে দুর্বৃত্তদের হাত থেকে মেয়েটিকে উদ্ধার করলো—এ যে-ভাবে তাকে বিয়ে করলো তা অত্যন্ত melo-dramatic। গুপের ছেলে-কে নিয়ে উৎপলার শেষ জীবনের পটভূমিকা রচিত হয়েছে সত্য, কিন্তু তার জন্যে এত কাণ্ড করে গুপের বিয়ে দেওয়ানোর প্রয়োজন ছিল না। অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই গুপের ছেলে-র অস্তিত্ব বোঝানো যেত। অর্থাৎ, গুপে ও গুপের স্ত্রী এই দুই চরিত্রই তার জন্যে যথেষ্ট ছিল। সম্ভবতঃ পরিচালক গুপে চরিত্রের মহত্ব বোঝাবার জন্যেই ঐ দুর্বৃত্ত কবলিত মেয়েটির উদ্ধার সাধন ও শেষকালে সমাজ পরিত্যক্তা সেই মেয়েটিকেই জীবন-সঙ্গিনীরূপে গ্রহণ করার অংশ যোগ করেছেন। কিন্তু মূল কাহিনীর গতি এতে ব্যাহত হয়েছে।

(৪) উৎপলার ননদ রেবার ঠাকুরঝি ইলার প্রসঙ্গটি কাহিনীর পক্ষে অপরিহার্য সন্দেহ নেই। কিন্তু কোনো মেয়ের পক্ষেই বোধহয় প্রাক্-বিবাহকালে অতটা বাড়াবাড়ি (বিশেষ করে যে-দৃশ্যটি চোখে পড়ায় উৎপলা স্বামীর ঘর ছেড়ে দিল্লী রওনা হলো) সম্ভব নয়। তার ওপরে, তার মনের পরিবর্তন ঘটিয়ে যে-ভাবে রাজীবের সঙ্গে 'মামা' সম্বোধনে আলাপের সুযোগ দেওয়া হয়েছে—তা অত্যন্ত শ্রুতিকটু। পরিচালক ঐ অংশটুকু সংশোধন করতে পারতেন অনায়াসেই।

কয়েকটি দৃশ্য রচনার জন্যে আমরা পরিচালকের দৃষ্টি-ভঙ্গীর প্রশংসা করি। যেমন—(১) দেওয়ানজী যেখানে উৎপলার (পালিত) পুত্রকে আদর করছেন; (২) উৎপলা যেখানে পুতুল কোলে নিয়ে গান করছে—সেখানে পাশের বাড়ির দৃশ্য; (৩) কথক ঠাকুরের কথকতার দৃশ্য; (৪) উৎপলা চলে যাওয়ার পর যেখানে রাজীব ও তার ছোটবোন রেখা কথাবার্তা বলছে, (৫) শ্রমিকরা যেখানে সভা করে মালিককে অভিনন্দিত করছে, সেখানে তাদের বক্তৃতা প্রভৃতি।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, রেখা যে-দৃশ্যে রাজীবের ছদ্মবেশ পরে 'নকল সাধু নইতো আমি গোপন ছদ্মবেশে' গানটি গেয়েছে—সে দৃশ্যটি উপভোগ্য হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু দৃশ্যটি অবাস্তব। এবং, উৎপলা ছেলেকে নিয়ে ফেরবার পর যেখানে রেখা গান গেয়ে তার মনের আনন্দ প্রকাশ করেছে—সে দৃশ্যের উপযুক্ততা অস্বীকার করবার উপায় নেই।

ছবি রায়ের অভিনয়ে স্বাভাবিকতা আছে, কিন্তু মাতৃ-হৃদয়ের ছাপ নেই। রাজীবের ভূমিকাভিনেতা অচল। গুপের ভূমিকায় জহর গাঙ্গুলীর অভিনয় উপভোগ্য। সব চেয়ে ভালো লেগেছে রেখার ভূমিকায় যমুনা সিংহের ও রমার ভূমিকায় উমা গোয়েঙ্কার অভিনয়। স্বর্গত অমর চৌধুরীর দেওয়ান, ও শ্রমিকরূপী তুলসী চক্রবর্তীর অভিনয়ও স্বাভাবিক হয়েছে।

চিত্র-শিল্পের কাজ মোটেই প্রশংসার যোগ্য নয়। রেকর্ডিং ভালো। সুচিত্রা মিত্রের কণ্ঠে রবীন্দ্র সঙ্গীত খুবই পরম উপভোগ্য। কবি সুনির্মল বসু রচিত ছড়া-টি জহর গাঙ্গুলীর কণ্ঠে খুব ভালো শুনিয়েছে। সুরসৃষ্টির ক্ষেত্রে দ্বিজেন চৌধুরী নব্যাগত হ'লেও আন্তরিকতার পরিচয় দিয়েছেন।

বাণী বসু

চিত্রবাণী

বন্ধুর পথ

নিতাই ভট্টাচার্য রচিত এই কাহিনীটি নিতান্তই মামুলি এবং অনেকদিনের লেখা। পরিচালক চিত্ত বসুর ও অপরিণত হাতের পরিচয় দেয় এই ছবিটি। কাহিনীর মধ্যে যেটুকুও উপভোগ্য ছিল তা ব্যর্থ হয়েছে দুর্বল পরিচালনা ও নৈরাশ্যজনক চিত্র এবং শব্দগ্রহণের জন্য। সাঁওতাল পরগনার কয়েকটি দৃশ্য ছাড়া আর কোনো দৃশ্যই পরিষ্কার বোঝা যায় না। শব্দগ্রহণের কথা মোটেই না তোলা ভালো।

হাইকোর্টের নামজাদা ব্যারিষ্টার চারুকিশোর ঘোষ সুখের সংসারে শান্তিতেই ছিলেন। কিন্তু আকস্মিক বিপর্যয়ে তিনি বিভ্রান্ত হ'য়ে পড়লেন। বড়জামাই বিলেত-ফেরৎ, তারই দুর্নীতি ও অপকীর্ত্তির কাহিনী জানালো তাঁকে বড় মেয়ে চোখের জলে। ছোট মেয়ে এ্যামেলিয়া সম্বন্ধে তিনি মনে মনে শঙ্কিত হ'য়ে উঠলেন। লরেটোয়-পড়া মেয়ে সে—রীতিমত মেমসাহেব। বর্দ্ধমানের জমিদার মলয় সেনের সঙ্গে তার অবাধ মেলামেশা তিনি এরপর ঠিক সুনজরে দেখতে পারেন না। তবু একদিন সেই মলয় সেনের ফৌজদারী মকদ্দমা উপলক্ষ্যে তাঁকে ছুটতে হল বর্দ্ধমানে। কোর্টে প্রতিপক্ষ উকীল রবীন ঘোষের বাগ্মিতা আর তর্ককৌশল দেখে তিনি মুগ্ধ হ'য়ে গেলেন। পরিচয় নিয়ে জানলেন সে তাঁরই পুরাতন বন্ধুর ছেলে। তিরিশ বছর আগের ছিন্নসূত্র কুড়িয়ে পেয়ে তিনি উৎফুল্ল হলেন। মনে মনে রবীনকে আপন ক'রে নেবার যে বাসনাটুকু দেখা দিল, হয়ত সেটা গোপনই থাকত, যদি না কলকাতায় ফিরে মলয় সেনের প্রকৃত স্বরূপ তাঁর চোখে ধরা পড়ত। মলয় সেন একটি শয়তান—নারীত্বের কোনো মর্য্যাদা নেই তার কাছে। মেয়েদের সে ভোগের ইন্ধনরূপেই ভাবতে অভ্যস্ত।

এই ব্যাপার জানার পর ব্যারিষ্টার সাহেব বন্ধুপত্নীর কাছে রবীনের সঙ্গে এ্যামেলিয়ার বিয়ের প্রস্তাব ক'রে চিঠি লিখলেন। কিন্তু এ্যামেলিয়া এ বিয়ের কথা ভাবতেই পারে না। বর্দ্ধমানের এক গেঁয়ো উকিল, তারওপর দাদা বৌদি, দিদিদের নির্ম্মম পরিহাসে সে ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠলো। সে প্রতিবাদ জানালো মায়ের কাছে। কিন্তু তিনি অক্ষম। গেল বাবার কাছে। চারুকিশোরও অনমনীয়। কোনো উপায় না দেখে এ্যামেলিয়া শরণ নিলো মলয় সেনের। মলয় সেন এ্যামেলিয়াকে নিয়ে গোপনে রওনা হোলো তুমকার পথে-মামামার কাছে। মলয় সেন এই জাল বিস্তার ক'রে এ্যামেলিয়াকে গ্রাস করতে চেয়েছিল। কিন্তু তার হাত থেকে পালিয়ে পরিত্রাণ পেলো এ্যামেলিয়া দৈবযোগে রবীনেরই সাহায্যে। শেষ পর্য্যন্ত এ্যামেলিয়ার ভুল ভাঙলো. মলয় সেনের ও মনোভাব এবং নিষ্ঠুরতার পরিবর্ত্তন হোলো বাঁধাধরা ভাবে আর অতি অভিপ্রেত নায়কনায়িকার মিলনের মধ্যেই ছবির কাহিনীর পরিসমাপ্তি।

কাহিনীর মধ্যে অবাস্তব বিষয়ের অভাব নেই। অর্থাৎ [illegible] বর্তমানে ছবির আর্থিক সাফল্যের জন্য প্রয়োজন সবই আছে। গানগুলি সুরচিত তবে সুরযোজনা হতাশ করেছে।

অভিনয়ের মধ্যে ভালো লেগেছে রেণুকা, ধীরাজ ও অহীনবাবুর অভিনয়। আর সবাই ভাড় বাড়িয়েছেন। রসিকতার দৃশ্যগুলি অত্যন্ত স্থূল। শ্যাম লাহার 'খোকা'পনা উপভোগ্য স্বীকার করতেই হয়। মিহির ভট্টাচার্য্য চোখা চোখা সংলাপ পেয়েও সদ্ব্যবহার করতে পারেননি।

—স্ফুর্ত্তি

প্রযোজনা	ঃ	**অরোরা ফিল্মস্**
কাহিনী	ঃ	**নিতাই ভট্টাচার্য্য**
চিত্রনাট্য ও পরিচালনা	ঃ	**চিত্ত বসু**
চিত্রগ্রহণ	ঃ	**বঙ্কু রায়**
শব্দগ্রহণ	ঃ	**সত্যেন দাসগুপ্ত**
সুরশিল্পী	ঃ	**পরিতোষ শীল**
ভূমিকায়	ঃ	**অহীন, ধীরাজ, মিহির, জীবেন, পূর্ণিমা রেণুকা, রাজলক্ষ্মী, বন্দনা ও আরো অনেকে**
দেখানো হচ্ছে	ঃ	**শ্রী, শ্যামাশ্রী, মায়াপুরী, উদয়ন ও রূপালীতে**
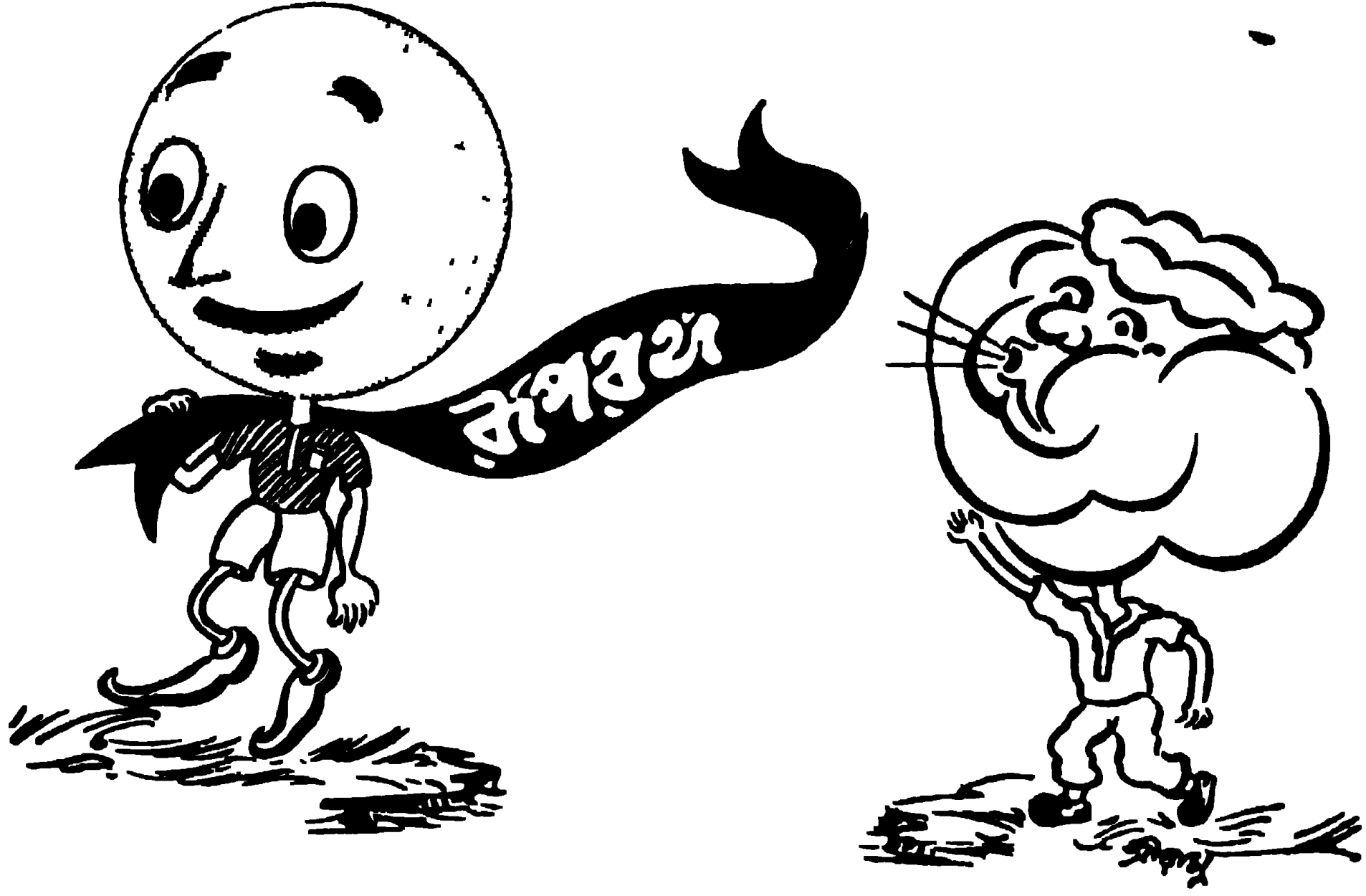
জরুরী অধিবেশন

ষ্টাফ রিপোর্টার প্রদত্ত

বলতে লজ্জা নেই, ইদানীং বক্তৃতা শোনা রোগে পেয়ে বসেছে আমাকে। যতই শুনি ততই ভাল লাগে, বিষয় যাই হোক না। কাজেই বক্তৃতা শোনার প্রোগ্রামে আমার ছেদ পড়েনা বড় একটা। পাবলিক মিটিং আর প্রাইভেট মিটিং দুই-এতেই আমাকে আপনারা দেখতে পাবেন। ভাবছেন, প্রাইভেট মিটিং এ হাজির হই কি ভাবে? এই সহজ কথাটা বুঝতে পারলেন না? বক্তৃতা শোনায় এমন পটু লোককে বাদ দিয়ে সভা কি জমে?

সেদিন বিশেষ এক জরুরী মিটিং-এ ছুটলাম। পড়ি কি মরি করে গিয়েও দেখি সভা আরম্ভ হয়ে গেছে। মিটিংটা হলো অল বেঙ্গল ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট প্রোডিউসারস্ সোসাইটীর জরুরী অধিবেশন। সময় রাত্রি দশ ঘটিকা। সভাপতিত্ব করলেন যুধিষ্ঠির ঝুনঝুনওয়ালা। চিনতে পারলেন না তাঁকে? সারা যুদ্ধের বাজারটা যে তাঁর কয়লার দোকানের সামনে লাইন দিলেন, এর মধ্যে ভুলে গেলে চলবে কেন? গত তিন বছর তিনি তিনখানা ছবিতে নাক গলিয়েছিলেন, অবশ্য সে সব ছবি আপনারা এখনও পর্দায় দেখেন নি। বদ-লোকে বলে, এসব ছবির মালিকানা নিয়ে অনেক গণ্ডগোল আছে। এ জরুরী সভা আহ্বান করা হয়েছে চলচ্চিত্র শিল্পের ভয়ানক পরিস্থিতি, বিশেষ করে কয়েকজন স্বাধীন (ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কথাটির অন্য প্রতিশব্দ জানা নেই) প্রযোজকের আর্থিক যোগাযোগ সম্বন্ধে আলোচনার জন্যে। সমিতির সম্পাদক প্রহ্লাদ খাস্তগীর কয়েকটি জনপ্রিয় চিত্র পরিচালনার গৌরব অর্জ্জন করেছেন। এই ছবিগুলি দেখে দর্শককুল এত উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিলেন যে চিত্রগৃহের মালিক ছবিগুলি পর্দ্দাচ্যুত করার জন্যে শশব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। খাস্তগীর মশাই গত অধিবেশনের বিবরণী পাঠ করে সভাপতি মশায়কে বক্তৃতায় আহ্বান করলেন, এমনি সময় আমার প্রবেশ।

যুধিষ্ঠিরবাবু উঠে দাঁড়িয়ে ভুঁড়ির ওপর প্যাণ্টটাকে টেনেটুনে নিয়ে বজ্রকণ্ঠে হাঁক দিলেন: সমবেত ভদ্রমহোদয় ও মহিলাবৃন্দ, (অস্ফুটকণ্ঠে শোনা গেল, মহিলা আবার

চিত্রবাণী

কোত্থেকে এলো) ঝুনঝুনওয়ালা মশায় সেদিকে কর্ণপাত করলেন না। আবার সুরু করেন, আজ আমরা এখানে সমবেত হয়েছি একটা নৈরাশ্যের পটভূমিকায়, এই নৈরাশ্যের ঘনায়মান অন্ধকার আজ আচ্ছন্ন করতে চলেছে আমাদের পরম প্রিয় এই শিল্পটিকে (হিয়ার হিয়ার)। ছবি প্রযোজনায় যাঁরা আত্মনিয়োগ করেছেন তাঁদের সামনে আজ আসন্ন দুর্দ্দিনের ঘনঘটা। একথা আজ আমি জোর দিয়েই বলতে পারি আমাদের এই জাতীয় শিল্পের ইতিহাসে এ রকম দুর্দ্দিন আর অনিশ্চিত অবস্থার উদ্ভব এর আগে আর কখনও হয়নি (ঘন ঘন হাততালি)! আমি সেই দুরবস্থার ছবি আঁকতে আসিনি এখানে, কিন্তু এই সূত্রে কতকগুলি সমস্যার কথা উল্লেখ না করে আমি সুস্থির হতে পাচ্ছিনা (চাপা ফিস্‌ফিসানি শোনা গেল—'আরও কত অস্থির হবেন ?'), এই সমস্যাগুলির সমাধান অবিলম্বেই আমাদের করতে হবে।

"আজ চারপাশে আমরা কি দেখছি (অস্ফুট কণ্ঠ: লোকজন চেয়ার টেবিল), আমরা দেখছি আমাদের মধ্যে অনেকেই আর্থিক দুর্গতিতে দিশেহারা, অন্নসংস্থানের পথ আজ আমাদের নিকট বন্ধ হতে চলেছে (পিছন থেকে শোনা গেল, আপনার বপুর বহর দেখে তা মনে হয় না)। ছবির পর ছবি পড়ে আছে ষ্টুডিওয় বাক্সবন্দী হয়ে, তাদের কোনটার কাজ অর্দ্ধেক শেষ হয়েছে, কোনটার কাজ বিস্তর বাকি, অথচ এই সব ছবি দেশের অমূল্য সম্পদ (লম্বা ছিপছিপে এক ভদ্রলোক উস্‌খুস্‌ করে উঠলেন, তাতে পাব্‌লিকের কি রয়ে গেল !)"

কথাটা বোধ হয় ঝুন্‌ঝুন্‌ওয়ালার ঝুনো বুদ্ধিতে আঘাত দিলো, তাই তিনি গলার স্বর চড়িয়ে কোমর বেঁধে লাগলেন, আজ আমাদের এই শিল্পটিতে এই নিশ্চল অবস্থার কারণ কি ? আমাদের শত্রুপক্ষ আমাদের দুর্ণাম রটিয়ে থাকেন তা আমরা জানি। আমরা জানি তাঁরা বলে বেড়ান, ছবি তৈরীর চেয়ে নিছক স্ফূর্ত্তির পেছনে আমাদের টাকা বেরিয়ে যায় (আমার পাশের ভদ্রলোক মুচকি হেসে আমার গায়ে ঠেলা দিলেন)। এতবড় মিথ্যে আর কি হতে পারে ? আমাদের শত্রুরা, ঐ সব পুঁচকে কাগজ-চালানো ছোকরার দল আমাদের সম্বন্ধে এই সব ভ্রান্ত ঈর্ষ্যান্ধ উক্তি করে, আর কেন করে জানেন ? কারণ আমরা তাদের প্রচুর বিজ্ঞাপন দিয়ে খুসি করতে পারিনা বলে (আমার পাশের ভদ্রলোকটি এবার মরিয়া, বেফাঁস বলে ফেল্লেন তিনি, বলি বিজ্ঞাপন দিলেও কি পাওনা টাকাটা দেওয়ার কথাটা মনে থাকে ?) এবারে শ্রীযুক্ত
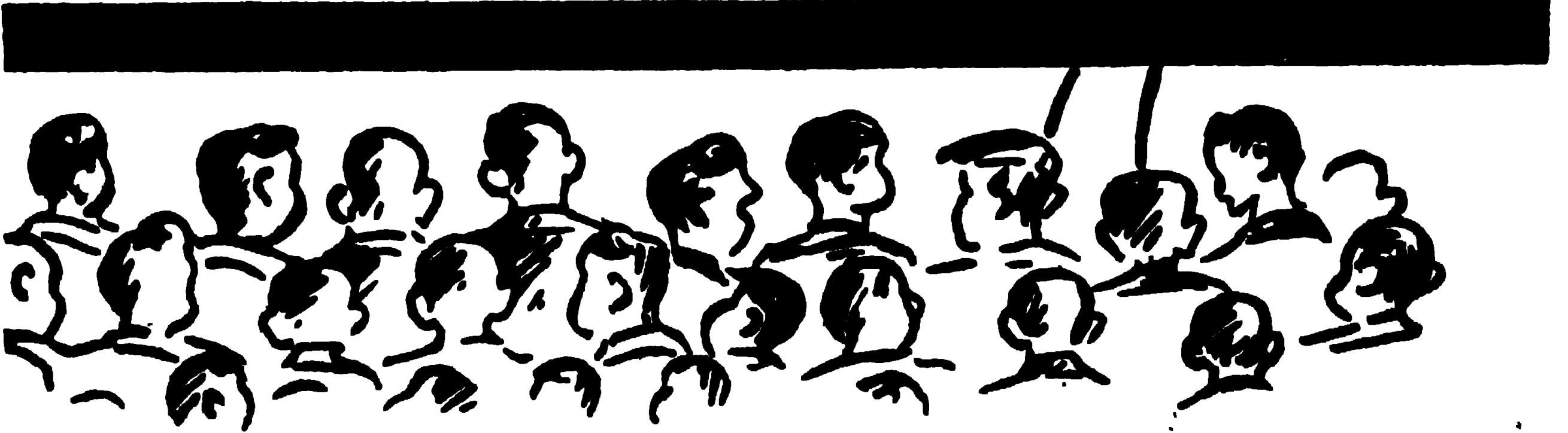
ঝুনঝুনওয়ালা মুখ তুলে চোখ পাকিয়ে তাকালেন শ্রোতাদের দিকে। ভাবাবেগে তিনি যেন সংযম হারিয়ে ফেলবেন। (জনৈক নীরব শ্রোতা এবারে দাঁড়িয়ে উঠে বল্লেন, ছবি তৈরীর ঝামেলা ছেড়ে দিয়ে অভিনয় করলেই ত পারেন!)

এবারে হাসি চেপে রাখা অনেকের পক্ষেই মুশকিল হ'য়ে উঠলো। তাতে সভাপতির মেজাজ খুশি হলোনা নিশ্চয়ই। হৈ হৈ করে শ্রোতাদের হাসি থামাতে গিয়ে

শ্রোতাদের হাসি থামাতে গিয়ে

তিনি এক কাণ্ড করে বসলেন। তাঁর হাত লেগে ফুলদানিটা টেবিল থেকে পড়ে ধরাশায়ী হলো। পতনোন্মুখ ফুলদানিটিকে ধরবার চেষ্টা করতে যাওয়াতে কালির দোয়াতটি গেল উল্টে, কালো কোটের আস্তিনে লাগলো কালি। মিনিট কয়েক তাঁর বাক্যস্ফর্ত্তি হলো না। একটু সামলে নিয়ে আবার বলতে লাগলেন, হ্যাঁ, আমাদের অবস্থা বর্ণনার অতীত। একদিকে এই আর্থিক অনটন, অন্যদিকে এত ভাল ছবি তৈরী করেও আমরা মার খাচ্ছি। নিরক্ষর অশিক্ষিত জনসাধারণ এই সব ছবি বুঝতেই পারেনা। আমাদের নতুন নতুন ফিল্ম টেক্‌নিক সবই বিফলে গেল। শিল্পী ও কর্ম্মীদের নিয়ে আমাদের ঝঞ্ঝাটের অন্ত নেই, তার ওপর কাঁচা ফিল্ম যোগাড় করতে যে কি হয়রানি তা তো আপনারা সকলেই হাড়ে হাড়েই বোঝেন। বন্ধুগণ, যতদিন আমরা এই বিদেশী শাসনের নাগপাশে আবদ্ধ আছি (নীরব শ্রোতারা এবারে চঞ্চল হয়ে উঠলেন) ততদিন এই শিল্পের উন্নতি বিধানের কল্পনাই করতে পারিনা। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এবং আমি জানি আমার সঙ্গে আপনারা একমত হবেন যে দেশ যখন স্বাধীন হবে (শ্রোতাদের চঞ্চলতা এবার মুখরতায় রূপান্তরিত হলো, ইনি কোন রাজ্য থেকে এলেন? দেশ যে স্বাধীন হয়েছে নেশার ঝোঁকে সে কথাটাও ভুলে গেলেন?)। কথাটি তিনি শেষ করতে পারলেন না। সভাস্থ সকলের গুঞ্জন ধ্বনিতে কিঞ্চিৎ বিব্রত বোধ করলেও, কারণটা ঠিক বুঝতে না পেরে বেশ জোরে বল্লেন: আমি আবার বলছি, দেশ স্বাধীন না হলে এ সবের প্রতিকার নেই। বন্ধুগণ, সেই দিনটিই কেবল আমাদের এই শিল্পটির ইতিহাসে মহত্তর অধ্যায়ের সূচনা করতে পারবে .....

গুঞ্জনধ্বনি এবার কলধ্বনিতে পরিণত হয়েছে। পিছন থেকে কয়েকজন উঠে চলে গেলেন দেখলাম। ব্যাপার বেগতিক দেখে খাস্তগীর মশায় ঝুনঝুনওয়ালাজীর কানে কি দু'একটা মন্ত্র দিয়ে ভেতরে নিয়ে গেলেন।

কানে মন্ত্র দিয়ে

সভা খানিকক্ষণ নিস্তব্ধ। কিছুক্ষণ পরে প্রহ্লাদবাবু এসে দাঁড়িয়ে সভাপতির আকস্মিক অসুস্থতার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। সভার সমর্থনের জন্য তিনি এই প্রস্তাবগুলি পড়ে শোনালেন:—

অল্ বেঙ্গল ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট প্রোডিউসারস্ সোসাইটির এই অধিবেশন বিশেষ উদ্বেগের সহিত দেশীয় চলচ্চিত্র শিল্পের ক্রমাবনতি এবং নানা প্রতিকূল অবস্থা লক্ষ্য করিয়া ইহার প্রতিকারকল্পে এই প্রস্তাব গ্রহণ করিতেছে—

(১) সামাজিক চিত্র প্রস্তুতের ব্যয়বাহুল্যের কথা চিন্তা করিয়া যতদিন না আমাদিগের আর্থিক দুর্য্যোগ অপসারিত হয় এবং জনসাধারণের মধ্যে উচ্চাঙ্গের চিত্র সম্বন্ধে পূর্ণ চেতনা জাগ্রত হয়, ততদিন সামাজিক কাহিনী নির্ব্বাচন, পরিচালনা ইত্যাদি ব্যবস্থাজনিত ব্যয়ের পথ হইতে দূরে থাকিতে হইবে, ততদিন নূতন করিয়া কাহিনী লিখাইয়া ছবি তুলিবার প্রয়োজন নাই।

(২) নানাপ্রকার সুবিধা এবং [illegible] কথা

চিত্রবানী

বিবেচনা করিয়া সম্পূর্ণ কাহিনী বা চিত্রনাট্য লইয়া কাজে নামিবার প্রয়োজন নাই। ইহাতে পরে প্রয়োজনমতো স্থানকালপাত্র অনুসারে এই কাহিনী চিত্রনাট্য ও সংলাপ পরিবর্ত্তনের বিশেষ সুবিধা হইবে। ইহাতে পরিচালক এবং শিল্পীরাও উপকৃত হইবেন ;

(৩) সম্ভব হইলে প্রযোজক নিজেই চিত্রের কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচনা ও পরিচালনার ভার গ্রহণ করিবেন। চেহারার দিক দিয়া নিতান্ত বেমানান না হইলে নায়কের ভূমিকা গ্রহণও তাঁহার পক্ষে বাঞ্ছনীয়। ইহাতে চিত্র গ্রহণের অকারণ ব্যয়সঙ্কোচ করিবার ব্যাপারে বিশেষ সুরাহা হইবে ,

(৪) প্রতিবার নূতন চিত্র নির্ম্মাণের সময় নূতন করিয়া গান রচনা করাইবার কোনই প্রয়োজন নাই। পুরাতন সঙ্গীতেই সামান্য পরিবর্তন করিয়া তাহাতে জনপ্রিয় হিন্দী গানের সুর সংযোজনা করিলে অনায়াসে এবং প্রায় বিনাব্যয়েই অভিপ্রেত ফল লাভ হইবে। সে ক্ষেত্রে গান রচয়িতা ও সঙ্গীত পরিচালকের সাহায্য গ্রহণের আবশ্যকতা নাই .

প্রস্তাবগুলি প'ড়ে শোনালেন

(৫) দর্শকবৃন্দের চাহিদার কথা স্মরণ রাখিয়া নায়িকা কিংবা অন্য প্রধান পার্শ্ব স্ত্রী ভূমিকা অভিনেত্রীকে যতদূর সম্ভব স্বল্পবসনা এবং বিচিত্রভূষণা করিয়া বহু আকাঙ্ক্ষিত গ্ল্যামারকে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। অবশ্য সেই সঙ্গে সেন্সারের পাহারার কথা ভুলিলে চলিবে না। এতদ্ব্যতীত কয়েক শত ফুট ফিল্ম পৃথক করিয়া পূর্ব্ব হইতেই রাখিয়া দিতে হইবে। এই ফিল্ম লাগিবে ছবির মধ্যে হাল্কা রস পরিবেশনের জন্য। মূল কাহিনীর সহিত ইহার যোগ না থাকিলেও চিন্তিত হইবার কারণ নাই ;

(৬) শিল্পীদের মধ্যে যাহারা নির্দ্দিষ্ট সময়ে সেটে উপস্থিত না হইয়া আমাদিগকে অনর্থক হয়রানির মধ্যে ফেলিবেন, প্রয়োজনবোধে তাঁহাদিগের উপর বলপ্রয়োগ করিতে কুণ্ঠিত হইলে চলিবে না ,

(৭) শিল্পী ও অন্যান্য কর্ম্মীরা শারীরিক অসুস্থতার অজুহাত দেখাইলে তাহার সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্য এই সমিতি হইতে সাধারণভাবে একজন এমন চিকিৎসক নিযুক্ত করিতে হইবে যিনি এতৎসঙ্গে যে কোন ছবিতে অভিনয় করিতে বাধ্য থাকিবেন ,

(৮) ষ্টুডিও ভাড়া বাবদ ষ্টুডিও মালিক যে কালোটাকা দাবী করেন তাহার জন্য তাঁহাদিগকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইতে হইবে যে তাঁহারা যেন সেটে চা বিস্কুট ও পানীয়ের বিধিমত ব্যবস্থা করেন ,

(৯) প্রযোজকদিগকে সর্ব্বদা সচেতন থাকিতে হইবে তাঁহারা যেন শিল্পীদিগের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইবার সময় কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের উল্লেখ না করেন। চিত্রনির্ম্মাণ সমাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত শিল্পীদিগকে প্রস্তুত থাকিতে হইবে। ইহাই যেন তাঁহাদিগকে জানাইয়া দেওয়া হয় যে সময়ের কোন প্রশ্ন ইহার সহিত জড়িত থাকিবে না .

(১০) যতদূর সম্ভব অল্পসংখ্যক 'সেট' রচনা করিয়া কাজ চালাইতে হইবে। একাধিক ছবির অংশ বিশেষের চিত্র গ্রহণ একই 'সেটে' সারিয়া লওয়া সকল দিক দিয়া সুবিধাজনক। প্রয়োজন হইলে ইহার জন্য চিত্রের কাহিনী ও ঘটনা সন্নিবেশ চিত্রগ্রহণের প্রাক্কালে পরিবর্ত্তন করিতে হইবে ;

(১১) ডিষ্ট্রিবিউটরদিগকে ইহা স্পষ্টই জানাইয়া দিতে হইবে যে কোনো চিত্রের পরিবেশন সংক্রান্ত বিষয়ে চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করিবার পূর্ব্বে সেই চিত্রটি দেখিবার জন্য অনাবশ্যক পীড়াপীড়ি করিলে তাহা চুক্তিভঙ্গেরই নামান্তর বলিয়া গণ্য হইবে ;

(১২) বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত ব্যাপারে কাগজওয়ালাদের সহিত একটি সুবন্দোবস্ত করা যাইতে পারে। এই

বন্দোবস্ত অনুসারে চিত্রের যাবতীয় বিজ্ঞপ্তি ও বিজ্ঞাপন তাঁহারা প্রকাশ করিয়া যাইবেন, ইহার বিনিময়ে সেই কাগজের জনপ্রিয়তা ও বিক্রয়সংখ্যা অনুপাতে বিজ্ঞাপন হারের অনুরূপ নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক শেয়ার সমমূল্যে প্রদত্ত হইবে। ইহাতে চিত্রটির আর্থিক সাফল্যের সহিত ও কাগজপরিচালকবৃন্দের যোগাযোগ বিশেষ ঘনিষ্ঠ হইবে এবং শেয়ার অনুপাতে লভ্যাংশও তাঁহারা এই আর্থিক সাফল্যের হিসাবনিকাশের অব্যবহিত পরেই কালক্রমে প্রাপ্ত হইবেন। এই বন্দোবস্তের প্রত্যক্ষ ফল হইবে এই যে প্রচার-সচিব নিয়োগ করিয়া অকারণ ব্যয়বাহুল্যের প্রচলিত প্রথার আর প্রয়োজন হইবে না। অপরদিকে চিত্রসমালোচনার ব্যাপারে কাগজওয়ালাদিগের নিকট হইতে বাধ্যতামূলকভাবে অনুকূল মতামত পাওয়া যাইবে।

তারপর শ্রীযুক্ত খাস্তগীর বাকী প্রস্তাবগুলি মুলতবী রাখলেন। পরের দিন ঐ সময় পর্য্যন্ত সভার অধিবেশন স্থগিত রইলো এবং তখন ঐ বাকী প্রস্তাবগুলি নিয়ে আলোচনা চলবে জানিয়ে তিনি অন্তর্ধান হলেন।

প্রেস প্রতিনিধিবৃন্দ বিনা মন্তব্যেই গাত্রোত্থান করলেন।

ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিয়োতে বোসার্ট প্রোডাকসন্সের দ্বিতীয় চিত্র 'রাধারাণীর' মহরৎ উৎসবে সমাগত সুধীবৃন্দের একাংশ। সজনী দাস, দেবকী বসু ও অন্যান্য পরিচালক এবং চিত্রজগতের সঙ্গে জড়িত কর্মীদের দেখা যাচ্ছে

আপনাদের চিঠি

INDIA POSTAGE

হরিসাধন ঘোষ, জামালপুর, মুঙ্গের

'চিত্রবাণী' আপনাব ভালো লাগছে এবং আপনি প্রতি মা'সের 'চিত্রবাণী' পড়ার জন্যে উদ্‌গ্রীব হ'য়ে থাকেন জেনে উৎসাহ পেলাম। আপনি প্রশ্ন কবেছেন, 'আপনাদের মতে বাংলার বর্ত্তমান শ্রেষ্ঠ শিল্পী কে? প্রেমেনবাবুর 'কালোছায়া' নিয়ে কয়েকদিন আগে বুদ্ধদেববাবু 'যুগান্তরে' যে চিঠিটা লিখেছেন আপনারা তা' দেখেছেন নিশ্চয়ই—সে সম্বন্ধে আপনারা কি বলেন?'

শ্রেষ্ঠ শিল্পী বলতে আপনি চিত্র বা মঞ্চ কোনটিব শিল্পী বোঝাতে চেয়েছেন জানি না। তবে চিত্রজগতের শ্রেষ্ঠ শিল্পী বলতে ছবি বিশ্বাসকে বুঝি আমি।

'কালোছায়া'র মৌলিকত্ব নিয়ে প্রেমেন-বুদ্ধ যে কালোয়াতি সুরু হয়েছে তাকে বিশেষ গুরুত্ব না দেওয়াই সমীচীন—ওটাকে হাল ফ্যাশানের শহুরে মার্কা কবির লড়াই ব'লেই মনে করবেন। তবে নিতান্ত এ বিষয়ে যদি আমাদেব মতামত জানতে চানই তবে বলতে হয় প্রেমেনবাবু যে বিবৃতি দিয়েছেন তাব মধ্যে যুক্তি আছে। বুদ্ধদেববাবু বেশ কিছু কালই দুরারোগ্য মানসিক বিকারে কষ্ট পাচ্ছেন, ঐ চিঠিটা এই বিকৃতিজনিত ক্ষিপ্রতারই নামান্তর। প্রেমেনবাবু একটা সৎসাহস দেখিয়েছেন, এই রহস্য রোমাঞ্চ সিরিজেব ছবির কাহিনী ও চরিত্রের জন্য সমগ্রভাবে মৌলিকতা দাবীর আব্দার করেন নি। এদেশে ডিটেকটিভ নাম দিয়ে যে ভেজাল চলে তা' সাগরপারের পাউণ্ড-শিলিং কিংবা পেনি সিরিজের প্রত্যক্ষ অনুপ্রেরণার ফল এটা কারই বা অজানা আছে?

অশোককুমার দত্ত, আগরতলা, ত্রিপুরা রাজ্য

আপনি জানতে চেয়েছেন, আমাদের দেশে কিশোরদের দেখবার উপযোগী ছবি তোলা হয়না কেন? কারণ এদেশের প্রত্যেকটি ছবিই কিশোরদের উপযোগী ব'লে বিবেচিত হয় আর সম্প্রতি এই জাতীয় ছবি তৈরীর চেষ্টা চলছে বড়দেব ছবিতে অধিক সংখ্যায় শিশু ও কিশোর শিল্পীকে নামিয়ে। এরপরও আর কিশোর-উপযোগী ছবি তৈরীর দরকার আছে ব'লে মনে করেন?

'চিত্রবাণী'তে খেলাধূলা, বেতারবার্ত্তা, প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করলে কিরকম হয় জানতে চান। বেতার আলোচনার ব্যবস্থা ত 'চিত্রবাণী'তে রয়েছেই, এই সংখ্যাতেও সে আলাচনা দেখতে পাবেন। 'চিত্রবাণী'কে আমরা চিত্র মঞ্চ ও শিল্পবিষয়ক আদর্শ পত্রিকারূপেই আপনাদের সামনে রাখতে চাই, আপনার কথামত তার মধ্যে যদি 'খেলাধূলা' বিভাগ যোগ করি তবে সেই সঙ্গেই অনুরোধ আসবে, 'রান্নাঘর' খুলুন, 'ছোটদের পাতা' সুরু করুন, ইত্যাদি। তখন তথই পাওয়াই মুস্কিল হবে। এরকম সাড়ে বত্রিশ ভাজা পরিবেশনের দক্ষতা আমাদের নেই তা' অকপটেই স্বীকার ক'রে রাখছি। আর প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা বলে আপনি কি বোঝাতে চেয়েছেন তা পরিষ্কার

ক'রে জানাবেন। আপনি পরবর্তী চিঠিতে সিনেমা বিষয়ক যে পত্রিকাটির ধাপ্পাবাজীর কথা বলেছেন সে সম্বন্ধে আমরা আরো কয়েকখানি চিঠি পেয়েছি, তবে এবিষয়ে আমাদের পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয়।

জয়ন্ত কুমার হালদার, মেডিকেল হোষ্টেল, কলকাতা

আপনি লিখছেন, 'মাঘ সংখ্যার 'চিত্রবাণী'র ৭২ পৃষ্ঠার নীচে যে ছবিটি 'চন্দ্রলেখা' চিত্র থেকে দেওয়া হয়েছে সেটা বোধ হয় শ্রীমতী যশোধরা কাটজুর নয়, ওটা খুব সম্ভব সুন্দরী বাঈ-এর। এ বিষয়ে আমার সন্দেহ দূর করবেন বলে আশা করি। আর আমার আর একটা প্রশ্ন এই যে চন্দ্রলেখার ভূমিকায় রাজকুমারী কি নিজেই সার্কাস দেখিয়েছেন এবং নিজেই গান করেছেন ?'

আপনি ছবিটি সম্বন্ধে যে ভুলের উল্লেখ করেছেন, তার জন্যে আমরা আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। ওটা সুন্দরী বাঈএর ছবি। জেমিনীর প্রচার দপ্তর থেকে প্রেরিত ব্লকের সঙ্গে যে পরিচয়লিপি ছিল তাতে এই ভুলটি ছিল। রাজকুমারী সার্কাস নিজে দেখান নি, কিন্তু গান নিজেই গেয়েছেন।

অনিল কুমার দত্ত, সোদপুর, ২৪-পরগণা

আপনি অনুরোধ করেছেন 'চিত্রবাণী'তে গল্প ছাপার জন্য। গল্পের খোরাক কি আপনি 'চিত্রবাণী'তে মোটেই পাচ্ছেন না ? আপনার অনুরোধ আপাততঃ আমাদের বিবেচনাধীন রইল। আপনার দ্বিতীয় অনুরোধ মাঘ সংখ্যার মধ্যে 'চিত্রবাণী'র কোন কোন সংখ্যায় শিল্পীদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের বিবরণ ছাপবার। এ সম্বন্ধে আমরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করেছি। এরপর আপনার দুটি প্রশ্ন, দেবীকারাণী ও তাঁর রাশিয়ান স্বামী মিঃ রে একটি আর্ট এ্যাকাডেমি স্থাপন করবার পরিকল্পনা করেছিলেন সেটা কি কার্য্যে পরিণত করেছেন ? আর, কোন তারকা অভিনয়ে বসে বসে অন্যের কথা ভাবছেন, অমনি তার মূর্ত্তি কি করে চোখের সামনে ভেসে ওঠে ?' প্রস্তাবিত আর্ট এ্যাকাডেমি এখনও পরিকল্পনার গণ্ডী পেরোতে পারেনি। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে জানাচ্ছি ওটা ক্যামেরার বিশেষ কিছু কসরৎ নয়, ভেসে ওঠা মূর্ত্তিটির ছবি আগের ছবিটিতে সংযোজিত হয়। ক্যামেরা অবশ্য দুবার কাজ করে, দুটি ছবি পৃথকভাবে তোলে।

বৃন্দাবন চন্দ্র নন্দী, বৈদ্যবাটী

প্রমথেশ বড়ুয়া সম্বন্ধে আপনি যে প্রশ্নটি করেছিলেন তার উত্তর গত সংখ্যায় প্রকাশিত বড়ুয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ-কারের বিবরণীতে নিশ্চয় পেয়েছেন। তারপর আপনি জানতে চেয়েছেন খ্যাতনামা অভিনেত্রী শান্তা আপ্তে কি নাথুরাম গডসের ভাই নারায়ণ আপ্তের আত্মীয়া ? খোঁজ নিয়ে জানলাম এঁদের মধ্যে এ জাতীয় কোনো আত্মীয়তার বন্ধন নেই।

অনিলকুমার, ধুবড়ী, আসাম

'অশোককুমার ও লীলা চিটনিশ অভিনীত 'আজাদ' নামে যে ছবিখানি তোলা হয়েছিল তা' মুক্তি পাবার সঙ্গে সঙ্গেই বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট এর প্রদর্শন নিষিদ্ধ করে। বর্ত্তমানে ঐ ছবি দেখানো হবে কিনা ?'

'আজাদ' ছবিটির প্রদর্শন নিষিদ্ধ হয়েছিলো জানা যায় তবে এই ছবিটি আবার দেখানো হবে কিনা তা' আমরা কি ক'রে বলি বলুন ? বর্ত্তমানে নতুন ছবি মুক্তিতেই যে রকম বিলম্ব ঘটে তাতে আর পুরোণো ছবির পুনঃপ্রদর্শন আশা করা চলে না।

'ভারতের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর সিনেমা হল কোনটি এবং সেটা কোথায় ?'—আপনার এই প্রশ্নটির উত্তরে জানাচ্ছি যে স্বাস্থ্যসম্মত সর্ব্বাঙ্গীন বন্দোবস্ত ও সাজসরঞ্জামের সকল দিক বিচার করলে বোম্বাইয়ের Eros (ইরোজ) চিত্রগৃহটিকেই সবচেয়ে সুন্দর বলতে হয়। আংশিকভাবে সুবন্দোবস্তের জন্য এরপরে আসে বোম্বাইয়ের মেট্রো সিনেমা। কলকাতার মেট্রো সিনেমার দর্শকধারণের স্থান অবশ্য এই দুই চিত্রগৃহের চেয়ে বেশী।

আপনার তৃতীয় এবং শেষ প্রশ্ন—জয়শ্রী নামে যে অভিনেত্রী আছেন তিনি 'শকুন্তলা' ও 'ডাক্তার কোটনীশ'

ছাড়া আর কোন্ ছবিতে আছেন? জয়শ্রী এই চিত্রগুলিতে নামার আগে যুক্ত ছিলেন প্রভাত ষ্টুডিয়োর সঙ্গে, প্রভাতের ছবিতেই তাঁকে আমরা দেখেছি।

ত্রিপুরেশ্বর ভট্টাচার্য্য, আগরতলা, ত্রিপুরা রাজ্য

আপনি প্রশ্ন করেছেন (১) 'সহর থেকে দূরে' এবং 'সন্ধি'র হিন্দী সংস্করণই কি 'সহর সে দূর' এবং 'স্নেহ'? (২) 'নেতাজী সুভাষ' এবং 'সুভাষচন্দ্র' ছবি দুইটির দেখি আর কোনই পাত্তা পাই না? ঐ দুইটি ছবির কি হইল, বলিতে পারেন?' 'সহর থেকে দূরে' এবং 'সহর সে দূর' এর মধ্যে কোনোই সম্বন্ধ নেই। 'সন্ধি'র হিন্দীরূপই 'স্নেহ'। 'নেতাজী সুভাষ' ছবিটির কথাই জানি, সেটি মাঝে মাঝে দেখানো হয় অন্ততঃ এবারে নেতাজীর জন্মদিনে দেখানো হয়েছিলো সংবাদের প্রদর্শনীতে। 'সুভাষচন্দ্র' ব'লে কোনো ছবির খবর ত জানি না। তবে 'সিপাহী-কা-স্বপ্ন' ব'লে একখানি ছবি তৈরী হয়েছিলো।

'চিত্রা' এবং 'রূপবাণী' নামে চিত্রবিষয়ক পত্রিকা এখনও বেরোয় কিনা জানতে চেয়েছেন। পত্রিকা দুটির প্রকাশ বহুদিন বন্ধ হয়ে গেছে।

অলোক কুমার দাশ, লেনাস্ রোড, দাশনগর

আপনি লিখছেন, 'আমার দু'একজন পরিচিত ভদ্রলোক চিত্র প্রযোজনা করিতে ইচ্ছুক। আপনি কোনো পরিচালকের সন্ধান দিয়ে সাহায্য করিতে পারেন?' আপনি লেখছি আমার [illegible] পরিচালকের এখন কি [illegible]? আপনার পরিচিত ভদ্রলোকেরা চিত্র প্রযোজনায় সত্যিই কতটা উৎসাহী তা' আমি জানি না। তবে আপনার চিঠির উত্তরে আমি একজন জানা শুনা পরিচালকের সন্ধান ব'লে দিতে পারি। তিনি বাঙ্গালী, বহু বছর হলিউডের অনেক ষ্টুডিয়োতে ছবি তৈরী সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরণের কাজে লিপ্ত ছিলেন এবং আগেকার যুগের বহু বিদেশী অভিনেতার সঙ্গে অভিনয়ও করেন, এঁদের মধ্যে নাম করতে হয় লন চেনি, গ্লোরিয়া সোয়ানসন, বার্ট লীটেল প্রভৃতির। এছাড়া তিনি ওদেশের তৎকালীন খ্যাতনামা পরিচালক গ্রিফিথ সাহেবের সঙ্গে ও মেট্রো গোল্ডউইনে সহ-পরিচালকরূপে কাজ করেন। দেশে ফেরার পর সরকারী প্রচার বিভাগের হ'য়ে অনেক প্রচারচিত্র তুলেছেন। সম্প্রতি 'হলিউড-প্রত্যাগত' যে বাঙালী পরিচালকের নাম কয়েকটি ছবির সঙ্গে যুক্ত দেখা গেছে তাঁর সঙ্গে এঁর কোনো সম্পর্ক নেই। আপনার পরিচিত ভদ্রলোকেরা যদি বিশেষ উৎসাহী থাকেন তবে আপনি 'চিত্রবাণী'র প্রসঙ্গ উল্লেখ ক'রে এই ঠিকানায় চিঠি লিখতে পারেন—কানাই রায়, ৬এ, মহারাজা নন্দকুমার রোড, কলিকাতা—২৯।

অনিল বক্সী ও সমরেশ ঘোষ, নৈহাটি

বড়ুয়া পরিচালিত নিউ থিয়েটার্সের 'পহচান' ছবির খবর কি জিজ্ঞাসা করেছেন আপনারা। এ সম্বন্ধে আমরা বাঙলার নাক থেকেও খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম ছবিটি শেষ হয়নি এবং আদৌ হবে না হবে কিনা সে সম্বন্ধে বড়ুয়া কোনো খোঁজই রাখেন না। ও ছবির সঙ্গে বড়ুয়ার বর্তমানে কোনো যোগাযোগ নেই। কাজেই এর চেয়ে বেশী আপাততঃ আমরাও আপনাদের জানাতে পারলাম না। আপনাদের আর একটি প্রশ্ন, ১৯৪৮ সালের শ্রেষ্ঠ বাংলা ছবি ও শ্রেষ্ঠ অভিনেতা অভিনেত্রী কে? এ সম্বন্ধে নির্দিষ্ট কোনো বিচারের ফলাফল জানা যায়নি। কাজেই এ সম্বন্ধে মতামত দিলেও তা ব্যক্তিগত অভিমত হতে বাধ্য। আমাদের মনে হয় ১৯৪৮ এর শ্রেষ্ঠ বাংলা ছবি 'সমাপিকা', শ্রেষ্ঠ অভিনেতা তুলসী চক্রবর্ত্তী, আর শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী সুনন্দা দেবী। অবশ্য এ সম্বন্ধে আপনাদের সঙ্গে আমাদের মতের মিল হওয়া না হওয়া স্বতন্ত্র কথা।

বাদল চৌধুরী, কলকাতা

আপনার প্রশ্ন—'অশোককুমারের প্রথম চিত্র কি? আপনার মতে তিনি সবচেয়ে ভালো অভিনয় করেছেন কোন্ ছবিতে? অশোককুমারের ঠিকানাটা জানাবেন কি?' আপনার প্রথম প্রশ্নের উত্তর এই সংখ্যায় প্রকাশিত অশোককুমারের জীবনীতে পাবেন। আমাদের মতে অশোককুমারের অভিনয়ের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন 'নয়া-সংসার'। অশোককুমারের ঠিকানা বোম্বে টকিজের ঠিকানা, এই ঠিকানা 'চিত্রবাণী'র কার্ত্তিক সংখ্যায় দেওয়া হয়েছিল, দেখে নেবেন।

নিতাই চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক চিত্রবাণী কার্য্যালয় ৫, হাজরা লেন থেকে প্রকাশিত এবং
মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রিণ্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স লিমিটেড, ৫১সি, বেচু চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট থেকে মুদ্রিত

চিত্রবাণী

প্রথম বর্ষ চৈত্র, ১৩৫৫ সপ্তম সংখ্যা

শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা বিড়ম্বিত দিনে শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের জয়ন্তী উৎসব পালন করার আয়োজন করে সমগ্র দেশবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন 'রূপধানী শিল্প সঙ্ঘ'। নবীন ভারতের শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ ভারতের আত্মাকে, ভারতবাসীর সত্তাকে পুনরাবিষ্কার করেছেন রঙে আর রেখায়। সৃষ্টিপ্রাণ অবনীন্দ্রনাথ তাঁর তুলির বিচিত্র পরশে ভারতীয় শিল্পের ঐতিহ্যকে বহুযুগের বিস্মৃতির অন্ধকার থেকে পুনরুদ্ধার করেছেন। রাজনৈতিক পরাধীনতা ও সাংস্কৃতিক আত্মবিস্মৃতির যুগে শিল্পপ্রাণ অবনীন্দ্রনাথ গতানুগতিক রীতি পদ্ধতির বন্ধন অস্বীকার করে ভারতীয় শিল্পের বিমুক্ত আত্মাকে ভারতীয় শিল্পানুরাগী ও শিল্পীর কাছে তার সহজ বিশিষ্ট ও আত্মস্বতন্ত্র রূপে তুলে ধরলেন। তার ফলে সেদিন বিদেশী বিলাসে স্বাজাত্য-বোধহীন অগণিতজনের কাছ থেকে উপেক্ষা ও পরিহাস সম্বল করেই তাঁকে এই দুরূহ ব্রতে হাত লাগাতে হয়েছিল। তাঁর সেদিনের সেই কঠিন ব্রতের সাফল্য ভারতীয় শিল্পের বিস্মৃত মর্য্যাদাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত ক'রে এক নতুন প্রতিভাদীপ্ত শিল্পীগোষ্ঠীর ঐতিহাসিক অভ্যুদয় স্মরণীয় ক'রে রাখলো ভারতের ইতিহাসে। শুধু তুলি আর রঙের শিল্পেই নয়, কালিকলমের শিল্পেও তাঁর অপূর্ব্ব দান সাহিত্যানুরাগীকে মুগ্ধ করে রেখেছে। অভিনয়শিল্পে, মঞ্চনির্দ্দেশে ও যন্ত্রসঙ্গীতে স্বভাবশিল্পী অবনীন্দ্রনাথের দক্ষতার পরিচয় শিল্পরসিক সমাজকে এককালে বিস্মিত করেছে। তাঁর তবলা সঙ্গৎ, এসরাজ ও সেতার বাজানোর কাহিনী যাঁরা জানেন তাদের কাছে শিল্পগুরুর বহুমুখী প্রতিভা অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের প্রতিটি নাটক বিশেষ ক'রে গীতিনাট্যগুলির অভিনয়ের

চিত্রবাণী

খুঁটিনাটি ব্যাপারে শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ ছিলেন প্রিয় দোসর। সরলপ্রাণ এই মানুষটির আমুদে স্বভাব ও পরিহাসপ্রিয়তা আজও অম্লান। জয়ন্তী অনুষ্ঠানের শ্রদ্ধা নিবেদনের মাঝে সমাগত সকলের কাছে তাঁর এই শিশুসুলভ মনের পরিচয় আশা ও আনন্দ জুগিয়েছে। "জোড়াসাঁকোর ধারে'র লেখক অবনীন্দ্রনাথ আর একদিন গল্পস্বল্পের ফাঁকে বললেন, 'এবার তোমরা গুপ্তনিবাসের কারাবাসটা লিখে নাও।' তা থেকে আমাদের মনে হয়েছে এই জয়ন্তী উৎসবের মধ্য দিয়ে তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করায় দেশবাসীরই মর্য্যাদা বেড়েছে।

আর তিনি যে এই লোকসমাগম ও গল্পস্বল্পের মধ্য দিয়ে তৃপ্তি ও আনন্দ পেয়েছেন তা অনির্ব্বচনীয়। আমরা তাঁর দীর্ঘায়ু কামনা করে ভারতীয় শিল্পের মহৎ মর্য্যাদাকে বার বার স্মরণ করি।

সুবুদ্ধির সূচনা

নিতান্ত গতানুগতিকভাবে দিনগত পাপক্ষয়ের মনোবৃত্তি নিয়ে স্বাধীন ভারতের জাতীয় সরকারের যে দপ্তরটি পরিচালিত হয় তা হোলো বেতার ও তথ্য বিভাগ। কিন্তু সম্প্রতি তাঁদের জড়তা ও শিথিলতার নিশ্চেষ্টতা আংশিক অপসারিত হবার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। এই দপ্তর থেকে প্রচারিত ব্রিটিশ ব্রডকাষ্টিং কর্পোরেশনের সংবাদ রীলে করার অনুষ্ঠানটি গত ১৬ই এপ্রিল থেকে বর্জ্জিত হয়েছে। এই অনুষ্ঠানটি নিয়মিত প্রচারিত হোতো প্রতিদিন রাত সাড়ে নটায়। ১৯৪৭ এর ১৫ই আগষ্টের পর থেকেই এই অনুষ্ঠানটি বন্ধ করার জন্য বিভিন্ন মহল থেকে বারবার অনুরোধ ও তাগিদ এসেছে। এবং সে অনুরোধ পূরণ করতে দেড় বছরেরও বেশী সময় লেগেছে। বেতার দপ্তরের এই সুবুদ্ধির সূচনায় আমরা বিস্ময় ও আনন্দ বোধ করেছি। সারা দুনিয়ার খবর ত ইংরাজীতে ও বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় প্রচারের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা চালু আছেই। তাছাড়া বি.বি.সি থেকে প্রচারিত সংবাদে ইদানীং মাঝে মাঝে পরোক্ষভাবে ভারতের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের আভাষ পাওয়া যাচ্ছিল। এমনকি কখনো কখনো ভ্রান্ত সংবাদ প্রচারও বাদ যায়নি। কাজেই সবদিক দিয়েই এই সংবাদ রীলে করার বহুবছর-প্রচলিত ব্যবস্থা বর্জ্জন করা যুক্তিযুক্তই হয়েছে এ বিষয়ে দ্বিমত নেই। তার জন্যে এই বিভাগের কর্ম্মকর্ত্তাদের আমরা অভিনন্দিত করছি।

শিল্পের দুর্য্যোগ

৯ই এপ্রিলের ইউনাইটেড প্রেসের এক সংবাদে প্রকাশ, হায়দ্রাবাদের অন্তর্গত জগদ্বিখ্যাত ইলোরা গুহার ইতিহাস প্রসিদ্ধ ভাস্কর্য্য ও অন্যান্য শিল্প নিদর্শনের ওপর রীতিমত উপদ্রব শুরু হয়েছে। এই উপদ্রবকারী হোলো একটি চিত্র প্রতিষ্ঠান আর একদল গুণ্ডা প্রকৃতির লোক। আরও প্রকাশ হায়দ্রাবাদ গভর্ণমেণ্টের একজন অফিসারকে এই বিষয় অনুসন্ধানের জন্য ঔরঙ্গাবাদে পাঠানো হয়েছে। সংবাদটি যেমন সংক্ষিপ্ত, তেমনি পীড়াদায়ক। ইলোরা ও অজন্তা গুহার ভাস্কর্য্য ও শিল্পকারুকার্য্যের নিদর্শন ভারতীয় শিল্প ঐতিহ্যের ধারক এবং বাহক রূপে সর্ব্বদেশে ও বহুযুগ ধরে স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। সেই শিল্পসম্পদের ওপর দৌরাত্ম্য করার উদ্দেশ্য কি এবং উপদ্রবকারীদের লাভই বা হবে কি এতে তা সহজ বুদ্ধির উপলব্ধির বাইরে। তাছাড়া বহুযুগসঞ্চিত এই সম্পদগুলির সংরক্ষণের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা এবং এগুলির ওপর সতর্ক পাহারার বন্দোবস্ত আছে বলেই সবাই জানে। সেই সতর্ক পাহারা এড়িয়ে কি করে উদ্‌ভ্রান্ত একদল লোক এই দৌরাত্ম্য করতে সাহস করে তা ভেবে অবাক হতে হয়। এর সঙ্গে রাজনীতির কোন যোগ নেই বলেই আশা করা যায়। সরকারী অফিসারের অনুসন্ধানের ফলাফল জানা যায় নি। অন্যান্য সরকারী অনুসন্ধানের ফলাফলের মতই এই অনুসন্ধানের পরিণামও জানার আশা পোষণ করা সমীচীন হবে না বলেই মনে হয়।

চিত্রবাণী

তারাশঙ্কর ও 'সন্দীপন পাঠশালা'

হুজুগের দেশে আরএক হুজুগ দেখলাম। 'সন্দীপন পাঠশালার' চিত্ররূপ নিয়ে সম্প্রতি যে নাটক ঘটে যেতে দেখলাম তার মধ্যে আর কিছু না থাক অভিনবত্ব আছে। 'সন্দীপন পাঠশালা' যখন উপন্যাস আকারে প্রকাশিত হয় তখন এটি অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল এবং অনেকেই সেটি পড়েছিলেন। ছায়াচিত্রে রূপান্তরিত 'সন্দীপন পাঠশালা'র দু'একটি শব্দ নিয়ে যাঁদের মধ্যে আজ বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে, তাঁদের মধ্যে কেউই যে আগে এ উপন্যাসটি পড়েননি এমন মনে করা বা ধরে নেওয়া মুস্কিল। আজ হঠাৎ তাঁদের চৈতন্যোদয়ে আমরা বিস্মিত বোধ করেছি। সে বিস্ময়ের ঘোর কাটতে না কাটতেই দেখলাম নাটক মেলোড্রামায় পৌঁছে গেছে। নাটকীয় ক্লাইমাক্সের চোটটা আর সবাইকে ছেড়েছুড়ে দিয়ে এসে পড়লো তারাশঙ্করের ওপর। সভাশেষে ফিরে আসার সময় পথিমধ্যে ও গাড়ীর মধ্যে তাঁর ওপর নির্মম আক্রমণ চলে। এই প্রস্তাবপর্বের উদ্যোক্তা কে বা কারা এবং এর উদ্দেশ্যই বা কি তা আজো অজ্ঞাত। এই অতর্কিত আক্রমণ নিয়ে বেশ হৈচৈও হলো। কিছুদিন গল্পের খোরাকও পেলেন অনেকে এই থেকে। ছবির অংশবিশেষ নিয়ে যারা হট্টগোল তুলেছিলেন তাঁরা শশব্যস্ত হয়ে জানালেন, ঐ ঘটনার সঙ্গে তাঁদের কোন যোগ নেই। ভীতচকিত তারাশঙ্কর ব্যাপার বেগতিক দেখে সুর নামিয়েছেন এবং জানা যাচ্ছে, তারাশঙ্কর নাকি ঐ উপন্যাস ও ছবি থেকে আপত্তিজনক অংশটি বর্জ্জন করাবেন।

এই অতর্কিত আক্রমণের নিন্দা করার মতো ভাষা নেই। তেমনি নেই তারাশঙ্করকে দেবার মত কোন সান্ত্বনা। 'সন্দীপন পাঠশালা' সম্বন্ধীয় আপত্তি ও অভিযোগ সম্পর্কে তারাশঙ্কর এবং ২৪ পরগণা জেলা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক ও বঙ্গীয় মাহিষ্য সমিতির সম্পাদকের মধ্যে যে পত্রালাপ হয় এই লাঞ্ছনা পর্ব্বের পূর্ব্বে তাতে তারাশঙ্কর একজায়গায় বলেছেন—"এই উগ্রতা অধীরতার ফলে আপনার সমাজের কতিপয় ব্যক্তি এমনি উন্মত্ত হইয়াছেন যে তাঁহারা কাপুরুষোচিত প্রথায় বেনামী পত্রে অশ্লীল ভাষায় আমার জননী, ভগ্নী, স্ত্রী কন্যার মর্য্যাদাহানিজনক উক্তি করিয়া পত্র লিখিতেছেন। আমি পত্রগুলি ছিঁড়িয়া দিয়াছি।...আপনাদের মাহিষ্য সম্প্রদায়ের গৌরবহানি আমি করি নাই। কোন সম্প্রদায়েরই গৌরব হানি করার মত মানিসকতা আমার নাই।...আপনারা আমার উপর অবিচার করিয়াছেন। আমার ঘরের সন্তান সীতারাম পণ্ডিতের পাদস্পর্শ করিয়াছে।...গ্রন্থ মধ্যের কোন অধঃপতিত চরিত্রের উক্তি গ্রন্থকারের উক্তি হয় না। বিশেষ করিয়া এইখানিতে গ্রন্থকারের উক্তি কোন্‌গুলি তাহা বাছিয়া লইতে ভ্রম হওয়ার অবকাশই নাই। কারণ পরিশেষে যেখানে সীতারামই 'সন্দীপন পাঠশালা' গ্রন্থের লেখক হইয়াছেন, সেখানে ধীরানন্দের উক্তিই গ্রন্থকারের উক্তি। মাতাল শিবকিঙ্করের উক্তির দায়িত্ব আমার উপর চাপাইলে অবিচারের অপরাধ বিচারককেই স্পর্শ করিবে। সে দিক দিয়া আজ ব্যাসদেবের বিচারেরও প্রয়োজন আছে। কারণ সূতপুত্র বলিয়া কর্ণ যে বারবার প্রকাশ্য রাজসভায় অপমানিত হইয়াছেন, স্বয়ংবর হইতে দূরীভূত হইয়াছেন, সে দায়িত্ব তাহা হইলে ব্যাসদেবের উপরেই চাপিবে।"

তারাশঙ্কর যে যুক্তিতর্কের অবতারণা করেছেন তা' যতই অকাট্য হোক তবু তা' অরণ্যে রোদনেরই সামিল। কেননা এতটা যুক্তিপ্রমাণ যাঁদের জন্য তিনি প্রয়োগ করলেন তাঁরা এ সবের উর্দ্ধে। আর যে অভিযোগ তাঁরা করেছেন তা' তারাশঙ্করের 'কবি' বা 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' বা অন্যান্য অনেক লেখকের উপন্যাস সম্বন্ধেও সহজেই প্রযোজ্য। কাজেই ব্যাপারটা এতদূর গড়াতে না দিয়ে আপত্তি উত্থাপনের সঙ্গে সঙ্গেই মীমাংসা করলে তারাশঙ্কর দূরদর্শিতারই পরিচয় দিতেন।

পশ্চিম বঙ্গ সরকারের প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের বেতার ও তথ্য বিভাগের মন্ত্রী মাননীয় শ্রীযুক্ত দিবাকরের সম্বর্দ্ধনা উপলক্ষ্যে ব্যবস্থা পরিষদ্-প্রাঙ্গনে এক চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার বিভাগ। এই প্রদর্শনীতে উপস্থিত ছিলেন শ্রীযুক্ত দিবাকর, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কয়েকজন মন্ত্রী, বহু শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক অধ্যাপক আর কয়েকটি বিদেশী ইনফরমেশন অফিসের কর্মীবৃন্দ। এই অনুষ্ঠানের কর্মসূচীর মধ্যে দেখলাম পাঁচখানি ছায়াছবির তালিকা তার মধ্যে চারখানি ডকুমেন্টারী আর একটি কার্টুন ছবি। কিন্তু প্রদর্শনীর সময় দেখা গেল অন্য ব্যাপার—কার্টুন ছবিটি মোটে দেখানোই হোলো না, অথচ অন্য একখানি ডকুমেন্টারী ছবি দুবার দেখানো হোলো। কার্টুন ছবিটি কেন দেখানো হোলো না এবং সে জায়গায় অন্য ছবিটি দুবার দেখানোর সার্থকতা যে কি তা আমাদের সহজ ও স্বাভাবিক বুদ্ধিতে বুঝতে পারলাম না। ব্যবস্থাপনার এমন নৈপুণ্য ও কর্মকুশলতা সরকারী প্রচার দপ্তরের কাণ্ডজ্ঞানহীনতারই পরিচয় দিয়েছে।

ডকুমেন্টারী ছবি চারখানি হোলো—(১) বঙ্গীয় জাতীয় রক্ষীবাহিনী—বঙ্গীয় জাতীয় রক্ষীদলের সামরিক শিক্ষা গ্রহণের ছবি ,(২) সুন্দরবনে সমবায় অভিযান : "গোসবা"—সুন্দরবন অঞ্চলে পরীক্ষামূলক সমবায় আন্দোলনের সংক্ষেপ চিত্র ; (৩) বনিয়াদ—নিখিল ভারত নারী সমিতির বঙ্গীয় শাখার উদ্যোগে পরিচালিত টাকুরপুকুর শিশু সদনে গান্ধীজীর ওয়ার্দ্ধা পরিকল্পনার কার্যকরী প্রয়োগের চিত্র, আর (৪) ময়ূরাক্ষী—ময়ূরাক্ষী নদীর বাঁধ পরিকল্পনার সংবাদ চিত্র।

ছবির বিষয়গুলি সুনির্বাচিত, আবহবর্ণনাও বিষয়োপযোগী কিন্তু টেকনিক্যাল দিকটা সম্পূর্ণ অবহেলিত। আলোকচিত্র ও শব্দগ্রহণ এতই ত্রুটীপূর্ণ যে ছবির বিষয়বস্তু অধিকাংশ জায়গাতেই সহজবোধ্য নয়। বিশেষ ক'রে এই জাতীয় তৃতীয় শ্রেণীর ছবি বিদেশীদের দেখিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করা যেতে পারে কিন্তু তা অন্যের কাছে হাস্যাস্পদ হওয়ারই নামান্তর। সরকারী প্রযোজনায় গৃহীত ছবি বলে প্রদর্শিত ছবিগুলিকে স্বীকার করতে আমাদের বাধে। সরকারী ছবির মান সকল দিক দিয়েই উন্নত হওয়া উচিত। আমাদের মনে হয় ভাল ছবি তোলার যাবতীয় সাজ-সরঞ্জামযুক্ত, উৎকৃষ্ট ছবি তোলার সুনামের অধিকারী কোন প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় এবং অভিজ্ঞ কৃতবিদ্য চিত্র-কুশলীদের দিয়ে সরকারী ডকুমেন্টারী ছবিগুলি তোলার ব্যবস্থা হওয়া উচিত। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার-অধিকর্তার এ ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তাঁদের এ প্রচেষ্টা যেমন প্রশংসনীয় তেমনি কাম্য হলো এই জাতীয় ছবির সর্ব্বাঙ্গীন উৎকর্ষ।

পরলোকে মিষ্টার টমাসন

কলিকাতাস্থ মার্কিন প্রচার দপ্তর ইউনাইটেড ষ্টেটস ইনফরমেশন সার্ভিসের ইনফরমেশন অফিসার জন টমাসন থার্ড সম্প্রতি আকস্মিক বিমান-দুর্ঘটনায় নিহত হওয়ার সংবাদে আমরা মর্ম্মাহত হয়েছি। মাত্র দু'বছর আগে তিনি কলকাতায় আসেন ও এই তথ্য ও সংবাদ বিভাগের ভার গ্রহণ করেন। কিন্তু এই স্বল্পকালের মধ্যেই তাঁর অমায়িক ব্যবহার ও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সকল কিছু জানার কৌতূহল দেখে আমরা মুগ্ধ হয়েছি। আমেরিকা ও ভারতবর্ষের নানা বিষয় নিয়ে যখনই তাঁর সঙ্গে আমাদের আলাপ আলোচনা হয়েছে তখনই তাঁর সহজ ও অকপট উক্তি আমাদের বিস্মিত করেছে।

'চিত্রবাণী' সংক্রান্ত বহু বিষয়ে আমরা তাঁর সহযোগিতা ও সৌহার্দ্য লাভ করেছিলাম। আমরা তাঁর শোকসন্তপ্তা স্ত্রী ও পরিবারবর্গকে গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি।

গৌর চট্টোপাধ্যায়

পুরাতনী

আর্ট ও জাতীয়তা

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মনের মধ্যে, চিন্তার মধ্যে নির্ভেজাল জাতীয়তাবোধ না থাকলে পরে আর্টের আহিতাগ্নিকে অনির্বাণ ভাবে জ্বালিয়ে রাখা সম্ভব নয়। ছেলেরা আজকাল একটু ছবি আঁকতে শিখেই এক একজন আর্টিষ্ট বনে যান। দেখে আমার হাসিও পায় দুঃখও লাগে। আর্টের সাধনা জন্ম জন্মান্তরের সাধনা, এক জীবনেই কি তাতে কেউ সিদ্ধি লাভ করতে পারে? নিজের মাটির ওপর, নিজের মায়ের ওপর, নিজের দেশের সংস্কৃতির ওপর যার দরদ নেই, সে কখনো আর্টিষ্ট হোতে পারে? দুই চোখ ভরে যে বর্ষার গঙ্গার রূপ না দেখেছে তার আর্ট বা শিল্প সার্থক হতেই পারে না—না রঙে না কথায়।

রাশিয়ার টলষ্টয় ঋষির একখানা বই আছে। সেটার নাম বোধ হয় "আর্ট কাকে বলে?" (What is Art?) মনে আছে রবিকা একবার সেই বইখানা আমাকে পড়তে দিয়েছিলেন। আমি ভাবলাম, ছবির সম্বন্ধে বুঝি কোনো ভালো বই হবে, এর লেখকও বোধ হয় একজন বড় চিত্রশিল্পী। উল্টেপাল্টে দেখি এটা ছবির বই নয়। রেখে দিলাম তখনি। কদিন পরে রবিকা জিজ্ঞাসা করলেন—কী অবন, বইটা পড়েছ? আমি বল্লাম, ও বইটা আপনার জুরিসডিকসনের, আমার ও বই পড়ে কি লাভ? রবিকা খুব বিস্মিত হয়ে বললেন: বলো কি? তোমরা কি আর্ট বলতে শুধু রঙ আর তুলি বোঝো? পড়ে দেখো বইটা একবার। টলষ্টয় একেবারে জাতশিল্পী।

বোকা বনে গেলাম। পড়লাম বইটা। দেখলাম রবিকা মিথ্যে বলেন নি—সত্যি বইটা না পড়লে আফশোসই থাকতো। আর্ট সম্বন্ধে এই বইটাতে যা লেখা আছে তা যদি আজকালকার ছেলেরা পড়ে দেখতো তাহলে তারা বুঝতে পারতো জাতীয়তা থেকে আর্টকে আলাদা করে দেখা যায় না, যেমন দেহ থেকে প্রাণটাকে আলাদা করা যায়না। আর্টের প্রাণই হোলো জাতীয়তা, টলষ্টয় এই বিচার করেছেন ঐ বইটাতে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কাব্য প্রেরণার মূলে ছিল জাতীয়তাবোধ—একথা কে না জানে?

শিল্পবস্তুটা তো আর কাঁচকলা জাতীয় পদার্থ নয় যে এর কোন মূল্য নেই। ব্যক্তিগত জীবনে যেমন, সমাজে তেমন, রাষ্ট্রিয় জীবনেও তেমন—এই একটা জিনিস যা চিরকাল বেঁচে থাকে রঙের ভেতর দিয়ে, কথার ভেতর দিয়ে, ছড়ার ভেতর দিয়ে। ভগবানের বিশ্বরূপের মতোই, শিল্পের এমন একটা ব্যাপকতা আছে, এমন একটা গভীরতা আছে যে, তার [illegible] কিছুরই হদিস পাওয়া যায় না।

কিন্তু এই শিল্প বা আর্ট বেঁচে থাকে, জন্ম যার জাতীয় ভাবধারা থেকে। আজ-কালের ছেলেদের রঙে ও রেখায় অনেক কিছু দেখতে পাই, আশ্চর্য্যরকমের মৌলিকতাও দেখেছি অনেকের তুলিতে, কিন্তু খুঁজে পাইনে তার মধ্যে শুধু একটি মাত্র জিনিস—জাতীয়তা। এখনকার ভারতীয় চিত্রশিল্পের ধারা যে ক্রমেই ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসছে এর একমাত্র কারণই হোল তুলিতে অভাব হয়েছে আসল রঙের—জাতীয়তার।

ছেলেবেলায় কোন্নগরের বাগানে বসে বসে দেখতাম দুকূল ছাপিয়ে গঙ্গা ভরে উঠেছে, কুলু কুলু ধ্বনিতে

চিত্রবাণী

বয়ে চলছে। সে ধ্বনি সত্যিই শুনতে পেতুম। ঘাটের কাছে বসে আছি, কানে শুনছি তার সুর কুল্ কুল্ ঝুপ্ ঝুপ্ আর চোখে দেখছি তার শোভা—সে কী শোভা, সেই ভরা গঙ্গার বুকে ভরা পালে চলেছে জেলে নৌকা, ডিঙ্গি নৌকা। রাত্রি হলে—সারি সারি নৌকার নানা রকম আলো পড়েছে জলে। জলের আলো, নৌকার আলো, ঝিল্ মিল্ করতে করতে সঙ্গে সঙ্গে নেচে চলতো। কোনো নৌকায় নাচগান হচ্ছে, কোনো নৌকায় রান্নার কালো হাড়ি চড়েছে। দূর থেকে দেখা যেতো আগুনের শিখা। গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত শীত বসন্ত কোন ঋতুই বাদ দেইনি, সব ঋতুতেই মা গঙ্গাকে দেখেছি।

এইভাবে গঙ্গার অনেক রূপই দেখেছি—সেই দেখার মধ্যে দিয়েই গঙ্গাহৃদি বঙ্গভূমিকে চেনেছি। এই জানাটা প্রত্যেক শিল্পীর পক্ষেই দরকার। তাইতো বলি, আজকাল ভারতীয় শিল্পী বলে নিজেকে যারা পরিচয় দেয় ভারতীয় তারা কোন্খানটায়? ভারতের আসল রূপটি তারা ধরলো কি? তাদের শিল্পে ভারত স্থান পায়নি মোটেই। কারণ তারা ভারতকে দেখতে শেখেনি, দেখেনি। তাদের দৃষ্টি ও সৃষ্টি সবই জাতীয়তাবোধ শূন্য। এ আমি জোরের সাথেই বলছি। রঙের ক্ষেত্রে তাদের তুলির মুখে ফসল ফলেছে অজস্র কিন্তু তার মধ্যে সার বস্তু কি? তাইতো ব্যথা বাজে—যখন দেখি কি জিনিস এরা হারায়!

অথচ আমাদের সময় যে জিনিসটা ছিল অস্পষ্ট এখন তা প্রত্যক্ষ এবং স্পষ্ট। সেদিনকার ন্যাশনালিজম্-এর সঙ্গে আজকের দিনের ন্যাশনালিজমের আকাশ পাতাল তফাৎ। সেদিন আমরা সেই অস্পষ্ট অপ্রত্যক্ষ জিনিষকে সম্বল করেই পথ করে নিয়েছিলাম। আজ দেশের দুকূল ছাপিয়ে জাতীয়তার বান ডেকে চলেছে—কিন্তু না শিল্পে না সাহিত্যে তার কোন ছাপ আছে। ছেলেদের তাই বলি, কম ছবি আঁকো ক্ষতি নেই, কিন্তু তার মধ্যে যেন জাতীয়তার শীলমোহর থাকে। তা না হোলে ধোপে টিঁকবেনা। রঙের কারবারে চমকপ্রদ ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করা খুব কঠিন কাজ নয়, কিন্তু তার ভেতর দিয়ে জাতির সংস্কৃতিকে রূপ দেওয়াই হোলো বড় কথা। রবীন্দ্রনাথ, নন্দলালের দৃষ্টান্ত সামনে থাকা সত্ত্বেও ছেলেরা কেন যে এ কথাটা বুঝতে চায়না আমি ভেবে পাইনে। জাতীয়তাবর্জ্জিত আর্ট একটি রসহীন বৃক্ষ আর গন্ধবিহীন ফুলের মতই প্রাণহীন সৃষ্টি।

বকফুল, বেগুনের ফুল, কুমড়ো ফুল এই সব রইল কাব্যের বাহির-দরজায় মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে, রান্নাঘর ওদের জাত মেরেছে। ......এইখানে চিত্রকলার সুবিধা আছে। কচুগাছ আঁকতে রূপকারের তুলিতে সংকোচ নেই। কিন্তু বনশোভা সজ্জায় কাব্যে কচুগাছের নাম করা মুশকিল। আমি নিজে জাত মানা কবির দলে নই তবু বাঁশ বনের কথা পাড়তে গেলে অনেক সময় "বেণুবন" বলে সামলে নিতে হয়। শব্দের সঙ্গে নিত্যব্যবহারগত নানাভাব জড়িয়ে থাকে। তাই কাব্যে "কুরুচি" ফুলের নাম করবার বেলা কিছু ইতস্তত: করেছি, কিন্তু কুরচিফুল আঁকতে চিত্রকরের তুলির মানহানি হয় না। —রবীন্দ্রনাথ
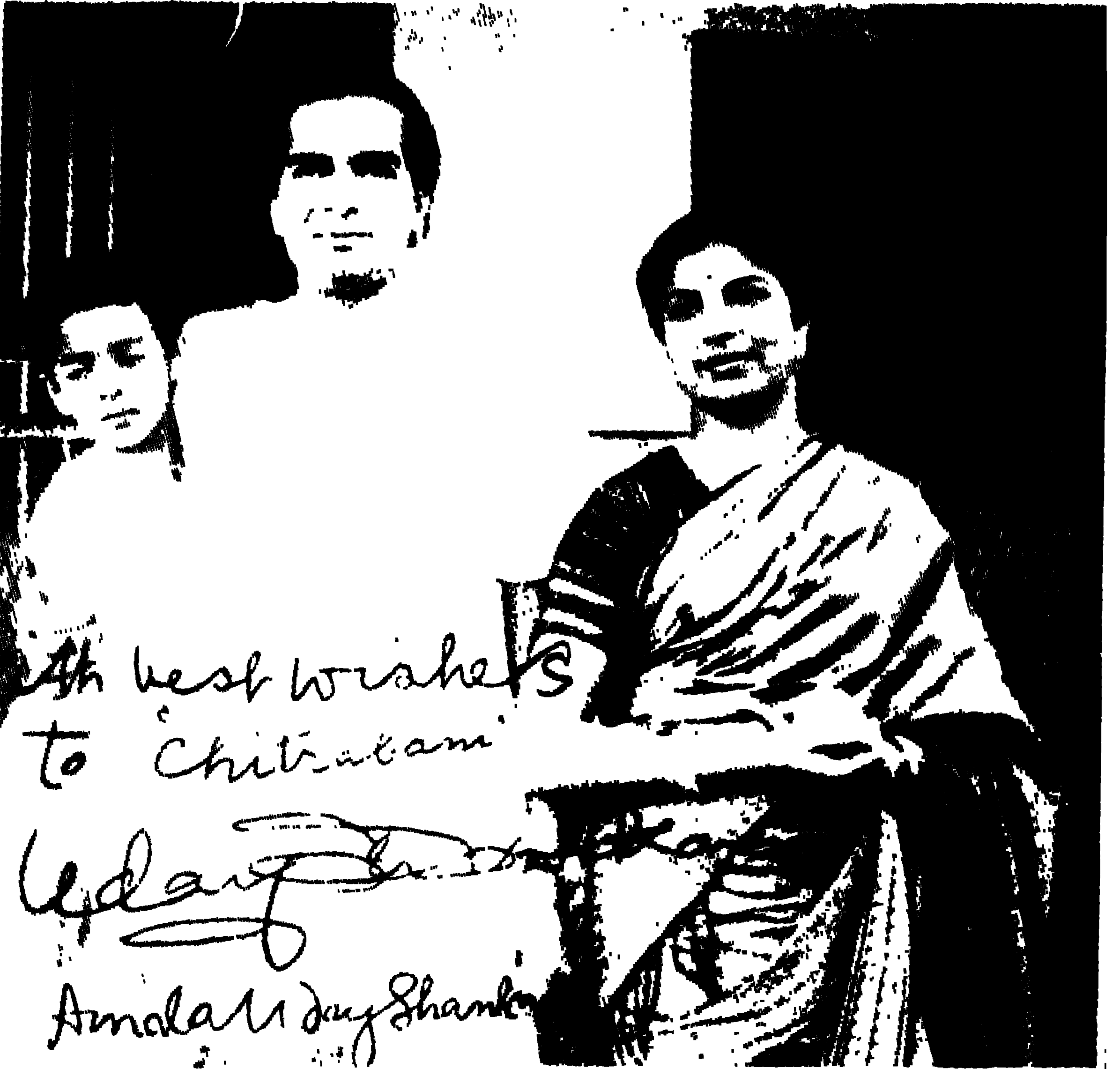
উদয়শঙ্করের বিদেশ ভ্রমণ

নাম-করা দৈনিক পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বন্ধু জানালেন, শঙ্করদম্পতি হোটেলে ওঠেননি, উঠেছেন টালিগঞ্জে। ঠিকানাটি পূর্বপরিচিত, খুঁজতে হয়নি। শনিবার ২৬শে মার্চ সকালবেলা। কার্ড পাঠাতেই বেরিয়ে এলেন শ্রীমতী অমলাশঙ্কর। প্রতিনমস্কার করে জানতে চাইলেন কি ব্যাপার? কোন কথা না বলে একসেট 'চিত্রবাণী' হাতে দিয়ে বল্লাম—ব্যাপার কাগজঘটিত। বহুদিন বাদে আপনারা দেশ জয় করে দেশে ফিরলেন। তারই বিবরণ সংগ্রহ করে সাংবাদিকের কর্ত্তব্য পালন করতে আর 'চিত্রবাণী'র পাঠকমহলের কৌতূহল মেটাতে হাজির হতে হয়েছে।

—তবে ত মুস্কিলে ফেলেছেন। আচ্ছা, একটু বসুন, আমি আসছি। বলে তিনি 'চিত্রবাণী'র কপিগুলি নিয়ে ভেতরে চলে গেলেন।

পাশের ঘরে বন্ধুবান্ধব পরিবেষ্টিত হয়ে উদয়শঙ্কর নানা আলোচনায় ব্যস্ত। তাঁর গলাও শুনতে পেলাম। দু'তিন মিনিটের মধ্যেই শ্রীমতী শঙ্কর ফিরে এসে বল্লেন, এখন ত উনি বিশেষ ব্যস্ত রয়েছেন। কালকে এই সময় আসতে আপনাদের কি খুব অসুবিধা হবে?

—না, তেমন আর কি! জবাব দিলেন সহকর্ম্মী।

হেসে বল্লাম—আমাদের যা জিজ্ঞাস্য তা জানতে বা আপনাদের উত্তর দিতে বিশেষ সময় লাগবে না। তার জন্যে এমন কিছু তোড়জোড়ের দরকার হবে না। কাজেই, সে পর্ব্বটা আপনার অসুবিধা না হলে এখনই সেরে ফেলা যেতে পারে। এই বলে মাঘ সংখ্যার 'চিত্রবাণী'র প্রশ্নোত্তরের একাংশ খুলে তাঁকে দেখালাম। বললাম, আপনি আমাদের ঝঞ্ঝাটে ফেলেছেন—অমলা চৌধুরী নাম না নিয়ে অমলাশঙ্কর হলেন কেন?

—ওঃ! এই আপনাদের প্রশ্ন! আপনারা কি উত্তর দিয়েছিলেন দেখি? বলে তিনি উত্তরটার ওপর চোখ বুলিয়ে নিলেন। ঘাড় নেড়ে বল্লেন, ঠিকই ত লিখেছেন! বিদেশে কিন্তু আমি 'অমলা উদয়শঙ্কর' নামে পরিচয় দিয়েছি।

—আর একটা বিষয় আপনাদের নজরে এসেছে কিনা জানিনা।

—কি বলুন ত?

—এ মাসের 'ফিল্ম ইণ্ডিয়া'তে বাবুরাও আপনাদের 'কল্পনা'র বিদেশে প্রদর্শন বিষয়ে খুব ঝাল ঝেড়েছেন।

—হ্যাঁ, ব্যাপারটা শুনেছি, পড়া হয়ে ওঠেনি। কোন্ কোন্ বিষয় নিয়ে তিনি ঝাল ঝেড়েছেন?

—অবশ্য শুধু আপনাদের ছবির ওপরই নয়, বিজয় ভট্ট, শান্তারাম এঁদের ছবির ওপরও খুব খাপ্পা হয়ে উঠেছেন। কাজেই সেই বিষয়েই প্রথমে আপনাকে কিছু জিগ্যেস করছি।

—দেখুন, আমার একটা সুন্দর কথা মনে পড়ছে, 'কল্পনা' সম্বন্ধে বলেছেন সোভিয়েট এম্ব্যাসীর একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী—"It should not have been an imagination, it should have been a reality."

—আমেরিকায় কোথায় কোথায় 'কল্পনা' দেখান হয়েছিল?

—নিউইয়র্ক, ফিলাডেলফিয়া, শিকাগো, সানফ্রান্সিসকো, লস্‌এঞ্জেলস্ প্রভৃতি জায়গায় আর বিভিন্ন ষ্টুডিওতে যেমন প্যারামাউণ্ট, মেট্রো গোলডুইন, ওয়ার্ণার ব্রাদার্স, স্যামুয়েল গোলডুইন ষ্টুডিওতে কয়েকবার করে দেখান হয়েছে এবং সমাদরও লাভ করেছে। স্যাম গোল্‌ডুইন আর ওখানকার নামকরা নর্ত্তক জেন্ কেলী প্রাণ খুলে উপভোগ করেছেন ছবিটি।

চিত্রবাণী

—আচ্ছা, পুরো ছবিটাই কি দেখানো হয়েছিল সব জায়গায় ?

—না। চোদ্দ হাজার ফুটের ছবির মধ্যে হাজার চারেক ফুট বাদ দেওয়া হয়েছিল।

—তার ফলে কোন্ কোন্ অংশ বাদ পড়লো ?

—Provincialism যে portionটাতে ছিল আর Village Scene এর কিছু কিছু বাদ দেওয়া হয়।

—লণ্ডন, রাশিয়া ইত্যাদি জায়গায় ছবিটি কি রকম সমাদর পেয়েছিল ?

—লণ্ডনে সাধারণ কয়েকটি প্রদর্শনী হয় 'টিভোলী' সিনেমায়। এই শো-হাউসে আড়াই হাজার লোক ধরে। প্রত্যেক শোতেই বেশ ভিড় হতো। মস্কোতে রুশ শিল্পী ও প্রযোজকদের উপস্থিতিতে 'কল্পনার' একটি বিশেষ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়। এই প্রদর্শন উৎসবে Soviet diplomatic Corpsএর কয়েকজনও উপস্থিত ছিলেন। আমরা জানতে পারলাম তাঁরা এই জাতীয় functionএ বড় একটা আসেন না। 'কল্পনা' তাঁদের ভালই লেগেছে জানালেন। এমনকি যাঁদের আমন্ত্রণে আমরা সোভিয়েটে যাবার সুযোগ পাই সেই V. O. K. S. প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ এই ছবির একখানি কপি ভারতীয় শিল্পকলার নিদর্শন হিসাবে রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আমাদের কাছে ঐ একটিমাত্র কপিই ছিল, কাজেই, দেওয়া আর হয়ে ওঠেনি। তাছাড়া, সে কপিটিও বিশেষ ভাল ছিল না। যাবার সময় মাদ্রাজ থেকে তাড়াতাড়িতে হাতের কাছে এই কপিটিই পাওয়া গেল। রাশিয়াতে 'কল্পনা' এগারবার দেখান হয়েছিল।

—এবারে আপনাদের পর্যটনের কিছু বৃত্তান্ত শোনা যাক্। লণ্ডনে আপনারা কতদিন ছিলেন ?

—যাওয়ার সময় লণ্ডনে ছিলাম তিন হপ্তা, ফেরার পথে আবার তিন হপ্তা। লণ্ডনে পৌছুলাম আমরা অক্টোবরের মাঝামাঝি। এই সময় অপ্রত্যাশিতভাবে আমন্ত্রণ এলো মস্কো আর্ট থিয়েটারের Fiftieth Anniversary celebrationএ যোগ দেওয়ার জন্যে। এই আমন্ত্রণের সংবাদ আমরা পেলাম লণ্ডনের হাই কমিশনারের মারফৎ। শঙ্কর এর আগে সোভিয়েটে যাবার কয়েকবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু পাশপোর্ট পান নি। কাজেই এই আকস্মিক আমন্ত্রণ পেয়ে আমাদের ভারী আনন্দ হলো। লণ্ডন থেকে প্লেনে উঠলাম, নামলাম গিয়ে প্রাগে। এইখান থেকেই রাশিয়াগামী প্লেন ধরতে হয়। কিন্তু, তখন আবহাওয়ার অবস্থা খারাপ থাকার জন্যে সেদিন আর মস্কো যাবার কোন প্লেন পাওয়া গেল না। এই সময় দেখলাম, চেকোশ্লোভাকিয়ার জনপ্রিয় শিল্পীরা সেখানে সমবেত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে অনেকে আমাদের ফটো তুললেন। তাঁদের সে সম্বর্দ্ধনার স্মৃতি আমরা ভুলতে পারবো না। এখানে আমাদের যে তিন দিন থাকতে হয়, আমরা ছিলাম State guest রূপে আর প্রাগ সহরটি এবং সেখানকার ব্যালে স্কুলগুলিও ঘুরে বেড়িয়ে দেখবার সুযোগ পেলাম। এখানে হঠাৎ শঙ্করের দাঁতের যন্ত্রণা সুরু হয়। কিন্তু তাঁর এক পুরাতন বন্ধু বিশেষ যত্নের সঙ্গে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই যন্ত্রণার উপশম ঘটান। এখানে আমার তৃতীয় দিন সকালে আমরা মস্কো যাওয়ার প্লেন ধরলাম। রাশিয়ায় আমরা ছিলাম ছ'দিন। মস্কো আর্ট থিয়েটারের এই উৎসবটি আমাদের ভারী ভাল লেগেছিল। এই উৎসবে দেশবিদেশ থেকে ছ'শোর বেশী শিল্পী এবং চিত্রপ্রযোজক যোগ দিয়েছিলেন। মস্কো আর্ট থিয়েটারের স্মারকচিহ্ন একটি ব্যাজ শঙ্করকে দেওয়া হয়।

—আমেরিকায় কতদিন ছিলেন ?

—তিন হপ্তা থাকার মৎলব নিয়ে গিয়ে আমরা সাড়ে তিন মাস কাটিয়ে এলাম।

—এই সব জায়গায় নিশ্চয়ই সেখানকার অনেকের সঙ্গেই আপনাদের ঘনিষ্ঠ আলাপ হয়েছে ?

—হ্যাঁ, তা হয়েছে। তাঁদের নাম জানতে চান বোধ হয় ?

—নিশ্চয়ই, অন্ততঃ কয়েকজনের নাম বলুন।

—রাশিয়ার শ্রেষ্ঠ ব্যালে নৃত্যশিল্পী মাদাম উলানোভা আর V. O. K. S. এর ডেপুটি প্রেসিডেন্ট মাদাম কিসলোভার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ হয়। আমেরিকাতে ত আমরা মিসেস্ পার্ল বাকের অতিথি হ'য়ে ছিলাম। আর আলাপ পরিচয় হয়েছিল চার্লি চ্যাপলিনের সঙ্গে।

—ডিস্‌নের সঙ্গে আলাপ হয় নি?

—না, সেটা আর হয়ে ওঠেনি।

—এসব জায়গায় নিশ্চয়ই সেখানকার নৃত্য প্রদর্শনী দেখেছেন?

এমন সময় উদয়শঙ্কর এসে দাঁড়ালেন আমাদের কাছে। পরিহাসপ্রিয়তার সুরে জিগ্যেস করলেন,—আমাকে কি কি প্রশ্নের জবাব দিতে হবে? উত্তর দিলেন শ্রীমতী অমলাশঙ্কর—এঁদের প্রশ্নের আর শেষ নেই।

হেসে বল্লাম—মিসেস শঙ্কর অনেক প্রশ্নেরই উত্তর দিয়েছেন, এবারে আপনি আর দু একটা প্রশ্নের জবাব দিন। আর এই প্রশ্নোত্তরগুলি 'চিত্রবাণী'তে প্রকাশিত হওয়ার পরও পাঠকমহল থেকে অনেকে আমাদের কি বলে খোঁচা দেবেন জানেন?

শ্রীমতী শঙ্কর বল্লেন—খোঁচাটা কিরকম?

—এই যেমন ধরুন, কেউ লিখবেন, এতক্ষণ এতকথা বললেন আর অমুক কথাটাই জিগ্যেস করতে ভুলে গেলেন? আবার অন্য কেউ হয়তো লিখবেন সাক্ষাৎকারের বিবরণীটি এত সংক্ষিপ্ত হলো কেন? সাংবাদিকের দুর্ভোগটা বুঝুন একবার।

শঙ্কর হেসে ফেললেন। বল্লেন, এ রকম খোঁচা এর আগেও খেয়েছেন বুঝি?

—নইলে কি আর এত হিসেব করে প্রশ্ন করি! আচ্ছা, আমাদের বর্ত্তমান প্রশ্ন—রাশিয়ায় বা আমেরিকায় নৃত্য প্রদর্শন কোন উৎসব দেখেছেন নাকি?

উত্তর দিলেন শঙ্কর: মস্কো আর্ট থিয়েটারের উৎসব উপলক্ষ্যে যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল, তার মধ্যে অতি চমৎকার অপেরা ব্যালে দেখতে পেলাম। ওদেশের নৃত্যশিল্পের উৎকর্ষের চমৎকার নিদর্শন। তাছাড়া আমরা মস্কো ব্যালে স্কুলও দেখতে গিয়েছিলাম। এখানে ছেলেমেয়েদের নিয়মিত নৃত্যকলা শেখাবার ব্যবস্থা আছে।

—তাছাড়া মস্কোতে আমরা একটি ছোটদের নাট্যশালা দেখেছি। এখানে শিশুরাই দর্শক আর শিশুরাই শিল্পী। এইটি আমরা যেদিন দেখতে গেলাম, সেদিন ছোটদের উপযোগী জনপ্রিয় একটি গল্পের নাট্যরূপের অভিনয় দেখাচ্ছিল ছোটরা নাচ গান সহযোগে। নিউইয়র্কেও আমরা 'স্কুল অব ব্যালে' দেখতে যাই। আমেরিকার নামকরা ব্যালে স্কুলগুলির মধ্যে এটি একটি। এই বলে শ্রীমতী অমলাশঙ্কর আমাদের কাছে ছুটি চাইলেন। যেতে যেতে বল্লেন, আপনারা আজকেই সব প্রসঙ্গ সেরে ফেলছেন দেখছি যে?

আগের প্রশ্নের জের টেনে উদয়শঙ্কর বল্লেন, বৃটেনেও অবশ্য আমরা 'রয়েল কলেজ অব মিউজিক' আর 'আর্ট কাউন্সিল অফ্ বৃটেন' দুটিই ঘুরে দেখেছি।

—এইবার নিয়ে বিদেশ ঘোরা আপনার ক'বার হলো?

—এবার নিয়ে বোধ হয় সাত বার হবে।

—আচ্ছা আপনার 'কল্পনা' ছবি ভারতবর্ষের মধ্যে কোন্ প্রদেশ থেকে বেশী সমাদর পেয়েছে?

—এ প্রশ্নেরও জবাব চাই? Appreciationটা অবশ্য বেশী এসেছে বাঙ্‌লা দেশ থেকেই।

—অ্যানা পাভলোভা ছিলেন সে যুগের শ্রেষ্ঠ নৃত্যশিল্পী, আর বর্ত্তমান কালে এই শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছেন মাদাম উলানোভা, এঁদের নৃত্যধারার মধ্যে বিশেষ কোনো পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করলেন কি?

—নিশ্চয়ই, যথেষ্ট পরিবর্ত্তন হয়েছে। কেননা এ পরিবর্ত্তন অপরিহার্য্য।

—শুনলাম আপনি পরশুদিন মাদ্রাজ যাচ্ছেন?

—হাঁা, সেখানে মাস চারেক নতুন শিল্পী নির্ব্বাচন করে

নতুন নৃত্য পরিকল্পনার তোড়জোড় করতে হবে। সেপ্টেম্বর মাসে আবার আমরা রওনা দেবো। অক্টোবরের প্রথম হপ্তায় লণ্ডনে পৌছব। সেখানে কিছু দিন থেকে, যেতে হবে ফ্রান্স, সুইজারল্যাণ্ড, ইটালী, স্টকহলম্ প্রভৃতি জায়গায়।

—তাতে কত দিন সময় লাগবে? প্রশ্ন করেন সহকর্মী।

—তা মাস দেড়েক লেগে যাবে। নিউ ইয়র্কে পৌছব ডিসেম্বরের মাঝামাঝি। এক চুক্তি অনুসারে ২৬শে ডিসেম্বর থেকে আমেরিকার বড় বড় সহরে পর পর ভারতীয় নৃত্য প্রদর্শন করতে হবে।

—ভারতীয় নৃত্যকলা সম্বন্ধে ওদেশের আগ্রহ ও উৎসাহেরই পরিচায়ক সেটা।

—সে পরিচয়টা এবারে যেমনভাবে চোখে পড়েছে তেমন আর এর আগে চোখে পড়েনি। স্বাধীন ভারত পরিপূর্ণ মর্য্যাদার আসন পেয়েছে সেখানে বিশেষ করে শিল্প ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে।

—এই নব পরিকল্পিত নৃত্যকলা প্রদর্শনীর কোন অনুষ্ঠান আপনাদের যাওয়ার আগে ভারতের কোথাও হবে কি?

—হ্যাঁ, নৃত্য প্রদর্শনের জন্য সফর করার ইচ্ছা আমাদের আছে, বিশেষ করে কলিকাতা, বোম্বাই আর দিল্লীতে।

সেদিনের মত এইখানেই আলাপ আলোচনার যবনিকা-পাত করা গেল।

আপনি কি বলেন?

নন্দকুমার' নাটকের পুনরভিনয়

শ্রীযুক্ত "চিত্রবাণী" সম্পাদক

মহাশয়,

বিগত ১৯১১ সালে তখনকার সরকারের হুকুমে পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের দুখানি ভাল ও জনপ্রিয় নাটকের অভিনয় বন্ধ ও নাটক দু'খানি বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়। সম্প্রতি সংবাদপত্রে দেখে আনন্দ হলো যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার নাটক দুখানির উপরে এই দীর্ঘ ৩৮ বছরের নিষেধাজ্ঞা বাতিল করে দিয়েছেন।

গত বছরে এই ভাবে গিরিশচন্দ্রের "সিরাজদ্দৌলা" নাটকের উপরে নিষেধাজ্ঞা বাতিল হয়ে যাওয়াতে শিশির কুমার ভাদুড়ী সেখানিকে কাট ছাঁট করে আধুনিক ধারায় অভিনয়োপযোগী করে নিয়ে কিছুদিন অভিনয় করিয়েছিলেন, কিন্তু যে কারণেই হোক খুব বেশী দিন চলে নি। আমার মনে হয়, শিশির কুমার যদি তাতে ভগ্নোদ্যম না হয়ে "নন্দ কুমার" নাটকখানিকে সময়োপযোগী ভাবে কাট ছাঁট করে নিয়ে অভিনয় করেন ত খুব ভাল হয়। এ নাটকখানিতে ঘাতপ্রতিঘাত, চরিত্রের ক্রমোন্মেষ প্রভৃতি নাটকীয় মালমসলা প্রচুর আছে, সেজন্য আমার বিশ্বাস এখানি বেশ ভাল চলবে। আমার আরো মনে হয় এ নাটকে মহারাজা নন্দকুমারের চরিত্র যেভাবে চিত্রিত করা হয়েছে সেটি সব দিক দিয়ে শিশিরকুমারের নিজেই অভিনয় করার একান্ত উপযোগী। আমি ১৯০৭ সালে ষ্টার থিয়েটারে যখন এই নাটকের অভিনয় দেখি তখন নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এই ভূমিকায় চরিত্রোচিত গাম্ভীর্য্য ও মর্য্যাদা সহকারে অভিনয় করে আমাদের মুগ্ধ করেছিলেন। এখন এ চরিত্রের যথার্থ রূপদান করতে পারেন একমাত্র শিশিরকুমার। আপনারা কি বলেন? ইতি—

শ্রীবিপিনবিহারী রায়, বালিগঞ্জ

অনন্যা ছবি সম্বন্ধে মতামত

শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মশাই,

ছায়াছবি সম্বন্ধে সাধারণের অভিমত ছাপবেন এই বিজ্ঞপ্তি দেখে 'অনন্যা' ছবিখানি সম্বন্ধে কিছু লেখবার সাহস করছি। এই গল্পের শেষ দিকটা কেমন যেন ভাল লাগলো না। এমনকি পরিণতিটিকে অযথা দীর্ঘ পথ টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ফ্ল্যাসব্যাকের সাহায্যে সন্ধ্যাকে দিয়ে তার জীবনের দুঃখময় বেদনার কাহিনী বলানো হয়েছে। এটা দেখতে দেখতে 'কাশীনাথ' ছবির কথা মনে পড়ে। এই ফ্ল্যাসব্যাকের ব্যাপারটি অতি পুরোনো হয়ে গেছে। সীতা দাদার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ট্রেনে উঠলো সেই দৃশ্যেই ছবিটি শেষ হলে আমার মনে হয় বেশ ভাল হোতো। কিন্তু বর্ত্তমানে ছবিটি যে দৃশ্যে শেষ হয়েছে তা অত্যন্ত হাস্যকর।

আর একটা কথা—রবীন্দ্রসঙ্গীত না দিলে ছবির দর্শক জোটে না, এটাই কি ছবির মালিকদের ধারণা? দেখলাম, কানন দেবী ও সব্যসাচীও সেই অহেতুক মোহ কাটাতে পারেন নি। জ্যাঠামশায় ও বাবার বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করে খাওয়ানোর দৃশ্যে 'হাবে রে-রে' গানটির সার্থকতা বুঝতে পারলাম না। আজকাল বেশীর ভাগ ছবিতেই রবীন্দ্রসঙ্গীত নির্ব্বাচনের দিকে কারুর দৃষ্টি থাকে না দেখতে পাওয়া যায়। ছবির কাহিনীর স্থানকালপাত্রের সঙ্গে যে এই সঙ্গীতগুলির একটা সম্পর্ক থাকা প্রয়োজন সে বিষয় তাঁদের হুঁস থাকে না কেন? ইতি—

রেবা বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, টালীগঞ্জ

* * *

কানন দেবী প্রযোজিত শ্রীমতী পিকচার্সের 'অনন্যা' ছবিখানা আমার কাছে ভালই লেগেছে তবে কয়েকটা জায়গা আমার দৃষ্টিকটু ঠেকেছে সেইগুলো আপনাকে জানাবো। জানিনা আমার সাথে আপনি একমত হ'তে পারবেন কিনা!

কানন দেবীর বিভিন্ন বয়সের বিভিন্ন চেহারা সত্যিই

মেক্-আপের গুণে সুন্দর দেখিয়েছে! অন্য চরিত্রগুলোও তাই। ছোট সীতার অভিনয় সুন্দর হ'য়েছে। সীতাকে যেমন ছোট থেকে বড় দেখানো হ'য়েছে তেমনি উমাকেও দেখানো উচিত ছিল। সীতা যখন শিশু উমাকে নিয়ে আদর করছিলেন তখন উমার পরণে একটা ছিটের প্যান্ট্ ছিল এবং যখন দয়াল ভৃত্য এসে সীতার বাবার অসুস্থতার সংবাদ দিল তখন সীতা উমাকে দয়ালের কোলে দিয়ে অসুস্থ বাবাকে দেখতে গেলো—তখন দেখা গেলো উমার পরণে প্যান্ট্‌টা নেই।

যখন ডাক্তার সীতা ও উমাকে বাড়ী থেকে বার ক'রে দিলেন তখন ডাক্তারের নির্বোধ ভাই কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল—সীতার কি উচিত ছিল না যে যাবার সময় স্বামীকে প্রণাম ক'রে বিদায় চাওয়া? স্বামীকে প্রণাম করার প্রথা পুরাকাল থেকেই চ'লে আস্‌ছে বাঙ্গালীর মধ্যে।

বিমান ব্যানার্জির প্রতিটি অভিনয়ই ভয়গ্রস্ত হয়। পূর্ণেন্দু মুখার্জির অভিনয় ভালই হ'য়েছে! ফণী রায়ের দাঁতখিঁচুনি সত্যিই আর ভালো লাগে না! বিপিন গুপ্তের অভিনয়ও ভালই হ'য়েছে! কানন দেবী সকলকেই খুসী ক'রেছেন! রেবা দেবী বোধ হয় ঐ সব পার্টেই ওস্তাদ! তিনিও বেশ অভিনয় ক'রেছেন! ইতি—

শ্রীঅনিল দত্ত, সোদপুর, ২৪-পরগণা।

বহুব্রীহি

সবিনয় নিবেদন,

১লা এপ্রিল 'বহুব্রীহি' ছবিখানি দেখে এলাম। বিশ্বাস করুন, একেবারে এপ্রিল ফুল হয়ে বাড়ি ফিরেছি। বাজে পয়সা খরচ হয়ে যাওয়ার শোক কিছুতেই ভুলতে পারছি না। তাই একটু কাগজে কলমে চীৎকার করার চেষ্টা করছি। আশা আছে ছাপার হরফে নিজের নামটা দেখতে পেলে সে শোকটা ভুলতে পারবো। ছবিখানির আগাগোড়া জলধরবাবুর মস্তিষ্কবিকৃতির পরিচয়। সেন্সারের কর্তারা কি সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বার বন্ধ করে ছবি দেখতে বসেছিলেন? নায়ক নায়িকার প্রেমদৃশ্যের বর্ণনা যেভাবে একটি ছোট্ট মেয়েকে দিয়ে তার বাপমায়ের সামনে বলানো হয়েছে—তা কোন্ সভ্য সমাজে চলে জলধরবাবুকে জিগ্যেস করতে পারি কি? ছবি দেখে শুধু এই কথা মনে হয়েছে যে একদল জীব পরিচালকের হাতে নোংরা ভাঁড়ামি করছে। আপনারা ত মাঝে মাঝে খুব বলেন অমুক অমুক ছবি চিত্রগৃহের অভাবে মুক্তি পাচ্ছে না, সেক্ষেত্রে চিত্ররাজ্যের এমন জঞ্জাল মুক্তি পাবার ছাড়পত্র পায় কি করে? 'খিড়কি' ছবি দেখে যাঁরা গালাগালি দেন তাঁদের প্রতি কোনরূপ কটাক্ষপাত না করেই জানতে ইচ্ছা হচ্ছে 'বহুব্রীহি' ছবির এবং তার পরিচালকমণ্ডলীর কি শাস্তি হওয়া উচিত? আশা করি আমার তিক্ত মতামতটি ছাপাবেন। শ্রদ্ধা গ্রহণ করবেন। ইতি—

নিবেদক

ধীরেন ঘটক, ডায়মণ্ডহারবার।

বিদুষী ভার্য্যা

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

আমি আপনার কাগজের নিয়মিত পাঠক। এখানে 'নতুন থিয়েটারে' একখানি নতুন ছবি দেখলাম, তার নাম 'বিদুষী ভার্য্যা'। ছবির গানগুলি বেশ ভাল লাগলো, কিন্তু গল্পটা যেন কি একরকম, তাই বলে অবশ্য বলছি না আজগুবি। তবে কতকগুলি দৃশ্য বড় অস্বাভাবিক লাগলো। যেমন ধরুন পাড়াগাঁয়ের ছেলেরা নায়িকার অটোগ্রাফ নেবার জন্যে ভীড় করে এসে দাঁড়িয়েছে। দিবাকর তিনবার ম্যাট্রিক ফেল করেছে এটা না হয় মানলাম কিন্তু ম্যাট্রিক ফেল্ করলেই যে সে কোন সভায় গিয়ে রা কাড়তে পারবে না এটা কি স্বতঃসিদ্ধ? ট্রেণের দৃশ্যটিতে পরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মলয়া সরকারের অভিনয় ভারী সুন্দর। ছবির শেষ দৃশ্যটি বিশ্রীরকম বেখাপ্পা। বিদুষী ভার্য্যা নিয়ে দিবাকরের ফ্যাসাদে পড়ার দিকেই পরিচালক খুব বেশী দৃষ্টি রেখেছিলেন, বলেই এইগুলি তাঁর নজর এড়িয়ে গেছে বলে মনে হয়। নমস্কার। ইতি—

মনিরুজ্জামান মজুমদার, ঢাকা।

ছায়াছবির গল্প

হেরফের

[সাহিত্যক্ষেত্রে কথাশিল্পী চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। তাঁর রচনার মধ্যে এক সময় যে বিপ্লবের সুর ধ্বনিত হয়েছিল, অতি সহজেই তা পাঠকচিত্ত জয় করেছিল। তাঁর রচনাবলীর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—'হেরফের', 'দোটানা', 'মুক্তিস্নান', 'চোরকাঁটা', 'পরগাছা', 'স্রোতের ফুল' প্রভৃতি। 'মুক্তিস্নান' ইতিপূর্ব্বেই চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়েছে। সম্প্রতি 'হেরফের' উপন্যাসখানিও ছায়াছবিতে রূপান্তরিত হয়ে শুভ উদ্বোধনের দিন গুণছে। ছায়াছবির কৌতূহলী দর্শকদের কাছে আমরা তাই আগে থাকতেই 'হেরফের' উপন্যাসের মূল বিষয়বস্তু সংক্ষেপে বিবৃত করছি। এই ছবিখানি তুলেছেন 'চিত্রপ্রতিষ্ঠান লিমিটেড'। আর এর একটি বিশিষ্ট স্ত্রীভূমিকায় অভিনয় করেছেন—শ্রীমতী চন্দ্রাবতী।

—'চিত্রবাণী' সম্পাদক]

তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র রজত যে শুধু বড়লোকের ছেলে বলেই সহপাঠীদের কাছে পরিচিত তা নয়, তার আমুদে অমায়িক স্বভাব, সরস বচনবিন্যাস, আর ব্যবহারে গর্ব-লেশশূন্যতা ও তার লেখাপড়ার কৃতিত্ব তাকে সতীর্থমহলে বিশেষ প্রিয় করে তুলেছিল। তার আরও একটি গুণ ছিল। সে বেশ ভালো কবিতা ও গল্প লিখতে পারতো। মাসিক পত্রিকাতেও তার রচনা ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়ে খ্যাতি অর্জন করেছে। কাজেই ছাত্রমহলে রজত যে বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে উঠবে সে-কথা বলাই বাহুল্য।

এহেন রজতের সঙ্গে বন্ধুত্ব হলো ক্লাসের সবচেয়ে দরিদ্র ছেলে শিশিরের। শিশির লোকের সঙ্গে মিশ... কথা ব'লত অল্প, পাছে তার দারিদ্র্যের গর্ব ... আঘাতে কোথাও আহত হয়। সব চেয়ে সে ... চল্‌তো রজতকে—রজত যে তার একেবারে ... উল্টো অবস্থার লোক! রজত যেমন ধনশালিতার ... মূর্ত্তিমান, শিশির তেমনি দারিদ্র্যের রিক্ততার প্রতি... অথচ, ঘটনাচক্রে দু'জনের বন্ধুত্ব হলো। রজত... আন্তরিকতায় শিশির মুগ্ধ হয়েছিল।

কলেজের ছুটির পর শিশিরের সঙ্গে তার মেসে ... রজত। নিজের চোখে দেখে শিশিরের দৈন্য, ... অধ্যবসায়। মনে মনে তার অসীম করুণা জাগে শিশিরের প্রতি। শিশিরের দুঃখ ও দারিদ্র্য দূর করবার এক... অটুট সংকল্প করে সে নিজের মনে। তারপর বন্ধুকে এক... রকম জোর করেই নিয়ে যায় তার বাড়িতে।

মায়ের দিকে তাকিয়ে রজত বলে—মা, এ শিশির... আমার বন্ধু। আমরা একসঙ্গে পড়ি। রজতের ... সুনয়নী শিশিরের দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারলেন, সে ... দরিদ্র। তার বেশ ও ভূষা নয়, তা যেন দারিদ্র্যের নি... নিশান। তিনি মমতায় দ্রব হয়ে বাৎসল্য রসে অভিষি... কোমল স্বরে বল্‌লেন—এস বাবা, এস। বৌমা, শিশিরকে বসতে আসন দাও।

এই ভাবে রজতের মা সুনয়নী আর স্ত্রী সন্ধ্যার সঙ্গে শিশিরের প্রথম পরিচয় হয়। শিশির লক্ষ্য করে, রজতদের সংসারে কি অনাবিল আনন্দ; মা ও ছেলে, শাশুড়ী ও পুত্রবধূ, স্বামী ও স্ত্রী—এদের সম্পর্ক কি মধুর। এদের তিনজনের কাছ থেকে শিশির যে প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার পেল, তার কাছে তা যেমন আনন্দের, তেমনি সৌভাগ্যের।

শিশিরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা দৃঢ় করবার জন্যে রজত তা... মার কাছে এক প্রস্তাব করে। বলে—শিশির রো... সন্ধ্যাকে পড়াক্। এই প্রস্তাবের মূলে ছিল দরিদ্র বন্ধু... সাহায্য করা। সুনয়নী সানন্দে মত দেন পুত্রের ... শিশির বলে—এখন তবে যাই ভাই।

রজত বলে—যাই বল্‌তে নেই, আসি বল। আজ তোমার পুরোনো টিউশানিতে জবাব দিয়ে এসো। কাল সন্ধ্যা থেকেই তুমি সন্ধ্যার শিশির।

শিশির গম্ভীর হয়ে বলে—ছাখো রজত, ও-রকম ঠাট্টা করাও ভালো না। তুমি বৌদির জন্যে অন্য মাষ্টার রাখো; আমার মতন অল্প বয়সের অবিবাহিত ছোকরাকে ঐ ভার দিয়ো না; তুমি আমার কিই বা পরিচয় জানো বা পেয়েছো?

রজত হাসিমুখে জবাব দেয়—তোমার সম্বন্ধে জানি এই যে, তুমি ভদ্রলোক, শিক্ষিত; তুমি আমারই মার ছেলে, আমার ভাই; কালিদাসের কাছে শুনেছি, তুমি কি রকম পিউরিটান নীরস লোক। আর, সন্ধ্যার সম্বন্ধে জানি এই যে, সে আমার স্ত্রী, আমি তাকে ভালোবাসি, সে আমাকে ভালোবাসে। সুতরাং তুমিই তার শিক্ষক হবে, গুরুমশায় হয়ে নয়, তার ঠাকুরপো হয়ে।

রজতের জবাব শুনে শিশির খুশি মনে বিদায় নেয়।

মেসে গিয়ে বন্ধু কালিদাসের কাছে অন্তরের উচ্ছ্বাস ব্যক্ত করে শিশির বলে—আমার ভাগ্য ভালো যে, তোমাকে আর রজতকে বন্ধু পেলাম। রজতরা বড়লোক বটে, কিন্তু বড় ভালো লোক। মা তো মাতৃস্নেহের প্রতিমূর্তি।... মা যে কি জিনিস তা তো আমি কখনো ভালো করে জানিনি। মায়ের যত্ন যে কেমন তা আজ টের পেয়েছি।

সন্ধ্যার গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হওয়ায় রজতদের বাড়িতে শিশিরের এক বেলাকার খাওয়া রোজ বরাদ্দ হয়ে গেল। শিশিরের কোনো সঙ্কোচই টিঁকত না সুনয়নী ও সন্ধ্যার কাছে। শিশির ক্রমশঃ রজতদের পরিবারেরই একজন হয়ে উঠ্‌লো।

একদিন তার জীবনের কাহিনী বলতে গিয়ে শিশির জানালো তার অতীত জীবনের সমস্ত দুঃখ সুখের কথা। ছেলেবেলায় তার বাবা তাকে এক ধনী গৃহস্থের কাছে পোষ্যপুত্ররূপে বিক্রয় করেন। সেই থেকে সে ঐশ্বর্য্য-সুখে লালিত-পালিত হতে থাকে। তার পালিকা মাতা মাতঙ্গিনী দেবী তাকে আদর করতে চাইতেন, কিন্তু সে আদরের মধ্যে কোনো আন্তরিকতা ছিল না। তারপর বৃদ্ধ বয়সে যখন নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁর এক ছেলে হলো, তখন থেকে তিনি সম্পূর্ণ বদলে গেলেন। মাতঙ্গিনী দেবীর স্বামীর মৃত্যুর পূর্বে এক উইল করে যান। তাতে তাঁর বিরাট সম্পত্তির কিছু অংশ শিশিরকেও দিয়ে যান পোষ্যপুত্র হিসাবে। কিন্তু মাতঙ্গিনী দেবীর ব্যবহার দিন দিন শিশিরকে এমন ভাবে পীড়িত করতে থাকে যে, শিশির নিজের সমস্ত অংশ তাঁর ছেলে দুলালকে দিয়ে এক কাপড়ে ও খালি পায়ে ক'লকাতা অভিমুখে যাত্রা করে। ইতিমধ্যে শিশিরের মা-বাবাও মারা গেছেন। শিশির তখন এফ-এ পরীক্ষায় স্কলারশিপ নিয়ে পাশ করেছে। এতদিন সেই স্কলারশিপের টাকা দিয়েই সে পড়াশোনা করে আসছিল। তারপর একদিন ভগবানের আশীর্বাদের মতো রজতের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হলো। শিশিরের এই আত্মকাহিনী রজত, সুনয়নী, সন্ধ্যা তিনজনকেই ব্যথিত করে তোলে।

সন্ধ্যাকে রোজ পড়াতে আসে শিশির। নিজের ভাইয়ের মতো সন্ধ্যা ভালোবাসে শিশিরকে, শ্রদ্ধা করে তার পাণ্ডিত্যকে, মুগ্ধ হয় তার সহজ, সরল, মধুর ব্যবহারে।

সন্ধ্যার প্রীতি ও শুভেচ্ছাকে শিশির তার জীবনের সান্ত্বনা বলে মনে করে।

এই সময় রজতদের বাড়িতে বিদ্যুৎ বলে একটি মেয়ের সঙ্গে শিশিরের পরিচয় হয়। মেয়েটি সন্ধ্যার সহপাঠিনী। মাঝে মাঝে সে আসে সন্ধ্যাকে গান-বাজনা শেখাতে। মেয়েটি গাইতে পারে যেমন সুন্দর, তার বাজনাও তেমনি মধুর। সন্ধ্যা—বিদ্যুৎকে পরিচয় করিয়ে দেয় শিশিরের সঙ্গে। প্রথম পরিচয়ের আড়ষ্টতা ক্রমশঃ সহজ হয়ে আসে। মনে মনে বিদ্যুৎ ও শিশির বোধ হয় পরস্পরের কাছে ধরা দেয়।

শিশিরের আরও অনেকগুলি গুণ ক্রমশঃ প্রকাশিত হয়ে পড়ে রজতদের বাড়িতে। শিশির ভালো গাইতে পারে, বাজাতেও সে ওস্তাদ। সাহিত্যচর্চাও করে সে

চিত্রবাণী

গোপনে। শিশিরের এই বহুমুখী প্রতিভাতে সন্ধ্যা ও বিদ্যুৎ আন্তরিকভাবে খুশি হয়। সুনয়নীও আনন্দিত হন মনে মনে।

কিন্তু রজতের যেন কেমন ভাবান্তর দেখা দেয় দিন দিন।

রজতের মনে বরাবরই একটা প্রচ্ছন্ন আত্মপ্রসাদ ছিল—দরিদ্র বন্ধুকে সাহায্য করার জন্যে। কিন্তু সাহিত্যের দিক থেকে সেই বন্ধু যখন তাকে পরাজিত করবার উপক্রম করলো—তখন সে আর সহ্য করতে পারলো না। মা ও স্ত্রীর কাছে সে দেখাতে লাগলো যে, শিশিরকে সে আগের মতই ভালোবাসে; কিন্তু গোপনে গোপনে সে শিশিরের সাহিত্যিক-সুনাম খর্ব করার চেষ্টা করলো। রজতের এই দ্বিমুখী ব্যবহার ক্রমশঃ সন্ধ্যা, সুনয়নী ও বিদ্যুতের কাছে ধরা পড়লো। শিশিরও বুঝতে পারলো সব।

ক্রমশঃ আনন্দপুরীতে নিরানন্দ দেখা দিল। সন্ধ্যা চিঠি লিখলো শিশিরকে।—ঠাকুরপো! যে সব অক্ষম আপনার উন্নত শির যশের ধ্বজাকে ধুলায় পাড়বার চেষ্টা করছে, তারা নিজেরাই ধূলিমলিন হয়ে নিজেদের অক্ষমতারই পরিচয় দিচ্ছে। আপনি তেজস্বী ভাস্কর, ধুলা উড়িয়ে সেই ভাস্বরতা আবৃত করবার দুরাশা যাদের, দুর্দশা তাদেরই। আপনি এই অবোধ অক্ষমদের প্রসন্ন মনেই ক্ষমা করতে পারছেন এই ওদের সর্বাধিক পরাজয়।—ব্যথিতা বৌদিদি।

শিশিরকে সুনয়নীও চিঠি লিখলেন।—বাবা, আমার গর্ভজাত সন্তানের অপকার্য্যের লজ্জা আমার স্নেহজাত পুত্রের মহত্বের গৌরবেই আমি এখনো বহন করতে পারছি।—তোমার মা।

শিশিরের মনে রজতের কদর্য আচরণ যে বিরক্তি ও গ্লানির সঞ্চার করেছিল সন্ধ্যা ও সুনয়নীর এই চিঠিতে তা নিঃশেষে ধুয়ে মুছে গেল।

এদিকে শিশির ও বিদ্যুতের সম্পর্ক ক্রমশঃ নিকটতর হতে লাগলো। দু'জনের বিয়ে হলে খুব ভালো হয়—এই অভিমত প্রকাশ করলো সন্ধ্যা। সুনয়নীও তাতে [illegible] দিলেন সানন্দে। বিদ্যুতের মা ক্ষণপ্রভারও ইচ্ছা ছিল তা[illegible]

কিন্তু অদৃষ্টদেবতা বিদ্যুতের ভাগ্যের প্রতি শয়নিক্ষেপ করলেন অতর্কিতে। বিদ্যুৎ একদিন তার মা-কে আবিষ্কার করলো নূতন মূর্তিতে—অনভিপ্রেত কদর্য পরিবেশের মধ্যে। শিশিরের কাছে ছুটে গেল সে। দুই চোখে তার অশ্রুধারা।

শিশির বিদ্যুতের দুই হাত চেপে ধরে পরম স্নেহসিক্ত সান্ত্বনার স্বরে ব'ললে—কি হয়েছে বিদ্যুৎ আমায় বল।

বিদ্যুৎ হাত ছাড়িয়ে শিশিরের হাতের মধ্যে বন্দী নিজের হাতের মধ্যে মুখ ঢাকবার চেষ্টা ক'রে বললো—না না, সে আমি বলতে পারব না। আমি বড় হতভাগিনী। সে কথা শুনলে আপনি শুদ্ধ আমায় ঘৃণা করবেন।

ক্রমশঃ সব জানা গেল। ক্ষণপ্রভা আত্মহত্যা করলো। তার আগে সে একখানা চিঠি দিয়ে যায় শিশিরকে। বিদ্যুতের সামনে সেই চিঠি পড়ে শিশির জানতে পারে—বিদ্যুৎ এক পতিতা নারীর কন্যা। ক্ষণপ্রভার জীবন সে পঙ্কিলতায় ভরা। কিন্তু বিদ্যুতের সমগ্র জীবনকে সে চির পবিত্র করে রেখে গেছে। পঙ্কের মধ্যে ডুবেও ক্ষণপ্রভা তার মেয়ের গায়ে এতটুকু কালিমা লাগতে দেয়নি। ক্ষণপ্রভা তার সমস্ত ঐশ্বর্য একমাত্র বিদ্যুৎকে দিয়ে গেছে।

বিদ্যুৎ শিশিরের দিকে তাকিয়ে বললে—কলেজের [illegible] আমাকে একটি চাকরি জোগাড় করে দিয়েছেন, আমি কালই শিলং যাচ্ছি।

শিলং যাবার আগে বিদ্যুৎ তার মায়ের লক্ষাধিক টাকার সম্পত্তি বিধবাদের সাহায্যে দান করে গেল। বিদ্যুতের নাম ছড়িয়ে পড়লো দেশময়। রজত কিন্তু এই সুযোগে রটিয়ে বেড়াতে লাগলো যে, ক্ষণপ্রভা বাঈজীর মেয়ে বিদ্যুৎ শিশিরের প্রণয়িনী। বিদ্যুতের পরিচয়ে রজত শিশিরকে লোকচক্ষুর কাছে হেয় প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করলো।

পুত্রের এই ব্যবহারে মর্মাহত হলেন সুনয়নী। স্বামীর এই নিষ্ঠুর আচরণে নিদারুণ আঘাত পেল সন্ধ্যা।

চিত্রবাণী

শিশির বুঝলো তাঁদের অন্তরের বেদনা। কিন্তু রজতের প্রতি তার অভিমান তখন দুর্ভেদ্য প্রাচীরের মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিদ্যুৎকে সাহায্য করবার জন্যে শিশির এক সময় রজতের কাছে হ্যাণ্ডনোট রেখে পাঁচশ টাকা ধার নেয়। সেই সূত্র ধরে রজত পাছে শিশিরকে বিপদে ফেলে, তাই সুনয়নী ও সন্ধ্যা উভয়েই গোপনে শিশিরকে পাঁচশ ক'রে টাকা পাঠিয়ে দেন। এই দু'টি নারীর প্রতি কৃতজ্ঞতায় শিশিরের মাথা নত হয়ে আসে।

ওদিকে শিলং থেকে বিদ্যুৎ-ও শিশিরকে টাকা পাঠিয়ে চিঠি লেখে—শ্রদ্ধাস্পদেষু, চাকরী নিয়ে অবধি টাকা জমাচ্ছিলাম, কবে আপনাকে ঋণমুক্ত করতে পারব ···তুচ্ছ টাকা কটাই শোধ করতে পারলাম, কৃতজ্ঞতার ঋণ শোধ করি এমন সাধ্য এই অক্ষমার নেই।—বিদ্যুৎ।

এর পরের ঘটনা বিদ্যুতের সঙ্গে শিশিরের মিলন। সে মিলন বড় মধুময়। কলকাতা থেকে শিশিরের বন্ধু কালিদাস হাজির হলো সেই মিলন উৎসবে। সেই সঙ্গে সন্ধ্যা পাঠিয়েছে তার প্রীতির অর্ঘ্য, আর সুনয়নী জানিয়েছেন তাঁর অন্তরের স্নেহাশীর্বাদ—শিশির আর বিদ্যুতের কাছে যার চেয়ে আর কাম্য নেই।

শিশির তাই বিদ্যুতের দিকে তাকিয়ে বলে—মা, বৌদি আর কালিদাসের শুভকামনা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ফিরছে। এই সৌভাগ্যই আমাদের সংসারযাত্রার পরম পাথেয়।

সদ্য প্রদর্শিত 'গজরে' ছবিতে সুরাইয়া ও মতিলাল

অভিনয়শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ

মনোজিৎ বসু এম এ

জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-বাড়ি এক সময় ছিল সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত, অভিনয়, সব রকম শিল্পকলার প্রধান কেন্দ্র। বাঙলাদেশে আধুনিক শিল্পকলার প্রচারে এই ঠাকুর-বাড়ি-ই বিখ্যাত হয়ে রয়েছে। অবনীন্দ্রনাথ ছেলেবেলা থেকে সেই সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত, অভিনয়ের আবহাওয়ার মধ্যেই মানুষ। তাই বোধ হয়, ভবিষ্যতে শিল্পকলার প্রায় প্রত্যেক দিকেই তিনি কৃতিত্ব দেখাতে পেরেছেন।

রবীন্দ্রনাথের নাটকই অভিনয় হ'তো সেকালকার ঠাকুরবাড়িতে। সে-সব নাটকের অভিনয় যারা দেখেছেন তাঁরাই বলেন সে-রকম নাটক আর হয় না। তার প্রধান কারণ ছিল, রবীন্দ্রনাথের নাটকের বিষয় থাকতো সাধারণ-নাটক থেকে ভিন্ন ধরণের, তাছাড়া ঠাকুরবাড়ির ছেলেরা যারা তাতে অভিনয় করতেন, তাঁদের প্রত্যেকের অভিনয় হ'তো নিখুঁত, পাকা-অভিনেতার মত। আর থাকতো অভিনয়-মঞ্চের অপূর্ব দৃশ্য-সজ্জা।

ঠাকুরবাড়ির ছেলেরা মিলে একটা ড্রামাটিক ক্লাব তৈরী করেছিলেন এক সময়। অবনীন্দ্রনাথ-ই ছিলেন তার মধ্যে একজন বড় রকমের উদ্যোক্তা আর উৎসাহী সভ্য। সেই ক্লাবে একবার ঠিক হ'লো রবীন্দ্রনাথের "বৌঠাকুরাণীর হাট" থেকে তাঁরা একটা নাটক খাড়া করবেন। রবীন্দ্রনাথ তখন বাইরে ছিলেন। ফিরে এসে দেখলেন 'বৌঠাকুরাণীর হাট' নাটকে রূপান্তরিত হচ্ছে। তিনি তখন নিজের হাতে নিলেন নাটক তৈরার ভার। সেই হ'লো—'বিসর্জন'।

অবনীন্দ্রনাথ হাসির ভূমিকায় অভিনয় করতেই বেশি ভালবাসতেন। সে-সব ভূমিকায় তিনি যা অভিনয়ের পরিচয় দিয়েছেন, আর তা কেউ করতে পারেনি এ পর্যন্ত। এমনি ছিল তাঁর অভিনয় করবার ক্ষমতা।

একবার তাঁকে এক ঘরোয়া বৈঠকে প্রশ্ন করা হলো—"আচ্ছা, কার কাছ থেকে আপনি অভিনয় করা শিখতেন?" প্রশ্ন শুনে তিনি হেসে জবাব দিয়েছিলেন—

—"ছেলেবেলায় আমাদের বাড়িতে গানবাজনা, অভিনয় তো লেগেই থাকতো, সেখানে আবার শিখবো কি? গান শুনে অমনি গানের সুর তুলে নিতুম। ঠিক হ'তো কি না বলতে পারি না। অভিনয়-ও সব দেখে দেখে শিখেছি, কেউ শিখিয়ে দেয়নি।...আমি চিরকালই কমিক-পার্ট করতে ভালোবাসতুম, রাজাগোজার পার্ট করিনি কোনদিন।"

"বৈকুণ্ঠের খাতা," "ফাল্গুনী," "ডাকঘর" প্রভৃতি নাটকে অবনীন্দ্রনাথের অভিনয় যারা দেখেছেন তাঁরা সে অভিনয়ের কথা ভুলবেন না কোনদিন।

"বৈকুণ্ঠের খাতা"য় তিনি সেজেছিলেন তিনকড়ি। যেমনি হয়েছিল সে অভিনয়, তেমনি হয়েছিল তাঁর রূপসজ্জা। বেশভূষার দিক থেকে অভিনয়ের চরিত্র যাতে নিখুঁতভাবে ফুটে ওঠে সেদিকে তার নজর ছিল খুব। ছেঁড়া সার্টের ওপর পানের পিক লাগিয়ে তিনি যখন তিনকড়িরূপে মঞ্চে দেখা দিলেন তখন সবাই অবাক হয়ে চেয়েছিলেন তাঁর দিকে। তাঁর সেই অদ্ভুত সাজ দেখে তাঁর মা তাঁকে বলেছিলেন, "তুই এমন একটা হতভাগা বেশ কোত্থেকে পেলি বলতো?"

এই 'তিনকড়ি'র প্রসঙ্গে এক জায়গায় তিনি বলেছেন—"রবিকা যে বৈকুণ্ঠের খাতায় তিনকড়ির মুখ দিয়ে আমাকে বলিয়েছিলেন 'জন্মে অবধি আমার জন্যেও কেউ ভাবেনি, আমিও কারো জন্যে ভাবতে শিখিনি,' এই হচ্ছে আমার সত্যিকারের রূপ। রবিকা আমাকে ঠিক ধরেছিলেন, তাই তো তিনকড়ির পার্ট অমন আশ্চর্য রকম মিলে গিয়েছিল আমার চরিত্রের সঙ্গে। ও সব

করে হয় না। করুক তো আর কেউ তিনকড়ির পার্ট আমার মত হবে না। ওই তিনকড়িই হচ্ছে আমার আসলরূপ।

'ফাল্গুনী' নাটকে তিনি হয়েছিলেন শ্রুতিভূষণ। হাতে বাঁকা লাঠি, বগলে ছাতা, গায়ে নামাবলী, পায়ে ঠনঠনে চটি, তাঁর সেই 'শ্রুতিভূষণে'র ছবি প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায় সাময়িক কাগজে। তাঁর সঙ্গে অভিনয় করেছিলেন তাঁর বড় দু'ভাই গগনেন্দ্রনাথ আর সমরেন্দ্রনাথ। প্রত্যেকের অভিনয় হয়েছিল সুন্দর ও নিখুঁত। আর অবনীন্দ্রনাথের তো কথাই নেই। তাঁর চলায়, বলায়, রূপ-সজ্জায় প্রেক্ষাগৃহে হাসির রোল বয়ে গিয়েছিল।

'ডাকঘরে'র মোড়ল সেজেছিলেন অবনঠাকুর। সে রকম মোড়লি পাঠ আর কেউ করতে পারেনি এ পর্যন্ত। মোড়লের সেই বাঁকা বাঁকা কথা অবিশ্বাসের বিদ্রূপের হাসি, তাঁর অভিনয়ে চমৎকার ফুটেছিল।

১৯১৭ সালের ডিসেম্বর মাসে যেবারে মিসেস এ্যানি বেসান্তের সভানেতৃত্বে কলকাতায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন বসে, সেবারই জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ 'ডাকঘর' অভিনয়ের আয়োজন করেন। রাজনীতিক নেতাদের সামনে সেই অভিনয় হয়। মিসেস বেসান্ত সেই অভিনয় দেখে প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন। সকলেই একবাক্যে বলেন এমন অভিনয় যে হতে পারে, এ ছিল কল্পনার বাইরে। শেষদৃশ্যে সবার চোখেই জল এসে গিয়েছিল।

'ডাকঘরে'র সেই অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, রথীন্দ্রনাথ পর্যন্ত অভিনয় করেছিলেন। অবনীন্দ্রনাথের নির্দেশে সেই নাটকের যে অপরূপ মঞ্চসজ্জা হয়েছিল, তার কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

ছেলেবেলা থেকেই অভিনয়ের দিকে অবনীন্দ্রনাথের ছিল একটা ঝোঁক। গুরুগম্ভীর পার্ট এড়িয়ে চলতেন সব সময়। নিজে প্রাণখোলা আমুদে মানুষ, তাই বোধ হয় হাসির পার্ট তাঁকে বেশি আকর্ষণ করতো। অল্পবয়সে একবার তিনি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের লেখা 'অলীকবাবু' নাটকে 'ব্রজদুর্লভ' সেজে যা অভিনয় করেছিলেন, তা দেখে সবাই সেদিন বুঝতে পেরেছিল যে, ভবিষ্যতে অবনীন্দ্রনাথ একজন সুদক্ষ অভিনেতা হ'তে পারবেন। হয়েছিলও তাই।

বিখ্যাত নাট্যকার ও অভিনেতা গিরিশ ঘোষ একবার তাঁর তিনকড়ির পার্ট দেখে বলেছিলেন—"এরকম অ্যাকটর সব যদি আমার হাতে পেতুম, তবে আগুন ছুটিয়ে দিতে পারতুম।"

শুধু অভিনয় নয়, অভিনয় সংক্রান্ত প্রায় সব দিকেই ছিল তাঁর দক্ষতা। রঙ্গমঞ্চের আধুনিক রূপসৃষ্টি তাঁর কল্পনা থেকেই একদিন দেখা দিয়েছিল। পেশাদার রঙ্গমঞ্চের গলদত্রুটির কথা তিনি বলেছেন বহু লোককে, চোখে আঙুল দিয়ে ধরিয়ে দিয়েছেন তা। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ একবার লেডী ল্যান্সডাউনকে অভ্যর্থনা করেন। সেই উপলক্ষে 'বাল্মীকির প্রতিভা' নাটকের অভিনয় হয়। অবনীন্দ্রনাথের উপর ভার পড়েছিল রঙ্গমঞ্চ তৈরী করবার, সেই সঙ্গে পোষাক-পরিচ্ছদ পরিকল্পনা করবারও। অবনীন্দ্রনাথের সেই হয়েছিল রঙ্গমঞ্চসজ্জার হাতেখড়ি। কিন্তু তাঁর পরিকল্পনায় অভিনেতাদের সাজসজ্জা থেকে আরম্ভ ক'রে দৃশ্যপট পর্যন্ত সব কিছুতে তাঁর মুন্সীয়ানাই ফুটে উঠেছিল সেদিন।

অভিনয়ের দিক থেকে অবনীন্দ্রনাথের যেমন দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়, বাজনার দিক থেকেও তেমনি তাঁর নৈপুণ্যের পরিচয় পেয়ে আমরা অবাক হয়ে যাই। ভাবি, একটা মানুষের মধ্যে এত নৈপুণ্য এলো কোথা থেকে।

এস্রাজ বাজাতে অবনীন্দ্রনাথ একদিন ছিলেন ওস্তাদ। রবীন্দ্রনাথের গানের সঙ্গে তিনি প্রায়ই এস্রাজে সঙ্গৎ করতেন। যাঁরা তাঁর এসরাজ বাজানো শুনেছেন তাঁরা বলেন—অবনঠাকুর পাকা বাজিয়ে। সে-কথা মোটেই বাড়িয়ে বলা নয়, খাঁটি সত্যি। রবীন্দ্রনাথ যখন নতুন নতুন গানের নতুন নতুন সুর সৃষ্টি করতেন, অবনীন্দ্রনাথ তখন সেই নতুন সুর ধরতেন তাঁর এস্রাজে।

[লেখকের 'অবনীন্দ্রনাথ' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত।]

নতুন ছবি

অনন্যা

প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী কানন দেবীর নিজস্ব চিত্র প্রতিষ্ঠান 'শ্রীমতী পিক্‌চার্সে'র' প্রথম ছবি 'অনন্যা'র মধ্যে প্রথম শ্রেণীর ছায়াছবির বহু গুণ থাকা সত্ত্বেও ছবিখানি সার্থকতা লাভ করতে পারেনি।

কানন দেবীর মতো অভিনেত্রী, বিনয় চট্টোপাধ্যায়ের চিত্রনাট্য ও সংলাপ এবং অজয় করের মতো চিত্রশিল্পী থাকা সত্ত্বেও 'অনন্যা' দর্শক সাধারণের উচ্ছ্বসিত প্রশংসার চন্দন তিলকে অভিষিক্ত হ'তে পারলো না। 'অনন্যা'র পরিচালক 'সব্যসাচী' পরিচালক হিসাবে নবাগত, তাঁর মধ্যে কাহিনীকে রসসমৃদ্ধ এবং জমাট করার কোনো শক্তি ও নিপুণতার পরিচয় আমরা পেলাম না। 'অনন্যা'র আলোকচিত্র পরিচালনায় খ্যাতনামা আলোকচিত্রশিল্পী অজয় কর অপূর্ব কৃতিত্ব দেখিয়েছেন! সুরশিল্পী দ্বিজেন চৌধুরীর তত্ত্বাবধানে ও কানন দেবীর সুমিষ্ট কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতগুলি পরম উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। আর, অভিনয়ের দিক থেকে কোনো শিল্পী-ই নিন্দনীয় অভিনয় করেননি। কিন্তু তা সত্ত্বেও 'অনন্যা' কেন প্রথম শ্রেণীর সার্থক ছায়াছবির ছাড়পত্র লাভে বঞ্চিত হলো সেই হলো আমাদের আলোচনার বিষয়। 'অনন্যা'র এই অসার্থকতার জন্য প্রধানত দায়ী এর কাহিনী ও চিত্রনাট্য।

শিল্পী সমরেন্দ্রনাথ ছেলে দেবকুমার আর মেয়ে সীতাকে নিয়ে গঙ্গার ধারে বিরাট এক অট্টালিকায় বাস করেন। মা-হারা ছেলেমেয়ে দু'টি তাঁর অগাধ স্নেহে মানুষ হয়ে উঠেছে। সীতা যেমন গানে, বাজনায় আর ছবি আঁকায় পারদর্শিনী, দেবকুমার তেমনি কুশলতা অর্জন করেছে বিজ্ঞানচর্চায়। ভাইবোনে খুব ভাব।

সীতা বড় হয়ে উঠছে দেখে, সমরেন্দ্রনাথের আত্মীয়-স্বজন সীতাকে পাত্রস্থ করবার পরামর্শ দিতে ভোলে না। কিন্তু আত্মভোলা শিল্পীর সেদিকে বড় হুঁশ নেই। ঘটক আনাগোনা করে। ধনীর ঘর থেকে সে সীতার সম্বন্ধ আনলেও, সমরেন্দ্রনাথ তাতে উৎসাহিত হন না। কারণ, সেখানে তিনি টাকার সুর-ই পান, হৃদয়ের সুরের সন্ধান পান না! কাজেই, সে সম্বন্ধ ভেঙ্গে যায়। ইতিমধ্যে স্টেট্ স্কলারশিপ্ পেয়ে, ইঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভের জন্য দেবকুমার যায় বিলেতে। সমরেন্দ্রনাথ হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। বাপের অসুখে সীতা অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়ে।

প্রযোজনা	: শ্রীমতী পিকচার্স
কাহিনী	: কল্যাণী মুখোপাধ্যায়
চিত্রনাট্য ও সংলাপ	: বিনয় চট্টোপাধ্যায়
পরিচালনা	: সব্যসাচী
চিত্রশিল্পী	: বিশু চক্রবর্ত্তী
আলোকচিত্র পরিচালনা	: অজয় কর
শব্দযন্ত্রী	: সন্তোষ বন্দ্যোপাধ্যায়
শিল্প নির্দেশক	: বীরেন নাগ
গান	: রবীন্দ্রনাথ ও শৈলেন রায়
সঙ্গীত পরিচালনা	: উমাপতি শীল
রবীন্দ্র সঙ্গীত তত্ত্বাবধায়ক	: দ্বিজেন চৌধুরী
প্রচারশিল্পী	: ফণীন্দ্র পাল
ভূমিকায়	: কানন দেবী, অনুভা গুপ্তা, কমল মিত্র, পূর্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়, রেবা বসু, বিপিন গুপ্ত, বিকাশ রায় ও আরো অনেকে
দেখানো হচ্ছে	: রূপবাণী, ইন্দিরা, ছায়া, আলোছায়া ও অন্যান্য চিত্রগৃহে

চিত্রবাণী

কিন্তু এই সঙ্কট-মুহূর্তে ঈশ্বরের আশীর্বাদের মতই আবির্ভূত হন ডাঃ রাঘব ঘোষাল। অক্লান্ত সেবা যত্নে ও চিকিৎসার বিচক্ষণতায় তিনি সমরেন্দ্রনাথকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেন। পিতা পুত্রীর মন স্বভাবতই ডাক্তারের প্রতি শ্রদ্ধায় ও কৃতজ্ঞতায় ভ'রে ওঠে। কিন্তু রাঘব ঘোষালের আসল রূপ তাঁদের চোখে ধরা পড়ে না।

কৌশলী ও কূট বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন রাঘব ঘোষাল একদিন সুযোগ বুঝে সমরেন্দ্রনাথের কাছে তাঁর ছোটভাই কমলের সঙ্গে সীতার বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। ডাক্তারের ব্যবহারে পিতা-পুত্রী তখন এতই মুগ্ধ যে, বিশেষ কোনো অনুসন্ধান না করেই সমরেন্দ্রনাথ সীতার সঙ্গে কমলের বিয়ে দিয়ে দিলেন।

কিন্তু বিয়ের পর সীতা বুঝলো—সে কত ঠকেছে। তার স্বামী কমল একটি অদ্ভুত জীব। বড় নির্বোধ সে। তার নিজের কোনো সত্তা আছে ব'লে সে মনে করে না। সব সময়ে সে তার দাদা রাঘব ঘোষালের আজ্ঞাবহ। সে মনে করে দাদা তাকে খেতে-পরতে দেয় বলে সে খেতে পরতে পায়। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই রাঘব ডাক্তারের আসল রূপটা সীতার কাছে ধরা পড়ে। সীতার বাবা সমরেন্দ্রনাথ তাঁর বিষয়-সম্পত্তি তাঁর ছেলেমেয়ে দু'টির মধ্যে সমান ভাগ ক'রে দিয়েছিলেন। কাজেই সমরেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর সীতার ভাগটাকে রাঘব ঘোষাল অনায়াসেই আত্মসাৎ করতে পারবেন—এই দুরভিসন্ধি ছিল বলেই তিনি তাঁর নির্বোধ ভাইটির সঙ্গে বুদ্ধিমতী সীতার বিয়ে দিয়েছিলেন। রাঘব ঘোষালের এই দুরভিসন্ধি সীতার কাছে গোপন থাকে না। তারপর তার জা সৌদামিনীর ব্যবহারেও সে পদে পদে আহত হয়। সৌদামিনী যেমন সঙ্কীর্ণমনা ও আত্মসর্বস্ব, তেমনি মুখরা। ধীরে ধীরে সীতার মনের সব রঙ্ যেন ফুরিয়ে যায়, তার আশার সৌধ যেন ভেঙে পড়ে।

কিন্তু দিন কারো সমান যায় না। একদিন সীতার কোল জুড়ে আসে এক শিশু। সীতার মেয়ে। শুরু হলো সীতার নতুন জীবন। মেয়ে নিয়ে মেতে উঠলো সে। এই মেয়ের মধ্য দিয়েই সীতা তার অতৃপ্ত জীবনকে সার্থক করে তুলবে।

ইতিমধ্যে সমরেন্দ্রনাথ মারা গেলেন। রাঘব ডাক্তার তখন খোঁজ নিয়ে জানতে পারলেন যে, সীতার ইচ্ছাতেই সমরেন্দ্রনাথ মৃত্যুর পূর্বে উইল বদল করে যান—তাতে তাঁর মেয়ে-জামাই সীতা ও কমলের জন্মে কিছুই থাকে না। সীতার প্রতি ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন রাঘব ডাক্তার। সৌদামিনীর ও যত আক্রোশ গিয়ে পড়ে সীতার ওপর। সীতা কিন্তু ভাসুর ও জা-র লাঞ্ছনা-গঞ্জনাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে মেয়ে উমা-কে গান বাজনা ও লেখা-পড়া শিখিয়ে মানুষ করে তোলে। সৌদামিনী আনে উমার বিবাহ প্রস্তাব। কিন্তু সীতা বলে উমার সঙ্গে তার কলেজের তরুণ অধ্যাপক সুকান্ত দাসের বিয়ের কথা ঠিক হয়ে আছে। সুকান্ত দাস! চাটুজ্যে নয়, বাঁড়ুয্যে নয়, মুখুয্যে নয়, দাস! রাঘব ডাক্তার আর সহ্য করতে পারেন না। ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে তিনি মা আর মেয়ে-কে দেন তাড়িয়ে। উমার হাত ধরে সীতা পথে এসে দাঁড়ায়।

তারপরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত। সুকান্তের হাতে উমা-কে তুলে দিয়ে সীতা চলে যায় তার দাদার কাছে। সেখানে কিছুদিন থেকে সে বীরভূমের এক মেয়েস্কুলের শিক্ষয়িত্রীর পদ নিয়ে—কাজের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দেয়। তারপর বহুদিন বাদে একদিন মেয়ের হাত ধরে কমল ফিরে আসে তার স্ত্রীর কাছে। অশ্রুজলের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর মিলন হয়।

কাহিনীর মধ্যে একমাত্র সীতার চরিত্রাঙ্কণ ব্যতীত লেখিকা আর কোথাও তাঁর নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিতে সক্ষম হননি। তারওপর চিত্রনাট্যের দুর্বলতায় গল্প এমনভাবে রূপায়িত হয়েছে যাতে মূল কাহিনী দানা বাঁধতে পারেনি। সমরেন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ অকারণ দীর্ঘ; দেবকুমার চরিত্র সার্থকতা লাভ করেনি; সবচেয়ে দুর্বলভাবে চিত্রিত হয়েছে কমলের চরিত্র। এই কমল চরিত্রের মধ্যে লেখিকা ও চিত্রনাট্যরচয়িতা যদি মানসিক সংঘাতের সৃষ্টি করে তার

চিত্রবাণী

পরিবর্তনের সুযোগ দিতেন তবেই চরিত্রটি সার্থক হয়ে উঠতো। কমলের মতো পরনির্ভরশীল মেরুদণ্ডহীন মানুষের অভাব নেই এ-সংসারে। কিন্তু চিরদিনই মানুষ অমন জড় হয়ে থাকে না। বিশেষ করে সে যখন পিতৃত্বের অধিকার লাভ করলো, তখন থেকে তার পরিবর্তন আসাই স্বাভাবিক। মেয়ে হবার পরও যখন সীতা ও তার মেয়ে উমার প্রতি সংসারের লাঞ্ছনা-গঞ্জনা বিন্দুমাত্র কমলো না, তখন কমল যদি মাঝে মাঝে বিদ্রোহ করে উঠতো তা'হলে তার চরিত্রটি বিকাশ লাভের সুযোগ পেত। আর তাতে দর্শকসাধারণের সহানুভূতি লাভেও সে বঞ্চিত হ'তো না। মানসিক দ্বন্দ্বের অভাবে 'কমল' চরিত্র ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। একদিকে সীতা ও উমার প্রতি ভালোবাসা, অন্যদিকে রাঘব ডাক্তার ও সৌদামিনীর লাঞ্ছনা গঞ্জনা—এই দু'য়ের মধ্যে পড়ে 'কমল'চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব যদি ফুটে উঠতো তাহলে মূল কাহিনী আরও জোরালো হোতো। যে ঘটনায় সুকান্তের মহত্ত্বের পরিচয় পেয়ে সীতা তার মত পরিবর্তন করে তার মেয়ে উমাকে সুকান্তের হাতে তুলে দিতে চাইলো তা অত্যন্ত তুচ্ছ। এই ঘটনাটি অসাধারণ হওয়া উচিত ছিল। রাঘব ডাক্তারের বাড়ির আভ্যন্তরীণ দৃশ্য, সমরেন্দ্রনাথের স্টুডিয়ো, সুকান্তের বাড়ি প্রভৃতির পরিবেশ রচনায় সেট-নির্দেশক ও পরিচালকের পরিচ্ছন্ন রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গী প্রশংসনীয়। কিন্তু ঘটকের অবতারণা, নিখিলেশ প্রভৃতির জলযোগ ও সেই সময় সীতা ও দেবকুমারের গান, কলেজের ছেলেমেয়েদের রিহার্সেল প্রভৃতি সংযোজনায় তাঁর প্রশংসা করতে পারব না। কারণ ঐ ঘটনাগুলির সঙ্গে মূল-কাহিনীর কিছুটা যোগ থাকলেও তা অত্যন্ত বিচ্ছিন্নভাবে চিত্রিত হয়েছে। সৌদামিনীর বোন সরীর 'বাঁধনা তরীখানি' গানের জন্য পরিচালকের বাস্তব-দৃষ্টিভঙ্গীর প্রশংসাই করতে হয়। 'অনন্যা'র প্রত্যেকটি গানই সুগীত হয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রসঙ্গীতগুলি অপ্রযুক্ততাদোষের জন্য আবেদনহীন হ'য়ে পড়েছে। 'হারে রে-রে রে-রে আমায় ছেড়ে দেরে দেরে' গানটি সংযোজনার কোনো সার্থকতা নেই। 'আমাদের যাত্রা হলো শুরু'—গানখানির পরিবেশ রচনা সহজেই দর্শকচিত্ত আকৃষ্ট করে কিন্তু তখন কি সীতার যাত্রা সাঙ্গ আর উমার যাত্রা শুরু হ'তে চলেছে বলাই ঠিক নয়?

চিত্রগ্রহণের দিক থেকে 'অনন্যা' অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করবে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। যে দৃশ্যে রাঘব ডাক্তার উত্তেজিত হয়ে উমাকে ঠেলে ফেলে দিলেন সেই দৃশ্যের চিত্রগ্রহণ মনে রাখবার মতো। তাছাড়া গঙ্গার ধারের মনোরম দৃশ্যগুলির চিত্রগ্রহণও প্রশংসনীয়। কিন্তু এই চিত্রের শব্দগ্রহণ আশানুরূপ হয়নি। শিল্প-নির্দেশনার জন্য বীরেন নাগ ধন্যবাদের পাত্র।

সীতার চরিত্রে কানন দেবীর অভিনয় সুন্দর। তাঁর রূপসজ্জাও সার্থক। কিন্তু তাঁর অভিনয়ে মাতৃহৃদয়ের অতল গভীরতার অভাব বোধ হলো। ছোট্ট উমাকে নিয়ে সীতা যেখানে গান গাইছে বা আদর করছে, সেখানে কানন দেবীর অভিব্যক্তিতে আনন্দোজ্জ্বল মাতৃমুখের ছবি দেখবার জন্যেই দর্শকসাধারণ আগ্রহান্বিত ছিল। কিন্তু সেদিক থেকে তিনি নিরাশ করেছেন। কানন দেবীর প্রত্যেকটি গানই শ্রুতিমধুর। রাঘব ডাক্তারের চরিত্রে কমল মিত্র চমৎকার অভিনয় করেছেন। কিন্তু তাঁর কণ্ঠস্বরের ওঠা-নামার কোনো পরিচয় আমরা পেলাম না। স্বরগ্রামের পরিবর্তনের কৌশল আয়ত্ত করতে পারলে কমলবাবু এই চরিত্রে অনেক বেশী দক্ষতার পরিচয় দিতে পারতেন। উমা চরিত্রে [illegible] অভিনয় এক কথায় অপূর্ব। অবান্তর হলেও ফণী রায়ের ঘটক উপভোগ্য। মুখরা স্ত্রী সৌদামিনীর ভূমিকায় রেবা দেবীও প্রশংসনীয় অভিনয় করেছেন। পূর্ণেন্দু মুখোপাধ্যায় যেটুকু সুযোগ পেয়েছেন, তাতে তিনি কমল চরিত্রে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। অন্যান্য ভূমিকায় বিশেষ উল্লেখ করার মত কিছু নেই। কিন্তু বিপিন গুপ্তের [illegible] অভিনয় আমাদের ভালো লাগেনি। তাঁর রূপসজ্জা ও অভিনয় 'অঞ্জনগড়' ও 'সমাপিকা' চিত্রের কথাই বার বার স্মরণ করিয়ে দেয়। 'অনন্যা'র প্রচারকার্যে প্রচারকুশলী ফণী পাল বেশ নতুনত্বের পরিচয় দিয়েছেন। —[illegible]

চিত্রবাণী

মেলডি টাইম

"দি থ্রী ক্যাবালেরোজ" ছবির পর থেকে আমরা দেখছি ডিসনের টেক্‌নিক অতি দ্রুত তালে নিত্য নতুন অভিনবত্ব নিয়ে এগিয়ে চলেছে, তার ফলে অবশ্য ডিসনের সহজসিদ্ধ সরল গল্প বলার কৌশলটি এখন আর ততটা সহজ বা সরল নেই, এমনকি "দি থ্রী ক্যাবালেরোজ" "মেক্ মাইন মিউজিক" "সঙ্ অব দি সাউথ" "ফান এ্যাণ্ড ফ্যানসী ফ্রী" আর এই সম্প্রতি প্রদর্শিত "মেলডি টাইম" ছবি সম্বন্ধে এই কথাই বলা চলে যে প্রতিটি ছবির মধ্যে ডিসনের আঙ্গিক ও দৃষ্টিভঙ্গির যে উত্তরোত্তর অগ্রগামিতা লক্ষ্য করা যায় সেই পরিমাণেই এর মধ্যে শিশু কিশোর দর্শকের বোধগম্য উপাদান ক্রমশঃই কমে আসছে। "স্নো হোয়াইট এ্যাণ্ড সেভেন ডোয়ার্ফস্" ছবি ডিসনের প্রথম পূর্ণাঙ্গ কল্পচিত্র। এই ছবির কলাকৌশল সকল দিক দিয়ে ডিসনে কতখানি উন্নত করতে পেরেছেন তার সার্থক পরিচয় রয়েছে 'মেলডি টাইমে'র মধ্যে।

সাতটি ছোট ছোট গল্পকে গেঁথেছেন ডিসনে এই ছবির মধ্যে। এই গল্পগুলি হল "লিটল্ টুট্", "জনি এ্যাপল্‌সিড", "বাম্বল্ বুগি", "ট্রা", "উইনটারটাইম", "ব্লেম ইট্ অন্ দি সাম্বা" আর "পিকোজ বিল"। ছোট 'টাগ্‌বোট্' "লিটল টুট্" ঘুরে বেড়ায় নিউইয়র্ক বন্দরের ধারে কাছে। সাগর জলে ভেসে ভেসে ছোট বড় জাহাজকে জব্দ করে মজা দেখে। হাল দেয় ঘুরিয়ে, জাহাজ ছোটে বান্‌চাল হয়ে, বিভ্রান্তগতি জাহাজ এসে লাগে ডাঙা ছাড়িয়ে পথে ঘাটে। লিটল টুট মনের আনন্দে হাসে। ভারী মজা! কিন্তু এই মজার শাস্তি তাকে পেতে হয়—বন্দরের সীমানা থেকে তাকে বার করে দেওয়া হল। সেখানে ঝড়বৃষ্টির মধ্যে সে একটা বড় জাহাজকে বাঁচালো নিজের বিপদ উপেক্ষা ক'রে। 'জনি এ্যাপল্‌সীডে'র মধ্যে দেখানো হয়েছে একটা কিশোরের উপাখ্যান—আপেলের মধ্যে সে মানুষের সুখ সমৃদ্ধির উৎস খুঁজে পেয়েছে। "পিকোজ বিল"—গল্পে প্রচলিত জনপ্রিয় নায়ক—ঝড় ঝঞ্ঝা সাগর নদী তরঙ্গ সবই তার বশীভূত। এই ছবির কাহিনী রূপকথা জাতীয়। এহেন পিকোজ বিলের জীবনে জাগে প্রেমের মধুর শিহরণ। বাকি চারটি কাহিনীর মধ্যে আখ্যানবস্তুর চেয়ে দ্রষ্টব্য বস্তু বেশী।

এই খণ্ড ক্ষুদ্র প্রত্যেকটি চিত্রের মধ্যেই সহজ স্বাভাবিক হাস্যরস আর বিস্ময়কর বর্ণবৈচিত্র্য ডিসনে ও তাঁর সম্প্রদায়ের শিল্পোৎকর্ষকে বার বার স্মরণ করিয়ে দেয়। ছবি গান বং আর নাটকীয়তায় উজ্জ্বল এই চিত্রগুলি তুলি নিয়ে যাদু খেলার গুণে মনকে অভিভূত করে রাখে।

—সপ্তর্ষি

উঁচ-নীচ

প্রযোজনা	ঃ নিউ থিয়েটার্স
পরিচালনা	হেমচন্দ্র
কাহিনী	ঃ বিনয় চট্টোপাধ্যায়
সংলাপ	ঃ আমজাদ হোসেন
গান	ঃ রমেশ পাণ্ডে
সুর	ঃ পঙ্কজ মল্লিক
আলোকচিত্র	ঃ সুধীন মজুমদার
শব্দগ্রহণ	ঃ শ্যামসুন্দর ঘোষ
অভিনয় করেছেন	ঃ চন্দ্রাবতী, ভারতী, সুমিত্রা, পূর্ণেন্দু, পল মহেন্দ্র, হীরালাল প্রভৃতি
দেখানো হয়েছে	ঃ চিত্রা ও নিউ সিনেমায়

নিউ থিয়েটার্সের বাংলা ছবি 'প্রতিবাদে'র হিন্দী সংস্করণ 'উঁচ-নীচ'। ছবিখানি ১৯৪৮ সালের ১১ই জুন সর্বপ্রথম বোম্বাইতে মুক্তিলাভ করে। এক সময় নিউ থিয়েটার্সের তোলা হিন্দী ছবি বোম্বাই, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি শহরে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করতো। কিন্তু ক্রমশঃ এই চাঞ্চল্য মন্দীভূত হয়ে আসে। মাঝখানে 'উদয়ের পথে'র হিন্দী-সংস্করণ 'হাম্‌রাহী' আবার হিন্দী-ছবির বাজারে নিউ থিয়েটার্সের পূর্বগৌরব ফিরিয়ে আনতে সমর্থ হয়েছিল। কিন্তু 'প্রতিবাদে'র হিন্দী-সংস্করণ 'উঁচ-নীচ' যে ঐ সব প্রদেশের দর্শকদের খুশি করতে পারেনি, তা সেখানকার

সাময়িক পত্রপত্রিকা ও দৈনিক পত্রিকার সমালোচনা দেখলেই বোঝা যায়। এই বিরূপ সমালোচনার যে অনেকগুলি কারণও আছে, ছবিখানি দেখে আসবার পর, সে বিষয়ে, আর সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

কাহিনীর দিক থেকে 'প্রতিবাদে'র মতো 'উঁচ-নীচ'ও সাধারণ দর্শকদের তেমন খুশি করতে পারেনি। ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের মধ্যে মানুষের গড়া জাতিভেদ সমস্যা—নতুন কোনো সমস্যা নয়। এ সমস্যা বহু পুরোনো। তাছাড়া, শূদ্রকন্যা মালতীর ট্রাজেডি দর্শকচিত্তে ততখানি স্থান পায়নি, যতখানি পেয়েছে ব্রাহ্মণকন্যা মাধবীর ট্রাজেডি। তারপর, চিত্রনাট্যের দোষে ছবিখানির চরিত্রগত সংঘাতগুলি স্পষ্ট হয়ে ওঠ্‌বার সুযোগ পায়নি। অথচ, ছবির সাফল্যের দিক থেকে এই সংঘাত স্পষ্ট না হলে ও সেই সঙ্গে দর্শক-সাধারণের কৌতূহলস্পৃহা না জাগাতে পারলে, ছবির একঘেঁয়েমি বেড়ে যায়, তার ফলে ছবি ঝুলে পড়ে। ঠিক এই দোষই ঘটেছে 'উঁচ-নীচ' ছবির বেলায়। দীর্ঘ-সংলাপও ছবির গতিকে অনেকক্ষেত্রে ব্যাহত করেছে। তাছাড়া, এই ছবির রেকর্ডিং এত ত্রুটিবিচ্যুতিপূর্ণ যা সহজেই কানে বাজে। গানের দিক থেকে কোনো গান নিন্দনীয় না হলেও নিউ থিয়েটার্সের সুরসৃষ্টির নৈপুণ্য এতে কোথায়ও ধরা পড়েনি। দর্শকসাধারণ নিউ থিয়েটার্সের মতো চিত্রপ্রতিষ্ঠান থেকে প্রথম শ্রেণীর নির্মিত ছবি দেখবার আশা করেন বলেই, যখন তার কোনো ছবিতে সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতিও দেখেন, তখন তা তাদের নিরাশ করে। একবার সুনাম অর্জন করে, বরাবর তা বজায় না রাখতে পারলে এইরকম বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হতেই হবে।

কিন্তু অনেক ত্রুটিবিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও, একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, 'উঁচ-নীচ' সাধারণ হিন্দী ছবির অনেক উর্ধ্বে স্থান লাভ করবার যোগ্যতা রাখে। অভিনয়ের দিক থেকে কেউই 'প্রতিবাদের' তুলনায় বেশি ভালো অভিনয় না করলেও—পল মহেন্দ্র, সুমিত্রা দেবী, ভারতী দেবী ও চন্দ্রা... স্বাভাবিক ও সুন্দর অভিনয় করেছেন। ডাঃ চৌধুরী ভূমিকায় হীরালালের অভিনয় এক কথায় চমৎকার। পরিচালনার দিক থেকে হেমচন্দ্র বাংলা সংস্করণের মতো এক্ষেত্রেও সমান দোষগুণের অধিকারী। সুরশিল্পী পঙ্কজ মল্লিকের সুরসৃষ্টি বাংলা-সংস্করণে অধিকতর সার্থক হয়েছে ব'লে আমাদের ধারণা। 'করবটে বদলাতা হয়া' গানখানি সুরের দিক থেকে সুন্দর হলেও, রেকর্ডিং-এর দোষে জায়গায় তা অস্পষ্ট হয়েছে। 'ফুল কহে ধন্য হুঁ মৈঁ' গান খানি 'ফুল বলে, ধন্য আমি মাটির 'পরে' শীর্ষক রবীন্দ্রসঙ্গীতের হুবহু অনুকরণ।

—অজাতশত্রু

বহুব্রীহি

'বহুব্রীহি সমাস, সমস্যা না সমাধান'—এইরকম একটা বিজ্ঞাপন কিছুদিন ধ'রে চোখে পড়েছিল। জনৈক সাহিত্যিক বন্ধু একদিন বলেছিলেন—বিজ্ঞাপনটা কি দেখেছেন? [illegible] বক্ষে ছিল, দেখেতে ভালো বেশ, কিন্তু বিজ্ঞাপনটা বাংলাদেশের একখানি সম্পূর্ণ ভাল ছবির। বিজ্ঞাপনের চটকে ভুলে এ ছবি দেখতে যাবেন অনেকেই। কিন্তু ঠকবেন তাঁরা সকলেই। বঙ্গ-রঙ্গের ছবি তুলতে গিয়ে প্রবীণ নাট্যকার ও নবীন পরিচালক অমরবাবু যা কাণ্ড করেছেন—তাতে সম্ভব থাকলে তাকে চিত্রজগৎ থেকে বিদায় নিতে বলাটাই হবে প্রকৃত সৎ কাজ!

টাকা থাকলে বারোটি মেয়ের বাপ হয়েও পরম নিশ্চিন্ত-মনে কন্যাদায় থেকে উদ্ধার পাওয়া যে কত সহজ, এ ছবি দেখলেই তা বুঝতে পারা যাবে। সে হিসাবে কন্যাদায়গ্রস্ত বাপদের কাছে এ ছবি হয়তো টোটকা ওষুধের কাজ করবে! তারপর, বিদুষী মেয়ের পক্ষে মাতাল শ্বশুরকে বশ করে স্বামীর ঘরে নিজের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করা যে কত সহজ, সে শিক্ষাও পাওয়া যাবে এই ছবির নায়িকা

চিত্রবাণী

প্রযোজনা	ঃ কল্পরূপায়নী
রচনা, পরিচালনা ও গীত রচনা	ঃ জলধর চট্টোপাধ্যায়
আলোকচিত্র	ঃ পঞ্চানন চৌধুরী
শব্দযন্ত্রী	ঃ শিশির চট্টোপাধ্যায়
সঙ্গীত পরিচালনা	ঃ কুমার প্রদ্যোৎনারায়ণ
অভিনয় করেছেন	ঃ মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, বাণীব্রত মুখোপাধ্যায় ঝর্ণা রায়, বীরেন ঘোষ, লীলাবতী প্রভৃতি
দেখানো হয়েছে	ঃ পূর্ণশ্রী, রূপম্ ও আলোছায়ায়

'বহুব্রীহির' কাছ থেকে! কাজেই, শিক্ষণীয় বিষয় অনেক!

ছবির কাহিনী এতই উদ্ভট আর অস্বাভাবিক হয়ে দেখা দিয়েছে যে, এ সম্পর্কে কোনরকম আলোচনা করাও দুষ্কর। সামাজিক অব্যবস্থার বিরুদ্ধে কাহিনীকারের নির্মম ব্যঙ্গ (বা Satire) যে প্রশংসনীয় তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তিনি যে ভাবে আজগুবি কৌশলের সাহায্যে সেই সব সামাজিক সমস্যার সমাধান করতে গিয়েছেন, তাতে তিনি নিজেকে ছায়াছবির দর্শকের কাছে করুণার পাত্র করে তুলেছেন মাত্র। বিধবা বিবাহ, বহুবিবাহ, পণপ্রথা, শাশুড়ীর নির্যাতন, প্রেম, মদ, গাঁজা—কোনো-রকম সমস্যাই এ ছবিতে বাদ যায়নি। তার ফলে ছবি হয়েছে জগাখিচুড়ি! এ-রকম ছবি যে কি ক'রে সেন্সর বোর্ডের ছাড়পত্র পায় তাই ভেবে বিস্মিত হই।

'বহুব্রীহি' ছবিখানিতে একটা জিনিস লক্ষ্য করবার বিষয়। ছবির কর্মীবৃন্দ প্রায় সকলেই যেন একসঙ্গে চেষ্টা করেছেন, ছবিখানিকে কে কতখানি নীচু স্তরের করতে পারেন! ছবির আলোকচিত্র ও শব্দগ্রহণের কাজ দেখলেই একথার সত্যতা বুঝতে পারা যাবে। অভিনয়ও প্রায় সেই রকম। তবু, তার মধ্যে ভাগ্যিস্ মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের মতো শিল্পী ছিলেন। মনোরঞ্জনবাবু এই ছবিতে নতুন ধরণের ভূমিকায় প্রশংসনীয় অভিনয় করেছেন। তাঁর কথা আগের মতো আর স্পষ্ট না হলেও, তাঁর বাচনভঙ্গী ও ভাবাভিব্যক্তি আনন্দদায়ক। বিশেষ ক'রে তাঁর সুর করে কবিতা ও গানের কলি আওড়ানো। সুরূপীর ভূমিকায় লীলাবতী আর বনমালীর ভূমিকানেতাও যথাযোগ্য অভিনয় করেছেন। অন্যান্য ভূমিকা অনুল্লেখ্য।

এই ছবির কর্মীবৃন্দের মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্য কিন্তু অতি সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেটা হচ্ছে—'চট্টোপাধ্যায়' পদবীটি। ছবির কাহিনী, সংলাপ, গীত রচনা ও পরিচালনা করেছেন—জলধর চট্টোপাধ্যায়; চিত্রনাট্য রচনা করেছেন—অশোক চট্টোপাধ্যায়, প্রচার করেছেন—মাখনলাল চট্টোপাধ্যায়, শব্দযন্ত্রীর নাম—শিশিরকুমার চট্টোপাধ্যায়; ব্যবস্থাপক—সুশীলকুমার চট্টোপাধ্যায়; পরিচালনায় সহকারিতা করেছেন—গণেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়; চিত্রশিল্পে সহকারী—সুশান্ত চট্টোপাধ্যায়; রসায়নাগারে সহকারী—ননী চট্টোপাধ্যায় আর অভিনয়ে আছেন—নিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় (এ্যাঃ); শশধর চট্টোপাধ্যায় ও ছবি চট্টোপাধ্যায়। 'অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট' বলে একটা প্রবাদবাক্য আছে। 'বহুব্রীহি'র এই চট্টোপাধ্যায়-এর ভিড় দেখে তাই বলতে ইচ্ছা করে যে, "অনেক চট্টোপাধ্যায়ে 'বহুব্রীহি' মাটি হয়েছে!" সব চেয়ে আফ্‌শোষ, যে কাগজে এই সমালোচনা করছি, সেই কাগজের সম্পাদকের পদবীও চট্টোপাধ্যায়!

—বোপদেব

বিদুষী ভার্য্যা

কথাশিল্পী উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'বিদুষী ভার্য্যা' উপন্যাসের চিত্ররূপ আধুনিক কালের দর্শকবৃন্দকে কতখানি খুশি করবে সে-কথা বলা শক্ত। কারণ, 'বিদুষী ভার্য্যা'র কাহিনীগত সমস্যার সঙ্গে পেছনে-ফেলে-আসা দিনগুলির যতটা সম্পর্ক আছে, এগিয়ে-চলা বর্তমান যুগের সঙ্গে তার ততটা যোগ নেই। সময়ের সঙ্গে তাল-বেখে না চল্‌তে পারলে, সাহিত্য ও শিল্পের সাফল্যে বহু বাধা ও আশঙ্কা দেখা দেয়। ঠিক এই কারণেই সাহিত্যগত দুর্বলতা থাকা সত্বেও 'উদয়ের পথে', ভুলি নাই' প্রভৃতি ছবির কাহিনী আধুনিক কালের দর্শকসাধারণকে মুগ্ধ করেছিল।

ঘটনাচক্রে তিনবার ফেল-করা জমিদারপুত্র দিবাকরের সঙ্গে এম এ পাশ করা সাধারণ গৃহস্থ-কন্যা যূথিকার বিয়ে হয়ে গেল। কিন্তু বিদুষী পত্নী তার মুর্খ স্বামী-কে যেমন সুখী করতে পারলো না, নিজেও তেমনি অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত হলো। বাস্তবের দিক থেকে এমন ঘটনা একেবারে অসম্ভব না হলেও, কোথায় যেন এব কৃত্রিমতা ফুটে উঠে মনকে বার বার পীড়া দেয়। বিশেষ ক'রে যখন দেখি যে, স্বামীগতপ্রাণা যূথিকা তার স্বামীকে সুখী করবার জন্য ও নিজের মানসিক স্বস্তির উদ্দেশ্যে তার আজন্মলব্ধ পাশ্চাত্যবিদ্যা কুলবিগ্রহ গোবিন্দজীর পায়ে উৎসর্গ করছে, তখন স্বভাবতঃ-ই প্রগতিসম্পন্ন মন বিব্রত বোধ করে। আদর্শের দিক থেকে এই ত্যাগের পণ যতই প্রশংসনীয় হোক্, বাস্তব সত্য এতে নিদারুণভাবে ক্ষুণ্ণ হয়। উপন্যাসের এই দুর্বলতা—চিত্রেও যথাযথভাবে রূপায়িত হয়ে উঠেছে। কিন্তু ছবির যে স্বচ্ছন্দগতি ছবিখানির প্রতি দর্শকচিত্ত আবিষ্ট করে রেখেছিল, কেবল এই একটি কারণেই সেই গতি হঠাৎ ব্যাহত হয়েছে। 'বিদুষী ভার্য্যা' ছায়াচিত্রের প্রথমাংশ যেমন জমাট, শেষাংশ তেমনি খাপছাড়া ও দ্রুত। কিন্তু যে ছবির প্রথমাংশের তুলনায় শেষাংশ রসঘন হয়ে ওঠে সে ছবি তত বেশী হৃদয়গ্রাহী হয়।

প্রযোজনা	: এম, পি, পোডাকসন্স
কাহিনী	: উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
চিত্রনাট্য ও পরিচালনা	: নরেশ মিত্র
চিত্রগ্রহণ	: বিভূতি লাহা
শব্দগ্রহণ	: যতীন দত্ত
গীত রচনা	: শৈলেন রায়
সঙ্গীত পরিচালনা	: রবীন চট্টোপাধ্যায়
ভূমিকায়	: মলয়া সরকার, কমিকা সরকার, পরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেশ মিত্র, [illegible] শিবশঙ্কর, তুলসী চক্রবর্তী [illegible] কুমার মিত্র ও আরো অনেকে
দেখানো হচ্ছে	: উত্তরা, উজ্জলা, পুরবীতে

'বিদুষী ভার্য্যা'-র মূল কাহিনী আমরা মাঘ-সংখ্যায় 'চিত্রবাণী'-তে বিবৃত করেছি বলে এই প্রসঙ্গে তার পুনরুল্লেখ করলাম না। পরিচালক নরেশ মিত্র মহাশয় মূল উপন্যাসকে যতদূর সম্ভব অবিকৃত রেখেই চিত্রে রূপায়িত করেছেন। গ্রাম্য জমিদারগৃহের পরিবেশ রচনায় তাঁর বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী প্রশংসনীয়। যূথিকা ও দিবাকরের ট্রেনের ঘটনাটি ও তাঁর পরিচালনায় নিখুঁত হয়ে দেখা দিয়েছে। কিন্তু যে মূল কারণে বিদুষী যূথিকা ডিগ্রীহীন দিবাকরের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল, পরিচালক সেই প্রসঙ্গটি খুব সংক্ষেপে সেরেছেন। যূথিকার গানে দিবাকর যেমন মুগ্ধ হয়েছিল, দিবাকরের সেতার বাজনায় যূথিকাও তেমনি আকৃষ্ট হয়েছিল। মূলতঃ কণ্ঠসঙ্গীত ও যন্ত্রসঙ্গীতের সূক্ষ্ম কলানৈপুণ্যই দুটি তরুণ হৃদয়কে পরস্পরের প্রতি অনুরাগী করে তোলে। একটি গানের আসরেই পরিচালক এই প্রসঙ্গের ইঙ্গিত দিয়েছেন। কিন্তু কয়েক মিনিট ধরে তিনি যদি উভয়ের সঙ্গীতচর্চার বিভিন্ন বৈঠকের ছবি সেই

সঙ্গে দেখাতেন তাহলে আরও পরিষ্কার ও হৃদয়গ্রাহী হ'তো। যে-সেটে মনসাগাছা গ্রামের কুটীর শিল্প প্রতিষ্ঠান ও বালিকা বিদ্যালয়ের উদ্বোধন অনুষ্ঠান দেখানো হয়েছে, ঠিক সেই সেটেই নতুন পরিবেশে রাজসাহী বালিকা বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ উৎসব সম্পন্ন হয়েছে দেখা গেল। এবিষয়ে পরিচালকের দৃষ্টি রাখা উচিত ছিল। দিবাকর যেখানে একাকী 'কাছে পেয়ে তোমারে হারাই, মন কাঁদে হায়' গানটি গেয়েছে -সেখানে দিবাকরের মধ্যে এমন কোনো ভাব ফুটে ওঠেনি, যাতে মনে হয় যে, সে যূথিকাকে একান্ত করে পাচ্ছে না বলেই ঐ বিরহ-সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে নিজের মনের ভাব প্রকাশ করেছে। যূথিকার কাছে ঐ ভাব না ফোটানো অবশ্য চিত্রের কৌতূহল রক্ষার দিক থেকে যথার্থই হয়েছে, কিন্তু তাতে দর্শকসাধারণের মনে দিবাকরকে ভুল বুঝবার অবকাশ থেকে যায়। দর্শককে বুঝতে দেওয়া উচিত ছিল যে, দিবাকর যূথিকার জন্যেই মনের খেদে ঐ গানটি গেয়েছে—শিবানীর জন্য নয়। তারপর, গোবিন্দজীর পায়ে পাশ্চাত্যবিদ্যা উৎসর্গ করে যূথিকা যখন নিজের ঘরে ফিরে আসছে তখন আবহসঙ্গীতরূপে 'দুখ যাত্রীর ঘুচিবে রাত্রির' মত একখানি ভাবসমৃদ্ধ গানের অবতারণা করে পরিচালক ছবির গতিকে অযথা মন্থর ও ভারাক্রান্ত করে তুলেছেন। দশ বারো বছর আগে এইরকম আবহ-সঙ্গীতের মূল্য ছিল। কিন্তু এখন এই কৌশল, ছবির পক্ষে শুধু নিরর্থক নয়, বিরক্তিকর। 'বিদুষী ভার্য্যা'র শেষাংশ অত্যন্ত দ্রুত ও খাপছাড়াভাবে শেষ হয়েছে সে-কথা আগেই বলেছি। দিবাকরকে ভুল বুঝে যূথিকার কলকাতায় চলে যাওয়ার পর ও দিবাকরের টেলিগ্রাম পেয়ে দেওরের সঙ্গে তার ফিরে আসার মাঝখানে—যূথিকার আর কোনো প্রসঙ্গই চিত্রে রূপায়িত হয়নি। সেই জন্যেই শেষ দৃশ্যে যখন অকস্মাৎ নিশাকরকে নিয়ে যূথিকা উপস্থিত হয় ও দিবাকর শিবানীকে নিশাকরের হাতে তুলে দেয়—তখন বড় খাপছাড়া লাগে। যূথিকার কলকাতায় চলে যাওয়া, নিশাকরের টেলিগ্রাম পাওয়া ও নিশাকরকে নিয়ে হৃষ্টচিত্তে আবার মনসাগাছায় ফিরে আসার দৃশ্যগুলিও যদি খুব সংক্ষেপে দেখান হোতো তাহ'লে ছবির শেষাংশের ত্রুটি ঢাকা পড়তো। তাছাড়া শেষদৃশ্যে চিত্রনাট্যরচয়িতা যূথিকাকে দিয়ে একটি কথাও উচ্চারণ করাননি, অথচ, যূথিকা-ই হলো ছবির মূল-চরিত্র। পরিবারের বাইরের লোকের সামনে শিবানীকে নীলকান্তমনি ও যূথিকাকে কমলহীরে বলাও দিবাকরের পক্ষে বাস্তবতাবিরোধী।

যূথিকার ভূমিকায় মলয়া সরকার

'বিদুষী ভার্য্যা'র চিত্রগ্রহণের কাজ সব জায়গায় সমতা রক্ষা না করলেও ক্ষেত্রবিশেষে বিশেষ প্রশংসনীয়। এই প্রসঙ্গে ট্রেনের ভিতরকার ও বাইরের দৃশ্য এবং বিভিন্ন

কোন থেকে বিভিন্ন চরিত্রের ক্লোজ-আপ নেওয়ার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। রাত্রিকালে ট্রেন চলার দৃশ্যগুলি অতি চমৎকার। শব্দযন্ত্রী যতীন দত্তও কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, বিশেষ করে কলিকাতাগামী নবদম্পাতির আলাপের পটভূমিকায় ট্রেন চলার শব্দগ্রহণে। গানের রেকর্ডিং সব জায়গায় ত্রুটিহীন নয়। সম্পাদনার দিক থেকে একটি বড় রকমের অসঙ্গতি উল্লেখ করা প্রয়োজন। পাহাড়ের পাশ দিয়ে রাত্রিকালের ট্রেন চলার একই দৃশ্য দু'তিনবার দেখানো হয়েছে। সম্পাদকের পক্ষে এই অসঙ্গতিবিধান কোনক্রমেই উপেক্ষণীয় নয়। জমিদারবাড়ীর সেটটি বাস্তবানুগ হওয়ায় শিল্পনির্দেশককে প্রশংসাই করতে হয়। ছবিতে গানের সংখ্যা ছ'টি। প্রত্যেক গানের সুরই ভাবব্যঞ্জক। কিন্তু দিবাকরের কণ্ঠে যে গানটি দেওয়া হয়েছে সেটি গায়কের দোষেই হোক আর রেকর্ডিং এর দোষেই হোক, তত হৃদয়গ্রাহী হয়নি। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে 'তুপ আঁধার ঘুচবে রাত্রি' গানটি অবান্তর হলেও শ্রুতিমধুর। যূথিকার প্রথম গান 'আজিকে বসন্ত এলো' যেমন জমেনি, তেমনি শিবানীর 'ভালো লাগে মধুপের কুমকুম' গানটি উপভোগ্য হয়ে উঠেছে।

অভিনেতা অভিনেত্রীদের মধ্যে নবাগতা নন্দা সরকারের যূথিকা ও কবিতা সরকারের শিবানী চরিত্রা-রূপায়ণ সুন্দর। নন্দা সরকারের অভিব্যক্তি আরও স্পষ্ট হওয়া উচিত ছিল। পরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয়গুণে দিবাকরের চরিত্রটি যথাযথ রূপ পেয়েছে। নরেশ মিত্রের ত্রৈলোক্য আর প্রভার ক্ষীরোদাঠাকরুণ এক কথায় চমৎকার। শিবানীর কাছে ক্ষীরোদার দিবাকর প্রসঙ্গ জানার যে কৌতূহল প্রভার অভিনয়ে ফুটে উঠেছে, তা একমাত্র তাঁর মতো অভিনেত্রীর পক্ষেই সম্ভব। সুহাসিনীর পিসীমা মন্দ হয়নি। পার্শ্বচরিত্রগুলির মধ্যে তুলসী চক্রবর্তী, কুমার মিত্র ও পুরু মল্লিকের অভিনয় প্রশংসার যোগ্য।

—অজাতশত্রু

বাংলা ছবির সমালোচকের দুঃখ

শ্রীচিত্রগুপ্ত

মাইলখানেক লম্বা লাইনে দুতিন ঘণ্টা রোদে জলে দাঁড়িয়ে তপস্যা করবার পর যারা টিকিট কিনে বায়োস্কোপ দেখে ধন্য হয় তারা হয়তো ভাবতেই পারে না যে ছবির সমালোচকের আবার দুঃখ কী থাকৃতে পারে ?

কিন্তু যাঁরা কখনো সখনো দুএকখানা বাংলা ছবি দেখে থাকেন অন্যের চাপে প'ড়ে--তাঁরা হয়তো এ লেখাটা পড়'লে সমালোচকের দুঃখের কথা বুঝ্তে পারবেন।

আমি সেই রকম একজন সমালোচকের কথাই বল্‌ছি ছবির সমালোচনা করা যাঁর পেশা। সমালোচনা করার খাতিরে গত বিশ-বাইশ বছর ধ'রে যিনি প্রায় প্রত্যেকটি বাংলা ছবিই ভালো ক'রে দেখেছেন এবং সেগুলির বিশ্লেষণমূলক পর্য্যালোচনা ক'রে নিজের মতামত প্রকাশ ক'রে এসেছেন।

ম্যাডানের স্টুডিওয় প্রথমে দুচারখানা বাংলা ছবি তোলার পর যখন দেখা গেল সেগুলি দেখতে বেশ ভিড় হচ্চে তখন কারো কারো বাংলা ছবি তোলার খেয়াল হোলো এবং ১৯২৮ সালে কলকাতা ও আশেপাশে একেবারে ব্যাঙের ছাতার মত অজস্র সিনেমা কোম্পানী গজিয়ে উঠ্‌লো—ঠিক আজকাল যেমন পাড়ায় পাড়ায়, 'নিউজ প্রিণ্ট' ছাপা সাময়িক পত্রিকার ভিড় দেখা দিয়েছে। সবাক্ ছবি তখনও বাজার 'জম্‌কে' বসেনি। আমেরিকায় তখন ছবিকে সবাক করবার চেষ্টা একটু আধটু শুরু হ'য়েছে মাত্র। সুতরাং এদেশে তখন কোনো রকমে এর বাগানে, ওর পুকুর-পাড়ে নয়তো গঙ্গার ধারে, ট্রাম রাস্তায় আর পার্কে 'খুচ্ খুচ্' একটু আধটু ক'রে ছবি তুলে দু'হাজার আট হাজার টাকায় একখানি ছবি দাঁড় করানো যেতো। সরঞ্জামের মধ্যে লাগ্‌তো একটা 'মুভী' 'হাত-ক্যামেরা'। দিনের আলোতেই ছবি তোলা হোতো—সুতরাং স্টুডিও লাইট্ ও অন্যান্য সরঞ্জামের বালাই ছিল না। অভিনেতা অভিনেত্রীদের মুখে ভালো ক'রে আলো প্রতিফলিত করবার জন্য বড় জোর কাঠের বোর্ডে 'জগজগা' এঁটে একটা 'রিফ্লেক্‌টর' তৈরী ক'রে নেওয়া হোতো। সুতরাং দু'হাজার আটহাজার টাকা মূলধন সম্বল ক'রে রাতারাতি বড়োলোক হ'য়ে যাবার কল্পনায় উৎসাহিত হ'য়ে বহু অনভিজ্ঞ ব্যক্তি ততোধিক অনভিজ্ঞ 'হবু' ডাইরেকটরদের পাল্লায় প'ড়ে ছবির প্রোডিউসার সেজে বস্‌তেন।

ঠিক এই সময়ে সুবৃহৎ পরিকল্পনা নিয়ে ম্যাডানের স্টুডিওর সঙ্গে পাল্লা দেবার স্পর্দ্ধা করবার মত বিরাট স্টুডিও তৈরী হোলো একাধিক। তাঁরা তিরিশ পঁয়ত্রিশ বা চল্লিশ হাজার টাকা খরচ ক'রে কয়েকখানা নীরব ছবি তৈরী ক'রে এরকম আশা করবার সুযোগ দিলেন যে, বাংলা ছবি কালে দর্শনযোগ্য হ'য়ে উঠতে পারে এবং এদেশে ছবি তৈরীর ব্যবসা সত্যিকার একটা ভালো ব্যবসাতে দাঁড়াবে।

ইতিমধ্যে আমেরিকা দস্তুরমত টকী ছবি তৈরী ক'রে এদেশেও তা' পাঠাতে আরম্ভ করলে এবং সেই সঙ্গে ম্যাডান ও অন্য বড়ো স্টুডিওগুলিও টকীর সরঞ্জাম আনিয়ে ফেলে সোৎসাহে টকী তুলতে শুরু করলে। নীরব ছবির যুগ তিরোহিত হ'য়ে এসে গেল টকীর যুগ। অল্প কয়েকটি বড়ো স্টুডিও এবং কোম্পানী ছাড়া বাকি 'ব্যাঙের ছাতা' কোম্পানীগুলো পঞ্চত্ব পেলো।

'আঁধারে আলো', 'ব্যথার দান', 'অগ্নিজ্বল' ইত্যাদি সাংঘাতিক রকমের বাজে ছবি দেখে ক্লিষ্ট সমালোচক বাংলার 'শিশু' চলচ্চিত্রশিল্পের উন্নতির সম্ভাবনায় উৎফুল্ল হ'য়ে ক্রমে সত্যিকারের ভালো ছবি দেখ্‌তে পাওয়ার আশা পোষণ করতে লাগ্‌লেন। ক্রমে দিশী ছবির দৃশ্যগুলো স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যেতে লাগ্‌লো ; কথাবার্তা, সঙ্গীত এবং

অন্যান্য শব্দগুলোও শ্রুতিগোচর হোলো; কিন্তু হায়, সমালোচকের দুঃখ কিন্তু তবু আজও ঘুচলো না।

সেই দুঃখের স্বরূপটাই এবার বিবৃত ক'রছি। গত বিশ বছর ধ'রে ছবির সমালোচনা করবার 'পেশা'কে আজও আঁকড়ে ধ'রে আছেন এমন লোক বাংলায় বেশী নেই। না থাকার কারণই হ'চ্ছে সমালোচকের পেশায় অনেক দুঃখ আছে। আর সেই কারণেই অনেকে এই বিশবছরের মধ্যে কোনো না কোনো সময়ে এ পেশা গ্রহণ ক'রেছেন এবং এ পেশার অবশ্যম্ভাবী দুঃখকে স্বীকার ক'রতে নারাজ হ'য়ে কেউ অল্পদিন বাদেই, আবার কেউ বা কিছু বেশী দিন পরে এ পেশা ত্যাগ ক'রে অন্য পেশা গ্রহণ ক'রেছেন। এগুলির মধ্যে প্রধান দুঃখ হ'চ্ছে এইগুলি :--

প্রথমতঃ, অল্প কয়েকখানা ছাড়া বেশীর ভাগই অত্যন্ত বাজে ছবি ক্রমাগত দেখ্‌তে বাধ্য হওয়া—যার ফলে ছবি দেখ্‌তে ব'সে মাথা ধরে, পিঠ টন্ টন্ করে, পা' ধ'রে যায়, হাই ওঠে। সবচেয়ে বড়ো দুঃখ, ছবি দেখ্‌তে ব'সে একদিকে ছবির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হতাশা জাগে আর অন্যদিকে "এতো বাজে ছবিকে 'বেগেঢেকে' 'বাঁচিয়ে' কেমন ক'রে সমালোচনা করবো" সেই কথা ভেবে উদ্বেগ! ছবিটা সত্যিকার ভালো ছবি হ'লে এ দুঃখগুলোর কোনটাই হবার কথা নয়।

দ্বিতীয় দুঃখ হোলো, শত্রু সৃষ্টি। ছবির নিরপেক্ষ সমালোচনায় দর্শকগোষ্ঠীর উপকার হয়, চিত্রশিল্পের উন্নতির সম্ভাবনা বাড়ে ইত্যাদি কারণে 'আইনে'ও ছবির সমালোচনা করবার অধিকার সাব্যস্ত। চিত্রনির্ম্মাতা, ছবির পরিবেশক ও সিনেমা হাউসের মালিক কিন্তু নিরপেক্ষ সমালোচনায় অপ্রসন্ন। অসাধারণ তাঁদের আব্‌দার! তাঁরা ভালো ছবি তৈরী করতে বা দেখাতে পারবেন না, নিজেদের অক্ষমতার ও অবহেলার জন্যে বাজে জিনিস তৈরী ক'রে লোক ঠকিয়ে পয়সা করবার চেষ্টা করবেন, অথচ কেউ কিছু বল্‌তে পারবে না!

তাঁরা বিজ্ঞাপনের ছটায় বাজে মাল চালাবার চেষ্টা করবেন। একদিকে সমালোচককে সিঙ্গাড়া, কচুড়ী, চা কেক সরবৎ খাইয়ে ভোলাবার ব্যর্থ চেষ্টা করবেন আর অন্যদিকে বিজ্ঞাপন বন্ধ ক'রে দেবার ও 'খেসারতের দাবী দিয়ে মামলা করবার' ভয় দেখিয়ে কাগজ-ওয়ালাদের মুখ বন্ধ রাখ্‌তে চাইবেন। সমালোচকের অবস্থাটা ভাবুন একবার একদিকে সত্যের খাতিরে 'নিমকী' খেয়েও নিমকহারামী ক'রতে বাধ্য হওয়ার সমস্যা আর অন্যদিকে বিজ্ঞাপনের মোটা টাকা আয় বন্ধ হওয়ার ভয়ে উৎকণ্ঠ কাগজ-ওয়ালার কোপে পড়বার ভয়। যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে আইন বাঁচিয়ে সত্য কথা বলবার কৌশল আয়ত্ব রাখার ঝঞ্ঝাট্‌ তো আছেই।

তৃতীয় সমস্যা হচ্ছে ছবিওয়ালাদের কাছে আত্মবিক্রয়ের প্রলোভন দমন। অর্থাৎ পেশাদার সমালোচকদের প্রায়ই চিত্রজগতের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলাপ হ'য়ে যায়। সেই আলাপ একটু ঘনিষ্ঠ হ'লে অনেক ক্ষেত্রে কর্ত্তৃপক্ষ তাঁকে চিত্রজগতে যোগদান করার প্রলোভন দেখান। এদিকে সমালোচনা লিখে আর্থিক লাভ কতটুকুই বা হয়? সুতরাং চিত্রজগতে ঢুক্‌তে পারলে জীবিকার একটা ভালো 'হিল্লে' হয়ে যাবার প্রলোভন দমন করা বেশ দুরূহ ব্যাপার। আর সেই কারণেই অনেক গুণী সমালোচক শেষ পর্য্যন্ত সমালোচনার পেশাকে চলচ্চিত্র জগতে প্রবেশের একটা ধাপ' হিসেবে ব্যবহার ক'রে কিছুকাল বাদে নিজের ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য ভুলে সিনেমা জগতে ঢুকে প'ড়েছেন।

চতুর্থ ঝঞ্ঝাট হ'চ্ছে বিরক্তিকর কাজের পেছনে প্রতি সপ্তাহের অনেকগুলি ক'রে ঘণ্টা সময় নষ্ট। এক একটি ছবি দেখ্‌তে যাবার প্রস্তুতি, যাতায়াত ও দেখার সময় নিয়ে তিনঘণ্টা সাড়ে তিনঘণ্টা সময় যায়। তারপর আছে গুছিয়ে গাছিয়ে অত্যন্ত সতর্কভাবে তার সমালোচনা লেখা। প্রতি সপ্তাহে অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম হিসেবে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে এই রকম কয়েকটি ছবির শো দেখা এবং ঠাণ্ডা মাথায় অত্যন্ত হিসেব করে তার সমালোচনা লেখা বড় কম কঠিন কাজ নয়। দুচার সপ্তাহ বা দু'চার মাস যদিও

চিত্রবাণী

কোনোরকম চালিয়ে যাওয়া যায়, কিন্তু বছরের পর বছর নিয়মিত ভাবে এই অত্যন্ত একঘেয়ে কর্তব্যটি ক'রে যাওয়া তার তুলনায় অনেক বেশী শক্ত। বিশেষ, করে প্রত্যেকটি ছবির সমালোচনা করার সময় সমালোচককে যেখানে নিজের দায়িত্ব ও সুনামের প্রতি কঠোর দৃষ্টি রাখতে হয়। কারণ তাঁর কাজটি আসলে বিচারকের কাজ। অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে ছবি না দেখলে এবং ততোধিক সতর্কতার সঙ্গে সমালোচনা না লিখলে 'রায়' দানের মত গুরুদায়িত্ব-পূর্ণ কাজে ত্রুটি ঘ'টে যাবার সম্ভাবনা পদে পদে। অথচ এ রকম ত্রুটি ঘটতে দেবার কোনও অধিকার সমালোচকের নেই। কারণ একটি ছবির সমালোচনার সঙ্গে অনেকের ভালোমন্দ একসঙ্গে জড়িত থাকে। একদিকে যেমন চিত্রনির্ম্মাতা, চিত্রপরিবেশক, প্রদর্শনাগারের মালিক, ছবির পরিচালক, শব্দ ও চিত্রগ্রহণকারী ইত্যাদি কর্মীশিল্পীগণ, পাত্র-পাত্রিগণ, সঙ্গীত রচয়িতা ও গীতিশিল্পী ইত্যাদি সকলের প্রতি সুবিচার করার দায়িত্ব থাকে সমালোচকের হাতে, অন্যদিকে থাকে শত শত দর্শকের কষ্টার্জিত যে-অর্থ এই ছবিটি দেখার জন্যে ব্যয়িত হতে চলেছে সত্যের খাতিরে সঠিক সমালোচনার দ্বারা সে ব্যয়কে উৎসাহিত বা নিরুৎসাহ করার দায়।

এতবড় গুরু দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করার বদলে আমাদের দেশে একজন সমালোচক কীই বা আশা ক'রতে পারেন, আর কীই বা পেয়ে থাকেন? ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন যে এতবড় গুরু কর্তব্য পালনের ফলে সমালোচকের যা' সত্যিকার পাওনা তা আমাদের দেশের সমালোচকরা পান না। সুতরাং এদেশের সমালোচকদের সত্যিই অনেক দুঃখ। তাঁদের সে দুঃখের প্রতি যেদিন দেশের সকলে সত্যিকার সহানুভূতিশীল হবেন সেইদিনই সমালোচকদের এ পেশা গ্রহণ করা সার্থক হবে। উপযুক্ত মর্যাদা পেলে নতুন নতুন বহু গুণী সমালোচক তৈরী হওয়াও শক্ত হবে না।

বাহুল্য হলেও এই প্রসঙ্গে বলে রাখছি যে এক্ষেত্রে সমালোচক বলতে সত্যিকার গুণসম্পন্ন নিরপেক্ষ সমালোচকের কথা মনে রেখেই আমি ওপরের কথাগুলি বলেছি। দুই-কোড়ি বারো-বাগান তথাকথিত 'সাজা' সমালোচকদের কথা বলিনি।

আগতপ্রায় 'কর্ম্মফল' চিত্রে স্বাগতা, প্রীতিধারা ও রাজলক্ষ্মী

আহরণী
চৈত্র, ১৩৫৫

শ'এর চোখে সেক্সপীয়র

হেইডেন চার্চ
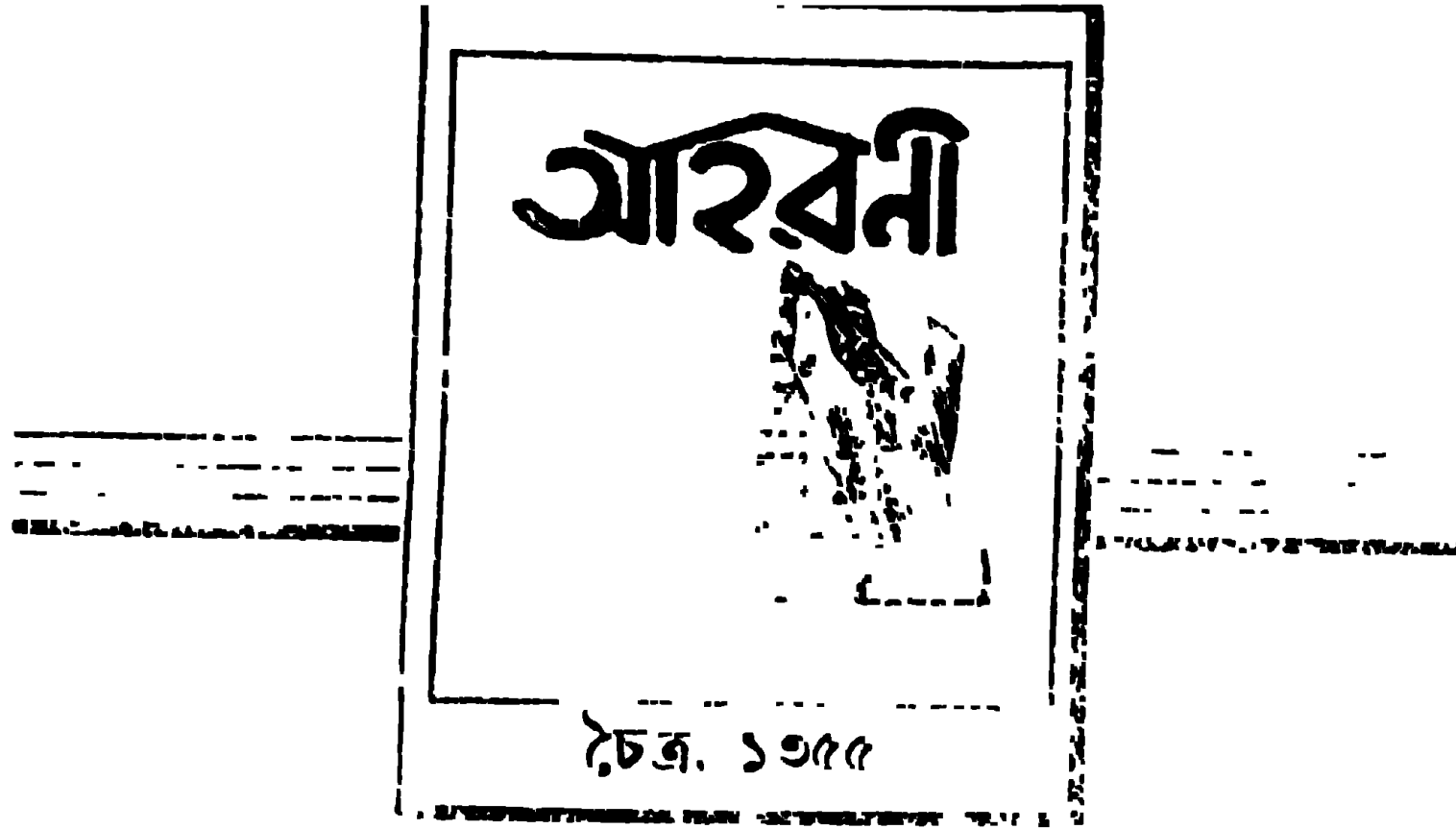
মাত্র কয়েক মাস আগে তিরানব্বই বছর পার হ'য়ে গেছে জর্জ বার্ণার্ড শ-এর। তিনি এখন নতুন একটি নাটক রচনায় ব্যস্ত। নাটকটির নাম—'ফার-ফেচেড ফেবল্স্', এবং বিষয়বস্তু হোল আণবিক বোমার পর পৃথিবীর পরিস্থিতি। এর বেশী কাউকে কিছু বলতে তিনি রাজি নন। বর্তমানে তিনি তার হার্টফোর্ড শায়ার গ্রামের কুটির ছেড়ে কোথাও বড় একটা নড়েননা, লণ্ডনে গিয়ে শো দেখাতো অবশ্যই নয়।

এই কারণেই যখন তাঁর সঙ্গে আমার সাম্প্রতিক সাক্ষাৎকারে সেক্সপীয়র সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয় তখন ক্যামডেন টাউনের,—বেডফোর্ড মিউজিক হল,—চিরাচরিত নৃত্য ও গীতি নাট্যই যেখানে শুধু মঞ্চস্থ হয়,—সেখানে ডোনাল্ড ওয়ালফিট্ প্রযোজিত বহু প্রশংসিত 'মার্চেণ্ট অব্ ভেনিস্'এর অভিনয় দেখা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি।

কিন্তু শাইলক, অ্যাণ্টোনিও ও পোর্সিয়ার এই প্রাচীন কাহিনী ক্যামডেনবাসীদের কাছে যে কতখানি জনপ্রিয় (এক মাস আগেই তারা আড়াই শো পাউণ্ডের অগ্রিম টিকিট ক্রয় ক'রেছেন) তারই সাংবাদিক বিবরণী মিঃ শ'কে তাঁর স্বাভাবিক উদারতার সঙ্গে সেক্সপীয়র অঙ্কিত [illegible] 'নতুন আলোচনা ক'রতে উদ্বুদ্ধ করে এবং এই প্রসঙ্গে তিনি এও বলেন যে তার মতে প্রায় প্রত্যেকটি অভিনেতাই নাকি শাইলকের চরিত্র চিত্রণে ত্রুটিহীন নন।

'সবাই একই ভুল করেন, এবং এ-ক্ষেত্রে হেনরী আর্ভিংও বাদ যাননি, তাঁরা ওকে ভদ্র ও বুদ্ধিমান ক'রে তোলেন' শ' মন্তব্য করেন: 'এত বুদ্ধিমান যে সে কিনা ভাবে যে ভেনিসের রাজদরবার থেকে সে কোন খৃশ্চানের এক পাউণ্ড মাংস পেতে পারে!'
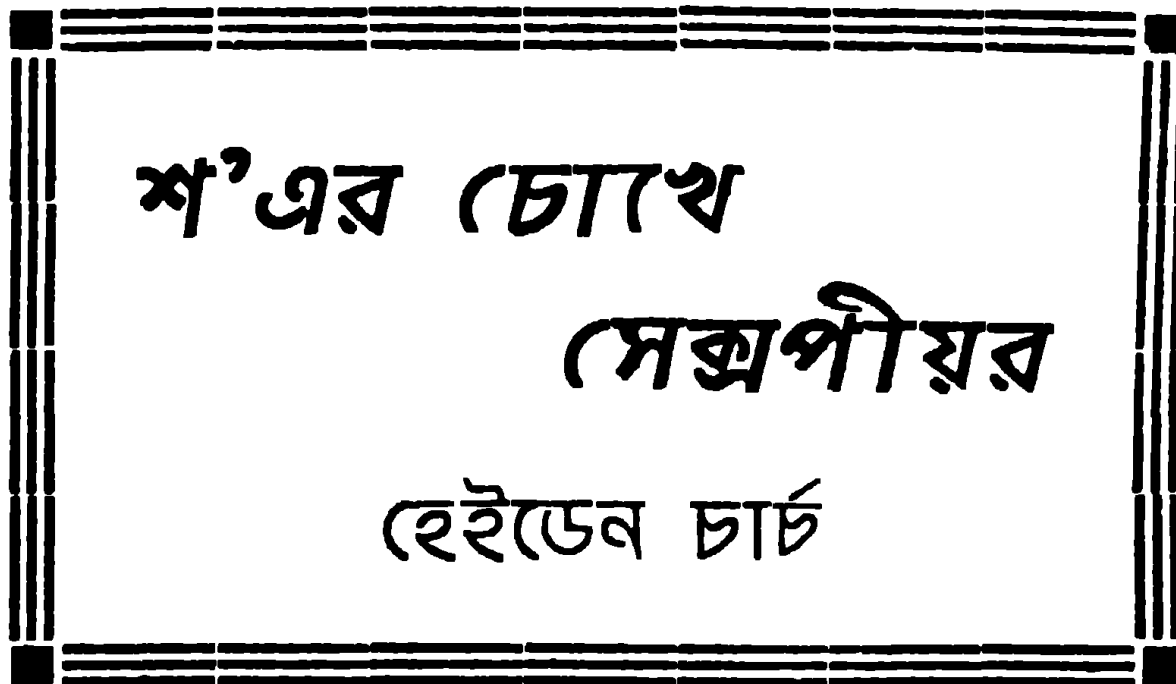
হাঁ, দেখেছিলাম বটে ভজী 'থিয়েটারে' শাইলকের ভূমিকায় এক ফরাসী অভিনেতাকে! শাইলককে তিনি এঁকেছিলেন ঠিক এক আধ-পাগলা ঘৃণ্য' সুদখোরের মতো। আর তাই না' দেখে এক দৃশ্যে ছোঁড়ারা [illegible] তাকে ঢিল ছুঁড়তে শুরু ক'রে দিলে।

ঐ ধরণের ইহুদীর পক্ষে অবশ্য, হ্যাণ্ডনোটের দাম যে তা'র কাগজেরই সামিল, এ কথাটা বিশ্বাস না করার মতো অজ্ঞতা ও সংকীর্ণতা থাকতে পারে'।

'আর দেখেছিলাম এক নির্ভীক মৌলিক অভিনয়!'—জি, বি, এস বলেন,—'পোর্সিয়ার ভূমিকায় এক অভিনেত্রীর। সেই বিখ্যাত বিচারের দৃশ্যে তিনি অবতীর্ণা হলেন অদ্ভুত এক দাড়ি লাগিয়ে! ইয়া লম্বা দাড়ি,

ঠেকেছে গিয়ে তাঁর কোমরেরও নীচে,—আর তার দামটিও সেই পরিমাণে জাঁদরেল নিশ্চয়ই ! যাই হোক 'এসেই তিনি একেবারে চেঁচিয়ে ফাটিয়ে ডিউককে নাস্তানাবুদ্ ক'রে দিলেন—লণ্ডন পুলিস আদালতের প্রথম শ্রেণীর কৌঁসুলীর মতো।'

নাট্যকার হিসাবে নিজের পদ্ধতি প্রকাশের খাতিরে শ'-কে সেক্সপীয়ার সম্বন্ধে অনেক কথাই ব'লতে হয়।

'আপনার নাটকগুলির মূল পাণ্ডুলিপির কি আর অদল বদলের প্রয়োজন হয় না ?' আমি প্রশ্ন করি।

'হয় বৈ কি !' শ' জবাব দেন। 'তবে আমার শিল্পী মনের মজা এই যে তার কাছ থেকে কোন রচনাই বেরোতে পারেনা যতক্ষণ না সেটা তত ভালো হয় যত ভালো তার হওয়া উচিত তখনকার মতো। তাছাড়া, আজকাল লেখার ওপর এত বেশী কলম চালাই যে শেষকালে নাটকটির পুরো তিনভাগের এক ভাগ কেটে বাদ না দিলে সামঞ্জস্য বজায় রেখে সময়ের সম্ভাব্য গণ্ডীর মধ্যে আনা অসম্ভব হ'য়ে পড়ে।'

'সেক্সপীয়রের নাটকের প্রথম সংস্করণের রূপ নিয়ে যদি আমার নাটক প্রকাশ কিম্বা অভিনয় হয় তাহোলে আমি ব'লতে পারি যে নির্ঘাত আমি ক্ষেপে উঠ্‌বো। তবে একথা অবশ্য সম্পূর্ণ স্বীকার করি যে সেক্সপীয়র আমার চেয়েও চালাক ছিলেন, কারণ তিনি 'হ্যামলেট' সংস্কারে বৃথা সময় নষ্ট না ক'রে বরং সেই সময়ে 'ম্যাকবেথ' লিখে ফেলেছিলেন। তাইতো বলি—সেক্সপীয়র ছিলেন একটি আগ্নেয়গিরি যাঁর কাছ থেকে লাভার মতো ফেটে বেরোতো নাটক। আর সেই তুলনায় আমি তো একটি সুসজ্জিতা বৃদ্ধা কুমারী।'

'আচ্ছা, আপনার কোন্ নাটকটি সবচেয়ে বেশী অর্থকরী হ'য়েছে ?' প্রশ্ন ক'রলাম (এই ভেবে যে হয়তো তিনি ব'লবেন, "পিগমেলিয়ান") : 'ব'লতে পারেন তা' থেকে আপনি কত টাকা পেয়েছেন ?'

'তার হিসেব তো করিনি কোনদিন' জবাব দিলেন তিনি, 'টাকা ক'রে পরে গুণ্‌তি না ক'রতে পারার ঝামেলাই সবচেয়ে বেশী।'

'নাটক কতবার অভিনয় হোল সেইটিই তার পরীক্ষা নয়। বড় রঙ্গমঞ্চের এক অভিনয় মানেই হোল ছোট রঙ্গমঞ্চের তিনবারের চেয়েও বেশী টাকা ও বেশী দর্শক ! এমনকি তুমি যদি অভিনয় সংখ্যা বাদ দিয়ে কেবলমাত্র দর্শক আর টিকিট বিক্রীর টাকার সংখ্যাই ধর, দেখবে তাহোলে অবাক হবে অভিনয়ের পার্থক্যে।'

'এই ধর না কেন, নামকরা অভিনেতাদের কথা,—রিচার্ড ম্যান্সফিল্ড (বিখ্যাত মার্কিণ অভিনেতা, যিনি আমার 'দি ডেভিল্‌স্ ডিসাইপল্' এর রূপ দেন) থেকে সুরু ক'রে সেড্রিক হার্ডউইক অবধি এবং অভিনেত্রী এলেন টেরী থেকে এডিথ ইভান্স অবধি,—যাঁরা আমার নায়ক নায়িকাদের সজীব ক'রেছেন,—এঁদের দিয়ে যদি তুলনা কর বক্স-অফিস তবিলের, তবে বুঝবে যে একটা নাটক কতটাকা কামায় আর তার অভিনেতা অভিনেত্রীরা কতটাকা কামায়—এ' দু'টো আলাদা করতে যাওয়া বড়টা অসম্ভব।'

কথা প্রসঙ্গে শ' জানান যে চৌষট্টি বছর আগে ১৮৮৫ সালে তাঁর প্রথম নাটক 'উইডোয়ার্স হাউসেস্' রচিত হয় এবং সাত বছর ফেলে রাখার পর শেষে ১৮৯২ সালে সেটি অভিনীত হয়। এই স্বল্প-অভিনীত নাটকটি সম্প্রতি লণ্ডন আর্টস্ থিয়েটারে পুনরভিনয়ের আয়োজন হ'য়েছে।

'আপনার নাটকের ভাব ও কাহিনী কিভাবে আপনার কাছে উদয় হয় ?' প্রশ্ন করি জি, বি, এস্ কে। 'আচ্ছা, কলমের মুখে ফুটিয়ে তোলবার অনেক আগে থেকেই কি ভাব আপনার মনে দানা বাঁধে ?'

'বহুভাবেই ভাবের উদয় হয়.' জবাব দিলেন তিনি। 'আমি হয়তো বসলাম শূন্য মনে—শুধু এই মনে ক'রে যে আজ একটা নাটক লিখবোই। ব্যস্, অমনি আমার ভাব এসে যায়। আর বেশ একটা ভালো নাটকই বেরিয়ে যায়। তবে হ্যাঁ, এর মধ্যে একটা কথা আছে—নাটক

চিত্রবাণী

ভালো হবে যদি না এমন কিছু লিখতে হয় যা আমার পক্ষে বিরক্তিকর,—এই যেমন ধর কোন কাহিনী পূরণ করা কিম্বা ঐ জাতীয় কোন কৃত্রিম কাজ।

'বেশীর ভাগ নাটকই সুরু হয় বেশ একটা নাটকীয় পরিস্থিতি নিয়ে। বাকিটুকু শুধু সেই ঘটনা ঘটানোর জন্যে যা কিছু করা। 'দি ডেভিল্‌স্ ডিসাইপ্‌ল্'—যেখানা ফিল্‌ম্ করবার জন্যে আমি গ্যাব্রীয়েল প্যাস্‌কালকে অনুমতি দিয়েছি—গ'ড়ে উঠেছিল একটা ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রে। 'জন বুল্‌স্ আদার আইল্যাণ্ড' সুরু হ'য়েছিল রসকল্পনার মধ্য দিয়ে, কিন্তু শেষে সেটা রূপ নিল বিরাট এক রাজনৈতিক পরিস্থিতির।'

'আর 'পিগম্যালিয়ন' নাটকের সূচনার মূল হোল সেই দৃশ্য যেখানে রাষ্ট্রদূতের ভোজসভায় এলাইজা প্রথম আবির্ভূতা হয় সফলতার সঙ্গে। কিন্তু লেখার সময় আমি সেটি বাদ দিয়ে দর্শকদের কল্পনার উপর ছেড়ে দিয়েছিলাম, কারণ মঞ্চের দৈন্য সে ব্যয়বাহুল্য বহনে অক্ষম। তাছাড়া তাতে নাটকও বড় হ'য়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল।'

'জেম্‌স্ ব্যারী এতে আপত্তি ক'রেছিলেন। তাই যখন নাটকটি পর্দায় ওঠে তখন আমি সেই বাদ-দেওয়া দৃশ্যটি জুড়ে দিয়েছিলাম। কারণ চলচ্চিত্র অগাধ অর্থব্যয়ে সক্ষম এবং বিরামহীন দৃশ্য সংযোজনার ফলে নাটকের চেয়ে সময়ও নেয় কম।'

'কোন নাটকের ভাব ও বিষয়বস্তু অনেক সময় নাট্যকারের মনে থাকে আধঘণ্টা আবার অনেক ক্ষেত্রে সারা জীবন ভোর'—বলেন জি, বি, এস। 'জোয়ান অফ্ আর্ক যে আদি প্রোটেষ্ট্যান্ট ছিলেন এটা আমি জানতে পেরেছিলাম তাঁর বিচারের বিবরণী প'ড়ে, কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে যে নাটক লিখ্‌বো একথা তখন আমার মনেই হয়নি। মনে হোল অনেক বছর পরে যখন আমার স্ত্রী একদিন প্রস্তাব ক'রলেন। শুনে আমি তো অবাক!'

আলাপ আলোচনার মধ্যে দিয়ে মনে হোল বিশেষ বিশেষ মানুষের মুখ অনেক সময় চরিত্রচিত্রণে শ'কে সহায়তা করে। বিখ্যাত প্রাণীবিদ্ ডাঃ মরিস্ আর্নে সম্প্রতি আমায় ব'লেছিলেন যে তাঁর ধারণা শ' তাঁর কোন চরিত্র সৃষ্টি করেন লণ্ডনস্থ ভূতপূর্ব তুর্কী রাষ্ট্রদূত মাওয়াসা পাশার ফটো থেকে, কিন্তু ফটোটি যে কার নাট্যকার নিজেও তা' জানতেন না,—না জানলেও ডাঃ আর্নেই সেটি দেখেছিলেন মিঃ শ'র ম্যান্টেলপিসের ওপরে। তাই আমি জি, বি, এস্ কে প্রশ্ন করি, তাঁর কোন্ চরিত্রটি উনবিংশ শতাব্দীর সেই তুর্কী রাষ্ট্রদূতের ছবি অবলম্বনে সৃষ্টি ক'রেছিলেন।

'ব্যাপারটা আমার মনে নেই,' জবাব দেন তিনি। 'তবে অনেক সময় হয় কি, কোন একটি বিশেষ মুখ থেকে চরিত্রের ইঙ্গিত পাই। কিন্তু অপরিচিত লোকের ছবি তখনই কাজে লাগাই যখন দেখি তার মধ্যে আমার নাটকের কোন চরিত্রাভিনেতার উপযুক্ত গঠন-ভঙ্গীমার অভাব নেই। হয়তো মাশুবাস্ পাশার মুখের আদল উনবিংশ শতকে লেখা 'ক্যাপ্টেন ব্রাসবাউণ্ডস্ কনভারশেসন' নাটকের (এটি শ' লিখেছিলেন এলেন টেরীর জন্যে) কোন মুর জাতীয় চরিত্রের উপযুক্ত ছিল।'

'পৃথিবীর বিখ্যাত হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ান মুষ্টিযোদ্ধা জিন্ টানীর সঙ্গে শ'এর অনেকদিনের বন্ধুত্ব। গত গ্রীষ্মে শ' যখন ইংলণ্ডে ছিলেন তখন তার সঙ্গে টানীর দেখা হয় এবং পরে উনি এক ক্লাড়া সাংবাদিককে বলেন যে জি, বি, এস্ এর উপন্যাস 'ক্যাশেল বায়রনস্ প্রফেশান'—যার নায়ক একজন প্রতিযোগী যোদ্ধা, তাঁর মুষ্টিযোদ্ধা জীবনের সুরুতে যথেষ্ট নাকি প্রভাব বিস্তার করে। শ'এর বয়স যখন কুড়ির কোঠায় তখন তিনি যে পাঁচখানা উপন্যাস লিখেছিলেন তারই একখানা হোল এই 'ক্যাশেল বায়রন'। কিন্তু উপন্যাসটি বহু বছর প'ড়ে ছিল কারণ কোন প্রকাশকই তখন সেটি প্রকাশ ক'রতে রাজি হননি।

ব্যাপারটা জানতে পেরে জি, বি, এস্‌কে আমি শেষ প্রশ্ন করি,—'আচ্ছা বলতে পারেন এই অদ্ভুত চরিত্রচিত্রণের দক্ষতা, অসাধারণ পাণ্ডিত্য, আর সাহিত্যপ্রতিভা থাকা

চিত্রবাণী

সত্ত্বেও কেন আপনার আগেকার উপন্যাসগুলি তাদের নাটকগুলির মতো সফল হোলনা? দু'টোর মাধ্যম কি এতই পৃথক কিম্বা দু'টোই আপনার কলমের পক্ষে সমান উপযুক্ত নয়?'

'কি ক'রে তুমি জানলে যে আমার উপন্যাস নাটকের চেয়ে কম সার্থক?' পাল্টা প্রশ্ন করেন শ'। 'অনেক সময় আমার নাটক বছরের পর বছর ধ'রে অনভিনীত প'ড়ে থাকে, কিন্তু উপন্যাস লোকে সমানে কিনে যায় এবং হয়তো পড়েও। আর যদি জিজ্ঞাসা কর উপন্যাস কেন লিখিনা, তাহোলে বলবো, যে মানুষ নাটক লেখে তার কি শোভা পায় উপন্যাস রচনার মতো একটা সহজ কাজে হাত দিতে রাজি হওয়া? যে কেউ উপন্যাস লিখতে পারে, - আর সবচেয়ে মারাত্মক যে সবাই তাই লেখে। হয়তো আরও যখন বুড়ো হ'য়ে আলসে হ'য়ে প'ড়বো তখন ভিক্টোরিয়ান যুগের এই প্রাচীন খেলায় আবার মেতে উঠ্‌বো। আর সেইটাই হবে আমার দ্বিতীয় শৈশব।'

—হিন্দুস্থান ষ্টাণ্ডার্ড থেকে অনূদিত

সোভিয়েট সিনেমা

১৯৩৭ সালে সোভিয়েটে ছিলো তিন হাজার চিত্রগৃহ আর ছত্রিশ হাজার প্রোজেক্টার। এই চিত্রগৃহগুলিতে খুব বেশী হলেও সাতশো করে লোক ধরতো। আর সেই কারণেই দিনে অন্ততঃ আট থেকে বারোটা ক'রে প্রদর্শনী রোজ প্রত্যেক চিত্রগৃহে দেখানো হোতো। এই প্রসঙ্গে রাশিয়ার দর্শকদের সম্বন্ধে ফোর্ড-এর উক্তি উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন—শ্রমিক চলেছে ছবি দেখতে। কোনো চিত্রতারকার নাম সে জানেনা (আর সোভিয়েটে চিত্রতারকা-প্রীতি ও প্রাধান্য নেইও)। পাঁচ রুবল্ খরচ করে সে নিজের ও স্ত্রীর জন্য দুখানি টিকিট কিনলো। প্রেক্ষাগৃহের ভেতরে কিন্তু ধূমপানের বা খাদ্য পানীয় গ্রহণের কোনো রীতি প্রচলিত নেই। ছবিতে সেই গল্প তার পছন্দ, যার মধ্যে প্রচুর এ্যাকশন্ বা নাট্যক্রিয়া আছে, আছে অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের জয়লাভ, আর আছে নায়িকার বীরত্বপনা। মস্কোর প্রেক্ষাগৃহে অনেকে পরস্পরের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলে কিন্তু চিত্রগৃহে এটা খুবই কম দেখা যায়। খুব বিশেষ হাসির দৃশ্য না হলে তারা হাসে না। সংলাপ খুব কমই হাস্যোদ্রেক করে তাদের।

ছবির প্রচার ও প্রদর্শন ব্যবস্থাটি এইরকম। ছবি সমাপ্ত হয়ে গেলে সাধারণে দেখাবার আগে প্রথমে একটি কমিশনের কাছে দেখাতে হয়। এই কমিশনের কাজ ছবি সেন্সার করা। সেন্সারের সময় দুটি বিষয়ের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা হয়। ছবির কোনো অংশ যেন সোভিয়েট শাসন ও গঠনতন্ত্রের অমর্য্যাদা না করে আর সাধারণ রুচি ও নীতিজ্ঞানকে আঘাত না করে। এরপর ছবিটি দেখানো হয় ক্রেমলিনে উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারীদের উপস্থিতিতে। সেন্সারের বেড়া ডিঙ্গিয়ে আসার পরও প্রয়োজন বোধ করলে তারা এই ছবির অদল বদল করতে পারেন। তারপর ছবিটি দেখানো হয় ফিল্ম ক্লাবের সদস্যদের। এই ক্লাবটি হোলো চিত্র-নির্ম্মাণে নিযুক্ত বিভিন্ন কর্ম্মীদের সঙ্ঘ। টেক্‌নিক্যাল দিক দিয়ে ছবিটি বিচার করে তারা একে ছাড়পত্র দেন। এখন ছবিটি চলে গেল ডিষ্ট্রিবিউশান ট্রাষ্টের কাছে। এঁরাই ছবির সার্ব্বজনীন পরিবেশন ও প্রদর্শন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করেন। ট্রাষ্টের কর্ম্মকর্ত্তারা ছবিটি দেখে এই ছবির কতকগুলি কপি তাদের প্রয়োজন তার নির্দ্দেশ দেন। সাধারণতঃ প্রথমেই তারা ছবিবিশেষে একশো কুড়ি থেকে দু'শো চল্লিশ কপি অবধি চেয়ে পাঠান। মস্কোর পাঁচটি বিশেষভাবে নির্দ্দিষ্ট চিত্রগৃহ ছাড়া প্রত্যেকটি ছবিঘরই এই ট্রাষ্টের নিয়ন্ত্রণাধীনে আছে। ছবিঘরের ম্যানেজার তাঁরাই নিযুক্ত করেন। তাছাড়া অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যাপার যেমন কবে কোন্ ছবি দেখানো হবে, কখন ছবি বদল হবে, ছবি দেখানোর সময়, ছবিঘরের প্রবেশমূল্য সবকিছুই তাঁরা ঠিক করেন।

[রজার ম্যানভেল লিখিত 'ফিল্ম' গ্রন্থ থেকে গৃহীত

খ ব রা খ ব র

অবনীন্দ্র জয়ন্তী উৎসব

গত ২৭শে মার্চ রবিবার নবভারতের শিল্পগুরু আচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জয়ন্তী উৎসব পালিত হয়েছে। এই উপলক্ষ্যে ঐদিন সকালে শিল্পগুরুর বরাহনগরের বাসভবন 'গুপ্তনিবাসে' তাঁর গুণমুগ্ধ বহু শিল্পী, সাহিত্যিক ও নাগরিক সমবেত হ'য়ে তাঁকে তাঁদের অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন—নবীন শিল্পীগোষ্ঠীর অন্যতম প্রতিষ্ঠান—'রূপবাণী'।

'রূপবাণী'র পক্ষ থেকে তার সভাপতি ডাঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় মানপত্র পাঠ করতে গিয়ে বলেন--"হে নবভারতের শিল্পদ্রষ্টা ঋষি!...ভারতের জীবনে যুগ যুগ ধরিয়া সত্য, শিব ও সুন্দরের যে উপলব্ধি ঘটিয়াছে, নূতন-ভাবে রূপে, রেখায় ও বর্ণে তুমি তাহাকে পুনঃপ্রকাশিত করিয়াছ।...বঙ্গবাণীর বীণাও অপূর্ব মধুর ও রমণীয় ঝঙ্কারে তোমার করস্পর্শে ঝঙ্কৃত হইয়াছে। তোমার

নানামুখী প্রতিভা দর্শনে আমরা বিস্মিত হই। শ্রদ্ধায় ও কৃতজ্ঞতায় তোমার চরণে আমরা মস্তক অবনত করি।"

শিল্পগুরু তাঁর স্বভাবমধুর ভঙ্গীতে বলেন—"আমি আর্ট নিয়ে সারা জীবন কাটিয়েছি, এইটুকু আমি বুঝেছি রসের ধারা এক। পশ্চিম থেকেই আসুক—পুব থেকেই আসুক, আর্ট এক—তার মধ্যে ভিন্নতা নেই। তবে রূপ এর একটু ভিন্নতর হয়। যেমন বাঙ্গালীর রূপ, ইংরেজের রূপ এক নয়। দেশভেদে—কালভেদে রূপের পার্থক্য হয়।··· তোমরা আর্ট নিয়ে দলাদলি করতে যেয়ো না; করে লাভও নেই।···আমার দেশের আর্ট বড়, ওদের দেশের ভালো নয়, এ বলবার দিন গেছে। সন্দেশ খেয়ে দেখো, এর মতো অপূর্ব জিনিস নেই। কিন্তু সন্দেশ যেমন ভালো, তেমনি ভালো 'কেক্'-ও। আমার কথা হলো—সব আর্টই ভালো।"

এই অনুষ্ঠান যখন সুরু হয়নি, তখন শিল্পগুরুর কাছে ব'সে তাঁর দুই স্নেহাস্পদ তাঁর সঙ্গে যে ঘরোয়া আলাপ-আলোচনা করছিলেন—এই প্রসঙ্গে তার উল্লেখ করা যেতে পারে। কারণ, এইরকম ঘরোয়া-আলাপের মধ্য দিয়ে মানুষ অবনীন্দ্রনাথের যে পরিচয় পাওয়া যায় তার কোনো তুলনা হয় না।

শিল্পগুরু দোতালার বারান্দায় একখানি আরাম কেদারায় বসেছিলেন। তার সামনে অতিথিবৃন্দের জন্যে কার্পেট পাতা। বেলা তখন আটটা হবে। শিল্পগুরু বললেন—"আজ তোমরা সব কি কাণ্ডমাণ্ড বাধাবে বলতো?"

—"রূপযানী-র তরফ থেকে আপনাকে দেশবাসীর শ্রদ্ধা নিবেদনের আয়োজন হয়েছে।"

—"তা এত সব ঘটা করবার কি দরকার? তোমরা আমাকে তোমাদের থেকে আলাদা করে দেখ কেন? আমি তোমাদেরই একজন। এসব formality-র কি প্রয়োজন? তোমরা আমাকে ভালোবাস, আমি তোমাদের ভালোবাসি—এই তো বেশ।"

স্পষ্টই লক্ষ্য করলাম আনুষ্ঠানিকভাবে এই অভিনন্দনের ব্যবস্থায় অবনীন্দ্রনাথ কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করছেন। তাঁর স্নেহাস্পদদের একজন বললেন—"আপনি আজকাল কেমন বোধ করেন? শরীর আগের চেয়ে ভালো তো?"

—"উঁহু, ভালো না। আর বেশি দিন নয়।" একটু থেমে মৃদু হেসে অবনীন্দ্রনাথ বললেন—"জানো মনোজিৎ, রেবতী কি বলে?"

—"কি বলে?"

—"ও হতভাগা বলে কি, রোজ বিকেলে সাইকেল রিক্সায় চেপে ঐ পুলের ধারে বেড়াতে। দেখ তো কি কাণ্ড!" রেবতী জবাব দিলেন—"বলিই তো, আপনি কেন ওরকম মুষড়ে যান?" তাকিয়ে দেখলাম অবনীন্দ্রনাথ রেবতীর দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসছেন!

এমন সময় রাধা ফিল্ম কোম্পানীর একখানি 'ভ্যান' এসে বাগানে ঢুকলো। অবনীন্দ্রনাথ যেন সচকিত হয়ে উঠলেন। বললেন—'ও আবার কি?'

—"রাধা ফিল্ম কোম্পানী এসেছে আজকের অনুষ্ঠানের ছবি তুলতে।'

অবনীন্দ্রনাথের মুখে এবার একটু হাসি দেখা গেল। বললেন—"ও চলচ্চিত্র! তা বেশ! তোমরা ঐ ছবির নাম দিয়ো—চলচ্ছক্তিহীনের চলচ্চিত্র!" জবাব শুনে হাসির রোল পড়ে গেল।

কথাপ্রসঙ্গে উঠলো বিচারপতি রাধাবিনোদ পালের কথা। অবনীন্দ্রনাথ বললেন—"রাধাবিনোদবাবু বাঙালীর মতোই রায় দিয়েছেন জাপানের ব্যাপারে। বাঙালীর মুখ উজ্জ্বল করেছেন তিনি। দেখলে তো, সব শেয়ালের এক রা, কিন্তু বাংলার বাঘের অন্য রা!"

আরও বহু কথা হলো। তাঁর হাতে তুলে দিলাম 'চিত্রবাণী'। কাগজখানি দেখে আনন্দ প্রকাশ করলেন তিনি। ধীরে ধীরে সবাই এসে পড়লেন। সভার কাজ সুরু হলো তারপর।

ঐ দিন বিকেলে 'রূপযানী'র কার্যালয়ে আর একটি

সভা হয়। তাতে বহু শিল্পী ও সাহিত্যিক উপস্থিত হয়ে শিল্পগুরুর বহুমুখী প্রতিভার আলোচনা করেন। এই জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষ্যে অবনীন্দ্রনাথের অঙ্কিত চিত্রের একটি প্রদর্শনীও খোলা হয়েছিল।

বিশ্বের দরবারে বাঙালী

শিক্ষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প ও কৃষ্টির পথে বাঙালী চিরদিনই ভারতের পথপ্রদর্শক। রাজা রামমোহন রায়, স্বামী বিবেকানন্দ থেকে সুরু ক'রে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বাংলাদেশের বহু কৃতী সন্তান বিশ্বের দরবারে বাংলা তথা ভারতের গৌরব ও সম্মান বৃদ্ধি করেছেন। আজও তেমনি ডাক এসেছে বাংলার। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও কৃষ্টি সম্মেলনে (Unesco) ভারতবর্ষ থেকে শিল্পকলা ও সাহিত্য বিভাগে প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছেন—আধুনিক ভারতের শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু, আর সাহিত্যশিল্পী ও চিত্রপরিচালক প্রেমেন্দ্র মিত্র।

গত ৩রা এপ্রিল 'রূপশ্রী' ষ্টুডিওতে 'ভারত লোকচিত্রম্' চিত্র প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে এই উপলক্ষ্যে প্রেমেন্দ্র মিত্র-কে যে সংবর্ধনা জানানো হয়। চিত্রবাণীর পক্ষে আমরাও সেই অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিত হয়ে বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্য শিল্পী ও চিত্র-পরিচালক প্রেমেনবাবুকে আমাদের আনন্দ ও শ্রদ্ধা নিবেদনের সুযোগ পেয়েছিলাম। এই অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্য করেন ডাঃ কালিদাস নাগ। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, প্রেমেন বাবুর এই সম্মানে বাংলাদেশেরই জয় হলো। বাংলাদেশের উপরে যত রকম আঘাত-ই আসুক না কেন, বাংলাদেশ চিরদিনই এমনি করে এগিয়ে যাবে, বিশ্বের দরবারে বাঙালী চিরদিনই ভারতের মুখোজ্জ্বল করবে। সংবর্ধনার উত্তরে প্রেমেনবাবু বলেন যে, আমেরিকায় অবস্থিত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও কৃষ্টি সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধি-রূপে তিনি এদেশের অগ্রগতির পরিচয় দেবারই চেষ্টা করবেন। তাঁর সেই প্রচেষ্টার পিছনে রইলো বাংলাদেশের প্রীতি ও শুভেচ্ছা; সেজন্য আশঙ্কার মধ্যেও তিনি আনন্দিত।

এই অনুষ্ঠানে হেমন্তকুমার সরকার, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, প্রবোধ সান্যাল, নরেন্দ্র দেব, সুধীরেন্দ্র সান্যাল, দেবকী বসু, সুশীল মজুমদার, সুনীল ঘটক, গজেন্দ্র মিত্র, মন্মথ ঘোষ, রাধামোহন ভট্টাচার্য প্রমুখ সাংবাদিক, সাহিত্যিক, চিত্র-পরিচালক, প্রচারশিল্পী ও অভিনেতারা প্রেমেনবাবুর বহুমুখী প্রতিভার উল্লেখ ক'রে বক্তৃতা দেন ও বিশ্বের দরবারে তাঁর আসনলাভে আনন্দ প্রকাশ করেন। প্রেমেন বাবুকে অভিনন্দিত করবার জন্য এই অনুষ্ঠানে আর যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, অজিত দত্ত, মনোজিৎ বসু, গৌর চট্টোপাধ্যায়, ধীরাজ ভট্টাচার্য, শ্রীমতী দীপ্তি রায়, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, অভি ভট্টাচার্য, কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সন্তোষ সেনগুপ্তের পরিচালনায়—'জনগণমন অধিনায়ক জয় হে' গীত হবার পর সভার কাজ শেষ হয়। সমাগত অতিথিবৃন্দকে জলযোগে আপ্যায়িত করেছিলেন 'পঞ্চমিত্রম্'।

পশ্চিমবঙ্গের প্রচার-অধিকর্তা সংবর্ধিত

গত ৩১শে মার্চ বিকেলে শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেডের বাড়িতে পশ্চিমবঙ্গের সাময়িক-পত্র-সঙ্ঘের তরফ থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নবনিযুক্ত প্রচার-অধিকর্তা শ্রীঅমল হোমকে সংবর্ধিত করা হয়। এই অনুষ্ঠানে 'চিত্রবাণী'র পক্ষ থেকেও শ্রীযুক্ত হোম মহাশয়কে বিশেষভাবে অভিনন্দিত করা হয়। পশ্চিমবঙ্গের বহু সাময়িক পত্রিকার সম্পাদক এই সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন। বৃটিশ ও আমেরিকান ইনফরমেশন সার্ভিসের পক্ষ থেকেও প্রতিনিধিরা এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। জলযোগ দিয়ে অনুষ্ঠানের কাজ শেষ হয়। সভার পর শ্রীসরস্বতী প্রেসের স্বত্বাধিকারী শৈলেন্দ্রনাথ গুহ রায় সকলকে একখানি করে সুদৃশ্য দেওয়ালপঞ্জী উপহার দেন।

বার্ণার্ড শ'র জীবন স্মৃতি

বার্নার্ড শ কর্তৃক লিখিত, সম্প্রতি প্রকাশিত, 'সিক্সটিন সেল্ফ্ স্কেচেস' নামক বইয়ের মুখবন্ধে শ বলেছেন "লোকে আমাকে প্রায়ই জিজ্ঞাসা করে আমি আমার আত্মজীবনী লিখিনে কেন। উত্তরে আমি বলি যে আমার জীবনী মোটেই চিত্তাকর্ষক হবে না। আমি কখনও কাউকে হত্যা করিনি। আমার জীবনে সে রকম অদ্ভুত কোন ঘটনাও ঘটেনি"।

৯৩ বৎসর বয়সেও জি, বি, এস পাঠকদের সঙ্গে রসিকতা করেছেন! তাঁর লেখার অন্য বৈশিষ্ট্যগুলিও এখনো বজায় আছে। বইয়ের এক জায়গায় আছে "আমি নিজেকে পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ শিক্ষিত লোক বলে দাবী করি এবং ডিগ্রীধারী খ্যাতনামা পণ্ডিতদের মধ্যে শতকরা ৯৫ জনকে মূর্খ বলে মনে করি। তাঁদের মধ্যে যে মুষ্টিমেয় কয়েকজনের বিশেষ প্রতিভা আছে তাঁদের প্রাপ্য সম্মান দিতে অবশ্য আমি কুণ্ঠিত নই"।

এই বইতে শ'র বাল্য জীবনের অনেক কৌতুকপূর্ণ কাহিনী আছে। আয়ার্ল্যাণ্ডে শৈশব জীবনের বর্ণনা, আত্মীয়দের সংক্ষিপ্ত চরিত্র চিত্রণ, ডাবলিনে কেরাণী জীবনের অভিজ্ঞতা, লণ্ডনে জীবন সংগ্রাম, জনসভায় প্রথম বক্তৃতা দান ইত্যাদির সরস বর্ণনা বইটিকে বিশেষ উপভোগ্য করে তুলেছে।

১৮৮৫ সালে উইলিয়াম আর্চারের সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্ব পর্যন্ত শ লণ্ডনে কিরূপ জীবন যাপন করছিলেন তার বর্ণনাই সর্বাপেক্ষা উপভোগ্য।

শ লিখেছেন "আমার একটি প্রবন্ধ মনোনীত হল এবং তার দরুণ আমি ১৫ শিলিং পেলাম। আমার এক প্রকাশক বন্ধু কতকগুলি পুরানো ছবি কিনে আনেন এবং আমাকে বলেন সেই ছবিগুলির নীচে একটি করে কবিতা লিখে দিতে হবে। স্কুলের ছেলেদের প্রাইজের বইতে সেই ছবিগুলি থাকবে। তিনি যে রকম কবিতা চাইলেন আমি তাঁর এক ব্যঙ্গ রচনা করে তামাসা করার জন্য তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিলাম। তিনি যখন আমাকে ধন্যবাদ জানালেন এবং পারিশ্রমিক হিসাবে নগদ ৫ শিলিং দিলেন তখন আমি বাস্তবিকই হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম। তখন আমার মন একটু নরম হল এবং আমি আর একটি ছবির জন্য একটি সত্যিকারের 'সিরীয়াস' কবিতা লিখে পাঠালাম। তিনি সেটাকে একটা কুরুচিপূর্ণ রসিকতা বলে ভাবলেন এবং আমার কবি জীবনের ওপর এইখানেই যবনিকাপাত হল।

একবার আমি একটা প্রবন্ধ লিখে ৫ পাউণ্ড পেয়েছিলাম. কোন প্রকাশক বা সম্পাদকের কাছ থেকে নয়, এক উকীল বন্ধুর কাছ থেকে। পেটেণ্ট ওষুধ সংক্রান্ত এক আন্দোলন সম্পর্কে চিকিৎসা সম্বন্ধীয় প্রবন্ধটি উকীল বাবুর ফরমাশ মত আমি লিখেছিলাম। এর পর বেশ কিছুকাল রোজগারপত্র কিছুই হয়নি। ন বছরে আমার আয় হয়েছিল ৬ পাউণ্ড। তবু লোকে বলে আমি ভুঁইফোঁড়, আমি নাকি রাতারাতি নামজাদা হয়েছি।"

শিশুদের জন্য চলচ্চিত্র

'চিলড্রেনস্ এন্টারটেনমেণ্ট ফিল্মস' নামে যে প্রতিষ্ঠানটি র‍্যাংক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থেকে শিশুদের উপযোগী চলচ্চিত্র উৎপাদনে মনোযোগী হয়েছেন। তাঁরা ১৯৪৯ সালে শিশুদের জন্য কি কি ছবি তুলচেন তা ঘোষণা করেছেন। তাঁরা ছ'টি বড় কাহিনী-চিত্র ছাড়াও সাধারণ বিষয় নিয়ে কয়েকটি সীরিয়ল এবং ছোট ছোট ছবি তোলার পরিকল্পনা করেছেন। গত বছর এই প্রতিষ্ঠানটি চারটি বড় ছবি তোলেন, প্রত্যেকটি নূতন ধরণের। ছবিগুলি এবছর এপ্রিলের গোড়ার দিকে মুক্তি পাবে আশা করা হয়।

১৯৪৪ সালে প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হওয়ার পর থেকেই ক্রমশঃ ছবির উৎপাদন বেড়ে চলেছে এবং কেবল পরিমাণের দিক দিয়ে নয় উৎকর্ষের দিক দিয়েও তার উন্নতি লক্ষণীয়। চিত্রগৃহে প্রত্যেক শনিবার সকালে ছেলেমেয়েদের ছবি দেখাবার সময় তাদের প্রতিক্রিয়া সাগ্রহে লক্ষ্য করা হয়, কারণ সেই বুঝে ছবিকে আরও বেশী আকর্ষণীয় করার জন্য বিষয়বস্তু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করার প্রয়োজন হতে

পারে। এতে প্রত্যেক বছর কেবল ছবির সংখ্যা নয় তার মনোরঞ্জনী শক্তিও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এই সব ছবি তোলার কাজে বিভিন্ন দৃশ্যের জন্য 'চিল্‌ড্রেন্‌স্‌ এণ্টারটেনমেণ্ট ফিল্‌মস্‌' প্রতিষ্ঠানকে ইংলণ্ডের বাইরেও যেতে হয়েছে। গত বছর 'দি মিষ্ট্রী অব দি স্নেক স্কিন বেল্ট' ছবিখানি তোলা হয় রোডেসিয়ায়। এ বছর আরও দু'খানি ছবি সেখানে তোলা হচ্ছে, তার একটিতে পরিবারের অন্য সকলের সঙ্গে ছেলেমেয়ের একটি দল কিভাবে বনে জঙ্গলে রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতালাভ করছে তা দেখানো হয়েছে। ছবিটিকে ঐতিহাসিক পটভূমিকায় তোলার চেষ্টা হচ্ছে। এ বছর আরও দুখানি ছবি অষ্ট্রিয়ায় তোলার পরিকল্পনা হয়েছে। প্রথমটিতে বরফের মধ্যে 'স্কির' কৌশল দেখানো হবে, তাছাড়া এতে আল্পাইন পাহাড়ের পটভূমিতে নানা বিচিত্র দুঃসাহসিকতাপূর্ণ ঘটনাবিন্যাস থাকবে। কয়েকটি স্বতন্ত্র দল এই সব দেশে গিয়ে স্থানীয় ছেলেমেয়েদের নিয়ে ছবি তুলবে। শিশু দর্শকদের আনন্দ বর্ধনের সঙ্গে তাদের মধ্যে দেশবিদেশের ভৌগলিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কৌতূহল জাগানো এঁদের কাজ। তাছাড়া বহির্জগতের ছবি দেখতে ছেলেমেয়েরা সত্যই ভালবাসে। কাহিনীর কাঠামো তৈরী করে নিয়ে প্রথমে এই সব ছবি আরম্ভ হলেও অনেক সময় স্থান কাল এবং শিশু অভিনেতাদের গুণাগুণ হিসাবে কাহিনীর স্থানে স্থানে পরিবর্তন করার প্রয়োজন হয়, সেইজন্য ছবিগুলির প্রথমেই নামকরণ করা হয় না। ছবি তোলা শেষ হলে ছবির বিষয়বস্তু বিচার করে উপযুক্ত নামকরণের চেষ্টা হয়।

গত বছর বৃটেনে যে তিনটি ছবি তোলা হয় তা সত্যই কৌতূহলোদ্দীপক, বিষয়বস্তুও বিচিত্র। তার মধ্যে 'রাইডার্স অব দি নিউ ফরেষ্ট' ছবিটি সব দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ। হ্যাম্পশায়ারের অরণ্য পটভূমিকায় তা তোলা হয়। অন্যটি হল 'ট্রাপড্‌ বাই দি টেরর,' ইংলণ্ডের গৃহযুদ্ধের সময়-কালীন কাহিনী নিয়ে তোলা। বিষয়বস্তুও খুব রোমাঞ্চকর, কিন্তু ভয়ংকর যা কিছু সব বাদ দেওয়া হয়েছে যাতে শিশুদের সুকুমার মনের উপর কোন রকম ভয়ের ছাপ না রাখে। তৃতীয়টি প্রহসন, তার নাম 'থ্রি ব্যাগস্‌ ফুল্‌', এর প্রধান ভূমিকা গুলিতে বয়স্ক লোকেরা অংশ গ্রহণ করেছেন। সাধারণতঃ সমস্ত ছবিতেই ছেলেমেয়েদের দিয়ে প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করানো হয় এবং বিশেষ করে মেয়েদেরই তাতে প্রাধান্য দেওয়ার চেষ্টা হয়ে থাকে। শিশু দর্শকদের হাবভাব লক্ষ্য করে দেখা গেছে যে মেয়েদের প্রতি এই পক্ষপাতে ছেলেরা আপত্তি করা দূরে থাকুক বরং খুসীই হয়। বৃটেনে প্রতি বছর বহু বিদেশী ছেলেমেয়ে অতিথি হিসাবে স্থানীয় ছেলেমেয়েদের সঙ্গে শনিবারের সকালের 'শো'তে ছবি দেখে এবং খুশী হয়। বর্তমানে ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড এবং হল্যাণ্ডে 'চিল্‌ড্রেন্‌স্‌ এণ্টারটেনমেণ্ট ফিল্‌মসের' তোলা সমস্ত ছবি পাঠানো হচ্ছে।

মৎস্যশিল্প সংক্রান্ত চিত্র

মৎস্য শিকার ও মৎস্য ব্যবসায় সংক্রান্ত 'ইউরোপস্‌ ফিসারিজ্‌ ইন ডেন্‌জার' নামক ছবির চিত্র গ্রহণ করার জন্য 'দিস্‌ মডার্ণ এজ' প্রতিষ্ঠানের একটি দল বিভিন্ন বন্দরে পরিভ্রমণ করেন এবং মৎস্যশিকারপোতে কয়েকবার সমুদ্রযাত্রা করেন। চিত্রের বক্তব্য বিষয় হল এই যে মৎস্য ব্যবসায় সংক্রান্ত কতকগুলি সমস্যা বৃটেনের সম্পূর্ণ নিজস্ব কিন্তু সামুদ্রিক মৎস্যশিকার সংক্রান্ত কতকগুলি সমস্যা বৃটেনের একার নয়। ফ্রান্স, নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক, স্পেন, পোর্তুগাল এবং আইসল্যাণ্ড প্রভৃতি ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলির সম্মুখেও এই সমস্যাগুলি বর্তমান। শীতকালে গভীর সমুদ্রে মৎস্য শিকার যে কিরূপ কষ্টসাধ্য তার বাস্তব চিত্রগ্রহণের জন্য এই দলটি বীয়ার দ্বীপে গিয়েছিলেন এবং একটি মৎস্য শিকারপোতে পঁচিশ দিন অবস্থান করেছিলেন। নিদারুণ শীতে মৎস্যশিকারীদের দিনের মধ্যে ১৮ ঘণ্টা পর্যন্ত কাজ করতে হয়। শীতকালে এই স্থানে তাপের মাত্রা শূন্য ডিগ্রীরও নীচে নামে এবং ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২২ ঘণ্টা এই স্থান সম্পূর্ণ অন্ধকার থাকে। চিত্র গ্রহণের জন্য যে সমস্ত আলো জ্বালাতে হয় ভীষণ ঝড়ে সেগুলি বারবার নিভে যায় এবং স্থানচ্যুত হয়।

চিত্রবাণী

ছাত্রদের পরিচালিত বেতার

আমেরিকা ও কানাডার কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ছিয়ানব্বইটি ছোট বেতার কেন্দ্র কিছুদিন ধরে পরিচালনা করছেন। যেসব ছাত্র বেতারশিল্পে যোগ দিতে চান, তাঁদের শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে আমেরিকার গভর্ণমেণ্ট এই ব্যবস্থা অনুমোদন করেছেন। এই সব বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত অনুষ্ঠান প্রায় দু'লক্ষ শ্রোতা নিয়মিত শোনেন। বেতার কেন্দ্রগুলির যাবতীয় উপকরণের মধ্যে তেমন কোনো বিশেষত্ব নেই। তবে এর শব্দ-তরঙ্গের গতি সীমাবদ্ধ। ফলে এক কলেজ থেকে প্রচারিত অনুষ্ঠান অন্য কলেজের ছাত্ররা শুনতে পান না। অবশ্য সম্প্রতি এর ব্যতিক্রম করা হয়েছে। নিউইয়র্ক ষ্টেটের এগারোটি কলেজকে একটি নেটওয়ার্ক গড়ে তোলবার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এই ব্যবস্থায় এক কলেজ থেকে প্রচারিত অনুষ্ঠান কাছের অন্য কোনো কলেজের ছাত্ররাও অনায়াসে শুনতে পাবেন। এই সব বেতার-কেন্দ্র পরিচালনা ও বেতার অনুষ্ঠান পরিকল্পনার জন্যে প্রায় তিন হাজার ছাত্রকে কাজ করতে হয়। বেতার-কেন্দ্র পরিচালনার খরচ যোগান সংশ্লিষ্ট কলেজ, ছাত্র-শ্রোতা আর স্থানীয় ব্যবসায়ী মহল। অবশ্য ব্যবসায়ীরা বিজ্ঞাপনের বদলে টাকা দেন।

চিত্র সমালোচকের ফ্যাসাদ

মিস্ আরনট রবার্টসন বনাম মেট্রো-গোলডুইন মেয়ার মামলাটি লণ্ডনের চলচ্চিত্রমহলে চাঞ্চল্যের সঞ্চার করেছে। মিস্ আরনট বি, বি, সি বেতার প্রতিষ্ঠানের চলচ্চিত্র সমালোচক। তিনি ছবিতে যেমন দেখেছিলেন ঠিক তেমনভাবেই সমালোচনা করেছেন। ১৯৭৬ সালে এম-জি-এম বি-বি-সির বিরুদ্ধে এইরূপ অভিযোগ আনেন যে—বি-বি-সির সমালোচক লক্ষ লক্ষ চলচ্চিত্রদর্শকের রুচি এবং আনন্দের খোরাক সম্বন্ধে কোন খোঁজই রাখেন না। ফলে মিস্ রবার্টসনকে আদালতের সাহায্য নিতে হয় এবং ক্ষতি-পূরণ স্বরূপ তিনি দেড় হাজার পাউণ্ড লাভ করেন। কিন্তু এম-জি-এম আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করে জয়লাভ করেন, এতে তরুণী মহিলাটি একেবারে নিরুৎসাহ হয়ে পড়েন। সহৃদয় সমালোচকেরা তাঁর প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে হাউস অফ লর্ডস্-এ আপিল করবার জন্যে একটি সাহায্য ভাণ্ডার খোলেন। এই সাহায্য ভাণ্ডারকে পুষ্ট করতে প্রথমে এগিয়ে এলেন নামকরা সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানগুলি। বর্তমানে এই সাহায্য ভাণ্ডারে ছ'হাজার পাউণ্ড জমেছে।

অননুমোদিত ছবি

পশ্চিম বঙ্গ সেন্সর বোর্ড কুরুচিপূর্ণ বলে 'দেওয়ানদোর' হিন্দী ছবিটিকে পশ্চিম বঙ্গে প্রদর্শনের অনুমতি দেননি।

শ' সেক্সপীয়র সাক্ষাৎকার

আগামী ম্যানভার্ন উৎসবে অভিনয়ের জন্য বার্ণার্ড শ' সম্প্রতি একটি নাটক লিখেছেন। অভিনয় প্রযোজনার ভার নিয়েছেন ল্যাঙ্কেষ্টার ম্যারিওনেট থিয়েটার। নট-নটীরা কিন্তু মানুষ নয়—পুতুল।

এই নাটকে শ' ও সেক্সপীয়রের মধ্যে এক সাক্ষাৎ-কারের কাহিনী অমিত্রাক্ষর ছন্দে বর্ণিত হয়েছে। এই পুতুল অভিনয়ের প্রথম প্রদর্শনী হবে সম্ভবতঃ আগামী ১ই আগষ্ট তারিখে, ম্যানভার্নে।

লণ্ডনে চারুকলা প্রদর্শনী

লণ্ডনে কলারসিকদের জন্য এক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে।

অষ্ট্রিয়া ও জার্মানী থেকে আনীত জগদ্বিখ্যাত শিল্পিগণ কর্তৃক অঙ্কিত মূল্যবান চিত্রাবলী এই প্রদর্শনীর শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ হবে।

মুনিক থেকে যে ১২০ খানি চিত্র আনা হয়েছে তার মধ্যে রুবেনসের অঙ্কিত ১৬ খানি এবং ভ্যান ডাইকের ৭ খানি চিত্র আছে।

রাশিয়ার থিয়েটার

ভারতস্থিত সোভিয়েট কূটনৈতিক দপ্তরের সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি মাদাম এরজিনা লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপের সভায় রাশিয়ার থিয়েটার প্রসঙ্গে বলেন—রাশিয়ায়

থিয়েটার কেবল জনসাধারণকে আনন্দই বিতরণ করে না, জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের কাজে সহায়তাও করে এবং শিল্পীরাও সোভিয়েট সমাজে সম্মানজনক স্থান পান। রাশিয়াতে কিশোরকিশোরীদের জন্য বহু থিয়েটার আছে। এতে যে সকল নাটক অভিনীত হয়, সেগুলি কিশোর কিশোরীদের উপযোগী করে লেখা হয় এবং এই সব নাটকে অংশ গ্রহণ করেন প্রতিভাশালী শিল্পীরা, কারণ শিশুদের শিক্ষা এবং তাদের চরিত্র গঠনের ব্যবস্থাকে সোভিয়েট দেশে বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, আর একাজে রঙ্গমঞ্চ একটি কার্য্যকরী মাধ্যমরূপে সর্ব্বত্র স্বীকৃত হয়েছে।

রাশিয়ায় বেশীর ভাগ কারখানারই নিজস্ব ক্লাব আছে। এই সব ক্লাবে রাশিয়ার জনপ্রিয় নাটক অভিনীত হয়, এই জন্যে সেখানে অনেক সখের দল রয়েছে। এতে প্রায় দশ হাজার সৌখিন (পেশাদারি নয়) পরিচালক আছেন। সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত এশিয়াস্থিত রিপাবলিক দেশসমূহেও মঞ্চাভিনয় বেশ জনপ্রিয়। এবং এই সব দেশে অভিনয় হয় নিজ নিজ দেশের মাতৃভাষায়।

যদিও ভারতের কয়েকটি ক্লাসিক গ্রন্থ রুশ ভাষায় অনূদিত হয়েছে, তবুও সেখানে আজ পর্য্যন্ত কোন ভারতীয় নাটক অভিনীত হয়নি। কিন্তু বর্ত্তমানে ভারতীয় সাহিত্য এবং জীবনধারার প্রতি সেখানকার লোকের আগ্রহ বেড়েছে, তার ইঙ্গিত পাওয়া যায় ভারতীয় ক্লাসিকের অনুবাদে, তাতে আশা করা যায় যে ইংরাজি নাটকের মত ভারতীয় নাটকও সেখানে অভিনীত হবে।

প্রযোজক বটে তবে দর্শক নন

আপনারা এমন অসম্ভব কথা শুনেছেন যে কোন লোক চলচ্চিত্রশিল্পে লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়োগ করেন কিন্তু একটিও ছবি দেখেন না। তিনি হলেন মিঃ হ্যারল্ড সি ড্রেটন, অগাধ টাকার মালিক, ৪৬ বছর তাঁর বয়স, গত ছ'বছর তিনি এই চিত্র ব্যবসায়ে লিপ্ত আছেন, এই সময়ের মধ্যে তিনখানি বৃটিশ ছবি থেকে তিনি প্রায় ১০০০০০০ পাউণ্ড পেয়েছেন, এর মধ্যে একটি ছবি হচ্ছে অ্যানা নিগলের 'দি কোর্টনিস্ অফ কারজন ষ্ট্রীট'। মিঃ ড্রেটন ৩২ বছর আগে সপ্তাহে ১৯ শিঃ ৮ পেঃ বেতনে সামান্য চাকরিতে ঢোকেন। ছবির ব্যাপারে তিনি কিছুই জানেন না, তবে যদি কেউ কোন সুচিন্তিত এবং লাভজনক পরিকল্পনা দেন, তাতে তিনি টাকা দিতে প্রস্তুত আছেন। মিঃ ড্রেটন বৃটিশ লায়ন ফিল্ম কোম্পানী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত আছেন।

কিশোরের খেয়াল

ন বছরের এক অসাধারণ শিল্পপ্রতিভাসম্পন্ন কাশ্মীরী বালক সিগারেটের প্যাকেটের সেলোফেন কাগজ দিয়ে ফিল্মের রোল তৈরী ক'রে ডিসনের কার্টুনের অনুকরণে কাশ্মীর যুদ্ধের ছবি এঁকে, কাশ্মীর যুদ্ধচিত্র তৈরী করেছে। এইটিই তার প্রথম ছবি। কার্ডবোর্ডের তৈরী প্রোজেক্টার দিয়ে এই ছবি দেখান হয়। ছবির আনুষঙ্গিক বর্ণনা করে সে নিজেই, সে এই বলে বর্ণনা শেষ করে যে, এই ছবিটি তার ট্রায়াল ছবি অর্থাৎ পরীক্ষামূলক ছবি। সে একটি শিক্ষামূলক ছবি তৈরী করতে চায় এবং বর্ত্তমানে সে পৃথ্বীরাজ ও জয়চাঁদ এর কাহিনী নিয়ে এই রকম ছবি তৈরী করতে ব্যস্ত।

বিদেশী কাহিনীর প্রভাব !

বর্ত্তমানে ভারতীয় ছায়াছবির কাহিনীর ওপর হলিউডের ছবির প্রভাব বেড়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে বোম্বাইয়ের একটি ষ্টুডিওতে 'লিভ হার টু হেভেন' এর একখানি ভারতীয় সংস্করণ তোলা হচ্ছে। এতে শুধু নায়ক নায়িকার চরিত্রের কিছু কিছু অদল বদল করা হয়েছে। 'রতন' ছবির মতো করে 'উদারিং হাইট' এর হিন্দী চিত্ররূপ তোলা হচ্ছে। অন্ততঃ দুটি ছবি বিখ্যাত ইংরাজী উপন্যাস এবং ছায়াছবি 'ইষ্ট লাইন' এর কাহিনী দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছে আর অন্ততঃ একখানি ছবি যা নামকরা নটনটীদের নিয়ে তোলা হচ্ছে তার কাহিনী ও চরিত্রচিত্রণ স্পষ্টই 'গন্ উইথ দি উইণ্ড' চিত্রের দ্বারা অনুপ্রাণিত দেখা যাচ্ছে।

আপনাদের চিঠি
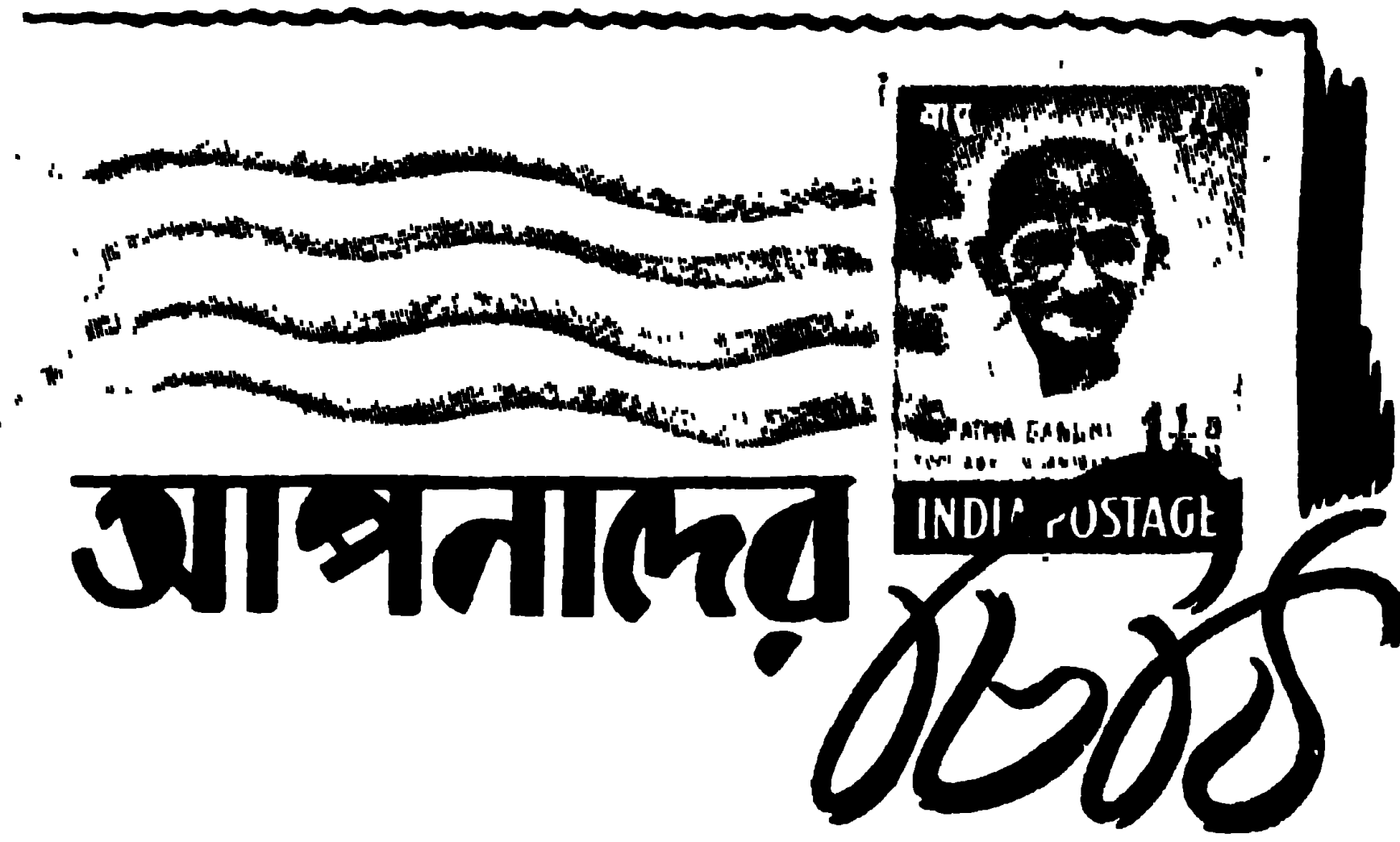
কানন চট্টোপাধ্যায়, রাঁচী

আপনি লিখেছেন- "আপনাদের চিঠি"—এ' বিভাগ আমি পূর্বের পূজাসংখ্যায় ও এ' **সংখ্যাও** পড়লাম কিন্তু আমার মনের মতন এ' বিভাগটা লাগলো—না, **তাহার** কারণ হচ্ছে—পাঠকরা যা প্রশ্ন ক'রে থাকেন--**তাহার** উত্তর আপনাদের **কাছে হতে** পুরাপুরী দেখলাম না, আর **যাদিয়ে** থাকেন—প্রশ্ন পড়ে মনে হয় **নেহত** দায়ে পড়ে উত্তর দেন! **তাহা** ছাড়া আরেকটা **বিশয়** সকলের দৃষ্টি **আক্রশনক'রে**—সেটা হচ্ছে আপনাদের **ড়ূড় ব্যাবহার —যান** (খুব সম্ভব দেন ?) প্রশ্ন পড়ে প্রশ্নদাতাকে মারতে চান—এ ছাড়াও আরও অনেক কিছু আছে--যা **একজন "চিত্রবাণী"** সম্পাদকের পক্ষে মোটেই **শোভনিয়** নয়। যদি আপনি নিজেকে সম্পাদকের **অনউপযুক্ত**মনে **ক'রেন তাহালে**—আমার অনুরোধ—আপনি কিছুদিন " " মাসিক পত্রিকার সম্পাদক--শী —এঁর অধীনে থেকে কিছুদিন কাজ করুন—**তাহালে—**"চিত্রবাণী"র মতন পত্রিকা —একদিন"···"র মতন **জনপ্রিয়তা** হয়ে উঠবেই, আর যদি নিজের **মতের মতন** চলতে চান ?—**তাহালে** "চিত্রবাণী" —এইখানেই ইতি। এ সব কথা লিখলাম এইজন্য যে, আমি একজন···র **প্রকিত** ভক্ত—আর "চিত্রবাণী"কেও গ্রহণ করেছি কিন্তু, তার···জন্য ভালো ভাবে করতে পারি নাই। যাক আশা করি **আপনার** আমার এ' পত্র ডাস্টবিনের মধ্যে না ফেলে "চিত্রবাণীর" **পিষ্টায়** আশ্রয় দিবেন, **তাহালে** আপনাদের মনের খানিকটা এ' বুঝতে পারিব। **পষ্ট** কথা লেখার জন্য রাগ করবেন না। নমস্কার গ্রহণ করুন।

আপনার নমস্কার গ্রহণ করেছি। স্পষ্টই ব'লে রাখছি আপনার **পষ্ট** কথা লেখার জন্যে রাগ করিনি। কারণ রাঁচী-বাসীদের (!) উপরে রাগ করাটা আমার স্বভাব-বিরুদ্ধ। তার ওপরে আপনি আশা করেছেন আপনার পত্র যাতে আমি ডাস্টবিনের মধ্যে না ফেলে 'চিত্রবাণী'র **পিষ্টায়** আশ্রয় দিই। আশ্রয়প্রার্থীরা চিরদিনই করুণার পাত্র। তাঁদের আশাভঙ্গ করা উচিত নয়। আমিও আপনার আশা ভঙ্গ করিনি, তা আপনার চিঠির উদ্ধৃত অংশ দেখেই বুঝতে পারবেন। ডাস্টবিনে সাধারণতঃ ময়লা জিনিস ফেলা হয়। কিন্তু সে নোংরা প'চে গেলে অনেক সময় মিউনিসিপ্যাল বা কর্পোরেশনের গাড়িও তা নিতে রাজী হয় না। তখন পাড়া-প্রতিবেশীদের সাহায্যেই সেই নোংরা পরিষ্কার করতে হয়। পাড়া-প্রতিবেশীদের আর কষ্ট দিয়ে লাভ কি বলুন ? 'চিত্রবাণী'র উন্নতির জন্য আপনি আমাকে কোনো একটি মাসিক পত্রিকার সম্পাদকের অধীনে (স্বাধীন দেশেও আবার অধীনতা! ছিঃ চাটুজ্জেমশাই!) কাজ করতে যে অযাচিত উপদেশ দিয়েছেন, সেজন্য আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।

চিত্রবাণী

কিন্তু আমার শুভানুধ্যায়ীরা বলছেন অন্য কথা। তাঁরা বলছেন—আপনার কাছেই সম্পাদনা শিখতে। কারণ, আপনার চিঠিখানি তাঁদের এত মুগ্ধ করেছে যে, তাঁরা বলছেন, আপনার চিঠি থেকেই যখন বহু কিছু শেখবার সম্ভাবনা রয়েছে, তখন আপনার কাছে আরও ন' জানি কত বহুমূল্য জিনিস শেখা যাবে! যাঁরা আপনার চিঠিখানি পড়েছেন তাঁরা প্রত্যেকেই আপনার ভাষাজ্ঞান ও বানানের ভূয়সী প্রশংসা করছেন! আপনার রাঁচী-বাস সার্থক হয়েছে এই তাঁদের সুস্পষ্ট অভিমত! চিঠির জবাব শেষ করবার আগে একটা কথা আপনাকে ও আপনার মতো সৎপরামর্শদাতা পাঠকবর্গকে জানিয়ে রাখি যে, ভবিষ্যতে এইরকম শিক্ষামূলক চিঠি পেলে আমরা তা 'চিত্রবাণী'-তে না ছেপে বাঁধানো খাতায় এঁটে রাখব। কারণ, একদিন না একদিন দেশের যাদুঘরে এই জাতীয় অমূল্য সম্পদ সযত্নে সংরক্ষিত হবেই!

রঞ্জিৎ গুপ্ত, বারাকপুর

আপনি জানিয়েছেন 'কোন একটি পত্রিকায় লিখেছে—আজকাল ছেলেরা সংস্কারমুক্ত নয়, তাই তারা দলে দলে সিনেমায় নামছে না—একথা সত্যি কি? তাহলে জানাচ্ছি যে আমি সিনেমায় নামতে চাই। আমার বর্তমান বয়স ১৬ বছর ৪ মাস। বহু রজনীর নাট্যাভিনয়ে আমার অভিজ্ঞতা আছে।' এই মূল্যবান কথাটি কোন্ পত্রিকায় লেখা হয়েছে, তা আপনি জানান নি। আমরা ত মনে করি ব্যাপারটি ঠিক উল্টো। আপনি যে এত অল্প বয়সে এত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন জেনে বেশ খুশী হলাম। ছায়াচিত্রে আপনি সুযোগ পেলে আমরা খুশীই হবো জানবেন, যদিও এ বিষয়ে আপনাকে সাহায্য করার ক্ষমতা আমাদের আয়ত্বের বাইরে। আপনি জিগ্যেস করেছেন, বাংলা ছবির উন্নতির উপায় কি কি? এ শিল্পটির ভিতরে ও বাইরে অযোগ্যদের দৌরাত্ম্যের অবসান যতদিন না হয় ততদিন উন্নতির আশা নেই।

ডি, আর, সরকার, ভাস্তাড়া, হুগলী

১৯৪৮ এ কোন্ অভিনেতা ও কোন্ অভিনেত্রী সর্বাপেক্ষা বেশী সংখ্যক ছবিতে অভিনয় করেছেন? আপনার এই প্রশ্নের উত্তরে জানাচ্ছি যে অহীন্দ্র চৌধুরী ও রেণুকা রায় সবচেয়ে বেশী ছবিতে অভিনয় করেছেন। অহীন বাবু মোট ন' খানা ছবিতে অবতীর্ণ হয়েছেন। সে ছবি হলো—ঘুমিয়ে আছে গ্রাম, প্রিয়তমা, বিচারক, সাহারা, ভাইবোন, স্যার শঙ্করনাথ, কালোঘোড়া, নন্দরাণীর সংসার ও জয়যাত্রা। আর রেণুকা রায় অভিনীত সাতখানি ছবি হলো—ঘুমিয়ে আছে গ্রাম, স্যার শঙ্করনাথ, তরুণের স্বপ্ন, বঞ্চিতা, রংবেরং, নারীর রূপ ও সমাপিকা। আপনি জানতে চেয়েছেন অভিনেতা হিসেবে ছবি বিশ্বাস ও প্রমথেশ বড়ুয়ার মধ্যে কে বেশী দক্ষ? এ প্রশ্নের দুটো দিক আছে। প্রথম কথা ছবি বিশ্বাস যত বিভিন্ন ও বিচিত্র ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করেছেন, বড়ুয়ার কাছ থেকে তা পাই নি। আবার বড়ুয়া যে ধরণের ভূমিকায় অবিস্মরণীয় অভিনয় কৌশল দেখিয়েছেন ছবিবাবুকে সেই রকম কোন ভূমিকায় আমরা দেখি নি। তবে অভিনীত ভূমিকার সংখ্যা ও বৈচিত্র্য বিবেচনা করলে, ছবিবাবুকেই এ দুজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন দেওয়া যায়। 'আপনি কি বলেন' বিভাগটি ফাল্গুন সংখ্যায় ছিল না বলে আপনি দেখছি বিষণ্ণ হয়েছেন। আপনারা কিছুই বলার মত বলেননি বলেই গত মাসে এই বিভাগটি বাদ গেছে। আপনার শেষ প্রশ্ন, 'ধাত্রী দেবতা' ও 'বাঁকালেখা'য়—অনুপকুমার নামে যে শিল্পী অভিনয় করেছিলেন তাঁর প্রকৃত নাম কি? এই শিল্পীর অন্য দ্বিতীয় নাম আছে বলে আমাদের জানা নেই।

সমর ঘোষ ও সৈয়দ হায়দর, চার্চ রোড, মেদিনীপুর

আপনাদের প্রথম প্রশ্ন, সুরশিল্পী পঙ্কজ মল্লিক ও রাইচাঁদ বড়াল ছাড়া অন্য কোন সুরশিল্পীর কি নিউ থিয়েটার্সের তরফ থেকে সঙ্গীত পরিচালনা করার অধিকার নেই?

কে কে প্রোডাকসন্সের আগামী চিত্র মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'পুতুল নাচের ইতিকথা'য় মতির ভূমিকায়
অমিতা বসু

ভারতী চিত্রপীঠের 'দাসীপুত্র' ছবিতে দীপক, দেবীপ্রসাদ ও পাঁ[illegible]বাবা

রূপায়ণ চিত্র প্রতিষ্ঠানের আগত-প্রায় নিবেদন 'দেবী চৌধুরাণী' চিত্রের নাম ভূমিকায় সুদর্শনা সুমিত্রা দেবী

পঙ্কজবাবু ও রাইবাবু হলেন বাঁধা শিল্পী। তাঁদের দিয়েই সুর সৃষ্টির কাজ করিয়ে নেন নিউ থিয়েটার্স। অন্য কোন শিল্পীর নিউ থিয়েটার্সের হয়ে কাজ করার অধিকারের প্রসঙ্গ অবান্তর। সেরকম কোন প্রয়োজনই নেই।

"কয়েক মাস পূর্ব্বে কোন সাপ্তাহিক পত্রিকায় পড়েছিলাম যে চিত্র-পরিচালক হেমচন্দ্র 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকটিকে চিত্রে রূপ দেবেন, এ সম্বন্ধে আপনি কোন খবর রাখেন কি?" আপনার এ প্রশ্নের জবাব হলো, হেমচন্দ্র বর্তমানে নিউ থিয়েটার্সের 'বিষ্ণুপ্রিয়া' ছবির কাজ নিয়ে ব্যস্ত আছেন। 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকের চিত্ররূপের কোন খবর আমরা পাইনি।

'চিত্রাভিনেত্রী সুনন্দা, সুবাইয়া ও সুমিত্রার মধ্যে অভিনয়ের দিক থেকে কে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করতে পারেন?' এঁদের মধ্যে নিঃসংশয়ে সুনন্দা দেবী শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করতে পারেন।

এম, এ মস্রাফ, তেজপুর আসাম

আপনি লিখছেন, "আপনার 'চিত্রবাণী'র পৌষ সংখ্যায় 'আনন্দবাজার পত্রিকা' থেকে সংকলিত 'পুরাতনী' বিভাগে 'জাতীয় সঙ্গীতের ধারা' নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মহাকবি ইকবাল সাহেবের 'চীন ও আরব হামারা হিন্দোস্তাঁ হামারা' কবিতার সমালোচনা করতে গিয়ে যে ভুল ভাষা এবং ভুল অর্থ ব্যবহার করেছেন সে সম্বন্ধে কিছু না লিখে থাকতে পারলুম না। কবি ইকবাল সাম্প্রদায়িক ভাবাপন্ন লোক ছিলেন কি না সে সম্বন্ধে আমি কিছু জানিনা, কিন্তু কবি এই কবিতাটি সাম্প্রদায়িক মনোভাব নিয়ে লেখেন নি, জাতীয়তাবাদী মনোভাব নিয়ে লিখেছেন। তাই তিনি গেয়েছেন, 'সারা জাঁহাসে আচ্ছা হিন্দোস্তাঁ হামারা।' তিনি কেবলমাত্র স্বদেশপ্রেমিকই নন, তিনি হয়েছেন বিশ্বপ্রেমিক, তাই তিনি নিজের জন্মভূমি ভারত, এশিয়া তথা বিশ্বপ্রেমের গান গেয়েছেন, 'চীন ও আরব হামারা হিন্দোস্তাঁ হামারা, মুসলিম হ্যায় হাম্ ওয়াতন হ্যায় সারা জাঁহা হামারা'। অর্থাৎ চীন ও আরব আমাদের, ভারতবর্ষ আমাদের, মুসলমান ধর্মে বিশ্বাসী, আমি সমগ্র পৃথিবীকে ভালোবাসি (বিশ্ব আমার মাতৃভূমি)।

'তেগোঁকে সায়েমে হাম্ পলকার জাওয়া হুয়ে হ্যায় খঞ্জর হেলাল কা হ্যায় কোমি নিশা হামারা'। তারপর তিনি পৃথিবীর ধ্বংসকারদের সাবধান করে দিয়েছেন তাঁর উপরোক্ত কবিতায়—তলোয়ারের ছায়াতলে (অর্থাৎ যুদ্ধ-বিগ্রহের মধ্যে) আমরা জোয়ান হয়েছি, তীক্ষ্ণ তলোয়ার ও অর্ধচন্দ্র আমাদের জাতীয় চিহ্ন (National Symbol), কাজেই হে ধ্বংস ও বিভেদ সৃষ্টিকারির দল সাবধান হও, নইলে আমরা তোমাদেরও নিশ্চয়ই ধ্বংস আনিব। সাবিত্রীবাবু উপরোক্ত গানটিকে কেন যে সাম্প্রদায়িক মনে করলেন বুঝতে পারলুম না। তিনি একই প্রবন্ধে কামিনীবাবুর 'অবনত ভারত চাহে যে সুদর্শনধারী মুরারী' স্বামী প্রজ্ঞানন্দের 'বাজিত মোহন বাঁশরী', বাবু অশ্বিনীকুমার দত্তের 'ভোর হলো গো, দুর্গা বল গো উঠ গো বাবুজি' প্রভৃতি গানকে দেশাত্মবোধক এবং জাতীয় সঙ্গীত বলে আখ্যা দিয়েছেন, কিন্তু ইকবালের গানের অর্থ না বুঝেই সাম্প্রদায়িক বলে ফেলেন। সাবিত্রীবাবু যদি এ সম্বন্ধে আমাকে দয়া করে বুঝিয়ে দেন তা হলে সত্য সত্যই কৃতজ্ঞ হবো।"

আপনার চিঠিটি আমি সাবিত্রীবাবুকে দেখিয়েছিলাম। আলোচ্য রচনাটি অবশ্য কয়েকবছর আগে শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। আপনার বক্তব্যের উত্তরে সাবিত্রীবাবু যে চিঠিটি লিখেছেন তা আমরা এখানে ছেপে দিচ্ছি—

"আপনি 'জাতীয় সঙ্গীতের ধারা' প্রবন্ধের ভুল নির্দেশ করে 'চিত্রবাণী'র সম্পাদকের কাছে যে পত্র দিয়েছেন তা পড়েছি। পত্রে আপনি অভিযোগ করেছেন যে, 'চীনো আরব হামারা' সঙ্গীতটি কবি ইকবাল সাম্প্রদায়িক মনোভাব নিয়ে লিখেছেন বলে নাকি আমি জানিয়েছি। একটু আশ্চর্য্য হয়েই প্রবন্ধটি বারবার পড়লাম। কিন্তু এরকম

কোথাও লিখেছি, তা তো দেখতে পেলাম না। তবে এক জায়গায় বলেছি যে, 'কবি ইকবাল পরবর্তীকালে সাম্প্রদায়িক বুদ্ধির জন্যে নিন্দিত হন শুনা যায়।' এর উপরের লাইনেই আছে 'তার একটি গান আছে—চিনো আরব হামারা, হিন্দুস্তাঁ হামারা' ইত্যাদি। যদি এই দুলাইনের জন্য আপনি উক্ত মন্তব্য করে থাকেন তবে বলব আপনি ভুল বুঝেছেন। দুটি লাইনই সম্পূর্ণ বিভিন্ন। একের সঙ্গে অপরটির কোন সম্বন্ধ নাই।

এছাড়া অর্থ সম্বন্ধে একমাত্র 'চিনো আরব হামারা'র 'চিনো' কথাটি ছাড়া তো আপনার সঙ্গে আমার অমিল কোথাও দেখলাম না। তবে উভয়ের প্রকাশভঙ্গী আলাদা। যাই হোক 'চিনো' কথাটির অর্থ সম্বন্ধে আমি খোঁজ নেব। পরিশেষে ভুল নির্দেশ করে আমার নজর করার যে চেষ্টা আপনি দেখিয়েছেন তার জন্য আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।" আশা করি এই উত্তর থেকেই আপনার জ্ঞাতব্য বিষয় পরিষ্কার হবে।

ভবতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়, যাদবপুর

আপনি লিখেছেন—"আপনার 'চিত্রবাণী' নিয়মিত পড়ছি। ফাল্গুন মাসের সংখ্যায় কাফি উইলসনের প্রবন্ধটি দিয়ে ভালোই করেছেন। একটা জিনিষ লক্ষ্য করেছি, আগামী ছবির গল্প দিয়ে কতকগুলি পৃষ্ঠার অপব্যবহার করছেন। এমাসে যেমন 'দেবী চৌধুরাণী'র গল্প দিয়েছেন। ছবির গল্পটা যদি চিত্র সমালোচনার সঙ্গে দেন তাহলে সেটা বেশ উপভোগ্য হয় না কি? আর একটা বাজে জিনিষ দিচ্ছেন 'রঙ্গালয়ের বিস্মৃত কাহিনী'। গিরীশচন্দ্রের লেখক অবিনাশ গাঙ্গুলী ও অপরেশবাবুর এ ধরণের বহু বই আছে। আজকাল অনেক সাধারণ পত্রিকাতেই এ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়। 'চিত্রবাণী'কে আমরা সাধারণের উর্দ্ধে দেখতে চাই। চিত্র নিয়ে যতটা উৎসাহ দেখাচ্ছেন, বাণী নিয়ে ততটা উৎসাহ নেই কেন? থিয়েটার ও রেডিওর বিষয় একটু একটু দিয়ে যেন দায় সারছেন। এগুলিও প্রতিমাসে বিশদভাবে আলোচনা করুন। নাট্যসাহিত্যের চারিদিকে ভেজাল আর জঞ্জালে আজ ভরে উঠেছে। প্রতিমাসে যদি একখানি নাটক ও একটি গল্প যাতে ছায়াছবির সম্ভাবনা আছে প্রকাশ করেন তাহলে ভালো হয় এবং আমরাও পড়ে তৃপ্তি পাই। এর জন্য যদি প্রয়োজন হয় একটা চিত্র সমালোচনা বাদ দেবেন। 'চিত্রবাণী'র কলেবর ছোট করছেন কেন? বুড়ার কথাগুলো একটু ভালভাবে ভেবে দেখবেন।" আপনার চিঠিখানি পড়ে বিশেষ উৎসাহিত হয়েছি। 'চিত্রবাণী' যে প্রবীণ পাঠক মহলেও সমান সমাদৃত এটা আমরা আগে এমন করে জানতাম না। 'ছায়াছবির গল্প' বিভাগটি ও 'বাংলা রঙ্গালয়ের বিস্মৃত কাহিনী' প্রবন্ধটি সম্বন্ধে আপনি যে মন্তব্য করেছেন সে বিষয়ে আমাদের বলার কথা হলো এই যে আগামী ছবির গল্প সম্বন্ধে বিরূপ মত এ পর্যন্ত আমরা পাইনি, বরং এ বিভাগটি বিভিন্ন পাঠকমহলে বেশ সমাদরই পেয়েছে বুঝতে পারি তাঁদেরই লেখা বহু চিঠি থেকে। তাছাড়া দেখেছেন নিশ্চয়ই, এ বিভাগে কেবলমাত্র খ্যাতনামা সাহিত্যিকদের উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত কাহিনী প্রকাশ করা হয়। এ ছাড়া অন্যান্য ছায়াচিত্রের কাহিনী সেই ছবির সমালোচনার সঙ্গেই দেওয়া হয়। ছবির গল্পটি এক সংখ্যা আগে ছাপা হলে সেই ছবির সমালোচনা সুখপাঠ্য হবে না কেন, তা আমরা বুঝতে পারলাম না। বাংলা রঙ্গালয় সম্বন্ধে ধারাবাহিক প্রবন্ধটির ভিতরে আপনি কি কোন নতুন তথ্য বা ঘটনাই খুঁজে পাননি? সাধারণ পত্রিকাতে এ জাতীয় বিষয় আলোচিত হয় বলেই কি নাট্য ও চিত্র সংক্রান্ত নির্দিষ্ট পত্রিকা থেকে এ জাতীয় আলোচনা বাদ দিতে বলেন? আমার মনে হয় পর পর 'চিত্রবাণী'র ছটি সংখ্যায় আপনি এ প্রবন্ধটি সবটা আবার পড়লে আমাদের বক্তব্য সহজেই বুঝতে পারবেন। থিয়েটার ও রেডিওর বিষয় আমরা নিয়মিত দেবারই চেষ্টা করছি জানবেন। আর নাটক গল্প ছাপা সম্বন্ধে ঐ একই ভরসা দিয়ে রাখছি।

চিত্রবাণী

সুনীল রাণা, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা

আপনি জানতে চেয়েছেন, 'তরুণী মেয়ের চরিত্রাভিনয়ে অথবা দরিদ্র গৃহস্থ কন্যার ভূমিকায় বিগতযৌবনা এবং কসমেটিক-শোভিতা অভিনেত্রীদের ন্যাকামি আর কতদিন বরদাস্ত করতে হবে?' যতদিন এই বিগতযৌবনা অভিনেত্রীরা ইহলোকে আছেন ততদিন একটু দৈর্য ধরে থাকতে হবে বৈকী!

'নীতি ও রুচিহীন হিন্দী ছবির হাত থেকে বাংলা ছবির বাঁচার উপায় নির্দ্দেশ করতে পারেন কি?' এ প্রশ্নের উত্তর আপনি নিজেও জানেন নিশ্চয়ই। আর সে উত্তরটা হলো, সে উপায় আছে একমাত্র দর্শকদেরই হাতে। এ জাতীয় হিন্দী ছবিকে পৃষ্ঠপোষকতা আপনারা যত কম করবেন, ততই মঙ্গল। বাজে হিন্দী ছবির প্রদর্শনের জন্য আজ বহু বাংলা ছবি মুক্তির অপেক্ষায় পড়ে আছে। চিত্র জগতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কারো হাতে এই প্রতিকারের উপায় আছে এটা ভুলেও ভাববেন না। কারণ তাঁরা সকলেই বলেন এক রকম, কাজে করেন অন্য রকম। কাজেই দর্শকসম্প্রদায় এই বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন হয়ে উঠলে এ ব্যাপারে সুরাহা হতে দেরী হবে না।

দেবকুমার চট্টোপাধ্যায়, মনসাতলা লেন, খিদিরপুর

কলকাতার কোন বড় ষ্টুডিওতে চলচ্চিত্রশিল্পের চিত্রগ্রহণ বিদ্যা শিক্ষার ইচ্ছা আপনার প্রশংসনীয়। কোথায় কতদিনে ও কিভাবে শিক্ষা পেতে পারেন জানতে চেয়েছেন। অবশ্যই ষ্টুডিওর অভিজ্ঞ আলোকচিত্রশিল্পীর অধীনে হাতে কলমে কাজ শিখতে হয়। কতদিন শিক্ষার প্রয়োজন সেটা নির্ভর করে শেখা ও শেখানোর ওপর। এর বাঁধাধরা কোন সময় নেই।

আনজুমান-আরা-খানম, গাজোল, মালদহ

• যে ছবির কথা আপনি জানতে চেয়েছেন তার কাজ শেষ হ'য়ে গেছে। ছবিটি শীঘ্রই কলকাতায় মুক্তিলাভ করবে

সুব্রত রায়, উমেশ ব্যানার্জ্জী লেন, হাওড়া

আপনার প্রশ্ন—

(১) 'সংসার' চিত্রের নায়ক নায়িকা কে? চিত্রটি কবে ও কোথায় মুক্তিলাভ করবে? (২) 'নিরুদ্দেশ' চিত্রের নায়ক নায়িকা কে? চিত্রটি কবে ও কোথায় মুক্তিলাভ করবে? (৩) রাঙামাটি, কবি, সমাপিকা, সতেরো বছর পরে, শ্যামলের স্বপ্ন ছবিগুলিকে শ্রেষ্ঠতানুসারে পর পর সাজিয়ে দিন।

'সংসার' ও 'নিরুদ্দেশ' উভয় চিত্রেরই নায়ক নায়িকা নবীন মজুমদার ও সন্ধ্যারাণী। প্রথম ছবিটি কবে ও কোথায় মুক্ত পাবে তা এখনও ঠিক হয়নি। শেষোক্তটি শীঘ্রই মুক্তিলাভ করবে মিনার—বিজলী—ছবিঘরে। শ্রেষ্ঠতানুযায়ী সাজালে ছবিগুলি হবে এই—সমাপিকা, কবি, রাঙামাটি, সতেরো বছর পরে, শ্যামলের স্বপ্ন।

লক্ষ্মীনারায়ণ দাস, রামকমল ষ্ট্রীট, খিদিরপুর

আপনি জানিয়েছেন, 'অভিনয়েচ্ছু মন লইয়া কোন প্রতিষ্ঠানে শিল্পী হিসাবে দাঁড়াইতে পারি কি না? এ বিষয়ে আপনার সাহায্য পাইলে বাধিত হবো। আমার গান বাজনা জ্ঞান নাই, তবে অভিনয় সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান আছে। বয়স ৩২, দীর্ঘাকৃতি ও শ্যামবর্ণ।' এ বিষয়ে পত্রিকা মারফৎ আপনাকে সাহায্য করা সম্ভব নয়। আশা করি আমাদের অক্ষমতার কারণ বুঝতে পারবেন।

সুচরিতা দত্ত, বরাহনগর

আপনার প্রশ্নের উত্তরে জানাচ্ছি, কানন দেবী প্রথম চিত্রাবতরণ করেন নির্বাক 'জয়দেব' ছবিতে রাধার ভূমিকায়। তাঁর প্রথম সবাকছবির নাম 'জোর বরাত'। শ্রীমতী পিকচার্সের পরবর্তী চিত্র নিবেদন হবে শরৎচন্দ্রের 'বামুনের মেয়ে' উপন্যাসের চিত্ররূপ।

রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, বেলেঘাটা

প্রমথেশ বড়ুয়ার ঠিকানা জানতে চেয়েছেন। কোনো শিল্পীরই ব্যক্তিগত ঠিকানা জানাতে আমরা অক্ষম। বড়ুয়ার কাছে আপনার কি প্রয়োজন আমাদের জানাতে পারেন।

চিত্রবাণী

অচ্যুৎকুমার, পুষ্প গুহ, মঞ্জু নাগ, আলিপুর সেন্ট্রাল জেল, কলিকাতা

"আপনার পৌষালী সংখ্যার 'চিত্রবাণী'তে 'বাংলাছবির সালতামামী' নামক প্রবন্ধে দেখিতে পাইলাম যে '১৯৪৮ সনে ৩৫ জন পরিচালক ৩৯ খানা বই পরিচালনা করিয়াছেন এবং চারিজন পরিচালক দুইখানা করিয়া ছবি পরিচালনা করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের হিসাবে দেখিতে পাই যে ৩৪ জন পরিচালক ৩৯ খানা ছবি পরিচালনা করিয়াছেন এবং পাঁচজন পরিচালক দুইখানা করিয়া ছবি পরিচালনা করিয়াছেন। এই প্রবন্ধের আরেকটি ভুল হচ্ছে যে ১৯৪৮ সনে সর্বশুদ্ধ ৩৪টি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে ৩৯টি ছবি পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই যে ৩৬টি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান ৩৯ খানা বই উপহার দিয়াছেন এবং ইহাদের মধ্যে তিনটি প্রতিষ্ঠান ২ খানা করিয়া বই উপহার দিয়াছেন।"

আপনাদের চিঠিটির উত্তর দিতে দেরী হলো তার কারণ ১৯৪৮-এ প্রদর্শিত বাংলা ছায়াছবির সালতামামী তৈরী করতে কিছু সময় লাগলো। যে প্রবন্ধটির ভুল আপনারা দেখিয়ে দিয়েছেন সেটি আমরা সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকা থেকে নিয়েছিলাম। আমাদের সালতামামীতে দেখছি আপনাদের কথাই ঠিক। এই ভুলটি দেখিয়ে দেবার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

অরুণকুমার গুহ মল্লিক, নৈহাটী

আপনার প্রশ্নের উত্তরে জানাচ্ছি, পঙ্কজ মল্লিক আপাততঃ আর কোন ছবিতে নামবেন না বলে আমাদের জানিয়েছেন। হেমচন্দ্র পরিচালিত নিউ থিয়েটার্সের 'বিষ্ণুপ্রিয়া' চিত্রের সুরকার রাইচাঁদ বড়াল এবং নাম ভূমিকায় অভিনয় করেছেন মীরা মিশ্র।

বৃন্দাবন চন্দ্র নন্দী, বৈদ্যবাটি

আপনার প্রশ্নগুলির উত্তর হলো—

১। অভিনয়ের উৎকর্ষ অনুসারে সাজালে আপনার উল্লিখিত তিনজন শিল্পীর স্থান দাঁড়ায় এইরূপ—রবীন মজুমদার, পরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অসিতবরণ।

২। হিন্দী ছবির অভিনেত্রী স্নেহপ্রভার পরবর্তী ছবির নাম আমরা জানি না।

৩। উৎপলা সেন, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ও সুপ্রভা সরকার—এঁদের মধ্যে সুপ্রভা সরকারকেই প্রথম স্থান দেওয়া চলে।

৪। চন্দ্রাবতী গ্রাজুয়েট নন্।

অমিয়রঞ্জন বসু, জেলিয়াটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

আপনার দুটি প্রশ্ন—

(১) সুরসাগর পঙ্কজ মল্লিক বর্তমানে বাংলার গায়কদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করিতে পারেন না? মুক্তি, অধিকার, অভিজ্ঞান, নর্তকী, আলোছায়া, ডাক্তার প্রভৃতি চিত্রে এঁর গানগুলি কি অতুলনীয় নয়?

(২) পঙ্কজ মল্লিক বহুদিন ছায়াচিত্রে নামেন না। তিনি কি বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন?

বাংলার গায়কদের মধ্যে পঙ্কজবাবুকে আপনি শ্রেষ্ঠ স্থান দিতে চান কিন্তু গানের শ্রেণী বিভাগের কথা স্মরণ করলে আপনার মত পালটাতে হবে না কি? এই শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত। আপনি যাঁকে শ্রেষ্ঠ বলবেন, আমি তাঁকে বলবো না, আবার আমি যাঁকে শ্রেষ্ঠ বলবো, আপনি হয়তো তাঁকে শ্রেষ্ঠ বলে মানতে পারবেন না। আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর এই সংখ্যার অন্যত্র দেওয়া হয়েছে, দেখে নেবেন।

কাশীনাথ পালিত, নৈহাটি

আপনি এত ঘন ঘন প্রশ্ন ক'রে চিঠি লিখেছেন যে আপনার প্রশ্ন তালিকাটি বেশ দীর্ঘ হয়েছে দেখছি। একে একে তার উত্তরগুলি হবে এই রকম—

১। স্বর্গীয় হিমাংশু দত্তের পর পঙ্কজ মল্লিক, জগন্ময় মিত্র সুরসাগর উপাধি পেয়েছেন বলে যে সংবাদ আপনি জানেন তা ঠিক।

২। বিনয় ব্যানার্জী পরিচালিত ভারতী ছায়া মন্দিরের

'ভ্যারাইটি ষ্টোর্স' কবে এবং কোথায় মুক্তি লাভ করবে সে সম্বন্ধে আমরা কোন খবর পাইনি।

৩। নিউ থিয়েটার্সের হিন্দী চিত্র 'ছোটাভাই' এর স্বরকার হলেন পঙ্কজ মল্লিক। বর্ত্তমানে তিনি 'নার্স সিসি'র হিন্দী চিত্ররূপ 'মর্য্যাদা'র সুর দিচ্ছেন।

আর একখানি চিঠিতে আপনি লিখেছেন, "আমার মতে 'চিত্রবাণী'র জন্যে একটি প্রথম শ্রেণীর প্রেস করতে যে টাকা লাগবে তা ঘোষণা করে 'চিত্রবাণী'তে চিত্রবাণী সাহায্য ভাণ্ডার খুলুন না।" 'চিত্রবাণী'র মঙ্গল অমঙ্গল সম্বন্ধে আপনি এতখানি চিন্তা করেন জেনে এবং আপনার দেওয়া এই সাহায্য ভাণ্ডারের পরিকল্পনাটি পেয়ে আপনাকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমরা ত জানি সাহায্য ভাণ্ডার খোলা হয় দরিদ্রনারায়ণ সেবার জন্যে, কিন্তু কোন ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানের জন্য সাহায্য ভাণ্ডার খোলা হয় বলে আমরা জানি না। এবং এরকম কোন ব্যক্তিগত সাহায্য ভাণ্ডার খোলা প্রবঞ্চনারই নামান্তর। তবে যদি নিতান্ত দায়ে পড়েই এরকম কোন ভাণ্ডারের পত্তন করতে হয়, তবে আপনাকেই তার প্রথম ট্রাষ্টি করবো—এ ভরসা আপনাকে অগ্রিম দিয়ে রাখছি।

কুমারী মায়া রায়, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

আপনি লিখেছেন, 'আমার এক সহপাঠী চলচ্চিত্রে যোগদান করিতে ইচ্ছুক, কারণ তাহার অবস্থা মোটেই স্বচ্ছল নয়। চিত্রজগতে প্রবেশের পূর্বে কোন অভিনেত্রীর সাহায্য লওয়া আবশ্যক। আমাকে সে কোন অভিনেত্রীর সহিত পরিচয় করাইয়া দিবার কথা বলে। সুমিত্রা দেবীর সঙ্গে আমাদের পূর্ব্বে কিছু পরিচয় ছিল। কিন্তু তিনি কিছু দিন পূর্ব্বে বাসা পরিবর্ত্তন করায় চিঠি উপযুক্ত স্থানে পৌছিতেছে না। যদি অনুগ্রহপূর্ব্বক আপনার পত্রিকায় সুমিত্রা দেবীর ঠিকানা প্রকাশ করেন তবে বাধিত হইব।'

সুমিত্রা দেবী বাসা পরিবর্ত্তন করেননি, কাজেই আপনি তাঁর যে ঠিকানা জানেন বলে লিখছেন সেই ঠিকানাতেই পত্রালাপ করতে পারেন।
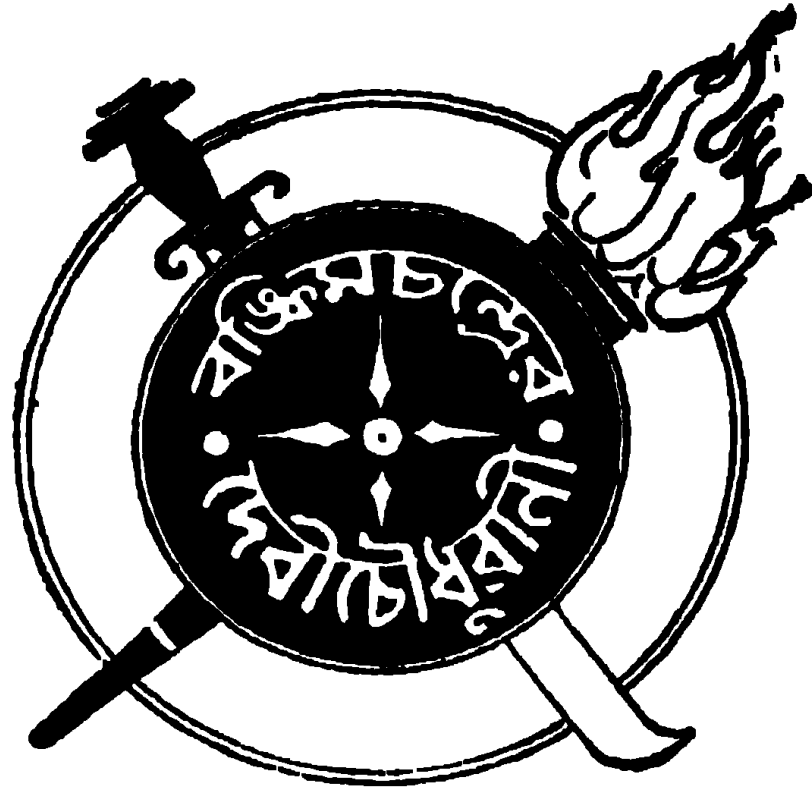
সিনেমা-হট্ট-মন্দিরে

প্রত্যক্ষদর্শী বিব্রত

সেদিন আমাদের সাপ্তাহিক চিত্র-পরিক্রমার জন্যে আমার স্ত্রী একখানি ছবি পছন্দ ক'রলেন। ছবিখানি অবশ্য সাধারণ কিন্তু কাহিনীটি প্রেমের এবং তন্বী তরুণীর প্রেমে হাবুডুবু খাওয়া নিয়ে তোলা।

দেখে বেরিয়ে আসার সময় কানে এলো নারী কণ্ঠের প্রশংসামুখর মন্তব্যের কলকাকলী। বলা বাহুল্য, এ থেকে বেশ বুঝলাম সাধারণ মহিলারা সু-চিত্ররসিক নন।

প্রযোজক মহাশয় যদি কেবলমাত্র পুরুষ ও চিন্তাশীলা নারীদের জন্যই ছবি তুলতে বাধ্য হয়ে থাকেন তাহোলে তো তিনি আরও একটু ঝাঁঝালো, জাঁকালো ও শাঁসালো ছবি তুলতে পারতেন।

অন্যান্য ছবির বিষয়ে দ্বিমত হোলেও এ ক্ষেত্রে কিন্তু সবাই আমরা একমত। প্রেমই যেখানে শুধু পরিস্ফুট অর্থাৎ কিনা ন্যাকামী নিয়ে ষাঁড়ের মতো ঝোপ ছাড়িয়ে মাথা উঁচিয়ে থাকে সে ছবি কি ভালো লাগে আপনার আমার ?

সেলুলয়েডের প্রেমের ওপর মেয়েদের এই নেশা দেখে কি মনে হয় জানেন ? মনে হয়, ওরা বোধ হয় ছবিঘরে যান পর্দার নায়িকার গদিতে নিজেদের বসিয়ে নায়কের প্রণয়প্রার্থিনী হবার দুর্দমনীয় লোভে। তাই যদি না হবে তবে পুরুষদের চক্ষুশূল হ'য়েও অতশত চিত্রতারকা মেয়েদের মনের মণিকোঠায় স্থান পায় কি ক'রে ?

হাঁ, মেয়েমহলের বাহবা-পাওয়া পর্দা-প্রেম-পরিসিক্ত খানকয়েক ছবি থেকে বিচার ক'রতে একটুও অসুবিধে হয় না যে ওরা নিশ্চয়ই মনে মনে নিজেকে নায়িকার স্থলাভিষিক্তা করেন। আর ঠিক এরই জন্যে প্রত্যেকটি মেয়ে যান ছবি দেখতে।

অনেকে আবার এর চেয়েও বেশী আশা করেন। তাঁরাই ভয়ের কারণ। কারণ তাঁরা পর্দার ঐ সব প্যান্‌পেনে মেনীমুখো নায়কদের মেয়েবন্ধু হবার আশা পোষণ করেন। আমার তো ভাবতেই রীতিমতো গা ঘিন্‌ঘিনিয়ে ওঠে, কি ক'রে মেয়েরা পর্দার মেনীমুখোদের দেখতে যান। আর

শুধু কি দেখা? দেখে স্রেফ্ ম'জে গিয়ে হাবুডুবু খান। অথচ আমার তো মশায় পুরুষের বেশে ঐ সব ন্যাকামী, নাকি সুরের প্রেমের গান আর তার সঙ্গে দু'একটা মিহি তারের টুঙ্‌টাঙি শুনলে গা জ্বলে ওঠে, মাথা ধরে হয় একশা।

একবারটি যদি দয়া করে মেনীমুখো ছেলেরা অন্ততঃ বছর খানেকের জন্যেও সিনেমা দেখা বন্ধ করেন তাহোলে আমি হলফ্ ক'রে ব'লতে পারি, ছায়াছবির পরিবর্তন নির্ঘাৎ হবেই হবে। এমন হবে যা তার সবাক জীবনে আজ পর্যন্ত হয়নি।

তবে হ্যাঁ, এ যাত্রায় আমি মশায় খুব বেঁচে গেছি। ভগবানের কৃপায় স্বামীটি আমার মেনীমুখো পাগলী নন। আর কিছু না হোক এইটিই জীবনের একমাত্র শান্তি। তবে কি তাই বজায় রাখবার উপায় আছে। যান না একবার দোকান কিম্বা রেস্তোরাঁয়, শুনবেন সেখানে ছোকরা ছোঁড়াদের মহলে তুমুল আলোচনা চ'লেছে হয়ত আমাদের পর্দার কোন মেনীমুখোকে নিয়ে, নয়তো বা সব ভাঁজছে ওদের ঢঙে কাঁদুনী সুরে। আপনার তখন কি মনে হবে? মনে হবে—হায়রে কপাল! এইসব টনসিল্ ছেঁড়া গানে যদি মেয়েদের মন পাওয়া যায়, না জানি হবে পর্দার কি অধঃপতনই না ঘটেছে!

অধঃপতন অবশ্য ঘটেছে ঠিক, তবে আর্থিক নয়। প্রযোজকের মোটা ব্যাঙ্ক ব্যালেন্সকে যদি মুটিয়ে তুলতে চান তবে আসুন একটি নির্ঘাৎ পথ বাতলে দি'। বেশীদূর যেতে হবে না তার জন্যে,—হাতের কাছ থেকে এমন একজনকে টেনে আনুন যার বেশ একটু প্রেমে গদগদ ভাব। তাকে এনে তার গলায় ঢুকিয়ে দিন মোটাকতক চাঁদ আর বসন্তের হা হুতাশ, বিলাপ আর প্রলাপ। বাস্ আর দেখতে হবে না। সে যখন সেগুলো ওগলাবে মেয়েদের সামনে, ওম্‌নি তাঁরা যে যার আঁচলের খুঁট খুলে ঢেলে দেবেন ঝন্‌ঝনিয়ে বক্স অফিসের শ্রীচরণে। আর যাঁদের আঁচল গড়ের মাঠ তাঁরা দেখবেন ঠিক তাঁদের পুরুষ-বন্ধুর ট্যাঁক ঠেঙিয়ে জুটেছেন গিয়ে নবতম প্রেম-কাহিনীর আশ্চর্যতম ছবির দোরে।

অবশ্য সন্তানবতীরাও এ দোষের সম-অংশীদারিনী। তাঁরা আসেন তাঁদের কচি-কাচাদের নিয়ে। কচি ব'লে নেহাৎ শিশু মনে ভাববেন না। এক সেকেণ্ডের চেঁচামেচিতে হাজার দর্শকের প্রাণ বাঁধিয়ে, চোখ ধাঁধিয়ে নাস্তানাবুদ করতে এদের জুড়ি মেলাই ভার।

জননীদের মা ষষ্ঠীর কৃপায় বক্স অফিস কাউন্টারের রূপোর পাহাড় ঠেলে উঁচিয়ে আর সেই সুবাদে আমাদের বরাতে জোটে নবতম কত পাকা শিশু যে আর দু'দিন বাদেই ওরা সবাই বিজ্ঞ কথায় পোক্ত হবে দিব্যি।

যাই হোক, ছবির কথা বাদ দিলেও একথা অবশ্য বলতেই হয় যে, মহিলারা সুবোধ নন। স্ত্রীজাতি কলমুখরা এবং মনে হয় তারাই সামান্য জাতি যারা তাঁদের সহদর্শকদের কোলাহলের হাত থেকে আকণ্ঠ না গিলিয়ে ছাড়েন না। তবে নেহাৎ আমরা নারী বলে, নইলে যে একটা কুরুক্ষেত্র বেধে যেতো তা মশায় আমি বলতে পারি চোখ বুজে। আমরা ছবি দেখতে এসে মৌন নির্বিবাদে সইবো? বলুন! ছবির শুরু থেকে শেষ অবধি সশব্দ চা পান, পান দোক্তা চর্বণ, নাক ঝাড়া আর যেখানে নায়িকার চোখের জলে একটা ঢেউ উঠছে, সেখানে বাদাম ভাজার জন্যে চকোলেটের ঠোঙার মর্মর ধ্বনি শব্দ, এসব শব্দব্রহ্মের উপাসনা ছাড়া কি আর এদেশে সিনেমা দেখা চলে!

এছাড়া মেয়েদের গল্প বিনিকোড়ার টন্‌টনানি তো আছেই। ছবিঘরকে এরা নিশ্চিত ওদের আলাপনী বেলুনের হাওয়া ছাড়বার প্রকৃষ্ট স্থান হিসাবে গ'ড়ে তুলেছেন, অর্থাৎ কিনা মোটরের এক্সজস্ট পাইপের মতো। এ যেন একাধারে দোপা-গয়না পাঁচফোড়নের অর্থনৈতিক আলোচনার হোয়াইট হাউস এবং খেঁদি-ভুতো-ভোলার গুণ-কীর্তনের মেটে আখড়া। বর্তমানের মাথা গোঁজবার ঠাঁই-সঙ্কটের দিনে শাশুড়ী ননদের কান বাঁচিয়ে ঝাল্ ঝাড়বার স্থান সিনেমা-হট্ট-মন্দিরের চাতালে আবিষ্কার ক'রে

পূর্ণিমারা যে কলম্বাসের চেয়েও মহীয়সী হ'য়েছেন তা বোধ হয় আমার বলার অপেক্ষা রাখে না। ব্রজরঙ্গিনীদেরও মুস্কিল আসান হোয়েছে। তাঁরা একে মানভঞ্জনের কুঞ্জ ক'রে নিয়েছেন। তবেই বুঝুন বাঁয়ে এক্সজষ্ট পাইপ, ডাইনে আখড়া আর সামনে কুঞ্জ রেখে ছবি দেখা আপনার কোথায় গিয়ে ওঠে! মাঝে মাঝে মনে হয় বুঝি বা লাফিং গ্যাস-বোঝাই কোন এক হুইস্পারিং গ্যালারীতে ব'সে আছি।

কিন্তু লাফিংএর উপায় নেই। কেউ গুল্ দিচ্ছে জেনে হাসি গিলতে হয় ভদ্রতার খাতিরে। লাফিং ক'রেছেন কি অমনি আপনি বিংশ শতাব্দীর এটিকেটে লাফিং-ষ্টক হ'য়ে দাঁড়াবেন। অবস্থাটা একবার ভাবুন! ঠিক পাশেই পাকড়াশী গিন্নীর দশ বছরের খুঁচকীর অগ্নি-নৃত্যের প্রতিভা স্ফুলিঙ্গে কবে নাকি লাখ্নৌ-এ খাস্তাখাই বাঈএর আঁচল ধরে গিয়েছিল তারই পল্লবিত প্রগল্ভ বর্ণনা শুনতে শুনতে সর্বশরীর আপনার সুড়্সুড়িতে ভরে উঠ্ছে, লাফিংএর ইন্‌ফ্লেশানে ছট্‌ফটিয়ে ডাক ছাড়ছেন—ত্রাহি! ত্রাহি মধুসূদন! এমন অবস্থায় আমি কি করি জানেন? আমার এক বন্ধুপ্রদত্ত অমোঘ মন্ত্র স্মরণ ক'রে এক লহমায় লাফিংএর ইন্‌ফ্লেশানে ডিফ্লেশান ঘটিয়ে দি—অর্থাৎ কিনা হাসির টইটম্বুর আঙ্গুরকে চট্ ক'রে চুপ্সা কিস্‌মিস্ বানিয়ে ফেলি।

মন্ত্রটা নেবেন? বন্ধুবর বলেছিলেন—'যখনই গুল্ শুনে হাসির দমকে দম্ আটকে আসবে তখনই মনে করবি কোন করুণ কিম্বা বীভৎস দৃশ্যের কথা। ভাববি তুই ব'সে আছিস্ কোন শ্মশানে নয়তো বা দেখছিস্ তৈমুরের নৃশংসতার ছবি। ব্যস দেখ্তে না দেখ্তে হাসি তোর স্রেফ্ গয়া হয়ে যাবে।

এদিকে ছবি দেখাও আপনার গয়া হ'য়ে যাবে যদি গ্যাঁটের টাকা খরচ ক'রে সিনেমায় গিয়ে নায়ক নায়িকা ছেড়ে হামেসাই শ্মশান আর তৈমুরের স্মৃতি জাগিয়ে রাখতে হয় বুকে। তার চেয়ে বরং আসুন প্রেক্ষাগারের মালিকদের দোরে এক প্রস্তাব নিয়ে হাজির হই। তাঁরা যদি দয়া ক'রে কিছুদিনের জন্যও অন্ততঃ সিনেমায় পান-ভোজন-আলাপন নিষিদ্ধ ক'রে ইস্তাহার লট্‌কে দেন তাহোলে দেখবেন মশায় আর ওসব খোপা-বিনুনী, জর্জেট হাই হিলের উৎপাত নেই। দিব্যি আরামসে নিরিবিলি মজা ক'রে ছবি দেখে বাঁচা যায়।

কিন্তু মালিক মহাপ্রভুরা কি আর আমাদের এ প্রস্তাব পাশ ক'রবেন? প্রতি একশো মহিলা পিছু একটি পুরুষকে খুসি ক'রে তাঁরা কি আর নিজের হাতে বক্স অফিসের রজত-গিরিতে ডিনেমাইট সংযোগ ক'রবেন? আর ক'রলেও হয়তো আমরাই একদিন সে আইন অমান্য ক'রে সহধর্মিণীসহ হাজির হব প্রেক্ষাগারের দোরে। কারণ হাজারই বলিনা কেন, ওঁরা সুদর্শক নন তবু মশায় ব'লতে লজ্জা নেই একদিনও যদি অর্ধাঙ্গিনীকে ফেলে ছবি দেখতে যাই কেবলই মনে হয় বাঁ পাশটা কেমন যেন খালি খালি। খালি মনে হয় যেন কথামালার মর্কটের মতো হৃদ্‌পিণ্ডটা রেখে এসেছি রান্নাঘরের উনুনপাড়ে।

ভারতবর্ষের ক্লাসিক নৃত্য

গোপা হেমাঙ্গীচৌধুরী

ভারতবর্ষের শিল্পচর্চায় নৃত্য চিরকালই খুব বড় আসন লাভ করে এসেছে। ছন্দ-বিজ্ঞানে নিপুণ শিল্পীর আত্মস্থ অনুভূতির যে আনন্দের তরঙ্গাবেশ—বাইরে তারই সংহত প্রকাশ ব্যক্ত হয় নৃত্যের মধ্য দিয়ে। উদয়শঙ্কর ভারতীয় নৃত্যকে আজ যে আসনে বসিয়ে দিয়েছেন, তা থেকে একথা আমরা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছি, যে নৃত্য কেবলমাত্র কটিসর্বস্ব অঙ্গভঙ্গীমূলক নয়। এর মূল কথা হল আনন্দ বা রস। বিভিন্ন অর্থসূচক মুদ্রা, ভাবসূচক অঙ্গভঙ্গী এবং ছন্দসূচক তাল একত্রিত হয়ে দর্শকের মনে যে আনন্দ এবং ভাব-তরঙ্গের সৃষ্টি করে, তাতেই নৃত্যের রস জাগ্রত হয়। এখানে নৃত্যের শিল্পরীতিই চরম নয়, চরম হচ্ছে শিল্পীর নিজের অন্তরকে পরিপূর্ণভাবে প্রকাশিত করতে পারা। কিন্তু ভারতীয় 'ক্লাসিক' নৃত্যে শিল্পরীতি বা technique-কে খুব বড় স্থান দেওয়া হয়েছে। ভারতের 'নাট্যশাস্ত্রে' বলা হয়েছে যে, নৃত্য হচ্ছে বাহু, সমগ্র মুখমণ্ডল এবং দেহের বিচিত্র ও সামঞ্জস্যপূর্ণ ভঙ্গী। একেই ভারতীয় 'ক্লাসিক'-নৃত্যের সংজ্ঞা হিসাবে ধরা চলতে পারে।

ভারতের 'ক্লাসিক্যাল' নৃত্য যে কবে থেকে গড়ে উঠেছে, তা সঠিক বলা যায় না। তবে নানা পরোক্ষ প্রমাণ থেকে মনে হয় যে, বৈদিক যুগের শেষে খৃষ্টপূর্ব শতকের দিকেই বোধ হয় এই শিল্প রূপগ্রহণ করেছিল। ভাস ও কালিদাসের নাটকগুলি থেকে বোঝা যায় যে, এই সময়ে ভারতীয় 'ক্লাসিক্যাল' নৃত্য খুবই উঁচু পর্যায়ে উঠতে পেরেছিল। ভারতের 'নাট্যশাস্ত্র' থেকে জানা যায় যে, সে সময়ে দাক্ষিণাত্যে দেবদাসীদের নৃত্য বিশে[illegible] প্রচলিত এবং প্রসিদ্ধ ছিল।

ভারতের 'ক্লাসিক' নৃত্যে দক্ষিণ-ভারতের [illegible] অসাধারণ। নৃত্যশিল্প যে প্রকৃতপক্ষে অনার্য জাতির [illegible] এবং নবাগত আর্যরা যে এর প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট ছিল[illegible] নানা বিষয় থেকে সে কথা প্রমাণিত হয়েছে। কা[illegible] অনার্যসভ্যতার কেন্দ্রভূমি দাক্ষিণাত্য যে নৃত্যের চ[illegible] প্রসিদ্ধিলাভ করবে, এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। দা[illegible] ভারতের নৃত্যকলা বহুযুগের সাধনার ফল।

সমস্ত ভারতীয় নৃত্যগুলির মত দক্ষিণী নৃত্যেরও [illegible] ভাগ আছে—তাণ্ডব ও লাস্য। তাণ্ডবের প্রচণ্ড গতি[illegible] এবং অসাধারণ বলিষ্ঠতা সাধারণতঃ পুরুষশিল্পীর পু[illegible] রূপদান করা সম্ভবপর হয়। লাস্যনৃত্যে নারীর ক[illegible] দেহসৌন্দর্য ও ভাবমাধুর্য ফুটিয়ে তোলা হয়। [illegible] দশম ও একাদশ শতকে দক্ষিণ-ভারতের প্রসিদ্ধ [illegible] সম্রাটদের রাজত্বকালেই সর্বপ্রথম নৃত্যের সংস্কার [illegible] হয়। সেই সময়ে শিল্পীরা দেবদেবীর কাহিনীকে তাঁ[illegible] নৃত্য পরিকল্পনার মধ্যে টেনে আনতে সুরু করলেন[illegible] গান এবং বাজনার মধ্য দিয়ে লীলায়িত অঙ্গভঙ্গীকে তাঁ[illegible] দেহভোগের জগৎ থেকে দেহাতীত জগতের মধ্যে উত্তী[illegible] করে দিতে চাইলেন। ফলে আবির্ভাব হল দেবদা[illegible] সম্প্রদায়ের এবং সেই থেকে ভারতবর্ষের বিখ্যাত 'ভা[illegible] নাট্যমে'র উদ্ভব হল। এই সুপ্রাচীন, সুসংস্কৃত নাট্য[illegible] আজ আর সহজলভ্য নয়। তবু নৃত্যশিল্পী উদয়[illegible] সম্প্রদায়ভুক্তা প্রয়াত লক্ষ্মী ও প্রসিদ্ধা নৃত্যশিল্পী [illegible]

চিত্রবাণী

নৃত্যের মধ্যে আমরা এই ভারতনাট্যমের কিছুটা পরিচয় পেয়েছি।

দক্ষিণ-ভারতের তাঞ্জোর অঞ্চলের প্রচলিত নৃত্য মানবদেহের অঙ্গভঙ্গীর মাধুর্য ও ভাবপ্রকাশের আদর্শ শক্তির নিদর্শন। এই নৃত্যের অপরূপ বৈশিষ্ট্য হল বিভিন্ন মুদ্রার কৌশল। এই মুদ্রার মধ্য দিয়ে শিল্পী তাঁর মনের ভাব প্রকাশ করেন। প্রত্যেকটি মুদ্রার এক একটি বিভিন্ন অর্থ আছে এবং একটি বা দুটি হাতের সাহায্যে শিল্পী এই সব মুদ্রা গঠন করেন।

এদের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ও সুন্দর হল মালাবার কেরল অঞ্চলের 'কথাকলি' নৃত্য। প্রাচীন ভারতে আমরা যে 'ভারত-নাটাম্'-এর দেখা পেয়েছিলাম তার প্রায় সবটুকুই আজ কথাকলিতে মিশে গেছে। আর এই মিশ্রণের ফলেই বর্ত্তমানের এই সংস্কৃত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর কথাকলি নৃত্যের সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। কথাকলি শব্দের অর্থ হল কথা ও অভিনয়। গীতবাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে নৃত্যের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন কাহিনীর মূক অভিনয় করা হয় কথাকলি শিল্পে। প্রায় সারারাত্রি ধরে খোলা মাঠে সামিয়ানা টাঙিয়ে রামায়ণ অথবা মহাভারতের কাহিনী শিল্পীদের মুদ্রার কৌশলে এবং অপরূপ ক্রিয়ার ব্যঞ্জনায় অভিব্যক্ত হয়। এই অভিনয়ের অভিব্যক্তির জন্য চব্বিশটি মূল মুদ্রা, মাথার নয়টি ভঙ্গী, চোখের আট রকম দৃষ্টি, ভ্রূ-লতার ছ'রকম ভঙ্গী, গ্রীবার চার রকমের দোলন এবং সমগ্র অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অন্যান্য আরও ৬৪টি ভঙ্গীকে আয়ত্ত করতে হয়। কাজেই বারো বছরের পূর্ব্বে কোনো শিল্পীই কথাকলির শিক্ষানবিশীতে দক্ষ হতে পারেন না। কথাকলির ষ্টাইল অত্যন্ত কঠিন, মুদ্রা সর্ব্বস্ব এবং গতানুগতিক হলেও ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ নৃত্যরীতিগুলির মধ্যে এর স্থান খুব উঁচুতে।

কেরল অঞ্চলে কল্মি, কাইকোট্টিকালী প্রভৃতি প্রায় ত্রিশ রকমের নৃত্য প্রচলিত আছে। এদের মধ্যে কোনোটা সহজ, কোনোটা বা অত্যন্ত জটিল। ছন্দ এবং দেহভঙ্গী সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান না থাকলে এ শ্রেণীর নৃত্য আয়ত্ত করা অত্যন্ত কঠিন। এগুলিতে পায়ের কাজ ইংরাজীতে যাকে বলে Foot work—খুব বেশী থাকে। দক্ষিণ ভারতের বিখ্যাত নর্তকশিল্পীদের মধ্যে গোপীনাথ, রাঘবন, শিবরামন প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিংশ শতাব্দীতে কথাকলির এক অভিনব ভাব-ব্যঞ্জনার প্রকাশ দেখা গেল উদয়শঙ্করের নৃত্যের মধ্যে। দক্ষিণের সমস্ত নৃত্য-রীতিগুলিকে, তাণ্ডব ও লাস্য নৃত্যকে তিনি সংহত করেছেন অপূর্ব প্রতিভা ও দক্ষতার বলে। এই নবতর কথাকলি

নটরাজ মূর্ত্তি

চিত্রবাণী

নৃত্যে সম্প্রতি খ্যাতি অর্জন করেছেন কেলু নায়ার, মাধব মেনন, শ্রীমতী অমলা উদয়শঙ্কর, বালকৃষ্ণ মেনন, সাধনা বসু প্রভৃতি।

উত্তর ভারতের 'ক্লাসিক' নৃত্য 'কথক' নামে পরিচিত। দক্ষিণ ভারতের 'ক্লাসিক' নৃত্যে আমরা যে মুদ্রা এবং অঙ্গভঙ্গীর বৈচিত্র্য দেখেছি তা কথক নাচে মেলে না। কথকের বৈশিষ্ট্য হল অসাধারণ ক্ষিপ্র বেগ এবং বিদ্যুৎ গতিতে অঙ্গসঞ্চালন। তালের সম্বন্ধে কথক শিল্পীরা অতিমাত্রায় সচেতন। ফলে গীতবাদ্যের পরিবর্তে অনেক সময়ে শুধু তবলার 'বোলের' সঙ্গেই শিল্পীকে নাচতে দেখা গেছে। লক্ষ্ণৌ অঞ্চলের 'কথক'নাচ বিশেষ প্রসিদ্ধ। কথকের foot work আয়ত্ব করা এবং তবলার অসাধারণ দ্রুতগতির সঙ্গে তাল রেখে চলা খুবই আয়াসসাধ্য ব্যাপার। কথকের কথা বলতে গেলেই বিখ্যাত শিল্পী নাম্বুদ্রীকে স্মরণ করতে হয়। তাঁর আপ্রাণ চেষ্টার ফলে 'কথক' নাচ আজ ভারতের অন্যান্য প্রদেশে এবং ভারতের বাই[illegible] যথেষ্ট সমাদর লাভ করেছে। তাঁর কৃতী ছাত্র শ[illegible] নৃত্যকুশলা মেনকা, যমুনাপ্রসাদ ও সাধনা বসুও ক[illegible] নৃত্যে খ্যাতি লাভ করেছেন।

ভারতবর্ষের 'ক্লাসিক্যাল' নৃত্যগুলি যেন গঠন[illegible] মুদ্রা, পাদক্ষেপ প্রভৃতি সমস্ত দিক থেকেই একটা নি[illegible] গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ। লোক নৃত্যে বা ওরিয়েণ্টাল-[illegible] যে নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য প্রকাশের সুযোগ আছে—এখানে তেমন নেই। 'ক্লাসিক' নৃত্যের সংযম, সামঞ্জস্য [illegible] প্রচেষ্টা এবং এর টেকনিক্যাল দিকের উৎকর্ষ এই নৃত্য[illegible] পদ্ধতিকে একটা অক্ষুণ্ণ মর্যাদা দান করেছে। য[illegible] 'মণিপুরী' প্রভৃতি লোকনৃত্যের মাধুর্য ও ললিত সৌন্দর্য[illegible] অপরূপ মহিমা এতে নেই, তবুও এই 'ক্লাসিক্যাল' নৃত্যে[illegible] ভেতর দিয়েই প্রাচীন ভারতের নৃত্যের ধারাটিকে আজ[illegible] খুঁজে পাওয়া যায়।

রূপ ও কথা
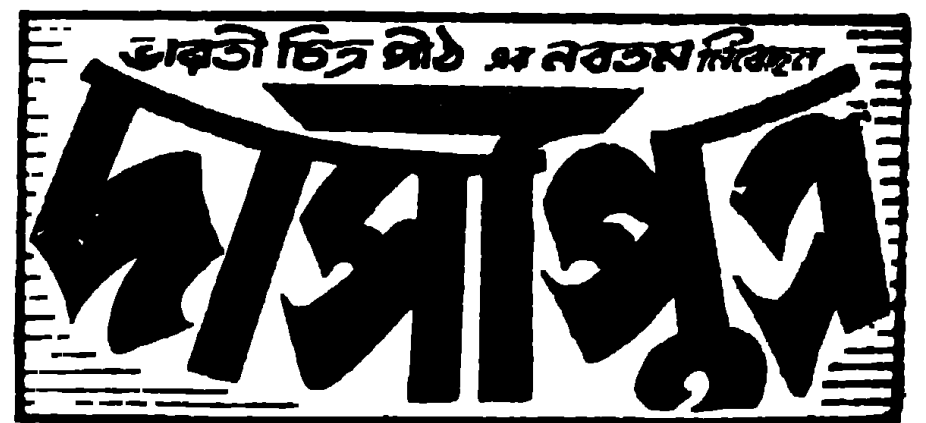
ফিল্ম ট্রাষ্ট অফ ইণ্ডিয়ার "৪২"

বাংলাতে যে কয়েকখানা ছবি প্রস্তুতির পথে রয়েছে তার মধ্যে 'তুলিনাই'খ্যাত হেমেন গুপ্ত প্রযোজিত ও পরিচালিত "৪২" বর্ত্তমান বর্ষের একখানি জনপ্রিয় ছায়াচিত্র হবে বলে আমরা সংবাদ পেয়েছি। "৪২" এর আন্দোলনে মেদিনীপুরে যে প্রথম স্বাধীনতা ঘোষিত হয়েছিল তারই পটভূমিকায় গ্রথিত তৎকালীন বিদেশী সরকারের অত্যাচার ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে শত সহস্র নরনারীর অহিংস আন্দোলন ও তাদের আত্মাহুতির ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর চমকপ্রদ কাহিনী এই ছবিটির বিষয়বস্তু। ছবিখানির সার্থক ও যথাযথ রূপায়োপের জন্য সেই আন্দোলনে সংশ্লিষ্ট কয়েকজন বিখ্যাত দেশকর্ম্মী পরামর্শ দিচ্ছেন। ছবির স্বাভাবিক পরিবেশ সৃষ্টির জন্য সৈন্যবিভাগীয় ও পুলিশের কার্য্যে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সাহায্য নেওয়া হচ্ছে।

প্রায় অর্দ্ধেকের বেশী ছবি তোলা হয়েছে। অভিনয়ের জন্য যাঁরা নির্ব্বাচিত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে নবাগতা পোষ্ট-গ্রাজুয়েট ছাত্রী শ্রীমতী মঞ্জু দে ও সুলেখিকা শ্রীযুক্তা পঞ্চবালা সেনগুপ্তার নাম উল্লেখযোগ্য। প্রধান অংশে অভিনয় করছেন প্রদীপ বটব্যাল। অন্যান্য অংশে আছেন শম্ভু মিত্র, বিকাশ রায়, কালী সরকার ও হরিমোহন বসু। ক্যামেরার কাজে আছেন জি, কে, মেহতা, শব্দগ্রহণে মিঃ রাও আর শিল্পনির্দ্দেশের ভার নিয়েছেন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী সুধেন নাগ।

চিত্রখানি অতি দ্রুতগতিতে কালী ফিল্মস ষ্টুডিওতে গৃহীত হচ্ছে। কর্ত্তৃপক্ষ ছবিখানি ১৫ই আগষ্ট মুক্তিদানের ব্যবস্থা করবেন বলে সংবাদ পাওয়া গেছে।

দাসীপুত্র

প্রচার সচিব অজিত সেন জানিয়েছেন বোম্বে পিকচার্স ডিষ্ট্রিবিউটার্সের পরিবেশনায় মঞ্চসাম্রাজ্ঞী সরযূবালার প্রাণস্পর্শী অভিনয়ে ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত ভারতী চিত্রপীঠের প্রথম চিত্র নিবেদন 'দাসীপুত্রে'র সম্পাদনা কার্য্য সম্প্রতি শেষ হয়েছে। খুব শীঘ্রই ছবিটি সেন্সারও হয়ে যাবে দীন মজুরের ঘরের বউ দামিনী আর তার একমাত্র ছেলে অজয়ের বিসর্পিল জীবননাট্যে আরও যারা দেখা দিল—ধনী ধনঞ্জয় রায়, তাঁর ছোট মেয়ে মালা, অজয়ের বন্ধু অশোকের বোন মীরা—এঁদেরই ভুল বোঝাবুঝি, মান-অভিমান, সংস্কার ও আভিজাত্যগর্ব্বে উদ্দীপ্ত এই কাহিনীটি দর্শকচিত্তকে আন্দোলিত করবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

কর্ম্মফল

শ্রীগুরু পিকচার্সের প্রথম ছবি 'কর্ম্মফল' মুক্তি প্রতীক্ষায়। কাহিনী লিখেছেন দুর্গাবতী দেবী। কাহিনীর মধ্যে নতুনত্বের সন্ধান পাওয়া যাবে বলে পরিচালক জানিয়েছেন। নারীহৃদয়ের অন্তর্নিহিত সুখদুঃখ ও হাসিকান্নাকে কেন্দ্র করেই 'কর্ম্মফলে'র কাহিনী গড়ে উঠেছে। নির্বাক যুগের চিত্র পরিচালক কালিপদ দাশ ছবিখানির প্রযোজক ও পরিচালক। সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন দেবী ভট্টাচার্য্য। বিভিন্ন ভূমিকায় রূপ দিয়েছেন মনোরঞ্জন, বাণীব্রত, প্রীতিধারা, অপর্ণা দেবী, বীরেন মিত্র, রাজলক্ষ্মী (এন্,টি) তুলসী চক্রঃ, স্বাগতা দেবী, সুকুমার গুহ প্রভৃতি।

দিনের পর দিন

জ্যোতির্ম্ময় রায় পরিচালিত লোকবাণী চিত্র প্রতিষ্ঠানের

প্রাথমিক চিত্র নিবেদন 'দিনের পর দিন' ছবির কাজ সমাপ্ত হ'য়ে গেছে। সেন্সারের ছাড়পত্র পেয়ে ছবিটি মুক্তির দিন গুনছে। এর দুটি প্রধান অংশে অভিনয় করেছেন শ্রীমতী বিনতা রায় ও বিকাশ রায়। অন্যান্য ভূমিকায় আছেন সন্তোষ সিংহ, নিবেদিতা দাস, সাধনা চৌধুরী, অপর্ণা দেবী প্রভৃতি। সুর দিয়েছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

মহাভারতী লিমিটেড্

এঁদের প্রথম ছবি 'কুয়াশা'র চিত্রগ্রহণ অতি দ্রুত গতিতে অগ্রসর হচ্ছে। ছবিখানি পরিচালনা করছেন এই নাটকের কাহিনীকার প্রেমেন্দ্র মিত্র। বিভিন্ন চরিত্রে আছেন ধীরাজ, শিপ্রা, ছায়া দেবী, গুরুদাস, কানু বন্দ্যোঃ, নবদ্বীপ, নৃপতি ও নৃপেন্দ্রগোপাল।

"আবার কালো-ছায়া" নামে আর একটি রহস্যচিত্র এই প্রতিষ্ঠানের দ্বিতীয় অবদানরূপে আত্মপ্রকাশ করবে—এই মর্মে কর্তৃপক্ষ একটি বিবৃতি দিয়েছেন। তাঁরা জানাচ্ছেন প্রেমেন বাবুর প্রথম সাফল্যমণ্ডিত রহস্য-চিত্র 'কালো ছায়া'র উপক্রমণিকা হিসেবে রচিত হলেও এর আখ্যানভাগের মৌলিকত্ব ও আকর্ষণ অনেক বেশী। আশা করা যায় ছবিখানি 'কালোছায়া' অপেক্ষাও চিত্তাকর্ষক হবে। এখানিরও রচয়িতা ও পরিচালক প্রেমেন বাবু।

মুক্তি-প্রতীক্ষায় "দেবী-চৌধুরাণী"

'দেবী-চৌধুরাণী'র অবগুণ্ঠন উন্মোচিত হবার শুভ দিনটি কর্তৃপক্ষ এখনও আমাদের জানাতে পারেন নি। আশা করা যায়, বৈশাখ সংখ্যায় আমরা এই ছবির মুক্তি দিবসটির ঘোষণা প্রচারের সুযোগ পাব।

গত সংখ্যার 'চিত্রবাণী'তে মূল উপন্যাসের সারাংশ আমরা প্রকাশ করেছি। কাহিনীর মাধুর্য অক্ষুণ্ণ রেখে, যত্ন ও নৈপুণ্যের সঙ্গে, বাণীচিত্রাকারে তার নাট্যাংশ পরিবেশিত হয়েছে, কর্তৃপক্ষ এ আশ্বাস আমাদের দিয়েছেন। নাটকের উপযোগী অনেকগুলি গান সন্নিবেশিত হওয়ায়, বাণীচিত্রের মাধুর্য বৃদ্ধি পেয়েছে। গানগুলির রচয়িতা নবযুগের অন্যতম জনপ্রিয় কবি বিমলচন্দ্র ঘোষ ও গীতকার মো[illegible] চৌধুরী। সঙ্গীতাংশের পরিচালনা করেছেন কালীপদ [illegible]

ছবিখানির সম্পূর্ণ বহির্দৃশ্য, জাঁকজমকপূর্ণ দৃশ্যাবলী, বিশেষ বিশেষ অংশগুলির পরিচালনা করেছেন [illegible] প্রযোগ-শিল্পী প্রফুল্ল রায়। পথমাংশের পরিচালনার ভার ছিল সতীশ দাশগুপ্তের উপর। শিল্পী শৈলেন [illegible] আলোকচিত্রগ্রহণে তাঁর কলা নৈপুণ্যের পূর্ণ পরি[illegible] দিয়েছেন বলে প্রকাশ। এই ধরণের চিত্র প্রযোজনা[illegible] ছবির মাধুর্য যে চিত্রশিল্পীর কৃতিত্ব ও নৈপুণ্যের উপ[illegible] অনেকখানি নির্ভর করে, একথা বোধ করি বার বার উল্লে[illegible] না করলেও চলে। দৃশ্যপটবাজির পরিকল্পনা ও পরিবেশনা[illegible] এই চিত্রের প্রবীণ শিল্প-নির্দেশক বটু সেন তাঁর সুনামে[illegible] উপযোগী কাজ করেছেন, এর আভাষও আমরা পেয়েছি।

'দেবী-চৌধুরাণী' সব দিক থেকে সাফল্যমণ্ডিত হোক, এই কামনা করি।

পরিবর্তন

ন্যাশান্যাল প্রোগ্রেসিভ পিকচার্স, যাঁরা 'ভুলি নাই' তুলেছিলেন, ছোটদের উপযোগী একটি পূর্ণাঙ্গ ছবি তোলার কাজে হাত দিয়েছেন। ভারতে এই রকম পূর্ণাঙ্গ ছবি তোলার ব্যাপারে তাঁরাই হবেন পথ প্রদর্শক। ছবিটির নাম দেওয়া হয়েছে 'পরিবর্তন' এবং পরিচালনার ভার গ্রহণ করেছেন সত্যেন বসু।

বোম্বে টকীজ

বঙ্কিমচন্দ্রের বিখ্যাত উপন্যাস 'রজনী' একটি অন্ধ বালিকার প্রেম কাহিনী। এই উপন্যাসটিতে নাটকের উপযোগী মালমশলা আছে প্রচুর। একে যথাযথ ভাবে চিত্রে রূপান্তরিত করতে পারলে, দর্শকসাধারণকে প্রচুর রস এবং আনন্দ পরিবেশন করতে পারবে। বোম্বে টকীজ ক্যামেরাম্যান-পরিচালক নীতিন বোসের অধীনে 'রজনী'র—বাংলায় চিত্ররূপ দেবেন বলে স্থির করেছেন। এর প্রধান দুটি চরিত্রে থাকবেন, অশোককুমার ও সুনন্দা দেবী।

চিত্রবাণী

কে, এম, মুন্সীর চিত্র প্রযোজনা

বোম্বের স্বরাষ্ট্র বিভাগের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী এবং হায়দ্রাবাদের প্রাক্তন এজেণ্ট জেনারেল মিঃ কে, এম, মুন্সীর বিখ্যাত উপন্যাস 'জয় ভারত' চিত্রে রূপান্তরিত হবে বলে জানা গেছে। ছবিটির প্রযোজনা করবেন মিঃ মুন্সী নিজেই এবং পরিচালনা করবেন রামচন্দ্র ঠাকুর।

শুভ মহরৎ

গত ১লা বৈশাখ ক্যালকাটা মুভিটোন ষ্টুডিওয় কলালক্ষ্মী চিত্রমন্দিরের প্রযোজনায় শরৎচন্দ্রের 'স্বামী'র শুভ মহরৎ হ'য়ে গেছে। ছবিখানি পরিচালনা ক'রবেন পশুপতি চট্টোপাধ্যায়। চিত্ররূপ দিয়েছেন পরিচালক স্বয়ং। চিত্র গ্রহণের ভার নিয়েছেন দেওজী ভাই।

জানা গেছে সুমিত্রা ও পাহাড়ী ছবিখানির দু'টি প্রধান অংশে অভিনয় ক'রবেন।

উল্টারথ

বসুমিত্রের দ্বিতীয় চিত্র 'উল্টারথে'র কাজ অমলকুমার বসুর পরিচালনায় ইষ্টার্ণ টকীজ ষ্টুডিওতে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হচ্ছে। কয়েকটি প্রধান ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করেছেন মলিনা, পাহাড়ী সান্যাল, সিপ্রা, গুরুদাস প্রভৃতি। অয়স্কান্ত বক্সীর 'ডাঃ মিস কুমুদ' নামক নাটক অবলম্বনে এই ছবির চিত্রনাট্য রচিত হয়েছে

বিষের ধোঁয়া

লীলাময়ী পিকচার্সের দ্বিতীয় ছবি 'বিষের ধোঁয়া'র চিত্রগ্রহণ সমাপ্ত হয়েছে। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় স্বরচিত কাহিনীর চিত্রনাট্য রচনা করেছেন। প্রধানাংশে অভিনয় করেছেন অহীন্দ্র, সন্ধ্যারাণী ও অভি ভট্টাচার্য। ছবিখানি পরিচালনা করেছেন অতনু বন্দ্যোপাধ্যায়।

'হযবরল' ও নৃত্যগীতানুষ্ঠান

গত ২০এ মার্চ রবিবার নিউ এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চে শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীগণ কর্তৃক সুকুমার রায়ের হ য ব র ল অভিনীত হয়। নাট্যাভিনয়ের পূর্ব্বে নৃত্যগীতানুষ্ঠান হয়।

হযবরল পড়েননি এমন লোকের সংখ্যা বাঙ্গলা দেশে খুব কম। বই পড়ে হাসেন নি, এমন লোকের সংখ্যা আরও কম। স্বপ্নের ঘোরে যে সব অদ্ভুত জন্তু জানোয়ারের দেখা পাওয়া যায়, তারাই সুকুমার রায়ের এক একটা জীবন্ত চরিত্র। এই কাহিনীকে নাট্যরূপ দেওয়া ও চরিত্রগুলি যথাযথ ফুটিয়ে তোলা দক্ষতার পরিচায়ক।

উদোর ভূমিকায় সুধীর সেন, হিজিবিজবিজের ভূমিকায় তপেন নিয়োগী, কাকের ভূমিকায় অমিতাভ চৌধুরীর অভিনয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'আমি'-র ভূমিকায় অর্থাৎ যার স্বপ্ন দেখার দৌলতে এতগুলি চরিত্রের সৃষ্টি—অভিনয় করেছেন শুভময় ঘোষ, এর অভিনয় সহজ ও স্বাভাবিক হয়েছে। সুনীবঞ্জন ঘোষ, সুধীর দাশগুপ্ত, নবকান্ত বড়ুয়া, সনৎ ব্যানার্জী যথাক্রমে বেড়াল, বুদো, নেড়া ও ব্যাকরণ সিং (ছাগল)-এর ভূমিকাভিনয় করেন।

হযবরল-র মুখোস ও সাজ পরিকল্পনা বিশেষ প্রশংসার দাবী করে। পরিকল্পনা করেন শান্তিনিকেতনের বিশিষ্ট শিল্পী রামকিঙ্কর বেইজ ও দৃশ্যসজ্জার সহায়তা করেন সুনীতি মিত্র ও আশিস মাইতি।

এই নাট্যাভিনয়ের পূর্বে নৃত্য ও গীতের অনুষ্ঠান হয়। শান্তিদেব ঘোষের 'কালো, তা সে যতই কালো হোক,' সুচিত্রা মিত্রের 'সার্থক জনম আমার' ও গীতা নাহার 'খেলার সাথী বিদায়-দ্বার খোলো' গান আমাদের বিশেষ তৃপ্তি দান করেছে। 'চিত্রাঙ্গদার' একটি দৃশ্যে কেলু নায়ার ও সেবা মিত্র অংশ গ্রহণ করেন, উভয়ের নৃত্যের যে স্বাভাবিক সৌন্দর্য আছে তার নূতন করে উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। একক নৃত্যে 'ফল ফলাবার আশা' গীত সংযোগে বাণী ভঞ্জ ও দ্বৈত নৃত্যে 'মম চিত্তে নিতি নৃত্যে' গীত সহযোগে কেলুনায়ার ও মাধবী ঘোষ দর্শকদের প্রশংসা অর্জন করেন। একটি অসমীয়া লোক-নৃত্য আমাদের বিশেষ আনন্দ দান করেছে—দুই ভগ্নী প্রতিভা ও প্রতিমা বড়ুয়া লোক সংগীত সহযোগে এই নৃত্যে অংশ গ্রহণ করেন। গানটি শ্রুতিমধুর হয়ে ছিল, নাচটিও সেই সঙ্গে বিশেষ উপভোগ্য হয়।

চিত্রবাণী

নৃত্যে বালিকার কৃতিত্ব

কুমারী পম্পা ঘোষ সম্প্রতি চন্দননগরে অনুষ্ঠিত নিখিল বঙ্গ সঙ্গীতকলা প্রতিযোগিতায় 'আধুনিক নৃত্য' বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। ঐ প্রতিযোগিতায় সকল বিভাগের বিভিন্ন বয়সের প্রতিযোগীদের মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়ায় সে একটি রূপার নটরাজ মূর্তি পুরস্কার পেয়েছে। তার নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গীতানুষঙ্গ করেন 'ঝরা-ফুলদল অর্কেস্ট্রা'।

কুমারী পম্পার বয়স আট বছর। কলকাতার [illegible] স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীর একজন মেধাবী ছাত্রী সে। ইতিপূর্বেও সে কয়েকটি ক্ষেত্রে নৃত্য ও আবৃত্তিতে কৃতিত্ব দেখিয়ে পুরস্কার লাভ করেছে। পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে এই বয়সেই সে নৃত্যশিল্পে প্রশংসনীয় নৈপুণ্যের অধিকারিণী হয়েছে। সে এখন 'নরেন্দ্রগীতি মন্দিরে'র নৃত্যশিক্ষক তপেন্দ্র শেখর সোমের শিক্ষাধীনে আছে। কুমারী পম্পা সাহিত্যিক-শিল্পী মনোমোহন ঘোষ (চিত্রগুপ্ত)-এর কন্যা।

পুতুল নাচের ইতিকথা

সংসারের কুটিল পথচলায় যারা ভ্রষ্টলগ্ন, সব থেকেও যারা জীবনে শান্তি খুঁজে পেলো না, ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ তরণীর মত যাদের জীবনস্রোত উদ্দামগতিতে ছুটে চলে কিন্তু প্রশান্ত মোহানায় এসে পৌঁছাতে পারেনা, জীবনপাত্র যাদের উচ্ছলে উঠেও মাধুরীর সন্ধান দেয় না, জীবনে অন্তহীন জিজ্ঞাসার জবাব যারা পেলে না—তাদেরই বেদনাজর্জর দৈনন্দিন জীবনের ইতিহাস নিয়ে রচিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুতুল নাচের ইতিকথা'। বহু পঠিত উপন্যাসের প্রতিটি ঘাত প্রতিঘাত, সংশয়-উদ্বেগ, রোমাঞ্চ ও উত্তেজনা চিত্ররূপে নিখুঁত ভাবে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা হয়েছে আমরা জানতে পারলাম। প্রযোজনা করেছেন কমল কুমার ঘোষ, পরিচালনা অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের। বিভিন্নাংশে আছেন নমিতা দাস, অমিতা বোস, কালী ব্যানার্জী, কুমার মিত্র, ভূপেন চক্রবর্তী প্রভৃতি। ছায়াবাণী লিমিটেডের পরিবেশনায় ছবিটির মুক্তিলাভের আর বিশেষ দেরী নেই জানা গেল।

'কালিকা'—মঞ্চে 'বিজয়নগর'

'নন্দনা এই পরিষদের' প্রযোজনায় ১১ই এপ্রিল রবিবার সাড়ে সাতটায় কালিকা রঙ্গমঞ্চে রবীন্দ্রনাথ মৈত্র রচিত 'বিজয়নগর' নাটক অভিনীত হয়। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন [illegible] এবং প্রধান অতিথি ছিলেন ডক্টর কালিদাস নাগ। নাটকে বিজয়নগর রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার [illegible] গৌরবারুণ রেখা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। অভিনয়ে অতিনাটকীয়তাই প্রবল। নীতিশ মুখার্জী (তোগলক) ও মণি চ্যাটার্জীর (ফিরোজ শাহ) মেক-আপ ভালো, নীতিশকে আরও বয়স্ক দেখালে ভালো হোত। নৃত্য সঙ্গীত ও নেপথ্য সঙ্গীতের ত্রুটির জন্য নৃত্যগুলি আবেদনহীন হয়েছে। অভিনয় পরিচালনা করেন সঞ্জীব দাস আর অন্যান্য বিভিন্ন ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করেন তুলসী লাহিড়ী, সত্য গাঙ্গুলী, সুধীর দে, জ্যোতিকণা রায়, স্মৃতিরেখা বিশ্বাস, শান্তা দেবী প্রভৃতি।

[illegible] কর্তৃক চিত্রবাণী কার্যালয় ৫, হাজরা লেন থেকে প্রকাশিত এবং
মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রিণ্টার্স এণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড, ৫৭সি বেচু চ্যাটার্জ্জী থেকে ষ্ট্রীট থেকে মুদ্রিত

চিত্রবাণী

দ্বিতীয় বর্ষ :: আষাঢ়, ১৩৫৭ :: দশম সংখ্যা

নূতন প্রহসন

বহু ধূম-ধাম ও সমারোহের সঙ্গে বহু-প্রচারিত এবং বহু-প্রতীক্ষিত বাংলা, আসাম, বিহার এবং উড়িষ্যার চিত্র প্রদর্শকবৃন্দের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। এ অনুষ্ঠান আমাদের সঙ্কটজনক চিত্রশিল্পে নতুন ইতিহাস রচনা করবে এতটা আশা আমরা করি নি। তাহলেও আজকে চিত্রশিল্পের এই দুর্দ্দিনের মাঝে এটা একটা ঐতিহাসিক ঘটনা। 'বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া'র মতই সেটা শুধু ঘটনাই রয়ে গেল। সম্মেলনের কোন দিনের কোন অনুষ্ঠানের মধ্যে চিত্রশিল্পের এই দুর্দ্দিনে নিজেদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সজাগ হওয়ার কোনো লক্ষণই দেখতে পেলাম না চিত্রগৃহের পরিচালকদের মধ্যে। তাঁরা প্রত্যেকেই শুধু ওকালতি ক'রে সাফাই গেয়ে পত্র-পত্রিকা ও চিত্রামোদী জনসাধারণের কাছে প্রচার করতে চেষ্টা করেছেন যে একদিকে যেমন তাঁদের দুরবস্থার অন্ত নেই, অন্যদিকে তেমনি তাঁরা এই শিল্পটির মুখ চেয়ে ত্যাগ স্বীকারের মহৎ ব্রতে দীক্ষিত। তাঁরা নিবেদন জানিয়েছেন সরকারের কাছে, তাঁদের কি কি চাই তারই লম্বা তালিকা দিয়ে। তাঁরা উপদেশামৃত বর্ষণ করেছেন বাংলার চিত্র-প্রযোজকদের, তাঁরা নির্দ্দেশনামা জারী করেছেন পরিবেশক সম্প্রদায়কে। বলা বাহুল্য, এই সম্মেলনে মফঃস্বল চিত্রগৃহের প্রদর্শকদের বক্তব্য তেমন কিছু জানা যায় নি। এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য কি, সার্থকতা কোথায় দেখা দিল, নতুন কোন পথের নিশানা পাওয়া গেল তা আমরা জানি না, জানবার বোধ হয় কথাও নয়। এই সম্মেলন অনুষ্ঠানের জন্য যে ব্যয় বহন করলেন উদ্যোক্তারা তার পরিবর্ত্তে তাঁরা কি পেলেন তা অবশ্য তাঁরাই বলতে পারেন। আমরা গত সংখ্যার 'চিত্রবাণী'তে এই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হীন সম্মেলনের ব্যর্থতা সম্বন্ধে যে আশঙ্কা প্রকাশ করে ছিলাম, আজ দেখছি তা সত্যে পরিণত হয়েছে। আমরা জানি যে চিত্রশিল্পের বর্ত্তমান দুর্গতির [illegible] কারণ হলেন কলকাতার একদল স্বার্থসর্ব্বস্ব কা[illegible] প্রদর্শক। ছবি দেখানোর জন্যে তাঁদের [illegible]

এবং অপ্রকাশ্য সর্ত্ত প্রযোজক ও পরিবেশকদের মেনে চলতে হয়—তার সব কথা জানা এবং দেখা গেলেও বলা যায় না, কারণ এইভাবে যে প্রযোজক আর পরিবেশক উৎপীড়িত হন তাঁরা এসব কথা সর্বসমক্ষে জানাতে ভয় পান। আর এই ভয়কে মূলধন করেই চলেছে এক শ্রেণীর প্রদর্শকের বাণিজ্য। হিসাব নিলে দেখা যায় গত কয়েক বছরে চিত্রশিল্পে শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে একমাত্র প্রদর্শকদেরই এবং সেটা সম্ভব হয়েছে চিত্রশিল্পের অন্যান্য বিভাগের ক্ষয়-ক্ষতিকে সম্বল ক'রে। চোরা-কারবারীদের সঙ্গে এই সুবিধাবাদীর দলকে একসঙ্গে তুলনা করলে কোন্ সম্প্রদায়কে ছোট করা হয় তা অবশ্য তাঁরাই বলতে পারেন। আমরা শুধু ভাবছি এই ভণ্ডামী আরও কতদিন চলবে? মুখোস খুলতে আর কত দেরী? এঁরা নাকি বলেন যে, এই দুস্কৃতি ও অন্যায় উৎপীড়ন বন্ধ হলেই কি আমাদের ছবির উৎকর্ষ বাড়বে? তা অবশ্যই নয়। কিন্তু সাধারণ ভাল ছবি তুলে প্রযোজকদের ঘরের টাকা ফিরে আসার আশা থাকবে। প্রযোজকের নির্বুদ্ধিতা এবং অনেকক্ষেত্রেই অকারণ ব্যয়-বাহুল্য আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু প্রদর্শকদের হাতে তাঁদের লাঞ্ছনার ইতিহাসও ভোলা যায় কি?

এই প্রদর্শক সম্মেলনে অনেক কথাই ওঠা উচিত ছিল, এই দুস্কৃতি ও উৎপীড়নের ইতিহাস প্রকাশ্যভাবে উদ্ঘাটিত হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তা হয় নি। সবই ধামাচাপা পড়ে গেছে। চিত্রশিল্পের জন্য কোন উৎকণ্ঠা প্রকাশ পায় নি উদ্যোক্তাদের মধ্যে, প্রকাশ পেয়েছে প্রচারের উৎকণ্ঠা, প্রকাশ পেয়েছে নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণের অপচেষ্টা। এই সম্মেলন চিত্রামোদীদের মনে শুধু একটি প্রশ্নই জাগিয়ে তুলবে, চোরা-কারবারীরা সমগ্র দেশের শত্রু হন, তবে চিত্রশিল্পের শত্রু কারা?

গৌর চট্টোপাধ্যায়

চিত্রশিল্পের দুর্গতি

মুরলীধর চট্টোপাধ্যায়, সভাপতি, বি-এম-পি-এ

চলচ্চিত্রশিল্পের অর্থনৈতিক অবস্থা : যেসব প্রতিষ্ঠান ছবি তোলে, তাদের মধ্যে বেশীর ভাগই অর্থের দিক দিয়ে দুর্ব্বল বলেই সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয় না। সাধারণতঃ দু'ভাবে এই শিল্পের জন্যে মূলধন পাওয়া যায়। (১) কোন ব্যক্তি বিশেষের কাছ থেকে এবং (২) কোন প্রতিষ্ঠান বিশেষের কাছ থেকে। এই শিল্পটির জন্যে কোনরকম শেয়ার অথবা ডিবেঞ্চার বিক্রী করে মূলধন পাওয়া যায় না। এবং ব্যাঙ্ক অথবা বীমা কোম্পানীর কাছ থেকেও কোন টাকা পাওয়া যায় না। উল্লিখিত উপায়ে যেসব সর্ত্তে অর্থ পাওয়া যায় তার দ্বারা এই শিল্পটির প্রসার লাভের কোন উপায় থাকে না। অর্থের অপ্রতুলতাই হচ্ছে প্রধান কারণ যার ফলে নানারকম সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও চলচ্চিত্রশিল্প আজ এখানে বিশেষ উন্নতি লাভ করতে পারেনি। অর্থের অপ্রচুরতার জন্যে শুধু যে ছবি তোলার খরচ, যা সত্যকারের হওয়া উচিত তার চেয়ে অনেক কমাতে হোয়েছে তাই নয়, লোকসানের মস্ত বড় এক বোঝাও শিল্পকে বইতে হচ্ছে। পর্য্যাপ্ত পরিমাণে অর্থ পাওয়া যায় না বলে দীর্ঘ মেয়াদের পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করা যায় না তার ফলে যে কেবল ব্যক্তিগত ছবি তোলার ক্ষেত্রে খরচ বেড়ে যায় তাই নয়, মজুরীর কাঠামোর ওপরও এর প্রভাব এসে পড়ে। কারণ বিচ্ছিন্নভাবে প্রযোজকরা ছবি তোলা সুরু করলে, একটি ছবি তোলা হয়ে যাওয়ার পর পরবর্ত্তী ছবি আবার কবে তোলা হবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই সেই কারণেই এই শিল্পের কর্ম্মীদের কাজেরও কোন রকম নিশ্চয়তা থাকে না। তার ফলে কর্ম্মীদের মজুরীর হারও বেড়ে যায়। এই সমস্ত কারণে আমি মনে করি গভর্ণমেণ্ট এই শিল্পের মূলধনের জন্যে গ্রেট ব্রিটেনের অনুকরণে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করুন যেখান থেকে এই শিল্পের জন্যে ন্যায্য সুদে দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ পাওয়া যেতে পারে। অবশ্য এই প্রতিষ্ঠানের কাজ হবে শুধু টাকা ধার দেওয়া, সেই টাকা যাতে মারা না যায় তার ব্যবস্থা করা এবং সেই থেকে যথেষ্ট আয় হচ্ছে কিনা দেখা। কেবলমাত্র টাকা ধার দেওয়া ছাড়া এই প্রতিষ্ঠান ছবি তোলার ব্যাপারে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। এই উপায় অবলম্বন করলে আমার মনে হয় চলচ্চিত্রশিল্পকে তার পূর্ণশক্তি নিয়ে কাজ করতে সাহায্য করা হবে। অবশ্য নজর রাখতে হবে চাহিদার চেয়ে ছবির সংখ্যা বেড়ে না যায়।

কর :— প্রাদেশিক সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার, বিভিন্ন দেশীয় রাজ্য এবং আধাসরকারী করভারে চলচ্চিত্রশিল্প জর্জ্জরিত। এই বিপুল করভার মাথায় নিয়ে চলা তার পক্ষে এক রকম অসম্ভব হোয়ে দাঁড়িয়েছে। এই শিল্পের দেয় করের তালিকা দেওয়া হোল :—

(১) কাঁচা ফিল্মের ওপর আমদানী শুল্ক (২) চলচ্চিত্র বিষয়ক যন্ত্রপাতির ওপর আমদানী শুল্ক (৩) যন্ত্রপাতির টুকরো অংশের ওপর আমদানী শুল্ক (৪) কার্ব্বন, মেক্-আপ-এর জিনিষ পত্র এবং রাসায়নিক দ্রব্যের ওপর আমদানী শুল্ক (৫) বিক্রয় কর (বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন হারে) (৬) বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহারের জন্যে কর (৭) ফিল্ম ভল্টের জন্যে লাইসেন্স (৮) জল ব্যবহারের জন্যে কর (৯) ব্যবসার জন্যে মিউনিসিপ্যালিটির লাইসেন্স (১০)

সিনেমা চালু রাখার জন্যে মিউনিসিপ্যাল লাইসেন্স (বাংলা-দেশে দিতে হয়) (১১) প্রচার পুস্তিকার ওপর বিক্রয়ের কর (১২) বিজ্ঞাপনের জন্যে কর (কোন কোন যায়গায় দিতে হয়) (১৩) প্রত্যেক শো'র জন্যে থিয়েটার কর (কোন কোন যায়গায় দিতে হয়) (১৪) ছবি সেন্সারের জন্যে ফি (১৫) অকট্রয় কর (কোন কোন যায়গায় দিতে হয়) (১৬) পুলিশ লাইসেন্স ফি (বাংলা দেশে দিতে হয়) (১৭) যানবাহন নিয়ন্ত্রণের জন্যে পুলিসকে দেয় কর (বাংলা দেশে দিতে হয়) (১৮) প্রত্যেক ফিল্মের পার্শেলের জন্যে আমদানী কর (মধ্যভারত রাজ্যে দিতে হয়) (১৯) সরকারী প্রদর্শনের ভাড়া। সাপ্তাহিক বিক্রয়ের ওপর শতকরা ২৲ টাকা থেকে ১৷৷০ টাকা দিতে হয় (২০) আমোদ কর (২১) আয়কর (২২) সুপার ট্যাক্স। আমোদকরের প্রতি আমি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, কারণ ঐ করটি শতকরা সাড়ে বারো টাকা থেকে শতকরা পঁচাত্তর টাকা পর্য্যন্ত স্থান বিশেষে হোয়ে থাকে। টিকিট বিক্রীর টাকার বেশীর ভাগ অংশই এই করের জন্যে চলে যায়। নিম্নলিখিত হারে কর ধার্য্য করলে এই শিল্পটির কিছু সুরাহা হয় এবং একে বাঁচাবারও একটা উপায় হয় :—

(১) আট আনা পর্য্যন্ত সমস্ত আসনের ওপর থেকে আমোদকর তুলে নিলে (২) আট আনা থেকে দু'টাকা পর্য্যন্ত সমস্ত আসনের ওপর আমোদকর কমিয়ে শতকরা সাড়ে বারো টাকা করলে। (৩) দু'টাকার বেশী মূল্যের আসনের ওপর আমোদকর কমিয়ে শতকরা পঁচিশ টাকা করলে।

অন্যান্য করগুলি যা চিত্রশিল্প ছাড়া অন্য শিল্পের বেলায় ধরা হয় না, সেগুলিকে একেবারে তুলে দেওয়া উচিত এবং করের হার সব জায়গায় একরকম হওয়া উচিত। এই ব্যাপারে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে যে করের হার কমালে এবং তুলে দিলে সরকারের আয় কমে যাবে এবং এই ক্ষতিপূরণ অন্য জায়গা থেকে করা সম্ভব নয়। এর উত্তরে বলা যায় যে প্রথমে হয়তো সরকারের আয় সামান্য কমতে পারে কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থা আরো কিছুদিন চললে চলচ্চিত্রশিল্প একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে। তখন তো সরকার কোন কিছুই পাবেন না।

ছবির বাজার

ভারতে ভ্রাম্যমান সিনেমাসহ তিন হাজারের ওপর সিনেমা আছে। ভারতের লোকসংখ্যা অনুসারে এই সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য। ছবির বাজার অত্যন্ত সীমাবদ্ধ, এবং প্রাদেশিক ভাষাসম্বলিত ছবির অবস্থা আরো শোচনীয়। ছবির বাজারের এই স্বল্প পরিধি কেবল যে ছবির সংখ্যাকে কমিয়ে দেয় তাই নয় ছবির উৎকর্ষের মানকেও নামিয়ে দেয়। পূর্ব্ব পাকিস্তান হওয়াতে পশ্চিম বঙ্গের ছবির বাজার অত্যন্ত সঙ্কুচিত হয়েছে। এই অবস্থার উন্নতি করতে হলে যেসব জায়গায় লোকসংখ্যা বেড়ে গেছে সেই সব জায়গায় নতুন চিত্র গৃহ তৈরী করা উচিত। অবশ্য নতুন চিত্র গৃহ তৈরী করার ওপর যে সরকারের নিষেধাজ্ঞা আছে সেটি প্রথমে তুলে নিতে হবে। আর ভারতীয় ছবি ভারতের বাইরে দেখাবার জন্যে সরকারকে সচেষ্ট হতে হবে।

বাধ্যতামূলকভাবে এদেশে সরকারী সংবাদ-চিত্র দেখানো প্রদর্শকদের কাছে অত্যন্ত অসুবিধার বিষয় হোয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ সরকার ছবি দেখানো বাবদ প্রদর্শকদের কিছুই দিচ্ছেন না উপরন্তু সেই ছবির ভাড়া আদায় করে ছাড়ছেন। এই বাধ্যতামূলকভাবে সরকারী সংবাদচিত্র দেখানো বন্ধ করে দেওয়া উচিত। সরকার যদি সিনেমার মাধ্যমে তাঁদের প্রচার চান তাহোলে তার জন্যে চিত্রগৃহকে ন্যায্য ভাড়া দিতে হবে। এবং সরকারকে নিজের তৈরী সংবাদ চিত্রকে অন্যান্য বেসরকারী প্রযোজকের তৈরী সংবাদচিত্রের সঙ্গে বাজারে ছাড়তে হবে, আর তার ভাড়াও প্রতিযোগিতামূলকভাবে ঠিক হবে।

সেন্সরশিপ

সেন্সর-ব্যবস্থা বর্ত্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে চলে গেছে। এর সদস্যদের মধ্যে যেন চিত্রশিল্পের যোগ্য ব্যক্তিগণ স্থান পান। এবং সেন্সরের আইনকানুন প্রস্তুত করবার সময় সরকার যেন উদারনৈতিক পন্থা অবলম্বন করেন। সেন্সরের কাজ হবে—ছবির কোন অংশে যদি জনসাধারণের নৈতিক চরিত্র-হানিকর এবং বে আইনী কার্য্যকলাপ থাকে সে অংশটুকু সাধারণ্যে প্রদর্শিত হতে না দেওয়া। চলচ্চিত্রের মাধ্যমে জনসাধারণকে শিক্ষা দেওয়ার জন্যে আদেশ করা অথবা সরকারের ইচ্ছানুসারে জনসাধারণের মতের ব্যাখ্যা করা সেন্সরের কাজ নয়। সেন্সরের কর্ত্তব্য হচ্ছে, জনমতের ওপর কোন রকম আঘাত করা হয়েছে কিনা সেদিকে লক্ষ্য রাখা, কোন নতুন ধরনের জনমত তৈরী করা নয়। রাজনৈতিক ছবির প্রচলিত সেন্সর পদ্ধতির আমি প্রতিবাদ করি : আমাদের দেশ স্বাধীন হয়েছে, এখন আমাদের জাতীয় সংগ্রামের চিত্ররূপ দিতে কোনরূপ বাধা-নিষেধ থাকা উচিত নয়। সেন্সরের কাজকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করতে হোলে সেন্সর প্রধানের অভিমতের বিরুদ্ধে আইন অনুসারে আপীলের সুযোগ দেওয়া উচিত। সেন্সর বোর্ড ভারতীয় ভাষান্তরিত বিদেশী ছবি এবং ভারতে তৈরী ছবি সেন্সারে যে

অসামঞ্জস্যপূর্ণনীতি গ্রহণ করেন তার প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বিদেশী ছবি ভারতীয় ভাষায় রূপান্তরিত করলেই ভারতীয় ছবির সামিল হয়। সুতরাং এই ছবি সেন্সর করবার সময় ভিন্ন নীতি গ্রহণ করা উচিত নয়। সব ক্ষেত্রেই একরকম নীতি থাকা দরকার। আর একটি বিষয় আমার উল্লেখ করা উচিত যে চিত্রনাট্য সেন্সর করার যে রীতি আছে সেটা থাকা উচিত নয়। কারণ এতে নানা প্রকার অসুবিধা দেখা দেয় এবং ক্ষতিও হয়।

ছবির জন্য A এবং U সার্টিফিকেট প্রবর্ত্তন করে সরকার ভালই করেছেন। কিন্তু এই নিয়মের ব্যতিক্রম হোলে সিনেমার ম্যানেজারকে দায়ী করা হবে এটা-ঠিক ন্যায় সঙ্গত হয়নি। জনসাধারণের মধ্যে ভালভাবে নাগরিক বোধ প্রসার লাভ করলে এই আইন যথারীতি পালিত হবে না। এই আইন কার্যকরী করবার ব্যাপারে চিত্রগৃহের ম্যানেজারের কোন রকম ক্ষমতাই নেই। একমাত্র পুলিশের দ্বারাই একাজ সম্ভব।

বিনা বাধায় যেসব বিদেশী ছবি এবং ভারতীয় ভাষায় রূপান্তরিত বিদেশী ছবি এদেশে দেখানো হচ্ছে তাতে বাধা দেওয়া উচিত। বিদেশী ছবি দেখানোর ফলে ভারতবর্ষ থেকে এই শিল্পের এক পঞ্চমাংশ আয় বিদেশে চলে যায়। এই যে বহু টাকা বিদেশে চলে যাচ্ছে, এটা একেবারে বন্ধ না করতে পারলেও তার জন্য একটা ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত

যেসব দেশের ছবি এখানে দেখানো হয় সেই সব দেশে ভারতীয় ছবি (যদি প্রয়োজন হয় ইংরাজী ভাষায় রূপান্তরিত করে) দেখাবার বন্দোবস্ত সরকারীভাবে করা যেতে পারে এবং সেখান থেকে যে পরিমাণ টাকা পাওয়া যাবে তারই সমপরিমাণ টাকা বিদেশী ছবি দেখিয়ে এবং এখান থেকে নিয়ে যাওয়া চলবে।

ছবির অতি-উৎপাদন

এক বছরে যতগুলি ছবি দেখানো সম্ভব ঠিক সেই পরিমাণ ছবিই তৈরী হওয়া উচিত। ছবির অতি-উৎপাদন কমানো সম্ভব হয় যদি একক প্রযোজকরা শিল্পের উন্নতিকল্পে একসঙ্গে মিলে কাজ করেন। ছবির উৎপাদন কমাবার জন্যে সরকারের অনুমতিপত্র (লাইসেন্স) নিয়ে ছবি তোলার ব্যবস্থাকে আমি অনুমোদন করি না, কারণ সত্যিকারের ভাল প্রযোজকের মান নির্ণয়ের কোন মাপকাঠি নেই।

টেকনিক্যাল শিক্ষা এবং গবেষণার জন্য বিদ্যালয়

টেকনিসিয়ান, শিল্পী এবং পরিচালকদের শিক্ষাদানের জন্যে এদেশে বিদ্যালয় স্থাপন করা অত্যন্ত প্রয়োজন। কাল বিলম্ব না করে এর প্রতিষ্ঠা-কার্য্য আরম্ভ করা উচিত। এর জন্যে যে টাকার প্রয়োজন তা শিক্ষার্থীদের দেয় মাহিনা এবং আমোদকরের টাকার কিছু অংশ থেকে মেটানো যাবে। আর যদি আমোদকর হ্রাস করা হয় তবে এই বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় অর্থের জন্যে শিল্পের ওপর অপর একটি কর বসানো যেতে পারে।

সংস্কৃতিমূলক ছবির ওপর আমোদকর

অত্যন্ত সুখের বিষয় যে কয়েকটি প্রাদেশিক সরকার সত্যিকারের সংস্কৃতিমূলক ছবির ওপর থেকে আমোদকর রহিত করে দেবার বন্দোবস্ত করছেন। এই ব্যবস্থা ভারতের সব প্রদেশেই করা উচিত।

নির্দ্দিষ্টসংখ্যক এদেশীয় ছবি দেখাবার ব্যবস্থা

ভারতবর্ষের সমস্ত সিনেমাগৃহগুলিতে সারা বছরে নির্দ্দিষ্টসংখ্যক ভারতীয় ছবি দেখাবার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের জন্যে আমি বিশেষভাবে সুপারিশ করছি। এই ব্যবস্থার ফলে ভারতীয় ভাষা সম্বলিত এবং প্রাদেশিক ভাষাসংযুক্ত ছবিগুলির বিশেষ সুবিধা হবে।

[চলচ্চিত্র তদন্ত কমিটিতে প্রদত্ত অভিভাষণের সারাংশ]

চলোর্মি সংস্কৃতি কেন্দ্র

গত শনিবার (৫ই আগষ্ট) সন্ধ্যায় "গীতাভবনে" চলোর্মি সংস্কৃতি কেন্দ্রের শিল্পকলা বিভাগের উদ্যোগে "বর্ষা উৎসব" অতি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানসূচীর মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। মহামহোপাধ্যায় কালিপদ তর্কাচার্য মহাশয় কর্তৃক মঙ্গলাচরণের পর অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। 'ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে" সঙ্গীতের পর মহামহোপাধ্যায় মহাশয় শ্রুতিমধুর কণ্ঠে "রামায়ণ" হতে বর্ষা বর্ণনা আবৃত্তি করেন। অনুষ্ঠানের মধ্যে সঙ্গীতে অংশগ্রহণ করেন শ্রীভক্তিময় দাশগুপ্ত, শ্রীমতী বাসন্তী বাগচী, শ্রীআরাধনা বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশীলা বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকানাই মুখোপাধ্যায়, শ্রীমধুর দাসগুপ্ত, শ্রীকিশোর বাগচী ও শ্রীনির্ম্মলা মিশ্র। কুমারী সুমিতা চৌধুরী ও কুমারী কৃষ্ণা ঘোষের নৃত্যগুলি বিশেষ চিত্তাকর্ষক হয়েছিল। তড়িৎ গীটারে রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুর বাজিয়ে শ্রীঅরুণ দাশগুপ্ত শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন। শ্রীমতী চিত্রা গুপ্তের রবীন্দ্রনাথের বর্ষামঙ্গল" আবৃত্তি শ্রুতিমধুর হয়েছিল। অনুষ্ঠানে তবলা সঙ্গত করেন শ্রীপরিতোষ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশোভন বন্দ্যোপাধ্যায়। এই উৎসবের ব্যবস্থাপনা করেন শ্রীসৌম্যেন বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমতী বাসন্তী বাগচী।

অনুষ্ঠানে অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র সভাপতিত্ব করেন। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন।

আপনাদের চিঠি

দীপ্তি চক্রবর্তী, যতীন দাস রোড, কলিকাতা

'অপবাদ'—চিত্রে একটি দ্বৈত-সঙ্গীতে যুবকরা মেয়েদের উদ্দেশ ক'রে গাইছে "অঙ্গ মোদের তোমরা ছাড়া, পূর্ণ কভু হয় না যে"—এরকম অশ্লীলতা লোকে সহ্য করে কি করে? আর, 'সেন্সর বোর্ড'-ই বা এই গান পাশ করেন কোন্ আক্কেলে ?

গানের ঐ কলির জন্য আপনারা যদি তীব্রভাবে প্রতিবাদ না জানান—তা'হলে চিরকালই এই চলবে! আর 'সেন্সর বোর্ড' ? ওঁদের কি আক্কেল আছে ? ওঁরা 'অশ্লীলতা'-কে হজম করতে পারেন ; কিন্তু 'স্বদেশিকতা-কে বরদাস্ত করতে পারেন না ! বাংলা দেশের মেয়েরা যদি সম্মিলিতভাবে ছায়াছবিতে প্রদর্শিত মেয়েদের প্রতি অসৌজন্য ও অশ্লীলতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান—তাহলে, ভবিষ্যতে কোনো পরিচালকেরই এই দুর্বুদ্ধি হবে না—সেটা নিশ্চিত জানবেন। 'গুঁতোর চোটেই ভূত পালায়!' জানেন তো ?

শিবনাথ দাস, হরিপাল, হুগলী

চিত্রজগতে অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা কতগুলি পুত্র-কন্যার পিতা-মাতা ? ক'জন অভিনেত্রী বিবাহ ক'রে সংসারী হয়েছেন ? আর, শ্রীমতী কানন ভট্টাচার্যের কয় বিবাহ ?

এসব খবরে আপনার কাজ কি ? আপনার এই ধরণের প্রশ্ন দেখে মনে হয়, পরবর্তী প্রশ্ন করবেন—অভিনেতা-অভিনেত্রীরা হাত দিয়ে ভাত খায় কি ? তারা কি নস্যি নেয় ? ইত্যাদি !

সুকুমার মুখার্জি, চরণপুর, বর্ধমান

অধুনা সন্ধ্যাদেবীকে বিশেষ কোনো বইয়ে দেখা যায় না কেন ? তিনি কি বাজারে একেবারে অচল হয়ে পড়্লেন ?

সাময়িক বিশ্রাম নিচ্ছেন। না, বাজারে তিনি পূর্ব্ববৎ সচল!

মনীশ লাল দাশ, বরজুলি, আসাম

বাংলা ছবি যতদিন থেকে প্রস্তুত হচ্ছে, তখন থেকে বর্তমান সময় পর্য্যন্ত ক'খানা ছবি তৈরী হয়েছে, তার কি কোনো হিসাব আছে ?

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিসংখ্যান বিভাগ এ তথ্য রাখেন কিনা আমাদের জানা নেই। কিন্তু এ-খবর নির্ভুলভাবে একমাত্র তাঁদেরই রাখা উচিত।

শিবানী মিত্র, বক্সীবাজার, কটক

আজকাল মেয়েরা সিনেমার নায়িকাদের সাজ-সজ্জা অনুকরণ করে কেন বলতে পারেন ? এটা কি লজ্জার বিষয় নয় ?

সিনেমাকেই যাঁরা প্রগতির মাপকাঠি ব'লে মনে করেন তাঁদের কাছে এটা লজ্জার নয়, গৌরবের। শুধু সাজ কেন, চলা, বলা, খাওয়া—সবই তাঁদের সিনেমা-ঢঙে !

শিবদাস ঘোষ, কালীঘাট, কলিকাতা

শৈলজানন্দবাবুর দ্বিতীয় ছবি কি 'একই গোয়ালের গরু' ?

না হ'লেও, নামটা শৈলজানন্দীয় বৈ কি !

সমর ঘোষ, চার্চ রোড, মেদিনীপুর

'নয়া-কাণ্টিং' কবিতায় 'ধুরন্ধর'মহাশয় ধীরাজ

ভট্টাচার্যকে বাদ দিয়েছেন কেন ?

আপনার চিঠি 'ধ্রুবজ্ব'কে দেখাতে তিনি দু'টি লাইন লিখে দিয়েছেন। এখানে তা উদ্ধৃত করছি—

ধীরাজ করুক 'বিরাজ'-এর পার্ট, নারী-বেশ ভালো তার
যাত্রা'দলের গুম্ফবিহীন নারী সে চমৎকার !

স্বদেশরঞ্জন দে, ডিব্রুগড় আসাম

বাংলার চিত্রজগতে কয়েকজন নামকরা বিশিষ্ট চিত্রপরিচালক ছাড়া, বাকী যাঁদের আমরা নিত্য নতুন দেখি তাঁরা কি পরিচালক হবার সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতা নিয়ে এ পথে অগ্রসর হন ?

এটা হলিউড নয়, টলিউড ! হলিউডে পরিচালক হ'তে হলে রীতিমত শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন আছে, কিন্তু টলিউডে ও-সবের বালাই নেই। এখানে নিনকয়েক ষ্টুডিয়োতে ঘোরাঘুরির মানেই অভিজ্ঞতা আর 'ক্ল্যাপষ্টিক' 'স্টার্ট ক্যামেরা এ্যাণ্ড সাউণ্ড,' ইত্যাদি জানা এবং সর্বোপরি টাকাওয়ালা লোক পাকড়ানোর নামই যোগ্যতা !

বিকাশ হালদার, চিৎপুর রোড, কলিকাতা

ভারত-সরকারের সংবাদ-চলচ্চিত্রগুলির বাংলা সংস্করণের সমাপ্তিতে লেখা থাকে 'মিনিষ্ট্রি ওফ্ ইনফরমেশন এ্যাণ্ড ব্রডকাষ্টিং, 'of' কি ক'রে 'ওফ্' হয় বলতে পারেন ?

অবাঙ্গালী এবং বাংলাভাষায় অজ্ঞ লোকের হাতে পড়লেই এ-দশা ঘটে। আমরা এ বিষয়ে ভারত সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। আশাকরি, অদূর ভবিষ্যতে এটা সংশোধিত হবে।

অশ্বিনী কুমার সিংহ, বালীগঞ্জ

বাংলা ও হিন্দী ফিল্মজগতে বর্তমান সুরস্রষ্টা কে ?

যাঁরা অসুরস্রষ্টা নন, তাঁরাই।

কাশীনাথ পালিত, নৈহাটী

আপনার প্রশ্নগুলির উত্তরের প্রতিটি লাইনে যে অভদ্রতা ও রুক্ষতা প্রকাশ পায়, সেইটিই কি আপনার আসল চেহারা ?

কাগজে নাম উঠাবার জন্যেই যাঁরা ক্রমাগত আবোল-তাবোল প্রশ্ন করে চিঠি লেখেন—তাঁদের প্রতি উত্তরদাতার উত্তর আর কত ভদ্র ও কোমল হবে বলতে পারেন ? সত্যিকারের জানার কৌতূহল নিয়ে শতকরা একজনও চিঠি লেখেন কিনা সন্দেহ ! বেশির ভাগ প্রশ্নকর্তাই জানতে চান অভিনেত্রীদের ঠিকানা, তাঁরা কে বিয়ে করেছেন, কোন অভিনেতার সঙ্গে কোন অভিনেত্রীর সম্বন্ধ, তাঁদের বয়স কি ইত্যাদি। বিচক্ষণতার সঙ্গে জ্ঞানবৃদ্ধির সহায়তামূলক প্রশ্ন করলেই আমার আসল চেহারা দেখতে পাবেন।

ডি. আর. সরকার, ভাস্তারা, হুগলী

মহিলা শিল্পীদের স্বামীর নাম যদি জানাতে ইচ্ছুক নন, তবে সাধনা বসু ও শীলা হালদারের স্বামীর নাম জানালেন কেন ?

কারণ, তাঁদের স্বামীও অভিনয়-শিল্পী।

বিশ্বনাথ মণ্ডল, রাণীগঞ্জ

বম্বে পিক্‌চার্সের 'সমর' চিত্রটি কি অন্তর্ধান করলো ?

না। আগামী পূজোর বাজারে কলকাতার 'মিনার, বিজলী ও ছবিঘরে' দেখতে পাবেন।

কেশব মুখোপাধ্যায়, নিশিরাগড়, বর্দ্ধমান

"আপনার কিছু সন্তোষ-কণা পড়িলে আমার 'পরে
জানি গো আমার শত উদ্বেগ দূরে পলাইবে সরে।"

আপনার ভুল ! সন্তোষ নাই। ঘরে আছে মোর খালি
বিরক্তি, রাগ, যত সে বিরাগ, অসন্তোষের ডালি।
দূর থেকে কেহ, বোঝেনাকো হায় ! সম্পাদকের দশা !
দিনরাত শুধু তাড়াইয়া চলি চাটুকাররূপী মশা।
পাঠকজনের সন্তোষরাশি থাকে যদি মোর প্রতি
হাসিমুখে আমি সহিয়া চলিব যত হোক ক্ষয়-ক্ষতি।

কল্যাণী মুখোপাধ্যায় ও বিনয় চট্টোপাধ্যায়ের সম্পর্ক কি ?

প্রথমজন সিনেমার কাহিনী রচনা করলে, দ্বিতীয়জন তার চিত্রনাট্য রচনা করেন। এই সম্পর্ক।

বৃন্দাবন চন্দ্র নন্দী, বৈষ্ণবাটী, হাওড়া

প্রথম কোন্ বাংলা চিত্র যার শেষ দৃশ্য প্রথমে দেখান হয় ? প্রথম কোন্ বাঙালী অভিনেত্রী ইংরাজী সবাক্ চিত্রে অভিনয় করেন ? প্রথম কোন্ বাংলা চিত্র যাতে অভিনয়ের মধ্যে অভিনয় দেখান হয় ?

নিউ থিয়েটার্সের 'রূপলেখা'। দেবিকারাণী—'কর্ম' ছবিতে। নিউ থিয়েটার্সের 'ভাগ্যচক্র'।

চলচ্চিত্র প্রদর্শক সম্মেলন

বেঙ্গল মোশান পিকচার্স এ্যাসোসিয়েশানের প্রদর্শক শাখার প্রথম বার্ষিক সম্মেলন সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয় গত ২৯শে ও ৩০শে জুলাই। দক্ষিণ কোলকাতার রাধা ফিল্মস্ ষ্টুডিয়োতে এঁদের দুই দিবসব্যাপী অনুষ্ঠান বেশ সমারোহের সঙ্গেই নিষ্পন্ন হয়। এই অনুষ্ঠানে পূর্বাঞ্চলের, অর্থাৎ বাংলা, আসাম, বিহার ও উড়িষ্যার চিত্রগৃহ সমূহের প্রায় দু'শো প্রতিনিধি ছাড়াও বহু চিত্রানুরাগী যোগদান করেন।

'জন-গণ-মন অধিনায়ক জয় হে' জাতীয় সঙ্গীতটি দিয়ে সুরু হয় উদ্বোধন উৎসব—২৯শে জুলাই সকালে। পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় ডাক্তার বিধান চন্দ্র রায় এই সম্মেলনের উদ্বোধন প্রসঙ্গে বলেন, 'চলচ্চিত্রের সঙ্গে সরকারের কিছু সংযোগ আছে; কিন্তু সে সংযোগ অনেকটা প্রহরীর সংযোগের মতো। ব্যক্তিগতভাবে তিনি এ ব্যবস্থার পক্ষপাতী নন। সাধারণভাবে ছবির অনুমোদন ব্যবস্থার বা সেন্সরের কিছু প্রয়োজনীয়তা থাকতে পারে, কিন্তু দেশ ও দেশবাসীর প্রতি চিত্র-প্রদর্শক যদি তাঁর কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন থাকতেন তবে সে অনুমোদন-ব্যবস্থার প্রয়োজন হবে কেন? চিত্র-প্রদর্শকের পক্ষে অল্প সময়ে অধিক লাভের প্রবৃত্তি দেখা দিলেই 'অনুমোদনে'র প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। প্রত্যেক দেশেই আজ এক ধরণের স্বপ্রাদেশিক স্বাবলম্বনের প্রবৃত্তি দেখা দিয়েছে। আমি এ মনোভাবের নিন্দা করি আর একে অবাঞ্ছনীয় বলে মনে করি। তার ফলে এমন এক অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দেবে যার রাজনৈতিক এবং সামাজিক পরিণতির কথা ভাবতেও আমার হৃৎকম্প হয়। আমি আশা করি এই সম্মেলনে আহুত সকলেই প্রদেশগত পার্থক্যের বিশ্লেষণ না ক'রে সে বিষয়ে ঐক্যের দিকগুলি অনুসন্ধান করবেন এবং সমগ্র জাতিকে সংহত ও শক্তিশালী ক'রে তুলতে সহায়তা করবেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, চলচ্চিত্র প্রদর্শকগণ দেশের ভবিষ্যৎ গড়তে অথবা নষ্ট করতে পারেন।'

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রী হরিধন বন্দ্যোপাধ্যায় অভ্যাগতদের সাদর সম্ভাষণ জানানোর পর বলেন, 'বিশেষ

চলচ্চিত্র প্রদর্শক সম্মেলনের উদ্বোধন প্রসঙ্গে মাননীয় ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় বক্তৃতা দিচ্ছেন। ফটো : শম্ভুদাস চট্টোপাধ্যায়

দুঃখের সঙ্গে এ কথা স্বীকার করতে হয় যে চিত্র-প্রদর্শক হিসেবে আমাদের সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আমরা প্রদর্শকরা বিশৃঙ্খল ও বিচ্ছিন্ন একটা আত্ম-সর্বস্ব গোষ্ঠী। যে যার খুশিমত পথ ধরে চলেছি, চলচ্চিত্রশিল্পের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিছুমাত্র না ভেবে। এটা স্বীকার না ক'রে উপায় নেই, আমাদের এই অবাঞ্ছিত অবস্থাটি আমাদের এ্যাসোসিয়েশানের কার্য্য কলাপের মধ্যেও কখনও কখনও প্রকাশ পেয়ে থাকে। আমি বিশ্বাস করি এই শিল্পটির প্রতি আমাদের একটা কর্ত্তব্য আছে আর আমাদের উচিত উদার মন নিয়ে প্রযোজকদের সঙ্গে সহযোগিতা করা যাতে চিত্রামোদী জনসাধারণের সঙ্গে একটা ঘনিষ্ঠ আন্তরিকতা বজায় থাকে। কোন কোন প্রদর্শক বিক্রীর টাকা বা ঠিক কতগুলি প্রদর্শনী হয় তার হিসেব দেখানো বা টাকাটা দেওয়ার ব্যাপারে ন্যায্য কাজ করেন না। ঐ মুষ্টিমেয় কয়েকজন কাণ্ডজ্ঞানহীন প্রদর্শকের জন্যে প্রদর্শকের সুনাম ক্ষুণ্ণ হয় এবং এই ব্যবসায়ের অন্যান্য শাখা বদনাম করে। যদি আমাদেরই কারো কারো এই দোষ থেকে থাকে তবে এই রকম দুর্নীতির প্রতিকারের পথ আমাদের খুঁজে বের করতে হবে। আমি অস্বীকার করি না যে অনেক সময় এমন অবস্থার উদ্ভব হয় যখন অনেক মফঃস্বলের প্রদর্শককে পরিবেষক আর ডিষ্ট্রিবিউটারের সামনে অনেক বিষয় গোপন রাখতে হয়। আমি বিশেষ জোর দিয়েই তাঁদের অনুরোধ করবো, তাঁরা যেন লিখে তাঁদের অসুবিধার কথাগুলি অকপটে পরিবেষকদের জানান আর প্রয়োজন হ'লে প্রদর্শকদের ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটিকেও জানান। আমাদের সমস্যাগুলি দূর করার জন্যে নিজেদেরই নজর দিতে হবে। সরকার অথবা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিয়োজিত আইন-কানুন আমাদের স্বভাবতঃই মেনে চলতে হয়। অথচ এটা খুবই দুঃখের বিষয় যে আমাদের এ্যাসোসিয়েশান যখন কোন দোষ-ত্রুটির জন্যে কোন বাধা-নিষেধ আরোপ করেন অর্থাৎ অসৎ উপায় অবলম্বনের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্যে এবং নিজেদের ভালোর জন্যেই যখন কোন নিয়ন্ত্রণ করা হয় তখন আমরা ব্যক্তিগত স্বার্থের কথা ভেবে সে নিষেধটি আর মানতে চাই না।'

সম্মেলনের সভাপতি কুমার কৃষ্ণবল্লভ প্রসাদ নারায়ণ সিংহ তাঁর অভিভাষণে বলেন, 'আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বেশ বিনা দ্বিধায় বলতে পারি যে 'এম্, জি' প্রথাটি হলো চিত্র পরিবেশনার ব্যবস্থাতে একটি ক্যান্সার রোগের মত মারাত্মক বস্তু। প্রদর্শক হিসেবে আমরা যে অবিরাম ভালো ছবিই পেতে চাই তা বলছি না। আমরা চাই এমন ছবি যা যথাযথভাবে নিষ্ঠার সঙ্গে সত্যিকারের দরদ দিয়ে তোলা হয়েছে তা সঙ্গীতমুখর, অপরাধমূলক, যৌন-আবেদনমূলক, বিয়োগ-বিধুর বা রোমাঞ্চকর কাহিনীসম্বলিত হোক্। প্রদেশভেদে আমোদ-করের একটা সমতা এবং নির্দ্দিষ্ট হার বজায় রাখার জন্যে আমাদের আন্দোলন করা উচিত। আমার প্রদর্শক-বন্ধুদের আমি জানাতে চাই যে তাঁরা 'হাউস প্রোটেকশান প্রথা'টি তুলে দিন কারণ আমরা যদি 'এম্, জি' প্রথাটি বরদাস্ত করতে না পারি তাহলে 'হাউস প্রোটেকশান'ই বা কি ক'রে দাবী করতে পারি? পরিষ্কার শতকরা হারে প্রাপ্য নিয়ে ছবি দেখানো উচিত আমাদের যাতে কোনো পক্ষেরই ভার বোধ না হয়।'

বি-এম-পি-এ'র প্রদর্শক শাখার সভাপতি শ্রীনিরোদ চন্দ্র নাগ তাঁর অভিভাষণ প্রসঙ্গে বলেন, 'প্রদর্শকদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যে নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থার বিশেষ প্রয়োজন। যদি কোনো বিশেষ ছবির প্রতি আমাদের সহানুভূতি থাকে তাহলে অপর ছবির প্রতিও সেই রকম ব্যবহার করা উচিত। যদি আমরা প্রযোজকের অংশের দেয় অর্থ যথা সময়ে না দিয়ে থাকি তবে এখন থেকে আমরা যেন তা সময় মত দেবার সঙ্কল্প করি। টিকিট বিক্রয় বা বিক্রয়ের টাকার ব্যাপারে যদি কোন অনুচিত পন্থার আশ্রয় আমরা নিয়ে থাকি তবে তা যেন আমরা অবিলম্বেই পরিত্যাগ করি। আমি আন্তরিকভাবে আশা করতে পারি যে এখানের বা মফঃস্বলের প্রদর্শকরা একটা ন্যায্য অঙ্কেই 'হোল্ড ওভার' টাকার পরিমাণ এবং 'প্রোটেক্শানে'র টাকাটা স্থির করবেন। একটা বিচক্ষণ

পরিষদ গঠন করা হোক, তাঁরা 'হোল্ড-ওভার' এবং 'প্রোটেক্শান' টাকার পরিমাণের বিষয় মীমাংসা করবেন। এই পরিমাণের ব্যাপারগুলি স্বিকৃত হ'লে আমরা স্বচ্ছন্দেই প্রযোজক আর পরিবেশকদের সঙ্গে চুক্তি-পত্র তৈরী করতে পারি, তাঁরাও আমাদের কাছ থেকে প্রাপ্য অংশ সম্বন্ধে একটা ধারণা করতে পারবেন।

সেইসঙ্গেই আমি প্রযোজক ও পরিবেশকদের কাছে আবেদন জানাই যে মফঃস্বল প্রদর্শকদের প্রতি ন্যায্য ব্যবহারের জন্য তাঁরা যেন মিনিমাম গ্যারান্টি, তাঁদের প্রতিনিধি পাঠানোর বাবদ খরচ, বাজে ছবি চালাবার বাধ্যতামূলক চুক্তি, ছবির বাজে প্রিন্ট বা হঠাৎ শেষ সময়ে গিয়ে কোনো কারণ না দেখিয়ে বুকিং বাতিল করা ইত্যাদি চাপ না দেন। দুঃখের সঙ্গেই আমাকে এটা স্বীকার করতে হচ্ছে যে আমাদের প্রদর্শক বন্ধুরা এ্যাসোসিয়েশানের ব্যাপারে খুব কম বা আদৌ আগ্রহ দেখান না আর সেটা বোঝা যায় সাধারণ বা জরুরী অধিবেশনসমূহে প্রদর্শক সদস্যদের নগণ্য সংখ্যক উপস্থিতি দেখে।'

সম্মেলনের সাফল্য কামনা ক'রে শুভেচ্ছাবাণী পাঠান বোম্বাইয়ের-আই, এম্, পি, পি এ-র সভাপতি শ্রীযুত বারুচা এবং এম্ পি-এস-এ ও আই-এম্-পি-পি-এ'র সভাপতি রায় বাহাদুর চুনীলাল।

শ্রীযুত এ, মুখোপাধ্যায় (প্রাইমা ফিল্মস্), শ্রীযুত এস্, পি, জয়সোয়াল (হিন্দ সিনেমা), শ্রীযুত স্থগেন্দু সেনগুপ্ত, (ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া থিয়েটার্স), শ্রীযুত এস্, এম্, বাগড়ে (সোসাইটী সিনেমা) সভায় বক্তৃতা দেন।

৩০শে জুলাই সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে মোট আঠারোটি প্রস্তাব গৃহীত হয়, তার মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য হলো :—

(১) সরকারী কর্ম্মচারীরা যে প্রদর্শকের স্বার্থের পরিপন্থী কাজ ক'রে অসহযোগিতার পরিচয় দেন তা থেকে তাঁদের বিরত করা এবং চিত্রগৃহে প্রবেশ মূল্য এমন কি আমোদ-কর পর্য্যন্ত না দিয়ে যে তাঁরা আসন দখল ক'রে বসে থাকেন তা যাতে তাঁরা আর না করেন তার জন্য সরকারের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের অনিচ্ছার বিরুদ্ধে এই সভা প্রতিবাদ জানাচ্ছে।

(২) বাংলা, আসাম, বিহার, ও উড়িষ্যার চিত্র-প্রদর্শকদের এই সম্মেলনে এই অভিমত প্রকাশ করা হচ্ছে যে 'হোল্ড-ওভারে'র ওপর 'স্লাইডিং স্কেল' প্রথা চালু করার প্রশ্ন একটি সাব-কমিটি কর্তৃক বিবেচিত হওয়া উচিত। এই সাব-কমিটি চলচ্চিত্র তদন্ত কমিটির সুপারিশ পর্য্যালোচনা করে দেখবেন। স্লাইডিং প্রথা সাধারণভাবে প্রয়োগ করার পক্ষে এই সম্মেলন সম্মতি দিতে পারেন।

(৩) কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সেন্সর বোর্ডে চিত্র-প্রদর্শকদের তরফ থেকে প্রতিনিধি নেওয়ার জন্যে এই সম্মেলন দাবী জানাচ্ছে। বি-এম্-পি-এ কর্তৃক নির্দ্ধারিত মতানুযায়ী ভারতের এই অংশের রাজ্য সমূহে চিত্র-প্রদর্শকদের তরফ থেকে চলচ্চিত্র উপদেষ্টা বোর্ডেও প্রতিনিধি নেওয়ার দাবী জানানো হচ্ছে।

সংবাদ-আলোকচিত্র প্রদর্শনী

গত ১৭ই জুলাই ক'লকাতার চৌরঙ্গী রোডের ওয়াই-এম্-সি-এ হলে নিখিল ভারত সংবাদ আলোকচিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন পশ্চিম বঙ্গের রাজ্যপাল ডাঃ কৈলাসনাথ কাটজু। ভারতীয় সংবাদ-আলোকচিত্রের ইতিহাসে এর বিশেষ তাৎপর্য আছে। 'আজ বাংলা যা চিন্তা করে, আগামীকাল ভারত সেই চিন্তা করে'—ব'লে তিলক মহারাজ একদিন যে অভ্রান্ত বাণী প্রচার করেছিলেন,—এই প্রদর্শনীর উদ্যোক্তারা সেই সত্যকে আজও সপ্রমাণ করলেন এই ধরণের সংবাদ-আলোচিত্রের প্রদর্শনীর সূত্রপাত করে। ভবিষ্যতে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে প্রতি বছর এই জাতীয় প্রদর্শনী আরও সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হোক আমরা সেই কামনাই করি।

সংবাদ-আলোকচিত্র নিছক ফটোগ্রাফ নয়। প্রত্যেক সংবাদ যে মূল্য বহন করে, প্রতিটী সংবাদ-আলোকচিত্র তার চেয়ে কম্ মূল্য বহন করে না। বরং অনেকক্ষেত্রে তার মূল্য হয় অনেক বেশি। যুদ্ধক্ষেত্রের তথ্যমূলক-সংবাদ আর তার আলোকচিত্রের মধ্যে পার্থক্য আছে বৈকি! কাজেই, এই জাতীয় আলোকচিত্র গ্রহণ সহজ বস্তু নয়। এর জন্য চাই প্রকৃত অনুশীলন, আর সর্কোপরি সাংবাদিক দৃষ্টিভঙ্গী। শুধু ছবি তুললেই হবে না সংবাদের দিক থেকে এবং শিল্পকলার দিক থেকে তার মূল্য থাকা চাই। তবেই সে ছবি হবে সার্থক সংবাদ-আলোকচিত্র।

এই প্রদর্শনীর উদ্যোক্তা হলেন—কলকাতার প্রেস-ফটোগ্রাফার্স এসোসিয়েশন অব ইণ্ডিয়া। ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে তাঁরা মোট ৪৫৮ ছবিখানি সংগ্রহ করেন। তার মধ্যে ৩২৯ খানি ছবি প্রদর্শনযোগ্য ব'লে বিবেচিত হয়। এর মধ্যে পুরস্কার পায় ১৪ খানি ছবি। তার ৯খানি নির্বাচিত হয় সংবাদ-আলোকচিত্র বিভাগ থেকে আর ৫ খানি নির্বাচিত হয় প্রাবন্ধিক-আলোকচিত্র বিভাগ থেকে। এই শ্রেণী বিভাগে যে নীতি অবলম্বিত হয় তা হলো এই—যে ছবিগুলি একক ভাবে একটি সম্পূর্ণ ঘটনা বা কাহিনীকে রূপ দেয়, তা পড়ে সংবাদ-আলোকচিত্র-শ্রেণীতে আর কয়েকখানি ছবি যুক্তভাবে কোনো একটি

ডাঃ কাটজু প্রদর্শনীর উদ্বোধন বক্তৃতা দিচ্ছেন ফটো : কানন মুখোপাধ্যায়

সম্পূর্ণ ঘটনা বা কাহিনীর রূপ দিলে তাকে ফেলা হয় প্রাবন্ধিক-আলোকচিত্র শ্রেণীতে।

বিষয়-বৈচিত্র্যের দিক থেকে এই প্রদর্শনীতে বহু উল্লেখযোগ্য ছবি স্থান পেয়েছে। কলানৈপুণ্যের দিক থেকেও এমন বহু ছবি আছে—যা আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে শ্রেষ্ঠ ছবিগুলির মধ্যে অনায়াসেই স্থান পেতে পারে।

এবারকার প্রদর্শনীতে প্রথম পুরস্কার পেয়েছেন বোম্বের 'ইলাস্ট্রেটেড উইকলী'র আলোকচিত্রশিল্পী এফ ই পামার। তাঁর 'এ নন্‌পলিটিক্যাল ক্যানন' ছবিখানিতে মহম্মদ আলী জিন্নার বিলিয়ার্ড খেলা রূপায়িত হয়েছে। ছবিখানি সংবাদচিত্র হিসাবে বিশেষ মূল্যবান। জিন্না সাহেবের মতো রাজনীতিকও যে বিলিয়ার্ড খেলায় নিবিষ্ট চিত্তে মন দিতে পারেন—এই ছবি না দেখলে তা বোঝা যায় না। তাঁর দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা ও একাগ্রতা অতি সুন্দরভাবে ছবিখানিতে ফুটে উঠেছে।

সংবাদ-আলোকচিত্র বিভাগে রৌপ্যফলক পুরস্কার পেয়েছেন আনন্দবাজারের শম্ভুদাস চট্টোপাধ্যায় ও বীরেন সিংহ, অমৃতবাজারের তারক দাস, নিউদিল্লীর ষ্টেটস্‌ম্যানের ডি, অর্জুন ও এ্যাসোসিয়েটেড প্রেস ফটোগ্রাফের কে, রায় আর কলকাতার কাঞ্চন মুখোপাধ্যায়। ব্রোঞ্জ-ফলক পুরস্কার পেয়েছেন ক'লকাতার স্টেটস্‌ম্যানের এস্, রায় আর ব্রজকিশোর সিংহ।

প্রাবন্ধিক-আলোকচিত্র বিভাগে রৌপ্যফলক পুরস্কার পেয়েছেন কলকাতার সুনীল জানা, তারক দাস আর এ, কে ব্যানার্জি, ব্রোঞ্জফলক পুরস্কার পেয়েছেন ক'লকাতার শম্ভুদাস চট্টোপাধ্যায় আর জে, আর সেন।

সংবাদ-আলোকচিত্র বিভাগে কাঞ্চন মুখোপাধ্যায়ের 'বোম্ব বার্স্টস্ এ্যাট্ ময়দান মিটিং' চিত্রটি ঘটনার দিক থেকে বিশেষ উল্লেখযোগ্য পণ্ডিত নেহেরুর সভায় বোমা বিদারণের কাহিনী সংবাদের দিক থেকে যেমন চাঞ্চল্যকর আলোকচিত্র হিসাবেও তেমনি বিস্ময়জনক। ব্রজ সিংহের 'হরিফায়েড্' চিত্রে মহাত্মাজীর বিহার পরিক্রমার একটি দৃশ্য ফুটে উঠেছে। বেদনাক্লিষ্ট মুখচ্ছবি ও ভগ্ন গৃহের

ডাঃ কাটজু আলোকচিত্রশিল্পীদের পুরস্কার বিতরণ করছেন। ছবিতে শ্রীযুত কাঞ্চন মুখোপাধ্যায়কে পুরস্কার গ্রহণ করতে দেখা যাচ্ছে

ফটো : কানন মুখোপাধ্যায়

পরিবেশ রচনায় শিল্পীর কৃতিত্ব আছে। ছবিখানির ঐতিহাসিক মূল্যও স্বীকৃত। শম্ভুদাস চট্টোপাধ্যায়ের 'ভিক্‌টিম্‌স্‌ অব এ সাইক্লোন' সংবাদ-আলোকচিত্র হিসাবে বিশেষ প্রশংসনীয়। বাত্যাবিক্ষুব্ধ মেদিনীপুরের নিহত ব্যক্তিদ্বয়ের এই আলোকচিত্র তৎকালীন ইতিহাসের একটি অধ্যায় চোখের সামনে তুলে ধরে। ঐতিহাসিক আলোকচিত্র হিসাবে বীরেন সিংহের 'আই স হিম লাষ্ট' বিশেষ মূল্যবান। কলকাতা থেকে অন্তর্হিত হবার পূর্বে তোলা এইটিই বোধ হয় নেতাজীর শেষ ছবি।

প্রাবন্ধিক আলোকচিত্র বিভাগে সুনীল জানা ও তারক দাসের তোলা দুর্ভিক্ষের ছবিগুলি সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সুনীল জানার ছবিগুলি চটকদার হলেও তাতে কৃত্রিমতার জন্য অর্থাৎ সাজিয়ে তোলার চেষ্টাই লক্ষ্য করা যায়। অথচ, তারক দাসের ছবিগুলি আঙ্গিকের দিক থেকে কম জৌলুসের হলেও তাতে কৃত্রিমতার নামগন্ধ নেই। শম্ভুদাস চট্টোপাধ্যায়ের 'গঙ্গাসাগর মেলা' শীর্ষক চিত্রাবলী সংবাদ আলোকচিত্র হিসাবে প্রথম শ্রেণীর পর্যায়ে পড়ে। গঙ্গাসাগর মেলার সূর্যাস্তের দৃশ্যটিতে শিল্পকলার অপূর্ব অভিব্যক্তি সহজেই চোখে পড়ে। আলোকচিত্রশিল্পীর শিল্পসংবোধের নিখুঁত পরিচয় বহন করছে এই চিত্রটি।

পুরস্কার না পেলেও সংবাদ আলোকচিত্র হিসাবে—বেঙ্গল ফটোটাইপ কোং-এর 'দি লীডার ক্যাচেস বং ড্রয়ার' শম্ভুদাস চট্টোপাধ্যায়ের 'আই-এন্‌-এ ট্রায়াল এ্যাণ্ড রেড ফোর্ট' 'দি গ্রেট নিমতলা ফায়ার'; ডি, রতন, কোং-এর 'দি গ্রেট ডিজ্যাসটার'; তারক দাসের 'টেগোর এ্যাণ্ড নেহেরু'; বাবুরাম গুপ্তের 'কুম্ভমেলা এ্যাণ্ড হাউওয়ার'; কাঞ্চন মুখোপাধ্যায়ের 'টেগোর অন্‌ ওয়ে টু প্রোটেষ্ট মিটিং' পাঞ্জাব ফটো সার্ভিসের 'পণ্ডিত নেহেরু সুইঙ্গ'; বীরেন সিংহের 'ত্রিপুরী কংগ্রেস' 'এশিয়ান রিলেশন কন্‌ফারেন্স', 'আফ্রাহাম এ্যাপীল' বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

প্রতিযোগিতা হিসাবে যোগদান না করলেও ভারত সরকার, উত্তর-প্রদেশ সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের বহু সংবাদ আলোকচিত্র এই প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে। বিষয়বৈচিত্র্য ও কলানৈপুণ্যের দিক থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের চিত্রাবলী প্রথম শ্রেণীর সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার বিভাগ কৃতিত্বের দাবী করতে পারেন।

নিখিল ভারত সংবাদ-আলোকচিত্র প্রদর্শনী এই প্রথম অনুষ্ঠানে ত্রুটি বিচ্যুতি যতই কেননা থাকুক উদ্যোক্তাদের প্রচেষ্টা যে সফল হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। ভবিষ্যতের প্রদর্শনার ক্ষেত্র বৃহত্তর হবে এবং আলোকচিত্রগুলি দৃষ্টিপথের অনুকূলে যথাযথভাবে সজ্জিত হবে ব'লে আমরা ভরসা রাখতে পারি। আর, রঙ্গমঞ্চ ও চলচ্চিত্র সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য সংবাদ-আলোকচিত্রাবলীও তাতে সংগৃহীত হবে ব'লে আশা করি।

আই স হিম লাষ্ট

ফটো : বীরেন সিংহ

৩৫৭

সাগর

টো :

দাস

পাধ্যায়

নতুন ছবি
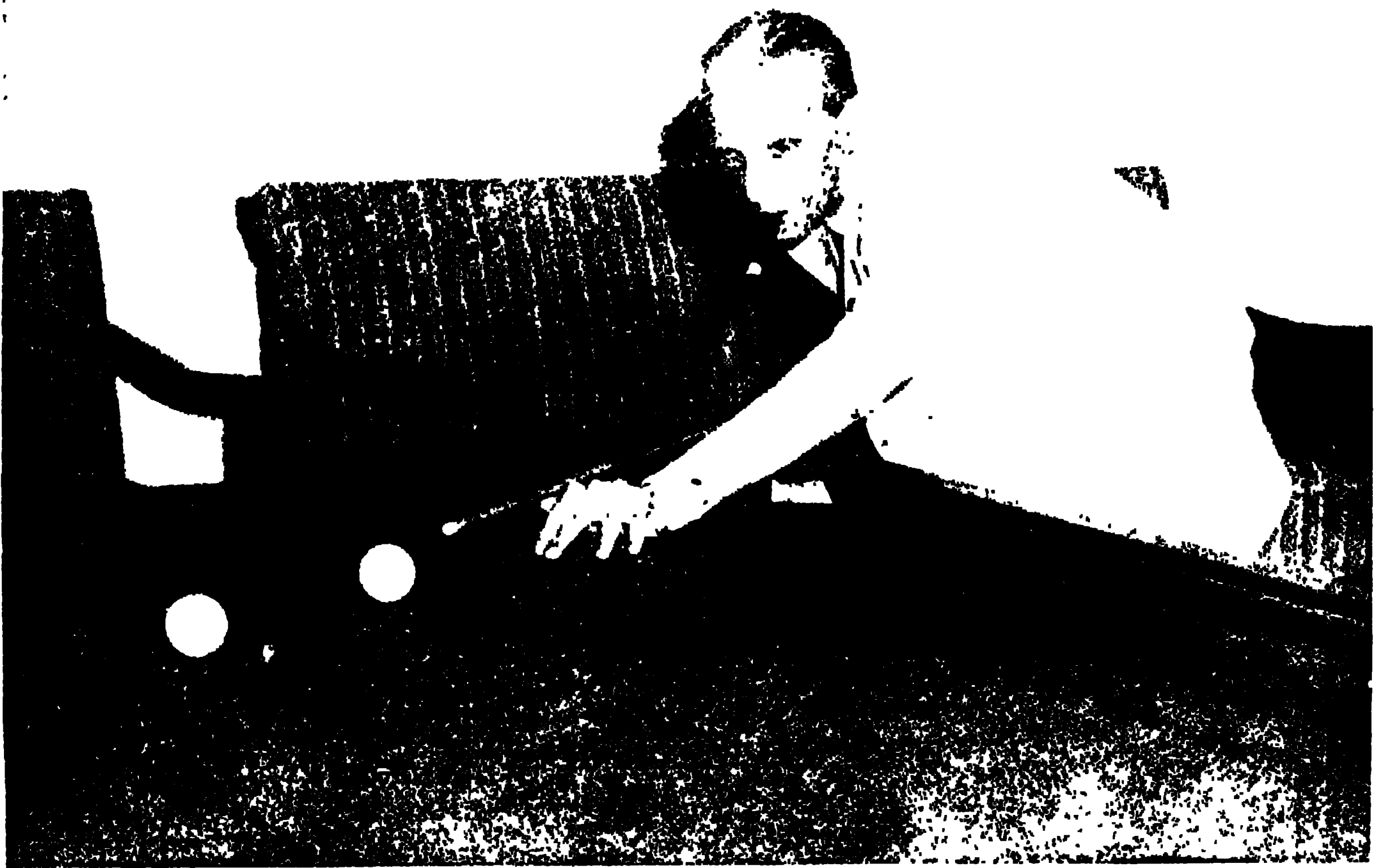
মাইকেল মধুসূদন

বাংলা ছায়াছবির ইতিহাসে আই. এন. এ পিকচার্সের 'মাইকেল মধুসূদন' একটি স্মরণীয় ব্যতিক্রম। কিছুদিন যাবৎ বাংলা চলচ্চিত্র সব দিক থেকে যেভাবে অপকর্ষের দিকে ছুটে চলেছিল—তাতে শিল্পানুরাগী ব্যক্তিমাত্রই শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন। 'মাইকেল মধুসূদন' তাঁদের সেই শঙ্কা দূর ক'রে আশার আলো দেখিয়েছে। এজন্য এই ছবির প্রযোজক মণি গুপ্তকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। মহাকবি মধুসূদনের জীবনীকে চিত্রে-রূপায়িত ক'রে তিনি এই সত্যকে সপ্রমাণ করলেন যে, নিষ্ঠার সঙ্গে কোনো কাজে হাত দিলে—তা সার্থক হয়, আর জনসাধারণও সেই সার্থক সৃষ্টিকে অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করে।

ইতিপূর্বে স্বামী বিবেকানন্দের জীবনীকে কেন্দ্র করে বাংলায় ছবি উঠেছে। কাজেই, 'মাইকেল মধুসূদন' জীবনী-চিত্র হিসেবে প্রথম নয়। কিন্তু উৎকর্ষের দিক থেকে তা পূর্ববর্তী ছবিকে ছাড়িয়ে গেছে। 'মাইকেল মধুসূদনে'র জনপ্রিয়তার কারণ হলো প্রধানত: তিনটি—প্রথমত: মধুসূদনের নাটকীয় জীবন-কাহিনী, দ্বিতীয়ত: শিল্পনির্দেশ ও যান্ত্রিক কলানৈপুণ্য, তৃতীয়ত: সু-অভিনয়। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা-সাহিত্যে মাইকেল মধুসূদন কাব্য ও নাটকের দিক থেকে যে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেন—তার তুলনা কোথায়? প্রতিকূলতার সঙ্গে অহরহ সংগ্রাম করে এই উদ্যমশীল মনীষী একের পর একখানি বিস্ময়কর গ্রন্থ উপহার দিয়ে সকলকে চমৎকৃত করেন। স্বদেশের মহাকাব্যের প্রেরণায় তাঁর লেখনীতে অমৃতধারার সৃষ্টি হয়েছে। তাঁর 'মেঘনাদবধ কাব্য,' 'বীরাঙ্গনা' ও 'ব্রজাঙ্গনা'—সর্বকালের, সর্বদেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। বাংলা নাটক, অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত কাব্য, চতুর্দশপদী কবিতা ইত্যাদিতে তাঁর অলোকসামান্য প্রতিভার দান সর্বজনস্বীকৃত। এত বড় যে কবি—তাঁর জীবন কিন্তু সুখের হয়নি কোনো দিন। আশৈশব ঐশ্বর্য সুখে ও বিলাসিতায় মানুষ হয়ে নিজের কর্মজীবনে দারিদ্রের পীড়ন তিনি সহ্য করতে পারেননি, এক মুহূর্ত। ফলে ঋণগ্রস্ত হয়েছেন—অর্থের অভাবে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন দাতব্য হাসপাতালে। কবির অন্তিমজীবনের সেই কাহিনী মর্মান্তিক ভাবে করুণ।

মাইকেলের মহাজীবনকে কেন্দ্র করে বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম নাটক রচনা করেন বনফুল। তাঁর সেই 'শ্রীমধুসূদন'ই বোধ হয় মধুসূদনের সর্বাপেক্ষা সার্থক জীবন-নাট্য। পরিচালক মধু বসুর চিত্রনাট্যে বনফুলের 'শ্রীমধুসূদনে'র বলিষ্ঠতা ও আঙ্গিক নৈপুণ্য না থাকলেও—তা প্রশংসার যোগ্য। মধুসূদনের খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত যাবতীয় ঘটনাগুলিকে তিনি যেভাবে সাজিয়েছেন—তার মধ্যে ত্রুটি আছে সত্য কিন্তু আন্তরিকতার অভাব নেই। তাঁর পরিচালনায় যে নিষ্ঠার পরিচয় আমরা পেয়েছি—তার জন্য তাকে ধন্যবাদ জানাই। মধুসূদনের জীবনের দুর্বার গতি ও নাট্যরস তিনি ছবির মধ্যে জমিয়ে তুলতে পারেন নি, সেটা অবশ্য তাঁর অক্ষমতার পরিচয় দেয়, ফাঁকির প্রকাশ নয়।

চিত্রনাট্যরচনায় যে দু'এক জায়গায় ঐতিহাসিক সত্য উপেক্ষিত হয়েছে—তার আলোচনা দরকার। মধুসূদনের জীবনীতে আছে যে, মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁর বন্ধু ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষকে সেক্সপীয়ারের 'ম্যাকবেথ' থেকে কয়েকটি লাইন আবৃত্তি করে শোনান। সেই লাইন কয়টি হ'লো—

'To-morrow, and to morrow, and to-morrow, creeps in this petty pace from day to day.

লেডী ম্যাকবেথের মৃত্যু সংবাদে ম্যাকবেথ যা বলেছিলেন, অন্তিমশয্যায় শুয়ে পত্নী হেনরিয়েটার মৃত্যু সংবাদ শুনে সেই কথাগুলি বন্ধুর কাছে আবৃত্তি করেছিলেন মাইকেল মধুসূদন। এই আবৃত্তির মধ্যে যে grandeur ও tragedy ফুটে উঠেছে তার চেয়ে নাটকীয় বস্তু আর

কি হতে পারে! পরিচালক কিন্তু এই নাটকীয়তা সৃষ্টি করেননি; উপরন্তু এই কবিতাংশটি তিনি মাইকেলের প্রথমা পত্নী রেবেকার রুগ্ণা কণ্যার শিয়রে উপবিষ্ট মধুসূদনের মুখ দিয়ে বলিয়েছিলেন। এতে ঐতিহাসিক সত্য যেমন ক্ষুন্ন হয়েছে, তেমনি ঘটেছে রসাভাব দোষ।

দ্বিতীয়তঃ শেষজীবনে মাইকেল যখন অত্যন্ত অর্থকষ্টে দিন কাটাচ্ছিলেন, তখন একদিন তাঁর বাল্যসহচর গৌরদাস বসাক এসে তাঁকে বল্লেন যে, তিনি তাঁর এক বন্ধুকে মাইকেলের কাছে নিয়ে আসবেন consultation-এর জন্যে। তাতে মধুসূদনের কিছু আয় হবে। কিন্তু মধুসূদন সে-প্রস্তাবে মৃদু হেসে বলেছিলেন—'তোমার বন্ধুর কাছ থেকে consultation fee! মাইকেল মধুসূদন অর্থকষ্টে ভুগছে সত্য, কিন্তু হৃদয়বৃত্তি ভোলেনি সে। যাক্ যদি তোমার নিজের টাকা সঙ্গে থাকে তো তা থেকে পাঁচটি টাকা হেনরিয়েটাকে দিয়ে যেও। আজ আমার বাজার খরচ পর্য্যন্ত নেই!' ছবিতে এই রকমটাই দেখান হয়েছে। কিন্তু যোগীন্দ্র নাথ বসু রচিত মাইকেলের জীবন-চরিতে আছে—"একবার মধুসূদনের এক বাল্যসুহৃদ (পদ্মিনী উপাখ্যান প্রণেতা স্বর্গীয় রঙ্গলালবাবুর কনিষ্ঠ বাবু হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়) তাঁহার কোনো পরিচিত ভদ্রলোককে, সঙ্গে লইয়া মধুসূদনের নিকট একটি মোকদ্দমা সম্বন্ধে পরামর্শ জানিবার জন্য গিয়াছিলেন। মধুসূদন পরামর্শ দান কবিলে ভদ্রলোকটি তাঁহাকে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট পারিশ্রমিক দিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু মধুসূদন কিছুতেই পারিশ্রমিক গ্রহণ করিলেন না। ভদ্রলোকটি বিদায় লইলে মধুসূদন তাঁহার বাল্যসুহৃদকে বলিলেন—ভাই! তুমি যখন উঁহাকে আত্মীয় বোধে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছ, তখন আমি কিছুতেই উঁহার নিকট হইতে পারিশ্রমিক লইতে পারি না, কিন্তু আমার গৃহে আজ একটি কপর্দকও নাই। যদি তোমার নিজেব টাকা সঙ্গে থাকে তবে পাঁচটি টাকা ঋণ দিয়া আমাব স্ত্রীকে বলিয়া আইস যেন উপযুক্ত সময়ে আমার আহার্য্য প্রস্তুত হয়।"—চিত্রনাট্যকার এই ঐতিহাসিক

সত্য থেকে বিচ্যুত হয়েছেন। আর একটি কথাও উল্লেখযোগ্য। বিধর্মী মধুসূদন যখন প্রথম বাংলায় মহাকাব্য লিখতে সুরু করেন তখন এদেশের বিদ্বৎসমাজে বিশেষ ক'রে পণ্ডিতমহলে বিশেষ চাঞ্চল্যের সঞ্চার হয় এবং প্রতিবাদের ঢেউ ওঠে। ছবিতে সেটা দেখালে পরবর্তীকালে মাইকেলের প্রতিভার স্বীকৃতির মধ্যে নাটকীয়তা সঞ্চার বিশেষ হৃদয়গ্রাহী হোতো।

এই ছবিতে সব ছেয়ে দৃষ্টিকটু ও শ্রুতিকটু যা হয়েছে তা হ'লো—হেনরিয়েটাকে সঙ্গে নিয়ে মাইকেল মধুসূদনের সিনেমার নায়ক নায়িকার ঢঙে ডুয়েট গান গাওয়া। মধুসূদন গান জানতেন একথা সত্য কিন্তু আধুনিক কবি প্রণব রায় রচিত প্রেমসঙ্গীত মাইকেলের কণ্ঠে শুনতে আমরা রাজী নই, ডুয়েট গান ত নয়ই।

মধুসূদন শৈশবে আগমনী-বিজয়ার গান শুনে মুগ্ধ হ'তেন। তরুণ বয়সে ফারসী গজলের সঙ্গেও তাঁর পরিচয় ঘটেছিল তাই বলে হেনরিয়েটাকে সঙ্গে নিয়ে তিনি ওভাবে গান গান নি, কোনও কালে। মধুসূদনের কণ্ঠে এই গানখানি ছবির গাম্ভীর্য ও সৌন্দর্যকে বিশেষ ভাবে ক্ষুণ্ণ করেছে। 'ব্রজাঙ্গনা'র পদ আবৃত্তি করতে করতে সম্মুখে স্বামীসঙ্গসুখ-বঞ্চিতা হেনরিয়েটার আবির্ভাব মাইকেলকে যে ভাবে অভিভূত করেছিল—ছবিতে তার রূপটি সার্থকভাবেই রূপায়িত হয়েছিল। এজন্য পরিচালকের দৃষ্টিভঙ্গীর সূক্ষ্মতা প্রশংসনীয়। কিন্তু পরক্ষণেই আবার গান, সব মাধুর্যকে নষ্ট করে দিয়েছে। মধুসূদনের জীবনের সবচেয়ে মর্মস্পর্শী অধ্যায় হ'লো—তাঁর অন্তিমজীবন। কিন্তু এই ছবিতে তাও যথাযথ রূপ পায়নি। মৃত্যুদৃশ্য মনে বিন্দুমাত্র রেখাপাত করে না। সাধারণ ছবির মৃত্যুদৃশ্যের মতন ঝড় ও অন্যান্য কলাকৌশল অবলম্বন যেমন হাস্যাস্পদ তেমনি ছবির মর্যাদাহানিকর।

জাহ্নবী দেবীর চরিত্র, মাইকেলের প্রতি বিদ্যাসাগরের উদারতা, মাদ্রাজে রেবেকার সঙ্গে সংসারযাত্রা, শর্মিষ্ঠার বিবাহে কবির উচ্ছ্বাস, কবি-জীবনের সাফল্যে আনন্দ—সব কিছুই নিষ্ঠার সঙ্গে রূপ পেয়েছে। বিশেষ ক'রে মাদ্রাজের সাগর-তটে রেবেকার সঙ্গে মাইকেলের প্রেমালাপ; আর, ইউরোপ থেকে ফিরে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় মাইকেলের স্বতস্ফূর্ত আনন্দের দৃশ্য দুটি মনে রেখাপাত করে। অসুস্থ অবস্থায় মধুসূদনের কবিতা আবৃত্তিও মর্মস্পর্শী হয়েছে।

মাইকেলের চরিত্রটিকে রূপ দিয়েছেন নবাগত উৎপল দত্ত। নবাগত হ'লেও তিনি যে শক্তিশালী অভিনেতা সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। মধুসূদনের কবিতা আবৃত্তি এবং ইংরাজী সংলাপের উচ্চারণে তিনি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন কিন্তু বলতে বাধা নেই তাঁর অভিনয়ে মধুসূদনের ব্যক্তিত্ব সর্বত্র ফুটে উঠেনি। অথচ, রূপসজ্জায় না মানালেও শিশিরকুমার, এই ব্যক্তিত্ব প্রকাশেই দর্শকজনের মনহরণ করেছেন।

মাইকেলের জীবনীতে আছে, একসঙ্গে তিনখানি কাব্যগ্রন্থ রচনা করবার সময় মধুসূদন পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের মতো অস্থিরতায় সারা ঘরে ঘুরে বেড়াতেন ও কবিতার পঙ্‌ক্তি বলে যেতেন। এই অস্থিরতার সম্যক্‌রূপ প্রকাশ পায়নি উৎপল দত্তের অভিনয়ে। তাঁর রূপসজ্জাতেও বহু ত্রুটি আছে। অবশ্য তাঁর চোখ দুটির সঙ্গে মধুসূদনের চোখের সাদৃশ্য আছে বলে অনেকেই স্বীকার করেছেন। জাহ্নবী দেবীর ভূমিকাটি মলিনাদেবীর অভিনয়ে প্রাণবন্ত ও মর্মস্পর্শী হ'য়ে উঠেছে। অহীন্দ্র চৌধুরীর রাজনারায়ণ দত্ত বৈশিষ্ট্যহীন। তাঁর অভিনয় দেখে মনে হয়েছে—তিনি যেন তাঁর পূর্বাভিনীত যে কোন একটি পিতার চরিত্রেরই পুনরাবৃত্তি করছেন। কিন্তু মধুসূদনের পিতা অন্য পিতার চেয়ে স্বতন্ত্র বৈকি! গৌরদাস বসাকের ভূমিকায় বানীব্রত মুখোপাধ্যায়ের প্রশংসা করতে পারছিনা। অত্যন্ত এক ঘেয়ে অভিনয় তাঁর। সবচেয়ে ত্রুটিপূর্ণ তার রূপসজ্জা। রেবেকার ভূমিকায় মিরিয়ম ষ্টার্ক সু-অভিনয় করেছেন। তাঁর তুলনায় হেনরিয়েটা নিষ্প্রভ এবং প্রাণহীন। রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন ও বিদ্যাসাগরের অভিনয় ও রূপসজ্জা মন্দ নয়। রাধারাণীর কীর্ত্তন শ্রুতিমধুর এবং পরিবেশ-অনুযায়ী হয়েছে।

এই ছবির চিত্র এবং শব্দগ্রহণ প্রথম শ্রেণীর। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এই ছবির শিল্প নির্দেশনা। শিল্পী চারু রায়ের বাস্তব ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রশংসা করি। প্রচার পুস্তিকাটি সুসম্পাদিত।—চিত্রভানু

অপবাদ

সিনেমা সমালোচকরা শত্রুদের হিংসারবস্তু এবং এই পদটিও তাদের অনেকেরই কাম্য; কিন্তু একেবারে পদার্থহীন ছবির সমালোচনা ক'রতে ব'সে এইসব সমালোচকের অবস্থা যে কতখানি করুণ হ'য়ে ওঠে, তা' যদি শত্রুরা একবার দেখতে পেত, তবে নিশ্চয়ই এইপদের জন্যে তারা লালায়িত হ'তনা। কয়েক বছর অন্তর এমন এক আধ খানা ছবি দেখা যায়, যা দেখা শাস্তির সামিল আর তার সমালোচনা লিখতে বসা? তার চেয়ে বোধ হয় ছ' মাসের জেলও অনেক বেশী কাম্য।

ঠিক এই জাতেরই ছবি হ'ল "অপবাদ"। কলিকাতা পুলিশের ডেপুটি কমিশনার, প্রাক্তন বৃটিশ সরকারের পরম গোলাম এবং তারই নিদর্শন "রায়বাহাদুর" খেতাবধারী শ্রীসত্যেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীসরোজ মুখোপাধ্যায় এই ছবিখানির প্রযোজক। প্রযোজককুলে তাঁর বয়স নিতান্তই অল্প কিন্তু এত অল্প বয়সে এমন মারাত্মক ও ব্যাপক sex Perversion তাঁর এলো কি ক'রে তা' সত্যিই আশ্চর্য্যের বিষয়। তাঁর মঙ্গলের জন্যে, বাঙ্গলার চিত্র-শিল্পের মঙ্গলের জন্যে এবং দেশের অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকদের মঙ্গলের জন্যে আমরা সরোজবাবুকে একবার ডাঃ গিরীন্দ্র শেখর বসুকে দিয়ে চিকিৎসা করাতে বলি।

সরোজবাবু তাঁর এই অল্প বয়সের মধ্যেই পর পর "অলকনন্দা," "শ্যামলের স্বপ্ন", "মনে ছিল আশা," "অভিমান," "জিপসী মেয়ে" ও "অপবাদ" ছবি প্রযোজনা করেছেন। তাঁর ছবি, বিশেষতঃ ইদানীংকালের "জিপসী মেয়ে" ও "অপবাদ" দেখে মনে হয়, তিনি হয়ত' বাঙ্গলার দর্শকদের মূর্খ মনে করেন আর না হয় তিনি নিজেই একটি অকাট মূর্খ। তাঁর ধারণা সস্তায় অশ্লীলতা, যৌন আবেদন, "A" সার্টিফিকেটের ট্রেডমার্ক এবং সবার ওপর চটকদার বিজ্ঞাপন দিয়েই হয়ত বাজার মাৎ করা যায়। কিন্তু তাঁর ধারণা যে কত ভুল তা' ইতিপূর্ব্বে প্রমাণিত হয়েছে এবং "অপবাদ"এর বেলায় এই প্রমান শোচনীয় রূপ ধারণ ক'রেছে। "অপবাদ"-এর এই চরম ব্যর্থতার পর কোন প্রদর্শক আর সরোজবাবুর কোন ছবি দেখাতে সাহসী হবেন বা দর্শকরাও আর তাঁর কোন ছবি দেখবার জন্যে বিন্দুমাত্র উৎসাহ বোধ ক'রবেন বলে মনে হয় না।

এরপরও যদি "অপবাদ"-এর বিস্তৃত সমালোচনা ক'রতে হয়, তার চেয়ে বড় শাস্তি আর কি থাকতে পারে? প্রথমেই গল্পের কথা। বাঙ্গলা ছবিতে আর যাই থাক বা না থাক, সব ছবিতে গল্পটা অন্ততঃ থাকে। কিন্তু বিকৃতবুদ্ধি সরোজ মুখোপাধ্যায় "অপবাদ" ছবিতে গল্পটুকু পর্য্যন্ত বলতে দেন নি। কতকগুলি আজে বাজে অর্থহীন দৃশ্য পর পর সাজিয়ে গিয়েছেন। মাঝে মাঝে সাড়ীর ওপর চুমকীর কাজের মত বিকতরুচির সংলাপ ও সঙ্গীত। তাও ঠাস বুনোনীর যোগ্যতা নেই। এই বিকৃত পরিবেশনার জন্যে ছবিখানি দর্শকদের কাছ থেকেও এমন ব্যপকভাবে নিন্দিত হ'য়েছে যে, ইতিপূর্ব্বে কোন বাঙ্গলা ছবির ক্ষেত্রে তা' হয় নি। যাঁরা জীবনে দশটা গল্পও প'ড়েছেন বা কয়েকখানা ছবি দেখেছেন, তাঁদের পক্ষেও এমন জঘন্য, অর্থহীন ও অসংলগ্নভাবে ফিল্মে গল্পের রূপদান সম্ভবপর নয়। আর হয়ত' এই কারণেই বাঙ্গলা ছবির ক্ষেত্রে শিক্ষিত লোকের পদার্পণ সর্ব্বাগ্রে কাম্য।

ছবি তুলতে গেলে "ক্যামেরা" বা "সাউণ্ড" যে এমন কিছু একটা ব্যাপার নয় তা' আমরা প্রথম বুঝলাম "অপবাদ" ছবি দেখে। এত বছরের অভিজ্ঞতায় আমরা এত নিম্নস্তরের ফটোগ্রাফী এবং সাউণ্ড রেকর্ডিং দেখেছি বা শুনেছি বলে মনে হয় না।

আর সঙ্গীত? শুনেছি, কোন কোন সভ্য দেশে জানোয়ারদের নাকি সঙ্গীতের সঙ্গত শেখানো হ'চ্ছে। এই সব জানোয়ার "অপবাদ"এর চেয়ে খারাপ সঙ্গত করে কিনা তা' আমাদের জানা নেই।

এইবার যদি পরিচালনার কথা ব'লতে হয়, তবেই ধৈর্য্য-চ্যুতি ঘটবে। তার চেয়ে পাঠকগণ এবারের মত মাপ ক'রবেন আমাদের। বরং, সহজে একটি কথা ব'লতে চাই, যাঁরা আমাদের শত্রু, তাঁরা একবার ছবিখানা দেখে আসুন আর, যাঁরা আমাদের হিতৈষী তাঁরা, ইতিমধ্যেই যাঁরা ছবি দেখেছেন, তাঁহাদের কাছ থেকে বিস্তারিত বিবরণ জেনে নিন।

তবে, "অপবাদ" থেকে আমরা কিছু আনন্দের খোরাকও সংগ্রহ ক'রেছি। আমরা দেখে আনন্দিত হ'য়েছি যে, বাঙলার দর্শক আর প্রদর্শকরা এইসব 'Sexciting' প্রযোজকদের উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থাও জানেন। দর্শকরা অন্ততঃ গাঁটের পয়সা খরচ ক'রে আর এই ধরণের বাজে ছবি দেখতে রাজী নন। প্রদর্শকরাও আর এইসব বাজে ছবি দেখিয়ে তাঁদের খরিদ্দারদের ঠকাতে রাজী নন। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত প্রদর্শক সম্মেলনে আমরা বিভিন্ন প্রদর্শকদের কাছ থেকে বাজে ছবি সম্বন্ধে এমন সব সঙ্কল্পের কথাই শুনেছি। অতএব, শ্রীসরোজ মুখোপাধ্যায় এবং তাঁর পদাঙ্কানুসারীরা নিজেদের এবং বাঙলার মঙ্গলের জন্যে এখন থেকেই সামাল হবেন ব'লে আশা করি।

—তীরন্দাজ

মহাসম্পদ

মহালক্ষ্মীর 'মহাসম্পদ' ষ্টুডিও গুদামের সিন্দুকে যতদিন ছিল (অবশ্য বেশ কয়েক বছরই ছিল) ততদিন হয়তো সত্যিই তা' প্রযোজক মহাশয়ের সম্পদ হয়েই ছিল কিন্তু যেই পর্দায় এসে হাজির হোল ওমনি দেখা গেল যে তা' আসলে প্রযোজকের মহাশেল এবং দর্শকের মহাবিপদ। 'মহা' অবশ্য দু'ক্ষেত্রেই রইলো তবে প্রথমটায় শেল আর আমাদের বেলায় বিপদ। বিপদ বৈকি! আড়াই মাইলের ওপর লম্বা ছবি দেখতে দেখতে হল-শুদ্ধ দর্শকদের সকলকেই যদি ঘন ঘন প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে হয় তাহোলে অবস্থাটা কি দাঁড়ায় বুঝুন! আপনি না হয় ঝাড়া-হাত-পা, টুক্‌টাক্ কাজ সেরে ফেললেন, বিপদের বেগ সামলাতে হোল কম, কিন্তু আমার? হাতে-পায়ে-বেড়ি, আণ্ডা গেঁড়গেঁড়ি নিয়ে নাকের জলে চোখের জলে চোবানী খেয়ে প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ! ডাক্তারবাবুর মুখে 'সিনেমা হেড-একে'র কথা শুনেছিলুম, তবে 'সিনেমা ডায়াবেটিস'-এর অভিজ্ঞতা এই প্রথম। তাই ভাবছিলুম এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ গবেষণা করে একটা 'ডক্টরেট' বাগালে কেমন হয়?

একবার এক সাহিত্যিক বন্ধু আমায় বলেছিলেন,— 'দাদা! যে ছবি দেখতে প্রকৃতির ডাক মালুম হয় তার সমালোচনায় নান্দিমুখ না ক'রে স্রেফ্ একেবারে শ্রাদ্ধ করে ছাড়বেন!' কথাটা খাঁটি সত্যি। আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে বস্তুর গুণাগুণ বিচার হয় তার অদৃশ্য রশ্মি আর ক্রিয়ার ওপর। ছবির বেলাতেও তাই। ছবি কোন্ শ্রেণীর তা' ধরা পড়ে, দর্শকের শরীরের ওপর তার অদৃশ্য ক্রিয়ার লক্ষণে। আমি মশায় বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সমালোচনা করি। তাই আজকাল আর বুড়ো বয়সে খোঁড়া চোখ নিয়ে মাইলের পর মাইল না ছুটে পর্দা থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে আপনাদের ওপর ফেলেছি। যেই দেখি আপনারা ঘন ঘন ওঠেন ওম্‌নি নোট বইয়ে টুকে রাখি—'ডায়াবেটিস মার্কা ছবি!' বগ টিপে মাঝে মাঝে মাথা ঝাড়তে দেখলে লিখি—'হেড-এক মার্কা।' যখন দেখি একটু ঢুলঢুলিয়া ভাব, শুনি হা হুতাশ আর হাপরের মত দীর্ঘশ্বাস, সঙ্গে সঙ্গে নোট করি—'ইনসোমনিয়া মার্কা।' আরও বহুৎ কিসিমের মার্কা আছে কিন্তু কাগজের সেটুকু স্থান বরাদ্দ তাতে আর সব লিখে কুলিয়ে উঠতে পারবো না। তবে হতাশ হবেন না। ছোকরা সমালোচকদের তাগিদে ত্রিলোচন শর্ম্মার 'সমালোচনার মেডইজি' বই শিগ্‌গীর বেরুচ্ছে! দেখবেন তাতে সব আছে: কত রকমের ছবি এ দেশে হয়, কি কি তার লক্ষণ ও ক্রিয়া, কোন্ ছবিতে কোন্ ওষুধ ও পথ্যির ব্যবস্থা, ইত্যাদি ইত্যাদি। মোদ্দা কথা বইটি হবে সমালোচকদের পক্ষে 'মেডইজি' আর দর্শকদের 'মেটিরিয়া মেডিকা'—স্রেফ্ কম্বাইণ্ড-ভলিউম্। আর যদি ভাগ্য আপনাদের সুপ্রসন্ন হয়, সরকারের চিত্রদপ্তরের কাঁচি বিভাগ যদি ছবিতে 'এ' 'বি' 'সি' মার্কা না দিয়ে ত্রিলোচনের থিওরি অনুযায়ী মার্কা দেন, তাহোলে তো আপনাদের পোয়া বারো! ছবিঘরে যাবার সময় রেশন ব্যাগে ওষুধ পথ্যি নিয়ে একেবারে সিটে ব'সবেন গ্যাট হয়ে। অবিশ্যি ছবি বুঝে পথ্যি আর ওষুধ নেবেন। পথ্যির মধ্যে: পান, বিড়ি, দোক্তা, নস্যি ইত্যাদি, আর ওষুধের মধ্যে: ইনসুলিন, অ্যাসপিরিন, ব্রোমাইড মিক্‌শ্চার ইত্যাদি।

'মহাসম্পদ' কোন্ শ্রেণীর, কোন্ মার্কার জিজ্ঞাসা করছেন? প্রথম শ্রেণীর 'ডায়াবেটিস্ মার্কা' ছবি। কেন

শুনবেন? ঘণ্টায় ঘণ্টায় প্রকৃতির ডাক আসবে আর আপনি তা' অনায়াসেই টের পাবেন। না পেয়ে উপায় নেই! কারণ মনটাকে তো আর ছবি টেনে রাখতে পারছে না; ফলে মুহুর্মুহু তা' শরীরের ওপর এসে প'ড়ছে। কেবল প্রকৃতির ডাকই কেন, 'মহাসম্পদ' দেখতে গিয়ে গায়ে একটা ক্ষুদে পিঁপড়ে হেঁটে গেলেও আপনি টের পাবেন! বুঝুন তাহোলে চিত্রের বিকর্ষণ শক্তির বহর! অথচ ভালো ছবি দেখতে পেলে কি হয় আপনার? পর্দার আকর্ষণে আপনি তলিয়ে বোম্ ভোলা! ক্যানেস্তারার পিটুনী, ছাড়পোকার কামড়ানি, কিছুতেই আপনার ভ্রূক্ষেপ নেই। এমন কি পাশের লোকের বিড়ির ছ্যাঁকার জ্বালা অবধি আপনার মগজে পৌঁছোয় না। সে সব হোল গিয়ে মশাই 'প্যারাসিসিস মার্কা' সচরাচর চোখে পড়ে না। যাক সে কথা। এবার 'মহাসম্পদে'র মহাদৈন্যের কাহিনীটা একবার শুনুন।

গল্পটা হাল আমলের নয় ১৩৫০ সালের, অর্থাৎ গত ২য় মহাযুদ্ধের সময়কার। হঠাৎ তারিখটা পিছলে ৩য় মহাযুদ্ধ লাগো লাগো সময়ে এসে প'ড়েছে। যাই হোক তখন মাগ্গিগণ্ডার দিনে গ্রামের ইস্কুলের আয় কমাতে অনুকূল মাষ্টার চাকরী ছেড়ে দিলে। কারণ, সে আদর্শ মাষ্টার, তার মহাসম্পদ হোল—শিক্ষা, সততা, সাহস, দাক্ষিণ্য, স্বদেশপ্রেম, সত্যানুরাগ, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, দয়া ও সহানুভূতি। অতএব এতগুলো সম্পদওলা মাষ্টার অনুকূল সেই দুর্দ্দিনে আর একটি মাষ্টারের চাকরীর স্থান ক'রে দিয়ে আদর্শ বজায় রাখলে। কাহিনীকারের এ লজিকটা ঠিক বুঝে উঠতে পারলুম না। যাক্ বোঝার দরকারও নেই। এরপর অনুকূলকে দেখলুম কোলকাতায় চাকরীর সন্ধানে। হ্যাঁ, ইতিমধ্যে কিন্তু অনুকূল গ্রামে থাকতে আদর্শবতী সুধার সঙ্গে প্রেম জমিয়ে ফেলেছিল এবং তার বাপ মরার সময় কথা দিয়েছিল তাকে বিয়ে করবে। সহরে এসে প্রথম প্রথম অনুকূলের আদর্শের ঝাঁজ ছিল। তাই চাকরীতে ঘুষ না নেওয়ার দরুন কোম্পানীর মালিক তাকে বরখাস্ত ক'রলেন। এখানেও লজিকটা বুঝতে পারলুম না। মরুকগে। শেষটায় অনুকূলের সব ঝাঁজ উবে গেল। সে ভিড়ে গেল গেণ্ডারীরাম বাটপেরিয়ার দলে। যুদ্ধের চোরা কারবারে ফেঁপে উঠতে লাগলো। তারপর যা হয়—টাকার আনুসঙ্গিক দোষ এসে হাজির হোল। অনুকূল অন্ধ মেয়ের দিকে নজর দিলে। সুধা জানতে পেরে কড়কে দিলে। ভুল বোঝাবুঝির মধ্যে অনুকূল তার আদর্শ ফিরে পেল। পেয়েই ওমনি ছুটলো 'জয়হিন্দে'র দলে। সেখানে ইচ্ছে করে গুলী খেয়ে হাজির হোল শেষ দৃশ্যে। সুধা ছুটে এলো হাঁকুপাকু করে। মিল হোল। দেখলো মহাসম্পদ, অনুকূলের সম্পদ কিছু খোয়া যায়নি।

এই হোল কাহিনীর খিচুড়ী। এতে আপনি সব পাবেন। আদর্শ, বাইজী, গোলাগুলী, জয়হিন্দ্ থেকে সুরু ক'রে চোরাকারবার অবধি। কিন্তু পাবেন বটে, তবে লাগবে একঘেয়ে আর ঝাপ্সা। কারণ, দেখে মনে হোল ছবি তোলার ক্যামেরা-বাবাজী বোধহয় নট্-নড়ন-চড়ন হয়েছিল ঘটের না আছে কায়দা না আছে বৈচিত্র্য মিডশটে একটা সিকোয়েন্স সুরু হোল তো ঐ শটেই রইলো বহুক্ষণ। ইতিমধ্যে অভিনেতা অভিনেত্রীরা ঠায় একভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লেক্চার দিয়ে যান। কর্পোরেশনের প্রচার বিভাগের পল্লীমঙ্গল সিরিজের ছবির মত অনেকটা, আর ঝাপ্সা হওয়ার কারণ বোধ হয় এতদিন বস্তাবন্দী অবস্থায় প'ড়ে থাকায় রোদ জল লেগে সব হাওয়া হয়ে গেছে!

অভিনয় অংশে নাম-করারা সব আছেন। কেউই অথচ নাম রাখতে পারেন নি। উনিশে-বিশে মিশিয়ে কোন রকমে উৎরে গেছেন। প্রশংসনীয় না হোলেও আগাগোড়া অপ্রশংসনীয় নন। আর গান-বাজনার তরফটা ছবির বড় তরফ বলা যেতে পারে। জিজ্ঞাসা করছেন নিশ্চয়ই—ছোট তরফটা তবে কোন্টা? সেটা হোল পরিচালনার। 'পরশপাথরে'র পরিচালক শ্রীসুরেন্দ্র রঞ্জন 'মহাসম্পদে' আর এক ধাপ নেমে এসে পরিচালনা জমিদারীর ছোট তরফের মালিক হয়েছেন। —ত্রিলোচন

পহেলা আদমী ঃ সমাধি

দু'খানি ছবিই আজাদ হিন্দ্ ফৌজ ও তার সর্ব্বাধিনায়ক কর্ম্মবীর নেতাজীর মৃত্যুহীন কালজয়ী স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমিকায় রচিত। প্রথম ছবিটি নিবেদন করেছেন বাংলার প্রখ্যাত চিত্র-প্রতিষ্ঠান নিউ থিয়েটার্স আর দ্বিতীয়টি এসেছে বোম্বাইয়ের নামকরা চিত্রনির্ম্মাতা ফিল্মিস্থানের কাছ থেকে। প্রথম ছবিটি আংশিকভাবে ডকুমেণ্টারী জাতীয় এবং প্রতিষ্ঠান ও পরিচালকের নিষ্ঠা ও স্বাজাত্যবোধের পরিচায়ক—দ্বিতীয়খানি পুরোপুরি ব্যবসায়িক মনোবৃত্তির নিদর্শন। 'পহেলা আদমী'তে নেতাজী স্বশরীরে দেখা দিয়েছেন ডকুমেণ্টারী শটগুলিতে, মূল কাহিনীতে নয়। আর 'সমাধি'র মধ্যে 'নেতাজী'র ভূমিকা সৃষ্টি করা হয়েছে, তৎকালীন প্রকৃত দৃশ্যের ডকুমেণ্টারী ছবি মোটেই নেই। 'পহেলা আদমী'তে আজাদ হিন্দ্ ফৌজ, তাদের ক্রিয়াকলাপ, তাদের ঐতিহাসিক ত্যাগস্বীকার ইত্যাদি মূলতঃ দেখানো হয়েছে, কাহিনী অনুসরণ করেছে এইগুলিকে। 'সমাধি'তে আছে নিছক একটি প্রেমকাহিনী এবং তাকেই অনুসরণ করে চলেছে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি এবং তার সর্ব্বাধিনায়ক 'পহেলা আদমী'র মধ্যে পাই আজাদ্ হিন্দ্ বাহিনীর শ্রেষ্ঠত্বের কারণ, প্রমাণ ও পরিচয় আর 'সমাধি' দেখে আই-এন্-এ সম্বন্ধে যে ধারণা জন্মায় তা কোনোদিক দিয়েই অনুকূল নয়

'পহেলা আদমী'র কাহিনী আরম্ভ বর্ম্মার একটি সহর পেগু থেকে। দুটি পরিবার পাশাপাশি বসবাস করতেন। ডাঃ বিজয়কুমার আর মিষ্টার চৌধুরী। ডাঃ বিজয়ের ছেলে কুমার আর মিষ্টার চৌধুরীর মেয়ে লতা, উভয়ের ছোটবেলা থেকেই ভাব ও যৌবনে পা দিতে দিতেই বিয়ের কথাও ঠিক হয়ে গেল! কিন্তু ঠিক বিয়ের কথা পাকাপাকি হবার সময়েই পূর্ব্ব এশিয়াতে যুদ্ধের দামামা বেজে উঠলো আর সব কিছুই যেন ওলোট পালোট হয়ে গেল। পূর্ব্ব এশিয়ার ত্রিশ লক্ষ ভারতবাসী তাদের প্রিয় নেতার প্রতি অভিবাদন জানাতে নিজেদের সব কিছুই পণ করে। প্রত্যেকের মুখেই কেবল নেতাজীর কথা। এই সেই ব্যক্তি যিনি পূর্ব্ব এশিয়ার যৎসামান্য ভারতবাসীকে একটি লৌহস্তম্ভে পরিণত করেন। ইনিই তিনি যিনি জোর গলায় বলেছিলেন "তুম্ মুঝে খুন দো—ম্যয় তুম্‌হে আজাদী দুঙ্গা।" এই ধ্বনি পেগু সহরের এই দুটি বাড়ীতেও এসে পৌছল।

ডাক্তার বিজয়কুমার আগে থেকেই দেশভক্ত ছিলেন, আজ তাঁর মনে দেশাত্মবোধ জেগে উঠলো। লতার আশা ভরসা সব কিছুই কুমারের সঙ্গে গাঁথা ছিল—মাতৃভূমির ডাকে সে যেন বিচলিত হয়ে পড়লো। ডাক্তার নিজের বাড়ীর এক মাত্র প্রদীপ "কুমার"কে লড়াই-এ পাঠিয়ে দিলেন। নেতাজীর ডাকে সাড়া দিয়ে ওঠে : "তুম্ মুঝে খুন দো—ম্যয় তুম্‌হে আজাদী দুঙ্গা।"

কুমার নিজের সুখ, আত্মীয় পরিজন, প্রেমিকা সকলকে ত্যাগ করে চললো নূতন ইতিহাস রচনা করতে, কুমার চলে যায়—লতা আশার প্রদীপ জেলে পথ চেয়ে থাকে। জীবনের বিনিময়ে রচিত হয় সে ইতিহাস—আশাভগ্না লতা সেই আরব্ধ ইতিহাসকে এগিয়ে নিয়ে যাবার সঙ্কল্প গ্রহণ করে।

দুই ভায়ের মধ্যে বিরোধ জাগে 'সমাধি' চিত্রে। শেখর লড়াই করছে আজাদ্ হিন্দ্ বাহিনীর হ'য়ে আর সুরেশ বৃটিশ বাহিনীর পক্ষে। দুই বোন ডলি আর লিলি। ডলি বৃটিশ পক্ষের গুপ্তচর এবং সুরেশের প্রতি প্রেমাসক্ত আর লিলি আকৃষ্ট শেখরের প্রতি—যে শেখর যোগ দিয়েছে আজাদ্ হিন্দ্ বাহিনীতে।

বোনের জন্যই লিলি তার প্রেমাস্পদের প্রতি বিশ্বাস্‌ঘাতকতা ক'রেও আজাদ্ হিন্দ্ বাহিনী সম্বন্ধে তথ্যাদি সংগ্রহ ক'রে বোনকে জানিয়ে দেয়। পরে লিলি আর ডলি ঘটনাক্রমে বৃটিশ বাহিনীর সঙ্গে থেকে নেতাজীর পক্ষে গুপ্তচরবৃত্তি করতে লাগলো।

এই সময় আবির্ভাব হলো শেখর—শত্রু-বাহিনীর পশ্চাদ্দিকস্থ একটী সেতু সে উড়িয়ে দেওয়ার জন্যে তৈরী হলো। সেতুটি ধ্বংস হওয়ার পর লিলি আর শেখর নিশ্চিত মৃত্যুর সম্মুখীন হলো। শেষ নিঃশ্বাস ফেলবার

আগে তাদের জন্মভূমির মাটি স্পর্শ করবার জন্ত প্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠলো—ঘটনাস্থল থেকে মাত্র একশো গজ দূরে পৌছবার জন্যে তারা উদগ্রীব। তাদের এই যাত্রা-পথে অবিরত মেশিনগানের গুলিবর্ষণকে লিলি তুলনা করছে তাদের বিয়ের উৎসবে বাজী পোড়ানোর সঙ্গে। ছবির সমাপ্তি ঘটেছে ডলি-সুরেশ এবং লিলি-শেখরের সমাধিতে।

'পহেলা আদমী'র মধ্যে কাহিনীটি বলা হয়েছে ভালোভাবে। আজাদ হিন্দ্ ফৌজের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার দৃশ্যগুলি আরও কমালে ভালো হোতো। যুদ্ধের দৃশ্য এবং রাতের দৃশ্যগুলির চিত্রগ্রহণ সুন্দর। অত্যধিক গানের সমাবেশ করা হয়েছে বোম্বাইয়ের হিন্দী ছবির অনুকরণে। অভিনয়ে স্মৃতিরেখা, পাহাড়ী সান্যাল এবং নাজির হোসেন কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। নায়করূপে বালরাজ চলনসই।

'সমাধি'র মধ্যে অবাস্তব বিষয় এবং হাস্যকর অসঙ্গতির অভাব নেই। আই-এন্-এ' সৈনিকের কাছ থেকে যে অত সহজে গোপন সামরিক সংবাদ সংগ্রহ করা যেতো, তা' আমরা 'সমাধি' দেখে জানলাম। নায়কের প্রেমবিলাসই প্রকাশ পেয়েছে সমধিক, বণদুর্ব্বার মূর্ত্তি নয়। ছবির মধ্যে 'নেতাজী'কে আনা আমরা সমর্থন করতে পারলাম না। নেতাজীর ভূমিকায় আনন্দ পালকে 'লং' শটে মোটামুটি মানিয়ে গেলেও 'ক্লোজ'-শটগুলিকে তাঁর রূপ-সজ্জা প্রকট হ'য়ে ওঠে। ছবিকে জনপ্রিয় উপাদানে ভরপুর ক'রে তোলার ব্যাপারে পরিচালকের আপ্রাণ এবং ঐকান্তিক চেষ্টা সর্ব্বত্রই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। —সপ্তর্ষি

কাঁকনতলা লাইট রেলওয়ে

চিত্র-এলাকায় প্রেমেন্দ্র মিত্রের সুনাম আছে, অন্ততঃ পক্ষে কাহিনীকার হিসাবে—নতুন ধরনের কাহিনী নিয়ে এক্সপেরিমেন্টের তিনি বরাবরই পক্ষপাতী। কিন্তু বর্ত্তমান চিত্রটি সবদিক দিয়েই তাঁর অক্ষমতার স্মৃতি বহন ক'রে থাকবে। ইদানীং তাঁর কাহিনীর ঘটনাবিন্যাস ক্রমান্বয়ে অসংলগ্ন এবং চরিত্রসৃষ্টি কষ্টকল্পনার পরিচায়ক হ'য়ে আসছে। নামে এবং কাহিনীতে আলোচ্য চিত্রটি প্রেমেন্দ্র মিত্রের পরিচালক জীবনের একটি ষ্টাণ্ট—ছবির নামকরণের সঙ্গে যেমন গোটা গল্পাংশের কিছুমাত্র যোগ নেই, তেমনি গল্পের পরিণতির সঙ্গে চরিত্রগুলির কোনো সঙ্গতি নেই।

নগণ্য গ্রামের ষ্টেশন মাষ্টার আকস্মিকভাবে এক অনাথ মেয়েকে কুড়িয়ে পেয়ে প্রতিপালন করতে বাধ্য হন—অথচ তার আসল পরিচয় তাঁর জানা নেই। কালক্রমে মেয়েটি বড় হয়, যৌবনে পা দেয়, স্বাভাবিকভাবেই প্রেম সঞ্চার হয় পাশের বাড়ীর প্রফেসারের ছেলের সঙ্গে। তিনি বোটানীর প্রফেসার, একগুঁয়ে পাগলাটে ধরনের লোক। ছেলে বি-এ পাশ ক'রে বাস-ড্রাইভারী করে—dignity of labour-এর মাহাত্ম্য প্রচার করে। প্রেম যখন পরিণয়ে পরিণতি লাভ করতে চলেছে, তখন প্রকাশ পেলো মেয়েটির সত্যকার পরিচয়। হারানো মেয়েকে খুঁজে পেলো তার নিকট আত্মীয়রা—সে বড়লোকের মেয়ে, ষ্টেশন মাষ্টারের ঘর থেকে সে যায় নিজের বাপের ঘরে—কিন্তু সেই নতুন পরিবেশে সে অস্বস্তি বোধ করে, আরও বেশী চিন্তিত হ'য়ে পড়ে বোকা-বোকা গোবেচারী একটি ছেলের সঙ্গে তার মা বিয়ের ব্যবস্থা পাকাপাকি ক'রে ফেলেছেন জেনে। পাগলা প্রফেসার একথা জানতে পেরে ছেলেকে হুকুম ক'রে পাঠালেন জোর ক'রে তার মানসীকে বিয়ে ক'রে নিয়ে পালিয়ে আসতে। বাধ্য ছেলে দেরী করেনা—বিয়ে বাড়ীতে গণ্ডগোল বাধে—কাহিনীর প্যাচ চলে—সার্ব্বজনীন মিলন ও বোঝাপড়া হয়। ষ্টেশন মাষ্টার এই মিলন-উৎসবে সভাপতিত্ব করেন। ছবির পরিসমাপ্তি ঘটে এইখানেই।

সমগ্র ছবিটি খণ্ড ক্ষুদ্র চিত্রের সমষ্টি—পরবর্ত্তী ঘটনার কার্য্যকারণ সম্বন্ধ পূর্ব্ববর্ত্তী দৃশ্যে বা ঘটনায় কোথাও পরিস্ফুট বা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তিনখানি গান আছে ছবিতে—তিনখানিই ছবির পক্ষে বাহুল্য মাত্র। বিয়ের দৃশ্যগুলি অকারণ অযথা দীর্ঘ এবং চিত্রনাট্যকারকে ছবির প্রয়োজনীয় দৈর্ঘ্য পূরণের দুর্ভাবনা থেকে মুক্তি দিয়েছে। চিত্র ও শব্দ গ্রহণ বিশেষ ত্রুটিপূর্ণ, এমনকি অনেক জায়গায় ছবির গল্প বোঝার পক্ষেও প্রতিকূল। ঠিকভাবে সম্পাদনা করলে ছবির দৈর্ঘ্য অর্দ্ধেক হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল।

অভিনয়ে জহর গাঙ্গুলী ষ্টেশন মাষ্টারের মুখ রেখেছেন। ধীরাজ ভট্টাচার্য্য উদ্ভট চরিত্রানুযায়ী সু-অভিনয় করেছেন। প্রেমার্ত্ত দৃশ্যগুলির আগে পর্য্যন্ত বিকাশ রায়কে ভালো লাগে। কবিতা সরকারও তাই। গুরুদাস এই চিত্রে 'গবা পাগলাকে' স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। শোভা সেনের ছোট্ট ভূমিকাটি উল্লেখযোগ্য। —পঞ্চভূত

লাঞ্ছিত যারা

গৌর চট্টোপাধ্যায়
মনোজ সান্যাল

(গত সংখ্যার পর)

পঁচিশ

সোজা এ্যালোশার কাছে গিয়ে হাজির হলাম। সে তখন বাপের সঙ্গে থাকে মর্স্কায়াতে। প্রিন্স ভালকো ভস্কির ফ্ল্যাটটি বেশ প্রশস্ত। থাকেন অবশ্য তিনি একা। এ্যালোশার ফ্ল্যাটে ঘর দুখানি বেশ চমৎকার। তার সঙ্গে ইতিমধ্যে আর দেখাসাক্ষাৎ করতে যাই নি। একবার মাত্র গেছি। সে বরং প্রায়ই আসতো আমার সঙ্গে দেখা করতে বিশেষ করে প্রথম দিকে, নাটাশার সঙ্গে সম্প্রীতি গড়ে ওঠার প্রথম দিকটাতে!

এ্যালোশা বাড়ী ছিল না। সোজা ঢুকলাম তার ঘরে। লিখে এলাম এক টুকরো চিঠি: 'এ্যালোশা, মনে হয় তোমার মাথার ঠিক নেই। মাত্র সেদিন মঙ্গলবার রাত্রে তোমার বাবা নিজে নাটাশাকে অনুরোধ করেছেন তোমাকে বিয়ে করার জন্যে। আমি নিজের চোখে দেখেছি এতে তুমি নিজেও বিশেষ খুশী হয়েছিলে। তুমি নিশ্চয়ই স্বীকার করবে তোমার ব্যবহার বেশ কিছুটা বিচিত্র। নাটাশার প্রতি তুমি কি ব্যবহার করছো সে তুমি জানো কি? সে যাই হোক্, এই চিঠিতে তোমায় স্মরণ করিয়ে দিতে চাই ভাবী স্ত্রীর প্রতি তোমার ব্যবহার যেমনই অশোভন তেমন অন্যায়। আমি বেশ ভালভাবেই জানি, তোমাকে বক্তৃতা দেবার অধিকার আমার নেই। কিন্তু তা নিয়ে আমার কোনো দুর্ভাবনাও নেই।'

পুনশ্চঃ, নাটাশা এ চিঠির বিন্দুবিসর্গও জানে না। আর বলতে কি তোমার সম্বন্ধে এসব কথা আমাকে সে বলে নি।

চিঠিখানা খামে ভরে খামের মুখ এঁটে টেবিলের ওপর রেখে এলাম। আমার জিজ্ঞাসার উত্তরে বাড়ীর চাকরটা জানালো, এ্যালেক্সি পেট্রোভিচ্ বড় একটা বাড়ীতেই থাকে না, আর ভোরের আগে সে ফিরবেও না।

অতিকষ্টে বাড়ী ফিরে এলাম। মাথাটা ঝিম্‌ঝিম্ করছে, পা দুটো কাঁপছে যেন কোনো জোর নেই। ফিরে দেখলাম আমার ঘরের দরজা খোলা রয়েছে। নিকোলাই সার্গেইচ আমার অপেক্ষায় বসে আছেন। টেবিলের ধারে বসে তিনি নির্ব্বাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করছিলেন এলেনাকে। এলেনাও লক্ষ্য করছিল তাঁকে, তার বিস্ময়ও কম নয়, তবে সে ঘাড় গুঁজে নির্ব্বাক হয়ে ছিল। মনে ভাবলাম নিশ্চয়ই তিনি ওকে দেখে বেশ অবাক হয়েছেন।

'এই ত্যাখো ত' বাবা, তোমার জন্যে বসে আছি তা পুরো একটি ঘণ্টা হবে। আর সত্যি বলতে কি এ রকম কিছু...এই সব দেখার আশা আমি করি নি।' বলে চললেন তিনি ঘরের চারিদিকে তাকিয়ে এলেনার দিকে তেমন কোনো ইঙ্গিত না করেই। তাঁর চোখে মুখে বিস্ময়, কিন্তু তাঁর দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম তার মধ্যে কেমন যেন উত্তেজনা ও নৈরাশ্যের ভাব। তাঁর মুখ অস্বাভাবিক রকম ম্লান।

'বসো বসো,' বললেন তিনি বেশ একটা চিন্তিত ভাব নিয়ে, 'বেশ শশব্যস্ত হয়েই তোমার কাছে আসতে হলো। তোমাকে একটা কথা বলার আছে। কিন্তু তোমার এ কি ব্যাপার? শরীর ভাল আছে ত'!'

'না, শরীরটা ভাল নেই। সারাটা দিন মাথা ঝিম্-ঝিম্ করছে'

'খুব সাবধান, অবহেলা করো না। হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগেছে, না অন্য কিছু?

'না তেমন কিছু না। মাঝে মাঝে এ রকম আমার হয়। কিন্তু আপনাকে দেখেও ত' ভাল মনে হচ্ছে না?'

'না, না, ও কিছু না। ক্ষণিক উত্তেজনা। তোমায় একটা কথা বলার আছে। বসো।'

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে টেবিলের ধারে বসে পড়লাম তাঁর সামনাসামনি। বৃদ্ধ সামনে আমার দিকে ঝুঁকে ফিস-ফিস করে বললেন, 'শোনো বলি, ওর দিকে তাকিও না। ভাবখানা এমন দেখাও যেন আমরা অন্যকিছু বলাবলি করছি। একে আবার কোত্থেকে জোটালে?'

'সেকথা আপনাকে পরে সব খুলে বলবো। এই মেয়েটি সংসারে একা। আপন বলতে ওর কেউ নেই। সেই যে বুড়ো স্মিথ এখানে থাকতো আর মুলারের কাফি-খানায় মারা গেছলো, ও তারই নাত্‌নী।'

'তাই নাকি! বুড়োর আবার নাত্‌নীও ছিল। তা বেশ বাবা, মেয়েটিকে দেখে কেমন যেন অবাক লাগে আর কি বা ওর বয়েস। তাকিয়ে আছে কি রকম একদৃষ্টিতে! তোমাকে স্পষ্ট বলছি তুমি যদি না এসে পড়তে তাহলে আমি আর পাঁচ মিনিটও ওকে সইতে পারতাম না। সেই যে দরজাটা খুলে দিল নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে, তার পর থেকে এতক্ষণ একটি কথাও বললে না! ওটাকে দেখে যেন মানুষ বলেই মনে হয় না। কিন্তু ও এসে জুটলো কি করে এখানে। বোধ হয় দাদুকে দেখতে এসেছিল। বুড়ো মারা গেছে না জেনেই?'

'হ্যাঁ, মেয়েটার দুঃখকষ্টের শেষ নেই। মরবার সময় বুড়ো ওর চিন্তাতেই কাতর হয়েছিল।'

'হুঁ, ওকে দেখে অনেকটা দাদুর নাত্‌নী বলে মনে হয়। সে যাক্, সেসব কথা পরে শুনবো'খন। ওর এই দুঃখকষ্টে কিছু সাহায্য করা দরকার। কিন্তু বাবা, ওকে এখন একটু বিদেয় করো, তোমার সঙ্গে একটা জরুরী বিষয় আলোচনা করবার আছে।'

'কিন্তু ওর ত' যাবার জায়গা নেই। ও ত' এখানেই থাকে।'

দু'এক কথায় তাঁকে বুঝিয়ে দিলাম যতদূর পারি। বললাম তাঁকে তিনি ওর সামনে স্বচ্ছন্দেই সেকথা বলতে পারেন, কেন না অতশত বোঝার মত বয়স ওর এখনো হয় নি।

'এ্যাঁ, বলো কি!...ওর বয়েস হয় নি। তুমি আমায় অবাক করলে বাবা। তোমার সঙ্গে একসঙ্গে আছে বলো কি!'

এই বলে বৃদ্ধ আবার তার দিকে তাকিয়ে থাকলেন দু'চোখ ভরা বিস্ময় নিয়ে।

তার সম্বন্ধেই আমরা কথা বলছি বুঝতে পেরে এলেনা মাথা নীচু করে চুপ করে বসে ছিল। দু'হাত দিয়ে সোফার ধার খুঁটছিলো। পোষাক-আসাক ইতিমধ্যে সে অবশ্য বদলে নিয়েছে, আর তাকে মানিয়েছেও বেশ। সযত্নে অন্যদিনের চেয়ে পরিপাটি ক'রে কেশবিন্যাস করেছে সে, কতকটা যেন নতুন পোষাকের মান রাখবার জন্যে। সব মিলিয়ে তার অদ্ভুত অস্বাভাবিক চাহনি বাদে সে সত্যি ভারী চমৎকার।

'তোমাকে যা বলতে হবে তা সংক্ষেপে আর স্পষ্ট করে' বলে চলেন বৃদ্ধ, 'সে অনেক কথা, বিশেষ জরুরী কথা।' বিশেষ গম্ভীর থমথমে ভাব নিয়ে তিনি বসে রইলেন

আর এত তাড়াহুড়ো থাকা সত্ত্বেও 'সংক্ষেপে ও স্পষ্ট করে' বলার কথাগুলি কিছুতেই যেন তাঁর মুখে জোগায় না। মনে ভাবলাম, ব্যাপারখানা কি।'

'জানো ভান্না, আমার একটি বড় উপকার তোমায় করতে হবে। কিন্তু প্রথমে...আমার এখন যা মনে হয়, কতকগুলি অবস্থার কথা তোমায় খুলে বলা দরকার... বিশেষ অস্বস্তিকর অবস্থা।'

গলা খাঁকারি দিয়ে আড় চোখে আমার দিকে একবার দেখে নিলেন। তাকিয়েই লজ্জায় লাল হয়ে উঠলেন। লজ্জায় লাল হয়ে নিজের এই অপ্রস্তুত ভাবের জন্যে নিজের ওপরই যেন চটে ওঠেন। চটে গিয়ে আবার বলতে থাকেন।

'শোনো তাহলে, আর বুঝিয়ে বলবার আছেই বা কি। তুমি নিজেই ত' বোঝো। সংক্ষেপে তা হলো এই, আমি প্রিন্স ভালকোভস্কিকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান জানাতে চাই। তোমাকে তার ব্যবস্থা করে দিতে হবে, আর তুমি থাকবে আমার কাছে কাছে।'

আমি চেয়ারের মধ্যে এলিয়ে পড়ে অপলক নেত্রে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলাম। বিস্ময়ের আমার সীমা নেই।

'কি হে, ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলে যে! এখনও পাগল হই নি!'

'কিন্তু, মাপ করবেন! এর প্রয়োজন কি? এর উদ্দেশ্য কি? আর এটা সম্ভবই বা কি করে?'

'প্রয়োজন! উদ্দেশ্য!' চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আচ্ছা বেশ!'

'বেশ বেশ, আমি জানি আপনি কি বলবেন। কিন্তু এ থেকে আপনার কি কল্যাণ হবে? আপনার লাভ কি এই দ্বন্দ্বযুদ্ধে! বলতে কি আমি এসব কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না।'

'আমি জানতাম তুমি বুঝতে পারবে না। শোনো, আমাদের মামলা মিটে গেছে। (মানে আর কয়েকদিনের মধ্যে মিটে যাচ্ছে। সামান্য ছোটখাট কয়েকটা কাজ বাকী আছে)। মামলায় আমি হেরে গেছি। দশটি হাজার খেসারৎ আমায় দিতে হবে। এই হলো মামলার রায়। ইচমেনেভকার সম্পত্তি জামিন রাখতে হয়েছে। আর আজ সেই জোচ্চোরটা টাকা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত। ইচমেনেভকার সম্পত্তি তার হাতে তুলে দিয়ে সমস্ত ক্ষতিপূরণ আমি করেছি, হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছি। আজ আমি মাথা উঁচু করে বলতে পারি—হে আমার সম্মানিত প্রিন্স, দীর্ঘ, দু'বছর ধরে যত খুশী অপমান তুমি আমায় করেছো, আমার নামে আমার পরিবারের নামে চাপিয়েছো তুমি অপবাদ আর আমি তা' মুখ বুজে সহ্য করতে বাধ্য হয়েছি। আমি তোমায় দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান জানাতে পারি নি। কিন্তু আজ যে আমার মাননীয় প্রিন্স আজ সব চুকে গেছে, তুমিও আজ নিশ্চিন্ত আজ আর তাতে কোন বাধা নেই। এই আমার বক্তব্য ভান্না। তুমি কি মনে করো এই সমস্ত কিছুর প্রতিশোধ নেবার অধিকার আমার নেই?'

তাঁর চোখ দু'টি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বাক্‌শূণ্য হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলাম অনেকক্ষণ। তাঁর মনের চিন্তাধারায় উঁকি দিয়ে দেখবার ইচ্ছে হলো।

'শুনুন,' বললাম আমি শেষকালে সোজাসুজি কথা বলবো ব'লে, 'আপনি সব খুলে বলবেন কি আমায়?'

'বলবো' জবাব দিলেন তিনি জোরের সঙ্গে।

'তাহলে খুলে বলুন ত' শুধু কি এই প্রতিশোধ নেবার জন্যেই তাঁকে এই আহ্বান জানাতে চান, না কি আপনার অন্য কোনো উদ্দেশ্য আছে?'

'ভান্না, তুমি জানো কতকগুলো ব্যাপার নিয়ে কাউকে আমি আলোচনা করতে দিই না কিন্তু তোমার বেলা তা' করবো না। কারণ তোমার অন্তর্দৃষ্টি খুব প্রখর। তুমি একেবারেই আসল ব্যাপারটা ধরে ফেলেছো। হ্যাঁ আমার অন্য উদ্দেশ্য আছে, তা হলো আমার হারানো মেয়েকে বাঁচানো। সাম্প্রতিক ঘটনাচক্র তাকে যে সর্ব্বনাশের পথে টেনে নিয়ে চলেছে তা থেকে তাকে উদ্ধার করতে হবে।'

'কিন্তু আপনি এই দ্বন্দ্বযুদ্ধের সাহায্যে কি করে তাকে বাঁচাবেন, সেইটাই ত' আমি ভেবে পাচ্ছি না।'

'কেন? তার বিরুদ্ধে এই যে যা কিছু ষড়যন্ত্র হচ্ছে সমস্ত

কিছুকে বাধা দিয়ে। শোনো বলি, ভেবো না যেন বাপের স্নেহ বা দুর্ব্বলতা আমায় পেয়ে বসেছে। ও সব বাজে। আমার অন্তরের কথা আমি কাউকে জানতে দিই না। এমন কি তুমিও তা জানো না। মেয়ে আমায় ছেড়ে চলে গেছে, চলে গেছে আমার বাড়ী থেকে তার প্রেমাস্পদকে নিয়ে আর আমি তাকে বিতাড়িত করেছি আমার অন্তর্লোক থেকে—বিসর্জ্জন দিয়েছি চিরকালের জন্য সেদিনের সেই সন্ধ্যাবেলায়—মনে পড়ে? তার ছবির ওপর চোখের জল ফেলতে যদি দেখেই থাকো আমায় তাতে এই বুঝো না আমি তাকে ক্ষমা করেছি। ক্ষমা তখন আমি তাকে করি নি। কেঁদেছি আমার ফেলে আসা দিনের সুখস্মৃতিতে কেঁদেছি আমার ব্যর্থ স্বপ্নের জন্যে কিন্তু তার জন্যে নয়। হয়ত প্রায়ই আমি কাঁদি। সেকথা বলতে আমার লজ্জা নেই, যেমন লজ্জা নেই স্বীকার করতে একদিন আমি তাকে ভালবাসতাম দুনিয়ার সকল জিনিষের চেয়ে। তুমি বলতে পারো, তাই যদি হয়, মেয়ে বলে যাকে আর আপনি স্বীকার করেন না তার ভাগ্য বা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আপনি এত উদাসীন হয়েও কেন আপনার এই দুশ্চিন্তা, কার বিরুদ্ধে কে ষড়যন্ত্র করছে আর কে করছে না? আমি জবাব দেবো, প্রথম কথা হলো সেই উদ্ধত ফন্দিবাজ লোকটা জিতে যাক এ আমি হতে দিতে পারি না। দ্বিতীয় কথা হলো দয়ার অনুভূতি, সে যদি আমার মেয়ে নাও হয় তবুও সে দুর্ব্বল, আত্মরক্ষাবিহীন ও প্রবঞ্চিত। আরও প্রতাড়িত হচ্ছে সে যাতে সর্ব্বনাশের পাত্র তার কাণায় কাণায় পূর্ণ হয়। সোজাসুজি এতে আমি মাথা গলাতে পারি না কিন্তু পরোক্ষভাবে পারি এই দ্বন্দ্বযুদ্ধের সাহায্যে। এক কথায় বলতে গেলে এ বিয়েতে আমার মত নেই আর তাতে বাধা দেবার জন্যে যা কিছু পারি তা আমি করবো।'

'না, যদি নাটাশার ভাল আপনি চান ত' কি করে তার বিয়েতে আপনি বাধা দিতে পারেন? এই একমাত্র পথ যাতে সে সুনাম ফিরে পেতে পারে, সারা জীবন তার পড়ে আছে। সুনামের তার বিশেষ প্রয়োজন।'

'দুনিয়ার লোকে কি বললো না বললো তাতে তার তোয়াক্কা করার দরকারটা কি!' তার এইটা বোঝা উচিত তার সবচেয়ে বড় কলঙ্ক থাকবে এই বিয়ের মধ্যে—ওই সব হতচ্ছাড়া লোকগুলোর সঙ্গে ওই নীচ ছোটলোকের সমাজের সঙ্গে তার এই সম্বন্ধ রাখায়। তার থাকলো গর্ব্বিত আভিজাত্য দুনিয়ার লোকের কাছে এই হবে তার উত্তর। তাহলেই হয়ত আমি তাকে আবার ডেকে নিতে পারবো। তারপর দেখি কে আমার সন্তানের নামে অপবাদ রটায়!'

তাঁর এই বেপরোয়া আদর্শবাদে আমি চমকে উঠি। কিন্তু তখনই দেখলাম তিনি প্রকৃতিস্থ নন। রাগে ও আক্রোশে বলেছেন এইসব কথা।

'এ হলো আপনার আদর্শের কথা,' জবাব দিলাম আমি, 'তাইতেই এত নির্ম্মম। আপনি তার কাছ থেকে এমন একটি শক্তি আশা করছেন যা সে জন্ম থেকে পায় নি। আপনার কি ধারণা সে এ বিয়েতে মত দিয়েছে প্রিন্সেস হবার লোভে? সত্যিই সে ভালবাসে। দুনিয়ার মতকে সে ঘৃণা করুক আপনি এইটা চান। কিন্তু আপনি নিজে সেই মতের কাছে মাথা নীচু করেছেন। প্রিন্স আপনাকে অপমান করেছেন, যা নয় তাই রটনা করেছেন আর এখন বলছেন যে এ বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেই সমস্ত অপবাদ খণ্ডন হবে। এই ত' আপনার লাভ। আপনি চাইছেন প্রিন্সের উপর প্রতিশোধ নিতে তাকে বিভ্রান্ত করতে আর তার জন্যে মেয়ের সুখশান্তি বলি দেবেন। এটা কি দম্ভ নয়। ভ্রূ কুঁচকে বৃদ্ধ বসে রইলেন বিষণ্ণ হয়ে। বহুক্ষণ কোনো কথার জবাব দিলেন না তিনি। শেষকালে বললেন, 'তুমি আমায় ভুল বুঝছো ভান্যা, আমি বলছি তুমি ভুল বুঝছো। যাকৃগে সে কথা। আমি ত' আর মনের ভেতরটা দেখতে পারি না।' বলতে বলতে উঠে পড়েন তিনি। চোখের কোণে অশ্রুবিন্দু টলটল করে ওঠে। 'একটা কথা তোমায় বলে যাই—এই মাত্র তুমি বললে আমার মেয়ের সুখশান্তির কথা, সে সুখশান্তির ওপর আমার কোনো বিশ্বাস নেই। তা ছাড়া এ বিয়ে কোন দিনই হবে না, আমি এতে হস্তক্ষেপ করি আর না করি।'

'কেন? এ রকম মনে হওয়ার কারণ কি। আপনি

নিশ্চয়ই এমন কিছু জানেন...?' বললাম আমি জিজ্ঞাসুভাবে।

'না। বিশেষ কিছু আমি জানি না। ফাঁদ পাতা রয়েছে। এ আমি জানি বেশ ভালো করে, আর হবেও তাই। আর এই বিয়ে যদি হয়েও যেত ত' সত্যি করে বলো ত' এ বিয়েতে সে কোনদিন সুখী হবে? নির্যাতন, অপমান, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, অবহেলা এই ত' সে পাবে তার জীবন-সঙ্গীর কাছ থেকে। বিয়েটা চুকে গেলেই...... না ভাগ্না, এই যদি তোমাদের উদ্দেশ্য হয় আর তোমার হাতও আছে কিছুটা এ ব্যাপারে, তবে এর জন্যে বিধাতার কাছে জবাবদিহি করতে হবে। আমি তোমায় সাবধান করে দিচ্ছি তখন হয়ত অনেক দেরী হয়ে যাবে। আচ্ছা আজ চলি তাহলে।'

বাধা দিলাম আমি। বললাম, 'শুনুন, এত তাড়াতাড়ি কিছু ঠিক করা চলে না। এটা জেনে রাখবেন অনেকের দৃষ্টি রয়েছে এই ব্যাপারে। আর এ সমস্তই আপনা থেকে মিটে যাবে বিনা হস্তক্ষেপ ও বিনা দ্বন্দ্বে। সময়ে সব ঠিক হয়ে যাবে। আর আপনার এই যে সব মতলব, এ সব সম্পূর্ণ অসম্ভব। আপনি কি একবারও ভাবতে পারেন প্রিন্স ডালকোভস্কি আপনার এই আহ্বান গ্রহণ করবেন?'

'গ্রহণ করবে না? তার মানে?'

'আমি বলছি তিনি করবেন না। বিশ্বাস করুন তিনি ধরাছোঁয়ার বাইরে যাওয়ার একটা উপায় খুঁজে বার করবেনই। আর আপনি তখন হয়ে দাঁড়াবেন উপহাসের পাত্র...'

'তা হতে পারে না, আমি বলছি তা হতে পারে না। তুমি আমায় অবাক করে দিলে। এতে সে রাজী না হয়ে পারে কি করে। কেন তুমি মনে করছো এই দ্বন্দ্বযুদ্ধের অশোভনটা কি আছে? ..'

'দেখছেন না, তিনি এমন সব অজুহাত দেখাবেন যাতে আপনারই মনে হবে এ বিরোধ সম্পূর্ণ অসম্ভব।'

'হুঁ! বেশ তুমি যা বলছো তাই হোক আমি অপেক্ষাই করবো। দেখবো কবে তা হয়! একটা কথা কিন্তু মনে রেখো। আমায় তুমি কথা দাও, এসব কথা তুমি সেখানে বলবে না, এ্যানা এ্যানড্রিয়েভনার কাছেও নয়।'

'বেশ, কথা দিলাম।'

'আর একটা ভাগ্না', এসব কথা আর কখনও তুলো না।'

'বেশ, তাতেও কথা দিচ্ছি।'

'আর একটা অনুরোধ। আমি জানি হয়ত তোমার কাছেও সব একঘেঁয়ে লাগছে। মাঝে মাঝে আমাদের ওখানে এসো না কেন। এ্যানা তোমায় বড় ভালবাসেন আর·· আর...তুমি না গেলে তিনি যেন কেমন মনমরা হয়ে পড়েন বুঝলে ভাগ্না' বলে তিনি আমার হাতদুটো চেপে ধরলেন। আমি সমস্ত অন্তর থেকে তাঁকে কথা দিলাম।

'আচ্ছা ভাগ্না, শেষের এই ছোট্ট কথাটি, টাকা পয়সা তোমার কিছু আছে ত?'

'টাকা পয়সা?' সবিস্ময়ে তাঁর কথার পুনরাবৃত্তি করলাম।

'হ্যাঁ' (বলে বৃদ্ধ চোখ বিস্ফারিত করে একবার তাকিয়ে নিলেন) 'দেখছি ভাগ্না, দেখছি তোমাকে, দেখছি তোমার ঘর-দোর...তোমার অবস্থা আর যখন ভাবি তোমার হয়ত আরও বাইরের খরচ থাকতে পারে (আর হয়ত সে খরচ তোমার এখুনি হতে পারে), তখন এই নাও, এই দেড়শো' রুবল্ এখনকার মত রেখে দাও ত'।'

'দেড়শো'! এখনকার মত! আপনি না মামলায় হেরে গেছেন!'

'তুমি দেখছি ভাগ্না আমার কথা কিছুই বোঝো নি! তোমার হয়ত বিশেষ জরুরী দরকার হতে পারে, বুঝলে না। সময় অসময়ে টাকা থাকলে নিজে নিজেই অনেক কিছু করা যায়, অনেক কিছু সিদ্ধান্ত করা যায়। হয়ত তোমার এখুনি লাগবে না কিন্তু ভবিষ্যতেও ত' লাগতে পারে। যাই হোক ওটা তোমার কাছে রেখে দাও। এইটুকুই আমি জোগাড় করতে পেরেছি। খরচ করার জন্য যদি না লাগে ত' ফিরিয়ে দিতে পারবে। এখন তবে চলি। তোমার মুখচোখ কেমন যেন শুকনো লাগছে! শরীর নিশ্চয়ই খারাপ...'

'বিনা প্রতিবাদেই টাকাটা নিলাম। বেশ বুঝতে পারলাম কেন তিনি এটা আমার কাছে রেখে গেলেন।'

'দাঁড়িয়ে থাকতে আমার বেশ কষ্ট হচ্ছে', বললাম আমি।

'নিজের শরীরের দিকে একটু দৃষ্টি রেখো ভায়া, দোহাই তোমার! আজ আর বেরিয়ো না। এ্যানা এ্যানাড্রিয়েভনাকে আমি বলে দেবো' খন তোমার এই অসুস্থ শরীরের কথা। একজন ডাক্তার ডাকলে হয় না। কাল এসে দেখে যাবো'খন কেমন থাকো। আমার চেষ্টা করবো। যদি উটে হেঁটে আসতে পারি। যাক এখন তুমি শুয়ে পড়ো দিকি নি...আমি বরং চলি, চলি কেমন! দেখেছো মেয়েটা পিছন ফিরে রয়েছে! এই রইলো আরও পাঁচ রুবল্। এটা রইলো ওর জন্যে। কিন্তু ওকে বলো না আমি রেখে গেছি তবে ওর জন্যেই খরচ করো। কিছু জামা জুতো কিনে দিও। এসব ওর বড় দরকার। আচ্ছা আসি তাহলে...'

তাঁর সঙ্গে সঙ্গে সদর দরজা পর্যন্ত গেলাম। চাকরটাকে বলে দিলাম বাইরে থেকে কিছু খাবার দাবার এনে দিতে। এলেনারও ত' কিছু খাওয়া হয় নি কিনা।

ছাব্বিশ

ঘরের মধ্যে ফিরে আসতে না আসতেই আমার মাথা ঘুরে গেল ঘরে গেল, ঘরের মাঝখানেই পড়ে গেলাম। আর কিছু মনে নেই এলেনার আতঙ্কিত চীৎকার ছাড়া। হাত দু'টো মুঠো ক'রে সে ছুটে এল আমায় ধরে ফেলার জন্যে। সেই মুহূর্ত অবধি আমার মনে আছে......

যখন চেতনা হোল তখন আমি বিছানায় শুয়ে। এলেনা পরে আমায় বলেছিল চাকরটা আমার কথামত খাবার নিয়ে এলে সে তার সাহায্যে আমায় ধরাধরি ক'রে নিয়ে গিয়ে সোফায় শুইয়ে দেয়। কয়েকবারই আমার ঘুম ভেঙে যায়, প্রতিবারই চোখ মেলে দেখি এলেনা ভীতচকিত ও স্নেহার্ত্ত দৃষ্টি মেলে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে। মনে পড়ে সেসব যেন স্বপ্নে দেখা, সব যেন কুয়াশাচ্ছন্ন, তার মধ্য থেকে ভেসে উঠছে সেই দুর্ভাগা মেয়েটার ভালবাসা-মাখা মুখখানা যেন ছবির মতন। সে যেন কি নিয়ে এলো আমায় খাওয়ানোর জন্যে, বিছানাপত্তর গোছগাছ করে দেয়, তাকিয়ে থাকে আমার দিকে ভয়ার্ত্ত বিহ্বল দৃষ্টিতে, আমার চুলের ফাঁকে আঙুল বুলিয়ে দেয়। মনে পড়ে একবার মুখের ওপর তার কোমল চুম্বন স্পর্শ অনুভব করলাম। আর একবার মাঝরাত্তিরে হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেল, বাতির স্তিমিত আলোয় দেখলাম এলেনা শুয়ে আছে, তার মুখখানি আমারই বালিসের ওপর; হাতের ওপর মুখটি রেখে সে শুয়ে আছে, তার ম্লান ঠোঁট দু'টি উদ্বিগ্ন নিদ্রায় ঈষৎ ফাঁক হয়ে রয়েছে। কিন্তু বেশ ভালো ক'রে জ্ঞান হোলো পরের দিন ভোরে। বাতিটা জ্বলে জ্বলে একদম শেষ হ'য়ে গেছে। প্রথম সূর্য্যোদয়ের রঙ লেগেছে দেওয়ালে। এলেনা তখনও ঘুমিয়ে টেবিলের ধারে ব'সে, তার মাথাটি রয়েছে বাঁ হাতে বালিশের ওপর ভর দেওয়ার মতন। মনে পড়ে, তার শিশুসুলভ মুখখানির দিকে অপলকনেত্রে তাকিয়েছিলাম অনেকক্ষণ। সেই ঘুমের মধ্যেও যেন তার মুখভরা বিষাদ, বিচিত্র বিশীর্ণ সৌন্দর্য্য ঘিরে রয়েছে সেই মুখখানি। ঘন কালো চুলের গোছা, একপাশে আগোছালোভাবে বিন্যাস-করা, আর অপর হাতটি আমার বালিশের ওপর অতি সন্তর্পণে আমি তার সেই ছোট্ট হাতে চুমু খেলাম। কিন্তু তার ঘুম ভাঙে নি, যদিও তার ম্লান ঠোঁট দু'খানিতে ঈষৎ হাসির রেখা। আমি তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। তাকিয়ে থাকতে থাকতে যেন ঘুমে দু'চোখ বুঁজে এলো। এবারের ঘুম ভাঙল দুপুর নাগাদ। যখন ঘুম ভাঙল তখন শরীরটা বেশ ঝরঝরে হয়েছে, তবে দুর্ব্বল ভাবটা সবটুকু কাটে নি। এরকম আমার আগেও হয়েছে। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই এই অসুস্থতা কেটে যায়।

তখন বেলা প্রায় দুপুর। প্রথম যা আমার চোখে পড়লো তা হলো আগের দিন আমি যে পর্দ্দাটা কিনেছিলাম সেটা দড়ি বেঁধে টাঙানো হয়েছে। এলেনাই এই পর্দ্দাটা টাঙিয়েছে ঘরের এক কোণে, যেন নিজের জন্য ছোট একখানি ঘর আলাদা করে নিয়েছে। ষ্টোভের সামনে বসে সে জল গরম করছিল। আমার ঘুম ভেঙেছে জানতে

পেবে আনন্দে সে হাসলো। সঙ্গে সঙ্গেই আমার কাছে এসে হাজির।

তার হাত দু'খানা নিজের হাতের মধ্যে রেখে বললাম।, সারারাত তোমার ঝামেলা গেছে। সত্যি, তোমার শরীরে এত দয়ামায়া আছে তা জানতাম না।'

'কি ক'রে বুঝলে সারারাত তোমার দেখাশোনা ক'রতে কেটেছে? আমার ত মনে হচ্ছে সারারাতই আমি ঘুমিয়েছি,' বললে সে সলজ্জ কৌতুকে সপ্রতিভ হয়ে। যেন নিজের কথাতেই তার মুখখানা লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে।

'ঘুম ভেঙে যেতে তোমায় দেখলাম না। তুমি ঘুমিয়ে পড়েছিলে ভোরের দিকে।'

'চা খাবে?'

আমার কথায় বাধা দেয় সে, যেন আগের কথার জের টানা মুস্কিল হয়ে পড়ে তার পক্ষে।

'বেশ তো! কিন্তু ভাল কথা, কাল তোমার খাওয়া হয়েছিল?'

'দুপুরে কিছু হয় নি, তবে রাত্তিরে হয়েছিল। চাকরটা এনে দিয়েছিলে। কিন্তু তুমি আর বেশী কথা কয়ো না। চুপটি ক'রে শুয়ে থাকো। তুমি কিন্তু এখনও ভাল ক'রে সেরে ওঠো নি,' বললে সে, আমার জন্যে চা এনে আমারই বিছানার ওপর বসে।

'শুয়ে থাকবো চুপটি ক'রে! বেশ, সন্ধ্যে পর্য্যন্ত শুয়েই থাকবো, তারপর কিন্তু বেরুবো। বেরুতে আমায় হবেই লিনোচ্‌কা!'

'তাই নাকি যেতেই হবে! কার সঙ্গে দেখা করতে যাবে? যে ভদ্দরলোক কাল এসেছিলেন, তাঁর কাছে নয় নিশ্চয়ই?'

'না, তাঁর কাছে নয়।'

বেশ, ওঁর কাছে আর যেও না। উনিই ত কাল সব গোলমাল করে দিলেন। তবে কি ওঁর মেয়ের কাছে?'

'ওঁর মেয়ের সম্বন্ধে কি জান?'

'তুমি কাল যা বলছিলে আমি সব শুনেছি,' বললে সে চোখ নামিয়ে। মুখখানা হঠাৎ যেন ব্যাজার হ'য়ে ওঠে। ভুরু কুঁচকে সে তাকায় আমার দিকে।

'বুড়ো বড় বদমেজাজী,' বললে সে।

'কিন্তু তুমি তাঁর সম্বন্ধে কিছুই জান না। লোক হিসেবে তিনি বরং বেশ ভাল।'

'না, না, লোকটা বড় বজ্জাত। আমি সব শুনেছি,' বললে সে বেশ জোর দিয়ে।

'কি শুনেছো?'

'ওর নিজের মেয়েকে উনি ক্ষমা করবেন না...'

'কিন্তু তিনি মেয়েকে খুব ভালবাসেন। মেয়ে কিন্তু ওঁর সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করেছে। তাই তিনি মেয়ের জন্যে অত চিন্তিত আর উতলা।'

'কিন্তু তাকে ক্ষমা করেন না কেন? উনি যদি এখন তাকে ক্ষমা করেন তবুও ওঁর কাছে তার ফিরে আসা উচিত নয়।

'কেন?'

'কেন কি? মেয়ের ভালবাসা পাবার যোগ্য ত উনি নন, বললে সে বেশ রেগে গিয়ে, 'তার চেয়ে মেয়ে বরং বাপকে ছেড়ে দূরে চলে যাক, সে ভিক্ষে করুক আর বুড়ো বসে বসে মেয়ের এই ভিক্ষে করা দেখুক, দেখে দুঃখ পাক।'

তার চোখ দু'টো ঝলসে ওঠে, মুখ হয়ে ওঠে লাল। আমি মনে মনে ভাবি তার এই কথার পেছনে নিশ্চয়ই কোনো কারণ রয়েছে।

'তুমি কি ওরই বাড়ীতে আমাকে পাঠাবে ঠিক করেছো?' বললে সে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর।

'হাঁ, এলেনা।'

'না। তার চেয়ে ঝিয়ের কাজ ক'রে দিন কাটাবো।'

'আঃ! কি সব যা তা বকছো লিনোচ্‌কা! কে তোমায় ঝিয়ের কাজ দেবে?'

'সে কাজ যে কোন চাষীর ঘরে ত পাবোই' ধৈর্য্য হারিয়ে জবাব দিলে সে। তাকে আরও বেশী আশান্ত মনে হয়। অবশ্যই মেজাজটা তখন তার খুবই চড়ে গেছে।

'কাজ করার জন্যে তোমার মতন মেয়ে কোনো

চাষীই চায় না', আমি হেসে বললাম।

'তাহলে কোনো গেরস্তর সংসারে।'

'এই মেজাজ নিয়ে তুমি করবে কাজ গেরস্তর সংসারে'

'হ্যাঁ, তাই।'

যতই সে চটে যায়, ততই তার উত্তর হয়ে উঠে খাপছাড়া।

'কিন্তু তা তুমি পারবে না।'

'হ্যাঁ, আমি পারবো। তারা আমায় বকাবকি করবে এই ত!'

কথার জবাব না দিলেই সব ল্যাঠা চুকে গেল। তারা আমায় মারবে এই ত! আমিও চুপ করে থাকবো, কথাটি বলবো না। মারুক যত পারে কাঁদতে আমি পারবো না। তাতে তারা হয়ত আরও চটে যাবে।'

'সত্যি এলেনা, এত দুঃখ তুমি পেয়েছো, তবু তার জন্যেই তোমার কি গর্ব! অনেক কষ্ট পেয়েছো তুমি না!'

আমি উঠে পড়লাম, গেলাম বড় টেবিলটার ধারে। এলেনা সোফার ওপরেই বসে রইলো স্বপ্নাতুর দৃষ্টিতে মেঝের দিকে তাকিয়ে। তার মুখে কোনো কথা নেই। আমি ভাবতে থাকি আমি যা বলেছি তার জন্যে সে চটে গেলো কিনা। টেবিলের ধারে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই আগের দিনের কেনা বইগুলি খুলে বসলাম যেন অনেকটা নিজের অজ্ঞাতসারে। ক্রমশঃ বইয়ের মধ্যে ডুবে গেলাম। এরকম আমার প্রায়ই হয়। অনেককিছু ভোলবার জন্যে অনেক সময় আমি বই নিয়ে বসি।

'তুমি সবসময় কি এত লেখো?' এলেনা প্রশ্ন করে, ভীরু হাসি মেখে, আস্তে আস্তে টেবিলের ধারে এসে।

'সে অনেক কিছু লিখোচ্‌কা। ওরা আমায় এর জন্যে টাকা দেয় কিনা?

'ওগুলো কি লিখছো, দরখাস্ত?'

'না, দরখাস্ত-টরখাস্ত নয়।'

এই ব'লে আমি যতদূর সম্ভব তাকে বুঝিয়ে দিলাম যে আমি রকমারী গল্প লিখি, আর সেইসব গল্প জুড়ে তৈরী হয় বই, এইসব বইকে বলে উপন্যাস। সে বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে সবকথা শোনে।

'তুমি যা লেখো সবই কি সত্যি?'

'না, আমি বানিয়ে লিখি।'

'যা সত্য নয় তা লেখো কেন?'

'কেন, এই ত পড়ো না। এই বইটা দেখছো ত! আগেই ত দেখেছো বইটা। পড়তে পারো ত তুমি, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'বেশ ত, পড়ে দেখো না। এ বইটা আমারই লেখা।'

'তুমি? বেশ আমি পড়বো'...

সে যেন কিছু বলতে চাইছিলো, যেন বলতে পারলো না, এবং বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠলো। তার এই প্রশ্নের ভিতরে যেন কিছু লুকিয়ে রয়েছে।

'এর জন্য তোমায় অনেক টাকা দেয়?' বললে সে শেষকালে।

'যখন যেমন জোটে। কখনও অনেক বেশী কখনও বিশেষ কিছুই নয়। কারণ সবসময় ত আর লেখা হয়ে ওঠে না। বড় শক্ত কাজ লিখোচ্‌কা।'

'তাহলে তুমি বড়লোক নও?'

'না—না, বড়লোক মোটেই নই।'

'বেশ তাহলে তোমার কাজই আমি করবো, তোমাকে সাহায্য করবো।'

এই বলে সে মুহূর্তের জন্যে একবার আমার দিকে তাকালে। তার চোখে মুখে আভা দেখা দিল, চোখ নামিয়ে নিয়ে দু'পা আমার দিকে এগিয়ে এসে হঠাৎ আমার গলা জড়িয়ে ধরে, এবং আমার বুকের মধ্যে জোর করে মুখ লুকোয়। আমি বিস্ময়-বিহ্বল দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকি।

'আমি তোমায় ভালবাসি...কোনো গর্ব্বই আমার নেই, বললে সে।

'তুমি বললে কাল আমার দম্ভ ছিল। না, না, আমি মোটেই তা নই। একমাত্র তুমিই আমার কথা ভাবো...'

কিন্তু অশ্রুরুদ্ধ হয়ে ওঠে তার কণ্ঠ। মুহূর্ত্তকাল পরেই কান্নায় ভেঙে পড়ে সে আগের দিনের মত। নতজানু হয়ে সে আমার হাতে চুমু খেলে...

'তুমি আমার কথা ভাবো! আবার বললে সে। 'তুমি, শুধু তুমি,।' পা দু'টো আমার জড়িয়ে ধরে সে। এতকাল অবরুদ্ধ তার মনের সমস্ত অনুভূতির আগল খুলে গেলো অকস্মাৎ, বুঝতে পারি বুভুক্ষু হৃদয় তার সমস্ত লুকোচুরির মোহ ত্যাগ করে রিক্ততার লজ্জা ত্যাগ করে উদ্বেল হয়ে উঠেছে, উদ্দাম হয়ে উঠেছে তার মধ্যে ভালবাসার আকাঙ্ক্ষা, প্রকট হয়ে উঠেছে কৃতজ্ঞতা, স্নেহ আর অশ্রু। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে সে কাঁদে, যেন তার মাথার ঠিক নেই। অনেক চেষ্টা করে তার বাহুবন্ধন শিথিল করি, তাকে ধরে তুলি, নিয়ে বসাই সোফার ওপরে। বহুক্ষণ ধরে সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে বালিশে মুখ লুকিয়ে, যেন আমার দিকে তাকাতে লজ্জা পায় সে। কিন্তু তবু আমার হাত নিয়ে সে তার বুকের ওপর চেপে ধরে।

আস্তে আস্তে সে শান্ত হয়, তবু সে মুখ তুলে তাকায় না আমার দিকে। দু'বার তার চোখে চোখ পড়লো। সে চোখে কি অপূর্ব্ব কোমলতা আর অনুভূতির ক্লান্তি। শেষকালে কিন্তু সে লজ্জায় রাঙা হয়ে হেসে ফেলে।

'একটু ভাল বোধ করছো?' জিগ্যেস করলাম আমি, 'কি অভিমানী মেয়ে তুমি লিনোচ্‌কা!'

'না লিনোচ্‌কা নয়...' ফিস্‌ফিস্ ক'রে সে, তখনও কিন্তু আমার কাছ থেকে মুখ লুকিয়ে রেখেছে সে।

'লিনোচ্‌কা নয়? তবে কি?'

'নেলী।'

'নেলী? নেলী হতে যাবে কেন? বেশ তুমি যখন বলছো। নামটা ত ভারী সুন্দর। তোমার যখন ইচ্ছে, আমি ঐ নামেই ডাকবো।

'মা। ঐ নামে আমায় ডাকতো। ও নামে আর কেউ আমায় ডাকে নি। মা ছাড়া আর কেউ না···মা ছাড়া এই নামে আর কেউ আমায় ডাকুক আমি চাইতামও না। কিন্তু তুমি আমায় এই নামে ডাকবে। আমি তাই চাই। আমি তোমায় ভালবাসবো, চিরকাল।'

মনে ভাবলাম, বুকভরা ভালবাসাও আছে, অভিমানও কম নয়। নেলী ব'লে ডাকার অধিকার পেতে এত সময় লাগলো! কিন্তু এখন জানি সে আমার অনেক কাছে এসেছে।

'শোনো নেলী!' বললাম আমি, যখন সে একটু শান্ত হয়েছে, 'তুমি বললে তোমার মা ছাড়া আর কেউ তোমায় ভালোবাসেন নি। কিন্তু তোমার দাদু তোমায় ভালোবাসতেন না, সেটা কি সত্যি?'

'না, ভালোবাসতো না।'

'তবু কিন্তু তুমি তাঁর জন্যে চোখের জল ফেলেছিলে, মনে পড়ে তোমার, ঐ সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে?'

এক মুহূর্ত সে আর কোনো কথা বললে না।

'না, না, দাদু আমায় ভালোবাসতো না···বড় বদ্ লোক ছিল সে।' তার মুখে বেদনার ছায়া ঘনিয়ে ওঠে

'কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে হঠাৎ এই রকম একটা ধারণা করা উচিত নয়, নেলী। আমার মনে হয় বুড়ো বয়সের জন্যে তাঁর ছেলেমানুষী বেড়েছিল। মারা যাবার সময় ত তাঁর মাথার ঠিক ছিল না বলে মনে হয়েছিল। মারা যাবার ব্যাপারটা ত তোমায় বলেইছি।'

'হ্যাঁ, ইদানীং শেষের দিকে তার কেমন যেন সব বিস্মরণ হ'য়ে যাওয়া সুরু হয়েছিল। সারাদিন বসে থাকত এই জায়গাটায় আর আমি যদি তার কাছে না আসতাম তবে দু'তিন দিনই কাটিয়ে দিতো কিছু না খেয়ে, এমনকি জল পর্য্যন্ত নয়! আগে কিন্তু এ রকম ছিল না।'

'আগে মানে?'

'মা মারা যাবার আগে।'

'তাহলে তুমিই তাঁকে খাবার-দাবার এনে দিতে, নেলী?'

'হ্যাঁ, আমিই নিয়ে আসতাম।'

'কোথা থেকে আনতে? মাদাম বুবনভের কাছ থেকে?'

'না, বুবনভের কাছ থেকে আমি কোনদিন কিছু নিই নি।' বললে সে বেশ জোর দিয়ে ধরা গলায়।

'তাহলে পেতে কোথা থেকে? তোমার নিজের ত কিছু ছিল না, ছিল কী?' নেলীর সর্ব্বশরীর যেন আচমকা ফ্যাকাশে হ'য়ে গেল, সে কোন কথা বললে না। শুধু আমার দিকে দীর্ঘ আয়ত দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইলো।

'আমি ভিক্ষে করতাম রাস্তায় রাস্তায়...·· হাতে পয়সা হলে তাকে রুটি আর নস্যি কিনে দিয়ে আসতাম······'

'আর তিনি তোমায় ভিক্ষে করতে দিতেন! নেলী! নেলী!!'

'প্রথম প্রথম আমি ভিক্ষে করতাম তাকে না বলেই, কিন্তু বুড়ো যখন জানতে পেরে গেলো তখন সে নিজেই আমায় পাঠিয়ে দিতো এই কাজে। ঐ পোলের ধারে দাঁড়িয়ে আমি ভিক্ষে চাইতাম পথচলা লোকের কাছে, আর বুড়ো তখন পোলের আসপাশেই পায়চারি করত। যখনি দেখত, আমি কিছু পেয়েছি তখনই ছুটে এসে পয়সাক'টা নিয়ে নিতো, যেন আমি সে পয়সাগুলো তার কাছ থেকে লুকোতে চাইছি, যেন তাকে সেগুলো দোবো না।'

বলতে বলতে সে হাসল, বিদ্রূপভরা তিক্ত, বিকৃত সে হাসি।

'কিন্তু এ সবই মা মারা যাবার পরের ঘটনা তারপরই বুড়োর মাথার গোলমাল সুরু হোলো, বোঝা গেলো,' বললে সে।

'তিনি নিশ্চয়ই তাহলে তোমার মাকে খুব ভালো-বাসতেন। কিন্তু তিনি তোমার মায়ের সঙ্গে থাকতেন না কেন?'

'না, আমার মাকে বুড়ো কোনদিন ভালোবাসতো, না······সে ছিল ভারী বজ্জাত, মাকে সে কোনদিন ক্ষমা করতে পারে নি......ঠিক তোমার কালকের ঐ বজ্জাত বুড়োর মতন,' বললে সে খুব আস্তে, প্রায় চুপি চুপি, ব'লেই যেন সে আরও নিষ্প্রভ হ'য়ে গেলো।

আমি সুরু করলাম এবার। গোটা একখানি নাটকের কাহিনী যেন আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। ভাগ্যাহতা সেই স্ত্রীলোকের নিঃসঙ্গ অবস্থায় অন্ধকূপে রিক্ত জীবনাবসান, তাঁর অনাথ শিশু মাঝে মাঝে দেখে আসে তার বুড়ো দাদুকে, যে দাদু তার মাকে সারাজীবন দিয়েছে অভিশাপ, বিকৃত-মস্তিষ্ক সেই বুড়ো যে তার কুকুরটা মারা যাওয়ার পর কাফিখানায় নিজেও মৃত্যুপথযাত্রী।

'আজোরকা ছিল আমার মায়ের পোষমানা কুকুর,' বললে নেলী হঠাৎ কিসের একটা পুরোনো স্মৃতি মনে পড়ে যাওয়ায়, হাসি মুখে। 'এক সময় দাদু কিন্তু মাকে খুব ভালোবাসতো। মা যখন তাকে ছেড়ে চলে গেল, আজোরকা রয়েই গেল বুড়োর সঙ্গে। তাইতেই বুড়ো আজোরকাকে অত ভালোবাসতো। মাকে সে ক্ষমা করে নি কিন্তু কুকুরটা যেই মারা গেল, সেও আর বাঁচলো না', বললে নেলী কর্কশভাবে, তার মুখের হাসি তখন মিলিয়ে গেছে।

'আচ্ছা, নেলী, আগে তিনি কি করতেন?' আমি জিগ্যেস করলাম তাকে খানিকক্ষণ চুপ করে থাকার পর।

'বুড়ো বড়লোক ছিল খুব·····কি করতো আমি ঠিক জানি না। তবে কিসের যেন একটা কারখানা ছিল। এই কথাই মা আমাকে বলেছিল। প্রথম প্রথম মা ভাবতো আমি খুব ছোট কিনা তাই আমায় সবকথা বলতো না। আমায় আদর করে বলতো, 'পরে সব জানতে পারবে, সময় এলে সব জানতে পারবে মা।' মা আমায় সবসময় বলতো, আমার বরাৎ মন্দ। আবার কখনও বা রাত্রে আমি ঘুমিয়ে পড়েছি মনে করে (যদিও আমি ইচ্ছে করেই ঘুমিয়ে পড়ার ভান করতাম) মা আমার পাশে এসে আমার ওপর ঝুঁকে পড়ে আমায় চুমু খেয়ে কেবলই কাঁদতো আর বলতো সবই তোমার কপালের দোষ মা!'

'তোমার মা কিসে মারা গেলেন?'

'যক্ষ্মায়। মারা গেছে মাস দেড়েক আগে।'

'তোমার দাদু যখন বেশ বড়লোক ছিলেন, তখনকার কথা তোমার মনে পড়ে?'

'আমি তখন জন্মাই নি যে? দাদুকে ছেড়ে মা চলে এসেছিল আমার জন্মের আগেই।'

'কার সঙ্গে তিনি চলে গিয়েছিলেন?'

'তা আমি জানি না,' বললে নেলী আস্তে, যেন সে বলতে দ্বিধাবোধ করছিল। 'মা চলে যায় বিদেশে, সেখানেই আমার জন্ম'।

'বিদেশে? কোথায়?'

'সুইজারল্যাণ্ডে। আমি অনেক দেশ দেখেছি।

ইটালীতে ছিলাম, প্যারিসেও গেছি।'

'আমি অবাক হয়ে গেলাম।

'তোমার সব মনে আছে নেলী?'

'অনেক কথাই আমার মনে আছে।'

'কিন্তু তুমি রুশভাষা এতো ভালো জানলে কি করে নেলী?'

'তখনই ত মা আমায় এই ভাষা শেখাতো। মা ত রাশিয়ানই ছিল, কারণ আমার মায়ের মা ছিল রাশিয়ান কিন্তু দাদু ছিল ইংরেজ, কিন্তু সেও ছিল প্রবহু রাশিয়ানদেরই মতো। বছর দেড়েক আগে যখন আমরা রাশিয়ায় এলাম তখন আমি রুশ ভাষা ভালভাবেই শিখে ফেলি। মা তখনই অসুস্থ হ'য়ে পড়েছিল। আমাদের অবস্থাও ক্রমশঃ খারাপ হ'য়ে আসে, মা সবসময় কান্নাকাটি করতো। প্রথম দিকে বহুদিন ধরে এখানে পিটার্সবুর্গে দাদুর খোঁজ খবর করেছিল, আর কেবলই কাঁদতো, দাদুর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছে বলে। সে কি কান্না! তারপর যখন জানতে পারলো দাদুর টাকাকড়ির টানাটানির কথা তখন তার দুঃখের আর সীমা রইল না। প্রায় চিঠি লিখতো দাদুকে কিন্তু দাদু কোন জবাব দিত না।'

'তোমার মা তবে ফিরে এলেন কেন এখানে? তোমার দাদুকে দেখতে শুধু?'

'তা আমি জানি না। কিন্তু তার আগেই বেশ সুখেই ছিলাম,' বলতে বলতে নেলীর চোখ দু'টো জলে ওঠে, 'মা থাকতো একা আমাকে নিয়ে ...র এক বন্ধু ছিল, তোমারই মত তাঁর দয়ামায়া। মা চলে আসার আগে থেকেই তিনি মাকে জানতেন। কিন্তু তিনি সেখানে মারা যান আর তার পরেই মা চলে আসে......'

'তোমার মা তাহলে তাঁর সঙ্গে চলে গিয়েছিলেন তোমার দাদুকে ছেড়ে?'

'না না, তাঁর সঙ্গে না, মা চলে গিয়েছিল অন্য আর একজনের সঙ্গে; আর সে লোকটা মাকে ত্যাগ করে চলে যায়......'

'কে বলো ত তিনি নেলী?'

নেলী একবার আমার দিকে তাকিয়ে নিলে, কোন কথা বললে না। যে ভদ্রলোকের সঙ্গে তার মা চলে গিয়েছিলেন, আর যিনি খুব সম্ভবতঃ তার বাবা—তাঁর নাম নেলী নিশ্চয়ই জানতো আমার কাছেও সে নাম বলতে তার কষ্ট হয়।

প্রশ্ন করে তাকে ব্যতিব্যস্ত করতে চাই না। অদ্ভুত তার চরিত্র, এক দিকে জলে ওঠে, আবার ভয়ে কেঁপে ওঠে, যদিও মনের অনুভূতি সে চেপে রাখে মনে মনেই। তাকে ভাল লাগে যদিও সে ভীষণ চাপা এবং অভিমানী। সে আমায় ভালোবাসে সমস্ত অন্তর দিয়ে, সে ভালোবাসা যেমন অকপট তেমনি স্বতঃস্ফূর্ত, সে মায়ের কথা বলতে সে বেদনার্ত হ'য়ে ওঠে—তাঁকে যতখানি ভালোবাসতো অনেকটা সেই রকমই ভালোবাসা তার আমার ওপর। তবু আমি যেদিন থেকে তাকে জেনেছি সেদিন থেকে সে এত খোলাখুলিভাবে আমাকে বলে নি। আর তখনও অবধি তার অতীতের স্মৃতি আমার কাছে উজাড় করে দেবার জন্যে এতটা ব্যাকুল এবং বিচলিত হয় নি। ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে থেকে থেকে সে বলে গেল তার বঞ্চিত লাঞ্ছিত জীবনের সেই বক্ষক্ষরা কাহিনী যা তার স্মৃতিকে পর্যাপ্ত বিপর্যস্ত করে তোলে। তার সেই রোদনভরা কাহিনী আমি ভুলবো না কোন দিন, কিন্তু সে কাহিনীর অধিকাংশই বলা হতে পারে......

সে কাহিনী বিভীষিকাময়। পরিত্যক্তা নারীর সে কাহিনী সুখস্বপ্নের স্মৃতিটুকু মুছে যাওয়ার পরও যাকে জীবনের জের টেনে চলতে হয়, বিক্ত, নিঃস্ব, ক্লান্ত দুনিয়ায় সবাই তাকে ছেড়ে চলে গেছে, ছেড়ে গেছে সেও যার ভরসায় যার মুখ চেয়ে সে পথ চলেছিল। নৈরাশ্যজর্জরিতা নারীর সে কাহিনী, চলেছে সে পিটার্সবুর্গের পঙ্কিল হিমশীতল রাস্তা দিয়ে ভিক্ষাপাত্র হাতে তার ছোট মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে। সেই নির্য্যাতিতা, উপেক্ষিতার কাহিনী যাকে অন্ধকূপের মাঝে কাটাতে হয়েছে মাসের পর মাস মৃত্যুর পথ চেয়ে, তবু সে বাপের ক্ষমা পায় নি জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত। সেই চরম মুহূর্ত্তে যখন বাপের কঠিন হৃদয় টললো তখন তিনি ছুটে গেলেন ক্ষমাসুন্দর প্রত্যাশা নিয়ে কিন্তু দেখা হোল তার নিস্পন্দ মৃতদেহের সঙ্গে—একদিন

যে ছিল পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশী প্রিয় প্রাণের চেয়েও প্রিয়।

বিকৃতমস্তিষ্ক বৃদ্ধের সঙ্গে তাঁর বালিকা নাতনীর দুর্জ্ঞেয় দুর্বোধ্য সম্বন্ধের রহস্যভরা কাহিনী। সেই ভাগ্যবঞ্চিতা মেয়েটি বৃদ্ধকে ভালভাবেই বোঝে, বোঝে সে আরো অনেক কিছুই যা অত অল্প বয়সে বোঝবার নয়। বঞ্চনার ইতিহাস, বেদনার কাহিনী লোকলোচনের অন্তরালে ঘটে যাওয়া বিয়োগ-বিধুর একখানি নাটক। সে নাটক ঘটেছে পিটার্সবুর্গের আকাশের তলায়, ঘটেছে বিরাট গোপন অন্ধকারে, ঘটেছে উপছে-পড়া জীবনের প্রাচুর্য্যের মধ্যে, ঘটেছে গোপন পাপ আর অতর্কিত অন্যায়ের মধ্যে, ঘটেছে উদ্দাম অস্বাভাবিক জীবনের নরককুণ্ডে......

কিন্তু সে কাহিনী পরে বলা যাবে......

[চলবে।

ডস্টয়ভস্কি থেকে অনূদিত

তরুণ-তরুণীদের চিত্তের ওপর চলচ্চিত্রের প্রভাব অত্যন্ত বেশী। কাজেই ফিল্মে ন্যাকামী পরিবেশন করলে সে ন্যাকামীর প্রভাব ছেলেমেয়েদের ওপর পড়বেই।

ফিল্মের প্রভাব লোকের ওপর এতই বেশী যে নামের মানে খুঁজে পাওয়া না গেলেও নতুন ধরণের শাড়ী বা সন্দেশের 'ভাগ্যচক্র,' 'মানে-না-মানা', 'দেনা-পাওনা' ইত্যাদি নামকরণ করতে ব্যবসায়ীদের বাধে না, খরিদ-দারবাও তা মেনে নেন-এমনকি এতে বরং বেশী খুসী হন! 'সে নিল বিদায় ঘি' বা 'সন্ধ্যা-বেলার রূপকথা ফেনাইল' এখনও বাজারে দেখা দেয় নি; হয়তো দেবে অচিরে। এবং দেখা দিলে লোকেও তা মেনে নেবে।

মেনে না নিয়েই বা উপায় কী? যে নামে যেটাকে চালাতে চেষ্টা করা হবে সেই নামেই তো সে চলবে। 'ছায়া-দিলো বাণী' নামে যে চিত্র-প্রতিষ্ঠান নিজেকে পরিচিত করতে চান তাকে তো সেই নামেই লোকে অভিহিত করবে! তা সেটা পছন্দ হোক আর না হোক।

কিন্তু মুস্কিল বাধে তখন, যখন এইরকম নামকরণকেই লোকে খুব বাহাদুরীর পরিচয় বলে মনে করে। ভাবে, বায়োস্কোপে যখন এই রকম নাম চালু হ'য়েছে তখন এইটাই নিশ্চয় প্রশংসনীয়, আধুনিকতার চরম লক্ষণ।

শুধু নামে নয়, জীবনযাত্রার প্রতিটি ক্ষেত্রে যেসব ধরণ-ধারণ চাল-চলনের নমুনা চলচ্চিত্র মারফৎ পরিবেশন করা হয় তরুণ জনচিত্তের ওপর তার প্রভাবও অত্যন্ত বেশী। কাজেই এসবের মধ্যে দিয়েও অবাঞ্ছিত কৃত্রিমতা তরুণ জনসমাজে সংক্রমিত হয়। বিশদভাবে না হ'লেও নমুনা হিসেবে এর মধ্যে দু'একটির উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। যেমন পোষাক-পরিচ্ছদ।

অমাদের গরম দেশে পুরুষদের পোষাক-বাহুল্যটা স্বাভাবিক নয়। সাধারণ লোকদের কথা দূরে থাক্, অত্যন্ত ধনী ব্যক্তিরাও রাত্রে ঘুমোবার সময় চওড়া-চওড়া ডোরাটানা কাপড়ের তৈরী পা'জামা ও কলারবিহীন কোট পরে নিদ্রা যেতে অভ্যস্ত নন। কিন্তু আমাদের চলচ্চিত্র জগতে এটাকে অত্যন্ত সাধারণ একটা জিনিষ হিসেবেই দেখানো হ'য়ে থাকে হরদম। তার ফলে বাস্তব জীবনে আজকাল তরুণদের মধ্যে এ ফ্যাশনটাও ধীরে ধীরে ঢুকে পড়ছে। দরিদ্র দেশে এই অনাবশ্যক ব্যয় সমাজ জীবনের ওপর অতিরিক্ত একটা ভার চাপিয়ে দিয়েছে। ফিল্মের মাধ্যমে প্রবর্তিত এই অত্যাচার আজ ঋণগ্রস্ত শ্বশুরদের কাঁধে অতিরিক্ত পীড়ার সঞ্চার ক'রছে। এখন 'তত্ত্বে'র উপহারের তালিকায় একপ্রস্থ স্লীপিং স্যুট এবং একটা ড্রেসিং গাউন প্রায় অপরিহার্য্য!

ফিল্মে ন্যাকামী

শ্রীচিত্রগুপ্ত

ফিল্ম কর্তৃক প্রবর্তিত মেয়েদের কতকগুলি অনাবশ্যক, অসুবিধাজনক, এমনকি অস্বাস্থ্যকর এবং সুরুচিবিরুদ্ধ ফ্যাশন যেমন:—হাত পায়ের আঙুলে বড় বড় সূচোলো নখ রাখা, বদ্ রঙে নখ ও ঠোঁটের বাড়াবাড়ি রকমে রঞ্জিত করা, নানারকম অদ্ভুত ধরণের কেশবিন্যাস ইত্যাদির কথা না হয় বাদই দেওয়া গেল। বাইরের নানা ব্যাপারে কর্ম্মব্যস্ত মেয়েদের পক্ষে হাতব্যাগ একটা অত্যাবশ্যক বস্তু সন্দেহ নেই। কিন্তু বিনা প্রয়োজনে কেবলমাত্র ফ্যাশন হিসেবেই একটা অদ্ভুত ধরণের চটকদার ব্যাগ বহন করার একটা বিস্ময়কর ঝোঁকের আমদানী আমাদের মেয়েদের মধ্যে হয়েছে প্রধানতঃ ফিল্মের সাহায্যে। প্রয়োজনে এক বা একাধিক হাতব্যাগের ব্যবহার যেমন সমর্থনযোগ্য—অপ্রয়োজনে এক আলমারী রকমারী ব্যাগ জমায়েত করার বিদ্‌ঘুটে নেশা তেমনিই নিন্দনীয়।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনের নিত্যব্যবহার্য ভাষা, আমাদের ঘরে ঘরে অতিপ্রচলিত সঙ্গীত ইত্যাদির ওপরও আমাদের ফিল্ম প্রবর্তিত ন্যাকামী অনিবার্যরকম প্রভাব বিস্তার ক'রছে। বলা বাহুল্য—সে প্রভাব গৌরবের নয়, নিতান্তই গ্লানিকর। কাঁচা লেখকের ত্রুটিবহুল ন্যাকা ন্যাকা ভাষা এবং কল্পনাশক্তিবিহীন গীতিকার ও সঙ্গীত-পরিচালকের যুগ্মসৃষ্টি অতি দীন এবং রুচিবিরুদ্ধ ফিল্ম সঙ্গীতগুলি শুধু ফিল্ম মাধ্যমে প্রচারিত ব'লেই

আমাদের তরুণ সমাজের রুচি ও পছন্দকে অত্যন্ত প্রভাবিত ক'রছে। জাতীয় সংস্কৃতির 'মান'কে নিম্নমুখী করে দেয় ব'লেই এটা অবাঞ্ছনীয়। বলাই বাহুল্য আমাদের জাতীয় রুচি ও সংস্কৃতিকে এই ভাবে নিম্নগামী ক'রে তোলার জন্যে আমাদের চলচ্চিত্র নির্মাতাদের অনেকের দায়িত্বজ্ঞানহীনতাই প্রধাণতঃ দায়ী

এম পি প্রোডাকসন্সের আগামী চিত্র-নিবেদন 'বিদ্যাসাগর'এ নাম ভূমিকার রূপসজ্জায় পাহাড়ী সান্যাল ও রামকৃষ্ণরূপে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
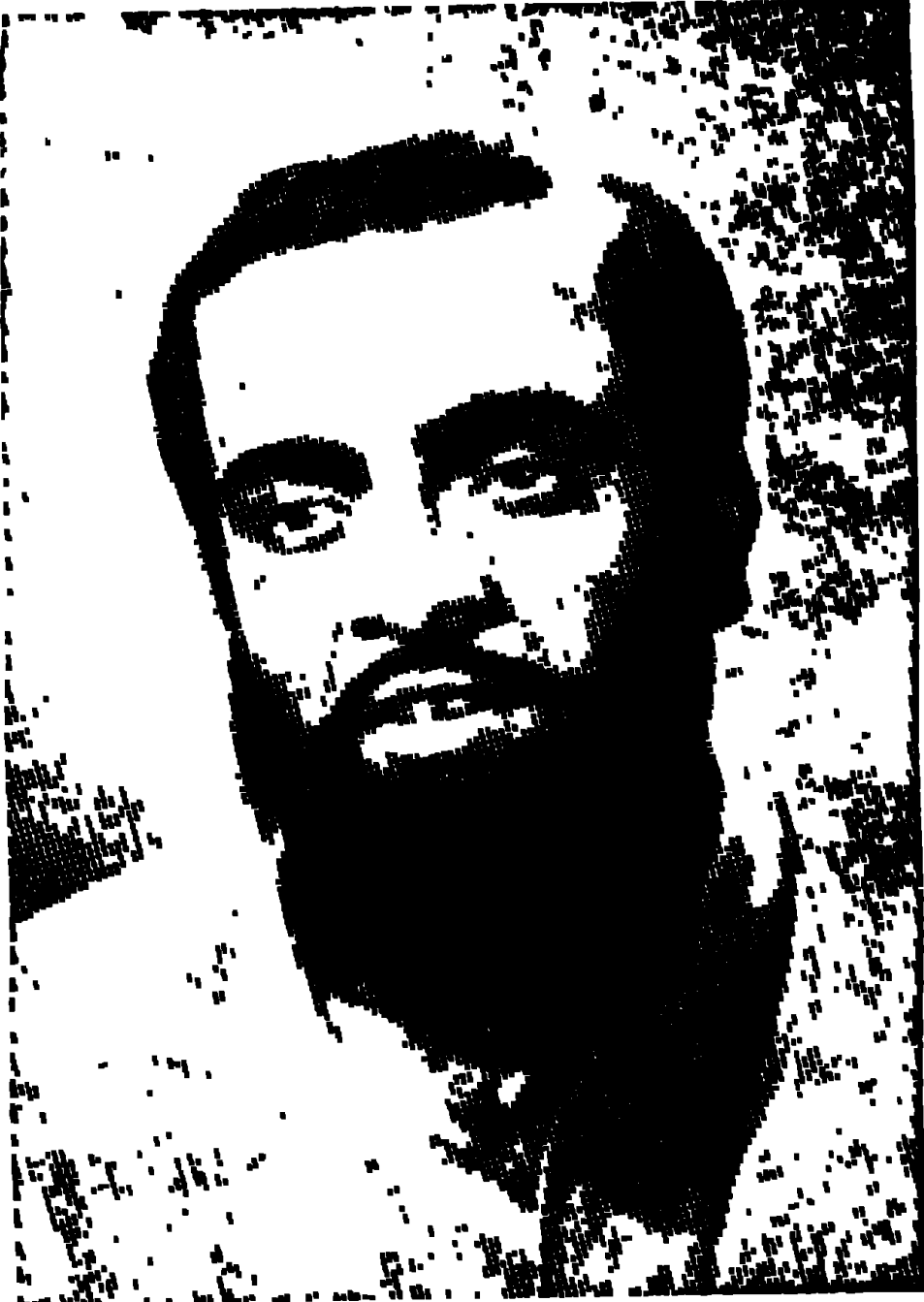
সবচেয়ে ক্ষতিকর প্রভাব—যা' আমাদের ফিল্মগুলির দ্বারা তরুণ সমাজের চিত্তের ওপর বিস্তৃত হচ্ছে—তা হোলো 'প্রেম' ও 'জীবন দর্শন' সম্পর্কে একেবারে ভ্রান্ত ধারণা প্রচারের প্রভাব। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উদার ও বলিষ্ঠ ধরণের প্রকৃত প্রেমকে চিত্রিত করবার ক্ষমতার অভাবে আমাদের চিত্রসংশ্লিষ্ট সবরকমের স্রষ্টারা দুর্বল এবং নিকৃষ্ট ন্যাকামীকেই আদর্শ সৃষ্টি হিসাবে চিত্রায়িত করেছেন। চিত্রসংশ্লিষ্ট দুর্বল লেখক, অযোগ্য পরিচালক ও সুশিক্ষা-বিহীন শিল্পীদের সমবেত অক্ষমতাই এজন্য দায়ী। ভুল 'জীবন দর্শন' প্রচারের ফলে তরুণ ছেলে-মেয়েদের মনে বিবেকবুদ্ধিহীন, দায়িত্বজ্ঞানহীন, নিতান্ত দুর্বল প্রকৃতির নায়কের সমাজ কল্যাণের পরিপন্থী জীবন-যাত্রা ও কার্যকলাপই 'আদর্শ' হিসেবে প্রতিভাত হয়। লেখকের অক্ষম ও নির্বোধ কল্পনার মেরুদণ্ডবিহীন অপদার্থ নায়কের মুখ দিয়ে উচ্ছ্বসিত ভাবল্যের সঙ্গে উচ্চারিত হয় চাবাক দর্শনের চটকদার বুলি। ফলে যে নায়কের চিত্রিত হওয়া উচিত ছিল Villain রূপে সে তরুণদের মনে মোহজাল বিস্তার করে Hero রূপে। এই সর্বনাশা প্রভাবকে রোধ করবার সমস্ত ক্ষমতা 'বোর্ড অব্ ফিল্ম সেন্সর'এর হাতে থাকা কোনমতেই সম্ভবপর হতে পাবে না—এইটাই হ'চ্ছে সবচেয়ে আশঙ্কার কথা। আইনমতে রুচিবিরুদ্ধ মনে হ'লে সেন্সর বোর্ড বড় জোর 'U'-এর বদলে 'A' certificate দিয়ে একটি ছবিকে তরুণদের দর্শনের অযোগ্য ব'লে নির্দেশ দিতে পারেন। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ত' উপরে বর্ণিত ত্রুটিগুলি আইনের বাধার আওতায় আদৌ আসে না!

তাই সমস্যাটা শেষ পর্য্যন্ত সমস্যা হিসেবেই থেকে যাবার সম্ভাবনাটা সমধিক বলে মনে হচ্ছে।

কিম্বা এমনটা কি আশা করা যেতে পারে যে, বিচক্ষণ, স্থিতধী এবং নির্ভীক পরিচালক ধনী প্রযোজকের বন্ধুর অক্ষম প্রচেষ্টায় সৃষ্ট কাহিনীটি সরাসরি ফেরৎ দিয়ে বলবেন—আপনার এ trash কাহিনী বা চিত্রনাট্য চলবে না মশাই—এ অস্বাভাবিক, এ মিথ্যা এবং এ সর্বনাশা। এ ছবিতে হাত দিয়ে আমি আমার সুনামকে কলঙ্কিত করতে চাই না।

যদি তা সম্ভব হয় তবেই বোধ হয় ফিল্ম মারফৎ বিষ পরিবেশন বন্ধের একটা সুরাহা হতে পারে। নচেৎ নয়।

খ ব রা খ ব র

কৃত্রিম সৌন্দর্য্য ও চিত্রতারকা

হলিউডের নানাপ্রকার ফ্যাসানের প্রবর্ত্তক জিন লুই যে কোন ধরণের কৃত্রিম সৌন্দর্যচর্চ্চার বিরোধী।

'কোন অভিনেত্রীর যদি প্রকৃত প্রতিভা থাকে তবে তাঁর পক্ষে নিছক দৈহিক পসরার আকর্ষণে জনপ্রিয় হবার দরকার করে না'—এই হলো লুই-এর অভিমত।

কলম্বিয়া ষ্টুডিওর অভিনেত্রীদের পোষাক-পরিচ্ছদের প্রধান নির্দ্দেশক হলেন লুই আর তাঁর মত হলো একজন অভিনেত্রীকে আকর্ষণীয়া ক'রে তোলার চেয়ে তাঁকে সৌন্দর্য্যহীনা করা আরও কঠিন কাজ।

তিনি সবচেয়ে বেশী পছন্দ করেন জিঞ্জার রজার্সকে। তিনি বলেন, 'জিঞ্জার রজার্সের দৈহিক গঠন সম্পূর্ণ নিখুঁত।' লুই ছ'বছর হলিউডের সঙ্গে জড়িত আছেন আর এখন তাঁর কাজ হলো পৃথিবীর রূপলাবণ্যময়ী মেয়েদের জন্যে চোখ ঝলসানো পোষাক পরিচ্ছদ পরিকল্পনা করা।

লুই বলেন, 'ডরোথি লেমুর হলেন সবচেয়ে প্রিয় চিত্রতারকা। আমাদের এই বিভাগে পঞ্চাশ জন দর্জ্জি, সূক্ষ্ম কারুকার্য্য তোলার কর্ম্মীরা তাকেই সবচেয়ে বেশী পছন্দ করেন।'

রোসালিণ্ড রাসেল আর আইরিন ডানও অকুণ্ঠ প্রশংসা পেয়ে থাকেন।

লুই বেশ সদর্পেই বলেন যে সকল অভিনেত্রীই সুন্দর।

রিটা হেওয়ার্থ আঁটোসাঁটো জামা-কাপড় পছন্দ করেন না আর জেনিফার জোন্স্ ত' একদম সইতেই পারেন না। কিন্তু সমস্ত অভিনেত্রীই পোষাক-আষাক সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন আর এ বিষয়ে তাঁদের সহযোগিতাও পাওয়া যায়। মোটের ওপর এটা তাঁরা বোঝেন যে পোষাক পরিচ্ছদে কৃত্রিম রূপলাবণ্য ফুটে ওঠে—কোন্ মেয়েই না চায় তাকে রূপলাবণ্যময়ী দেখাক, বলুন? এই হলো লুই-এর বক্তব্য।

লিণ্ডা ডার্নেল কখন কশাঘাতে জর্জ্জরিত হন—জানেন?

টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী ফক্সের No Way Out ছবিটি এখন তোলা হচ্ছে, এই ছবিতে লিণ্ডা ডার্ণেলকে বেকসুর ভুগতে হয়েছে।

একটী মারামারির দৃশ্যগ্রহণের সময় অভিনেতা বার্ট ফ্রিড একটী শিকল দিয়ে তাঁকে এমন আঘাত করেন যে তাতে লিণ্ডার ঠোঁট দুটী ও নাক ফুলে ওঠে আর চোখে কালসিটে পড়ে যায়! দৃশ্যগ্রহণের বিরতির সময় ক্ষতস্থানে বরফ লাগাচ্ছেন আর নীরবে সব সহ্য করে যাচ্ছেন, আর মনে মনে ভাবছেন কশাঘাতের চিহ্নগুলি পর্দ্দার ওপর বেশ নাটকীয় ভাবেই ফুটে উঠবে।

এখন তিনি জানতে পারেন কশাঘাতচিহ্নসহ ঐ দৃশ্য-গুলি বাদ দেওয়া হয়েছে আর তার চেয়ে অনেক কম চিত্তচমকপ্রদ দৃশ্যের মধ্যে হাতে শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে থাকার দৃশ্যটিই সংযোজিত হয়েছে। এতে তিনি খুব অবাক হয়েই প্রযোজক ড্যারিল এফ্, জ্যানুককে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারেন—যতবারই নিশানা ভুল হয়ে শৃঙ্খলটী তার মুখের ওপর পড়েছে, ততবারই বার্ট ফ্রীড চীৎকার করে উঠেছেন—'...... আমি দুঃখিত।' কিন্তু সে জায়গায় সংলাপ ছিল, 'কি হোল? তোমার খুব লেগেছে?'

যদি তিনি আমাকে আঘাত করেও অত সুন্দরভাবে ক্ষমা প্রার্থনা না করতেন অথবা দৃশ্যগ্রহণ শেষ হওয়া পর্য্যন্তও অপেক্ষা করতেন তাহলে হয়তো দৃশ্যটি ছবিতে থাকতো। কিন্তু এখন আমার কালসিটে পড়া মুখ দেখলে সেটের কর্ম্মীরা ছাড়া আর কেউই বিশ্বাস করবেন না যে ছবি তোলার খাতিরে মার খেয়েই আমার এমন হয়েছে। লিণ্ডার আর আপশোষের শেষ নেই!

পুরুষ বা স্ত্রী হওয়া নিজের ইচ্ছাধীন!

নিউইয়র্কস্থিত সিটি কলেজের ফিল্ম ইন্সটিটিউট 'হরমোন্স্' (Hormones) ছবিটির সর্ব্বশেষ দৃশ্যগুলির চিত্রগ্রহণে ব্যস্ত। এই ধরণের ছবি এর আগে আর তোলা হয় নি।

ছবিটির কাহিনীতেও নতুনত্ব আছে। এক প্রফেসার যাদুবিদ্যার সাহায্যে একজন পুরুষকে স্ত্রীলোকে পরিণত করতে পারেন বা স্ত্রীলোককে পুরুষে পরিণত করতে পারেন। তিনি যাদুবলে একজনকে হুইস্কীর বোতলে ভর্ত্তি করেন। এক পকেটমার বোতলটি সর্দ্দারের কাছে নিয়ে যায়। তার সর্দ্দার কোনোরকম কিছু সন্দেহ না করে সেটি পান করে, সঙ্গে সঙ্গেই সে স্ত্রীলোকে পরিণত

হয়—তখনও তাদের মুখে চুরুট লেগে আছে। সেই দলের লোকরা জানতে পারে যে তারা যদি প্রফেসারের অপর যাদু-রসায়নটি কোনক্রমে হস্তগত ক'রতে পারে তাহলে তাদের অপরাধমূলক কার্য্যাদি বেশ সুন্দরভাবে চালিয়ে যেতে পারে। শেষে একটি সুন্দরী মেয়ে অপর রসায়নটি চুরি করলো। তারপর থেকে সেই দলটি তাদের কার্য্যাদি বেশ চালিয়ে যেতে লাগলো আর তারপর ধরা পড়ার মুখে স্ত্রীলোকে পরিণত হয়ে যেতো।

কে মোরে রোধিবে ?

ইনগ্রীড বার্গম্যানের খবর ইতালীয় চিত্রপরিচালক রবার্টো রোসেলিনীর দৌলতে আজকাল খবরের কাগজে প্রায়ই পাওয়া যায়।

সম্প্রতি তাঁর স্বামী ডাঃ পিটার লিণ্ডস্ট্রম ইনগ্রীডকে বিবাহ বন্ধন থেকে মুক্তি দিয়েছেন। বিবাহ বিচ্ছেদ সংক্রান্ত মামলাটি মেক্সিকার জুয়ারেজ নামক সহরে নিষ্পত্তি হয়েছে। ডাঃ পিটার লিণ্ডসট্রম এই বলে অভিযোগ করেছেন যে তাঁর স্ত্রী তাঁর প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছেন এবং তাঁকে ত্যাগ করে চলে গেছেন। তিনি কোর্টের কাছে আরো একটি অনুরোধ জানিয়েছেন যে কোর্ট তাঁর বারো বছরের মেয়ে পিয়াকে মেক্সিকোর বাইরে নিয়ে যেতে যেন অনুমতি না দেন, এবং তাঁর আর ইনগ্রীডের দুজনের নামে এক সঙ্গে যে দু'লক্ষ পঞ্চাশ হাজার ডলার জমা আছে তাও যেন ভাগ করে দেওয়া হয়।

ইনগ্রীড এখন তাঁর নবজাত সন্তানের পিতা রবার্টো রোসেলিনীকে বিনা বাধায় বিবাহ করতে পারেন। প্রকাশ যে, ইনগ্রীড বলেছেন—'আমি এতে খুব খুসী হয়েছি। আমরা এখন নতুন করে জীবন আরম্ভ করতে পারি।'

খুনের দায়ে ছায়াছবি !

মার্সেলিস্-এর নিকটবর্ত্তী সেটের অধিবাসী কারমেলা কেল্টিকলীয় নামে ১০৪ বছরের এক বৃদ্ধাকে ডাক্তার সিনেমা দেখতে বারণ করাতে তিনি বলেছিলেন 'যে তা-হোলে বেঁচে থেকে আর লাভ কি!' কিছুদিন বাদেই বৃদ্ধা মারা গেলেন। তবেই বুঝুন ১০৪ বছর বয়স্কদেরও সিনেমা উত্তেজনা এবং আনন্দের খোরাক জোগাতে পারে।

কার জনপ্রিয়তা বেশী—নেহেরুর না সুরাইয়ার ?

মধ্য প্রদেশ রাজ্যের এক মিউনিসিপ্যালিটীর ছয়জন সদস্য একটি প্রস্তাব এনেছেন যে স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটীর বাজার, 'নেহেরু বাজারের' নাম পালটে 'সুরাইয়া বাজার' রাখা হোক।

অন্ধকারের আড়ালে

হালে মিশরের চিত্রগৃহে অবিবাহিত স্ত্রী পুরুষের জোড় বেধে আসার সংখ্যা এত অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে যে তাতে চিত্রগৃহের মালিকরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছেন। মিশরের স্ত্রীলোকদের এই অতি-আধুনিকতা বন্ধ করার জন্যে মোলাইয়ের (মিশরের একটি সহর) চিত্রগৃহের মালিকরা স্ত্রীলোকদের চিত্রগৃহে প্রবেশ নিষিদ্ধ করেছিলেন। স্ত্রীলোকরা কেবলমাত্র তাঁদের স্বামীর সঙ্গে আসতে পাবেন। অবশ্য সেই ক্ষেত্রে স্বামীদের বিবাহের পরিচয়পত্র দেখাতে হবে।

যথাশীঘ্র নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগ করার কারণ ঘটে বিদেশী কাগজে প্রকাশিত মিশরীয় স্ত্রীলোকদের মধ্যে অতি-আধুনিকতার প্রসার সংক্রান্ত একটি গল্প মিশরের সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ায়।

গল্পটি এইরূপ :—একজন বিদেশী মহিলা সাংবাদিক কায়রোর কোন এক চিত্রগৃহে ম্যাটিনী শো দেখতে গেছেন। প্রেক্ষাগৃহে প্রবেশ করে দেখলেন, প্রেক্ষাগৃহ পরিপূর্ণ। হঠাৎ ছবি দেখানো বন্ধ করে ম্যানেজার জানালেন—'বাইরে এক ভদ্রলোক বলছেন যে তাঁর স্ত্রী অন্য একজন লোকের সঙ্গে ছবি দেখছেন। সেই মহিলাটি যদি এখুনি বেরিয়ে না যান তবে তিনি অনর্থ বাধাবেন বলে ভয় দেখিয়েছেন। আমি সেই মহিলাটি চলে যাবার জন্যে পাঁচ মিনিট আলো নিভিয়ে রাখছি।' যখন আলো জললো তখন দেখা গেল সেই বিদেশী মহিলা সাংবাদিক ছাড়া আর কোন মহিলা প্রেক্ষাগৃহে নেই।

আদর্শ বটে !

শোনা যাচ্ছে, শীগ্গীরই মার্কিন চিত্রতারকা মার্ণা লয় তাঁর তৃতীয় স্বামী প্রযোজক জেনী মার্কের সঙ্গে বিবাহ

সম্পর্ক ত্যাগ করবেন। মার্গা এবং জেনীর বিয়ে হয়েছে ১৯৪৬ সালের ৩রা জানুয়ারী। সবচেয়ে মজার ব্যাপার এই যে পর্দায় সবসময় মার্গা আদর্শ স্ত্রী ব'লে পরিগণিত হয়ে আসছেন।

কিম্ আশ্চর্য্যম্!

চরিত্রাভিনেতা চার্লস্ লটন তাঁর বিবাহের একবিংশতিতম বার্ষিকী উৎসব পালন করেছেন। পাঠকরা হয়তো ভাবছেন—এতে আর এমন কি হয়েছে! কিন্তু হলিউডে—সেখানে প্রতি ককটেল পার্টিতেই বিবাহবন্ধন শিথিল হ'য়ে যায়—সেখানে একুশ বছর ধরে একই স্ত্রী সঙ্গে ঘর করা আশ্চর্য্য নয় কি!

শ্রমিকদের নিরাপত্তার জন্য শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র

বিখ্যাত মার্কিন চলচ্চিত্র-নির্মাতা মেট্রো-গোল্ডউইন-মায়ার শ্রমশিল্পে দুর্ঘটনা নিরোধকল্পে একখানি বিশেষ শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র প্রস্তুত করছেন বলে সংবাদ পাওয়া গেছে। ঠিকভাবে কাজকর্ম করার অভ্যাস না থাকায় অনেক সময় শ্রমিকরা দুর্ঘটনায় পড়ে। তাদের অন্যায় বা ভুল অভ্যাস দূর করাই এই ছবিটির উদ্দেশ্য

চলচ্চিত্রটির নির্মাণকার্য্য সম্পূর্ণ হবার পর আমেরিকার সাধারণ চিত্রগৃহে এবং বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠানে এটা দেখানো হবে।

প্রেসিডেন্ট টুম্যানের অনুরোধে ১৯৪৮ সালের জুন মাসে আমেরিকায় দেশব্যাপী শ্রমিক নিরাপত্তা বিধানের জন্য একটি নতুন কর্ম্মসূচী আরম্ভ করা হয়। প্রেসিডেন্ট কর্ত্তৃক নিয়োজিত 'কনফারেন্স অব ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল সেফটি'র পরিচালনায় এই জাতীয় কর্ম্মপ্রচেষ্টা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। শ্রমিক, ব্যবসায়ী এবং গভর্ণমেণ্টের মোট ৪০০ প্রতিনিধি নিয়ে এই প্রতিষ্ঠানটি গঠিত হয়েছে।

ক্যান্সার রোগ সম্পর্কে চলচ্চিত্র

দু' হাজার ছ'শোরও বেশী বিজ্ঞানী, চিকিৎসক, জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত অফিসার এবং জাতিপুঞ্জের প্রতিনিধিগণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গৃহীত ক্যান্সার সম্পর্কিত একটি নতুন চলচ্চিত্রের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে চিত্রটি দেখেন। ক্যান্সার রোগ প্রতিরোধের আন্তর্জ্জাতিক আন্দোলনের অঙ্গ হিসেবে চিত্রটি শীঘ্রই সারা পৃথিবীময় দেখানো হবে।

চিকিৎসকরা বলেন যে, আক্রমণের মুখে রোগনির্ণয় করে চিকিৎসা করাই হ'ল ক্যান্সার রোগ নিরাময়ের একমাত্র উপায়।

আক্রমণের প্রথমভাগে ক্যান্সার রোগে বিশেষ যন্ত্রণা হয় না। তখন মনে হয় সাধারণ চর্ম্মরোগ বা অন্ত্র ধরণের কোন ছোটখাট অসুখ করেছে। পরে যখন রোগী বিষম যন্ত্রণা অনুভব করতে থাকে তখন রোগী চিকিৎসকের সাহায্য গ্রহণ করতে যায়। কিন্তু তখন রোগ হয়ত এত বেড়ে যায় যে তার নিরাময় সম্ভব নয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার বিজ্ঞানী ও চিকিৎসা-বিশারদগণের সাহায্যে ক্যান্সার সম্পর্কিত চলচ্চিত্রটি গৃহীত হয়েছে জাতিপুঞ্জ এবং বিশ্বস্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানও উক্ত চিত্রটিকে তাঁদের সমর্থন জানিয়েছেন।

উক্ত চিত্রে মনুষ্যদেহের অন্তর্নিহিত কলা-কোষ (tissue-cells সমূহকে বৃহদাকার করে দেখানো হয়েছে। কিভাবে সাধারণ এবং ক্যান্সার আক্রান্ত কোষগুলি শ্বাস গ্রহণ করে, খাদ্য হজম করে, উৎপাদন করে এবং অন্যান্যভাবে পরিবর্ত্তিত হয় তা' ঐ চিত্রে বর্ণনা করা হয়েছে। অনুবীক্ষণ যন্ত্রে কোষসমূহকে পরীক্ষা করে কি ভাবে ক্যান্সার রোগ নির্ণয় করা হয় এবং অস্ত্রচিকিৎসা, রঞ্জনরশ্মি বা রেডিয়ামের সাহায্যে কিরূপে ক্যান্সার রোগের চিকিৎসা করা হয় তা'ও চলচ্চিত্রটিতে দেখানো হয়েছে

প্রামাণ্য চিত্রের আন্তর্জ্জাতিক উৎসব

এই বছর এডিনবরাতে প্রামাণ্য চিত্রের যে আন্তর্জ্জাতিক উৎসব অনুষ্ঠিত হবে তাতে প্রদর্শনের জন্য ২৫টি দেশের বহু চিত্র পাওয়া গেছে। বিশেষজ্ঞদের দ্বারা গঠিত এক বিচারক কমিটি এই সকল চিত্রের মধ্য থেকে ৫০টি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্র নির্ব্বাচন করেছেন। জুলাই মাসে নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ করা হবে।

পৃথিবীর সমস্ত দেশের গভর্ণমেণ্ট ও চিত্রপ্রতিষ্ঠান-সমূহ এই উৎসবের পৃষ্ঠপোষক। এডিনবরাতে প্রতি-বৎসর যে আন্তর্জ্জাতিক সঙ্গীত ও নাটকোৎসব অনুষ্ঠিত হয় এই উৎসবটি তারই অঙ্গ। তিন বছরের মধ্যেই

এটা বাস্তবানুগ, পরীক্ষামূলক ও ডকুমেন্টারী চিত্রের উৎসব হিসেবে সমগ্র বিশ্বের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে।

এই উৎসবে প্রদর্শনের জন্য কোন চিত্র মনোনীত হলে পৃথিবীর যে কোন দেশের প্রযোজকই বিশেষ গর্ব্ব অনুভব করে থাকেন। ছবির গুণাগুণই তার শ্রেষ্ঠত্ব বিচারের একমাত্র মাপকাঠি। কোন চিত্র বর্ত্তমান বিশ্বের কোন বাস্তব ঘটনা বা দৈনন্দিন জীবনের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা বা সৃষ্টিধর্ম্মী তথ্য হিসেবে কতখানি কুশলতা ও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে বিচারকমণ্ডলী তাই পুংখানুপুংখরূপে পরীক্ষা করে দেখেন।

শ্রেষ্ঠ চিত্রগুলিকে কোন পুরস্কার দেওয়া হয় না কিন্তু উৎসবে প্রদর্শনের জন্য মনোনীত চিত্রগুলিকে একটি করে সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। চলচ্চিত্রশিল্পের সমস্ত দিক সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়ে বিচারকমণ্ডলী গঠিত।

শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমাঞ্চলের একটি বিদ্যালয়ের অন্ধকার কক্ষে একদল ছাত্র নেদারল্যাণ্ড সম্বন্ধে একটি চলচ্চিত্র দেখছিল। তারা দেখছিল তাদের বয়সী ওলন্দাজ ছেলেমেয়েরা কিভাবে পড়াশুনা করে, কাজ করে ও খেলাধুলা করে। চলচ্চিত্রটি যখন শেষ হয়ে গেল তখন বিদেশীয় এই সকল তরুণ ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধে আলোচনা সুরু হয়ে গেল এবং এতে শিক্ষকরাও ছাত্রদের সঙ্গে যোগ দিলেন।

আমেরিকায় বর্ত্তমানে যে সকল শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র প্রস্তুত হচ্ছে এই চলচ্চিত্রটি তার অন্যতম নিদর্শন। এই সকল চলচ্চিত্র শুধু মাত্র ছোট ছেলেদের জন্যই যে প্রস্তুত করা হয় তা নয়, বয়স্কদের জন্যও প্রস্তুত করা হয়। স্কুলের ছোট ছোট ছেলেদের জন্যে নানাপ্রকার উপকথা থেকে আরম্ভ করে বিজ্ঞান ও শিল্পকলার নানা
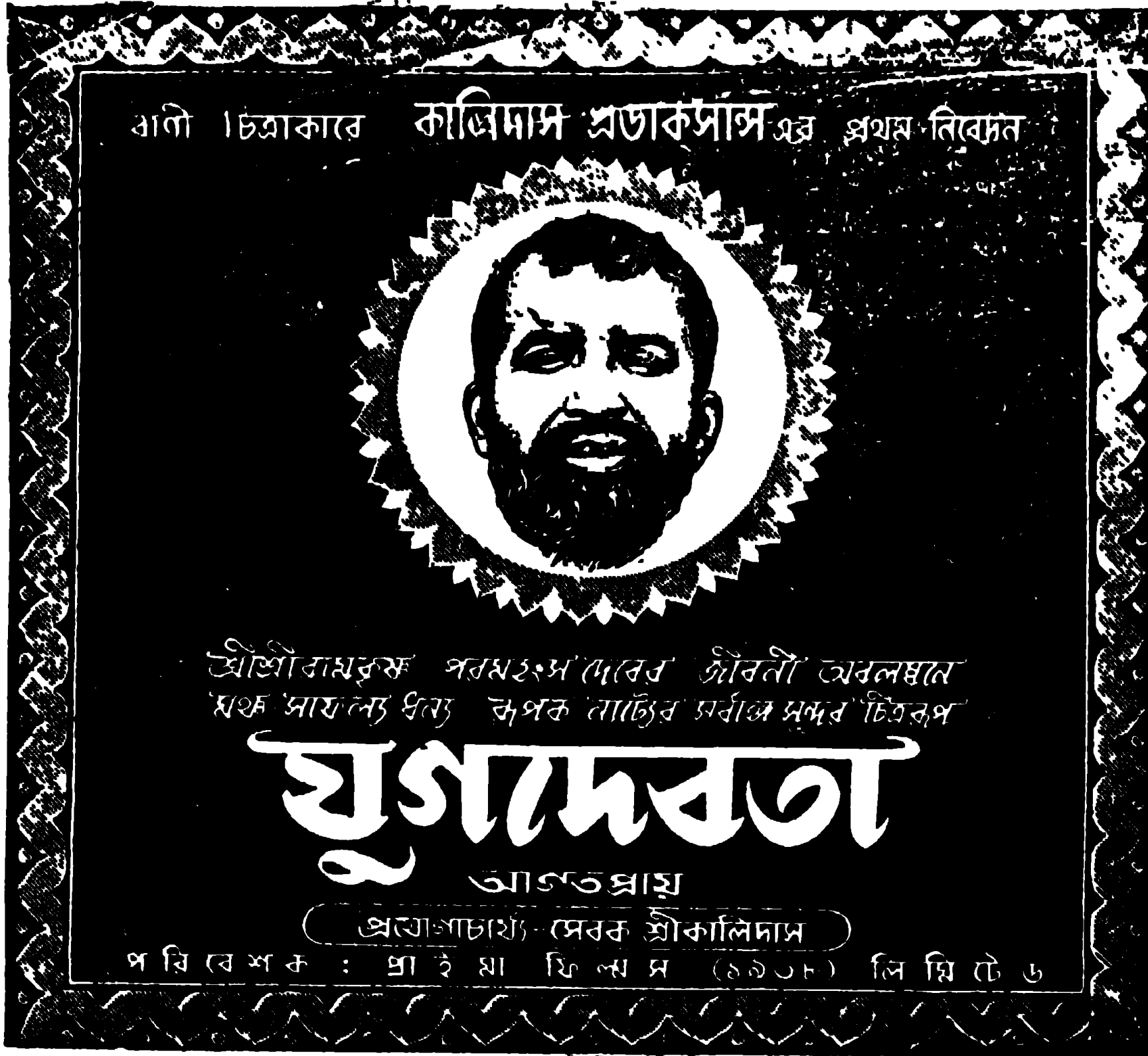
জটিল বিষয়ও এর উপজীব্য হয়ে থাকে। যে সকল বিষয়ে ছবি তোলা হয় তার মধ্যে ইতিহাস, কৃষি, বিজ্ঞান, শারীরিক শিক্ষা, সমাজবিজ্ঞান, আণবিক শক্তি শিল্পকলা প্রভৃতি অন্যতম। ঐ সকল বিষয়ে যাতে চলচ্চিত্রের সাহায্যে শিক্ষালাভ করা যায় এমন ভাবেই ঐ গুলি তৈরী।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে সকল প্রতিষ্ঠান এই সকল চলচ্চিত্র প্রস্তুত করে থাকে তার মধ্যে অন্যতম সর্ববৃহৎ প্রতিষ্ঠান হচ্ছে এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা ফিল্মস্, ইনকরপোরেটেড। ১৯২৯ সালের পর থেকে এই কোম্পানীটি পাঁচশোরও বেশী চলচ্চিত্র এবং ফিল্ম ষ্ট্রীপ প্রস্তুত করেছে। চলচ্চিত্রগুলি ১৬ মিলিমিটার সাউণ্ড প্রোজেক্টরের উপযোগী করে প্রস্তুত হয়। স্কুল কলেজ ও অন্যান্য শিক্ষাকেন্দ্রসমূহ চলচ্চিত্রগুলি ব্যবহারের জন্য ভাড়া করে থাকে বা ক্রয় করে থাকে। সমবায় পদ্ধতিতে বহু ফিল্ম লাইব্রেরী গড়ে উঠছে। এর অন্তর্ভুক্ত সদস্য প্রতিষ্ঠানসমূহ কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে ফিল্ম জমা দেন এবং প্রয়োজন মত এখান থেকে অন্যান্য ফিল্ম ব্যবহারের জন্য নিয়ে থাকেন।

উক্ত ফিল্ম কোম্পানীটি বর্ত্তমানে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করছে। বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় উক্ত কোম্পানী ছবি তুলে থাকে। ছবির পরিকল্পনা ও ছবি তোলা সকল ব্যাপারেই বিশেষজ্ঞগণ সাহায্য করে থাকেন। ইংরাজী ছাড়া আরও ১৩টি ভাষায় উক্ত কোম্পানী ছবি তৈরী করে থাকেন।

"জীবনের মুখপত্র"

শিশু মনস্তত্ত্ব সম্পর্কিত চলচ্চিত্র

বড়দের কাছ থেকে শিশুরা তাদের প্রথম বয়সে অর্থাৎ জীবনের প্রথম উষায় যে জাতীয় ব্যবহার পায়, শিশুদের সমগ্র পরবর্ত্তী জীবনের মানসিক প্রবণতা এবং আবেগের গভীরতাকে সেটা বহুলাংশে প্রভাবিত করতে পারে। শিশু জীবনে ইচ্ছাশক্তির সঞ্চার এবং ক্রমশঃ আবেগের প্রাবল্য কিভাবে পরিণতি লাভ

করে—এই সম্বন্ধে একটি শিক্ষাপ্রদ চলচ্চিত্র তৈরি হয়েছে মার্কিন্ যুক্তরাষ্ট্রের 'জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান' এবং শিক্ষা দপ্তরের পৃষ্টপোষকতায়।

চিত্রখানার নাম দেওয়া হয়েছে—'জীবনের মুখপত্র' এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বত্র এটি দেখাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। শিশু মনস্তত্ব সম্বন্ধে যাঁরা কৌতূহলী তাঁরা এই ছবিখানা থেকে শিক্ষার খোরাক পাবেন। 'জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের' তরফ থেকে ছবিটি বিভিন্ন রাষ্ট্রের স্বাস্থ্য-বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের কাছে বিতরণ করা হবে।

আজব বটে বেতার দপ্তর

ভারতের বাইরে ভারত সম্পর্কে প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রায় দু-বছর আগে ডিরেক্টর জেনারেল অব রেডিও এ্যাণ্ড ব্রডকাষ্টিং-এর উদ্যোগে "ইণ্ডিয়া স্পীকস্" নামে একটি সচিত্র সাময়িক পত্রিকা প্রকাশের এক পরিকল্পনা গৃহীত হয়। পরিকল্পনা গৃহীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই লোকজন নিয়োগের কাজ শুরু হয়। বেতার ও প্রচার বিভাগের কর্তৃস্থানীয় এক ব্যক্তির এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু বেকার বসেছিলেন, তাঁকে মাসে মাসে হাজার টাকা বেতনে পাঁচ বছর চাকুরীর সর্তে "ইণ্ডিয়া স্পীকসের" সম্পাদক নিযুক্ত করা হয়।

ডিরেক্টর জেনারেল অব রেডিও এ্যাণ্ড ব্রডকাষ্টিং এর অফিস ঘরের পাশের কামরাটি "ইণ্ডিয়া স্পীকসের" সম্পাদককে ছেড়ে দেওয়া হয় তাঁর নিজের জন্য এবং এইভাবে শুরু হয় "ইণ্ডিয়া স্পীকস" প্রকাশের উদ্যোগ আয়োজন।

গত দু'বছরে 'ইণ্ডিয়া স্পীকসে'র একটি সংখ্যাও অবশ্য বার হয় নি এবং এখন শোনা যাচ্ছে যে, ভারত সরকার "খরচ কমাও" নীতি গ্রহণ করার ফলে "ইণ্ডিয়া স্পীকস" প্রকাশের পরিকল্পনা বাতিল হয়ে গিয়েছে।

"ইণ্ডিয়া স্পীকস" প্রকাশিত না হোক তার সম্পাদক তাঁর চাকুরীতে আরও তিন বছর বহাল থাকবেন, কেননা পাঁচ বছরের সর্ত্তেই তিনি চাকুরী নিয়েছিলেন। সর্ত্তাধীনে চাকুরী নেবার সৌভাগ্য যাঁদের হয় নি সেই অল্প মাইনের কেরানী কর্ম্মচারীদের ৬জনকে সম্প্রতি বরখাস্ত করা হয়েছে, "খরচ" কমাও নীতি অনুসারেই।

সারগেই আইসেনষ্টাইন

অনিল কুমার দে

আজকের ছায়াছবি আঙ্গিক কলা-কৌশলের পরিপূর্ণতায়, দৃশ্যসজ্জার চমৎকারিত্বে, সঙ্গীতের অপূর্ব্ব মূর্চ্ছনায় এবং আবেদনের গভীরতায় রসিক দর্শকসাধারণকে মুগ্ধ করে। ছবি দেখতে দেখতে আমরা ভুলে যাই আমাদের বর্ত্তমান পরিবেশের কথা, ক্ষণকালের জন্যে বিস্মৃত হই কঠোর বাস্তবের দৈনন্দিন হীনতায় পূর্ণ জীবনের কথা। সেই ক্ষণকালের জন্যেই ছবির নায়ক-নায়িকা হয় আমাদের পরম আত্মীয়, তাদের সুখে আমরা হাসি, তাদের দুঃখে আমরা কাঁদি। তাদের বিসদৃশ আচরণে আমরা ক্ষুব্ধ হই, তাদের গৌরবে আমরা গৌরব বোধ করি এবং তাদের পরাজয়কে আমরা বোধ করি নিজেদের পরাজয় ব'লে। এই সময়টুকু অল্প হলেও কত সুন্দর, অন্ততঃ কিছু দিনের জন্যেও এর মধুর স্মৃতি আমাদের মনকে ভরিয়ে রাখে এক সুখকর আবেশে। আজকের ছায়াছবি বহু শিল্পীর, বহু যন্ত্রীর সাধনার ফলে বর্ত্তমানের পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। যে সমস্ত শিল্পী এবং প্রতিভাবান ব্যক্তির সাধনার ফলে ছায়াছবি আজ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর উৎকর্ষ লাভ করেছে, সারগেই আইসেনষ্টাইন হচ্ছেন তাঁদের অন্যতম।

১৮৯৮ সালে রাশিয়ার রিগা সহরে আইসেনষ্টাইনের জন্ম। রাশিয়ার বিপ্লবের সময় আইসেনষ্টাইনের বয়স উনিশ বছর। তখন তিনি স্থপতি বিদ্যালয়ের ছাত্র। এর কিছুদিন পরে মস্কোতে ছাত্র অবস্থায় আইসেনষ্টাইন রেড আর্মির থিয়েটারের সঙ্গে সংযুক্ত হন। এইখানেই জি, ভি, আলেকজান্দ্রভ্ নানারকম কসরৎ-কেরামতি দেখাতেন। আইসেনষ্টাইনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। 'ব্যাটল্‌শিপ পোটেমকিন্' ছবিতে তিনি আইসেনষ্টাইনের সহকারী পরিচালকরূপে কাজ করেন। পরবর্ত্তী দু'খানি ছবিতে সহযোগী পরিচালকের পদে তিনি উন্নীত হলেন। এড়ুয়ার্ড কাশিমিরোভিচ্ টি, সি, ব'লে সুইডেনের একজন নামকরা ক্যামেরাম্যান অতি চমৎকার বহির্দৃশ্যের চিত্রগ্রহণ করতেন। এঁরা তিনজনে মিলে ছবি করলেন আইসেনষ্টাইনের সেই প্রথম ছবি। ছবির নাম-'ষ্ট্রাইক'।

১৯২৫ সালে আইসেনষ্টাইন তৈরী করলেন তাঁর বিখ্যাত ছবি 'ব্যাটলশিপ পোটেমকিন'। এটি দেখাতে মাত্র পঞ্চাশ মিনিট সময় লাগে, কিন্তু এই ছোট্ট ছবিটি সমস্ত পৃথিবীব্যাপী যে পরিমাণ সাড়া জাগিয়েছিল এর আগে অন্য কোন ছবি তা করতে সক্ষম হয়েছিল কিনা অথবা ভবিষ্যতে কোন ছবি পারবে কিনা তাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এই ছবিটি আইসেনষ্টাইনের অভূতপূর্ব্ব সৃজনী-প্রতিভার একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এতে আলোকচিত্রশিল্পী টি, সি তাঁর ক্যামেরার ভেতর দিয়ে যে অবিস্মরণীয় শিল্পের সৃষ্টি করেছেন অন্যান্য অনেক অভিজ্ঞ আলোকচিত্রশিল্পীর কাছে তা অচিন্তনীয় এবং অসম্ভব বলেই মনে হয়েছিল।

এর পর আইসেনষ্টাইন যে ছবিখানি তোলেন তার নাম 'জেনারেল লাইন' (রাশিয়ায় এটি 'দি ওল্ড এ্যাণ্ড দি নিউ' নামে প্রদর্শিত হয়েছিল)। সমবায় কৃষি আন্দোলনের কাহিনীকে কেন্দ্র করে ছবিটি তৈরী হয়েছে এবং শেষ করতে তিন বছর সময় লেগেছে। এই ছবিটি দেখে ষ্টালিন আইসেনষ্টাইনের উচ্চ প্রশংসা করেছিলেন। ইতিমধ্যে ১৯২৭ সালে 'জেনারেল লাইন' শেষ করবার আগেই আইসেনষ্টাইন 'অক্টোবর' বিপ্লবের একখানি অপূর্ব্ব জাঁক-জমকপূর্ণ ছবি তুললেন। বিপ্লবের ছবিটি শেষ করবার জন্যে আইসেনষ্টাইন ও তাঁর সঙ্গীদের অন্যান্য সব কাজ বন্ধ করে কয়েক সপ্তাহ ধরে রাত্রিদিন অমানুষিক পরিশ্রম করতে হয়েছিল, কারণ হাতে বেশী সময় ছিল না বিপ্লবের দশম বার্ষিকী অনুষ্ঠানে এই ছবিটিকে দেখাতেই হবে। পুডভকিনও এই অনুষ্ঠানের জন্য একখানি ছবি তৈরী করেছিলেন—সেটির নাম 'দি এণ্ড অব সেন্ট পিটার্সবার্গ'। পুডভকিন, আইসেনষ্টাইনের কার্য্যতৎপরতা দেখে মন্তব্য

করেছেন—এক রাত্রিতে একটি প্রাসাদের ছাদের এক অংশ ধ্বসিয়ে তার দৃশ্য তুলতে আমি অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলাম কারণ তাতে হয়তো বিপদ ঘটবার সম্ভাবনা ছিল। অথচ সেই রাত্রিতে আইসেনষ্টাইন শোবার ঘরের দু'শোটি জানলা ভেঙে তাঁর ছবি তুলেছিলেন।'

'জেনারেল লাইন' ছবি শেষ করে আইসেনষ্টাইন, আলেকজান্দ্রভ এবং টি, সি রাশিয়া ছেড়ে পশ্চিমের দিকে বেরিয়ে পড়লেন। বিদেশে তখন সবাক চিত্রের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। দেশে পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে. এতে উৎকর্ষগত পরিবর্তনের চেয়ে পরিমাণগত প্রসারের দিকেই নজর দেওয়া হয়েছে। সুতরাং প্রত্যেকে পকেটে পঁচিশটি করে ডলার ফেলে এবং এক বছরের ছুটি নিয়ে তিনজনই বেরিয়ে পড়লেন। ফ্রান্সে এবং সুইজারল্যাণ্ডে কিছুদিন ঘুরে, লণ্ডনে ফিল্ম সোসাইটির তত্ত্বাবধানে গঠিত কয়েকটি ক্লাসে আইসেনষ্টাইন বক্তৃতা দিয়ে প্যারামাউণ্ট চলচ্চিত্র কোম্পানীর সঙ্গে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে তিনজনে হলিউডে গিয়ে উপস্থিত হোলেন। সেখানে তাঁরা লক্ষ্য করলেন যে ধরণের কাহিনী নিয়ে সাধারণতঃ তাঁরা ছবি তুলে থাকেন

সারগেই আইসেনষ্টাইন

তার ধার দিয়ে ও হলিউড যায় না। এ্যাকাডেমীর এক সভায় আইসেষ্টাইনের মুখে হলিউড প্রথম শুনলো ক্লোজ-আপের সত্যিকারের প্রয়োজন কী। সেই সভাতেই একজন সংবাদিক আইসেনষ্টাইনকে জিজ্ঞাসা করলেন—সোভিয়েট ইউনিয়নে কি লোকেরা হাসে? আইসেনষ্টাইন তার উত্তরে জানালেন—আমি যখন তাদের আজকের এই সভার কথা জানাবো তখন তারা ঠিক হাসবে।

হলিউডে আইসেনষ্টাইন প্রথমে ঠিক করলেন যে বর্তমান কোন আমেরিকার লেখকের একটি কাহিনী নিয়ে কাজ আরম্ভ করবেন। কিন্তু হয়ে উঠলো না কারণ কোন আমেরিকান লেখক তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করতে চাইলেন না। একটা কুৎসিত দলাদলির ভেতর আইসেনষ্টাইন 'সাত্তারস্ গোল্ড' ছবির কাজ শেষ করলেন। এর পর তিনি 'এ্যান আমেরিকান ট্রাজেডী' নাম দিয়ে একটি কাহিনী চিত্রায়িত করবেন ঠিক করলেন। যদিও তিনি জানতেন এই কাহিনী নিয়ে হয়তো কোন গণ্ডগোল বাধবে। কারণ এই কাহিনীতে বলা হয়েছে যে হত্যার জন্যে হত্যাকারী দায়ী নয়, দায়ী তার সমাজ এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা। এখানে তিনি মার্কিন সমাজ এবং সমাজ ব্যবস্থাকেই ইঙ্গিত করেছিলেন। হোলও ঠিক তাই। হলিউডের চারিদিকে অসন্তোষ দেখা দিল। আইসেনষ্টাইন এবং তাঁর সঙ্গীদের 'লাল কুত্তা' এবং তাঁদের কাজকে লালকুত্তার অপকার্য্য আখ্যা দিয়ে চারিদিকে প্রচারকার্য্য চলতে লাগলো। কিন্তু আইসেনষ্টাইন কাজ করে যেতে লাগলেন, এ বিষয়ে কোন ভ্রূক্ষেপও করলেন না, কারণ তিনি জানতেন যে তিনি সত্যের অপলাপ করেন নি। অবস্থা চরমে পৌছোলো। এর একটা মীমাংসার জন্য কংগ্রেসের এক সদস্য আইসেনষ্টাইনকে ডেকে পাঠালেন। তখন অবশ্য আইসেনষ্টাইনের কাহিনীর পাণ্ডুলিপি শেষ হয়েছে। কিন্তু আইসেনষ্টাইনের প্রতিভার কাছে প্যারামাউণ্টের কর্তারা পরাজয় স্বীকার করলেন। তাঁদের কাছে এটি একটি হৃদয়গ্রাহী এবং অদ্বিতীয় কাহিনী বলেই মনে হোল।

এর পর আইসেনষ্টাইনের সামনে দুটি ছবি করার

সুযোগ দেখা দিল—একটা জাপানে আর একটা আপটন সিনক্লেয়ারের সাহায্যে মেক্সিকোতে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত এই-ছবি তোলার পরিকল্পনা সফল হোল না। যেটি অনন্যসাধারণ একটি চলচ্চিত্রে পরিণত হোত, তা' পড়লো গিয়ে অপরের হাতে।

ভগ্নমনোরথ হয়ে আইসেনষ্টাইন ফিরে এলেন রাশিয়ায়, এবং বহুদিন ধরে নিজেকে চলচ্চিত্র বিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজে ডুবিয়ে রাখলেন। আর আলেক-জান্দ্রভ স্বাধীনভাবে সঙ্গীতবহুল কমেডী ছবির পরিচালনা আরম্ভ করলেন। সোভিয়েট চলচ্চিত্র জুবিলীতে আর সবাইকেই বিশেষ সম্মানে ভূষিত করা হয়, তার ফলে এবং ষ্টালিনের কথায় উত্তেজিত হয়ে (সেই বুড়ো বেকুবকে কোন রকম কিছু দেওয়া হবে না যতক্ষণ না আবার সে নতুন কিছু সৃষ্টি করে) আইসেনষ্টাইন আবার ছবির জগতে নামলেন। এর পর একখানি ছবির কাজ তিনি দু'বার আরম্ভ করে দুবারই বন্ধ করে দিলেন। যার ফলে আইসেনষ্টাইনকে সি, পি, এস, ইউ-র কেন্দ্রীয় কমিটির কাছ থেকে অনেক বিদ্রূপ, অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছে। অবশ্য সেই সময় তাঁর মতিগতিও ঠিক ছিল না। সুতরাং দীর্ঘদিনের অবসর দিয়ে আইসেনষ্টাইনকে তাঁর পরবর্ত্তী ছবির বিষয়ে ধীরে সুস্থে চিন্তা করবার জন্যে রাশিয়ার এক শ্রেষ্ঠ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে-ঐশ্বর্য্যশালিনী স্থানে পাঠানো হোল। সেখান থেকে ফিরে এসে আইসেনষ্টাইন রাশিয়ার শ্রেষ্ঠ সুরকার ও কলা-কুশলীদের নিয়ে যে ছবিখানি (আলেকজান্দার-নেভস্কী) তুললেন তা সাধারণ হলেও চমৎকার মাধুর্য্যময় আবেগশীল এক অপেরা। এর পর এলো যুদ্ধ। যুদ্ধের প্রথম কয়েক সপ্তাহ তিনি সোভিয়েট দর্শকের জন্যে এম, ও, আই ফিল্ম তুলতে সাহায্য করলেন, এবং তারপর মধ্য এশিয়ায় গিয়ে তাঁর জীবনের অবিস্মরণীয় কীর্ত্তি 'আইভান দি টেরিবল' ছবিটির প্রথম পর্ব্ব শেষ করলেন, এবং দ্বিতীয় পর্ব্ব তোলার কাজ শেষ করার সঙ্গে সঙ্গেই ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তাঁকে ক্রেমলীনের হাসপাতালে রাখা হলো। সেখানে কিছুটা সুস্থ হয়ে আইসেনষ্টাইন জানতে পারলেন যে কারো কারো মতে দ্বিতীয় পর্ব্বে ইতিহাসকে বিকৃত করা হয়েছে। এই বিষয় নিয়ে তাঁর সঙ্গে ষ্টালিনের এক গুরুত্বপূর্ণ দীর্ঘ আলোচনার পর তিনি দ্বিতীয় পর্ব্বের কিছু অদলবদলের এবং তৃতীয় পর্ব্ব তোলার কাজে হাত দিলেন কিন্তু তা শেষ করবার আগেই তাঁর জীবনের সমস্ত কাজের দায়িত্ব থেকে তাঁকে মুক্তি দিল মৃত্যু।

আইসেনষ্টাইন বহু গুণের অধিকারী ছিলেন। রুশিয়া, ফরাসী, জার্ম্মান, স্পেনীয় এবং ইংরাজী ভাষায় তিনি পড়তে, লিখতে এবং অনর্গল বক্তৃতা দিতে পারতেন। নানা বিষয়ে তাঁর জ্ঞান ছিল অপরিসীম। তিনি পড়াশুনা করতেন প্রচুর এবং যখন তিনি পড়তেন তা উপন্যাস অথবা সমাজনীতির বই হোক, সেই বইয়ের পৃষ্ঠার ধারে ধারে চলচ্চিত্র বিষয়ক টিকা লিখে রাখতেন। তিনি বহু বই সংগ্রহ করেছিলেন এবং সেগুলোকে ঘরের মেঝেতে স্তুপাকার করে রেখে দিতেন। বইগুলো এত এলোমেলো এবং অগোছালভাবে থাকতো, দরকারের সময় কোন বই খুঁজে পাওয়া প্রায় একরকম অসম্ভব হোত এবং আইসেন-ষ্টাইনকে আর একখানি নতুন বই কিনে কাজ করতে হোত। আইসেনষ্টাইনকে যখন কোন ছবির সম্বন্ধে অথবা অন্য কোন বিষয় বোঝাবার দরকার হোত; তা পরিষ্কার এবং নিখুঁতভাবে বোঝাবার জন্যে তিনি সেই বিষয়বস্তুর ছবি, কার্টুন এমন কি অনেক সময় রসিকতা ক'রে বিকৃত নক্সা পর্য্যন্ত আঁকতেন। এতে ইপ্সীত ফল পাওয়া যেত, যে জিনিষটিকে তিনি বোঝাতে চাইতেন তার একটা সুস্পষ্ট ছাপ সহকর্ম্মী অথবা ছাত্রদের মনে পড়তো। যেসব ছাত্র আইসেনষ্টাইনের শিক্ষাধীনে থেকেও কার্য্যক্ষেত্রে বিশেষ উৎকর্ষতা লাভ করতে পারেন নি, তারা গবেট ছাড়া আর কিছুই নয়। লণ্ডনে যেসব তরুণ পরিচালক আইসেনষ্টাইনের বক্তৃতা শুনে-ছিলেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই বর্ত্তমানে কৃতিত্ব এবং যশের অধিকারী হয়েছেন।

দীর্ঘ তেইশ বছরে—১৯২৫ সাল থেকে ১৯৪৮ সাল—আইসেনষ্টাইন মাত্র পাঁচখানি ছবি উপহার দিয়েছেন। সংখ্যায় অল্প হলেও প্রত্যেকটি ছবিই শ্রেষ্ঠত্বের দাবী রাখে

তবে সেক্সপিয়ার অথবা অপর কোন বিখ্যাত দরদী লেখকের সৃষ্টির মত বিশ্বজনীন শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী না হলেও প্রত্যেকটি ছবিতেই সেই সময়কার সোভিয়েট জনসাধারণের সুখ দুঃখ এবং অতি প্রয়োজনীয় সমস্যাকে অপূর্ব্ব দক্ষতার সঙ্গে রূপায়িত করা হয়েছে। যেমন 'পোটেমকিন' ছবিতে—অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, 'অক্টোবর' ছবিতে —জনসাধারণের বিজয়; 'জেনারেল লাইন' ছবিতে—কৃষি আন্দোলনের সাফল্য; 'নেভস্কী' ছবিতে বহিঃশত্রুর আক্রমণের বিরুদ্ধে দেশপ্রেমিকের দেশরক্ষা; 'আইভান' ছবিতে—প্রবল শত্রুর বিরুদ্ধে দুর্ব্বল রাষ্ট্রগুলির একত্রীকরণ দেখানো হয়েছে।

আইসেনষ্টাইন ছিলেন বাস্তববাদী তিনি ছবিতে বাস্তবকে খাড়া করে নিজের প্রতিভার যাদুমন্ত্রে রূপ ও রসের সঞ্চার করেছেন। সেইজন্যেই তিনি বাস্তবতার সন্ধানে রঙ্গমঞ্চ থেকে চলচ্চিত্রে এসেছিলেন। ছবির রাজ্যে আসবার আগে তিনি তাঁর একটি নাটকের (ষ্ট্রাইক) অভিনয় রঙ্গমঞ্চের বদলে সত্যিকারের কারখানায় করিয়েছিলেন। কিন্তু তাতে তিনি সফলকাম হন নি। সেইজন্যই তাঁর ঈপ্সিত বস্তু লাভের জন্যে চলচ্চিত্রের সহায়তা ছাড়া উপায় ছিল না। অবশ্য সত্যিকারের জিনিষ দিয়ে সবসময় সেট তৈরী এক রকম অসম্ভব। কিন্তু ছবিতে সত্যিকারের জিনিষের সহায়তা ছাড়াও বাস্তবের ছাপ রাখা যায়। আইসেনষ্টাইন তাঁর ছবির সম্পাদনা এমনভাবে করতেন যাতে আনাড়ী অভিনেতাদের সার্থক চরিত্রসৃষ্টির কাজে লাগাতে পারতেন। শেষ দুটি সবাক চিত্র ছাড়া তিনি তাঁর কোন ছবিতেই পেশাদার অভিনেতাদের নেন নি। তাঁর দ্বিতীয় বৈশিষ্ট হোল সঙ্গীতের মূর্চ্ছনার সাহায্যে ছবিতে উত্তেজনা ও tensions-এর সঞ্চার করা। আইসেনষ্টাইনের ছবিতে আর একটি লক্ষ্যণীয় বিষয়—আবহ-সঙ্গীতের সঙ্গে ছবির গতির এবং সংলাপের সুসম্পন্ন সংযোজন। তবে এইখানেই শেষ নয়। চিত্রজগতে আইসেনষ্টাইনের দানও সৃষ্টি-বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিরাট বই লেখা চলে এবং একদিন তা হবেও, তবে তাঁর সৃজনী ক্ষমতার সবচেয়ে বড় সাক্ষ্য তাঁর সৃষ্ট চিত্রগুলি।

অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী হয়েও আইসেনষ্টাইন তাঁর সহকর্মী এবং অধীনস্থ কর্ম্মচারীদের সঙ্গে বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করেছেন। যশের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করেও তিনি কখনও তাঁর আচরণে ঔদ্ধত্য অথবা অহঙ্কার প্রকাশ করেন নি। এই নিরহঙ্কার ব্যবহারের জন্যেই তিনি সকলের কাছে শ্রদ্ধার এবং ভালবাসার পাত্র ছিলেন। আইসেনষ্টাইন কাজ-পাগলা লোক ছিলেন। কাজ পেলে আর কিছু চাইতেন না। দীর্ঘরাত্রি পর্য্যন্ত তিনি কাজের মধ্যে ডুবে থাকতেন। এমন কি অবসর সময়েও হাতে যদি কোন ছবি থাকতো তবে ছবির কথা, অথবা পরবর্ত্তী ছবির কথা চিন্তা করতেন। অসুখের মধ্যেও নিতান্ত অশক্ত না হয়ে পড়লে তাঁর কাজের কামাই যেত না। ডাক্তারের বারণও শুনতেন না, দিন দিন যে তাঁর শরীর ভেঙে যাচ্ছে, তাও তিনি গ্রাহ্য করেন নি। প্রকৃতির নিয়মে সব জিনিষেরই একটা সীমা আছে, আইসেনষ্টাইন এই সীমাও অতিক্রম করলেন, তাই প্রকৃতিদেবী ১৯৪৮ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারীর রাত্রিতে আইসেনষ্টাইনকে আর ক্ষমা করলেন না, গ্রহণ করলেন তাঁর চরম প্রতিশোধ। তার পরদিন সকালে আইসেনষ্টাইনের সহকর্ম্মীরা এসে দেখেন আইসেনষ্টাইন তাঁর লাইব্রেরীতে লেখার ডেস্কের সামনে বসে রয়েছেন মৃত অবস্থায় এবং ডেস্কের ওপর প'ড়ে রয়েছে রঙীন এবং ত্রিতলমাত্রিক ছবির বিষয় নিয়ে লেখা এক অসমাপ্ত থিসিস। আইসেনষ্টাইনের প্রতিভা যখন মধ্য গগনে দীপ্ত ভাস্করের ন্যায় বিরাজমান তখনই হলো তাঁর দেহান্তর। অপযশের কালিমা তাঁকে স্পর্শ করতে পারে নি। আইসেনষ্টাইনের বহুমুখী কর্ম্মময় এবং প্রতিভাদীপ্ত জীবন প্রগতিশীল, শিক্ষাবান এবং সংস্কৃতিবান তরুণদের মনে অনুপ্রেরণার সঞ্চার করতে পারবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

কালো হরিণ চোখ

ক্যাপ্টেন ফণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি. এস্. সি, এম্. বি

মহাকবি রবীন্দ্রনাথ আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন মনের আর চোখের" স্বাস্থ্যের অপূর্ব্ব এক আদর্শ এই তিনটি কথা, কাল হরিণ চোখ-এর মধ্যে। চোখের রং কালো। এই কালো রং প্রতিফলিত করছে সৌম্য-শান্ত-স্নিগ্ধতা। আর 'হরিণ চোখ'—চঞ্চল, সাবলীল সুষমা-জড়িত নয়নভঙ্গীর প্রতীক। অপূর্ব্ব মানসিক স্থৈর্য্য আনবে এই সৌম্য, শান্ত, স্নিগ্ধতা, আর সঙ্গে সঙ্গে সুস্থ জীবনীশক্তির বিকাশ। ঔজ্জ্বল্যবিবর্জ্জিত নয়নযুগল অন্যকে আকর্ষণ করতে ত পারেই না, উপরন্তু সময়ে সময়ে দৃষ্টিকটু হয়ে পড়াও বিচিত্র নয়। Eye is the mirror of Health—দেহের অটুট স্বাস্থ্য সর্ব্বদাই প্রতিফলিত হয় চক্ষুতারকার ঘন কৃষ্ণ আভায়। হরিণের মত সদাচঞ্চল চাহনি প্রকাশ করছে চক্ষের অতি সূক্ষ্ম স্নায়ুপুঞ্জ ও সুক্ষ্ম ক্ষুদ্র কয়েকটি মাংশপেশীর অপূর্ব্ব কর্ম্মদক্ষতা। এই স্নায়ু-মাংসপেশীগুলির সহযোগিতায় দৃষ্টি-ভঙ্গিমাকে এতই সুষমা মণ্ডিত করে যার অভিব্যক্তি আমরা দেখতে পাই কবির ভাবের উচ্ছ্বাসে শ্যামাঙ্গিনীর রূপমাধুর্য্যে—"তা সে যত কালই হোক দেখেছি তার কাল হরিণ চোখ"।

মন-প্রাণ-হরণকারী চোখের এই চুম্বকী-শক্তি 'মনের ভাষা'র অভিব্যক্তি মাত্র। চিত্রতারকা এবং মঞ্চ-শিল্পী এই মহতী শক্তির সাধক। তাদের সব কৃতিত্ব নির্ভর করছে এই Dynamic Expression of Eyes এর উপর। সবাক্ যুগে বাচনভঙ্গী ও ভাষার ছটা চোখের মহিমাকে অনেকটা ম্লান করেছে বটে নির্ব্বাক যুগের অপূর্ব্ব ভাবের অভিব্যক্তিকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কি হাস্যরস পরিবেশনে, কি বীভৎস দৃশ্যের অবতারণায়, কি শোকদুঃখ বিমিশ্রিত করুণ কাহিনীতে কিম্বা বজ্র কঠোর উচ্চগম্ভীর ডাকের সমাবেশে—চোখ দুটোই সকল ভাবের উৎসরূপে আজও সগৌরবে বিরাজ করছে।

অভিনয়শিল্পের চাতুর্য্যে নির্ভর করছে এই 'কাল হরিণ চোখে'র ওপরই। কিন্তু সংসারের নিত্য অসংখ্য ঘাত প্রতিঘাত 'মনকে' এতই বিপর্য্যস্ত করছে—যার কবল থেকে চোখ দুটোকে রক্ষা করা এক বিষম সমস্যার কথা। এই মানসিক বিকৃতির প্রতিক্রিয়া চোখের ওপর এমনই বিস্তার করে; যার ফলে স্বাভাবিক সুন্দর মুখশ্রী নষ্ট হয়ে যায়। আজ যিনি মঞ্চ বা চিত্রে উজ্জ্বল তারকারূপে গণ্য হয়েছেন, কাল হয়ত ভাবের অভিব্যক্তির দীনতা প্রকট হয়ে উঠে দর্শকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন হওয়াও বিচিত্র নয়। তাই সাধনা দেহ ও মনের স্বাস্থ্য অটুট রাখতে। হলিউডের পাশ্চাত্য অভিনেতা বা অভিনেত্রীগণের শরীর চর্চ্চার ও মানসিক স্থৈর্য্য রক্ষাকল্পে অনাবিল আনন্দ পরিবেশের সমাবেশের কাহিনী প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায়। কিন্তু সেখানে এদেশীয়দের মধ্যে এই বিষয়ের অনুকরণ স্পৃহতার অভাব বড়ই পরিলক্ষিত হয়। যার ফলে তাঁদের দৈহিক সৌন্দর্য্যের অবনতি দিন দিন প্রকট হয়ে উঠছে। আর সঙ্গে সঙ্গে অভিনয় চাতুর্য্যের ক্রমোন্নতির পরিবর্ত্তে অধোগতিই প্রকাশিত হচ্ছে।

দৃষ্টিক্ষীণতা অভিনয়শিল্পের পরিপন্থী। চশমাপরিহিত অভিনেতা বা অভিনেত্রী কখনও সফলতা লাভ করতে পারেন না। ভাবের অভিব্যক্তি সুপরিস্ফুটভাবে প্রকাশিত হতে পারে না চশমার ভেতর দিয়ে, বা সাময়িক চশমা পরিত্যক্ত বিকৃত মুখমণ্ডলে। যাঁরা সর্ব্বদা চশমা ব্যবহার করেন তাঁদের চশমা ছাড়া মুখ অন্যের চক্ষে বেশ একটু expressionless বলেই মনে হয়। তাই প্রাণহীন চাহনিকে প্রাণবন্ত করা এক বিরাট সমস্যা।

মনোরাজ্যে বিদ্রোহ দেখা দিলে চোখের ও মুখের ভাবান্তর প্রথমেই পরিলক্ষিত হয়। সদাচঞ্চল চাহনি কিসে যেন বাধাপ্রাপ্ত হয়ে একদিকে সন্নিবিষ্ট হতে চায়। Look becomes vacant. ফলে হয় চক্ষে ও মগজে রক্ত চলাচলে বাধা। যার অভিব্যক্তি আমরা দেখতে পাই মাথা ধরা, দৃষ্টিক্লান্তি ও আলোকভীতির মধ্যে। মানসিক স্থৈর্য্যের অবনতি যতই বেশী হতে থাকে চোখের কোলে কালিমা ততই প্রকট আকার ধারণ করে। তখন হয়ত নিজের প্রতিবিম্ব আরসিতে দেখে নিজেই শিউরে ওঠেন।

তখন তাঁর মন প্রাণ পড়ে থাকে কি করে লোকচক্ষুর দৃষ্টির সামনে থেকে চোখের কালিমা ঢাকতে পারবেন। তখনই শরণাপন্ন হতে হয় রঙিন চশমার; যার আবরণে আলোক ভীতির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়, আর সঙ্গে সঙ্গে অন্যের দৃষ্টি থেকেও। প্রসাধন হিসাবে কাজলের ব্যবহারের পেছনে রয়েছে ঐ লোকচক্ষু প্রতারিত করার অদম্য বাসনা।

মানসিক অবসাদজনিত দৃষ্টিক্লান্তি, দৃষ্টিভ্রান্তি বা মাথা ধরা সম্পূর্ণ সাময়িক। যার প্রমাণ দেখতে পাওয়া যায় প্রাতে নিদ্রাভঙ্গের পর থেকেই মাথাধরা সুরু হওয়ায়। অথচ চোখের ওপর প্রতিক্রিয়া হবার মত কাজ তখনও হয় নি। এর পেছনে রয়েছে দুঃস্বপ্নজনিত সুখনিদ্রার অভাব। ঘুমের অন্তরালে মন অত্যন্ত সক্রিয় ও উত্তেজিত অবস্থায় থাকায় শ্রান্তি অপনোদনের পরিবর্তে ক্লান্তির মাত্রা ক্রমেই বেড়ে যায়। তারই অভিব্যক্তিস্বরূপ ঘুম ভাঙার পরে পরেই মাথাধরার সূত্রপাত। মনকে অনাবিল আনন্দ পরিবেশের মধ্যে রাখাতে এই সদা আড়ষ্টভাব কেটে যায়-- তখন মাথা ধরার কথা মনেও থাকে না। তাই রাত্রে শয্যা গ্রহণের পূর্ব্বে মনের আড়ষ্টভাব যতটা কমানো যায় তার ওপরেই নির্ভর করছে সুখনিদ্রাজনিত আনন্দের অভিব্যক্তি প্রভাতে। পণ্ডিতের মতে ঘুম সম্বন্ধে বলা হয় "clear conscience is the soft pillow", কিন্তু এই soft pillowর পরিবেশ ক'জনের ভাগ্যে জোটে আজকালকার সমস্যার সংঘাতে।

সভ্যতার আধিপত্যে আমরা পঞ্চভূতের সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হতে চলেছি। তাই আমাদের মধ্যে চোখের স্বাস্থ্যের এত অবনতি। আমাদের স্বাস্থ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত আছে "ক্ষিতি-অপ্-তেজ-মরুৎ-ব্যোম" এই পঞ্চভূতের অভিনব সংযোজনায়।

চোখের ওপর মাটির আধিপত্য প্রচুর। বাসস্থানের আবেষ্টনীর সুষ্ঠু সমাবেশ চোখের আড়ষ্টভাব লাঘবে অনেক সহায়তা করে। সুদূর প্রসারী বিস্তীর্ণ সবুজ প্রান্তর দৃষ্টিশক্তির স্নিগ্ধতা ও কার্য্যকারিতা বাড়াতে অদ্বিতীয়। নিয়মিত জলের ঝাপ্টা দ্বারা চোখ বুঁজে বা চোখ বন্ধ করে চক্ষুর মধ্যে এবং আশে পাশে রক্ত চলাচলের উন্নতি হয়। ফলে স্নায়ু ও মাংশপেশীসমূহ সদা কার্য্যক্ষম থাকে। প্রভাত-অরুণ-কিরণ-স্নাত মুখমণ্ডল অচিরেই এক অপূর্ব্ব শ্রীমণ্ডিত হয়ে উঠে। আর সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক ultra-violet ray 'কালিমা'-ক্লিষ্ট চোখের ওপর অনুকূল ক্রিয়ার প্রভাব বিস্তার দ্বারা দৃষ্টিশক্তির উন্নতি বিধান করে। ধূলি-ধূম বিবর্জ্জিত বিশুদ্ধ বায়ু পাওয়াই আমাদের দুর্ঘট। তাই বৈকালে খোলামাঠের বাতাস কিছুক্ষণ চোখেমুখে লাগানো অতীব স্বাস্থ্যপ্রদ। চশমাধারী যাঁরা তাঁদের উচিত এই সময় কিছুক্ষণ চশমার ব্যবহার বন্ধ রাখা। অনন্ত ব্যোম বহন করে আনছে দূরদূরান্তরের আলোকরশ্মি আমাদের চোখে। এই দূরাগত আলোক আমাদের চোখের স্নায়ু-পর্দ্দাকে সুষ্ঠুভাবে উত্তেজিত করায় মগজের দৃষ্টি-কেন্দ্র সব সময় সতেজ ও সজাগ থাকে। তাই Star gazing দুর্ব্বল দৃষ্টিশক্তিকে সতেজ করতে সমর্থ হয়। আমাদের মনের অলক্ষে এমনি করেই প্রকৃতি তার সহযোগিতার বাহু প্রসারিত করে আমাদের প্রতি। কিন্তু মূঢ় অমরা অনেক সময়েই "সে যে কাছে এসে বসেছিল তবু জাগেনি" কবির এই মর্ম্মবেদনার গূঢ় তত্ত্বের উপকরণ হয়ে পড়ি।

বিস্মৃত দিনের চীনা চিত্রাভিনেত্রী এ্যানা মে ওয়াং
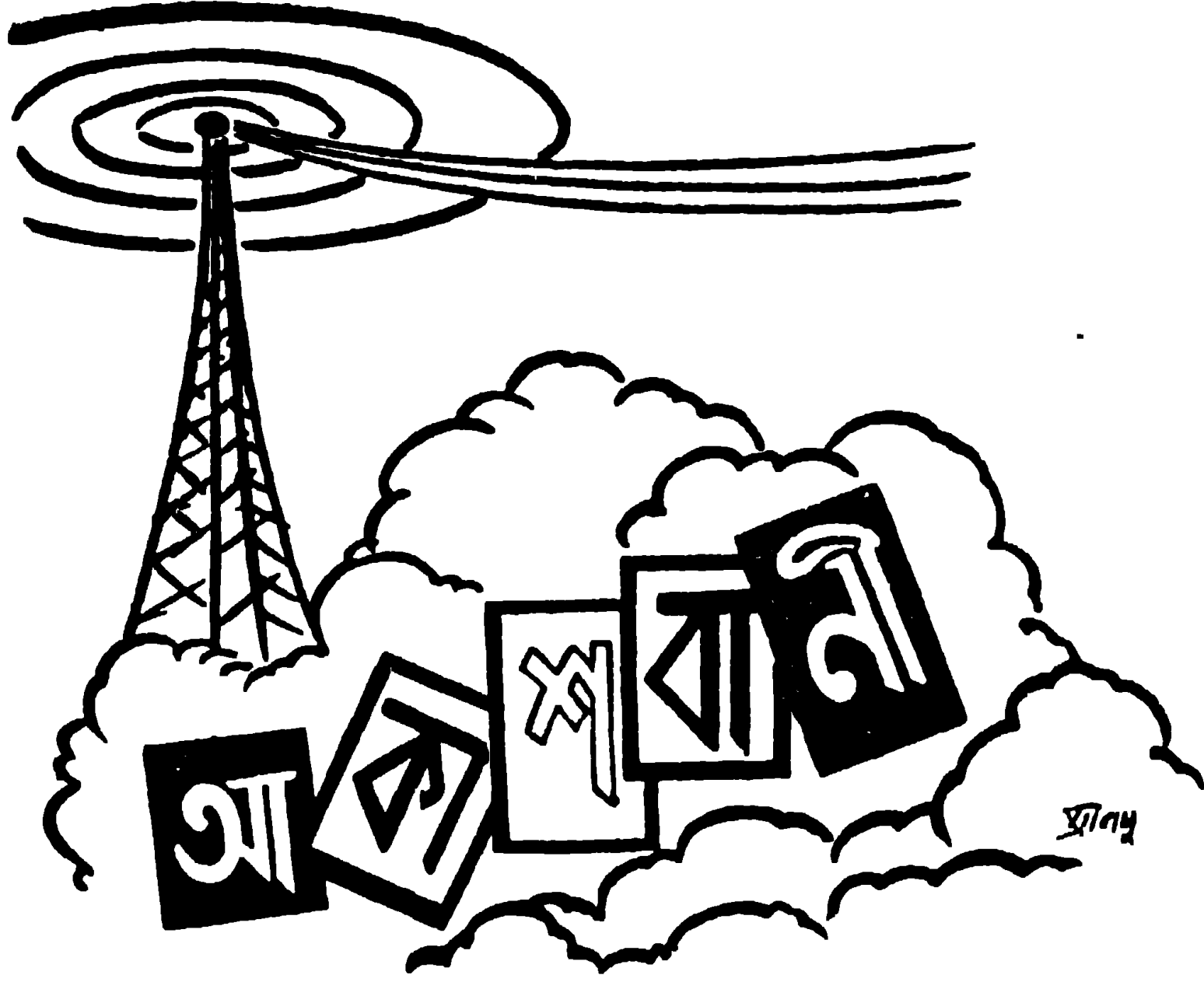
বেতারবন্ধু

ঐক্য-বাক্য-মাণিক্য ঃ

আমাদের দেশে ক্ষমতা হাতে পেলেই এক শ্রেণীর মানুষ 'অমানুষ' হয়ে ওঠে। ক্ষমতার অপব্যবহার নানান্ কাজের মধ্যে দিয়ে অত্যন্ত স্থূল রূপ নিয়ে প্রকাশ পায়। তারে বেতারে শাসনে শ্মশানে সর্ব্বত্রই এই এক কথা। ক্ষমতার এই অপব্যবহার আরো তীব্র হয়ে ওঠে যখন ক্ষমতার অপব্যবহারকারা বুঝতে পারে তাকে প্রতিরোধ করার বা তার কাজে প্রতিবাদ করবার কেউই নেই। কাজেই কোলকাতার বেতার কেন্দ্রের কর্ম্ম-কর্ত্তারা অত্যাচারী অবিবেচক হবেন এ আর বেশী কথা কি ! 'হাতে মাথা কাটা' কথাটা এতদিন শোনা কথা হলেও তার প্রত্যক্ষ রূপ আমরা দেখতে পাচ্ছি বেতার কেন্দ্রে। এখানে শিল্পীদের 'হাতে মাথা' কাটছেন বেতার কর্ম্ম-কর্ত্তারা। এঁদের অত্যাচার ও অবিচার আরো বেড়েছে শিল্পীদের নিজেদের দোষেই। ব্যক্তিগত সুযোগ সুবিধা লাভের আকাঙ্খায় সমষ্টির কল্যাণের মুখে খড়্গাঘাত করছেন শিল্পীরা নিজেই। নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারা আর কি !

শিল্পী সংঘ এককালে সংঘবদ্ধতার দরুন অসাধ্য সাধন করেছিলো—১৯৪৭ সালে শিল্পীদের বেতার ধর্ম্মঘট একটা ঐতিহাসিক ব্যাপার। কিন্তু শিল্পীদের বড়-কর্ত্তা, মেজ-কর্ত্তার দল নিজেদের মধ্যে দলাদলি করে সংঘটাকে প্রাণে মেরে ফেললেন—শিল্পীদের ঐক্য নষ্ট হলো। বাক্য রোধ হলো এবং মাণিক্য অপহৃত হলো। তাই আজ এই ঐক্যের অভাবে সাধারণ শিল্পীরা বেতার কর্ত্তাদের কাছে পুজুরী বামুনের মতো—দয়া-দাক্ষিণ্য করে যা দেওয়া হয়—তাই হাসিমুখে তুলে নিয়ে জয়ধ্বনি করতে করতে এঁরা বিদায় নিচ্ছেন। শিল্পীদের 'দয়া করুণা প্রার্থী'র মনোভাব শিল্পীদের সম্মান ও শ্রদ্ধাকে নষ্ট করে দিয়েছে। তাই বেতারের কর্ম্ম-কর্ত্তারা এমন ব্যবহার করেন যে ব্যবহার বৃটিশ আমলে বড় সাহেব কেরানীদের ওপর করতে লজ্জা পেতেন।

শিল্পী সংঘ আজ মরে যেতে বসেছে। মরে গেছে বললেই হয়। এবং সেজন্যই শিল্পীদের সঙ্গে বেতার-কর্ত্তাদের সম্পর্ক হয়েছে প্রভু-ভৃত্যের মত। কথাটা কটু এবং একটু কাটাকাটা, কিন্তু স্বীকার না করে উপায় নেই। শিল্পীদের নিজেদের বাঁচবার পথ ব্যক্তিগত স্বার্থ অক্ষুন্ন রাখায় এবং তা পূরণে নয়—তা নির্ভর করছে সমষ্টিগত কল্যাণের ওপর। বিদ্যাসাগর মশাইয়ের প্রথম ভাগের তিনটি শব্দ 'ঐক্য বাক্য এবং মাণিক্য শিল্পীদের' অনুপ্রাণিত করুক শিল্পী সংঘের পুণর্গঠনে—'চিত্রবাণী' তাই আহ্বান জানাচ্ছে বেতারের ছোট বড় খ্যাত অখ্যাত সমস্ত শিল্পী বন্ধুদের !

অবাক কাণ্ড ঃ

কোলকাতা বেতারের নাম-করা শিল্পীদের গানের আসরে আর পাওয়া যাচ্ছে না ব'লে বেতার শ্রোতাদের

কেউ কেউ আমাদের কাছে অভিযোগ করেছেন। অনুপস্থিত শিল্পীদের তালিকায় সবচেয়ে নাম করা শিল্পী শ্রীমতী বিজন ঘোষ দস্তিদার। শুধু বাংলায় নয় সারা ভারতে এঁর নাম। সঙ্গীত জগতে এক ডাকে যাঁদের চেনা যায় ইনি তাঁদেরই একজন। বাঙালী মেয়ের পক্ষে এ বড় কম পরিচয় নয় এবং বাঙালী হিসেবে কম গৌরবের কথা নয়।

এহেন সঙ্গীত কুশলী মেয়েকে বেতার কর্তারা কোলকাতা থেকে ছলে বলে কৌশলে দূরে রাখবার চেষ্টা করেছেন এবং কিছুটা পরিমাণে সফলও হয়েছেন। এই সমস্ত অকাজের মূলে আছে রস-রসিক দা-ঠাকুরের কথায় 'ও'য়ের মধ্যে আত্মগোপনকারী দেবতাটি!

সবচেয়ে আশ্চর্য্যের ব্যাপার হচ্ছে শ্রীমতী ঘোষ দস্তিদার কোলকাতা বেতার কেন্দ্রের দায়িত্বপূর্ণ পদে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করেছেন। তিনি 'ষ্টাফ' শিল্পীদের অন্তর্ভুক্ত। সাম্প্রতিক কালে অন্য সমস্ত 'ষ্টাফ' শিল্পীদের তিন বছরের কণ্ট্রাক্ট দেওয়া হলেও শ্রীমতী দস্তিদারকে মাত্র ছ' মাসের কণ্ট্রাক্ট দেওয়া হয়। স্বল্প-মেয়াদী কণ্ট্রাক্ট শ্রীমতী ঘোষ দস্তিদার গ্রহণ করেন নি এই বৈষম্য ব্যবহারের প্রতিবাদে।

শোনা যাচ্ছে শ্রীমতী ঘোষ দস্তিদারকে কিছুকাল আগে বেতারের কোন কর্তা সান্ধ্যকালীন সঙ্গীত আসরে এমন একটি রাগ গাইতে বলেন যেটা সন্ধ্যাকালে গাওয়া সঙ্গীত-শাস্ত্র-বিরোধী। শ্রীমতী ঘোষ দস্তিদার অন্য সমস্ত শিল্পীদের মতো কর্তাভজা নন—তিনি শাস্ত্র-বিরুদ্ধ সঙ্গীতালাপে আপত্তি করেন এবং এই থেকেই নাকি যত অনর্থের সৃষ্টি। রাগ থেকে রাগারাগি আর কি! ফলে কলমের এক খোঁচায় তিন বছরের কণ্ট্রাক্ট ছ' মাসে দাঁড়ায় এবং ব্যাপারটা সবদিক থেকে এমন ঘোরালো এমন অসম্মান-জনক করে তোলা হয় যে শ্রীমতী ঘোষ দস্তিদার এই অসম্মানজনক স্বল্প মেয়াদী সর্ত্তে চুক্তি পত্রে সই করতে অস্বীকার করেন

শ্রীমতী ঘোষ দস্তিদারের ওপর আমাদের প্রচুর বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধা আছে। আমরা জানি কোলকাতা বেতারে এখনও একজন শিল্পী আছেন যিনি বেতারের কর্তাদের নানাবিধ অন্যায় অত্যাচারের প্রতিবাদ করতে পারেন এবং করেছেনও। এককালে কোলকাতা বেতারে অন্য বহু শিল্পীদের মতো এঁর নাম কালো খাতায় তোলা হয়েছিল। এই কালো খাতায় (Black list) আরো বহু গুণী শিল্পীদের নাম ছিল তার মধ্যে পঙ্কজ মল্লিক, সুপ্রীতি ঘোষ প্রভৃতিরাও ছিলেন। সে সময়ে সংবাদপত্রে এই নিয়ে আন্দোলন হবার বহু আগেই 'দূর দিল্লী'র দৃষ্টি আকর্ষণ করে শ্রীমতী ঘোষ দস্তিদার এই 'কালো খাতা' থেকে মুক্তি পান। এ নিয়ে তাঁকে অনেক সংগ্রাম করতে হয়। যে কোলকাতা বেতার
[illegible]২৫ টাকা প্রোগ্রাম দিতে অস্বীকার করে দিল্লীর নির্দ্দেশে তাঁকেই 'মিউজিক ওয়েল-ফেয়ার অফিসার' হিসাবে নিয়োগ করতে বাধ্য হয়—আশা করি কোলকাতার বেতার-কর্তারা সেকথা ভুলে যান নি।

শ্রীমতী ঘোষ দস্তিদারের এই মনোভাবকে আমরা অভিনন্দিত করি। আশা করছি 'কত ধানে কত চাল' তা কোলকাতার কর্মকর্তারা বেশ ভালভাবেই বুঝতে পারবেন। এ আর 'হা-ভাতে' শিল্পী নন যে এক দাপটে একে ঠাণ্ডা করা যাবে!

এই সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ জানাবার জন্যে আমরা শ্রীমতী ঘোষ দস্তিদারকে সাদর আহ্বান জানাচ্ছি।

আর একটি কাহিনী

বেতারে শিল্পীদের ওপর অবিচারের নিত্য নতুন কাহিনী আমাদের দপ্তরে এসে পৌঁচচ্ছে। শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্র রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী হিসাবে সুনামধন্যা। এই দিক দিয়ে স্বল্প যে ক'জন শিল্পীর দেখা মেলে ইনি তাঁদের অন্যতমা। তাঁকেও বেতার-রবীন্দ্র সঙ্গীত আসরে আর পাওয়া যাচ্ছে না। তাঁর সম্পর্কে বেতার কর্তাদের অভিযোগ হাস্যকর। অবশ্য খাস বেতার দপ্তর এ ব্যাপারে চিরকালের মত নীরব —তবে বেতারের কর্মকর্তা ব্যক্তিস্থানীয়রা নাকি এই অভিযোগে শ্রীমতী মিত্রকে অভিযুক্ত করেন যে তিনি 'লাল বাবা'র দলীয় লোক এবং আমাদের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু বেশ কিছুকাল আগে যখন কোলকাতায় পদার্পণ করেন তখন শ্রীমতী মিত্র রবীন্দ্রনাথের এমন একটি গান বেতারে পরিবেশন করেন যাতে নাকি পণ্ডিতজীর প্রতি অসম্মান প্রকাশ করা হয় এবং শ্রীমতী মিত্র যে 'লাল বাবা'র দলের লোক তার প্রমাণ মেলে এবং সেইজন্যেই শ্রীমতী মিত্রকে বেতার থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে —এমনি উপভোগ্য কাহিনী কোলকাতার বাজারে বেশ চালু হয়েছে। এ বিষয়ের মুস্কিল আসান করতে পারেন

শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্র ও বেতারের কর্ত্তারা। কিন্তু কে এগিয়ে এসে এই মুস্কিল আসান করবেন? যে কারণই থাক শ্রীমতী মিত্রের মত প্রথম শ্রেণীর শিল্পীকে এইভাবে বেতার থেকে সরিয়ে রেখে শ্রোতাদের আনন্দ উপভোগের যে বাধার সৃষ্টি করা হচ্ছে তার প্রতিবাদ আমরা না করে পারি না।

বেতারে থাকার হাজার মজা !

সত্যি হাজার মজা নয় তো কি? খুদে অফিসার হ'লে শিল্পীরা প্রার্থী হয়ে ভীড় করে দাঁড়িয়ে কৃপা করুণা প্রার্থনা করে—মেয়ে মহলে কদর বাড়ে, কোন শিল্পীকে বেতার আসরে বাঁচিয়ে রাখা বা গুম খুন করা কত সহজসাধ্য হয়। হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতা সাজা আর কি। 'তারপর উপরি আয়' এর সুযোগ ঘটে শালা, ভাগ্নে আর বন্ধু অক্ষম ও অখ্যাত হলেও বেতার কোষাগার থেকে দু-পয়সা 'পাইয়ে' দেওয়া যায় আর কত স্বর্গ সুখ! যাঁরা কর্ম্মকর্ত্তা বা খুদে অফিসর নন তাঁরাও কি কম যান। নিদেনপক্ষে বেতারের কর্ম্মকর্ত্তার গিন্নীকে 'দিদিমণি' আর পদস্থ ব্যক্তিকে আদুরে সুরে 'বেটু' বলে ডেকে কত অসাধ্য সাধন করা যায় তার কি কিছু ঠিক আছে—! ভাববেন প্রলাপ বকছি—মোটেই না। ডেকে জিজ্ঞাসা করুন শ্রীশুভেন্দু বসুকে—সবজান্তা বক্তিয়ার খিলজী এই ভদ্রলোক 'কোন গুণ নাই তার কপালে আগুন' হলে কি হবে—একেবারে সাক্ষাৎ ভৈরব বাবা। শ্রীযুক্ত বসুর সঙ্গে অমৃতবাজারের যে যোগ আছে তা সাংবাদিক হিসাবে নয়—অথচ ভদ্রলোক সেই হিসেবে নিজেকে চালিয়ে থাকেন। যে কোন কারণেই বেতারের শ্রীঅনিল বরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে এর মাখামাখি ভাব। এই ভাবের জন্যে কোন কিছুরই অভাব হয় নি। শ্রীঅখিল নিয়োগী প্রযোজিত-পরিচালিত 'দশে মিলি করি কাজ' নক্সায় ইনি সম্পর্ক শূন্য হয়েও কোলকাতা বেতার কেন্দ্রের মুখপত্র 'বেতার জগতে' নিজের ফটোর তলায় বাহাবী করে নাম ছেপেছেন উপরি-উক্ত নক্সাটির প্রযোজক হিসাবে! বেতার জগতে কোন কিছু ছাপাতে গেলে বিভাগীয় পরিচালকের এবং বেতারের কর্ম্মকর্ত্তার অনুমোদন প্রয়োজন হয় এক্ষেত্রে প্রচলিত নিয়মকে ফাঁকি দিয়ে কোন্ গুপ্ত রন্ধ্রে এই প্রচার ব্যবস্থা কায়েম হলো তা জানতে ইচ্ছে করে, কিন্তু তা জানেন শ্রীমধুসূদন আর বেতার বর্ত্তারা।

এই গুপ্ত রন্ধ্রেই কত কাণ্ড সংঘটিত হচ্ছে নিঃশব্দে, কত পঙ্গু পর্ব্বত পার হচ্ছে, কত মূক বাচাল হচ্ছে তার হদিস কে রাখে—আমরা বেতারের খোদ-কর্ত্তা যিনি দূর দিল্লীর মসনদে বসে আছেন তাঁর দৃষ্টি সবিনয়ে আকর্ষণ করছি।

মস্কো বেতারে বাংলা

আপনারা শুনে খুসী হবেন সম্প্রতি কিছুকাল হতে 'সব মানুষের দেশ' দেশ রাশিয়া থেকে ভারতীয় ভাষায় প্রতিদিন নিয়মিত অনুষ্ঠান সুরু হয়েছে। ভারতীয় ভাষার মধ্যে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে বাংলা ও হিন্দুস্থানীকে। মস্কো বেতার কেন্দ্র থেকে ভারতীয় সময় সন্ধ্যা ৭-১৫ থেকে ৭-২৯ মিঃ পর্য্যন্ত প্রতিদিন বাংলা ভাষায় অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়ে থাকে। আপনারা যাঁরা এবিষয়ে উৎসাহী তাঁরা উপরি' উক্ত সময়ে ১৯-৪৯ মিটারে এই অনুষ্ঠান শুনতে পারেন।

'বিচিত্রা' সংবাদ

লণ্ডনের বি, বি, সি-ও (British Broadcastng Corporation) ভারতীয় নানা ভাষায় অনুষ্ঠান প্রচার করে থাকেন। এর মধ্যে বাংলা ভাষায় প্রচারিত অনুষ্ঠান 'বিচিত্রা' এদেশের বেতার-শ্রোতাদের জীবনে কিছু বৈচিত্র্য এনেছিল। এই অনুষ্ঠানের পরিচালক শ্রীকমল বোস-এর কৃতিত্ব সমধিক। বি-বি-সি-প্রচারিত অনুষ্ঠান 'বিচিত্রা' কোলকাতা বেতার কেন্দ্র কর্তৃক পুনঃপ্রচারিত হওয়ার দরুন সাধারণ বেতার শ্রোতাদের এই 'বিচিত্রা' অনুষ্ঠান শোনবার অনেক সুবিধা হয় এবং এই অনুষ্ঠানের জনপ্রিয়তার মূলে কোলকাতা বেতার এর 'রিলে'র দান অনেকখানি। সম্প্রতি কিছুকাল 'বিচিত্রা' প্রতি শনিবার সন্ধ্যা ৭টার (ভারতীয় সময়) পরিবর্ত্তে রাত্রি ৮॥ টায় প্রচারিত করার ফলে কোলকাতা বেতার কেন্দ্র রিলে বন্ধ করে দেন—রিলে পুনঃপ্রবর্ত্তনের জন্য অনেক লেখালিখি আজও হচ্ছে। সাধারণ মানুষের ধারণা 'বিচিত্রা' বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু 'বিচিত্রা' প্রতি শনিবার রাত্রি ৮॥ টায় ১৩ ও ১৯ মিটারে বি-বি-সি থেকে নিয়মিত প্রচারিত হচ্ছে। সাধারণ

শ্রোতাদের এই আনন্দকর অনুষ্ঠান শোনার থেকে বঞ্চিত করার জন্যে আমরা প্রতিবাদ জানাই এবং অবিলম্বে যাতে এই অনুষ্ঠান আবার নতুন করে 'রিলে' করার ব্যবস্থা হয়—সেজন্য অল ইণ্ডিয়া রেডিও ও বি-বি-সি'র কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানাচ্ছি।

প্রথম মহিলা কন্‌ট্রোলার

মিস্ ম্যারি সোমারভিলি—বি-বি-সি'র বক্তৃতা বিভাগের প্রথম মহিলা কন্‌ট্রোলার নিযুক্ত হয়েছেন। এর আগে কোন মহিলাকে এমন গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করা হয় নি। মিস্ সোমারভিলি ১৯২৫ সালে অক্সফোর্ড থেকে গ্রাজুয়েট হবার পর বি-বি-সি'র বিদ্যার্থীমণ্ডল অনুষ্ঠানে যোগ দেন। ১৯২৭ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্য্যন্ত ছাত্রদের জন্য নির্দ্দিষ্ট এই অনুষ্ঠানের সমস্ত দায়িত্বভার তাঁর ওপর ছিল।

(ওপরে) শ্রীমতী ভারতী দেবী, শীঘ্রই এঁকে 'দুর্গেশনন্দিনী' ছবিতে 'আয়েষা' চরিত্রে দেখা যাবে

'কমল কে ফুল' ছবিতে শকুন্তলা ও অমরনাথ

(পাশে) অলিভিয়া ডি হেভিল্যাণ্ড সম্প্রতি ওয়াশিংটনের ন্যাশনাল উইমেন্‌স্ প্রেস ক্লাব কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হন।

মার্থা গ্রাহাম—মার্কিন্ নর্ত্তকী, ইনিও সম্বর্দ্ধনা লাভ করেছেন

গোয়েন্দা

পরিচালক অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায় খুব তাড়াতাড়ি ছবি তোলার এক রেকর্ড রেখেছেন, আর একজন পরিচালকও আর একদিক দিয়ে বোধ হয় পৃথিবীর রেকর্ড রাখলেন। তাঁর নাম শ্রীফণী গঙ্গোপাধ্যায়। ইনি এক বছরের মধ্যে পাঁচটি ছবির শুভ মহরৎ করেছেন, একটি ছবিও শেষ হয় নি। শুভ রথ-যাত্রার দিন তাঁর সাম্প্রতিক ছবি "ছবির মত"-শুভ (!) মহরৎ অনুষ্ঠান ফণীবাবু অনেকদিন মনে রাখবেন।

ক্যালকাটা মুভিটোন ষ্টুডিওতে ছবি তোলার ব্যবস্থা ক'রে অগ্রিম হিসাবে পাঁচশ' টাকার এক চেক প্রযোজক দেন। তা ফেরৎ আসে; 'মহরৎ' বন্ধ হয়—সুতরাং নগদ টাকা দিয়ে প্রথম ফাঁড়া কাটে। তারপর মহরতে খাওয়ানোর জন্য কোনও এক প্রসিদ্ধ খাবারের দোকানের খাবার আনার পর একটি চেক দেওয়া হ'ল, সে চেক্ ফেরৎ। নগদ ছাড়া খাবারের দোকানের মালিক আর মানবেন না; তাই আবার নগদ খরচ করতে হল। আরও তিনটে চেক ফেরতের সংবাদ আমাদের কানে এসেছে—তা হয়েছে নায়িকার ভূমিকায় মীরা সরকারের অভিনয়ের জন্য দেয় অগ্রিম টাকার চেক, ট্যাক্সি-ড্রাইভারকে ভাড়া বাবদ বাহাত্তর টাকার চেক ও প্রোডাকসনের সহকারীকে দেয় ষোল টাকার একটি চেক। সুনীল দানগুপ্তের চেক ও নাকি ফেরৎ এসেছে।

হয়ত প্রযোজক প্রত্যেকের টাকাই মিটিয়ে দেবেন, কিংবা এতদিনে দিয়েছেন—কিন্তু বাজে চেক ছড়ানো কেন?

●

বোম্বাই এর চিত্রনট ও চিত্রনটী দেব আনন্দ ও সুরাইয়ার এর বিবাহ নিয়ে বিশেষ জল্পনা কল্পনা চলছিল। গত ৮ই জুলাই দেব আনন্দ কোলকাতায় সাংবাদিকদের জানিয়েছেন যে ও গুজব বাজে, ভিত্তিহীন। তিনি সুরাইয়াকে বিয়ে করবেন না। (vice versa ইতি 'নরাধম') বেচারা সুরাইয়া।

●

চলচ্চিত্র অনুসন্ধান সমিতি কোলকাতায় এলেন, গেলেন। বক্তব্য পেশ করলেন প্রায় পঞ্চাশ জন। এত কথার মধ্যে আমার পাঁচ জনের কথা বেশ ভাল লেগেছে।

"ঘাঘরা ঘোরে, ওড়না ওড়ে" মার্কা ছবির প্রযোজক শ্রী সরোজ মুখার্জি বলেছেন বাংলা দেশের সেন্সর বোর্ড যথাযোগ্য ছবি তোলার ব্যাপারে বাধা সৃষ্টি করে আসছেন। সরোজ বাবু বলতে পারেন এ কথা—তাঁর "অভিমান", "জিপসী মেয়ে" ও "অপবাদ" ছবি তিনটিতে বোধহয় সেন্সর বোর্ড একটু বাধা সৃষ্টি করেছিলেন

"রাধারাণী" ছবির চিত্রনাট্য রচয়িতা শ্রীসজনীকান্ত দাসের মত নিঃস্বার্থপর লোক খুব কম দেখা যায়। তাঁর চিত্রনাট্য রচনার ব্যর্থ প্রচেষ্টার ফলপ্রসূত অত্যন্ত বাজে ছবি "রাধারাণী" দেখেই বোধহয় চলচ্চিত্র অনুসন্ধান সমিতিকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে এ ধরণের বাজে ছবি একেবারে বন্ধ করা যায় কিনা! উত্তর হয়েছে, যায়, কিন্তু সজনীবাবু কি তবে চিত্রনাট্য-রচনা ছেড়ে দেবেন?

কানন দেবী বলেছেন যে প্লে-ব্যাকে গান গাওয়া বাদ দিয়ে গান-জানা চিত্র-তারকা দিয়ে ছবি করা উচিত। আমিও তাই বলি; কানন দেবী গান জানেন।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন যে ভাল গল্প-লেখকের অভাব নেই। "রঙ বেরঙ", "ঘুমিয়ে আছে গ্রাম,"

সন্ধ্যা-"বেলার রূপকথা" বা "একই গ্রামের ছেলে" দেখার পর কে একথা অবিশ্বাস করবে?

শশী রায় নামে এক চিত্র-সাংবাদিক জানিয়েছেন যে পত্র-পত্রিকার সমালোচনা দেখে ছবির উৎকর্ষ বিচার করা উচিত নয়। কারণ, যে কাগজ ছবির বিজ্ঞাপন পায় তারা ভাল সমালোচনা করে, আর যারা বিজ্ঞাপন পায় না তারা ছবির ভাল সমালোচনা করে না। এ কথা জানতাম না, ইংরাজী "রূপকথা" পড়ে জানলাম।

●

নিউ থিয়েটার্সের ছবি বলতে দর্শক যেমন একটা কিছু ধারণা করে নেয়, প্রযোজক সরোজ মুখার্জির ছবি বলতেও দর্শকদের একটা অবশ্য কিছু ধারণা আছে। সেদিক দিয়ে সরোজবাবু ভাগ্যবান। দুর্ভাগ্য তাঁর এই যে তাঁর 'অভিমান' ছবিটি বোম্বাই শুধু বহুপূর্বে 'দিনরাত' নাম দিয়ে নকল করেছে তা নয়, 'রূপসী মেয়ে'টিও বহুপূর্বে 'কাজল' নাম দিয়ে নকল ক'রে বসে আছে। এমন কি, আশ্চর্য্যের বিষয় তাঁর সাম্প্রতিক 'অপবাদ' এর নকল 'গ্রহস্থী'ও বহুপূর্ব্বেই গ্যাঁড়া মারা। এখন যদি তাঁর 'মর্য্যাদা' বোম্বাই 'হামারি গলিয়া' নাম দিয়ে আগে নকল করে থাকে তবে আমরাই গলিয়া যাইব। তারও পরের ছবিটি কি দুটি ইংরাজী ছবি আগে থেকেই নকল ক'রে বসে আছে?

●

বিজলী ছবিঘরে: একটি কবিতার দুটি লাইন দর্শকদের প্রতি করুণ নিবেদন করছে। শেষের লাইনটি তার 'মিছেই দিলে অপবাদ, মধুই শুধু চাখলে না।' মানে করলে বোধহয় এই দাঁড়ায় যে আগের ছবি দুটো দেখে 'অপবাদ'কে শুধুই অপবাদ দিলে, মধু চাখলে না—অর্থাৎ টিকিট কেটে ছবিটি দেখলে না। কিন্তু ভুল ভাঙল যখন আর এক ভদ্রলোক ওই লাইনটির শুধু অর্থ করে দিলেন। লাইনটি সরোজ বাবুর আত্ম-জিজ্ঞাসা। অর্থাৎ হে সরোজ, তুমি শুধু শুধুই 'অপবাদ' ছবিটি দিলে, 'মধু' অর্থাৎ 'মাইকেল মধুসূদন' (যা 'অপবাদ' এর সামনেই চলছে) ছবিটি দিতে পারলে না বা দেখলে না। সাধু! সরোজ মানেই তো পদ্ম, যা—

●

প্রশ্ন

বোম্বাই-মার্কা মহিলা কুম্ভিগীর দেখেছেন? কোনও একটি বাংলা ছবির তা-ই আকর্ষণ। ছবিটির নাম কি?

●

রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা'র কিটি অমিতের পেছনে ঘুরত, আর সম্প্রতি এক প্রযোজক একটি কিটির পেছনে ঘুরছেন। এই কিটির বিশেষ ধরণের সজ্জায় কোনও এক ইন্ডিয়ান শোরুম ইন্ডিয়ায় প্রায় শ'খানেক লোকের ভিড় জমে গেছিল। সাধু আর চোর্সির জয় হোক।

●

সত্য কথা বলতে কি 'নাগেরদোলা'র এক পাঠক 'চিত্রবাণী'র সম্পাদককে পত্রাঘাত করে আমাকে একেবারে বিস্ময়-বিমূঢ় করে ফেলেছেন। সম্পাদক মহাশয়ের এই দু'মাস ধ'রে ধারণা ছিল, 'নাগরদোলা' কেউ পড়েন না, তাই 'নবাধম'কে বরখাস্ত করবার কল্পনা করছিলেন, পত্রাঘাতকারীকে সেজন্য আন্তরিক ধন্যবাদ।

একেবারে ব্যাকরণ বিশুদ্ধ (!) ইংরাজীতে ১৩৩, আপার সার্কুলার রোড থেকে এ বর্মাকের চিঠির পত্রোদ্ধার করে জানতে পারলাম যে আমরা নাকি কোনও এক চিত্র-তারকার (যাঁর নাম তিনি জানিয়েছেন, আমরা জানালাম না) নামে গত দুই সংখ্যায় অসত্য এবং কাল্পনিক কাহিনী সন্নিবেশ করেছি। আশ্চর্য্য যে তিনি এই 'কাল্পনিক' কাহিনী থেকে চিত্র-তারকার নামটি কি করে খুঁজে বের করলেন। মনে হয়, এই কাল্পনিক কাহিনীর ইতিবৃত্ত তাঁর কানেও গিয়ে হয়ত পৌঁচেছে। এ ধরণের কাহিনী চালু হলে চিত্র-তারকার জনপ্রিয়তা হ্রাস হয়, সে কথা পত্র-লেখকের সঙ্গে একমত হয়েই আমরা বলছি যে যাতে এ ধরণের কাহিনী চালু না হয়, তার দায়িত্ব চিত্র-

ফেমাস পিক্‌চার্সের মুক্তি-প্রতীক্ষিত চিত্র-নিবেদন 'কমল-কে-ফুল' চিত্রে শ্রীমতী সুরাইয়া

ভারত জাতীয় চিত্র-প্রতিষ্ঠানের আগত প্রায় 'সে নিল বিদায়' চিত্রে এক বিশিষ্ট-ভঙ্গিমায় শ্রীমতী স্মৃতিরেখা

তারকাদেরই। শুধু তাঁদের অবগতির জন্য এবং তাঁদের সাবধান করার জন্যই তাঁদের নাম গোপন রেখে কাহিনীগুলি জানানো হচ্ছে। এতে উপকার না হ'লে তাঁদের নাম প্রকাশ করে কাহিনীগুলি পাঠকদের জানানো হবে।

এক ষ্টুডিওতে কোনও এক পরিচালকের কাছে শুনলাম যে চিত্র-শিল্পের ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত কাহিনী প্রকাশ করা সুরুচির পরিচায়ক নয়—তাঁর কাহিনী প্রকাশিত হয়েছিল বলে কিনা জানি না। আমাদের মনে হয় ব্যক্তিগত কাহিনী ব্যক্তিগত করে রাখাই উচিত, সকলের সামনে তা তুলে ধরলে তা নিয়ে পাঁচজনে আলোচনা করবেই।

●

বাংলা দেশে বিশেষ ধরণের ছবির প্রযোজক স্বনামধন্য সরোজ মুখার্জীর (যিনি চলচ্চিত্র-অনুসন্ধান সমিতির কাছে সেন্সর বোর্ড সম্বন্ধে অভিযোগ জানিয়েছেন) নির্মীয়মান ছবি "মর্য্যাদা"তে আশ্চর্য্যের সঙ্গে লক্ষ্য করলাম যে তাঁর পুরাতন বন্ধুরা অর্থাৎ মেয়েলি-নায়ক পরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'জিপসী মেয়ে'র বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন দাস ও অবনী বন্দ্যোপাধ্যায় নেই। আমাদের নিমাই ষ্টুডিওর দরজায় দাঁড়িয়ে পাঁচজনের কাছ থেকে সত্য-মিথ্যা পাঁচ কথা শুনে থাকে। তাকে কারণ জিজ্ঞাসা করায় বললে যে বন্ধু-বিচ্ছেদ টাকা কে ধার দেবে তাই নিয়েই। অর্থাৎ সরোজ মুখার্জীর কণক ডিষ্ট্রিবিউটার্সের কাছ থেকে নিউ (ইণ্ডিয়া) থিয়েটার্স টাকা নিয়ে ছবি করার পর প্রাথমিক আয়ের টাকা ডিষ্ট্রিবিউটার্স অর্থাৎ সরোজবাবু নেওয়াতে অন্যান্য অংশীদার নাকি মনক্ষুন্ন হয়ে প্রতিবাদ জানান এবং সব টাকা যদি ওদিকেই চলে যায় তবে নিউ (ইণ্ডিয়া) থিয়েটার্স পেল কি? সরোজবাবু নাকি জানিয়েছিলেন যে, যে কোনও ডিষ্ট্রিবিউটার্সের কাছ থেকে টাকা ধার করলেই তাঁরা আগে নিজের টাকা সুদসমেত গুণে নেবেন। তখন অংশীদাররা জানালেন তবে অন্য ডিষ্ট্রিবিউটার্সের কাছ থেকে টাকা ধার নেওয়া হোক্। সরোজবাবুর প্রতিবাদ—আমি থাকতে আবার অন্য ডিষ্ট্রিবিউটার কেন? ফলে 'ভবানী কন্যা মন্দির'।

আবার নাকি নিউ (ইণ্ডিয়া) থিয়েটার্সকে কায়কল্প করে বাঁচানো হবে। তবে পুরাতন দুই বন্ধুকে সরে যেতে হবে কিছু টাকা নিয়ে এবং পরে আর এক 'বন্দ্যো-মতি-সাদা'কেও সরতে হতে পারে।

●

বিশ্বাস করুন, সেদিন মিনার সিনেমায় 'অপবাদ'এর বিশেষ প্রদর্শনীতে নিমন্ত্রিত হ'য়ে গিয়েছিলাম। নিমন্ত্রণের ঘটা ছিল, চায়ের আয়োজনও ছিল—কিন্তু এক কাপ ক'রে চা যে অর্দ্ধেক নিমন্ত্রিত ব্যক্তি পান নি সে কথা জানাতে এ কাহিনীর অবতারণা নয়। বিশেষ সংবাদ-পত্রের একজন প্রতিনিধি ব্যতীত আর কাউকে যে সমাদর করা বা চা দিয়ে পরিতৃপ্ত করা হয় নি এ কথাও জানাতে বসি নি।

আমার কথা হচ্ছে যে 'অপবাদ' ছবিটি নাকি কেবলমাত্র প্রাপ্ত-বয়স্কদের জন্য, কিন্তু সেই বিশেষ প্রদর্শনীতে বাপ মায়ের সঙ্গে এত অপ্রাপ্ত-বয়স্ক ছেলেমেয়ের ভিড় কেন? আর বাপ-মা বা অভিভাবকের বুদ্ধিই বা কেমন যে তাঁরা 'প্রাপ্ত-বয়স্কদে'র ছবি জেনেও সঙ্গে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের আনেন? সাধারণ চিত্রগৃহের ম্যানেজারদের সেন্সর বোর্ড ছোটদের এ ধরণের ছবিতে প্রবেশাধিকার দিতে নিষেধ ক'রে বিজ্ঞপ্তি দিয়েছেন; কিন্তু এই ধরণের বিশেষ প্রদর্শনীতে আইনের ব্যতিক্রম হ'লে কি হবে, সেন্সর বোর্ড সে কথা জানাবেন কি?

রূপতরঙ্গ

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

বাণী-চিত্রে "যুগদেবতা"

বিপুল মঞ্চসাফল্যমণ্ডিত রূপকনাট্য হিসেবে 'যুগদেবতা'র ব্যাপক জনপ্রিয়তার কথা আপনাদের অজানা নয়। একাদিক্রমে ২৭০ রাত্রি ধরে একই রঙ্গমঞ্চে চলবার পরেও আজও তার আকর্ষণ বিন্দুমাত্র হ্রাস পায় নি।

নাট্যকলার একনিষ্ঠ সেবক অক্লান্তকর্মী 'শ্রীকালিদাস' এই নাটকখানি মঞ্চস্থ করে দেশের ও দশের শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন। মঞ্চের ওপর এর অভিনয় সীমাবদ্ধ থাকায়, তার বহুল প্রচারের পথে যে বাধা ছিল, আজ নাটকটি বাণী-চিত্রের মাধ্যমে নব কলেবর ধারণ করায় সে বাধা অতিক্রম করবার ক্ষেত্র বিস্তৃত হ'ল।

'যুগদেবতা'—শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের পূত জীবনীর পূর্ণাঙ্গ আলেখ্য। তাঁর চরিতকথা ও কথামৃত আমাদের শক্তির উৎস। এ সেই শক্তি—এ সেই উৎস, যা একদিন সৃষ্টি করেছে বীর বিবেকানন্দের মত ত্যাগী সন্ন্যাসীদের, আর যা একদিন এই মরণোন্মুখ, আত্মবিস্মৃত জাতিকে পতনের হাত থেকে রক্ষা করে, এগিয়ে দিয়ে গেছে পরম কল্যাণের পথে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাব ও বাণী আমাদের জাতীয় জীবনের অমূল্য সম্পদ, যার ধারা বংশানুক্রমে আমাদের ভেতর প্রবাহিত। আমরা তার উত্তরাধিকারী।

সর্বকালে যা প্রাণবন্ত, সকল যুগে যা শক্তিময়, সেই ভাব-বাণী-ও-সঙ্গীতে সমৃদ্ধ অপূর্ব জীবনী-কথা, বাণীচিত্রের আঙ্গিকে নবরূপে নিপুণভাবে পরিবেশিত হয়েছে এই চিত্র-নাট্যে। প্রকাশ যে, আলোকচিত্র, শব্দানুলেখন ও দৃশ্যপটাদি বিন্যাসের দিক থেকে ছবিখানি অসাধারণ হয়ে উঠেছে। বাণীচিত্রে সন্নিবেশিত ভজনগান, ভক্তি ও ভাব সংগীত এবং পদকীর্তনাদি তার বাণী ও সুরের শুদ্ধতা ও স্বাভাবিকত্ব রক্ষা করে অতি নিপুণভাবে পরিবেশিত হয়েছে বলে জানা যায়।

প্রাইমা ফিল্মস (১৯৩৮) লিমিটেডের পরিবেশনাধীনে এই সৃষ্টিধর্মী জীবনী চিত্রখানি আগামী মহাপূজার পূর্বেই সারা বাংলাদেশের পর্দার বুকে প্রতিফলিত হ'বে—কর্তৃপক্ষ এ খবর আমাদের জানিয়েছেন। এই ছবির মূল ভূমিকাগুলিতে চিত্রাবতরণ করেছেন, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, নীতিশ মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী চন্দ্রাবতী, রমা চৌধুরী, ভবত চৌধুরী, জ্যোতির্ময়কুমার ও হরিধন। পরিচালনা ও সুরারোপ করেছেন যথাক্রমে বিধায়ক ভট্টাচার্য ও রামচন্দ্র পাল।

মহরৎ

গত ১লা শ্রাবণ পি, আর্ট্‌স প্রোডাকশন্সের প্রথম চিত্র-নিবেদন 'ফণী-মনসা'র শুভ মহরৎ অনুষ্ঠান নিষ্পন্ন হয়ে গেছে। ছবিটি প্রযোজনা করছেন শ্রীমনীন্দ্রনাথ শর্মা। অরোরা ফিল্মস্ ষ্টুডিয়োতে চিত্রগ্রহণ কার্য্য সুরু হয়।

দিল্লীর সর্ব্বপ্রথম ফিল্ম ষ্টুডিয়ো

ভারতের রাজধানী দিল্লীর সমস্ত সৌন্দর্য্য-সুষমার মধ্যে কোথায় যেন একটা খুঁত থেকে গিয়েছিলো. এবার সেটি পূরণ হবে। জানা গেছে দিল্লীর উপকণ্ঠে ছ' মাইল দূরে সর্বপ্রথম ফিল্ম ষ্টুডিয়ো এবং ল্যাবরেটরী স্থাপিত হতে চলেছে। এ বিষয়ে উৎসাহী হয়েছেন শ্রীযুত বি, ডি, লেট। তিনি ভারতের চলচ্চিত্রশিল্পের জনক দাদা ফালকের সহকর্মী ছিলেন। শ্রীযুত লেটের উদ্যোগে নব-প্রতিষ্ঠিত ষ্টুডিয়োটির নামকরণ হয়েছে 'রিপাব্লিক ষ্টুডিয়োজ (ভারত) লিমিটেড'।

শিল্পী সম্বর্ধনা

'কঙ্কাল' চিত্রের সাফল্যের জন্য সম্প্রতি উত্তরা সিনেমায় পরিচালক নরেশ মিত্র ও অভিনেতা ধীরাজ ভট্টাচার্যকে সম্মানিত করবার এক আয়োজন করা হয়েছিল। 'ছাত্র সংহতি'র উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই সম্বর্ধনা সভায় সুখ্যাত কথাশিল্পী ও চিত্র-পরিচালক প্রেমেন্দ্র মিত্র পৌরোহিত্য করেন। পরিচালক নরেশবাবু ও মূল অভিনেতা ধীরাজবাবুকে এই প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে দু'টি মানপত্র প্রদান করা হয় এবং সাফল্যের স্মরণিকা হিসাবে যথাক্রমে এই দুই গুণী শিল্পসেবককে পার্কারের লেখনী সেট ও স্বর্ণময় 'রোলেক্স' হাতঘড়ি উক্ত ক্লাবের পক্ষ থেকে প্রদান করা হয়।

'ছাত্র সংহতি' এইভাবে উদ্যোগী হয়ে দেশের দুই গুণী শিল্পীকে সম্মানিত করায় সভ্যদের গভীর শিল্পপ্রীতির তারিফ করে সভাপতি প্রেমেন্দ্র মিত্র ও সাংবাদিক সুধাবেন্দ্র সান্যাল তাঁদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

আনন্দমঠ

নিউ-স্ক্রীণ-প্লেজ লিঃ-এর প্রথম নিবেদন বঙ্কিমচন্দ্রের অমর কাহিনী 'আনন্দমঠ' লব্ধ-প্রতিষ্ঠ পরিচালক সতীশ দাসগুপ্তের পরিচালনায় ইতিমধ্যে অর্ধেকেরও বেশী তোলা হ'য়ে গেছে। প্রধান চরিত্রে বিশিষ্ট শিল্পীরা রূপ দিচ্ছেন।

কমল-কে-ফুল

সুবাইয়া প্রতি বছরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে কমপক্ষে আট দশখানা চিত্রে অবতরণ করেন। কিন্তু যখনই তিনি ফেমাস্ পিকচার্সের প্রযোজিত কোনো চিত্রে অবতরণ করেছেন তা' ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। ইদানীংকার চিত্রগুলির মধ্যে "পিয়ার-কী জীত" এবং "বড়ি বাহেন"-এর নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

কমল-কে-ফুল কাশ্যপ প্রযোজিত এবং সুবাইয়া অভিনীত ফেমাসের নবতম চিত্র-নিবেদন। বোম্বাই এবং মধ্যভারতে চিত্রটি যেরূপ আলোড়নের সৃষ্টি করেছে তা' সত্যই বিস্ময়কর। আমরা আশা করি কোলকাতায় চিত্রামোদীদের কাছে এই চিত্রটি সমান জনপ্রিয়তা অর্জন করবে। শীঘ্রই বিভিন্ন চিত্রগৃহে এটি মুক্তিলাভ করবে।

এম্ পি'র পরবর্ত্তী ছবি

সুলেখক সলীল সেনগুপ্তের কাহিনী অবলম্বনে এবং সুকুমার দাশগুপ্তের পরিচালনায় এম পি প্রোডাকসন্সের পরবর্ত্তী ছবি 'প্রত্যাবর্ত্তন'-এর কাজ ন্যাশানাল সাউণ্ড ষ্টুডিওতে সুরু হবে। কাহিনীটি অভিনব, এবং মনস্তত্ত্ব-মূলক। সাধারণ জীবনের ঘটনাবলীকে কেন্দ্র ক'রে এর কাহিনী সুরু। দৈনন্দিন জীবনে যে সমস্ত ঘটনা ঘটে তা' আমাদের অজ্ঞাতে ভবিষ্যতের গতিকে কিভাবে নিয়ন্ত্রিত করে তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্তই এই কাহিনীর মূল কেন্দ্র।

ভক্ত রঘুনাথ

শ্রীযুক্ত সত্যাংশু কিরণ দালালের প্রযোজনায় ভারতী চিত্রপীঠের দ্বিতীয় নিবেদন "ভক্ত রঘুনাথ"-এর কাজ ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিয়োতে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চ'লেছে, শ্রীচৈতন্য-সহচর সপ্তগ্রামের রাজকুমার রঘুনাথ দাস গোস্বামীর জীবনী অবলম্বনে আলোচ্য চিত্রনাটটি গড়ে উঠেছে। চিত্রনাট্য রচনা করেছেন নাট্যকার দেবনারায়ণ গুপ্ত এবং তিনিই পরিচালনার ভার গ্রহণ করেছেন। সুর সংযোজনা ক'রেছেন শ্রীযুক্ত বিভূতি দত্ত। শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক বহু চরিত্রের অবতারণা করা হ'য়েছে এই চিত্রনাট্যে। রথযাত্রার ও পুরীর অন্যান্য দৃশ্যগ্রহণের জন্য পরিচালক গুপ্ত সদলবলে গত ১০ই জুলাই পুরীযাত্রা করেন। প্রকাশ, পুরীর দৃশ্যগুলি বিশেষ নিপুণতার সঙ্গে গ্রহণ করা হয়েছে। 'ভক্ত রঘুনাথে'র বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করছেন সন্দীপ্তা রায়, অপর্ণা দেবী, সন্তোষ সিংহ, গুরুদাস, ফণী-রায় অনুপকুমার, সুশীল রায়, দেবীপ্রসাদ, হরিমোহন, সুধাংশু মুখোপাধ্যায়, রাধারমণ, প্রভাতশঙ্কর, সাধন লাহিড়ী, তারা ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি।

আন্দোলন

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ রাজত্বের শাসন আর শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হলো আর পাশে এসে দাঁড়ালো চাষী ও মজুর, যুবক ও বৃদ্ধ, কিশোর আর নারী। পরবর্ত্তী স্মরণীয় বছরগুলিতে ১৯ সালে নাগপুর কংগ্রেস, ১৯৩০ সালে ডাণ্ডি মার্চ্চে ওঠে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ

তারপর রচিত হলো ১৯৪২ সালের রক্তরাঙা অধ্যায়। আগষ্ট বিপ্লবের মূল উৎস ছিল জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর বাণী 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে'। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা ছাত্র ও যুবা, শিক্ষক ও কর্মজীবী সকলেই মেতে উঠেছিল ভারতকে শৃঙ্খলমুক্ত করার আয়োজনে। প্রাণের বাঁধ সেদিন ভেঙে গিয়েছিল, কারও অন্তরে ছিল না কোনো পিছনের দিকে ফিরে চাওয়ার অভিলাষ। সকলেই এগিয়ে চলেছে জাতীয় পতাকা হাতে, উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে এক জাতি, এক প্রাণ, -একতা'র ভাব মনে রেখে। কত কিশোর-প্রাণ, কত চাষী মজুরের আর কত যুবকের

দেহ লুটিয়ে পড়লো রাস্তার ধূলিতে, বয়ে গেল তাদের তপ্ত রক্ত। এত রক্তক্ষয় ও আত্মবলিদান দিয়ে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ভারতের জীবনে এনেছিল ঊষার নূতন আলোক—সে হলো স্বাধীন।

সবকিছুই দেখানো হয়েছে 'আন্দোলন' চিত্রে। চারু দত্তের ভূমিকাটিকে কেন্দ্র ক'রে তাঁদের পরিবারের সুখদুঃখের অংশের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলেছে এই ছবির কাহিনী। ছবির কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সমসাময়িক পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে, যেমন যোজিত হয়েছে ঘোড়ার ট্রামের দৃশ্য এবং আরও অনেক কিছু।

'আন্দোলন' হলো হিন্দী ভাষায় তোলা চিত্ররূপ আর 'Our Struggle' হলো এরই ইংরাজী সংস্করণ।

ছবিটি তোলা হচ্ছে বোম্বাইতে। শশধর মুখার্জীর ব্যবস্থাপনায় ফিল্মিস্তান লিমিটেড এটির প্রযোজনা করেছেন। পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন ফণী মজুমদার। সঙ্গীত পরিচালনার ভার নিয়েছেন পান্নালাল ঘোষ। অভিনয়ে অংশ নিয়েছেন বহু নতুন অভিনেতা অভিনেত্রী।

ডাঃ দাসগুপ্তের ইন্দ্রজাল প্রদর্শনী

ডাঃ এস, আর দাসগুপ্ত, এম, বি সম্প্রতি নিউ এম্পায়ারে এক রবিবার সকালে কার্নিংহেমের একটি স্কুল ও ডঃস্থাগারের সাহায্যকল্পে এক ইন্দ্রজাল প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। অনুষ্ঠানটির আয়োজন করেছিলেন শ্রীঅমর হালদার ও শ্রীনির্মল সরকার।

সাম্প্রতিক কালে কোলকাতা সহরে যেন ম্যাজিক শো'র ঢেউ উঠেছে। পি, সি, সরকার, প্রফেসর সোম গোগিয়া পাশা প্রভৃতির কত রঙই না রঙ্গমঞ্চে দেখলাম। পুরাতন ধরণের একই রকমের খেলা প্রায় সকলেরই দেখা গেল—উনিশ বিশ তফাৎ নেই। কেবলমাত্র প্রচারের ঢাকে কাঠি বাজিয়ে এঁরা আসর মাৎ করেছেন।

কিন্তু ডাঃ দাসগুপ্তের ম্যাজিক এই সব তথাকথিত যাদু-সম্রাট ও যাদু-রাজার থেকে পৃথক। প্রথমতঃ ইনি এ্যামেচার এবং ভারতের অ্যামেচার যাদুকরদের মধ্যে ইনি শ্রেষ্ঠ, দ্বিতীয়তঃ ব্যক্তিগত জীবনে ইনি ডাক্তার, ডাক্তারী জীবনের বিরামহীন অবসরের মধ্যেও তিনি সময় করে নেন সাহায্যাভিনয়ের নিজ সৃষ্ট ইন্দ্রজাল প্রদর্শনের জন্য এবং তৃতীয়তঃ এ পর্যন্ত যে ক'টি প্রদর্শনী ডাঃ দাসগুপ্ত করেছেন তার প্রত্যেকটিতে তিনি নিত্য নতুন যাদুর খেলা দেখিয়েছেন। সমাজ জীবনের নানা প্রশ্ন এবং সাংস্কৃতিক বিষয়ের মধ্যে রূপায়িত হয়ে সমাধানের পথ খুঁজে নিয়েছে। অন্য যাদুকরদের সঙ্গে ডাঃ দাসগুপ্তের তফাৎ এই সব দিক দিয়ে। সাম্প্রতিক প্রদর্শনীতে তাঁর 'টি পার্টি' 'বাস্তহারার প্রার্থনা' তাঁর শিল্পমনের বাস্তববোধের অপরূপ নিদর্শন। নাড়ীর গতিকে স্তব্ধ এবং হৃদযন্ত্রকে নিয়ন্ত্রিত করা উপস্থিত বিজ্ঞ চিকিৎসকদের বিস্ময় উৎপাদন করে। অতি সাধারণ পোষাকে (ধুতি পাঞ্জাবী আর গান্ধী টুপি পরে) যাদুবিদ্যা দেখানো তার বৈশিষ্ট্যের অন্যতম পরিচয়। ডাঃ দাসগুপ্তের সহকারী হিসাবে [illegible] ঘোষ, সহকারী উমা দাসগুপ্তা [illegible] শিল্পীদের নাম উল্লেখযোগ্য।

আপনি কি বলেন?

পহেলা আদমী

মাননীয় সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,

নিউ থিয়েটার্স লিমিটেডের "পহেলা আদমী" চিত্রটী ভারতের গৌরব আজাদ-হিন্দ ফৌজের পটভূমিকায় রূপায়িত হয়েছে। যে বিরাট দীপ্তিমান মহাপুরুষ ভারতীয় ঐতিহ্য ও ভাবসাধনাকে মূর্ত্ত করে তুলেছিলেন, সেই নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর কয়েকটি পর্য্যায়কে ফুটিয়ে তুলতে কয়েকটি ঘটনাকে বেছে নেওয়া হয়েছে আলোচ্য চিত্রটিতে। এই চিত্রটী সম্পর্কে নিউ থিয়েটার্সের কর্ত্তৃপক্ষ এবং পরিচালক বিমল রায়কে ধন্যবাদ না জানিয়ে পারি না। বিশেষ করে নেতাজীর ভূমিকায় আর কাউকে যে নির্ব্বাচন করে তাঁরা হাস্যাস্পদ হবার ব্যবস্থা করেন নি তার জন্যও ধন্যবাদ জানাই।

ভূতপূর্ব্ব আই. এন. এ'র নাজির হোসেন সাহেব কাহিনীর মধ্যে এমন কোন অবান্তর ঘটনা বা সংলাপের সৃষ্টি করেন নি যাতে দর্শকগণের মনে অতৃপ্তি আসে।

স্মৃতিরেখা বিশ্বাস, অসিতা বসু, ডাঃ বিজয়কুমার, পাহাড়ী সান্যাল, বালরাজ প্রভৃতির চরিত্রগুলি সু-অভিনীত হয়েছে। ব্রহ্মদেশের দৃশ্যগুলির জন্য কমল বসু কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। সুর-স্রষ্টা রাইচাঁদ বড়াল মহাশয় সুরসৃষ্টির কাজে প্রশংসার দাবী করতে পারেন। নমস্কার নেবেন।

ইতি—সত্যেন ঘোষ,
এন. সি. চৌধুরী রোড, কসবা

পহেলা আদমী ও সমাধি

প্রিয় "চিত্রবাণী" সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,

"চিত্রবাণীতে" "আপনি কি বলেন?" বিভাগের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আসানসোলে "পহেলা আদমী" দেখে এলাম এবং দেখে আনন্দও পেলাম আর দুঃখও পেলাম এইজন্য যে, ওখানেই "সমাধি" চলছে, তাতে এত ভিড় যে বলা চলে না কিন্তু "সমাধি"র চেয়ে "পহেলা আদমী" বহু গুণে ভাল ছবি।

"পহেলা আদমী"তে একজন বাঙ্গালীর সঙ্গে একজন অবাঙ্গালীর দৌড়-প্রতিযোগিতা দেবার দরকার কি ছিল? এবং যুদ্ধের জায়গাগুলি আরও ভাল হওয়া উচিত ছিল।

"সমাধি" দেখে আমার কয়েকটা কথা মনে হয়েছে; তাই আপনাকে জানালাম—

"সমাধি"তে নেতাজীকে এত সামনাসামনি দেখিয়ে বিশেষ অন্যায় করেছেন বোম্বেওয়ালারা। শুনলাম, "নেতাজী"র ভূমিকায় যিনি অভিনয় করেছেন তাঁর নাম আনন্দ পাল এবং বাঙ্গালী, তাঁর এ ভূমিকায় নামার আগে এ সম্বন্ধে ভাবা উচিত ছিল।

বোম্বেওয়ালাদের কাছে নাচ, গান; দিল্লাগী ছাড়া আর অন্য কোন ভাল জিনিস আশা করা যায় না, 'সমাধি'ও এর ব্যতিক্রম নয়। "সমাধি"তে এত প্রেম আমদানী করার দরকার কি ছিল?

I. N. A. Captain কি নিজের কাজ ছেড়ে শুধু প্রেমই করতো?

আপনি আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার জানবেন। ইতি—

গোপাল চন্দ্র বসু
নেহরু রোড, রাণীগঞ্জ

কয়েকজন নবাগত শিল্পী

"চিত্রবাণী"-সম্পাদক মান্যবরেষু,

খুব সম্প্রতি যে ক'জন অভিনেতা পর্দায় আত্মপ্রকাশ করেছেন তাঁদেরই নবাগত অভিনেতা হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। নবাগত অভিনেতাদের সকলের সম্বন্ধে আলোচনা করা সম্ভব নয়। এঁদের মধ্যে যাঁরা অভিনয়-শক্তি দ্বারা জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছেন, তাঁদের সম্বন্ধে দর্শকসমাজের মতামত কি তাই নিয়েই এই আলোচনা।

নবাগত গোষ্ঠীভুক্ত অভিনেতাদের মধ্যে সর্বাগ্রে মনে পড়ে কমল মিত্রের কথা। অতি অল্প সময়ের মধ্যে নিপুণ অভিনয় দ্বারা ইনি অসামান্য জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন।

গম্ভীর কণ্ঠস্বর, সুষ্ঠু ও মননশীল অভিনয় এঁর সাফল্যের প্রধান কারণ। ইদানীং বহু চিত্রে অভিনয় করায় এঁর জনপ্রিয়তা কিছু হ্রাস পেয়েছে। তাছাড়া এঁর অধুনা-অভিনীত কতগুলি ছবিতে নিষ্ঠার অভাবও পরিলক্ষিত হয়েছে। এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন না হলে অর্জিত সুনাম ক্ষুণ্ণ হবার সম্ভাবনা আছে। এর পরই নাম করতে হয় রাধামোহন ভট্টাচার্য্যের। ইনি যে ধরণের চরিত্রে অভিনয় করে যশস্বী হয়েছিলেন, তার বিপরীত ধরণের চরিত্রে রূপদানের সুযোগ ইনি পেয়েছিলেন। কিন্তু দেখা গেছে ইনি তাতে সফল হতে পারেন নি। সুতরাং এই সিদ্ধান্ত করা বোধ হয় অন্যায় হবে না যে ইনি সব ধরণের চরিত্রে রূপদানে সক্ষম নন। এক বিশেষ ধরণের চরিত্রই এঁর সাফল্য অর্জনের উপযোগী। সুতরাং আমাদের মনে হয় অভিনয়ের দিকে বিশেষ না ঝুঁকে এঁর পরিচালনার ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করা উচিত।

এঁর পরই মনে পড়ে বিকাশ রায়ের কথা। এঁর তীক্ষ্ণ, বুদ্ধিদীপ্ত অভিনয় দর্শক-চিত্ত জয় করেছে। এঁর চেহারা নিয়ে অনেকে অভিযোগ করেন। চিত্রনট হলেই যে কার্তিকের মত দেখতে হবে এমন ধারণা করা অন্যায়। চিত্রনটের সুশ্রী হওয়া প্রয়োজন। তাঁর মধ্যে সুশ্রীতার অভাব আছে বলে মনে হয় না। তবে এঁর চলন-ভংগীটী উন্নত হওয়া দরকার। উপযুক্তভাবে পরিচালিত হলে ইনি শক্তিমান নটদের অন্যতম হবেন নিঃসন্দেহে। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় হালে বহু চিত্রে অভিনয় করছেন। কিন্তু এঁর সর্বপ্রথম অভিনীত চিত্রটী ছাড়া অন্য কোন চিত্রে ইনি আশানুরূপ কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন নি। কণ্ঠস্বর অত্যন্ত দুর্বল এবং ব্যক্তিত্বের অভাব আছে বলে মনে হয়।

প্রদীপ বটব্যাল সুদর্শন নায়ক হিসাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন চিত্রামোদীদের। কিন্তু অভিনয়ে কোনরূপ কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি। কেবলমাত্র সুচেহারার জোরে চিত্রজগতে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া দুষ্কর। তাই অভিনয়-শক্তির উৎকর্ষ সাধনে এঁর তৎপর হওয়া প্রয়োজন।

দীপক মুখোপাধ্যায়ের মধ্যে অভিনয় প্রতিভার স্ফুরণ আমরা লক্ষ্য করেছিলাম। কিন্তু আজকাল যেন স্তিমিত হয়ে আসছে। সুদক্ষ চরিত্রাভিনেতার মর্যাদা দেওয়া যায় শিশির বটব্যালকে। সংযত অভিনয় ও চরিত্রের যথাযথ রূপদান এঁর সাফল্যের প্রধান কারণ। সাধন সরকারের অভিনয়ে মঞ্চদোষ অত্যন্ত পরিস্ফুট। নায়কের ভূমিকায় অভিনয় না করে পার্শ্ব-চরিত্রে তাঁর অভিনয় করা উচিত।

সমস্ত নবাগত চিত্রশিল্পীদের সম্বন্ধে আলোচনা সম্ভবপর নয় বলে নীচে নবাগত শিল্পীদের একটী সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া গেল। সুযোগ-সুবিধা ও উপযুক্ত শিক্ষা পেলে এঁরা শক্তির পরিচয় দিতে পারেন বলেই বিশ্বাস।

বারেশ্বর সেন, শক্তিপদ ভাদুড়ী, সুনীল দাসগুপ্ত, শম্ভু মিত্র, কালী সরকার, পূর্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়।

নমস্কার নেবেন। ইতি—সুনীল রায়

আশু বিশ্বাস রোড, কলিকাতা।

চিত্র-বাণী

রেকর্ড প্রসঙ্গ
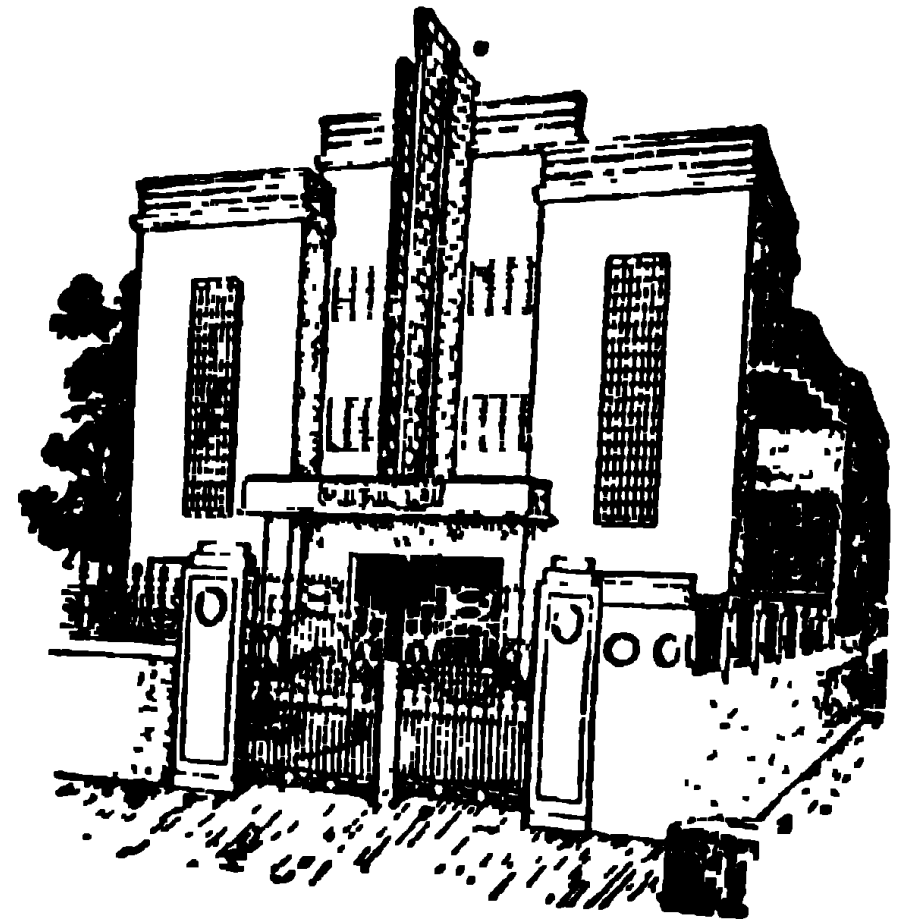
গতবারের রেকর্ড সমালোচনার পর কয়েকখানি ভালো রেকর্ড সম্প্রতি গত কয়েক মাসে বেরিয়েছে। তার মধ্যে আমাদের যেগুলি ভাল লেগেছে সেগুলির পরিচয় দিচ্ছি।

মার্চ্চ মাসে কলম্বিয়া রেকর্ড কোম্পানী যে ক'খানি আধুনিক বাংলা গানের রেকর্ড শ্রোতাদের উপহার দিয়েছেন তার মধ্যে GE 7664 রেকর্ডে বেলা মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া 'এই আছ এই নাই, ধরা ছোঁয়া নাহি পাই।' এবং 'বল কিবা চাওগো; কাছে এসে হেসে কেন দূরে সরে যাওগো॥'—গান দুখানির উল্লেখযোগ্য সুর দিয়েছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। গানের সুরের মধ্যে 'হেমন্ত-বৈশিষ্ট্য' বেশ ফুটে উঠেছে। G. E. 7651 রেকর্ডে অপরেশ লাহিড়ীর গাওয়া 'আমি চির অভিশপ্ত বিরহী যক্ষ গো রামগিরি পাহাড়ে। রচি মেঘদূত বেদনারই সুরে বিরহের গীতিহারে।' এবং 'ভিখারী নহি গো'—গান দু'খানির কথা ও সুরের মধ্যে শিল্পী বিরহের ভাব বেশ স্বচ্ছন্দভাবে ফুটিয়েছেন। G. E. 7663 রেকর্ডে শচীন গুপ্তের গাওয়া 'সারারাত জ্বলে সন্ধ্যাপ্রদীপ ছায়া পড়ে আছে পায়,' এবং 'মোর সুন্দর স্বপ্ন ভেঙ্গে গেছে, কাঁদি আমি কাঁদি গো' আমাদের তৃপ্তি দিয়েছে। এইচ, এম্, ভি'র তালিকায় কৃষ্ণচন্দ্র দে (অন্ধগায়ক) N 31175 রেকর্ডে 'খণ্ডিতা' পালাকীর্ত্তনের ৭ম ও ৮ম খণ্ড (শ্রীকৃষ্ণের উক্তি) নিবেদন করেছেন। একদিকে 'রাইক হৃদয়ভাব বুঝি মাধব পদতলে ধরণী লোটাই' ও অপরদিকে 'রাই অনাদর হেরি রসিকবর অভিমানে করল পয়ান।'—গান দু'খানিতে কেষ্টবাবু তাঁর কীর্ত্তন গাওয়ার বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। তাছাড়া এই পালাকীর্ত্তনেরই আগেকার প্রকাশিত অপর রেকর্ড-গুলির সঙ্গে কাহিনী ও ভাবগত সংযোগ বেশ ভাল-ভাবেই বজায় আছে। সত্য চৌধুরীর কণ্ঠে গীত শ্যামাসঙ্গীত দু'খানি ভক্তিরসসমৃদ্ধ এবং বিশেষ শ্রুতিমধুর। N 31176 রেকর্ডে একদিকে তিনি গেয়েছেন 'সেই ভালো মা এমনি করেই লুকিয়ে থাকিস্ অন্ধকারে। নইলে আমি তোরেই চেয়ে ডাকব কেন বারে বারে॥' আর অপরদিকে 'কে তোরে কি বলেছে মা ঘুরে বেড়াস কালী মেগে, ওমা বরাভয়ী ভয়ঙ্করীর সাজ পেলি তুই কোথা থেকে॥' কথা ও সুর উভয়ের মাধ্যমে যাঁরা কাহিনী শুনতে ভালবাসেন তাঁরা 'একটী কিষাণের কাহিনী' শুনে দেখতে পাবেন, N 31168 রেকর্ডে, গানটির আরম্ভ হচ্ছে 'একটি কিষাণের জীবন কাহিনী শোনাই গানে গানে, অশ্রুভরা নয় সে যে শোণিত-রাঙা কথা, বেদনা নয়—আগুন জ্বালায় প্রাণে।' তবে গানখানি হেমন্তবাবুর 'কোনো এক গাঁয়ের বধূর কথা' গানখানি স্মরণ করিয়ে দেয়। রবীন্দ্র-সঙ্গীত প্রকাশিত হয়েছে মাত্র একখানি রেকর্ডে—N 31171—'তুমি কি এসেছো মোর দ্বারে খুঁজিতে আমার আপনারে॥' এবং 'কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়া'—গান দু'খানি সুনীল মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে ভালই লাগলো।

এপ্রিল মাসে কলম্বিয়া রেকর্ডে প্রকাশিত 'কলম্বিয়া কিশোর সঙ্ঘে'র 'বিদ্যাসাগরের মাতৃভক্তি' কিশোরদের ভাল লাগবে। রেকর্ডটির নম্বর হলো—G. E. 7579। এছাড়া, G. E. 7680 রেকর্ডে নচিকেতা ঘোষের গাওয়া—'এই গ্রামেতে আমার বাস' এবং 'পথ আর কত দূর ?' —দু'খানি আধুনিক গান; এবং G. E. 7681 রেকর্ডে উত্তরা দেবীর দু'খানি কীর্ত্তন গান, 'বঁধু হে, তুমি সে আমার প্রাণ' এবং 'বঁধু হে, ছাড়িয়া না দিব তোরে' এই জাতীয় গান যাঁরা ভালোবাসেন তাঁদের পছন্দসই হবে।

যে মাসে প্রকাশিত রেকর্ড তালিকার প্রধান বৈশিষ্ট্য

রবীন্দ্র-সঙ্গীত। রবীন্দ্র জন্মতিথি ২৫শে বৈশাখ উপলক্ষ্যে কবিগুরুর উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত বিভিন্ন শিল্পীর কণ্ঠে গীত রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ডালি আমাদের পরম তৃপ্তি দিয়েছে। 'যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে,'—কলম্বিয়া রেকর্ডে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে এই গানটির মর্য্যাদা রক্ষিত হয়েছে, রেকর্ডটির নম্বর G. E. 7701 এবং এ রেকর্ডটির অপরদিকে আছে 'শুধু তোমার বাণী নয় গো, হে বন্ধু, হে প্রিয়, মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার পরশখানি দিয়ো॥' এ ছাড়া কলম্বিয়া রেকর্ডে আছে G. E. 7702 রেকর্ডে দেবব্রত বিশ্বাস গীত 'এখন আমার সময় যাবার দুয়ার খোলো খোলো॥' এবং 'এইতো ভালো লেগেছিল আলোর নাচন পাতায় পাতায়।' G. E. 7703 রেকর্ডে গীতা নাহার কণ্ঠে 'গানের ভিতর দিয়ে যখন দেখি ভুবনখানি তখন তারে চিনি, আমি তখন তারে চিনি॥' এবং 'মরি লো মরি, আমায় বাঁশীতে ডেকেছে কে।' এইচ, এম্, ভি, রেকর্ডে বিশেষ আকর্ষণ সুপ্রীতি ঘোষের কণ্ঠে N31200 রেকর্ডে 'পূব সাগরের পার হ'তে' এবং 'এই শ্রাবণ বেলা'। সুধা মুখোপাধ্যায় গীত N31199 রেকর্ডে 'তোমায় আমায় মিলন হবে বলে আলোয় আকাশ ভরা।' ও 'বসন্ত সে যায়তো হেসে, যাবার কালে শেষ কুসুমের পরশ রাখে বনের ভালে।' N31201 রেকর্ডে সত্য চৌধুরীর কণ্ঠে 'তোমার হল শুরু, আমার হল সারা—' এবং 'নীল অঞ্জনঘন পুঞ্জছায়ায় সম্বৃত অম্বর হে গম্ভীর।' N31202 রেকর্ডে সন্তোষ সেনগুপ্তের গাওয়া 'তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে যত দূরে আমি ধাই—' আর 'অল্প লইয়া থাকি, তাই যাহা যায় তাহা যায়।' জগন্ময় মিত্র ও গীতা মিত্রের দ্বৈত কণ্ঠে গীত 'বিপদে মোরে রক্ষা করো, এ নহে মোর প্রার্থনা—বিপদে আমি না যেন করি ভয়।' ও 'হে মোর চিত্ত, পুণ্যতীর্থে জাগোরে ধীরে এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে॥' উল্লিখিত রবীন্দ্রসঙ্গীতগুলি বাণীর ঝঙ্কারে ও সুরের মূর্চ্ছনায় অন্তর স্পর্শ করে। এই মাসে P11908 রেকর্ডে কুমার শচীন দেববর্ম্মণের গাওয়া দু'খানি আধুনিক গান 'আঁখি দুটী ঝরে হায় একা জেগে থাকি, রুধিরে রাঙানো আমি তীর বেঁধা পাখী॥' এবং 'মালাখানি ছিল হাতে ঝ'রে তবু ঝরে নাই।' মনকে নাড়া দেয়।

জুন মাসে প্রকাশিত কলম্বিয়া রেকর্ড তালিকার মধ্যে GE7714 রেকর্ডটিতে কাজী নজরুল ইস্‌লাম রচিত গিরীন্ চক্রবর্ত্তীর কণ্ঠে "বিদ্রোহী", ১ম ও ২য় খণ্ড, যথাক্রমে 'বল বীর—বল উন্নত মম শির' এবং 'আমি বন্ধন-হারা কুমারীর বেণী, তন্বী নয়নে বহ্নি' গান দু'খানি মনকে উদ্দীপ্ত ক'রে তোলে। GE7719 রেকর্ডে রাধারাণীর দু'খানি কীর্ত্তন গানই কণ্ঠমাধুর্য্যে বেশ শ্রুতিমধুর হয়েছে। প্রথমটি হলো 'অপরূপ শ্যাম গুণধাম (সখীরে)' এবং দ্বিতীয়টির 'প্রেম কারিগর মোরা যত সখিগণ'। GE7715 রেকর্ডে রবীন মজুমদারের গাওয়া 'বন্ধু কেমন আছো!' এবং 'ভালবাসি বলে সারাটি জীবন তোমারে দিয়েছি ফাঁকি,' GE7717 রেকর্ডে শচীন গুপ্তের গাওয়া 'তুমি দেখেছ কি' ও 'তুমি কি কিছু বলবে' GE7716 রেকর্ডে ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের কণ্ঠে 'কুমুদি গো চেন কি মোরে॥' ও 'ঘুমায়ে র'য়েছে প্রিয়তমা মোর ওই' GE7718 রেকর্ডে সমর গুপ্তের কণ্ঠে 'কথা, বলো, আমায় যাবে না ভুলে' এবং 'মাটির প্রদীপ জ্বালিয়ে দিতে সপ্ত ঋষির দেশে—' উপরোক্ত আধুনিক বাংলা গানগুলির কথার মধ্যে ও বিভিন্ন শিল্পীর সুরেলা কণ্ঠ-সম্পদে প্রেমিক মনের ভাব বেশ সুন্দর ফুটে উঠেছে। 'গম্ভীরা' গানের জনপ্রিয় শিল্পীর কণ্ঠে GE7550 রেকর্ডে দু'খানি গান প্রকাশিত হয়েছে, একদিকে 'ওহে রজত বরণ সেনাপতিত্বে বরণ ক'রে নিলাম স্মরণ চল না, চল না মোদের চালাও না' আর অপরদিকে 'আজ ভাল মানুষীর দিন গিয়্যাছে ওহে পশুপতি।'—গান দু'খানির মধ্যে দেশের বর্ত্তমান অবস্থার বেশ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, দ্বিতীয়টির কয়েকটী কলি তোলো—জাল জালিয়াত বিশ্ব জুইর‍্যা। ব্ল্যাক-মারকেট্ বাজার ভইর‍্যা। গাড়ী চালায় বাড়ী হাঁকায়। জ্বালায় বিজলী বাতি।' ইত্যাদি। এইচ, এম্, ভি রেকর্ডে N31211 রেকর্ডে কৃষ্ণচন্দ্র দে'র কণ্ঠে 'খণ্ডিতা' পালাকীর্ত্তনের ৯ম ও ১০ম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। N31212 রেকর্ডে সুধীরলাল চক্রবর্ত্তীর কণ্ঠে 'তুমি কতদূরে কোন্' এবং 'কেন

তব আঁখি দু'টি'—আধুনিক গান দু'খানি বেশ ভালই লাগলো। কুচবিহার প্রেম-গীতি পর্য্যায়ের বিরোজা সেনের (মঞ্জু) গাওয়া N31208 রেকর্ডে 'ওকি পীরিতি ভাঙিবে' ও 'কন্যা মোকে ঠেকালু' এই দু'খানি গান যারা ভাওয়াইয়া পছন্দ করেন তাঁদের ভালই লাগবে। বাস্তহারার মনের ব্যথা ও বেদনা মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে 'বাড়ী ছিল পদ্মা নদীর পারে' এবং 'আমায় তোমরা চেনো কিগো আমিও মানুষ ভাই' এই দু'খানি গ্রাম্য-গীতির কথা ও সুরে। গানখানি গেয়েছেন চিত্ত রায়; কথা ও সুরযোজনা করেছেন গিরীন্ চক্রবর্ত্তী। রেকর্ডটির নম্বর N31216.

জুলাই মাসে প্রকাশিত রেকর্ডগুলির মধ্যে কলম্বিয়া রেকর্ডে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে 'অবাক পৃথিবী' আর 'বিদ্রোহ আজ বিদ্রোহ চারিদিকে'—গান দু'খানি সুরের মধ্য দিয়ে বাণীকে মর্ম্মস্থলে পৌঁছে দেয়। এই গান দুখানি কবি ৺সুকান্ত ভট্টাচার্য্যের, রেকর্ডটির নম্বর GE7742। GE7735 রেকর্ডে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে গীত 'ঝরাপাতা আর ঝড়ে-নেভা-দীপ যারা··' আর 'ওরে ও বিজন রাতের পাখী...' —দু'খানি গানই আমাদের বেশ তৃপ্তি দিয়েছে। GE7736 রেকর্ডে নীলিমা গুপ্তার কণ্ঠে 'পাগলা হাওয়ার বাদল-দিনে...' আর 'শ্যামল ছায়া, নাইবা গেলে ..' দুটী রবীন্দ্র-সঙ্গীত আমাদের ভাল লেগেছে।

আগষ্ট মাসে প্রকাশিত কলম্বিয়া রেকর্ড তালিকা দেখে আমরা উৎসাহ বোধ করি না। GE7746 রেকর্ডে রবীন্দ্র-সঙ্গীতটি তেমন ভাল লাগলো না। গান দুটি হলো—'আমার নাইবা হলো পারে যাওয়া' অপরটি হলো 'এই যে তোমার প্রেম ওগো হৃদয়হরণ।' GE7741 রেকর্ডে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত-গায়িকা শ্রীমতী বাঁশরী লাহিড়ীর (সুরভারতী) কণ্ঠে গীত দু'খানি আধুনিক গানে কোনো আনন্দ পাওয়া গেল না। প্রথম গানটি হলো 'দুটি নয়নে যে অশ্রু পড়ে ঝরিয়া ··' দ্বিতীয়টি হলো—'এলোরে বাদল এল এলোরে বাদল।'

দৃষ্টিপাত

প্রদ্যোত কুমার মিত্র

চিত্র ও নাট্য জগতের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনার জন্য 'দৃষ্টিপাত' বিভাগের অবতারণা। এই বিভাগে প্রকাশিত মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন, তবে এই বিভাগের কোনো বক্তব্যের বিরুদ্ধে যদি কারো কিছু বলার থাকে, তবে তা'ও সাদরে বিবেচিত হবে।

Journalists of the Film World Unite

বাংলা চলচ্চিত্রের আজ যে মহা দুর্দ্দিন, একথা খুবই সত্যি কিন্তু সবচেয়ে দুর্দ্দিন বোধহয় চলচ্চিত্র সম্পর্কিত পত্র-পত্রিকার আর চিত্র-সাংবাদিকদের। বাংলার চলচ্চিত্র-শিল্প হয়ত আরও কিছুদিন নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারবে কিন্তু অনেক কাগজেরই আর বেশীদিন টিঁকে থাকার সামর্থ্য নিঃশেষ হ'য়ে গিয়েছে, এমনকি, দুই-এক খানা অতি বিখ্যাত সিনেমা-পত্রিকা ইতিমধ্যে নিজেদের অস্তিত্ব বিলোপ করতে বাধ্য হ'য়েছেন।

এই লক্ষণ মোটেই সুস্থ নয়। অকুণ্ঠ চিত্তে বলা যেতে পারে যে, আজ দেশে সিনেমাশিল্প যদি কিছুমাত্র প্রসার লাভ ক'রে থাকে, যদি এদেশে সিনেমা কিছুমাত্র জনপ্রিয়তা অর্জ্জন ক'রে থাকে, তবে তা এইসব সাময়িক পত্রিকার অবিশ্রান্ত প্রচেষ্টার ফলেই সম্ভব হ'য়েছে। প্রতিষ্ঠাবান, অপ্রতিষ্ঠ, ক্ষণস্থায়ী, দীর্ঘস্থায়ী নির্ব্বিশেষে সকল পত্র-পত্রিকার সমবেত চেষ্টায় আজ যে সিনেমাশিল্প এতটা জনপ্রিয় হ'তে পেরেছে, সেকথা জোর করে বলা চলে। এইসব সাময়িক পত্রিকার সমবেত শক্তি এমনই প্রচণ্ড যে দৈনিক পত্রিকার অসংখ্য প্রচারের মহিমাও তার কাছে ম্লান হ'য়ে যায়। একটা কথা সত্যি যে, নানা ভঙ্গিমার ছবিতে, চলচ্চিত্র শিল্পের নানা খুঁটি-নাটি দিয়ে, নায়ক-নায়িকাদের নানা বর্ণনা পারিপাট্যে চলচ্চিত্র সম্পর্কিত সাময়িক পত্রিকা যে ভাবে fan সৃষ্টি ক'রতে এবং fan-দের তৃপ্তি বিধান করতে পারে তা' এ পর্য্যন্ত কোন দৈনিক পত্রিকার পক্ষেই সম্ভবপর হয় নি। এইসব পত্র-পত্রিকা নানা লাঞ্ছনা সহ্য ক'রে সিনেমাশিল্পের জন্যই নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছে আর যারা বিলীন হয়েছে, তারাও দধিচীর মত নিজেদের অস্থি দিয়ে চলচ্চিত্রশিল্পকে বাঁচাবার কামনা করে। শত বিভেদ সত্বেও এইসব পত্র-পত্রিকার লক্ষ্য অন্ততঃ একটি বিষয়ে অভিন্ন, সে হ'ল—"কিভাবে চিত্রশিল্পের উন্নতি করা যায় ?" সকলেই তারা আপন আপন সামর্থ্য আর মত অনুসারে চলচ্চিত্রশিল্পের পুষ্টিসাধনে অভিলাষী। আজ যদি এইসব পত্র-পত্রিকার মৃত্যু ঘটে তবে তা বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পের পক্ষে মোটেই শুভ হবে না।

বেতারে যা ঘটছে

আমরা বিশ্বস্তসূত্রে জানতে পেরেছি যে, ক'লকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে "বেতার জগৎ"-এর জন্যে যে সহ-সম্পাদক নেওয়ার কথা ছিল, সেই লোক নাকি আগে থেকেই ঠিক ছিল এবং এখন তাঁকে নেওয়ার ব্যবস্থা পাকাপাকি হয়েছে।

অথচ, এই পদ পূরণের জন্যে ক'লকাতা বেতার কেন্দ্রের বড়কর্ত্তা অনেক রকম কসরৎ দেখিয়েছেন। উপযুক্ত লোক চেয়ে তিনি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় সার্কুলার পাঠিয়েছেন অসংখ্য প্রার্থীদের মধ্যে বেছে বেছে কয়েক-জনকে ইন্টারভ্যু দিয়ে কৃতার্থ করেছেন এবং অনেককে খাতা পেন্সিলে পরীক্ষাও করিয়েছেন।

শেষ পর্য্যন্ত খাতিরের লোকই চাকরী পাবে। কিন্তু এর জন্যে এতগুলি ভদ্রলোককে নিছক হয়রানি করার দরকার কি ছিল ? আপন স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য কলিকাতা বেতার কেন্দ্রের ডিরেক্টরের এই যে হীন পন্থা অবলম্বন, এর কি কোন প্রতিবাদ সম্ভব নয় ? শ্রীযুক্ত এ. কে সেন এর উত্তর দেবেন কি ?

আর যদি কোন পত্র-পত্রিকার প্রদীপ নিভে যায়, তবে সেই পাপের পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত ক'রতে হবে বাংলার সিনেমা-শিল্পকে এবং তাদের আজকের এই অন্যায়ের মাশুল একদিন সুদে-আসলে শোধ ক'রতেই হবে।

সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, আজ আর চিত্র-ব্যবসায়ী ও পত্র-পত্রিকাদের মধ্যে কোন যোগাযোগ নেই, তাদের মধ্যে কোন প্রীতির সম্পর্ক পর্য্যন্ত নেই। এ যেন প্রাণ ছাড়া দেহের কল্পনা। এইভাবে ছাড়াছাড়ি হ'য়ে ক্রমাগত শিল্পজগৎ ও পত্রিকা-জগতের মধ্যে যে ভুল বোঝাবুঝি মাথা চাড়া দিয়ে উঠ্ছে, তা' নিঃসংশয়ে বাংলার চলচ্চিত্রশিল্পের ধ্বংসের অন্যতম কারণ হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে। এই অবস্থা যে কি চরমে এসে দাঁড়িয়েছে, তা' নীচের দু' একটা ঘটনা থেকেই স্পষ্ট বোঝা যাবে :—

কিছুদিন আগে সোসাইটি সিনেমায় "পতঙ্গা" ব'লে একখানা ছবির প্রেস-শো হয়। প্রচলিত নিয়মানুসারে এইসব প্রেস শো'র আমন্ত্রণে কেউ কেউ হয়ত' একজন সঙ্গী নিয়ে যান। আবার অনেকে একেবারেই যান না। এই সঙ্গী নেওয়ার ব্যাপারে এতদিন পর্য্যন্ত কোন পক্ষ থেকে কোন কথাই ওঠে নি'। কিন্তু ভুল বোঝাবুঝির রূপ আজ এমনই চরমে পৌঁছেছে যে, এক অজ্ঞাত গূঢ় কারণে কয়েকজন সাংবাদিক এই প্রদর্শনী বয়কট করেন। এর বিবরণ ইংরাজী "শট্" পত্রিকায় বিস্তারিতভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

কিন্তু আমাদের বক্তব্য নয় "পতঙ্গা"র এই প্রেস-শো'তে এক বিখ্যাত দৈনিক পত্রিকার এক বিশিষ্ট সাংবাদিক সস্ত্রীক উপস্থিত হন। সোসাইটী সিনেমার ম্যানেজার মিঃ এস, এম বাগড়ে অতীত জীবনে একজন সাংবাদিক ছিলেন— এবং বহুদিন যাবৎ প্রাক্তন 'চলচ্চিত্র সাংবাদিক সঙ্ঘে'র সম্পাদক ছিলেন। আজ তিনি বোধ হয় সাংবাদিকতার স্মৃতিটুকু পর্য্যন্ত মুছে দিয়ে পুরোপুরি সিনেমার দাসত্ব গ্রহণ করতে পেরেছেন। তাই শ্রীযুত বাগড়ে পূর্ব্বোক্ত বিখ্যাত পত্রিকার বিশিষ্ট সাংবাদিককে সস্ত্রীক ঢুকতে বাধা দেন। তিনি জানালেন যে নিমন্ত্রণ একজনের জন্যে, দু'জনকে তিনি ঢুকতে দিতে পারবেন না। মহিলাদের প্রতি যে সামান্য সম্ভ্রম এবং স্বাভাবিক সৌজন্য থাকা দরকার সিনেমাশিল্পের দাসত্ব করতে গিয়ে মিঃ বাগড়ে তা' একেবারে বিস্মৃত হন। আমন্ত্রিত সাংবাদিকদের প্রতি সম্ভ্রম তাঁর কাছে যে কতখানি পরিহাসের বিষয়, তার উল্লেখ এখানে বাহুল্য!

এর পরের ঘটনা অনুষ্ঠিত হয় 'বসুশ্রী' চিত্রগৃহে। সিলেটের বাসিন্দা অমর দত্ত নামে এক ভদ্রলোক ক'লকাতায় এসেছেন সিনেমার ব্যবসা করতে। ইতিপূর্ব্বে তিনি "ঘরোয়া" নামে একখানা ব্যর্থ ছবি প্রযোজনা করেন তাঁর দ্বিতীয় ছবি "সীমান্তিক।" 'বসুশ্রী' চিত্রগৃহে শ্রীঅমর দত্ত তাঁর এই দ্বিতীয় ছবি "সীমান্তিক"এর প্রেস-শো'র অনুষ্ঠান করেন। এই অনুষ্ঠানে অনেকেই গিয়েছিলেন আর গিয়েছিলেন একখানি পত্রিকার দুইজন মহিলা প্রতিনিধি। প্রদর্শনীর শেষে যখন এই দু'জন মহিলা প্রেক্ষাগৃহ থেকে বেরিয়ে আসছেন, তখন একজন অতি উৎসাহী ব্যক্তি এই দু'জন সঙ্গীহীন মহিলাকে আপ্যায়িত করার লোভ সম্বরণ করতে পারেন নি। তিনি অতিরিক্ত আপ্যায়ণ দেখিয়ে মহিলা দু'জনকে 'বসুশ্রী' সিনেমা-সংলগ্ন কফি-হাউসে পাঠিয়ে দেন। বলেন যে, সেখানে নাকি কিছু জলযোগের ব্যবস্থা আছে। মহিলা দু'জন কফি-হাউসে গিয়ে কাউকেই দেখতে পান না। বেয়ারা এসে লম্বা সেলাম দিয়ে জানতে চাইল, তাঁরা কি খেতে চান। তাঁরা অসামান্য আহার্য্যের অর্ডার দেন। তারপর খাওয়া-দাওয়ার শেষে বেয়ারা তাঁদের হাতে একখানা বিল দিলে তাঁরা বিশেষ ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে পড়েন। নিতান্ত নিরুপায় হ'য়েই তাঁরা শেষ পর্য্যন্ত ব্যাগের যাবতীয় পয়সা দিয়ে কফি হাউসের পাওনা চুকিয়ে দেন এবং বাড়ী ফেরার বাসভাড়াটুকুও হাতে না থাকায় তাঁরা বাধ্য হ'য়ে ট্যাক্সি ক'রে বাড়ী ফিরে আবার ট্যাক্সি-ওয়ালাকে আর এক চোট আক্কেল-সেলামী দিতে বাধ্য হন।

কিন্তু চরম ব্যাপার ঘটে বোধ হয় "নিউ সিনেমা"র "পহেলা আদমী"র প্রেস-শো'র দিনে। প্রেস শো'র শেষে সাংবাদিকরা যখন দোতলা থেকে নীচে নেমে

পড়েছেন, তখন দুই ব্যক্তি হন্তদন্ত হ'য়ে তাঁদের কাছে ছুটে এসে জানায় যে, ওপরে ভীষণ দরকার; তাঁরা যেন দয়া ক'রে একবার ওপরে আসেন। কি দরকার কে জানে! সাংবাদিকরা ওপরে এলেন। সেখানে তাঁরা দেখলেন যে, দু'টি অবাঙ্গালী ভদ্রলোক হাতে একগাদা নিমন্ত্রণপত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। কি ব্যাপার? না, "অফসার" ছবির দেব আনন্দ এখনই তাঁদের সঙ্গে দেখা ক'রবেন, এই তার নিমন্ত্রণ পত্র, সকলে যেন এখান থেকে সোজা ধুলো পায়ে সেখানে চলে গিয়ে দেবানন্দ দর্শন ক'রে কৃতার্থ হন। কোন আত্মসম্ভ্রমশীল ব্যক্তিই এই রকম আমন্ত্রণ গ্রহণ ক'রতে পারেন না। অনেকে তাঁদের সামনেই চিঠি ছিঁড়ে ফেলে দেন। কিন্তু সব চেয়ে দুঃখের কথা, দুই-একজন বিখ্যাত সাংবাদিক নাকি এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

এই প্রসঙ্গে একটা মস্ত বড় কথা উল্লেখযোগ্য যে, "পতঙ্গা" ছবির উক্ত প্রেস-শো এবং সাংবাদিক-দম্পতীকে অবমাননার কথা যখন উক্ত ছবির পরিবেশক প্রতিষ্ঠানের অবাঙ্গালী কর্ত্তাকে জানানো হয়, তখন তিনি সোজা উত্তর দেন, "প্রেস শো আমি করতে চাই না। নেহাৎ ওরা এসে ধরে তাই—"

শুধু অবাঙ্গালীদেরই যে এই মনোভাব, তা নয়। বাঙ্গালী চিত্র-ব্যবসায়ীদের মধ্যেও অনেকেরই এই সংকীর্ণতা আছে। সম্প্রতি "অপবাদ"-এর প্রেস-শোতে সাংবাদিকদের তুচ্ছ করার এমন সব অভিযোগও আমাদের কানে এসেছে। এটা অবশ্য "অপবাদ"-এর 'প্রেস-শো' নয়, 'ট্রেড শো'। সেখানে ট্রেডের প্রভাব এমনই বেশী যে, সাংবাদিকদের আসনের কোন ভাল ব্যবস্থা ত' ছিলই না, বরং সেখানকার অব্যবস্থাকে নিতান্ত অপমান-জনকই বলা যেতে পারে।

নিজেদের এইসব লাঞ্ছনার কাহিনী এমনভাবে ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করাতে অনেক সাংবাদিকই হয়ত' ক্ষুব্ধ হবেন কিন্তু নিজেদের দুর্ব্বলতার কথা এমনভাবে চেপে রেখেও কোন লাভ নেই। এই অভিজ্ঞতার আলোকে আমাদের পথ চিনে নিতে হবে এবং এর প্রতিকারের জন্য ছোট-বড় নির্ব্বিশেষে সকল সাংবাদিককে সঙ্ঘবদ্ধ হ'তে হবে। আজ আমরা বিচ্ছিন্ন ব'লেই শক্তি-হীন এবং আমাদের শক্তিহীনতার জন্যই অত্যন্ত অযোগ্যরাও আমাদের অসম্মান ক'রবার ভরসা পায়। বাংলার চলচ্চিত্রশিল্পের এইসব অদূরদর্শী বালখিল্যরা আজ আমাদের সঙ্ঘবদ্ধহীনতার সুযোগ নিয়ে অত্যন্ত সম্ভ্রমশীল পত্রিকাকেও রক্তচক্ষু দেখাবার সাহস পাচ্ছে।

অবশ্য, সাংবাদিকরা অন্তরে অন্তরে বোধ হয় অনুধাবন ক'রেছেন তাঁদের প্রকৃত সমস্যা। তাই সম্প্রতি তাঁদের মধ্যে একতাবদ্ধ হওয়ার আগ্রহ দেখা গিয়েছে এবং স্থির হয়েছে যে, পুরাতন চলচ্চিত্র সাংবাদিক সঙ্ঘকে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত ক'রে তার মারফৎ তাঁরা সঙ্ঘবদ্ধ হবেন। এই উদ্দেশ্যে গোটা দুয়েক সভাও অনুষ্ঠান হ'য়ে গিয়েছে। আমরা তাঁদের এই সঙ্কল্পকে সাদর সম্ভাষণ জানাই—
"Journalists of the film world unite".

বিদ্যাসাগর সম্পর্কে শ্রীবীরেন্ দাস

নির্ম্মীয়মান "বিদ্যাসাগর" চলচ্চিত্র ও তার কাহিনী সম্পর্কে আমরা গত সংখ্যায় যে মন্তব্য করেছিলাম, সেই সম্পর্কে শ্রীযুক্ত বীরেন দাস আমাদের নিম্নোক্ত মর্ম্মে এক-খানি পত্র দিয়েছেন:—

"চিত্রবাণী" সম্পাদক

প্রিয়বরেষু,

জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'চিত্রবাণী'তে 'বিদ্যাসাগর কাহিনী' সম্পর্কে comment পড়ে মোটামুটি ঘটনাটা আপনাদের লিখছি। 'বিদ্যাসাগর" জীবনী চিত্রে রূপায়িত করবার উৎসাহ ও প্রেরণা পাই প্রথমে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন পালের নিকট থেকে—১৯৪৪ সালের জানুয়ারী মাসে। তখন থেকেই বিদ্যাসাগর-এর জীবনী নিয়ে আমি গবেষণা সুরু করি। সাহিত্য পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এবিষয়ে আমাকে চিঠিপত্রে যতখানি সম্ভব সাহায্য করেন। (আমি তখন বোম্বাইয়ে থাকতাম)। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চান্সেলার বি পি ওয়াদিয়াও আমাকে উৎসাহ দেন এ বিষয়ে।

এ ছাড়া, হুমায়ুন কবীর, অমর নাথ ঝা প্রভৃতি বিশিষ্ট শিক্ষাবিদরা আমাকে চিঠি লিখে অভিনন্দন জানান। প্রযোজক হিতেন চৌধুরীকে আমি প্রথম 'বিদ্যাসাগর' চিত্রনাট্যের কথা বলি। এরপর ১৯৪৭-এর এপ্রিল মাসে আমি কলকাতায় আসি। জীবনী সম্পর্কে আমাদের প্রযোজকদের আগ্রহের অভাব লক্ষ্য করে, আমি ও প্রসঙ্গ চেপে যাই তখনকার মত। শ্রীযুত নরেশ মিত্রের প্রধান সহকারী হিসাবে আমি 'কঙ্কালে'র কাজে যোগদান করি। 'কঙ্কালে'র প্রযোজক শ্রীযুক্ত শিশির মল্লিকের উপদেশে আমি "বিদ্যাসাগর"-এর চিত্রনাট্যখানি censor করাই। ১৯৪৯-এর ১২ই সেপ্টেম্বর আমার "বিদ্যাসাগর"-এর চিত্রনাট্যখানি পশ্চিমবঙ্গ সেন্সর বিভাগ কর্তৃক pre-censor করা হয়। এরপর দু'একজন বিখ্যাত প্রযোজক আমার চিত্রনাট্য পড়ে দেখেছেন। কিন্তু নিবর্থক। ইতিমধ্যে আজাদ হিন্দ পিকচার্স 'নতুন পাঠশালা'র চিত্ররূপ দেবার মনস্থ করে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তখনকার মত 'বিদ্যাসাগর'কে ভুলে আমি 'নতুন পাঠশালা' নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠি।

এরপর মেসার্স তপন পিকচার্স (বি, এম, পি-এর সভ্য) 'বিদ্যাসাগর' চিত্রে রূপায়িত করবার জন্য আমার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হন। তারা ইন্দ্রপুরী স্টুডিয়োর সঙ্গে চুক্তি ও অন্যান্য প্রাথমিক কাজ সুরু করেন। হঠাৎ একদিন কাগজে বিজ্ঞপ্তি বেরুল যে এম পি প্রডাকশন 'বিদ্যাসাগর' ছবি করছেন। রীতিমত Bombshell! তপন পিকচার্স বি-এম পি-এর শরণাপন্ন হন। বি-এম-পি-এ জানিয়ে দেন বিষয়টী তাঁদের jurisdiction-এর বাইরে। তখন তপন পিকচার্স এম-পি র শরণাপন্ন হন। পত্রোত্তরে এম-পি তপন পিকচার্সকে জানিয়ে দিলেন, "বিদ্যাসাগর" তাঁরা তুলবেনই।

সুতরাং বাধ্য হয়েই তপন পিকচার্সকে পাততাড়ি গুটোতে হল। আমার লিখিত "বিদ্যাসাগর"এর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এই। সশ্রদ্ধ নমস্কার নেবেন। ইতি

বিনীত :—
বীরেন দাস।

এই সম্পর্কে আমরা কোন মন্তব্য করতে চাই না।

'সংকেত' সম্পর্কে হেমেন দাস

গত সংখ্যাতেই 'সংকেত' ছবির কাহিনী নিয়ে এই বিভাগে যা লেখা হয়েছিল সেই সম্পর্কে শ্রী হেমেন দাস আমাদের একখানি পত্রাঘাত করেছেন। পত্রখানি এই :—

শ্রদ্ধেয় 'চিত্রবাণী' সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—
মহাশয়,

আপনার 'চিত্রবাণী'র 'দৃষ্টিপাত' বিভাগের সমালোচনায় শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচিত 'সঙ্কেত' নামক নির্ম্মীয়মান চলচ্চিত্রের কাহিনীর মৌলিকত্ব সম্পর্কে হঠাৎ আমার নামের উল্লেখ দেখলুম।

আপনারা লিখেছেন "সঙ্কেত" সম্পর্কে শ্রীযুক্ত হেমেন দাসের কাছে (এ, এস প্রোডাকসন্সের 'সীমান্তিকে'র কাহিনীকার) আরও একটি চমকপ্রদ কাহিনী শোনা আছে। সে কথা এখন থাক।" এখানের এই উদ্ধৃতিতে 'সঙ্কেত' সম্পর্কে না লিখে 'কঙ্কাল' সম্পর্কে লিখলে বেশি appropriate হত। শ্রীযুক্ত প্রদ্যোত মিত্র আমার যে 'চমকপ্রদ কাহিনী'টির কথা এখানে উল্লেখ করেছেন সে সম্বন্ধে বলতে গেলে একটু allusion দিতে হবে।

একদিন নারায়ণবাবুর বাড়ীতে পরিচালক শ্রদ্ধেয় পরেশ রায় মহাশয়ের মুখে হুবহু আমার একটি উপন্যাসের কাহিনীটি শুনে আশ্চর্য্য হয়ে তাঁকে প্রশ্ন করি—'আপনি এ গল্প কার মুখে শুনলেন?' তিনি বললেন—'নারায়ণবাবুর মুখে।' নারায়ণবাবুকে জিজ্ঞাসা করলুম,—'নারাণদা আপনি এ কঙ্কালের গল্পটা কার মুখে শুনলেন?' তিনি বললেন—'ওটা পরিচালক অর্দ্ধেন্দুবাবুর মুখে শুনি। তিনি আমায় বলেছেন ও গল্পটা তাঁর নিজের বানান।' আমি একটু উত্তেজিত ভাবেই বললুম, 'এ গল্প আমার নিজের রচিত।' নারায়ণবাবু বললেন,—'অর্দ্ধেন্দুবাবু আমায় বলেছেন—হেমেনবাবু কঙ্কালকে স্বাভাবিকের মত করতে পারেন। আমি সেই factটার ওপর ভিত্তি করেই এ গল্পটা বানিয়েছি। তিনি আমায় স্পষ্ট বলেছেন—হেমনবাবু এ বিষয়ে কোন গল্প develop করেন নি।' আমি ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠে বললুম,—'হয় আপনি ভুল শুনেছেন, নয় তিনি ভুল বলেছেন আর নয় তিনি deliberately

সত্যের অপলাপ ঘটিয়েছেন। আমি গল্পাকারে এটা লিখিনি। ইং ১৯৪৩ সালে আমি এটি একেবারেই উপন্যাসাকারে লিখি।

গত বছর এপ্রিল মাসে 'দীপালী' অফিসে অর্দ্ধেন্দু-বাবুর সঙ্গে আমার প্রথম আলাপের দিন তাঁকে আমি এই কাহিনীটি সবিস্তারে শোনাই। অর্দ্ধেন্দুবাবু আমার কাহিনীটীর প্লটের মৌলিকত্বের প্রশংসা করেন। 'দীপালী'-সম্পাদক বঙ্কিমবাবু বলেন—'অর্দ্ধেন্দুদা, গল্পটা ভারি চমৎকার; এইটাই লাগিয়ে দিন। এরপর আমি তাঁকে আর একটি গল্প শোনাই। সেটি শুনে তিনি আরও বেশী আকৃষ্ট হন। পরবর্ত্তী কাহিনীটীর আংশিক পরিবর্ত্তন করে তিনি 'সীমান্তিক' নামে চলচ্চিত্রে রূপায়িত করেন।

তার একদিন পরে অর্দ্ধেন্দুবাবুর উক্তি যে সম্পূর্ণ সত্যবর্জ্জিত প্রমাণ করবার উদ্দেশ্যেই নারায়ণবাবুকে fully developed সুবৃহৎ পাণ্ডুলিপিখানি চাক্ষুষ দেখাই।

স্থানাভাবে এখানে আমার ঐ 'চমকপ্রদ কাহিনীটী' সবিস্তারে বর্ণনা করা সম্ভব হলো না, তবে তার বিষয় বস্তুর আভাসটা দিচ্ছি,—আমার কাহিনী আরম্ভ হচ্ছে এক খেয়ালী শিল্পীর মানসীর একটি কঙ্কাল নিয়ে। তার মধ্যে কতকগুলি রহস্য আছে। গল্পের বৃহত্তর অংশ গড়ে উঠেছে ঐ শিল্পীর ঔরস ও তার মানসীর গর্ভজাত কন্যাটিকে নিয়ে। শেষে আছে একটি Court Scene। এ কাহিনী রচনায় আমি কোন বিদেশি গল্পের ছায়া অবলম্বন করিনি বা তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হই নি। এটি আমার সম্পূর্ণ মৌলিক সৃষ্টি। নমস্কার নেবেন। ইতি—

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাস

এরপর অর্দ্ধেন্দুবাবু এবং নারায়ণবাবুর কি বলার আছে এ সম্বন্ধে—সে বিষয়ে পাঠকবর্গের কৌতূহল হওয়া খুবই স্বাভাবিক।
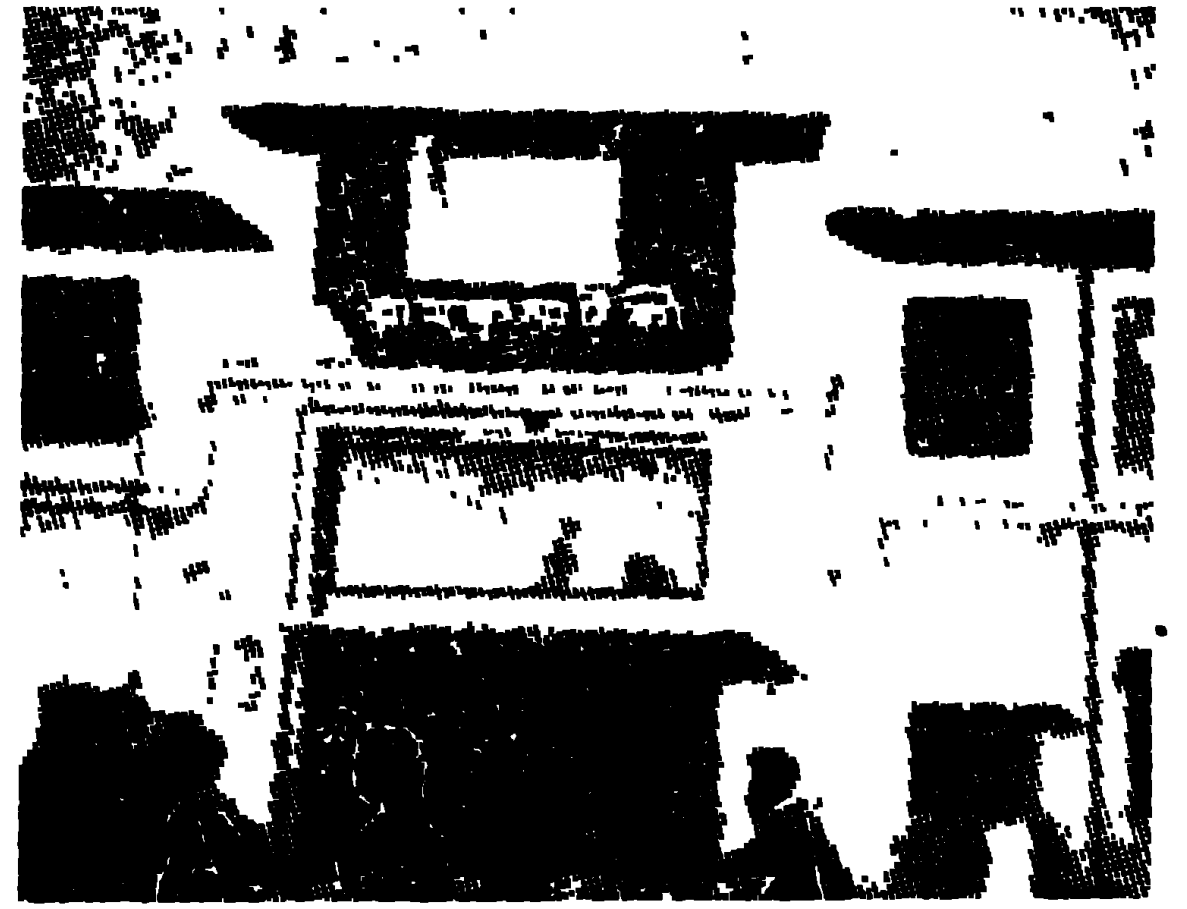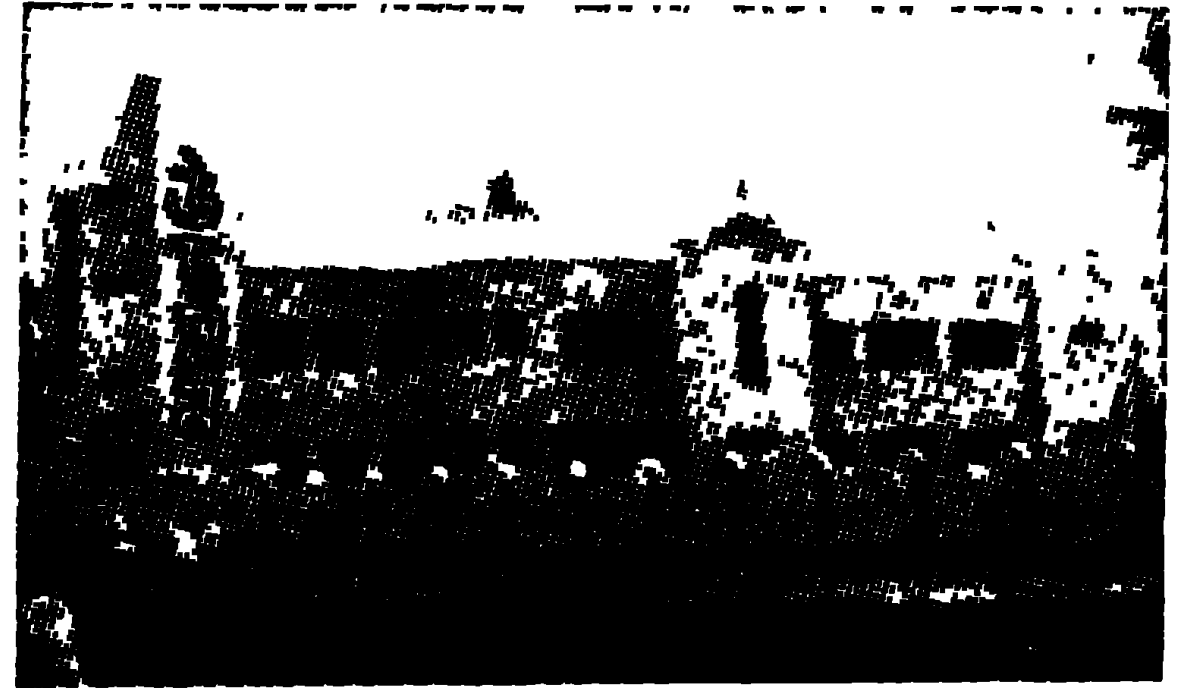
নিতাই চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক চিত্রবাণী কার্য্যালয় ৫, হাজরা লেন থেকে প্রকাশিত এবং মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রিণ্টার্স এ্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড, ৫৯সি, বেচু চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট থেকে মুদ্রিত

চিত্রবাণী

দ্বিতীয় বর্ষ :: শ্রাবণ-ভাদ্র, ১৩৫৭ :: একাদশ—দ্বাদশ সংখ্যা

'বিয়াল্লিশে'র বরাত

বোমকশায়িত ব্রিটিশ সরকারের চক্ষুশূল হয়েছিল বিয়াল্লিশের বিপ্লব। আর সেদিন যাঁরা এই 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' ধ্বনি তুলে বিপ্লবের নায়কত্ব করেছিলেন সেই কংগ্রেসী সরকারের চক্ষুশূল হয়ে দাঁড়িয়েছে এই বিপ্লবের ইতিহাস 'বিয়াল্লিশ' ছবিখানি। তবে তফাৎ এই বিয়াল্লিশের বিপ্লব ব্রিটিশ সরকারের চোখে প্রদেশে প্রদেশে ভিন্ন ছিল না। আর 'বিয়াল্লিশ' ছবিখানি বাইরে আর সর্ব্বত্র দেখাবার অনুমতি পেলেও এবং দেখানো হোলেও পশ্চিম বাংলায় দেখানো চলবে না। এই ছবির প্রযোজক-প্রতিষ্ঠান গত ষোলো মাস ধ'রে ছবির ছাড়পত্র পাবার পর্ব্বে পর্ব্বে আবেদন-নিবেদন জানিয়ে এবং বহুবিধ চেষ্টা ক'রেও শেষ পর্য্যন্ত জবাব পেয়েছেন এ ছবি দেখানো চলবে না। যে ছবি পশ্চিম বাংলার বাইরে সর্ব্বত্র নির্ব্বিচারে নির্ব্বিবাদে দেখানো চলতে পারে তা কেন যে এখানে চলতে পারবে না, তা সুস্থমস্তিষ্কে আমরা আজও ভেবে উঠতে পারলাম না। তবে কি পশ্চিমবঙ্গের কোন বৈশিষ্ট্য আছে? সেন্সর বোর্ড অভিমত দিয়েছিলেন, ছবিখানি 'likely to excite passion and encourage disorder.' কিন্তু এতগুলি মাস ধ'রে যে ছবিখানি বিভিন্ন রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় জনসাধারণের কোনো passion জাগায় নি এবং disorder সৃষ্টি করে নি তখন পশ্চিমবঙ্গেই বা এই ছবি নিয়ে এত দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনা কেন? তবে কি পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা এতই সঙ্গীন যে একটা ছায়াছবি থেকেই গোলযোগের সূত্রপাত হতে পারে? এই ছবির কর্ম্মকর্ত্তারা সেন্সর বোর্ডের নির্দ্দেশ অনুসারে দফায় দফায় ছবি দেখিয়েছেন, মূল ছবিতে রদ-বদল, কাটা-ছেঁড়া, জোড়া-তালি করেছেন—তাতেও ভবি ভোলবার নয়। আরও তাজ্জব হোল যে সম্প্রতি সেন্সরের নির্দ্দেশ-অনুযায়ী সংশোধিত 'বিয়াল্লিশে'র এই সংস্করণটি পশ্চিমবঙ্গ ফিল্ম সেন্সর বোর্ড ভোটাধিক্যে অনুমোদন করেছিলেন। কিন্তু কথা উঠলো কয়েকজন মন্ত্রী ছবিটি দেখে চূড়ান্ত অনুমোদন দেবেন। গত ১২ই সেপ্টেম্বর সেন্সর বোর্ডের সম্পাদক

এক চিঠিতে এই ছবির প্রযোজককে জানিয়েছেন, 'সমস্ত বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনা ক'রে এই সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে ছবিটি এবং তার পরিবর্তিত সংস্করণটিও এ রাজ্যে দেখানো চলবে না, কাজেই এ রাজ্যে ছবিটি অননুমোদিত রয়েই গেল।' এর পর সেন্সর বোর্ডের ইঙ্গিত বা সার্থকতা কোথায় রইলো তা বলাই বাহুল্য। সেন্সর বোর্ডের তাঁবেদারী স্বরূপটা এমন নগ্নভাবে প্রকট হয়ে পড়ার পর সেন্সর বোর্ডের অস্তিত্বের প্রয়োজন সম্বন্ধে সন্দেহটা নিতান্ত স্বাভাবিক। যেখানে সেন্সর বোর্ডের এতগুলি সভ্যের মতামতের কোন মূল্য থাকে না, যেখানে ভোটাধিক্য গ্রাহ্যের মধ্যে আনা হয় না, সেখানে আকাশ বাতাস মুখরিত করে গণতন্ত্রের জয়গান করা কি বাতুলতারই নামান্তর নয়? বিয়াল্লিশের সংগ্রাম ফুটিয়ে তুলেছিল মদমত্ত স্বৈরতন্ত্রের স্বরূপ আর আজ 'বিয়াল্লিশ' ছবির দুর্গতি প্রকট করে তুললো স্বাধীন ভারতের তথাকথিত গণতন্ত্র তথা প্রজাতন্ত্রের নির্লজ্জ স্বরূপকে।

ধূমপান বন্ধ আইন

পশ্চিমবঙ্গে চিত্রগৃহ ও রঙ্গালয়ের প্রেক্ষাগারে ধূমপান দণ্ডনীয় অপরাধ ব'লে গণ্য হবে। জনসাধারণের স্বাস্থ্যের খাতিরে প্রেক্ষাগারে ধূমপান বন্ধ করার উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজ্য পরিষদের শরৎকালীন অধিবেশনে একটি বিল উত্থাপন করবেন।

এই বিলটি পশ্চিমবঙ্গে প্রেক্ষাগৃহে ও জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত গৃহে ধূমপান নিষেধ (১৯৭০) বিল বলে অভিহিত হবে। উক্ত বিলে এই রকম বলা হয়েছে যে, "পরিপূর্ণ চিত্রগৃহ ও রঙ্গালয়গুলিতে বিশেষ ক'রে সম্পূর্ণভাবে বন্ধ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত প্রেক্ষাগৃহগুলিতে ধূমপানের ফলে যাঁরা ধূমপান করেন না, শুধু তাঁদেরই অসুবিধা হয় না, জনসাধারণের স্বাস্থ্যের পক্ষেও এটি বিপজ্জনক।" এই কারণে সরকার চিত্রগৃহ, রঙ্গালয় এবং অন্যান্য প্রমোদ ও জনসাধারণের বিশ্রামাগারে ধূমপান নিষিদ্ধ করে এক আইন প্রণয়নের প্রস্তাব করেছেন। সিনেমা প্রভৃতিতে ধূমপান ফৌজদারী অপরাধ বলে গণ্য হবে।

"হলের ভেতর ধূমপান দণ্ডনীয় এবং ধূমপানরতব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হবে" এই মর্মে বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রাচীরপত্রসমূহ বিশেষ বিশেষ স্থানে লাগাতে এবং স্লাইড প্রদর্শন করতে চিত্রগৃহগুলিকে বলা হবে। আইন অমান্যকারী ধূমপায়ীদিগকে গ্রেপ্তার করার ক্ষমতা প্রত্যেক পুলিশ অফিসারেরই থাকবে।

আমাদের দেশে অধিকাংশ চিত্রগৃহেই বায়ু চলাচলব্যবস্থা সন্তোষজনক নয়। ফলে বন্ধ ঘরের ভিতর অগণিত জনের ধূমপানের ফলে যে পুঞ্জীভূত ধোঁয়ার সৃষ্টি হয় তা আর যাই হোক স্বাস্থ্যকর নয়—বিশেষ ক'রে চোখের স্বাস্থ্যের পক্ষে তো নয়ই। সেক্ষেত্রে আমরা এই জাতীয় আইনকে সমর্থন না জানিয়ে পারি না। এই আইন প্রণয়ন ও তাকে কার্যকরী করার জন্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে উৎসাহ ও অভিনন্দন জানাই। সেই সঙ্গে জানাই আন্তরিক আবেদন ধূমপায়ী দর্শকসাধারণের কাছে, তাঁদের নাগরিক বিচারবুদ্ধির কাছে।
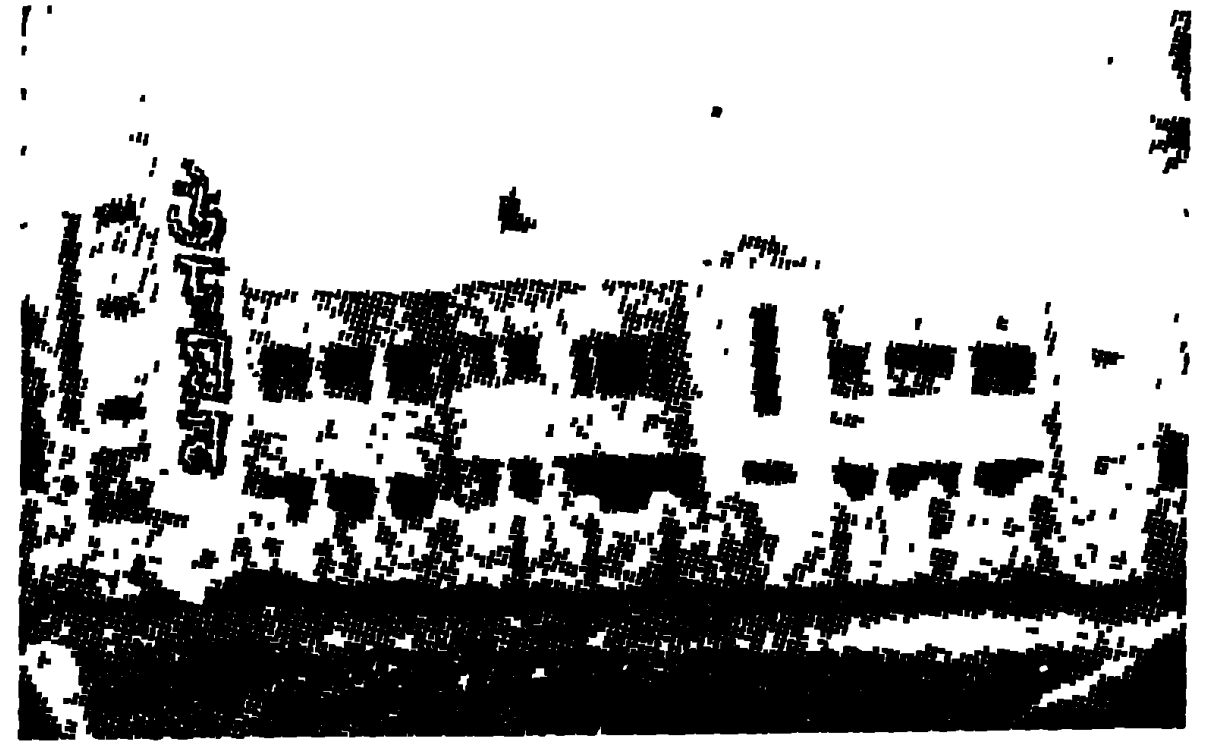
নতুন ছবি

১০৯ ধারা

বর্তমানে বাংলা ছায়াছবির ক্ষেত্রে নূতনত্ব সৃষ্টির প্রয়াস বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এটা আশার কথা। নিছক প্রেমকাহিনীকে কেন্দ্র ক'রে ছায়াছবি তোলবার যে একটা ধারা অব্যাহতভাবে চলে আসছিল—তার পরিবর্তন ঘটিয়েছে 'পরিবর্তন,' 'স্বামিজী,' 'কঙ্কাল,' 'মাইকেল মধুসূদন' প্রভৃতি চিত্র। '১০৯ ধারা'-চিত্রেও আমরা কাহিনীগত বৈচিত্র্য লক্ষ্য করি।

স্বামী, স্ত্রী ও নাবালক পুত্র—কাশী থেকে চলেছেন ক'লকাতায়। পথে আকস্মিক ট্রেণ দুর্ঘটনায় স্বামী মারা গেলেন, স্ত্রী ও পুত্র গুরুতরভাবে আহত হলো। স্ত্রী যদিও বা কোনগতিকে সেরে উঠলেন, কিন্তু দুর্ঘটনার প্রচণ্ড আঘাতে কিশোর ছেলেটির স্মৃতিশক্তি সম্পূর্ণ লোপ পেল। মা-কে সে চিনতে পারলো না। অভাগীর বুকে তা দ্বিতীয় আঘাত হানলো। তারপর, কি ক'রে এই স্মৃতিশক্তিবিলুপ্ত ছেলেটি এক গুণ্ডার হাতে প'ড়ে সমাজবিরোধী হীন কার্যে লিপ্ত হলো, কি করে আবার পাপের পঙ্কিলতা থেকে নিজেকে মুক্ত করে সে অভাগী মায়ের বুকে ফিরে গেল—সেই কাহিনীই রূপায়িত হয়েছে আলোচ্য চিত্রে।

আইনের ১০৯ ধারায় বর্ণিত আছে, 'যেখানেই আসামী সম্পর্কে এরূপ প্রমাণ থাকবে যে, ম্যাজিষ্ট্রেটের এলাকার মধ্যে আসামী নিজের সম্পর্কে কোনরকম সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ দিতে পারে না, সেখানেই ম্যাজিষ্ট্রেটরা আসামীর উপর ১০৯ ধারা প্রয়োগ করে শাস্তি দিতে পারবেন।' স্মৃতিশক্তিবিলুপ্ত নাবালক পল্টু ও পুলিশের প্রশ্নের উত্তরে কোনরকম সন্তোষজনক উত্তর দিতে না পারায় তার বিরুদ্ধে ১০৯ ধারা প্রয়োগ করা হয়। এর ফলে একটি কিশোর-জীবনের গতি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে যায়। সেদিক থেকে এই নামের সার্থকতা আছে।

ছবির আরম্ভ থেকে মাঝামাঝি পর্যন্ত একটা নিরবচ্ছিন্ন কৌতূহল সৃষ্টির প্রয়াস দেখা যায়। কিন্তু চিত্রনাট্য রচনার দোষে শেষদিকটা অত্যন্ত মেলোড্রামাটিক ও সেই কারণে দুর্বল হয়ে পড়েছে। স্বামী-পুত্র-হারা মা, গুণ্ডা সর্দার, দেওকী, স্মৃতিশক্তি বিলুপ্ত পল্টু প্রভৃতির চরিত্রাঙ্কণ অভিনব। কিন্তু এই কাহিনীতে বৈষ্ণবীর কোনো সার্থকতা নেই। Missing link রূপে তাকে আনবার চেষ্টা যাত্রা-গানের 'বিবেকে'র পার্টের মতো। 'সোনার-সংসারী'-প্যাচে হাস্যরস সৃষ্টির প্রয়াসে একটি ভাঁড়ের দল গঠনের খুব প্রশংসা করতে পারব না। বড় যেন বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে।

পরিচালনায় অপূর্ব মিত্র বহুলাংশে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী আরও বাস্তব হ'লে খুশি হতাম। দেওকীর আড্ডায় রাখালীর নাচ পরিবেশ সৃষ্টির সহায়তা করেছে সন্দেহ নেই। কিন্তু দেওকীর কাছে সম্পূর্ণ আধুনিক ঢঙে রাখালীর প্রেমসঙ্গীত সেই পরিবেশ সৃষ্টিতে ব্যাঘাত ঘটিয়েছে। দেওকীর স্ত্রীকে কুৎসিত পাগলিনীরূপে চিত্রিত করবারও কোনো সঙ্গত কারণ দেখি না। এটাকে একটা stunt ছাড়া আর কিছু বলতে পারি না। শেষ দিকে দেওকী খুন না হয়ে যদি পল্টুর সঙ্গে তার ধস্তাধস্তির সময় পুলিশ এসে পড়তো এবং দেওকী পুলিশের হাতে বন্দী হতো তাহলে তা আরও হৃদয়গ্রাহী হতো। একদিকে মাতা-পুত্রের মিলন ও অন্যদিকে পাপীর শাস্তি—যদি এইভাবে ছবি শেষ হোত তাহ'লে মনে তা আরও দাগ কাটতো।

কাহিনীর সংলাপ অনেক স্থানে ত্রুটিপূর্ণ। বিশেষ করে রাখালীর সংলাপে 'প্রতিশ্রুতি' জাতীয় শব্দ ব্যবহার অসঙ্গত হয়েছে। সঙ্গীতরচনা ও সুরসৃষ্টি পরিবেশ রচনার সহায়ক হলেও—গানের সংখ্যা অনায়াসেই কমানো যেত। বিশেষ করে বৈষ্ণবী ও রাখালীর গান।

অভিনয়ই এই ছবির সবচেয়ে প্রশংসনীয়। মায়ের ভূমিকায় মলিনা দেবীর অসামান্য অভিনয়-নৈপুণ্যে আমরা বিস্মিত ও বিমুগ্ধ হয়েছি। তাঁর রূপসজ্জা ও চলাফেরা ও চরিত্রোপযোগী। তারপরেই নাম করতে হয় দেওকীর ভূমিকায় বিপিন গুপ্তের। গুণ্ডার সর্দ্দারের দৈহিক ও বাচনিক বলিষ্ঠতা তাঁর অভিনয়ে যেন নিখুঁত হয়ে ফুটে উঠেছে। স্মৃতিরেখা, পদ্মা, বিপিন, গীতশ্রী, অপর্ণা প্রভৃতির অভিনয়ও যথাযথ।

আঙ্গিকের দিক থেকে সেট-নির্ম্মাণে বহু ত্রুটি আছে। ক্যানভাসের কুঞ্চন অতি সহজেই ধরা পড়ে। রাত্রে কমলীকে নিয়ে যাওয়ার সময় সমস্ত সেটটাই দুলে ওঠে। শব্দগ্রহণ ও চিত্রগ্রহণে রাধাফিল্ম কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

বানপ্রস্থ

এম, পি প্রোডাকসন্সের ছবি 'বানপ্রস্থ'-এর নতুন ধরণের কাহিনীর মধ্যে যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও ছবিটি ব্যর্থ ছবির তালিকায় একটি সংখ্যা বাড়ালো মাত্র। চিত্রনাট্যরচনার দোষে এবং অপ্রাসঙ্গিক উপকাহিনীর অবতারণায় 'বানপ্রস্থ' কোথাও নাটকীয়তায় জমে ওঠেনি। সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে বাপ-মা বুড়ো হলে আর হাতে টাকা পয়সা না থাকলে যে সমস্যার উদ্ভব হয় এবং সমগ্র পরিবারের কাছে তাঁরা কি রকম বোঝা হয়ে দাঁড়ান ও শেষ পর্য্যন্ত তাঁদের কি পরিণাম ও পরিণতি দাঁড়ায় ছবিতে এই বিষয়বস্তুই দেখাবার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছিল সুরুতে। বিনোদবিহারী বুড়ো হয়েছেন। ছেলেদের লেখাপড়া এবং মেয়েদের বিয়ে দিতে তাঁর টাকা পয়সা জমাজমি যায় বসতবাড়ী পর্য্যন্ত চলে গেছে। শেষ অবস্থায় উপনীত হয়ে বিনোদবিহারী ছেলেমেয়েদের ডেকে নিজের এবং স্ত্রী সুরবালার একটা বন্দোবস্ত করতে বললেন। এ পরিস্থিতির জন্যে কেউ প্রস্তুত ছিল না। সকলেই নিজের দুরবস্থার কথা জানিয়ে দিলে। কিন্তু একটা ব্যবস্থা তো করতে হবে! তাই ঠিক হোল সুরবালা কিছু দিনের জন্যে

পুস্তক পরিক্রমা

দীপালী ইংরাজী মাসিক পত্রিকা—আগষ্ট সংখ্যা—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও সুনীল কুমার গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক-সম্পাদিত। দীপালী কার্য্যালয়, ১২৩-১, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা—৬ হইতে প্রকাশিত : দাম এক টাকা দু'আনা।

দীপালী পত্রিকার পরিচয় দেওয়া বোধ হয় নিষ্প্রয়োজন। কারণ দীর্ঘ বাইশ বছর ধরে দীপালী সাপ্তাহিক পত্রিকা রূপে পাঠকসাধারণের মনোরঞ্জন করে আসছে। আলোচ্য সংখ্যা থেকে দীপালী মাসিক পত্রিকায় রূপান্তরিত হোল। এই সংখ্যাটির রচনাগুলি সুচিন্তিত এবং সুলিখিত। এতে পরিবেশিত চিত্রজগতের খবর, চিত্রশিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সুধীজনের মূল্যবান প্রবন্ধ এবং সুপ্রচুর মনোহর চিত্রাবলী পাঠকসাধারণকে যে আনন্দের, রসের এবং জ্ঞানের খোরাক জোগাতে পারবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। দীপালীর নবরূপের জন্যে আমরা এর সম্পাদকদ্বয়কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং সেই সঙ্গে এর শ্রীবৃদ্ধিও কামনা করি।

১ নং ও ২ নং—সুরুচি সেনগুপ্তা, পরিবেশক--বেতার ভবন, ৭৩।৩ ডিক্সন লেন, কলিকাতা-১৪ : দাম দু'টাকা।

১ নং ও ২ নং, অন্তর ও বাহির, চটক-মূষিক-মার্জ্জার উপাখ্যান, অবগুণ্ঠিতা, বিধাতাপুরুষ, চিকিৎসা-সংকট, কালীকান্ত, মামুলি, ন'কড়ি ছ'কড়ির লড়াই, শেষ-রক্ষা, টক্ টাক্ টাকা, এইতো জীবন, লেডিজ সীট্, নস্যের কৌটা, অসহ্য, গলায় গলায় ভাব, মুখোমুখী, আদায় কাঁচকলায়, ৮১ নং বেড—এই উনিশটি ছোট হাসির গল্পের সঙ্কলন '১ নং ও ২ নং'।

আজকাল সত্যিকারের হাসির গল্প খুব কমই চোখে পড়ে। যাও বা পড়ে, সেগুলির মধ্যে হাসির কোন রকম উপাদান থাকে না, বরং জোর ক'রে হাসাবার একটা কষ্টকল্পিত প্রচেষ্টাই প্রকট হ'য়ে ওঠে। আলোচ্য পুস্তকটি কিন্তু সে দোষে দুষ্ট নয়। যে সমস্ত গুণাবলী থাকলে গল্প সত্যিকারের সুন্দর হাসির গল্প হ'য়ে ওঠে সেই সমস্ত গুণাবলীই এই গল্পগুলির মধ্যে রয়েছে। লেখিকা মানুষের জীবনের সাধারণ ভুল-ভ্রান্তি, ত্রুটি-বিচ্যুতি, তার বোকামী এবং সাধারণ মানুষের জীবনের পারি-পার্শ্বিকতার মধ্যে থেকেই খুঁজে নিয়েছেন হাসির উপাদান এবং তা পরিবেশন করেছেন তাঁর সহজ, সরল, মনো-মুগ্ধকর ভাষায়। আমাদের বিশ্বাস গল্পগুলি সহজেই পাঠকবর্গকে আকৃষ্ট করবে এবং তাঁরা বর্ত্তমান জীবনের দুঃসহ জ্বালা এবং বিষময় পারিপার্শ্বিকতার কথা ভুলে গিয়ে অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্যেও প্রাণ খুলে হাসতে পারবেন। প্রচ্ছদপট, ছাপা এবং বাঁধাই সুন্দর।

মহিলা মহল (আষাঢ়, ১৩৫৭)—সম্পাদিকা গীতা বোস। ১৬.এ ডাফ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬ হইতে প্রকাশিত। মূল্য আট আনা।

সমাজ কল্যাণে নিবেদিত বাঙালী মেয়েদের পত্রিকা 'মহিলা মহল' সাময়িক পত্রিকা মহলে একটা বিশেষ স্থান অধিকার করে নিয়েছে আপন স্বকীয়তায়। এ পত্রিকায় মেয়েরাই মেয়েদের কথা বলেন। সাধারণতঃ মেয়েদের পত্রিকা বলতে যা বোঝায় এ পত্রিকাটি তা থেকে ভিন্ন। সমাজ জীবনের কল্যাণই এর লক্ষ্য। আলোচ্য সংখ্যাটি চতুর্থ বর্ষের প্রথম সংখ্যা। নানা তথ্যপূর্ণ আলোচনায় ও ছবিতে বইটি আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। একটা পরিচ্ছন্ন রুচি ও আন্তরিকতার আভাস এর মধ্যে সুস্পষ্ট। নানা গল্প-প্রবন্ধ উপন্যাস-কবিতা প্রভৃতির মধ্যে আমাদের ভালো লেগেছে সাবিত্রী ঘোষালের অনুবাদ-উপন্যাস 'ড্রাগন সীড' (পার্ল বাক), নিজন ঘোষ দস্তিদারের 'সঙ্গীত শিক্ষার আসর', ইন্দুবালা দেবীর 'পরলোক তত্ত্ব', কমলা বন্দোপাধ্যা-য়ের ধর্ম্মতত্ত্ব ও কণিকা বসুর লণ্ডনের চিঠি। নারী জীবনকে সমৃদ্ধ করে তোলার প্রচেষ্টায় এ বইখানি উজ্জ্বল। বাঙালী মেয়েদের কাছে এর যোগ্য সমাদর হোক এই শুভ কামনা করি।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের
স্মৃতি-উদ্‌যাপন
তদীয় জন্ম-বার্ষিকী
শুক্রবার ১২ই আশ্বিন।

জাতির উদ্দেশ্যে
এম·পি·প্রোডাকসন্সের সশ্রদ্ধ নিবেদন

বিদ্যাসাগর

নারীর বন্ধু ও আর্তের সহায়ের
স্মরণীয় জীবন-বেদ!

নাম ভূমিকায়
পাহাড়ী সান্যাল

অপরাপর চরিত্রে—
অহীন্দ্র, ছবি, কমল, গুরুদাস, মলিনা, রেণুকা,
অলকা, শোভা, উৎপল দত্ত, মিরিয়াম ষ্টার্ক

পরিচালনা : কালীপ্রসাদ ঘোষ
তত্ত্বাবধান : অগ্রদূত
সুর : রবীন চট্টোপাধ্যায়

—ডি লুক্স ফিল্মসের পরিবেশনে—
উত্তরা • পূরবী
উজ্জ্বলায়

ভবানী

ফোন : ৭. সাউথ ১৫২৮

দক্ষিণ কলিকাতার অন্যতম মনোরম
ও আরামপ্রদ চিত্রগৃহ

★

চলিতেছে

শকুন্তলা

চম্পা (বারাকপুর)

সহরতলীর নয়নাভিরাম চিত্রগৃহ
আসিতেছে

সমর

শ্রেষ্ঠাংশে : অশোককুমার ও সুমিত্রা

রামকৃষ্ণ টকী

নৈহাটী
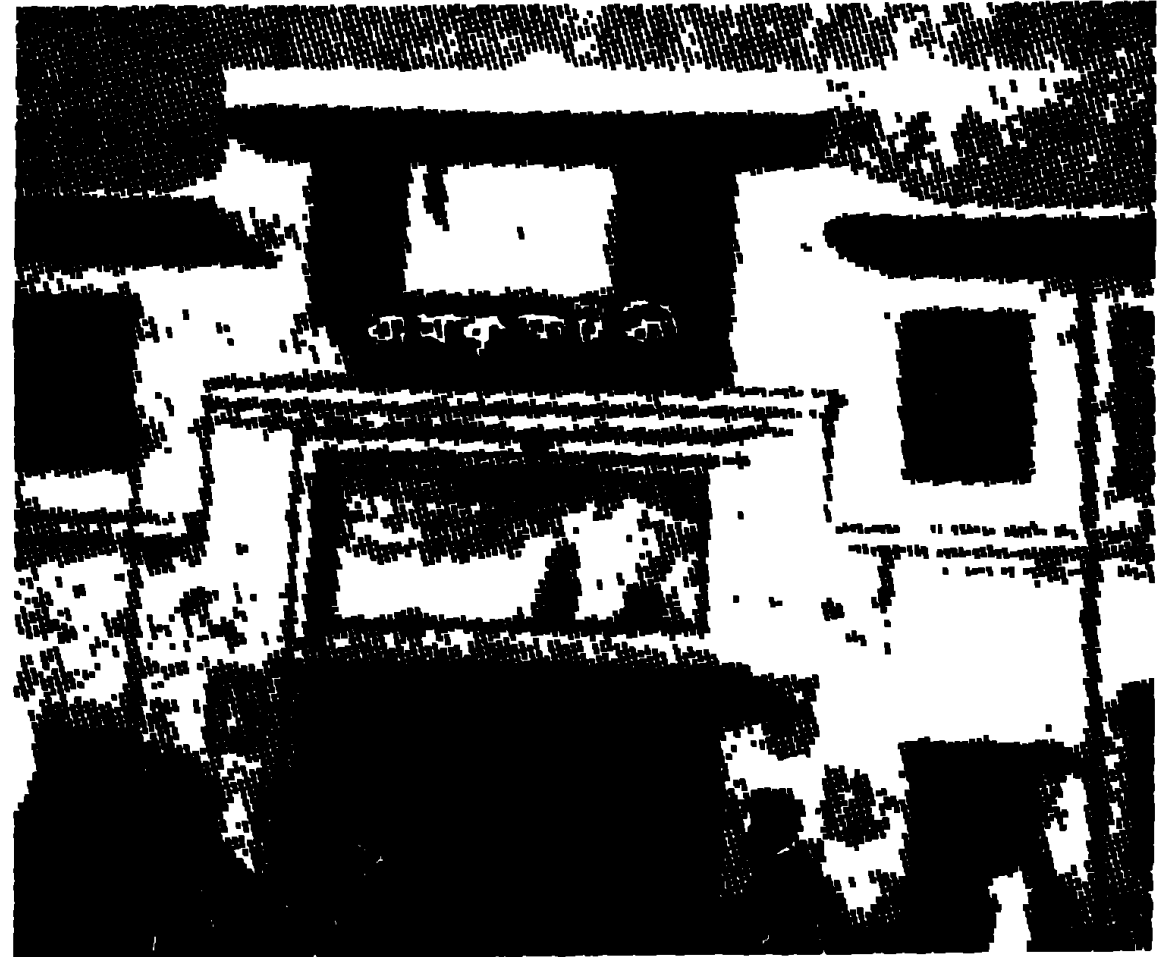
ফোন নং ভাটপাড়া—৭৩

সর্ব্বজনপ্রিয় চিত্রগৃহ : আধুনিকতম নিত্য নতুন ছবি

পুস্তক পরিচয়

দীপালী ইংরাজী মাসিক পত্রিকা—আগষ্ট সংখ্যা—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও সুনীল কুমার গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক-সম্পাদিত। দীপালী কার্য্যালয়, ১২৩-১, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা—৬ হইতে প্রকাশিত : দাম এক টাকা দু'আনা।

দীপালী পত্রিকার পরিচয় দেওয়া বোধ হয় নিষ্প্রয়োজন। কারণ দীর্ঘ বাইশ বছর ধরে দীপালী সাপ্তাহিক পত্রিকা-রূপে পাঠকসাধারণের মনোরঞ্জন করে আসছে। আলোচ্য সংখ্যা থেকে দীপালী মাসিক পত্রিকায় রূপান্তরিত হোল। এই সংখ্যাটির রচনাগুলি সুচিন্তিত এবং সুলিখিত। এতে পরিবেশিত চিত্রজগতের খবর, চিত্রশিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সুধীজনের মূল্যবান প্রবন্ধ এবং সুপ্রচুর মনোহর চিত্রাবলী পাঠকসাধারণকে যে আনন্দের, রসের এবং জ্ঞানের খোরাক জোগাতে পারবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। দীপালীর নবরূপের জন্যে আমরা এর সম্পাদকদ্বয়কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং সেই সঙ্গে এর শ্রীবৃদ্ধিও কামনা করি।

১ নং ও ২ নং—সুরুচি সেনগুপ্তা, পরিবেশক--কেতাব ভবন, ৭৩৩ ডিক্সন লেন, কলিকাতা-১৪ : দাম দু'টাকা।

১ নং ও ২ নং, অন্তর ও বাহির, চটক-মূষিক-মার্জ্জার উপাখ্যান, অবগুণ্ঠিতা, বিধাতাপুরুষ, চিকিৎসা-সংকট, কালীকান্ত, মামুলি, ন'কড়ি ছ'কড়ির লড়াই, শেষ-রক্ষা, টক্ টাক্ টাকা, এইতো জীবন, লেডিজ সীট্, নস্যের কৌটা, অসহ্য, গলায় গলায় ভাব, মুখোমুখী, আদায় কাঁচকলায়, ৮১ নং বেড—এই উনিশটি ছোট হাসির গল্পের সঙ্কলন '১ নং ও ২ নং'।

আজকাল সত্যিকারের হাসির গল্প খুব কমই চোখে পড়ে। যাও বা পড়ে, সেগুলির মধ্যে হাসির কোন রকম উপাদান থাকে না, বরং জোর ক'রে হাসাবার একটা কষ্ট কল্পিত প্রচেষ্টাই প্রকট হ'য়ে ওঠে। আলোচ্য পুস্তকটি কিন্তু সে দোষে দুষ্ট নয়। যে সমস্ত গুণাবলী থাকলে গল্প সত্যিকারের সুন্দর হাসির গল্প হ'য়ে ওঠে সেই সমস্ত গুণাবলীই এই গল্পগুলির মধ্যে রয়েছে। লেখিকা মানুষের জীবনের সাধারণ ভুল-ভ্রান্তি, ত্রুটি-বিচ্যুতি, তার বোকামী এবং সাধারণ মানুষের জীবনের পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে থেকেই খুঁজে নিয়েছেন হাসির উপাদান এবং তা পরিবেশন করেছেন তাঁর সহজ, সরল, মনোমুগ্ধকর ভাষায়। আমাদের বিশ্বাস গল্পগুলি সহজেই পাঠকবর্গকে আকৃষ্ট করবে এবং তাঁরা বর্ত্তমান জীবনের দুঃসহ জ্বালা এবং বিস্ময় পারিপার্শ্বিকতার কথা ভুলে গিয়ে অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্যেও প্রাণ খুলে হাসতে পারবেন। প্রচ্ছদপট, ছাপা এবং বাঁধাই সুন্দর।

মহিলা মহল (আষাঢ়, ১৩৫৭)—সম্পাদিকা গীতা বোস। ১৬এ ডাফ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬ হইতে প্রকাশিত। মূল্য আট আনা।

সমাজ কল্যাণে নিবেদিত বাঙালী মেয়েদের পত্রিকা 'মহিলা মহল' সাময়িক পত্রিকা মহলে একটা বিশেষ স্থান অধিকার করে নিয়েছে আপন স্বকীয়তায়। এ পত্রিকায় মেয়েরাই মেয়েদের কথা বলেন। সাধারণতঃ মেয়েদের পত্রিকা বলতে যা বোঝায় এ পত্রিকাটি তা থেকে ভিন্ন। সমাজ জীবনের কল্যাণই এর লক্ষ্য। আলোচ্য সংখ্যাটি চতুর্থ বর্ষের প্রথম সংখ্যা। নানা তথ্যপূর্ণ আলোচনায় ও ছবিতে বইটি আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। একটা পরিচ্ছন্ন রুচি ও আন্তরিকতার আভাস এর মধ্যে সুস্পষ্ট। নানা গল্প-প্রবন্ধ উপন্যাস-কবিতা প্রভৃতির মধ্যে আমাদের ভালো লেগেছে সাবিত্রী ঘোষালের অনুবাদ-উপন্যাস 'ড্রাগন সীড' (পার্ল বাক), বিজন ঘোষ দস্তিদারের 'সঙ্গীত শিক্ষার আসর', ইন্দুবালা দেবীর 'পরলোক তত্ত্ব', কমলা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধর্ম্মতত্ত্ব ও কণিকা বসুর লণ্ডনের চিঠি। নারী জীবনকে সমৃদ্ধ করে তোলার প্রচেষ্টায় এ বইখানি উজ্জ্বল। বাঙালী মেয়েদের কাছে এর যোগ্য সমাদর হোক এই শুভ কামনা করি।

থাকবেন বড়ছেলে মোহিতের কাছে আর বিনোদবিহারী কয়েক দিনের জন্যে বড়মেয়ে মনোরমার কাছে, তারপর ছোট মেয়ে সুষমার কাছে কলকাতায় মোহিতের বাড়িতে সুরবালার প্রতিপদে সংঘর্ষ বাধে পুত্রবধূ অপর্ণা এবং কলেজে-পড়া নাতনী বিনার সঙ্গে। ওদিকের বর্দ্ধমানে বিনোদবিহারীর ভার বড় মেয়ে মনোরমার কাছে অসহ্য হোয়ে উঠেছিল। এদিকে অপর্ণা সুরবালাকে অন্যত্র পাঠাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। হঠাৎ একদিন অফিসের টাকা ভাঙবার অপবাদে পুলিশ মোহিতকে গ্রেপ্তার করে সুরবালা লোকলজ্জা ভুলে ছুটলেন ছেলের মনিবের বাড়ী। মায়ের সন্তান স্নেহে তিনি অভিভূত হলেন শেষ পর্যন্ত সুরবালাকে তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন মোহিতকে রক্ষা করবেন বলে। সুরবালা বাড়ী এসে জানতে পারলেন বিনোদবিহারী অসুস্থ। তখুনি ছুটলেন বর্দ্ধমানে। সেখানে গিয়ে স্বামীকে সুস্থ করে তুললেন। এই হোল মোটামুটি কাহিনী।

কাহিনী প্রথম দিকে বেশ ভালভাবেই সুরু হয়েছিল কিন্তু শেষের দিকে বিশেষ করে শেষের ক'টি দৃশ্যে কাহিনীর খেই হারিয়ে যাওয়ায় তা যেমন হাস্যাস্পদ, তেমনি অবাস্তব, তেমনি অপ্রাসঙ্গিক হয়েছে। গোঁজামিল দিয়ে কাহিনী জোড়াতালি দেওয়ার চেষ্টা অতি প্রকট চিত্রনাট্যকার ও পরিচালকের লক্ষ্যহীনতার জন্য কাহিনী আবেদন জাগায় না। অভিনয়ের মধ্যে সুরবালার চরিত্রে মলিনা দেবী অপূর্ব্ব অভিনয় করেছেন। তাঁর রূপসজ্জা ও আবেগময় অভিব্যক্তি চরিত্রটিকে প্রাণবন্ত করে তুলেছি। জহর গাঙ্গুলী বৃদ্ধ বিনোদবিহারীর চরিত্রে যথাযথ রূপদান করেছেন।

—তীরন্দাজ

ম্যাকবেথ

সেক্সপিয়ারের অমর নাটক 'ম্যাকবেথ' অরসন ওয়েল্‌সের বলিষ্ঠ চিত্র-নিবেদন। নাম ভূমিকায় অভিনয়ও করেছেন তিনি নিজেই।

ছবিটি দেখে ম্যাক্‌বেথের চরিত্র সম্বন্ধে দু'রকম ধারণা হতে পারে। প্রথমতঃ ম্যাক্‌বেথকে দুর্ব্বল চিত্তের বলে মনে হয়। স্ত্রীর প্ররোচনাতেই সে রাজা হয়ে একের পর এক হত্যা করে যেতে লাগলো। সেক্সপিয়ার রচিত নাটকে যা ছিল তা বর্ণে বর্ণে পালিত হয় নি। ক্যামেরার কাজের সুবিধার জন্য কোন কোন অংশ বাদ দেওয়া হয়েছে বা অনেক অংশ আরও বড় ক'রে তুলে ধরা হয়েছে। চলচ্চিত্র হিসাবে এগুলি মেনে নিলেও সেক্সপীয়ারের নাটকের দিক থেকে কিন্তু সমর্থনযোগ্য নয়।

এ ছবির প্রযোজনা ক'রে প্রযোজক-পরিচালক অরসন ওয়েলস্ কৃতিত্বের দাবী করতে পারেন। একাদশ শতাব্দীর স্কটল্যাণ্ডের দুর্গের দৃশ্যাদি, কুয়াশার দৃশ্য, যুদ্ধের দৃশ্য, সবকিছুই বেশ নিখুঁত হয়েছে, এদিক থেকে ক্যামেরার কাজ অপূর্ব্ব। সঙ্গীত এ ছবির একটা সম্পদ বিশেষ।

অভিনয়ের দিক থেকে নাম ভূমিকায় অরসন ওয়েল্‌সের অভিনয় বহু নাটকীয় মুহূর্ত্তে উৎকর্ষ দেখিয়েও আগাগোড়া সমতা রাখতে পারে নি। লেডী ম্যাক্‌বেথের ভূমিকায় জেনেট নোলানের অভিনয় চরিত্রটির গুরুত্ব ও বলিষ্ঠতা ক্ষুণ্ণ করেছে। 'ম্যাক্‌বেথ' নাটকে পরিচালক চলচ্চিত্রগত গতি সঞ্চার করতে পেরেছেন। ম্যাক্‌ডাফের ভূমিকায় ড্যান ও'হেরলিহি সুন্দর অভিনয় করেছেন। ম্যালকমের ভূমিকায় রডি ম্যাক্‌ডাওয়েল চরিত্রটিকে মোটেই ফোটাতে পারেন নি।

—সপ্তর্ষি

সুধার প্রেম

মতীন্দ্রনাথ মিত্র প্রবর্ত্তিত নিউ থিয়েটার্স (ইষ্টার্ণ) ডিষ্ট্রিবিউটার্সের ছবি। ইতিপূর্ব্বে এই প্রতিষ্ঠান উপহার দিয়েছিলেন 'শঙ্করনারায়ণ'—এমন একখানি ভালো ছবির পর এরকম কুৎসিৎ ছবি তাঁদের কাছ থেকে আশা করিনি—বিশেষ ক'রে যাঁরা 'নিউ থিয়েটার্স' কথাটা নামের আগে ব্যবহার করেন। পরিচালনা করেছেন বাংলা চিত্রজগতের প্রবীণতম পরিচালক প্রেমাঙ্কুর আতর্থী। তিনি স্বজ্ঞানে এমন একখানি ছবির কর্ণধারণ করেছেন বিশ্বাস করতে বাধে।

ছবির মধ্যে সুধাও নেই, প্রেমও নেই—আছে শুধু প্রেমের ফষ্টিনষ্টি আর অকারণ অনুপযোগী গান, সেই সঙ্গে সুবিন্যস্ত কাহিনীর অভাব। মূল উপন্যাসের কাহিনী ছবিতে পরিবর্ত্তিত হয়েছে কিন্তু সে পরিবর্ত্তন বাস্তববোধের অভাব এবং কল্পনার দৈন্যই প্রকাশ করেছে। সুধার ভূমিকায় যে শিল্পীকে নির্ব্বাচিত করা হয়েছে তাঁর মধ্যে সুধা এবং প্রেম অর্থাৎ আঙ্গিক সৌষ্ঠব ও কমনীয়তা এবং অভিনয়নৈপুণ্য কোনোটারই সন্ধান পাওয়া গেল না। তেমনি সন্ধান পাওয়া গেল না—শেষ পর্য্যন্ত মোটরে উঠে সুধা গেল কোথায়? এতখানি বস্তুপ্রধান ছবি হঠাৎ আচম্‌কা এমন ইঙ্গিতপ্রধান হ'য়ে উঠলো কি ক'রে?

ছবির কাহিনী বলার প্রয়োজন নেই—নামেই তার পরিচয়। প্রেমিকের ভূমিকায় অসিতবরণ দম-দেওয়া কলের পুতুলের মতন—ফরমাস মাফিক প্রেম করতে করতেই অনুভূতি, অভিব্যক্তি আবেগ সব নিঃশেষিত। দু'নম্বর দয়িতা মাধুরীর ভূমিকায় নবাগতা বাসন্তী উৎরে গেছেন

রূপতরঙ্গ

★★★★★★★★★★★★★★★★★★

সে নিলো বিদায়

আজীবন ঐশ্বর্য্য-সুখে পালিতা অলকা ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে এমন জায়গায় এলো যেখানে এক মুঠো অন্নের জন্যে সইতে হয় গঞ্জনা লাঞ্ছনা·· শুধু কি তাই মিথ্যা অপবাদের বোঝাও তার ওপর এসে পড়ে। অলকা চায় পালিয়ে যেতে · থাকতে চায় না সে এই বিষাক্ত আবহাওয়ার মধ্যে। কিন্তু যাবে কোথায়? যেখানেই যাবে নিয়তির মতন অনুসরণ করবে চক্রপাণি...কে এই চক্রপাণি? কি তার উদ্দেশ্য? কেন সে অলকাকে ছায়ার মতো অনুসরণ করে? সে কি অলকাকে ভালবাসে না আর কোন উদ্দেশ্য আছে? ...এই জিজ্ঞাসাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে ভারতী জাতীয় চিত্র প্রতিষ্ঠানে'র 'সে নিল বিদায়'। ছবিখানি শীঘ্রই কলিকাতার কয়েকটি বিশিষ্ট চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করবে ব'লে প্রকাশ। এর বিভিন্ন ভূমিকায় আছেন স্মৃতিরেখা, রেণুকা রায়, প্রভা, রেবা, পূর্ণিমা, অপর্ণা, বিপিন মুখার্জ্জী, ছবি রায়, ভানু ব্যানার্জ্জী, তুলসী চক্রবর্ত্তী কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। কাহিনী ও পরিচালনা জ্যোৎস্নাময় মিত্রের, চিত্রনাট্য ও সংলাপ শচীন সেনগুপ্তের। সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন সুবল দাশগুপ্ত এবং ছবিটি প্রযোজনা করেছেন বিষ্ণুচরণ সাহা।

'বহুরূপী'র 'উলুখাগড়া'

'বহুরূপী' ব'লে যে নতুন নাট্যসঙ্ঘটি তুলসী লাহিড়ী রচিত 'পথিক' নাটকের সুঅভিনয় ক'রে সুনাম অর্জ্জন করেছিলেন সেই নাট্যসঙ্ঘই গত ১২ই আগষ্ট ম্যানসন ইন্‌স্টিটিউটে শ্রীসঞ্জীব লিখিত 'উলুখাগড়া' অভিনয় করেছেন!

নাট্যকার নবীন। তাঁর ভঙ্গী ব্যঙ্গাত্মক। বিষয়বস্তু ট্র্যাজেডি। এবং আমাদের রাজনৈতিক পরিস্থিতির একটা রূপকও উঁকি মারে প্রচ্ছন্নভাবে। আমাদের দেশের পক্ষে নতুন ধরণের নাটক।

প্রয়োগ পদ্ধতি সম্পূর্ণ অভিনব। একটা দরজা বা একটা জানলা বসিয়ে সেটু বোঝানোর চেষ্টা একটা গভীর শিল্পবোধের পরিচয় দেয়। তারপর অভিনয়। অর্দ্ধ-বিকৃত-মস্তিষ্ক এক মহিলার ভূমিকায় তৃপ্তি মিত্রের অভিনয় নিখুঁত। অপরাপর চরিত্রে গঙ্গাপদ বসু, শম্ভু মিত্র ইত্যাদির অভিনয় যথাযথ। কালী সরকারের অভিনয় কিঞ্চিৎ মঞ্চঘেঁষা।

নীলদর্পণ

গত ২৭শে আগষ্ট শিয়ালদহ রেলওয়ে ম্যানসন ইন্‌ষ্টিটিউট হলে 'নাট্যচক্র' কর্ত্তৃক স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্রের অমর নাটক 'নীলদর্পণে'র অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিদেশী নীলকরদের অত্যাচারে লাঞ্ছিত ও বিক্ষুব্ধ বাংলার অবিস্মরণীয় ও ঐতিহাসিক কাহিনীর নাট্যরূপ এই 'নীলদর্পণ'। শাসক শক্তির রোষ কশায়িত করে তুলেছিল—উৎপীড়িত জনগণের মর্ম্মবেদনা ও প্রতিরোধকে ধ্বনিত করে তুলেছিল। আজ এত বছর পরেও তার নাট্যমূল্য বা আবেদন ক্ষুণ্ণ হয় নি। সেই চিরনূতন নাটককে নতুন ভাবে রূপায়িত করার জন্য 'নাট্যচক্রে'র উদ্যমকে আমরা অভিনন্দন জানাই। আমাদের বিশেষ ক'রে মুগ্ধ করেছে এই নাট্যসঙ্ঘের দৃষ্টিভঙ্গী ও দায়িত্ববোধ এবং সেই সঙ্গে তাঁদের আন্তরিক ঐকান্তিক নিষ্ঠা। বস্তুতঃ তাঁদের সঙ্গতি-হীনতা এবং ভুলভ্রান্তি ম্লান হোয়ে গেছে তাঁদের উদ্যমের নিষ্ঠার কাছে। ত্রুটি অবশ্য আছে অনেক, আছে রূপসজ্জায়, আছে মঞ্চসজ্জায়, আছে আবহ-সঙ্গীতে কিন্তু তার প্রত্যেকটিই সংশোধিত হওয়া খুবই সহজ তাঁদের নিষ্ঠার গুণে। সবচেয়ে যা উল্লেখযোগ্য এই অনুষ্ঠানে তা হোল প্রত্যেকটি ভূমিকার যথাযথ অভিনয়। 'সাবিত্রী'র ভূমিকায় শোভা সেন, 'তোরাপে'র ভূমিকায় বিজন ভট্টাচার্য্য, 'আদুরী'র ভূমিকায় আরতি মৈত্র, 'পদি ময়রাণী'র ভূমিকায় মাধবী রায়, 'গোপী'র ভূমিকায় গঙ্গাপদ বসু, 'সাধুচরণ' রূপে নকুলেশ্বর চক্রবর্ত্তী, 'উডের' চরিত্রে সত্য রায়, 'ক্ষেত্রমণির' ভূমিকায় গীতা সোমের অভিনয় নাটকখানিতে প্রাণ-সঞ্চার করেছে। একটি রায়তের ভূমিকায় নবেন্দু ঘোষের নির্ব্বাক অভিনয় প্রসংশনীয়।

রত্নদীপ

প্রখ্যাত কথা-শিল্পী ও স্বর্গত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের জনপ্রিয় উপন্যাস 'রত্নদীপ' অবলম্বনে নির্মীয়মাণ সমাজ-চিত্রটি বিখ্যাত প্রযোজক দেবকীকুমার বসুর পরিচালনাধীনে তাঁহার নিজস্ব প্রতিষ্ঠান 'চিত্রমায়া'র দ্বিতীয় চিত্র-নিবেদন রূপে আত্মপ্রকাশ করবে। ছবিখানির অর্দ্ধাংশের চিত্রগ্রহণ গত একমাসে শেষ হয়েছে, এবং আগামী মহাপূজার পূর্বেই ছবিটি সম্পূর্ণ হবে ব'লে প্রকাশ।

'রত্নদীপ' চিত্রের বিভিন্ন চরিত্র-গুলিতে যেসব খ্যাতনামা শিল্পীরা চিত্রাবতরণ করেছেন, তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য: অনুভা গুপ্তা, মঞ্জু দে, ছায়া দেবী, সুপ্রভা মুখোপাধ্যায়, নীতিশ মুখোপাধ্যায়, বিকাশ রায় ও নবাগতা শিক্ষিতা শিল্পী মায়া গঙ্গোপাধ্যায়। সংগীতাংশের পরিচালনাভার গ্রহণ করেছেন রবীন চট্টোপাধ্যায়।

নতুন চিত্রের মহরৎ

গত ১৫ আগষ্ট মঙ্গলবার 'রূপমঞ্চ'-সম্পাদক কালীশ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে ফিরপো রেষ্টুরেন্টে বড়ুয়া চিত্র প্রতিষ্ঠানের প্রথম চিত্র 'অন্তরাগের' মহরৎ অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে বহু চলচ্চিত্র সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন। 'অন্তরাগ' রচনা ও পরিচালনা করবেন পুষ্পিতানাথ চট্টোপাধ্যায়। স্মৃতিরেখা বিশ্বাস, বিকাশ রায়, মলিনা দেবী, ছবি বিশ্বাস প্রভৃতি অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করবেন।

প্রবীণ কথাশিল্পী উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের জনপ্রিয় একখানি উপন্যাসের নাম 'অন্তরাগ'। কাজেই এই নামটি ব্যবহার ক'রে এই চিত্রের উদ্যোগীরা সুবুদ্ধি বা সৌজন্যের পরিচয় দিয়েছেন ব'লে আমরা মনে করি না।

গত বৃহস্পতিবার ১৭ই আগষ্ট 'তোমাদের ছবি লিমিটেডে'র প্রথম চিত্র-নিবেদন 'অপরাধী'র মহরৎ গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেলে অনুষ্ঠিত হয়।

বাণী-চিত্রে "যুগদেবতা"

বাণী-চিত্রাকারে পরিবেশিত কালিদাস প্রভাকসাল-এর বহু-অপেক্ষিত জীবনী-চিত্র 'যুগদেবতা' শুক্রবার ১৫ই সেপ্টেম্বর একযোগে রূপবাণী, অরুণা, ইন্দিরায় এবং শহরতলীর আরও বারোটি 'সিনেমাহলে' মুক্তিলাভ করবে!

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের পূর্ণাঙ্গ জীবন-কথা বাণী-চিত্রের মাধ্যমে রূপায়িত হবার সুযোগলাভ করায়, সারা দেশব্যাপী, জাতিধর্মনির্বিশেষে সর্বশ্রেণীর দর্শককে পরিতৃপ্ত করবার ক্ষেত্র প্রশস্ত হল। শ্রীশ্রীঠাকুরের অলৌকিক জীবনকথা, তাঁর অপূর্ব "কথামৃত" ও ব্যক্তিত্বের আকর্ষণী প্রতিভা সম্বন্ধে আমাদের দেশবাসী সকলেই অবহিত আছেন! তিনি তাঁর জীবন সমুদ্র নিজেই মথিত করে দিয়ে গেছেন কলুষিত, হিংস্র উন্মত্ততায় মত্ত বিশ্বের সম্মুখে শাশ্বত ভারতের দিব্য মূর্তিকে সমুদ্ভাসিত করে..। তিনি তাঁর সঙ্গীন যাত্রাপথে প্রত্যক্ষভাবে এই ভারতের সহস্র যুগের বিভিন্ন ধারার আন্তর সুর মাধুর্যকে মূর্ত্ত করে গেছেন।

শ্রীকালিদাস এই ছায়াচিত্রখানিকে পরিপূর্ণ ও সার্থক ভাবে রূপায়িত করতে ধৈর্য, অধ্যবসায় ও আন্তরিকতার পরিচয় দিয়েছেন বলে প্রকাশ। জানা গেল, বারোখানি আবেগপূর্ণ ভক্তিরসাত্মক সঙ্গীতের সমাবেশ চিত্রটির আর একটি আকর্ষণ। মূল নায়িকা চরিত্রে রূপ দিয়েছেন বাঙলার স্বনামধন্যা চরিত্রাভিনেত্রী শ্রীমতী চন্দ্রাবতী। অন্যান্য বিশিষ্ট চরিত্রে রূপ দিয়েছেন যথাক্রমে গুরুদাস, নীতীশ, জ্যোতির্ময়, মাষ্টার পঙ্কজ, ভবত চৌধুরী, হরিধন, রমা চৌধুরী, উমা মুখার্জি, ফণী রায় ও তারক মুখার্জি। সঙ্গীতাংশের পরিচালনা করেছেন রামচন্দ্র পাল।

"গৈরিক পতাকা" নাটকাভিনয়

'বৈজয়ন্তী'র সভ্যবৃন্দের উদ্যোগে চিত্রাভিনেতা শৈলেন পালের পরিচালনায় স্বনামধন্য নাট্যকার শচীন সেনগুপ্তের 'গৈরিক পতাকা' ২২শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হবে।

স্যামসন এ্যাণ্ড ডেলিলা

আগামী ১৩ই অক্টোবর এলিট সিনেমাতে আরম্ভ হবে সেসিল বি, ডি মিলি প্রযোজিত প্যারামাউন্টের বহুবর্ণরঞ্জিত ছবি 'স্যামসন এ্যাণ্ড ডেলিলা'।

জাঁক-জমকপূর্ণ ইংরাজী ছবির পরিচালক হিসেবে ডি'মিলি বিশেষ পরিচিত। খৃষ্টান সুসমাচার থেকে গৃহীত 'বুক অফ জাজেস'-এর ত্রয়োদশ থেকে ষোড়শ অধ্যায়ের সারাংশ থেকেই গঠিত হয়েছে এর কাহিনী।

স্যামসন আর ডেলিলার বিয়োগান্ত জীবন-কাহিনী ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এই ছবিতে। ডেলিলার ভূমিকায় দেখা যাবে হেডি লামারকে, স্যামসনের রূপ দিয়েছেন ভিক্টর ম্যাচিয়োর। জর্জ স্যাণ্ডারস্, এঞ্জেলা ল্যান্সবেরী এবং হেনরী উইলকক্সন ইত্যাদি তারকাদেরও এই ছবিতে দেখা যাবে।

স্টিরিওস্কোপি

নিমাই ঘোষ

মানব ইতিহাসের প্রথম পর্ব্বের দিকে এক প্রভাতে—কোন এক গুহাবাসী মানুষ, চোখ খুলতেই দেখলো তার গুহার এবড়ো-খেবড়ো দেওয়ালে উজ্জ্বল লাল এবং কালোয় এক অপূর্ব্ব নক্সার সৃষ্টি হয়েছে। তার অনুভূতি তাকে বলেছিল—এ রং নয়, লাল আলো। তার অনুসন্ধিৎসু মন এই লালের উৎপত্তি খুঁজে বার করতে প্রেরণা জুগিয়েছিল। সে ধড়মড় করে উঠে বসে ঘাড় ঘুরিয়ে গহ্বরের দ্বারপথের দিকে চেয়েছিল।

কি দেখলো?

দেখলো গুহার জমাট অন্ধকারের ঠিক মাঝখানে এক বিরাট ফাটলের ভিতর উজ্জ্বল এক ঝলক আলো,—প্রকৃতির গড়া দরজার ফ্রেমের আঁকাবাঁকা, ভাঙাচোরা লাইনটা কত স্পষ্ট। দরজার ঠিক বাইরেই বড় বড় নলা-ঘাসগুলো খাড়া দাঁড়িয়ে তার একটু দূরেই সাদা সাদা জংলী ফুলগুলো কে যেন লাল রাংতা দিয়ে মুড়ে দিয়েছে,—তার খানিকটা দূরেই একটা বুড়ো পাহাড়ে গাছ, তার পায়ের কাছ থেকে বিরাট কোদাল দিয়ে বেশ এক চাঙড় মাটি কোপ মেরে নিয়ে যাওয়ায়, বড় বে-কায়দায় পড়ে গেছে, কোমড় ভেঙে পড়ে যাবার দুর্ঘটনায় সামাল দিতে, তার জরাজীর্ণ দেহে কুঁজো হোয়ে এক হাত দিয়ে একটা পাথরের মাথা ধরে ফেলেছে আর একটা হাত ওপর দিকে তুলে গাঁটবহুল আঙুলগুলো ছড়িয়ে—আকাশের লালপেড়ে মেঘগুলো খাম্‌চে ধরবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে।—তার পরেই জমিটা যেন হুস্ কোরে নীচে দিয়ে গড়িয়ে গেছে, তার খানিকটা সবুজ বাকীটা সোনালী,—বোধ হয় বালি—তার ওপর দিয়ে একটা নদী এঁকে-বেঁকে দৃষ্টিকে কেবলই দূরের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে,—যে রাংতা দিয়ে ফুলগুলি মোড়া হয়েছে তারই কুচি কে জলের ওপর ছড়িয়ে দিয়েছে চিক্‌চিক্ চিক্‌চিক্ কোরে ভাস্‌তে ভাস্‌তে চলে যাচ্ছে কিন্তু ফুরোচ্ছে না।—দূরে—আরো দূরে, দৈত্যের মত নীল পাহাড়গুলো মাথায় কুয়াসার পাগড়ী জড়িয়ে সীমানা পাহারা দিচ্ছে। তাদেরই কাঁধের পিছন থেকে উঁকি দিচ্ছে লাল আলোর উৎস।

আদিম মানুষ বিস্ফারিত চক্ষে এই দৃশ্য দেখেছিল তার চিবুক ঝুলে পড়েছিল, বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে তার গলা দিয়ে কতকগুলো দুর্ব্বোধ্য আওয়াজ বেরিয়েছিল। ভাষা ছিল না তাই বেচারা ভাষা খুঁজে পায় নি। তবে নিঃসন্দেহে সে এই কথাই বলেছিল :—

"কি সুন্দর!" "কি চমৎকার!"

এই দুটী বাক্যের মধ্যেই চিত্রশিল্পের বীজ লুকানো ছিল।

গুহাবাসীর সৌন্দর্য্য উপভোগের এই বোধশক্তি তার ভিতরের ঘুমন্ত-শিল্পীকে জাগিয়ে তুলেছিল। তাই পাথরের দেওয়ালে আঁচড় কেটে প্রাকৃতিক দৃশ্যের, অথবা তার পারিপার্শ্বিক জীব-জন্তুর প্রতিকৃতি এঁকে দেখার চেষ্টা সে করেছে।

সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এলো তুলিচিত্র (painting)। সভ্য মানুষ তুলি নিয়ে রং দিয়ে প্রকৃতিকে একটা ফ্রেমের মধ্যে আটক করার কাজে বেশ সফলতা অর্জ্জন করলো। কিন্তু তবুও যেন কোথায় একটু অভাব রয়ে গেল। সবই হল কিন্তু রিয়ালিটি তো ফুটিয়ে তোলা যাচ্ছে না! বৈজ্ঞানিক যুগের মানুষ আরো এক ধাপ ওপরে উঠে বললে—"পেয়েছি"!

এলো Photography বা আলোকচিত্র। এই নতুন চিত্রশিল্প ছবির মধ্যে প্রথম Reality-র ছোঁয়াচ দিল। কিন্তু কতখানি?

একটা আলোকচিত্র কাগজের ওপর ছাপা অবস্থায় কিম্বা পর্দ্দার ওপর প্রতিফলিত অবস্থায় দেখলে—কি দেখি? দেখি, বাস্তবের হুবহু প্রতিচ্ছবি। আঁকা ছবির সঙ্গে আলোকচিত্রের আসলে এইখানেই পার্থক্য। নৈলে একটা দৃশ্য দেখাবার মূলতত্ত্বের (Principle-এর) দিক দিয়ে তুলিচিত্র থেকে বিশেষ কিছু তফাৎ নেই।

কোন দৃশ্য Reproduce করতে আলোকচিত্র, তুলিচিত্রের এক ধাপ উপরে উঠলো বটে কিন্তু বাস্তব উপলব্ধির সম্পূর্ণতা আনতে পারলো না। তার [illegible],

আলোছায়ার খেলার মধ্য দিয়ে এবং দৃশ্যের আভ্যন্তরীণ-বস্তুগুলির আকারের তারতম্যের ভিতর দিয়ে গড়নের (Solidity-এর) এবং তাদের পরস্পরেরআপেক্ষিক দূরত্বের (Perspective-এর) একটা ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করার মধ্যে, সীমাবদ্ধ রইল। অর্থাৎ একটা দৃশ্যের ফোটোগ্রাফ দেখলে,—দৃশ্যটা সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা, একটা Painting-এর চাইতে Reality-র দিক থেকে অনেক বেশী হয় বটে কিন্তু আমাদের চেতনা সবসময় মনে করিয়ে দেয় যে ছবিটা একটা flat surface-এর ওপর ছাপা। তার দৈর্ঘ্য আছে, প্রস্থ আছে কিন্তু গভীরতার (Depth-এর) পুরোপুরি উপলব্ধি হচ্ছে না।

আরো একটু পরিষ্কার করে বলি :—

"গুহার দরজা......**দরজার ঠিক বাইরেই** বড় বড় নলা ঘাস...... **তার একটু দূরে** সাদা সাদা জংলী ফুল... **তার খানিকটা দূরে,** একটা বুড়ো গাছ......**তার পরেই** জমিটা যেন হুস্ করে নীচের দিকে গড়িয়ে গেছে, তার ওপর দিয়ে নদী এঁকেবেঁকে দৃষ্টিকে **দূরের দিকে** টেনে নিয়ে যাচ্ছে... **দূরে; আরোও দূরে**...নীল পাহাড়" ইত্যাদি।

বস্তুগুলির এই যে আপেক্ষিক দূরত্ববোধ এবং প্রত্যেকটার Solidity-র উপলব্ধি, যা আমরা চোখে দেখার সময় পেয়ে থাকি—ঠিক এই অনুভূতিরই অভাব বোধ করি একটা সাধারণ Photograph-এর মধ্যে।

আধুনিক মানুষ এ অভাবও বরদাস্ত করেনি। Photograph-এর মধ্যে যে Third-Dimension-এর (ত্রি-মাত্রার) অভাব, সেটুকুই বা বাকী থাকবে কেন? এই "কেন"র উত্তর বিজ্ঞান না দিয়ে পারে নি। ফলে আমরা পেলাম Stereoscopic বা Third-dimension Photography.

এই জাতীয় আলোক-চিত্রের বিশেষত্ব হোল Photographic ও Optical science-এর (দৃষ্টি বিজ্ঞানের) কতকগুলি কার্য্যকরী প্রয়োগের দ্বারা যে ছবি তোলা হয় তাতে দৃশ্যের ভিতরের বস্তুগুলির এককভাবে প্রত্যেকটার আকারের Solidity-র এবং সমগ্রভাবে তাদের পরস্পরের আপেক্ষিক দূরত্বের একটা স্বাভাবিক ও সম্পূর্ণ উপলব্ধির সৃষ্টি করে।

এইবার, Stereoscopic ছবির Principle (মূলসূত্র) ও Method (কার্য্যপদ্ধতি) সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক্।

চোখে আমরা যখন দেখি, তাতে Solidity-র impression পাই কেন? কারণ, আমরা **দু'চোখ দিয়ে দেখি বলে!** যখনই কোন solid জিনিষ দেখি, (চোখের ঠিক Camera-র মত Lens আছে যাকে বলি "তারা," এবং তার পিছনে—অর্থাৎ ছবির Plate-এর স্থানে এক রকম সজীব স্নায়ুবহুল পর্দ্দা আছে যার ওপর ছবি focussed হয়ে পড়ে- যার দরুন আমরা দেখতে পাই (সেই পর্দ্দার নাম—"Retina")—তখন আমাদের দুটো চোখের দুটো Retinaতে একই বস্তুর ছবি প্রতিফলিত হয় বটে, কিন্তু এই ছবি দুটোর মধ্যে পার্থক্য থাকে যথেষ্ট। কারণ ডান চোখ ও বাঁ-চোখের মাঝখানে ২½ ইঞ্চির ব্যবধান আছে। কাজেই ডান চোখ জিনিষটিকে যেখান থেকে দেখছে, বাঁ চোখ তার ২½ ইঞ্চি তফাৎ থেকে সেইটিকে দেখে। দুটো চোখের viewpoint দু' জায়গায় হওয়ায় Parallux error হয় (Parallux error-সোজা কথায় বলা যায়—Cameraর Lensএর ভিতর দিয়ে প্রতিফলিত ছবি, এবং তারই view finderএর ভিতরের ছবির মধ্যে যথেষ্ট অমিল থাকে এবং সে কারণে অমিল হয়, সেই ব্যাপারটিকে Parallux error বলে) তার দরুন দুটি ছবির মধ্যে পার্থক্য থাকে কিন্তু এই দুটি ছবি যখন মস্তিষ্কে পৌঁছয়, দুটি মিশে গিয়ে (mentally merge ক'রে) একটা ছবিতে পরিণত হয় এবং সেই মিশ্রিত ছবিটি বস্তুটির Solidityর উপলব্ধি আমাদের চেতনায় জাগিয়ে তোলে এবং এই Third Dimensionএর অনুভূতি হয় বলেই

বর্ত্তমান প্রবন্ধের লেখক অভিজ্ঞ ক্যামেরাম্যান রূপে একাধিক বাংলা ছবিতে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। সম্প্রতি তাঁর পরিচালনায় গৃহীত 'ছিন্নমূল' ব'লে একখানি ছবি মুক্তির অপেক্ষায় আছে। এই প্রবন্ধে তিনি চিত্র-জগতের বর্ত্তমান বিষয় নিয়ে ধারাবাহিক অনেক না সুরু করেছেন।

যেখানে অনেকগুলি বস্তু থাকে তাদের Perspective এরও উপলব্ধি হয়।

১নং নক্সাটী দেখে—সেই অনুযায়ী একটা পরীক্ষা করা যাক তাহলেই আমার বক্তব্য আরো পরিষ্কার হবে :—
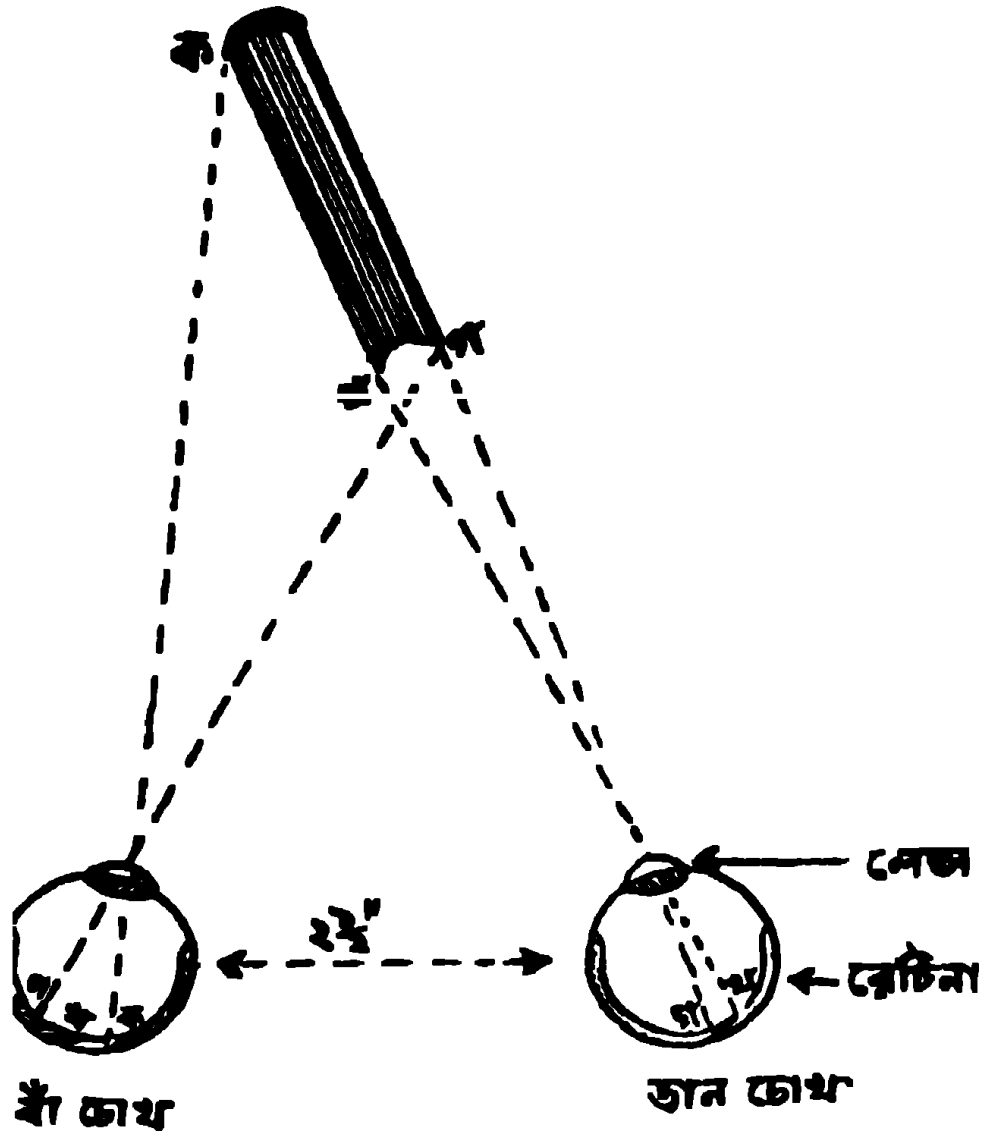
১নং নক্সা—ডান চোখের ছবি—খগ
বাঁ চোখের ছবি—খগ + কগ

শুধু বাঁ, চোখ বন্ধ করে, একটী মোটা বই,—সামনের দিকে হাত যতখানি লম্বা করা যায় ততখানি তফাতে যদি এমন করে ধরা যায়, যাতে ডান চোখ দিয়ে বইটির কেবল একটী ধার অর্থাৎ খ, গ, দেখা যাবে—আর কিছু না।—এই
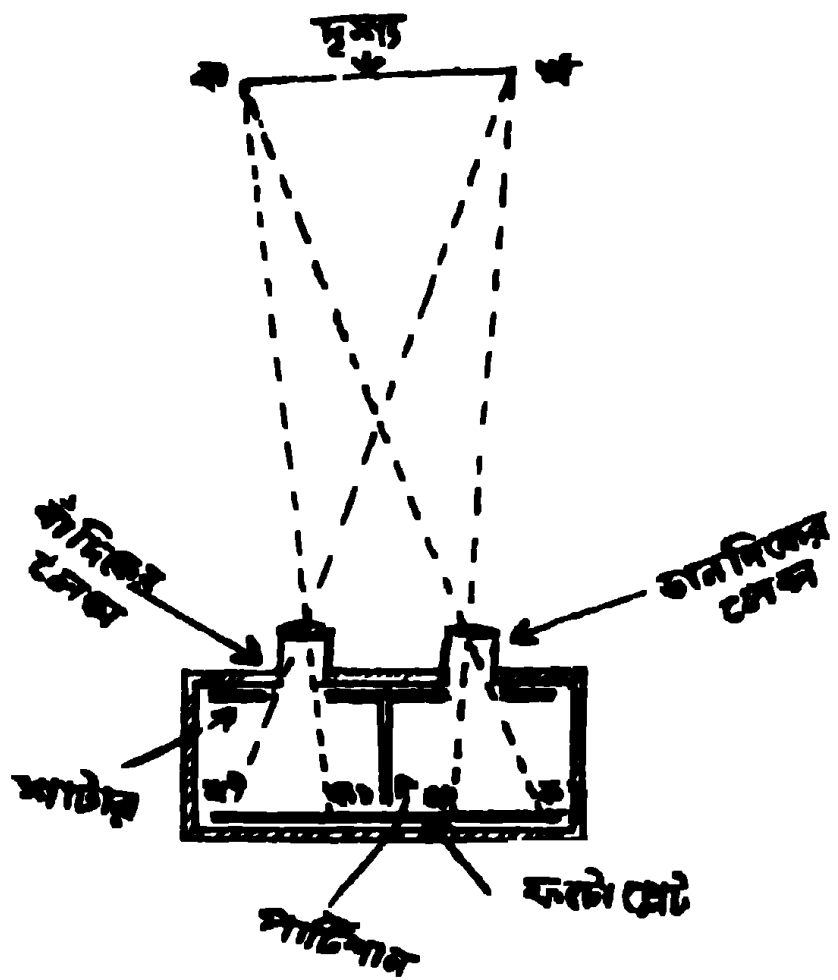
২নং নক্সা—ষ্টিরিওস্কোপিক ক্যামেরা
কখ—ডান চোখের ছবি ; ক, খ,—বাঁচোখো ছবি

বার ডান চোখটি বন্ধ কোরে বাঁ চোখ খুললেই দেখা যাবে যে, বইয়ের সেই 'খ, গ, অংশটী তো দেখা যাচ্ছেই—তার সঙ্গে বইটির একদিকের মলাট —অর্থাৎ 'ক' 'খ' -তাও দেখা যাচ্ছে। তাহলে বাঁ চোখের দৃশ্য সঠিক-ভাবে বল্‌তে দাঁড়াচ্ছে "ক' 'খ, গ"; আচ্ছা, এইবার দুটী চোখই খুলে দিলে দেখা যাবে যে, দুই চোখের এই দুটী পৃথক ছবি মনের মধ্যে মিশে গিয়ে, বইটির Solidity সম্বন্ধে আমাকে সজাগ করে দিল। প্রকৃতির এই আইন অনুযায়ী ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে Sir David Brewster প্রথম Stereoscopic Camera প্রস্তুত করেন (২নং নক্সা দেখুন)

Cameraটির দুটী Lens বা দুটি চোখ। Lens দুটী ২½ ইঞ্চ তফাতে fit করা। এ দিয়ে যখন ছবি তোলা হয়, Plate এ দুটী ছবি প্রতিফলিত হয়, একটী "ডান চোখো ছবি" অন্যটি "বাঁ চোখো ছবি"। ছবি দুটির মধ্যে বেশ পার্থক্য থাকে। তারপর, Print করার পরে শুধু চোখে দেখলে কিন্তু কোন ফল পাওয়া যাবে না, কারণ, দুই চক্ষুই একই সঙ্গে দুটো ছবি দেখে ফেল্‌বে। তাই, এই বিশেষ ধরণের ছবি দেখবার জন্যে এক বিশেষ ধরণের যন্ত্র তৈরী হোল (৩নং নক্সা দেখুন) যার নাম 'Viewer'। ঐ
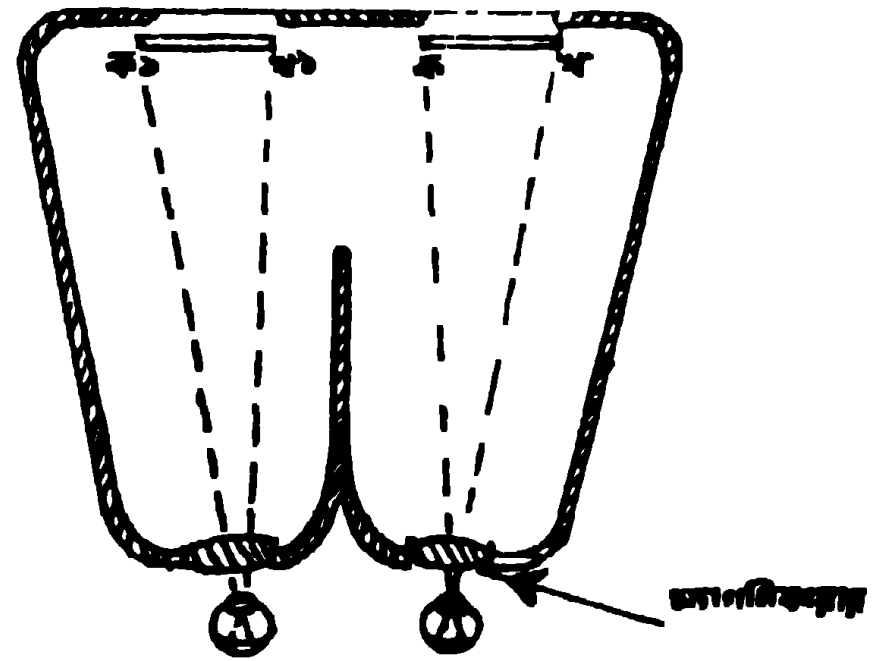
Viewer বা ষ্টিরিওস্কোপিক ছবি দেখার যন্ত্র

জোড়া ছবি তার মধ্যে লাগিয়ে দেখলে দুটি পৃথক ছবি দুই চক্ষুকে পৃথক ক'রে দেখাবে। অর্থাৎ—ডান চোখের জন্য তোলা ছবি কেবল ডান চোখই দেখতে পাবে, বাঁ চোখ পাবে না। এবং বাঁ চোখের ছবি কেবল সেইই দেখতে পাবে ডান চোখ দেখতে পাবে না। এইভাবে দুটি চোখ যখন দুটি ছবি দেখতে থাকবে,—মস্তিষ্ক সেই দুটিকে আর পৃথক থাকতে দেবে না, মিশে গিয়ে (mentally merge করে) এক হোয়ে যাবে এবং তখনই দৃশ্যটির স্বাভাবিক Solidity ও Perspective উপলব্ধি করা যাবে।

কিছুক্ষণ দেখলে মনে হবে যেন একটী জানালার এ পাশে আমি বসে রয়েছি, আর ও পাশে দৃশ্যটি তার সমস্ত স্বাভাবিকতা নিয়ে জীবন্ত হোয়ে উঠেছে। অর্থাৎ Foreground-এর "ঘাসগুলি থেকে দূরের নীল পাহাড় পর্য্যন্ত" প্রত্যেকটি জিনিষ—পরস্পরের কত ফুট,—কত গজ, বা কত মাইল দূরে রয়েছে, যেন দেখে দিতে পারি। Stereoscopic বা Third dimension Photography—একেই বলে।

এই Third-dimension Photography নিয়ে Europe ও America-য় বহু গবেষণা হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। আজ Colour Photographyর (রঙীন ছবির) উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এঁরা Stereoscopic ছবিকে Realityর দিকে অনেকখানি এগিয়ে নিয়ে গেছেন।

সবই হয়েছে—প্রতিমাটি নিখুঁত হয়েছে, কিন্তু প্রাণ সঞ্চার করতে পারেন নি।

এক নতুন সভ্যতা কিন্তু এই প্রতিমাকে প্রাণবন্ত করে তুলেছে। আজ আমরা যেখানে, দূরবীণের মত Viewer চোখে লাগিয়ে Stereoscopic ছবি, একা বসে দেখে আনন্দিত হয়ে উঠছি, সে জায়গায় দু'বছর আগে অর্থাৎ ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বর মাসে 'Robinson Crusoe" উপন্যাসটি, সবাক ও রঙীন Stereoscopic চলচ্চিত্ররূপে, Moscow-তে আত্মপ্রকাশ কোরে লক্ষ লোকের সমবেত হাততালি কুড়িয়েছে। তাঁরা Viewer দিয়ে দেখার গণ্ডির বাইরে বেরিয়ে এসেছেন। সেখানে Viewer-এর ভূমিকা গ্রহণ করেছে, এক বিশেষ ধরণে প্রস্তুত পর্দ্দা (Screen) তাই তাঁরা খালি চোখে একসঙ্গে এক জায়গায় বসে সমবেত ভাবে ছবির মধ্যে Stereoscopic effect পান। যদি বলি যে, আজ Stereoscopic ছবি, তাঁদের কাছে শুধুমাত্র Third-dimension photography নয় তাঁরা ওর মধ্যে Fourth dimensionও যোগ করে দিয়েছেন—তাহলে অত্যুক্তি হবে বলে মনে হয় না। কারণ ছবির মধ্যে আজ তাঁরা শুধু—দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং গভীরতাই পান না—গতিও পান। চিত্রশিল্পে তাঁরা এক নতুন আলোক সম্পাত করেছেন। সেই আলোর উৎস খুঁজতে গেলে আজও আমাদের সেই আদিম মানুষের মত—বিস্ময় বিস্ফারিত চক্ষে, ব্যাদান ক'রে "লাল আলোর" দিকে চেয়ে থাকতে হয়। ভাষা আছে আমাদের—তাই ভাঙচি দিলেও বলে ফেলি :—

"কি সুন্দর—কি চমৎকার!"

এ বিষয়ে আরো জানবার ঔৎসুক্যের সাড়া পেলে। বারান্তরে আরো আলোচনার ইচ্ছা রইল।

দৃষ্টিপাত

প্রদ্যোত কুমার মিত্র
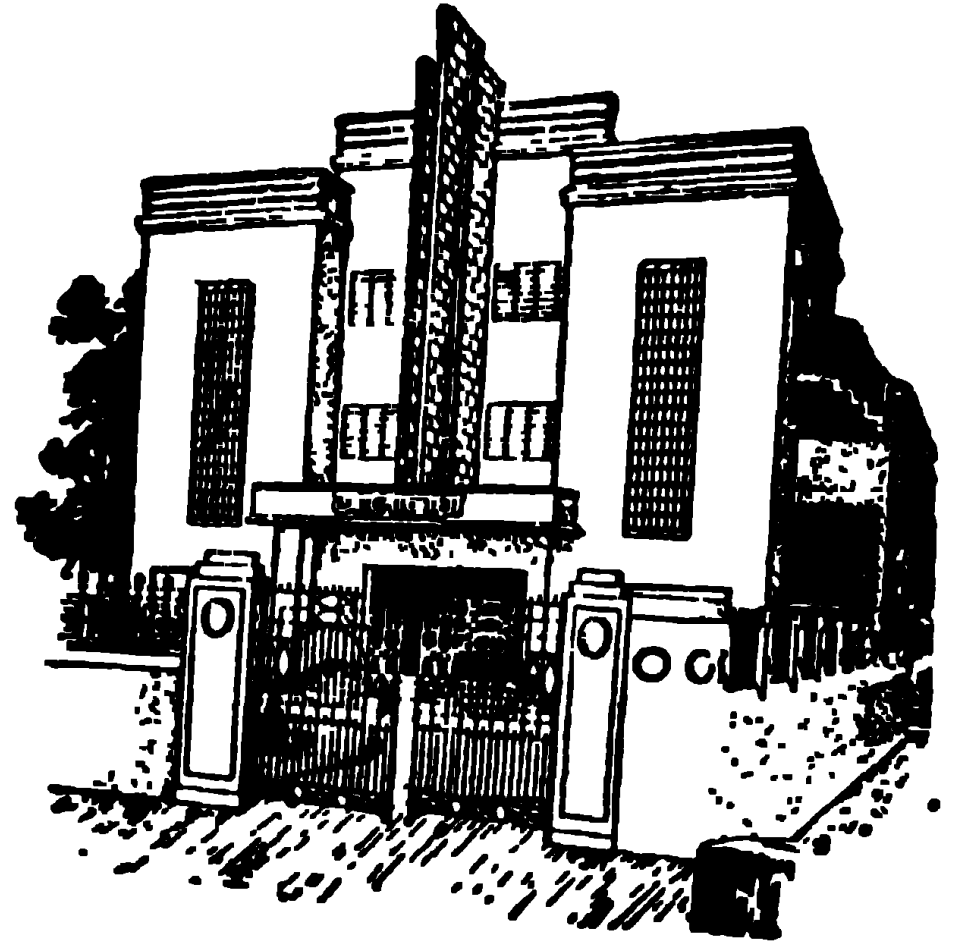
চিত্র ও নাট্য জগতের বিভিন্ন দিক দিয়ে আলোচনার জন্ত 'দৃষ্টিপাত' বিভাগের অবতারণা। এই বিভাগে প্রকাশিত মতামতের জন্ত সম্পাদক দায়ী নন, তবে এই বিভাগের কোনো বক্তব্যের বিরুদ্ধে যদি কারো কিছু বলার থাকে, তবে তা'ও সাদরে বিবেচিত হবে।

বি-এম-পি-এ'র পরামাণিক

জীবজগতে শৃগাল এবং মানবকুলে পরামাণিকদের বুদ্ধিজীবী ব'লে খ্যাতি আছে। কিন্তু বি-এম-পি-এ'র পরামাণিক বোধ হয় তা'নয়। ইদানীংকালে তাঁর কতকগুলি চাল এমনভাবে ধরা প'ড়ে যাচ্ছে যে, তাঁকে বোকাই বলা যেতে পারে। সবচেয়ে মুস্কিল, তিনি সবকুল সামলাতে গিয়ে এমন সব ব্যাপার ক'রে বসেন, যা'র জন্তে তাঁর চাকরী বজায় রাখা দুশ্চিন্তার কারণ হ'য়ে পড়ে।

ভদ্রলোকের পদ হ'ল বেতনভুক্ সেক্রেটারীর। তিনি নিজেকে বোধ হয় মনে করেন, কর্পোরেশনের চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার। অবশ্য, আগে ইনি কর্পোরেশনেই কাজ ক'রতেন। চাকরীটা ছিল খুবই সামান্য। তবু বড় সাহেবের ঢং নকল ক'রবার যে সুপ্ত বাসনা তাঁর মনে ছিল, বি-এম-পি-এ'র চাকরী পেয়ে তিনি তা' সুদে আসলে পুষিয়ে নিচ্ছেন।

এই পরামাণিক অর্থাৎ, ডি, পরামাণিক বি-এম-পি-এ'র এক বিশেষ দলের অনুগ্রহে চাকরী পান। অন্য দল পরে যখন প্রবল হ'ল, তিনি ঢ'লে প'ড়লেন সেই দলের দিকে। সাম্প্রতিক প্রদর্শক সম্মেলনের ফলে তাঁর হয়তো ধারণা হ'য়েছে, অতঃপর কয়েকজন প্রদর্শকের একটি ঘরোয়া দলই বুঝি শেষ পর্য্যন্ত পরাক্রান্ত হবে, তাই তিনি এখন তলে তলে সেই দিকেও ঝুঁকছেন। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন প্রতিপত্তিশালী সদস্যের কাছে তিনি যে-ভাবে, বরের ঘরের মাসী ও কনের ঘরের পিসী' সাজছেন, তা' বি-এম পি-এ'র পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকারক। বাড়ীর চাকরের অনেক দোষ যে-ভাবে বাড়ীর কর্ত্তার ঘাড়ে বর্ত্তায়, ঠিক সেই রকম এই পরামাণিকটির অনেক দোষ বি-এম-পি-এর কর্ত্তাদের বিশেষতঃ সভাপতি মুরলীবাবুর ঘাড়ে প'ড়ছে।

দু' একটা উদাহারণ দিলেই একথা স্পষ্ট বোঝা যাবে। বি-এম-পি-এ-র বিগত বার্ষিক নির্ব্বাচনের সময় ইনি অতি তুচ্ছ খুঁটি-নাটিতে কয়েকজন সদস্যের ভোটাধিকার বাতিলের চেষ্টা করেন। চাঁদার টাকা কেন চেকে দেওয়া হ'ল, এই অভিযোগেও একজন বিশিষ্ট সদস্যের ভোটাধিকার বাতিলের চেষ্টা করা হয়। তিনি চেপে ধ'রলে পরামাণিকটি এমন চোখ ম'টকে হাসলেন যে, স্পষ্টই মানে করা যেতে পারে "কর্ত্তার ইচ্ছেয় কর্ম্ম।"

সম্প্রতি তিনি কোন এক ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটির বিশিষ্ট সদস্যের প্রতিনিধিত্বের অধিকার চ্যালেঞ্জ ক'রেছেন। যে-কোন ব্যক্তি সামান্য লেখা-পড়াও জানে, সে-ও ব'লবে যে, যদি অমুক ব্যক্তি কোন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিই না হবে তবে সে নির্ব্বাচিত হ'য়ে ছ'মাস পদাধিকার ক'রে আছে কি ক'রে! শুধু তাই নয়, প্রতিনিধিত্বের অধিকার চ্যালেঞ্জ ক'রে তিনি মুরুব্বিয়ানা চালে অভদ্র ভাষায় যে পত্র দেন, পরে তাঁকে তার জন্তে ক্ষমা চাইতে হয়।

এমনি সব অনেক খুঁটি-নাটি ব্যাপার আছে। সে-কথা যাক। সম্প্রতি তিনি তাজ্জব ব্যাপার ক'রেছেন।

প্রদর্শক সম্মেলন হ'য়ে যাওয়ার প্রায় মাসখানেক পরে তিনি বি-এম-পি-এ'র খামের ভেতর উক্ত প্রদর্শক সম্মেলনেরই উদ্যোক্তা পাঞ্জাবী ব্যবসায়ী শম্ভু সিং এবং বীণা সিনেমার ফণী বসুর দুটি স্বকপোলকল্পিত বক্তৃতা পাঠিয়ে দিয়েছেন। প্রথমতঃ এই দুইজন সাংঘাতিক বক্তাকে আমরা অন্ততঃ দু' দিনের কোন সম্মেলনেই বক্তৃতা দিতে দেখি নি, বা কোন পত্র-পত্রিকাতেও তাঁদের নাম প্রকাশ হয় নি। এই দু'জনের বক্তৃতা দেওয়ার কোন ক্ষমতা আছে বলেও আমাদের জানা নেই। অথচ, পরামাণিক সাহেব এদের খুশী করার জন্তে এমন একটি হাস্তকর ব্যাপার ক'রে ধরা প'ড়লেন। আচ্ছা, এই দুই মহাবক্তা যদি বক্তৃতা ক'রেও থাকেন, তবে অন্তান্ত

বক্তাদের বাদ দিয়ে শুধু এই দু'জনের বক্তৃতা এমন বিশেষভাবে প্রচার করার দরকার হ'ল কেন ?

আসলে, বি-এম-পি-এ-কে অনেকে নিজেদের খাস জমিদারীতে পরিণত ক'রতে চাচ্ছেন আর, পরামাণিক হলেন, তাঁদের সকলের আড়কাঠি। বহু বড় বাড়ীতে এমন সব ঘর-ভাঙানো ঝি থাকে, যাদের জন্যে সুখের সংসার ভেঙে তছনছ হ'য়ে যায়। পরামাণিকের কার্য্যকলাপ দেখে আমাদের এইরকমই সন্দেহ হয়।

অথচ, এই ব্যক্তিটি বি-এম-পি-এ-র ঘাড়ে শ্বেতহস্তীবিশেষ। বেতনে ভাতায় ইতি যত টাকা পান, তা' দিয়ে একজন আই-সি-এস পোষা যায়। আমরা বি-এম-পি-এ'র কর্ত্তৃপক্ষকে বিশেষতঃ সভাপতি শ্রীমুরলীধর চট্টোপাধ্যায়কে এখনও এই ব্যক্তিটি সম্পর্কে সচেতন হ'তে বলি। অন্যথায় বলা যায় কি, ভগিনীর নন্দনের হাতেই একদিন কংসের নিধন হবে। ইতিহাসের শিক্ষা ভোলবার নয়

প্রদর্শক প্রহসন

কেউ শুনেছেন, "All India Profiteers' Union ?" কিংবা, 'International Black-Marketeers' Confederation ?" অথবা, "Hoarders' Conference ?"

জানি, এ নামগুলি আপনারা কেউ এখন পর্য্যন্ত শোনেন নি। কিন্তু এও জানি, এদের জানতে আর খুব বেশী দেরীও নেই। অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ বিহারের চিত্রপ্রদর্শকগণ ওপরের ওই সব প্রতিষ্ঠান গঠনে প্রেরণার সঞ্চার ক'রবেন এবং তার সূত্রপাত তাঁরা ক'রেছেন, গত ২৯শে ৩০শে জুলাই রাধা ফিল্ম ষ্টুডিওতে পূর্ব্ব ভারতীয় প্রদর্শক সম্মেলনে'র মারফৎ।

বাঙ্গলার ছায়াছবি ব্যবসার কিছুমাত্র খবর যাঁরা রাখেন, তাঁরাই জানেন যে, দীর্ঘকাল গর্ভ-যন্ত্রণা ভোগ ক'রে, প্রসবকালীন সঙ্কট এড়িয়ে শিল্পমাতৃকা যে সামান্য দুধটুকু বিতরণ ক'রছেন, প্রদর্শকরাই তার জলটুকু ছেঁকে ফেলে কেবল ক্ষীরটুকুই শুষে নিচ্ছেন। আর, শিল্পমাতৃকার হতভাগ্য সন্তান, চিরবঞ্চিত প্রযোজককুল ধীরে ধীরে শুকিয়ে অকাল মৃত্যুর কোলে ঢ'লে প'ড়ছেন। এই ক্ষীরের মোহেই আজ দেখা যাচ্ছে, পরিবেশক প্রতিষ্ঠানগুলি আর সামান্য কমিশনে সন্তুষ্ট হ'তে পারছেন না, তাঁরাও শোষণের নেশায় উন্মত্তের মত কুক্ষিগত করার চেষ্টা ক'রছেন একের পর আর এক প্রেক্ষাগার। কিন্তু সবাই যদি শুষতে চায়, তবে শেষ পর্য্যন্ত তারা শুষবে কাকে ? এ ভাবনা কারও নেই। যে-গরুর দুধ পাওয়া দরকার, তাকে যে সময়মত সামান্য ঘাস-জল দিতে হয়, একথা আজ কোন শোষণধর্ম্মী প্রদর্শকই ভেবে দেখছেন না।

অথচ, ক্ষোভের তাঁদের অন্ত নেই, দাবীরও শেষ নেই তাঁরা আরও প্রেক্ষাগার কর'তে চান, সিমেন্টের পারমিট চান। প্রযোজক আর শিল্পমাতৃকাকে শোষণ ক'রেও তাঁদের তৃপ্তি নেই,—তাঁদের আকাশস্পর্শী লোভ ইনকাম ট্যাক্স পর্য্যন্ত কমাবার দাবী জানিয়েছে। ভাগ্যিস্, পূর্ব্ব ভারতের এইসব বুদ্ধিমান প্রদর্শকের এইসব সাধু প্রস্তাব সভ্য দেশের কেউ জানতে পারে নি! নইলে, হয়ত' কেউ রাষ্ট্রসঙ্ঘের মারফৎ প্রস্তাব ক'রে বসতো যে, এদের শিক্ষা দেওয়ার জন্যে কয়েক বছরের জন্যে কোন এক ইউরোপীয় 'রিং মাষ্টার' রাখা হোক।

রাধা ফিল্ম কোম্পানীর এই বঙ্গখানায় কত রকম মজার ব্যাপার যে হ'য়েছে জুলাই-এর শেষ ক'দিন, তা' আর বলবার নয়। (চিড়িয়াখানা এখান থেকে বড় জোর মাইল তিনেক)। সম্মেলনের উদ্যোক্তারা শুনেছেন যে, এই ভারতের স্বয়ং রাষ্ট্রপতি যিনি, তিনি বিহারের বাসিন্দা, সুতরাং তাঁরাও তাঁদের সম্মেলনপতিত্বে বরণ ক'রলেন (অনেকটা স্বয়ংবরের মত) বিহারেরই এক সিংহ-কুমারকে অর্থাৎ, শ্রীকৃষ্ণ সিংহেরই স্বগোত্রীয় কুমার-কৃষ্ণ-বল্লভ প্রসাদ (রাজেন্দ্রপ্রসাদেরও খানিকটা আছে বৈকি!) নারায়ণ সিংহকে।

সভাপতিত্ব করার মত কোন্ গুণ ভদ্রলোকের আছে, তা আমরা জানি না,—তবে সভামঞ্চে তাঁর পোষাক-পরিচ্ছদ আর হাব-ভাব দেখে সার্কাসের ভাঁড়ের কথাই মনে প'ড়ছিল। আর মনে পড়ছিল সেইসব প্রতিভাবান পুরুষদের, যাঁরা এঁকে আবিষ্কার ক'রেছিলেন। সঙ্গে

সঙ্গে আরও একটা কথা মনে হ'চ্ছিল। শ্রীবীরেন্দ্র নাথ সরকারও একজন প্রদর্শক, শ্রীমুরলীধর চট্টোপাধ্যায়ও একজন প্রদর্শক। এঁদের কারও সভাপতি হওয়ার সৌভাগ্য হ'ল না, হ'ল কোথাকার কুমার কৃষ্ণ-বল্লভ ইত্যাদি সিংহের? সভাপতিটিই বোধ হয় প্রদর্শক সম্মেলন নামক প্রহসন নাট্যের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। অবশ্য এমন একটা সম্মেলনে শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সরকার অথবা শ্রীমুরলীধর চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্ব মানাতোও না, যতটা মানিয়েছিল কুমার-কৃষ্ণ-বল্লভ ইত্যাদিকে।

যাকগে। সম্মেলন ত' সুরু হ'ল ২৯শে জুলাই সকালবেলা। উদ্বোধন ক'রলেন বাঙ্গলার মুখ্যমন্ত্রী ও মুখ্য ডাক্তার বিধান চন্দ্র রায়। তিনি তাঁর বক্তৃতায় এমন সব কথা ব'ললেন, যা' তাঁর গভর্ণমেণ্ট কোন দিন ক'রবে না। প্রদর্শক হিসাবে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি সান্নুদা' তাঁর বক্তৃতায় এমন সব নীতির কথা ব'ললেন, যা' কোন প্রদর্শকই শুনবে না। সভাপতি কুমার-কৃষ্ণ-বল্লভ না কি যেন এমন সব নীতির কথা শোনালেন, যা' তাঁর সমব্যবসায়ীরা কোন দিনই কর্ণপাত ক'রবে না।

ডাঃ বিধান রায় ব'লেছেন, "সেন্সর বোর্ড আবার কি? প্রযোজকরা নিজেরাই সেন্সর ক'রবে নিজেদের ছবি।"

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি সান্নুদা' তাঁর বক্তৃতায় স্বীকার ক'রলেন যে, প্রদর্শকরা যে রকম আত্মসর্ব্বস্ব গোষ্ঠীর মত প্রযোজকদের কথা একবারও বিবেচনা ক'রে দেখছে না, তা' অচল অনেক প্রদর্শক যে বিক্রীর ন্যায্য টাকা বা বিক্রীর হিসাব পর্য্যন্ত প্রযোজকদের দেন না, সান্নুদা' সেটাও অন্যায় ব'লে মনে করেন। প্রদর্শকগণ গভর্ণমেণ্টের বা স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের হাজার রকম আইন মেনে চ'ললেও তাঁরা যে বি-এম-পি-এর সামান্য নির্দ্দেশটুকু পর্য্যন্ত মানেন না, সান্নুদা' তাতে ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং সকলের ঐ ত্রুটী সংশোধনের অনুরোধ জানান।

সম্মেলনের মূল-সভাপতি কুমার কৃষ্ণবল্লভ প্রযোজকদের বহু হিত-কথা শুনিয়ে শেষ পর্য্যন্ত নিজেদের সম্বন্ধে স্বীকার করেন যে, প্রদর্শকরা যে প্রোটেকশন ব্যবস্থা কায়েমী ক'রেছেন, তা' অন্যায়। তিনি সেটা তুলে দিতে বলেন।

প্রদর্শক শাখার ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটির সভাপতি শ্রীনিরোদ নাগ তাঁর সুদীর্ঘ বক্তৃতায় সর্ব্ববিষয়ে সব কিছু ব'লে শেষ পর্য্যন্ত ফাঁস ক'রে দিলেন আসল কথাটি। তিনি জানালেন যে, এই সম্মেলনের কথা প্রথম নাকি "বীণা" "বসুশ্রী"র অন্যতম কর্ণধার শ্রীফণী বসুর মাথায় আসে।

এত বড় ব্যাপারটা এতক্ষণে প্রাঞ্জল হ'ল। প্রেক্ষাগার কুলে "বীণা" ও "বসুশ্রী"ই এতদিন পর্য্যন্ত প্রোটেকশনে জোরালভাবে, শাঁসে-জলে দিব্যি পুষ্টিলাভ ক'রেছেন। সুতরাং, সেই স্বার্থ কায়েমী করার গরজ তাঁদেরই বেশী। আর এইজন্যেই কলকাতার বুকে এই প্রদর্শক প্রহসনের ব্যবস্থা। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, খাস বি-এম-পি-এ এই প্রহসনের জন্য কোন ব্যয়-বরাদ্দ ক'রতে রাজী না হ'লেও উদ্যোক্তাদের তাগিদে প্রদর্শকরা নিজেরাই এই বাবদে হাজার দশেক টাকা ব্যয় করেন। গরজ বড় বালাই!

এই প্রসঙ্গে আর একটা বড় কথা উল্লেখ করা দরকার। বাঙ্গলা, বিহার, আসাম ও উড়িষ্যায় যদিও মোট শ'পাঁচেক প্রদর্শক প্রতিষ্ঠান আছে, তবু প্রথম দিনের এই বড় খেলায় যোগদান করেন বড় জোর জনা ষাটেক। বাকী যাঁরা দল ভারী ক'রেছিলেন, তাঁরা সব আমন্ত্রিত প্রযোজক, পরিবেশক, সাংবাদিক এবং অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ।

দ্বিতীয় দিনে, অর্থাৎ প্রস্তাব গ্রহণের মত গুরুত্বপূর্ণ সময়ে তাঁরাও হাজির ছিলেন না। ছিলেন মাত্র জনা দশ-বারো প্রদর্শক আর উদ্যোক্তাদের সবাই। তবু এই ক'জনাতেই কি প্রচণ্ড সংগ্রাম! ছোটবেলা যাত্রা দেখার পর ঝাঁটার কাঠির তলোয়ার নিয়ে এমন সংগ্রাম একসময় আমাদেরও ক'রতে হ'য়েছে।

প্রথম দিকে বিহারের দল প্রস্তাব ক'রলেন, বি-এম-পি-এ নামটাই বাতিল ক'রে দেওয়া হোক। প্রস্তাবটির মর্ম্মার্থ প্রাঞ্জল, এই সম্মেলনে আদৌ এ ধরণের কোন প্রস্তাব আলোচনা করা ঠিক হবে কি না হবে, তা' কারও বিবেচ্য নয়, প্রস্তাব ওঠামাত্রই সংগ্রাম সুরু হ'য়ে গেল। মনে হ'ল, "সংগ্রাম for সংগ্রাম 's sake"।

প্রচণ্ড তোলপাড়! এ ওকে অগ্নিবাণ হানে, ও বরুণ বাণ দিয়ে তা' বিধ্বস্ত করে। ও একে হাওয়াই বোমা

ছাড়ে, এ এ্যান্টি-এয়ারক্র্যাফ্ট দিয়ে উড়োজাহাজ শুদ্ধ উড়িয়ে দেয়। সকলেই কথা বলে, সকলেই তর্ক করে। শেষ পর্য্যন্ত সকলে একসঙ্গে ঝগড়া আর তর্ক আরম্ভ করে।

আমন্ত্রিত দর্শকরা হতভম্ব! এ-হেন অবস্থায় জনৈক কর্ত্তা-ব্যক্তিকে একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে ব'ললাম, "অমুকদা, এ ব্যাপারটা এই Conference-এ সাব্যস্ত হওয়ার মত বিষয়ও নয়। নাম পাল্টাবার সম্পূর্ণ অধিকার বি-এম-পি-এ'র। তবে তা নিয়ে এত হৈ চৈ কেন?"

অমুকদা ব'ললেন, "ওদের ব'লতে দাও ভাই। প্রাণে আবেগ আছে, ব'কে যাক্।"

ব'ললাম, "কিন্তু আমরা যে আর বেগ সামলাতে পারছি না দাদা। তার চেয়ে ব্যাপারটা ভোটে চড়ান।"

অমুকদা কেঁপে উঠ্লেন। ব'ললেন, "খবরদার। ও-কথাটিও আর এখানে ব'লো না। অনেক কষ্টে 'মেটে কার্ত্তিক' সাজিয়ে রেখেছি। একটু জল পড়'লেই মাটি চ'টে খড় বেরিয়ে প'ড়বে।" তারপর চুপিচুপি ব'ললেন, "ভোট নিলেই ত' ভোটারের আসল সংখ্যা ধরা পড়ে যাবে। তার চেয়ে ঘরে বাইরে মিলিয়ে যে-কজন এখানে আছেন, বেশ আসর সাজানো থাক্।"

অনেক বাক্‌বিতণ্ডার পর শেষ পর্য্যন্ত প্রস্তাবটি মুলতুবী রাখা হ'ল।

তারপর, পর পর এসে গেল সিমেণ্ট, পারমিট, প্রমোদকর, আয়কর প্রভৃতি সম্পর্কিত প্রস্তাব। এসব প্রস্তাবের বেলা কিন্তু সবাই চুপ, কারণ, সবারই স্বার্থ আছে এ'তে।

কিন্তু দ্বিতীয় মহাসমর বাধল নির্ব্বাচনের প্রস্তাব নিয়ে। যতগুলো প্রস্তাব এই সম্মেলনে উপস্থাপিত হ'য়েছিল, সবই সরকারী প্রস্তাব অর্থাৎ, বিষয় নির্ব্বাচনী কমিটিতে পাশ-করা। ইলেক্‌শন সম্পর্কিত প্রস্তাবটিও তাই। কিন্তু প্রস্তাবটি এমনই অর্থহীন যে, প্রস্তাব ওঠা-মাত্রই উপস্থিত সকলে হেসে ফেললেন। প্রস্তাবটিকে একটু ভদ্রস্থ করার জন্যে সাহুরা' উস্‌খুস্ ক'রতে লাগলেন। কিন্তু তিনি নিজে বিষয় নির্ব্বাচনী কমিটির সদস্য হিসাবে একবার সেখানে প্রস্তাব পাশ করিয়েছেন সুতরাং, এখানে তিনি নিজেই আবার কোন সংশোধন আনতে পারেন না। আইনে আটকালো। অতএব শেষ পর্য্যন্ত ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া থিয়েটার্সে'র ম্যানেজার শ্রীযুক্ত সুখেন্দু সেনগুপ্ত তাঁর উদ্ধারের জন্যে এগিয়ে এলেন। তিনি প্রস্তাবটি সংশোধন ক'রে যা' দাঁড় করালেন, তা'র অর্থ হল, চিত্রগৃহের মালিকরা এ্যাসেম্বলীর ইলেক্‌শনে দাঁড়াবেন এবং শাসনযন্ত্রে ঢুকে প'ড়বেন।

এর জন্যে Conference-এ প্রস্তাব পাশের দরকার কি? আবার হৈচৈ সুরু হ'ল। এবার বড় জবর হৈচৈ। তারপর—তারপরের কথা জানিনা। শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত বোধ হ'চ্ছিল। পিছনের চেয়ারে গিয়ে ঘুমিয়ে প'ড়লাম।

ঘুম যখন ভাঙলো, দেখি বন্ধুরা ডাকাডাকি ক'রছেন, লাঞ্চে যেতে হবে। প্রদর্শকরা বহু পয়সা খরচ ক'রে লাঞ্চের ব্যবস্থা ক'রেছিলেন Bristol-এ। মনে আফশোষ হ'তে লাগল, আহা! ঘুমিয়ে না প'ড়লে আরো কত মজাই না দেখতে পেতাম! ঘুমিয়ে প'ড়লেও এখবরটা আমরা সঠিকভাবেই জানি যে পাঞ্জাবী ব্যবসায়ী শম্ভু সিং কিংবা "বীণা" সিনেমার ফণী বোস কেউ বক্তৃতা করেন নি।

যাক্, বি-এম-পি-এ অফিসে মোটা চা দিয়ে সম্মেলনের সূত্রপাত হ'য়েছিল আর 'ব্রিষ্টল'-এর মোটা লাঞ্চ-এ তার শেষ হ'ল।

কিন্তু উপসংহারের পরেও পরিশিষ্ট থাকে। এই সম্মেলনের পরে আরও মজাদার খবর আছে। পরের দিন অর্থাৎ ৩১শে জুলাই রাধা ফিল্মস-এর এই রঙ্গখানাতেই খাস বি-এম-পি-এ'র সাধারণ সভার অনুষ্ঠান হয়। পূর্ব্ব দিন অর্থাৎ ৩০শে জুলাই সম্মেলন, লাঞ্চ এবং একটা চায়ের নেমন্তন্ন সেরে সমবেত প্রদর্শক আর সাংবাদিকরা প্রদর্শক 'বসুশ্রী'র আতিথ্য গ্রহণ করেন এবং 'দহেজ' দেখে ধন্য হন। এই অনুষ্ঠানেই শ্রীযুক্ত শম্ভু সিংকে অত্যন্ত তৎপর দেখা যায়। তিনি অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে প্রদর্শকদের স্মরণ করিয়ে দেন যে, প্রদর্শক সম্মেলনের চেয়ে খাস বি-এম-পি-এ'র এই বৈঠকই নাকি বেশী গুরুত্বপূর্ণ। এখানেই প্রদর্শকদের ভাগ্য নির্দ্ধারিত হবে। এই দিন

বি-এম-পি এর বৈঠকে নূতন গঠনতন্ত্রের খসড়া যদি বানচাল করা যায়, তবে বলা যায় কি, প্রদর্শকরাই হয়ত' সামনের ইলেক্‌শনে বি-এম-পি-এ দখল ক'রে ব'সবে। অতএব, কমরেড হুঁসিয়ার।

পরের দিন দেখা গেল, ভারতের দেশরক্ষা সচিব সর্দ্দার বলদেব সিং-এর স্বজাতীয় শ্রীশম্ভু সিং-এর আহ্বানে সাড়া পাওয়া গিয়েছে। একদল প্রদর্শক এক বাত্রেই জঙ্গী হ'য়ে উঠেছেন রীতিমত। সকলেরই মুখের ভাব, 'রণং দেহি'।

বিপক্ষও প্রস্তুত। গঠনতন্ত্রের প্রস্তাব উঠলো, সঙ্গে সঙ্গে বিপক্ষদল সংশোধনের কামান ছুঁড়লেন।

সভাপতি মুরলীবাবুর ভাই হারুবাবু ব্রহ্মাস্ত্র ছুঁড়লেন। তিনি চ্যালেঞ্জ ক'রলেন, যারা সভায় কথা ব'লবে, তাদের কথা বলার অধিকার আছে কিনা, সর্ব্বাগ্রে তাই প্রমাণ ক'রতে হবে।

সেই সভায় হারুবাবু নিজে সেই প্রমাণ দেখাতে পারতেন কিনা, তা' কেউ জিজ্ঞাসা ক'রতে ভুলে গেল। সকলেই নিজের নিজের অবস্থা বুঝে শঙ্কিত হ'য়ে উঠলো। তাইতো', ছবিআঁটা ভোটের লাইসেন্স ত' কেউ আনে নি। নিরুপায় বিপক্ষদল ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠল। তারা প্রথমে চেঁচামেচি সুরু ক'রল।

অপর দলও কম যায় না। তাদেরও অনেকে ভাড়া-করা হাল্কা ফোল্ডিং চেয়ার আঁকড়ে ধ'রলো।

খানিকক্ষণ বাক্‌যুদ্ধ চলার পর সকলে কায়িক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হ'তে লাগলো; নিরীহ সদস্যরা ভয়ে স'রে প'ড়তে লাগল আস্তে আস্তে। উভয় পক্ষের সকলে একসঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে হাওয়ায় ঘুষি মারতে লাগলো আর এই অবস্থায় সভাপতি প্রমাদ গ'ণে সভা ভঙ্গ ক'রলেন।

কোন এক প্রদর্শক এই গোলযোগের ফাঁকে যখন বিপক্ষের দিকে হাওয়ায় ঘুঁষি সঞ্চালিত ক'রতে গিয়েছিলেন, তখন পরিচালক শ্রীহেমেন গুপ্ত নাকি তাঁকে ধ'রে ফেলেন। আর, এই ঘুঁষি ফস্কাবার আক্রোশে সেই প্রদর্শক ভদ্রলোক আজ কিছুদিন ধ'রে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। আর শোনা গেল, এই খবরের পর, আগষ্ট বিপ্লবের ইতিহাস '৪২'-এর পরিচালক ফিল্মিস্তানের কণ্ট্রাক্ট নিয়ে সোজা বোম্বে পালিয়েছেন।

কালিদাস প্রোডাকশন্সের প্রথম চিত্রার্ঘ্য 'যুগদেবতা'য় প্রধান দু'টি ভূমিকায় গুরুদাস ও চন্দ্রাবতী। বর্ত্তমানে ছবিখানি দেখানো হচ্ছে।

নারাঙ্ পিকচার্সের 'অপরাজিতা' ছবিতে পাহাড়ী সান্যাল

মিশরের ছায়াছবি

আনন্দ দে

মিশর দেশটা ভারতবর্ষের চেয়ে অনেক দিক থেকে অনগ্রসর। কিন্তু ছায়াছবির শিল্পটা সেখানে অনেকখানি অগ্রসর আমাদের দেশের তুলনায়। কিভাবে ধীরে ধীরে এই উন্নতি সম্ভব হলো তার পরিচয় কিছুদিন আগে এক মার্কিনী কাগজে মিশরের একজন তরুণ চিত্র পরিচালক ফরিদ্-এল-মাজার্ড খুব চমৎকারভাবে দিয়েছেন। এই পরিচালকটি প্যারীতে আইন আর চিত্রশিল্প সম্বন্ধে পড়াশুনা করেন, আর লণ্ডনে তিনি মেকানিকাল ইঞ্জিনীয়ারীং শেখেন। ছায়াছবির প্রতি আসক্ত বলেই তিনি এদিকে এসেছেন।

১৯৪৮ সালে বলতে গেলে মিশরের ছায়াছবি শিল্পটা সাবালকত্ব প্রাপ্ত হয়। ১৯২৭ সালে মিশরে মাত্র একখানা ছবি তোলা হয়েছিল, এখন সেখানে বছরে পঞ্চাশখানার মতো তোলা হয়। সবশুদ্ধ ন'টি ষ্টুডিও মিশরে আছে; আর সেখানে কাজ করেন প্রায় দশ হাজার লোক। এদের আবার চারটে ভাগ আছে, (১) টেক্‌নিসিয়ান; (২) অভিনেতা-অভিনেত্রী; (৩) গায়ক-বাদক, (৪) অন্যান্য শিল্পী।

নির্বাক ছবির যুগে ১৮৯৬ সালে মিশরে ছায়াছবি আমদানী হয়। এই আমদানী চলতেই থাকে। ১৯১৮ সালে এক-রীলের ছবি 'মাদাম লোরেটা' তোলা হয়; ১৯২২ সালেও এক রীলের 'এনচাণ্টেড রিং' তোলা হয়; পর বৎসরেও সেই এক-রীলের ছবি 'আমেরিকান-আণ্ট' তোলা হয়। ১৯২৭ সালে এই শিল্পের দিকে সকলের নজর যায়। মঞ্চনেত্রী আজিজা এমীর প্রযোজনায় আহমদ্ গলালের পরিচালনায় 'লায়লা' ছবি তোলা হয়। পর-পর তিন বছর ছবি তোলার দায়িত্বে ছিলেন তিনজন মহিলা: আজিজা এমী, আসিয়া দখের ও ফতিমা রোশ্‌দি'।

১৯২৯ সালে সবাক ছবি তোলার প্রথম প্রচেষ্টা করেন পরিচালক মা-দী। ছবির নাম 'মুনলাইট'। কিন্তু লোকসান দিতে হয়। ১৯৩১ সালে প্যারীতে দু'খানা সবাক ছবি তোলা হয়। ভোল্‌পী তোলেন 'সং-অব-দি-হার্ট' আর মোঃ করিম তোলেন 'সনস্‌-অব-নবিলিটি'। ১৯৩২ সাল থেকেই রীতিমত মিশরের শব্দধারণ ব্যবস্থা করা হয়। এতদিন ভাষা-মাধ্যম ছিল ইংরাজী। এবার থেকে আরবীয় ভাষা আর মিশরীয় ও আরবীয় কাহিনী-নৃত্য-গীত শুনতে চাইলো মিশরীয় দর্শক-সমাজ।

প্রথম দিককার ছবিগুলো প্রহসন আর ভাঁড়ামিতে ভরা ছিল। প্রথম দিককার ছবির মধ্যে ১৯৩৪ সালের মোঃ করিম পরিচালিত 'সাদা-গোলাপ'। ১৯৩৮ সালে 'লাশিনী' নামে পরিচালক ফ্রিজ ক্যাম্প যে ছবি তোলেন তাতেই প্রথম আরবীয় গল্প পাওয়া যায়। এই সময়ে আহমদ্ গলাল প্রায় ডজনখানেক সামাজিক নাটক চিত্রায়িত করেছেন। পরিচালক কামাল সেলিমের 'উইল' নয়া যুগের সূচনা করে। কাহিনী বেশ প্রগতিশীল: হাই-ইনষ্টিটিউট অব্ কমার্সের ছাত্রদের ধর্মঘটের ভিত্তিতে রচিত। এই প্রথম গল্প পাওয়া গেল বলে বেশ সাফল্যলাভ ঘটেছিল। ১৯৪৫ সালে হেনরী বরকৎ তুলেছিলেন 'আমার পিতার পাপ,' সেটাও মন্দ হয়নি। ১৯৪১ সাল থেকে ১৯৪৯ সাল পর্য্যন্ত বিভিন্ন পরিচালকের তোলা যেসব ছবি জনগণের অভিনন্দন লাভ করেছে তার নাম দিলাম:

আহমদ ব্রাধা পরিচালিত	ইয়ুথফুল-সাক্‌সেস	(১৯৪১)
হুসেন ফৌজী	আই-লাইক-মিস্‌টেকস্‌	(১৯৪২)
আবদেন হুসেন	লাভ্‌-ফ্রম্‌-হেভেন	(১৯৪৩)
জি, মাদকৌর	ফার্ষ্ট লাভ	(১৯৪৪)
আহমদ সালেম	ফরগটন পাষ্ট	(১৯৪৫)
এন, মুস্তাফা	আন্তার এণ্ড আবলা	(১৯৪৫)

কামাল ভালমেসানী পরিচালিত	দি ব্ল্যাকমার্কেট	(১৯৪৬)
ওমার গোমি	দি মাদার	(১৯৪৬)
এ, কে, মুর্সী	দি পাব্লিক প্রসিকিউটার	(১৯৪৭)
এস, আবু সইফ্	দি রিভেনজার	(১৯৪৭)
আনওয়ার ওয়াগদী	এ্যাম্বার	(১৯৪৮)
হাসান এল ইমাম	দি টু অরফ্যান্স্	(১৯৪৮)
এচ, বাফ্লা	হিল্ডা	(১৯৪৯)

এইগুলি প্রথম শ্রেণীর, প্রথম উল্লেখযোগ্য। কিন্তু বর্ষীয়ান নাট্যকার-অভিনেতা-পরিচালক য়ুসুফ ওয়াহবীর নাম পৃথকভাবে উল্লেখ করতে হয়। তাঁর নিজের তেত্রিশ-খানা নাটকের মধ্যে যে ক'খানার চিত্ররূপ দেওয়া হয়েছে তাদের মধ্যে 'হীরক' (১৯৪৩), 'প্রেম ও প্রতিশোধ' (১৯৪৪), 'বাতি জ্বলছে' (১৯৪৫) ও 'পাহাড়িয়া গায়ক' (১৯৪৬) আজও দর্শকদের কাছে চিরনতুন। তিনি এখন তাঁর মঞ্চসফল নাটক 'কন্ফেসানাল-সিক্রেটের' চিত্ররূপ দেওয়ার কাজে ব্যস্ত।

Studio Misrতেই প্রথম আমোদপ্রদ, শিক্ষামূলক ও বিভিন্ন শিল্পসম্বন্ধীয় ছবি তোলার ব্যবস্থা হয় ১৯৪৬ সালে। এই ষ্টুডিওটি ১৯৩২ সালে প্রতিষ্ঠিত। সবচেয়ে ভালো ডকুমেণ্টারী ছবি 'আরবীয় ঘোড়া,' 'মিশরের পিরামিড' এখান থেকেই তোলা হয়। সাদ নাদিম ছিলেন এর পরিচালক। এই ছবি দু'টো পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে দেখানো হয়েছে। এই ডকুমেণ্টারী ছবি তোলার দিকে মিশর সরকারও নজর দেন সেটা ১৯৪০ সালের ঘটনা। সরকার শিক্ষামূলক ছবি "কৃষক," "সমাজ-জীবন," "মজদুর," ও "নাগরিক" তোলেন। Studio Misr এই জন্যে প্রতি মাসে সাহায্য পান নিউজরীল তোলার জন্যে সরকারী তরফ থেকে। শোনা যাচ্ছে এবার থেকে সাপ্তাহিক ভাবে নতুন নতুন নিউজ রীল বার করা হবে।

চলচ্চিত্রের অভিনেতা-অভিনেত্রীর শিক্ষাদান ব্যাপারে আমাদের মতো বেবন্দোবস্ত দেশ পৃথিবীর আর কোথাও নেই বোধ হয়। মিশরে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের শিক্ষাদানের জন্যে রয়েছে High Institute of Dramatic Art। এখান থেকে প্রতি বৎসর বহু অভিনেতা-অভিনেত্রী পাশ করে বেরিয়ে থাকেন।

১৯২৭ সালে আলেকজান্দ্রিয়া সহরে তিনটে ষ্টুডিও ছিল বটে, কিন্তু আধুনিক উপকরণে সজ্জিত ষ্টুডিও তৈরী হয় ১৯৩৪ সালে। পরিচালক ওয়াহবী তৈরী করেন। গিজো পিরামিডের কাছেই তাঁর 'ষ্টুডিও ওয়াহবী' তৈরী হয়। এরই কাছে তোগো মিজ্রাহী আর একটা করেন। মিশরের ছায়াছবির ইতিহাসের প্রথম দিকে তিনজন মহিলা যেমন অনেক দায়িত্ব নিয়েছিলেন, তেমনি দায়িত্ব আজ তোগো মিজ্রাহী ও ওয়াহবীর ওপর। আজ হলিউডের কাছে যেমন লস্ এঞ্জেল্সের গুরুত্ব তেমনি গুরুত্ব কায়রোর কাছে গীজো পিরামিডের। বর্ত্তমানে মিশরে ৮টা ষ্টুডিও আছে। আলেকজান্দ্রিয়ায় এদের ১০টা সাউণ্ড-প্রুফ্ ষ্টেজ আছে। এদের মধ্যে 'ষ্টুডিও নাহা' সবচেয়ে উন্নত ও সম্ভ্রান্ত। ছবি তোলার প্রতিষ্ঠান হচ্ছে পাঁচটা: আইসিস ফিল্মস্, লোটাস ফিল্মস্, ফৌজী ফিল্মস্, ইউনাইটেড ফিল্মস্, এ্যারাবিক ফিল্মস্। এঁরা বছরে গড়পড়তা তিনটে করে ছবি তোলেন। মিশরে প্রদর্শনীগৃহ আছে দু'শো' পঞ্চাশটা। তাতে বসার জায়গা হলো ১২৫০০০ জনের। গড়ে প্রতি ১৫০ জনের জন্যে একটা ক'রে আসন। আমাদের দেশে একথা কল্পনা করা চলে না। অভিজ্ঞতার থেকে দেখা গেছে, প্রদর্শনী গৃহে বিদেশী ছবির থেকে মিশরীয় ছবি বেশ ভালো চলে। এর কারণ প্রায় নিরক্ষর আরবীয় জগতের অধিবাসীরা নিজেদের অতীত কাহিনী, ধর্ম্মমূলক শৌর্য্য-বীর্য্যপূর্ণ কাহিনী শুনতে ভালোবাসেন সেইজন্যে মিশরীয় ছবি 'লেডি-অব-দি ক্যামেলিয়াস'-এর মতো ছবি সতেরো সপ্তাহ পর্য্যন্ত চলে; সে ক্ষেত্রে 'বেদিং বিউটি'র মতো ছবি চলেছিল মাত্র পাঁচ সপ্তাহ। এর চেয়ে বেশীদিন কিন্তু কোনো বিদেশী ছবি চলেনি। দোভাষী বা ভিন্ন ভাষা রূপান্তর করেও ছবি তোলা হচ্ছে। এ বিষয়ে ইতালীয় পরিচালকরা অগ্রণী। একজন ফরাসী পরিচালক ও একজন মিশরীয় পরিচালকও এ ব্যাপারে আছেন। কিন্তু নিজের দেশের শিল্পটার উন্নতি-বিধানের জন্যে সংরক্ষণনীতির দ্বারস্থ হয়েছেন মিশর

সরকার। ঠিক হয়েছে, বছরে তিনটে মাত্র ফিচার ফিল্ম ডাবিং করা চলবে। তাছাড়া ডাবিং-এ অসুবিধা আছে, ইংরাজী ভাষার সংগে আরবীয় তফাৎ অনেক বলেই ডাবিং ভালো হয় না। 'থিফ-অব-বাগদাদ' তেমন সাফল্য লাভ করেনি।

আমাদের দেশে ছায়াছবির উন্নতির প্রতিবন্ধক যেমন মাথামোটা সেন্সর বোর্ড, মিশরে কিন্তু তা নয়। মিশরের সেন্সর বোর্ড অনেকখানি আগ্রহশীল শিল্পটীর উন্নতির জন্যে। যদিও সেন্সর বোর্ড সমাজ-সংগঠন মন্ত্রিদপ্তরের কর্তৃত্বে রয়েছে, কিন্তু বোর্ডের সবায়ের মতের ওপরই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, কোনো একজন মাথাওয়ালার চাপে বাতিল হয় না। এই দিক থেকে অনেকটা মার্কিন মুলুকের মতো। আর এই সেন্সর বোর্ড ছেলে বুড়োর জন্যে পৃথক পৃথক ছবির কোনো ব্যবস্থা করে না, এইটেই তার গলদ। আমাদের দেশে আইন আছে পৃথক ব্যবস্থার; কিন্তু পালন করা হয় না দেখেছি।

মিশরীয় ছায়াছবি শিল্প সত্যি উন্নতির দিকে। ওরা যে বিদেশী ছবির আমদানী বন্ধ করে নিজেদের পায়ের ওপর শক্ত-সবল হয়ে দাঁড়াচ্ছে সেইটেই আশার কথা।

নেপথ্যে

শ্রী নরাধম চালিত

নরাধমের এবার প্রধান অভিযোগ বিশিষ্ট চিত্রশিল্প-পতি শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ সরকারের বিরুদ্ধে। তিনি এটা মানেন কিনা জানি না, কিন্তু সমস্ত বাঙালী নিউ থিয়েটার্সকে জাতীয় প্রতিষ্ঠানের মর্য্যাদা দেন, তাই এর ভালো-মন্দে আনন্দ ও ব্যথা অনুভব করেন সমস্ত বাঙালী। নিউ থিয়েটার্সের এই প্রতিষ্ঠার মূলে প্রথম দশ বছরের কর্মীদের অক্লান্ত কর্ম্ম-সাধনাই প্রধানতঃ দায়ী; কিন্তু সেই প্রতিষ্ঠাকে আজ ধূলিসাৎ করবার চেষ্টা চলছে পরবর্ত্তী দশ বছর ধরে। গত পাঁচ বছরের মধ্যে নিউ থিয়েটার্সের সুনাম-অনুযায়ী কয়টি ছবি বেরিয়েছে? প্রথম দশ বছরের ইতিহাসে সকলের এই ধারণা হত যে বাজারে যা ভাল ছবি তা নিউ থিয়েটার্সের, বাকী সব অন্য কোম্পানীর—কিন্তু আজকে সকলেরই ধারণা বাজারের ভাল ছবি অন্য কোম্পানীর, বাকী সব নিউ থিয়েটার্সের। এই অধঃপতনের কারণ কী—শ্রীযুক্ত সরকার কি একবারও ভেবে দেখেছেন?

তাঁর কোম্পানীর বড় বড় কর্ম্মীরা আই, সি, এস, কর্ম্মচারীর মত মোটা বেতনে পুষ্ট—বাইরের কর্ম্মীরা এঁদের ঈর্ষ্যার চোখেই দেখেন। কিন্তু এই পরিপুষ্ট কর্ম্মীদের হাত থেকে আজ আর একটি ভাল ছবি আমরা পাই না কেন? নিউ থিয়েটার্স ষ্টুডিওতে আজ ছবি তোলা হয়, না আর কিছু হয়? আজ বাইরে পাঁচ জনের মুখে নিউ থিয়েটার্সের কয়েকজন রুই-কাৎলার নৈতিক আচরণ সম্বন্ধে যেসব জঘন্য কথাবার্ত্তা শোনা যায়, তাইতে সকলের এই ধারণা হওয়াই স্বাভাবিক যে ছবির দিকে মন দেওয়ার মত তাঁদের আর সময় নেই। কয়েকজনের নোংরামীতে আজ নিউ থিয়েটার্সের মত চিত্র-প্রতিষ্ঠান সকলের কাছে অশ্রদ্ধার পাত্র হয়ে উঠছে। এর প্রতিবিধানের জন্য শ্রীযুক্ত সরকার কি করছেন, তাই তাঁর কাছে আমাদের জিজ্ঞাস্য। যে কথা আজ সকলের মুখে মুখে, তার কণামাত্র তাঁর কানে যায় নি—এ কথা আমরা বিশ্বাস করতে পারি না। বাইরের লোক যখন এত কথা জানে, ঘরের লোকের আরও কথা জানা স্বাভাবিক।

আজ এই কয়টি রুই-কাৎলার কুৎসিত আচরণের জন্য চুনো-পুঁটির দুরবস্থা কল্পনা করুন। এঁদের কাছ থেকেই সমস্ত শিক্ষা দীক্ষা হবে ছোটদের; অথচ বড়দের কীর্ত্তি-কলাপ যদি এত জঘন্য হয়-তবে তাঁদের কাছ থেকে ছোটরা কি শিখতে পারে?

কোনও এক পরিচালককে প্রায় সবসময়ে পাওয়া যেত টালিগঞ্জস্থিত এক অভিনেত্রীর বাড়ীতে, এমনকি তাঁর খাবারও আসত, বিশ্বাস করুন, সেই অভিনেত্রীর বাড়ী থেকে। কলকাতায় তাঁর বাড়ী আছে, স্ত্রী-পুত্র আছে—অথচ সময়ে অসময়ে অভিনেত্রীর বাড়ীতে থাকা, খাওয়া-দাওয়া কি চাকরীর অঙ্গ? সমাজ এবং তাঁর স্ত্রী-পুত্র আত্মীয়-স্বজন কি মনে করেন? এতখানি বেপরোয়া ভাব এঁর কি করে হল, শ্রীযুক্ত সরকার? আপনাকে ভয় করলে কি ইনি এরকম করতে সাহস পেতেন?

আপনাদের কোম্পানীর বার্ণার্ড শ'কে জিজ্ঞাসা করে দেখুন তো তিনি কার সঙ্গে থাকেন? মহিলাটি কার স্ত্রী এবং দু'জনের সম্পর্ক কি? ষ্টুডিও মহলে প্রত্যেকে জানে, আপনি কি জানেন না শ্রীযুক্ত সরকার? আপনাদের ষ্টুডিওর গাড়ী কি কোনও কর্ম্মীর ব্যক্তিগত কারণে যথেচ্ছ ব্যবহৃত হতে পারে? এবং সেই গাড়ী কাজের জন্য ষ্টুডিওতে চলে গেলে কি ষ্টুডিও-ম্যানেজারের সঙ্গে ঝগড়া-মারামারি করা যেতে পারে? একথা কি একবার এই জি, বি, এসকে জিজ্ঞাসা করবেন? আর ঝগড়ার ভাষাটি

একবার উপস্থিত যে কোনও কুলি কিংবা মেয়ে-সুপারদের জিজ্ঞাসা করতে পারেন, কারণ তারাই বেশী উপভোগ করছিল।

পঞ্চ-পাণ্ডবের অন্যতমকে ষ্টুডিওর সকলে এত ভয় করেন কেন? তাঁর সম্বন্ধে কেউ কিছু বললে তিনি সকলের হাঁড়ি হাটে ভেঙে দেবেন বলে কি? তিনি কি তাঁর নিজের বাড়ীতে থাকেন, না—তাঁরও অবস্থান অন্যত্র! এখনকার দিনে সবচেয়ে চমকপ্রদ কাহিনীর পরিবেশিকা এক অভিনেত্রীর সঙ্গে তাঁকে পার্ক ষ্ট্রীটের একটি বিশেষ হোটেলে কয়েক ঘণ্টা প্রায়ই কেন দেখা যায়? এর আগেও আরও দু'একজন অভিনেত্রীর সঙ্গে সেখানেই তাঁকে দেখা গেছে।

আর একজন গুণী লোককেও সংযত করুন। তিনি রয়েল বেঙ্গল টাইগার; আত্মদান ব্যতীত তাঁর কাছে কাজ পাওয়া যায় না—এইটাই সকলের অভিযোগ।

শ্রীযুক্ত সরকার, আপনার ষ্টুডিওতে ছবি তোলার সময় কেন এমন লজ্জাজনক ব্যাপার ঘটবে—যার জন্য ছোট-খাটো কর্ম্মীরা লিখে দিতে বাধ্য হন যে এখানে ছবি তোলার সময় কেউ জড়াজড়ি করবেন না!

আপনার ষ্টুডিওর কর্ম্মীরা কোনও এক অভিনেত্রীকে নিয়ে একটি পার্কে কেন এমন ব্যবহার করবেন যার জন্যে জনসাধারণ তাঁদের শিক্ষা দিতে বাধ্য হয়?

আপনার ষ্টুডিওতে আজ কোনও একটি অভিনেত্রীকে নিয়ে কেন এমন কাণ্ড হবে যে যার জন্য অন্যান্য কর্ম্মীরা লজ্জায় কারও কাছে মুখ দেখাতে পারেন না?

সম্প্রতি সুধীন মজুমদার ও অসিতা বসুকে নিয়ে সমস্ত ষ্টুডিওতে যে হৈহৈ হচ্ছে, তার কতটুকু খবর আপনি রাখেন? সুধীন মজুমদারের স্ত্রী ও পুত্র-কন্যা বর্ত্তমান। আজ যদি সিনেমায় এই স্বৈরাচার চলতে থাকে এবং তা' যদি নিউ থিয়েটার্সে'র মত ষ্টুডিওতেই হয়, তবে এই লাইনে আসবার জন্য কোনও নূতন কর্ম্মী কি তার বাড়ী থেকে অনুমতি পাবে? আপনার ষ্টুডিওতে কেন এমন হবে শ্রীযুক্ত সরকার!

● ● ●

যেখানে কয়েকজন কর্ম্মী এইসব অবস্থা কাজে ব্যস্ত থাকেন, যেখানে আপনার কর্ম্মীরা স্বনামে কিংবা বেনামে অন্য চিত্রপ্রতিষ্ঠানের সাহায্যে অগ্রসর হন, যেখানে কেউ কেউ সিনেমার কাজ ছেড়ে মাছ বা অন্য কিছুর স্বাধীন ব্যবসায়ে ব্যস্ত, সেখানে তাঁরা তাঁদের ছবি ভাল করে করবার কথা ভাববেন কখন! তাই নিউ থিয়েটার্স থেকে সাধারণতঃ আর খুব ভাল ছবি দেখা যায় না। আজও সময় আছে—আগত দশ বছরে নিউ থিয়েটার্স আবার ভারতের শীর্ষস্থান অধিকার করতে পারে।

● ● ●

'সীমান্তিক' ছবিটির প্রযোজক অমর দত্ত ও পরিচালক অর্দ্ধেন্দু মুখোপাধ্যায় কি হিন্দী ছবি "দুলারী" দেখেছেন? যদি দেখে থাকেন তো জিজ্ঞাসা করব তার title musicটা কি রকম লাগল? নৌশাদ ভালই music দিয়েছেন, নয় কি?

বাজারে জোর গুজব: কোনও একটি বাংলা ছবির title music একটি হিন্দী ছবির title music এর সঙ্গে একেবারে মিল দেখা গেছে। কতদূর সত্য জানি না।

● ● ●

রূপশ্রী ষ্টুডিওতে হঠাৎ গজিয়ে উঠল একটি চিত্র-প্রতিষ্ঠান। রূপশ্রী লিঃ নয়, রূপশ্রী চিত্র প্রতিষ্ঠান। বাজারে গুজব শোনা গেল, কোনও এক পরিবেশক এঁদের চারটি ছবি করবার জন্য কিছু টাকা অগ্রিম দিতে স্বীকৃত হয়েছেন এবং এঁরাও ছবি তোলার জন্য বদ্ধপরিকর। স্থির ছিল দু'টি ছবি পরিচালনা করবেন মনুজেন্দ্র ভঞ্জ, আর দুটি অর্দ্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়। ১লা বৈশাখ শুভ মহরৎ মনুজেন্দ্র ভঞ্জের ছবির—মহরৎ হ'ল কিন্তু অর্দ্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'রূপান্তরে'র। কোনও একটি ইংরাজী সাপ্তাহিক পত্রিকা ডিটেক্‌টিভের মত এর প্রকৃত কারণ গোপনে অনুসন্ধান ক'রে এমন এক কাহিনী ফেঁদে বসলেন যে রূপশ্রী চিত্র প্রতিষ্ঠান প্রমাদ গণলেন। সেই পত্রিকার সম্পাদকদ্বয়ের সঙ্গে 'প্যারাডাইস' চিত্রগৃহের লবিতে বসে কি মীমাংসা হল

জানি না, তার পর থেকে ওই ব্যাপারের আর কিছু সেই সাপ্তাহিক পত্রিকা লেখে নি। কিন্তু ষ্টুডিওতে এই নিয়ে হৈ হৈ ব্যাপার। কর্তৃপক্ষ টেকনিসিয়ানদের কয়েকজনকে একটু ধমকের সুরেই বলেছিলেন—কি করে বাইরে কাগজওলার কাছে ষ্টুডিওর খবর যায়? তিনি সব জায়গায় ভূত দেখতে সুরু করলেন। কয়েকজন টেকনিসিয়ানকে তিনি একটু সন্দেহের চোখে দেখেছিলেন।

সেই সাপ্তাহিক পত্রিকা কি কারণে জানি না মনুজবাবুর সম্বন্ধে একটু ভাল কথাই লিখেছিল। এই একটি কারণ এবং যেহেতু ছবি তোলার ব্যাপারে মনুজবাবুই পরাজিত-পক্ষ তাই কর্তৃপক্ষের তাঁর ওপর হয়ত একটু সন্দেহ হয়েছিল। নয়ত হঠাৎ কেন মনুজবাবু সেই পত্রিকায় একটি পত্রাঘাত করে জানালেন যে তাঁর ছবি না হওয়ার কারণ কোনরূপ 'ভিতরের ব্যবস্থা' নয়, গল্প মনোনীত না হওয়াই প্রধান কারণ এবং তিনি গল্প খুঁজছেন। এই পত্রাবতারণা স্বেচ্ছায়, না পরের অনুরোধে জানিনা।

রূপশ্রী চিত্র-প্রতিষ্ঠানের দ্বিতীয় ছবির শুভ মহরৎ সম্পন্ন হয়েছে। সাধু! পরিচালক কে? মনুজেন্দ্র ভঞ্জ? না, মশাই—সেই আমাদের চিরপরিচিত অর্দ্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়। এবারে শ্রীযুক্ত মনুজেন্দ্র ভঞ্জ কি বলবেন? রূপশ্রী চিত্র-প্রতিষ্ঠানের শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র দত্তের এ সম্পর্কীয় একটি বিবৃতি পেলে আমরা আমাদের পাঠক-পাঠিকাদের নিরস্ত করতে পারি।

শোনা গেল, অর্দ্ধেন্দু মুখোপাধ্যায় টার্জ্জানের গল্পের মত একটি অরণ্য কাহিনী অবলম্বন ক'রে ছবি তুলবেন। কাহিনী বোধ হয় লিখবেন 'সংকেত' কাহিনীখ্যাত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। কিন্তু টার্জ্জান সাজবেন কে? অর্দ্ধেন্দুবাবুকে কিন্তু অনেকদিন ভাল ভূমিকায় অভিনয় করতে দেখি নি।

● ● ●

'চিত্রবাণী' সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

আপনার জন্ম আমাকে নরাধম হতে হয়েছে। আপনার জন্ম ষ্টুডিওতে ঘুরে ঘুরে সংবাদ সংগ্রহ করতে হচ্ছে। লেখা দিতে দেরী হলে তাগাদার অন্ত থাকে না। কিন্তু স্যার, 'চিত্রবাণী'র তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলনে 'প্রাচী' চিত্রগৃহে ভূরিভোজনে সমস্ত সাংবাদিক নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন, আমি বাদ কেন? আমি তো কাউকে বলি নি যে প্রদর্শক-সম্মেলনে বক্তৃতাদানকালীন পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ডক্টর বিধানচন্দ্র রায়ের যে ছবি গত মাসে 'চিত্রবাণী'তে ছাপিয়েছেন, তা দুটো ছবি কেটে, আঠা দিয়ে জুড়ে আপনার নিজের ছবিটি সুচারুরূপে প্রকাশ করেছেন; অথচ আমাকে সরিয়ে দিয়েছেন। আর আজ এ কথাও বলছি না যে আপনার উক্ত নিমন্ত্রণ-সভায় আপনি শ্রদ্ধেয় চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছাকাছি এমনভাবে বসেছিলেন যাতে ভোজন এবং ছবি কোনওটাতেই বাদ না যান! ভাল কথা, আপনার নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যান নি যে দু'জন আপনার বন্ধু-সাংবাদিক শ্রীযুক্ত ফণী দে এবং শ্রীযুক্ত দেবু মুখোপাধ্যায়—তাঁদের অনুপস্থিতির কারণ কি জানেন? নিমাই (সেই যে ছেলেটি ষ্টুডিও থেকে হাইকোর্ট পর্য্যন্ত ঘোরে) বলছিলো যে একজন নাকি একটি ইণ্টারভ্যুর জন্য ব্যস্ত ছিলেন, আর একজন হাইকোর্টের কাছে ঘুরছিলেন। আমার বিশ্বাস হয় না।

নিমাই আরও জানিয়েছে যে কোনও এক প্রযোজক নাকি আপনাকে হাইকোর্ট দেখাতে পারেন। দেখেন নি কি? তবে তাঁর বিজ্ঞাপন ছাপলে তিনি আরও খুশি হবেন। নমস্কার। ইতি—

আপনার বিশ্বস্ত
নরাধম

‘চিত্রবাণী’র মজলিশ

গত ১৭ই আগষ্ট বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে মধ্য কলিকাতার জনপ্রিয় চিত্রগৃহ “প্রাচী”-তে ‘চিত্রবাণী’ পত্রিকার সম্পাদক ও কর্ম্মীবৃন্দের পক্ষ থেকে একটি চা-চক্রের আয়োজন করা হয়। বাঙ্গলার প্রায় সকল বিখ্যাত চিত্র-সাংবাদিকই এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। প্রধান অতিথিরূপে এই অনুষ্ঠানকে সম্মানিত করেছিলেন বঙ্গীয় চলচ্চিত্র সঙ্ঘের সভাপতি শ্রীযুক্ত মুরলীধর চট্টোপাধ্যায়।

আয়োজনটি ছোট, তার চেয়েও ছোট ‘চিত্রবাণীর’ কর্ম্মীবৃন্দের আপ্যায়ন-ক্ষমতা, কিন্তু এ সত্ত্বেও বাঙ্গলার এত জননমস্য বিশিষ্ট ব্যক্তি যে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে উদ্যোক্তাদের ধন্য ক’রেছেন তার একমাত্র কারণ ‘চিত্রবাণী’র প্রতি তাঁদের অকৃত্রিম স্নেহ ও ভালবাসা। বিরাট কলিকাতা নগরীর দক্ষিণ প্রান্তের যে গৃহটিতে ব’সে ‘চিত্রবাণী’র কর্ম্মীবৃন্দ সাধনা ক’রে থাকেন সত্য শিব ও সুন্দরের, সেই স্থানটি এত সব বিশিষ্ট ব্যক্তিদের যোগ্য আপ্যায়নের পক্ষে যথেষ্ট প্রশস্ত নয়। তাই, স্বভাবতঃই তাঁরা কুণ্ঠিত হ’য়ে পড়েন; একটু প্রশস্ততর স্থানে অনুষ্ঠানটি আয়োজনের কথা চিন্তা করেন। “প্রাচীর” কর্ত্তৃপক্ষ কথাটি জানতে পেরে সাগ্রহে তাঁদের আহ্বান জানান এবং শেষ পর্য্যন্ত বহু অসুবিধা সহ্য ক’রেও তাঁরা অনুষ্ঠানটিকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য যৎপরোনাস্তি ক্লেশ স্বীকার করেন। বস্তুতঃ, তাঁদের এই আন্তরিকতা ও সৌজন্যেই এই অনুষ্ঠান এমন সাফল্য লাভ ক’রেছে। এই সাফল্যের জন্যে যা-কিছু ধন্যবাদ প্রাচী” প্রেক্ষাগৃহের কর্ত্তৃপক্ষ ও কর্ম্মীবৃন্দের প্রাপ্য।

আয়োজনটি সামান্য কিন্তু এখানে আমরা ইঙ্গিত পেয়েছি বাঙ্গলা চলচ্চিত্রশিল্পের এক বিরাট সম্ভাবনার। এই অনুষ্ঠানেই আমরা দেখেছি বাঙ্গলার চিত্র-সাংবাদিকগণ আগের চেয়ে এখন কত গভীরভাবে চিন্তা করছেন বাঙ্গলার মুমূর্ষু চিত্রশিল্পের কথা,—যেমন ক’রেই হোক, তাঁরা বাঙ্গলার সংস্কৃতি, শিল্প ও রুচির ধারক ও বাহক এই শিল্পকে বাঁচাবার জন্য এখন কতখানি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তাঁদের অনেকেই অনুভব ক’রেছেন যে, বাঙ্গলার চলচ্চিত্র-শিল্প যদি আর বেশীদিন এই অবস্থায় চলে, তবে তার ধ্বংস

মজলিশে যাঁরা যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের একাংশ — ফোটো : মনো মিত্র

অনিবার্য! চারিদিকে বিদ্বেষের দাবাগ্নির মাঝে বাঙলার এই শান্তিপ্রিয় কলালক্ষ্মীর আসন যে ভাবে ক্রমাগত সঙ্কুচিত হ'য়ে আসছে তার অনিবার্য্য পরিণতিস্বরূপ অদূর ভবিষ্যতেই আসামিয়া, উড়িয়া প্রভৃতি বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার মতই বাঙলা ভাষায় ছবি তোলাও একেবারে বন্ধ হ'য়ে যাবে,—এই আতঙ্কজনক সম্ভাবনা সম্পর্কেও এই অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের বিশেষ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দেখা গেল।

সুতরাং, উৎকণ্ঠিত সাংবাদিকগণ এই অনুষ্ঠানেই চেপে ধ'রলেন পূর্ব্ব ভারতের চলচ্চিত্র ব্যবসায়ের চেম্বার অফ্ কমার্স, বেঙ্গল মোশ্যান পিকচার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি শ্রীযুক্ত মুরলীধর চট্টোপাধ্যায়কে জানতে চাইলেন, "এর প্রতিকার কি?"

মুরলীবাবুকেও দেখা গেল, বাঙলা চলচ্চিত্রশিল্পের আসন্ন দুদ্দিন সম্পর্কে তিনিও কম দুশ্চিন্তাগ্রস্ত নন।

আলোচনা সুরু হ'ল সাংবাদিক আর শিল্পপতির মধ্যে নানা সমস্যা নিয়ে। চিত্রশিল্পের সব স্পেশ্যালিষ্টের এমন ব্যাপক সমাবেশে বিস্তারিত আলোচনা হ'ল রোগী বাঁচাবার ব্যবস্থা নিয়ে। এই আলোচনায় সকলে সমবেত-ভাবে যে সিদ্ধান্তে উপস্থিত হ'লেন, তা' বাঙলা চলচ্চিত্র শিল্পের ইতিহাসে যুগান্তকারী। 'চিত্রবাণী'র কর্ম্মীবৃন্দের এই ক্ষুদ্র আয়োজনে বাঙলা চলচ্চিত্রশিল্পের নূতন "ইতিহাসের সূত্রপাত হ'ল ১৭ই আগষ্ট বৃহস্পতিবার "প্রাচী" চিত্রগৃহে।

এই সম্মেলনে যে-সব আলোচনা হয়, তা' একান্ত ঘরোয়া এবং এই কারণেই তা' প্রকাশ নিষিদ্ধ। তবে, তারই পরিণতিস্বরূপ শ্রীযুক্ত মুরলীধর চট্টোপাধ্যায় গত ১লা সেপ্টেম্বর এক চাঞ্চল্যকর বিবৃতি পরিবেশন ক'রেছেন খবরের কাগজের মারফৎ। পর পৃষ্ঠায় এই বিবৃতির পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যাবে। দৃঢ়তা এবং সুস্পষ্টতার দিক দিয়ে শ্রীযুক্ত মুরলীধর চট্টোপাধ্যায়ের এই বিবৃতিটিও ঐতিহাসিক। বাঙলার মুমূর্ষু চিত্রশিল্পকে বাঁচাবার জন্য তিনি সাংবাদিকদের সঙ্গে পরামর্শক্রমে যে পথের নির্দ্দেশ দিয়েছেন, তা' বাঙলার জনসাধারণের ঐকান্তিক সহযোগিতায় সার্থক হ'য়ে উঠবে ব'লেই আমরা আশা করি

প্রদ্যোত মিত্র

মজলিশে আলোচনায় রত অভ্যাগতবৃন্দ ফোটো: মনো মিত্র

পশ্চিম বাংলার চিত্রশিল্প

পশ্চিমবঙ্গের ছায়াছবিশিল্পের বর্তমান দুর্গতি, তার কারণ ও প্রতিকারের উপায় সম্বন্ধে বঙ্গীয় চলচ্চিত্র সঙ্ঘের সভাপতি শ্রীমুরলীধর চট্টোপাধ্যায় এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেছেন—পশ্চিমবঙ্গের মুমূর্ষু চিত্রশিল্পকে বাঁচাতে হলে পশ্চিমবঙ্গে প্রযোজিত ছবি দেখাবার জন্যে খানিকটা সময় বিশেষভাবে চিহ্নিত এবং নির্দিষ্ট ক'রে রাখতেই হবে। এটিকে সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিকতা ব'লে ভুল করলে চলবে না। এটা একান্তভাবে প্রয়োজন এই শিল্পটিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য—যে শিল্প এই দেশেরই বহু লোকের অন্ন জোগায়। পশ্চিম বাংলায় তোলা ছবি যেসব জায়গায় দেখিয়ে আয় করা যেত সেখানকার বাজারও সঙ্কুচিত হ'য়ে গেছে। এটা মনে রাখতে হবে যে পশ্চিম বাংলায় যে সব ছবি তোলা হয় তার অধিকাংশই বাংলা ভাষায়, তাই তার বাজার পশ্চিম বাংলাতেই সীমাবদ্ধ।

সম্পূর্ণ বিবৃতিটি এই—

কিছুদিন ধ'রে দেখা যাচ্ছে সমস্ত সংবাদ-পত্র আর চলচ্চিত্র সম্বন্ধীয় সাময়িক পত্র-পত্রিকা পশ্চিমবঙ্গের চলচ্চিত্র শিল্পের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করছেন। এই সব আলোচনা থেকে স্বতঃই বোঝা যায় যে, আমাদের চিত্রজগতে গলদ ঢুকেছে। এই অবস্থার কারণ এবং তা' দূরীকরণের ব্যবস্থা সম্বন্ধে এই শিল্পের শুভানুধ্যায়ীদের কাছ থেকে অনেক উপদেশ পাওয়া গেছে। সমস্ত কারণগুলি কিন্তু বিশদভাবে বলা হয়নি। যে সমস্ত গলদ আমি দেখেছি তা' ব'লে ত্রুটিবিচ্যুতিগুলি দূর করা কিভাবে সম্ভব হতে পারে তা আমি এখানে আলোচনা করার চেষ্টা করব।

প্রথমেই যে দোষ পশ্চিমবঙ্গের চিত্রশিল্প সম্বন্ধে দেওয়া হয় তা হলো এই যে, সময়ের সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারছে না বলেই এর ক্রমোন্নতি ব্যাহত হচ্ছে। দোষ মেনে নিয়ে আমি এর কারণগুলি সংক্ষেপে বলছি। সেগুলি এই :—

(১) প্রযোজকদের আর্থিক দুর্গতির দরুণ প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম তাঁরা সংগ্রহ করতে পারেন না। কলকাতার কোনো ষ্টুডিয়োতেই প্রয়োজনমত সমস্ত যন্ত্রপাতি নেই যা দিয়ে ছবির কলাকৌশলগত উৎকর্ষ তাঁরা দেখাতে পারেন। এই জন্যই পশ্চিমবঙ্গে যেসব ছবি তোলা হয় সেগুলি স্বভাবতঃই বোম্বাই এবং এমনকি মাদ্রাজে তোলা ছবির চেয়ে তুলনায় নিরেশ হয়—বিদেশী ছবির তুলনায় তো কথাই নেই। ন্যায্য হারে সুদে আবশ্যকমত অর্থ সংগ্রহ করতে পারলে এই অসুবিধার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়।

(২) পশ্চিম বাংলায় তোলা ছবি যেসব জায়গায় দেখিয়ে কিছু আয় করা যেতো সেখানকার বাজার সঙ্কুচিত হয়ে গেছে। এটা মনে রাখতে হবে যে, পশ্চিম বাংলায় যে সব ছবি তোলা হয় তার অধিকাংশই বাংলা ভাষায়, তাই এর বাজার পশ্চিম বাংলাতেই সীমাবদ্ধ। কারণ, পূর্ববঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা এবং আসামের বাজার ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হয়ে আসছে। এর কিছুটা প্রতিকার হতে পারে পশ্চিমবঙ্গে চিত্রগৃহের সংখ্যা আরো বাড়িয়ে। এখানে বাংলা ছবির বদলে প্রযোজকরা হিন্দী ছবি তুলবেন এটা সমর্থনযোগ্য নয়। এর ফলে বাংলা চলচ্চিত্রশিল্প যে মৃত্যুর পথে গিয়ে গিয়ে আমাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির ধারাকে ব্যাহত করবে তাই নয়, হিন্দী ছবি তৈরীও সংখ্যায় অতিরিক্ত হয়ে যাবে। এ ছাড়াও হিন্দী ছবি প্রযোজনার ব্যাপারে টাকার কথা নিয়েও সমস্যা দেখা দেবে। এতে খরচ অনেক পড়বে এবং বহু প্রযোজকেরই তা সাধ্যের বাইরে। হিন্দী ভাষাভাষী অঞ্চলসমূহে ছবির মুক্তিলাভের ব্যাপারে যেসব অসুবিধা রয়েছে তাও বিবেচনার বিষয়। অতএব নতুন চিত্রগৃহ তৈরী করে এবং ভ্রাম্যমান সিনেমার সংখ্যা বাড়িয়ে বাংলা ছবির প্রাণশক্তি আবার ফিরিয়ে আনা যেতে পারে।

(৩) বাংলা দেশে তোলা যেসব ছবি সাধারণতঃ দেখা যায় তা নিরেশ হওয়ার জন্য নতুন নতুন প্রতিভার অভাবও দায়ী। সমবায় পদ্ধতিতে বিভিন্ন স্থানে শিক্ষাকেন্দ্র খুলে এই অব্যবস্থা দূর করার বন্দোবস্ত করা উচিত।

(৪) ছবির কাহিনী সম্বন্ধেও যথেষ্ট অভিযোগ শোনা যায়। ছবির কাহিনী নির্বাচনের ব্যাপারে প্রযোজকদের দূরদর্শিতার অভাব সম্বন্ধে বলা হয়। বলা হয় যে তাঁদের

প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী নেই। কিন্তু একটা কথা মনে রাখা হয় না যে প্রযোজকরা এই শিল্পে যোগ দিয়েছেন নিজেদেরই টাকা নিয়ে (হয় নিজেরই টাকা নয়তো অন্যের কাছে ধার-করা)। অতএব তাঁদের প্রথম কাজই তোলো টাকার নিরাপত্তার দিকে দৃষ্টি রাখা: তারপরে আসে জাতির প্রতি কর্তব্যের মনোভাব। প্রগতিমূলক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ছবি তোলার মত প্রযোজকের হয়তো অভাব হবে না কিন্তু এমন কেউ আছেন কি যিনি এই সব ছবির প্রদর্শনের অনুমতির জন্য গ্যারাণ্টি দিতে পারেন? অথবা এই সব ছবিতে নিয়োজিত প্রযোজকের মূলধন ফিরিয়ে পাবার নিশ্চয়তা দিতে পারেন? অন্য দেশে অনেকগুলি পুরস্কার পেয়েছে এমন বিষয়বস্তুও কিন্তু এখানকার কর্তৃপক্ষ বাতিল করেছেন। প্রযোজকদের কাছে এ বিষয়ে খোঁজ নিলেই আমার উক্তির সত্যতা সম্বন্ধে জানতে পারা যাবে। সেন্সারের আইনকানুন শিথিল না করা পর্যন্ত এর কোনো বিহিত হবে না। এই সমূহ বাধাবিপত্তি থাকা সত্বেও অনেক প্রযোজক এমন ছবি তৈরীর চেষ্টা করেছেন এবং এখনো করছেন যা জনসাধারণের কাছে শুধু সমাদরই লাভ করে তাই নয়, তাঁদের এবং তাঁদের পারিপার্শ্বিক বেষ্টনীর মঙ্গলের পথ নির্দেশ করে।

(৫) দর্শকসাধারণের রুচির তারতম্যও একটি ব্যাপার যার দিকে প্রযোজকদের নজর রাখতে হয়। বড় বড় সহর অঞ্চলে যে সব ছবি থেকে যথেষ্ট আয় হয়েছে মফঃস্বল অঞ্চলে আবার সেই সব ছবিতেই সম্পূর্ণ লোকসান হ'য়ে গেছে। দর্শকদের পছন্দ বা অপছন্দের কোনো নির্দিষ্ট মান ব'লে কিছু নেই। যতক্ষণ না সমগ্র জাতির সাধারণ শিক্ষার মানের কোনো উন্নতি হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত লোকসান না দিয়ে আর ছবির মানের প্রত্যক্ষ কোনোরকম উন্নতি করা যাবে না। সবচেয়ে বিচিত্র ব্যাপার হোলো এই যে, বিদেশী বা হিন্দী ছবিতে যে সব কাহিনী দর্শকদের আকৃষ্ট করে, সেই কাহিনীই বাংলা ছবির বেলাতে কোনো আকর্ষণের ক্ষমতা রাখে না।

(৬) নির্দিষ্ট সংখ্যক ছবি দেখানোর ব্যবস্থা: পশ্চিমবঙ্গের মুমূর্ষু চিত্রশিল্পকে বাঁচাতে হলে পশ্চিমবঙ্গে প্রযোজিত ছবি দেখাবার জন্যে খানিকটা সময় বিশেষভাবে চিহ্নিত এবং নির্দিষ্ট ক'রে রাখতেই হবে। এটাকে সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিকতা ব'লে ভুল করলে চলবে না। এটা একান্তভাবে প্রয়োজন এই শিল্পটিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য—যে শিল্প এই দেশেরই বহু লোকের অন্ন জোগায়

(৭) অতিরিক্ত পরিমাণ ছবি তোলা: বর্তমানে অতিরিক্ত পরিমাণে ছবি তোলা হচ্ছে। এটা এখনই কমিয়ে ফেলা উচিত, যদি প্রয়োজন হয়, প্রযোজকদের জন্য লাইসেন্স প্রথা প্রবর্তন করা যেতে পারে আর তা নির্ধারিত হবে এই ব্যবসায়-সংশ্লিষ্ট সঙ্ঘ বা প্রতিষ্ঠানের পরামর্শক্রমে। অতিরিক্ত হারে ছবি তোলার দরুণ যে সব অবাঞ্ছিত লোক এসে জুটেছে এই শিল্পে, তাদের সরিয়ে ফেলার প্রয়োজন রয়েছে সকলের ভালোর জন্যই।

(৮) পরিবেশকদের 'মিনিমাম গ্যারাণ্টী' চাওয়া এবং প্রদর্শকদের 'হাউস প্রোটেকশন' অর্থ চাওয়া—দুটোই সমানভাবে ঘৃণ্য, কারণ ও দু'টির পিছনে কোনো নৈতিক সমর্থন নেই। কৃত্রিম উপায়ে কোনো ছবির বা কোনো চিত্রগৃহের মূল্য বাড়ানোকে উৎসাহ দেওয়া চলবে না। ছবিকে তার নিজের গুণাগুণের ওপর নির্ভর করে চলতে হবে।

(৯) তথাকথিত আনন্দ পরিবেশনের ব্যাপারে ছবির প্রযোজনার দিকে আয়ের চেয়ে ব্যয় হয় বেশী। সেইজন্য প্রযোজকদের আয় যাতে বাড়ে তার ব্যবস্থা করা উচিত এবং তাতেই একমাত্র এই শিল্প বাঁচতে পারবে।

(১০) চোরাকারবার: কঠোর হস্তে একে দমন করতে হবে। খুব অল্প লোক জড়িত থাকার দরুণ একাধিপত্যের সুযোগ নিয়ে ফিল্ম, কার্বণ ও অন্যান্য দরকারী আনুষঙ্গিক বিক্রয়ের ব্যাপারে যারা চোরা-কারবারের আশ্রয় গ্রহণ করে তাদের ধরতে হবে এবং তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। ছবির প্রদর্শনের ব্যাপারেও কালো টাকা দেওয়াকে উৎসাহ দেওয়া চলবে না। অতিরিক্ত হারে ছবি তোলা বন্ধ করতে পারলেই এই দুর্নীতি বন্ধ করা যাবে

চলচ্চিত্রশিল্প সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং কর্তৃপক্ষ যদি এ বিষয়ে গভীর ভাবে চিন্তা ক'রে দেখেন তাহ'লে আমি জোর দিয়ে বলতে পারি যে, এই শিল্পটি দুর্গতির হাত থেকে মুক্তি পেতে পারে

আপনি কি বলেন?

শ্রীরায়

মাইকেল মধুসূদন

শ্রদ্ধেয় সম্পাদক 'চিত্রবাণী',

'আপনি কি বলেন' বিভাগটির জন্য ধন্যবাদ। আপনাদের এই বিভাগটির সুযোগ নিয়ে "মাইকেল মধুসূদন" সম্বন্ধে নিজস্ব মতামত জানাচ্ছি।

ছবিটার নামটা একটুখানি আপত্তির সৃষ্টি করেছে। ইংরাজের যুগ চলে গেছে সুতরাং নামের আগে 'মাইকেল' শব্দটা তুলে দেওয়া চলে। মধুসূদন নিজে তাঁর সমাধিস্থ কবিতায় নিজেকে 'শ্রীমধুসূদন' ডেকেছেন। সুতরাং 'মাইকেল' শব্দটা আজকের দিনে অপ্রয়োজনীয় ও অশোভন।

ছবিটা এক-কথায় সুন্দর। সুন্দর নবাগত উৎপল দত্ত। তাঁর চমৎকার ইংরাজী উচ্চারণ ও বাচনভঙ্গী মুগ্ধ করেছে সকলকে। সার্থক দেবযানীর রেনবিয়েটা। জয়যুক্ত হোক আই, এন, এ পিকচার্সের এই শুভ মহৎ প্রচেষ্টা। বাঙ্গলার এই প্রতিভাবান কবির চিত্ররূপ তাঁকে বাঁচিয়ে রাখবে আরো অনেক দিন—আমাদের মাঝে—'মধুসূদন' মধু বোসের সার্থক সৃষ্টি। ইতি—

শ্রীবাসুদেব রায়
বনমালী চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—২

কাঁকনতলা লাইট রেলওয়ে

এম, পি, প্রোডাকসন্স লিঃ-এর "কাঁকনতলা লাইট রেলওয়ে" চিত্রখানি অন্যান্য ছবির তুলনায় ভাল হয় নাই। ছবিটির মধ্যে এই নামের কোন তাৎপর্য্য খুঁজিয়া পাইলাম না। ট্রেনটি যখন ষ্টেশনে আসিয়া পৌছিল তখন ষ্টেশনটির কোন নামই দেখিতে পাইলাম না। যখন কোন চিত্রে ট্রেন একটি ষ্টেশনে এসে থামে তখন ষ্টেশনটির নাম দেখা যায়। কিন্তু এই চিত্রের বেলায় তাহা দেখা গেল না। অথচ ছবিটির নাম দেওয়া হইয়াছে "কাঁকনতলা লাইট রেলওয়ে"। ট্রেনটি ষ্টেশনে থামিলে যাত্রীরা ট্রেন হইতে নামিল কিন্তু কোন যাত্রীকে ট্রেনে উঠিতে দেখা গেল না। ষ্টেশন মাষ্টার কুঞ্জবাবুকে ট্রেনের সময় হইলেই প্রত্যহ হাজির হইতে হয়। এখানে ট্রেন আর দেখানো হইল না। যদি দুই একটি ট্রেন আসিত এবং খানিকক্ষণ থাকিয়া চলিয়া যাইত, তবু কিছুটা হইত। সাধারণতঃ রেল ষ্টেশনে যাহা দেখিতে পাওয়া যায়।

যে কয়টি গান গাওয়া হইয়াছে তার মধ্যে শিবানীর গানটি ভাল হইয়াছে। ষ্টেশন মাষ্টার কুঞ্জবাবুর ভূমিকায় জহর গাঙ্গুলীর অভিনয় ভালই লাগিয়াছে। প্রফেসারের ভূমিকায় ধীরাজ ভট্টাচার্যের অভিনয়ের মধ্যে বেশ একটু নূতনত্ব দেখা যায়। শিবানীর ভূমিকায় কবিতা সরকারের অভিনয় খুব বেশী সুবিধাজনক হয় নাই। বিকাশ রায়ের অভিনয় ভাল হয় নাই। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয় দেখিলে পূর্ব্বের ছবি "স্বয়ংসিদ্ধা"র গোবিন্দের কথাটিই আমাদের বেশী মনে পড়ে। বহুদিন পরে তাঁহাকে এ ধরণের ভূমিকায় অভিনয় করিতে দেখিলাম।

পথিক (আগরতলা)
ত্রিপুরা রাজ্য

অপবাদ

মাননীয় সম্পাদক মহাশয়,

"অপবাদ" "খাজাঞ্চির" বাংলা রূপ না "জুগনু" ও "গৃহস্থির" বাংলা রূপ তা বলা কঠিন। "খাজাঞ্চি"র "সাওন কি নজারে" গানখানার মত ছেলেমেয়ে মিলিয়ে গান আছে। আছে "জুগনু"র মত কলেজের ছেলেমেয়ের পিক্‌নিক্—আর আছে "গৃহস্থির" কাহিনীর অংশ বিশেষ। এর নাম "জগাখিচুড়ী" রাখা উচিত ছিল। তাছাড়া "অপবাদ" নামখানির কোন যুক্তি এতে নেই। কেবল দু'একবার চিত্রের মাঝে "অপবাদ" করে চেঁচালেই তার নাম "অপবাদ" হয় না। বোম্বাইয়ের বনকোয়েল "সুলোচনা"কে সরোজবাবু দর্শকসমাজের চোখে বোধ হয় ধাঁধাঁ লাগাবার জন্যেই আনিয়েছিলেন। কিন্তু "সুলোচনা" বা "রেহানা"কে আনলেও আর Box-Office Hit করা যাবে না।

সুলোচনার দ্বারা এ অভিনয় সম্ভব নয়, বাংলা উচ্চারণ তাঁর হয় না, তাছাড়া সে একরকম কলম ভাঙ্গার দলে তাকে দিয়ে ইংরিজী বলানো যায় না। কেবল রূপ দেখালেই যে অভিনয় হয় না, তার প্রমাণ প্রদীপ। মীর্জা মুসরফের মত একজন প্রথম শ্রেণীর অভিনেতার ব্যর্থ নকল করতে চেয়েছেন আমাদের শ্রীমান পরেশ। তাঁর দ্বারা এ অসম্ভব। লাঠি ঘোরালে আর গোঁফ নাচালেই বাহবা পাওয়া যায় না। কমলবাবুর অভিনয় যথাযথ। যদিও কমলবাবুকে এই চিত্রে আনা হয়েছে কেবল এই চিত্রের নাম সার্থক করবার জন্য। এটা একটা অবান্তর চরিত্র।

নমস্কার জানবেন। ইতি—
অশোক চৌধুরী
ঝাড়গ্রাম

লাঞ্ছিত যারা

গৌর চট্টোপাধ্যায়
মনোজ সান্যাল

(গত সংখ্যার পর)

সাতাশ

গোধূলি নেমে এসেছে। ছিন্নবিচ্ছিন্ন দুঃস্বপ্নের জাল ছিঁড়ে বর্ত্তমানে ফিরে আসার আগেই অন্ধকার ঘনিয়ে এলো।

'নেলী!' ব'ললাম,—'তোমার শরীর মন ভালো নেই, তবুও তোমাকে চোখের জলে ফেলে রেখে বেরোতে হোচ্ছে। লক্ষ্মীটি! আমায় মাপ কর। কি ক'রবো? আর একজন ভালোবাসা পেয়েও ক্ষমা পেলেনা—কত মর্ম্মান্তিক, লাঞ্ছিত, নিঃসঙ্গ জীবন তার! সে আমার প্রতীক্ষায় রয়েছে। তোমার কাহিনী শুনে আমি যেন আরও চঞ্চল হ'য়ে প'ড়েছি, এই মুহূর্ত্তেই তাকে না দেখে কিছুতেই স্থির থাকতে পারছি না।'

জানি না যা ব'ললাম তা' ও বুঝলো কিনা। ওর কাহিনী আর আমার অসুস্থতায় মিলে অত্যন্ত বিপর্য্যস্ত ছিলাম। তবুও তখনই ছুটলাম নাটাশার কাছে। রাত অনেক। যখন পৌঁছোলাম তখন ন'টা।

নাটাশার গেটের সামনে রাস্তার ওপর একখানা গাড়ী দেখলাম। মনে হোল প্রিন্সের। বাড়ীটায় ঢুকতে হয় উঠোন পেরিয়ে। সিঁড়িতে উঠতে উঠতে শুনলাম আমার ওপরে আর কেউ যেন উঠ্‌ছে অতি সন্তর্পণে পা ফেলে। পা ফেলার শব্দে বুঝলাম লোকটির কাছে স্থানটি অপরিচিত। মনে হোল নিশ্চয়ই প্রিন্স, কিন্তু পরক্ষণেই সন্দেহ দেখা দিল। লোকটি বিড়্‌বিড়্‌ ক'রে গাল দিয়ে সিঁড়িকে জাহান্নমে পাঠাতে পাঠাতে উঠছে। যতই উঠছে ততই তার ভাষাও উঠছে তীব্র হ'য়ে। অবশ্য সিঁড়ি অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ, খাড়াই আর নোংরা,—কখনও আলো জ্বালা থাকে না। তবে ওপর থেকে যে ভাষা শুনলাম তাতে তা' প্রিন্সের ব'লে বিশ্বাস হয় না। উঠ্‌তি ভদ্রলোক গাল দিচ্ছিলেন গাড়োয়ানের মত। চারতলায় এসে এক ঝলক আলো দেখা গেল। নাটাশার দোরগোড়ায় ছোট্ট একটি বাতি জ্বলছে। দরজার কাছে এসে লোকটির সঙ্গ ধ'রলাম এবং বিস্ময়ে অভিভূত হ'য়ে প'ড়লাম তাকে চিনতে পেরে—প্রিন্স ভাল্‌কোভস্কি! মনে হোল এমন অপ্রত্যাশিতভাবে আমার সঙ্গে দেখা হ'য়ে যাওয়ায় তিনি খুব খুশি হোলেন না। প্রথমটা এমন ভাব দেখালেন যেন আমায় চিনতেই পারেননি, কিন্তু পর মুহূর্ত্তে মুখখানা তাঁর বদলে গেল। রাগ আর বিরক্তির ভাব স'রে গিয়ে প্রসন্নতা উপ্‌ছে

উঠলো। আনন্দের আতিশয্যে হাত দু'টি বাড়িয়ে দিলেন আমার দিকে।

'আরে আপনি! এই মাত্তর ভাবছিলাম, এ যাত্রায় বেঁচে গেলাম। যা সিঁড়ি! গাল দিচ্ছিলাম শুনেছেন বোধ হয়?'

এই ব'লে ফেটে প'ড়লেন প্রাণখোলা হাসিতে। কিন্তু হঠাৎ আবার মুখটা গাম্ভীর্য্য আর উদ্বেগে থম্‌থমে হ'য়ে প'ড়লো।

'এ্যালোশাটা কি! নাটাল্যা নিকোলেভ্‌নাকে কিনা এনে তুললে এমন একটা বিচ্ছিরী জায়গায়!' বললেন তিনি মাথা নেড়ে। 'এইসব ছোটখাটো ব্যাপার থেকেই লোকের স্বভাব বোঝা যায়। এ্যালোশার জন্যে আমি সর্ব্বদা চিন্তিত। অতি গোব্যাচারা, দরাজ অন্তঃকরণের ছেলে, এই দেখুননা কেন,—যাকে তুই এত ভালোবাসিস তাকেই কিনা এই অন্ধকূপে এনে রেখেছিস্! শুনেছি অনেকদিন নাকি নাটাশার তেমন খাওয়াও জোটেনা।' শেষটুকু তিনি ব'ললেন ফিস্‌ফিসিয়ে দরজার ঘন্টী-হাতল খুঁজতে খুঁজতে। 'এ্যালোশার কথা ভেবে মাথা আমার ঘুরে ওঠে, আরও ঘোরে যখন চিন্তা করি এ্যানা নিকোলেভ্‌নার বিষয় বিশেষ ক'রে ও যখন তার বৌ...'

কথার মাঝে যে নাটাশার নামে ভুল ক'রলেন সে খেয়াল প্রিন্সের হোল না। ঘন্টার হাতল খুঁজে না পাওয়ায় ভারী বিরক্ত হ'য়ে প'ড়েছেন তিনি। কিন্তু দরজায় কোন ঘন্টা ছিলনা।

দরজার হাতলটা ধ'রেই আমি ঝাঁকাতে লাগলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্যস্ত-সমস্ত হ'য়ে মাভ্‌রা এসে খুলে দিল। অপরিসর প্রবেশপথের একপাশে কাঠের পার্টিশান দিয়ে রান্নাঘর করা হ'য়েছে। খোলা দরজা দিয়ে দেখা গেল পাক-প্রস্তুতির অনেক কিছুই। সবই যেন আজ অন্য দিনের মত নয়—ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে। উনুনে আঁচ রয়েছে, টেবিলে নতুন কয়েকটা বাসন-কোসন সাজানো। দেখে শুনে মনে হোল আমাদের আগমন আজ প্রত্যাশিত। মাভ্‌রা ছুটে এলো আমাদের কোট খোলার সহায়তায়।

'এ্যালোশা আছে এখানে?' আমি তাকে জিজ্ঞাসা ক'রলাম।

'না আসেনি' ফিস্‌ফিস্ করে সে ব'ললে রহস্যময়ভাবে। আমরা ভেতরে গেলাম নাটাশার কাছে। তার ঘরে বিশেষ আয়োজনের কোন লক্ষণ দেখলাম না। সবকিছুই প্রতিদিনকার মত। তবে ওর ঘর চিরদিনই এমন সুন্দর ক'রে সাজানো গোছানো থাকে যে নতুন ক'রে কিছু করার প্রয়োজন হয় না। দরজার দিকে মুখ ক'রে নাটাশা আমাদের অভ্যর্থনা ক'রলে। আমি অবাক হ'য়ে গেলাম ওর মুখের বিশীর্ণ দৃষ্টিতে, বিস্মিত হলাম তার অবর্ণনীয় বর্ণহীনতায়, যদিও মুহূর্ত্তের জন্যে পাণ্ডুর গালদু'টিতে এক ঝলক্ রঙ খেলে গেল। ব্যস্ত হ'য়ে হাতখানি এগিয়ে দিল প্রিন্সের দিকে নিঃশব্দে। চঞ্চল ও বিব্রত হওয়ার ভাব প্রত্যক্ষ হ'য়ে উঠলো। এমনকি আমার দিকেও তাকালে না। নীরবে দাঁড়িয়ে রইলাম অপেক্ষায়।

'আমি তাহোলে এলাম!' প্রিন্স ব'ললেন বন্ধুত্বের ভঙ্গীতে। 'এই তো ঘণ্টাকয়েক হোল ফিরছি। এ ক'দিন তোমায় ভুলতে পারিনি' (সস্নেহে ওর হাতে চুমু খেলেন) 'কতনা ভেবেছি তোমার কথা। কত ভেবেছি তোমায় ব'লবো...যাক্ আজ প্রাণ খুলে গল্প করা যাবে! প্রথমতঃ আমার গবেট ছেলেটি আজ এখনও অধিষ্ঠান হননি...'

'এক মিনিটের জন্যে আমায় মাপ ক'রতে হোল প্রিন্স!' নাটাশা বাধা দিলে লজ্জায় আড়ষ্ট হ'য়ে,—'আইভ্যান পেট্রোভিচের সঙ্গে একটা কথা আছে। এসো ভান্যা...'

আমার হাত ধ'রে টানতে টানতে পর্দ্দার ওপারে নিয়ে গেল।

'ভান্যা!' ব'ললে ফিস্‌ফিস্ ক'রে, ঘরের দূরতম কোণে নিয়ে গিয়ে, 'তুমি আমায় ক্ষমা কর।'

'চুপ, আস্তে! কি বলছো তুমি?'

'না, না ভান্যা, তুমি আমায় অনেক ক্ষমা ক'রেছো, অনেক, অনেকবার। ধৈর্য্যেরও একটা সীমা আছে। জানি কোনদিনও তুমি আমার চিন্তা ছাড়তে পারবে না। কিন্তু আমি কি অকৃতজ্ঞ। কাল আমি তোমায় অবহেলা ক'রেছি, পরশুও ক'রেছি, কি স্বার্থপর আমি! উঃ কি নিষ্ঠুর!...'

হঠাৎ কান্নায় ফেটে প'ড়লো। মুখখানা চেপে ধরলো আমার কাঁধের ওপর।

'ছিঃ চুপ কর নাটাশা!' তাড়াতাড়ি ওকে শান্ত করার চেষ্টা করলাম। 'সারারাত অসুস্থ ছিলাম এখনও ভালো ক'রে দাঁড়াতে পারছিনা, তাই কাল আসিনি, আজও না। আর তুমি হয়তো ভাবলে আমি রাগ ক'রেছি। লক্ষ্মীটি তুমি কি ভাবো আমি বুঝিনা তোমার মনে কি ঝড় চলেছে?'

'তবে, তবে তুমি আমায় ক্ষমা করেছো'—ও ব'ললে চোখের জলে হাসি তুলে, সজোরে আমার হাতখানা চেপে ধ'রে। 'বাকিটুকু পরে ব'লবো। অনেক, অনেক কথা আছে ভান্না। চল এখন ওঁর কাছে যাই···'

'এসো শিগ্‌গির হঠাৎ ওভাবে ওঁকে ছেড়ে আসা ঠিক হয়নি...'

'দাঁড়াওনা, এখনই টের পাবে ব্যাপার কি হয়' চুপিচুপি আমায় ব'ললে 'বুঝতে আমার বাকি নেই, সব টের পেয়েছি। ওঁরই সব কারসাজি। আজই সন্ধ্যায় অনেক কিছু মীমাংসা হ'য়ে যাবে। এসো ভান্না!'

বুঝলাম না মীমাংসাটা কিসের। প্রশ্ন করারও সময় ছিল না। নাটাশা প্রিন্সের কাছে এসে উপস্থিত হোল গভীর প্রশান্তি নিয়ে। তিনি তখনও দাঁড়িয়ে ছিলেন টুপি হাতে। নাটাশা রসিকতার সুরে ক্ষমা প্রার্থনা ক'রলে, তাঁর হাত থেকে টুপিটা নিলে, তাঁকে একখানা চেয়ার এগিয়ে দিলে। ছোট্ট টেবিলখানা ঘিরে আমরা তিনজন বসলাম।

'আমার গবেট ছেলেকে দিয়েই শুরু ক'রছি' প্রিন্স ব'লতে লাগলেন। 'মুহূর্তের জন্যে তাকে দেখলাম, তাও রাস্তায়, যখন সে গাড়ীতে উঠছিল কাউন্টেসের বাড়ীতে যাবার জন্যে। ব'ললে বিশ্বাস ক'রবে না এত ব্যস্ত যে চারদিন আমি এখানে ছিলাম না, আমার সঙ্গে একবার দেখা করবারও তর্ সইলো না। দোষ আমারই নাটাল্যা নিকোলেভ্‌না যে ও এখানে এলো না, আমরাই আগে এসে হাজির। আমি এ সুযোগ হারালাম না। আজ আর কাউন্টেসের ওখানে যেতে পারলাম না ব'লে ওর হাত দিয়ে খবর পাঠালাম। তবে দু'এক মিনিটের মধ্যে ও এসে অধিষ্ঠান হোচ্ছে।'

'আপনাকে কি ও আজ আসবে বলেছে?' জিজ্ঞাসা ক'রলে নাটাশা প্রিন্সের দিকে অনাবিল দৃষ্টিতে চেয়ে।

'নইলে সে যেন আর আসতো না! কি ক'রে জিজ্ঞাসা করলে!' প্রিন্স ব'লে উঠলেন, ওর দিকে সবিস্ময়ে তাকিয়ে। মনে হোচ্ছে তুমি ওর ওপর রাগ ক'রেছো। ঠিকই তো! ও-ই কোথায় আসবে সবার আগে না আসছে শেষে! তবে আবারও বলছি সেটা আমারই দোষ। ওর ওপর রেগো না। ও নেহাৎ চঞ্চল, বুদ্ধিহীন। ওর হয়ে ওকালতি করছি না, তবে কতকগুলো বিশেষ কারণে কাউন্টেস এবং অন্যান্য আত্মীয়-কুটুম্বদের ত্যাগ করা ওর পক্ষে যুক্তিসঙ্গত হবে না, বরং তাঁদের সঙ্গে যতদূর সম্ভব যোগাযোগ রাখাই উচিৎ। আজকাল যখন ও তোমায় ছেড়ে নড়ে না, আশা করি পৃথিবীর সবকিছুই যখন ভুলেছে তখন যদি আমার কোন কাজে দু'এক ঘণ্টার জন্যে, অবশ্য তার বেশী কখনই হবে না, ওকে একটু যেতে হয় ওর ওপর রাগ ক'রো না। বলতে কি সেদিনকার সেই সন্ধ্যার পর থেকে একবারও সে প্রিন্সেস'এর সঙ্গে দেখা করে নি, এবং আমিও বিরক্ত হ'য়ে উঠছি যে আজও ওকে জিজ্ঞাসা করার ফুরসৎ পেলাম না!...

নাটাশার দিকে তাকালাম। প্রিন্স ভালকোভস্কির কথা ও শুনছিল ঈষৎ ব্যঙ্গের হাসি নিয়ে। অবশ্য প্রিন্সের কথা এত সরল ও স্বাভাবিক যে তাঁকে সন্দেহ করা অসম্ভব মনে হোল।

'তবে সত্যিই কি আপনি জানেন না যে এ ক'দিন ও আমার কাছে মোটেই ঘেঁষেনি?' প্রশ্ন ক'রলে নাটাশা শান্ত বিনীত সুরে, যেন অতি সাধারণ কোন কথা ও ব'লছে।

'কি? একবারও এখানে আসে নি? সে কি! কি তুমি ব'লছো!' প্রিন্স ব'লে উঠলেন বিপুল বিস্ময়ের ভাব দেখিয়ে।

'গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় আপনি আমার এখানে ছিলেন অনেকক্ষণ। পরদিন সকালে আধঘণ্টার জন্যে ও

একবার এসেছিল, তারপর থেকে আর ওকে দেখিনি।'

'বলো কি!' (ক্রমশঃই তিনি বিস্ময়ের ভাব দেখালেন) 'ভেবেছিলাম তোমায় ছেড়ে ও নড়বে না। কিছু মনে করো না, ভাবী অদ্ভুত ঠেকছে...বিশ্বাসের অতীত বলে মনে হচ্ছে।'

'কিন্তু তবু সত্য, আর আমি তার জন্যে দুঃখিতও বটে। ভাবছিলাম আপনার কাছে যাবো। আপনার কাছে জানবো ও কোথায়।'

'যাক্ ও এখনই এখানে আসছে। কিন্তু তুমি যা ব'ললে তাতে এত অবাক হোয়েছি যে···ব'লতে কি ওর যে কোন স্বভাবের জন্যেই আমি প্রস্তুত, তবে এটা, এটা!'

'কিন্তু এতে আপনি অবাক হচ্ছেন কি ব'লে! আমি তো ভাবছি আপনি আগে থেকেই জানতেন যে এমনটি হবে।'

'জানতাম! আমি? কিন্তু বিশ্বাস কর নাটাল্যা নিকোলেভ্না আজ শুধু এক মুহূর্তের জন্যে আমি ওকে দেখেছি, আর কাউকে ওর কথা জিজ্ঞাসাও করিনি। কেন যে তুমি আমায় বিশ্বাস ক'রছো না বুঝতে পারছি না,' তিনি ব'লতে লাগলেন আমাদের দু'জনকে বিশ্লেষণ ক'রে দেখতে দেখতে।

'ছিঃ ওকথা মুখেও আনবেন না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আপনি যা বলছেন তাই ঠিক।' নাটাশা বললে এবং হেসেও উঠলো প্রিন্স ভাল্কোভস্কির মুখের ওপরই। তিনি যেন কিছু সঙ্কুচিত হ'য়ে প'ড়লেন।

'তাই বা কি ক'রে বলা যায়!' ব'ললেন অপ্রতিভভাবে।

'কেন, এ তো সোজা কথা। জানেনই তো কি আত্ম-ভোলা মানুষ ও। আর এখন অবাধ স্বাধীনতা পেয়েছে, তাই হয়তো ভেসে গেছে।'

'কিন্তু ওভাবে ভেসে যাওয়াটা সম্ভব নয়। নিশ্চয়ই এর পেছনে কিছু আছে, আসুক ও, এখনই জিজ্ঞাসা করছি। কিন্তু সবচেয়ে অবাক হচ্ছি তুমি আমাকে যেন এর জন্যে কিছু দায়ী করছো, অথচ আমি এখানে ছিলামই না। দেখছি ওর ওপর খুব চটেছো, অবশ্য তা' অকারণ নয়। রাগবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে, আর আমি ব্যাচারা প্রথম এসেছি তাই আমার ওপরই ঝাল ঝাড়ছো,—এই তো ব্যাপার, তাই না?' বলতে লাগলেন সরোষ পরিহাসে আমার দিকে ফিরে।

নাটাশা লজ্জায় লাল হয়ে উঠলো।

'ঠিক বলেছো নাটাল্যা নিকোলেভ্না'—প্রিন্স তাঁর কথার জের টেনে চলেন আভিজাত্যের সুরে,—'দোষ আমারই, দোষ এই কারণে যে তোমার সঙ্গে পরিচয় হবার পরদিনই আমি চলে গেছি। তাই তোমার মধ্যে যে সন্দিগ্ধতা দেখেছি তার ফলে ইতিমধ্যেই আমার সম্বন্ধে তোমার ধারণা পাল্টে গেছে—অবশ্য এতে ঘটনাও কিছুটা সহায়তা করেছে। আমি যদি চলে না যেতাম, আমায় ভালো করে চিনতে, আর এ্যালোশাও আমার অবাধ্য হ'য়ে এমন ছন্নছাড়া হয়ে উঠতো না। যাক্ আজ সন্ধ্যায় ও এলে ওকে কি বলি নিজে শুনো।'

'অর্থাৎ আবার আপনি ওর মন বিষিয়ে দেবেন যাতে ও আমায় গলগ্রহ ভাবে। তবে এতে যে আমার কোন উপকার হবে না সেটা বোঝবার মত শক্তি আপনার নেই।'

'তুমি আমায় অপমান করছো নাটাল্যা নিকোলেভ্না। তুমি কি বলতে চাও আমি ইচ্ছে করেই ওর মন বিষিয়ে দিতে চাই? সেই ইঙ্গিতই কি তুমি করছো না?'

'না, যখন পারি, যার সঙ্গেই কথা বলি হেঁয়ালী আমি করি না,' জবাব দিলে নাটাশা। 'বরং চেষ্টা করি খোলাখুলি বলতে যতদূর সম্ভব। আজ সন্ধ্যায় হয়তো আপনার সে ধারণা হবে। আপনাকে অপমান করার কোন ইচ্ছেই আমার নেই, আর কেনই বা থাকবে। জানি আমার কথায় আপনি মনে কিছু করবেন না। সে বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত, কারণ আপনার আমার সম্পর্ক সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ সচেতন, সে সম্পর্কে গুরুত্ব আপনি দিতে পারেন না, পারেন কি? তবে যদি আমি সত্যিই কোন অসৌজন্য প্রকাশ করে থাকি

তার জন্তে ক্ষমা চাইতে প্রস্তুত, আতিথ্যের দিক থেকে আমার যেন কোন ত্রুটী না থাকে।'

নাটাশার কথাগুলির মধ্যে লঘু এবং পরিহাসের সুর ছিল, ঠোঁটে ছিল হাসির আভাষ। তবুও ওকে এত উত্তেজিত কোনদিন আমি দেখিনি। এতক্ষণে শুধু বুঝলাম এই তিন দিন কি মর্ম্মজ্বালাই না ও সয়েছে। আমাকে যে হেঁয়ালী করে বললে—ও সব জানে, সব টের পেয়েছে—সে কথা মনে ক'রে ভয় পেলাম, তা প্রিন্সের উদ্দেশ্যেই বলা। ওঁর সম্বন্ধে ওর ধারণার পরিবর্ত্তন হোয়েছে, ওঁকে শত্রু বলেই ভাবে তা পরিষ্কার বুঝলাম। ও ধরে নিয়েছে এ্যালোশার সঙ্গে ওর এই মনোমালিন্য ওঁরই প্ররোচনায়, অবশ্য এ বিশ্বাসের যথেষ্ট কারণও রয়েছে। আমি রীতিমত শঙ্কিত হয়ে পড়লাম—যে কোন মুহূর্ত্তেই নাটাশা আর প্রিন্সের মধ্যে তুমুল কলহের অবতারণা হোতে পারে। ওর কথার মধ্যে উপহাসের সুর অতি সুস্পষ্ট, অনাবৃত। শেষ কথাগুলো, বিশেষ করে—সম্পর্কের গুরুত্ব, আতিথ্যের সৌজন্য—যেন ওঁকে জানানোর জন্তেই বলা যে ও স্পষ্ট করে বলতে জানে। কথাগুলো এত তীব্র, এত সুস্পষ্ট যে প্রিন্সের পক্ষে তা না বোঝা অসম্ভব। দেখলাম তাঁর মুখের ভাবান্তর; কিন্তু তিনি আত্মসংযমে পটু। তৎক্ষণাৎ এমন ভান করলেন যেন কথাগুলো শোনেন নি, তার তাৎপর্য্যও বোঝেন নি।

'হা ভগবান! তোমাকে দিয়ে আমি ক্ষমা চাইয়ে নেবো!' চেঁচিয়ে উঠলেন হাসতে হাসতে, 'তা আমি কখনও চাইনি। আর বলতে কি ওটা আমার নীতিবিরুদ্ধ, —মেয়ে মানুষ ক্ষমা চাইবে তা' আমি বরদাস্ত ক'রতে পারি না। প্রথম পরিচয়েই বুঝেছো আমি কেমন মানুষ, তাই হয়তো আমার একটা কথায় রাগ ক'রবে না, বিশেষ ক'রে সেটা যখন সব স্ত্রীলোকের পক্ষেই খাটে। আপনিও হয়তো আমার সঙ্গে একমত হবেন, ব'লতে লাগলেন সবিনয়ে আমার দিকে ফিরে। 'নারী চরিত্রের একটা বৈশিষ্ট্য আমি লক্ষ্য করেছি—তারা যখন কোন কারণে দোষ ক'রে ফেলে তখন সেই মুহূর্ত্তে তা' স্বীকার ক'রে ক্ষমা না চেয়ে বরং পরে হাজার প্রীতি-উচ্ছ্বাসে সে দোষ স্খালনকেই বেশী বাঞ্ছনীয় মনে করে। সুতরাং, ধরে নেওয়া গেল তুমি না হয় আমায় অপমান ক'রেছো, তাই বলে কিন্তু বোকার মত এখনই আমি তোমার ক্ষমার জন্তে লালায়িত হব না। বিলম্বেই আমার লাভ, তখন তুমি তোমার ভুল বুঝে আমার কাছে আসবে······শত প্রীতি-উচ্ছ্বাস নিয়ে। কল্পনায় দেখছি সেই মুহূর্ত্ত যখন অনুশোচনায় কত মধুর, কত পবিত্র, কত অনাবিলই না তুমি হ'য়ে উঠবে! অপূর্ব্ব সুন্দর তোমার সে রূপ! যাক্, ক্ষমার বদলে বরং বল আমি কি ক'রলে তুমি আমার আন্তরিকতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হও।'

লজ্জায় আরক্তিম হ'য়ে ওঠে নাটাশা। আমারও মনে হয় প্রিন্সের কথায় কেমন যেন একটা প্রগল্‌ভতা ফুটে ওঠে, অনুচিত রসিকতার সুর ধ্বনিত হয়।

'প্রমাণ ক'রতে চান আমার সঙ্গে আপনার ব্যবহারে কোন কপটতা নেই?' প্রশ্ন ক'রলে নাটাশা, তাঁর দিকে চেয়ে 'রণং দেহি' ভাব নিয়ে।

'হ্যাঁ'।

'তাই যদি হয়, যা বলি, করুন।'

'কথা দিচ্ছি, ক'রবো।'

'আকারে ইঙ্গিতে বা কিছু ব'লেই হোক এ্যালোশাকে আপনি আমার বিষয় নিয়ে বিব্রত ক'রতে পারবেন না, শুধু আজ নয়, কালও। আমায় ভোলার জন্তে ওকে আপনি ভৎর্সনা ক'রতে পারবেন না; কোন তিরস্কার নয়। আমি ওর সঙ্গে মিলতে চাই যেন কিছু হয়নি এইভাবে, যাতে ও কিছু বুঝতে না পারে। এই আমি চাই, কথা দিচ্ছেন আমার এ ইচ্ছা পালন ক'রবেন?'

'অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে,' জবাব দিলেন প্রিন্স ভাল্‌কোভস্কি, 'আর সেই সঙ্গে একথাও আমাকে জানাতে দাও সর্ব্বান্তঃকরণে যে এমন পরিস্থিতিতে এমন একটা সহজ ও স্বচ্ছদৃষ্টিসম্পন্ন মনোভাব আমি খুব কমই দেখেছি··· এ্যালোশা আসছে ব'লে মনে হোচ্ছে না?'

প্রবেশপথে পদশব্দ শোনা গেল। নাটাশা চমকে উঠলো এবং মনে হোল যেন কিছুর জন্তে নিজেকে প্রস্তুত

ক'রে নিল। প্রিন্স ভালকোভস্কি গম্ভীর মুখে ব'সে রইলেন অপেক্ষায় কি হয় না হয় তা দেখবার জন্যে। গভীর অভিনিবেশে নাটাশাকে তিনি লক্ষ্য করছিলেন। দরজা খুলে গেল এবং ঝড়ের মত ছুটে এলো এ্যালোশা।

আঠাশ

ঝড়ের মত ছুটে এলো এ্যালোশা,—হর্ষোদ্দীপ্ত, আনন্দোচ্ছল। পরিষ্কার বোঝা যায় এ চারদিন ও বেশ আনন্দেই কাটিয়েছে। মুখ দেখে মনে হয় কিছু যেন বোলতে চায়।

'এই যে আমি এসে গেছি!' ও চেঁচিয়ে উঠলো আমাদের সম্বোধন ক'রে, 'আমার আসার কথা সবার আগে কিন্তু—কিন্তু এখুনি তোমাদের ব'লবো সব, সব সব! বাবা, আজ সকালে তোমার সঙ্গে দু'টো কথা কইবার ফুরসৎ পাইনি। কত কথা তোমায় বলার আছে!' এই ব'লে আমার দিকে ফিরে আবার সুরু ক'রলে,—'ছাখো, বাবার যখন মেজাজ ভালো থাকে তখন তিনি এমনিভাবে তাঁর সামনে কথা বলতে দেন। তবে হ্যাঁ, অন্য সময় কিন্তু চলে না! তখন কি করেন জানো? আমার পুরো নাম ধ'রে ডাকেন, তবে আজ থেকে আমি চাই যাতে বাবার সবসময় মেজাজ ভালো থাকে, আর তার জন্যে আমি চেষ্টাও ক'রছি। গত চার দিনে আমি বদলে গেছি, বিলকুল আলাদা মানুষ হ'য়ে গেছি, বলছি সে কথা, আরে! এই যে নাটাশা! নাটাশা, কেমন আছো তুমি!' ব'লতে ব'লতে নাটাশার পাশে ব'সে এ্যালোশা ওর হাতে চুমু খেতে লাগলো লোলুপের মত। 'এ ক'দিন তোমার বিরহে কি জ্বালাই না সয়েছি! কিন্তু, কি ক'রবো উপায় ছিল না! তোমায় যেন রোগা দেখাচ্ছে! ইস্ কি ফ্যাকাশে হ'য়ে গেছো তুমি! ·····'

ব'লতে ব'লতে নাটাশার হাতদুটি ঢেকে দেয় অজস্র চুম্বনে। তাকায় তার দিকে সুন্দর চোখ তুলে,—সে দৃষ্টির যেন আর শেষ নেই। আমি চাইলাম নাটাশার দিকে। তার মুখ দেখে মনে হোল আমাদের দু'জনের চিন্তা একই খাতে বইছে, দু'জনেই ভাবছি: এ্যালোশা সম্পূর্ণ নিষ্পাপ। কি ক'রে আর ওর দোষ দেওয়া যায়? সহসা নাটাশার পাণ্ডুর গালে ছড়িয়ে প'ড়লো রক্তিম আভা, যেন হঠাৎ হৃৎপিণ্ডের সমস্ত রক্ত একসঙ্গে ছুটে এলো মাথায়। চোখ দু'টো জ্বলে উঠলো এবং গর্বিত দৃষ্টিতে তাকালো প্রিন্স ভালকোভস্কির পানে।

'কিন্তু কোথায়, কোথায়, এ ক'দিন তুমি ছিলে?' ব'ললে নাটাশা চাপা এবং ভাঙ্গা-ভাঙ্গা গলায়। দীর্ঘ এবং অসম শ্বাসপ্রশ্বাসে তার বক্ষ আন্দোলিত হ'য়ে উঠছে। হায় ভগবান, কত ভালোই না ও এ্যালোশাকে বাসে!

'হ্যাঁ, দোষ আমারই! দোষী জেনেই আজ আমি এসেছি। ক্যাটারিনা আমায় কাল ব'লেছে, আজও ব'লেছে যে এ অবহেলা কোন নারীই ক্ষমা করে না (ও জানে মঙ্গলবার এখানে যা যা ঘটেছিল; পরদিন আমি ওকে সব বলেছিলাম); কিন্তু আমি ওর সঙ্গে তর্ক করেছি, বলেছি—ক্ষমা করে এমন নারীও আছে, আর সে হোল নাটাশা। হয়তো তার সমকক্ষ আরও একজন আছে পৃথিবীতে, সে ক্যাটারিনা। আর আজ আমি জয়ের আশা নিয়েই এসেছি। তোমার মত নিষ্কলুষ নারী কখনও ক্ষমা না কোরে থাকতে পাবে? "ও আসেনি, নিশ্চয়ই তবে কিছুতে আটকে পড়েছে। এর মানে এই নয় যে ও আমাকে ভালোবাসে না!"—এই কথাই ভাববে আমার নাটাশা! তোমায় কি কেউ ভালো না বেসে থাকতে পারে! এও কি সম্ভব! আমার সমস্ত হৃদয় কেঁদে উঠছে তোমার জন্যে। তবুও দোষ আমারই। কিন্তু সব শুনলে তুমিই আমায় সমর্থন ক'রবে সবার আগে। এখুনি বলছি সব, তোমাদের সবার সামনে প্রাণের কথা খুলে বলবো, আর তাই আজ এসেছি, আজ তোমার কাছে ছুটে আসবো ভেবেছিলাম (এই তো আধ মিনিট হোল ছাড়া পেয়েছি)—তোমায় একটিবার শুধু চুমু খেতে। কিন্তু তাও পারিনি। ক্যাটারিনা আমায় জরুরী কাজে পাঠিয়েছিল। সেই যে বাবা, তুমি যখন আমায় গাড়ীতে দেখলে তার আগে। তখন আমি দ্বিতীয়বার ক্যাটারিনার কাছে যাচ্ছি দ্বিতীয় চিঠির পর। সারাদিন ওতে আমাতে চিঠি চালাচালি হোয়েছে। আইভ্যান পেট্রোভিচ,

তোমার চিঠি শুধু কাল রাত্তিরে পড়বার সময় পেয়েছি। যা তুমি লিখেছো. খাঁটি কথা। কিন্তু আমি কি ক'রবো ? আসা আমার পক্ষে নেহাৎ অসম্ভব ! তাই ভেবেছিলাম— কাল সন্ধ্যায় গিয়ে সব মিটমাট ক'রে দেবো, কারণ আজ তোমার কাছে না আসা অসম্ভব, নাটাশা।'

'কি চিঠির কথা বলছো ?' প্রশ্ন করলে নাটাশা।

'কাল ভান্না আমার ওখানে গিয়েছিল কিন্তু দেখা হয়নি। অবশ্য চিঠিতে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ ক'রে এসেছে তোমার কাছে না আসার জন্যে। ওর অভিযোগ সম্পূর্ণ সত্য ?'

নাটাশা আমার দিকে তাকালে।

'কিন্তু ক্যাটারিনার সঙ্গে সকাল থেকে রাত অবধি কাটাবার সময় পেলে আর...' প্রিন্স ভাল্‌কোভস্কি সুরু করলেন। কিন্তু শেষ ক'রতে পারলেন না।

'জানি, জানি তুমি কি ব'লবে,' বাধা দিলে এ্যালোশা। 'যদি ক্যাটারিনার কাছে যেতে পারি তবে তার চেয়ে দ্বিগুণ কারণ রয়েছে এখানে আসার। তুমি ঠিকই ব'লেছো বাবা, ওবে আমি বলি হাজার হাজার গুণ কারণ রয়েছে এখানে আসার। কিন্তু জীবনে এমন অনেক অদ্ভুত অপ্রত্যাশিত ঘটনা এসে যায় যা মানুষের সবকিছুকেই বিশৃঙ্খল ক'রে দেয়। আমারও ঠিক এমনি হয়েছে। বলতে কি গত চার দিনে আমি সম্পূর্ণ বদলে গেছি, আমূল পরিবর্তন হোয়েছে আমার। ভাবো একবার কি অবশ্যম্ভাবী ঘটনা।'

'আঃ, বলইনা কি হোয়েছিল তোমার ? দোহাই, আর আমাদের উদ্বিগ্ন ক'রে রেখো না !' ব'ললে নাটাশা ওর আবেগের উষ্ণতায় হেসে।

সত্যই ভারী অদ্ভুত এই এ্যালোশা। দ্রুত অনর্গল বকে যায়,—কথাগুলো ছিট্‌কে আসে বাঁধভাঙা জলের মত নিরবচ্ছিন্ন গতিতে। সবকিছুই ও শোনাতে চায়, ব'লতে চায়। একটানা কথার মাঝে নাটাশার হাত কিন্তু ঠিক ধরে থাকে। ফাঁকে ফাঁকে ঠোঁটের কাছে তুলে ধরে চুমু খায়, যেন চুমু খেয়ে ওর আশ মেটে না।

'সেইটাই তো আসল কথা—আমার কি হোয়েছে', এ্যালোশা ব'লতে থাকে। 'বন্ধু ! কত জিনিষ দেখলাম, কত কি করলাম, কতইনা মানুষকে চিনলাম ! সুরু করি ক্যাটারিনাকে দিয়ে ! কি সুন্দর সৃষ্টি এই ক্যাটারিনা ! অথচ এর আগে পর্য্যন্ত ওকে আমি চিনতে পারিনি। এমনকি সেদিন, সেই মঙ্গলবার যখন ওর কথা বলছিলাম, মনে আছে নাটাশা, কি আমার উৎসাহ ? কিন্তু তখনও ওকে এতটুকু বুঝিনি। শুধু আজ ও আমার কাছে স্বরূপ প্রকাশ ক'রেছে। এখন আমাদের দু'জনের মধ্যে প্রগাঢ় পরিচয়ের প্রয়োজন। আমি ওকে ডাকি কাট্যা ব'লে ও আমায় ডাকে এ্যালোশা। শোন তবে গোড়া থেকেই বলি। মঙ্গলবার এখানে যা ঘটেছিল তার কথা যখন ওকে বললাম, তোমার কথা যখন শোনালাম তখনও যা বললে তা যদি তুমি শুনতে নাটাশা ...হ্যাঁ ভালো কথা, মঙ্গলবার তোমার এখানে কি নির্বুদ্ধিতার পরিচয়ই না আমি দিয়েছি ! তুমি আমায় কত প্রেম আর উৎসাহভরে আহ্বান ক'রলে, কত কথা চ'লতে চাইলে, আর আমি কিনা রইলাম গম্ভীর হ'য়ে। উঃ, কি বোকা ! কি বোকা আমি ! বিশ্বাস করবে না, আমি চেয়েছিলাম দেখাতে যে আমি স্বামী হয়েছি, রীতিমত একজন সম্মানিত ভদ্রলোক। ছিঃ তুমি কি ভাবলে ! হয়তো হেসে বিদ্রূপও ক'রেছো।'

প্রিন্স ভাল্‌কোভস্কি বসে রয়েছেন নীরবে, তাকাচ্ছেন এ্যালোশার দিকে কেমন যেন বিজয়ীর মত, মুখে একটা শ্লেষের হাসি নিয়ে। মনে হোল তিনি বেশ খুশি হোয়েছেন—ছেলে তাঁর খামখেয়ালী আর নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিচ্ছে। সেদিন আগাগোড়া আমি তাঁকে ভালো ক'রে লক্ষ্য করলাম এবং এই সিদ্ধান্তেও পৌঁছলাম যে ছেলেকে তিনি আদৌ ভালোবাসেন না, হাজারই পিতৃস্নেহের তিনি বড়াই করুন।

'তোমার এখান থেকে গেলাম ক্যাটারিনার কাছে,' এ্যালোশার কথার স্রোত বয়ে চলে। 'আগেই বলেছি সেদিন সকালেই শুধু আমাদের সত্যকার পরিচয় হয়, আর কি অদ্ভুতভাবেই না তা' হয়···মনে পড়ে না কেমন ক'রে

সম্ভব হোয়েছিল·· দুটো অনুরাগের কথা, কয়েকটা অনুভূতি, মনের আদান-প্রদান, আব ওম্‌নি চিরদিনের মত মিতালী পাতিয়ে ফেললাম। নাটাশা, ও কে তোমার চেনা উচিত, বোঝা উচিত। কি সুন্দরই না ও কথা কইলে, তোমার ব্যাখ্যা ক'রে বোঝালে আমায়। জানালে তুমি কত বড় একটা মহাসম্পদ। ধীরে ধীরে ওর চিন্তা, ওর জীবনের দৃষ্টিভঙ্গী সব কিছুর কথাই বললে। অমন উৎসাহী মেয়ে হয় না! আমাদের কর্ত্তব্য, জীবনের আদর্শ, কিভাবে মানুষকে সেবা করবো, সবই আলোচনা ক'রলে এবং ছ'ঘণ্টা আলাপের পর আমাদের মতের মিল হোল। শেষটায় আজীবন বন্ধুত্বের শপথ গ্রহণ ক'রে ঠিক হোল দু'জনে আমরা একসঙ্গে কাজ ক'বে যাবো।'

'কিসের কাজ?' বিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন প্রিন্স।

'আমি এমন বদলে গেছি, বাবা, যে এসব শুনলে তুমি অবাক হ'য়ে যাবে। জানি এতে তোমাব মত নেই,' জয়ের উল্লাসে এ্যালোশা সায় দিলে। 'তোমরা হোলে বৈষয়িক মানুষ—তোমাদের কতকগুলো কঠিন নীতি আছে। অবশ্য সেগুলো আজকাল অচল। প্রত্যেকটি নতুন, প্রত্যেকটি তরুণ ও সজীব জিনিষকে তোমরা ভাখো ঘৃণা, অবিশ্বাস ও বিদ্রূপতার চোখে। কিন্তু, দিনকয়েক আগে যেমন জানতে আজ আমি সেরকম নই, সম্পূর্ণ আলাদা মানুষ! জগতের সবকিছুর আজ সম্মুখীন হই সাহসের সঙ্গে। যদি বুঝি আমার ধারণা সত্য তবে শেষ অবধি দেখবো আর যদি আমার পথ থেকে বিচ্যুত না হই তবে আমি খাঁটি মানুষ। তাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। এরপর তোমাদের যা খুশি তাই তোমরা বল। নিজের ওপর আমার বিশ্বাস আছে।'

'ওহো-হো!' ব্যঙ্গের সুরে চেঁচিয়ে উঠলেন প্রিন্স।

অস্বস্তিতে নাটাশা আমাদের দিকে চায়। এ্যালোশার জন্যে ওর ভারী ভয়। ও জানে অনেকক্ষেত্রে এ্যালোশা কথাবার্ত্তা ব'লতে গিয়ে বেকায়দায় পড়ে যায়। তাই ও চায় না যে আমাদের সামনে, বিশেষ ক'রে প্রিন্সের উপস্থিতিতে এ্যালোশা হাস্যাস্পদ হয়ে পড়ে।

'কি তুমি ব'লছো এ্যালোশা? মনে হোচ্ছে যেন দর্শনের কথা,' ব'ললে নাটাশা। 'কেউ হয়তো তোমার কাছে আউড়েছে...তার চেয়ে বরং বল এতদিন কি ক'রেছো।'

'বলছি শোন!' এ্যালোশা চেঁচিয়ে উঠলো। 'ক্যাটারিনার দূর সম্পর্কের দুই আত্মীয় আছে, খুড়তুতো ভাই গোছের, লেভিন্কা আর বোরিন্কা নামে। একজন ছাত্র, আর অপরজন হোল তরুণ। ক্যাটারিনার সঙ্গে ওদের দু'জনের ভাব আছে। ওরা একটু অসাধারণ গোছের মানুষ। কাউণ্টেসের ওখানে ওরা যায় না, আদর্শের খাতিরে। মানুষের ভাগ্য, জীবনেব আদর্শ, এইসব নিয়ে আলোচনা করতে করতে ক্যাটারিনা ওদেব নাম করে আমার কাছে, আর তখনই আমাকে একখানা চিঠি দেয় ওদের নামে। ব্যস্ আমি ওম্‌নি ওদের সঙ্গে আলাপ করতে ছুটলাম। সেইদিনই সন্ধ্যায় বেশ বন্ধুত্ব হ'য়ে গেল। ওখানে প্রায় জনবারো নানা ধরণের লোক ছিল। কেউ ছাত্র, কেউ অফিসার, কেউবা শিল্পী, একজন ছিল লেখক। ওবা সবাই তোমায় চেনে, আইভ্যান পেট্রোভিচ্। অর্থাৎ কিনা তোমার বই ওরা পড়েছে, তোমার কাছ থেকে ভবিষ্যতে অনেক কিছু আশা করে, তাই বললে। সবাই আমায় বেশ খাতির করলে। বললাম শিগ্‌গিরই বিয়ে করছি, ওরাও তাই আমায় ধ'রে নিলে বিবাহিত ব'লে। পাঁচতলায় ছাদের ওপরকার ঘরে ওরা থাকে। প্রায়ই ওরা একত্র হয়, বিশেষ ক'রে প্রতি বুধবার, লেভিন্কা আর বোরিন্কাদের ওখানে। সবাই ওরা তরুণ, সব শ্রেণীর মানুষের ওপর খুব দরদ আছে দেখলাম। অনেকক্ষণ আলাপ হোল, নানান বিষয় নিয়ে: আমাদের বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ, বিজ্ঞান, সাহিত্য। বেশ সাধারণ অথচ খোলাখুলি আলোচনা,··· স্কুলের একটি ছেলেও ওখানে আসে। তোমাদের দেখা উচিত কি সুন্দর ওরা সকলের প্রতি ব্যবহার করে, কত উদার চিত্তের মানুষ ওরা। ওদের মত লোক আর আমি এর আগে দেখিনি! এতদিন কোথায় ছিলাম? কি দেখেছি? কি আমার ধারণা হোয়েছে? একমাত্র তুমিই শুধু এ কথা আমায়

বলেছো নাটাশা। নাটাশা, ওদের সঙ্গে তোমার আলাপ হওয়া উচিত। ক্যাটারিনা ওদের জানে। ক্যাটারিনাকে ওরা খুব শ্রদ্ধা করে। ইতিমধ্যেই লেভিস্কা আর বোরিস্কাকে ক্যাটারিনা ব'লেছে যে সে যখন তার সম্পত্তি পাবে তখন তার থেকে সে দশ লক্ষ টাকা ওদের দেবে জনসাধারণের কল্যাণে।'

'তবে কি ধ'রে নেবো—লেভিস্কা, বোরিস্কা আর তাদের চ্যালাচামুণ্ডারা ওই দশ লক্ষ টাকার কর্তা হবে?' প্রশ্ন করলেন প্রিন্স ভাল্‌কোভস্কি।

'মিথ্যা, মিথ্যা! ওভাবে কথা বলা তোমার অন্যায় বাবা!' উত্তেজনায় চেঁচিয়ে উঠলো এ্যালোশা। তুমি কি ভাবছো বুঝেছি! ও টাকা নিয়ে আমরা অনেক আলোচনা করেছি। ঠিক হোয়েছে—সব আগে ওটা জনসাধারণের শিক্ষার্থ ব্যয় করা হবে…'

'বটে! তবে তো দেখছি ক্যাটারিনাকে আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি।' প্রিন্স মন্তব্য করেন অনেকটা যেন নিজের মনে, অবশ্য আগের মতই শ্লেষের হাসি হেসে। 'ওর সব খেয়ালের জন্যই প্রস্তুত ছিলাম, কিন্তু এটা…'

'নয় কেন?' এ্যালোশা বলে ফেলে চট্‌ ক'রে। 'অসম্ভব ভাবছো কেন? কারণ এটা তোমার সঙ্কীর্ণ ধারণার বাইরে, তাই না? এর আগে তো কেউ দশ লক্ষ টাকা দান করেনি, আর ও কিনা ক'রছে! তাই বুঝি? কিন্তু তাতে কি! ও যদি দশজনকে মেরে নিজে বড় হোতে না চায়। ওই দশ লক্ষ টাকাসঞ্চয় করা মানেই অপরকে বঞ্চিত করা। (এ সত্য আমি আজ বুঝেছি) ও চায় দেশের ও দশের সেবা করতে, বিলিয়ে দিতে ওর শেষ কপর্দক সাধারণের জন্যে। আমরা শুধু দান করার কথা কেতাবেই পড়ে এসেছি তাই যখন সে দান দাঁড়ায় দশ লক্ষ টাকায় তখন ভাবি ওর মধ্যে নিশ্চয়ই কোথাও ফাঁকি আছে! তুমি আমার দিকে অমনভাবে চেয়ে আছো কেন, বাবা? যেন আমি ভাঁড়, নির্ব্বোধ! নির্ব্বোধই যদি হই তাতেই বা কি? এ সম্বন্ধে ক্যাটারিনা কি ব'লেছে শুনবে নাটাশা?—"মস্তিষ্কই বড় কথা নয়, তাকে যে চালনা করে তারই প্রয়োজন বেশী। প্রয়োজন —চরিত্রের, অন্তঃকরণের, উদার মনোভাবের, প্রগতিশীল মতবাদের।" ওর চেয়েও ভালো বলে বেজমিগীন। বেজমিগীন হোল লেভিস্কা আর বোরিস্কার বন্ধু, আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বুদ্ধিমান, প্রতিভায় নেতৃস্থানীয়। সেদিন কথায় কথায় ও বললে,—"বোকা তার বোকামী বুঝতে পারলে আর বোকা থাকে না।" কত সত্য এ উক্তি! প্রতি মুহূর্ত্তেই ওর মুখ থেকে অমন দামী দামী কথা শোনা যায়।'

'প্রতিভার লক্ষণ নিশ্চয়ই,' মন্তব্য করেন প্রিন্স ভাল্‌কোভস্কি

'বিদ্রূপ ছাড়া তুমি আর কিছুই জানো না, বাবা। কিন্তু এ ধরণের কথা তোমার মুখ থেকে কখনও শুনিনি। তোমার বন্ধুদের কাছ থেকেও না। বরং উল্টো। তোমাদের মহলে তোমরা এ ভাব ঢাকবার চেষ্টা কর, নীচতার মধ্যে পথ হাঁতড়ে বেড়াও, সবাই চলে গড্ডালিকা প্রবাহে একই বাঁধা পথে—যেন তা সম্ভব; যেন তা আমরা যা বলি' আমরা যা ভাবি তার চেয়ে হাজার গুণে অসম্ভব নয়। আর তবুও কিনা লোকে বলে আমরা কল্পনাবিলাসী। কাল ওরা যা আমায় বললে তা যদি শুনতে…'

'কিন্তু, বল কি তোমাদের কথা, কি তোমাদের মতবাদ? এখনও অবধি কিছুই তো বুঝে উঠতে পারলাম না', বললে নাটাশা।

'যা কিছু প্রগতিশীল আমরা আছি তারই জন্যে। সংবাদপত্র স্বাধীনতা, শাসন সংস্কার, বিশ্বমানবিকতা, দেশের জননায়ক,—এই নিয়েই আমাদের আলোচনা ও সমালোচনা। তবে সবচেয়ে বড় কথা—আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছি আমাদের দলের প্রত্যেকেই প্রত্যেকের সঙ্গে সরল ব্যবহার করবে, নিঃসঙ্কোচে সবকথা খুলে বলবে। এই স্পষ্টবাদিতা ছাড়া আমাদের উদ্দেশ্য সফল হোতে পারে না। আর এরই জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করছে বেজমিগীন। ক্যাটারিনাকে এসব কথা বলেছিলাম সে বেজমিগীনের মতে বিশ্বাসী। সবাই আমরা শপথ করেছি বেজমিগীনের নেতৃত্বে আজীবন সংগ্রাম করে যাবো, কখনও লক্ষ্যভ্রষ্ট হব না, এগিয়ে যাবো কাজের পথে—যাই কেন না লোকে বলুক

আমাদের। বেজমিগীন বলে,—লোকের সম্মান পেতে হোলে নিজেকে সম্মান ক'রতে শেখো। ক্যাটারিনা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত।'

'কি ঘোর নির্ব্বুদ্ধিতা!' বিরক্তিতে চেঁচিয়ে উঠলেন প্রিন্স ভাল্‌কোভস্কি। 'কে এই বেজমিগীন? না, এভাবে এসব জিনিষ উপেক্ষা করা চলে না ·...'

'কি উপেক্ষা করা চলে না?' এ্যালোশা ব'ললে চট্ করে। 'শোন বাবা, তাহোলে বলি কেন এসব কথা তোমায় শোনাচ্ছি। ঠিক ক'রেছি তোমাকেও আমাদের দলে ভিড়িয়ে নেবো। হাসছো! জানি তুমি হাসবে! কিন্তু শোন, দিলখোলা মানুষ তুমি, তুমিই বুঝবে। তবে, ওদের তুমি কখনও দেখনি, না দেখে বিচার করা চলে না। ওখানে যাও, মেশো ওদের সঙ্গে, আলাপ কর—আমি বাজি রেখে বলতে পারি দেখলে শুনলে নিশ্চয়ই তুমি আমাদের দলে আসবে। আসল কথা হোল তোমার বদ্ধ সংস্কার পাল্টে তোমাকে তোমার দলের ধ্বংসের হাত থেকে যে কোরেই হোক আমাকে বাঁচাতেই হবে।'

এইসব অনর্থক প্রলাপ প্রিন্স ভাল্‌কোভস্কি শুনছিলেন নীরবে, উৎকট অবজ্ঞার সঙ্গে। মুখে তাঁর বিদ্বেষের ভাব। প্রকাশ্য বিতৃষ্ণায় নাটাশা তাঁকে লক্ষ্য করছিল। তা জেনেও তিনি না দেখার ভান করেন। তবে এ্যালোশার কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি হাসির তোড়ে ফেটে পড়লেন। কিন্তু সে হাসি সহজাত নয়, ছেলেকে আঘাত ও অপদস্থ করবার জন্যেই তার অবতারণা। এ্যালোশা অত্যন্ত মুষড়ে পড়ে। সারা মুখে তার বিমর্ষের ছাপ। তবুও সে ধৈর্য্য ধ'রে অপেক্ষা করে পিতার কৌতুক অবসানের।

'বাবা, কেন তুমি আমায় ঠাট্টা করছো?' সখেদে সুরু ক'রলে এ্যালোশা। 'আমি এসেছি খোলা মনে। তোমার মতে বোকার মত যদি কিছু বলে থাকি, শিখিয়ে দাও আরও ভালো ক'রে, তাই ব'লে হাসবে কেন? হাসবার কি আছে এতে? আর, আমি যে সত্যিই ভুল করছি তাই বা ধরে নিচ্ছ কিসে? না হয় আমি বোকা, ভুল করছি, কিন্তু যা করছি তা' সরল বিশ্বাসেই করছি। উচ্চ আদর্শ নিয়ে আজ আমি মেতে উঠেছি। সে আদর্শ ভুল হোতে পারে, কিন্তু তা' সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। আজ অবধি তুমি কিম্বা তোমার জগতের কেউ কোন আদর্শের কথাই আমায় বলেনি। তাই আমি যদি কোন কিছু গ্রহণ ক'রে থাকি সেটা যে মিথ্যা তা' প্রমাণ করে যুক্তিতর্ক দিয়ে, তার চেয়ে ভালো কিছুর হদিস দাও, আমি তোমায় মেনে নেবো। কিন্তু তা' না ক'রে শুধু বিদ্রূপ করো না, ওতে আমি বড় আঘাত পাই।'

অত্যন্ত অকপটে ও গাম্ভীর্য্য সহকারে এ্যালোশা কথাগুলি বলে। নাটাশা তাকায় ওর দিকে সানুকম্প দৃষ্টিতে। অবাক বিস্ময়ে প্রিন্স তাঁর ছেলের কথা শোনেন। পরক্ষণেই তাঁর সুর বদলে যায়।

'তোমায় আঘাত দিতে আমি চাইনি,' বললেন তিনি, 'বরং তোমার জন্যে আমি দুঃখিত। যে পথে তুমি যেতে চাচ্ছো তোমার মত গবেটের পক্ষে তা' পরিত্যাগ করাই সঙ্গত। সেই রকমই আমার মনে হয়। তাই না হেসে থাকতে পারি না, তবে তোমার মনে কোন ব্যথা দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়।'

'তবে কেন আমার এমন মনে হয়?' এ্যালোশা ব'ললে, একটু যেন রুষ্ট হয়েই। 'মনে হয় এতদিন তুমি আমার সব কাজেই বাধা দিয়ে এসেছো, ব্যঙ্গ আর বিদ্রূপ ক'রে। পিতার কর্ত্তব্য এ নয়। আমি যদি তোমার মত হোতাম তবে কখনই এমন অন্যায়ভাবে ব্যঙ্গ করতাম না। যাক, শোন—এই মুহূর্ত্তেই আমাদের মধ্যে একটা খোলাখুলি বোঝাপড়া হ'য়ে যাক, চিরদিনের মত, যাতে ভবিষ্যতে আর ভুল বোঝাবুঝি না হয়। আর···আমিও বলছি সব কথা, এখানে এসেই বুঝেছিলাম একটা কিছু অপ্রীতিকর হয়ে গেছে। এভাবে তোমাদের দেখবো আশা করিনি। ঠিক কিনা? তাই যদি হয়, সবচেয়ে ভালো প্রত্যেকেই তার মনের কথা খুলে বলুক। অকপট স্বীকারে কত অঘটনই না এড়ানো যায়!'

'বেশ, বল এ্যালোশা,' প্রিন্স ভাল্‌কোভস্কি বললেন। 'তোমার প্রস্তাব অতি যুক্তিসঙ্গত! হয়তো সুরুতেই এটা করা উচিত ছিল,'—শেষটুকু বললেন নাটাশার দিকে চেয়ে।

'খোলাখুলি বলছি বলে রাগ করো না,' সুরু করলে এ্যালোশা। 'তুমিই চেয়েছো। শোন, নাটাশার সঙ্গে আমার বিয়ের কথায় তুমি মত দিয়েছো। অবশ্য এর জন্যে তোমার মনের সঙ্গে অনেক যুদ্ধ ক'রতে হোয়েছে, আর আমরাও সুখী হোয়েছি। তোমার উদার চিত্তের প্রশংসা করি। কিন্তু কেনইবা এখন এমন মজা ক'রে আমায় ঠাট্টা ক'রছো, আড়েচাড়ে শোনাচ্ছো—আমি গবেট, স্বামী হবার যোগ্য নই। আরও দুঃখের—নাটাশার চোখে তুমি আমায় হেয় প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা ক'রছো। বহুদিন থেকেই লক্ষ্য করছি আমায় অপদস্থ ক'রে তুমি আনন্দ পাও। জানি না কেন তুমি প্রমাণ করতে চাও যে আমাদের বিয়েটা অসম্ভব এবং একটা বোকামী, একে আমরা অপরের যোগ্য নই। তোমার কাছে এটা যান একটা ঠাট্টা, আজগুবি কল্পনা, প্রহসন মাত্র। আজ ব'লে নয়, সেদিন সেই মঙ্গলবার সন্ধ্যায় এখান থেকে তোমার কাছে যখন গেলাম কতকগুলো অদ্ভুত কথা শোনালে,—অবাক হলাম, মনে বড় আঘাত পেলাম। তাছাড়া বুধবার দিনও যাবার সময় আমাদের সম্বন্ধ নিয়ে ইঙ্গিত করলে, ওর সম্পর্কে এমন কয়েকটা কথা বললে যা তোমার কাছ থেকে আশা করিনি। অবশ্য সেটাকে গালাগাল বলা যায় না, ওর প্রতি একটা নির্মম তাচ্ছিল্য, স্নেহলেশহীন অবজ্ঞা……ভাষায় তা' প্রকাশ করা যায় না, কিন্তু সুর সুস্পষ্ট, মর্মে মর্মে অনুভব করা যায়। বল, আমি ভুল বলছি। আমায় অভয় দাও. শান্ত কর আর...ওকেও, ওকেও তুমি আঘাত ক'রেছো। ঘরে ঢুকেই আমি তা' বুঝেছি'......'

গভীর আবেগ ও দৃঢ়তায় এ্যালোশা বলতে থাকে। নাটাশা ওর কথা শোনে, মনে মনে অনুভব করে বিজয়ের উল্লাস, উত্তেজনায় উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে মুখমণ্ডল। ওর কথার মাঝে মাঝে অনেকটা যেন নিজের মনেই বলে,—'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক।' বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যান প্রিন্স ভাল্‌কোভস্কি।

'অবশ্য তোমায় যা যা বলেছি সবকথা আমার মনে নেই।' শেষটায় জবাব দিলেন প্রিন্স—'তবে ভারী অবাক হচ্ছি তুমি আমার কথায় ওভাবে অর্থ করেছো। আমি সম্পূর্ণ প্রস্তুত—কিসে তোমার হয় বিশ্বাস হয় বল। এইমাত্র যদি হেসে থাকি তা' অত্যন্ত স্বাভাবিক। বলেইছি তো হাসির আড়ালে আমি আমার মনের কটুতাকে ঢাকতে চাই। যখনই ভাবি তুমি স্বামী হয়েছো, মনে হয় অবিশ্বাস্য, অসম্ভব—রাগ ক'রো না এমনকি হাস্যকর বলেও মনে হয়। হাসির জন্যে তুমি অনুযোগ কর কিন্তু কি ক'রবো তা' তোমারই ব্যবহারে। দোষ আমারও। হয়তো সম্প্রতি তোমার দিকে তেমন নজর দিতে পারিনি, আর তাই এতদিন পরে আজ বুঝলাম তোমার দৌড় কত দূর। নাটাল্যা নিকোলেভ্‌নার ভবিষ্যৎ ভেবে শিউরে উঠছি। অত্যন্ত তাড়াহুড়ো করেছি, ব্যাপারটা বুঝিনি—আজ দেখছি তোমাদের মধ্যে বিরাট বৈষম্য রয়েছে। প্রেমের মোহ দু'দিনের কিন্তু এ বৈষম্য চিরদিনের। ভালো ক'রে ভেবে দ্যাখো—নাটাল্যা নিকোলেভ্‌নাকে ধ্বংস ক'রবে, নিজেকেও নষ্ট করবে—এ একেবারে ধ্রুব সত্য। এক ঘণ্টা তো খুব লম্বাচওড়া বক্তৃতা দিলে—বিশ্বমানবিকতা, আদর্শের উচ্চতা, তোমার বন্ধুদের মহানুভবতা—অনেক কথাই শোনালে। কিন্তু জিজ্ঞাসা কর আইভ্যান পেট্রোভিচ্‌কে একটু আগেই নোংরা সিঁড়িতে ওঠবার সময় ওঁকে কি বলেছিলাম। আমি তো মন্দ, আমার কি মনে হয়েছিল জান? এই তো তোমার ভালোবাসা! এমন একটা জঘন্য স্থানে নাটাল্যা নিকোলেভ্‌নাকে রাখতে তোমার একটুও দ্বিধা হোল না! যদি তোমার সঙ্গতি না থাকে, কর্তব্য পালনের ক্ষমতা যদি না থাকে তবে তোমার স্বামী হবার কোন দাবী নেই, দায়িত্ব গ্রহণের কোন অধিকার নেই—এও কি বোঝ না! শুধু প্রেমটাই বড় কথা নয়, প্রেমের পরিচয় কার্য্যে, কিন্তু তোমার উদ্দেশ্য যেন—'খাও না খাও থাক আমার সঙ্গে!' এটা তো আর মনুষ্যত্ব নয়। বিশ্ব-প্রেম, বিশ্ব-সমস্যা নিয়ে তো খুব কপ্‌চালে আর তুমিই কিনা নিজে প্রেমের অবমাননা করলে! ধারণারও অতীত! না না. আমায় বাধা দিও না নাটাল্যা নিকোলেভ্‌না; শেষ ক'রতে দাও। এই মাত্তর তুমি বললে এ্যালোশা যে, একদিন তুমি উচ্চ আদর্শ নিয়েছিলে, অপবাদ দিলে আমাকে এবং আমার সমশ্রেণীর জীবদের

সঙ্কীর্ণ বলে, অথচ গত মঙ্গলবারের ব্যাপারের পর চার চারটে দিন একবার খোঁজও নিলেনা নাটাল্যার—যে তোমার কাছে পৃথিবীর সবচেয়ে মূল্যবান। নিজেই স্বীকার করলে, ক্যাটারিনার কাছে নাটাল্যাকে তুমি কত বড় ক'রেছো বলছো ও তোমায় এত ভালোবাসে যে তোমার সব ত্রুটি ক্ষমা করবে। কিন্তু এ ক্ষমা লাভের অধিকার কোথায় পেলে? একবারও মনে হোল না এতদিন ব্যাচারী নাটাল্যা কত মর্ম্মপীড়া, কত সন্দেহ, কত অবিশ্বাসের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে? নতুন মতবাদে দীক্ষিত হোয়েছো বলেই কি ভাবো তোমার প্রথম কর্ত্তব্যে অবহেলা করবার অধিকার পেয়েছো? মাপ কর নাটাল্যা। আর আমার কথা রাখতে পারছি না, বলতে হচ্ছে সব। বুঝতেই পারছো আমার প্রতিজ্ঞার চেয়ে বর্ত্তমান পরিস্থিতি অনেক গুরুতর…জানো এ্যালোশা, এ চার দিন তুমি ওকে কত সুখীই না করতে পারতে, কিন্তু তার বদলে দেখলাম এসে ওর এই দুরবস্থা, মনঃকষ্ট! একদিকে তোমার এই ব্যবহার আর অন্যদিকে শুধু বড় বড় কথা—কথা, কথা, আর কথা…ঠিক কিনা বল? দোষ সম্পূর্ণ তোমার, আমায় অনুযোগ কর কিসে?'

প্রিন্স ভাল্‌কোভস্কির কথা শেষ হোল! বক্তৃতার আবেগে এতই বিহ্বল তিনি যে নিজের জয়োল্লাস গোপন রাখতে পারলেন না আমাদের কাছ থেকে। নাটাশার দুঃখের কথা শুনে এ্যালোশা তার দিকে চাইলে ব্যথাতুর উদ্বেগে। নাটাশা কিন্তু তখন স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেছে।

'থাক এ্যালোশা, দুঃখ করো না'; বললে সে—'তোমার চেয়ে অপরের দোষই বেশী! বোসো, শোন তোমার বাবাকে আমার কি বলার আছে; আর নয়, এ পালা শেষ ক'রে দেওয়ার সময় এসেছে!'

'বল, তোমার কি বলবার আছে নাটাল্যা নিকো-লেভ্‌না!' প্রিন্স বললেন। 'আমার বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি, দু'ঘণ্টা ধ'রে এইসব হেঁয়ালী শুনছি। রীতিমত অসহ্য হয়েছে, আর বলতে কি এখানে এসে এমন অভ্যর্থনা পাবো এটা আশা করিনি।'

'করেননি তার কারণ হয়তো ভেবেছিলেন কথার ছটায় আমাদের ভুলিয়ে দেবেন আর আমরাও আপনার গোপন অভিসন্ধির কোন হদিস পাবো না। কি আর আপনাকে বলবার আছে?' সবই তো নিজে জানেন, বোঝেনও। এ্যালোশা ঠিকই বলেছে। আপনার প্রথম মতলব আমাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো। গেল মঙ্গল-বার থেকে এখানে কি কি ঘটবে সব আপনি মনে মনে জানতেন, আর সেই আশাতে বসেছিলেন। ভেতরে ভেতরে আমাকে এবং আমাদের এই বিয়েকে আমল দেন নি। শুধু একটু খেলা করছিলেন; কৌতুক করছিলেন আমাদের সঙ্গে, অথচ আপনার অভিসন্ধি অনুযায়ী কাজ ঠিক করে যাচ্ছিলেন। আপনার তরফে আপনি নিরাপদ। এ নিয়ে এ্যালোশা যদি আপনাকে দু'কথা শুনিয়ে থাকে, কিছু অন্যায় করেনি। এ্যালোশাকে ভৎ'সনা ক'রে বরং আপনার আনন্দিত হওয়াই উচিত কারণ এ বিষয়ে বিন্দুবিসর্গ না টের পেয়ে সে আপনার আশানুরূপ কাজই করেছে, এমন কি হয়ত কিছু বেশীই করেছে।'

বিস্ময়ে পাষাণ হয়ে গেলাম আমি। ভাবলাম আজ সন্ধ্যায় কিছু একটা বিপর্য্যয় না ঘটে যায়। নাটাশার এই নির্ম্মম অকপটতায়, অনাবৃত ঘৃণার স্বরে চমকে উঠলাম। তাহলে ও নিশ্চয়ই সব জানে এবং এ নাট্যের যবনিকাপাতের জন্যে কৃতসঙ্কল্প। হয়ত এতদিন অধীরভাবে প্রিন্সের আগমন প্রতীক্ষায় ছিল—তাঁর মুখের ওপর সবকথা শোনাবার আগ্রহে। প্রিন্স ভাল্‌কোভস্কিকে কিঞ্চিৎ বিবর্ণ দেখা গেল। এ্যালোশার মুখে চোখে ভীতি ও উৎকণ্ঠার ছাপ ফুটে উঠলো।

'ভেবে ত্যাখো কিসে আমায় অভিযুক্ত করলে,' প্রিন্স-বললেন, 'আর একটু ভেবে ত্যাখো তোমার কথাগুলো… কিছুই আমি এর বুঝলাম না।'

'ও-ও! বোঝবার প্রয়োজন মনে করেন না!' বললে নাটাশা। 'এমনকি এ্যালোশাও আপনাকে বুঝেছে ঠিক আমারই মত ক'রে, আর এর জন্যে আমাদের পূর্ব্বাহ্নে কোন চুক্তি করার প্রয়োজন হয়নি। এমন কি দু'জনের দেখাও হয়নি! ও আপনাকে দেবতার মত বিশ্বাস করে ভক্তি করে। ওর মত লোকও বুঝেছে কি নীচ এবং ঘৃণিত

ছলনা আপনি আমাদের সঙ্গে করছেন। হয়ত ভেবেছিলেন ও বোকাসোকা মানুষ কিছুই টের পাবে না, তাই আর যথেষ্ট সতর্কতা ও ভণ্ডামীর প্রয়োজন অনুভব করেন নি। কিন্তু ওরও হৃদয় বলে একটা বস্তু আছে, আর তার কোমল ও অনুভূতিশীল দিকও আছে—সেখানে আপনার বাক্যবাণ ক্ষত করে দিয়েছে…'

'তোমার কথার এক বর্ণও বুঝছি না,' পুনর্বার জানালেন প্রিন্স, বিব্রতভাবে আমার দিকে ফিরে, যেন আমায় সাক্ষী মানতে চান। ক্রোধে উত্তপ্ত হয়ে পড়েছেন।

'তুমি বড় সন্দিগ্ধ চিত্তের, অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠেছো,' বলতে লাগলেন নাটাশাকে লক্ষ্য ক'রে। 'আসল কথা ক্যাটারিনার প্রতি ঈর্ষায় অন্ধ হয়ে তুমি সকলের দোষ দেখছো, বিশেষ ক'রে আমার…আর বলতে কি ভারী অদ্ভুত চরিত্র তোমার.. এ ধরণের ব্যাপারে আমি অভ্যস্ত নই। আমার ছেলের বিষয় না হলে এক মুহূর্তও আমি আর এখানে থাকতাম না। এখনও আশা ক'রে আছি, বুঝিয়ে বলবে কি সব ?'

'এখনও শোনবার স্পৃহা! অথচ সব জেনেও না বোঝার ভান করবেন। তাহোলে বলবো সব কথা, খুলে ?'

'আমি উদ্‌গ্রীব হয়ে আছি তার জন্যে।'

'বেশ, শুনুন তবে,' বললে নাটাশা। রাগে চোখ দু'টো ওর জ্বলে উঠলো। 'বলবো আপনাকে, সব বলবো!'

উনত্রিংশ

নাটাশা উঠে পড়লো। উত্তেজনাবশতঃ নিজের অজ্ঞাতসারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কথা বলতে লাগলো। কিছুক্ষণ শোনার পর প্রিন্স ভাল্‌কোভস্কিও উঠে দাঁড়ালেন সমস্ত দৃশ্যটা গুরুগম্ভীর।

'মঙ্গলবারের কথাটা মনে রাখবেন,' নাটাশা সুরু করলে। 'বলেছিলেন অর্থ আপনার চাইই—চিরাচরিত পথ অবলম্বন ক'রে সংসারে প্রতিষ্ঠা পেতে হোলে,—মনে আছে ?'

'মনে আছে'—

'আর সেই অর্থের লোভে, পাছে তা ফস্‌কে যায় আপনি মঙ্গলবার এখানে এসেছিলেন এবং আমাদের বিয়ের প্রস্তাব ক'রেছিলেন, ভেবেছিলেন এই পরিহাস করে আপনার অভিসন্ধি সফল করতে পারবেন।'

'নাটাশা!' আমি চেঁচিয়ে উঠলাম। 'কি বলছো ভেবে ভাখো!'

'পরিহাস! অভিসন্ধি!' প্রিন্স পুনরুক্তি করলেন, লাঞ্ছিত আভিজাত্যের নিশ্চল আক্রোশে'।

এ্যালোশা বসে থাকে বেদনায় বিদীর্ণ হয়ে, চেয়ে থাকে কিছুই না বুঝে।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বাধা দিও না আমায়। প্রতিজ্ঞা করেছি আজ সব বলবো,' নাটাশা বলতে লাগলো উত্তেজনায়। 'মনে রাখবেন এ্যালোশা আপনার বাধ্য নয়। ছ'মাস ধ'রে আপ্রাণ চেষ্টা করছেন আমার কাছ থেকে ওকে সরিয়ে রাখবার। কিন্তু কিছুতেই ওকে আয়ত্বে আনতে পারছেন না। ওদিকে সুযোগ বুঝি হারায়। এক মুহূর্তও আর নষ্ট করা চলে না। শেষটায় বড়লোকের মেয়ে, অর্থ, সবই যাবে ফস্‌কে। বিশেষ ক'রে তিরিশ লক্ষ টাকার যৌতুক হাতের মুঠোয় এসে বেরিয়ে যাবে। একে বন্ধ করবার একমাত্র পথ—কোন রকমে বড়লোকের মেয়েটাকে এ্যালোশার নজরে ধরিয়ে দেওয়া। ভাবলেন, যদি একবার ও মেয়েটার প্রেমে পড়ে যায় তাহোলে নিশ্চয়ই আমায় পরিত্যাগ করবে।'

'নাটাশা! নাটাশা! কি বলছো তুমি?' সভয়ে চেঁচিয়ে ওঠে এ্যালোশা।

'আর কাজেও আপনি তাই করলেন,' নাটাশা বলে চলে এ্যালোশার কাতরোক্তিতে কর্ণপাত না করে। 'কিন্তু —আবার সেই পুরোনো কাহিনী! সবই হয়তো ঠিক হয়ে যেতো, কিন্তু আবার আমি অন্তরায় হয়ে দাঁড়ালাম। তবে একমাত্র আশা আপনার ছিল। আপনার মত চতুর অভিজ্ঞ লোকের লক্ষ্য করতে একটুও দেরী হয় না—মাঝে মাঝে এ্যালোশা তার পুরোনো প্রেমে শ্রান্ত হয়ে পড়ে। আমাকে ওর একঘেয়ে লাগে, তাই আর অনেক দিন আসে না, আজকাল উপেক্ষা করতে সুরু করেছে—এসব

তথ্য আপনার নজর এড়ায় না। ভাবলেন এমনি করেই হয়তো একদিন ক্লান্ত হয়ে ও আমায় ত্যাগ করবে। কিন্তু হঠাৎ মঙ্গলবারে এ্যালোশার স্থির সঙ্কল্প আপনাকে ঘাবড়ে দিল। চিন্তিত হয়ে পড়লেন—তাইতো কি করা যায়!'

'না, না, না,—বরং উল্টো, ব্যাপারটা...'প্রিন্স নিজেকে বোঝাবার চেষ্টা করেন।

'জানি'—নাটাশার দৃঢ়তা আরো বেড়ে চলে, 'সেদিন সন্ধ্যায় আর কিছু ভেবে না পেয়ে ঠিক করলেন আমাদের বিয়েতে মৌখিক সম্মতি দিয়ে এ্যালোশাকে শান্ত করবেন। শুধু কথার কথা! কাজের বেলায় না হয় বিয়ের তারিখটা অনির্দ্দিষ্ট কাল অবধি পেছিয়ে দেওয়া যাবে! ওদিকে ওর মনে নতুন প্রেমের রেখাপাত হয়েছে—তাও জানেন। ফলে আপনার সব আশা-ভরসা গিয়ে পড়লো এই নতুন প্রেমের পরিণতির ওপর।'

'উপন্যাস, উপন্যাস,—এসব হোল নির্জ্জনে চিন্তা করা আর উপন্যাস পড়ার ফল,' প্রিন্স বিড়্‌বিড়্‌ করে বলে উঠলেন অনেকটা যেন নিজের মনেই।

'হাঁ, এই নতুন প্রেমের ওপরই: আপনার সব আশা-ভরসা,' নাটাশা আবার বললে। উত্তেজনার উষ্ণতায় ও উদ্দাম হয়ে উঠেছে। 'এই আপনার সুযোগ! মেয়েটিকে ভালো ক'রে না চিনে রূপে মুগ্ধ হয়ে এ্যালোশা তাকে ভালোবেসে ফেলে। তারপর সেদিন সন্ধ্যায় এ্যালোশা যখন তাকে জানায় যে তাকে ও ভালোবাসতে পারে না কারণ আর একটি মেয়ের প্রতি ওর প্রেম ও কর্ত্তব্য ওকে বাধা দিচ্ছে, তখন মেয়েটি হঠাৎ তার অন্তরের উদারতা দেখায়, তার প্রতিদ্বন্দ্বিনীর প্রতি অনুকম্পা ও দরদে উপছে পড়ে। এ্যালোশার মন টলে যায় তার মহানুভবতায়। আমার কাছে এলে তারই শুধু গল্প করে। তার মত একজন উদারচেতা নারীর কাছে যাবার লোভ সামলাতে পারে না। আর কিছু না হোক অন্ততঃ কৃতজ্ঞতার খাতিরেও যাওয়া উচিত! আর তাছাড়া, যাবে নাই বা কেন? এ্যালোশা জানে ওর পুরোনো প্রেমিকার আর কোন দুঃখ নেই, তার ভবিষ্যৎ নিরাপদ, সারা জীবন সে ওকে পাবে, অথচ এই নবপরিচিতা পাবে ক্ষণিকের সঙ্গ। নাটাশা নিশ্চয়ই কিছু মনে করবে না এতে, তেমন অকৃতজ্ঞ সে নয়। আর এমনি ক'রেই ধীরে ধীরে এ্যালোশা তার নাটাশার মুহূর্ত্ত হরণ করে নিলে, হরণ করে নিলে একদিন, দু'দিন, তিনদিন···আর ইত্যবসরে মেয়েটি নতুন রূপে ওর চোখে দেখা দিল। কত উদার কত প্রাণবন্ত! অথচ শিশুর মত সরল, অনেকটা ওরই মত। দু'জনে চিরবন্ধুত্বের বন্ধনে বাঁধা পড়লো। পাঁচ ছ' ঘণ্টার আলাপে নতুন অনুভূতিতে মেয়েটি ওর হৃদয় জয় করলো। আপনি ভাবলেন—একটা সময় আসবে যখন ও এই নতুন অনুভূতির সঙ্গে তুলনা করবে পুরনোর। পুরনোর মধ্যে আর কি আছে সেখানে সবই পরিচিত, গতানুগতিক, অধিকার আর দাবীর প্রশ্ন; সেখানে শুধু ঈর্ষা আর ভৎর্সনা; অভিমান আর চোখের জল··সেখানে ছেলেমানুষী আর চপলতার স্থান নেই, সেখানে ও শিশুর মত ব্যবহার পায়, সমকক্ষের মত নয়···আর সব চেয়ে মারাত্মক—সবই একঘেয়ে, বৈচিত্র নেই একটুও···'

উদ্গত অশ্রু আর বেদনায় কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে এলো নাটাশার। তবুও নিজেকে সে সংযত করে নিলো ক্ষণিকের জন্যে।

'আর তাছাড়া? কেন—সময়! ভাবলেন—নাটাশার সঙ্গে বিয়ের দিনতো এখনও স্থির হয় নি, অনেক সময় আছে—সবই বদলে যাবে···তারপর আপনার কথা, ইঙ্গিত, যুক্তি, বক্তৃতা···হয়তো তাই দিয়ে কোন রকমে এই নাছোড়বান্দা নাটাশার ওপর টেক্কা মারা যাবে। হয়তো তাকে বিকৃত ক'রে দেখানো যাবে···কি ক'রে তা বলার আবশ্যক নেই। তবে হয় আপনারই! এ্যালোশা! আমায় দোষ দিও না প্রিয়! ভেবো না আমি তোমার প্রেমের অমর্য্যাদা করছি। জানি তুমি এখনও আমায় ভালোবাসো, আর এও জানি হয়তো এই মুহূর্ত্তে আমার কথা তুমি বুঝবে না। এসব কথা বলা আমার অন্যায়, কিন্তু কি করবো আমি যে তোমায় ভালোবাসি—অনেক অনেক ভালোবাসি···তোমার প্রেমে আমি উন্মাদ!'

বলতে বলতে দু'হাতে মুখ ঢেকে চেয়ারে এলিয়ে পড়ে নাটাশা। শিশুর মত ফোঁপাতে থাকে। ভয়ে চীৎকার ক'রে এ্যালোশা ছুটে আসে ওর কাছে। ওর অশ্রুহীন ক্রন্দন সইতে পারে না এ্যালোশা।

মনে হোল নাটাশার ফোঁপানীতে প্রিন্স খুব সুবিধা পেলেন। ওর দীর্ঘ অভিযোগের তীব্রতা, তাঁর প্রতি ওর আক্রমণের প্রচণ্ডতা যা অন্ততঃ ভদ্রতার খাতিরে তাঁকে প্রতিবাদ ক'রতে হোত তা হয়তো এক্ষেত্রে ঈর্ষার উন্মাদনা, আহত প্রেমের প্রলাপ, এমনকি অসুস্থতার ফল ব'লেও উড়িয়ে দেওয়া চলবে। ওর প্রতি সহানুভূতি দেখানোই এখন সঙ্গত।

'শান্ত হও, দুঃখ করো না, নাটালা্যা নিকোলেভ্না,' প্রিন্স ওকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। 'এ তোমার পাগলামী, নিছক মনগড়া, নির্জনে থাকার ফল। এ্যালোশার ব্যবহারে তুমি অত্যন্ত চটেছো দেখছি। জানই তো ওর এক ফোঁটাও বুদ্ধি-সুদ্ধি নেই। তাছাড়া মঙ্গলবারের ব্যাপারটার ওপরই তুমি বেশী জোর দিচ্ছো, কিন্তু তাতে বরং ওর প্রেমের গভীরত্বই প্রমাণিত হচ্ছে, অথচ তুমি ধরে নিচ্ছো ঠিক উল্টো ··'

'থাক্ যথেষ্ট হয়েছে, আর আমাকে দগ্ধাবেন না!' চেঁচিয়ে উঠলো নাটাশা কাঁদতে কাঁদতে। 'সব আমি জানি, মন আমায় বলেছে অনেক দিন আগেই! আমাদের পুরনো ভালোবাসা আজ মরে গেছে—তা কি আমি বুঝি না ভেবেছেন?...এইখানে, এই ঘরে, একা...ও আমায় ছেড়ে গেল, ভুলে গেল···অনেক, অনেক ভেবেছি·· কি আর করবার আছে?...আমি তোমায় দোষ দিচ্ছি না, এ্যালোশা...কেন আর আপনি আমায় প্রতারণা করছেন? আমিও কি নিজেকে ঠকাবার চেষ্টা করিনি? কত, কতবার করেছি! ওর কথার প্রতিটি স্বর কি আমি শুনিনি? ওর মুখ, ওর চোখ—তাদের ভাষা কি আমি বুঝতে শিখিনি? সবশেষ; —প্রেমের সমাধি হয়ে গেছে···হায়! কি অভাগী আমি!'

ওর পাশে ব'সে এ্যালোশাও কেঁদে ফেলে।

'হাঁ, হাঁ, আমারই দোষ! আমিই এর জন্যে দায়ী!' ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলতে লাগলো এ্যালোশা।

'না, নিজেকে দোষ দিও না এ্যালোশা। এ আমাদের শত্রুদের কাজ·· এ ওঁদের কাজ...ওঁদের!'

'কিন্তু মাপ করতে হোল আমাকে,' প্রিন্স আর ধৈর্য্য রাখতে পারলেন না,—'কোন্ ভিত্তিতে সব দোষ তুমি আমার ঘাড়ে চাপাচ্ছো? সবই তোমার মনগড়া। তার কো কোন প্রমাণ নেই···'

'প্রমাণ নেই!' নাটাশা চেঁচিয়ে উঠলো, ইজি-চেয়ার থেকে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে, এর পরেও প্রমাণ চান! বিশ্বাসঘাতক! সেদিন বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এখানে আমার মধ্যে এ ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য থাকতে পারে না, আর কোন উদ্দেশ্য থাকতে পারে না! সেদিন এসেছিলেন ছেলেকে শান্ত করতে, তার বিবেকের দংশনকে প্রশমিত করতে যাতে নিরুদ্বেগে মুক্ত মন নিয়ে ক্যাটারিনার কাছে সে আত্মসমর্পণ করতে পারে। নইলে সে তো আমায় ভুলতো না, সে আপনার বিরুদ্ধাচরণ করতো, আর আপনিও তখন প্রতীক্ষায় ক্লান্ত। বলুন সত্যি কিনা?'

'স্বীকার করছি,' প্রিন্স বললেন স্নেহের হাসি নিয়ে— 'যদি তোমায় ঠকাবার চেষ্টা করে থাকি তবে তা' গোপন অভিসন্ধির জন্যে। তুমি দেখছি অত্যন্ত বুদ্ধিমতী··· তবে কিনা মানুষকে এমনিভাবে অপমান করার আগে তোমার প্রমাণ দেখানো উচিত।'

'প্রমাণ! প্রমাণ তো আপনার ব্যবহারে, ছেলেকে আমার কাছ থেকে সরিয়ে নেবার হীন প্রচেষ্টার মধ্যে! যে মানুষ তার নিজের ছেলেকে অর্থের লোভে এবং বড় একটা কর্ত্তব্যকে অবহেলা ক'রতে শেখায় তার আর মনুষ্যত্ব কোথায়! এইমাত্তর আমার বাসা আর সিঁড়ির নোংরামী নিয়ে বলছিলেন না? অথচ আপনিই ওর মাসহারা বন্ধ করে দিয়েছিলেন যাতে দারিদ্র্য আর অনাহারের জ্বালায় ও আমায় ছাড়তে বাধ্য হয়। এভাবে বাস করার জন্যে দায়ী আপনি, আর আপনিই কিনা এখন ওকে বকছেন! উঃ কি ভীষণ দু'মুখো মানুষ! সেদিন রাত্তিরে করুণা আপনার উথলে উঠলো, আমি যেন আপনার কত আপন! ভেবেছেন কি আমি টের পাইনি? তখনই বুঝেছি এসব আপনার চালাকী, ধাপ্পা, হীন

প্রতারণা, অপমানকর অশোভন প্রহসন...আমি আপনাকে চিনেছি, চিনেছি অনেকদিন আগেই। এ্যালোশা যখনই আপনার কাছ থেকে আসতো ওর মুখ দেখে ধরে নিতাম কি আপনি ওকে বলেছেন, কি ওর মাথায় ঢুকিয়েছেন। আমার চোখে ধুলো দেওয়া আপনার ক্ষমতা নয়! হয়তো আজ আবার অন্য অভিসন্ধি আছে; হয়তো চরম এখনও হয়নি। কিন্তু তাতেই বা কি! আপনি প্রতারণা করেছেন—সেইটাই বড় কথা। আর তা' আজ আমায় বলতে হোল আপনারই মুখের ওপর!'

'বলা শেষ হয়েছে? এই তোমার মোট প্রমাণ? কিন্তু তোমার মাথার ঠিক নেই, ভালো ক'রে ভেবে ছাখো: আমার মঙ্গলবারের প্রস্তাবকে তুমি প্রহসন বলতে পারো কিন্তু আমি তার নৈতিক বন্ধনে নিজেকে রীতিমত বাধ্য বলে মনে করি, আমার পক্ষে অত্যন্ত দায়িত্বহীনতার কাজ হবে'...

'কি রকম বাধ্য শুনি? আমার মত অবস্থার মেয়েকে অপমান করার কি অর্থ হয়? অসহায়, অভাগা, পিতৃপরিত্যক্তা নারী আমি! সমাজ-সংসার ছেড়ে চলে এসেছি! সামান্য সুবিধার জন্যে তার মত মেয়েকে এভাবে ব্যঙ্গ করা কি এমনই প্রয়োজন?'

'ভেবে দেখো নাটাল্যা নিকোলেভ্না নিজেকে তুমি কি অবস্থার মধ্যে ফেলছো। বারবার বলছো আমি তোমায় অপমান করেছি। কিন্তু এ ধরণের অপমান যে কত হীন ভেবেই পাই না কি ক'রে তুমি তা কল্পনা করতে পার, কি করেই বা তা মুখে আনতে পারো। নিশ্চয়ই এতে তুমি অভ্যস্ত নইলে এত সহজে কি করে তা ভাবো। তোমায় তিরস্কার করার আমার অধিকার আছে কারণ তুমি আমার ছেলেকে আমারই বিরুদ্ধে লাগিয়ে দিয়েছো। অবশ্য এই মুহূর্তে তোমার হয়ে আমার সঙ্গে ঝগড়া না করলেও ওর মন আর আমার ওপর নেই।'

'না বাবা, না,' এ্যালোশা বলে উঠলো, 'তোমার সঙ্গে আমি ঝগড়া করিনি তার কারণ আমি বিশ্বাসই করতে পারি না যে এতবড় একটা অপরাধে তুমি দোষী হোতে পার, ভাবতেই পারি না এমন অপমান সম্ভব!'

'শুনছো ওর কথা?' প্রিন্স বললেন নাটাশাকে লক্ষ্য করে।

'নাটাশা, এ আমারই দোষ! ওকে কিছু বলো না। তা' অন্যায় ও অনুচিত।'

'শুনলে ভান্যা? এরই মধ্যে ও আমার বিপক্ষে চলে গেছে,' নাটাশা বললে।

'যথেষ্ট হয়েছে!' প্রিন্স বললেন। 'এ অসহ্য দৃশ্যের যবনিকা টেনে দেওয়া উচিত। অসংযত ঈর্ষার এই অন্ধ ও অভদ্র উচ্ছ্বাসে তোমার চরিত্রের একটা নতুন দিক দেখতে পেলাম। যাক সময় থাকতে সতর্ক হওয়া যাবে। ব্যাপারটায় অত্যন্ত তাড়াহুড়ো করেছিলাম, অত্যন্ত হুড়োতাড়ায় সব হয়ে গেছে। তুমি এমন কি টেরও পাওনি যে আমায় অপমান করেছো, সেটা তোমার কাছে কিছুই নয়। অত্যন্ত তাড়াহুড়ো করেছি...অত্যন্ত তাড়াহুড়ো...অবশ্য আমার কথার নড়চড় না হওয়াই উচিত, কিন্তু···আমি বাপ, ছেলের সুখই আমার কাম্য···'

'নিজেই নিজের কথার খেলাপ করছেন!' নাটাশা চেঁচিয়ে উঠলো আত্মহারা হয়ে। 'এ সুযোগে আপনি খুশি। কিন্তু জেনে রাখুন—আজ নয়, দু'দিন আগেই ঠিক করেছি ওকে আমি ওর প্রতিজ্ঞা ফিরিয়ে দেবো, আর এখন সে কথা জানাচ্ছি আপনাদের সকলের সামনে। আমি ওকে ছেড়ে দিচ্ছি!'

'তার মানে, হয়তো আবার নতুন করে ওর মনে পুরনো চিন্তা জাগিয়ে তুলতে চাও, জাগিয়ে তুলতে চাও কর্তব্যবুদ্ধি, প্রতিজ্ঞাভঙ্গের অনুশোচনা, যাতে আবার ও ধরা দেয় তোমার বন্ধনে। তোমার তথ্য অনুযায়ী এই অর্থই দাঁড়ায়। কিন্তু যাক্—সময়ে সব বোঝা যাবে। তোমার মস্তিষ্কের স্থিরতার জন্যে অপেক্ষা করে রইলাম—তখন তোমার সঙ্গে বোঝাপড়া করা যাবে। আশা করি আমাদের সব সম্পর্ক যেন ঘুচে না যায়। আশা করি তুমি আমায় আরও ভালো ক'রে বুঝতে শেখো। ভেবেছিলাম তোমাদের নতুন পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে আমার কয়েকটা পরিকল্পনা আজ আমি তোমায় শোনাবো, তাতে তোমার বিশ্বাস হতো...কিন্তু থাক্, যথেষ্ট হয়েছে! আইভ্যান

পেট্রোভিচ্,' বলতে বলতে প্রিন্স আমার কাছে এগিয়ে এলেন। 'বরাবরই তোমার সঙ্গে ভালো করে আলাপ করবার ইচ্ছে আমার ছিল, আর এখন তার আরও বেশী প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। আশা করি আমার কথা বুঝেছো। দু'একদিনের মধ্যে আমি এসে তোমার সঙ্গে দেখা করবো অবশ্য তোমার যদি কোন আপত্তি না থাকে।'

হেঁট হয়ে সম্মতি জানালাম। আমারও মনে হোল ওঁর সঙ্গে পরিচিত হওয়া ছাড়া এখন আর উপায় নেই। উনি এসে আমার হাত চেপে ধরলেন, নীরবে নত হ'য়ে নাটাশাকে বিদায় জানালেন, তারপর বেরিয়ে গেলেন উদ্ধত সম্ভ্রমের ভঙ্গীতে।

[চলবে

ডস্টয়ভস্কি থেকে অনূদিত

'চিত্রবাণী'র আগামী সংখ্যাই শারদীয়া সংখ্যা
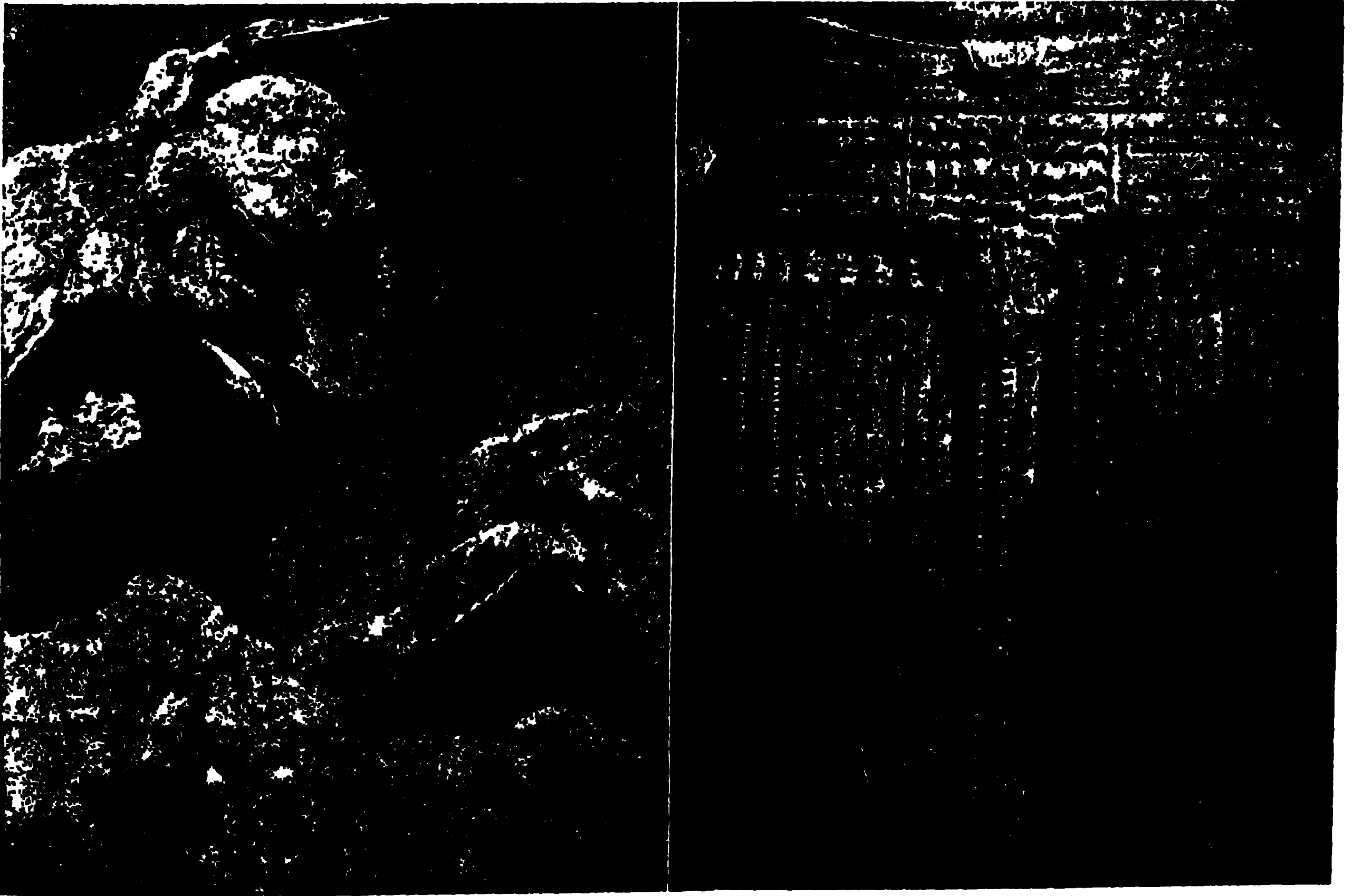
কোনারক : : ফোটো : জে আর সেন : সম্প্রতি অনুষ্ঠিত সংবাদ-আলোকচিত্র প্রদর্শনীতে পুরস্কারপ্রাপ্ত

আহরনী

শ্রাবণ-ভাদ্র, ১৩৫৭

ষ্টিরিয়োস্কোপিক ছবির ভবিষ্যৎ

আইভর মন্টেগু

মস্কোর কেন্দ্রস্থলেই হলো ষ্টিরিয়োস্কোপিক চলচ্চিত্রগৃহটি যেখানে পার্টিসানদের সর্ব্বদলীয় শান্তি সম্মেলন হয়েছিল সেই 'হল অফ কলাম্‌সে'র প্রায় বিপরীত দিকে। থিয়েটার স্কোয়ারের একটি কোনে এই বাড়ি টি, আর একটি দিকে আছে অপেরা আর ব্যালে প্রদর্শনের ক্ষেত্র 'বলশয় থিয়েটার'। মস্কোর অন্যান্য চলচ্চিত্রগৃহের মত মস্কো সিটি কাউন্সিলের 'কিনোফিকেশান বিভাগে'র নিয়ন্ত্রণাধীনে এটি পরিচালিত হয়। সোভিয়েট রাশিয়ার বাইরে অন্য কোথাও এই রকম নিয়মিত ষ্টিরিয়োস্কোপিক ছবি দেখাবার মত চিত্রগৃহ কিম্বা ব্যবস্থা নেই।

বাড়ীটি বেশ পুরোনো, ভেতরে আছে তিনটি ছোট ছোট প্রেক্ষাগৃহ : একটিতে দেখানো হয় সংবাদচিত্রসমূহ, দ্বিতীয়টিতে রঙীন্ কার্টুন ছবি আর অপরটিই ষ্টিরিয়োস্কোপিক ছবি দেখাবার জন্যে নির্দ্দিষ্ট। টিকিট কেনার বিভিন্ন কাউণ্টারগুলি একই জায়গার মধ্যে, যেটির জন্যে যে ছবি তার জন্যে নির্দ্দিষ্ট টিকিট দর্শকরা কেনেন। প্রত্যেকটি চিত্রগৃহের প্রবেশদ্বার ও সাজসরঞ্জাম রাখবার অন্যান্য কামরাগুলো কিন্তু আলাদা।

ষ্টিরিয়োস্কোপিক ছবি দেখাবার প্রেক্ষাগৃহটিতে, একে বলা হয় 'ষ্টিরিয়োকিনো', ১৫০ টি বসবার আসন আছে। সচরাচর যেমন চিত্রগৃহ দেখতে আমরা অভ্যস্ত তার তুলনায় মস্কোর চিত্রগৃহগুলি আয়তনে ছোট। আমি যতদূর দেখেছি তাতে মনে হয় ওঁরা ছোট ছোট ছবিঘরেরই পক্ষপাতী এবং সেগুলি প্রদর্শনের সময় একবেলাও খালি যায় না। এও জানতে পারলাম যে রাশিয়ার অন্য কয়েকটি প্রদেশে বড় আয়তনের চিত্রগৃহ থাকলেও মস্কোতে তেমন কোনো চিত্রগৃহ নেই, আর সোভিয়েট চলচ্চিত্র-প্রস্তুতকারকরা তাঁদের চিত্রগুলি বড় পর্দ্দায় দেখায় অভ্যস্ত নন যদিও অবশ্য বিদেশে এইসব ছবি ঐ অবস্থায় দেখানো হয়।

ষ্টিরিয়োকিনোতে প্রতিটি আসনের জন্যে দক্ষিণা লাগে দশ রুব্‌ল্, হিসেব মত সাধারণ ছবি দেখতে সবচেয়ে ভালো আসনের জন্য যে দর্শনী লাগে তার দ্বিগুণ। তবু কিন্তু এই ষ্টিরিয়োস্কোপিক ছবি অত্যন্ত জনপ্রিয় আর এর প্রদর্শনীর জন্যে আসন সংগ্রহ করাও বেশ দুরূহ।

প্রবেশপত্র সংগ্রহ করার পর আমরা ওপরে গিয়ে প্রেক্ষাগারসংলগ্ন একটি বিশ্রামাগারে গিয়ে বসলাম। এখানে ছবি আরম্ভ হওয়ার জন্যে অপেক্ষা করতে হয়। এই প্রতীক্ষার সময়টুকুকেও ওঁরা কাজে লাগিয়েছেন এই হিসাবে যে এখানে থাকলে মনে হয় যেন কোন সামাজিক মিলন কেন্দ্রে এসেছি। চিত্রগৃহসংলগ্ন সুন্দর ভোজনালয় এখানে সর্ব্বত্রই দেখতে পাওয়া যায়। তেমনি বইপত্র বিক্রীর জন্যে আর সঙ্গীতাদি শোনবার জন্যে কিয়স্কের ব্যবস্থাও আছে। ষ্টিরিয়োকিনোতে পড়বার ঘর আছে, লাইব্রেরী আছে আর ভারী মোলায়েম আরামদায়ক বসবার

চেয়ারও আছে। কোথাও কোথাও বা কন্সার্টের ঘরও আছে, সেখানে ছোটখাটো দলের ঐক্যতান বাদন শোনা যায়। এখানে খুব ভাল ভাল চলচ্চিত্রের বর্ণনাসহ ষ্টুডিও ষ্টিলের প্রদর্শনীও আমি দেখেছি। আলোকচিত্র, ইঞ্জিনের আর উড়োজাহাজের মডেলসম্বলিত একটি প্রদর্শনীও আমি দেখেছিলাম। চিত্রগৃহের ডায়নামো ঘরের ঠিক নীচে আবার খেলবার ঘর আছে, সেখানে অপেক্ষমান দর্শকরা দাবাবোড়ে বা অন্যান্য খেলা খেলতে পারেন। ষ্টিরিয়ো-কিনোতে একটি মাঝারী গোছের কন্সার্ট হলে যাওয়াই আমরা বেছে নিলাম। যখন ঢুকলাম তখন ওখানে কোনো বাজনা বা কিছু হচ্ছিল না, তবে দেখলাম আমাদের সঙ্গে বিভিন্ন বয়স ও আকৃতির জন পঞ্চাশেক যাঁরা ওখানে ছিলেন তাঁদের মধ্যে দুজন ছাড়া সকলেই বই পড়তেই ব্যস্ত।

৮০ মিনিট ধরে অনুষ্ঠান চলে। ১০ মিনিট সময় লাগে আসনগুলি খালি করতে আর পুনরায় ভর্ত্তি করতে। একদিকের দরজা দিয়ে শ্রোতারা বাইরে চলে যান, আর ঠিক সেইসঙ্গে অপর দিকের দরজা খোলা হয় এবং ঘণ্টা বাজিয়ে জানিয়ে দেওয়া হয় যে পরের বারের শ্রোতারা ভেতরে আসতে পারেন। প্রেক্ষাগারের নিয়ম মতই তৃতীয় ঘণ্টার পর দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়। প্রত্যেক প্রবেশপত্রে আসনের সারির ও সংখ্যার উল্লেখ থাকে। আসন দেখিয়ে দেবার জন্যে কেউ থাকে না শুধু দরজায় লোক থাকে, নিজের আসন নিজেকেই খুঁজে নিতে হয়। যদি দেরীতে আসেন তাহলে প্রবেশের অনুমতি প্রত্যাহৃত হয়।

ষ্টিরিয়োকিনোর পর্দাটি থাকে সামনের সারির আসনের থেকে বেশ অনেকটা দূরে আর উচুঁতে, যাতে প্রত্যেকটা আসন থেকেই সমানভাবে দর্শনযোগ্য হয়। ফোকাস ঠিক রাখার যে অসুবিধে হয় তা আমি আগেই শুনেছিলাম। টিকিটের পেছনেও ছাপানো আছে, 'ষ্টিরিয়োস্কোপিক ছবি দেখার ভাল ফল পাওয়া যায় যদি দর্শক তাঁর নিজের আসনে ঠিক সোজা হয়ে বসেন আর তাহলেই তিনি সমস্ত পর্দাটি জুড়ে সমান আলোকিত অবস্থায় ছবি দেখতে পাবেন।

মস্কোতে রাশিয়ার প্রথম ষ্টিরিয়োস্কোপিক সিনেমার প্রেক্ষাগৃহ

এক পাশে হেলে বসলে ষ্টিরিয়োস্কোপিক ছবি দেখার বিঘ্ন ঘটে আর চার থেকে আট ইঞ্চি সরে বসলেই এ অবস্থাটা কাটিয়ে ওঠা যায়'। ব্যক্তিগতভাবে আমি কোনো অসুবিধে বোধ করিনি। ফোকাস নষ্ট হওয়া মানে এই ধরুন সাধারণ ছবি দেখতে দেখতে কেউ যদি একবার অন্যমনস্ক হন, সেই রকম আর কি। প্রায়ই এরকম ঘটে তবে সেটা এমন কিছু মারাত্মক নয়, মাথাটা একটু সরিয়ে নড়িয়ে দৃষ্টিপথটা ঠিক করে নিলেই সব ঠিক হয়ে যায়। আমাদের দলে টম রাসেল ব'লে একজন লেখক ও সঙ্গীতশিল্পী ছিলেন। তিনি এই রকম ছবি দেখায় ঠিক অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারেন নি আর প্রায় সবসময়েই ফোকাস হারানোর দুর্গতিতে ভুগেছেন। খোলাখুলি বলতে গেলে ঐ একজন ছাড়া আর সকলেই বেশ ভালই উপভোগ করেছেন, সেটা তাঁদের আনন্দ প্রকাশের ভঙ্গী থেকেই সহজে বিচার করে বোঝা যায়।

মোট তিনটি ছবি দেখানো হলো: Sunny Region, এতে ক্রিমিয়ার সমুদ্রতট, বিশ্রামকেন্দ্র, ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের শিবির ইত্যাদি মিলিয়ে একটি ভ্রমণকাহিনীর মত চিত্র দেখানো হলো; দ্বিতীয়টি হলো Crystals, এটি একটি শিক্ষামূলক ছবি, খানিকটা রঙীন করে দেখানো হয়েছে, কি করে একজন পর্যটক-আবিষ্কারক পাহাড়-পর্বত ঘুরে, গুহায় বেড়িয়ে—যার কোথাওবা গুহার ওপর দিক থেকে পাথর ঝুলছে আর কোথাওবা গুহার মুখে নীচের দিকে পাথর দাঁড়িয়ে রয়েছে, মডেলের সঙ্গে মিলিয়ে কৃষ্ট্যালের নানাপ্রকার গঠনভঙ্গী ও কি করে অণু-পরমাণু দিয়ে স্ফটিক গঠিত হয় তাও বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। তৃতীয় চিত্রটি হলো Caran d'Ache on the Ice—এটা একটা হাস্যরসাত্মক চিত্র। মস্কোর জনপ্রিয় হাস্যরসাভিনেতা Caran d'Ache এক হকি খেলার অনুষ্ঠানে দৈবাৎ মেয়েদের দলের গোল-রক্ষক হিসেবে খেলতে সুরু করেন, দলের অধিনায়িকা হলেন সুশ্রী, সুতন্বী গায়িকা সেকিলোভ্স্কায়া। এঁর অপর চিত্রাবতরণ হলো Anton Ivanitch gets Angry, তিনি আইসেনষ্টাইনের তোলা অপর একটি ছবি Ivan the Terrible প্রথম খণ্ডে জারিনার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন যদিও তাতে বিশেষ সুবিধে করতে পারেন নি। Caran d'Ache রোগা ধরণের, দাঁত মাজা বুরুশের ডগার মত গোঁফ, সুন্দর চেহারা কিন্তু ম্যাক্স লিণ্ডারের চেয়ে স্বভাব-চরিত্র অনেক ভাল, তাঁর থমকে থমকে পড়ে যাওয়া আর ঘুরে ঘুরে নাচন-কোঁদন দেখে দর্শকরা খুবই আনন্দ পেলেন। কিন্তু ষ্টিরিয়োস্কোপিক ছবির বৈশিষ্ট্যের সুযোগ গ্রহণের দিক থেকে শেষোক্ত ছবিটির কোনো সার্থকতা নেই বা কোনো আকর্ষণও নেই। কৃষ্ট্যাল ছবিতে স্ফটিকের বৈজ্ঞানিক বর্ণনা বিষয়ে কিন্তু রাশিয়ান ভদ্রলোক খুব ভাল বলতে পারলেন না। এক্ষেত্রে মনে হয় আমাদের সঙ্গী প্রফেসার বের্ণাল বোধ হয় আরও ভালভাবে বোঝাতে পারতেন। ছবিতে যে কৃষ্ট্যালের আণবিক গঠন-ভঙ্গী দেখানো হোল তা তিনিই আবিষ্কার করেছেন। শিক্ষার দিক থেকে মোটামুটি ছবিটি সম্পর্কে তাঁর সমালোচনা ও মতামত অনুকূল।

শিল্পের জগতে ষ্টিরিয়োস্কোপির দান কতখানি? আমার মনে হয় কম্পোজিসানের দিক থেকে যেখানে ওপর থেকে নীচে, দুপাশে আর কোনাকুনি লাইন দিয়ে ফ্রেম তৈরী সেখানে ষ্টিরিয়োস্কোপিক ছবির দান তেমন কিছু নয়। তবুও আজকের দিনে একজন বিশারদ চিত্রশিল্পী লেন্স আর আলোর সাহায্যে সাধারণ ছবির মধ্যে যে গভীরতার ভাবটি ফুটিয়ে তুলতে পারেন তা বড় কম নয়। যদি সাধারণ ছবির মধ্যেই এই জিনিষগুলি বর্তমান থাকে তবে আর ষ্টিরিয়োস্কোপিতে নাটকীয়ভাবের দিক থেকে কতটা লাভ হয়? তবে প্রাকৃতিক দৃশ্যাদিতে ঘনত্বের সৃষ্টি করতে পারলে ছবিতে অকৃত্রিম ভাব ফুটে ওঠে আর ষ্টিরিয়োস্কোপির এটাও বড় কম গুণ বলে মনে হয় না।

কিন্তু ছবির বিষয়বস্তু আর তাতে নড়াচড়া, যেমন দর্শকের দিকে এগিয়ে আসা বা দর্শকের থেকে দূরে চলে যাওয়া, এইসব ভয়ঙ্কর, অত্যদ্ভুত রকম কল্পনাতীত প্রাণ এনে দেয় ছবির মধ্যে।

এই ব্যাপারটা মাঝে মাঝে এমন অদ্ভুত লাগে, যখন একটা গাছের সামনে ক্যামেরা থাকে তখন গাছের

ডালপালাগুলি মনে হয় যেন একেবারে দর্শকদের মাথার ওপরে এসে ছড়িয়ে রয়েছে। Sunny Region-এ দুটি ছেলে একটা কাঠের গুঁড়ির ওপর দু'দিকে ভারসাম্য বজায় রেখে দুলছে দেখা গেল। পর্দায় যখন একটি ছেলের দৃষ্টি-কোণ থেকে তোলা ছবিটি ভেসে ওঠে তখন অপর ছেলেটির দিকটা দেখতে গিয়ে চোখে যেন ধাঁধাঁ লেগে যায়।

সময় সময় এটা আরও সুক্ষ্মভাবে বোঝা যায়। ক্রিষ্ট্যালের গঠন সম্বন্ধে সাধারণ ছবির চেয়ে ষ্টিরিয়োস্কোপিক ছবিতেই আরও ভাল বোঝা যায় কারণ ক্রিষ্ট্যালের গঠন প্রকৃতিই হলো তিন আয়তন বিশিষ্ট এবং এর ভেতর সুক্ষ্মতম অংশ পর্য্যন্ত অন্য কোনো উপায়েই এত ভাল ক'রে দেখতে পেতাম না।

ষ্টিরিয়োস্কোপিক ছবিতে যে কতটা ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা রয়েছে তা' প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বাদ দিয়ে শুধু পুঁথিগত ভাবে বলতে আমি চাই না। ছবির বিষয়বস্তুর আকার আয়তন ও দর্শকের মধ্যেকার প্রতিক্রিয়ার অনেকখানিই অজানা রয়ে গেছে। প্রথম দর্শনে অনেকেই হয়ত ভাবতে পারেন যে, যেহেতু ষ্টিরিয়োস্কোপিক ছবিতে ঘনত্ব দেখানো সম্ভব অতএব এই ধরণের ছবিতে বোধ হয় শিল্পগত ভাব ফুটিয়ে তোলার কাজে সমস্যার উদ্ভব হয় না। কিন্তু মোটেই তা' নয়। খালি চোখে আমরা যে স্বাভাবিক দেখি তার কারণ দৃশ্য বস্তু সামগ্রিক ভাবে এক রকম দেখি না, দৃষ্টি আকর্ষণের একটা ক্রমমান থাকে। ফিল্ম-ক্যামেরা ঐ দৃশ্যবস্তুকে আলাদা করে দেয়। সেইজন্যেই, ষ্টিরিয়োস্কোপিক ছবিতে ডালপালাসুদ্ধ একটা গাছ কোনো একটা জায়গা থেকে আমাদের দিকে ঝুঁকে থাকলে সাধারণত: আমরা যেমন দেখি তার থেকে বেশী রকম আমাদের দিকে ঝুঁকে আছে বলে মনে হয়। কতকগুলি জিনিষ: যেমন আমাদের দিকে বন্দুক উঁচিয়ে ধরা বা কেউ যেন এগিয়ে আসছে, এগুলি মনে হয় যেন হুমড়ী খেয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে এসে পড়ছে। কতকগুলি জিনিষ আবার আসলের চেয়ে খুব ছোট ছোট বলে মনে হয়। আবার ধরুন একটি ক্লোজ-আপ দৃশ্যে দেখা গেল কারো নাকটি হয়ত একেবারে লোহার সাবলের মত,—সাধারণের থেকে অনেক বড় মাপের; সামনাসামনি দিকে একটা হাত হয়ত একেবারে ভয়ঙ্কর রকম বড় আকারের দেখাতে লাগলো। মোটকথা ষ্টিরিয়োস্কোপিক ছবির বর্ত্তমান শিল্পগত উৎকর্ষ নিয়ে একখানি রসোত্তীর্ণ ছবির নিখুঁত ভাবব্যঞ্জনা ও পরিবেশ সৃষ্টির কাজ সাধারণ কলাকুশলীর পক্ষে দুঃসাধ্য।

এ ছাড়া আরও অনেক মৌলিক সমস্যা সমাধানের প্রয়োজন অবশিষ্ট থাকে। এসব সমস্যা মূলতঃ যান্ত্রিক। সমগ্রভাবে বিচার করলে বলা যায়, বর্ত্তমানে ষ্টিরিয়োস্কোপিক ছবি শৈশব অবস্থায় আছে এবং একে পুষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ করে তুলতে গেলে এখনও বহু গবেষণা ও উদ্ভাবনার প্রয়োজন। তবে সেইসঙ্গে আমরা উন্মুখ হয়ে আছি ভবিষ্যতের জন্যে যেদিন ষ্টিরিয়োস্কোপি আমাদের চোখের সামনে ছবি হয়েও ছবির মায়া কাটিয়ে সত্যকার ছবি দেখাতে সক্ষম হবে।

[সিনেমা ১৯৫০ থেকে গৃহীত]

ভারতীয় চলচ্চিত্রের আয়

গত ৩১শে মার্চ যে আর্থিক বছর শেষ হয়েছে সেই বারো মাসে ভারতে চলচ্চিত্রের দরুণ মোট আয় হয়েছে ১৭ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে ১০ লক্ষ টাকা গিয়েছে ফিল্ম ডিভিসনের ছবি দেখানোর ভাড়া বাবদ সরকারী তহবীলে, বিদেশী ছবি উপার্জ্জন ক'রেছে ৩ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা, আর বিদেশী ছবির পরিবেশকরা এদেশে তাদের কারবার চালানোর জন্যে খরচ ক'রেছে ৫১ লক্ষ টাকা। ভারতীয় ছবির ব্যবসায়ে আয় হ'য়েছে ১৪ কোটি টাকা। এর মধ্যে প্রদর্শকদের ভাগে গিয়েছে ৫ কোটি ৬০ লক্ষ, পরিবেশকদের ভাগে ১ কোটি ৬৮ লক্ষ এবং চিত্র নির্ম্মাতারা ফিরে পেয়েছে ৬ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা। এ হিসেবটা ধরা হ'য়েছে বিভিন্ন ভাষা নিয়ে ঐ বারো মাসের মধ্যে মুক্তিপ্রাপ্ত ২৭৫ খানি ছবিকে ধ'রে। তোলার জন্যে ছবি পিছু গড়পরতায় খরচ পড়েছে ৪লক্ষ টাকা, কিন্তু গড় পরতায় ছবি পিছু আমদানীর অংশ হ'চ্ছে ১ লক্ষ ৭৩ হাজার টাকা। তার মানে সারা বছরের হিসেবে যত ছবি মুক্তিলাভ করেছে তার মধ্যে প্রায় ৩৷৫ ভাগ অর্থাৎ মোট ১৫৬ খানি ছবির চিত্রনির্ম্মাতা লোকসান ভোগ ক'রেছে।

ভারতীয় চিত্রশিল্পের সমৃদ্ধি

১৯৫০ সাল পর্য্যন্ত ৩০ বছরের মধ্যে ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্পের সমৃদ্ধি হ'চ্ছে: ষ্টুডিও সংখ্যা—৬০; লেবরেটরী—৩৭; চিত্রগ্রহণ মঞ্চ—১৩৮; প্রযোজক—৪৬০; পরিবেশক—৯০০; স্থায়ী সিনেমা—২০৬৭; ভ্রাম্যমান বা অস্থায়ী সিনেমা—৯২৮, চিত্র নির্ম্মাণে নিয়োজিত মূলধন—১৫ কোটি টাকা; পরিবেশনে নিয়োজিত ৩ কোটি; প্রদর্শনে নিয়োজিত—২৫ কোটি; বছরে প্রদত্ত প্রমোদ-কর—সওয়া ৪ কোটি, সরকারকে প্রদত্ত অন্যান্য কর—সাড়ে ৪ কোটি; কর্ম্মী সংখ্যা—সওয়া লক্ষ।

মালয়ের পটভূমিকায় সাবুর আরণ্য চিত্র

সিঙ্গাপুর থেকে প্রেরিত পি টি আই রয়টারের এক সংবাদে প্রকাশ যে, বিখ্যাত ভারতীয় চিত্রনট সাবু মালয়ের পটভূমিকায় একখানি ছবি তৈরী করবেন।

তিনি আগামী মাসের প্রথমে প্রডিউসার ও টেকনিক্যাল এডভাইসর সঙ্গে নিয়ে সিঙ্গাপুরে পৌছবেন।

দু'টি হস্তী-শাবক 'এলিফ্যাণ্ট বয়' সাবুর এই চিত্রে অংশ গ্রহণ করবে এবং ইতিমধ্যে শাবক দুটি সংগ্রহ করা হয়েছে। এই চিত্রে বৃহৎ অজগর সাপ, উল্লুক, ভাল্লুক ও ময়ূরের সমাবেশও দেখা যাবে।

গ্রেটা গার্ব্বোর নতুন ছবি

এক খবরে প্রকাশ যে, পরিচালক জি, ডবলিউ, পেবষ্ট আশা করেন—তাঁর ছবি হোমারের 'ওডিসী'তে গার্ব্বো 'পেনেলোপে'র ভূমিকায় অভিনয় করবেন।

এডিনবরার আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে ভারতীয় প্রামাণ্য চিত্র

আগামী এডিনবরা চলচ্চিত্র উৎসবে ভারতবর্ষ যে চিত্রখানি প্রেরণ করেছে তা বিশেষ কারণে উল্লেখযোগ্য। এই চিত্রখানির নাম "আওয়ার ইণ্ডিয়া" বা "আমাদের ভারতবর্ষ"। এতে ভারতীয় সভ্যতা এবং সংস্কৃতির আদিযুগ থেকে অর্থাৎ ৪০০০ বৎসর পূর্ব্বের আর্য্য সভ্যতা থেকে বর্ত্তমান যুগ পর্য্যন্ত দীর্ঘ সময়ের বিচিত্র পরিচয় পাওয়া যাবে। এই ছবির সংলাপ ইংরাজী ভাষায়।

"আওয়ার ইণ্ডিয়া" ভারতবর্ষের এবং ভারতীয় জীবনের মর্ম্মকথা প্রকাশ করেছে। তার কলকারখানা এবং যৌথ কৃষিব্যবস্থা, তাজমহল এবং ধর্ম্ম মন্দিরের পরিপ্রেক্ষিতে যে জীবন ফুটে উঠেছে তা' সত্যই উপভোগ্য। চিত্র-

খানির পরিচালনা করেছেন পল জিল্‌স। ইনি ইতিপূর্ব্বে ভারতীয় দলিল-চিত্র পরিচালনা ক'রে খ্যাতি অর্জন করেছেন।

এই চিত্রখানিতে যাঁরা অভিনয় অংশে আছেন তাঁরা প্রায় সকলেই চিত্রজগতে বিখ্যাত এবং সকলেই যৌথ ব্যবস্থায় অংশীদার হিসেবে অভিনয় করেছেন। চিত্র নির্ম্মাণকালে অভিনেতাগণ পারিশ্রমিক বাবদ সামান্য মাত্র অর্থলাভ করেছেন, কারণ চিত্রের লভ্যাংশ পরে তাঁদের মধ্যে আনুপাতিক হিসাবে ভাগ ক'রে দেওয়া হবে।

গ্রীক এরেণা থিয়েটার মার্কিণ রাষ্ট্রে পুনরাবির্ভূত

এই যন্ত্র যুগে যন্ত্রকে সযত্নে পরিহার করে চলা খুব সহজ কথা নয়। বিশুদ্ধ রুচি কিম্বা সৌন্দর্য্যের খাতিরে যন্ত্রপ্রভাব-বিমুক্ত থেকে শিল্পচর্চ্চা করা, শিল্প ও সৌন্দর্য্য-নিষ্ঠার পরিচায়ক।

নাট্যমঞ্চে প্রবেশ করা যাক্। দক্ষিণে, বামে, সম্মুখে, পিছনে ওপরে নীচে দশ দিকেই দড়িদড়া, কলকব্জা, লোহা-লক্কড়, কাঠ কাঠরার ছড়াছড়ি মহারণ্য বললেও চলে। মঞ্চ ঘূর্ণমাণ, দৃশ্য চলমান, আলোক ভ্রাম্যমান,—শব্দানুকৃতি দৃষ্টিবিভ্রম, বাস্তবানুসরণ ইত্যাদি বহু চমকপ্রদ ঘটনায় আধুনিক দর্শককে একেবারে ধাঁধাঁ লাগিয়ে দেওয়া হয় সেখানে। বলা বাহুল্য যন্ত্র সভ্যতার যাদুকর জাত, মার্কিণ-রাষ্ট্রবাসী তাদের নাট্যমঞ্চে যন্ত্রবিজ্ঞানকে ভূতের মতই খাটিয়ে নিচ্ছে।

পশ্চাতে দৃশ্যপট নেই, মঞ্চে নেই পাদপ্রদীপ, সম্মুখে যবনিকা নেই, যন্ত্ররাজবিবর্জ্জিত এমন এক নাট্যশালায় আধুনিক কালের কুশীলবগণ অবতীর্ণ হয়েছেন, এটা বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না।

কিন্তু উপায় নেই। বিশ্বাস করতেই হচ্ছে যে—মলিয়েরে, সেক্সপীয়র, শেপভ, গোল্ডস্মিথ, ওয়াইল্ড থেকে আরম্ভ করে ডরোথি পার্কার ও তরুণ মার্কিণ নাট্যকার টেনেসি উইলিয়ামস্ রচিত নাটকাবলীর অভিনয় হয়ে যাচ্ছে এই জাতীয় বাহুল্য বর্জ্জিত নিরাভরণ রঙ্গমঞ্চেই, হঠাৎ জ্বলে-ওঠা হঠাৎ নিভে-যাওয়া শখের আতসবাজির মত নয়—দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ধরেই তা হচ্ছে।

হচ্ছে আমেরিকায়। প্রাচীন গ্রীক পন্থায় নাট্যভূমি রচনা করে ঐ সব নাটক সেখানে অভিনয় করে চলেছেন আমেরিকার নটনটীকুল। প্রেক্ষাগার যে জনসমাকীর্ণ হচ্ছে তার প্রমাণ, যুক্তরাষ্ট্রের বহু ছোট বড় শহরে এর বিস্তৃতি। রাষ্ট্রের বৃহত্তম নাট্য-কেন্দ্র, খাশ নিউইয়র্ক শহরে পর্য্যন্ত এইরকম নাট্যশালার পত্তন হয়েছে।

প্রাচীন গ্রীক এরেণা-নাট্যশালার পুনঃপ্রবর্ত্তন মার্কিন রাষ্ট্রে প্রথম করেন গ্লেন হিউজেস, ১৯৩২ সনে, সিয়াটল্ শহরের এক হোটেলের মধ্যে। এখন সেখানে তাঁদের নিজস্ব নাট্যশালা তৈরী হয়েছে। ১৭২ জন দর্শককে স্থান দিয়ে থাকেন তাঁরা এরেণা অর্থাৎ রঙ্গভূমির চতুঃপার্শ্বে। সপ্তাহে ছ'দিন ক'রে অভিনয় চলে সমস্ত বছর ধরেই; আজ পর্য্যন্তও তা চলে আসছে সগৌরবে।

নিউইয়র্কে নিগ্রো শিল্পপ্রদর্শনী

সম্প্রতি নিউইয়র্কে চার দিন ধরে এক নিগ্রো শিল্প-প্রদর্শনী খোলা হয়েছে। তার নাম দেওয়া হয়েছে আফ্রো-আর্টস বাজার। নাইজিরিয়া, ভার্জিণ দ্বীপপুঞ্জ, হাইতি, কিউবা প্রভৃতি স্থানের প্রায় ৭৫ জন নিগ্রোশিল্পীর নির্ম্মিত প্রায় ২০০০টি শিল্প নিদর্শন সেখানে স্থান পেয়েছে। ঐ সকল শিল্প নিদর্শনের মধ্যে আছে ব্রোঞ্জ নির্মিত ক্ষুদ্র মূর্ত্তি, মেহগনির টেবিল, নানা প্রকার চিত্র ও তাম্রনির্ম্মিত দ্রব্যাদি। আফ্রিকার সঙ্গীত ও নৃত্যাদির ব্যবস্থাও প্রদর্শনীতে করা হয়েছে।

এই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তারা বলেন যে—তরুণ নিগ্রো শিল্পীগণের জন্য বিভিন্ন শিল্পবিষয়ে নিয়মিত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করবার ইচ্ছা তাঁদের আছে। এই প্রদর্শনীটি তারই সূচনা মাত্র।

টেলিভিসনে সমুদ্রতলের দৃশ্য

গভীর সমুদ্রের তলায় কি আছে তা' দেখবার জন্যে চিরকালই মানুষের অনুসন্ধিৎসা বিদ্যমান; এজন্যে অনেক সময়ে নানাভাবে চেষ্টা হয়েছে। ডুবুরী ডুব দিয়ে কি দেখেছে উঠে এসে তা' মুখে বর্ণনা করেছে, ক্যামেরার সাহায্যে সমুদ্রগর্ভের ছবি তুলে এনেছে। এখন টেলিভিসনে সমুদ্র-গর্ভের দৃশ্যাবলী দেখাবার চেষ্টা হচ্ছে। এজন্য আমেরিকার অন্তর্গত ক্যালিফোর্ণিয়ার উপকূলে, প্রশান্ত মহাসাগরের ১২০০০ ফিট নীচে টেলিভিসান ক্যামেরার যন্ত্রপাতি নামিয়ে

দেওয়া হবে। যাতে সমুদ্রতলের প্রচণ্ড চাপ সহ্য করতে পারে এজন্য বেন্থাগ্রাফ নামক গোলাকার লৌহনির্ম্মিত কক্ষ করে যন্ত্রপাতিগুলি নামিয়ে দেওয়া হবে, তার মধ্যে কোনও মানুষ থাকবে না। ওপর থেকে বৈদ্যুতিক তারের সাহায্যে যন্ত্রপাতি চালানো হবে।

এই কাজে দক্ষিণ ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে সহযোগিতা করছেন প্রখ্যাতনামা মার্কিণ ডুবুরী ওটিস বার্টন। গত বছর তিনি বেন্থাস্কোপ নামক লৌহকক্ষের সাহায্যে সমুদ্রতলে অবতরণ করেন। তিনি সমুদ্রের যত নীচে নেমেছিলেন এত নীচে আর কেউ যেতে পারেন নি। বার্টন মনে করেন সমুদ্রতলের স্বচ্ছদেহ ও জেলীর ন্যায় আকৃতিহীন যে সকল প্রাণী সাদা চোখে দেখা যায় না টেলিভিসনে সেগুলি দেখা যেতে পারে। সমুদ্রতলের কোন কোন প্রাণীর শরীর থেকে বিচ্ছুরিত অতি ক্ষীণ আলোও টেলিভিসন ক্যামেরায় ধরা পড়তে পারে। সমুদ্রতলের দ্রব্যাদি থেকে মানুষের খাদ্য ও জ্বালানী উপাদান সংগ্রহ করা যায় কিনা সে সম্বন্ধেও জ্ঞানলাভ করা যেতে পারে।

সমুদ্রের প্রায় ১৫০০ ফিট নীচে এক প্রকার অদ্ভুত 'পর্দ্দা' ভেসে বেড়ায়, শব্দ তরঙ্গ তার গায়ে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসে এবং তার ফলে সমুদ্রের গভীরতা নির্ণয়ে গোলমাল হয়। ঐ পর্দ্দা প্রায় ১০০ ফিট গভীর। তার প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয়েও বেন্থাগ্রাফ সহায়তা করতে পারে।

বেন্থাগ্রাফের ব্যাস ৩৯ ইঞ্চি, লোহার দেওয়াল দেড় ইঞ্চি চওড়া আর প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে ১২,০০০ পাউণ্ড পর্য্যন্ত চাপ সহ্য করতে সক্ষম।

সিনেমা আবিষ্কারকের জীবনীচিত্র

আগামী বছর বৃটেনের জাতীয় উৎসবে প্রদর্শনের জন্যে সিনেমা আবিষ্কারকের জীবনী অবলম্বনে একটি রঙীন চিত্র তোলবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এই চিত্র নির্ম্মাণের জন্যে বৃটেনের সমস্ত শ্রেষ্ঠ যন্ত্রশিল্পীগণ, এই প্রথম, একসঙ্গে কাজ করবেন। এই চিত্র নির্ম্মাণের ব্যয় হবে আনুমানিক ২,৫০,০০০ পাউণ্ড (৩৩·৩৩ লক্ষ টাকা)।

৬০ বছর আগে উইলিয়ম ফ্রিজি গ্রীন নামে একজন বৃটিশ আলোকচিত্রশিল্পী এক নতুন ধরণের ক্যামেরা উদ্ভাবন করেন যার সাহায্যে সেলুলয়েড ফিতার ওপর অবিচ্ছিন্নভাবে চিত্রগ্রহণ করা সম্ভব হয়। ইনিই চলচ্চিত্রশিল্পের জন্মদাতা বলে স্বীকৃত এবং আলোচ্য চিত্রে এঁর জীবনকাহিনী রূপায়িত হবে।

এই চিত্রে অভিনয়ের জন্যে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চিত্রতারকাদের নির্ব্বাচন করা হচ্ছে। প্রদর্শনীলব্ধ অর্থের অর্ধেক পরিমাণ চিত্রশিল্পের উন্নতিকল্পে ব্যয় করা হবে। গভর্ণমেণ্ট সাহায্যপুষ্ট বৃটিশ ফিল্ম ফিনান্স কর্পোরেশন চিত্র নির্ম্মাণের আংশিক ব্যয়ভার বহন করবে। চিত্রখানি পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হবে

হলিউডের বিষ !

যোগজাকার্ত্তাস্থিত ইন্দোনেশীয় ফিল্ম কমিটি স্থির করেছেন যে, যে সমস্ত মার্কিন সংবাদচিত্র ইন্দোনেশিয়ায় আসে সেগুলি প্রদর্শনের আগে ভালোভাবে পরীক্ষা করে নেবেন। স্ত্রীলোকদের দেহ-সৌন্দর্য্য প্রতিযোগিতামূলক দৃশ্য এবং অন্যান্য ঘটনাবলী, যা ভবিষ্যতে ইন্দোনেশিয়ার জনসাধারণের নৈতিক চরিত্রের ওপর খারাপ প্রভাব বিস্তার করতে পারে, তা বাদ দিতে হবে। ফিল্ম কমিটি বলেছেন, 'আমরা ইন্দোনেশিয়ার সমাজের ভবিষ্যতকে রক্ষা করতে চাই।'

মঞ্চে নগ্ন স্ত্রীলোকদের আবির্ভাব

আজকাল বৃটিশ মঞ্চে নগ্ন স্ত্রীলোকদের আবির্ভাব খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এর ফলে পাবলিক মর‍্যালিটি কাউন্সিল বিশেষ উদ্বাস্ত হয়ে উঠেছেন। ইণ্টার-ডিনোমিনেশানাল চার্চ্চ গ্রুপের পঞ্চাশৎ বার্ষিক রিপোর্টে বলা হয়েছে, 'লর্ড চেম্বারলেন মঞ্চের ওপর যে বিবসনা স্ত্রীলোকের আবির্ভাব সমর্থন করেছিলেন তা কয়েকটি সর্ত্তে যেমন মঞ্চের ওপর নগ্নভাবে আবির্ভূতা স্ত্রীলোকদের কোন গতি থাকবে না, মঞ্চের ওপর আলো হবে স্তিমিত এবং মেয়েদের দৈহিক গঠন হবে সুঠাম সুন্দর। আমরা সে বিষয়ে আপত্তি জানাই। এইভাবে দেখানো মানে হচ্ছে নগ্ন মূর্ত্তি দেখাবার পক্ষে অবাঞ্ছিত সমর্থন জানানো আর এই রকম আমোদ-প্রমোদে ইউরোপে বিরূপ সমালোচনার সৃষ্টি

হয়েছে।' লণ্ডনের পাব্লিক মর‍্যালিটি কাউন্সিল এতে খুব বিচলিত হয়ে পড়েছেন আর কোন কোন সদস্য 'ফলিস বার্জা'র' প্রতিষ্ঠানের প্রতি দোষারোপ করছেন, কারণ এই সম্প্রদায় এখন লণ্ডনে পূর্ণপ্রেক্ষাগৃহে তাঁদের প্রদর্শনী চালিয়ে যাচ্ছেন। এই প্রতিষ্ঠানের প্রযোজক অবশ্য লর্ড চেম্বারলেন নির্দ্ধারিত সীমা বজায় রেখেই প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছেন। প্রযোজক বলেছেন, 'নগ্নভাবে আবির্ভূতা চোদ্দোজন স্ত্রীলোককেই আমরা দৃশ্যেরই অঙ্গ হিসেবে মনে করি। সেইসব অভিনেত্রীরা একেবারে মঞ্চের ওপর উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত বহির্বাস খুলে ফেলার অনুমতি দেওয়া হয় না। এমন কি দেহকে সম্পূর্ণভাবে না ঢেকে এক পাও নড়তে দেওয়া হয় না।'

হরিষে বিষাদ!

বোম্বাই-এর একটি খবরে প্রকাশ যে সেখানে দুবলা অঞ্চলের মডেল টকীজে রাত্তিরের শো'তে এক দর্শকের পা দৈবাৎ অন্য এক দর্শকের গায়ে লাগাতে খুন-জখমের ভেতর দিয়ে ব্যাপারটির মীমাংসা হয়েছে।

শেখ আহম্মদ নামে এক ব্যক্তি তার দুই বন্ধুর সঙ্গে রাত্রি দেড়টার সময় মডেল টকীজে ছবি দেখতে যায়। ইণ্টারভ্যালের পর যখন অন্ধকারে শেখ আহম্মদ তার জায়গায় বসতে যাচ্ছিল তখন অজ্ঞাতে এক দর্শকের গায়ে তার পা লেগে যায়। প্রকাশ, ছবি শেষ হয়ে যাওয়ার পর সেই দর্শকটি শেখ আহম্মদকে গালাগালি সুরু করে, এবং পকেট থেকে একটি পেন্সিল-কাটা ছুরি বের ক'রে তাকে আঘাত করে পালিয়ে যায়। তখনি শেখ আহম্মদকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

হিটলারী ব্যাপার!

বার্লিনের হেনরিচ নল নামে এক অভিনেতা তাঁর তিন জন সহকর্মী অভিনেতার বিরুদ্ধে এই বলে আদালতে নালিশ করেছেন যে তাঁর বন্ধুরা এক পার্টিতে খাওয়া-দাওয়ার পর অবিকল হিটলারের মত তাঁর চুলের গোছাটি কেটে ফেলে। মার্কিন ছবিতে হিটলারের ভূমিকায় অভিনয় করবার সুযোগ তারা নষ্ট ক'রে দিয়েছে। হেনরিচ বলেছেন, "আমার অন্ন মারা গেল। একটি মার্কিন ফিল্ম কোম্পানীর

সঙ্গে যে চুক্তি হয়েছিল তাও, বরবাদ হয়ে যাবে। বন্ধুদের সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তিতে আমার যে তিনটি দাঁত পড়ে গেছে, তাতে আমার তেমন ক্ষতি হয়নি। কারণ দাঁতগুলি আবার বাঁধিয়ে নেওয়া যাবে অনায়াসেই।"

ঘর-সংসারের কাজে টেলিভিশন

ঘর-সংসারের নানা প্রয়োজনীয় কাজ-কর্ম্মে টেলিভিশন কি রকম সাহায্য করতে পারে তার পরীক্ষা চলছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। ক্ষেত-খামারের কাজেও এর প্রয়োগ চলেছে। যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি-দপ্তর এই প্রচেষ্টায় উদ্যোগী হয়েছেন এবং "ন্যাশনাল ব্রডকাষ্টিং কোম্পানীর" সহযোগিতায় তাঁদের কার্য্যসূচী পরিচালিত হচ্ছে।

বাড়ীর হাতায় যে ঘাসঢাকা জমিটুকু রয়েছে সেটাকে আরও ভালোভাবে কি করে সাজানো যায়, মাংসটা টাটকা রাখা যায় কেমন করে, বাজারে কোন্ জিনিষটা কোনখান থেকে ভালো আর সস্তায় পাওয়া যায়, পোকামাকড় ইঁদুরের অত্যাচার নিবারণের উপায় কি এবং নানা রকম খাবার তৈরী করবার প্রণালী ইত্যাদি বাৎলে দিয়ে ঘর-সংসারের নানা রকম কাজে সাহায্য করা হচ্ছে কৃষি-দপ্তরের পরিচালিত টেলিভিশন-প্রোগ্রাম অনুযায়ী।

এই প্রোগ্রাম বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করছে। একদিন প্রোগ্রামের বাইরে, অর্থাৎ প্রোগ্রামে যার উল্লেখ ছিল না এমনি একটা বিষয় টেলিভিশনে বলা হলো। বিষয়টি ছিল পোষাক তৈরী করা সম্বন্ধে। বলা হয়ে যাবার ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই হাজার খানেক অর্ডার এসে গেল টেলিফোন যোগে।

বাজারে নানা 'বাড়তি' জিনিষ খুব সস্তায় পাওয়া যায় মাঝে মাঝে; টেলিভিশন প্রোগ্রামে তার সংবাদও দেওয়া হয় এবং ক্রেতারা খুশি হন সস্তায় সেইসব 'বাড়তি' জিনিষ কিনতে পেয়ে। শিশুপালন, ঘর-দুয়ারের সাজসজ্জা, হাঁস মুর্গীর ডিম—ইত্যাদি বিষয় নিয়েও আলোচনা করা হয় এবং সেটা হয় সচিত্র।

চেয়ার, কোচ ইত্যাদির ঢাকনা কি করে বেশ পরিষ্কার আর অনেক দিন টিকিয়ে রাখা যায়—এ সম্বন্ধে আলোচনা হবে আগামী হেমন্তকালে।

ক্ষেত খামারের মার্কিন কৃষকরা কি রকম কাজ করছে তার সচিত্র বেতার বিবরণ দেওয়া হয়েছে ধারাবাহিকভাবে গত এক বছর ধরে।

আমেরিকার খামার-বাড়ীতে আজকাল টেলিভিশন সেট্ আর খুব একটি দুর্লভ বস্তু নয়। নিউজার্সি, কানেক্‌টিকাট্, ম্যাবিল্যাণ্ড, ওহায়ো, আইওয়া, লুইজিয়ানা, টেক্‌সাস, জর্জিয়া, মিসৌরি, আর্কানসাস, প্রভৃতি প্রদেশের খামার-বাড়ীতে টেলিভিশন-সেট দেখতে পাওয়া যাবে। নিউইয়র্কের প্রায় সর্বত্র, পেনসিল্‌ভেনিয়ার পূর্বাঞ্চলে ক্যালিফোর্নিয়ার দক্ষিণে ইণ্ডিয়ানা, ইলিনয় এবং উইস্‌কন্‌সিনের কোনও কোনও যায়গায়, নেব্রাস্কার পূর্ব্বাঞ্চল ও টেনেসির পশ্চিমাঞ্চলেও এর চলন হয়েছে।

গান গেয়ে তারে ভোলাবো!

হাতে, পায়ে, নাকে, কানে—কাটাকুটি করবার দরকার হলে ডাক্তাররা আজকাল আর ভাবনায় পড়েন না, ফস করে ছুরি চালিয়ে দেন। রোগীর পক্ষেও ভয়ের কারণ তেমন কিছু থাকে না, অর্থাৎ কাটা-ছেঁড়া করবার সময়কার

যন্ত্রণার ভয়। ক্লোরিক-ঈথার শুঁকে অজ্ঞান হয়ে নয়—সজ্ঞানেই রোগী দেখতে থাকেন, তাঁর শরীরে অস্ত্রোপচার হচ্ছে, অথচ তার বেদনা নেই।

এটা সম্ভবপর হয়েছে, কাটাকুটি করবার যায়গাটাকে অবশ করে অর্থাৎ অনুভূতিলেশশূন্য করে রাখতে পারার জন্যে। ইনজেকশানের সাহায্যে কিছুকালের জন্য খানিকটা জায়গাকে অনুভূতিলেশশূন্য করে রেখে, ডাক্তাররা চটপট্ সেইখানে ছুরি চালিয়ে তাঁদের কাজ সেরে নেন। দাঁতের গোড়ায় খুব সরু ছুঁচ ফুটিয়ে অমনি ইনজেকশান দিয়ে খারাপ দাঁতগুলি উপড়ে নিয়ে আসেন দন্তাচার্য্যগণ আজকাল অনায়াসেই। রোগীকেও পরিত্রাহি চীৎকার করতে হয় না।

কিন্তু কাটা ছেঁড়ার জন্যে শারীরিক যন্ত্রণা ভোগ না করতে হলেও মনে মনে একটা উদ্বেগ এবং অশান্তি রোগীরা ভোগ করে থাকেন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই। তা ছাড়া, চোখ দিয়ে দেখলেও বীভৎসভাব বিরূপ প্রতিক্রিয়া মস্তিষ্কে কিছুটা হয়ই। যার জন্যে নিজের কেন, অপরের শরীরে আস্ত্রোপচার দেখলেও কেউ কেউ মূর্চ্ছা যান। রোগীর বয়স কিম্বা দুর্ব্বলতার জন্যে রোগীকে অনেক সময়ে মোহাচ্ছন্ন করে রাখবার ওষুধ খাওয়ানো চিকিৎসকরা নিরাপদ মনে করেন না।

মোহাচ্ছন্ন না হলেও মুগ্ধ করে রাখবার যাদুকরী ক্ষমতা নাকি সঙ্গীতের আছে। মার্কিন রাষ্ট্রে তারই পরীক্ষা চলছে এইসব রোগীর ওপর দিয়ে। শিকাগোর "নাথান গোল্ডব্লাট্ মেমোরিয়াল হাসপাতালের" ছয়টি রোগীর শরীরে বেশ বড় রকমের আস্ত্রোপচার হয়, সেই সময়ে রোগীদের পছন্দমত সঙ্গীত তাঁদের শোনবার ব্যবস্থা করেছিলেন সেখানকার চিকিৎসকরা। ফল নাকি খুব আশাপ্রদই হয়েছিল।

রুচি সকলের সমান নয়। কেউ কালোয়াতীর পক্ষপাতী কেউ বা আধুনিকের। ঐ হাসপাতালে সব রকম রুচি অনুযায়ী সঙ্গীত পরিবেশনের ব্যবস্থাই করা হয়েছে। এমনকি শিশুদের জন্যে 'সিণ্ডারেলা'—জাতীয়, ওয়াল্ট ডিস্‌নের তৈরী সিনেমা সঙ্গীতের আয়োজনও করা হয়েছে। রোগীদের মাথায় হাল্‌কা হেড-ফোন লাগিয়ে এইসব গান-বাজনা শোনানো হয়, কারণ—অন্যের রুচি এবং মানসিক অবস্থা এর অনুকূল না হতেও পারে।

আকাশবাণী

বেতারবন্ধু

দাও মা আমায় তবিলদারী ঃ

কলকাতা বেতারের ব্যাপার দেখে রামপ্রসাদের এই গানটাই আমার সবচেয়ে আগে মনে পড়লো। সত্যি বেতারের তবিলদারী যাদের হাতে 'ছয় রিপু কুম্ভিরাদি'র মতো তারা ডাইনে-বাঁয়ে তাদের চেনা-জানা লোকদের জন্য বিনা দ্বিধায় খরচ-পত্র করছে।

পল্লী মঙ্গল আসরের যিনি কর্ণধার—তাঁর মঙ্গলের জন্যে তাঁরই কর্ণধার 'সু'-দেব্‌তাটি তাঁকে বেতার নদী পারাপারের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন মাসিক ৫০৲ টাকার পরিবর্ত্তে ২৫০৲ টাকার বরাদ্দ-ব্যবস্থা করে। ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ আর কি! বেতারের দেবতাটি 'সু'-ভাবে আপন পদাধিকার বলে যা খুসী তাই করছেন—আত্মীয় বন্ধু পোষণের এর চেয়ে বড় দৃষ্টান্ত আর কি হতে পারে?

'দূর দিল্লীর' এ বিষয়ে দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়ায় বেতারের এই 'সু'-দেব্‌তাটির মুখ রক্ষ্যে করবার জন্যে বেতারের কর্ণধার শ্রীযুক্ত সেন দেব্‌তার কাজের (এই স্বজন-বন্ধু পোষণের) সমর্থন করে দিল্লী প্রভুর কাছে অর্জ্জি পেশ করেছেন। দেখা যাক্ কোথাকার জল কোথায় গড়ায়!

ইনি শিল্পী সংঘের সংগঠন-সম্পাদক হিসাবে যে অসাধারণ ধৈর্য্য, অনন্যসাধারণ কর্ম্মক্ষমতা এবং সংগঠন শক্তি দেখিয়েছেন তার তুলনা মেলে না। ছোট বড় সমস্ত শিল্পীকে সংঘবদ্ধ করার অসাধারণ ক্ষমতার জন্যই মুখী-প্রধান ১৯৪৭ সালের শিল্পী ধর্ম্মঘটকে সাফল্যমণ্ডিত করে এটাই প্রমাণ করেছিলেন যে সংঘবদ্ধতাই সমস্ত অবিচার অত্যাচারের জলন্ত জবাব।

দুঃখের বিষয় বেতারের অনুসৃত ভেদ-নীতির ফলে এবং শিল্পীদের নিজেদের দৌর্ব্বল্যের জন্য শিল্পী-সংঘে নানাভাবে ভাঙন দেখা যায়—রাজনৈতিক মতবাদের জন্য।

২৩, ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট!

'অস্তি গোদাবরী তীরে বিশাল শাল্মলী তরু' আর কি। এই বাড়ীটির নাম এ দেশের জন-সমাজের কাছে চির-পরিচিত।

বিখ্যাত আইনবিদ্ ও স্বদেশ-বৎসল শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্রের আবাসগৃহ এটি। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে নানাদিক দিয়ে এটি প্রসিদ্ধ হয়ে উঠেছে। আরও আশ্চর্য্য যে ক'টি সংস্কৃতিমূলক সংঘ শ্রীযুক্ত চন্দ্রের আনুকূল্যে ও বদান্যতায় গড়ে উঠেছিল সে ক'টিই 'একে একে নিভিছে দেউটি' আর কি!

আচ্ছা প্রথমতঃ ধরুন শিল্পী সংঘের কথা। এইখানেই কলকাতার ছোট বড় সকল শিল্পি এককালে আপন সংঘ-বদ্ধতার গুণে অসাধ্য সাধন করেছিলেন ১৯৪৭ সালের ঐতিহাসিক বেতার শিল্পী ধর্ম্মঘটের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে এবং তা সার্থক করে তোলেন। বেতারের ডেপুটি-ডাইরেক্টারকে দিল্লী থেকে সোজা বিমানে করে আসতে হয়েছিল শিল্পী সংঘের সভ্যদের সঙ্গে আপোষ-আলোচনা চালাবার জন্যে। ছোট

বড় সকল শিল্পীকে একত্রিত করে 'এক জাতি এক প্রাণ একতা'র দুর্জ্জয় প্রাচীর গড়ে তুলেছিলেন শিল্পী-দরদী সত্যকার সংগঠক শ্রীযুক্ত সুধীপ্রধান। (অবশ্য এ মতবাদ তিনি কখনই শিল্পীদের মধ্যে প্রচার করেন নি) সংগঠন-সম্পাদক কুশলী সুধীপ্রধানকে লোকলোচনের অন্তরালে থাকতে হয়। সংগঠন-সম্পাদকের এই সাময়িক অনুপস্থিতির সুযোগে, শিল্পী সম্প্রদায়ের স্বার্থপরতার ও ঔদাসিন্তের সুযোগ গ্রহণ করে প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তিরা এই সংঘের ওপর আঘাত হানে। কর্ম্মকর্ত্তা শ্রেণীর শিল্পীরা পরস্পরের দোষারোপ ও নিন্দাবাদ করে নিজেদের কবর নিজেদের হাতেই খোঁড়েন এইখানেই। পারস্পরিক ভুল বোঝাবুঝির ফলে অবস্থা চরমে ওঠে এবং শিল্পী সংঘের অন্তিম ঘনিয়ে আসে। ১৯৫০ সালের প্রথম দিকে সংগঠন-সম্পাদক সুধীপ্রধান উপস্থিত হয়ে দেখলেন শিল্পী সংঘের শ্মশান-শয্যা জানি না সুধীপ্রধান সংঘের পুনরায় প্রাণ-প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হবেন কিনা, কিন্তু আমি জানি এমনি নির্ভীক নিরলস নির্লোভী কর্ম্মীর আন্তরিক চেষ্টা ব্যর্থ হবার নয়। সংগঠক সুধীপ্রধানকে নির্য্যাতিত অত্যাচারিত শিল্পী বন্ধুদের দুরবস্থার কথা স্মরণ করিয়ে 'চিত্রবাণী' শিল্পী-সংঘকে গড়ে তোলার জন্য আহ্বান জানাচ্ছে। কিন্তু সে ডাকে তিনি কি সাড়া দেবেন?

শিল্পী সংঘের শেষ নিশ্বাস যখন পড়ছিল তখনই প্রতিষ্ঠিত হয় শ্রোতৃ-সংঘ। শিল্পী সংঘের কবরের ওপরই কি তার প্রতিষ্ঠা হয়?—তাই কোন কাজ করবার আগেই শ্রোতৃ সংঘের সমস্ত উদ্যোগ আয়োজন যেন স্তিমিত হয়ে এলো। এই সংঘের পুরোভাগে অধ্যাপক খগেন্দ্র নাথ সেনকে দেখে আমি আশান্বিত হয়েছিলাম। কারণ বেতার পুনঃ সংস্কার করে যাঁরা একে জাতীয় সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে চান অধ্যাপক সেন তাঁদেরই একজন বরং এইসঙ্গে আরো একটু যোগ করা যেতে পারে যে এ বিষয়ে এঁর মতো আগ্রহশীল এবং একনিষ্ঠ বেতার বন্ধু বিদগ্ধ জনসমাজে আর নেই। শ্রোতৃ সংঘ বেতার শ্রোতাদের সংঘবদ্ধ শক্তিতে বলীয়ান হয়ে উঠলে বেতারের অন্ধকারে অনুষ্ঠিত বহু অকাজ কুকাজ বন্ধ করে দিতে সমর্থ হবে। বেতার অনুষ্ঠানের উন্নতি ঘটাতে পারবে এবং ভাগ্যবিড়ম্বিত মানুষের মারে মার-খাওয়া শিল্পী বন্ধুদের অবস্থার উন্নতি ঘটাতে পারবে। বিপুল সম্ভাবনা থাকা সত্বেও কিন্তু শ্রোতৃ সংঘের উদ্যোগ আয়োজন স্তিমিত হতে দেখে আশঙ্কিত হচ্ছি—সুধীপ্রধান শিল্পী-সংঘের সঙ্গে শ্রোতৃ সংঘের যোগ সূত্র স্থাপন করে বেতার সম্পর্কীয় এই দুটি অনুষ্ঠানের কর্ম্মধারাকে নিয়ন্ত্রিত করে কলকাতা বেতার সংস্কার সাধনে ব্রতী হোন। সকল প্রকার প্রগতিমূলক সংস্কারের পিছনে 'চিত্রবাণী'র আন্তরিক শুভেচ্ছা ও সহযোগিতা আছে এ কথাই আমরা শিল্পী বন্ধুদের জানাতে চাই।

এই দুটি প্রতিষ্ঠান ২৩ নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটে অবস্থিত কাজেই সমন্বয় সাধনের বিশেষ অসুবিধা কিছু নেই।

এই দুটি প্রতিষ্ঠান ছাড়া আরো দুটি প্রতিষ্ঠান এই বাড়ীতে অবস্থিত তার মধ্যে একটি হলো সংস্কৃতিমূলক প্রতিষ্ঠান 'শনিবারের বৈঠক' ও অপরটি হলো 'কংগ্রেস সাহিত্য সংঘ'। এর মধ্যে প্রথমটির ভাইটামিনের অভাব এবং দ্বিতীয়টি মৃত।

মনে হচ্ছে এই ২৩ নম্বর ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটে যে সংঘ বাসা বাঁধুক না কেন—কয়েক বছরের মধ্যে তা শেষ হয়ে যায়। শিল্পী সংঘ এবং শ্রোতৃ সংঘ, শনিবারের বৈঠক ও কংগ্রেস সাহিত্য সংঘ মরে এ কথাই প্রমাণ করছে কিনা কে জানে।

আপনারা জবাব দিন

এদেশে অন্যায় আর অবিচার বেশী করে সংঘটিত হয় কোন প্রতিবাদ হয় না বলে। প্রতিবাদ করলেই অন্যায়কারী একেবারে নিরস্ত না হতে পারে কিন্তু এ কথা ঠিক যে তার অন্যায় অত্যাচারের ব্যাপকতা ও গতি আপনা হতেই কমে আসে।

আমাদের দেশের বেতার প্রতিষ্ঠানের বেতার কর্তাদের বহুবিধ অন্যায়ের প্রতিবাদ শ্রোতারা না করার দরুণ পরোক্ষভাবে প্রশ্রয় দেন বলেই আজ বেতারে শিল্পীরা মরে যেতে বসেছে।

অন্য দেশে যখন বেতার-প্রতিষ্ঠান লোকের কল্যাণকর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জাতীয় সংস্কৃতিকে উন্নত করার জন্য

উৎসর্গ-প্রাণ, শিল্পী 'সৃষ্টি' এবং 'অন্বেষণ' করে আনার ব্যগ্র ব্যাকুলতায় উদ্‌গ্রীব—তখন আমাদের দেশেরই বেতারে আমাদের দেশের জনেরা 'শিল্পী নিধনে'র উৎকট উল্লাসে ব্যস্ত।

আপনারা যাঁরা বেতারকে ভালবাসেন তাঁদের কাজ হচ্ছে বেতারের কোন অন্যায় দেখলেই তার যোগ্য জবাব দেওয়া। জবাব দেবেন, প্রতিবাদ করবেন কারণ বেতারকে আপনারা ভালবাসেন, এর প্রচারিত অনুষ্ঠান-গুলির জন্য আপনারা 'পয়সা' দেন। শ্রোতাদের পয়সা নিয়েই শিল্পীদের বধ করবার ব্যবস্থা যদি কায়েমী হয়ে ওঠে তার চেয়ে দুঃখের ও লজ্জার কি থাকতে পারে ?

বিদ্যাসাগর মহাশয় বর্ণিত 'গোপাল অতি সুবোধ বালক যাহা পায় তাহা খায়'এর দিন চলে গেছে। বেতারকে সংস্কার করে শিল্পী এবং অনুষ্ঠানের উন্নতি ঘটাতে গেলে শ্রোতাদের তীব্র প্রতিবাদ প্রয়োজন।

বাংলা দেশের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত-শিল্পী বিজন ঘোষ দস্তিদার অসামান্য প্রতিভার অধিকারিণী এবং জনপ্রিয়া শিল্পী হয়েও বেতার কর্ত্তার অঙ্গুলি হেলনে আজ কলকাতা বেতার ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়েছেন, বাংলা সাহিত্যের অপরাজেয় কথাশিল্পী ও সুবক্তা যশস্বী অনুবাদক শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টো-পাধ্যায় আজ বেতার থেকে নির্ব্বাসিত, আধুনিক কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গায়ক সুরসাগর জগন্ময় মিত্র বেতারে যেন 'হরিজন'—রসরসিক দা'ঠাকুর (শরৎচন্দ্র পণ্ডিত) কলকাতা বেতারে পদার্পণ করতে ঘৃণা বোধ করেন, বাংলার নাট্যমঞ্চের প্রতিভার দুলাল শিশিরকুমার ভাদুড়ী অনাদৃত কেন ?—এই প্রশ্নের জবাবে সরকারী উত্তর অবশ্য আছে এবং বেতার মারফৎ বেতার কর্ত্তারা যা বলে থাকেন তা এত দুর্ব্বল, নিরর্থক ও হাস্যকর তা বলবার নয়।

কিন্তু শ্রোতাদের কথা হচ্ছে : আমরা ভাল অনুষ্ঠান চাই, ভাল শিল্পী চাই, সত্যিকার শিল্পীদের আমরা এভাবে মরে যেতে দিতে পারি না। শিল্পী এবং বেতার কর্ত্তাদের মধ্যে একাধিক ব্যাপারে মতবিরোধ থাকতে পারে কিন্তু তাই বলে সেই সম্পর্ক যদি 'ভাসুর ভাদ্রবৌ'-এ গিয়ে দাঁড়ায় তাহলে কলমের খোঁচায় শিল্পীকে বেতার থেকে নির্ব্বাসিত করতে হবে তাই বা কেমন কথা ? শিল্পী ছাড়া বেতার চলতে পারে না। শিল্পী সৃষ্টি যদি নাও করতে পারো শিল্পী বধ তোমরা কিছুতেই করতে পারো না।

—বেতার শ্রোতাদের প্রতিবাদ ধ্বনিত হোক। বেতারের রুদ্ধ কক্ষের 'সাউণ্ড-প্রুফ' দেয়াল ভেদ করে কর্ত্তাদের অন্যায়ের প্রতিবাদ আপনারা পৌঁছে দিন—আপনারাই সমুচিত জবাব দিন।

সব ঝুটা হ্যায় !

'গ্রামে গ্রামে সেই বার্ত্তা রটি গেল'-র মতো সংবাদপত্র অফিসে অফিসে জুনের ২৬শে তারিখে খবর পৌঁছলো কলকাতা বেতারের মুখপত্র 'বেতার জগৎ'-এর সহ-সম্পাদক নেওয়া হবে। সংবাদ পাঠালেন বেতারের খোদ কর্ত্তা অশোক সেন। শিবিরে শিবিরে সে কি উত্তেজনা ! 'আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান'-এর মতো কাড়াকাড়ি পড়ে গেল আবেদন পত্র পাঠানোর।

সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে ২৬শে তারিখে খবর এলো যে ৩০শে জুন আবেদন করার শেষ দিন। 'শিয়রে সংক্রান্তি' করে খবর দেবার কি অর্থ থাকতে পারে তা জানেন বেতারের মহাপ্রভুরা।

মজা আরো এক কাঠি চড়লো 'ইনটারভিউয়ে'র দিন বেতারের বড় কর্ত্তা, মেজ কর্ত্তা (এর দাপট বেশী) আর 'বেতার জগৎ'-এর একজন 'ইনটারভিউ' নিলেন। অমৃতবাজার, আনন্দবাজার, যুগান্তর, লোকসেবক, সত্যযুগ ও চিত্রবাণীর সাংবাদিক বন্ধুরা হাজির হলেন। যত অদ্ভুত, যত উদ্ভট যত বোকা প্রশ্ন থাকতে পারে তাই নিক্ষিপ্ত হতে লাগলো পদপ্রার্থীদের প্রতি। সবচেয়ে বেশী বোকার মতো প্রশ্ন করেছেন আমাদের মেজ কর্ত্তা—এঁরই দাপট বেতারে বেশী। সবচেয়ে মজার প্রশ্ন করা হয়েছিল আনন্দবাজারের সাংবাদিক বন্ধুটিকে : আনন্দবাজারের সার্কুলেশন কত ? ভাগ্যিস্ জিজ্ঞাসা করে নি আনন্দ-বাজারের শ্রীযুক্ত সুরেশ মজুমদার এম পি (বেতারের উপ-দেশক মণ্ডলীর অন্যতম সভ্য) দিনে কতবার কোট বদল করেন ? সাংবাদিক বন্ধুদের বিড়ম্বনা কম হয় নি। সম্প্রতি আমার দপ্তরে যে শেষ খবর এসেছে—তা শুনে 'বেতার

জগৎ'-এর পদপ্রার্থী বন্ধুরা চমকে উঠবেন। খবরটি হচ্ছে : এই সহ-সম্পাদকের পদটির আর্থিক ব্যবস্থা 'বাজেটে' নেই—বাজেট যদি নাই থাকে তাহলে এতগুলো ভদ্র সন্তান ও সন্ততিকে (দুজন মহিলা পদপ্রার্থিণী) নিয়ে রঙ্গ-রসিকতার হঠাৎ খেয়াল ২৩শে জুন জাগলো কেন তা তিনিই বলতে পারেন যিনি সব করাচ্ছেন, আমরা তো নিমিত্ত মাত্র! ব্যাপারটা একটু ধোঁয়াটে ধোঁয়াটে লাগছে? —সত্যি মিথ্যে আপনারা বেতারের বড় আর মেজ কর্ত্তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করুন না? আমার সাংবাদিক বন্ধুরা কি এ বিষয়ে একটু সাহস অবলম্বন করবেন?

পরিণয় পরিক্রমা

কলকাতা বেতার নাকি একেবারে স্বর্গের নন্দনকানন। যত সুর-সুন্দরীদের ভীড় সেখানে, কত হাসি কত গানের মেলা সেখানে বলবার নয়। প্রেম বস্তুটি নাকি সেখানে সকল হৃদয়ে সর্ব্বদাই একেবারে লাগাম কশিয়ে আছে। দৃষ্টি বিনিময়ের মধ্যেই নাকি হৃদয় বিনিময় হয়ে যায়। সাম্প্রতিক কালে বেতারের সঙ্গীত বিভাগের কর্ত্তা সঙ্গীতজ্ঞ প্রদ্যুম্ন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে বেতারের রাগ-সঙ্গীত শিল্পী যশস্বিনী পূরবী মুখোপাধ্যায়ের অনুরাগ-বিবাহ, বেতারের বিভাগীয় কর্ত্তা পি, চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে সঙ্গীত বিভাগের অন্যতম অধিনায়িকা উমা মজুমদারের সঙ্গে প্রেম-বিবাহ কলকাতার যুবক মহলে দারুণ চাঞ্চল্য এনেছে। দু' একটি ঘটনার দ্বারা একটি বিশেষ সিদ্ধান্তে পৌঁছনো উচিত হবে না ব'লে আগষ্ট মাসের ইংরাজী 'দীপালী' মাসিক পত্রিকায় কলকাতা বেতার কেন্দ্রে এ পর্য্যন্ত যতগুলি প্রেম-বিবাহ সংঘটিত হয়েছে তার তালিকা আমার নাকের সামনে তুলে ধরা হলো। হতচকিত হয়ে যেসব ভাগ্যবান ও ভাগ্যবতী দেখলাম তাদের তালিকা যথাযথ উদ্ধৃত করছি। প্রেমের ব্যর্থতায় যে কত হৃদয় ভেঙেছে তার তালিকা কিন্তু আমার জানা নেই। জানি না আমার সাংবাদিক বন্ধু এই দীর্ঘ তালিকা দেখেই স্বর্গের নন্দনকাননের মালী হবার প্রার্থী হয়ে ছুটে গিয়েছিলেন কিনা।

বেতারে প্রেম-বিবাহের তালিকা পেস করলাম তবে শুনছি এটা নাকি পূর্ণ তালিকা নয়—আরো কটির নাম 'ওয়েটিং লিষ্টে' আছে।

এ পর্য্যন্ত যত প্রেম-বিবাহ হয়েছে তার তালিকা :

১। ভিক্টর পরাণ-জ্যোতির (প্রধান কর্ণধার, কলিকাতা) সঙ্গে মিসেস কমলা চৌধুরী (পরিচালিকা মহিলা-মহল)

২। প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের (সহকারী কর্ণধার, কলিকাতা) সঙ্গে অরুন্ধতী গুহ ঠাকুরতা (রবীন্দ্র-সঙ্গীতশিল্পী)

৩। সুধীন চট্টোপাধ্যায়ের (সঙ্গীত বিভাগের কর্ত্তা) সঙ্গে উমা ভট্টাচার্য্য (সঙ্গীত-শিল্পী,আধুনিক)

৪। দক্ষিণা ঠাকুরের (যন্ত্র-শিল্পী) সঙ্গে শোভনা দেবী (নাট্য-শিল্পী)

৫। দেবাশীষ সেনগুপ্তর (শিল্পী) সঙ্গে মিস্ অনিমা দাসগুপ্ত (সঙ্গীত শিল্পী, আধুনিক)

৬। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের (রবীন্দ্র-সঙ্গীত শিল্পী) সঙ্গে মিস্ বেলা মুখোপাধ্যায় (সঙ্গীত-শিল্পী, আধুনিক)

৭। প্রদ্যুম্ন মুখোপাধ্যায়ের (সঙ্গীত বিভাগের কর্ত্তা) সঙ্গে মিস্ পুরবী মুখোপাধ্যায় (সঙ্গীত শিল্পী, রাগপ্রধান)

৮। এস চট্টোপাধ্যায়ের (বিভাগীয় কর্ত্তা) সঙ্গে মিস্ উমা মজুমদার (সঙ্গীত-বিভাগের অধিনায়িকা)

অবশ্য আপনারা যদি চান কার হৃদয় কতবার ভেঙেছে এবং কতবার কার হৃদয় কে জোড়া লাগিয়েছে তারও একটি তালিকা আমাদের বেতার বিশারদ তৈরী করছেন। অতএব ধৈর্য্য ধরুন।

রেডিও প্রোগ্রাম সংক্ষেপ

ব্যয়-সঙ্কোচের নয়া পরিকল্পনা

বিশ্বস্তসূত্রে জানা গেল, অল ইণ্ডিয়া রেডিও-র কর্তৃপক্ষ দৈনন্দিন রেডিও প্রোগ্রাম থেকে এক ঘণ্টা সময় সংক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত করেছেন। আগামী ১লা অক্টোবর থেকে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে অবস্থিত ২১টি ষ্টেশনে এই সিদ্ধান্ত কার্যকরী করা হবে। এক ঘণ্টা প্রোগ্রাম সংক্ষেপ করে কর্তৃপক্ষ বৎসরে দশ লক্ষ টাকা খরচ বাঁচাবেন বলে আশা করছেন।

সময় পরিবর্ত্তন

সুজাগঞ্জ, মেদিনীপুর থেকে গ্রাহক লক্ষ্মীকান্ত দাস আমাদের প্রচারিত জানিয়েছেন মস্কো বেতার থেকে যে বাংলা অনুষ্ঠান হয়, তার সময় এখন পরিবর্ত্তিত হয়ে রাত্রি ৮৷৹ টায় (ভারতীয় সময়) প্রচারিত হচ্ছে—২৫·১৭ আর ২৫·৩৪ মীটারে।

আমরা এ বিষয়ে খোঁজ নিয়ে জানলাম, তিনি যা জানিয়েছেন, তা ঠিকই ; আগেকার সময়ের বর্ত্তমানে এইরূপ পরিবর্ত্তন হয়েছে।

আপনাদের চিঠি

শিখা চট্টোপাধ্যায়, সর্দার শঙ্কর রোড, কালীঘাট

সুশ্রী, সুন্দর ও অপদার্থ অভিনেতা প্রদীপ ব্যাটবল-এর পরবর্তী ছবি কি ?

উনি, ব্যাটবল নন—বটব্যাল! ওঁর পরবর্তী ছবি, 'সিনেমা হইতে বিদায়!' সত্যি কিনা জানি না! তবে লোকে বলাবলি করে!

'মাইকেল মধুসূদনে'র 'দেবযানী' ও 'বড়বৌ'-এর উষা খাঁ কি একই অভিনেত্রী ?

নাম এক নয়; তবে রূপ দেখে তাই মনে হয়!

সুনীলবরণ মজুমদার, সাকচী, সিংভুম

রবীন মজুমদার ও অসিতবরণের মধ্যে গানে কে শ্রেষ্ঠ ?...'সংসারে'র খবর কি ?

পরের মুখে ঝাল খেয়ে লাভ কি ? আপনার কাছে যাকে ভালো লাগে, আমার কাছে তাকে ভালো নাও লাগতে পারে! আর 'সংসারে'র খবর ? কোন্ সংসারের খবরই বা ভালো ? শেয়ালকাঁটা মেশানো তেল আর কাঁকরমণি চালে সকল সংসারই অস্থির! তবে, ছবির কথা যদি বলেন, তাহলে বলবো 'নন্দরাণীর সংসারের' পর আর কোনো 'সংসার'-এর খবর জানিনা।

মলিনা দেবীর স্বামীর নাম কি ? সুনন্দা দেবী কি বিধবা ?

Director of Informationকে জিজ্ঞাসা করুন।

সন্তোষকুমার ভট্টাচার্য, আভাদী, মাদ্রাজ

সম্প্রতি ক'লকাতায় গিয়ে লক্ষ্য করলাম বহু বিঘোষিত 'অপবাদ' ছবিতে ভিড় নেই; কিন্তু 'মাইকেল মধুসূদন 'দেখতে অসম্ভব ভিড়। এর কারণ কি ?

কারণ অতি সহজ। লোকে বাঁদরামি সহ্য করতে রাজী নয়।

মৃণালকুমার মজুমদার, ডিব্রুগড়, আসাম

সোজাভাবে প্রশ্ন করলেও যে বাঁকাভাবে উত্তর দেয়, তাকে কি ক'রে শায়েস্তা করতে হয় ?

দ্বিতীয়বার প্রশ্ন না করে।

যূথিকা ঘোষ, মেদিনীপুর

কিছুদিন আগে জনরব উঠেছিল—সিনেমা অভিনেতাদের সঙ্গে রেডিও-শিল্পীদের একটি প্রদর্শনী ফুটবল ম্যাচ হবে। এটা সত্যি, না গুজব ?

একেবারে গুজব নয়। চেষ্টা চলছে। তবে 'খিড়কি'র মতো একদিকে ১১জন পুরুষ-শিল্পী, অন্যদিকে ১১জন মহিলা-শিল্পী থাকবেন কিনা—তা ব'লতে পারি না।

শুভেন্দু সরকার, কাশীপুর, বাঁকুড়া

রবীন মজুমদারের ডাক-নাম কি ? সুনন্দা দেবী ফাঁকা গলায় গাইতে পারেন ?

ডাকনামে কেউ আজ তাঁকে ডাকে না। রবীন মজুমদার নামেই তাঁর নামডাক! সুনন্দা দেবী গলা ফাঁক করেই গেয়ে থাকেন। সবাই তাই গায়!

মহবুব, চট্টগ্রাম

গীতা নিজামী, নিগার, মনোয়ার সুলতানা, নারগীস্, রেহানা, নিরুপা রায়, নিম্মি, বনমালা, খুরসীদ, বেগম পারা, গীতাবালী, কামিনী কৌশল, মীনা, শশীকলা, মধুবালা এবং গোলাপ খাতুন-এঁদের বিয়ে হয়েছে কি? তাঁদের স্বামীর নাম কি?

আমাদের কার্য্যালয়কে 'প্রজাপতির-অফিস' ঠাউরে আপনি ভুল করেছেন! এক কাজ করুন না। সোজা বোম্বাই চ'লে যান। তারপর সেখানকার ষ্টুডিয়োগুলি ঘুরে ঘুরে আপনার তথ্য সংগ্রহ করুন। অবিশ্যি, তাতে যদি আপনার কপালে কোনো লাঞ্ছনা জোটে, আমরা সেজন্য দায়ী থাকব না। তবে 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' হ'লে—আমরা সে খবরটা ছেপে দিতে রাজী আছি।

জ্যোতিঃপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়, দক্ষিণ গোবিন্দপুর, ২৪-পরগণা

চলতি বাংলা ছবির মধ্যে কোন্‌টা ভালো হয়েছে? বাংলা দেশে '৪২ আগষ্ট চিত্রখানি কি মুক্তি লাভ করবে না?

'মাইকেল মধুসূদন'। '৪২ আগষ্ট নামে কোনো বাংলা ছবি ওঠে নি। তবে '৪২ এখন সরকারী অপারেশান থিয়েটারে। কয়েক জায়গায় কাটা-ছেঁড়ার পর ডাক্তাররা পরীক্ষা ক'রে দেখছেন তাঁদের এই সিরিয়স পেসেণ্টকে এবার ছেড়ে দেওয়া যায় কিনা!

শক্তিসাধন পাল, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া

শারদীয়া সংখ্যা ভিন্ন আপনাদের 'চিত্রবাণী'তে কোনো অভিনেতা বা অভিনেত্রীর জীবনী দেখতে পাওয়া যায় না কেন?

প্রথমতঃ, অভিনেতা-অভিনেত্রীদের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে মাথা ঘামানোর অবসর আমাদের কম। দ্বিতীয়তঃ, যাঁরা অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সাধারণ জীবনকে কল্পনার রঙ্‌ মিশিয়ে অসাধারণ ক'রে দেখান—আমরা সে দলে নই। অন্যান্য সংখ্যায় জ্ঞাতব্য অনেক বিষয়ের আলোচনা করতে হয় বলে, আমরা কেবল শারদীয়া সংখ্যার কয়েক পাতা অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সাধারণ জীবনের হুবহু প্রতিচ্ছবি রূপায়িত করবার জন্য নির্দিষ্ট রেখেছি।

অকপট হালদার, রাঁচী

যাঁরা কেবল অভিনেত্রীদের জাতি, বয়স ও ঠিকানার সন্ধান ক'রে চিঠি লেখেন, আমি তাঁদের বলি মেরুদণ্ডহীন ক্লীব—বলিষ্ঠ ও সুস্থ চিন্তাশক্তি তাঁদের নেই, তাঁরা সমাজের অকল্যাণ। আপনার কি মত?

রাঁচীতে বাস করলেও আপনি সম্পূর্ণ সুস্থমস্তিষ্কসম্পন্ন, এ কথা অকপটে স্বীকার করি।

শীলা চট্টোপাধ্যায়, টেগোর টাউন, এলাহাবাদ

বাংলা দেশের সংস্কৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিরা যদি একটি নাট্য প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে তোলেন তাহ'লে বাংলা ছবি ও নাটকের অনেক উন্নতি হ'তে পারে ব'লে আমার বিশ্বাস।

আমরাও বিশ্বাস করি সে-কথা। ক'লকাতায় ছোট-খাটো যে-সব সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আছে তাঁদের অভিনয়-অনুষ্ঠান প্রায়ই আমাদের মুগ্ধ করে রুচি ও শালীনতায়। কিন্তু, শুধু সেইখানেই এদেশের ছবি ও নাটকের উন্নতি নির্ভর করছে না। এজন্য চাই সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় একটি স্থায়ী অভিনয়-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। কেবল সেই প্রতিষ্ঠানের সার্টিফিকেট ছাড়া কেউ সিনেমায় বা রঙ্গমঞ্চে ছাড়পত্র পাবেন না—এমন যদি কোনো ব্যবস্থা হয় তাহলে সত্যিকারের উন্নতি দেখা দেবে।

চঞ্চল চট্টোপাধ্যায়, দিনহাটা, কুচবিহার

সুরাইয়া, নার্গিশ, কাক্কু, নিম্মি, রেহানা, গীতাবালী—এঁরা হিন্দু না মুসলমান ?

ব্যক্তিগত জীবনে এঁরা কোনো না কোনো ধর্মাবলম্বী ; কিন্তু অভিনয়-জীবনে এঁদের' একজাতি-একপ্রাণ-একতা।'

ফজলে রব্বি, পল্লীতলা, রাজসাহী

'চিত্রবাণী'তে প্রকাশিত 'অতলস্পর্শ' নাটিকাটির রচয়িতা কি গায়ক ধীরেন মিত্র ?

না।

স্মৃতিপদ চট্টোপাধ্যায়, পুরুতল্লী, মালদহ

একই দৃশ্যে একই ব্যক্তি সামনাসামনি বসে তাস খেলছে অথবা টেবিলের সামনে মুখোমুখী ব'সে আছে, এ দৃশ্য কি ক'রে তোলা সম্ভব ?

কেন, যে কবে সিনেমার ছবি তোলা সম্ভব ! দুটো ছবি আলাদা ক'বে তুলে জুড়ে দেওয়া হয় যান্ত্রিক কলা

প্যারামাউণ্টের আগামী চিত্র 'স্যামসন এ্যাণ্ড ডেলিলা' চিত্রে
ম্যাচার ও হেডি ল্যামার

উদীয়মানা ব্রিটিশ চিত্রতারকা
রোজামণ্ড জন

ভারত জাতীয় চিত্র প্রতিষ্ঠানের আগামী
'সে নিলো বিদায়' ছবিতে কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়

নারাঙ্‌ পিকচারের 'অপরাজিতা' ছবিতে
স্মৃতিরেখা ও কানু বন্দ্যোপাধ্যায়

চিত্রবাণী

তৃতীয় বর্ষ শারদীয়া, ১৩৫৭ প্রথম সংখ্যা

উৎসবমুখরিত লগ্নে

বর্ত্তমান সংখ্যা থেকে 'চিত্রবাণী' তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ করছে। উদ্বেগসঙ্কুল ও বিপর্য্যয়-বহুল দিনের মধ্য দিয়ে দীর্ঘ দুটি বছর পেছনে ফেলে আসার গৌরব যাঁরা 'চিত্রবাণী'কে দিয়েছেন— দিয়েছেন উৎসাহ, আশা—দিয়েছেন সমর্থন, জানিয়েছেন অভিনন্দন—অকপটে দেখিয়ে দিয়েছেন তার দোষত্রুটি—স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন তার মহত্তর সম্ভাবনার কথা, সজাগ করিয়েছেন তার আগামী দিনের দায়িত্ব সম্বন্ধে—তাঁদের নিবেদন করি কৃতজ্ঞতার অঞ্জলি অন্তর ভ'রে—আজকের এই বর্ষ-বার্ষিকী ও শারদীয়া উৎসবের মিলনক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে জানাই তাঁদের প্রীতি ও শুভেচ্ছা— জানাই কাছের ও দূরের জনকে—জানাই পরিচিত অপরিচিত জনকে—জানাই অগণিত পাঠক-সাধারণকে, যাঁরা 'চিত্রবাণী'র সঞ্জীবনী শক্তি, যাঁরা শুনিয়েছেন তাকে মন্ত্র বরাভয়—যাঁরা রয়েছেন আসাম, বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা তথা সারা ভারত ও পাকিস্তান জুড়ে। এ প্রীতি ও শুভেচ্ছার বাণী প্রেরণ করি আজ তাঁদেরও কাছে, চলার পথে 'চিত্রবাণী' যাঁদের আঘাত দিয়েছে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে তার আদর্শের নিষ্ঠায়। রঙ্গজগতের বৃহত্তর স্বার্থ ও মহত্তর অধ্যায়ের কথা স্মরণ ক'রে 'চিত্রবাণী' যাঁদের আঘাত দিতে বাধ্য হয়েছে, তাঁদের কাছ থেকে আজ তার দাবী সম্মিলিত শুভেচ্ছা ও প্রীতি বিনিময়ের—আজকের এই উৎসবমুখরিত লগ্নে অবসান হোক ভুল বোঝাবুঝির, সঞ্চিত হোক নূতন সম্পর্ক অনাগত দিনের জন্যে!

সম্পাদক

বিদ্যাসাগর

বাংলাদেশের মহাপুরুষ-জীবন-অবলম্বনে রূপায়িত চতুর্থ ছবি হলো এম্‌ পি প্রোডাকসন্সের 'বিদ্যাসাগর'। যে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে ছবিখানি সেলুলয়েডের ফিতায় রেখায়িত হয়েছে তা অভিনন্দনযোগ্য। 'বিদ্যাসাগর' পতনোন্মুখ বাংলা ছায়াছবি-শিল্পকে মর্যাদা দান করেছে।

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর একাধারে পাণ্ডিত্য, শিক্ষাবিস্তারক, দানবীর ও সমাজ-সংস্কারক। পাশ্চাত্য-সভ্যতার প্লাবনে বাংলার সমাজ-জীবনে যখন বিরাট ভাঙন ধরেছিল তখন এই মহাপুরুষই হিন্দু সভ্যতার আদর্শকে সামনে রেখে সেই ভাঙনের প্রতিরোধ ক'রেছিলেন। তাঁর জীবনেতিহাস যেমনি বিরাট, তেমনি নাটকীয়। লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক বনফুলই সর্বপ্রথম তাঁর অসাধারণ জীবনকে কেন্দ্র ক'রে একটি পূর্ণাঙ্গ নাটক রচনা করেন। দুঃখের বিষয়, কোন্ কারণে জানি না, সে নাটক আজও বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হলো না, ছায়াচিত্রেও রূপ পেল না তা। অথচ, 'বিদ্যাসাগরে'র অমন সার্থক জীবননাট্য আর রচিত হয়নি।

পরিচালক কালীপ্রসাদ ঘোষ নিজস্ব ভঙ্গীতে এবং চলচ্চিত্রের উপযোগিতার কথা মনে রেখে 'বিদ্যাসাগরে'র চিত্রনাট্য রচনা করেছেন। ইতিপূর্বে যে তিনখানি জীবন-নাট্য ছায়াচিত্রে রূপায়িত হয়েছে তার কোনটিতেই মূল চরিত্র পূর্ণ বিকশিত হতে পারেনি চিত্রনাট্য রচনার দোষে। কোনোটি হয়েছে ঘটনাপ্রধান, কোনোটি বা সংলাপ-প্রধান। কিন্তু 'বিদ্যাসাগরে' এ দোষ নেই বললেই চলে। এতে মূল-চরিত্র-বিকাশের জন্য যে সকল ঘটনা সন্নিবেশিত হয়েছে তা সংক্ষিপ্ত হলেও যথার্থ। সমাজ-সংস্কারক, দয়ার-সাগর, তেজস্বী বিদ্যাসাগরকে সার্থকভাবে রূপায়িত করা হয়েছে [illegible] ছবির পরিসমাপ্তি দর্শকদের ক্ষুব্ধ করবে—তার আকস্মিকতার জন্য। যে উচ্চগ্রামে ছবির সুর বাঁধা, তা যেন হঠাৎ ছিন্ন হয়ে গেল দ্রুত সমাপ্তির মুখে।

সংলাপ রচনার দিক থেকে বোধ হয় অনেক ক্ষেত্রেই বাস্তবতাকে লঙ্ঘন করা হয়েছে। প্রমাণ স্বরূপ, মিঃ মার্শাল ও গভর্ণর হ্যালিডের সংলাপ। এ যেন বাংলা-নাটকের সেই কাপ্তানো, ওআটসন জাতীয় ইঙ্গ-চরিত্রের মার্কা-মারা ইঙ্গ-বঙ্গীয় সংলাপ! বিদ্যাসাগর মহাশয় ইংরাজী ভাষাতেও সুপণ্ডিত ছিলেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে তাঁর যেসব ছাত্র ছিল, তারা সবাই ইংরেজ। তাঁদের শিক্ষাদানের মাধ্যম নিশ্চয়ই ইংরাজী ছিল। ইতিহাসই তার প্রমাণ। এটাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত যে, বিদ্যাসাগর মহাশয় মিঃ মার্শাল, গভর্ণর হ্যালিডে প্রভৃতির সঙ্গে ইংরাজীতেই কথোপকথন করতেন। তাহ'লে সেই রূপ না ক'রে এই মিশ্রণ ঘটাবার কি প্রয়োজন ছিল? সংলাপ-রচয়িতা হয়তো বলবেন—সর্বসাধারণের সহজবোধ্য সংলাপ হিসেবেই এই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। কিন্তু আমরা বলব, এই কয়েকটি ক্ষেত্রে যদি ইংরাজী সংলাপ দেওয়া হ'তো, তাহ'লেও তা সাধারণের বোঝার দিক থেকে কোনরূপ বাধার সৃষ্টি করতো না। কারণ, অভিনয়ের ইঙ্গিতে ও ভঙ্গীতেই চরিত্রের বক্তব্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আর, তাছাড়া স্বল্প-সংখ্যক ইংরাজী অনভিজ্ঞ দর্শকের জন্য এই অসঙ্গতি সমর্থন করা যায় না।

অভিনয়ের দিক থেকে সার্থক ও বিস্ময়কর অভিনয় করেছেন 'বিদ্যাসাগরে'র ভূমিকায় পাহাড়ী সান্যাল। বিদ্যাসাগরের তেজস্বিতার ভাব অতি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তাঁর অভিনয়ে। রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের পণ্ডিত-মণ্ডলীর সম্মুখে বিধবা-বিবাহের অনুকূলে তাঁর বক্তব্য পেশ

নব-দম্পতির বাসরগৃহের সঙ্গীত-শ্রবণে তাঁর তৃপ্তির অভিব্যক্তি, সাহেবী-পোষাক পরিধানের জন্য গভর্ণর হ্যালিডের প্রস্তাবের উত্তরে তাঁর সদম্ভ প্রত্যাখ্যান দর্শকচিত্তে গভীরভাবে রেখাপাত করে। কিন্তু রূপসজ্জার ব্যাপারে চির-পরিচিত পাহাড়ী সান্যালের মুখখানিই সর্বদা উদ্ভাসিত হয়েছে ব'লে তাঁকে একটিবারের জন্যও বিদ্যাসাগর ব'লে কল্পনা করা যায়নি। রসোপলব্ধির দিক থেকে এ একটা মস্ত অন্তরায়!

রূপসজ্জার এই অসঙ্গতি ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভগবতী দেবীর ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করা যায়। অথচ, ঐ দু'টি চরিত্রে যথাক্রমে অহীন্দ্র চৌধুরী ও মলিনা দেবী চমৎকার অভিনয় করেছেন। রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকায় কমল মিত্র, মাইকেলের ভূমিকায় [illegible] ও রামকৃষ্ণের ভূমিকায় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে কথায় [illegible]। সুরবালার চরিত্রে শোভা সেনও তাঁর কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। বালক বিদ্যাসাগরও সুন্দর। বিশেষভাবে আর কারুর নাম উল্লেখ না করলেও প্রত্যেকেই স্ব-স্ব ভূমিকার মর্যাদা রক্ষা করেছেন।

এই ছবির শিল্পনির্দেশনা যুগোপযোগী হয়েছে সন্দেহ নেই কিন্তু কলেজ স্কোয়ারের রক্ষিত বিদ্যাসাগরের মর্মর মূর্তি ও সংস্কৃত কলেজকে স্টুডিয়োর মধ্যে তৈরী করবার কোনো সার্থকতা খুঁজে পাই না। ঐ দু'টির বাস্তব চিত্র-গ্রহণই অধিকতর হৃদয়গ্রাহী হতো। আর একটি কথা। ছবির প্রায় সর্বত্রই বেশ একটা গোছানো-ভাব। বিদ্যাসাগর কি সব সময় সুসজ্জিত কক্ষে ব'সে লেখাপড়া করতেন—তাঁর বইপত্রও কি সর্বদা অতি সন্তর্পণে গোছানো থাকতো? এইসব ক্ষেত্রে যা বাস্তব তারই যথার্থ চিত্রণ যুক্তিসঙ্গত!

ছবির চিত্রগ্রহণ ও শব্দধারণে এম পি প্রোডাকসন্সের খ্যাতি অক্ষুণ্ণ আছে। পরিশেষে, আবার বলি যে, ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অসঙ্গতি থাকা সত্ত্বেও 'বিদ্যাসাগর' বাংলা ছায়াছবির ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এজন্যে প্রযোজক, পরিচালক ও অভিনেতৃবর্গ সকলেই ধন্যবাদের পাত্র।

—চিত্রভানু

যুগদেবতা

যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের অলৌ[illegible] জীবনেতিহাসকে কেন্দ্র ক'রে ১৯৪৮ সালের ১৯শে নভেম্বর দক্ষিণ-কলিকাতার একমাত্র রঙ্গমঞ্চ 'কালিকা-থিয়েটারে' [illegible] মুখোপাধ্যায়ের 'যুগদেবতা' নাটকটির উদ্বোধন হয়। কাহিনী পরমহংসদেবের প্রতি ভক্তিতে এবং কতকটা অভিনেতা-অভিনেত্রী সজ্জার নৈপুণ্যে তা জনসমাগম-আকর্ষণে সফল হয়। সেই সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে লেখক [illegible] সেই 'যুগদেবতা' নাটকখানিকে চিত্রে রূপায়িত করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় নাটক যুগদেবতা যে-কারণে ব্যর্থ, ঠিক সেই কারণেই চিত্র যুগদেবতা সাফল্য-লাভে বঞ্চিত। কারণটি হ'লো রূপকের মিথ্যা জাল-বিস্তার!

বাস্তব আর রূপক পরস্পরবিরোধী। রূপক সৃষ্টি করা চলে সেই জিনিসের যা আমাদের কল্পলোকে বিচরণ করে। রূপকের মধ্যে বাস্তব-সত্তা যদি প্রচ্ছন্নভাবে থাকে, তাহ'লে ক্ষতি নেই, কিন্তু তা প্রকট হ'লেই যত অনর্থের সৃষ্টি হয়। 'যুগদেবতা'র ক্ষেত্রে তাই হয়েছে। প্রথমতঃ পরমহংসদেব ঐতিহাসিক চরিত্র। তাঁর জীবনের খুঁটিনাটি পুঁথিপত্রের মধ্যে স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ আছে। অর্থাৎ, তিনি আমাদের কাছের মানুষ, বাস্তব জগতের চরিত্র। তাঁকে নিয়ে রূপক করা চলে না কিছুতেই। পরমহংসদেবকে, 'রঘুনাথ' মাতা চন্দ্রমণিকে 'ইন্দ্রাদেবী', জনক ক্ষুদিরামকে 'জগৎরাম', সারদামণিকে 'বাণী,' রাণী রাসমণীকে 'রাণী নারায়ণী', 'হৃদয়রামকে রূপরাম', মথুর বিশ্বাসকে 'বৃন্দাবন', নরেন্দ্রনাথ (বিবেকানন্দ) কে 'লোকেন' রূপে রূপকভাবে চিত্রিত ক'রে, আবার সেই সঙ্গেই আনা হয়েছে কেশবচন্দ্র সেন, বলরাম বসু, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি বাস্তব চরিত্র। মূল চরিত্রগুলির নামের পরিবর্তন ঘটেছে কিন্তু ঐতিহাসিক দক্ষিণেশ্বর, দ্বাদশ শিবালয়, পাশাপাশি রাধাশ্যাম ও কালী মন্দির ইত্যাদি অবিকৃতরূপে স্থান পেয়েছে। এই জগাখিচুড়ি অন্ধের আস্বাদন যোগ্য হলেও, চক্ষুষ্মানের অভোগ্য!

একথা আমরা অত্যন্ত স্পষ্ট ক'রেই বলতে চাই যে, ভারতের মহাসাধক রামকৃষ্ণদেবের পূত জীবন-চরিত নিয়ে এমন ছেলেখেলা করা প্রযোজক বা সেন্সরবোর্ড কারোই উচিত হয়নি। প্রযোজকের ভক্তি ও সদিচ্ছার পরাকাষ্ঠা দেখা যেত সেইখানে, যেখানে তিনি ঐতিহাসিক চরিত্রের যথাযথ-চিত্রণের ছাড়পত্র আদায় করে আনতে পারতেন। সেন্সর বোর্ডও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতেন এই রকম ছবি তোলবার অনুমতি না দিয়ে। হয় যথাযথভাবে ছবি তুলতে দেওয়া হোক, না হয় একেবারেই বন্ধ হোক—মাঝামাঝি পথ অনুসরণ করা বা করতে দেওয়া উভয়ই অনুচিত।

আমরা বুঝতে পারি না যে, কোন্ কারণে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বা স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি চরিত্রের রূপায়ণে তাঁদের আসল-নাম প্রয়োগ বন্ধ হয়। ভয়টা কিসের জন্য? চরিত্র-রূপায়ণে যদি অসঙ্গতি বা বিকৃতি দেখা দেয়, তাহ'লে মূল ব্যক্তির প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হবে এই তো? হায়রে, রূপকের জালে জড়িয়ে তাকে কি আরও অসঙ্গত এবং আরও বিকৃত ক'রে তোলা হচ্ছে না? মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের জীবন অবলম্বন ক'রে যখন ছবি ওঠে তখন যদি কোনো প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে আপত্তি না উঠ্‌তে পারে তাহ'লে রামকৃষ্ণপরমহংস বা স্বামী বিবেকানন্দের বেলাতেই বা উঠবে কেন? হিন্দুর কাছে মহাদেব, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীদুর্গা প্রভৃতি দেবদেবী নিত্য আরাধ্য ও পরম শ্রদ্ধার বস্তু। সেই মহাদেব, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীদুর্গা যখন যাত্রা, থিয়েটার ও সিনেমার মাধ্যমে দেখা দেন, তখন কেউ তো আপত্তি তোলেন না, তাঁদের মহিমা তো কমে যায় না!—এই সব দিক ভেবে দেখতে হবে। কোনো মহাপুরুষের প্রতি কোনরকম অসম্মান হয়—এ যখন কেউই চান না, তখন রূপকের বোরখা পরিয়ে যুগদেবতা জাতীয় প্রহসন-সৃষ্টির মানে কি?

ছবি হিসেবে 'যুগদেবতা' ব্যর্থ বাংলা-চলচ্চিত্রের মধ্যে স্থান করে নিতে পারবে অনায়াসেই। কাহিনী ও চিত্রনাট্য-রচনা বিশেষ ত্রুটিপূর্ণ। ছবির প্রথমাংশ অনাবশ্যক দীর্ঘ ও কৌতূহল-রসবর্জিত। যাত্রাদলের ভাঁড়ামির অংশ তুলতেই কয়েক শ' ফিট ফিল্ম নষ্ট করা হয়েছে। জমিদার ও জমিদারপুত্রের প্রলাপের প্রলেপ বিরক্তিকর, অসহ্য। উমা-চরিত্রসৃষ্টিরও কোনো সার্থকতা নেই এই কাহিনীতে। সর্বোপরি যে মহাপুরুষের জীবন অবলম্বন ক'রে এই ছবি তোলা হয়েছে, তাঁর জীবনের গঠনমূলক কাজগুলিই বাদ পড়েছে। তিনি যে দীনদুঃখীর সেবক ছিলেন, তিনি যে জাতিভেদ মানতেন না—ইত্যাদি কোনো রূপই ফুটিয়ে তোলা হয়নি এই ছবিতে। অথচ, সে সম্পর্কে প্রামাণ্য বহু কাহিনীই ছিল। মূল-চরিত্রের যদি development না দেখানো যায়, তাহ'লে সে চরিত্র মনে দাগ কাটতে পারে না। কর্মের মধ্য দিয়েই চরিত্রের এই development দেখানো যায়, শুধু সংলাপে তা হয় না। এই ফাঁকি সাধারণ-দর্শকের কাছে হয়তো ধরা পড়বে না; কারণ, পরমহংসদেব আগে থেকেই তাঁদের কাছে চেনা-মানুষ! চেনা-মানুষের যে কথা বলা হয় না, তা যে, আগে থেকেই জানা হয়ে থাকে। কাজেই, অজানার ফাঁকিটা তাঁরা জানার অভিজ্ঞতা দিয়েই পূরণ করে নেন!

পরিচালনা অত্যন্ত সাধারণ শ্রেণীর ও ত্রুটিপূর্ণ। রাণী নারায়ণীর মুখ দিয়ে সস্তা স্বদেশীবুলি আওড়ানো, আধুনিক সিমলা ষ্ট্রীটের উপর দিয়ে সেকালের নরেন্দ্রনাথের গমন, 'ভরতমিলাপ'-'রামরাজ্য'-ঢঙে রামকুমারের সঙ্গে গদাধরের কলিকাতা যাত্রাকালে রামধুনসঙ্গীত ('সীতাপতি রামচন্দ্র রঘুপতি রঘুরাই!') অত্যন্ত শ্রুতিকটু ও দৃষ্টিপীড়াদায়ক!

এই ছবির যা একমাত্র উল্লেখযোগ্য তা হলো রামকৃষ্ণের ভূমিকায় তরুণ অভিনেতা গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনবদ্য অভিনয় ও অপরূপ রূপসজ্জা। পাগল-ভাবটি অতি সুন্দর হয়ে ফুটে উঠেছে তাঁর অভিনয়ে। চন্দ্রাবতীর রাসমণি (নারায়ণী) ও চরিত্রোপযোগী। অন্যান্য ভূমিকা অনুল্লেখ্য। সবচেয়ে অসহ্য ও বিরক্তিকর স্বামিজী (লোকেন)-র ভূমিকায় জ্যোতির্ময়কুমার।

প্রচারের দিক থেকে অবশ্য সুধীরেন্দ্রনাথ সান্যাল-মহাশয় তাঁর পূর্ব সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। ছবি যদি চলে তো, পরমহংসদেবের প্রতি স্বাভাবিক ভক্তি, গুরুদাসের অভিনয় আর সান্যালমহাশয়ের প্রচারের জোরেই চলবে!

—অজাতশত্রু

(শেষাংশ ১৪৮ পৃষ্ঠায়)

রূপ চর্চ্চার

আধুনিক প্রণালী

সকল দেশে ও সকল সময়ে রমণীরা নানা উপায়ে নিজেদের দেহশ্রী ও লাবণ্য বৃদ্ধির চেষ্টা করেছেন। সভ্যতা ও বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সৌন্দর্য্যচর্চ্চার বিভিন্ন অভিনব প্রণালীর সৃষ্টি হয়েছে। **ক্যালকেমিকোর** প্রসাধন সামগ্রী আজ রূপচর্চ্চার অন্যতম আধুনিক প্রণালী বলিয়া সর্ব্বত্র সমাদৃত।
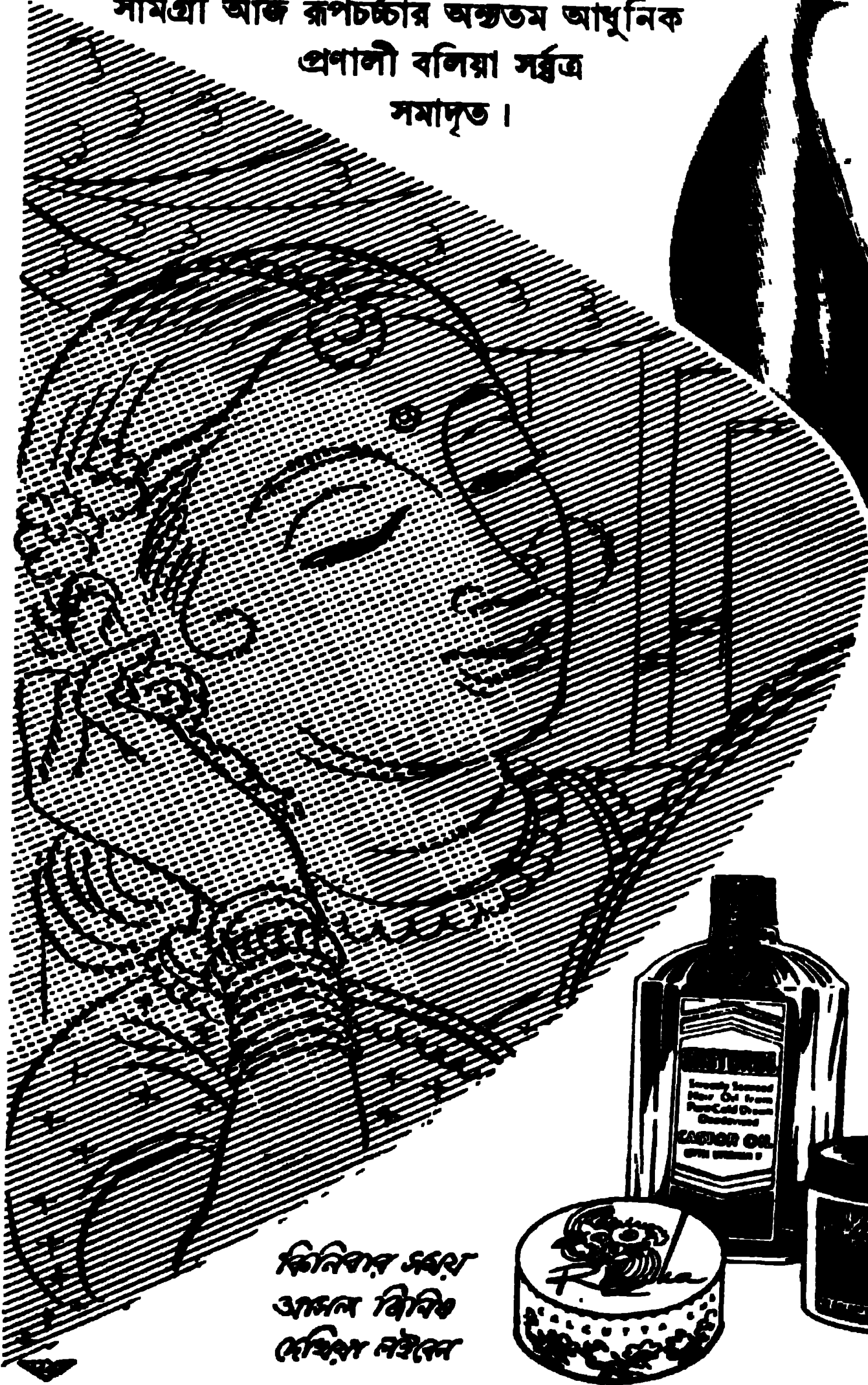
মলয় চন্দন সাবান
রেণুকা পাউডার
লাবণি স্নো ও ক্রীম
তুহিনা সৌন্দর্য্য ক্ষীর
ক্যাষ্টরল সুবাসিত ক্যাষ্টর তৈল

কিনিবার সময় আসল জিনিষ দেখিয়া লইবেন

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং, লি:

গ্রেটা গার্বো

মনোজ সান্যাল

পল্লব-ঘন দু'টি আঁখির অতলস্পর্শ গভীরতায় ছায়া পড়ে বিশ্বের। আর তারই ছায়াপথ ঘিরে ফুটে ওঠে প্রতিলিপি চিরন্তন মানুষের পরিবর্তনহীন মনের অসংখ্য অনুভূতির। সে তো শুধু আঁখি নয়, যেন দু'টি বাতায়ন,—উন্মুক্ত পথে তার দৃষ্টি যায় অন্তরের সর্বশেষ স্তরে। সে তো শুধু বাতায়ন নয়, যেন দু'টি হ্রদ—স্বচ্ছ সুনীল, ছায়া-সুনিবিড়। বুকে তার কখনও খেলা করে দু'টি শ্বেত হংস, আর তাদেরই শুভ্র পাখার বিস্তারে মনে হয় চক্‌চক্ করে দু'ফোঁটা অশ্রু। আবার কখনও অস্তোন্মুখ সূর্যের ম্লান আলোকে ব্রততীর প্রলম্বিত ছায়া জাল বোনে দীর্ঘ এক রহস্যের। তারপর কখন নেমে আসে অলক্ষ্যে নিস্তরঙ্গ বক্ষ জুড়ে এক ঝাঁক সাগর-পাখী। প্রসারিত পক্ষের বিচিত্র রামধনু বর্ণে ছল্‌ছল্ ক'রে ওঠে আনন্দের বিপুল চাঞ্চল্য।

সে তো শুধু আখি নয়, যেন ভাষাময় সৃষ্টি কোন এক খেয়ালী শিল্পীর। হাজার চোখের ভীড়েও হারায়না সে চোখ। সাধারণের মাঝে থেকেও সে অনন্যসাধারণ। শিল্পী নইলে ধরা পড়ে না সে চোখের মর্মলিপি·····

সন্ধ্যার আলোজ্বালা রাজপথে শিল্পী চ'লেছেন। সহরের পুঞ্জীভূত জীবনের বিচিত্র কলকাকলীতে ব্যাহত তাঁর চিন্তা। তবুও তাঁকে ভেসে বেড়াতে হয় পথে পথে, জনতার ছন্দহীন কলোচ্ছ্বাসের মাঝে। তিনি নিরুপায়। সাধনার বড় উপাদান সিগারেট—তাঁর আজ নিঃশেষিত। অথচ যে কোন সিগারেট হোলেও চ'লবে না, চাই তাঁর সেই প্রিয় সিগারেটটি। শিল্পীর খেয়াল! খেয়াল ঠিক নয়, আপাতঃ তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর কোন বস্তুর ওপর এই যে অগাধ আকর্ষণ প্রতিভারই একটা লক্ষণ। সামান্য খেয়ালের এই বিলাসিতা চরিতার্থ করতে শিল্পীর যেন অকরণীয় কিছু নেই! সারা সহরের কুলীন প্রতিষ্ঠানগুলি খুঁজেও সে সিগারেটের সন্ধান মিললো না। মিললো অতি সাধারণ নামগোত্রহীন একটি দোকানে।

দোকানের কর্মচারিণী—একটি তন্বী তরুণী। দোকানটির মতই তারও পোষাক প্রসাধনে অনুচ্চার আড়ম্বরহীনতার ছাপ। এগিয়ে বহু আকাঙ্ক্ষিত দেয় সিগারেটের বাক্স দাম দিতে গিয়ে শিল্পীর চোখ পড়ে তার চোখে। তারাখসা সে এক ক্ষণিক মুহূর্ত! তবু যেন শিল্পীর মনের আকাশে স্বাতীর জ্যোতিরেখা দাগ রেখে যায়। ধরা কিন্তু পড়েনা তখন, ঢেকে থাকে কল্পনার পূর্বমেঘে। সিগারেট নিয়ে শিল্পী চ'লে যান দোকান ছেড়ে। হোটেলে ফিরে রাতের অবসরে কর্মশেষ অবকাশে ফুটে ওঠে চোখ দু'টি। অগণিত তারাজ্বালা আকাশে এ যেন এক নবীন অভ্যুদয়,—অনুপম দ্যুতিময় দু'টি নতুন তারা। এইতো সেই চোখ! এইতো সেই মুখ! এইতো সেই নারী! যার সন্ধানে শিল্পী এতদিন ঘুরে বেড়িয়েছেন উদ্‌ভ্রান্তের মত দেশ বিদেশে। যার অভাবে সৃষ্টি তাঁর অঙ্গহীন, প্রাণহীন নিবেদন। সৃষ্টিকে সার্থক ক'রে তুলতে হোলে এ আঁখির, এ মুখের, এ দেহলতার সেই দেহীকে তাঁর অপরিহার্য।

কিন্তু কোথায় সেই মেয়েটি? সহরের সংখ্যাহীন মানুষের মাঝে কোথায় মিলিয়ে গেছে সে মুখ! পণ্য আর বিপণীর অরণ্যে নিশ্চিহ্ন বিলীন। ক্লান্তিহীন বিরামহীন সন্ধান প্রতিদিন ফিরে আসে ব্যর্থ হয়ে। দিন গড়িয়ে যায় বছরে। আর বর্ষশেষে তেমনি ক'রেই হঠাৎ একদিন দেখা হ'য়ে যায় মেয়েটির সঙ্গে ·····

উনিশশো' তেইশ সালের এক সন্ধ্যা। সহরের এক পূর্ণ-প্রেক্ষাগারে সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় হ'চ্ছে 'দি গ্রীণ ড্রেস সুট' নাটকটির। প্রথম সারিতে ব'সে আছেন সুইডেনের বিখ্যাত চিত্র-পরিচালক মরিস ষ্টিলার। সহসা তাঁর নজরে পড়ে মঞ্চের পাদপ্রদীপের সামনে অভিনয়রতা সেই মেয়েটি! সামান্য ভূমিকায় সেই অসামান্যাকে দেখে আনন্দে অধীর হ'য়ে পড়েন ষ্টিলার। যে চোখ, যে মুখ, এতদিন শয়নে স্বপনে নিশি জাগরণে তাঁর কল্পনায় পরিব্যাপ্ত ছিল, যার সন্ধানের ব্যাকুলতায়

কত বিনিদ্র রজনী তিনি কাটিয়েছেন তার সঙ্গেই কিনা আজ চাক্ষুষ পরিচয়। ষ্টিলার আর স্থির থাকতে পারেন না। দৃশ্যশেষে মঞ্চের অন্দরে গিয়ে মেয়েটিকে অভিনন্দন জানান। আহ্বান করেন তাঁর শিল্প-সাধনার ক্ষেত্রে…

এইভাবেই একদিন ষ্টিলার আবিষ্কার করেন গার্বোকে। কালের যাত্রার পথে সেদিনের সেই মঞ্চালোকিত সন্ধ্যাটির শুভ সমাবেশ না হোলে আজও হয়তো অনামী গার্বো রয়ে যেতো ষ্টিলারের কল্পনালোকে মানস প্রতিমা হ'য়ে, থেকে যেতো অপরিজ্ঞাত সারা পৃথিবীর কাছে। আজও সে হয়তো তেমনি ক'রেই দাঁড়িয়ে থাকতো সিগারেটের পসরা নিয়ে স্টক্‌হোল্‌মের রাজপথে, দাঁড়িয়ে থাকতো সে অগ্নিসম্ভবা প্রদীপ্ত প্রতিভার ঘুমন্ত শিখা নিয়ে, লুকিয়ে থাকতো বীজ মানুষের অগোচরে বিরাট মহীরুহের সম্ভাবনা বুকে জড়িয়ে। সে বঞ্চনার হাত থেকে মানুষকে বাঁচিয়ে গেছে সেই ক্ষণিক মুহূর্তটি, শিল্পীর খেয়ালে যার জন্ম। একটি মুহূর্ত দিয়ে গেছে বিশ্বকে উজ্জ্বল আনন্দময় মুহূর্তের অফুরণ সম্পুট…কিন্তু থাক্, এখানে আর না এগিয়ে—গার্বোর সঙ্গে পরিচিত হবার আগে গ্রেটাকে জানা প্রয়োজন। তাই একটু পেছনে ফেরা যাক…

গ্রেটার প্রথম জীবন আর দশজন মেয়ের মতই। স্টকহোল্‌মের এক অতি দরিদ্র পরিবারে তার জন্ম। প্রতিপদে অভাবে অনটনে বিড়ম্বিত হ'য়ে কোন রকমে এগিয়ে আসে কয়েকটা বছর। তারপর যখন বুঝতে শেখে সংসারের সংস্থান, তখনই দেখা দেয় মর্মান্তিক সংগ্রাম। গরীবের মেয়ে হওয়া কম লাঞ্ছনার কথা নয়! তার ওপর ভাবতে হয় তাকে পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনের কথা। শৈশবের ক্ষীণ কল্পনার জৌ'লুস ধীরে ধীরে ফিকে হ'য়ে আসে দারিদ্র্যের নিষ্করুণ বর্ষণে। নিরন্ধ্র অন্ধকারে ঢেকে আসে জীবন। তবু কিন্তু গ্রেটা সঙ্গোপনে তারই মাঝে বাঁচিয়ে রাখে এক ফোঁটা আশার আলো। শিল্পী মনের শিখা সে তো নেভবার নয়। উজ্জ্বলতা না থাকলেও তাপ তার থাকে। সোনার খেলো জৌলুসের মাঝে প'ড়ে হয়তো প্ল্যাটিনাম ম্লান হোতে পারে তবু মূল্য তার কমে না সোনার চেয়ে। ছোট্ট সিগারেটের দোকানে অল্প মাইনের কাজ করে গ্রেটা। বেচাকেনার ভীড়ে মনের হাটে ধুলো জমলেও উড়ে যায়, ভীরু মনের কান্নায় তা' পঙ্কিল ক'রে তোলে না। তাই মাঝে মাঝে অবকাশ পেলেই দাঁড়ায় গিয়ে ক্যামেরার সামনে। আবার ফিরে আসে

ব্যর্থ হয়ে। ছবির কর্তারা ওর উৎসাহ নিভিয়ে দেন। বলেন—এ মেয়ের দ্বারা অভিনয় চলবে না। ভাব ব'লে কোন পদার্থই নেই এর। তার ওপর ক্যামেরার বিচারে মুখ চোখের আদল নাকি সুন্দরীদের পর্যায়ে পড়ে না। গ্রেটার উদ্যম কিন্তু দমে না। ব্যর্থতার বোঝা ব'য়ে ব'য়ে ব্যর্থতাকে ও আপন অঙ্গে জুড়ে নিয়েছে অবিচ্ছেদ্য ক'রে তাই আর ভেঙ্গে পড়ে না। ওর বিশ্বাস—এই প্রত্যাখ্যানের পথ বেয়েই একদিন আহ্বান এসে ডাক দেবে। দিলও তাই। দু'কথার অভিনয় থেকে দু'হাজার কথার অভিনয়ের আমন্ত্রণ এলো। একেবারে মঞ্চের পরিচারিকা থেকে ছবির রাজমহিষী।

ষ্টিলারও যেন গার্বোকেই খুঁজছিলেন। বহুদিন থেকেই তাঁর সন্ধান চলেছে এমন একটি মেয়ের, যার চিন্তাধারা অনাবিল, মনের শ্লেটে যার বাইরের আঁক পড়েনি। তিনি নিজে তাকে আপন ছাঁচে গড়ে তুলবেন; দীক্ষা দেবেন নিজের শিল্প সাধনার বীজমন্ত্রে। গার্বোর মধ্যে তিনি দেখতে পান সে সম্ভাবনার ইঙ্গিত। গার্বোও তাঁকে প্রথম দর্শনেই গুরু বলে মেনে নেয়! বাইরের কদর্যতা ভেদ ক'রে ভেতরের আসল শিল্পীটিকে চিনতে তাঁর দেরী হয় না। ষ্টিলার ছিলেন অত্যন্ত কুৎসিৎ ও কদাকার মানুষ। কিন্তু অন্তরে তিনি অনুপম সৌন্দর্যের অধিকারী। অতবড় পরিচালক বুঝি আর হয় না। তাঁর চিত্রনির্ম্মাণ-নৈপুণ্যকে বাদ দিলেও শুধু এই গার্বো প্রতিভার আবিষ্কার ও বিকাশের জন্যেই চিত্র জগতে তিনি অবিস্মরণীয় হ'য়ে থাকবেন।

ষ্টিলার প্রথমেই গার্বোকে দেন নায়িকার অংশ। 'দি এ্যাটোনমেণ্ট অব গোষ্টা বার্লিং, চিত্রে কাউণ্টেসের ভূমিকায় গার্বো অবতীর্ণ হয়। ছবিখানির অভূতপুর্ব সাফল্যে সারা দেশে সাড়া পড়ে যায়। ষ্টিলারের পরিচালনাধীনে গার্বো প্রথম পাঠ যে এতখানি সার্থকভাবে উত্তীর্ণ হবে তা কেউ আশা করেনি। কিন্তু যেদিন সুদূর আমেরিকা থেকে এই নবাগতার ডাক আসে সেদিন সবিস্ময়ে সবাই ভাবে—শিষ্যা বুঝি আজ ছাড়িয়ে যায় গুরুকে!

মেট্রো গোল্ড্ইন মেয়ারের কর্তৃপক্ষ আকৃষ্ট হন গার্বোর অভিনয়ে। ছবি দেখে লুইবি, মেয়ার রীতিমত মুগ্ধ হন। চিত্রব্যবসার অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে যাচাই করে তিনি বুঝতে পারেন গার্বো একদিন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চিত্রতারকা হয়ে উঠবে। সে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের এটি হোল প্রারম্ভিক সোপান। অনুসন্ধান করে অনতিবিলম্বে হাজির হোলেন গার্বোর কাছে; সাপ্তাহিক দু'শো' ডলারের এক চুক্তি নিয়ে। দোকানী মেয়ের কাছে এ যেন আকাশ-কুসুম, যেন কোন স্বর্গীয় আশ্বাস! তবু কিন্তু গার্বো গুরু দক্ষিণার কথা ভোলেনা। মেয়ারকে জানায়—গুরু ছাড়া সে সুইডেন ছেড়ে কোথাও নড়বে না। লক্ষ ডলারের প্রলোভনেও না। উপায়ান্তর না দেখে অনিচ্ছাসত্বেও ষ্টিলারকে নিতে হয় মেয়ারের। গার্বোকে পেতে যে কোন স্বর্তকেই তিনি স্বীকার করে নিতে প্রস্তুত...

সেটা উনিশশো' পঁচিশ সাল। গার্বো আসে আমেরিকায়। ডলারের দেশ মার্কিন মুলুক তাকে স্তম্ভিত করে দেয়। নিউ ইয়র্কের গগনচুম্বী সৌধের মতই তারও বিস্ময় গিয়ে ঠেকে আকাশে। এ যেন এক আজব সহর! কল্পনা বিলাসীর স্বপ্নরাজ্য! দিনের যান্ত্রিক কর্মব্যস্ততা মিলিয়ে যায় রাত্রের আলোক মালায় সুদূর অবাস্তবতায়। এর আদবর-কায়দা চাল-চলন, সবই বয়ে চলে শৃঙ্খলহীন খাতে নৈশবিহারের অমিতাচারে। আভিজাত্যের আতিশয্যে ভোগের প্রাচুর্য্যে গার্বো হাঁপিয়ে ওঠে নিউ-ইয়র্কে। বিলাস-বিমুখ মন তার সঙ্কুচিত হ'য়ে আসে। হোটেল ছেড়ে এক পাও নড়েনা কোথাও।

হোটেলের গণ্ডী ছাড়িয়ে গার্বোকে প্রথমে বাইরে আনেন রলফ্ ল্যাভেন,-ষ্টিলারের সেক্রেটারী, গার্বোরই স্বদেশবাসী। গার্বো খুব বেশী আপত্তি করেনা, কারণ তারও প্রয়োজন বেরোনোর। একজোড়া জুতো কিনতে হবে। গরীবের মেয়ে ঐশ্বর্যে অনভ্যস্ত, তাই স্বভাবতঃই সে রলফ্‌কে অনুরোধ করে তাকে কোন ছোটখাটো দোকানে নিয়ে যেতে। যেখানে খুব সস্তা দামের জুতো মেলে। কিন্তু রলফ্ পাকা মানুষ, তিনি বোঝেন প্রথম অভিজ্ঞতার একটা মূল্য আছে—বিশেষ করে আমেরিকার

মত দেশে। তাই গার্বোকে নিয়ে যান ফিফ্‌থ্‌ এ্যাভেনিউয়ের একটা নামকরা দোকানে। গার্বোর পায়ের মাপ সাধারণ মেয়ের চেয়ে কিছু বড়, সাত নম্বর জুতো তার লাগে। খুঁজে পেতে প্রথমটা একটু কষ্ট হয়। জুতো দেখে আনন্দে উপছে ওঠে গার্বো, কিন্তু দাম শুনে তেমনি আবার পিছিয়ে পড়ে বিস্ময়ে। সখেদে বলে—'কিন্তু রল্‌ফ্‌, পঁচিশ ডলার এর দাম! তার মানে আমাদের একশো' ক্রোনেন! ওঃ কি ভীষণ!'

সেই থেকে আজও গার্বো কখনও কিছু কিনতে হোলে আগে মনে মনে ডলারকে হিসেব ক'রে নেন

গ্রেটা যখন সুইডেন থেকে প্রথম হলিউডে আসে

ক্রোনেনে। ক্রোনেন হোল সুইডেনের টাকা। স্বাভাবিক বিনিময় প্রথায় এক ডলার চার ক্রোনেনের সমান।

গার্বোর দ্বিতীয় বিস্ময় অপেক্ষা করে ছিল এক বিখ্যাত পরিচ্ছদ বিপণীতে। সেখানে একটা টুপি দেখে নজরে ধরে। তবে দাম শুনে সব পছন্দ তার উবে যায়। পঁয়তাল্লিশ ডলার! তার মানে একশো আশি ক্রোনেন! গার্বো প্রায় কেঁদে ফেলে,—'আমায় বাড়ী নিয়ে চলুন রল্‌ফ্‌। এদের কাছ থেকে কিছু কিনবোনা। এরা ডাকাত। সুইডেনে আমার দশ ক্রোনেন হোলেই ভালো জুতো হোত। আর টুপি? না হয় পনেরো ক্রোনেন নিক...'

নিউ ইয়র্ক থেকে গার্বো চ'লেছে হলিউডে। আদিগন্ত প্রান্তরের বুক চিরে ট্রেণ ছুটছে। হঠাৎ একটা নির্জন স্থানে ট্রেণ যায় থেমে, ট্যাঙ্কের কাছে, জল নেবার জন্যে। ফেলে আসা দেশের স্মৃতিটা কেমন যেন দুলে ওঠে। অবারিত সবুজের আকর্ষণে গার্বো আর বন্দী থাকতে পারে না কাঠ ঘেরা কামরায়। কি খেয়ালে গাড়ী থেকে নেমে পড়ে। লম্বা পা দু'খানি ছড়িয়ে আরাম করে মাঠে বসবার ভারী লোভ হয় তার। ওদিকে জল নিয়ে ট্রেণ দেয় ছেড়ে। ভাগ্যিস্‌ সে যাত্রায় রল্‌ফ ছিলেন সঙ্গে নইলে একটা বিশ্রী অবস্থার উদ্ভব হোত। জানলা দিয়ে মুখ বাড়াতে গিয়ে হঠাৎ গার্বোকে তিনি দেখে ফেলেন। দেখেন সে নিশ্চিন্ত নির্বিকারে নরম ঘাসের মখমলের ওপর পায়চারি করছে। একটুও ভ্রূক্ষেপ নেই যে গাড়ী ছেড়ে দিয়েছে। রল্‌ফ মরিয়া হয়ে ভ্যাকুয়ামের চেকল ধ'রে ঝুলে পড়েন। ট্রেণ থেমে যায় অনেকটা দূর এগিয়ে গিয়ে। আবার তাকে পেছু হটে ফিরে আসতে হয় ট্যাঙ্কের ধারে। গার্বো তখন একটা কাঠের বাক্সর ওপর বসে গভীর প্রশান্তিতে সিগারেট টানছে। বিদেশ বিভূঁইয়ে এমন একটা কেলেঙ্কারী দেখে ষ্টিলার রীতিমত রেগে ওঠেন।

'নিশ্চয়ই তুমি উন্মাদ!' ষ্টিলার ফেটে পড়েন।

'মোটেই না,' ছোট্ট ক'রে জবাব দেয় গার্বো। 'কেমন মজা হোল বলুন তো!...'

হলিউডের পথে এই আনাড়ী গ্রাম্য গার্বোকে নিয়ে ষ্টিলার আর রল্‌ফকে যে আর কোন বিপদে পড়তে হয়নি এমন নয়। তবে শেষের ঘটনাটিই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য,—যেমন হাস্যকর তেমনি মজাদার। হলিউডের একটা চিরকালের প্রথা ষ্টুডিও এবং চিত্রামোদীদের তরফ থেকে

তারকাদের অভ্যর্থনা জানানো। কিন্তু গার্বোর অভ্যর্থনা উৎসব যেমন বিপত্তির মাঝে শেষ হয় এমন বোধ হয় আর কোন চিত্রশিল্পীর বেলায় হয়নি। যথারীতি লস্ এঞ্জেল্‌স্ শাস্তাফে ষ্টেশনে অভিনন্দনের আয়োজন হয়। প্লাটফর্ম লোকে লোকারণ্য, চতুর্দিক জনতায় গিজগিজ করছে। ষ্টুডিওর উর্দ্ধতন কর্মচারী, তারকা-স্তাবক, চিত্ররসিক, সংবাদপত্র প্রতিনিধি, সবাই এসেছেন দলে দলে। প্রধান অভ্যর্থনাকারী হিসেবে এসেছেন সুইডেনের জনৈক ব্যারন, লস্ এঞ্জেল্‌সের নাগরিক। ব্যারন সাজপোসাকের কোন রকম ত্রুটী রাখেন নি। স্বদেশের সম্মানিতা মেয়েকে অভ্যর্থনা ক'রে নিজের মান বাড়াবার এবং সেইসঙ্গে আর সকলকে চমৎকৃত করে দেবার জন্যে যতদূর সম্ভব লম্বা পোষাকে সজ্জিত হ'য়ে এসেছেন। কিন্তু টের পাননি যে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী, হ'য়ে এসেছে তাঁরই পরিচিত সুইডেনের এক আর্টিষ্ট ছোকরা। আর্টিষ্ট লম্বায় ছ'ফুটের ওপর। তার আসার কারণ ব্যারনকে জনতার সামনে জব্দ ক'রে একটু কৌতুক উপভোগ করা। ব্যারন কায়দা ক'রে দাঁড়িয়ে আছেন প্লাটফর্মে, ঠিক যেখানে গার্বোর কামরা এসে থামবে। ট্রেণ আসতেই তিনি এগিয়ে গিয়ে পা-দানীর ওপর দাঁড়িয়ে অভিনন্দনপত্র পড়তে সুরু ক'রে দেন। প'ড়তে গিয়ে সে কি তার কাঁপুনী! ইত্যবসরে লম্বা আর্টিষ্ট ভীড় ঠেলে এসে ছোঁ মেরে গার্বোকে পাজাকোলা ক'রে তুলে তাঁরই মাথার ওপর দিয়ে হৈ হৈ ক'রে নিয়ে যায়। যেতে যেতে চেঁচিয়ে ব'লে ওঠে,—'ব্যারনের বক্তৃতায় আপনার মাথা ধ'রে যাবে! স্বাগতম্ মিস্ গার্বো! ক্যালিফোর্ণিয়া আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছে।'

জনতার সবার হাতেই কাগজের মোড়ক আর প্যাকেট দেখে গার্বো ফিস্‌ফিসিয়ে প্রশ্ন করে রলফকে,—'আচ্ছা, ওঁদের হাতে ওসব কি?'

'উপহার,' রলফ্ জবাব দেন, 'চিত্রতারকাদের অভ্যর্থনা ক'রতে হোলে দামী দামী উপহার দেওয়াই এখানকার রেওয়াজ। ওগুলো ওঁরা এনেছেন তোমার জন্যে।'

'তাই নাকি! ভারী মজাতো!' খিল্‌খিলিয়ে হেসে ওঠে গার্বো। তারপর নিউ ইয়র্কে জিনিষপত্তরের দামের কথা মনে পড়ায় বলে,—'আচ্ছা, প্যাকেটগুলোর মধ্যে বোধহয় পোষাক-পরিচ্ছদ আছে, কিম্বা এমন কিছু যা আমি ব্যবহার ক'রতে পারবো—তাই না?'

এ হেন সংসারী মেয়ে গার্বোর হতাশার আর পরিসীমা থাকেনা যখন বিল্টমোরের অভ্যর্থনা কক্ষে তারই চোখের সামনে অতিথিরা বড় বড় পেটি খুলতে সুরু করেন অথচ সেগুলো তাকে উপহার দেননা। পেটিতে আর কিছু ছিলনা, ছিল বাছাই-করা মদ—স্কচ্ আর বোর্‌বোন হুইস্কি, যা দিয়ে অতিথিরা গার্বোর স্বাস্থ্য পান করেন......

অনেকেই গার্বোকে জানেন চাষীর মেয়ে বলে। কিন্তু তা' ঠিক নয়, দরিদ্র নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারে তার জন্ম। তার পূর্বপুরুষরা ছিলেন যাকে বলে একেবারে খাঁটি গেঁয়ো। পরিবর্তনহীন অতি সাধারণ মানুষের মত চ'লে এসেছেন পুরুষানুক্রমে। বড় হব, টাকা ক'রবো, সমাজে মর্যাদা পাবো,—এসব কল্পনা তাঁদের কোন কুলেও ছিলনা। নিজেদের ভাগ্যহীনতাকে ভগবানের দান বলে গ্রহণ ক'রে পরম সন্তুষ্টিতে দিন কাটিয়ে গেছেন। তাঁদের এই দারিদ্র্য কল্পনার গণ্ডীকে এত সঙ্কীর্ণ ক'রে দেয় যে, অর্থ পেয়েও ভাবতে পারেননা তা' নিয়ে কি ক'রবেন। গার্বোর জীবনে এর একটী সুন্দর ঘটনা আছে। নিউইয়র্ক থেকে এসে গার্বোর মাইনে যখন ওঠে চারশো' ডলারে, সে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারেনা তার ভাগ্যকে। তার চিন্তারাজ্যে এ যেন রূপকথার মতই একটা অবাস্তব কিছু! তবু গার্বো মাকে চিঠি লেখে সুইডেনে, জানায়—মা যা চান তাই আজ সে তাঁকে দেবে।

'স্টকহোল্‌মে আমায় একটা ছোট্ট মুদীখানার দোকান খুলে দিও'—মা জানান চিঠিতে।

হলিউড জীবনে অর্থের প্রাচুর্যের মধ্যেও গার্বো অতি সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করে। আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় বুঝিবা মেয়েটি কৃপণ। কিন্তু যাঁরা ওর সান্নিধ্যে এসেছেন তাঁরা জানেন ধনীর বিলাস ও কোনদিনও কল্পনায় আনতে পারে না। ও যদি সস্তা চীজ্ খায়, বুঝতে হবে দামী ক্যাভিয়ারের কথা ভাবতে পারেনা ব'লেই। এই

প্রসঙ্গে আরও একটি ঘটনার উল্লেখ প্রয়োজন। আজও শান্টা মনিকার অধিবাসীদের মুখে মুখে গল্পটি বেঁচে আছে।

শান্টা মনিকার সবচেয়ে বড় রাইডিং স্কুল। একদিন সকালে তার মালিক মিঃ সিয়াগো দেখেন স্কুল প্রাঙ্গণে বেড়ার ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে একটি লম্বা ছিপ ছিপে মেয়ে।

'ঘোড়ায় চড়তে কত লাগে? মানে, চড়া শিখতে আর কি?' প্রশ্ন করে মেয়েটি।

'কে তুমি?' উত্তরে জিজ্ঞাসা করেন সিয়োগো অগ্রাহের ভঙ্গীতে, মেয়েটির ওপর আপাদমস্তক চোখ বুলিয়ে। সাজপোশাক আর ধরণ-ধারণ দেখে তাঁর মনে হয় এমন অভিজাত প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এ অযোগ্য। গায়ে ছেঁড়া টুইডের কোট, পরণে অতি খেলো সস্তা রাইডিং ব্রিচেস্, আর পায়ে অক্সফোর্ড জুতো।

সিয়াগোর প্রশ্ন শুনে গার্বো বলে,—'আমি কে জিজ্ঞাসা ক'রছেন? এই একটু এসেছি এখানে ছবিতে কাজ করতে।'

'আমাদের এখানে শিখতে ঘণ্টায় চার ডলার ক'রে লাগে,' জানান সিয়াগো।

'ঘণ্টায় চা র ড-লা-র!' গার্বো যেন আকাশ থেকে পড়ে! 'তার মানে ষোলো ক্রোনের! শুধু শেখার পক্ষে এ অত্যন্ত বেশী!'

'তোমার দেখাছি অনেক দুর্ভোগ আছে ছবিতে ঢুকতে' সিয়াগো মন্তব্য করেন। 'যাই হোক, তাই ভাবছি ঘণ্টায় তিন ডলার নিয়ে তোমায় আমি ঘোড়ায় চড়া শেখাবো'......

নিউ ইয়র্ক থেকে হলিউডে এসে গার্বো যেন ছিটকে পড়ে তপ্ত কড়াই থেকে জলন্ত উনুনে। নিদারুণ অস্বস্তিতে মন তার ভ'রে ওঠে। চারদিকে শুধু বিলাস আর প্রাচুর্য, প্রাচুর্য আর অপচয়। মানুষ এর মাঝে থাকে কি ক'রে! দিনরাত কেবল মেপেজুকে চলা, ওজন ক'রে বলা, আর রূপের দৈন্যকে চিকচিকিয়ে তোলাযে কি রোশনাই দিয়ে! হলিউডের অগণিত তারকাখচিত আকাশে গার্বো যেন ম্লান হ'য়ে পড়ে। না পারে ওদের সঙ্গে সমান তালে চ'লতে, না বা মন খুলে মিশ্‌তে। গেঁয়ো মেয়ে না জানে আদব-কায়দা, না বোঝে ইংরিজী। তাই স্বভাবতঃই সে ভয়ে অসাড় হ'য়ে পড়ে প্রথম পরীক্ষার দিন—মেট্রো ষ্টুডিওর সুবিস্তীর্ণ ফ্লোরে। ঘেমে নেয়ে ওঠে কি ক'রবে না ক'রবে ভাবতে ভাবতে। আজও গার্বোর মনে অম্লান হ'য়ে আছে সেদিনের সেই স্মৃতি।

মেট্রো লটে বাগানের বিরাট সেট তৈরী হ'য়েছে গার্বোকে পরখ করার জন্যে। ষ্টুডিওর উর্দ্ধতন কর্মচারী থেকে সুরু ক'রে মিস্ত্রী, ইলেকট্রিসিয়ান, পেণ্টার, সবাই ব্যস্ত সেটের কাজে। গার্বোকে পরীক্ষা এবং পরিচালনা করার ভার পেয়েছেন মণ্টা বেল—জনৈক মার্কিন পরিচালক। ষ্টিলারকে এম্, জি, এম্ এনেছেন শুধু গার্বোর খাতিরে এবং জেদে। তাঁদের আসল অভিপ্রায় গার্বোকে কোন রকমে রাজী করিয়ে শেষটায় ষ্টিলারকে ছবি থেকে বাদ দেওয়া।

গার্বোর জীবনে বুঝি এতবড় পরীক্ষা আর কোনদিনও হয়নি। একে বিদেশী পরিচালক তার ওপর সেই অপরিচিত পরিবেশ। আমেরিকান ছবি তৈরীর আড়ম্বর আর সরঞ্জামের ঘটা দেখে গার্বো স্তম্ভিত হ'য়ে পড়ে। প্রকাণ্ড একটা কারখানাকে যেন ফ্লোরে এনে হাজির করা হোয়েছে! নির্বাক নিস্পন্দ গার্বো পাথরের মত দাঁড়িয়ে থাকে এক কোণে। ভীত শিশুর মত ষ্টিলারকে সে আঁকড়ে থাকে। মাঝে মাঝে বিস্ময় আর কৌতূহলে ওঁদের কাজকর্ম দেখে আর ষ্টিলারকে বলে,—'মরিস্! একি ভীষণ ব্যাপার, আমার মাথা যেন ঘুরে আসছে! আমায় কি করতে হবে? ওঁরা সব কি বলাবলি করছেন?'

এমন সময় একটি সুইডিস যুবক এসে দাঁড়ায় ওদের কাছে। তাকে দেখিয়ে ষ্টিলার বলেন গার্বোকে,—'এই যে এসে গেছে। এ তোমায় সব বুঝিয়ে দেবে ওঁরা কি বলেন না বলেন। এর কাজই হবে ওঁদের ইংরিজী কথাগুলো আমাদের ভাষায় তোমায় জানানো।'

'তাই নাকি!' গার্বো যেন ফেটে পড়ে আনন্দের আতিশয্যে! 'যাক্ হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম!'

যুবকটির নাম স্তেন্ হিউগো বর্গ,—গার্বোর দেশেই বাড়ী। গার্বোর অসুবিধা অনুভব ক'রে ষ্টুডিও

কর্তৃপক্ষ বর্গ্‌কে নিয়োজিত করেন গার্বোর দোভাষী হিসেবে, ছবির জন্যে ওকে ইংরিজী শেখাতে। ইংরিজী বাণীচিত্রে প্রথম বর্গ্‌ই গার্বোর কথা ফোটায়। গার্বোর হলিউড জীবনে বর্গ্‌ শুধু দোভাষীই ছিলনা, ছিল তার একান্ত অনুগত সঙ্গী। দিনরাত বর্গ তার সঙ্গে থাকতো ছায়ার মত। হলিউডের রমোন্যাসিক বিচিত্র জীবনের পিচ্ছিল আবর্তে সে তাকে চালিয়ে নিয়ে বেড়াতো। আগলে রাখতো নৈশক্লাবের কুহেলিকা থেকে, সামাজিক রীতিনীতির নানান কৃত্রিমতা থেকে। এমনকি তার চুল আঁচড়ে দিতো, জুতো এগিয়ে দিতো, মেক-আপ-বক্সটি হাতে তুলে দিতো, প্রসাধনের শেষ কাজটুকু পর্যন্ত সেই ক'রতো,—শুধু পোষাক পরানো ছাড়া। এক কথায় বর্গ্‌ ছিল গার্বোর পুরুষ পরিচারিকা।

বর্গ্‌কে প্রথম পরীক্ষার দিন ফ্লোরে পেয়ে গার্বোর উদ্বেগ ও আতঙ্ক অনেকটা কাটে। পরিচালক বেলের প্রত্যেকটি আদেশ গার্বোকে সে বুঝিয়ে দেয়। ধীরে ধীরে সেটের সব প্রস্তুতি শেষ হ'য়ে চরম মুহূর্তটি এগিয়ে আসে। ক্যামেরার চারদিকে জনতা ভেঙ্গে পড়ে। স্টোরের শেষ কর্মচারীটি পর্যন্ত এসে দাঁড়ায় এই বিদেশিনীর অভিনয়নৈপুণ্য দেখবার কৌতূহলে। ক্যামেরা চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য দর্শকের সংখ্যাহীন ফিসফিসানী ষ্টুডিওর নিস্তব্ধতাকে আবিল ক'রে তোলে। বিস্মিত ও বিমুগ্ধ মানুষের মুখে মুহূর্তে শোনা যায় চাপা কণ্ঠের প্রশংসামুখর মন্তব্য।

—'অদ্ভুত! অপূর্ব! একেই বলে প্রতিভার আবিষ্কার!'

—'বাজি রেখে বল্‌তে পারি ইনিই একদিন আমাদের ষ্টুডিওর প্রধান তারকা হ'য়ে দাঁড়াবেন।'

পরীক্ষা শেষে মিঃ বেল গার্বোকে ডেকে হেসে বলেন,—'ঠিক হোয়েছে মিস্ গার্বো, সুন্দর হোয়েছে!' তারপর ক্যামেরাম্যান টনি গদিওর দিকে ফিরে বলেন,—'দেখেছো টনি, লক্ষ্য ক'রছো ওঁর চোখের পল্লবগুলো? প্রায় ইঞ্চিখানেক লম্বা! অপূর্ব!'

কিন্তু গার্বো তখন আর এক মানুষ। ক্যামেরা থামার সঙ্গে সঙ্গে গার্বো যেন সম্পূর্ণ বদলে যায়—বিবর্ণা জ্যোতি-হীনা সাধারণ একটি নারী। অথচ ক্যামেরা যখন ঘোরে সেই নারীই হ'য়ে ওঠে মহীয়সী, হয়ে ওঠে কোন এক রহস্যময় আলোয় উদ্ভাসিতা, কোন এক অদৃশ্য শিল্পীর অলৌকিক প্রতিভার অধিকারিণী। ফ্লোরের গার্বোয় আর বাইরের গার্বোয় স্বর্গমর্তের প্রভেদ। মনে হয় একই গার্বোর অন্তরে বুঝিবা দু'টি নারী, দু'টি বিপরীতধর্মী মনশ্চেতনা আশ্রয় নিয়েছে। আজও কেউ এ রহস্যের সন্ধান দিতে পারেননি, মনোবিজ্ঞানীরা হয়তোবা পারেন…

হলিউডে এসে গার্বো তার থাকার জন্যে বেছে নেয় মিরামার হোটেলটি। শান্টা মনিকার দিগন্ত প্রসারী সমুদ্র সৈকতের ওপর এই সুন্দর হোটেলটি তার ভারী পছন্দ। সৌন্দর্যপিপাসু, প্রকৃতির রূপ বিলাসিনী গার্বোর কাছে সহরের কোলাহল যেন অসহ্য মনে হয়। তাই অনেক ঘুরে, অনেক নাকচ ক'রে এই আবাসটিকেই সে মনোনীত করে। তার ইচ্ছায় বাধা দেবার দুঃসাহস ছবির রাজ্যে কারও নেই, বর্গ্‌তো সামান্য সহচর মাত্র। বর্গ্‌কেও তাই নিজের আস্তানা ছেড়ে উঠে আসতে হয় ক্যালিফোর্নিয়া হোটেলে—মিরামারের ঠিক উল্টো দিকে।

হোটেল থেকে ষ্টুডিও, অনেকটা পথের ব্যবধান। গার্বো একখানি ছোট্ট মোটর কেনে। শেষটায় এই মোটরের ধাক্কা এসে পড়ে বেচারী বর্গের ওপর। বর্গ্‌কেই গাড়ী চালাতে হয়, আর শুধু চালানোই নয় গার্বোকে শেখাতেও হয়। কিন্তু বিপদ বাড়ে যখন ছাত্রীর চালানো শেখা হ'য়ে যায়। শিখতে না শিখতেই স্পিডের মোহ গ্রাস ক'রে বসে গার্বোকে। ঘণ্টায় ষাট মাইলে না ছোটালে তার গাড়ী চালানোই মনে হয়না। ষ্টুডিও থেকে বেরিয়েই তীর বেগে মোটর ছোটায় মিরামারের দিকে। তখন সে কি তার আনন্দ! হর্ষের উচ্ছাসে স্পিডও বাড়তে থাকে—চল্লিশ, পঞ্চাশ, ষাট।

একবার এক দশ মাইলের এলাকায় ঘণ্টায় ষাট মাইল বেগে গাড়ী চালিয়ে গার্বো ধরা পড়ে। শেষ পর্যন্ত তার জন্যে বর্গকে ছুটতে হয় শান্টা মনিকার বিচারপতির এজলাসে। যাওয়ার আগে সে ফোন ক'রে ষ্টুডিওর মিঃ মেয়ারকে খবর দেয়, জানায় তাঁকে সব কথা। শুনে মিঃ মেয়ার পুলিশের ওপর তুমুল বেগে উঠে তক্ষুনি পুলিশ প্রধানকে ফোন করেন। ফাঁড়িতে গিয়ে বর্গ্‌ দেখে ইতি-মধ্যেই সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে। দশ ডলার জরিমানা দিলে গার্বোকে আর জেলে যেতে হয় না। তৎক্ষণাৎ সে দশ ডলার দিয়ে গার্বোকে খালাস ক'রে আনে। গার্বো কিন্তু মোটেই খুশি হয় না। হোটেলে ফিরে সে আক্ষেপ ক'রে বর্গ্‌কে বলে,—'ইস বর্গ্‌! দ-শ ড লা-র! মানে চল্লিশ ক্রোনেন! কেন তুমি আমায় জেলে যেতে দিলেনা? আমার ব্যাগে মোটে সাড়ে ছ'ডলার আছে। তাই এখন নাও, বাকিটা তোমায় পরে দিয়ে দেবো।'

এমন একবার নয়, বহুবার গার্বোকে গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে যায় অতিবেগে গাড়ী চালানোর অপরাধে। আর প্রতি-বারই তাকে মুক্ত ক'রে আনতে হয় ফাইন দিয়ে, হয় বর্গ্‌কে না হয় মিঃ মেয়ারকে। তবে গার্বো যদি চিত্রতারকা না হোত তাহোলে তার যে লাইসেন্স থাকতো না তাতে আর কোন সন্দেহ নেই। নেহাৎ গার্বো ব'লেই অত অপরাধ সত্ত্বেও তার লাইসেন্স বহাল ছিল। পুলিশ প্রধান মিঃ ওয়েব একবার বলেন,—'দেখুন, ওঁদের আনন্দে আমরা বাধা দিইনা পাছে ছবিতে আমাদের আনন্দময় মুহূর্তগুলি নষ্ট হ'য়ে যায়। ওঁদের খুশি রাখতে হয় নিজে-দেরই স্বার্থে…'

একে ইংরিজী বলতে পারেনা তার ওপর নিজের গোঁ ছাড়বেনা! গার্বোকে নিয়ে প্রথম দিকে মহা ফ্যাসাদে পড়েন তার পরিচালকরা। তবে তারা ওকে যথেষ্ট সমীহ ক'রতেন, শ্রদ্ধা ক'রতেন, ভালোবাসতেন। ষ্টিলার কিন্তু ছেড়ে কথা কইতেন না। একটু গরমিল কিম্বা বোবার মত জবুথবু ভাব দেখলেই বিরক্ত হ'য়ে গার্বোকে তিনি তীব্র তিরস্কার ক'রতেন। সে গালাগালের ভাষা যদি আমেরিকানরা বুঝতেন তাহোলে রীতিমত আঁৎকে উঠতেন।

হলিউডে গার্বোর প্রথম ইংরিজী ছবি—'দি টোরেণ্ট'। পরিচালনার ভার পড়ে মণ্টা বেলের ওপর। ষ্টিলারকে শুধু ডাকা হয় গার্বোর কয়েকটা পরীক্ষা নেবার জন্যে। গুরু নইলে শিষ্যাকে সামলানো সম্ভব নয়! ওপরওয়ালার অনুরোধে ষ্টিলার এলেন গার্বোর পায়ের কয়েকটি শট্‌ নেবার জন্যে। সব প্রস্তুত, কিন্তু যেই ক্যামেরা ঘোরে অমনি গার্বোর সুন্দর পা দু'টি যেন কাঠের মত আড়ষ্ট হ'য়ে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে থামার আদেশ আসে ষ্টিলারের কাছ থেকে। বিরক্তিসূচক শব্দ ক'রে তিনি গর্জে ওঠেন,—'আঃ গ্রেটা! তোমার কি সেক্স্‌ ব'লে কিছু নেই? তোমার পা দু'টো যেন ব্যাগপাইপের নল! (স্ক্রিপ্ট্‌ গার্লকে দেখিয়ে) ছ্যাখোতো এই মার্কিন মেয়েটির পা! অমনি ভাবে নাড়তে পারনা?'

এতেও যেন ষ্টিলারের রাগ পড়েনা। রল্‌ফ্‌ এবং বর্গের দিকে চেয়ে স্বদেশী ভাষায় একটা গাল দিয়ে বলেন,—'মেয়েটা হতভাগা! নড়ে ছ্যাখোনা, যেন ছ্যাক্‌রা গাড়ীর বেতো ঘোড়া! নারীর কমনীয়তা নেই একটুও! ও আবার চিত্রতারকা হবে না ছাই হবে!'

শুনে গার্বোর কান্নার বন্যা যেন আর থামতে চায়না। ষ্টিলার চটলেই গার্বোর ক্রন্দন সুরু হয়। ফোঁপানী দেখে
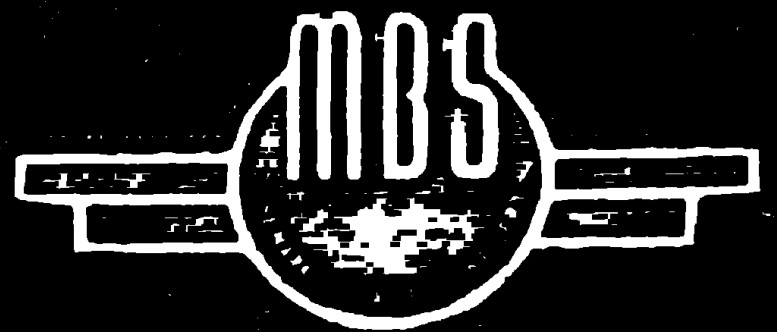
ষ্টিলারের রাগ প'ড়ে আসে। তিনি ওকে আদর ক'রে সান্ত্বনা দেন,—'ছিঃ গ্রেটা কাঁদতে নেই! এটা বোঝনা যে তোমার ভালোর জন্যেই আমি বলি?'

গার্বোর প্রথম পরীক্ষার দিনে আর একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করা বিশেষ প্রয়োজন। সেদিনকার সামান্য পরিচয়ে পরিচালক বেল্ যা মন্তব্য করেন গার্বোর জীবনে তা পরবর্তী কালে অদ্ভুত এক ভবিষ্যদ্বাণী রূপে দেখা দেয়। ব্যাপারটা ঘটে বাগানের সেই বিরাট সেটে। সেটে একটি পিয়ানো ছিল। পরীক্ষার ক্লান্তিতে একটু অবকাশ পেয়েই বর্গ্‌কে নিয়ে গার্বোগিয়ে বসে পিয়ানোর সামনে। হঠাৎ কি খেয়ালে কৌতুকোচ্ছলে বর্গকে শুনিয়ে গানের একটা কলি গেয়ে ওঠে, এবং নেহাৎই কৌতূহলে পিয়ানোর একটা রীড ছুঁয়ে যায় আঙুলে। পিয়ানো বেজে ওঠে খাদের সুরে, আর সেই সঙ্গে অপূর্ব সুরেলা ভাবে মিশে যায় গার্বোর সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর। সুরের মাধুর্যে সবাই আকৃষ্ট হয়, সেটের কাজ থামিয়ে চেয়ে থাকে অপলকে গার্বোর দিকে। এমন মিষ্টি গলা তারা কোনদিন শোনেনি!

লজ্জায় লাল হ'য়ে ওঠে গার্বো। সেটে একটা অন্যায় ক'রে ফেলেছে ভেবে অত্যন্ত অপ্রতিভ হ'য়ে পড়ে। অপরাধী শিশুর মত প্রায় কাঁদো কাঁদো হ'য়ে বর্গ্‌কে বলে,—'ভারী অন্যায় হ'য়ে গেছে! আমি ভেবেছিলাম মেকি পিয়ানো, সেট সাজাবার জন্যে রাখা হোয়েছে। তা নয় বর্গ্,—এ এ্যাক্কেবারে সত্যি পিয়ানো!'

মণ্টা বেল্ কিন্তু আনন্দে লাফিয়ে ওঠেন গার্বোর গলা শুনে। পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। ইংরিজীতে বর্গের কাছে প্রশংসা করেন,—'কি অপূর্ব কণ্ঠস্বর! হায়, হায়, আমরা যদি এ স্বর কাজে লাগাতে পারতাম! আর কিছু না হোক শুধু ওঁর গলা শুনিয়েই ছবির বাজার মাৎ ক'রে দিতে পারতাম!'

এ কথা একদিন গার্বোর জীবনে পরম সত্য হ'য়ে দেখা দেয় যেদিন রূপের সঙ্গে সংযোগ হয় বাণীর। আর সেদিন সারা বিশ্বের দর্শক ভীড় ক'রে আসে প্রেক্ষাগারে। দিক দিগন্তে ধ্বনিত হ'য়ে ওঠে গার্বোর কণ্ঠস্বর। ভাষায় প্রকাশের নয় সে স্বর-মাধুর্য! যেন কোন এক ঐন্দ্রজালিক প্রভাবে মানুষকে তা' নিয়ে যায় সুরলোকের সপ্তস্বর্গে। রূপালী পর্দায় গার্বোর প্রথম বাণী চিত্রের প্রথম ক'টি কথা হোল,—'গিভ্ মি এ গ্লাস অব্ হুইস্কি'। প্রেমিকা নারীর সুরার জন্যে এই আকুল মিনতি নিয়ে সুরু হয় গার্বোর বাণী-চিত্রের জীবন।

এরপর আরম্ভ হয় গার্বোর প্রথম ছবি 'দি টোরেণ্ট'-এর চিত্র গ্রহণ মণ্টা বেলের পরিচালনায়। রিকার্ডো কোরেজ আসেন গার্বোর নায়ক হ'য়ে। রিকার্ডোর গৌরবসূর্য তখন মধ্যগগনে। অতবড় একজন শিল্পীর সঙ্গে অভিনয় করার কল্পনায় গার্বো সন্ত্রস্ত হ'য়ে ওঠে। তার ওপর ওর প্রধান অবলম্বন ষ্টিলারকেও ও পাবেন'। যতই দিন ঘনিয়ে আসে গার্বোও ম্লান হ'য়ে পড়ে নিশ্চিত মৃত্যু-পথ যাত্রীর মত। ষ্টিলারহীন ফ্লোর ওর কাছে যেন অকূল সমুদ্র, যেন এক নির্মম মরুভূমি।

তবুও ওকে দাঁড়াতে হয়। ষ্টিলারের উৎসাহ ওকে দেয় সাহস, তাঁরই প্রভাবে ও পায় শক্তি। সময় পেলেই ছোটে ষ্টিলারের কাছে, একটি মুহূর্তও নষ্ট করে না তাঁর অমূল্য উপদেশের পরিবর্তে। তবু যেন মাঝে মাঝে মনে হয়, যখন কাজ সুরু হবে ছবির—যে ছবির ওপর নির্ভর ক'রছে ওর শিল্পী জীবনের ভবিষ্যৎ,—যখন ক্যামেরার দৃষ্টি প'ড়বে ওর ওপর, তখন ওর দৃষ্টির সামনে থাকবেনা ষ্টিলার—ওর সৃষ্টির যিনি কেন্দ্র। তেমন কোন মুহূর্তের কথা ভাবতেও গা ওর শিউরে ওঠে।

'বর্গ্! দোহাই তোমার, এর একটা বিহিত কর।' গার্বোর মিনতি আকুল হ'য়ে ওঠে কান্নায়। 'ওঁদের ব'লে ক'য়ে মরিসকে আমায় দাও! কেন ওঁরা মরিসকে দিচ্ছেন না?'

গার্বোর করুণ আবেদন ব্যর্থতায় নিষ্ফল হ'য়ে যায়। ষ্টিলারকে সেটে না পাওয়ার বেদনার মধ্যেই একদিন এগিয়ে আসে প্রথম স্যুটিংএর দিন। মন খারাপের জন্যে পাছে ষ্টুডিওতে উপস্থিত হোতে দেরী ক'রে ফেলে সেই ভয়ে সকাল সকাল বর্গ্ সেদিন ওর হোটেলে এসে হাজির হয়। অনেক তাগিদ দিয়ে শেষটায় ওকে বার ক'রতে পারে।

ছোট্ট গাড়ীখানা ক'রে রওনা হয় ষ্টুডিওর পথে। তখনও গার্বোর দুঃখ কমেনি। বর্গের পাশে ব'সে সারা পথ ও শুধু ফোঁপায় আর অমুরো ধকবে ষ্টিলাবকে নেওয়ার জন্যে।

ছবিতে রিকার্ডো কোবেজকে নায়কের ভূমিকা দেওয়া হয় ভ্যালেন্টিনোর সুযোগ্য উত্তরসাধক হিসাবে। ভ্যালেন্টিনোর মতই তখন তাঁর বিশ্বজোড়া খ্যাতি। কোরেজ জাতিতে স্প্যানিস। সুন্দর সুপুরুষ চেহারা। তাঁর সঙ্গে গার্বোর মত এক অজানা পল্লী মেয়ের অভিনয় না জানি বেমানান না হ'য়ে যায়! ষ্টুডিওর অনেকের মনের এ সন্দেহ যে সেদিন জাগেনি এমন নয়। কে একজন যেন রসিকতা ক'রে গার্বোকে বলে কোরেজের সঙ্গে স্প্যানিস্ ভাষায় কথা কইতে।

'কইতাম, কিন্তু আমিতো সে ভাষা জানিনা', গার্বো প্রতিবাদ করে।

'উনিও জানেন না', বলে সেই রসিক ভদ্রলোক।

'বটে?' পল্লবঘন আয়ত ভুরু দু'টী তুলে গার্বোও রসিকতা করতে ছাড়ে না,—'তবে কি উনি খাঁটি সুইডিস্?'......

ষ্টুডিও যেন আলাদা একটা জগৎ। প্রাত্যহিক পরিচিত পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তার রীতিনীতি, অভাব-অভিযোগ, ঈর্ষা-দ্বন্দ্বের যতকিছু নীচতাকে কেন্দ্র ক'রে গড়ে উঠেছে নতুন এক কূটনীতি যাকে ষ্টুডিও পলিটিক্স নামে অভিহিত করা হয়। মেট্রোও এ গলদ থেকে রেহাই পায়নি। সেখানকার প্রতিষ্ঠান যেমন বড় তেমনি জটিল তার কূটনীতির জাল। যতই সুটিঙ্ এগোয়, ধীরে ধীরে অনিবার্য রূপে গার্বোও জড়িয়ে পড়ে তার ক্লেদাক্ত গভীরতায়। তবে অসামান্যা বুদ্ধিমতী ব'লে অনেক চেষ্টায় এড়িয়ে চলে। বর্গ্ কিন্তু পারে না, বীতশ্রদ্ধ হ'য়ে অভিযোগ করে। নিরুদ্বেগ প্রশান্তিতে গার্বো তাকে বোঝায়,—'কিন্তু বর্গ্ ওরা আমাদের কে? সবুর কর, সবুর কর। ধৈর্য ধ'রে থাকো অনেক কিছুই দেখবে।'

কোবেজ গার্বোকে উপেক্ষা করলেও গার্বো কিন্তু তাতে ভ্রূক্ষেপ করেনা। বোঝাও যায়না ও সে সম্বন্ধে সজাগ, শুধু মাঝে মাঝে আড়চোখে চায় বর্গের দিকে। দু'একটি ক্লোজ-আপ ছাড়া কোবেজের সঙ্গে ও একটিও বাড়তি কথা বলেনি। স্যুটিং-এর সময় কোবেজ সেটে ঘুরে বেড়ান রাজকীয় মহিমায় যশের মদগর্বে, আর গার্বো প'ড়ে থাকে নিঃশব্দে সবার পেছনে। তবে ছবির খাতিরে প্রয়োজন হোলে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত ক'রতে পেছিয়ে পড়েনা। সেখানে ও সবার আগে, মহীয়সী নারীর মর্যাদা নিয়ে দাঁড়ায় সোজা হ'য়ে। সব অপমান অনাদর ও সইতে পারে মুখ বুজে কিন্তু যেখানে ওর শিল্পসৃষ্টি বিপন্ন সেখানে ও অনমনীয় দৃঢ়তায় ভয়ঙ্কর।

ষ্টুডিওর লোকেরা অনেকেই জানেনা যে, ছবি-তোলার অবসরে গার্বোকে বর্গ্ ইংরিজী শেখায়। তাই তারা আগের মতই গার্বোকে নিয়ে নিজেদের মধ্যে হাসিঠাট্টা করে ইংরিজীতে, ভাবে ও কিছু বোঝে না।

—'ওহে! এবার ওই গবেট মেয়েটিকে সেটে এনে তোল'।

—'জড়ভরত মেয়েটির হোল কি!'

এ সব উক্তির অনেক কিছুই বোঝবার মত ইংরিজী

বিদ্যা গার্বোর তখন হোয়েছে তবু সে একটিও প্রতিবাদ ক'রতোনা, কারণ তার দৃঢ় বিশ্বাস একদিন সে ওই ষ্টুডিওরই মহিষী হ'য়ে এসে দাঁড়াবে ওদের সামনে, আর ওরা সসম্ভ্রমে স'রে দাঁড়াবে ওকে দেখে। সেদিন আর ওদের এই প্রগলভতা থাকবে না। ফিস্‌ফিসিয়ে নিজেদের বিস্ময় জানাবে একটিবার ওকে নিজেদের সামনে দিয়ে যেতে দেখে। ষ্টিলারের ছাত্রী হ'য়ে পলায়নপর মনোবৃত্তি কি ওর সাজে! দিনের পর দিন নিজের স্বাধীন মনোবৃত্তি বিকশিত হ'য়ে ওঠে গার্বোর মধ্যে।

একদিন সন্ধ্যায় মিঃ বেল্ তাড়াহুড়ো ক'রতে থাকেন সূর্যাস্তের দৃশ্য গ্রহণের জন্যে। সূর্য ডুবে গেলে সেদিনের সব পরিশ্রম পণ্ড। দৃশ্যে একটি বোমা বিস্ফোরণ দেখাতে হবে। প্রথম 'টেক্' সফল হয় না। অবশ্য বোমা ঠিক ফাটে তবে তার টুক্‌রো ছুটে এসে গার্বোর ঠোঁটে লেগে ব্যর্থ ক'রে দেয়। দ্বিতীয় 'টেক্'-এর নির্দেশ দিয়ে মিঃ বেল্ ফিরে দেখেন সেটে গার্বো নেই। বর্গকে বলেন— 'মেয়েটিকে এক্ষুনি নিয়ে এসো। আর পাঁচ মিনিটের মধ্যে শট্ না নিলে আবার আর একটি সূর্যাস্তের জন্যে অপেক্ষা ক'রে থাকতে হবে।'

গার্বো তখন সেটের বাইরে গিয়ে ঠোঁটের ক্ষতস্থান থেকে বোমার কুচিগুলো বার ক'রছিল। মিঃ বেলের হুকুম শুনে ও বলে—'ওঁকে অত ব্যস্ত হোতে নিষেধ কর বর্গ্। সূর্যাস্ত তো আর চিরদিনের মত চ'লে যাচ্ছেনা! আরও অনেক তিনি পাবেন'.........

সাধারণতঃ গম্ভীর প্রকৃতির মেয়ে হোলেও মাঝে মাঝে গার্বোর তীক্ষ্ণ শ্লেষ ও সরস মন্তব্যগুলি অত্যন্ত উপভোগ্য হয়। একদিন একটি দৃশ্যগ্রহণের সময় গার্বোর কি যেন একটা ত্রুটী শুধরে নেবার জন্যে মিঃ বেল্ বর্গকে আদেশ দেন ওকে বুঝিয়ে বলতে। তখনকার দিনে ছবি ছিল নির্বাক। তাই চিত্রগ্রহণের মাঝেই বর্গ্ ওকে কথাটা বলে। সে দৃশ্যে ওর করুণ রস ফুটিয়ে তোলার কথা। কারুণ্য দূরে থাক বেলের আদেশ শুনে চলন্ত ক্যামেরার সামনেই ও তাঁর মুণ্ডপাত সুরু করে। অবশ্য মাতৃভাষায়। বর্গ্‌কে শুনিয়ে মুখ বেঁকিয়ে বলে—'ক্ষতি কি বর্গ, যাক্ না ও আমার জন্যে চুলোয়!' ভাগ্যিস্ সে ছবির সেই দৃশ্যটা কোন সুইডেনবাসীর অক্ষটা নজরে পড়ে নি! পড়লে সে গার্বোর ঠোঁট নড়া থেকে ঠিক বুঝে নিতো ছবির সংলাপের বদলে ও পরিচালকের শ্রাদ্ধের মন্ত্র আউড়েছে......

'দি টোরেণ্ট'-এর স্যুটিং দিনগুলো গার্বোর জীবনে যেমন অবিস্মরণীয় তেমনি আনন্দময় মেট্রোর প্রতিটি লোকের কাছে। এক একটি দিনের অভিজ্ঞতা—কখনও তিক্ত কখনও মধুর, গার্বোকে ওর পরবর্তী ছবির সাফল্যের ইঙ্গিত দিয়ে যায়। ও বোঝে অনেক, দেখে অনেক,—আর এই ছোটখাটো প্রাত্যহিক ঘটনার সঞ্চয় থেকে গ'ড়ে ওঠে ওর চিত্রজীবনের বিচিত্র রমোন্যাস—যার প্রতিটি অধ্যায় আন্দোলিত আশা আর নিরাশায়। কখনও মনে হয় গার্বোকে দৃঢ়তায় অটল, ঘটুক যা কিছু, শেষ ও ক'রবেই ছবি। আবার কোন কোন দিন হয়তোবা ভেঙ্গে পড়ে ব্যর্থতায় ঝটিকাহত লতিকার মত। দীর্ঘ দৃশ্যের শেষে অশেষ ক্লান্তিতে, ষ্টিলারবিহীন বিভ্রান্তিতে মাঝে মাঝে ও মুষড়ে পড়ে। বর্গের পাশে ব'সে চাপা স্বরে বলে,—'চল আমরা দেশে ফিরে যাই। আর বুঝি পোষায় না।'

তেমনি আবার কোনদিন এমন কিছু কাণ্ড ক'রে বসে যা সমস্ত ষ্টুডিওকে হাসিতে ভ'রে তোলে। ইংরাজী অনভিজ্ঞা গার্বো প্রায়ই হাস্যকর হ'য়ে উঠ্‌তো। 'দি টোরেণ্ট'-এর একটি দৃশ্যে ওকে গান গাইতে হয়। নাটকীয় পরিস্থিতি অনুযায়ী সে দৃশ্যে ও বিমর্ষা, পিয়ানোয় ব'সে দুঃখের গান গাইতে হবে। প্রথমটা দুঃখের পরে খুব আনন্দের। আগে থেকেই বর্গ্ ওকে যথেষ্ট তালিম দেয়, তোতা পাখীর মত গানের লাইনটা মুখস্থ করিয়ে নেয়।

কারণ সেটা ছিল ওর ক্লোজ-আপ তাই ঠোঁটের ভঙ্গী ইংরাজী উচ্চারণ মাফিক নিখুঁত হওয়া চাই। শিখে প'ড়ে শেষটায় ক্যামেরার সামনে যখন বসে পিয়ানোয় তখন ওর সব যায় এলোমেলো হ'য়ে। গান অবশ্য ও গায়, তবে তার উচ্চারণ যেমন মজাদার তেমনি হাস্যকর

ওর হাবভাব। ভুল উচ্চারণ আর তার সঙ্গে আনন্দের ভাব না ফুটিয়ে আগাগোড়া করুণ রসের অবতারণায় সারা ষ্টুডিও কেঁপে ওঠে হাসির ধ্বনিতে। ওদের হাসিতে গার্বোর সে কি রাগ! ব্যাপারটা বুঝিয়ে সুজিয়ে শেষ্‌ ওকে কোন রকমে সে যাত্রায় শান্ত করে…

এই ভাবেই একদিন শেষ হয় 'দি টোরেণ্ট'। গার্বোর সংশয় ও ষ্টিলারের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও ছবিখানি অভূত-পূর্ব সাফল্যে মণ্ডিত হ'য়ে ওঠে। তুমুল সাড়া প'ড়ে যায় আমেরিকায়! বিপুল আনন্দে চিত্রামোদীরা নবাগতা গার্বোকে জানায় তাদের অন্তরের অভিনন্দন। ক্ষুধিত দর্শক এতদিনে বুঝি তৃপ্ত হয় নতুন তারকাকে পেয়ে। মেট্রোও উল্লসিত হ'য়ে ওঠেন, এবং সুরু করেন গার্বোকে নিয়ে তাঁদের দ্বিতীয় ছবির প্রস্তুতি—'দি টেম্প্‌ট্রেস্‌।' গার্বো আনন্দে অধীর হ'য়ে পড়ে যখন শোনে যে ছবি-খানি ষ্টিলার পরিচালনা ক'রবেন। মানসনেত্রে ওর ভেসে ওঠে 'গোস্টা বার্লিং'-এর স্মৃতি, মনে পড়ে ওর সেই প্রথম ছবির কথা। আশা হয় ষ্টিলারকে পেয়ে এবার ও তেমনি একখানি ছবির সৃষ্টিতে ম্লান ক'রে দেবে বিশ্বের আর সব তারকাকে। 'জানো বর্গ্‌, মরিস্‌কে পেয়ে আমি ওদের দেখিয়ে দেবো। 'দি টোরেণ্ট' আবার ছবি! ধ্যেৎ! দাঁড়ও না দেখাচ্ছি!……'

আবার মেট্রোলটে কর্মব্যস্ততা জেগে ওঠে। হাজার হাজার ডলার ব্যয়ে প্যারিসিয়ান সার্কাসের প্রকাণ্ড একটা সেট তৈরী হয়। প্রতিভাময়ী গার্বোর জন্যে কর্তৃপক্ষ অর্থ ব্যয়ে ত্রুটী করেন না। শ'য়ে শ'য়ে এক্‌স্ট্রা নিয়োগ করা হয়। স্যুটিং সুরু হয়।

দৃশ্যটি আনন্দমুখর। বিচিত্র বর্ণের পোষাক, মনোরম সাজ-সজ্জায় সেটটি যেন ঝল্‌মল্‌ করে! সার্কাসের বহু অভিজ্ঞ খেলোয়াড় চারদিক ঘিরে আগুনের রিঙ্‌ নিয়ে কসরৎ দেখাচ্ছে, আর মাঝখানে দাঁড়িয়ে গার্বো একটি সাদা ঘোড়ায় চেপে। চিত্র-গ্রহণ আরম্ভ হ'য়েছে এমন সময় ভীড় ঠেলে একটি লোক এসে ষ্টিলারকে এক টুকরো কাগজ দেয়। তৎক্ষণাৎ ষ্টিলার হাতের ইসারায় ক্যামেরা ও শিল্পীদের থামবার নির্দেশ দেন। গার্বোকে কাছে ডাকেন। ঘোড়া থেকে নেমে গার্বো এসে দাঁড়ালে নিঃশব্দে তিনি ওর হাতে কাগজটি তুলে দেন। দুঃসংবাদটি পড়বার সঙ্গে সঙ্গে আর্তনাদ ক'রে গার্বো প'ড়ে যায়, ষ্টিলার ওকে ধ'রে ফেলেন। খবর এসেছে ওর বোন, ওর প্রিয় এ্যাল্‌ভা সুইডেনে মারা গেছে! গার্বোর কাছে এ বার্তা পৌছোনোর আগে পর্যন্ত কেউ জানতেও পারে নি যে ষ্টিলার এ দুঃসংবাদ চব্বিশ ঘণ্টা চেপে রেখেছিলেন। অথচ কেন যে তা প্রকাশের জন্য স্যুটিং-এর এই মুহূর্তটিকেই শুধু বেছে নিয়েছিলেন তা একমাত্র তাঁর মত নিপুণ ও দক্ষ পরিচালকের পক্ষেই জানা সম্ভব।

খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গেই গভীর সমবেদনায় সেট নিস্তব্ধ হ'য়ে আসে। মুহূর্ত কয়েক গার্বো নিশ্চুপ, মাথায় হাত দিয়ে ব'সে। তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলে,—'এসো মরিস্‌; কাজ সুরু করা যাক্‌।' এই ব'লে একটু হেসে আবার ঘোড়ায় উঠে পড়ে। সেদিনকার গার্বোর অভিনয় যাঁরা দেখেছিলেন আজও তাঁরা ভুলতে পারেন নি। অমন সার্থক মুহূর্ত সৃষ্টি গার্বোর অভি-নেত্রী জীবনে আর দ্বিতীয়টি হোয়েছে কি না সন্দেহ……

এমন সুন্দর যে ছবির সুরু তা' বুঝি আর সারা হয় না। ষ্টিলারের পরিচালক জীবনে আসে প্রথম আঘাত। স্বদেশে ষ্টিলার ছিলেন সর্বশক্তিমান, এক-ছত্রাধিপতি। নিজেই চিত্রনাট্য লিখতেন, প্রযোজনার তদারক ক'রতেন, ছবির খুঁটিনাটি যাবতীয় বিষয় দেখা শোনা ক'রতেন,—এমন কেউ ছিল না যার কাছে তাঁকে জবাব দিহি ক'রতে হোত। এ ক্ষেত্রেও তিনি সেই রীতিই অবলম্বন করেন। কিন্তু মিঃ মেয়ার তা' পছন্দ করেন না। তারপর ষ্টিলার যখন সুপারভাইসার, এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ডিরেক্টার, প্রভৃতি অন্যান্য সহকারী নেবার প্রস্তাবে অস্বীকৃত হন তখন মিঃ মেয়ারের সঙ্গে তাঁর মনোমালিন্য দেখা দেয়। এক সপ্তাহ ছবি তোলার পর মিঃ মেয়ার তাঁকে বরখাস্ত করেন।

বিবাদের ফলে ষ্টিলার অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন, গার্বোও তাই। ও তক্ষুনি ছুটে যায় তাঁর কাছে। গার্বোর

সহানুভূতিতে উৎসাহিত হ'য়ে ষ্টিলার স্থির করেন ওকে দিয়েই তিনি এ অপমানের প্রতিশোধ নেবেন। ছাত্রীকে তাই বোঝান,—'গ্রেটা। তুমি আজ মস্তবড় অভিনেত্রী। আর আমেরিকায় তোমার মত বড় বড় শিল্পীরা কেউই সপ্তাহে চারশো' ডলারে কাজ করে না। ওঁদের গিয়ে বল যে এর চেয়ে বেশী পারিশ্রমিক না দিলে তুমি কাজ ক'রবে না।'

'কিন্তু মরিস্' দারিদ্র্যের বোঝা আবার টেনে আনার ভয়ে ভীরু প্রতিবাদ করে গার্বো—'তাহোলে ওঁরা আমায় আবার সুইডেনে পাঠিয়ে দেবেন।'

'না, দিতে পারেন না,' চাপা হাসিতে প্রকম্পিত হ'য়ে জবাব দেন ষ্টিলার। 'ওঁদের সাহসে কুলোবেনা।'

গুরুর আদেশে সুরু হয় শিষ্যার অসহযোগ। সহসা ষ্টুডিও থেকে গার্বো নিরুদ্দেশ। ষ্টিলার ও বর্গ্ ছাড়া কেউ জানে না সে কোথায়। বর্গের ওপর ভার ছিল গুরু শিষ্যার মধ্যে সংবাদ আদান প্রদানের। তাই সে গার্বোর সঙ্গে একটা সঙ্কেত ঠিক ক'রে নিয়েছিল। দরজায় একটি দীর্ঘ আর দু'টি হ্রস্ব টোকার শব্দ হোলেই গার্বো বুঝতো বর্গ্ এসেছে। এইভাবেই চলতে থাকে গার্বোর আত্মগোপনের দিনগুলো, 'এম্, জি, এম্'এর ইতিহাসে যা স্মরণীয় অধ্যায় রচনা ক'রেছে।

ওদিকে গার্বোর সন্ধানে কর্তৃপক্ষ গোয়েন্দা নিয়োগ করেন। গোয়েন্দারা বর্গ্কে অনুসরণ ক'রে গার্বোর গোপন আবাসের সন্ধান লাভের চেষ্টা করে। কিন্তু পারে না। সুকৌশলে তাদের চোখে ধুলো দিয়ে বর্গ্ যথারীতি গার্বোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। এদিকে ধীরে ধীরে ষ্টুডিওতো প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হ'য়ে দাঁড়ায়। তখন পরিচালক ফ্রেড্ নিব্লোকে দিয়ে ছবির বাকিটুকু তোলার ব্যবস্থা হয়। কিন্তু গার্বোকে কোথায় পাওয়া যাবে? উপায়ান্তর না দেখে মিঃ মেয়ার একদিন বর্গ্কে অনুরোধ করেন গার্বোকে তাঁর কাছে এনে ব্যাপারটার মীমাংসা ক'রে ফেলতে। শেষে বর্গ্ রাজী হয়। কিন্তু হাজার চেষ্টা ক'রেও গার্বোকে সে টলাতে পারে না। প্রতিজ্ঞায় ও অটল।

গার্বো তাকে জানায়—এর মীমাংসা হবে কোর্টে। হলিউডের এ্যাটর্নীর হাতে ও ছেড়ে দেবে ব্যাপারটা। ওর দৃঢ়তায় বেগতিক দেখে বর্গ্ তখন অন্য পথ অবলম্বন করে। ওর দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে বলে,—'ছাখো গ্রেটা, মিটিয়ে নাও। উকিলের খরচ যোগানোর মত সঙ্গতি তোমার নেই। আর তাতে ফলও কিছু হবে না। মাঝখান থেকে তোমার বহু কষ্টার্জিত অর্থ নষ্ট হবে। এরপর সংসার চালাবে কি ক'রে?'

গার্বোর মনে পড়ে দুঃস্থা মা'র মুখখানি। দৃঢ়তায় কিছু যেন ফাটল ধরে। তবুও বলে,—'উঃ তুমি কি সাংঘাতিক মানুষ, বর্গ্! এ কথা ব'লতে পারলে! উপদেশ আমি চাইনি তোমার কাছে। আমার ভালোমন্দ বিচার করবার তুমি কে?'

দিনের পর দিন যায়, আর ফুরিয়ে আসে গার্বোর পুঁজি। অর্থের চিন্তায় ক্লান্ত হ'য়ে পড়ে গার্বো। মাকে টাকা পাঠানোর ভাবনায় কাতর হ'য়ে ওঠে; আর এরই সুযোগে বর্গের দৌত্য ধীরে ধীরে এগোয় সফলতার দিকে। গার্বো প্রায় যেন রাজী হ'য়ে আসে কাজে ফিরে যেতে! এমন সময় আবার একটি বাধা এসে দাঁড়ায়। গার্বো জানতে পারে তার প্রিয় রূপসজ্জাকর ম্যাক্স্ রীকে 'দি টেম্প্ট্রেস্'-এর কাজ থেকে বরখাস্ত করা হোয়েছে। আবার গার্বো বেঁকে বসে। জানায়, ম্যাক্স্ রীকে না পেলে সে কিছুতেই নামবে না। যে মেয়ে একদিন হলিউডের পথে ছেঁড়া সোয়েটার আর পুরনো পোষাক প'রে ঘুরে বেড়াতো, পোষাক-প্রসাধন সম্পর্কে তার এই বিচারকুণ্ঠায় সবাই বিস্মিত হয়,—হননা শুধু পরিচালক নিব্লো। তিনি বোঝেন গার্বোর এ দ্বিধা অশোভন নয়, সত্যিকার শিল্পী-জনোচিত। তাই তিনি জানান—কর্তৃপক্ষ না রাজী হোলেও নিজের পকেট থেকে টাকা দিয়ে ম্যাক্স্কে তিনি বহাল রাখবেন।

সম্মতির শেষ অন্তরায়টুকু দূর হয়। গার্বো কাজে যোগদানের স্বীকৃতি দেয়। আর এই প্রথম গার্বোর পথ স'রে যায় ষ্টিলারের থেকে দূরে, অনেক দূরে······

শ্রীমতী
সুভিরেখা
•
নারাহু,
পিক্‌চার্সে'র
মুক্তি-
প্রতীক্ষিত
চিত্র
অপরাজিতা'র
বিশিষ্ট এক
দৃশ্যে
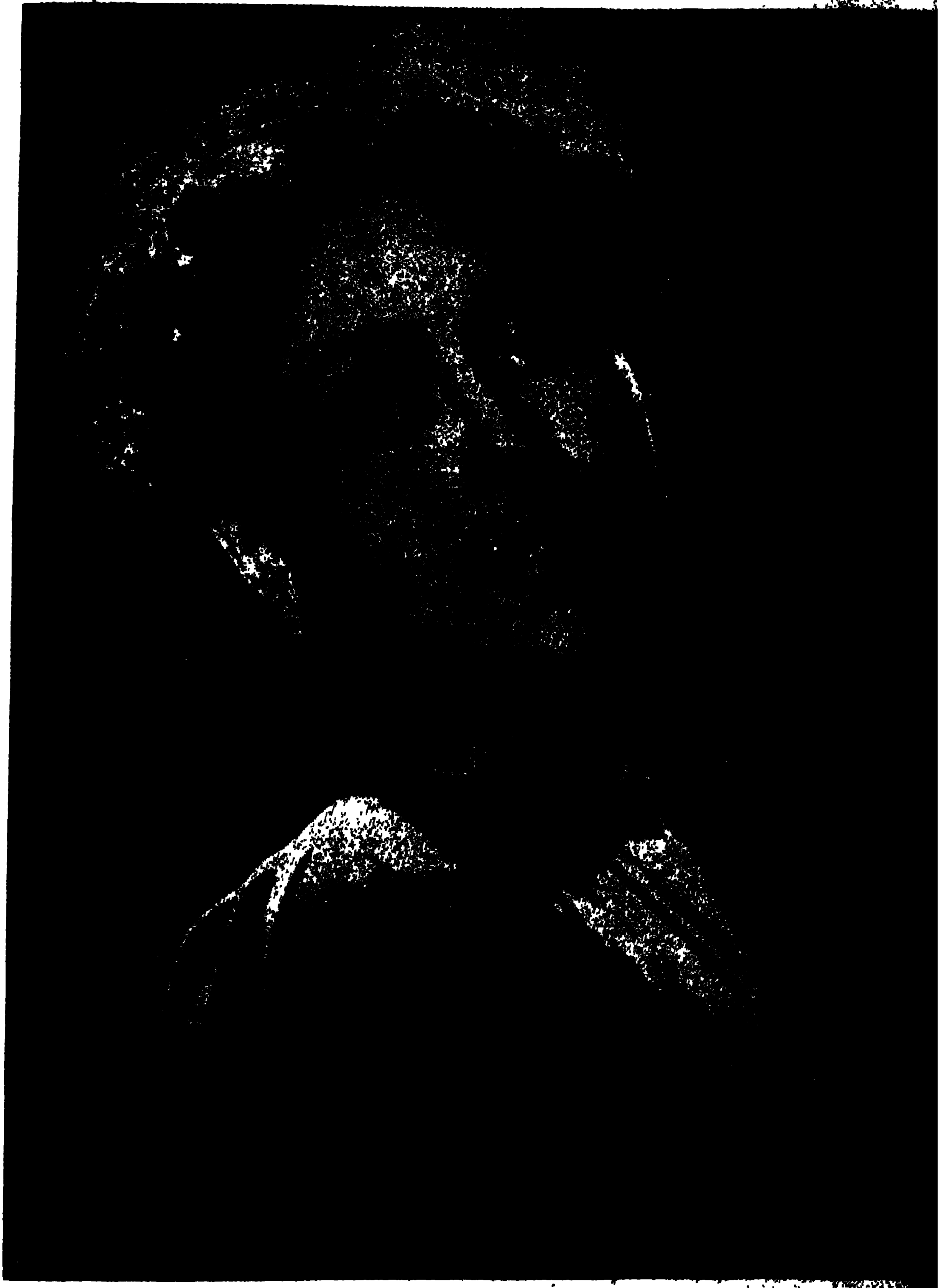
চিত্রশ্রীর মুক্তি-প্রতীক্ষিত ছবি 'চিতা বহ্নিমান'-এ নবাগতা অনুরাধা দেবী

আর সে ব্যবধান ধীরে ধীরে দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হ'য়ে ওঠে। কালের বিবর্তনে গার্বোর গৌরবসূর্য যতই এগিয়ে চলে ঊর্ধ্বে ততই তার কক্ষ যেন সরে যায় ষ্টিলারের পৃথিবী থেকে। তবু কিন্তু গার্বো ভোলে না তার জীবনের প্রথম গুরুকে।

সেদিন কাজে যোগ দিয়ে ষ্টুডিও থেকে ফিরছে গার্বো—ওর হোটেলে। ছোট্ট গাড়ীখানি ছুটছে তীব্রবেগে সমুদ্রের বালিয়াড়ির বুক বেয়ে। পাশে ব'সে আছে বর্গ্। অপরাহ্নের পরিম্লান আলো ছড়িয়ে প'ড়েছে সমুদ্রের নীল নিস্তরঙ্গ বুকে, ছড়িয়ে প'ড়েছে গার্বোর বিষাদমলিন মুখমণ্ডলে। মুখে ওর কথা নেই। কি যেন একটা অব্যক্ত বেদনা থেকে থেকে ওর মাঝে গুমড়ে উঠছে। গাড়ী ছুটছে বালির ধুলো উড়িয়ে। হঠাৎ আড়চোখে চেয়ে বলে,—'বর্গ্, মাঝে মাঝে কি মনে হয় জানো? মনে হয় তোমায় খুন করি! তুমি একটা বুড়ো খোকা। ভারী ছেলেমানুষ তুমি! এসো কিছু খাওয়া যাক্।'

গাড়ী থামিয়ে তু'জনে ঢোকে ছোট্ট একটি ইটালীয়ান কাফেতে। খাওয়ার অবকাশে কথা হয়। সেদিন কথার নেশা যেন গার্বোকে পেয়ে বসে। অন্তরের সমস্ত সঞ্চিত আবেগ মুহূর্তের উচ্ছ্বাসে বিদীর্ণ ক'রে দেয় ওর বুক।

গার্বো বলে,—'বর্গ্, লোকে বলে আমি নাকি মরিসের প্রেমে প'ড়েছি। কিন্তু তা' একটুও সত্যি নয়। কোন পুরুষের কাছে আজও আমি ধরা দিইনি, এমনকি মরিসের কা'ছেও না। আমি তাঁকে ভালোবাসি না, তিনিও আমায় বাসেন না। আমি তাঁকে ভয় করি, শ্রদ্ধা করি, আর ভাবি—আজ থেকে বুঝি আমি তাঁকে হারাবো। তবু কিন্তু আজও আমি তাঁকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ ব'লেই মানি, মানবো চিরদিন।

'তুমি হয়তো দেখেছো আমি তাঁর দেহের সান্নিধ্যে ব'সে এক সঙ্গে সিগারেট খেয়েছি, খেয়েছি তাঁরই ঠোঁট থেকে সিগারেট নিয়ে। দেখেছো তাঁকে আমায় শিশুর মত আলিঙ্গন ক'রতে। ভারী ভালো লাগে আমার! ওঁর দৃঢ় বাহু যখন আমায় বেষ্টন ক'রে থাকে আমি যেন মনে এক অদ্ভুত বল পাই। কিন্তু তাতো প্রেম নয়, বর্গ্! তিনি যে আমার গুরু, আমি তাঁকে প্রণাম করি'.....

ষ্টিলারও ভোলেন না গার্বোকে। ওর জন্যে তিনি কম উদ্বিগ্ন নন। পরে যখন গার্বো আর গিলবার্টকে নিয়ে ষ্টুডিও মহলে মুখরোচক গুজবের উদ্ভব হয়, একদিন বর্গ্কে ডেকে তিনি প্রশ্ন করেন,—'বর্গ্, গ্রেটাকে তুমি দেখেছো?'

'না, কিছু ব'লতে হবে?'

'না'—বেদনারুদ্ধ স্বরে ষ্টিলার জবাব দেন,—'শুধু—শুধু একবার ওকে স্মরণ করিয়ে দিও আমার দীক্ষার কথাটা: জীবনে এমন কিছু না ক'রে বসে যা ওকে আঘাত করে।'

তিনি বুঝেছিলেন গিলবার্টের মোহ ওর জীবনে অভেদ্য দুর্ভেদ্য এক মায়াজাল রচনা করছে। এ তাঁর ঈর্ষা নয়—গুরুর নিষ্ঠুর কর্তব্য। ওকে যে তিনি সন্তান স্নেহে গ'ড়ে তুলেছেন। আজও তাই ওকে আগলে রাখতে চান মোহান্ধ মানুষের আঘাত থেকে। তাঁর শিল্পীসত্তা সৌন্দর্যের পূজারী দেহের স্থূল ক্ষুধা তার নাগাল পায়না। আজও তাই অনেকে অবাক হয়ে ভাবে ষ্টিলারের জীবনে কোন নারী সত্যিই এসেছিল কিনা!...

সন্ধ্যা নিবিড় হয়ে আসে। একটি দু'টি ক'রে কাফের আলোকমালায় উজ্জ্বল ফুল ফুটে ওঠে। দিনান্তের শ্রান্ত সমুদ্রের মতই একসময় শান্ত হয়ে আসে গার্বো'র উচ্ছ্বাস। আস্তে আস্তে ডুবে যায় বিষণ্ণতায়। গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে হঠাৎ ব'লে ওঠে—'এত নিঃসঙ্গতা আর সহ্য হয় না, বর্গ্। দেশের জন্যে ভারী মন কেমন করে। মনে হয় এক্ষুনি ছুটে যাই মা'র কাছে। কি হবে আর এ সবে?'

গার্বোর আবেগে বাধা পড়ে। ছোট্ট একটি ইটালীয়ান শিশু হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসে টেবিলের দিকে। সহসা গার্বোর মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে নতুন এক আভায়। দু'বাহু বাড়িয়ে সস্নেহে সে কুড়িয়ে নেয় শিশুটিকে মেঝে থেকে। অজস্র চুম্বনে ভ'রে তোলে তার গাল দু'টি। আধো আধো ভাষায় কত কথাই না বলে শিশুটির সঙ্গে। এমন সময় তার মা এসে দাঁড়ায়। ছেলেটিকে তার কোলে তুলে দিয়ে বর্গ্কে বলে গার্বো,—

'বর্গ, আমার সবচেয়ে বড় কামনা এমনি একটি ছোট্ট শিশু,—যে হবে একান্ত আমার।'

গার্বোর এ ক্ষণিকের উচ্ছ্বাস নয়। এ উদগ্র সন্তান কামনার মূল ওর অন্তরের গভীরে, প্রতিনিয়তই তা উদ্বেলিত ক'রে তোলে ওর বক্ষ। শুধু মাঝে মাঝে কোন দুর্বল মুহূর্তে এমনিভাবে প্রকট হয়ে ওঠে মাতৃত্বের অতৃপ্ত বুভুক্ষা, প্রকট হ'য়ে ওঠে অনিবার্য্যরূপে নারীর সহজাত বৃত্তি। আর এমনি সব আবেগময় মুহূর্তে ছায়ার গার্বো নেমে আসে কায়া নিয়ে, নেমে আসে স্তাবকের কল্পলোক থেকে মাটির এই পৃথিবীতে—রক্ত-মাংসে-গড়া মানবীর রূপ নিয়ে·····

নির্জনতা মুখর করে তোলে গার্বোকে। শান্ত পরিবেশে ও যেন একান্ত করে পায় নিজেকে। ষ্টুডিওর প্রশান্ত গার্বো নিভৃতির কোমল পরশে চঞ্চল হ'য়ে ওঠে ঝর্ণার মত। আপন অন্তরের অনর্গল উচ্ছলতায় খুশিতে উপছে পড়ে। এই আত্মিক একান্ততা শিল্পীজীবনে একান্ত প্রয়োজন। তাই প্রতিদিন অপরাহ্ণে কাজের অবকাশে সমুদ্র-তীরে না এলে ওর চলে না। সমুদ্রের সফেন ইঙ্গিত মনে ওর দুর্নিবার আকর্ষণ আনে।

শান্টা মনিকার সমুদ্র তীর জনসঙ্কুল নয়। এক দিকে ছড়িয়ে পড়েছে নীল জলরাশি দিকচক্রবাল ছুঁয়ে, আর একদিকে পাহাড়ের কোলে ধূসর বিস্তীর্ণ বালুবেলা। রোজ সন্ধ্যায় গার্বো বসে গিয়ে সেখানে। কখনও চেয়ে থাকে দূর নীলিমায়, জাল বোনে এলোমেলো চিন্তার। কখনও বা শিশুর মত নাচে, গান গায়, খেলা করে ছুটোছুটী করে। এমন সব সান্ধ্য বিহারে বর্গ্ই ওর একমাত্র সাথী।

একদিন এমনি এক বিজন সন্ধ্যায় আপন মনে নাচছে; হঠাৎ চোখ তুলে দেখে কিছু দূরে ছোট্ট একদল লোক বিস্ময়ে ওর দিকে চেয়ে আছে। অপ্রতিভ হ'য়ে বালির ওপর ধপ্ ক'রে বসে পড়ে বর্গ্কে বলে,—'ছিঃ ওঁরা সব দেখে ফেললেন! ভাববেন আমি পাগল! আচ্ছা বর্গ্ ওঁরা কে?'

'ওঁরা তোমার স্তাবক। দেখছেন, ছবির গার্বোকে আসলে কেমন দেখতে। জাননা তোমার 'টেম্পট্রেস' যে হিট্ করেছে?

—'তাই নাকি!'

সত্যিই তাই। 'দি টেম্পট্রেস'-এর সাফল্য 'দি টোরেন্ট'কেও ছাপিয়ে যায়। দেশব্যাপী তুমুল আলোড়নের ঢেউ এসে লাগে ষ্টুডিওয়—স্তুতি আর অভিনন্দনের বন্যায়। সেদিনের অনামী গার্বো রাতারাতি আমেরিকার শ্রেষ্ঠ চিত্রতারকারূপে সমাদৃত হয়। মেট্রো কর্তৃপক্ষ স্থির করেন পরবর্তী ছবিতে গার্বোর নায়ক হিসাবে নেবেন সেরা অভিনেতা জন গিলবার্টকে। চুক্তি হয়, 'লাভ্' (এ্যানা কারেনিনা) ছবিখানিতে গার্বো আর গিলবার্ট অবতীর্ণ হবেন। সেদিনের সেই চিত্রচুক্তির আড়ালে হয়তোবা দুজনের মনের চুক্তিও সাক্ষরিত হয়েছিল, হয়েছিল অলক্ষ্যে কোন এক মহাশিল্পীর নির্দেশে।

গার্বোর জীবনে রণিত হয় প্রথম প্রেমের চরণধ্বনি...

গিলবার্ট আসে গার্বোর জীবনে অতনুর প্রথম পরশ নিয়ে, চাঁদ যেমন কুমুদের কাছে। জ্যোৎস্নার কোমল চুম্বনে কোরকের ঘুম ভাঙ্গে। মৃণালের তন্ত্রীতে শিহরণের উন্মাদ অনুভূতি! শতদল চোখ মেলে, দেখে কুমারী মাটির বুকে স্বপ্নের ছোঁয়াচ্। মাতাল বসন্তের উদ্দাম উচ্ছ্বাস নামে, নামে রূপ আর রসের উৎসারে, বর্ণ আর গন্ধের সম্ভারে। উত্তাল হ'য়ে ওঠে কামনার সুপ্ত সমুদ্র। চঞ্চল ঢেউয়ের বুকে পাড়ি দেয় নীড়কামী পাখী, উপান্তের রূপোলী মেঘের হাতছানিতে। ভেসে যায় দূর থেকে দূরান্তরে,—দূরে আরও দূরে। আকাশের প্রান্তে জ্বলে উজ্জ্বল ধ্রুবতারা, দিকহীন সাগরে নির্ভুল দিশারী।

অভিসারী গার্বো ছোটে গিলবার্টের দুরন্ত আকর্ষণে। তবু কিন্তু ওর ওপর ষ্টিলারের অভ্রান্ত দৃষ্টি। নেপথ্যে নিয়ন্ত্রণ করেন শিষ্যার জীবন। আপন হাতে গড়া শিল্পী তলিয়ে যাবে প্রেমের চোরাবালিতে! গার্বোর সৃষ্টি সম্ভাবনাকে কখনও তিনি অঙ্কুরে বিনাশ হোতে দিতে পারেন না······

'লাভ্'-এর স্যুটিংকে কেন্দ্র করেই গার্বো আর গিলবার্টের প্রেম নিবিড় হয়ে ওঠে। ছবিখানি সার্থকনামা—ওরা দু'জন বাঁধা পড়ে প্রণয়ের অচ্ছেদ্য বন্ধনে। প্রেমের অভিনয় করতে গিয়ে গার্বোর অন্তরে যে আবেগের

সঞ্চার হয় তা থেকেই ধীরে ধীরে বিকশিত হ'য়ে ওঠে সত্যকার প্রেম। গার্বো আর ছাড়তে পারেনা গিলবার্টকে, গিলবার্টও তাই। ষ্টুডিওর প্রেম পরিব্যাপ্ত হ'য়ে পড়ে দু'জনের জীবনে। ফ্লোরের দৃশ্যের পুনরভিনয় দেখা যায় প্রাত্যহিক অবকাশে। আর তা ক্রমেই ঘনিষ্টতর হ'য়ে ওঠে চিত্রনাট্যের প্রণয় অনুক্রমের অগ্রগতিতে।

এক একদিন ষ্টুডিওকে ওরা ওদেরই প্রাক্'কুঞ্জ ক'রে তোলে। স্যুটিং হচ্ছে, ক্যামেরা ঘুরছে আর তারই সামনে চলেছে ওদের অনুরাগপর্ব অবাধ সাচ্ছন্দে। তখনও নিবিড় অধরের নিপীড়ন। চুম্বনে বিরাম নেই, তনুর সান্নিধ্যের নেই শিথিলতা।

ষ্টুডিও মর্মরিত হয়ে ওঠে কলগুঞ্জনে। কর্মী মহলে সুরু হয় কানাকানি। আর কানাকানি ছড়িয়ে পড়ে জানাজানিতে। সাংবাদিক মহলে চাঞ্চল্য দেখা দেয় গার্বো-গিলবার্টের গোপন প্রেম নিয়ে। ছবি আর কাব্যে, স্কুপিং আর স্লাশিং-এ, ব্যানারে আর হেডলাইনে আমেরিকার পত্র-পত্রিকায় প্লাবন জাগে। অথচ যাদের নিয়ে এত, তাদের কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই একটুও।

গ্রেটা গার্বো ও জন গিলবার্ট

লেশমাত্র খেয়াল নেই গ্লোব-শুদ্ধ লোকের কৌতূহলী দৃষ্টি ওদেরই ওপর নিবদ্ধ। সে যেন অভিনয় নয়! অপূর্ব আবেগ ও প্রেমোচ্ছাসের বাস্তব পরিচয়, শৃঙ্খলহীন কামনার সহজ প্রকাশ, দেহসম্ভোগের জলন্ত অনুকৃতি! পরিচালক থেকে সুরু করে সবাই বিস্মিত হ'য়ে পড়েন ওদের অভিনয়ে। তবু কিন্তু তা অভিনয় নয় ওদের কাছে। পরিচালকের 'কাট্' নির্দেশ কানে ওদের পৌঁছয় না। ক্যামেরা থামলেও থামে না ওরা; শিথিল হয় না ওদের বাহু-বন্ধন। দেহের আলিঙ্গন তখনও অটুট,

মাঝে মাঝে যেন গার্বোর মোহমুক্তি ঘটে। গিলবার্টের আলিঙ্গনের বাইরে সহসা ওর মনে পড়ে ষ্টিলারকে। ভয় হয়, দ্বিধা আর কুণ্ঠা ওকে জড়িয়ে ধরে। আক্ষেপ করে—'বর্গ, মরিস্ একথা শুনলে কি মনে ক'রবেন? কি তিনি ভাববেন?'

কিন্তু কুণ্ঠার এ কণ্টক প্রেমের পথ রোধ ক'রতে পারেনা। চিত্রনাট্যে প্রেমদৃশ্য এগিয়ে এলেই গার্বোর সব ভীতি মুহূর্তে যেন মিলিয়ে যায়।......

গিলবার্ট আসার আগে পর্যন্ত হলিউড সমাজে গার্বোর

গতায়াত ছিলনা। কারও সঙ্গে ও মেশেনি, কারও সংস্রবেও আসেনি। অবশ্য সুযোগের অভাবে নয়, রুচির বৈপরীত্যে। হাটের হট্টগোল ওর ধাতে সয়না, বহুর ভীড়ে ও যেন হারিয়ে ফেলে নিজেকে। আত্মকেন্দ্রীক মন ওর তাই নিজেকে নিয়েই ছিল এতদিন। কিন্তু গিলবার্ট এসে ওর মনের গতি ছড়িয়ে দেয় বাইরে। তারই পাল্লায় মাঝে মাঝে গার্বোকে বেরোতে হয়, রাখতে হয় নিমন্ত্রণ অভিজাত মহলে। তখনও ও মিয়মাণই থাকে। গিলবার্টের একটি মনোরম প্রমোদ উদ্যান ছিল। অতি সুন্দর সেখানকার 'সুইমিং পুল'টি। অবারিত শ্যামলিমার মাঝে ছোট্ট স্বচ্ছ একটি হ্রদ। চারধারে বিচিত্র ফুলের কেয়ারী। তারই পাড় ঘেঁসে গার্বোর জন্যে গিলবার্ট একটি ঘর তৈরী ক'রে দেয় নতুন পরিকল্পনায়। যাতে সাঁতারের খেয়াল হোলে গার্বোর যেন কোন রকম অসুবিধা না হয়। যখন খুশি নিজের ইচ্ছেমত অবাধে সে পোষাক পরিবর্তন ক'রতে পারে।

গার্বোর গোপন প্রণয় জীবনের দিনগুলি রহস্যে অনুপম, বৈচিত্র্যে রঙীন। সেদিনের গার্বো সে যেন এক স্বতন্ত্র নারী! যার সঙ্গে মিল নেই আগের ও পরের গার্বোয়। পুষ্পশরে আহতা নারীর অত্যুগ্র কামনা উদ্বেলিত অঙ্গের লালসায়। রক্তের কণায় কণায় ছড়ানো স্পর্শের উষ্ণ স্পন্দন। চুম্বনে চুম্বনে স্নায়ুর উত্তেজনা।

গিলবার্টকে পেয়ে গার্বোর গাম্ভীর্যের আবরণ সহসা খসে পড়ে। এ যেন ওর জীবনের একটি উচ্ছল মুহূর্ত, লঘু চাপল্যের আবর্তনে লীলায়িত ক'রে তোলে স্থির নীরবকে। এরও প্রয়োজন আছে, আছে বিশেষ সৃষ্টির খাতিরে। স্রোতের জীবনে যেমন জোয়ার, মাটিরও তেমনি পলির প্রয়োজন। ক্ষণবৈচিত্র্যের আস্বাদ শিল্পীকে দেয় সৃষ্টির উর্বরতা। গার্বোর দিনগুলি ভ'রে ওঠে ফসলের সম্ভাবনায়। গিলবার্টকে নিয়ে ও পাড়ি দেয় মত্ত সমুদ্রে।

ষ্টিলার বোঝেন সব, জানেন সব, কিছুই তাঁর নজর এড়ায়না। মনে মনে উদ্বিগ্ন হ'য়ে ওঠেন শিষ্যার অমঙ্গল। গার্বোরও ভয় হয় পাছে এ আঘাত ওর গুরুকে ব্যথা দেয়। তাই ও গোপন ক'রে চলে ওর প্রতিটি চলাফেরা, প্রতিটি প্রাত্যহিক নৈশ অভিসার। মাঝে মাঝে অপারগ হোলে বর্গের সাহায্য চায়। বলে,—'বর্গ, তুমি একটা উপায় বাৎলে দাও। মরিসকে কি অজুহাত দেখাবো? আজ সন্ধ্যায় যে জ্যাকের (গিলবার্টের) কাছে যাবো ব'লে কথা দিয়েছি।'

'এ আর এমন কি! ষ্টিলারকে ব'ললেইতো পারো—'রিটেক্'-এর জন্যে আট্‌কে প'ড়েছিলে ষ্টুডিওতে,' বর্গ ওর সমস্যার সমাধান করে।

'মন্দ বলনি তুমি, কথাটা মন্দ নয়', গার্বো বলে, কিছু যেন ভাবতে ভাবতে সামনের দাঁতগুলিতে নখ দিয়ে টোকা দিতে দিতে। 'কিন্তু, যদি ধ'রে ফেলেন?'

—'কি ক'রে আর তিনি টের পাচ্ছেন?'

'ঠিক ব'লেছো,' গার্বো উচ্ছসিত হ'য়ে সোফায় ছড়িয়ে দেয় নিজেকে। 'যাই হোক না কেন কথা আমায় রাখতেই হবে, যেতেই হবে জ্যাকের কাছে।'

বর্গ ফোন ক'রে ষ্টিলারকে জানায়—গার্বো আজ আর তাঁর ওখানে যেতে পারবেনা। ষ্টুডিওর কাজে আট্‌কে প'ড়েছে। ষ্টিলার বোঝেন। একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস বিসিভারে ধাক্কা খেয়ে পৌছোয় আর এক প্রান্তে বর্গের কানে......

অভিমানের উপল নইলে মুখর হ'য়ে ওঠেনা প্রেমের প্রস্রবণ। ক্ষণিক বিরাগ না হোলে অনুরাগ ফিকে মনে হয়। মান অভিমানের অম্লমধুরতায় সরস হ'য়ে ওঠে গার্বো-গিলবার্টের প্রণয়।

একদিন রাত্রে বিরাট এক পার্টির আয়োজন ক'রেছে জ্যাক। গার্বো তখন অভিমানে আহতা। জ্যাকের শত অনুরোধেও গার্বো রাজী হয়না যোগ দিতে। কিছুতেই সে চায়না তার ঘর ছেড়ে নীচে নামতে। শেষটায় মরিয়া হ'য়ে ঘরে খিল এঁটে ব'সে থাকে চুপ ক'রে। বিফল হয় জ্যাকের মিনতি, ব্যর্থ হয় তার মানভঞ্জনের প্রচেষ্টা। বিরক্ত হ'য়ে জ্যাক দরজায় করাঘাত ক'রতে থাকে।

'লক্ষী ছেলেটির মত চলে যাও জ্যাক। আমার বড্ড ঘুম পেয়েছে!' ভেতর থেকে জবাব আসে।

তবুও দরজা ধাক্কানির বিরাম নেই, তবুও গার্বোর দ্বার উন্মুক্ত হয় না। রাগে অভিমানে আত্মহারা হ'য়ে পড়ে জ্যাক। পার্টির অতিথিরা প'ড়ে থাকেন, জ্যাক রাগে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যায়। ঝড়ের বেগে উন্মত্তের মত মোটর ছোটায় রাস্তা দিয়ে। যতই মনে হয় গার্বোর কথা ততই তার রাগ বাড়তে থাকে আর সেইসঙ্গে গাড়ীর স্পীডও। শেষটায় পুলিশের হাতে ধরা প'ড়ে হাজতে যেতে হয়। এই নিয়ে কাগজে কাগজে বেশ একটা আলোড়ন দেখা দেয়। জ্যাক অবশ্য অনেক হয়রান হ'য়ে জেল থেকে মুক্তি পায়।

এরপর মনে হয় ওদের প্রণয়ে বুঝি বা ভাঙন ধ'রলো। কারণ দিনকয়েক জ্যাকের আর পাত্তা নেই। যদিও বা দেখা হয়, কথা হয়না। শেষে একদিন লাঞ্চের সময় গার্বো অনুরোধ করে বর্গকে,—'বর্গ, তুমি একবার জ্যাকের সাজঘরে গিয়ে ওর সঙ্গে কথা ব'লে ছাখোনা, মেজাজখানা কি রকম।'

সেদিন প্রচণ্ড রাগ নিয়ে জ্যাক এসেছে ষ্টুডিওয়। বর্গকে দেখেই সে টের পায় তার আসার আসল কারণ। তাই চেঁচিয়ে ওঠে,—'যান, গিয়ে তাকে ব'লবেন আমার সমস্ত হয়রানির মূলে একমাত্র সে। আমি আর তার মুখ দর্শন করবোনা!'

হয়রানি অর্থে জ্যাক যে সেদিনের পার্টির ব্যাপারটার কথাই বলছে বর্গের তা' বুঝতে দেরী হয়না। হাজতে-পুলিশে জ্যাককে সেদিন কম দুর্ভোগ ভুগতে হয়নি! কথাগুলি ব'লতে বলতে রাগে গম্ গম্ ক'রতে ক'রতে জ্যাক তার সাজঘরে ঢোকে, বর্গও অনুসরণ ক'রতে ছাড়েনা। ভেতরে ঢুকে জ্যাককে সে বলে শান্ত সুরে,—'যদি কিছু মনে না করেন, দরজাটা বন্ধ ক'রে দিই। আপনার চ্যাচামেচিতে রাস্তায় ভীড় জমে গেছে! কেলেঙ্কারীটা ষ্টুডিওয় ফলাও ক'রে লাভ কি? আমি তো সবই জানি, গ্রেটাকে আপনি অযথা দোষী ক'রছেন'—

'থাক্ ও আলোচনায় আর দরকার নেই', গিলবার্ট খাঁঝিয়ে ওঠে, শৃঙ্খলিত শ্বাপদের মত ক্রোধে ছটফট্ করে। হঠাৎ সোফায় এলিয়ে প'ড়ে দু'হাতে মুখ ঢেকে অনুতাপ করে—'বর্গ, বর্গ, দোষ আমারই, আমারই অন্যায়, ঠিক ব'লেছেন!'

এমন সময় দরজায় টোকার শব্দ হয়। ক্রোধান্ধ ব্যাঘ্রের মত লাফিয়ে উঠে দরজা খোলে জ্যাক। দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে গার্বো—রহস্যময় হাসিতে ঠোঁট দু'টি প্রসারিত। জ্যাক স্তম্ভিত হ'য়ে দু'পা পেছিয়ে যায়। গার্বো ঘরে ঢোকে। বর্গ বেরিয়ে যায় সন্তর্পণে দরজাটি আলগোছে ভেজিয়ে। ভেতরে চুম্বন আর আলিঙ্গনের উচ্ছ্বাস......

তবু একদিন ঢেউবিলাসী পাখীর মনে নীড় রচনার স্বপ্ন যেন ফিকে হ'য়ে আসে। স্তিমিত হ'য়ে আসে আবেগের উন্মত্ততা। রূপোলী মেঘের মরীচিকায় বিভ্রান্তি আনে। সংশয় দেখা দেয়। নীড় যদি একদিন হ'য়ে ওঠে বন্ধন! যদি সঙ্কীর্ণ ক'রে আনে মুক্তপক্ষের অবাধ সাঞ্চরণ! অসীম অনন্ত মুক্তির পথেই তো সৃষ্টির আনাগোনা। পথহারা পাখীর আকুল সন্ধান ফেরে দূর নীলিমায়। তখনও রাত্রিশেষে জলে ধ্রুবতারা, জলে তারই জন্যে আপনাকে ক্ষয় ক'রে।

গার্বোর মনে পড়ে ষ্টিলারের কথা: 'বন্ধনের মধুমোহে ধ্বংস ক'রোনা নিজের সৃষ্টি সম্ভাবনাকে। জীবনের চেয়েও সৃষ্টি অনেক বড়।' তখনও ষ্টিলার রয়েছেন হলিউডে মেট্রোর অপমান সহ্য ক'রেও। প্যারামাউন্টে একটা কাজ নিয়েছেন। রয়েছেন শুধু গার্বোরই মুখ চেয়ে। অমন অনভিজ্ঞা মেয়েকে ধ্বংসের মুখে ফেলে কি ক'রে তিনি সুইডেনে ফেরেন! অথচ গার্বো তাঁর এ স্নেহের মর্ম বুঝলোনা। ষ্টিলারের জীবনে সবচেয়ে যা বড় আঘাত তা মেট্রোর তরফ থেকে আসেনি, এসেছে তাঁরই শিষ্যার কাছ থেকে। তবু তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত গার্বোর মঙ্গল কামনা ক'রেই গেছেন, বিদায় নিয়েছেন পৃথিবী থেকে গার্বোর চিন্তা নিয়েই।

গার্বোও অকৃতজ্ঞ নয় ক্ষণভুলের প্রায়শ্চিত্ত তার চলে জীবনভোর অনুতাপের মর্মদাহে সে আজ পীড়িতা। আজ যেন বেশী ক'রে ষ্টিলারের কথাগুলি ওর অন্তরে ধ্বনিত হ'য়ে ওঠে। বোঝে, শিল্পীর জীবনে প্রণয়ের প্রয়োজন থাকলেও পরিণয়ের স্থান নেই। পরিণয় সঙ্কুচিত ক'রে আনে স্রষ্টার জীবন সৃষ্টির উদার ক্ষেত্র থেকে। গার্হস্থ্য জীবন গার্বোর জন্যে নয়। তাই

ও হঠাৎ মুক্ত ক'রে আনে নিজেকে গিলবার্টের বন্ধন থেকে, ছিনিয়ে আনে নিজেকে প্রিয়তমের কাছ থেকে। হাজার ভালোবাসা সত্বেও প্রত্যাখ্যান করে তার বিবাহের প্রস্তাব……

'ফ্লেশ এ্যাণ্ড দি ডেভিল'-এর নির্মাণ তখন প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে। অন্তর কাঁদলেও বৃহত্তর সৃষ্টির খাতিরে গার্বো ওর কর্তব্য স্থির ক'রে ফেলে। স্থির করে, আপন হাতেই সমাধি রচনা ক'রবে ওর প্রথম ও শেষ প্রেমের। দীর্ঘচ্ছেদ পড়ে গার্বো-গিলবার্টের মধুর অধ্যায়ে। গিলবার্টকে এড়িয়ে চলতে সুরু করে গার্বো। আর ও যায় না তার প্রমোদ কাননে গোপন অভিসারে।

জ্যাক নিরাশ হ'য়ে পড়ে। অনেক অনুনয় করে গার্বোকে তাদের পুরনো প্রেমকে আবার নতুন ক'রে নিতে। গার্বো তবু অচঞ্চল। ও জানে—বাঁধন ছেঁড়বার আজ সময় এসেছে।

এমন সময় জ্যাকের পরিচয় হয় ইনা ক্লারার সঙ্গে। আর হঠাৎ একদিন আকাশ থেকেই যেন তাদের বিয়ের সংবাদটা ছড়িয়ে পড়ে। গার্বো তখন ছিল 'লোকেশান'-এ। জীবন যুদ্ধের প্রকৃত নায়িকার মতই এ সংবাদ ও গ্রহণ করে নিশ্চল দৃঢ়তায়। ষ্টুডিওয় ফিরে মনের কথা জানায়—'চমৎকার হোয়েছে! ওরা সুখী হোক!' তারপর একটা চাপা দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে আবেগ কেঁপে ওঠে—'চাওয়ার ওপরেই তো আর পাওয়া নির্ভর করেনা,—আজীবন গার্বো থাকবে নিঃসঙ্গ'……

শুধু নিঃসঙ্গই নয়, আজীবন গার্বো কাটিয়েছে নির্জনে। এই নির্জনপ্রিয়তা ওর প্রধান বৈশিষ্ট্য। এর জন্যে আপতঃ দৃষ্টিতে ওকে রহস্যময়ী ব'লে মনে হয়। কিন্তু আসলে তা নয়। ওর নিরহঙ্কার অনাড়ম্বর জীবনে অন্তঃসারশূন্য কোন প্রগল্‌ভতারই স্থান নেই। তাই ও বাইরে আভরণহীন, অন্তরে ঐশ্বর্যময়ী। সমাজের মাপকাঠিতে তাই ও অসামাজিক। মানুষকে ও এড়িয়ে চলে মানুষেরই স্বার্থে। ওর মতে—সৃষ্টির সঙ্গে স্রষ্টার বাইরের কোন যোগ থাকেনা, থাকে অন্তরের। স্রষ্টাকে দেখে সৃষ্টি-বিচার ত্রুটিশূন্য হয় না। শিল্পীর সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় শিল্প থেকে রস গ্রহণের অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়ায়। গার্বো তাই থাকে জনতার আড়ালে।

প্রচার ওর কাছে বদ রুচির পরিচায়ক। প্রচারে ওর সবচেয়ে বেশী ঘৃণা। অথচ হলিউডে সেই প্রচারমহলের নাছোড়বান্দাদের নিয়েই ওকে সব চেয়ে ভুগতে হয় বেশী। প্রচার-বাতিক-গ্রস্ত আমেরিকায় খ্যাতিই গার্বোর বিড়ম্বনা হ'য়ে দাঁড়ায়। হলিউডের শ্রেষ্ঠ চিত্র-তারকার দ্বারে চব্বিশ ঘণ্টাই ব্যূহ রচনা ক'রে রেখেছে পত্র-পত্রিকার প্রতিনিধিরা। সৌজন্যপূর্ণ নির্মম প্রত্যাখ্যান যখন অচল হ'য়ে পড়ে তখন মাঝে মাঝে অনিচ্ছাসত্বেও গার্বোকে রাজী হোতে হয়। কিন্তু অনেক সময় তাদের দাবী এতই হাস্যকর হ'য়ে ওঠে যে, তা' গার্বোর মত মেয়ের পক্ষে রক্ষা করা সম্ভব হ'য়ে ওঠেনা।

একদিন এক স্পোর্টস্ ক্লাব থেকে অনুরোধ আসে তাদের দু'জন এ্যাথলেটের সঙ্গে গার্বোকে দাঁড়াতে হবে ছবি তোলার জন্যে। লোক দু'টির পালোয়ানী বপু দেখে ভেতরে রাগ থাকলেও মুখে প্রত্যাখ্যান করার সাহসে কুলোয় না গার্বোর। তবে রাগ ওর চরমে পৌঁছোয় যখন ওরা আব্দার করে রানিং শর্ট প'রে দৌড়ের ষ্টার্ট নেওয়ার ভঙ্গীতে গার্বোকে উবু হোতে হবে। শুনে গার্বো গর্জে ওঠে—'আশা করি আমার কথা আমি রেখেছি এবং আপনারাও খুশি হ'য়েছেন। কিন্তু এর বেশী আমার দ্বারা সম্ভব নয়।'

'দি টোরেন্ট' ছবিখানির উদ্বোধন দিনের কথা গার্বোর আজও মনে আছে। ষ্টুডিও কর্তৃপক্ষ অনুরোধ জানান 'লোস্ ষ্টেট' থিয়েটারে গার্বোকে সেদিন উপস্থিত থাকতে হবে ব'লে। প্রথমটা বেঁকে বসলেও শেষে ও কোন রকমে রাজী হয়। তবে আর সকলের মত মঞ্চে অবতীর্ণ হয়ে দর্শকদের দেখা দেয়না। বক্সে নিজের আসনে ব'সেই কোন রকমে তাঁদের অভিনন্দন জানায়। তারপর লজ্জায় রাগে যত তাড়াতাড়ি পারে প্রেক্ষাগার ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে। যেতে যেতে পথে বর্গ্‌কে বলে,—'আমেরিকানরা কি বোকা বলতো! এতে ওদের কি লাভ হয়? পর্দার সজীব গার্বোর উচ্ছ্বাস ফেলে এই কাঠের মত আড়ষ্ট গার্বোকে ব'সে থাকতে দেখে কি ওরা আনন্দ পায়?'

১৯২৭ সালে সুইডেনের ক্রাউন প্রিন্স ও প্রিন্সেস যখন হলিউডে এসেছিলেন তখন তাঁদের সম্মানে এক সাড়ম্বর ভোজ সভার আয়োজন হয়। সেখানে গার্বোর উপস্থিতির এক বিশেষ আমন্ত্রণ আসে। গার্বো তখন ছিল 'দি টেম্পট্রেস' এর 'লোকেশান সুটিং'এ। পত্রবাহক সেখানে গিয়ে হাজির! সুটিং স্থগিত রেখে পরিচালক নিব্লো ও বর্গ্‌কে নিয়ে গার্বো রওনা হয়। পৌছোতে কিছু বিলম্ব হয়, ভোজ তখন সুরু হ'য়ে গেছে। ক্রাউন প্রিন্সের বাঁ দিকে গার্বোর জন্যে রক্ষিত আসনটি শূন্য। গার্বো উপস্থিত হোতেই সমবেত অতিথিরা সম্বর্দ্ধনা করেন। প্রিন্স নিজে ওকে অভ্যর্থনা জানান। সুইডেনের ভাবি রাজার পাশে ব'সে আহারের গৌরব যে কোন নারীর কাছে কাম্য হোলেও গার্বোর যেন এতে মন ভরে না। ভোজ-শেষে 'লোকেশানে' এ ফেরার পথে গার্বো বলে,—'আমি কি বোকা! ভাবতে পার বর্গ্? আমি কিনা প্রিন্সকে সিগারেট নিবেদন করতে গিয়েছিলাম! সুইডেনের মেয়ের পক্ষে এত বড় লজ্জা বুঝি আর নেই! কে না জানে প্রিন্স মদ, সিগারেট এসব খাননা? এইজন্যেই তো আমি সামাজিক অনুষ্ঠান পছন্দ করিনা। কখন যে একটা মারাত্মক ত্রুটী ক'রে বসবো কোনই খেয়াল থাকে না। আদব-কায়দার আড়ষ্টতা আমার পোষায় না!'

বর্গ্ ওকে উৎসাহ দিয়ে বলে,—'ভয় নেই, দেশে ফিরে একদিন রাজদরবারে তোমার ডাক পড়বেই।...'

গরীব গ্রাম্য মেয়ে গার্বোর কাছে সহরের চেয়ে গ্রামের আকর্ষণই বেশী। সহরের ইটকাঠে ঘেরা অনড় পরিবেশ মনে ওর কোন অনুভূতিই জাগায় না। বিস্তীর্ণ বনানীর নরম সবুজে, পাইন পপ্‌লারের স্নিগ্ধ ছায়াবীথিকায় ফেলে-আসা দিনগুলোর স্মৃতি যেন জমে থাকে। তাই পরে যখন সান ভিনসেন্ট বুলেভার্ডে থাকতো তখনও রোজই ও ছুটতো শান্টা মনিকা ক্যানিয়নে। ঝড় নেই, জল নেই, গার্বো চলেছে দীর্ঘ বিজন পথ ধরে অরণ্যের আমন্ত্রণে। অঙ্গে নেই পোষাকের বিলাসিতা, মুখে নেই প্রসাধণের প্রলেপ—শতছিন্ন কোট আর রুজ-পাউডারবিহীন গার্বো চলেছে দীন দরিদ্র মেয়ের মত। রোজই ও যায় এমনি ভাবে। একদিন ওকে দেখে ভারী করুণা হয় ওখানকার একটি গ্রাম্য স্ত্রীলোকের। সে এই দুঃস্থা মেয়েটীকে দেখে দয়াপরবশ হয়ে বলে,—'আহা মা, তোমার ভারী কষ্ট, না? এমন ছেঁড়া পোষাক কি প'রতে আছে! আমার একটা ভালো কোট আছে, একেবারে নতুন, এক ধোপ শুধু পরেছি। সেটা তুমি কি নেবে মা?'

নিরুত্তরে গার্বো শুধু তাকে একবার জড়িয়ে ধরে—যেন সে কত আপনার। এতবড় দান জীবনে ভোলবার নয়! আজও এই স্মৃতিটি ওর মনে নতুন হয়ে আছে।

স্ত্রীলোকটির কিন্তু তবু সয়না। পরদিন সে আবার গার্বোকে ধরে, এবার একেবারে কোটটি নিয়ে এসে হাজির। বলে,—'এই নাও মা গায়ে দাও, ভারী সুন্দর তোমায় মানাবে। নেবে না?'

'ধন্যবাদ। আপনার একথা আমি জীবনে ভুলবো না।

তবে এ আমার দরকার নেই। ছেঁড়া পোষাকই আমার ভালো লাগে, ওতে নিজেকে যেন সহজ মনে হয়।'

স্ত্রীলোকটি বিস্মিত হয় ওর কথায়, আর সে বিস্ময় তার একদিন আকাশ ছোঁয় যেদিন বছরখানেক পরে সে জানতে পারে যে, যে মেয়েটিকে সে কোট দিতে গিয়েছিল সে আর কেউ নয় স্বয়ং গ্রেটা গার্বো—পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চিত্রাভিনেত্রী ····

একটার পর একটা ছবির সাফল্যে গার্বোর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে বিশ্বে। দূরদূরান্তর থেকে চিত্রামোদীরা তাকে জানায় অন্তরের অভিনন্দন। কোটী কোটী স্তাবকের পত্র আর উপহারে উপ্‌চে পড়ে তার ডাকবাক্স। সারা দিনরাত অগণিত নরনারী গার্বোর আবাসে ধর্ণা দেয়। দাঁড়িয়ে থাকে তাদের কল্পনার মানস প্রতিমার ক্ষণিক দর্শনের আশায়। কতই না ছলচাতুরি করে একটিবার শুধু তাদের প্রিয় তারকাকে কাছে থেকে দেখবার লোভে। আর স্তাবকদের এই প্রচণ্ড বেগের ধাক্কা সামলাতে হয় বেচারী বর্গ্‌কে। দর্শকদের গার্বো-প্রীতির অজস্র নমুনা আছে, তার মধ্যে একটি মজার ঘটনার কথা এখানে লিপিবদ্ধ করছি।

একদিন সন্ধ্যায় মিরামার হোটেলে একটি তরুণী এসে বর্গ্‌কে অনুরোধ করে গার্বোর সঙ্গে তাকে একবার দেখা করিয়ে দেবার জন্যে। কি ক'রে বা সে টের পেয়েছিল বর্গই গার্বোর একমাত্র গোপন সঙ্গী। তরুণীর বাড়ী মিলবকিতে, বাড়ী থেকে সে পালিয়ে এসেছে, এসেছে দুরন্ত বাসনা নিয়ে একবার অন্ততঃ সে তার আরাধ্যা অভিনেত্রীকে দেখবে। তার অভিপ্রায় শুনে বর্গ্‌ যখন জানায় যে গার্বোর সঙ্গে দেখা করা সম্ভব নয় মেয়েটি তখন প্রায় উন্মাদ হ'য়ে পড়ে। অটল প্রতিজ্ঞা নিয়ে নিশ্চল হ'য়ে দাঁড়িয়ে থেকে হোটেলের প্রবেশ পথে, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত। সন্ধ্যায় গার্বো যখন ষ্টুডিও থেকে ফেরে মেয়েটি তখন পাগলের মত ওর চলন্ত মোটরের সামনে আছড়ে পড়ে। চাপা পড়তে পড়তে বেঁচে যায় একটুর জন্যে। তক্ষুণি সংবাদ দেওয়া হয় ডিষ্ট্রিক্ট এ্যাটর্ণীকে। অনেক সন্ধান ক'রে মেয়েটিকে তিনি বাড়ী পৌঁছে দেন। তার বাবা, বৃদ্ধ দাঁতের ডাক্তার, মেয়ের নিরুদ্দেশে কাতর হ'য়ে চারদিকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন।

এখানেই এ কাহিনীর পরিসমাপ্তি নয়। বছরখানেক পরে মেয়েটি আবার এসে উপস্থিত হয়। এর মধ্যে সে বেশ সুন্দরী যুবতী হ'য়ে উঠেছে। গার্বো তখন থাকতো সানভিন্‌সেণ্ট্‌ মুলে ভার্ডে। মেয়েটি এবার সটান সেখানে গিয়ে দরজা-ঘন্টির হাতল নাড়ে। গার্বোর পরিচারিকা দোর খোলে। খোলার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি তাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে হন্‌ হন্‌ করে অন্দরে ঢোকে। গার্বো তাকে দেখে বিস্মিত হ'য়ে প্রশ্ন করে,—'কি তুমি চাও?'

'আমি?' জবাব দেয় মেয়েটি—'আমি এসেছি আপনার সঙ্গে একটু কথা ব'লতে, শুধু আপনাকে একটু দেখতে।'

গার্বো মহা ফাঁপরে পড়ে। তাড়াতেও পারে না, অথচ
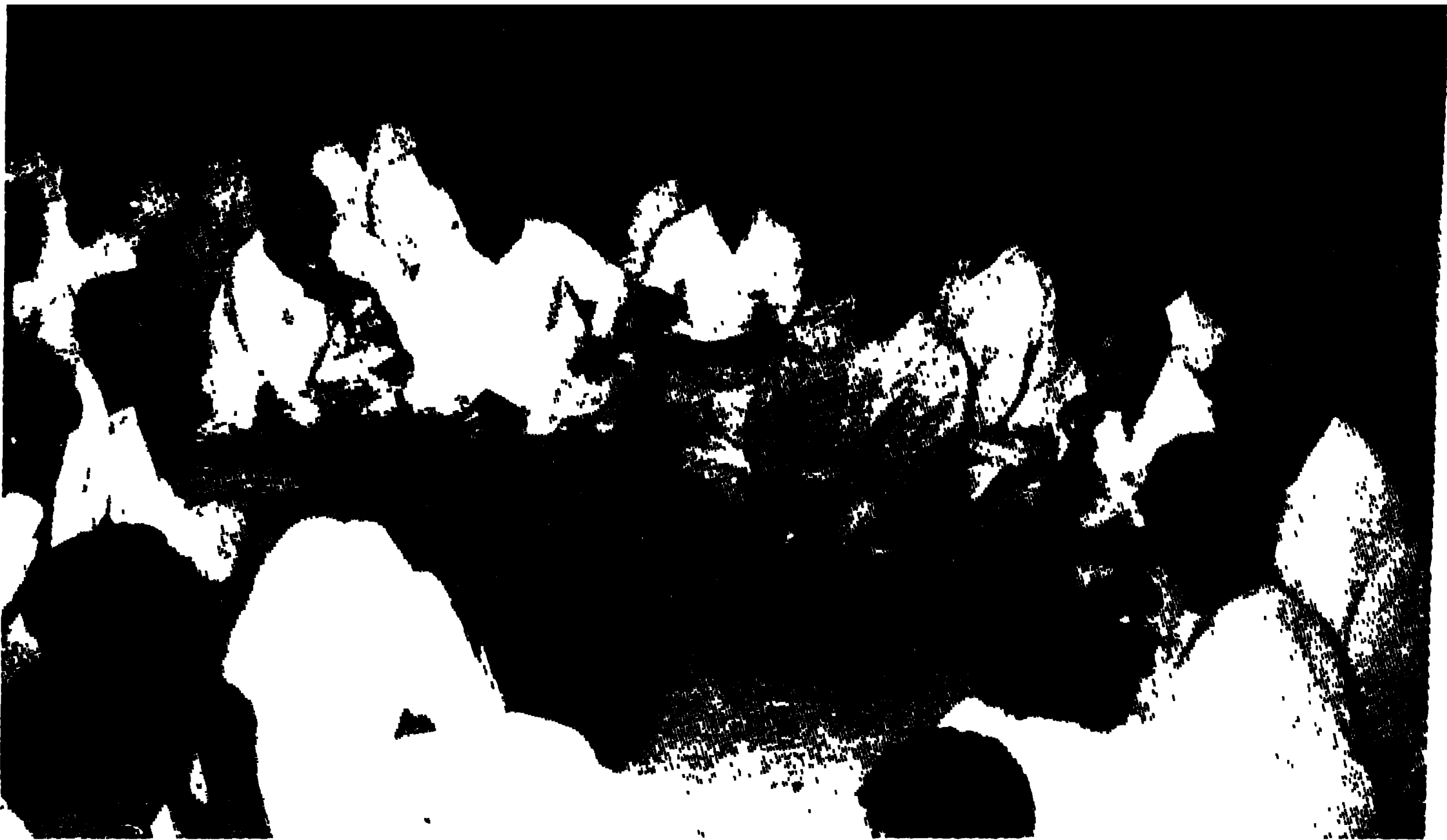
(শেষাংশ ৬১ পৃষ্ঠায়)

..বা উপস্থিত ছিলেন : মুরলীধর চট্টোপাধ্যায়, সুধীর সান্যাল, মণ্ডকেন্দ্র ভঞ্জ, নির্ম্মলকুমার ঘোষ, ফণীন্দ্র পাল, কালীশ মুখোপাধ্যায়, প্রদ্যোত মিত্র, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, পঙ্কজ দত্ত, সন্তোষকুমার চট্টোপাধ্যায়, নিকুঞ্জ পত্রী, বিমল বসু, শৈলেন রায়, সলীল সেনগুপ্ত, সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায়, নলিন ব্যানার্জ্জী, হেমন্ত ব্যাণার্জ্জী, জিতেন বসু, সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়, নীরোদ রায়, মনোমোহন ঘোষ, মনোজিৎ বসু, শশী রায়, কল্যাণ গুপ্ত, বিজন দত্ত, ভবানী রায়, প্রবীর দাশগুপ্ত, শচীন সিংহ, শম্ভুদাস চট্টোপাধ্যায়, বীরেন সিংহ, গোপাল ভৌমিক, বিদ্যুৎ মিত্র, শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায়, ফণী মজুমদার ও 'চিত্রবাণী'-সম্পাদক

বাংলা চিত্র জগতের জনপ্রিয়া অভিনেত্রী মলিনা দেবী

সুরসাধক কৃষ্ণচন্দ্র

অনিলকুমার দে

শিল্পীর জীবন সুন্দরকে কেন্দ্র ক'রেই। জীবন চলমান, এগিয়ে চলে বৃত্তাকারে নতুনকে আলিঙ্গন ক'রে নিজের পরিধির মাঝে। পরিধি ছড়িয়ে পড়ে দূর থেকে দূরান্তরে। সেই পরিব্যাপ্তির মাঝে সময় ও সমাজের বিবর্ত্তনে সত্যম্ শিবম্ ও সুন্দরম্‌ই যে শুধু ধরা দেবে এমন আশ্বাস নেই শিল্পীর। তবে কি শিল্পীর জীবনকে আনতে হবে সঙ্কুচিত ক'রে? শিল্পীর সার্থকতা রয়েছে জীবনের সেই কেন্দ্রে,—যেখানে রয়েছে তার সাধনার বীজ, যেখান থেকেই যোগান আসে সকল অসুন্দরকে জয় করার অমিত শক্তি, এগিয়ে চলার অফুরন্ত অনুপ্রেরণা। সুরসাধক কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গীত সাধনার ইতিহাস সেই অমিত শক্তির ইতিহাস, সেই অফুরন্ত অনুপ্রেরণার ইতিহাস।

সুরসাধক কৃষ্ণচন্দ্রের জন্ম হয় ১৩০১ সালে ক'লকাতায় সিমলা পাড়ার ৯ নম্বর মদন ঘোষ লেনে, ভাদ্রমাসের জন্মাষ্টমীর দিন। জন্মাষ্টমীর দিন জন্মেছিলেন ব'লেই বোধ হয় বাবা ছেলের নাম রেখেছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র। তাঁর পিতার নাম ৺শিবচন্দ্র দে। ছেলের যখন দেড় বছর বয়েস তখন শিববাবু মারা যান। শিশু বয়সেই কৃষ্ণচন্দ্র হন পিতৃহারা। যাই হোক্ যথা সময়ে বালক কৃষ্ণচন্দ্র বই খাতা বগলে করে কেশব এ্যাকাডেমীতে গিয়ে ভর্ত্তি হোলেন। শুরু হোল বিদ্যাভ্যাস। কিন্তু কেশব এ্যাকাডেমীতে বেশী দিন পড়া হোল না, কৃষ্ণচন্দ্র ভর্ত্তি হলেন গিয়ে বৌবাজার হাই স্কুলে। তাঁর যখন বছর সাড়ে বারো বয়স তখন থেকেই তাঁর চোখের দৃষ্টি কমে আসতে লাগলো। ক্লাসে বসে ব্ল্যাকবোর্ডের লেখা পড়তে পারেন না। তবুও তিনি বুঝতে পারেন না যে, তাঁর দৃষ্টিশক্তি ক্রমশঃ নিভে যাচ্ছে। একদিন স্কুলের মাষ্টার মশাই তাঁকে ডেকে বললেন —'কেষ্ট, বাড়িতে ব'লো যেন ডাক্তারকে দিয়ে তোমার চোখ দেখানো হয়, বোধ হয় তোমার চোখের অসুখ হয়েছে।' বগলা হাসপাতালের ডাঃ সাণ্ডার্স-এর কাছে নিয়ে যাওয়া হোল বালক কৃষ্ণচন্দ্রকে। তিনি দেখে ওষুধ দিলেন। কিন্তু কোন ফল হোল না। চোখের দৃষ্টি আরো কমে গেল। ভাল করে আর কিছুই দেখতে পান না। দিনের আলো থাকতে থাকতেই বালকের মনে হোত—সন্ধ্যে হয়ে গেছে। এইসঙ্গে দেখা দিল আর এক উপসর্গ অসহ্য মাথার যন্ত্রণা। মাথার যন্ত্রণায় কৃষ্ণচন্দ্র অস্থির—না পারেন খেতে, না পারেন ঘুমুতে, না পারেন দু'দণ্ড একটু সুস্থির হোয়ে বসতে তেরো বছর বয়সে চোখের দৃষ্টি একেবারে নষ্ট হয়ে গেল। কিন্তু মাথার যন্ত্রণা তবু বন্ধ হ'লনা। ওষুধ দিয়েও কোন ফল হোলনা। একদিন মাথার যন্ত্রণায় অধীর হোয়ে বাড়ীর রোয়াকে বসে কৃষ্ণচন্দ্র কাঁদছিলেন। একটি লোক সেখান দিয়ে যেতে যেতে তাঁর কান্না শুনে থমকে দাঁড়ালেন। জিজ্ঞেস করলেন—'খোকা তুমি কাঁদছো কেন?' কৃষ্ণচন্দ্র তখন সব খুলে বললেন। সব শুনে সেই লোকটি তখন সমান দু'ভাগ মাখন আর চন্দন নিয়ে মিশিয়ে তাঁর কপালে প্রলেপ লাগাতে বললেন। এতে ফল পাওয়া গেল অদ্ভুত রকমের—মাথার সমস্ত যন্ত্রণা খুব তাড়াতাড়ি কমে গেল। কিন্তু চোখ আর ভাল হোল না।

চোখ নষ্ট হোয়ে যাওয়াতে লেখাপড়া বন্ধ হয়ে গেল। তখন আর কি করেন, চুপচাপ বাড়িতে বসে থাকেন আর ভাবেন আকাশ-পাতাল কত কি। এই রকম করে কয়েক বছর কেটে গেল। যখন তাঁর আঠার বছর বয়স তখন তিনি ঠিক করলেন, গান শিখবেন। এর আগে কোন দিন তিনি গান-বাজনার চর্চ্চা করেন নি। তবে ছোট বেলায় কোন জায়গায় গান শুনলে তা গাইবার চেষ্টা করতেন। পাড়ায় যেসব ভিখিরী এসে গান গেয়ে ভিক্ষা করতো—তাদের সেইসব গানও তিনি আপন মনে

গুন্ গুন্ করে গাইতেন। বাড়িতে অবশ্য গান-বাজনার কোনরকম পাটই ছিলনা। কাজেই গান শিখতে হোলে ভাল শিক্ষকের দরকার। কেষ্টবাবু অনেক চেষ্টা করলেন কিন্তু একজন ভাল শিক্ষক জোগাড় করতে পারলেন না। এই সময় অমৃতলাল ঘোষ (বংশীবাদক) মহাশয়ের চেষ্টায় তিনি একজন উপযুক্ত শিক্ষকের সন্ধান পেলেন। অমৃতবাবু সেই সময়ের বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ শশিভূষণ দে মহাশয়ের কাছে কেষ্টবাবুকে নিয়ে গেলেন। তিনি কেষ্টবাবুকে গান শেখাতে রাজী হোলেন। সুরু হোল শিল্পীর সাধনা। চোখের সামনে থেকে বাইরের আলো নিভে গেল বটে, কিন্তু ভেতরে জ্বলে উঠলো সাধনার আলো। সেই আলোয় শিল্পী সন্ধান পেলেন স্বপ্নময় সুর-লোকের। প্রায় পাঁচ বছর তিনি শশীবাবুর কাছে খেয়াল গান শেখেন। পাঁচ বছর শেখাবার পর শশীবাবু অন্যত্র চলে যান। কাজেই, তাঁর কাছে আর কেষ্টবাবুর গান শেখা হোল না। কিন্তু তা বলে তো শিল্পীর সাধনা থামতে পারে না। তাঁর সামনে তখন স্বপ্নময় সুর লোকের স্বর্ণময় দ্বার খুলে গেছে। সেখানকার অপরূপ রাগরাগিনী করছে তাঁকে আহ্বান। শিল্পী অন্তরে অন্তরে অনুভব করছেন তা'। ব্যাকুল হোয়ে ওঠেন তিনি। তাঁর অন্তরের এই ব্যাকুলতা, ঐকান্তিক কামনা তো ব্যর্থ হোতে পারে না··· তাই সুর-লোকের যাত্রাপথে তরুণ শিল্পীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হোল বহু কৃতী শিল্পীর, যাঁরা তাঁকে সুরের মায়ালোকে পৌঁছোতে সাহায্য করলেন।

শশীবাবু চলে যাওয়ার পর কেষ্টবাবু সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছে তিন বছর টপ্পা গান শেখেন। তারপর আহম্মদ খাঁর কাছে খেয়াল, শনি মহারাজের কাছে ঠুংরী, করমতুল্লা খাঁর কাছে খেয়াল, বাদলখাঁ এবং অন্যান্য কৃতী-শিল্পীর কাছে আরও অনেক গান শেখেন। সবশেষে মহম্মদ দবীর খাঁর কাছ থেকে রাগালাপ, খেয়াল, ধ্রুপদ গান শেখেন। বিখ্যাত গায়ক লছমীপ্রসাদের কাছে গান শেখবার ইচ্ছাও ছিল তাঁর, কিন্তু নানা কারণে তা আর সম্ভব হোয়ে ওঠেনি।

বর্তমানেও তিনি কোন যায়গায় ভাল জিনিষের সন্ধান পেলেই তা সংগ্রহ করেন।

কেষ্টবাবু খুব অল্প বয়সেই পেশাদার গায়ক হোয়েছিলেন। তাঁর অল্প বয়সে পেশাদার হওয়ার অবশ্য একটা কারণ ছিল। যখন তাঁর একুশ বছর বয়স তখন তাঁর তৎকালীন শিক্ষাগুরু শশীবাবু দেখলেন যে, শিষ্য মাঝে মাঝে অনুপস্থিত হচ্ছেন। প্রথম দিকে তিনি কিছু বললেন না। কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্র যখন ঘনঘন অনুপস্থিত হতে লাগলেন তখন শিষ্যকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। শিষ্য জবাব দিলেন—কি করবো, আমাকে ওরা ধরে আসরে গান গাওয়াতে নিয়ে যায়। গুরু তাঁকে কোন জায়গায় যেতে নিষেধ করে দিলেন। কিন্তু তার কয়েক দিন পরে গুরু লক্ষ্য করলেন শিষ্য তবু অনুপস্থিত। পরে যখন শিষ্য এলেন তখন গুরু জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলেন—শিষ্যের অনুপস্থিতির কারণ সেই একই। গুরু দেখলেন যে, শিষ্য যদি এই রকম করে তবে তার সাধনায় ব্যাঘাত ঘটবে। তাই তিনি কৃষ্ণচন্দ্রকে বললেন—"এবার যদি তোমায় কেউ গান গাইবার জন্যে কোন জায়গায় নিয়ে যেতে চায়, তাহলে পারিশ্রমিক চাইবে।' এই ঘটনার কিছুদিন পরে কেষ্টবাবু এক ঘরোয়া আসরে পেশাদার হিসেবে প্রথম গান গাইলেন। এই ব্যাপারেই বোঝা যায় যে, তরুণ বয়সেই তিনি বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন। এবং এই জনসমাদর লাভই তাঁর পেশাদার আসরে আসার কারণ।

একুশ বছর বয়সে পেশাদার গায়ক হোলেও কেষ্টবাবু গান রেকর্ড করেছিলেন তার তিন বছর আগে। অর্থাৎ তাঁর গান শেখবার প্রথম বছরে। তখন এইচ এম ভি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি ছিলেন ভগবতী ভট্টাচার্য্য। কেষ্টবাবুর অপূর্ব্ব কণ্ঠস্বর শুনে ভগবতীবাবু তাঁকে গান রেকর্ড করবার জন্য হিজ মাষ্টার ভয়েস রেকর্ড কোম্পানীতে নিয়ে যান। তখন থেকে আজ অবধি তিনি এই কোম্পানীতে নিয়মিত গান রেকর্ড করে আসছেন। প্রথম যে গানটি কেষ্টবাবু রেকর্ড করেন তার বাণী হলো—'আর চলে না চলে না মাগো'—দ্বিতীয় গান রেকর্ড করেন তার পরের
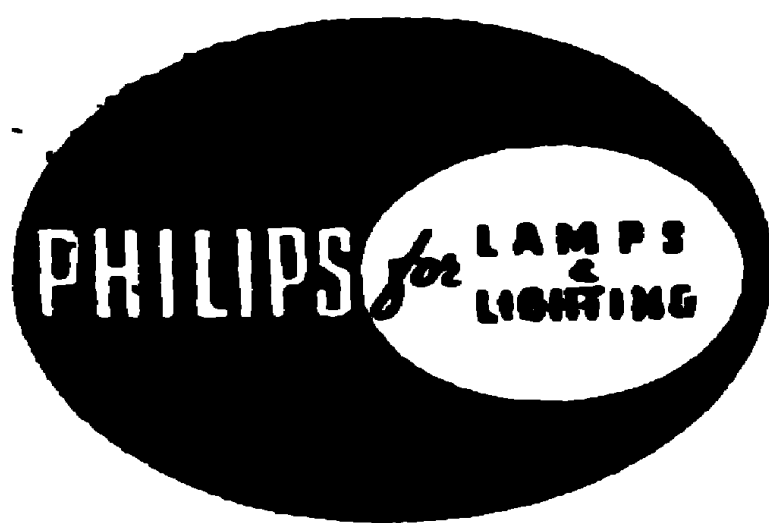
বছরে। তখন কেষ্টবাবুর বয়স উনিশ বছর। সেই গানটির কথা হলো—দীন তারিণী তারা। এই গানখানি রচনা করেন শিল্পী নিজেই। গানটি খুবই জনপ্রিয় হোয়ে ওঠে। তার ফলে রেকর্ডখানি খুব বিক্রী হয়। কিন্তু অর্থের দিক দিয়ে কেষ্টবাবু লাভবান হন নি মোটেই যেমন হয়েছিল কোম্পানী। কারণ, তখনকার দিনে অর্থাৎ রেকর্ডিং-এর প্রথম যুগে কোম্পানী শিল্পীদের যা পারিশ্রমিক দিতেন তা নামমাত্র বললেই হয়। কেষ্টবাবু প্রথমবার ছ'খানি গান রেকর্ড করে পারিশ্রমিক পান মাত্র পঞ্চাশ টাকা। দ্বিতীয়বারে ছ'খানি গান রেকর্ড করে পান একশো টাকা। এখনকার শিল্পীরা পারিশ্রমিকের এই হার দেখে হয়তো চমকে উঠবেন। তাও কেষ্টবাবু একজন উঁচু দরের শিল্পী এবং তাঁর রেকর্ডের খুব কাটতি হয় বলেই কোম্পানী এই টাকা দিয়েছিলেন। অন্যান্য শিল্পীদের আরো কম দিতেন। অবশ্য তারপর পারিশ্রমিকের হার কিছু কিছু করে বাড়তে থাকে। ১৯২৯-৩০ সালে কেষ্টবাবু গান পিছু আশি টাকা ক'রে পেতেন। এই সময়েই তিনি কোম্পানীর কাছে রেকড বিক্রীর ওপর রয়ালটি দাবী করেন। এর আগে রয়ালটি কোন শিল্পীকেই দেওয়া হোত না। কোম্পানী কিন্তু রয়ালটি দিতে রাজী হোলেন না। তাঁরা চাইলেন ষোল আনা লাভ। রয়ালটি না দেওয়ার দরুন কেষ্টবাবু রেকর্ডে গান দেওয়া বন্ধ করে দিলেন। তার ফলে হয়তো কোম্পানীর লাভের হার কমে গিয়েছিল। কারণ, দু'বছর পরে তাঁরা ইংলণ্ড থেকে রেকর্ড বিক্রীর ওপর শতকরা পাঁচ টাকা রয়ালটি অনুমোদন করিয়ে আনালেন। তখন আবার কেষ্টবাবু রেকর্ডে গান দিতে শুরু করলেন। ১৯৩১ সালে প্রথম যে রেকর্ডটির ওপর রয়ালটি পান তার একপিঠে ছিল 'ফিরে চল, ফিরে চল আপন ঘরে' গানটি। পরবর্তী রেকর্ড হোল 'ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা বধু' গানটি। এই রেকর্ডটি কেষ্টবাবুর অতি-বিক্রীত রেকর্ডগুলির মধ্যে একটি। তাঁর যে গানটির রেকর্ড সবচেয়ে বেশী বিক্রী হোয়েছে সেটি হচ্ছে 'পুরাণ ভকত' কথাচিত্রের 'যাও যাও মেরে সাধু' গানটি। তার পরেই হচ্ছে 'ধূপছাঁও' কথাচিত্রের 'বাবা মন কে আঁখে খোল্' গানটি। কেষ্টবাবু প্রথম যে গজল গানটি রেকর্ড করেন তার কথা হচ্ছে—'যব তব্ আঁখে ওয়ারহে তেরা হি মু দেখা কুরু'। বর্ত্তমানে তিনি রেকর্ডের ওপর শতকরা সাড়ে সাত টাকা রয়েলটি পেয়ে থাকেন। বাংলা দেশে তিনিই প্রথম রয়ালটির প্রবর্ত্তন করান।
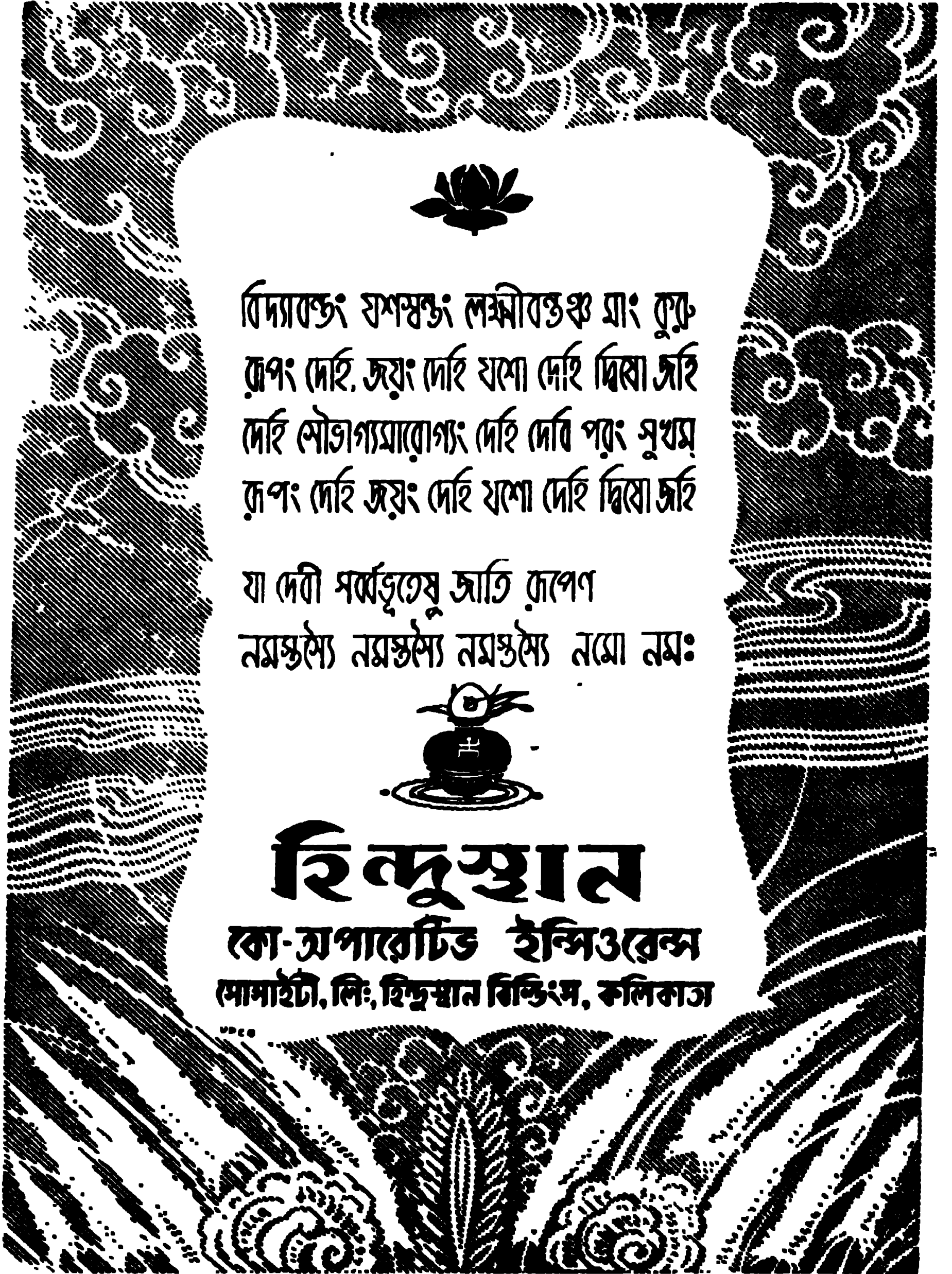
গায়ক হোলেও সংসার-খরচের জন্য অন্য উপায়ও দেখতে হয়। কেষ্টবাবু দর্জির দোকান দেন। সেখানে অনেক শিল্পী আসতেন। অভিনেতা রবি রায়ও আসতেন সেখানে। ক'লকাতায় তখন শিশির-সম্প্রদায় অভিনয় করছেন। রবি রায়ও আছেন সেই দলে। রবি রায় কেষ্টবাবুকে রাজী করিয়ে শিশিরবাবুর কাছে নিয়ে যান। ১৯২৩ সালে কেষ্টবাবু শিশির-সম্প্রদায়ে যোগদান করেন। তাঁর পারিশ্রমিক ঠিক হয় মাসে একশো টাকা। ঐ সম্প্রদায়ের হোয়ে প্রথম আলফ্রেড থিয়েটারে 'বসন্তলীলা' নাটকে 'বসন্তদূতে'র ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। পরে মনোমোহন থিয়েটারে 'সীতা' নাটকে 'বৈতালিকে'র ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। শিশির-সম্প্রদায়ের হোয়ে আরো অনেক নাটকে অভিনয় করেন তিনি। পরে এই সম্প্রদায়েই কর্ণওয়ালিশ থিয়েটারে অভিনয় করেন। যখন তিনি শিশির-সম্প্রদায় ছেড়ে যান তখন পারিশ্রমিক পেতেন মাসিক দেড়শো টাকা। তারপর তিনি মঞ্চে বহু নাটকে অংশ গ্রহণ করে অগণিত রসপিপাসু নর-নারীকে তাঁর সঙ্গীতের মূর্চ্ছনায় মোহিত করেছিলেন। তাঁর মধুর উদাত্ত কণ্ঠস্বর সহজেই সকলকে অভিভূত করতো। বাংলা রঙ্গমঞ্চে কেষ্টবাবুর মতন সঙ্গীতজ্ঞের আবির্ভাব হয়নি, ভবিষ্যতেও হবে কিনা সন্দেহ আছে।

কেষ্টবাবু যখন তাঁর সুর-মাধুরীতে রঙ্গমঞ্চের দর্শক সাধারণকে মাতিয়ে রেখেছেন তখন আবির্ভাব হোল সবাক্‌চিত্রের। চিত্রনির্ম্মাতারা ভাবলেন যদি তাঁরা কেষ্ট-বাবুকে তাঁদের দলে আনতে পারেন তবে ছবির উৎকর্ষ বেড়ে যাবে এবং তাঁরাও সফলতা লাভ করতে পারবেন। তাঁরা কেষ্টবাবুকে চলচ্চিত্রে আনবার জন্যে সচেষ্ট এবং সফলকামও হোলেন। খুব সম্ভবতঃ ১৯২৮ সালে

'চণ্ডীদাস' ছবির জন্যে নিউ থিয়েটার্সের সঙ্গে কেষ্টবাবু চুক্তিবদ্ধ হন। ছবি যখন মুক্তিলাভ করলো রসপিপাসু দেশবাসী তখন তাঁর গান শুনে পাগল হোয়ে উঠলো। ছেলে থেকে আরম্ভ করে বুড়ো পর্য্যন্ত—সকলের মুখেই তাঁর গানের প্রশংসা, তাঁর গানের কথা। বাংলা দেশে তখন বোধ হয় এমন কোনো লোক ছিল না যে, 'চণ্ডীদাসে'র গান চলচ্চিত্রে অথবা রেকর্ডে শোনে নি। এর পর তিনি নিউ থিয়েটার্সের পর-পর অনেকগুলি ছবিতে নামলেন এবং তাঁর জনপ্রিয়তা ক্রমশঃ বেড়েই যেতে লাগল। নিউ থিয়েটার্সের হিন্দী ছবি 'পুরাণ-ভকত' যখন বাংলার বাইরে দেখানো হোল তখন সারা ভারতের লোকে কেষ্টবাবুর গানে মোহিত হোয়ে গেল। বারবার কেষ্টবাবুর গান শুনেও যেন লোকের আশ মেটে না। বাংলার বাইরে কেষ্টবাবু কতখানি জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন একটি ঘটনারউল্লেখ করলেই তা বোঝা যাবে। কেষ্টবাবু যখন বোম্বাইতে যান তখন 'পুরাণ ভকত' চলছিল। কেষ্টবাবুর বন্ধুরা তাঁকে নিয়ে গেলেন একটি চিত্রগৃহে—সেখানে 'পুরাণ ভকত' দেখানো হচ্ছিল। তাঁর বন্ধুরা ইচ্ছে করেই তাঁকে একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর চিত্রগৃহে নিয়ে গেলেন। কারণ প্রথম শ্রেণীর চিত্রগৃহে নিয়ে গেলে কেষ্টবাবুর আর ভীড়ের ঠেলায় ভেতরে যাওয়া সম্ভব হবে না। এ ভীড় হবে কেষ্টবাবুকে দেখবার জন্যে। আর যাওয়া হোল রাত্রির শো'তে, তা না হোলে রাস্তায় লোকে গাড়ী আটকাবে। যাই হোক, কোন রকমে তাঁরা চিত্রগৃহের ভেতরে একটি বক্সে গিয়ে বসলেন। ছবি শুরু হোল। হঠাৎ দর্শকদের মধ্যে কিসের কোলাহল। কি ব্যাপার! দর্শকরা জানতে পেরেছেন যে, কৃষ্ণচন্দ্র সেই চিত্রগৃহে এসেছেন। ছবি দেখানো বন্ধ হোয়ে গেল। জলে উঠলো আলো। দর্শকরা সোল্লাসে জানিয়ে দিলেন যে তাঁরা কে, সি, দেকে দেখতে চান। তা না হোলে তাঁরা

গণ্ডগোল থামাবেন না। তখন বাধ্য হয়ে কেষ্টবাবুকে উঠে দাঁড়িয়ে সমবেত দর্শককে দর্শন দিয়ে অভিবাদন জানাতে হোল। দর্শকরাও হাততালি দিয়ে তাঁকে অভিনন্দিত করলেন।

'চণ্ডীদাস', 'দেবদাস' প্রভৃতি ছবিতে কৃষ্ণচন্দ্রকে মুখ্যতঃ গানই গাইতে হোয়েছে। কিন্তু 'ভাগ্যচক্র' ছবিতে তিনি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করলেন। ছবিটি মুক্তিলাভ করলে দর্শকরা তাঁর অভিনয় নৈপুণ্যে চমৎকৃত হোলেন। তাঁদের মুখে যে জিজ্ঞাসার ভাব ফুটে উঠেছিল, তাতে মনে হয়, তাঁরা জানতে চেয়েছিলেন, যিনি চোখে দেখতে পান না তাঁর দ্বারা কি করে ছুটোছুটি করে এই ধরণের অপূর্ব্ব অভিনয় করা সম্ভব হলো। 'ভাগ্যচক্রে' অভিনয় করে কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর অভিনয়-দক্ষতা সপ্রমাণ করলেন।

কৃষ্ণচন্দ্র নিউ থিয়েটার্স ছাড়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ছবিতেও অভিনয় করেন এবং গানও গেয়েছিলেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়ার যে ছবি দু'টিতে তিনি অংশ গ্রহণ করেছিলেন সে দু'টি ছবির নাম 'সীতা' ও 'সাবিত্রী' এবং সুর দিয়েছিলেন 'সোনার সংসার' ছবিতে। এরপর তিনি আবার নিউ থিয়েটার্সে ফিরে আসেন এবং 'বিদ্যাপতি' ও 'সাপুড়ে' ছবিতে অংশ গ্রহণ করেন। ১৯৪১ সালে তিনি বোম্বাইতে যান। সেখানে গিয়ে 'তমন্না', 'মেরা গাঁও', 'মহব্বৎ', 'দেবদাসী' প্রভৃতি ছবিতে গান এবং অভিনয় করেন। বোম্বাই যাবার আগে নিউ থিয়েটার্সে তাঁর শেষ ছবি 'আলোছায়া'। 'চণ্ডীদাস' ছবির জন্যে তিনি পারিশ্রমিক হিসাবে পাঁচশো' টাকা পেয়েছিলেন। আর 'পুরাণ-ভকত'-এর বেলায় পেয়েছিলেন আটশো টাকা। 'পুরাণ ভকত' ছবির সময় সায়গল প্রথম নিউ থিয়েটার্সে যোগদান করেন এবং এই ছবিতে অংশ গ্রহণ করেন। 'দেবদাস' ছবির সময় কেষ্টবাবুকে কোম্পানী মাসিক বেতনে রাখেন। তখন তাঁর মাইনে হয় মাসিক চারশো' টাকা। 'ভাগ্যচক্র' ছবির সময় তাঁর মাইনে হয় মাসিক পাঁচশো' টাকা। এবং 'বিদ্যাপতি' আর 'সাপুড়ে' ছবির সময় দাঁড়ায় আটশো টাকায়। এর পর বোম্বের লছমী প্রোডাকসন্স মাসিক হাজার টাকা মাইনে দিয়ে তাঁকে বোম্বাই নিয়ে যান।

কেষ্টবাবু যে কেবল ছবিতে গানই গেয়েছেন তাই নয়, সঙ্গীত পরিচালনাও করেছেন। কণ্ঠ সঙ্গীতেই তাঁর প্রতিভা সীমাবদ্ধ ছিলনা, সুরসৃষ্টিতেও তাঁর প্রতিভা সম্যক বিকাশ লাভ করেছে। লোকে যেমন তাঁর মধুক্ষরা কণ্ঠে মোহিত হোয়েছে তেমনি তাঁর সুরের মায়াজাল সৃষ্টিতে মুগ্ধ হোয়েছে। তিনি প্রথম যে ছবির সঙ্গীত পরিচালনা করেন সেটি হচ্ছে ইষ্ট ইণ্ডিয়ার 'সাবিত্রী'। ছবিটি পরিচালনা করেছিলেন যশস্বী পরিচালক নরেশ মিত্র। তারপর সুরসংযোজনা করলেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়ার হিন্দী ছবি 'সীতা'তে। হিন্দী 'সীতা' ছবিটি পরিচালনা করেছিলেন অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরিচালক দেবকী বসু। এর পর ঐ কোম্পানী 'সোনার সংসার' ছবি তোলেন। এতেও কৃষ্ণচন্দ্র সঙ্গীত পরিচালনা করেছিলেন এবং ছবিটি পরিচালনা করেছিলেন দেবকীবাবু। ছবিটির সুরসংযোজনা সার্থক হোয়েছিল এবং খুব জনসমাদর লাভ করেছিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়ার বহু হিন্দী ও মাদ্রাজী ছবিতে সঙ্গীত পরিচালনা তিনি করেছিলেন। ১৯৩৩ সালে বোম্বাইতে গিয়ে প্রথম যে ছবিতে সুর যোজনা করেছিলেন তার নাম 'লিওর অফ্ দি সিটি'। তখনকার মত একখানা ছবিতে সুরযোজনা এবং অভিনয় ক'রে কলকাতায় ফিরে আসেন। পরে আবার বোম্বাই যান এবং সেইবারই 'তমন্না', 'মেরা গাঁও', 'মহব্বৎ', 'দেবদাসী', প্রভৃতি ছবির সঙ্গীত পরিচালনা করেছিলেন। 'তমন্না' ছবিতে বোম্বাই-এর বিখ্যাত অভিনেত্রী সুরাইয়া অভিনয় করেছিলেন। কেষ্টবাবু লাহোরের পাঞ্চোলী ষ্টুডিয়োতে গিয়েছিলেন। লাহোরে যখন যান তখন তাঁকে সম্মানিত করবার জন্যে সেখানকার জনসাধারণ লাহোর কলেজে এক অভ্যর্থনা সভার আয়োজন করেছিলেন। তাতে লাহোরের বহু বিশিষ্ট এবং সম্মানিত ব্যক্তি, সঙ্গীতজ্ঞ এবং আরো অনেক গুণী জ্ঞানী ব্যক্তি বাংলার শিল্পীকে অকুণ্ঠ অভিনন্দন জানান।

ছবির সঙ্গীত পরিচালনা ছাড়া ছবির প্রযোজনা
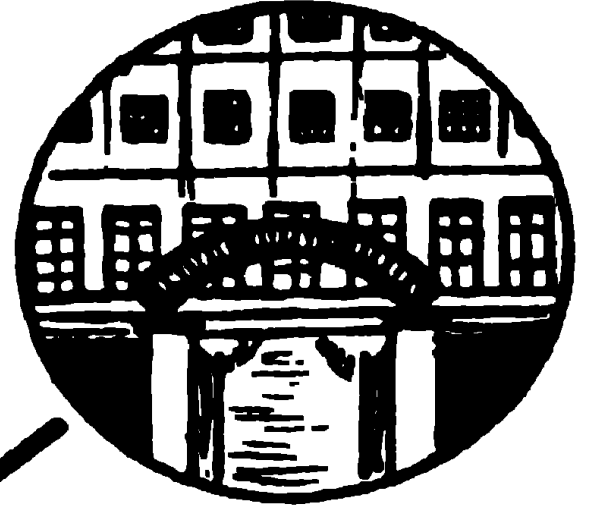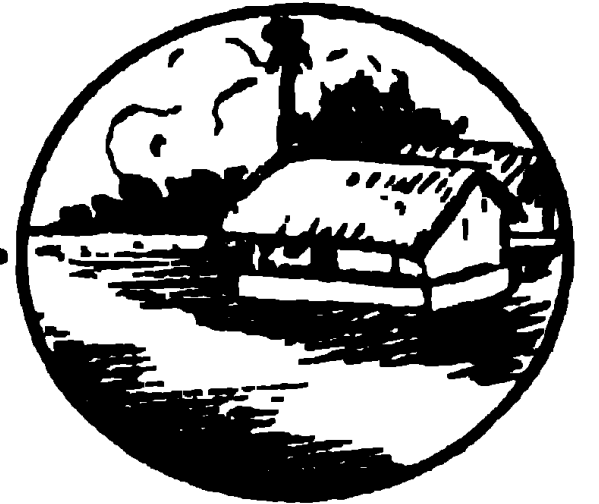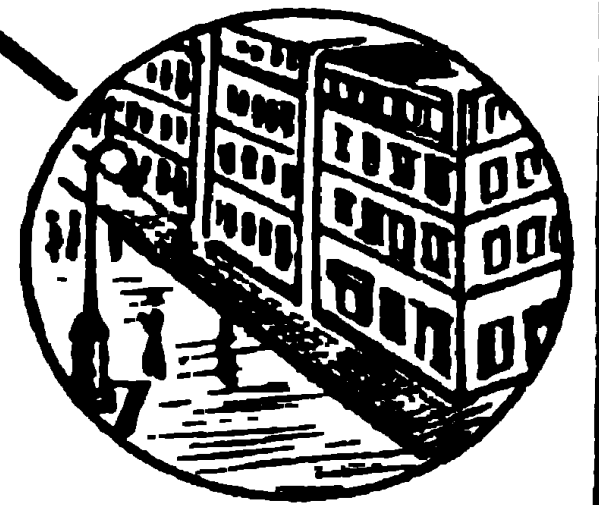
তিনি করেছেন। তাঁর প্রযোজিত ছবির নাম 'পূরবী'। 'পূরবী' একটি সঙ্গীতপ্রধান ছবি। বোম্বাইতেও তিনি খান-দুই ছবির প্রযোজনা করেছিলেন। ছবির প্রযোজনার ব্যাপারে কেবল ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশী ব'লে আজকাল বেশীর ভাগ লোকের যা অভিমত কেষ্টবাবু তা মনে করেন না। তাঁর মতে ভাল কাহিনী নিয়ে আন্তরিকতার সঙ্গে ছবি তুললে জনসাধারণ তা গ্রহণ করবেনই। এ বিশ্বাস তাঁর আছে। বর্ত্তমানে ছবি তোলবার ইচ্ছা কেষ্টবাবুর আছে এবং এ বিষয়ে তিনি চেষ্টাও করছেন।

বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের যুগে সঙ্গীত প্রচারের মাধ্যম হিসাবে চলচ্চিত্রের পরেই রেডিওর স্থান। কেষ্টবাবু ক'লকাতা বেডিওর সঙ্গে গোড়া থেকেই জড়িত। যখন ক'লকাতা বেতার কেন্দ্র সৃষ্টি হোল তখন এর নাম ছিল ইণ্ডিয়ান ব্রডকাষ্টিং কোম্পানী। এর উদ্বোধন দিনে প্রথম গান গেয়েছিলেন স্বর্গীয় দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি গেয়েছিলেন রবীন্দ্রসঙ্গীত। দীনেন্দ্রনাথের পরই কেষ্টবাবুর কণ্ঠ বেতারে ধ্বনিত হ'য়ে অগণিত শ্রোতার মনোরঞ্জন করে। সেদিন তিনি গেয়েছিলেন হিন্দী এবং বাংলা দুই-ই। বেতারের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও যোগাযোগ স্থাপন করেন নৃপেন মজুমদার। সে যুগে তাঁর পারিশ্রমিক ছিল মাসিক আশী টাকা—সপ্তাহে দু'দিন অনুষ্ঠানের জন্যে। বর্ত্তমানে কেষ্টবাবু মাসে একটি ক'রে প্রোগ্রামের জন্যে একশো টাকা পেয়ে থাকেন। বেতারে তিনি শুধু সঙ্গীতই পরিবেশন করেন নি, বার দু'য়েক অভিনয়ও ক'রেছিলেন। 'জয়দেব' ও 'পরাশর' এই দুটি ভূমিকায় বেতার নাট্যে তিনি অবতীর্ণ হন।

কেষ্টবাবুর বয়স বর্ত্তমানে ছাপান্ন বছর চ'লছে। তিন ভায়ের মধ্যে তিনিই কনিষ্ঠ। মা এখনও জীবিত আছেন। এই পুণ্যশ্লোকা বৃদ্ধার বয়স আশী বছর। কেষ্টবাবু বিবাহ করেননি।

বিশেষ [illegible]

নাট্যাচার্য্য শিশিরকুমার
মঞ্চে মগ্ন, গৃহে বিশ্রামরত,
একটি অগ্নিসংযোগ মুহূর্ত
ক্যামেরায় যা দেখা গেছে

ফোটো শ্রীরবি গঙ্গোপাধ্যায়

ক্যামেরার চোখে

সুদক্ষ নট ছবি বিশ্বাস
সকালে তাঁর প্রথম কাজ
বাড়ীর সংলগ্ন বাগানটি সাজানো
গোছানো আপন হাতে। এই
কাজ শেষে দূর থেকে উদ্যান-সৌন্দর্য্য
নিরীক্ষণে রত মুহূর্ত ক্যামেরার চোখে।

ফোটো : কাঞ্চন মুখোপাধ্যায়

'স্যামসন এ্যাণ্ড ডেলাইলা'
চিত্রের একটি চমকপ্রদ দৃশ্যে
হেডি ল্যামার

'স্যামসন এ্যাণ্ড ডেলাইলা'
ছবির অপর একটি দৃশ্যে
ভিক্টর মেচিয়োর ও হেডি ল্যামার

গ্রেটা গার্বো

(৩২ পৃষ্ঠার পর)

অস্বস্তি মনে হয়। শান্তিপ্রিয় নারীর কাছে এ এক কঠিন পরীক্ষা। উপায়ান্তর না দেখে তখনই ফোন করে ওর এক বান্ধবীকে,—জনৈক জার্মান সাহিত্যিকের স্ত্রী। তিনি এসে তাঁর জিম্মায় মেয়েটিকে দিয়ে গার্বো যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচে......

খ্যাতির বিস্তৃতির অনুপাতে গার্বো যেন সঙ্কুচিত ক'রে আনে আপন পরিচিতের পরিধিকে। বৃহত্তর শিল্প-জীবনে বহুর পদক্ষেপ সাধনার ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। এ সত্য গার্বো যেমন উপলব্ধি ক'রতে পেরেছে তেমনভাবে আর কেউ বোধহয় পারেনি। তাই বলে ও আর সকলের চেয়ে কম আলাপ-চারী নয়। তবে ওর মার্জিত শিল্পীসুলভ রুচিবোধ ঘনিষ্ঠ হ'য়ে ওঠবার অধিকার নির্বিচারে যাকে তাকেই দিয়ে বসেনা। ওর সঙ্গলিপ্সায় কত কোটিপতি, কত ধনকুবেরের যে আর্তমিনতি ব্যর্থ হ'য়ে গেছে ওর বহুস্তের অচলায়তনে মাথা খুঁড়ে তার আর শেষ নেই! ওর আকর্ষণ ব্যক্তিত্বের প্রতি, শিল্পী ও সাহিত্যিকের প্রতিই শ্রদ্ধা ওর বেশী। হলিউডে ওর সবচেয়ে ভালো লাগতো বহুরূপের রূপদানকারী বিশ্ববিশ্রুত নট লন্ চ্যানিকে। চ্যানির প্রতি ওর অগাধ শ্রদ্ধা।

গার্বো যেদিন প্রথম চ্যানিকে দেখে ষ্টুডিওয়, বর্গকে বলে,—'কি সুন্দর এই মানুষটি। আর সব শিল্পীদের মত একটুও অহমিকা নেই!'

উত্তরে বর্গ তাকে প্রশ্ন করে,—'বড় শিল্পী হোতে গেলে কি অহমিকার প্রয়োজন হয়না মনে কর?'

—'হয়তো হয়, কিন্তু তা' বাইরে নয়। বাইরের অহমিকা শিল্পীকে ছোটই করে, অন্তরের অহমিকা তাকে ক'রে তোলে বড়।'

এরপর চ্যানির সঙ্গে গার্বোর আলাপ খুব ঘনিয়ে ওঠে। প্রায়ই দু'জনে সেটের অবকাশে গভীর আলোচনায় ডুবে থাকে। চ্যানির অভিনয় দক্ষতা গার্বোকে অত্যন্ত মুগ্ধ করে। চ্যানির রূপসজ্জার একটি ঘটনা আজও গার্বো ভুলতে পারেনা।

একদিন ষ্টুডিওয় দেখে চ্যানি তাঁর চোখের পাতার নীচে কি যেন একটা ওষুধ লাগাচ্ছেন। অন্ধের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন ব'লে চ্যানির এই মেক্-আপ্—যাতে তাঁকে সত্যিকার কানা ব'লে মনে হয়। ব্যাপার দেখে ভয়ে বিস্ময়ে গার্বো পাষাণ হ'য়ে যায়। কিছুক্ষণ দেখে দেখে আর না থাকতে পেরে গার্বো বলে ফেলে—'আচ্ছা লন্, আপনার সাহস তো বড় কম নয়! ও সব ওষুধপত্তর লাগাচ্ছেন শেষটায় চোখ যদি সত্যিই কানা হ'য়ে যায়! কিসের জন্যে এত বিপদের ঝুঁকি নিচ্ছেন? চোখটা যে যাবে!'

'যেতেও পারে, তবে কিনা "রূপচাঁদে"র জন্যে সবই ক'রতে হয়'—ওষুধ লাগাতে লাগাতেই গম্ভীর হয়ে জবাব দেন চ্যানি।

"রূপচাঁদ" কথাটা গার্বোর কাছে নতুন। কথাটার অর্থ বোঝার মত ইংরিজী বিদ্যা তখনও গার্বোর হয়নি। তাই বিমূঢ়ের মত বর্গকে খোঁচা দিয়ে বলে,—'এই বর্গ, তাড়াতাড়ি, তাড়াতাড়ি! চট্ ক'রে বলতো "রূপচাঁদ" মানে কি?'

বর্গের উত্তর শুনে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে গার্বো বলে,—'ও-ও বুঝেছি! টাকা? মানে—ক্রোনেন।'

সেদিন হোটেলে ফেরার পথে বলে,—'বর্গ—আজ বুঝলাম লন্ একজন সত্যিকার নট—খাঁটি জাত শিল্পী'............

এই ভাবেই শেষ হয় গার্বোর প্রথম হলিউড জীবন। এরপর সাফল্যের জয়মাল্য প'রে দীর্ঘ ছুটি নিয়ে গার্বো স্বদেশে ফেরে। সুইডেনে ওর জন্যে বিরাট বিস্ময় অপেক্ষা ক'রে ছিল। সম্মান আর সম্বর্দ্ধনায়, অভিনন্দন আর অভ্যর্থনায় ওর অবকাশের দিনগুলো যে এমন মুখর হ'য়ে উঠবে একথা ও ভাবতেও পারেনি। ভাবতেও পারেনি যে এই প্রবাস যাপনের স্বল্প কালের মধ্যে স্বদেশের প্রতিটি লোকের অন্তরে ওর আসন সুপ্রতিষ্ঠিত হ'য়ে গেছে। শুধু সুইডেনেই নয় দূর-দূরান্তে, পৃথিবীর নিভৃততম প্রদেশে খ্যাতি ওর ছড়িয়ে প'ড়েছে, ছড়িয়ে প'ড়েছে ওর আবেগময় অভিনয়ের অনুভূতি মানুষের

মনে মনে। এমন কৃতিত্ব আর কোন শিল্পীর ভাগ্যে এত সুলভ ও সহজ ক'রে ধরা দিয়েছে কিনা সন্দেহ। গার্বো খুশি হয় আপন সৃষ্টি সার্থকতায়।

মার স্নেহছায়ায় শৈশবের স্মৃতিবিজড়িত পরিবেশে গার্বোর দিন কাটে পরম আনন্দে। আজ আর ওর ষ্টুডিওর ব্যস্ততা নেই, নেই কোন চিন্তা ভাব ব্যঞ্জনার, আজ শুধু উপভোগ,—শুধু দু'চোখ ভ'রে নতুন সূর্যোদয়ের আলোক গ্রহণ, দারিদ্র্যের অন্ধকারময় রাত্রির আজ চির অবসান। কিন্তু গার্বোর আর বেশীদিন বিশ্রাম সম্ভব হয় না। আবার আসে কর্মজীবনের আহ্বান। আসে এক ছ'লক্ষ ডলারের চুক্তি, তিনখানি ছবির জন্যে।

সুরু হয় গার্বোর দ্বিতীয় হলিউড জীবন। এবার আর গার্বো পূর্বের সেই ইংরাজী অনভিজ্ঞা মুখচোরা গ্রাম্য মেয়ে নয়। হলিউডের ও এক সম্মানিতা মহিষী। আপন মহিমায় নিজেকে ও প্রতিষ্ঠিত করে। গার্বোর কোন কাজে হস্তক্ষেপ করা দূরে থাক ষ্টুডিও কর্তৃপক্ষ প্রতিটি বিষয়ে ওর পরামর্শ নিয়ে চলেন; ব্যস্ত হ'য়ে ওঠেন ওকে খুশি করার প্রচেষ্টায়। গার্বো জানায় 'কুইন ক্রিশ্চিনা'য় এবার সে নিজেই তার নায়ক নির্বাচন ক'রবে। তথাস্তু। চিত্র জগতের ইতিহাসে অভিনেত্রীর খেয়ালকে সম্মান করার এ নিদর্শন সত্যই বিরল। গার্বোর মত শিল্পীর পক্ষেই শুধু প্রযোজক ও পরিচালকের ওপর এতখানি আধিপত্য বিস্তার সম্ভব।

গার্বোর সেদিনের প্রতিজ্ঞা সফল হয়। ষ্টুডিও আজ সন্ত্রস্ত। এমন কি উঁচু স্বরে ওর সামনে কেউ কথা কইতেও সাহস পায় না। দীর্ঘদিন পরে এসে গার্বো দেখে তার সাজঘরের চেহারা বদলে গেছে। নতুন পরিকল্পনার সাজানো গোছানো—আরাম ও সাচ্ছন্দের প্রত্যেকটি উপকরণ দিয়ে। কিন্তু একটি শুধু ছোট্ট ত্রুটী ছিল—সকলের নজর এড়িয়ে। ঘরে ঢুকে কোট খুলে টাঙাতে গিয়ে গার্বো দেখে জামা ঝোলানোর হুকগুলো নীচে নামানো, —মেঝে থেকে মাত্র তিন ফিট উঁচুতে। মুহূর্তে গার্বো ফেটে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে ষ্টুডিওর কর্মীবৃন্দ ছুটে আসেন ভয়ে সবাই তটস্থ। তৎক্ষণাৎ ত্রুটীতো শুধ্‌রে দেওয়া হয়ই, তারওপর ষ্টুডিও-প্রধানের হুকুম আসে এর কারণ অনুসন্ধানের। কারণ শুনে গার্বো একবার ওর দীর্ঘ দেহের ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে হাসিতে উছ্‌লে পড়ে। জানা যায় গার্বোর অবর্তমানে ওর সাজঘর দখল ক'রেছিল এক খর্বকায়া অভিনেত্রী। হুকগুলো তার নাগালের বাইরে ছিল ব'লে সুবিধের জন্যে সেগুলো তখন নামিয়ে দেওয়া হ'য়েছিল। কিন্তু পরে তুলে দেওয়ার কথা কারও আর মনে হয়নি। তার জন্যে কর্তৃপক্ষ ওর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে।

এমনি আধিপত্যের মাঝেই কাটে গার্বোর হলিউড জীবন, কাটে প্রারম্ভিক সংগ্রামে সুগম ক'রে আনা পথে অগ্রগতির মধ্যে। আর সে যাত্রা একদিন পৌঁছে যায় সার্থকতার তীর্থে। তারপর ?.........

তারপর অতিবাহিত কত সুদীর্ঘ বছর। আজও তবু গার্বোর যাত্রা হয়নি শেষ। সৃষ্টির জগৎ থেকে বিদায় নিয়ে সুরু তাঁর পরিক্রমা শান্তির জগতে। নির্জনতার আহ্বানে আশ্রয় নিয়েছেন সুইডেনের সুদূর গ্রামাঞ্চলে—তাঁর আপন শান্তিনিকেতনে মানুষ তার নাম দিয়েছে 'গার্বো স্নো'—'গার্বো শান্তি'।

আজও গার্বো ভোলেননি তাঁর অতীত। কালের নির্মম নির্দেশে হয়তো জরার করাল ছায়া নেমেছে তাঁর দেহ ঘিরে, নেমেছে রজত শুভ্রতা উজ্জ্বল কেশের গুচ্ছে, নেমেছে অজস্র কুঞ্চন কোমল চর্মের গাত্রে। তবু মন তাঁর আজও সজীব। আজও তাঁর যাত্রা চলে প্রভাতের প্রথম পবনে স্মৃতির সরণী ধ'রে দূর অতীতের পানে—সৃষ্টির পরম তীর্থে। মানুষ বিস্ময়ে বলে,—'এইখানে থাকে এক রহস্যময়ী বৃদ্ধা যে একদিন পৃথিবীকে দিয়েছে তার সব ঐশ্বর্য।'

আজও গার্বো নিঃসঙ্গ। বিশ্বের প্রতিটি মানুষের অন্তরতম হোয়েও তিনি সঙ্গীহীনা। আজও তাই যখন দিনান্তের রক্ত-রাঙা তির্যক রশ্মি ছড়িয়ে পড়ে তাঁর ঘরে, ছড়িয়ে পড়ে ম্যান্‌টেল্‌রপিসে ওপর রাখা রূপোর ফ্রেমে বাঁধা স্টিলারের ছবিখানির ওপর, তিনি চেয়ে থাকেন সেইদিকে, চেয়ে থাকেন পল্লবঘন দু'টি ম্লান আঁখি প্রসারিত ক'রে। ধীরে ধীরে দৃষ্টি আনত হ'য়ে প্রণাম ঝ'রে পড়ে তাঁর স্রষ্টার পদপ্রান্তে। তারপর সূর্য যায় আরও নেমে, আরও তির্যক হ'য়ে আসে তার রশ্মি। নীচ থেকে আলো ওঠে ওপরে, পড়ে দেয়ালে ঝোলানো সুন্দর একটি শিশুর ছবিখানির ওপর। পল্লবঘন আঁখির দৃষ্টি থেমে যায় সেইখানে। তারপর আলো যায় স'রে অস্তাচলে। আয়ত আঁখির কোল বেয়ে ঝ'রে পড়ে দু'ফোঁটা অশ্রু।

মানুষ বিস্ময়ে বলে—'এইখানে থাকে এক রহস্যময়ী নারী, জীবনে যে সঙ্গীহীনা, পুত্রহীনা!' •

আজও মানুষের বিস্ময় গেল না, আজও গার্বো রহস্যময়ী।

চলচ্চিত্র

বিমল চন্দ্র ঘোষ

শিব গড়তে বাঁদর গড়ার কম্‌পিটিশন চল্‌ছে
বাংলা ছবির মড়ক এবার টাকার চিতা জ্বলছে
অনেক মিঞাই তড়পে বলে নতুন কিছু করবো
দুনিয়াটাকে দেখিয়ে কলা খ্যাতির মালা পরবো।

জ্ঞানের জাহাজ ডিরেকটরের নাকের ডগায় বিশ্ব
ঘর্ঘরিয়ে ঘুরছে বেবাক, আঁৎকে ওঠে শিষ্য,
বিদ্যা যদি থাকতো পেটে, থাকতো না ভাই দুঃখ
কথায় কথায় শোনান তবু আত্মকথা সূক্ষ্ম।

তাও যদি ভাই নিজের হ'তো থাকতো না তায় লজ্জা
সাহিত্যিকের বুদ্ধি-চুরীর ধারকরা সাজ-সজ্জা
এই তো সেদিন বিখ্যাত এক প্রবীন ডিরেকটার
চোরাই নাটক আঁকড়ে বুকে হলেন পগার পার।

ছবির মধ্যে বিজ্ঞাপনে সাহিত্যিকের নাম
হজম কোরে পেলেন খ্যাতি এমনি গুণধাম
দৈনিকে আর সাপ্তাহিকে মাসিক পত্রিকাতে
চতুর পরিচালক মাতেন আত্ম-প্রশংসাতে।

ভাবেন মনে খুব জিতেছেন চুরীর অন্ধকারে
আপন গবেষণার (?) কথা শোনান যাঁরে তারে
মারলে বোমা শূন্য পেটে বেরোয় না ক-খ'
'ককনী' ভাষায় মাৎ কোরে দেন ইংরাজী হ'-হ'।

কোন চেতনায় দীপ্ত উনবিংশ শতাব্দীতে
কোন মণীষার জন্ম হ'ল, আকুল ব্যাখ্যা দিতে
হিমসিমিয়ে আঁৎকে ওঠেন ভেবেই গলদঘর্ম
নিরেট মাথায় হয়না প্রবেশ সমাজনীতির মর্ম।

বিখ্যাত এক সাহিত্যিকের তৈরী জীবন-নাট্য
স্তোকবাক্যের ধাপ্পা দিয়ে দেখিয়ে নানান শাঠ্য
ঠকবাজীতে গায়েব কোরে নিলেন রাতারাতি
চুক্তি-শূন্য সাহিত্যিকের নিবিয়ে খ্যাতির বাতি।

হজম কোরে পাণ্ডুলিপি চক্ষে দিয়ে ধুলো
ছাঁটাই কোরে দিলেন লেখার আসল দৃশ্যগুলো
দৃশ্যগুলো থাকতো যদি সবাই হতেন মুগ্ধ
চোরের হাতে আসল নাটক রইল না তাই শুদ্ধ।

এমনি ধারা আছেন অনেক ধূর্ত ডিরেকটার
গল্প-চুরীর ওস্তাদীতে হাতটি চমৎকার
প্রযোজক আর লেখকমারা ডিরেকটরের দম্ভ
বাক-চাতুরীর সাগরবুকে অসার জলস্তম্ভ।

সাইকলজীর ফেরেপবাজী নাট্যকলার ধাপ্পা
ছবির ভাষায় শুনলে লোকের মেজাজটা হয় খাপ্পা
একেই লোকে পেটের দায়ে সমস্ত দিন খাটছে
দিন-যাপনের প্রাণ-ধারণের দুঃখে জীবন কাটছে।

রুক্ষ মেজাজ অন্ন-বস্ত্র বাসস্থানের চিন্তায়
দম ফেল্‌বার পায়না সময় রক্ত ঝরা দিনটায়
ধার দেনাতেই জীবন কাটে নানান কাজের ভীড়ে
সময় পেলেই সবাক ছবির স্নিগ্ধ-শীতল নীড়ে।

একটু আরাম একটু আমোদ একটু নতুন শিক্ষা
ছবির মধ্যে সবাই খোঁজে নতুন প্রাণের দীক্ষা
কোথায় আরাম কোথায় আমোদ নতুন প্রাণের তৃপ্তি
কোথায় বা সুখ-শান্তি কোথায় সুস্থ ছবির দীপ্তি।

চলছে কেবল নোংরামী আর ঘৃণ্য ব্যাভিচার
সস্তা-ছবির পর্দ্দাজুড়ে পাপের অন্ধকার
ছবির ভাষায় রুগ্ন বুকের অন্ধ প্রতিক্রিয়া
বিষিয়ে তোলে অজ্ঞ মনের নরক উদ্বেলিয়া।

হায়রে ছবি বাংলা ছবি দ্বিখণ্ড এই দেশটায়
মরণ-দশায় পৌঁছে গেছে ডুববে বুঝি শেষটায়
কেউ তুল্‌ছে যৌন-ক্ষুধা কেউবা নাচায় কঙ্কাল,
পর্দ্দাফুঁড়ে বাঁদরামীতে কেউবা ছড়ায় জঞ্জাল ।

দেশবরেণ্য মহাত্মাদের চরম লাঞ্ছনাতে
কেউবা ডোবায় জীবনছবি কলুষ অজ্ঞতাতে
হায়রে আমার বাংলা দেশ, হায়রে চলচ্চিত্র
বৈশ্যজন-রক্ষিতা নও রামরাজ্যের মিত্র ।

তোমার বুকের আধখানাতে উর্দ্দু জবরদাস্তি
পাকিস্তানী চোখ-রাঙাণী নেইক প্রাণে স্বস্তি
হিন্দি ভাষার জোর-জুলুমে কণ্ঠ তোমার রুদ্ধ
হায় জননী বাংলা তোমার তাই কি হৃদয় ক্ষুব্ধ ?

তাই কি এত গজিয়ে ওঠে নিরেট থাজা ভুঁইফোঁড়
শিব গড়তে বাঁদর গড়ার তাই কি এত তোড়জোড় ?
জাঁকজমকের আড়ম্বরের বিজ্ঞাপনের বাদ্য
তুমুলনাদে বাজিয়ে করে ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ ।

হায়রে তবু আঁতুড় ঘরেই উঠছে মড়াকান্না
নিরেট মাথা ছবির মালিক গলদ খুঁজে পাননা
বস্তা পচা গল্প দিয়ে মন ভোলানো মিথ্যে
দাগ কাটেনা লক্ষ কোটি ক্ষুব্ধগণ চিত্তে ।

আপনারা যা জানতে চেয়েছেন

সুরাইয়া
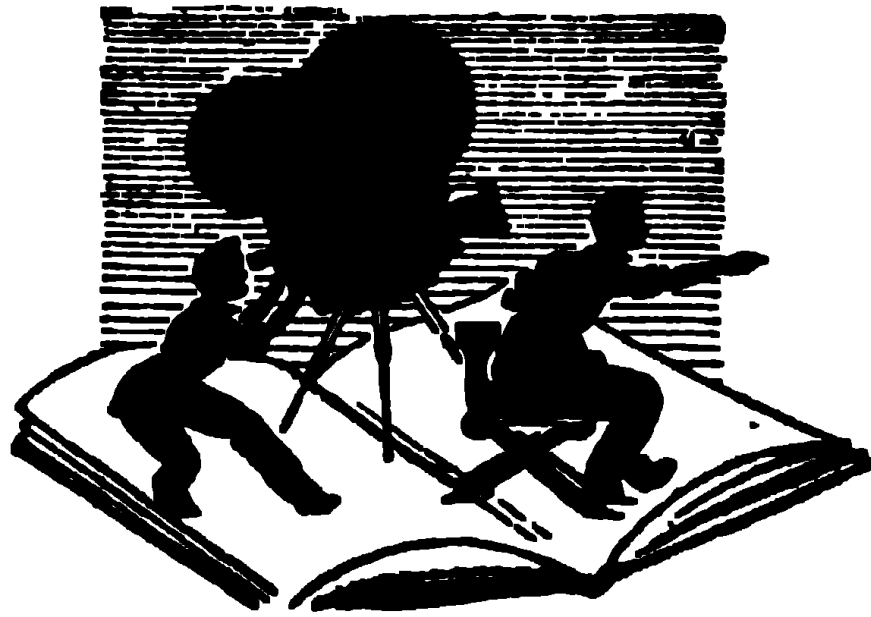
আপনারা আমাকে বলেছেন নিজের সম্বন্ধে কিছু বলতে। কি মুস্কিল বলুন তো! নিজের সম্বন্ধে নিজে আবার কি বলবো! বড় বিপদে ফেললেন দেখছি! এর চেয়ে এক নাগাড়ে ষাট ঘণ্টা স্যুটিং করতে বলতেন, তবুও না হয় একটা উপায় খুঁজে বার করতাম। কিন্তু তার চেয়ে গল্প হ্যাঁ একটি মেয়ের গল্প বলি শুনুন—একটি পরিবার লাহোর থেকে বোম্বেতে এসেছে, একটি ছোট্ট মেয়েও তাদের সঙ্গে আছে। মেয়েটি দেখতে বেশ ফুটফুটে খুব অল্প বয়েস থেকেই তাকে 'কোরাণ' পড়ানো শুরু হোল এবং উচ্চারণ শুদ্ধির জন্যে একজন আরবীয় শিক্ষকও এলো। আর বড় হোলে তাকে ইংরাজী শেখাবার জন্যে ইংরিজী স্কুলে পাঠানো হোল। সেই বিদ্যালয়ে সে মোটে তিন বছর পড়েছিল। তারপর বাড়ীতে পড়াশুনো চললো। সেখানে তার পড়াশুনার ওপর ঠাকুরমার সজাগ দৃষ্টি। বাড়ীতে ইংরাজী ছাড়াও মৌলবী সাহেবের কাছে সে উর্দ্দু, ফারসী এবং হিন্দী শিখতে লাগলো। ফারসী তার জীবনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। ফারসী পড়তে পড়তেই নৈতিক চরিত্রের মূল্যের এবং আধ্যাত্মিক শক্তির ওপর তার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মায়। এবং তার পরবর্ত্তী জীবনের ভিত্তি গড়ে ওঠে ফারসী কবি ফারদৌসির একটি কবিতাকে কেন্দ্র করে —"তুচ্ছ একটি পিঁপড়েকেও আঘাত করো না, কারণ তার মধ্যেও জীবন আছে আর সে জীবন অতি মধুর, অতি সুন্দর।"

দশবছর মেয়েটির যখন বয়েস, তার কাকা একদিন তাকে 'তাজমহল' ছবিতে বালিকা মমতাজ মহলএর ভূমিকায় অভিনয় করবার জন্যে বললে। এটিকেও সে একটি খেলা ভেবে রাজী হোল। বোধ হয় তখন সে কল্পনাও করেনি যে এই 'খেলা'ই পরে তাকে কল্পনাতীত ঐশ্বর্য্য এনে দেবে। এই ঘটনার তিন বছর পরে সে স্কুল ছেড়ে দিয়ে চলচ্চিত্রে অভিনয় করবার জন্যে নিজেকে তৈরী করতে লাগলো। সে গান, ভাবাভিব্যক্তি এবং উচ্ছ্বাসকে যথাযথ ভাবে রূপায়িত করবার জন্যে এবং অভিনয়ের অন্যান্য আঙ্গিক কলা-কৌশলের তালিম নিতে আরম্ভ করলে। কিন্তু তার চলার পথ খুব সহজ ও সরল হয়নি। অনেক বাধা বিপত্তির সম্মুখীন তাকে হোতে হয়েছিল। এই সময় তার আত্মবিশ্বাস এবং দৃঢ়তা তাকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছিল। সে চলচ্চিত্রে যোগদান করলে। সেখানে সে তার পরিচালক এবং অন্যান্য কয়েকজনের কাছে সমাদৃত হোলেও অনেকের সে চক্ষুশূল হয়ে দাঁড়ালো। কারণ এত অল্পে যে সুযোগ সে পেয়েছিল তার জন্যে তারা ঈর্ষান্বিত হোয়েছিল। তারা প্রতি কথায়, প্রতি কাজে তার ভুল ত্রুটি বার করতে লাগলো। কিন্তু প্রতিভার পথ রোধ করতে কেউ পারেনা, সে নিজের পথ নিজেই করে নেয়। পরের বছরে সে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করবার সুযোগ পেলে। এইখানেই প্রতিভা তার আবরণ উন্মোচন করলে—তার অভিনয় নৈপুণ্যে সকলে বিস্মিত হোল,

এবং স্বার্থান্বেষীদের মাথা নত হ'য়ে এলো। মেয়েটির প্রশংসায় চারদিক মুখরিত হোয়ে উঠল···আর সে আরোহণ করলে সফলতার উচ্চশিখরে।

বর্ত্তমানে সে একসঙ্গে পাঁচ-ছ'খানি ছবিতে কাজ করে এবং বিনিময়ে সে যে অর্থ পায় তার পরিমাণ এতো বেশী যে তা ইন্‌কামট্যাক্স কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি লোভাতুর করে তোলে। তার অভিনীত ছবি পরম নিশ্চিন্তে ব্যবসায়িক সাফল্য অর্জ্জন করে কারণ দর্শকসাধারণের সে অত্যন্ত প্রিয়। কিন্তু যখন সেই প্রীতির উচ্ছ্বাস চরমে পৌঁছোয় তখন তার হয় প্রাণান্ত দুর্ভোগ। একবার তার এক ছবির উদ্বোধনের সময় দর্শকের প্রীতির চাপে তার গাড়ীর এমন হাল হয়েছিল যে সেটা আর চেনার উপায় ছিল না।

তার চলচ্চিত্রে সফলতা অর্জ্জনের মূলে ছিল—লাবণ্য-দীপ্ত সুপশ্রী, মধুক্ষরা কণ্ঠস্বর এবং তার বরাভয়দাত্রী ঠাকুরমা। ঠাকুরমা তার অভিভাবক, তার ম্যানেজার তার চৌকিদার অর্থাৎ সবকাজেই ঠাকুরমা আছেন, তাঁকে বাদ দিয়ে কোন কাজ করবার যো নেই। যখন সে ষ্টুডিওতে যায় তখন তার ঠাকুরমা আগে আগে চলতে থাকেন আর পিছনেই সে স্মিত অধরে ষ্টুডিওর লোকজনের অভিবাদনের প্রত্যুত্তর দিতে দিতে চলতে থাকে। ঠাকুরমা ষ্টুডিওর ভেতরে গিয়ে একটি চেয়ার নিয়ে বসেন সেই। সময় তাঁর সারা অবয়বে প্রচণ্ড দৃঢ়তা ফুটে উঠতো। চারপাশের লোকেরা সেই ষাট বছরের শুকনো বারুদ-স্তূপ সম্বন্ধে সবসময় সচেতন থাকতো কারণ সামান্য ত্রুটিতেই তা ফেটে পড়বে। সেখানকার ষ্টুডিও মহলে একটি প্রচলিত প্রবাদ আছে যে—একমাত্র দেবআনন্দ ছাড়া অন্য কেউ, এমন কি পরিচালকরা পর্য্যন্ত সেখানে ঘেঁষতে ভয় পান। মেয়েটিও ঠাকুমাকে কাছে পেলে কাজে উৎসাহ পায়—আর তিনি চেয়ারে বসে হুক্কা অথবা সিগারেট টান্‌তে টান্‌তে তার সব কাজ লক্ষ্য করেন। তার সবকাজে ঠাকুরমা থাকেন, তার কণ্ট্রাক্ট-এর বিষয় তিনিই সব করেন আর মেয়েটিও ঠাকুরমা ছাড়া অত্যন্ত অসহায় বোধ করে।

আগেই বলেছি—মেয়েটির মনে আধ্যাত্মিকভাব প্রবল এবং ভগবানে তার অসীম বিশ্বাস। যার ফলে তার মন হয়েছে অত্যন্ত কোমল। কাউকে কোনরূপ আঘাত দিতে তার মন চায়না, তা সে যত নগণ্যই হোক এবং তার জন্য সামান্য ক্ষতিও যদি তাকে স্বীকার করতে হয় তবুও সে করে। একবার, একটি ছবিতে তার একটি শিশুকে কোলে করার দৃশ্য ছিল। সেটে তখন কাজ চলছিল—এমন সময় একজন অপরিচিতা স্ত্রীলোক একটি শিশুকে সর্ব্বাঙ্গ কাপড় দিয়ে মুড়ে এনে তাকে বললে: 'ঈশ্বরের দোহাই,আপনি এই শিশুটির সর্ব্বাঙ্গে ফোঁড়া হয়েছে বলে কোলে নিতে অস্বীকার করবেন না। আপনি যদি অস্বীকার করেন তবে যে টাকা আমাকে দেওয়ার কথা আছে তা ওরা দেবেনা। টাকাটা না পেলে আমার অত্যন্ত ক্ষতি হবে'। মেয়েটি স্ত্রীলোকটির কথায় রাজি হোল এবং সেই দৃশ্য গ্রহণের সময় সেই রুগ্ন শিশুটিকে কোলে নিতে কোন রকম ঘৃণা বা বিরক্তি প্রকাশ সে করে নি।

মেয়েটির কণ্ঠস্বর অতি সুমিষ্ট! সে যখন গান গায় মনে হয় যেন অন্তর থেকে সেগান আসছে। নাচের বেলায়ও তাই, সে অন্তরের ভাবকে নাচের ছন্দের ভেতর

আমি বন বুলবুল গাহি গান আমি রে ......

বাড়ীতে ব'সে পিয়ানো বাজাচ্ছেন শ্রীমতী ভারতী দেবী

'চিত্রবাণী'র জন্য বিশেষভাবে গৃহীত আলোকচিত্র

ফোটো : চিত্রবাণী

বোম্বে টকীজের সদ্যমুক্ত বাংলা ছবি 'সমর'-এর একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় সুমিত্রা দেবী

দিয়ে প্রকাশ করে। মেয়েটি তার সুধাভরা সঙ্গীতে অগণিত জন সাধারণকে মুগ্ধ করলেও সে গর্ব্ব করে না যে সে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের (ক্লাসিক্যাল) একজন নিপুণ শিল্পী। তার জীবনের মতো সঙ্গীতেও পারসীক এবং মিশরীয় সঙ্গীতের প্রভাব অত্যন্ত বেশী। সে মিশরীয় যন্ত্র-সঙ্গীত শুনতে বড় ভালবাসে। সময় পেলেই (যদিও সময় সে কমই পায়) মিশরের উম্-ই-কুলসম্ এবং আবদুল ওয়া-হাব এর রেকর্ড শোনে। মেয়েটি সায়গলের খুব ভক্ত ছিল এবং তাদের মধ্যে সম্প্রীতিও ছিল খুব। সে সায়গলের সঙ্গে 'তদ্‌বির' ছবিতে প্রথম অভিনয় করে, পরে 'পাবওয়ানি' ছবিতেও তাঁর সঙ্গে অভিনয় করে। সায়গল মেয়েটিকে 'কুশু' কিম্বা ঐ গোছের কিছু একটা আদরের নাম ধরে ডাকতেন। মেয়েটিও সায়গলকে পিতার মতো ভালো-বাসতো, ভালোবাসতো তার স্বপ্নময় কণ্ঠস্বরকে, তার প্রাচুর্য্যময় সজীবতাকে। সায়গলের মৃত্যুতে মেয়েটি মনে অত্যন্ত আঘাত পেয়েছিল। সব সময় মন মরা ভাব। এমন কি ছবি তুলবার সময়ও এই-ভাব থাকতো। আর একটা অদ্ভুত জিনিষ সায়গলের মৃত্যুর পর মেয়েটির মধ্যে দেখা দেয়। তার মনের মধ্যে একটা বিশ্বাস আসে যে মৃত্যুর পরও জীবন আছে অর্থাৎ মৃত্যুর পর মানুষের আত্মা আবার মানুষের রূপ নেয়, যদিও এই মতবাদ ইসলাম ধর্ম্ম বিরোধী। এবং সেই জন্যে মেয়েটি অত্যন্ত বিভ্রান্ত বোধ করে। এর একটা মীমাংসা না হোলে তার মনে শান্তি নেই।......

মেয়েটির মনে বর্ত্তমানে ছবি প্রযোজনার বাসনা জেগেছে। অবশ্য সে যে ছবি তৈরী করবে তার মধ্যে এমন কিছু নতুনত্ব থাকবে যা দর্শক সাধারণকে মুগ্ধ করতে পারবে।

তার কোন কিছুরই অভাব নেই বর্ত্তমানে। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যময় গৃহ, অর্থ, যশ, সবই আছে। তবুও কোথায় যেন একটা কিসের অভাব আছে...হ্যাঁ, অভাব একজন মনের মতন স্বামীর। এমন একজন লোককে সে চায় যে শুধু তাকেই চাইবে, তার টাকাকড়ির জন্যে তাকে নয়। কয়েকজন লোক অবশ্য তার জীবনে এসেছিল...তাকে ভালবাসা জানাতে, ভালোবাসতে নয়। তাই খেলা শেষ হোতেই চলে গেছে তারা, রেখে গেছে মনে একটি কোমল বেদনার ছাপ। এই সব নানা কারণে সে চিত্র সমাজে মিশতে চায় না। সমাজের প্রতি একটা ঘৃণার ভাব জেগেছে মনে। অবশ্য মাঝে মাঝে সে সেখান থেকে আনন্দও পায়। যেমন, কয়েক বছর আগে সমগ্র চলচ্চিত্র শিল্পের প্রতিনিধিদের সামনে সেই বছরের শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রীর সম্মানের নিদর্শন হিসেবে তাকে এক স্বর্ণ পদক দেওয়া হোয়েছিল—সেদিন তার জীবনের একটা স্মরণীয় দিন। কিন্তু...এছাড়া তার একুশ বছরের জীবনে আর কিছু আছে কি? অবশ্য টাকা পয়সার দিক দিয়ে বলছিনা। টাকা পয়সা তার প্রচুর আছে। কিন্তু অর্থ ই তো সব নয়! তার নিভৃত মনের গোপন কন্দরে যে মানুষটির ছবি এঁকে সে রেখেছে তার সন্ধান তো আজও সে পায়নি, তার প্রতীক্ষায় আজও সে উন্মুখ হোয়ে আছে।...

[যে মেয়েটির গল্প এতক্ষণ সুরাইয়া করলেন পাঠকবর্গের বোধহয় বুঝতে কোনরূপ অসুবিধা হয় নি যে মেয়েটি আর কেউ নয় সুরাইয়া নিজেই।]

শারদীয়ার মনোমত চিত্রোপহার

সর্বজন চিত্তে রেখাপাত করার
অলক্ষ্য শক্তি নিয়ে আসছে

দৈনন্দিন সহজ জীবনের
অতি স্বাভাবিক জটিলতা
সুখ-দুঃখ, স্নেহ-আবিলতার
স্বচ্ছন্দগতি কাহিনী অবলম্বনে
চিত্ররূপায়িত অনবদ্য সঙ্গীত
রসপ্রধান চিত্রার্ঘ্য!

সনী আর্ট প্রডাক্সন্স-এর
নিবেদন
নার্গিস • দিলীপ কুমার ও মুনাওয়ার সুলতানা
অভিনীত

বাবুল

সঙ্গীতে • নৌশাদ ★ পরিচালনা • সনী

শুভারম্ভ • শুক্রবার ১৩ই অক্টোবর
ওরিয়েন্ট • ম্যাজেষ্টিক • খান্না
আরও অনেক ছবিঘরে

রেডিয়েন্ট রিলিজ

সিনেমার গল্প

শ্রীনরাধম

রূপক নয়; নিছক একটি গল্প লেখার চেষ্টা করছি। এই কাহিনীর কোনও চরিত্রের সঙ্গে যদি বাস্তব জগতের কারও কারও মিল থাকে, তবে তা নেহাৎই আকস্মিক বা accidental.

আমার এক বিশেষ অভিনেতা-বন্ধুর কিছু প্রচার প্রয়োজন। বন্ধুটি চিত্রজগতে নতুন যদিও তার সম-সাময়িক অনেক অভিনেতা ইতিমধ্যে অভিনয়ে যথেষ্ট সুনাম করেছে এবং একাধিক ছবিতে নামছে, আমার এই বন্ধুটির সেদিক দিয়ে অত্যন্ত দুর্ভাগ্য। হাতে ছবি তো নেই, শুধু নায়ক সাজবার জন্য নিজের ছবি করতে হচ্ছে। এই কারণেই আমার বন্ধুটির প্রতি কর্তব্য-বোধ আমাকে সজোরে নাড়া দিচ্ছে। অনেক ছবিতে নামা সত্বেও, একটি ছবি করতে সুরু করলেও কি জানি কেন কোনও চিত্র-পত্রিকার বা দৈনিক পত্রিকার চলচ্চিত্র বিভাগে তার নাম প্রকাশিত হচ্ছে না। আমার হাতে যখন একটি পত্রিকা আছে, তখন বন্ধুটির পত্রিকা-মারফৎ প্রচার করলে আমাকে পক্ষপাতিত্ব দোষে অপরাধী করতে পারেন, কিন্তু অন্যায় বলবেন না দয়া ক'রে।

অভিনেতা-বন্ধুটির নাম শীতল সরখেল, শেতলা নামেই সে প্রখ্যাত। লেখা-পড়া সে প্রচু—র করেছে, অন্ততঃ বলে বেড়ায়—তবে বিদ্যা তার সেকেণ্ড ক্লাস পর্য্যন্ত। অভিনয় বোধহয় সে শিখেছে কয়েকজন গুণ্ডার কাছে, কারণ ছেলেবেলা থেকেই অভিনেতা হওয়া পর্য্যন্ত তাদের সঙ্গে তাকে প্রায় দেখা যেত এবং তার অভিনয়ের ধরণ প্রায় সেইরকমই।

শেতলা অনেক পরিচালকের দোরে ধর্ণা দিল, ছোট বড় অনেক অভিনেতাকে মুরুব্বি ধরল—কিছুতেই কিছু হয় না। অবশেষে একদিন শিকে ছিঁড়ল, 'বাজার মন্দা' না ওই ধরণের কি এক ছবিতে একটি কাঠের পুতুলের ভূমিকায় প্রাণবন্ত অভিনয় করল। চেহারাটি মেয়েলি, তাই বাংলা দেশের মেণীমুখো নায়কের ভূমিকায় অভিনয় না করিয়ে শুধু ক্যামেরার সামনে দাঁড় করানোই চলে। তাই স্বপন গুপ্ত নামে এক পরিচালক তাকে 'খুলি নাই' নামে একটি ছবিতে নায়কের ভূমিকায় নামালেন। মেয়েলি চেহারার জন্য আর মাথা তখনও ভারি না হওয়ার জন্য মন্দ মানালো না, যদিও তার চেয়ে অভিনয় অনেক গুণে ভাল করলো প্রকাশ, রাধাভূষণ, এমন কি ছোট্ট টার শংকু পর্য্যন্ত।

এবার কিন্তু তার মাথা ভারি হয়ে গেল। একটা আদ্দির পাঞ্জাবি, পায়জামা পরে সিনেমা হাউসের সামনে দাঁড়াতে সুরু করলো—ফিরো কিনা, পরিচয়টা দেওয়া চাই। বিশেষ বন্ধুদের আর চিনতে পারে না। (অবশ্য আমাকে বাদ দিয়ে)। ছবির কয়েকটা কণ্ট্রাক্টও তার হাতে এল। সমস্ত পরিচালকই এবার একে চিনতে পারলেন। 'বনবন অশ্বশালা' ছবিতে তার ঘোড়ার মত অভিনয়ে নিজেই বিরক্ত হয়ে একদিন পরিচালককে অন্য পরিচালকের সামনে বলে বসল, "ও পরিচালক একটা thundering fool. অভিনয় একেবারে বোঝে না; নয়ত আমাকে দিয়ে অভিনয় করাতে পারে না।" নিউ মাস্টেরিয়াস কোম্পানীতে ভক্তিরসাপ্লুত অভিনয়ের ফলে পরিচালক রাগে তার মাথা ন্যাড়া করে দিয়ে ছাড়লেন; ঘোল ঢেলেছেন কিনা জানি না। তবে শেতলা বলেছে, সে সুযোগ পরিচালককে সে দেয় নি, ঘোল আনার আগেই সে পালিয়েছিল। 'আমি' বলে ছবিটিতে অভিনয় করার দিন থেকেই সে পরিচালক, ক্যামেরাম্যান, রেকর্ডিষ্ট, অন্যান্য অভিনেতা—অভিনেত্রী এবং টেক্‌নিশিয়ানদের রীতিমত চটিয়ে তারপর নিরস্ত হলো। ষ্টুডিওতে এসেই বলতো অতটার মধ্যে তাকে ছেড়ে দিতে হবে, তার স্ত্রীর প্রসব-বেদনা উঠেছে। আশ্চর্য্য, মাসখানেক ধরে এই একই চালে সব জায়গা থেকে ছুটি নিয়ে পালাত। কিন্তু তার প্রায় মাসখানেক পরে তা'র একটি মেয়ে হয়। একদিন সে এক পরিচালকের কাছে স্বীকার করল যে প্রত্যেককেই সে date দিত এবং ওভাবে মিথ্যা কথা বলে না পালালে অন্য জায়গায় কাজ করা সম্ভব হত না।

কিন্তু নিজে এত বড় অভিনেতা হওয়া সত্ত্বেও আজ পর্য্যন্ত কেউ ওর অভিনয় পছন্দ করে নি। কোনও কাগজে ওর অভিনয় সম্বন্ধে ভাল কথা বার হয় নি। ফলে চটে মটে কাগজওয়ালাদের শায়েস্তা করতে গিয়ে একটি কাগজে নিজের সেকেণ্ড ক্লাস সুলভ বিদ্যার পরিচয় দিয়ে বসল—কাগজওয়ালারা কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজা দেখে নি। অভিনয়ের তারা বোঝে কি ইত্যাদি এবং এক কাগজের সম্পাদককে লিখে বসলো যে ঘুষখোর, আমি ঘুষ দিই না বলে আমার নামে ভাল কথা লেখে না। ফলে উকিলের চিঠি এবং নাকে খৎ দিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা।

তার অভিনয় প্রতিভায় পরিচালকেরা এতদূর বিস্মিত হয়েছিলেন যে কাজের সময়ে তার নাম বিস্মৃত হলেন। ফলে অনাহার। কিন্তু একটা ছবিতেও না নামলে ওর নাম কেউ করবে না যে! এমনিতেও সম্পাদকদের গালাগাল দেওয়া সত্ত্বেও নায়কের ভূমিকায় নামলেও কোনও কাগজে ওর নাম নাম প্রকাশ হয় না। বড্ড মুস্কিল। এবার তাই দাদা কেলোর শরণাপন্ন হ'তে হল।

কেলো আবার কোনদিন ষ্টুডিও দেখেনি। এপাশ থেকে ওপাশ থেকে কিছু টাকা জোগাড় করে কোম্পানী পত্তন হল। কিন্তু প্রথমেই ঘা খেল শেতলা; তার দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে এক অভিনেত্রী পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে নিরুদ্দেশ। সেইজন্যেই বোধহয় তার ছবির নাম 'পালিয়ে গেছে যে'।

কিন্তু সিনারিও লেখে কে? কেলোরও যা বুদ্ধি, শেতলারও তাই। তখন শরণাপন্ন হতে হল একজন হবু পরিচালকের। নাম তার কাজলী, আমাদের অভিনেতা বিন্দুদার ভাই। কাজলীকে শেতলা বলল, দাদা সবই তুমি করো—টাকার জন্য ভেবো না। জুন মাসে সিনারিও লিখতে বসে কাজলী কুড়ি দিনের মধ্যে কাজ শেষ করে দিল। তখনও শেতলা কিছু বলেনি। কাজলী রোজ অফিসে আসে, কাজ করে। কিন্তু এক মাস যায়, দেড়মাস যায়—মাইনে আর পায় না। একদিন কাজলী মাইনের কথা বলতে উত্তর পেল, মাইনে এখন কি? আগে ছবি আরম্ভ হোক।

কিন্তু কাজলী নাছোড়বান্দা। অবশেষে কুড়ি দিনের মাইনে তাকে শেতলা দিতে বাধ্য হল। কাজলী জিজ্ঞাসা করল—কুড়িদিনের কেন! উত্তর হল—এই যা পেয়েছ ঢের। ছবি তোলার ব্যবস্থা পাকা হলে কাজলীকে ডেকে কেলো আর শেতলা বলতে সুরু করল—আগেকার কথা ভুলে যাও। তোমাকে ছাড়া চলবে না ইত্যাদি।

কাজলীর অর্থাভাব তাই সে বাধ্য হয়ে আবার চাকরী নিল। আগষ্ট মাস থেকে ছবি তোলা সুরু হল। নতুন উৎসাহ, পরিচালক কেলোর দৌড় ধরা পড়ে যাওয়াতে ক্যামেরাম্যানের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া আর উপায় রইল না। ক্যামেরাম্যানই de facto পরিচালক, তবে কেলো চীৎকার করে start আর cut কথা দুটি ব'লে পরিচালকত্ব জাহির করে।

পরিচালনার নমুনা শুনুন একটা। একটি শটে দুই প্রবীণ অভিনেতা ও অভিনেত্রী আছেন। তাঁরা ও চিত্রজগতে অপূর্ব্ব সুন্দর অভিনয় করে সকলের অভিনন্দিত হয়েছেন। তাঁদের composite শট্ তোলা হল। পরের শটে আছেন শুধু অভিনেতা একটি close up নেওয়া হচ্ছে। অভিনেতা দাঁড়িয়ে, অভিনেত্রীটি close up বলে পাশের চেয়ারে বসে আছেন। শটের মাঝখানে হঠাৎ পরিচালক চীৎকার করে cut বলে উঠে ছুটে এলেন অভিনেত্রীর কাছে—কী কাণ্ড, একটা ভাল expression দিন। অভিনেত্রীর চক্ষু চড়ক গাছ—সে কি মশাই আমি expression দেব কি? এটা যে অমুক বাবুর close up.

পরিচালক তত চটে যাচ্ছেন—close up বলেই তো ভালো expression চাই।

অভিনেত্রীটি বুঝিয়ে বললেন, অমুকবাবুর close up এ যে আমি frame এ থাকতে পারি না।

পরিচালক বুঝলেন—ও তাই নাকি! ওঁর close up এ আপনি নেই। তবে ঠিক আছে, আপনি expression না দিয়ে একটু বসেই থাকুন।

এই ভাবে ছবি চলছে। হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই ক্যামেরার সহকারী কাঁদন ও প্রোডাকসনের সহকারী

মাধাইয়ের মুখের নোটিশে চাকরী খতম্। যাদের চাকরী আছে, তাদের বিড়ম্বনা আরও বেশী। কাজ করে অথচ মাইনে পায় না। মাইনে চাইলে জবাব পায়—নিউ মাস্কেটিয়ার্স কোম্পানীই পাঁচ ছ'মাসের মাইনে দেয় না, আমাদের তো মাত্র দু' এক মাস।

ইতিমধ্যে শেতলা নিজের পয়সা খরচ করে বোম্বে গেল যদি ওখানে চাকরী জোগাড় করতে পারে। আর এখানে সকলে ভরসা দিচ্ছে বোম্বাই থেকে শেতলা অনেক টাকা আনবে। তখন সব মাইনে চুকিয়ে দেওয়া হবে। শেতলা আর আসে না।

অবশেষে শেতলা ফিরলো ২৩শে সেপ্টেম্বর। সকলে মাইনে চাইল—কিন্তু সেদিকে উচ্চবাচ্য নেই। কর্ম্মচারীও ছাড়বে না; তারা জানে ছবির কাজ আর দু'একদিন আছে। কোন রকমে এই দুটো দিন কাটাতে পারলে আর মাইনে দেবেই না। তাই তারা বললো যে মাইনে মিটিয়ে না দিলে শুটিং বন্ধ।

এই কথা শুনেই শেতলা চটিতং। কাজলীর চাকরী খতম্। অন্যসব কর্ম্মচারীও কাজ ছেড়ে বেরিয়ে এল। তাই সকলে ছোটাছুটি করে টাকা এনে এক মাসের মাইনে চুকিয়ে দিয়ে কাজে অগ্রসর হল। কিন্তু কর্ম্মচারীরা আবার নোটিশ দিয়েছে—পুরো মাইনে মিটিয়ে না দিলে আর কাজ করবে না।

তার পরের ইতিহাস জানি না। জানবার বাসনাও নেই। গল্পটি সুরু করেছি বটে কিন্তু ভেবে দেখলাম একেবারে সিনেমার গল্প হয়ে গেছে। সুরু কোনও রকমে করা যায়, কিন্তু কি করে ভাল ভাবে শেষ করা যায় তা বলা কঠিন। যদি কেউ গল্পের শেষ করে দিতে পারেন তো খুশিই হব।

● ●

বিদ্যাসাগর ছবিটির প্রেস শো দেখে ফিরছি, হঠাৎ এম্, পি, প্রোডাক্সনের কর্ম্মকর্ত্তা ছুটে এসে একজন সাংবাদিককে ফিস্ ফিস্ করে জানালেন যে পাহাড়ী সান্যাল নাকি বিদ্যাসাগরের মেক্আপএ খুশি হয়ে মেক্আপম্যানকে একশ' টাকা পুরস্কার দিয়েছেন। ভাবলাম, সংবাদটি যদি সত্য হয় তো পাহাড়ী সান্যাল মেক্আপম্যানের সঙ্গে নিশ্চয়ই রসিকতা করেছেন। কারণ পাহাড়ী সান্যালের অতিবড় ভক্তও (এমন কি পাহাড়ী সান্যাল নিজেও) স্বীকার করবেন যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও পাহাড়ী সান্যালের ছবিতে মিলের দূরত্ব ঠিক বীরসিংহ থেকে লক্ষ্ণৌএর দূরত্বের সামিল। পাহাড়ীদা বোধহয় মেক্আপম্যানকে লক্ষ্ণৌ থেকে বীরসিংহে যাবার ভাড়াটাই দিয়েছিলেন।.........

গল্পের দৈন্য আমাদের কাহিনীকার এবং পরিচালকদের এমন ভাবে গ্রাস করেছে যে অনেকে বাংলা দেশে চিত্রোপযোগী ভাল গল্পের সন্ধান পাচ্ছেন না। বিশ্বাস করুন আর না করুন, আমাদের এক সুপ্রসিদ্ধ কাহিনীকার-পরিচালকও ভাল গল্প লেখার কষ্ট স্বীকার করতে রাজি নন। তাঁর সাম্প্রতিক চিত্রের কাহিনী (যার 'মহরৎ' শীগ্গিরই আশা করা যাচ্ছে) দার্জ্জিলিং-এর land slide কে উপলক্ষ্য করে লেখা হলেও, কাহিনীটি Duel In the Sun থেকে নেওয়া। বিশ্বাস না হলে ছবিটির মুক্তির পর আমার কথা সত্য কিনা মিলিয়ে দেখবেন।

চন্দ্রাবতী বলেন

প্রথম যখন 'চন্দ্রাবতী'-কে দেখেছিলাম পর্দার ওপর, মনে মনে তাঁকে তুলনা ক'রেছিলাম একখানি চক্‌চকে ছুরির সঙ্গে। তখন নিজের বয়স ছিল খুবই অল্প, বোধ হয় যৌবনোন্মেষের প্রথম পর্য্যায়। আর, 'চন্দ্রাবতী'র glamour-ও তখন কানায় কানায়।

একটা কথা এখানে ব'লে রাখি। "মীরাবাঈ" চন্দ্রাবতীর প্রথম ছবি হ'লেও সে-ছবিটা আমার আগে দেখা হয়নি। তাঁকে প্রথম দেখি আমি 'চন্দ্রমুখী'র ভূমিকায় 'দেবদাস' ছবিতে।

যে বয়সে লোকে Hero-worshipper হয়, ঠিক সেই বয়সে Heroine-worshipper হ'লে আশা করি, কেউ আপত্তি ক'রবেন না। আর, সত্যি কথা ব'লতে কি, দেশের অগণিত দর্শকের সঙ্গে আমিও পর্য্যায়ভুক্ত হ'লাম চন্দ্রাবতীর মুগ্ধ ভক্ত দলের। অসম্ভব কিছু নাই। "দেবদাস"-এর মত তখনকার অমন impressive ছবি, তারপর নায়িকার ভূমিকায় যমুনার আড়ষ্ট প্রাণহীন অভিনয়ের contrast-এ চন্দ্রাবতীর সেই expression আমার মত যে কোন নির্ব্বোধ দর্শককেও মুগ্ধ করার পক্ষে যথেষ্ট।

এরপর, পরপর অনেকগুলো ছবি দেখি চন্দ্রাবতীর। তাঁকে মনে হয় একখানি নতুন ছুরির ফলা রোদের আলোয় ঝল্‌মল্ ক'রে উঠেছে।

চন্দ্রাবতীর সঙ্গে আমার প্রথম প্রত্যক্ষ আলাপ হ'ল সেদিন, তাঁর প্রথম ছবি দেখার প্রায় বছর পনেরো পরে। আবারও সেই ছুরির কথা মনে হ'লো। তবে, এবার তেজহীন, হয়ত' বা স্তিমিত। অতি ব্যবহারে চাকচিক্য হয়ত' কমেছে, কিন্তু ধার বেড়েছে অনেক বেশী, আর এমনই এক পুরাতন আভিজাত্যের মর্য্যাদা পেয়েছে, যা' সত্যিই দুর্লভ আর প্রত্যেকেরই কাম্য।

Allegory ছেড়ে এবার সোজা কথায় বলি। তাঁর মধ্যে এমন এক স্থির-শান্ত-সংযত ভাব দেখলাম যা হয়ত' তাঁর ছবিতে থাকলেও আমার কল্পনায় ছিল না। তাঁর "গৃহলক্ষ্মী", "হেরফের" আর এই ধরণেরই কতকগুলো চটুল ছবি দেখে এই সে-দিন পর্য্যন্ত ধারণা ছিল, "দেবদাস-"এর 'চন্দ্রমুখী'র রূপদাত্রীর আসল রূপটিই বোধ হয় এই। কিন্তু ভুল ভাঙ্গল কাছে গিয়ে। দূর থেকে যাকে মনে হ'য়েছিল মূর্ত্তিকাস্তূপ, কাছে গিয়ে দেখলাম, সে অচলায়তন। হিমগিরির গাম্ভীর্য্য নিয়ে মহামহিমায় সে সমাসীন। কথাটা তাঁকে ব'লেও ফেললাম। ব'ললাম, "ওসব চটুল অভিনয়ে আপনাকে মানায় না চন্দ্রাদেবী। কেন নামেন ওসব role এ?"

"ওরা আমায় চায়, তাই।" ব'ললাম, "ওরা মানে ত' প্রোডিউসর বা ডিরেক্টর? কিন্তু তাদের বাইরেও বিরাট জগৎ আছে, সেখানে আপনি সম্রাজ্ঞী। ওদের কথায় আপনার আসল Patronদের ছাড়া উচিত নয়।"

এ কথারও একটা কৈফিয়ৎ অবশ্য দিলেন চন্দ্রাদেবী কিন্তু সেটা খুব জোরদার মনে হ'ল না। বুঝলাম, নায়িকার ভূমিকায় অভিনয়ের ওপর তাঁর খুবই ঝোঁক, তিনি কল্পনাই ক'রতে পারেন না যে, কাঁচা বয়সী মেয়ের ভূমিকায় অভিনয়ের মত বয়স তাঁর আর নেই।

এখান থেকে কথা উঠ্‌ল জনপ্রিয়তার। চন্দ্রাদেবী যে জনপ্রিয়া, এই তথ্য সম্পর্কে তিনি খুবই সজাগ। কারা কোথায় কবে যেন তাঁর অটোগ্রাফের জন্যে ভীষণ ভীড় ক'রেছিল, কোথায় কারা তাঁকে দেখবার জন্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে ছিল, এইসব অনেক অভিজ্ঞতার কাহিনী তিনি ব'ললেন।

সাধারণতঃ যা' হয়। সঙ্গে সঙ্গে কথা উঠ্‌ল

অন্য বহু অভিনেত্রীর জনপ্রিয়তার। শুধু তাই নয়, কোন একজন জাঁদরেল অভিনেত্রীর বাড়ীতে পাড়ার ছেলের দল কেন চড়াও হয়েছিল, কোথায় কাকে ছেলেরা তাড়া ক'রেছিল, কোন অভিনেত্রীকে কি কারণে থানায় যেতে হ'য়েছিল, এ সব আলোচনাও হ'ল আমাদের ভেতর।

চন্দ্রাদেবী ব'ললেন, "আমাকে কিন্তু এমন সব অবস্থায় প'ড়তে হয় নি কোনদিন। চিরদিনই ভদ্র পল্লীতে থাকি। এমন এক সময় গিয়েছে যে, সারা দিন নাচ গান আর তবলায় চাঁটি চ'লেছে কিন্তু কেউ কোনদিন আমাকে একটি কথা পর্য্যন্ত বলে নি। বড় জোর কোন একখানা hit ছবি release করার পর কোন চপল ছেলে আমার জানলার দিকে তাকাতে তাকাতে আমারই বলা কোন dialogue কপচাতে কপচাতে হেঁটে গিয়েছে কিংবা পথের মাঝে দেখা হ'লে আমারই গাওয়া গান গেয়েছে এক কলি। ব্যস্ এই পর্য্যন্ত ; কিন্তু তার বেশী না।"

খানিকক্ষণের আলোচনায় স্পষ্টই বোঝা যায়, চন্দ্রাদেবী frank এবং সুস্পষ্ট। কোন প্রসঙ্গেই তাঁর আড়ষ্টতা নেই। এমন কি, নিজের ব্যক্তিগত জীবনের গোপনতম খবরটি পর্য্যন্ত একটু চেষ্টা ক'রলেই হয়ত বের ক'রে নেওয়া যায়। কিন্তু তাই ব'লে তিনি নির্ব্বোধ নন। তাঁর বুদ্ধি শাণিত, ক্ষুরধার।

যৌন জীবনের অনেক প্রশ্ন হয়ত স্পষ্ট ক'রে বলা যায় না কিন্তু যে কথা ব'লতেই হবে, সে সম্পর্কে চন্দ্রাদেবী পরিষ্কার। প্রশ্নকারী হয়ত কিছুটা ইতস্ততঃ করেন, কিন্তু চন্দ্রাদেবীর সে জড়তা নেই। বহু তাঁর পড়াশুনা, ইংরাজী ও বাঙ্গলা সাহিত্যেরও অনেক খবর তিনি রাখেন। যেখানে কোন কথা একটু ঘুরিয়ে ব'লতে হয়, চন্দ্রাদেবী সেখানে আশ্রয় নেন বিশ্বসাহিত্যের অন্তরালে, তিনি উপমা দিয়ে কথা বলেন।

কিন্তু ষ্টুডিও লাইনের দুর্নীতি সম্পর্কে তাঁর অভিমত সুস্পষ্ট। তিনি বলেন, "এটা খুবই স্বাভাবিক। একটা সুন্দর ছেলে একটা সুন্দরী মেয়ের হাতে হাত রেখে শরীরের কাছে শরীর নিয়ে এত প্রেমের রিহার্স্যাল দেবে আর এই পরিবেশে, রিহার্স্যাল আর অভিনয়ের উচ্চারণ করা কথাগুলো যদি কেউ মুহূর্ত্তের জন্যেও বাস্তব জ্ঞান করে, তবে খুব দোষ দেওয়া যায় কি ?"

কথাটা সুস্পষ্ট এবং রসালো। সুতরাং, ফেনায়িত করার ইচ্ছা হ'ল মনে। ব'ললাম, "কিন্তু ক্ষণিকের হৃদয়বৃত্তির কথা ত' এ নয়। আসল প্রশ্ন হ'ল লাইনের দুর্নীতি।"

ভাবলাম চন্দ্রাদেবীকে এবার বুঝি খুব অসুবিধেয় ফেললাম। কিন্তু না। তাঁর উত্তর হ'ল আরও চমকপ্রদ, যাকে হয়ত বলা যেতে পা'রে, মর্ম্মান্তিক স্বীকৃতি। তিনি ব'ললেন, "এটাও খুবই স্বাভাবিক, এতে অন্যায়ও কিছু নেই। আর একটা কথা—এই ধরুণ আপনারা। সিনেমার মেয়েদের যত সহজলভ্য মনে করেন, আর কোন মেয়ের সম্পর্কে কি সেরকম কোন ধারণাও মনে আনতে পারেন ? আর শুধু এই নেশাতেই বহু নতুন নতুন প্রযোজক পতঙ্গের মত ঝাঁপিয়ে প'ড়ছেন এই লাইনে। অবশ্য, পাখাও তাঁদের পুড়ছে কিন্তু তবু অগ্নিসাধনার অন্ত নেই।"

কথাটা এমনই direct যে নিজেই চাপা দিতে চাইলাম তাড়াতাড়ি। প্রসঙ্গ ঘোরাবার চেষ্টায় বললাম, "কিন্তু ভদ্র-ঘরের যেসব মেয়ে এই লাইনে আসতে চান, এই রকম আবহাওয়া যে তাঁদের শিল্পসাধনার পথে মোটেই অনুকূল নয়। আশা করি আপনি সে কথা স্বীকার করবেন।"

চন্দ্রাদেবী বললেন, "এ পর্য্যন্ত যত মেয়ে এসেছেন সিনেমায় তাঁদের ভেতর কে যে তেমন catholic moral code মেনে চলার প্রতিজ্ঞা নিয়ে এসেছেন তা আমার জানা নেই। তাঁদের সবাই এসেছেন, glamour-এর আকর্ষণে আর এমন এক চড়া মাদক রসের আকর্ষণে যা তাঁদের আটপৌরে ঘরোয়া পরিবেশে কিম্বা কড়া সমাজ ব্যবস্থায় একান্ত অভাব ছিল।"

অবাক হয়ে গেলাম চন্দ্রাবতীর অপূর্ব্ব বিশ্লেষণ-শক্তি দেখে। তিনি যে সমুদয় সমস্যাটি এমন গভীরভাবে ভেবে দেখেছেন, সে ধারণা আমার ছিল না। আমি তর্কের

খেই হারিয়ে ফেললাম। এলোপাথাড়ি নানা রকম তর্ক তুলতে লাগলাম। এমন সব নামকরা নবাগতা চিত্র তারকাদের নাম করতে লাগলাম যাঁদের সম্বন্ধে আমার প্রায় কিছুই জানা ছিলনা।

দেখলাম, চন্দ্রাবতী সত্যিই আশ্চর্য্য। দেখলাম যেসব শিল্পী নতুন এসেছেন বা আসছেন সিনেমায় তাঁদের সম্পর্কে তাঁর কি অপরিসীম আগ্রহ। তিনি ব্যক্তিগতভাবে কি অপরিসীম দরদ নিয়ে পরিচয় করেছেন তাঁদের সঙ্গে, কি আগ্রহ নিয়ে তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনেছেন তাঁদের সকলের ঘরের কথা, তাঁদের মনের কথা।

এখানেও আমার হার হলো। বুঝলাম, যেসব সমস্যার কথা আমরা ভেবেছি, আর সেই সম্পর্কে উপনীত হয়েছি amaturish সিদ্ধান্তে তা' কত অসার। চলচ্চিত্রশিল্প সম্পর্কে আমরা পোষণ করেছি তৃতীয় পক্ষের দরদ আর চন্দ্রাবতী নিজে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত থেকে, অবিমিশ্র শিল্পপ্রাণ নিয়ে দেখেছেন সমস্যার অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত। তাই, তাঁর অনেক অভিমত আমাদের কানে বেখাপ্পা শোনালেও তাঁর কথাগুলো যে কত সত্য এবং এই সত্যের ভিত্তি যে কত গভীর তা একমাত্র চিত্রমহলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরাই বুঝতে পারবেন। বাইরের আর কারও পক্ষে তা বোঝা সম্ভবপর নয়।

যেসব ভদ্রঘরের মেয়ে চিত্রলোকে আসতে চাইছেন, তাঁদের কর্ত্তব্য সম্পর্কে চন্দ্রাবতীর মত জানতে চাইলাম। চন্দ্রাবতী বললেন, "সিনেমার জীবন যেমন মোহময়, ঘরের জীবন তেমনি মধুময়। সিনেমা জীবনে তৃষ্ণা আছে কিন্তু তৃপ্তি নেই, আর ঘরের জীবনে জ্বালা নেই আছে দীপ্তি! সিনেমায় যদি কেউ আসতে চান, তবে তাঁকে ঘর ছেড়ে আসতে হবে। দু'দিকই রাখব—এ নীতি অচল, চলতে পারেনা।

শেষের কথাগুলো তিনি এমনই জোর দিয়ে বললেন যে, হারবো জেনেও প্রতিবাদ ক'রতে হ'লো। ব'ললাম— "কেন, অন্যদেশে কি তা হচ্ছে না?"

চন্দ্রাদেবী আবার জোর দিয়ে বললেন,—"না। বিদেশ আমিও ঘুরেছি, সেখানেও দেখেছি, চিত্রশিল্পীদের জীবন কত অশান্ত যে-সব তারকাদের পারিবারিক সুখ শান্তির গল্প আপনারা পড়েন নানা পত্র পত্রিকায়, জানবেন হয় তাঁদের শিল্পী-জীবন শেষ হয়ে গিয়েছে আর না হয় এ সবই বানানো গল্প।"

ভয় দেখাবার জন্যে বললাম "যদি বলি, এইভাবে আপনি চিত্রজগতে দুর্নীতিরই প্রশ্রয় দিচ্ছেন আর যদি বলি, এইভাবে আপনি নবাগতা বা যাঁরা আসতে চান, তাঁদের নিরুৎসাহিত ক'রছেন?"

চন্দ্রাদেবী ভয় পেলেন না। দৃপ্ত তেজে ব'ললেন, "আমি চাই আপনারা আমার কথা প্রচার করুন যতখুশী। সত্য শিব সুন্দরের পূজারী আমি। যদি আমার মত জিজ্ঞাসা করেন সত্যি কথাই ব'লব আমি। তাতে যে ভাষ্য ইচ্ছে, আপনারা করতে পারেন। তবে একটা কথা ঠিক যে, যা গ্রহণ করবেন তার ভালো মন্দ দু'টোকেই গ্রহণ করতে হবে। কাঁটা বাদ দিয়ে যিনি গোলাপকে কল্পনা করবেন, আমি ব'লব তাঁকে মূর্খ।

ঝলমল ক'রে উঠলেন চন্দ্রাবতী। আবার মনে হ'ল রোদের আলোয় ঝকঝকিয়ে উঠল শাণিত ছুরি। অতি ব্যবহারে ধার হয়ত কমেছে কিন্তু ভার বেড়েছে অনেক বেশী।

বাঁচবার উপায়

সুধীরেন্দ্র সান্যাল

আমার কর্মজীবনের প্রায় পঁচিশটি বছর কেটে গেল, পাবলিশিটির 'শিটি' বাজিয়ে। এখনও 'শিটি' হাতেই কর্মক্ষয় করে চলেছি। পঞ্চাশ উত্তীর্ণ হবার পর আজো যদি 'শিটি' বাজিয়ে আত্মপরিচয় দিতে হয়, তবে সেটা আমার পক্ষেও হবে পরম লজ্জার কথা।

অপরকে জাহির করবার জন্যে জীবনে অনেক রকম বাজনাই বাজিয়ে গেলাম। তালপাতার ভেঁপু থেকে, কাঁসর-কর্তাল ও জয়ঢাক পর্যন্ত। এখন বাকী আছে শিঙে। সেটা একবার ফুঁকে উঠতে পারলেই আপনাদের সঙ্গে দেনাপাওনা শোধ হয়!

বয়স হয়েছে। পিতৃপুণ্যে কিছু লেখাপড়াও শিখেছিলাম এবং নিজেকে প্রডাকটিভ্ কোরে তুলতে কিছু সাধনাও কোরেছিলাম। ফলে, যেটুকু অভিজ্ঞতার দাবী করি, আমার পাঠক-পাঠিকাদের কাছে তার দাম কতটুকু?

আমি যে শিল্পে হাত পাকিয়েছি বলে অনেকে মনে করেন, ব্যক্তিগত ভাবে সে যোগ্যতা সম্বন্ধে আমার কোন দম্ভ নেই। তাই পণ্ডিত সাজবার ভান বা অপচেষ্টা জীবনে কখনও করিনি। আমি সৌন্দর্যের উপাসক, অতি মাত্রায় কাব্য-বিলাসী এবং প্রতিভার পূজারী। তাই আর্টের স্রষ্টা, সার্থক কবি, সাহিত্যিক ও প্রতিভাধরদের আমি মনে-প্রাণে পূজা করি। তাঁদের উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

'চান্স' জীবনে একবারের বেশী কদাচিৎ আসে। উন্নতির মূলে যেমন উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকা চাই, তেমনি পথ খোলা পাবার জন্যে চান্স-এর প্রয়োজন। আমার বিশ্বাস, পূর্ব জন্মের সুকৃতি এবং ভগবৎকৃপা না পেলে, জীবনে এই মহাসুযোগ কদাচ আসে না।

তাই, নবব্রতী, নতুন কর্মীদের বলতে চাই: পথ খোলা যাঁরা পেয়েছেন, তাঁরা যেন ধৈর্য না হারান। জীবনের Steeple-chase-এ অনেক বেড়া ও পগার ডিঙিয়ে যেতে হয়। এই racing instinct যাঁর মধ্যে নেই তিনি 'চান্স' পেলেও তা হারাতে বাধ্য।

নতুন কর্মীদের মধ্যে হামেশাই দেখতে পাই—ধৈর্য, concentration এবং আত্মবিশ্বাসের অভাব। তরুণদের এই restlessness আমাকে বড় পীড়িত করে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ, পরীক্ষায় পাশের জন্যে। জীবনকে সফল কোরে তোলবার জন্যে যে পাঠ, তার সুরু ছাত্র জীবনের শেষ পরীক্ষার পর থেকেই। আমি অতি ছোট বয়স থেকেই 'বুক-ওয়ার্ম'। কেতাবের সাগরে ডুব দেবার যে কী আনন্দ তা' আমার মত ভুক্তভোগীরাই উপলব্ধি করতে পারবেন।

বহু মানবের জীবনী পড়ে এটা বুঝতে পেরেছি যে, কর্ম হচ্ছে সত্যিকারের life force! কর্মহীন জীবন জড় পুত্তলীকার মতন। বুদ্ধিজীবি মানবের কাছে সে জীবন দুর্বহ বলে মনে হ'তে বাধ্য। বহু কর্মীর, বহু

বিচিত্র কর্মময় জীবনের কাহিনী আমাদের নিজ নিজ জীবন ধারাকে জাগ্রত ও সক্রিয় কোরে তুলতে সাহায্য করে। "Ease and Luxure have killed more people, than bullets on battle-fields !" এই পরম সত্যটি একটি বিখ্যাত কর্মবীরের উক্তি।

ফিল্ম শিল্পের মত যাঁরা applied art-এর সাধক, তাঁদের নিষ্ঠার সঙ্গে নিয়মিত পড়াশুনা করা দরকার। না-পড়িয়া-পণ্ডিত হবার যুগ অনেক কাল গত হয়েছে। এখন দেখা দিয়েছে তীব্র প্রতিযোগিতা। শিল্পের প্রসার, অগ্রগতি ও উন্নতির মূলে Healthy Competition যেমন অবশ্যম্ভাবী তেমনি অনস্বীকার্য।

আজ হাঁটি-হাঁটি-পা-পা কোরে আমাদের industry অনেক দূর এগিয়ে গেছে। যৌবনের প্রারম্ভে এসে সে চায় সহজ ভাবে তার পূর্ণ শক্তির বিকাশ। এখন তার মটো হচ্ছে: Survival of the fittest ! অনেকে দুঃখ করেন আমরা অপর প্রদেশের কাছে প্রতিযোগিতায় হেরে যাচ্ছি বলে। এই হার স্বীকারের মূল কারণ অনুসন্ধান করলে সত্যকে আবিষ্কার করা যায়। আর্টের productivity-র ক্ষেত্রে মিথ্যা দম্ভ বা আস্ফালনের কোন দাম নেই। শিল্পগত মূল্যবিচারে প্রাদেশিকতা বা সাম্প্রদায়িকতার কোন প্রশ্নই ওঠে না। প্রতিযোগিতায় আমাদের যারা ঠুকে বসিয়ে দিচ্ছেন, তাঁদের প্রাপ্য জয়মাল্য থেকে বঞ্চিত করে কে। এই সাফল্যের মূলে আছে survival of the fittest।

আমাদের বুদ্ধিতে মর্চে ধরে গেছে, সৃজনী-শক্তি স্তিমিত হয়ে আসছে—এটা কি সত্যই বিশ্বাস যোগ্য ? যদি তাই হবে, তা হ'লে বাঙলার বাহিরে, বাঙালী পরিচালক, টেকনিশয়ান, শিল্পী এবং সুরস্রষ্টাদের এত চাহিদা ও সমাদর কেন ?

মোটকথা, আমাদের মধ্যে যা সত্যিকারের অভাব, তা হচ্ছে একতার অভাব। সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে কাজ করবার উপযোগী টিমওয়ার্কের অভাব। পরিশ্রম-কাতরতা, ঈর্ষাপরায়ণতা ও নিয়ম শৃঙ্খলার প্রতি অবজ্ঞা—এসব তো আছেই।

Organisation-এর ভিৎ আলগা হয়ে গেলে, তার বোল্‌ট নাট্‌ ঢিলে হয়ে গেলে যে শোচনীয় অবস্থা ঘটে দুঃখের বিষয় বাঙলাদেশ আজ সেই অবস্থার সম্মুখীন।

প্রতিকারের হাত নিজেদের হাতেই এবং আমাদের শিল্পপতিরা সমবেত ভাবে যদি এই অবস্থার প্রতিকারকল্পে সজাগ না হ'ন—শীঘ্রই তাঁদের পাত্তাড়ী গুটোতে হ'বে।

সারা বছরে একখানি মাত্র 'কঙ্কাল' বা 'বিদ্যাসাগর' তুলে বাঙলার ফিল্ম শিল্পকে আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচানো যাবে না। শতকরা ৯৫ খানা ছবি কাদের অপরাধে অকালে মৃত্যু বরণ কোরছে ?

ভারত বিভাগের ফলে বাঙলা ছবির বিস্তারের ক্ষেত্র আজ সীমাবদ্ধ। বাঙলার যেসব ছবিঘরে ইতিপূর্বে কেবল বাঙলা ছবিই দেখানো হোত—আজ সেখানে দেখছি অধিকাংশই হিন্দী ছবি। এইসব ছবিঘরকে feed করবার উপযোগী যথেষ্ট পরিমাণে বাঙলা ছবির হয়ত অভাব নেই—কিন্তু প্রতিযোগিতায় দাঁড়াবার উপযোগী ছবি ক'খানি ?

ছবির মত ছবি আমাদের দিতে হ'বে। তার জন্যে গল্প নির্বাচন কোরতে হবে বিশেষ যত্ন ও যোগ্যতার সংগে। অক্ষম অপটু লেখকের মামুলী বস্তুহীন কাহিনী দিয়ে ন'য়।

তারপর ছবির পরিচালনা থেকে তার গঠন ব্যাপারে বিভিন্ন বিভাগের কাজগুলি সুচারুরূপে নির্বাহ করবার জন্যে যথাযোগ্য কর্মীদের নিয়োগ করতে হ'বে। হিন্দী ছবির তুলনায় বাঙলা ছবিতে এন্‌টারটেইন্‌মেণ্ট-এর অভাব থেকে যাচ্ছে। সে অভাব পূরণের দিকেও নজর দিতে হ'বে।

অব্যবসায়ী এবং অর্বাচীনদের হাতে সেলুলয়েড নিয়ে এক্সপেরিমেণ্ট ইতিপূর্বেও হয়েছে; গত মহাসমরের পর থেকে তার সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। এই ধরণের এক্সপেরিমেণ্ট বন্ধ করা দরকার। সংবাদ পত্রের সাহায্যে এই ব্যবস্থার অনুকূলে যথেষ্ট জনমত গঠন কোরতে পারলে খানিকটা প্রতিকার হতে পারে বলে আমার মনে হয়।

ছবির চাহিদা বাড়িয়ে তাকে বাজারে চালু রাখবার জন্যে যে প্রচারের প্রয়োজন তার জন্যে উপযুক্ত অর্থব্যয় কোরতে অনেক প্রডিউসারকেই উদাসীন দেখা যায়, অথচ

যেসব ব্যাপাবে ব্যয়সঙ্কোচ সহজসাধ্য সে সম্বন্ধে অনেকেই থাকেন অচেতন।

নিতান্ত বস্তুহীন অসার ছবি ছাড়া, সুপ্রচারের সাহায্যে যে কোন প্রডাকসানের চাহিদা ও জনপ্রিয়তা যথেষ্ট পরিমাণে বাড়ানো যায়। হিন্দী ছবির প্রয়োগকর্তারা এই তথ্যটির হদিস পেয়েছেন। বাঙলা ছবির সুপ্রচারের জন্যে যাঁরা অর্থব্যয়ে কার্পণ্য করেন না—তাঁবাও প্রচাবেব প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা সম্বন্ধে ভাল ধাবণাই পোষণ কবেন।

প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকাকে উপেক্ষা কোরে প্রচারকার্যকে সফল কোবে তোলা যায় না। সমবেতভাবে এঁদেব সহযোগিতার ওপবেই প্রচারের সাফল্য নির্ভর কবে। গত ৩৫।৩৬ বছর ধবে এই শিল্পকে স্থিতিশীল ও সুদৃঢ় কোরে তুলতে ভারতীয় সংবাদ পত্র ও সাময়িক পত্রাদিব দান অমূল্য।

আজ যেমন সাহিত্যিক ও কথাশিল্পীদের বর্জন কোরে ছবির উপযোগী ভাল গল্প পাওয়া দুঃসাধ্য ব্যাপার, তেমনি সাময়িক পত্রিকা বর্জন কোরেও ছবির প্রচার মাহাত্ম্যকে অক্ষুণ্ণ রাখা দুঃসাধ্য।

বাঙলাদেশের শিল্পপতিদেব আজ তাই বিশেষ ভাবে বলতে চাই—ছবির প্রচাব সম্বন্ধে তাঁরা অবহিত হোন। চিত্রগঠনের প্রতিস্তবে যেমন যত্ন, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা এবং যোগ্যতার পরিচয় চাই, তেমনি চাই ছবির Salesmanship সম্বন্ধে। ব্যয় সঙ্কোচ করা দরকার অবশ্যই। আজকের দিনে প্রাদেশিক ছবির production cost না কমাতে পারলে জীবনযুদ্ধে বেঁচে থাকা অসম্ভব। কিন্তু সব খবচা অবশ্যম্ভাবী, তা যাতে অপব্যয়ে পরিণত না হয় সেদিকেও কর্মকর্তাদের প্রখর দৃষ্টি থাকা চাই।

আমার এ্যালবাম থেকে

নার্গিস

আমার কাছ থেকে কিছু শুনতে চেয়েছেন 'চিত্রবাণী'র পাঠকরা। এ আমার পরম সৌভাগ্য, এর জন্যে তাঁদের অসংখ্য ধন্যবাদ। তবে দেখুন, আমার মতে মানুষের জীবনী জিনিষটা নেহাৎই নীরস, তার কাহিনীটা আবার তেমনি উপাদেয়! প্রথমটায় পাই ধারাবাহিকতার কটুতা আর দ্বিতীয়টায় আছে এলোমেলোমীর মিষ্টতা। বাঁধাধরা ছাঁচের মধ্যে আর যাই থাক আর্ট থাকে না, অগোছালোর ভেতরে যে গোছানোর রূপটি তাতে সৌন্দর্যের স্বাদ পাওয়া যায়।

তাহোলে আমার কাহিনী বলি, কি বলুন? কিন্তু কোথাথেকে সুরু ক'রবো? বর্তমান? না অতীত থেকে? না, না, বর্তমানের কিছু নয়। বর্তমান ভারী বিশ্রী লাগে আমার! অথচ আজকের দিনটি যখন পিছ্‌লে কালকে চ'লে যায় তখন তা হাজার তুচ্ছ কিম্বা বিবর্ণ হোলেও স্মৃতির কোঠায় গিয়ে মধুর ও রঙীণ হ'য়ে ওঠে। বর্তমানকে আমার ভালো লাগে অতীতের এ্যালবামে বেঁধে উপভোগ ক'রতে। আমার সেই মনের এ্যালবাম থেকে আপনাদের কাছে কয়েকটা টুক্‌রো টুক্‌রো ছবি সাজিয়ে দিচ্ছি...

একুশ বছর আগেকার সেই রশিদ ফতিমা বেগম যে আজ আপনাদের প্রিয় নার্গিস হ'য়ে উঠ্‌তে পেরেছে তা' শুধু আমার মার জন্যে। মার নাম আপনারা শুনেছেন নিশ্চয়ই? কোলকাতার প্রসিদ্ধা নৃত্যশিল্পী জদ্দনবাঈ।

মনে মনে অভিনেত্রীদের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করলেও নিজে যে একদিন অভিনেত্রী হব এমন কোন বাসনা আমার ছিল না। ছেলেবেলায় ছবি দেখেছি প্রচুর। তবে সে প্রাচুর্যেরও একটা সীমা ছিল। আর সে সীমা নির্দেশ ক'রে দিয়েছিলেন আমার মা। মার হুকুমে মাসিক একটা নির্দিষ্ট সংখ্যা ছিল ছবি দেখার। অত বাঁধাবাঁধির মধ্যে ও কিন্তু কারও ছবি আমি বাদ দিইনি। সেদিন সবচেয়ে আমার মনে রেখাপাত করেছিলেন—গ্রেটা গার্বো, জন ব্যারীমুর, অশোককুমার আর মতিলাল। আজও এঁদের প্রতি আমার অসীম শ্রদ্ধা। তবুও সেদিন একবারও ভাবিনি যে একদিন এঁদেরই অনুগমন ক'রবো, এঁদের প্রদর্শিত পথেই আমার যাত্রা হবে সুরু।

সুরুটা নেহাৎই ছেলেমানুষীর মধ্যে। ঠেকা দিতে এসে ওস্তাদ তবলচির নাম কিনে ফেরা—অনেকটা সেই গোছের। আত্মীয়স্বজনের কথা দূরে থাক আমিও কোন দিন টের পাইনি যে আমার মধ্যে একটা অভিনেত্রী ঘুমিয়ে ছিল। স্রেফ্‌ ঠেকা দিতে এসে ঠোক্কর খেয়ে সে ব্যাচারীর ঘুমটা গেল ভেঙে। বয়েস তখন আমার পাঁচ বছর। মা একখানা ছবি তুলছিলেন 'তালাস্‌-ই-হক' (সত্যের সন্ধান) নামে। তাতে একটি ছোট্ট মেয়ের চরিত্র ছিল। কিন্তু ছোট্ট মেয়ে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। যাওবা পাওয়া যায়, দরে পোষায় না। মা তখন বিরক্ত হ'য়ে বসেন,—দাও ফতিমাকে নামিয়ে, ঘরের পয়সা ঘরেই থাকবে। ব্যস্‌ আমিও অম্‌নি বিনুনী দুলিয়ে নাচ্‌তে নাচ্‌তে নেমে গেলাম। ছবি দেখে সবাই রায় দিলেন,—এ মেয়ের মধ্যে প্রতিভা আছে।

আছে কি না আছে তা' আর পরখ করে দেখিনি। তখনকার মত তাকে আবার ঘুম পাড়িয়ে বই খাতা নিয়ে ছুটলাম বোম্বের স্কুলে। কুইন মেরী হাই স্কুলে সুরাইয়া ছিল আমার সহপাঠী। একদিন স্কুলের কয়েকজন বন্ধু মিলে ঠিক ক'রলাম ম্যালাডে বোম্বে টকিজের ষ্টুডিওতে যাবো অশোককুমারকে দেখতে। ছবিতে তাঁকে দেখেছি কিন্তু কাছে থেকে সশরীরে দেখার ভারী একটা কৌতূহল ছিল। যাইহোক কোনরকমে মাষ্টারমশায়দের শ্যেন দৃষ্টি আর শাণিত শাসন এড়িয়ে একদিন ষ্টুডিওতে গিয়ে হাজির হোলাম বটে কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাদ সাধলো দরোয়ানজী। গেটের সামনে ভোজপুরী দরোয়ানের বপুখানি দেখে ভয়ে আমাদের প্রাণ শুকিয়ে গেল। তবুও চোখকান

বুকে ইচ্ছেটা প্রকাশ করে ফেললাম। কিন্তু দরোয়ানজী বিল্‌কুল পাথরের মত অটল। 'নো এ্যাডমিশন' জানিয়ে গেট আগলে দাঁড়িয়ে রইলো। বরাৎটা সেদিন নেহাৎই ভালো ছিল তাই স্বয়ং অশোককুমারের নজরে পড়ে গেলাম। তিনি তাঁর ক্ষুদে স্তাবকদের দেখতে পেয়ে ছুটে এলেন। আদর করে আমাদের ভেতরে নিয়ে গিয়ে সরবৎ খাওয়ালেন, স্যুটিঙ্‌ দেখালেন তখন 'বন্ধন'-এর স্যুটিঙ্‌ হোচ্ছিল। আমরা সবাই মিলিয়ে দেখলাম—আমাদের কল্পনার অশোক কুমারের সঙ্গে এ অশোককুমার অবিকল মিলে গেল। অমন সুদর্শন, ভালোমানুষ অভিনেতা আর হয় না।...

হ্যাঁ, যা বলছিলাম: স্কুলের পড়া আর এক্‌জামীনের গুঁতোয় আমার ভেতরের সেই শিল্পীটি নিরুপায় হয়ে এত-দিন শুধু নাক ডাকাচ্ছিল। তার ঘুম ভাঙ্গলো দশটি বছর পরে—অনেকটা 'রিপ্‌-ভ্যান-উইঙ্ক্‌ল্‌'-এর মত আর কি। তবে এবারে যেই ভাঙ্গা ওম্‌নি আমায় হিড়্‌ হিড়্‌ করে টানতে টানতে নিয়ে চল্‌লো ছায়াপথ ধরে। ব্যস্‌ সুরু হোল আমার চিত্রজীবন। সেটা উনিশ্‌শো চুয়াল্লিশের কথা।

আর সব অভিনেতা অভিনেত্রীর মত ছবিতে ঢুকতে আমায় বেগ পেতে হয়নি। হাতেখড়ি আগেই দেওয়া ছিল, শুধু বাকি ছিল পুরোপুরী যোগ দেওয়া। পড়া শেষ করে এসে লেগে প'ড়লাম আমার মার প্রতিষ্ঠানে,—নার্গিস আর্ট কনসার্নে। আমার প্রথম ছবি হোল 'তক্‌দীর', —মেহ্‌বুবের পরি-চালনায়। একেতো প্রথম ছবি তার ওপর নামতে হোল কিনা মতিলালের মত একজন নিপুণ অভিজ্ঞ শিল্পীর সঙ্গে। অতএব ভয়ের পরিমাণটা অনুমান ক'রতে নিশ্চয়ই আপনাদের বেগ পেতে হোচ্ছে না? তবে নসিবটা তখন উঠ্‌তি পথে তাই কোনরকমে উৎরে গেলাম।

আর তারপর থেকে আজ অবধি একটার পর একটা ছবি পেরিয়ে মোট পঁয়ত্রিশটায় এসে দাঁড়িয়েছি। তবে সবচেয়ে আনন্দ হয় যেদিন অশোককুমারকে পাই আমার নায়ক হিসেবে। অশোককুমার আমায় দেখেই চিনতে পারলেন আমিও খুশি হয়ে উঠ্‌লাম সাত বছর আগেকার সেই অবি-স্মরণীয় ঘটনাটা স্মরণ করে। তাঁর সেই সরবৎ খাওয়ানো আর আমার ছেঁড়াখোঁড়া অটোগ্রাফের খাতায় সই করার কথাটা আজও ভুলিনি.........

অনেক কিছুই ভুলিনি। জীবনের এমনি অজস্র ছোট-খাটো ঘটনাকে বাঁধিয়ে রেখেছি স্মৃতির এ্যালবামে। রেখেছি আমার অবকাশের মুহূর্তগুলিকে রঙীণ করে তোলবার জন্যে। যোলো ঘণ্টা ষ্টুডিওর কাজ ক'রে ভোরে যখন বাড়ী ফিরি, ক্লান্তি নেমে আসে সারা দেহে। কোনদিন ঘুম আসে, কোনদিন বা আসে না। যে দিন আসে না সেদিন খুলে বসি এ্যালবাম্‌খানা, না হয় রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলী'।

কোন্ ষ্টুডিয়োতে কোন্ ছবি তোলা হচ্ছে

ছবির নাম	প্রযোজক	পরিচালক	প্রথম স্যুটিং আরম্ভ
	অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন		
প্রহ্লাদ	নিজস্ব	ফণী বর্ম্মা	জুন, ১৯৫০
ফণী মনসা	থ্রি আর্ট প্রোডাকশান্স	—	জুন, ১৯৫০
	বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ষ্টুডিয়ো		
স্বপ্নজাল	এ-কে-ডি প্রোডাকশান্স	অমর দত্ত	সেপ্টেম্বর, ১৯৫০
অপরাজিতা	নিজস্ব	—	—
চীনের পুতুল	ঐ	—	—
অনামী	ঐ	—	—
	ক্যালকাটা মুভিটোন লিমিটেড		
জিঘাংসা	চয়নিকা চিত্রমন্দির	অজয় কর	আগষ্ট, ১৯৫০
সহসা	ন্যাশন্যাল ফিল্মস্ লিমিটেড	সৌম্যেন মুখার্জ্জী	মে, ১৯৫০
বরযাত্রী	ন্যাশন্যাল প্রোগ্রেসিভ পিকচার্স	সত্যেন বসু	মে, ১৯৫০
ছবির মতো	রূপ-ও-বাণী	—	জুলাই, ১৯৫০
	ইষ্টার্ণ টকিজ লিমিটেড		
মহীয়সী	নিজস্ব	সুরেন সরকার	সেপ্টেম্বর, ১৯৫০
আন্তর্জ্জাতিক	ভারতী আইডিয়াল পিকচার্স	ফণী গাঙ্গুলী	নভেম্বর, ১৯৪৯
ভৈরব মন্ত্র	বসুমিত্র	মণি ঘোষ	জুলাই, ১৯৫০
চক্রান্ত	চক্রান্ত প্রোডাকশান্স	বি, চৌধুরী	আগষ্ট, ১৯৫০
	ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিয়ো		
নিয়তি	ইণ্ডিয়া ইউনাইটেড পিকচার্স	নরেশ মিত্র	সেপ্টেম্বর, ১৯৫০
সেতু	ভ্যানগার্ড প্রোডাকশান্স	প্রেমেন্দ্র মিত্র	এপ্রিল, ১৯৫০
নাগপাশ	ঐ	কালী সাহা	মে, ১৯৫০
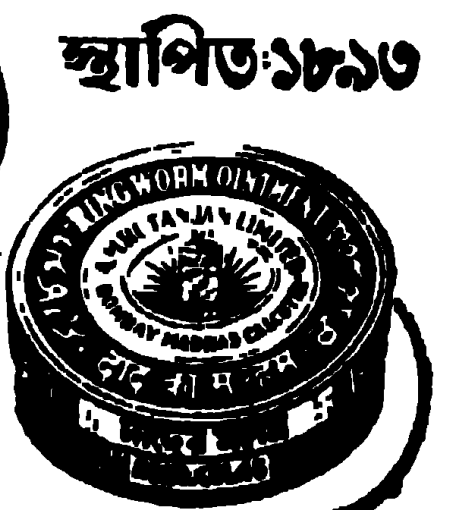
ছবির নাম	প্রযোজক	পরিচালক	প্রথম স্যুটিং আরম্ভ
নতুন পাঠশালা	আজাদ হিন্দ পিকচার্স	বীরেন দাস	—
অনুতাপ	নিউ অজন্তা পিকচার্স	এস্, চক্রবর্ত্তী	জুলাই, ১৯৫০
দুর্গেশনন্দিনী	রূপায়ণ থিয়েটার্স	অমর মল্লিক	জুলাই, ১৯৫০
ভক্ত রঘুনাথ	ভারতী চিত্রপীঠ	দেবনারায়ণ গুপ্ত	—
পলাতকা	প্রতিমা পিকচার্স	কে, বটব্যাল	—
প্রতীক্ষা	এইচ, পি, পিকচার্স	বি, কে, দালাল	জুলাই, ১৯৫০
আনন্দমঠ	নিও গ্রীণ প্রেজ	সতীশ দাসগুপ্ত	এপ্রিল, ১৯৫০

ইন্দ্রলোক ষ্টুডিয়ো

ছবির নাম	প্রযোজক	পরিচালক	প্রথম স্যুটিং আরম্ভ
মানুষ	আর, সি, এস্, বি, পিকচার্স	—	—
মুখোস	সাবা ফিল্মস্	পঞ্চভূত	এপ্রিল, ১৯৫০
অধিনায়ক	ইয়ং বেঙ্গল ফিল্ম প্রোডিউসার্স	—	—
অপরাধ	ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফিল্ম কর্পোঃ	—	—

কালী ফিল্মস্ ষ্টুডিয়ো

ছবির নাম	প্রযোজক	পরিচালক	প্রথম স্যুটিং আরম্ভ
সুরের সমাধি	—	কুমার সরকার	আগষ্ট, ১৯৫০
বাস্তব	পোদ্দার পিকচার্স	ফণী গাঙ্গুলী	—

ন্যাশন্যাল সাউণ্ড ষ্টুডিয়ো

ছবির নাম	প্রযোজক	পরিচালক	প্রথম স্যুটিং আরম্ভ
কবি কঙ্কা	এম্ পি প্রোডাকশান্স	সুধীশ ঘটক	আগষ্ট, ১৯৫০
সহোদব	এস্, দাস প্রোডাকশান্স	—	—

নিউ থিয়েটার্স লিমিটেড

ছবির নাম	প্রযোজক	পরিচালক	প্রথম স্যুটিং আরম্ভ
পরিত্রাণ	নিজস্ব	ভোলা মিত্র	জুন, ১৯৫০
স্পর্শমণি	নিউ থিয়েটার্স (ইষ্টার্ণ) ডিষ্ট্রিবিউটার্স	সুধীন মজুমদার	জুন, ১৯৫০
মহাপ্রস্থানের পথে	নিজস্ব	কার্ত্তিক চট্টোপাধ্যায়	জুন, ১৯৫০

রাধা ফিল্মস্ লিমিটেড

ছবির নাম	প্রযোজক	পরিচালক	প্রথম স্যুটিং আরম্ভ
রত্নদীপ	চিত্রমায়া	দেবকী বসু	জুন, ১৯৫০

রূপশ্রী লিমিটেড

ছবির নাম	প্রযোজক	পরিচালক	প্রথম স্যুটিং আরম্ভ
সবুজ খাতা	ন্যাশন্যাল ইণ্ডিয়ান ফিল্মস্	অর্দ্ধেন্দু মুখার্জ্জি	সেপ্টেম্বর, ১৯৫০
হানাবাড়ী	এ, এল্, প্রোডাকশান্স	প্রেমেন্দ্র মিত্র	ঐ
বেদেনী	লিও ফিল্মস্	নির্ম্মল দে	ঐ
রাহু	—	অর্দ্ধেন্দু মুখার্জ্জি	ঐ

(ওপরে)
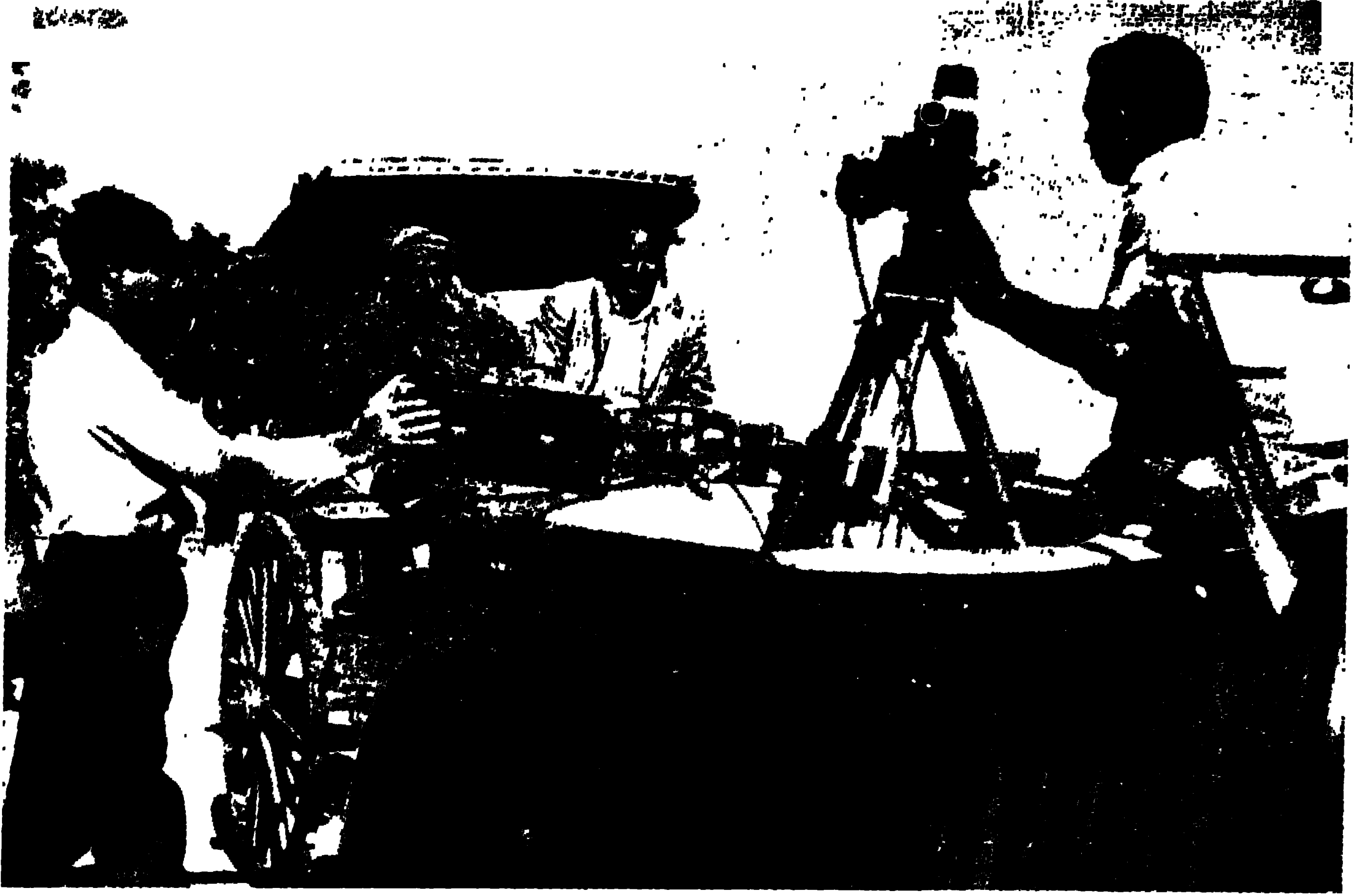
'টাঙ্গায় চেপে নায়ক অসিতবরণ চলেছেন'— দৃশ্যটি পর্দায় যত সহজ দেখায় আসলে কিন্তু তত নয়। এর ছবি তুলতে ক্যামেরা-ম্যান দেওজীভাই (মাটির) ও চিত্রসম্পাদক সন্তোষ গাঙ্গুলীকে (রাস্তায় দাঁড়িয়ে) কম পরিশ্রম ক'রতে হয় না।

(পাশে)

ইংরাজী 'রিভার' চিত্রের একটি দৃশ্যে শ্রীমতী সুপ্রভা মুখোপাধ্যায় ছোট ছোট মেয়েদের চিত্তবিনোদনের কাজে তন্ময় হ'য়ে:

চিত্রশিল্প সম্বন্ধে কে কি বলেন ?

কানন দেবী—প্রযোজকদের বড়ই দুর্ভোগ ভুগতে হচ্ছে। আমোদ-কর অত্যধিক মাত্রায় হওয়ায় প্রদর্শনলব্ধ মোট বিক্রয়ের টাকার এক-তৃতীয়াংশ মাত্র প্রযোজকের ভাগে পড়ে। আমার এক ছবির বেলায় মোট বিক্রী দু'লক্ষ সত্তর হাজার টাকা হ'লেও প্রদর্শক আর পরিবেষকের প্রাপ্য এবং আর আমোদ-কর ইত্যাদি বাদ দেওয়ার পর মাত্র ষাট হাজার টাকা পেলাম। প্রযোজকের কোন একটা ছবি যদি সাফল্যমণ্ডিত না হয় তাহলে তাঁকে এমন মার খেতে হয় যে তাঁর আর দ্বিতীয় ছবি তোলার মত আর্থিক সঙ্গতি থাকে না। পাকিস্তান হওয়ার পর থেকে ছবির বাজার খুব সঙ্কুচিত হয়ে গেছে। আরও বেশী প্রেক্ষাগৃহেরও প্রয়োজন হোয়ে পড়েছে। আমোদ কর যথেষ্ট পরিমাণে কমিয়ে দেওয়া হোক। এই তদন্ত কমিটি যেন প্রযোজকদের অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করেন। প্রযোজকের নিয়োজিত মূলধন ফেরৎ পাওয়ার ব্যবস্থা রেখে তারপর যেন সরকার তাদের প্রাপ্য অংশ আদায় করেন। আমোদ কর সম্বন্ধে আমার আপত্তি নেই তবে তা যেন উৎপীড়ন না করে। প্রযোজকদের অস্তিত্ব যদি বিলুপ্ত হয় তাহলে টাকার উৎসও নষ্ট হয়ে যাবে। আমরা—প্রযোজকরা, সবসময়ই ভাল ছবি তৈরীর জন্যে আন্তরিক চেষ্টা করি কিন্তু কতকগুলি কারণে আমরা অনেক সময় বিফল হই। অন্যতম কারণ হলো মূলধন ফিরিয়ে পাওয়ার জন্যে দোরে দোরে ভিক্ষে করতে হয়। আমরা চাই না যে প্রদর্শকদের সর্ত্তই আমাদের মেনে চলতে হবে বা আমাদের সর্ত্ত প্রদর্শকদের মেনে নিতে হবে। ছবির প্রাপ্য ন্যায্য মূল্য যেন দেওয়া হয় আর যে যার অংশ যেন ঠিকমত পেয়ে যায়। এই টুকু হলেই যথেষ্ট হবে। গ্রেট ব্রিটেনের মত ভারতীয় ছবিও যেন আমেরিকায় প্রদর্শিত হয়ে টাকা রোজগার করে আনতে পারে। তাঁরা যেন বুঝতে পারেন যে ভারতীয় ছবিও উৎকর্ষ দেখিয়ে বিদেশের বাজারে প্রদর্শনের যোগ্যতা রাখে। অভিনেতা বা অভিনেত্রীদের কাছ থেকে পরিচালক-দের সহযোগিতা না পাওয়ার কোন কারণই নেই। কোন কোন শিল্পী প্রয়োজন অনুপাতে পারিশ্রমিক পান না আর কেউ কেউ প্রয়োজনাতিরিক্ত পান। শিল্পী নির্ব্বাচনের কাজটা আগে শুধু পরিচালকেরই ছিল। কিছুকাল আগে থেকে প্রযোজকরা এ বিষয়ে মাথা গলিয়েছেন আবার এখন পরিবেশকরাও নাক গলাচ্ছেন। আমি দেখেছি কোন বিশেষ শিল্পীকে ছবিতে নেওয়ার জন্যে পরিবেশকরা পরিচালককে বাধ্য করাতে চান। যোগ্যতা সম্বন্ধে বাছ-বিচার করা যেন তাঁদের একটুও খেয়ালই করতে হয় না। এতে অনেক নতুন শিল্পীর নিজের ক্ষেত্র প্রস্তুতের পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কলকাতায় কোন কোন বিশিষ্ট শিল্পীকে বিভিন্ন প্রকার ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করতে বাধ্য হতে হয়। প্রযোজক বা পরিচালক এটা ভেবেই দেখেন না যে তাঁদের দিয়ে ঐসব ভূমিকায় অভিনয় করানো চলবে কিনা। আমিও অনেক সময় মনের মতন ভূমিকা পাইনি। আর যা পেয়েছি তার বেশীর ভাগই আমার কাছে উপযুক্ত মনে হয় নি। অনেক পরিচালকই বেশ কর্ম্মনিপুণ নন। শিল্পীদের কোন সমিতি গড়া হলে যে কোনো কাজ হবে তা আমি মনে করি না এবং এর সভ্য বা সভ্যাদের স্বভাব-চরিত্র ঠিক রাখার জন্যে সমিতির প্রয়োজন হতে পারে এও মনে হয় না। ১৯৩৯ সালের পর থেকে চিত্রে সঙ্গীতের মানের বিশেষ অবনতি হয়েছে; এর কারণ কিন্তু আমি বুঝে উঠতে পারি না। ষ্টুডিয়োর যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধারও উন্নতি হওয়া উচিত। 'প্লে-ব্যাক' প্রথার পরিবর্ত্তে যেসব শিল্পী গান জানেন তাঁদের নেওয়া ভাল। সেন্সরের কাজ বড় পীড়াদায়ক হয়ে উঠেছে। কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অমর-উপন্যাস 'বামুনের মেয়ে'র চিত্ররূপ তৎকালীন সেন্সর বোর্ড বাতিল করে দিয়েছিলেন। এক বিধবা মেয়ের কাহিনী নিয়ে ছবিটি তোলা আর তাতে যৌন-আবেদনমূলক বা অশ্লীলতাত্মক কিছুই ছিল না। এক জায়গায় "ঝাড়ু মারো" এই কথাটি থাকাতে সেন্সর বোর্ড আপত্তি তোলেন আর সে অংশ বাদ দেওয়া হলো। তাছাড়া এত বেশী অদল-বদল এই ছবিতে করতে হয়েছিল যে যখন সেন্সর কর্ত্তৃপক্ষের অনুমোদন নিয়ে ছবিটি আত্মপ্রকাশ করলো তখন আসলে যা তোলা হয়েছিল তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিষ দেখা গেল।

প্রমথেশ বড়ুয়া—আজকাল ছবির মান যে ভাবে নেমে যাচ্ছে তার জন্যে আমি প্রযোজকদের দোষ দিই না। এর একমাত্র কারণ হলো সুষ্ঠুভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত কলা-কুশলীদের অভাব। অনেক ষ্টুডিয়োতেই উন্নত ধরণের যন্ত্রাদির এবং অনেক ক্ষেত্রে সেগুলো ব্যবহার করবার মত কুশলী টেক্‌নিসিয়ানেরও অভাব আছে। প্রযোজকরা একা কি করতে পারেন যদি ক্যামেরাম্যান বা অন্যান্য টেক্‌নিসিয়ানরা ঠিকমত শিল্পবোধ নিয়ে কাজ না করতে পারেন। শেষোক্ত ব্যক্তিরা হয়ত নিজে নিজেই শিক্ষালাভ ক'রে বা সহকারী শিল্পীরূপে চলচ্চিত্রশিল্পে যোগ দেন। তাঁদের কাছ থেকে যে উদ্দীপনা আশা করা যায় সেটা তাঁদের মধ্যে দেখা যায় না। জনকতক ভাল পরিচালক অবশ্য আছেন কিন্তু কুশলী টেক্‌নিসিয়ানের অভাবে তাঁরা ভাল ছবি তৈরী ক'রে উঠতে পারেন না। আমি বলি এখানে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হোক সেখানে ছবির শিল্পগত ও যান্ত্রিক কলা-কৌশল শিক্ষা দেওয়া হবে। ছবির কাহিনীর এমন সব উপাদান আমাদের দেশে আছে যা দিয়ে ছায়াছবি বেশ ভালভাবেই তৈরী হতে পারে। অবশ্য, এটা বেশ বুঝতে পারছি দশ বছর আগেও যা কাহিনী পাওয়া যেত ছবির জন্যে তার চেয়ে খারাপ স্তরের কাহিনীই এখন নেওয়া হচ্ছে। হাল্কা ধরণের গল্পই এখন বেশী দেখা যায়। মনে হয় কাহিনীর ভাণ্ডার নিঃশেষ হয়ে গেছে। এ ব্যাপারে ব্যক্তিগতভাবে আমি চাই শিক্ষিত ব্যক্তিদের নিয়ে একটী কেন্দ্রীয় সংসদ তৈরী হোক, তাঁরা সরকারী আওতায় থাকলেই ভাল হয়; তাঁরা ছায়াছবি তোলবার উপযোগী একশো'টি গল্প প্রতি বছরে ঠিক করে দেবেন। প্রযোজকদের তখন কাহিনী বেছে নেওয়ার খুব সুবিধে হবে। আমার মনে হয় এইভাবে ছবির উপযোগী কাহিনীর মান বিচার করা যাবে। আমাদের দেশে অভিনয় বেশ ভালই বলা চলে, ঠিকমত নির্দ্দেশ দিতে পারলে আরও উন্নতি হতে পারে। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের শিক্ষাদানের জন্যে বিদ্যালয় স্থাপন প্রয়োজন বলে আমি মনে করি. সেখান থেকে প্রযোজক আর পরিচালক নিজেদের পছন্দমত শিল্পী পেতে পারেন। কেউ কেউ বলেন যে দর্শকসাধারণ তাঁদের প্রিয় তারকাদেরই পর্দ্দার ওপর দেখতে চান কিন্তু আমি নিজে মনে করি না যে ভারতবর্ষে তারকা-সম্বলিত চিত্রসমূহের প্রয়োজন আছে ব'লে। এদেশে অনেক তারকা আছেন যাঁদের উপযুক্ত সুযোগ সুবিধা দিলে তাঁরা সাফল্যমণ্ডিত ছবিই দেবেন তাঁদের অভিনয়ের মধ্য দিয়ে। বিদেশে ভারতীয় ছবি পাঠিয়ে তার বদলে সেখানকার ছবি আনানো আমি প্রয়োজন মনে করি। কতকগুলি ভারতীয় ছবি বিদেশে আন্তর্জ্জাতিক খ্যাতি লাভ করেছে দেখেছি। যদি বিদেশের বাজারে ভারতীয় ছবি পাঠানো সম্ভব হয়, তাহলে দু'ভাবে ব্যবস্থা করা যায়—প্রথম হলো স্থানীয় অধিবাসীদের জন্যে হিন্দী ছবি, আর দ্বিতীয় হলো 'ডাব'-করা ছবি।

অহীন্দ্র চৌধুরী — জীবনের ২৯ বছর চিত্রজগতের সঙ্গে কাটালাম। আরও কয়েক বছরে চালিয়ে যাবার আশা রাখি, শিল্পী হিসেবে বলতে পারি যে আমাদের অবস্থা মোটেই সন্তোষজনক নয়। গলদ যথেষ্টই রয়েছে। উন্নতি করবার সুযোগ থাকা সত্বেও সেগুলির সদ্ব্যবহার করা হয় না। বিচক্ষণ শিল্পীর অভাব থাকতে পারে কিন্তু সুশিক্ষার দ্বারা তা পূরণ করে ফেলা যায়। সুযোগ্য শিল্পীদের কাজে লাগানো হয় না। ষ্টুডিয়োর বাইরে শিক্ষাকেন্দ্র খোলা উচিত। শোনা যায়, শিল্পীরা প্রযোজকদের শোষণ ক'রে নিঃশেষ করে ফেলেন হয়ত এর কিছুটা সত্যি। বিশিষ্ট তারকারা নায়ক বা নায়িকার ভূমিকায় অভিনয়ের জন্যে অত্যধিক পারিশ্রমিক দাবী করেন। প্রশ্ন ক'রতে পারেন তাঁদের গুণানুযায়ীই এরকম দাবী করেন কিনা—উত্তর হবে, সব ক্ষেত্রেই সে রকম নয়। কোন কোন শিল্পী হঠাৎ জনপ্রিয়তার শিখরে আরোহণ করেন, তারপর মাত্র চার বা পাঁচ বছর চিত্রশিল্পীর জীবন কাটিয়ে দেবার পর তাঁদের আর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। তারকাদের মধ্যে বিশেষ ক'রে মহিলা শিল্পীরা গোড়া থেকে একটা সঙ্গতি রেখে সুরু করেন।

কেউ হয়ত তাঁকে চিত্রজগতে এনে হাজির করলেন, যদি উৎরে গেলেন তো যথেষ্ট সুনাম অর্জ্জন করলেন। যখন তিনি বেশ পরিচিত হয়ে উঠলেন, তখন তাঁর দাবী ক্রমশঃ বাড়তে থাকে, আর তাঁর এই ক্রমবর্দ্ধমান দাবীর কোন শেষ থাকে না। যত বেশী সংখ্যক ছবি তাঁর সাফল্যমণ্ডিত হতে থাকে সেই হারেই তাঁর পারিশ্রমিকের দাবীও তত বেড়ে যায়। শেষে একটা অবিশ্বাস্য রকম বৃহৎ অঙ্কে তাঁর দাবীর মাত্রা গিয়ে পৌঁছোয়। কেউ কেউ এই যুক্তি দেখান যেহেতু অভিনেত্রীদের পরমায়ু খুব দীর্ঘস্থায়ী হয় না সেইজন্য তাঁরা যতটা বেশী পাবেন অর্থ সংগ্রহ ক'রে নেন—হ্যাঁ, এটা সত্যি। কিন্তু যিনি সত্যিকারের শিল্পী, সেই অভিনেতা বা অভিনেত্রী বেশ কিছুদিন চালিয়ে যেতে পারেন। আমি নিজে তো ১৯২১ সাল থেকে দিব্যি চালিয়ে যাচ্ছি। অতএব আপনারাই দেখছেন শিল্পীর পরমায়ু যে অল্পদিন স্থায়ী হবে, এটা যে মেনে নিতেই হবে এমন কোন কথা নেই। আর অভিনেত্রীদের বেলায়ই কি এটা সত্যি হতে পারে? কোন কোন অভিনেত্রী যথেষ্ট দীর্ঘদিন ধরে চালিয়ে যাচ্ছেন। কানন দেবীর কথাই ধরুন না। শিল্পীদের 'রক্ষাকবচে'র মত কোন কিছু ব্যবস্থা হওয়া উচিত। সেই ব্যবস্থা কি উপায়ে হওয়া উচিত সে বিষয়ে আমি মন্তব্য করতে নারাজ কারণ এটি এখন একটি শিল্প হিসেবে চলছে, সরকার পরিচালিত কোন কিছু নয়। এই যে চার বছর বা পাঁচ বছর একজন শিল্পীর পরমায়ুর কথা উল্লেখ করলাম এর যদি কারণ জিগ্যেস করেন তার উত্তরে বলবো যে কোন প্রযোজক যে আর তাঁকে কিছুদিন পরে অপছন্দ করেন তা নয়। যতই দিন যায় নতুন নতুন শিল্পী জন্মাতে থাকে আর তাঁরা অপেক্ষাকৃত অল্প পারিশ্রমিকে কাজ করেন বলে প্রযোজকরা স্বভাবতঃই অল্প খরচের জন্যেই তাঁদের নিয়োগ করেন। তার ওপর এখন পেশা হিসেবে চলচ্চিত্রশিল্পীর জীবন বেছে নেওয়ার পক্ষে সামাজিক কোন বাধা বা আপত্তি দেখা যায় না।

আরও মুস্কিল হয়েছে এই যে যেহেতু তাঁরা সমাজের নামকরা ঘর থেকে আসছেন সেইজন্যে তাঁরা ক্যামেরার সামনে এসে পড়লেও কোন ইতর-বিশেষ হয় না। শিল্পীদের জন্যে না হলেও অন্ততঃ টেকনিসিয়ানদের জন্যে শিক্ষাকেন্দ্র খোলা উচিত কারণ তাতে প্রযোজকদের অনেক কম ঝামেলা পোয়াতে হবে। সব পরিচালকও সবসময় বেশ নিপুণতার পরিচয় দেন না। প্রশিক্ষ পরিচালকদের মধ্যে অল্পসংখ্যকই আছেন যাঁরা তাঁদের কাজ সম্বন্ধে বেশ ওয়াকিবহাল। তবু তাঁরা শেখবার চেষ্টা করেন, কিন্তু নবাগতদের মনোগত ভাব হলো কি ক'রে 'দু-পয়সা' বাগিয়ে নেবেন। তাঁদের আর পরিচালক বলা যায় না। তাঁরা কোন রকমে কয়েকজন টাকাওয়ালা লোক জোগাড় করলেন তারপর ছবি যদি উৎরে গেল তো ব্যস্, তাঁরা হলেন ছবির একজন 'বড় ডাইরেক্টর'। একটা জিনিষ লক্ষ্য করা গেছে যে অভিনেত্রীদের বেলায় বিবাহ বা মাতৃত্ব কোনটাই তাঁদের শিল্পজীবনকে বাধা দেয় না। সেইজন্যেই কৌতূহল হয় তাঁদের চিত্র-জীবন ক্ষণস্থায়ী হয় কেন? যদি তাঁরা নিজেদের ইচ্ছায় অটল থাকেন তাহলে বলবার কিছু নেই। কিন্তু এ ছাড়া অন্য কোন কারণ আছে কিনা যা তাঁদের পছন্দের পরিপন্থী হয়ে কাজ করে? এর উত্তরে বলবো যে তার জন্যে চলচ্চিত্রশিল্পই দায়ী।

জহর গাঙ্গুলী—আমি নিজে একজন অভিনেতা আর অভিনেতা হিসেবেই জীবন কাটাতে চাই। প্রযোজক বা পরিচালক হবার মত উচ্চাকাঙ্ক্ষা আমার নেই। চলচ্চিত্র-শিল্পী হিসেবে আমার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা থেকে এইটুকুই বলতে পারি যে বেশীর ভাগ পরিচালকই তাঁদের কাজের উপযুক্ত নন। কোনো ভূমিকায় যতটা অভিব্যক্তি দেওয়া প্রয়োজন ততটুকু প্রকাশ করবার মত স্বাধীনতা অভিনয় কালে তাঁদের দেওয়া হয় না। তাঁদের পছন্দমত ভূমিকা বেছে নেওয়ার মত স্বাধীনতাও তাঁদের দেওয়া হয় না। ষ্টুডিয়োতে সবকিছুর ব্যবস্থাই অপ্রতুল। তাছাড়া এই কাজের নিশ্চিন্ত নিশ্চয়তা বা রক্ষা-ব্যবস্থা ব'লে তো কিছুই নেই। পশ্চিম বঙ্গে নায়কের ভূমিকায় সবচেয়ে বেশী পাওয়া যায় দশ থেকে বারো হাজার টাকা আর নায়িকার ভূমিকায় চোদ্দো থেকে পনেরো হাজার টাকা।

পঙ্কজ মল্লিক—সঙ্গীত শিক্ষাদানের জন্যে একটি বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠা অত্যন্ত প্রয়োজন বলে মনে করি। চলচ্চিত্রে সঙ্গীতের প্রয়োগ আজকাল হয়ে দাঁড়িয়েছে দর্শক যেমনটি চান সেইভাবে, এতে উৎকর্ষ ও প্রাণ-সঞ্চারের কোনো অবকাশই দেওয়া হয় না। যেমন-তেমন ভাবে গান জুড়ে দিলেই হলো। সম্পূর্ণ বাছ-বিচার ক'রে আব সঙ্গতি রেখে এটি করা উচিত। যদি শুধু রসগ্রহণেব জন্যেই সঙ্গীতেব প্রয়োগ প্রয়োজন হয় তবে তার সুরে যেন মিষ্টতার অভাব রাখা না হয়। আর যদি শিল্প-কলা ও সংস্কৃতিব ধাবা বজায় রাখতে হয় তাহলে যেন বেশ সাবধানতা অবলম্বন করা হয়। একদল আছেন যাঁরা শুধু উপভোগ কবা-টুকুতেই সন্তুষ্ট থাকেন, আর একদল আছেন যাঁরা গানের মধ্য দিয়ে শিল্পকলাগত ও সংস্কৃতিগত ঐতিহ্য ও ভাবধারা গঠনের পক্ষপাতী। চিত্রে আব সঙ্গীতে একটা মান বজায় রাখার ব্যবস্থা আমি পছন্দ কবি আব একটা বিদ্যায়তনেব সাহায্য নিয়ে সেটি হলে ভাল হয়। বাংলা ভাষা যাঁরা বোঝেন না তাঁদের কাছেও বাংলা গান বেশ উপভোগ্য হয়। বাংলা গানের সুরেব একটা সার্ব্বজনীন আবেদন আছে, যাঁরা উপভোগ করতে পাবেন ভাষা বুঝতে কষ্ট হলেও শুধু সুরেব জন্যই তাঁদের ভাল লাগে। রবীন্দ্র নাথ সঙ্গীত রচনা করে নিজেই তাতে সুর সংযোগ করতেন। সত্যিকারের টেকনিসিয়ানেব এইভাবেই চলা উচিত। ইউরোপীয় সঙ্গীত বা তার সুর উপভোগ করতেও এদেশের লোকের কোন আপত্তি থাকে না। সঙ্গীতমাত্রই উপভোগ করার মত রসগ্রাহিতা সকলের থাকা উচিত। বাংলাদেশের লোক-সঙ্গীতেব ব্যাপারে সুরের মাধুর্য্য ও সাবলীলতা বজায় রাখাই অধিকতর প্রয়োজন মনে করি, এতে একেবারে চুল-চেরা হিসেব না রাখলেও চলতে পারে, যদিও সেটা একেবারে অবহেলার বস্তু নয়।

রাইচাঁদ বড়াল—শ্রীযুত মল্লিক যা' যা' বললেন, আমি সব বিষয়েই তাঁর সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত।

সৌরেন সেন—ছবি তোলার জন্যে যেসব ব্যবস্থা রয়েছে তাতে আমি সন্তুষ্ট নই। শিল্প-নির্দ্দেশকদের কাজ ভালভাবে হয় না এদেশে। পরিচালক, প্রযোজক আর শিল্প-নির্দ্দেশক এই তিনজনে মিলে কাজ করলে ছবির খরচ অনেক কম করা যায় এবং এই সহযোগিতার দ্বারা চলচ্চিত্রশিল্পকে দেউলে হবার হাত থেকে বাঁচানো যায়। সিন তৈরী ও অন্যান্য ব্যাপারে অজস্র টাকা খরচ হয়—এতে অতিরিক্ত খরচ বাঁচানো যায়।

সুধীশ ঘটক—বাংলাদেশের চলচ্চিত্রশিল্পেব শতকরা ৮০ ভাগ রোজগারই প্রদর্শক আর সরকারের খাতে চলে যাচ্ছে। সরকাব যে অংশ আদায় করে নেন তার কিছুটাও এই শিল্পে দেন না আর প্রদর্শকরাও যা পান তার কোন অংশই এই শিল্পেব উন্নতিব জন্যে নিয়োগ করেন না। যেসব পুরুষ আব মহিলা এই শিল্পের জন্যে সত্যিকারেব খেটে যাচ্ছেন তাঁরা পারিশ্রমিক হিসেবে খুব সামান্যই পান। মালিকের পবিচালনার দোষে অনেক ষ্টুডিয়ো এখন বসে গেছে। আমাদেব এই 'সিনে-টেক্‌নিশিয়ান্‌স অব বেঙ্গল' সঙ্ঘ চায় যে, যেসব ফাটকাবাজ এসে এই শিল্পে প্রবেশ করছে তাদের বিরুদ্ধে যেন বেশ কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হয়। গ্রেট ব্রিটেনেব মত এখানেও যেন সবকার 'ফিনান্স কর্পোরেশান' স্থাপন করেন। তাছাড়া পশ্চিম বঙ্গেব ষ্টুডিয়োগুলিতে এখনই ফ্যাক্টরী আইন প্রবর্ত্তিত হোক। বিদেশী ও ভারতীয় ছবির বেলায় যেন একই মান বজায় রেখে সেন্সর ব্যবস্থা করা হয়।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়—চিত্রে যেসব কাহিনী দেখা যায় তার অধিকাংশই ফরমায়েস দিয়ে তৈরী। পরিচালকদের কিছু একটা দেবার ইচ্ছা অনুযায়ীই এ রকম হয়। কাহিনীকার আর প্রযোজকের মধ্যে সংযোগটা ঠিক রাখা হয় না। ছবি তৈরীর ব্যাপারে লেখক, চিত্রনাট্য-রচয়িতা আর পরিচালকের মধ্যে যোগাযোগের অভাব ভাল কথা নয়। বৃটিশ শাসন অবসানের পর যেসব কাহিনী নিয়ে ছবি তোলা হয়েছিল তার পুনরাবৃত্তি পরে হওয়ায় তা সাফল্যলাভ করে নি। এতে ক্ষতিই হয়েছিল। দেশকে শৃঙ্খলমুক্ত করার চিন্তা তখন সকলকেই পেয়ে বসেছিল, সেইজন্যে ১৯৪০ সাল থেকে লেখকরা রাজনীতিমূলক ঘটনাকে কেন্দ্র

ক'রে কাহিনী রচনা করতেন। ১৯৪২ সালের পর থেকে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি সকলের নজরে এলো। তাঁরাও তখন মার্ক্সীয় সংস্কৃতি চালু করার জন্যে প্রস্তুত হলেন। তাঁরা তাঁদের প্রচারমূলক পদ্ধতিতে চালিয়ে গেলেন, জীবনের তাৎপর্য্য খুঁজে বের করবেন বলে ভরসা দিলেন এবং লেখকরাও সেই ধরণের কাহিনী তৈরী করতে লাগলেন। তারপর সেই চিন্তা ধারাতেই তাঁরা একদম মশগুল হয়ে গেলেন। ১৯৪৭ সালের আগে পর্য্যন্ত আমাদের জীবনের আদর্শ ছিল ভিন্ন প্রকার। তারপর নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্যে তাঁরা ঠিক রাস্তায় চিন্তা সুরু করেছেন। সেইজন্যে লেখকরা এই সময়ে কিছুটা গোলমালে পড়ে গেছেন। আমার মনে হয় কিছুকাল পর এ অবস্থাটা কেটে গিয়ে কাহিনীর পুনরাবৃত্তি হওয়াও বন্ধ হয়ে যাবে। আমাদের সামনে এতসব সমস্যা দেখা দিয়েছে যে, লেখকরাই পাঠকপাঠিকাদের ঠিক পথে চালিয়ে তাঁদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করতে পারেন। মার্কস্‌-পন্থী লেখকদের বিরুদ্ধে কলম ধরার জন্যে যথেষ্ট-সংখ্যক লেখক থাকা সত্ত্বেও উদীয়মান লেখকদের মধ্যে ঐ ভাবধারাই বিশেষভাবে বদ্ধমূল। ঠিক কি পরিমাণ রচনা সচরাচর লেখকদের কাছ থেকে আসে আর কতগুলি অন্যান্যদের কাছ থেকে আসে সে বিষয়ে আমি ঠিকমত কিছু বলতে পারি না। আমি এটুকু বিশেষ জোর দিয়ে বলতে চাই যে, চলচ্চিত্রের কতকগুলি গান সম্বন্ধে যেন সেন্সর-কর্ত্তৃপক্ষ সতর্ক দৃষ্টি দেন কারণ ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মনের ওপর তার ক্ষতিকর প্রভাব লক্ষ্য করা গেছে।

সজনীকান্ত দাস—কতকগুলি অর্থহীন, বাজে বইয়ের ওপর বাধা-নিষেধ আরোপ করা সরকারের পক্ষে সম্ভব নয় কি? এ ধরণের অন্ততঃ খানপঞ্চাশেক ছবি আমি দেখছি। দু'রকমের ছবি দেখাবার কথাই আমি সমর্থন করতে চাই—এক শ্রেণীর ছবি হবে সর্ব্বসাধারণের জন্যে আর দ্বিতীয় শ্রেণী হবে ষোল বছর বয়স পর্য্যন্ত কিশোর-কিশোরীদের জন্যে।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়—ভাল কাহিনী রচয়িতার অভাব হয়েছে এমন ইঙ্গিত করা খুবই অসঙ্গত। আমার মনে হয় সত্যিকারের উৎসাহ পেলে ভারতীয় ছবিও বিদেশের বাজারে বেশ চালু হতে পারে। চলচ্চিত্রশিল্পে প্রযোজকরা যে পরিমাণ ক্ষতি স্বীকার করছেন তাতে তাঁদের কোন রকম রক্ষা ব্যবস্থার জন্যে আমি সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাই।

হেমেন গুপ্ত—সেন্সর বোর্ড যেভাবে কাজ চালাচ্ছেন তাকে আমি বিরক্তিকর বলে মনে করি। নতুন ভাব নিয়ে কাহিনী রচনা ক'রে ছায়াছবি তোলার পক্ষে তাঁরাই বাধার সৃষ্টি করছেন। যা সত্য, যা অভ্রান্ত আর যার মধ্যে সত্যিকারের দরদ আছে তাই নিয়ে বেশ ভাল কাহিনীর সৃষ্টি হতে পারে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বিপ্লবাত্মক কাহিনী নিয়ে ছবি তৈরীর যথেষ্ট সুযোগ থাকা সত্ত্বেও মনে হয় সেন্সর কর্ত্তৃপক্ষ এটা চান না। সামাজিক আর মনস্তত্ত্ব-মূলক কাহিনী নিয়ে ছবি তোলার যথেষ্ট সুযোগ থাকলেও, এখনকার জীবনধারায় সামাজিক সমস্যাগুলি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যার সঙ্গে এমন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত যে, সামাজিক সমস্যাকে চিত্রে দেখাতে গেলেই তা' দেশের ধনী লোকদের বিরুদ্ধে বলা হবে। এবং এই নগ্ন সত্যের বিরুদ্ধে আপত্তি তোলা হবেই। ভারতের বিপ্লবের কাহিনীকে কেন্দ্র ক'রে বিশেষ করে মেদিনীপুরের কাহিনীকে চিত্রে রূপায়িত করা ছবিতে আপত্তি তোলা হয়েছে, এই বলে যে সহিংস ভাবকে জাগিয়ে তোলা হয়েছে—যদিও সেই কাহিনীকে সম্পূর্ণ অহিংসা নীতির ওপর ভিত্তি ক'রেই তোলা হয়েছিল। হয়ত বলা হবে সরকার চান না কোন বিশেষ সম্প্রদায়কে প্রচারের সুযোগ দেওয়া হয়। কিন্তু এটাও বিচার ক'রে দেখতে হবে, যে পূর্ব্বে স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্যে যাকে হিংসাত্মক কার্য্য ব'লে আখ্যা দেওয়া হতো এখন তাকে জনসাধারণের বিরুদ্ধেই হিংসাত্মক কার্য্যাবলী বলা যায়। এ ব্যাপারে সোজাসুজি পরিষ্কার একটা নীতি ঘোষণা করলেই ভাল হয়। যাঁরা শুধু মুনাফা লুটে নেওয়ার মনোভাব নিয়ে এই শিল্পে আসতে চান, তাঁদের বাধা দেওয়ার জন্যে আমি অনুরোধ জানাই। আমি এইটুকুই বলতে চাই যে

উদ্দেশ্যমূলক ছবিই যেন তৈরী হয়, নিছক আনন্দ উপভোগের জন্যে ছবি নাইবা হলো।

সরোজ মুখার্জ্জী—উপযুক্ত ধরণের ছবি তৈরীর বিরুদ্ধে পশ্চিম বঙ্গের সেন্সর বোর্ড বড়ই বাধার সৃষ্টি করেন। আমি এই কথাটিই বিশেষ জোর দিয়ে বলতে চাই যে এক রকম নীতিই যেন কার্য্যকরী রাখা হয়, ছবি সেন্সর করার ব্যাপারে।

ডক্টর কালিদাস নাগ—ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর সময়ের গোলমাল করে যেন কোন কিছু দেখানো না হয়। আমার মনে পড়ে একটা ছবিতে প্রভু বুদ্ধের মূর্ত্তি দেখিয়ে এমন এক শতাব্দীতে সেটি প্রস্তুতের কথা বলা হলো যখন বুদ্ধের জন্মই হয় নি। এমন অনেক ভারতীয় ছবি আছে যা মাতা এবং পিতার সঙ্গে একত্রে বসে পুত্র-কন্যারা দেখতে পাবেন না। বৈদেশিক সামাজিক আচার-ব্যবহার অনুযায়ী চুম্বন সম্বন্ধে বিদেশী ছবিতে আপত্তি না থাকলেও ভারতীয় সামাজিক আচার-ব্যবহার অনুসারে কোনো ভারতীয়ই ভারতীয় ছবিতে তার প্রচলন পছন্দ করবেন না। ছবিতে নষ্টামী বা যৌন আবেদনের ব্যাপারগুলি, সাধারণ শালীনতার প্রতি দৃষ্টি রেখেই বিচার করতে হবে। আমাদের দেশে যে বিচক্ষণতার অভাব আছে একথা আমি স্বীকার করি না। চলচ্চিত্রশিল্পের সঙ্গে যাঁরা জড়িত আছেন তাঁরা এ বিষয়ে খুব কমই খোঁজ রাখেন। ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা অনুযায়ী যে নৃত্য, সাহিত্য সঙ্গীত বা যাত্রা যা আছে তার একটিও কেউ যদি ঠিকভাবে চিত্রে রূপায়িত করেন তাহলে তা হৃদয়ঙ্গম করতে দর্শকের অভাব হবে না বলেই আমি মনে করি। চিত্রে সঙ্গীত সম্বন্ধে আমার মত হলো এই যে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতও যদি ঠিকমত পরিবেশিত হয় তবে তার যে প্রশংসার অভাব হবে, একথা আমি মনে করি না। এদেশে যেখানে শতকরা ৯০ জন পড়তে জানে না তাদের দ্রুতগতিতে শিক্ষা দেওয়ার পক্ষে ছায়াছবি যে একটি অদ্বিতীয় বাহন সে বিষয়ে আমার দ্বিমত নেই।

ডক্টর মেঘনাদ সাহা—এদেশে কাঁচা ফিল্ম তৈরীর জন্যে গত ৯ বছর ধরে যেসব ব্যবস্থা করা হয়েছিল, সেসব বোধ হয় এখন বন্ধ হয়ে গেছে। ফিল্ম তৈরী যে চিত্রশিল্পের জন্য অতীব প্রয়োজনীয় তা নয় বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার জন্যেও এর প্রয়োজন আছে। স্কুল আর কলেজে বেশীসংখ্যক শিক্ষামূলক ছবি দেখাবার জন্যে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করি। বিদেশ থেকে বিজ্ঞানবিষয়ক এবং শিক্ষামূলক ছবি আমদানী করা হচ্ছে, এদেশেও ঐ জাতীয় ছবি তৈরীর ব্যবস্থা হওয়া উচিত। দামোদর ভ্যালী সম্বন্ধে কোন কিছু দেখতে হলে সে ছবি তো আর বিদেশ থেকে আমদানী করা যাবে না।

নির্ম্মল কুমার ঘোষ—সমাজের পক্ষে যা ভাল বা নতুন কিছু দেখবার জন্য উৎসাহিত করার জন্য পত্র-পত্রিকার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা দরকার। তাঁরা যেন প্রযোজক বা পরিবেশকদের পক্ষ নিয়ে বা বিরুদ্ধে কিছু না বলেন। চটকদার চিত্রের সমালোচনা তাঁদের করা উচিত নয়। মুনাফা লোটবার মত সস্তা মনোবৃত্তি নিয়ে যেন হিন্দু ধর্ম্মের দিক-পালদের জীবনী চিত্রে রূপায়িত করার ব্যবস্থা না হয়। "কেবলমাত্র প্রাপ্ত-বয়স্কদের জন্য" মার্কা দেওয়া ছবি যেন অপরিণতদের আরও আকৃষ্ট করে যৌন আবেদনমূলক ঐসব ছবি দেখবার জন্যে। ইংরাজী ও বাংলা ছবির সেন্সরের ব্যাপারে মান বিচার করার জন্যে দু'রকমের নীতি আমার কাছে মূর্খতা বলে মনে হয়, এই যেমন চুম্বন দৃশ্যাদির বেলায়। তবে হ্যাঁ, আমাদের সামাজিক মাপকাঠির বিচারে তার বিচার হওয়া দরকার।

আই, এ, হাফেসজী—ভারতীয় ছবি প্রস্তুতের জন্যে কোন নির্দ্দিষ্ট পন্থা অবলম্বন করা হয় না। একই তারকা একসঙ্গে চার-পাঁচটী ছবিতে কাজ করতে থাকেন, এতে কোন একটি ছবির প্রতি তিনি সুবিচার করতে পারেন না। সেন্সর সম্বন্ধে একই প্রকার নীতি গ্রহণের কথা আমি বলি।

নীরোদ চন্দ্র নাগ—দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা এখন এমনই খারাপ হয়েছে যে এত সস্তায় আনন্দ উপভোগের জন্যে সামান্য খরচ করতে জনসাধারণ অক্ষম হয়ে পড়েছে। উচ্চ শ্রেণীর টিকিট বিক্রীও কয়েক মাস আগের থেকেও কমে গেছে। প্রবেশমূল্য আরও কমানো দরকার আর তা করতে গেলে আমোদকর ও অন্যান্য কর ও স্বভাবতঃই কমিয়ে দেওয়া প্রয়োজন হয়। আমাদের দেশের চলচ্চিত্রশিল্প সাধারণতঃ ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার ওপরেই নির্ভর করে আছে। গ্রেট ব্রিটেনের মত এখানেও ফিল্ম ফিনান্স সমিতি গঠিত হওয়া উচিত। সরকারও এই শিল্পে অর্থ দাদন দিয়ে বেশ ভাল রকম রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা ইচ্ছা করলেই করতে পারেন।

ও সি গাঙ্গুলী—চলচ্চিত্র অত্যাবশ্যক ভাবে শিক্ষার মাধ্যম হওয়া প্রয়োজন। একটি চলচ্চিত্র শিক্ষাগার প্রতিষ্ঠা করলে ভারতীয় চলচ্চিত্রশিল্পের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি দেখা যাবে।

শচীন সেনগুপ্ত—ভারতীয় চিত্রের কলাকৌশল ও সাহিত্যবিষয়ক মানের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হওয়া প্রয়োজন। এদেশে উৎকৃষ্ট কাহিনীর অভাব নেই। এখন দরকার সেই কাহিনীকে ঠিকভাবে চলচ্চিত্রের উপযোগী ক'রে নেওয়া।

নাটকে বীভৎস রস

বিপিন বিহারী রায়

আসরে আমাদের সেদিন অর্সন্ ওয়েলসের "ম্যাকবেথ" ছবি নিয়ে আলোচনা চলছিল। একজন মন্তব্য করলেন, ছবিখানার পরিবেশ কি ভয়াবহ! শুকনো খাঁ খাঁ করছে মাঠ, রুক্ষ কঠিন পাহাড় কেটে প্রাসাদ তৈরি হয়েছে, কেবল আলো আর আঁধারের খেলা, তার সঙ্গে আবার তেমনি বাজনা, একেবারে "গ্র্যাণ্ড গুয়ীনল" ধরণের আবহাওয়া। এতে নাটকের চরিত্রগুলি যে খুনোখুনি হানাহানি নিয়েই থাকবে, ডাকিনী প্রেতিনীদের আবির্ভাব হবে, এ আর বিচিত্র কি?

প্রশ্ন হলো, "গ্র্যাণ্ড গুয়ীনল" (Grand Guignol, খাঁটি ফরাসী উচ্চারণ করলে "গ্রাঁ গুয়ীনল") ব্যাপারটা কি? সেই প্রশ্নের উত্তরে তার কিছু বিবরণ দিচ্ছি।

বহুদিন আগে থেকে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস সহরে এই নামে একটি বিখ্যাত থিয়েটার ছিল, সেটি এখনো টিঁকে আছে কিনা ঠিক বলতে পারি না। এই থিয়েটারে একমাত্র বীভৎস-রসাত্মক নাটক অভিনীত হতো। সাধারণতঃ সব দেশেরই রঙ্গমঞ্চে অভিনীত নাটকে থাকে সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, প্রেম-প্রণয় ইত্যাদি, করুণ রস, হাস্যরস, রৌদ্ররস, বীররস এই সবের অভিব্যক্তি, কদাচিৎ হয়তো একটু-আধটু বীভৎস রসের অবতারণা হয়, কিন্তু আগাগোড়া নিছক বীভৎস রস নিয়ে নাটক, এ রকম আর কোথায়ও দেখা যায়নি (একবার ইংলণ্ডে কিছু প্রচেষ্টা হয়েছিল, সে কথা পরে বলছি।) তাই বলে, এ কথা মনে করলে ভুল হবে যে, এই "গ্রাঁ" থিয়েটারে কেবল স্পষ্ট ও উৎকৃষ্ট খুনোখুনি মারামারি বা এই ধরণের ব্যাপার নিয়ে বীভৎস রসের সৃষ্টি করা হতো। হয়তো প্রথম দিকে কিছুটা ওই রকম হতো, কিন্তু ইদানীং—অর্থাৎ বিগত ৩০।৪০ বছরের ইতিহাসে দেখা যায়, কয়েকজন বিশিষ্ট নাট্যকার এই থিয়েটারের জন্যে যেসব নাটক রচনা করেছিলেন—সেগুলিতে সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপারের ভিতর দিয়ে ভয়াবহ ও তীব্র উৎকণ্ঠামূলক পরিবেশের সৃষ্টি করা হতো, তার ভিতরেও যথেষ্ট আর্ট ছিল। এ থেকে ইংরাজী সাহিত্যে একটা কথাই দাঁড়িয়ে গেছে, অতি বীভৎস বা ভয়াবহ কিছু ব্যাপার ঘটলে তাকে "গ্রাঁ গুয়ীনলী" বলা হয়। এসব নাট্যকারের মধ্যে সবচেয়ে খ্যাতি অর্জ্জন করেছেন আঁদ্রে দে লর্দ (Andre de Lorde) ইনি পরপর প্রায় দেড়শো নাটক গ্রাঁ থিয়েটারের জন্যে রচনা করেছিলেন, এবং সেগুলি অভিনয় করে থিয়েটার কর্তৃপক্ষ প্রচুর লাভবান হয়েছিলেন। অদ্ভুত তাঁর কল্পনাশক্তি! তাঁকে ফরাসীদেশে "ভয়ের রাজা" (Prince of Terror) নাম দেওয়া হয়েছিল। একজন সমালোচক তাঁর সম্বন্ধে লিখেছেন "প্রাত্যহিক জীবনে দে লর্দ অতি চমৎকার লোক, কিন্তু কলম ধরলেই তিনি এক উৎকট যন্ত্রণাদাতা হয়ে ওঠেন। আমাদের ভয়ে কাঁপিয়ে তুলতে, বুকের রক্ত হিম করে দিতে, এমনকি আমাদের নৈশ নিদ্রা অতি ভয়াবহ স্বপ্নে পরিপূর্ণ করে দিতে তিনি সিদ্ধহস্ত, এই যেন তাঁর খুব ভাল লাগে।" গ্রাঁ থিয়েটারে অভিনীত নাটকগুলি দৈর্ঘ্যে খুব বড় হতো না, দেড় বা দু'ঘণ্টার মধ্যে অভিনয় শেষ হয়ে যেতো, অবশ্য বলাই বাহুল্য, এ ধরণের নাটক সবার জন্য নয়, এর জন্যে এক বিশেষ শ্রেণীর দর্শক জুটতো।

একটা কথা এখানে বলা দরকার, হয়তো গ্রাঁ থিয়েটারে প্রথম দিকে (অর্থাৎ ৫০।৬০ বছর আগে) যেসব নাটক অভিনীত হতো তাকে মেলোড্রামার (melodrama) পর্য্যায়ে ফেলা যেতে পারে, কিন্তু আধুনিক নাট্যকারগণের বিশেষ করে দে লর্দ-এর রচিত নাটককে সে পর্য্যায়ে ফেলা যায় না। কথাটা আর একটু পরিষ্কার করে বলি, মেলোড্রামাতে অনেক সময়ে অবাস্তব ঘটনার সমাবেশ দেখা যায়, কিন্তু বীভৎস-রসাত্মক নাটকের তার সঙ্গে প্রভেদ এই যে তাতে অবাস্তব বা অস্বাভাবিক

চিনতে

পারেন

এঁদের ?

পাহাড়ী এখন আর শুধু পাহাড়ী নন

এখন তিনি স্পেশাল কনেষ্টবল

ফোটো : কে. এ. রেজা

জহর গাঙ্গুলী—তাই পুলিশী কাজের ফাঁকে বিশ্রাম করছেন

ভীড় সামলাতে এসে নিজেই কাবু হ'য়ে পড়েছেন

ফোটো : মনো মিত্র

ন্যাশনাল ফিল্মসের 'সহসা' চিত্রের একটি দৃশ্যে বনানী চৌধুরী, মঞ্জু দে ও মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য

এমন কিছু থাকবে না যা দেখে দর্শক বিরক্ত হয়ে মনে করতে পারে দূর, এ হোতে পারে না"—এই হলো এ ধরণের নাটকের সাফল্যের মূল তত্ব, এব আর্ট। বঙ্কিম চন্দ্রের "কৃষ্ণকান্তের উইলে" যখন রোহিণী অন্ধকার রাত্রে বাগানে গিয়ে লুকিয়ে নিশাকরের সঙ্গে দেখা করছিলো, হঠাৎ দেখলে নিশাকর নেই, আর অন্ধকারে তার পেছনে আর কে এসে দাঁড়িয়েছে, সভয়ে জিগেস করলে "কে তুমি ?" উত্তর হলো. "তোমার যম !" তারপরে গোবিন্দলাল তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে পিস্তলের গুলিতে হত্যা করলে—এই হলো মেলোড্রামা। এ হলো আলাদা জিনিস, খুব স্থূল। "তবে রে পাপি, চুনি করো" ও দুম্‌ করে পিস্তলের গুলী—মেলোড্রামা, তাতে নানারকম উৎকট ঘটনাবলীর সঙ্গে শেষ পর্য্যন্ত ধর্ম্মের জয়, পাপের শাস্তি হওয়া চাই। কিন্তু বীভৎস রস পরিবেশন করতে হলে এর চেয়ে অনেক সূক্ষ্ম আর্টের দরকার।

আগেই বলেছি, ইংলণ্ডে একবার গ্রাঁ গুয়ীনলের অনুরূপ থিয়েটার স্থাপনের চেষ্টা হয়েছিল, এবারে তার বিবরণ দেবো। ১৯২০।২১ সালে জোসী লেভি (Jose Levy) নামক এক ভদ্রলোক লণ্ডনে "লিট্‌ল্ থিয়েটার (Little Theatre)" নাম দিয়ে একটি থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এখানেও গ্রাঁ থিয়েটারের মতো কেবল বীভৎস রসের নাটক অভিনয় করা। কয়েক বছর বেশ চলেছিল, তারপর, সম্ভবতঃ যুদ্ধ-বিগ্রহ আরম্ভ হওয়ার সময়ে, সেটি উঠে যায়। সেখানে যে নাটকখানি প্রথম অভিনীত হয় তার নাম "তিন বুড়ী" (The three old woman) এবং এখানি বিশেষ করে এই থিয়েটারের জন্যে ফরাসী নাট্যকার আঁদ্রে লর্দ্'ই লিখে দেন (অবশ্য সেটিকে ইংরাজীতে ভাষান্তরিত করে নেওয়া হয়েছিল)। নাটকখানি বেশ সাফল্যের সঙ্গে অনেকদিন চলেছিল কিন্তু তৎকালীন সমালোচকবৃন্দ এ সম্বন্ধে নানাভাবের বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করেন। অনেকে বলেন এ রকম ভয়াবহ লোমহর্ষণ নাটক পাবলিক থিয়েটারে অভিনীত হওয়া উচিত নয়। এতে নায়িকা "লুইসের" (Louise) ভূমিকায় অভিনয় করেন সিবিল্ থর্ণডাইক (Sybil Thorndike), যিনি উত্তরকালে একজন শ্রেষ্ঠা ট্র্যাজিক অভিনেত্রী বলে খ্যাতি অর্জ্জন করেন ও "ডেম" (Dame) উপাধি লাভ করেন। আরো এতে ছিলেন তাঁর ভাই রাসেল্ থর্ণডাইক, এবং এথিনী স্তেলার (Athene Seylor) নামক আর এক খ্যাতিসম্পন্না অভিনেত্রী। এই নাটকের গল্পাংশ অতি সংক্ষেপে দিচ্ছি তা থেকে পাঠক এর বীভৎসতা কিছু উপলব্ধি করতে পারবেন। এখানে বলা প্রয়োজন, কয়েকজন বিশিষ্ট ইংরেজ নাট্যকার তার পরে এই থিয়েটারের জন্য নাটক লিখতে থাকেন এবং সেগুলিও বেশ সাফল্য অর্জ্জন করেছিল। তাঁদের মধ্যে ইলিয়ট্ ক্রশে-উইলিয়াম্‌স্-এর (Eliot Crawshay Williams) নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। "ই-অ্যাণ্ড-ও-ই" (E. & O. E.) এঁর লেখা একখানি প্রসিদ্ধ নাটক।

"তিন বুড়ী"

নাটকের ঘটনাস্থল ফ্রান্সের কোন স্থানে একটি ক্যাথলিক ধর্ম্মাবলম্বী সন্ন্যাসিনীদের আশ্রম (convent), এই আশ্রমে উন্মাদরোগগ্রস্তা রমণীদের চিকিৎসাগার স্থাপিত আছে, সন্ন্যাসিনী বা "সিষ্টার"-গণ রোগীদের সেবায় নিজেদের নিয়োজিত করেছেন। তিনটি উন্মাদ বুড়ী, আর একটি অল্পবয়স্কা মেয়ে (Louise) লুইস্ এখানে থাকে। লুইস্ ষোড়শী ও সুন্দরী। বুড়ীদের নাম বার্ণেস (Borgnesse) বোসীউ (Bossue) ও নর্ম্মাণ্ড্ (Normande).

প্রথম অঙ্ক আরম্ভে দেখা গেল, একজন সেবিকা—সিষ্টার উর্স্যুলা (Ursula)—বৃদ্ধা মাদাম রবিনের সঙ্গে আলাপে রত। জানা গেল যে লুইস্ সেরে গেছে, শীঘ্রই তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে। রবিন নিজেও এককালে উন্মাদ ছিল, বহুদিন সেরে গেছে, কিন্তু সে এখানেই থাকে কাজকর্ম্ম করে। বলে, ৪০ বছর এখানে আছি, বাকী জীবন এখানেই কাটিয়ে দেবো, এখন বাড়ী যাওয়া বৃথা, সকলেই পিছনে ফিস্‌ফাস্ করবে, ঘৃণা ও সন্দেহের চোখে দেখবে। কিন্তু ওই ছুটো শীর্ণকায়া বুড়ী যে আছে, নর্ম্মাণ্ড আর বোসীউ, ওদের সে মোটে বিশ্বাস করেনা, কি রকম

ক্রূর শয়তানী ভাব সে লক্ষ্য করেছে, বিশেষতঃ লুইস্‌কে ওরা দুজনে ভীষণ হিংসা করে তাকে নানাভাবে জ্বালাতন করে। ওদের মেয়ে মারা যাবার পর থেকে ওরা পাগল হয়ে যায়, কোন ভাল সুন্দরী মেয়েকে দুচক্ষে দেখতে পারে না, তাই লুইস্‌কে ভয় দেখায়, তার ওপর নানা উৎপাত করে। কিন্তু এমন চতুর, যখন সিষ্টার বা অপর কেউ থাকে তখন খুব শান্ত ভাব দেখায়। মেয়েটাকে একলা পেলেই নানারকমে ভয় দেখায়। (লুইস্ যে ঘরে শোয়, এই দুই বুড়ীও সেই ঘরেই শোয়। সিষ্টাররা কেউ রাত্রে এদের ঘরে থাকে না, এই এখানকার নিয়ম)। আর পাশের ঘরে যে পক্ষাঘাতগ্রস্তা বুড়ী (বর্গেস্) শুয়ে থাকে সেও কম শয়তানী নয়। বহু শিশুকে সে হত্যা করেছিল, বিচারকালে উন্মাদ সাব্যস্ত হয়ে এখানে এসে আছে কত বছর।··সিষ্টার কিন্তু রবিনের এসব কথায় নাক সেটকায়, সে উগ্র ধর্মান্ধ ক্যাথলিক, লুইস্‌কে সে মোটে পছন্দ করে না কারণ লুইস্ কখনো গির্জ্জায় বা প্রার্থনায় যোগ দেয় না। সিষ্টার বলে "ও কি রকম মেয়ে! ধর্মবিশ্বাস নেই, ভগবান মানে না, ওর বাপ-মা কিরকম শিক্ষা দিয়েছে মেয়েকে! ধর্মবিশ্বাস যার নেই সে আবার মানুষ কি, তাতে আর জানোয়ারে কোন প্রভেদ নেই।'

সেদিন বড় ডাক্তার রোগীদের পরিদর্শন করতে এসেছেন, আশ্রমের বাঁধা ডাক্তার তাঁকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরিয়ে সব দেখালেন, লুইসের কথা জানালেন যে ও সেরে গেছে, শীঘ্র ওকে ছেড়ে দেওয়া হবে, শুনে তিনিও খুশী হলেন। এদিকে লুইস্ বায়না ধরেছে তাঁকে কি বলতে বলতে চায়; সিষ্টার বাধা দেবার চেষ্টা করলে কিন্তু লুইস্ জোর করে এগিয়ে গেল। বড় ডাক্তার তাকে সস্নেহে জিগ্যেস করলেন কি বলতে চায়। লুইস্ ব্যাকুলভাবে তাঁকে বললে "আমাকে শীঘ্র এখান থেকে সরিয়ে দিন, আমার বড় ভয় করে, আমার বিরুদ্ধে কি একটা ষড়যন্ত্র চল্‌ছে বেশ বুঝতে পারি।" দুই ডাক্তারে মুখ চাওয়াচায়ি করলেন, সে কিসের ভয় পায় জিগ্যেস করলেন। লুইস্ বললে যে দিনে কোন গোলযোগ নেই, কিন্তু রাতে সিষ্টাররা কেউ ঘরে থাকে না, তখন ওই দুটো বুড়ী কত রকমে তাকে ভয় দেখায়। পাশের ঘরে থাকে যে বুড়ী, মাঝের চাবি দেওয়া দরজা খুলে সেও উঠে তার (লুইসের) শয্যার কাছে এসে কিরকম বিশ্রীভাবে তার দিকে তাকায়, আর তিনজনে কি ফিস্‌ফিস্ হাসাহাসি করে—ডাক্তার বললেন "সে কি কথা! বর্গেস্, ওই পাশের ঘরে যে থাকে, সে আজ ছ'বছর পক্ষাঘাতে পঙ্গু, চলে বেড়ানো ছেড়ে বিছানায় নিজে উঠে বসতে পারে না—তাছাড়া চাবি বন্ধ দরজা খুলে—

লুইস্ কোন কথা শোনে না, বলে, বাঃ, আমি নিজে দেখি সে রাত্রে আমার ঘরে উঠে আসে—

ডাক্তার তখন অপর ডাক্তারকে বললেন, এতো স্পষ্ট বিকৃত মস্তিষ্কপ্রসূত কল্পনা, তাহলে মেয়েটি তো সেরে যায় নি।

শেষ পর্যন্ত লুইসের কাতর অনুরোধে ডাক্তার কড়া হুকুম দিয়ে গেলেন যে রাতে সিষ্টার উর্স্যুলা লুইসের ঘরে শোবে।

অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্বেও সিষ্টারকে রাজী হতে হলো। অনিচ্ছার আরো কারণ এই যে, সেদিন সকালে সিষ্টার সাল্‌পিস্ (Sulpice) নামে এক সন্ন্যাসিনী মারা গেছেন, তাঁর মৃত দেহ গির্জ্জার মধ্যে রাখা আছে, প্রধানা "মাদার" (Mother Superior) হুকুম দিয়েছেন আজ রাতে সকল সিষ্টার সেই মৃত দেহ ঘিরে বসে পূজা প্রার্থনাদিতে রাত কাটাবে। উর্স্যুলা একে ধর্মান্ধ, তাতে লুইসের ওপর তার মোটে সহানুভূতি নেই, কাজেই সে এ অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত থাকতে চায় না। শেষ পর্য্যন্ত সে লুইস্‌কে ধমকে, ভয় দেখিয়ে, ভুলিয়ে রাজী করালে যে ডাক্তারের হুকুম সত্বেও সে (উর্স্যুলা) গির্জ্জাতেই রাত কাটাবে, লুইস যেমন একা থাকে তাই থাকবে। এইখানে প্রথম অঙ্ক শেষ।

দ্বিতীয় অঙ্কে স্থান একই, কেবল রাত হয়ে গেছে, একটা জানালা দিয়ে একফালি চাঁদের আলো এসে

ঘরের মধ্যে নিদ্রিতা লুইসের শয্যার ওপরে পড়েছে। সেল্‌ফের ওপরে একটা ছোট আলো মিট্‌মিট্‌ করে জ্বলছে। দূরে সমস্বরে স্তব পাঠের শব্দ শোনা যাচ্ছে। একটা ঘড়িতে রাত দশটা বাজলো।

বোসীউ ও নর্ম্মাগু নিজেদের শয্যার ওপরে উস্‌খুস্‌ করছে, একজন জিগ্যেস করছে "ঘুমিয়েছে কি ?" অপর বৃদ্ধা উত্তর দিচ্ছে "ঠিক ঘুমিয়েছে কি না দেখতে হবে। রোসো, কে যেন আসছে ?" দুজনে মট্‌কা মেরে শুয়ে পড়লো, খানিক পরে বললে, "নাঃ, এদিকে আসছে না"··· তারপর দুজনে কথোপকথন হচ্ছে—

"তাহলে আজ রাত্তেই তো ?"

"সে তো তাই বলেছে"—

"হুঁ, তার কথা আমাদের শুনতেই হবে, নইলে—

"হ্যাঁ, শেষে আমাদের কোন ক্ষতি করে বসবে···"

"সে যা চেয়েছিল মনে আছে ?"

"হ্যাঁ, একটা ছোট তোয়ালে"

"তোয়ালে তো পাই নি, বিছানার চাদর থেকে এক টুক্‌রো ছিঁড়ে নিলেই হবে।'

চাদর ছেঁড়ার শব্দে লুইসের ঘুম ভেঙে গেল, "ও কিসের শব্দ ?"

বোসীউ বললে "ঘুম ভেঙেছে যে—"

নর্ম্মাগু বললে, "চুপ্‌—"

লুইস্‌ বললে "কিসের যেন শব্দ শুনলুম, নিশ্চয়ই এই ঘরে কিছু—" চারদিকে চেয়ে দেখতে লাগলো।

নর্ম্মাগু। এইবার আমরা সঙ্কেতের জন্য অপেক্ষা করি ?

বোসীউ। হ্যাঁ, সঙ্কেত! মৃত্যু-সঙ্কেত!

লুইস্‌। আরে, ওরা কথা বলছে, তাহলে ঘুমোয় নি।

এইভাবে কিছুক্ষণ কেটে যাওয়ার পর দুই বুড়ী নানা-রকম ইশারা-ইঙ্গিত করে কথা বলছে আর খুব হাসছে।

হাঃ-হাঃ-হাঃ, ও মনে করেছে ওর পাগলামি সেরে গেছে!

হ্যাঁ, ভাবছে শীঘ্র আশ্রম ছেড়ে চলে যাবে!

(লুইস্‌কে লক্ষ্য করে) কোনো দিনও তুমি যাবে না।

হুঁ-হুঁ, যদি যাও তো জ্যান্তে আর এ ঘর থেকে বেরোবে না!

খানিক পরে পাশের ঘর থেকে একটা টানা শিস্‌ দেওয়ার শব্দ শোনা গেল। সকলে স্থির। দুই বুড়ী লুইস্‌কে শাসাচ্ছে—চুপ, নড়োনা, শব্দ কোরোনা—

সে খুব ভয় পাচ্ছে। তারপর দুই ঘরের মাঝের বন্ধ দরজা আস্তে আস্তে খুলে গেল, পক্ষাঘাতগ্রস্তা বুড়ী বর্ণেস্‌ এ ঘরে এলো। তিন বুড়ীই তখন লুইসের শয্যা ঘিরে দাঁড়ালো, লুইস্‌ ভয়ে হিম, অসাড় হয়ে গেছে। বর্ণেস্‌ লুইসের শয্যার ওপরে বসলো। আর দুই বুড়ী তার হুকুম তামিল করবার জন্যে খুব ব্যস্তভাব দেখাচ্ছে, তারাও ওকে ভয় করে। (তারপরে যা ঘটলো, সামান্য অংশ বাদ দিয়ে মূল নাটকের কথা উদ্ধৃত করে দেওয়া হচ্ছে)—

লুইস শয্যার ওপরে মূর্চ্ছিতপ্রায় পড়ে আছে, তিন বুড়ী তাকে নিয়ে ঘিরে রয়েছে।

বর্ণেস্‌। নর্ম্মাগু, তোয়ালে এনেছো ?

নঃ। হ্যাঁ, এই যে।

ব। আচ্ছা, তুমি ওর হাত দুটো চেপে ধরো। ছুঁচ আছে ?

বোসীউ। ছুঁচ ?

ন। বুঝেছি, সিষ্টার যাতে উল বোনেন, সেই বড় লম্বা কাঁটা—বো (খুঁজতে গিয়ে)। এই তো, সেল্‌ফের ওপরে, পেয়েছি ·

··· ··· ···

ব। ভাল দেখতে পাচ্ছি না।

বো। হ্যাঁ, তোমার আরো আলোর দরকার

ব। ছোট আলোটা কাছে আনো তো

বো। (আনলো) হবে ?

ব। আর একটু কাছে—

ন। হেঁঃ, মেয়েটাকে দেখলে মনে হয় যেন মরে গেছে!

ব। নাঃ, মরে নি, কেবল আমি ওর গলাটা একটু টিপে দিয়েছি। ভাখোনা, এখুনি জ্ঞান হবে—

(শেষাংশ ৮১ পৃষ্ঠায়)

হঠাৎ এ প্রশ্ন শুনে আমাকে ভুল বোঝার কোন কারণ নেই। আপনি কে? এ প্রশ্নের উত্তরে আমি শুধু জানতে চাইছি—বাংলা চলচ্চিত্র-শিল্পে বা ব্যবসায়ে আপনি কিভাবে জড়িয়ে রয়েছেন।

যদি আপনি একজন প্রযোজক হয়ে থাকেন,—তাহলে বাংলার বুকে আমার অভিজ্ঞতা আপনাকে বলবো,—লাখ টাকা খরচা করলেই লাখ টাকা লাভ হবে এ স্বপ্ন আপনার ভেঙ্গে যাক্। দেড় লাখ টাকা ছবির 'বাজেট' করে পঁচিশ হাজার টাকা জোগাড় করে কোন রকমে কাজে পা বাড়িয়ে ষ্টুডিয়ো বা কর্ম্মীবৃন্দের পাওনা টাকা বাকীতে 'ম্যানেজ' করে, সেট প্রপারটীজ বা কষ্টিউম কৃতজ্ঞতায় 'ম্যানেজ' করে, বেশী বখরায় ডিষ্ট্রিবিউটারের সহায়তায় টাকা 'ম্যানেজ' করে ছবি শেষ করবার দুর্বুদ্ধি যদি কেউ আপনাকে দিয়ে থাকেন তাহলে আপনি জানুন বন্ধুর পরিচয়ে তিনিই আপনার প্রথম শত্রু। আপনার মত বিচক্ষণ ব্যক্তি এটা নিশ্চয়ই বুঝতে পাচ্ছেন আরও দশটা জিনিষের পাশে আপনার জিনিষটাও যেখানে ক্রেতা হিসেবে দর্শক সম্প্রদায়কে যাচাই করে নেবার সুযোগ দিতে হচ্ছে, সেখানে ভাল-মন্দের প্রশ্ন ছাড়াও লৌকিকতা বা সামাজিকতায় আপনাকে আরও একবার ভাবতে বলছি,—জন্মের ইতিহাসই যে ছবির এত নোংরা,—সমাজে তার কিভাবে পরিচয় দেবেন?

আমি শুধু বলছি তাঁদেরই যাঁরা কোন অভিজ্ঞতা না নিয়েই প্রযোজনায় আত্ম-প্রকাশ করছেন। চলচ্চিত্র পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ না হোক অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যবসা, কিন্তু দুঃখ হচ্ছে আপনার মত প্রযোজক নিয়ে, ব্যবসার ধাক্কায় এসে অব্যবসায়ীর মত পা বাড়িয়ে শেষ পর্য্যন্ত নিজেই ফেঁসে গেলেন। আমাকে জানবার বা চেনবার চেষ্টা না করেই মধু খাবার তালে ঘুরে বেড়ালে এ শাস্তি তো আপনাকে পেতেই হবে! নিজের বাগান বাড়ীতে ফুলের চাষ করতে হলে যে পরিশ্রম দরকার কেনা-বেচার প্রশ্নে যদি সে ফুলকে কম্পিটিশনের বাজারে ছাড়তে হয় তাহলে নিশ্চয়ই আরও ঢের বেশী যত্নের প্রয়োজন। অভিজ্ঞ মালি যদি সে বাগান রক্ষার উপযুক্ত ব্যক্তি হয়ে থাকে তাহলে অনভিজ্ঞ কর্ম্মী, পরিচালক বা গল্পলেখকের কাছ থেকে দর্শক সম্প্রদায়কে উপহার দেবার মত সুন্দর ছবি কি করে আশা করতে পারেন! অথচ আপনার এই অনভিজ্ঞ প্রযোজনার কল্যাণে আমার দুরবস্থাটা একবার ভেবে দেখুন তো! নানা ফন্দী ফিকিরে ছবিখানা শেষ পর্য্যন্ত বাজারে বেরোনোর পর পরবর্ত্তী সপ্তাহেই যদি কোলকাতা ছেড়ে মার খাবার ভয়ে পালিয়ে বাড়ী গিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করি তাহলে অন্য প্রযোজকরা আপনার এই মূর্খতার হিসেব চাইবেন না আমার ব্যর্থতার ইতিহাসটাই ভবিষ্যতের নজীর ধরবেন?

দশ পনেরো বা কুড়ি হাজার টাকার প্রযোজক হয়ে শেষ পর্য্যন্ত দেবার ক্ষমতা থাকবে না জেনেও ষ্টুডিয়ো এবং শিল্পীদের সারা মাসের ডেট বুক করে এই যে মিটার চড়িয়ে রাখলেন এতে নিজের তো কিছু ভাল হোলই না উপরন্তু অল্প হ'লেও যেসব প্রযোজকের শেষ পর্য্যন্ত দেবার ক্ষমতা ছিল তাঁদেরও মিটারটি ডাউন করে চলচ্চিত্রের সর্বনাশ করে ছেড়ে দিলেন। বিপদ বুঝলে আপনি তো হাওয়া হয়ে যাবেন—একবার ভেবে দেখুন তো আমার ওপর আপনার এ অবিচারের কারণটি কি?

যদি আপনি একজন প্রদর্শক হয়ে থাকেন—তাহলে আপনাকেই সাবধান হতে বলছি সবচেয়ে বেশী। এ্যাংলো-আমেরিকান কায়দায় যেভাবে দোকান সাজিয়ে দর্শক সম্প্রদায়কে আকৃষ্ট করবার উপায় গ্রহণ করেছেন তাতে আমার যথেষ্ট সহানুভূতি রয়েছে। কিন্তু যাঁদের পরিশ্রমে বা অর্থে আপনার এ ব্যবসা তাঁদের ভাল-মন্দ সম্বন্ধে আপনার এই ঔদাসীন্য বর্ত্তমানে যুগোপযোগী হচ্ছে কি? নানা ভাগ্য বিপর্য্যয়ের ভিতর দিয়ে যদি কোন ছবি ষ্টুডিয়ো গেট পার

আপনি কে?

বীরেন নাগ

রাম

হয়ে দর্শক সমাজকে দেখবার সুযোগ পায় তাহলে আপনি দোকানদার হিসেবে মালটি যত্ন করে আপনার দোকানে তুলুন, মাল ভাল হলে ক্রেতার দলই আপনার পাওনা পুষিয়ে দেবে। অথচ "ধরি মাছ না ছুঁই পানি" এটা আপনার কোন্ ব্যবসায়ী চাল আমি ঠিক বুঝে উঠতে পাচ্ছিনে। প্রযোজনা ক্ষেত্রে আপনার কোন দান নেই উপরন্তু প্রদর্শনায় এমন ফাঁদ পেতে বসে আছেন যে, আপনার দোকান ভাড়াটি পর্য্যন্ত আক্কেল সেলামী হিসেবে প্রযোজককে দিয়ে যেতে হচ্ছে। হাউস দেখিয়ে ম্যানুফ্যাক্চারারকে আকর্ষণ করবেন, প্রটেক্‌শনের দোহাই দিয়ে তাঁকেই জবাই করবেন, বখরার হিসেবে পঞ্চাশ থেকে ষাট ভাগ তাঁরই ঘাড়ে চাপাবেন অথচ এত বাধ্যবাধকতা সত্ত্বেও কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার মত প্রযোজনা ক্ষেত্রে প্রযোজক বাঁচবেই এ নিশ্চয়তার আভাস আপনি কোথায় পাচ্ছেন ? আগে কন্যা-দায়গ্রস্ত পিতার দুরবস্থা বুঝতে চেষ্টা করুন তারপর পুত্রের পিতা হলেও আপনি সহায়তার চেষ্টা করুন—শোষণের নয়।

নিজের ব্যবসাটি পুরোপুরি বুঝছেন অথচ ছবির ভাল-মন্দ বোঝেন না এত ছোট করেই বা কেন আপনাকে বুঝতে বলছেন। হাউসে ছবি প্রদর্শনের আগে ভাল-মন্দ যাচাই করে নিন, দর্শকের চাহিদামত মনের আনন্দে ছবি চালিয়ে যান, প্রযোজককে বাঁচাতে আপনার নাগপাশ আরও একটু শিথিল করুন, কেননা নানা ঘটনার চাপে পড়ে যদি বাংলার শিল্প ডুবে যায়, হিন্দী বা ইংরাজী ছবি চালিয়ে দর্শকদের আকৃষ্ট করে যে মুহূর্ত্তে নিজের ব্যবসাটা চালু রাখতে চেষ্টা ক'রবেন,—এ পরিবর্ত্তনের যুগে দর্শকসম্প্রদায়ই আপনার মূল ব্যবসা-কেন্দ্রটী উচ্ছেদ করে দেবেন। সনাতনপন্থী পিতার কথা আবার একবার ভাবুন,—প্রচুর ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হয়েও একমাত্র পুত্রের কাছে মতবিরোধের অজুহাতে শেষ জীবনে প্রচুর দুঃখ ভোগ করতে হয়েছিল। এটা অন্যায় নয়,—যুগ ধর্ম্ম।

গত ছ'বছরে আপনি আরও ছ'খানা হাউসের মালিক হলেন কিন্তু কন্যার পিতার জ্বালা বুঝবার মত সহানুভূতি তো আপনার কাছে আজও পাওয়া গেল না ! আমাকে দিয়ে ব্যবসা করবেন অথচ আমাকেই এড়াতে চাইছেন ! চলচ্চিত্র ব্যবসা থেকে যে মোটা লাভের অঙ্ক সহজেই তেলের ব্যবসায় ঢেলে দিলেন কিন্তু একখানা ছবির প্রযোজনায় কিছুটা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে পরবর্ত্তী প্রযোজকদের এ ব্যবসায় একটু সহানুভূতি জানালে আপনার কি এমন ক্ষতিটা হ'ত বলুন তো' ! সমাজে বাস ক'রবেন অথচ সামাজিকতা স্বীকার করবেন না,—বাংলার মাটী হয়তো আজও এতটা সহ্য করতে শেখেনি।

যদি আপনি একজন পরিবেশক হয়ে থাকেন,—তাহলে আপনাকে ব'লবো ঘটকের যেমন বিয়ের আসরে কোন জায়গা থাকে না, এ চলচ্চিত্র-শিল্পে আপনার অবস্থাটাও ঠিক তাই। ভাল পাত্রের সন্ধান দিতে পারলে দুই তরফ থেকে ঘটক বিদায়ের ব্যবস্থাটী ভালভাবেই হ'বে, নয়তো বিপদের সম্ভাবনা বুঝলে নিজেই সুযোগ বুঝে গা ঢাকা দেবেন। যতদিন বিয়ের আলাপ-আলোচনা চ'লবে আপনার আতিথেয়তার কোন ত্রুটী হবে না, কিন্তু বিয়ে হয়ে যাবার পরও আনাগোনার অর্থ কি ?

প্রযোজক ছবি তৈরী ক'রলেন, প্রদর্শক তা প্রদর্শনের ভার গ্রহণ করলেন; অথচ ঘটক বিদায়ের সুযোগে আপনিও দেখছি শতকরা একটা ভাগের ব্যবস্থা করে বসলেন ! কিন্তু ছবি নেবার বেলায় যে উৎসাহের পরিচয় দিয়েছিলেন হাতে পাবার পর আপনার সে উৎসাহ কোথায় গেল ? কালোটাকা সাদাটাকা ইত্যাদি নানা চেহারার টাকা নিয়ে তো' নতুন নতুন খেলা খেলছেন, অথচ বাংলার বাইরেও যে বাংলা ছবি আপনার চেষ্টা থাকলে মোট খরচার প্রায় অর্দ্ধেক টাকা জোগাড় করে নিয়ে আসতে পারতো দয়া করে একটু সেদিকে নজর দিন না। তাতে তো' প্রদর্শকের সঙ্গে আপনার মাখামাখি কমছে না ?

আমি বলছি আপনিও একটু সদয় হোন, কেননা কন্যার পিতা যদি নিজের দুরবস্থার কথা চিন্তা করে সমাজের পীড়ন সহ্য করতে না পেরে অসামাজিক একটা কিছু করে বসেন, ঘটকালীর সুযোগ তখন কোথায় থাকবে ? প্রযোজকের দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে কিছু টাকা গুঁজে দিয়ে শতকরা হয়তো ত্রিশ ভাগ নিজের কোলে টেনে নিলেন

কিন্তু প্রদর্শকরাও যদি এ কারবারে লেন-দেন সুরু করেন তাহলে আপনার প্রজাপতি-আফিসটীর কি ব্যবস্থা হবে ?

নিজের বুদ্ধি বলে যে জায়গা জোগাড় করেছেন অন্যের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে সে বুদ্ধির আর অপমান করবেন না। সহানুভূতি বা সহায়তার আদান-প্রদানে দুর্দিনের পথ রোধ করুন, সত্যিকারের বন্ধুত্বের পরিচয় দিন।

যদি আপনি একজন ষ্টুডিয়ো মালিক হয়ে থাকেন,—তাহলে আপনি শুধু একবার ভেবে দেখুন এই যে চাতক পাখীর মত হাঁ করে আকাশের দিকে তাকিয়ে বৃষ্টির আশায় অপেক্ষা করছেন, শুধু হাঁ করে হাহাকারকে জাহির করলেই শীতকালটাই আপনার প্রয়োজনে বর্ষাকাল হ'তে যাবে কেন বলুন ত'! করে কোন্ পার্টি কিছু টাকা জোগাড় করে নিয়ে আপনারই ষ্টুডিয়োতে ছবি প্রযোজনা ক'রতে আসবেন, কিছু টাকা তাঁর কাছে পাবেন তবে আপনি গত তিন মাসের কর্ম্মীদের বাকী মাইনে চুকিয়ে দেবেন। অথচ গত বর্ষায় যখন লাভের অঙ্কে ফেঁপে উঠেছিলেন, তখন তো শীতকালের এই অনিবার্য্য জলাভাবের কথা আপনার একবারও মনে হয়নি! বোনাস বা মাইনে বাড়ানোর ভয়ে লাভের অঙ্কটী কর্ম্মীবৃন্দের কাছে গোপন রাখলেন, 'ইনকামট্যাক্সের' ভয়ে দু'খানা ছবি আরম্ভ করে প্রায় চার লাখ টাকা আটকে প'ড়ে গেছে বলে গভর্ণমেণ্টকে হিসেব বুঝিয়ে দিলেন। অথচ এত হিসেব করে যিনি চলতে জানেন, আজকে হঠাৎ তিনিই বা থেমে যাচ্ছেন কেন? শীতকালের দোহাই দিয়ে যাঁদের আপনার দুঃখে সমবেদনা জানাতে বাধ্য ক'রছেন বার্ষকালে তো আপনার পাশে দাঁড়ানোর ঠাঁই তাঁদের ছিল না। লাভটী শুধু আপনার নিজস্ব, লোকশানের বেলায় সেণ্ট পারসেণ্ট প্রত্যেকের ?

এক হিসেবে কিন্তু আপনিও প্রদর্শকের চেয়ে কোন অংশে কম যান না। প্রদর্শক,—হাউস, অপারেটার, ম্যানেজার, আসবাবপত্র ও কিছু মেসিনারী নিয়ে যে পদ্ধতিতে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন, আপনিও গুটীকতক কর্ম্মী, কিছু মেসিনারী ও দু'একটী ফ্লোর নিয়ে সমানতালে ব্যবসা চালাবেন ভাবছেন। কিন্তু প্রদর্শকের হাউস প্রোটেকশনের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু আপনার ষ্টুডিয়ো প্রোটেকশনের কোন ব্যবস্থা করতে পেরেছেন কি ? তাছাড়া প্রদর্শকের ব্যবসার কেন্দ্র হ'চ্ছে সারা পৃথিবীর ছবি, অথচ আপনার ভাগে পড়ছে শুধু বাংলার নগণ্য দু'একটী প্রোডাক্শন মাত্র তা আবার প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধে দিয়ে শেষ পর্য্যন্ত পার্টিকে ধরে রাখতে পারলে!

পুরোপুরী মরশুমে মাসে ছাব্বিশটী সুটিং ডে'তে বার করিয়ে, দিন রাত্তির কাজ করিয়ে, কর্ম্মীবৃন্দের কর্ম্ম-ক্ষমতা প্রায় নষ্ট করে ফেলেছেন অথচ পাওনা টাকা ও ওভার-টাইমের বেলায় তো দেখছি দিব্বি পার্টিকে ঠেকিয়ে দিচ্ছেন। পার্টির ছবি রিলিজ হবে, প্রদর্শকের ও পরিবেশকের পাওনা শতকরা হিসেব চুকিয়ে প্রযোজকের ভাগে যখন টাকা আসবার সময় হবে সেদিন থেকে আপনি আপনার জমা খরচের খাতা খুলবেন,—কিন্তু পাওনা টাকা পেতে ততদিন আপনার কর্ম্মীবৃন্দ বেঁচে থাকবেন কি ?

আপনি তো হিসেব ক'রছেন,—চার পাঁচশো টাকার কম 'ডে' পেলে আপনার ষ্টুডিয়ো চলবেনা, অথচ পাশের বাড়ীর ধর্ম্মপ্রাণ ব্যবসায়ী ভদ্রলোক যে বলছেন—তিনি তিনশ' টাকা করে 'ডে' নেবেন। নিজের বাড়ীর লোককে তো ধমকে ঠাণ্ডা করে দিচ্ছেন, যান না ভবিষ্যতের দোহাই দিয়ে ওবাড়ীর বন্ধুটীকে একটু 'ম্যানেজ', করে আসুন না! কিন্তু সেখানে হয়তো আপনারও যা'বার উপায় নেই, বাংলার চলচ্চিত্র-শিল্পটীকে অক্টোপাসের মত গ্রাস করতে তিনি যে ফাঁদ পেতেছেন, আপনিও হয়তো জেনে শুনেও গোপনে সেখানেই ধার করে বসে রয়েছেন।

তাইতো বলছি, যৌবন বিক্রী করে যখন আপনাকে খেতে হচ্ছে না, আলো জালিয়ে খদ্দেরের অপেক্ষায় বসে থাকবার আপনারও উদ্দেশ্যটা কি ? ধীরে ধীরে পলতের অভাবে যে আলোটী লালচে আভা দিচ্ছে, সেদিকে নজর দিচ্ছেন কি ? পলতে পালটে ফেলুন, "আজ নগদ কাল ধার" লিখে একটী বোর্ড অফিসে ঝুলিয়ে দিন, বছরে যে ফিল্ম কোটা আপনার ষ্টুডিয়োর ভাগে পড়ছে তারই সদ্ব্যবহারের উদ্দেশ্যে প্রযোজনায় নামুন। নিজের খাবার ব্যবস্থা নিজেই করুন, কার্য্যক্ষেত্রে কর্ম্মীবৃন্দের সহানুভূতির সহায়তা করুন, নিজের ব্যানারে নিজেই প্রযোজনা করুন,

বাজেট কম করতে চেষ্টা করুন, গুণী ব্যক্তির সমষ্টিতে নতুন স্বষ্টির সন্ধান দিয়ে দর্শক সম্প্রদায়কে জয় করুন,—সংগ্রামের পর স্বাধীনতা, এইত ধর্ম্ম।

যদি আপনি একজন কর্ম্মী হয়ে থাকেন,—তাহলে বুঝুন দেহের সঙ্গে মনের, মগজের সঙ্গে বুদ্ধির যে সম্বন্ধ তার চেয়েও ঘনিষ্ঠভাবে নতুন স্বষ্টির সন্ধানে একে অন্যকে জড়িয়ে রয়েছি। পারিবারিক অশান্তি, সামাজিক জীবনের তিক্ততা আপনার চলার পথ রোধ ক'রতে পারবে না। শুধু মাত্র পেটের জ্বালায় স্বষ্টির আনন্দ বা সাধনার স্বপ্নকে বিসর্জ্জন দিয়ে মূল্যের বিনিময়ে নিজস্ব সত্বাকে কখনই কোন অবস্থাতেই বিক্রী ক'রবেন না। এটা কাব্য নয়, এইটাই স্রষ্টার জীবনে চরম ব্রত। তবে সাধনার দীক্ষাকে গ্রহণ না করে শুধু টাকার দুঃস্বপ্নকে মাথায় নিয়ে কর্ম্মীর পরিচয় দিয়ে যদি এই চিত্র-শিল্পকে গ্রহণ করে থাকেন, তা'হলে গোড়াতেই আপনাকে সাবধান হতে ব'লছি। প্রতি মুহূর্ত্তেই নিশ্চিন্ত-অনিশ্চয়তাকে বরণ করে নেবার মত মনের জোরও আপনার শেষ পর্য্যন্ত থাকতে পারে না,—কেননা আপনি শুধু টাকা চাইছেন যে!

দুর্দ্দিনের দোহাই দিয়ে শুধু নিজেকে বাঁচাতে যেভাবে শিল্প-স্বষ্টি করছেন একবার ভেবে দেখুন না এর পরিণতি কি হতে পারে? পৃথিবীতে কে কবে অর্থের বিনিময়ে ওজন দরে শিল্প স্বষ্টি করে দেশ বা জাতির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল ক'রতে পেরেছে? স্বষ্টির গোড়ায় যে শিল্পবোধ আর সেই বোধশক্তি গড়ে ওঠে অসীম ত্যাগ ও সাধনার বিনিময়ে। তাইতো ভাবতে ব'লছি,—বর্ত্তমানে একটু ত্যাগ ও স্বীকার করে মুমূর্ষু বাংলার চলচ্চিত্র-শিল্পটি'কে ভবিষ্যৎ শিল্প-স্বষ্টির রাস্তায় তুলে ধরুন,—আমি বাঁচলে আপনিও নিশ্চয়ই বাঁচবেন।

যদি আপনি একজন শিল্পী হয়ে থাকেন,—তাহলে আমার বিচারে আপনি নিজের ওপর অবিচার করছেন সবচেয়ে বেশী। এই যে বহুরূপীর সাজ ধরে দিনে রাত্রে অন্ততঃ পক্ষে তিন জায়গায় রাজা উজীরের ভূমিকায় অভিনয় করে বেড়াচ্ছেন এটা আপনার শিল্পী জীবনের স্বপ্ন না শিল্পের বিনিময়ে স্বার্থের দোকানদারী? শিল্পীর পরিচয়ে সুন্দরের সাধনায় আপনার দেহের সাড়া পেলেও প্রাণের সাড়া পাচ্ছিনে কেন? আমি জানি যৌবনই আপনার রোজগারের একমাত্র মূলধন, অতএব ভবিষ্যতের চাহিদাও বর্ত্তমানকেই কেন্দ্র করে গুছিয়ে নিতে হবে। কিন্তু এত অল্পতেই আপনার যৌবন শেষ হয়ে যাচ্ছে কেন?

বর্ত্তমানে যে ক'খানা বাংলা ছবি চলছে আপনি তো প্রায় সবগুলি ছবিতেই বিভিন্ন ভূমিকায় বিরাজ করছেন,—কিন্তু যদি দর্শকের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করেন তাহলে বুঝবেন,—আজ যিনি স্নেহান্ধ পিতা কাল তিনিই দস্যু, আজ যিনি আদর্শ জননী কাল তিনিই বারবনিতা, আজ একান্ত প্রিয়তমা যিনি, তিনিই যদি কাল ডাইনীরূপে একই সপ্তাহে দর্শকসম্প্রদায়ের কাছে আত্মপ্রকাশ করেন তাহলে দর্শকের আত্মাই খাঁচাছাড়া হয়ে যাবার উপক্রম হয়, অভিনয় প্রতিভাকে বিচার করা তো অনেক পরের কথা।

অবশ্য কম পারিশ্রমিকের দোহাই দিলে যুক্তিতে আমার কাছে জিতে যাবেন কিন্তু তাতে দর্শকের চাহিদা বা যৌবনের মেয়াদ বাড়বে না। তবে দর্শকের চাহিদা থাকলে আপনিও চলচ্চিত্র-শিল্পে বেঁচে থা'কবেন। সারা ইনডাষ্ট্রীতে যেখানে দুর্য্যোগ চলছে সেখানে শুধু স্বতন্ত্রভাবে আপনার দুর্গতির দোহাই দিলে যদি কিছু ভবিষ্যতের ব্যবস্থা হয় হোক,—কিন্তু চাহিদার বেশী আত্মপ্রকাশ করলে আত্ম-হত্যার সর্ব্বনাশও ভবিষ্যতে আপনাকে পাগল করে দেবে। লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।

যদি আপনি একজন দর্শক হয়ে থাকেন,—তাহলে প্রথমেই আমার সশ্রদ্ধ ভালবাসা গ্রহণ করুন। পরাধীন দেশেই স্বাধীন দেশের শিল্পের অনুপ্রেরণায় আমার জন্ম হয়েছিল, দুঃখে দারিদ্র্যে আপনাদেরই সহানুভূতিতে আমি কথা বলতে শিখেছি, হামাগুড়ি দিয়েও সারা ভারতকে বাংলার শিল্প-স্বষ্টি সম্বন্ধে সজাগ করতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু বর্ত্তমান স্বাধীন দেশে যে চলাফেরার গণ্ডী আমাকে বেঁধে দেওয়া হয়েছে তাতে আমার আত্মহত্যা ছাড়া অন্য কোন রাস্তা খোলা নেই; কিন্তু কেন?

ন্যায় অন্যায়, ভাল মন্দ বিচার যদি জনসাধারণের তরফ থেকে আংশিকভাবেও আপনার ওপর এসে থাকে তাহলে আমাকে নিয়ে যাঁরা এভাবে ছেলেখেলা করছেন আপনি কেন তার প্রতিবাদ করছেন না ? কোলকাতা এবং তার আশপাশের সিনেমা-হাউসগুলির খবর নিয়ে জানুন প্রায় শতকরা সত্তর ভাগেরও হয়তো বেশী ইংরেজী বা হিন্দী ছবি চলছে। সস্তা সেক্স বা নাচ গানের আকর্ষণে আপনার পয়সা অন্যে লুটে নিয়ে যাবে, অথচ ইজ্জতের ভয় দেখিয়ে, দেশ ও জাতির কল্যাণের দোহাই দিয়ে ঘোমটার বোঝা আমার মাথায় চাপিয়ে দিয়ে, দয়া করে আমাকে বাঁচিয়ে রেখে এভাবে অবহেলা করবার হেতুটী কি ঠিক বুঝতে পাচ্ছিনে ! আমার যদি প্রয়োজন থেকে থাকে তাহলে যোগ্য আসনে বসিয়ে বাঁচবার রাস্তা পরিষ্কার করে করে দিন, নিজেদের অক্ষমতায় যাঁরা আমাকে অকেজো করে ফেলেছেন তাঁদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করুন, যেসব প্রদর্শক বাংলার শিল্প ধ্বংস হচ্ছে জেনেও বেশী লাভের লোভে সস্তা ছবি দেখিয়ে বাঙ্গালীর রুচি কুৎসিত ক'রে ফেলছেন, তাঁদের সাবধান করুন, আর বিশেষ মিনতি করুন তাঁদের যাঁরা বাংলা ছবি 'ভাইবোন' ভাল হয়নি শুনেই অন্যের যাবার পথ রোধ করতে চেষ্টা করেছিলেন, যথা হিন্দী ছবি 'ভাইবোনের'—স্ত্রী অঙ্গের বিশেষ পোষ্টার দেখেই, কোন বিচারের অপেক্ষা না করেই নাইট শো'র টিকিট বুক করে ফেললেন ! অন্যের বাড়ীর নগ্নতা সম্বন্ধে মানুষের স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা থাকতে পারে কিন্তু মানুষ হিসেবেই আবার নিজের বাড়ীর অভাব-অভিযোগ শোনাটাও কি কম প্রয়োজনীয় ?

বাংলা ছবি ভাল হচ্ছে না বলে কেন আপনি সরে দাঁড়াচ্ছেন ? প্রতি টিকিট পিছু যে আমোদকর আপনার কোলের ছেলেটীর জন্যেও গভর্ণমেণ্টের অর্থ-ভাণ্ডারে জমা দিয়ে আসছেন—একবার সে অর্থের কি সদ্ব্যবহার হচ্ছে গভর্ণমেণ্টের কাছে জানতে চাইবেন কি ? বাংলার চিত্র-শিল্প হাবুডুবু খাচ্ছে দেখে জনসাধারণের তরফ থেকে গভর্ণমেণ্টকে কিছুটা লোকসানের অংশীদার হতে অনুরোধ করবেন কি ? অনিশ্চয়তার মাঝে যেসব প্রযোজক শেষ পর্য্যন্ত খেই হারিয়ে যান,—গভর্ণমেণ্টের সহায়তায় সেইসব ছবি শেষ করে দেবার সুযোগ গভর্ণমেণ্টকে করে দিতে বাধ্য করবেন কি ? তাতে ব্যবসার উন্নতি হবে, শিল্প বেঁচে যাবে, আবর্জ্জনাও সরে দাঁড়াবে।

আপনি জানুন,—গত ক'বছরে এই বাংলা দেশেই খানিকটা করে কাজ এগিয়ে অন্ততঃ আশীখানা ছবি বন্ধ হয়ে গেছে। অথচ প্রশ্ন করুন কাঁরা সেসব প্রযোজক বা কাঁদের টাকায় এ প্রযোজনার পাগলামী, কোন জবাব পাবেন না। অথচ আমাকে নিয়ে এই যে অরাজকতা, উশৃঙ্খলতা এ তো আমি কোনদিনই চাইনি, আমি চাইছি তাঁদের যাঁরা আমাকে ভালবাসেন, বুঝতে চেষ্টা করেন, দেশের শিল্পকে বাঁচাতে চান,—দেশেরই শিল্পের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করে দিতে প্রয়াস পান।

এই চলচ্চিত্র-শিল্পে সঙ্ঘ প্রযোজকদের আছে, কর্ম্মীদের, শিল্পীদের, প্রদর্শকদের এমনকি হয়তো পরিবেশকদেরও রয়েছে কিন্তু আমার সঙ্ঘ তো আপনাদের নিয়েই গড়ে তুলতে হবে, তবে কেন ঐ সহজ সত্যটী আপনি এড়িয়ে যেতে চাইছেন ?

সর্ব্বভারতীয় সমস্যায় চিরদিনই বাংলাকে যে ব্যর্থতার হিসেব গুণতে হয়েছে নতুন করে আপনাকে অন্ততঃ তার হিসেব দেবার কোন প্রয়োজন নেই ; কিন্তু চলচ্চিত্র-শিল্পের উন্নতির জন্যে ভারত গভর্ণমেণ্টের তরফ থেকে যে ফিল্ম-এন্‌কোয়ারী কমিটী গঠিত হয়েছে, বাংলাকেও তাঁরা সেখানে একটু জায়গা ছেড়ে দিয়েছেন শুনছি। চিত্র-শিল্পের উন্নতির পথ পরিষ্কার হলে ভাবনার আর কিছু নেই, তবে বাগানবাড়ীর সংশোধন অর্থ যদি হয় চারা গাছ শুদ্ধ উপড়ে ফেলা, দুর্ভাবনা একটু বাড়বে বৈ কি ? অবশ্য এ ক্ষেত্রেও, ভগবান ভরসা !

যাই হোক আপনার কাছ থেকে আমার বিদায় নেবার কোন উপায় নেই কেননা আমিই বাংলা চলচ্চিত্র-শিল্প।"

আরও ছোট্ট একটি প্রশ্ন করে আজকের মত থামতে চাইছি,—এই যে এত কর্ম্মী, শিল্পী, প্রযোজক, প্রদর্শক, ছবি, পরিবেশক অথবা ষ্টুডিয়ো মালিক আমার চারদিক জুড়ে রয়েছেন,—আমাকে নিয়ে এঁরা সব, না এঁদের নিয়ে আমি ? যদি আমাকে নিয়ে এঁরা সব হয়ে থাকেন তাহলে,

এস্. বি. পিকচার্সের আগামী চিত্র-নিবেদন বনফুলের 'দ্বৈরথ' চিত্রে
পাহাড়ী সান্যাল ও বীরেশ্বর সেন
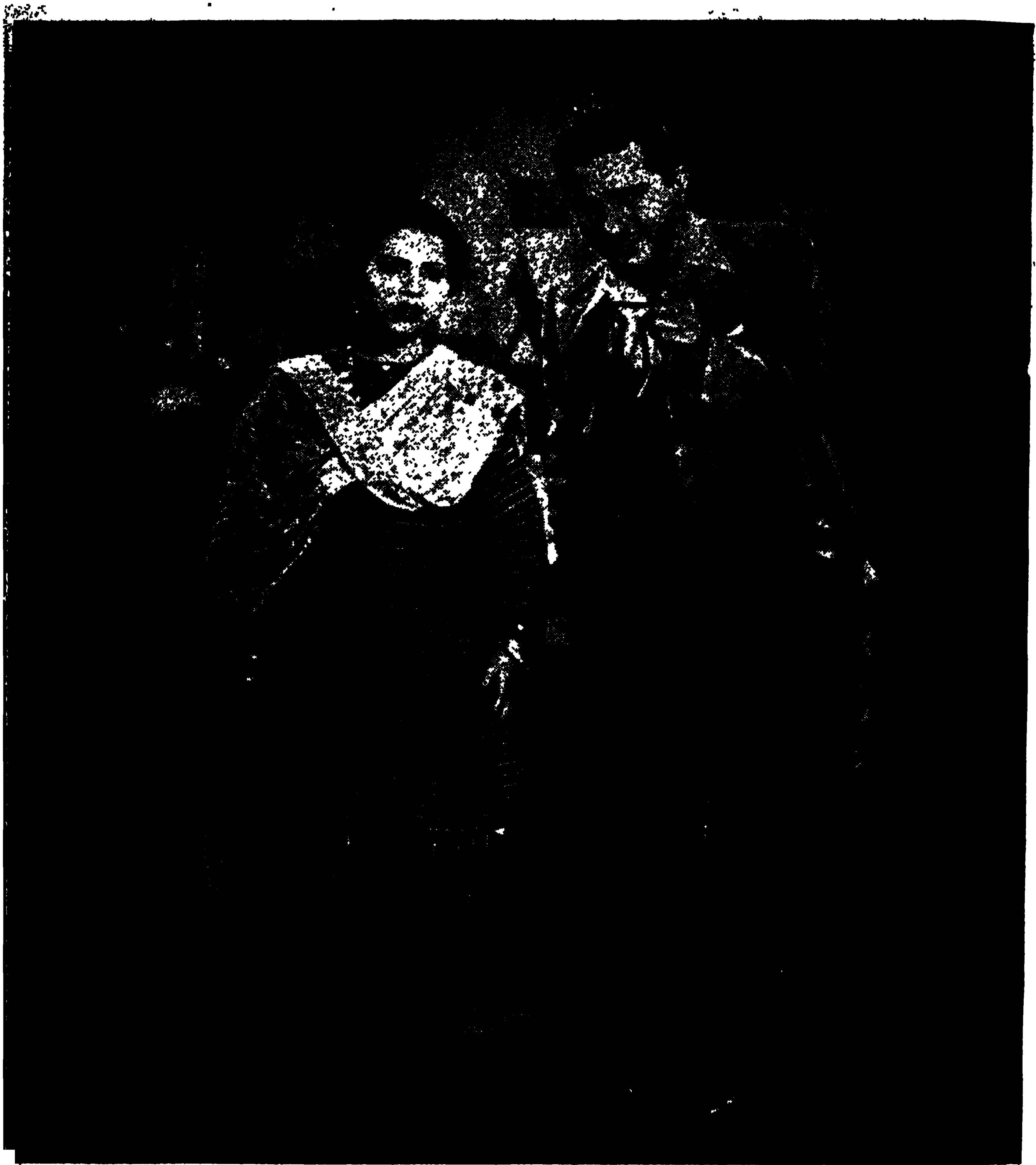
হিন্দী 'দো-বাতে' চিত্রে রমলা ও সুন্দর

আমার কথার ব্যঙ্গোক্তি করে তর্কের অবতারণার কোন কারণ নেই। আমার অনুরোধ, আমাকে শুধু জানুন, বুঝতে চেষ্টা করুন। ভালবাসার দোকানদারীতে বাঁচবার সুযোগ দিন্। আর যদি এঁদের নিয়ে আমি হয়ে থাকি, তাহলে আমার প্রতি কি আদেশ জানতে চাইছি। অবশ্য তার আগে আমার প্রশ্ন—'আপনি (আমার) কে?' এ প্রশ্নের নিশ্চয়ই আগে জবাব দিয়ে নেবেন।

নাটকে বীভৎস রস

(৭৫ পৃষ্ঠার পর)

ভাখোনা, এখুনি জ্ঞান হবে—

লুইস্ (ছট্‌ফট্ করছে)—আঁ—আমি কোথায়?

ব। এই, অতো ছট্‌ফট্ করিস্ নি

লু (সাদের সকলকে দেখে) তোমরা আমাকে কি করবে?

ব। কাঁদিস্ না, তোকে কিছু করবোনা, কেবল ওই তোর চোখ দুটো—

(নর্মাও আর বোসীউ খুব হাসছে)

ব। এই, চুপ। শোন, তোর একটা উপকার আমরা করবো। তুই তো পাগল হয়ে গিয়েছিলি, মনে আছে তো?

বো ও। তা আর মনে নেই, নিশ্চয় মনে আছে।

ব। শোন, তুই যখন পাগল হয়ে গেছিলি, একটা জানোয়ার তোকে পেয়েছিল—একটা প্যাঁচা! সেটা এখনো তোর দেহের ভেতরে আছে। এই! আবার যদি চেঁচাবি তো এমন গলা টিপে দেবো। শোন্, বুঝিয়ে দিই। আমি সেই প্যাঁচাটাকে বের করে দেবো।

লু। না, না, ওগো, দয়া করো, দয়া করো—

ব। বুঝছিস্ না?

লু। ওগো, তোমার পায়ে পড়ি—

ব। আরে, তোর ভালো'র জন্যেই তো—

লু। তোমরা আমাকে মেরে ফেলবে

ব। এতে তুই মরবি কি করে?

লু। ওগো, কে আছ, বাঁচাও—

ব। চুপ কর্ বলছি! এ, চট্‌পট্ সেরে নিতে হবে। আর চেঁচাতে দিলে চলবে না! চুপ্! ভাখ্ না, এখুনি হয়ে যাবে। প্যাঁচাটা কোথায় আছে আমি জানি, কিন্তু এখন তাকে খুঁজে বের করাই তো মুস্কিল।

(সজোরে লুইসের বুকে ছুঁচ প্রবেশ করিয়ে দিল)

আঃ! এই তো, কেমন গরম! কেমন তাজা! ঠিক বহুদিন আগের শত্তুরগুলোরও ঠিক এমনি—

(ডান দিকে পদশব্দ শোনা গেল। চাঁদের আলো এসে শয্যার ওপরে লুইসের দেহের ওপরে পড়েছে)

চুপ্ চুপ্

(আলোটা সেলফে রেখে এসে তিন বুড়ীই খাটের পাশে লুকিয়ে পড়লো, বাইরে কথা শোনা গেল—)

"হ্যাঁ, কি যেন একটা শব্দ শুনতে পেলাম, সিষ্টার কেউ ডাকছিলে কি?"

(ঘরের চৌকাঠে এসে একজন সিষ্টার দাঁড়ালো)

নাঃ, সবই তো চুপচাপ। চলো, মাদার আবার গির্জে ছেড়ে আসা পছন্দ করেনা"

(দূরে সমবেত নারীকণ্ঠে স্তোত্র পাঠ শব্দ শোনা গেল)

"হ্যাঁ, সিষ্টার, তাহোলে ভুল হয়েছিল। তুমি ঠিক বলেছো, চলো, আমরা গির্জায় ফিরে যাই।"

প্রিয় সম্পাদকভায়া,

তুমি এখনও বেঁচে আছ, অর্থাৎ, তোমার কাগজ এখনও বেঁচে আছে দেখে তাজ্জব ব'নে গেছি! ম্যাজিক-ট্যাজিক শিখছো নাকি? একমাত্র ম্যাজিক ছাড়া আর কিছুতে তো বাঁচার পথ দেখছি না! রেশনের চাল কমে গিয়েছে, তবু লোক দুবেলা খাচ্ছে, ম্যাজিক ছাড়া তা সম্ভব কিসে? জিনিষপত্রের দর বেড়ে চলেছে, তবু দোকানে দোকানে অসম্ভব ভিড, ম্যাজিক ছাড়া এ হয় কি ক'রে? বাঙ্গালী ছেলেমেয়ে হিন্দী জানে খুব কম, তবু হিন্দী ছবি তারাই দেখে বেশি—এটাই বা সম্ভব হয় কিসে, এক ম্যাজিক ছাড়া?

সব দেখেশুনে আমি এই বুঝেছি যে, বাংলাদেশের ভাগ্য-স্থানের তুঙ্গীতে বাস করছে এখন ম্যাজিক! এই দেখ না বেশ কিছুদিন ধরে ক'লকাতায় ম্যাজিকের epidemic গেল। মিশর থেকে এলেন গোগীয়া পাশা, মার্কিন মুল্লুক ঘুরে এলেন পি, সি, সোরসার। তা ছাড়া, নিউ এম্পায়ার, ছায়া এবং অন্যান্য রঙ্গমঞ্চেও একে একে আবির্ভূত হলেন—প্রঃ সোম, প্রঃ দাসগুপ্ত, প্রঃ আলতাস, প্রঃ যতীন সাহা আরও কত পেশাদার ও নেশাদার যাদুকর। গোগীয়া পাশা চোখ বেঁধে জনবহুল রাস্তায় সাইকেল চালাচ্ছেন, পি, সি, সোরসার নারীদেহ দ্বিখণ্ডিত ক'রে জোড়া লাগাচ্ছেন—এতেই সবার চোখ ধাঁধিয়ে গেছে। কিন্তু আরও একজন শক্তিশালী ম্যাজিশিয়ান যে খেল্ দেখাচ্ছেন তার দিকে কারো নজরই পড়ছে না।

তিনিও সোরসার। অর্থাৎ বিধান-সরকার। বাস্তুহারাদের মানসিক পুনর্বসতির জন্য তিনিও এক জবর খেল বের করেছেন। 'ভাঙ্গাগড়া' নাটক দেখিয়ে তিনি নাকি বাস্তুহারাদের ভাঙ্গা মন গ'ড়ে তুলবেন। একি কম কথা ভাইরে! লালদীঘির ওতোরপাড়ের মুন্সীখানায় সেইজন্যেই নাকি এদেশের নামকরা অভিনেতা-অভিনেত্রী, গায়ক-গায়িকাদের প্রায়ই দেখা যাচ্ছে। সেপাই-শাস্ত্রী আর জানালার ধারে-বসা কেরাণীরা শুধু বলাবলি করছে, একি ম্যাজিক দেখছি নাকি রে! রাইটার্স-বিল্ডিংসে 'ডাঃ ভোস', 'কোনো এক গাঁয়ের বধূ'! আমাদের ত্রিলোচনদার আর্দালী একাদশী পাকড়াশী সেদিন আবার বলছিল—জানেন কর্তা, এবার এক নতুন মন্ত্রী আসছেন থ্যাটার ছিনেমা বিভাগের জন্যি! জিজ্ঞেস করলাম—তার নামডা কি? একাদশী জবাব দিলে—কেন, শোনোনি—নিশাচর ভেলে? সম্পাদকভায়া! এইবার তোমার সুযোগ! বলতো, তোমাকে তাঁর পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী করে দেবার জন্য সুপারিশ করি। কাগজ চালোনার ঝঞ্ঝাট থেকে বেঁচে যাবে।

আর এক ম্যাজিক দেখাচ্ছেন ফিলিম-ছাঁটাই-দল। দলের পাঁচজন ভোট দিয়ে বল্লেন—এবারে '৪২' মুক্তি পাক। মাত্র দু'জন বললেন—না, কখনই না! লোকে জানে, ভোট বেশি পেলেই জয় হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে দুয়েরই বাজীমাৎ! পাঁচের কুপোকাৎ! দুই প্রভু গিয়ে গোবরমিণ্ট (যে মিণ্টে গোবর তৈরী হয়)-এর পায়ে পড়ে আরজি জানালেন, মহাপ্রভু রক্ষে করুন। পঞ্চবাণ '৪২'-কে বাজারে ছাড়ছে, আমরা দুই নেত্র দেখি কি করে? মহাপ্রভুর দয়ার শরীর। তিনি সব সহ্য করতে পারেন কিন্তু কান্না সহ্য করতে পারেন না। অমনি, ক্যাবিনেটের মীটিং বসলো—

সাব-কমিটি গঠিত হলো ছ'জন মন্ত্রীকে নিয়ে। পাঁচজন বিপক্ষে আর একজন পক্ষে রায় দিলেন। আর যায় কোথায়—দুই নেত্রের জয় জয়কার। তাঁরা '৪২' এর কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিলেন গোবরমিণ্ট নারাজ, কাজেই-'৪২' আর মুক্তি পাবে না। এ কি সোজা ম্যাজিক?

ঘটনাক্রমে তোমাদের এক নামজাদা অভিনেত্রীর সঙ্গে কিছুদিন আগে আলাপ হলো। তাঁর কাছে শুনলাম আর এক ম্যাজিকের কথা। তিনি এক নতুন ছবিতে নায়িকার অংশে অভিনয় করেছেন। ছবি তোলবার আগে তিনি পনেরো দিনের জন্য চুক্তিবদ্ধ হন। কিন্তু সাতদিন কাজ করার পর তিনি অবাক হয়ে লক্ষ্য করেন যে, সে ছবিতে কাজ করার জন্য কেউ আর তাঁকে নিতে আসছে না। খোঁজ নিয়ে তিনি জানতে পারলেন, ছবি নাকি শেষ হয়ে মুক্তির প্রতীক্ষায় দিন গুনছে। কি সাংঘাতিক ম্যাজিক রে বাবা! নায়িকা বোঝবার অবকাশই পেলেন না, তাঁর পার্ট শেষ হ'লো কি না, অথচ, সত্যি তা শেষ হয়ে গেল। আমি জিজ্ঞেস করলাম ছবির নাম কি? তিনি বললেন—ম্যাজিকের যা বাংলা হয় তাই। বুঝলাম—যাদুজাল, ভোজবাজী বা ঐ ধরণের কিছু একটা হবে! তাহলেই বোঝ, বাংলাদেশের ভাগ্যাকাশের তূণীতে এখন ম্যাজিক ছাড়া আর কে আছে?
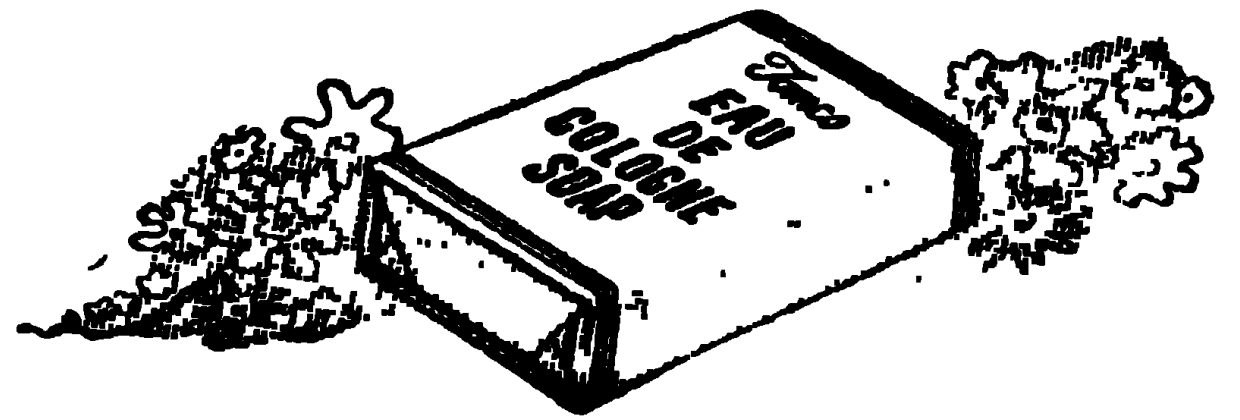
তিনটী ছবির out-door শ্যুটিং-এর কথা। ছবি তিনটীর নাম, যথাক্রমে,—ধরৃত্তি কে লাল, A tiny thing brings death ও Our India বা 'হিন্দুস্থান হামারা'।

প্রসঙ্গতঃ বলা চলে যে এই তিনখানি ছবিই আন্তর্জ্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে ভারতবর্ষের প্রতিনিধিত্ব করবার গৌরব লাভ করেছে।

'ধরৃত্তি কে লাল' তোলা হয় ১৯৪৫-৪৬ সালে। বহির্দৃশ্য তোলার জন্য প্রথমে আমরা যাই পুণার নিকটবর্ত্তী দিকৃসাল বলে এক জায়গায়। সে এক বিরাট ফার্ম্ম। নানান্ রকম ফলের বাগান ও নানান্ রকম শস্যের ক্ষেত মিলে তার বিশাল পরিধি। তারই মালিকের সৌজন্যে আমরা সেখানে গিয়েছিলাম, তাই আমরাও সেখানে 'বাবু' ছিলাম, সেখানকার ক্ষেতমজুরেরা আমাদের কাজ ক'রে দিয়েছে কিন্তু আত্মীয়তা করেনি। তাছাড়া সেখানকার বাগান, ক্ষেত বা জলের নালা এতো সুবিন্যস্ত ছিল যে ভারতবর্ষের সাম্প্রতিক গাঁয়ের আবহাওয়া সেখানে একদম ছিল না, তাই আমাদের কিছু টুক্‌রো টুক্‌রো ছবি নিয়েই ফিরতে হয়েছিল। তখনও তাই বুঝিনি out-door শ্যুটিং এর আনন্দ কী!

বুঝলাম একটা অত্যন্ত অজ মারাঠী গ্রামে গিয়ে,—ধুলিয়া স্টেশন থেকে অনেক ভিতরে—গ্রামের নাম কাপাড়্‌নে।

গাড়ী আমাদের গ্রামের বসতির ঠিক বাইরে ছেড়ে দিল কারণ গ্রামে ঢুকতে হ'লে নদী পার হয়ে যেতে হয়। ছোট্ট পাহাড়ী ধরণের নদী, পায়ের গোছ পর্য্যন্ত জল। সেইটা পায়ে হেঁটে পার হয়ে অপরদিকের উঁচু পাড়ে পৌছলে—গ্রামের বাড়ীঘর। অদ্ভুত গ্রাম। খোলার চালের মাটীর বাড়ীই বেশী, কিন্তু সাম্‌নের দাওয়াটায় মোটা মোটা কাঠের থাম দেওয়া, আর সেইসব থামে নানা পৌরাণিক মূর্ত্তি খোদাই করা। পাকা মন্দির আছে একটি, আর তার সংলগ্ন আছে একটা ধর্ম্মশালা। ছোট্ট ছোট্ট দোকান আছে। পাড়ার মধ্যেকার পথের মতো সরু সরু ঘনিষ্ঠ রাস্তা এঁকে বেঁকে গেছে। পৌছেই মনে হোল একটা বহু পুরোনো সভ্যতার পীঠে এসে পৌছেছি। আমাদের অভ্যর্থনা ক'রে থাকতে দেওয়া হোল সেই ধর্ম্মশালায়, মেয়েরা রইলেন নিকটেই একটা সংসারের মধ্যে।

প্রতিদিন অন্ধকার থাকতে উঠে মেক্-আপ সেরে শীতে কাঁপতে কাঁপতে আমরা রওনা দিতাম। খোলা একটা লরী অপেক্ষা করতো নদীর ওপারে, আর সেই শীতের ভোরে আমাদের জল ভেঙে গিয়ে তাতে চড়তে হোত। লরী চলতে সুরু করলে ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপ্‌টায় নাক থেকে প্রচুর কাঁচা জল ঝরা সুরু হোত আমাদের।

সেইভাবে প্রায় মাইল ত্রিশ পেরিয়ে এক বিশাল অনুর্ব্বর মাঠের মধ্যে আমাদের শ্যুটিং হোত। মাথার ওপরে মার্ত্তণ্ডদেব ক্রমশঃ প্রখর থেকে প্রখরতর হতেন, একেবারে মারাঠী মরুভূমির সূর্য্য। ভরা দুপুরে আমরা ছায়ার খোঁজে তাকিয়ে তাকিয়ে শেষে হয়তো একটা গরম পাথরের ঢিবির পাশে বিঘৎ পরিমাণ ছায়ার মধ্যে মাথাটা দিয়ে ক্লান্ত কুকুরের মতো জিভ বের ক'রে হাঁপাতে থেকেছি। একদিন তো আমাদের একজন অভিনেত্রী অজ্ঞানই হ'য়ে গেলেন। কিন্তু তবু এই বিপুল কষ্টের মধ্য দিয়ে একটা নতুন জ্ঞান, একটা নতুন অভিজ্ঞতা পেতে লাগলাম।

ঐ মাঠে কেবল আমরা নয়, আশেপাশের গ্রামের কয়েক হাজার চাষী স্ত্রী-পুরুষ আমাদের সঙ্গে শ্যুটিং করেছে। কোলে কাঁখে বাচ্চা নিয়ে মায়েরা পর্য্যন্ত। তারা পেশাদার এক্‌স্ট্রা নয়। তাদের বলা

দেখেছি যা বলছি

— শম্ভু মিত্র

হয়েছে যে আমরা বাংলার দুর্ভিক্ষ নিয়ে ছবি তুলছি যাতে এই ছবি দেখে ভারতবর্ষের ও ভারতবর্ষের বাইরের লোকেরা কিছুটা বুঝতে পারে বাংলার দুর্দ্দশার অবস্থা। এই কথাতেই তারা এসেছিল সাহায্য করতে, মাথাপিছু টাকা না পেয়েই।

একদিনের ঘটনা বলি। আমাদের দেখাবার ছিল ছোট ছোট এক একটা দল গ্রাম ত্যাগ ক'রে সহরের পথে পাড়ি দিচ্ছে। এর জন্যে সবশুদ্ধ চারটে দল বোধ হয় ভাগ করা হোল। কিন্তু তিনটার ছবি তোলার পর মনে হোল আর দরকার নেই, দৈর্ঘ্যে বেড়ে যাচ্ছে। চতুর্থ দলে যারা প্রস্তুত হয়ে ছিল তারা অত্যন্ত মুষ্‌ড়ে পড়লো, তাদের ছবি নেওয়া হবে না শুনে! তখন তাদের স্তোকবাক্য দেবার জন্য ঠিক করা হোল যে ক্যামেরা না চালিয়ে আমরা শ্যুটিং-এর অভিনয় করবো। তারাও সান্ত্বনা পাবে, আমাদেরও ফিল্ম বাঁচবে। সুতরাং যথাযথভাবে চীৎকার করা হোল—ক্যামেরা ষ্টার্ট! এবং সেই চতুর্থ দলটী পরম বিশ্বাসে এগুতে লাগলো।

হঠাৎ সকলে অবাক হয়ে দেখলাম তারা খালি এগুচ্ছে না, অভিনয়ও করছে। গাঁ-ছাড়ার ক্ষোভ দুঃখ ক্লান্তি সমস্ত অভিনয়ে প্রকাশ ক'রে তারা এগুচ্ছে। তাদের পদক্ষেপ, তাদের চাউনি, একজনের পরিশ্রান্ত হয়ে রাস্তার ধারে ব'সে পড়া, অন্য সকলের ধুঁকতে ধুঁকতে এগিয়ে যাওয়া এসমস্ত এতো অপূর্ব্বভাবে ফোটাল সেই অশিক্ষিত চাষীর দল যে আমরা ক্যামেরা না চালিয়ে পারলাম না, তাদের ছবি নিতেই হোল।

এইটাই হোল আমার নতুন জ্ঞান। নিজের দেশকে, তার সংবেদনশীল শিল্পী আত্মাকে, যেন হঠাৎ দেখ্‌তে পেলাম। জানলাম যে আমরা, এই স্বল্পসংখ্যক উদ্ধত ইংরেজিওয়ালা দেশকে একদম প্রকাশ করি না। আমরা ধোপার কুকুর, ঘরেরও না, ঘাটেরও না। আমাদের বাদ দিয়ে এই বিশাল পুরোনো দেশটা তার পুরানো সভ্যতার বিবর্ত্তন ঘটিয়ে যাচ্ছে, সেখানে আমরা আবর্জ্জনা মাত্র। অথচ বাঁচবার পথ আছে। সে হচ্ছে বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ভারতের শিল্পী আত্মাকে বোঝা, তাকে ভালবাসা। তার শ্বাসরোধী পরগাছাগুলিকে উপ্‌ড়ে ফেলা, এবং তার হাজার হাজার বৎসরের পুরোনো শিকড় থেকে যে নতুন চারা গজিয়ে উঠ্‌ছে তাকে বুক দিয়ে ঘিরে বাড়তে সাহায্য করা।

এই বোধ আসার সঙ্গে সঙ্গে চলচ্চিত্রের রূপেরও একটা আভাস আস্‌তে লাগলো মনে। মনে হ'তে থাকলো, এই যে বিরাট আমার দেশ, আর এই যে তার বিচিত্র রূপ এটা প্রকাশ যদি না করা যায় তো ফিল্ম ব্যর্থ। আমাদের দেশে যেমন নদী নালায় ভেজা সবুজ বাংলা দেশ আছে তেমনি রুক্ষ ঊষর মহারাষ্ট্র আছে। চা বাগানের কুলীদের কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার পাগলকরা ছবি আছে। বিহার বা উত্তর প্রদেশের গ্রাম আছে। সেখানে গমের ক্ষেত, আখের ক্ষেত, লঙ্কার ক্ষেত। সারি সারি সবুজ গাছে পাকা লাল লঙ্কা দেখ্‌লে মনে হয় যেন হাজারে হাজারে টিয়াপাখী এসেছে। তাও দেখেছি। একদিন

সু-অভিনেতা এবং বর্ত্তমান প্রবন্ধের লেখক

—ফোটো : চিত্রবাণী

ভোরে আমার তাড়ায় প্রায় হাজার দুয়েক টিয়াপাখী ঘাসের মধ্য থেকে ফট্ ফট্ ক'রে উড়ে পড়ে। আর সে কী আওয়াজ!

এতো রূপ আমার দেশের, এতো বৈচিত্র্য। এতো সভ্যতার সংমিশ্রণ অথচ কিছুই আমাদের চলচ্চিত্রে নেই, সেখানে কেবল ছেঁদোছাঁদের সেট, আর ছেঁদোছাঁদের মানুষগুলোর ঐতিহ্যবিহীন ব্যবহার।

আমি জানি না আমি ঠিক বোঝাতে পারছি কিনা, আমার কথাটা হচ্ছে, আমাদের বাংলা দেশের শিল্পের একটা ঐতিহ্য আছে, তাতে কালীঘাটের পট আছে, কাঠের খেলনা আছে, কাঁথার নক্সা আছে, শাঁখের আভরণ আছে। আবার আছে আউল-বাউলের গান, আছে কীর্ত্তন, আছে নানান্ লোকসঙ্গীত ও লোককাব্য। এই ঐতিহ্যের অস্বীকৃতির ওপরেই মনে হয় আমাদের ফিল্মশিল্প যেন গড়ে উঠতে চায়।

তাই বলে একথা যেন কেউ মনে না করেন, যে ছবিতে ছ'টা কাঁথা, আর ন'টা কীর্ত্তন ঢোকালেই সেটা বাংলা সংস্কৃতি প্রকাশ করলো। সংস্কৃতি জিনিষটা ঐতিহ্য আশ্রয় ক'রে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে চলে। তাই বর্ত্তমান অস্বীকার করা মানে form-সর্ব্বস্ব চোরাবলিতে পা দেওয়া। কারণ বর্ত্তমানটাই চিরকাল শিল্পের বিষয়বস্তু, তার প্রাণ।

কিন্তু এসব বলা বা ভাবা যতো সহজ হাতে-কলমে করা ততো সোজা নয়। তার ওপর আমাদের মতো লোকের, যাদের এসমস্ত এক্সপেরিমেণ্ট্ করবারও কোনও অর্থ-সামর্থ্য নেই। তাই মাঝে মাঝে এই সব টেকনিক্ সম্বন্ধে যদিবা কিছু ভেবেছি বিশেষ গুরুত্ব তাতে আরোপ করিনি।

এমন সময়ে, '৪৮ সালের নভেম্বর মাসে পল জিলস্ আমার কলকাতার ঠিকানা খোঁজ ক'রে হাজির, তিনি ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ (I C. I) এর হয়ে একটা ছবি তুলবেন ম্যালেরিয়ার ওপর—যদি আমি ও আমার স্ত্রী একটু খেটে দিই তাতে। ডকুমেণ্টারী সম্পর্কে আমার কোনও অভিজ্ঞতা ছিল না সুতরাং লাফিয়ে রাজী হলাম।

শ্যুটিং হয়েছিল ডায়মণ্ডহারবারের কাছাকাছি গ্রামে। সমস্ত Out door। Indoor দৃশ্য যেগুলো ছিল, যেমন রাত্রিবেলায় কুঁড়েঘরের অভ্যন্তর, সেগুলোও তোলা হয়েছে সত্যিকার কুঁড়ে ঘরে, তার দাওয়ায়। এবং কোনও কৃত্রিম আলোর ব্যবস্থা না ক'রে কেবলমাত্র Reflector-এর সাহায্যে, বেলা দুপুরে।

এবং তাইতে যে dramatic mood-এর lighting হয়েছে তা দেখে আমি অবাক হয়ে গেছি। সেই চিত্রকরের নাম ফালি বিলিমোরিয়া। বয়স অল্প, কিন্তু তার নিরলস অধ্যবসায় আমার শ্রদ্ধার উদ্রেক করেছে। এবং 'A tiny thing brings death'ই হচ্ছে তার প্রথম স্বাধীনভাবে তোলা ছবি।

জিলস্ ও বিলিমোরিয়ার একসঙ্গে কাজ করার ধরণ

দেখে একটা কথা আমি হাতেকলমে শিখলাম যে ফিল্ম তোলাটাকে শিল্পসৃষ্টি হিসেবে দেখতে গেলে কতোটা মন বোঝাবুঝির দরকার হয় ডাইরেক্টর আর ক্যামেরাম্যানের। যেমন ধরুন, একটা শট্ আছে—এক জেলে তার জালটা ঘুরিয়ে জলে ফেল্‌ছে। আলাদা ক'রে ধরলে, এই একটা শটের নিজস্ব কোনও মানে নেই, কিন্তু ফিল্মের নিয়মই এই যে পরপর আলাদা ছবি জুড়েই তার আবেগ প্রকাশ পায়, এবং সেইজন্যেই প্রত্যেকটা শটের বিন্যাস ও গতি নিয়ে এতোখানি মাথা ঘামাবার প্রয়োজন। এক্ষেত্রে, ফাঙ্গি তার ক্যামেরা নিয়ে নাম্‌লো জলে যাতে জালটা এসে পড়ে ক্যামেরার ওপরে, এবং ক্যামেরার চিত্রগ্রহণের গতি বাড়িয়ে দিল দ্বিগুণেরও ওপর। ফলে, জালের মুভ্‌মেণ্টটা প্রায় নাচের ছন্দের মতো দেখতে হোল। এবং মণ্টাজ্-এর এক বিশেষ অংশে রীতিমতো এক সুরের জন্ম দিলো।

এর থেকে অনুভব করলাম যে, আমার এই অতি-প্রিয় মাতৃভূমিকে যদি প্রকাশ করতে হয় ফিল্মের মাধ্যমে তাহলে এমনি শিল্পীর অধ্যবসায় নিয়েই চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এও বুঝলাম যে রোমাণ্টিক দৃষ্টিভঙ্গীতে যেন বাস্তবকে বিকৃত না করি। আজকাল নামকরা ক্যামেরা-ম্যানদের সেই প্রচেষ্টা যেন প্রচুর, ডিফিউসার দিয়ে দিয়ে সবকিছুই নরম করে সুন্দর করে দেখাবার চেষ্টা। কিন্তু যে সৌন্দর্য্যবোধ বাস্তবের নোংরামির অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গ'ড়ে ওঠেনি সে সৌন্দর্যবোধ ফিকে, অগভীর। চিত্রের কথাই ধরা যাক্। নায়িকার ক্লোজ-আপে দুটো কেন ছ'টা ডিফিউসার লাগান আমি নাচার। কিন্তু রাস্তার ফুট-পাতে যে মুমূর্ষু নায়িকা দুর্ভিক্ষের জ্বালায় সন্তান কোলে ক'রে ম'রে গেল, সেটাও কি ডিফিউস করবেন? অথচ হচ্ছে তাই। আজও আমরা দেশের রূপটাকে,—তার মহান সৌন্দর্য্য এবং কুৎসিত বিকৃতিকে—মোটেই ফোটাতে পারিনি আমাদের ফিল্মে। আমরা হলিউডের আঁস্তাকুড় থেকে গ্লামার কুড়িয়ে এনে তার বেসাতি ক'রে ফিরেছি, সত্যকার সৌন্দর্য্যের পূজারী হ'তে পারিনি।

এই বোধই আমার আরও বেশী ক'রে এল 'Our India'র শ্যুটিংএ। বোম্বে সহরের ষ্টুডিয়ো ছেড়ে যখন আমরা কয়েকজনে চললাম Out-doorএ তখন কেমন যেন একটা মুক্তির আনন্দে আমরা উচ্ছল। অভিনেতা হিসাবে আমি দেখেছি যে চাষীদের দলের মধ্যে চাষা সেজে অভিনয় করা ষ্টুডিয়োতে অভিনয় করার চেয়ে ঢের বেশী শক্ত। তাদের ভাবভঙ্গীর মধ্যে যে সহজ ছন্দ থাকে তা আমাদের ষ্টুডিয়োধর্ম্মী অতিকৃত অভিনয় থেকে একেবারে আলাদা। 'Our India'র জন্য যখন তারা ফসল কাট-ছিল, বোঝাই করছিল বা ঝাড়ছিল তখন কি স্ত্রী কি পুরুষ প্রত্যেককেই এতো সহজ লাগছিল আমার যে বল-বার নয়। কারণ, তারা নিজেদের মধ্য দিয়ে প্রকাশ কর-ছিল একটা সমাজকে। আমরা কোন ফিল্মেই আর সুযোগ পর্য্যন্ত পাই না।

আমার লেখার সময় পর্য্যন্ত এখানে 'Our India ছবি দেখানো সুরু হয়নি। শুনেছি শীগ গিরই হবে। তাই হঠাৎ লিখতে লিখতে থেমে গেলাম। কারণ, আমার লেখাটা সে ছবির Propaganda করবার জন্যে নয়। আমার যেটা ভালো লেগেছে সেটা হচ্ছে, অনেক চাষীর সঙ্গে তাদেরই জীবনের দৈনন্দিন কাজ করতে করতে আমি ফিল্মের অভিনয়ের একটা নতুন দিক দেখতে পেয়েছি। সেটা হচ্ছে যে আমাদের সমাজকেন্দ্রিক গল্প ফিল্মে আনলে শুধু যে ফিল্মের টেকনিক কিছুটা বদ্‌লে যাবে তা নয়, অভিনয়ের টেকনিক পর্য্যন্ত বদ্‌লাতে বাধ্য।

এই হোল মোটামুটি যা' আমি দেখেছি, যা' আমি ভেবেছি এবং এর জন্যে দায়ী উপরোক্ত ছবি তিনটির Out-door শ্যুটিং।

—আদাব ভট্টাচার্যবাবু, আসুন।

—আদাব, আদাব ওস্তাদ।

—যন্ত্রটায় সুর বাঁধতে বাঁধতে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আপনার কথা ভাবছিলাম।

—অযথা শিল্পীদের সময় নষ্ট করা ঠিক হবেনা। তাই যদিও আমি জানতাম আজকে আপনার কোন তাড়াহুড়ো নেই তবুও নির্দিষ্ট সময়ের আগে আসা বেশ পছন্দ করে উঠতে পারিনি।
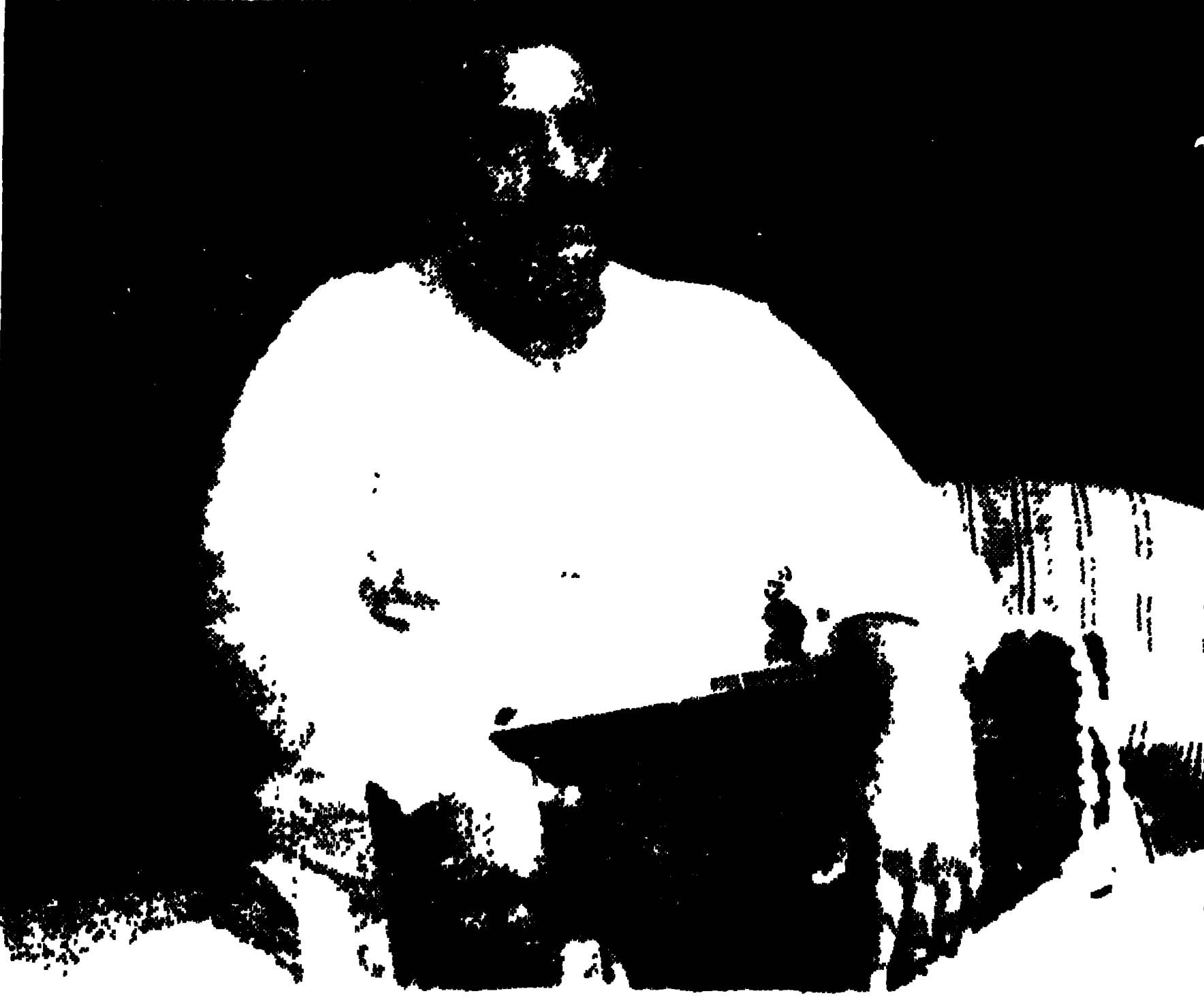
—কাজের লোক কখনো অমনি সময় নষ্ট করেনা,—তা জানি হুঁ-হুঁ-হুঁ..., কি বলেন? হ্যাঁ, আপনাদের এখানকার একজন বাংগালী ভদ্রলোক এসেছিলেন একটু আগে। আমার কাছে নাড়া বাঁধতে চান। লোকটি নাকি প্রায় বছর দশেক ধরে এই লাইনে আছেন। কিন্তু গলাটি তেমন তৈরি করে উঠতে পারেননি। তাছাড়া কণ্ঠস্বরও সুবিধে বলে মনে হলনা। দেখুন, সংগীতের সুরই হচ্ছে সব। কণ্ঠস্বরে যদি মাধুর্য না থাকে তাহলে অযথা কসরৎ করে বাজীমাৎ করতে চাইলে অন্ধ ভক্তিভাজন সাগরেদ্‌রা বাহবা দিতে পারে, কিন্তু শ্রোতারা শুনবে কেন? সংগীতের সুরধারায় যদি রসিক শ্রোতাকে সুরের কল্পলোকে নাই পাঠানো যায়, তাহলে অপরকে গান শোনাবার প্রচেষ্টায় লাভ কি? ওর চেয়ে আপন মনে গাওয়া অনেক ভাল, তার একটা স্বার্থকতা আছে,...মনে মনে আনন্দ পাওয়া। যাঁরা পেটের দায়ে কিছু কিছু সংগীত চর্চা করে থাকেন তাঁদের কথা আলাদা। কিন্তু যাঁরা গান বাজনা শিখবেন, নিজেদের শিল্পী বলে পরিচয় দিতে যাঁরা গর্ব অনুভব করবেন তাঁদের পক্ষে তলোয়ার হীন সেনাপতি সাজা বড়ই খাপছাড়া ব্যাপার। আর একটা জিনিষ আমি লক্ষ্য করেছি—আপনাদের এখানে অধিকাংশ গায়কদের খেয়াল, ঠুংরী প্রভৃতি গানের বাণী উর্দু, হিন্দী, মারাঠি, গুজরাটি না মনগড়া এতো কিছুই বোঝবার উপায় নেই। রাগ সংগীত যদি কথা-প্রধান নয়, সুর প্রধান, তবুও যতটুকু বাণী থাকে তাকে শুদ্ধ করে পরিবেশন করা প্রয়োজন। না হোলে শ্রোতারাই বা বুঝবেন কি করে, আর যা' তা' একটা উচ্চারণ করলে তাঁরা বরদাস্ত করবেনই বা কি করে? রাগছেন না তো? আমি কোন দেশকে ইংগিত করে কিছু বলছিনা। কারণ আমি জানি—এখানে মার্গ সংগীত পরিবেশন করবার লোক ছিলেনও এবং এখনো কেউ কেউ আছেন। আমি শুধু বলতে চাই—গায়কদের আসরে গাইতে হলে এবিষয়ে বিশেষ হুঁসিয়ার হওয়া উচিত।

—আপনার কথা অস্বীকার করতে পারি না। আসল ব্যাপারটা কি জানেন, আমার মনে হয়, সস্তায় কিস্তিমাৎ করবার মতলবই এর কারণ।

—তা করতে চাইলে চলবে কেন? সংগীত সাধনার ধন। একে এমনি করে অবহেলা করলে কি চলে? সংগীত সাধনা করতে হলে এ নিয়ে ধৈর্য ধরে অনেক খাটতে হয়। এ ফোঁকোটের জিনিষ নয়, আসরে নামবার আগে আমরাও একাদিক্রমে ১৫ বছর ধরে শুধু তানপুরা নিয়ে ওস্তাদের কাছে সুর সাধনা করেছি। সেই থেকে এখনো চলছে। তবুও মনে হয় শিল্পের এ শাখার কিছুই শিখতে পারিনি।

ভারতের সুবিখ্যাত সংগীতকুশলী ওস্তাদ বড় গোলাম আলির পক্ষে এ বিনয় অস্বাভাবিক নয়। তবে একথা ঠিক,—সংগীতশাস্ত্র অপার। এক জীবনের সাধনায় এর কতটুকু আয়ত্ত করা যায়! শিল্পী গোলাম আলির দেশ লাহোর, তিনি অল্প বয়স থেকে কণ্ঠ-সংগীত চর্চা সুরু করেন, কাজেই পড়াশুনার প্রতি তেমন নজর দেওয়া সম্ভব হয়নি। ভারতের অন্যতম বিখ্যাত ওস্তাদ খাঁ সাহেব কালেখাঁর ঘরোয়ানার অনুগামী এই শিল্পী। ওস্তাদ খাঁ সাহেব আলিবক্স খাঁর প্রধান শিষ্য বড় গোলাম আলি ৬ বছর বয়সে গুরুর কাছে নাড়া বাঁধেন এবং ২১ বছর বয়স পর্যন্ত দৈনিক ১৫ ঘণ্টা করে বিভিন্ন সুরে কণ্ঠ সাধনা করেন। সংগীত সাধনার ইতিহাসে ১৯ বছর বয়স থেকে ২১ বছর বয়স পর্যন্ত—এই তিন বছর গোলাম আলি সন্ধ্যে থেকে সুরু করে সমস্ত রাত ধরে অবিরত সাধনা করেন। আশ্চর্যের বিষয়—এর মধ্যে একটি দিনও তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েননি। কণ্ঠ ও শরীর ঠিক রাখবার জন্য তাঁর দৈনিক খাদ্য ছিল দুধ এবং মাংস।

—আচ্ছা ওস্তাদ,—কখন থেকে আসরে গান গাইতে সুরু করেন?

—পনেরো বছর সাধনার পর ওস্তাদের অনুমতিক্রমে আসরে গাইতে সুরু করি এবং আস্তে আস্তে জনপ্রিয় হয়ে উঠি। খেয়াল ও ঠুংরী দুটোতেই আমি বেশ আনন্দ পাই, আর আসরেও দু' রকম সংগীত পরিবেশন করে থাকি। এইভাবে ২৬ বছর বয়স পর্যন্ত আমার সংগীত জীবনের ইতিহাস এগিয়ে চলে। ২৭ বছর বয়স থেকে হঠাৎ ঠুংরীর দিকে আমার বিশেষ অনুরাগ এসে পড়ে। তখন থেকেই সুরমণ্ডলের সংগে ঠুংরী রেওয়াজ করি। আমি ৩০ বছর বয়সের পরে অর্থাৎ দীর্ঘ ২৪ বছর সাধনার পর ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে সংগীতের আসরে নিমন্ত্রিত হতে থাকি এবং আমার ওস্তাদের আশীর্বাদে ক্রমে ক্রমে শ্রোতারা আমাকে সর্বভারতীয় যশের অধিকারী করেন।

—পাশ্চাত্য সংগীত সম্পর্কে—?

—হ্যাঁ,—পাশ্চাত্য সংগীতও কিছু কিছু চর্চা করেছি। সংগীতের বিভিন্ন ধারা সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান না থাকলে শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করা সম্ভব নয়। আমি ঠুংরীর চালে একটু একটু পাশ্চাত্য সংগীতের সাহায্য গ্রহণ করে থাকি বৈকি। তবে সব সময়েই যে এ কাজ করি তা নয়। আসর এবং মেজাজের ওপর নির্ভর করে সুরের এ জাতীয় মিশ্রণ। আমার সুরমণ্ডল যন্ত্রটীও বিদেশী। (ওস্তাদ গোলাম আলি Auto-harp-এর নাম দিয়েছেন সুরমণ্ডল। যন্ত্রটী জার্মান দেশে আবিষ্কৃত হয়। আরব্-সঙ্গীতে এই যন্ত্রটীর ব্যবহার খুব বেশী হয়) পার্শী সংগীতের ছোঁয়াচও আমার সংগীতে আছে।

গোলাম আলি খাঁ সাহেবের পার্শী সংগীত সম্পর্কীয় এই স্বীকৃতি অবলম্বনে ভারতীয় মার্গ সংগীত সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলা প্রয়োজন। ভরতের নাট্যশাস্ত্রের সময় থেকেই (খৃষ্টীয় ৪র্থ শতকের পূর্বে) বর্তমানে প্রচলিত অনেক রাগ এদেশে গাওয়া হোত। কাজেই অতি প্রাচীনকাল থেকেই যে ভারতে সুসংবদ্ধ রাগসংগীত চর্চা হোত একথা বলাই বাহুল্য। কিছু কিছু সময়োচিত পরিবর্তনের মাঝখান দিয়ে সেই সংগীত ধারাই ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ভারতে মুসলমান অভিযানের পূর্ব পর্যন্ত চলে আসছে। তারপরে রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারে রাগসংগীত চর্চার ব্যাপকতা বন্ধ হয়ে যায়। কয়েক শতাব্দী পরে ষোড়শ শতাব্দীতে সংগীতপ্রিয় বাদশাহ্ আকবর শাহ্ যখন দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন থেকে আবার রাগসংগীত চর্চা প্রসার লাভ করে।

ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলী খাঁ

অধ্যাপক গৌরীশংকর ভট্টাচার্য

এই সময় অনেক হিন্দু সংগীতশিল্পী রাজপ্রসাদ লাভে সমর্থ হওয়ায় মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। এঁদের মধ্যে আট জনের নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য—দিবাকর পণ্ডিত, সোম পণ্ডিত, পণ্ডিত বৈজুবাওরা, তন্নমিশ্র, নায়ক গোপাল, রাজা গন্ধর্ব সেন, সুরথ সেন, এবং সউকা সেন। এঁদের মধ্যে প্রথম চারজন ব্রাহ্মণ, নায়ক গোপাল ছিলেন সূত্রধর, বাকি তিনজন সেনবংশীয়। উল্লিখিত ভারতবিখ্যাত শিল্পিগণের প্রত্যেকেই মথুরার বল্লভ আচার্যের বংশধর পণ্ডিত হরিদাস গোস্বামীর শিষ্য ছিলেন। ঐ আটজন ওস্তাদের সময় থেকেই মুসলমান প্রভাবে ভারতীয় মার্গ সংগীতে পারস্য সংগীতের ধারা এসে পড়ে। কিন্তু এই প্রভাব উত্তর ভারতে যতখানি ছড়িয়ে পড়ে রাজনৈতিক কারণে দক্ষিণ ভারতে ততখানি প্রসার লাভ করতে পারেনি। এই জন্যই ভরত, হনুমন্ত এবং নারদ এই ত্রয়ী প্রচারিত একই রীতি অনুসরণ করা সত্ত্বেও উত্তর ভারত ও দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত রাগের মধ্যে অনেক পার্থক্য দেখা দিয়েছে; আর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দক্ষিণ ভারতীয় পণ্ডিত এবং ওস্তাদগণ উত্তর ভারতীয় সংগীতকে খাঁটি ভারতীয় মার্গ সংগীত না বলে মিশ্র সংগীত নামে অভিহিত করতে চান। দক্ষিণ ভারতের এই প্রকার দাবীকে একেবারে অগ্রাহ্য করা চলে না।

—খেয়াল এবং ঠুংরীর মধ্যে কোন্‌টী আপনার অধিক প্রিয়?

—গাইবার কলাকৌশলের দিক থেকে আমার কাছে দুই-ই সমান। তবে খেয়ালের চেয়ে ঠুংরী একটু হালকা ধরণের, গাইতেও পরিশ্রম অপেক্ষাকৃত কম। আসরে শ্রোতাদের পছন্দ অনুসারে আমি সাধারণতঃ প্রথমে খেয়ালই গেয়ে থাকি, পরে কখনো কখনো ঠুংরীও গাই।

—অনেকে বলেন প্রথমে খেয়াল গেয়ে পরে ঠুংরী গাইলে বিভিন্ন প্রকার সুরের কাজ দেখাতে সুবিধে হয়—এ বিষয়ে আপনার কি মত?

—দেখুন, সাধারণের পক্ষে হয়ত এতে একটু সুবিধে হতে পারে; কিন্তু আমি ওতে বিশেষ কিছু সুবিধে-অসুবিধে মনে করি না। একটি বিশিষ্ট আসরে বসেও খেয়াল না গেয়ে প্রথমেই মজাদারী ঠুংরী গাইতে আমার বিন্দুমাত্র অসুবিধে হয় না। কারণ খেয়ালের মত ঠুংরী চর্চাও আমি যথেষ্ট করি।

—বর্তমানে আপনার রেওয়াজের সময় কতক্ষণ?

—এখনো আমি দৈনিক প্রায় দশঘণ্টা রেওয়াজ করি। তাছাড়া গান প্রায় চলে, খাওয়া এবং সামান্য কিছুটা বিশ্রামের সময় বাদ দিয়ে ষোল, সতেরো ঘণ্টা আর এই যে সুরমণ্ডলটি দেখছেন—এইটেই হচ্ছে এ ব্যাপারে আমার পরম বন্ধু।

—গান গাইবার সময় আপনার সংগে কেবলমাত্র ঠেকা ছাড়া তবলায় আর কিছু বাজানো হয় না কেন?

—কণ্ঠ সংগীতে ঠেকাই যথেষ্ট। গানের সংগে তবলার ওস্তাদী দেখাতে গেলে আমরাও পিছিয়ে পড়ব না। আসল কথা কি জানেন—ওতে সুরের স্বপ্ন জাল বিস্তার করে শ্রোতাকে সংসারের উর্দ্ধলোকে নিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে সার্থকতাহীন কসরতী সংগীতেরই সৃষ্টি হয়। তবলায় ওস্তাদী দেখাতে হলে হয় তার-যন্ত্রের সংগে বাজানো উচিত, না হয় লহরা বাজিয়ে গুণপনা জাহির করা প্রয়োজন।

—তাহলে তবলা বাজিয়েরা এভাবে রসভঙ্গ করেন কেন?

—হয় তাঁরা যন্ত্রের সংগে সুবিধে করে উঠতে পারেন না, না হয় হঠাৎ বাজাবার সুযোগ পেয়ে নিজের কেরামতি দেখাবার জন্য কণ্ঠ সংগীতকে নষ্ট করেন। তা না হলে শ্রেষ্ঠ শিল্প—সংগীতের রসকে অপ্রয়োজনীয়ভাবে তবলার গৎ-বাজনা দিয়ে মাধুর্য্যহীন করা,—এ নিশ্চয়ই পাষণ্ডের কাজ।

ওস্তাদের বক্তব্যের এই শেষ অংশটুকু শিল্পী মাত্রেরই মনে রাখা কর্তব্য। না হলে কাব্যচর্চা করতে গিয়ে রসকে বাদ দিয়ে ব্যাকরণের শব্দ প্রয়োগ বিধি এবং সূত্র নিয়ে বাদানুবাদ করে সময়ের অপব্যবহার করবার মতই কসরতি সংগীতে সত্যিই সময় নষ্ট করে শিল্পকলার অপমান করা হয়। অথচ দুঃখের বিষয় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কণ্ঠসংগীত এবং তবলার এ জাতীয় পৈশাচিক দ্বন্দ্ব

বর্তমানেও দেখা যায়। ওস্তাদি জাহিরকারী সংগীতশিল্পের এই সকল প্রেতমূর্তিদের সংগীত সমাজ থেকে অনেক দূরে সরিয়ে দেওয়া উচিত নয় কি, যেমন ভাবে তাড়িয়ে দেওয়া উচিত সেইসব অল্পশিক্ষিত, অপারগ, আনাড়ি সংগীত-মিস্ত্রিদের যারা অর্থের জোরে অথবা দল পাকানোর জোরে আসরে মার্গ-সংগীত গাইতে বসে আপনার অজ্ঞাতসারে বিশিষ্ট অংগ-ভংগি সহযোগে প্রধানতঃ কুকুর, গর্দভ বা অশ্বরাগের অবতারণা করে রসিক শ্রোতাদের একসংগে পঞ্চাশ, ষাট মিনিট সময় নষ্ট করতে কিছুমাত্র লজ্জা বোধ করে না।

—খেয়াল এবং ঠুংরীর মধ্যে কোন্‌টা পরিবেশন করা বেশী শক্ত?

—এ নির্ভর করে শিক্ষা এবং রেওয়াজের ওপর তবে একটা কথা হচ্ছে—ঠুংরী হচ্ছে প্রধানতঃ রাধাকৃষ্ণের প্রেম-বিষয়ক গান। মনে যার প্রেমের উপলব্ধি নেই, শত চেষ্টাতেও সে কখনো ভাল ঠুংরী গাইতে পারে না, শিক্ষাকৌশলের জোরে হয়ত যন্ত্রের মত খানিকক্ষণ স্বরের বিভিন্ন ভঙ্গী দেখাতে চেষ্টা করতে পারে। কিন্তু তাতে সংগীতের রস সৃষ্টি হয় না। উপযুক্ত রসিক শ্রোতা ছাড়া মাধুর্যপূর্ণ এ তফাৎটুকু অন্যে বুঝতে পারে না, তাই তারা অযথা মাথা নেড়ে সমঝদারী ভঙ্গী প্রকাশ করে কর্মহীন সময় কাটায় মাত্র।

—আচ্ছা রাধাকৃষ্ণের প্রেম-বিষয়ক গান গাইতে আপনাদের আপত্তি নেই?

—হুঁ-হুঁ-হুঁ...কেন,—আমি মুসলমান বলে? রাম, কৃষ্ণ, ভগবানই বলুন আর আল্লাই বলুন—আসলে ও সবই এক, পথটা মাত্র ভিন্ন। তাছাড়া সংগীতই জীবনে যাদের একমাত্র সাধনা তাদের কাছে বিভিন্ন জাতি-ধর্মের প্রশ্ন অবান্তর। সংগীত সাধনাই আমাদের একমাত্র ধর্ম। ভগবৎকৃপা এর মারফতেই পাওয়া যায়, যদি ভণ্ডামি বাদ দিয়ে একাগ্রচিত্তে সংগীতকে জীবনের সাথী করে নেওয়া যায়।

—ভজন গান আপনি চর্চা করেন?

—গজল এবং ভজন, দুই-ই আমি জানি। আসরে অবিশ্যি এতো হালকা গান গাওয়া হয় না। গজলটা বন্ধুবান্ধবের মধ্যে বেশী গাই; আর ভজন—ও দিয়ে তো মনের আবেগে একলা বসে খোদাতাল্লার আরাধনা করি। তবে কখনো কখনো ঘরোয়াভাবে ভজন গেয়েও থাকি। আচ্ছা, আজ আপনাকে একটু ভজন শোনাচ্ছি......

ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলির গান যিনি শোনেন নি তাঁর পক্ষে স্বরের স্নিগ্ধ, মধুর ভাব কল্পনা করাও সম্ভব নয়। আসরে বসার সংগে সংগেই কিভাবে যে তাঁর কণ্ঠ-স্বরধারা শ্রোতার মন হরণ করে নেয় তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। শিল্পীর সাহচর্যে এসে তাঁর সুর পরিবেশনের রীতির সংগে কিছু কিছু পরিচিত হওয়ায় আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। বর্তমানে ভারতের অন্যতম প্রধান সংগীতশিল্পী লাহোরনিবাসী এই ওস্তাদের বয়স
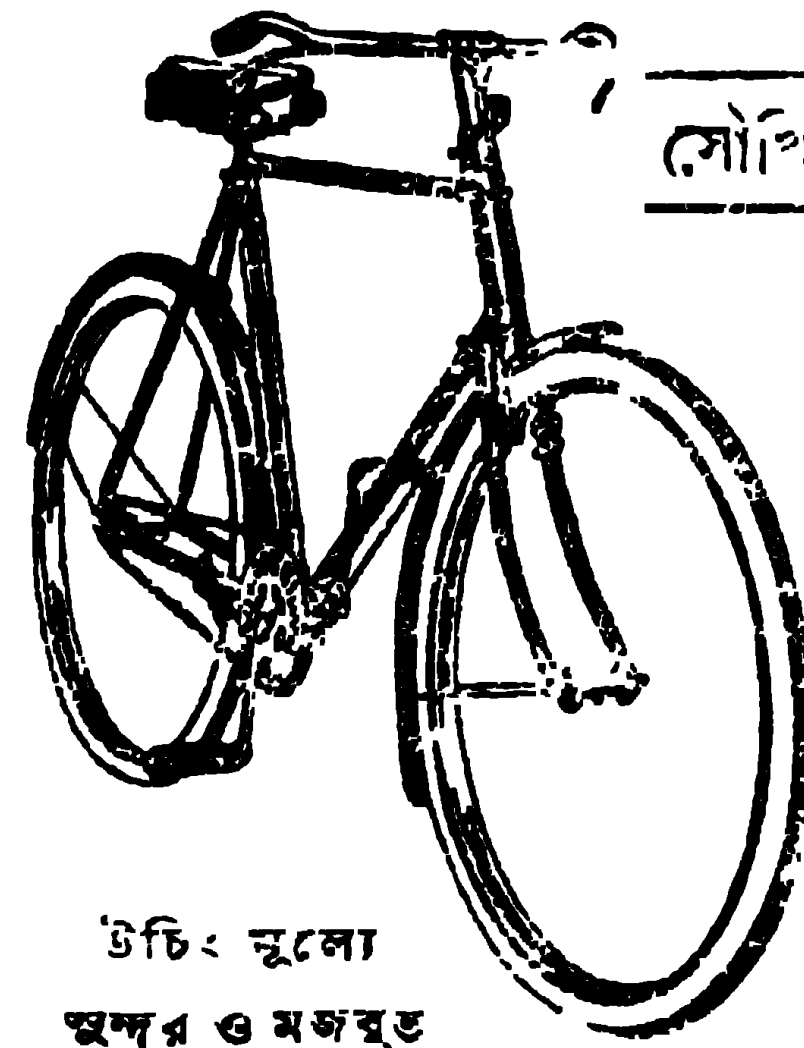
আমার উত্তর

— শোভা সেন
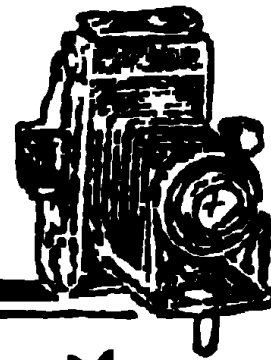
মঞ্চ ও চিত্র এ দুটোর মধ্যে কোনটা আমার ভালো লাগে? রঙ্গমঞ্চ ও ছায়াচিত্র এ দুটোই আমাকে অপরিসীম আনন্দ দেয়। দুটিরই সমান মূল্য, কে বেশী, কে কম একথা বলা যায়না।

অভিনয়ের আনন্দটা আসলে কী? সমস্ত শিল্পের মতই এতেও বিপদ বাধাকে অতিক্রম করে শিল্পের সৌন্দর্য্য প্রতিষ্ঠাতেই সে আনন্দ। এই বাধার বৈচিত্র্য, এবং তাকে উৎরে ওঠার পদ্ধতি—তার ভেতর দিয়েই আসে তৃপ্তি। রঙ্গমঞ্চে এ তৃপ্তি হাতে হাতেই পাওয়া যায়। অভিনয় সফল হল কিনা কাজ করতে করতেই অনুভব করি, উৎফুল্ল হই, প্রেরণা পাই। তাছাড়া মঞ্চের নিজস্ব কৃত্রিমতা থেকে উদ্ভূত একটা জগৎ সৃষ্ট হয়ে যায়। তার মোহময় আকর্ষণ বড় কম নয়। এ জগৎ কৃত্রিম স্বীকার করি, কিন্তু বাস্তব থেকেই সে কৃত্রিমতার মান জন্মগ্রহণ করেছে। বাস্তবকে অস্বীকার করে নয়। অবশ্য আমাদের দেশের সব নাটক কেন, বেশীর ভাগ নাটক সম্পর্কেই একথা বলা চলেনা, যাদের সম্বন্ধে বলা চলে আমি সাধারণতঃ তাতেই অভিনয় করতে উৎসুক।

রঙ্গমঞ্চে আমি নিরবচ্ছিন্ন তিনঘণ্টাকাল আমার চরিত্রের মধ্যে বাস করি। তারই মধ্যে নাটকের পথ ধরে আমার বিকাশ হয়। যেখানে চরিত্রটা শুরু, সেখানেই সারা নয়। ধরুন 'নীলদর্পণে'র 'সাবিত্রী' চরিত্র। আরম্ভ হচ্ছে গৃহকর্ম্ম-নিপুণা একান্নবর্তী মধ্যবিত্ত পরিবারের হাল ধরে থাকা গৃহিনীরূপে অত্যাচারের মধ্যে দিয়ে পার হয়ে শেষ হচ্ছে চরম দুঃখে পাগল হয়ে যাবার মধ্যে। তখন সাবিত্রী গৃহহীনা, স্বামীহারা, পুত্রহারা, মূর্তিমতী প্রতিশোধ। এই যে একটি চরিত্রের পূর্ণবিকাশ, এই যে অনুভব করে জীবনটাকে ফুটিয়ে তোলা—নাটকেই একমাত্র এ সম্ভব। রঙ্গমঞ্চের বিরাট আকর্ষণ এইখানেই। সৃষ্টিময় শিল্পকর্ম্ম এখানে চলে অব্যাহতভাবে।

কিন্তু সিনেমাতে এগুলো পাওয়া যায়না। তাই বলে কী ছবি আমার খারাপ লাগে? মোটেই না। ধানের ক্ষেতে বেগুন খুঁজতে গিয়ে বেগুন না দেখে ধানকে শস্তই বলবো না, এরকম মনোবৃত্তি আমার নয়।

ছবিতে অনেক দূরের ভবিষ্যতের দর্শকের অভিভূত মুখ স্মরণ করে আনন্দ আনতে হয়। আনন্দ কিন্তু আসে, ভাবতে যতই অদ্ভুত লাগুক না কেন। আর এখানের অভিনয় একদিক থেকে যেমন কঠিন অন্যদিক থেকে তেমনি সোজা। যন্ত্র একেবারে মেপে-জুপে আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধে, এতদূর অবধি lens-এর focus, এই level-এ কথা বলতে হবে, camera frame-এর এই অংশই ঠিক light করা যেটা আমাকে গ্রহণ করতে হবে, ইত্যাদি। দৈহিক দিক থেকে সিনেমার চাহিদা শিল্পীর কাছে মঞ্চের থেকে অনেক বেশী। আজকের ভুল কাল শোধবানো যাবেনা। যা করব চিরদিনের জন্যেই করব।

এসব সত্ত্বেও মনের দিক থেকে স্বাধীনতা অনেক বেড়ে যায়। এখানে সহজ হবার, সাধারণ স্বাভাবিক হবার অবকাশ আছে। মঞ্চের কৃত্রিমতা এখানে নেই। অভিব্যক্তি অনেক সূক্ষ্ম, দৈনন্দিন জীবনের মতই করা চলে। হয়তো মনে হয় শিল্পের দিক থেকে এটা অনেক কঠিন, আসলে কিন্তু শিল্পী হৃদয়ের পক্ষে এইটাই বেশী সুবিধাজনক। মাধ্যমের ওপর দখল আনার জন্য বিশেষ পদ্ধতি ব্যবহার করার প্রয়োজনীয়তা এখানে কম।

সিনেমায় কল্পনাশক্তির প্রয়োজন অনেক তীব্রতরভাবে অনুভূত হয়। মঞ্চের মত একটানা একটি চরিত্রের মধ্যে বাস করার কথা এখানে ভাবাই যায় না।

অর্থাৎ এখানের সমস্যা সমাধানের জন্য নতুন ধরণের চিন্তাধারার প্রয়োজন। মঞ্চের নিজস্ব সমস্যা আছে, সেখানে সমাধানের পদ্ধতিও আলাদা। এ সম্বন্ধে আমি বিশদভাবে বলতে পারি, এমন গভীরভাবে চিন্তা করার মত সময় আমাদের থাকেনা। যা কিছু বললাম, Pudovkin-এর Film Acting বইটাতেই ভালভাবে

পাওয়া যাবে। তবে কথাগুলো শুধু বই-এর কথা নয় আমার কাছে, প্রতিটী বিষয় নিজেই অনুভব করেছি।

সিনেমাতে অভিনয় শ্রদ্ধার সঙ্গে অনুধাবন করাটা হালে আরম্ভ হয়েছে। সেইজন্য উৎসুক ব্যক্তিদের অনুরোধ করি Stanislavski-র পদ্ধতি চিত্রেও লাগিয়ে দেখতে। মনস্তত্ত্বের ওপর তার প্রতিষ্ঠা এবং স্বভাবধর্ম্মী তার অভিব্যক্তি হওয়ার দরুন চিত্রে ব্যবহারের অত্যন্ত উপযোগী এই পদ্ধতি।

তবে একথা অনস্বীকার্য্য, মঞ্চে তবু যা হোক একটু সুযোগ সুবিধে আছে অভিনয় নিয়ে গভীর চিন্তা করার, কিন্তু আজকের ক'লকাতার চিত্রজগতে এ সুবিধে একেবারেই নেই। ওদেশের খানিকটা formalist যে মতবাদ আছে চিত্র-পরিচালনা সম্বন্ধে, film-এ অভিনেতা শুধুই Plastic Material,—সেটা এখানকার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা ঘুণাক্ষরেও না জেনে ব্যবহার করে থাকেন। Art-এর একটা movement হিসেবে নয় অবশ্য, পয়সা রোজগারের সুবিধের জন্যে।

কিন্তু তাই বলে হাল ছেড়ে দেবার পক্ষপাতী আমি নই। পরিবর্ত্তন আসতে বাধ্য, এবং তার চিহ্ন দেখা দিচ্ছে। আমি পেছিয়ে থাকব না। এখানকার সমস্যাকে সামাল দেবার জন্যে প্রস্তুত হব। তাই মঞ্চ এবং চিত্র দুই-ই আমাকে ভারী প্রলুব্ধ করে।

কোন্ ধরণের চরিত্রে অভিনয় করতে আমার ভালো লাগে? বেশী না ভেবে এর উত্তর দিতে গেলে বলতে হয় গম্ভীর ধরণের অথবা অত্যাচারিত নিপীড়িত চরিত্র-গুলো আমার ভাল লাগে। কিন্তু ভাবতে বসে দেখলাম, সব চরিত্রই আমার ভাল লাগে, সব ধরণের চরিত্রই আমি ফুটিয়ে তুলতে চাই। সস্তায় কিস্তিমাৎ করার দরকার হলে বা সময়-সুযোগ কম থাকলে উপরোক্ত ধরণের চরিত্রই পছন্দ করি, কারণ এগুলো আসে সহজে। কিন্তু ভাল লাগে করতে সবকিছু।

কারণটা খুব সোজা। চরিত্র, তা সে যেই হোক, একটি গোটা মানুষ। তার সুখ আছে, দুঃখ আছে, ভালবাসা আছে, ঘৃণা আছে, কত বৈচিত্র্য তার মধ্যে। একটা মানুষের মত কৌতূহলোদ্দীপক কিছু আছে? নিরবচ্ছিন্ন ভাল বা নিরঙ্কুশ খারাপ কোন মানুষ নেই, সবার মধ্যেই সব ধরণের মনোবৃত্তি বর্ত্তমান। তার মধ্যে যেটা সবচেয়ে জোরালো, সেই মানুষকে আমরা সেই মনোবৃত্তি দিয়েই চিনি। কিন্তু তার মানে এ নয় যে, গোটা লোকটা শুধু ঐ মনোবৃত্তিতেই ভরা। এই কথাগুলো যখন ভাবি, প্রত্যেক ব্যক্তির অন্তর্দ্বন্দ্ব আর ঘাত-প্রতিঘাতের কথা যখন মনে করি, তখন মনে হয়, প্রত্যেক চরিত্রই মহান—ছোট-খাটো একটা বিশ্ব-জগৎ সেখানে বিরাজ করছে। তার সামগ্রিক রূপটা ফোটাতে পারলে উৎসাহ লাগবেই, আনন্দ আসবেই, আর আমাকে পারতেই হবে এটা, বাধা অতিক্রম করার মধ্যেই তো আনন্দ। বিশ্রামে নয়। এক ধরণের চরিত্রে অভিনয় করলে বিশ্রামই করা হয়।

তাই আমি গম্ভীর চরিত্রও যেমন ভালবাসি, হাল্কা আনন্দময় চরিত্রও তেমনি চাই। ক্রুর প্রতিহিংসাপরায়ণ মানুষের অভিনয় করতে যেমন ভাল লাগে, আপন-ভোলা সব দিয়ে-দেওয়া লোকও তেমনিই ভাল লাগে। শিল্পীর

বাছ-বিচার নেই, সব মানুষই তার কাছে শ্রদ্ধার বস্তু। তারা প্রত্যেকে কতকগুলি সমস্যা সামনে নিয়ে আসে, সমাধানের মধ্যে আনন্দের স্বাদ পেতে হয়।

তাই, চরিত্র চরিত্রই—তারা শিল্পীর দায়িত্ব; তাদের জাত নেই।

চিত্রজগতে আমার অভিজ্ঞতা? গত প্রায় দেড় বছর ধরে চলচ্চিত্রশিল্পের সঙ্গে জড়িত রয়েছি। অভিজ্ঞতা আমার সামান্যই! তবু তার সম্বন্ধে কিছু বলবো। যে দু'দিক থেকে আমার অভিজ্ঞতার কথা বলা যায় তা' হোল (১) শিল্পের দিক (২) আমার ব্যক্তিগত দিক।

শিল্পের দিক থেকে বলতে গেলে শুধু গালাগালই দিতে হয়। ভাল জিনিষ এঁরা করবেন না, করার ক্ষমতাও নেই, অন্য কেউ করবেন সেটা পর্য্যন্ত এঁদের সহ্য হয় না। মান্ধাতার আমলের দৃষ্টিভঙ্গী এখানে, প্রগতিশীল সবকিছু ধ্বংসের জন্য এঁরা কতদূর যেতে পারেন তা না দেখলে বোঝানো যায় না। সমস্ত ব্যাপারটা চলছে মুনাফা লোটবার জন্যে। শিল্প সম্বন্ধে এঁরা চিন্তাও করেন না, জানেনও না। ব্যবসা যে ভাল করে করবেন, সে শিক্ষাও নেই। অবশ্য সবাইকে অভিযুক্ত করছিনা, বিশেষ করে নতুন যাঁরা আসছেন তাঁদের কারো কারো ওপর আমার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা জন্মেছে। কিন্তু এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর বিরুদ্ধে এমন ষড়যন্ত্র এমনই ঘৃণ্যভাবে চলে মাঝে মাঝে হতাশ হোতে হয়। এটা অবশ্য আমারই দোষ, কারণ এঁরা জিতবেনই এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। আর তার নিদর্শনও মিলতে আরম্ভ করেছে।

ব্যক্তিগত দিক আমার ব্যক্তিগত নয়। সাধারণ মধ্যবিত্ত ভদ্রঘরের সব মেয়েরই হোয়ে আমি বলতে পারি। চিত্রজগতটা আমাদের কাছে খুব আনন্দ ক'রে প্রবেশ করার জায়গা ছিল না, কিন্তু আজ দেশের অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মুখে এখানের অচলায়তনেও আঘাত লাগার ফলে পথ খানিকটা সুগম হয়েছে। এখানে এলে চরিত্র ও সম্মান বজায় রেখে চলার সম্ভাবনা কোন বড় বিভাগীয় বিপণির Sales-girl বা Merchant Office-এ কেরাণীগিরি করার সমানই, কম বা বেশী নয়। ওটা নির্ভর ক'রে নিজের ওপর। যেসব মেয়ে ঐ সব চাকরী খুঁজতে বাধ্য হচ্ছেন, তাঁরা চিত্রজগতেও আসতে পারেন; অর্থোপার্জ্জন এবং শিল্পের মধ্যে স্বাস্থ্য সঞ্চার—দুটোই তাঁরা করতে পারবেন। কিছুদিন আগেকার ক্লেদাক্ত ইতিহাস দুঃস্বপ্নে পরিণত হবে তখনই। নৈতিক দিক থেকে আজ বেশীর ভাগ Production Unit-ই পরিষ্কার হয়ে আসছে। কিন্তু বিপদকে ছোট করে দেখাও কাজের কথা নয়, নিজের দৃঢ়তার ওপর নির্ভর করার প্রয়োজন আজও আছে। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে শিল্পীর হালখানাই আমাকে সবচেয়ে বেশী ব্যথিত করে। ছবি বা চরিত্র যা, তাতো আপনারা দেখতেই পান। কী করব, এজগতে টিকে থাকতে হলে এইসব ধরণের চরিত্রই গ্রহণ করতে হয়, নইলে বিস্মৃত হ'য়ে যাবো। তাও যদি ভালো ক'রে চরিত্রগুলো অনুধাবন করার সুযোগ পেতাম। সে তো দূরের কথা, কাজের দিন ষ্টুডিওতে গিয়ে পরিচালকের কাছে সেদিনের সংলাপ চেয়ে তাঁর বিরাগভাজন হতে হয়েছে, এমন দৃষ্টান্তও জানা আছে। গল্প ঠিক নেই, স্যুটিং চলার সঙ্গে সঙ্গে গল্প তৈরী হয়েছে, এতো হামেশা দেখছি। এ সব কী?...ছবি করার নমুনা? শিল্পের? তবে হ্যাঁ, এটা প্রত্যেক পরিচালকের সম্বন্ধেই আমি বলছিনা, এর মধ্যেও দু-একজন ব্যতিক্রম আছেন।

তবু টিঁকে থাকতে হবে। দিন আসছে, একেবারে সামনে, যখন চিত্রজগতে শিল্প এবং শিল্পী দুই-ই মর্য্যাদা পাবে। এই বিশ্বাস, এই জ্ঞানই আমাকে ধৈর্য্য ধরিয়ে রেখেছে।

ছবিতে কাজ করার ইচ্ছা হয়েছিল বছর চারেক আগে। কিন্তু এটাও সঙ্কল্প ছিল যদি কাজই করি তবে সসম্মানে ভাল চরিত্রে ও একটি ভাল Unit-এ প্রথমে কাজ করবো। তাহলে আমার যেসব ভয় ভীতি ছিল এ লাইন সম্বন্ধে সেগুলো এড়িয়ে উঠতে পারবো, সাহসও বাড়বে পরে অন্য জায়গায় কাজ করতে। আমার কপাল গুণেই হোক বা দৈবক্রমেই হোক হঠাৎ একদিন 'ছিন্নমূল' ছবির পরিচালক বন্ধুবর নিমাই ঘোষ আমার বাড়ীতে এলেন ও তাঁর ছবিতে নায়িকার ভূমিকায় নামতে বললেন। সত্যিই আমার তখন খুবই আনন্দ হচ্ছিল। এ সুযোগ

হেলায় হারানো উচিত হবে না ভেবে গ্রহণ করে বসলাম এবং এখন দেখছি ভুল করিনি। সে ছবিতে পূর্বপরিচিত আমাদের অনেক শিল্পীই অংশ গ্রহণ করেছিলেন। সেজন্য প্রথমেই একেবারে অপরিচিতের মধ্যে পড়তে হয়নি আমাকে। শ্রীযুক্ত নিমাই ঘোষ মহাশয়ও আমাকে ভয়মুক্ত করবার জন্য অনেক কৌশলেরই সাহায্য নিয়েছিলেন। তাঁর মত এত সহজ ও সুন্দরভাবে যে কোন জিনিষকে বুঝিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা আমি খুব কম লোকেরই দেখেছি। আমার ছোট্ট অভিজ্ঞতায় খান বারো ছবিতে কাজ করেছি, কিন্তু অমন সুযোগ খুব কমই পেয়েছি। প্রথম ছবি বলেই কিনা, কিম্বা সকলে বিশেষ পরিচিত ও খাঁটী সিনেমা লাইনের না হবার দরুনই কিনা জানি না, আমায় সবচেয়ে আনন্দ দেয় ব্যক্তিগত ও শিল্প দুদিক থেকেই-ঐ "ছিন্নমূল"। বাস্তববাদী ছবির একটা মানে আছে এবং আমি প্রচুর সুবিধে পেয়েছি চিন্তা করবার, অনুভব করার।

আর যেসব ছবিতে কাজ করেছি তার মধ্যে নাম করতে হয় শ্রীমতী পিকচার্সে'র 'বামুনের মেয়ে'র। আমি শ্রীযুক্ত অজয় কর ও শ্রীমতী কানন দেবীর কাছে প্রচুর সাহায্য পেয়েছি এবং সত্যিই যদি কিছু সাফল্য লাভ করে থাকি তবে সেজন্য ওঁদের কাছে আমি যথেষ্ট কৃতজ্ঞ। এর পর এম্. পি. প্রোডাকসান্সের 'বিদ্যাসাগর'-এর নাম করতে হয়। সেখানেও 'অগ্রদূত' গোষ্ঠী আমাকে অত্যন্ত স্নেহ ও যত্নের সঙ্গে কাজ শিখিয়েছেন। তারপর বলবো রূপশ্রীর "রূপান্তর" ছবির কথা। পরিচালক শ্রদ্ধেয় অর্দ্ধেন্দু মুখোপাধ্যায় আমাকে অতি সুন্দর একটি চরিত্রে নির্ব্বাচন করেছেন, সেজন্য আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ এবং রূপশ্রী সঙ্ঘের সঙ্গেও কাজ করে অত্যন্ত আনন্দ পেয়েছি। বাকী যে সব ছবিতে কাজ করেছি তাঁদের সম্বন্ধে এটুকু বলতে চাই, তাঁরা সকলেই আমাকে সম্মান দিয়েছেন যথেষ্ট, জানিনা অতখানি পাওয়ার যোগ্যতা আমার আদৌ আছে কিনা।

[ইউরোপ-আমেরিকায় নৃত্য প্রদর্শন ক'রে ফিরে এলেন উদয়শঙ্কর, ফিরে এলেন প্রতীচীর বিজয়মাল্য নিয়ে। দেশের কলারসিক ও শিল্পানুরাগীরা গেলেন এগিয়ে, তাঁদের অভ্যর্থনা করলেন অন্তরের প্রীতি অর্ঘ্য দিয়ে। 'চিত্রবাণী'র পক্ষ থেকে আমাদের প্রতিনিধি সেই অনুষ্ঠানে যোগ দেয়; কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে নয়, অত্যন্ত ঘরোয়াভাবে, দমদম বিমান ঘাঁটির বিশ্রামকক্ষে, মাদ্রাজ রওনা হবার দিন। উদয়-অমলার ব্যবহারিক মাধুর্যে তাঁরা যেমন মুগ্ধ হয়েছেন তেমনি লাভবান হয়েছে 'চিত্রবাণী' তাঁদের সঙ্গে নৃত্যবিষয়ক আলোচনা ক'রে। সেই আলাপ আলোচনার বিষয়বস্তুকে আজ পরিবেশন করলাম 'চিত্রবাণী'র পাঠকপাঠিকার কাছে।—চিত্রবাণী—সম্পাদক।]

অমলা ও 'চিত্রবাণী'র প্রতিনিধি

—উদয়শঙ্কর আমার বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনায় মগ্ন। এই ফাঁকে আপনাকে দু'একটা প্রশ্ন করতে চাই।

—স্বচ্ছন্দে। প্রশ্নের জবাব দেব, কিন্তু পাশ ফেল আপনার হাতে!

—শঙ্করের নৃত্যের মধ্যে কোন বিষয়টি আপনাকে সবচেয়ে বেশী আকর্ষণ করেছে?

—ভারতের প্রাচীন আদর্শের প্রতি তাঁর ঐকান্তিক শ্রদ্ধা। তাঁর নৃত্যকলার মধ্যে দিয়ে আমরা প্রাচীন ভারতের স্বরূপটিকেই যেন খুঁজে পাই। তবে এটা ঠিক, প্রাচীন ভিত্তির ওপরে নতুন সৌধ গড়েছেন অর্থাৎ ছন্দটা নতুন, কিন্তু রূপটা পুরাতন।

—শঙ্করকে যদি আপনি বিশ্রাম নিতে বলেন, তাহলে তার কি জবাব তিনি দেবেন?

—বিশ্রাম? অসম্ভব। তাঁর প্রাণে রয়েছে চির আনন্দ; সত্য, শিব ও সুন্দরের সন্ধান তিনি পেয়েছেন। তাই বিশ্রাম তাঁর পক্ষে অবাস্তব। যে আনন্দ তিনি পেয়েছেন, তার ভাগ সবাইকে বিলিয়ে দিতে না পারলে যে তাঁর শান্তি নেই। এইজন্যেই তো তিনি ছুটে বেড়াচ্ছেন দেশে বিদেশে।

—এদেশে কিন্তু কিছু কিছু বিরুদ্ধ সমালোচনাও হচ্ছে।

—হ্যাঁ, আমিও শুনেছি কিছু কিছু। কিন্তু, শঙ্কর এখন নিন্দা প্রশংসার ঊর্দ্ধে। তিনি শুধু অপেক্ষা করছেন সেই দিনটির জন্যে, যেদিন তাঁর নৃত্য ঘরে বাইরে, মাঠেঘাটে, দেশের সর্বত্র এক নতুন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হবে। তাঁর নৃত্য যেদিন হবে সর্বসাধারণের সেদিনই তিনি নেবেন বিশ্রাম অফুরন্ত আনন্দ নিয়ে।

—আচ্ছা, শঙ্কর এই যে বিদেশে এত উচ্ছ্বসিত প্রশংসা পেলেন এতেই তিনি খুশি, না, দেশের ভক্তদের স্বল্প প্রশংসাতেই তাঁর বেশী আনন্দ?

—শেষেরটাতেই! একটা গল্প বলি শুনুন। বিদেশ থেকে ফিরে একবার তিনি যখন ষ্টেজে সাপুড়ে নৃত্যের মধ্যে দিয়ে ভিক্ষার অভিনয় করছেন, তখন ঘটলো এক মজার ব্যাপার। একটি ছোট ছেলে শঙ্করের নৃত্যে অভিভূত হয়ে তাঁকে লক্ষ্য ক'রে ষ্টেজের ওপর একটা পয়সা ছুঁড়ে দিল। শঙ্কর বিহ্বল আনন্দে পয়সাটিকে তুলে নিয়ে মাথায় ঠেকালেন। পরে ষ্টেজের ভিতর আমাদের বললেন—'এই আমার ভারতে প্রথম দান প্রাপ্তি। এ আমার গৌরব।'

—শঙ্করের আলমোড়া কেন্দ্র কি আবার নতুন রূপ নিয়ে চঞ্চল হবে না?

—দেশবাসী ও দেশীয় সরকারের ওপরেই তা নির্ভর করছে। সবচেয়ে আক্ষেপের বিষয় কি জানেন—তাঁর আলমোড়া কেন্দ্রের খরচের শতকরা ৯৬ ভাগই এসেছিল বিদেশ থেকে আর বাকি মাত্র ৪ ভাগ তিনি পেয়েছিলেন স্বদেশ থেকে। তার পর এলো সুদীর্ঘ মহাসমর। সব গেল তছনছ হয়ে, বৈদেশিক সাহায্যের অভাবে। তবে, শঙ্কর আশাবাদী। পূর্ণোদ্যমে এখনও তিনি পরিশ্রম করে চলছেন তাঁর কল্পনার পরিপূর্ণ রূপ দিতে।

—তার জন্যে কি আমাদের খুব বেশীদিন অপেক্ষা করতে হবে?

উদয়—অমলার জবাব

ষ্ট্যানগার্ড প্রোডাকসন্সের 'গরবিণী' চিত্রের একটি দৃশ্যে
দীপ্তি রায় ও জহর গাঙ্গুলী

মনোরমার কোনো চাতুরীতে কমল মিত্র ও হরিধন মুখার্জীকে বিভ্রান্ত বলিয়া মনে হইতেছে।
সুশীল দাস প্রযোজিত আগামী 'সহোদর' চিত্রের একটি দৃশ্যে।

—বোধ হয় না। ১৯৫১-এর প্রথম দিকেই তাঁর নবপরিকল্পিত নৃত্যানুষ্ঠান সারা ভারতকে মাতিয়ে তুলবে বলেই আমার বিশ্বাস। আমার এই কথাকে স্বামীর প্রতি সহধর্মিণীর উচ্ছ্বাস ব'লে মনে করবেন না—এ হলো গুরুর শক্তির ওপর শিষ্যার আস্থা।

—আমেরিকায় ভারতীয় নৃত্যের সমাদর হলো কী রকম?

—আশাতীত। স্যানফ্রান্সিস্কো-অপেরা, ক্লেভিল্যাণ্ড অডিটোরিয়াম, লস্ এঞ্জেলস্ ক্যাভালকেড অডিটোরিয়াম-এর হাজার হাজার দর্শক যখন নৃত্যশেষে কয়েক মিনিট ধরে করতালি করেছে, আমরা তখন অভিভূত। ভারতীয় নৃত্যের মধ্যে তৃপ্তির আস্বাদ না পেলে তারা এই উচ্ছ্বসিত হর্ষধ্বনি করতো না। অনেক ক্ষেত্রে দর্শকদের মধ্য থেকে ধ্বনি উঠেছে "Come back Shankar, come back soon!" এ থেকেই আশা করি বুঝতে পারবেন, প্রাচ্যের নৃত্যকলা প্রতীচ্যের রসপিপাসু জনসাধারণের কাছে কতখানি সমাদৃত হয়েছে।

—আপনার কথায় আমরা গৌরব বোধ করছি। আমেরিকায় শঙ্কর যে নৃত্য পরিকল্পনা করেছিলেন তার মধ্যে পাশ্চাত্য নৃত্যের কোনো প্রভাব ছিল কি?

—হঠাৎ এরকম প্রশ্ন করলেন কেন, ঠিক বুঝতে পারলাম না।

—এদেশের অনেকের ধারণা, শঙ্করের নৃত্য পরিকল্পনার মধ্যে পাশ্চাত্যের এমন কোনো ভাব ছিল, যার প্রভাবে ওদেশে তাঁর নৃত্য এত প্রশংসা পেয়েছে।

—এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। শঙ্করের নৃত্য পুরোপুরি ভারতীয় ছিল বলেই ওদেশে তা এত সমাদর লাভ করেছে। তাঁর নৃত্যে বিন্দুমাত্র পাশ্চাত্য প্রভাব থাকলে ওদেশের দর্শকসাধারণ তা দেখতেন না।

—আপনাদের যন্ত্রসঙ্গীত কেমন খ্যাতিলাভ করেছে?

—উচ্ছ্বসিতভাবে। ওদেশের লোকেরা ভারতীয় নৃত্যের মতই ভারতীয় যন্ত্রসঙ্গীতের কদর করেছে। একবার মার্কিন্ যুক্তরাষ্ট্রের এক Musician's union আমাদের অনিচ্ছাসত্ত্বেও উপযাচক হয়ে এসে আমাদের Programme-এর মাঝখানে একটি সমবেত যন্ত্রসঙ্গীতের অনুষ্ঠান করেন। তাতে সবাই এত বিরক্ত হয়েছিলেন যে পরের দিনের কাগজে কাগজে তাঁদের তীব্র ভাবে তিরস্কৃত করা হয়। তাঁরা বলেছিলেন যে, ভারতীয় যন্ত্রসঙ্গীতের সুরমাধুর্যে নৃত্যের যে অপরূপ পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল, ঐ বাদকদলের ঐকতান তাতে রসভঙ্গ করেছে।

উদয়শঙ্কর ও 'চিত্রবাণী'র প্রতিনিধি

—এবারে আপনাকে একলা পেয়েছি, প্লেনও ছাড়তে দেরী আছে, এই ফাঁকে যদি দু'একটা কথা—

—নিশ্চয়ই। আপনাদের মতো কলারসিক সাংবাদিকেরাই আমাদের ভরসা! বলুন—

—নৃত্যের ভেতর দিয়ে আপনি এখন কোন রূপটাকে ফুটিয়ে তুলতে সবচেয়ে পছন্দ করেন?

—দেশের প্রকৃত রূপকে নিশ্চয়ই। আমি আমার জন্মভূমি ভারতবর্ষ, সেইসঙ্গে তার অগণিত জনগণের দুঃখদুর্দশা ও তাদের সমস্যাগুলিকে ফুটিয়ে তুলতে চাই।

—দেশের বর্তমান রূপ বলতে আপনি কি বোঝেন? সেই রূপকে ফুটিয়ে তুলতে আপনি কোনো নৃত্যের পরিকল্পনা করেছেন কি?

—সারা পৃথিবী জুড়েই চলেছে অশান্তির তাণ্ডবলীলা। নারী-পুরুষকে কেন্দ্র করেই আজ যত অশান্তি। তাই, অনেক ভেবে আমি 'অনন্ত-সঙ্গীত' নামে একটি নৃত্যের পরিকল্পনা করেছি। সেই নৃত্যের মধ্যে নারী-পুরুষের সৃষ্টি থেকে শুরু করে তার ধ্বংস পর্যন্ত দেখিয়েছি।

—অঙ্কনবিদ্যা ছেড়ে আপনি নৃত্যের দিকে ঝুঁকেছিলেন কেন?

—অঙ্গসঞ্চালনে বৈচিত্র্য ও শক্তির সন্ধানেই বোধ করি আমি নৃত্যের পূজারী। অনেকে আমাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, পঞ্চাশ বছর বয়সেও আমি কি ক'রে যুবজনোচিত স্বাস্থ্য রেখেছি? কি ক'রে যে এই স্বাস্থ্য অটুট রইল আমি তা জানিনা। আমার বিশ্বাস, নৃত্যের মধ্যে দিয়ে যে শারীরিক চর্চা হয়, তাই আমাকে বনে যাবার সময়েও তারুণ্যের গৌরব দিয়েছে।

—ভারতীয় নৃত্যের মূল প্রেরণা আপনি পেলেন কোথা থেকে ?

—আমি তখন লণ্ডনে ছবি আঁকা শিখছি। অধ্যক্ষ স্যার উইলিয়াম রথেনষ্টিন আমার গুরু। তিনি আমাকে ভারতীয় শিল্পকলার অনুশীলন করতে উপদেশ দেন। তাঁরই পরামর্শে ব্রিটিশ মিউজিয়মের কিউরেটরের কাছে গেলাম। কিউরেটর এক বিরাট টেবিলের ওপর কতকগুলি ছবি মেলে দিলেন। অজন্তা-ইলোরা আর ভারতীয় মন্দিরের অপূর্ব শিল্পমণ্ডিত অসংখ্য ছবি। আমি তখন বিস্ময়ে বিমুগ্ধ। স্বপ্নপুরীর তোরণদ্বার যেন খুলে গেল আমার সামনে। ঠিক ঐ সময়েই আমার পরিচয় ঘটে জগদ্বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী আনা পাভ্লোভার সঙ্গে। তিনি আমার নাচ দেখেছিলেন। আমাকে তিনি হিন্দু বিবাহ ও রাধাকৃষ্ণ সম্পর্কে দুটি নাচের আয়োজন করতে বলেন। সেই নাচ দেখিয়ে আমি প্রশংসা অর্জন করি। শ্রীমতী পাভ্লোভা তখন আমাকে ভারতীয় নৃত্যের অনুশীলন করে তার প্রচারের ব্যবস্থা করতে বলেন। ভারতীয় নৃত্যের মূল প্রেরণা তাই পেয়েছি ভারতীয় শিল্পকলা ও শ্রীমতী পাভ্লোভার কাছ থেকে।

—আপনার আলমোড়া কৃষ্টিকেন্দ্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠার আয়োজন কতদূর ?

—তা বলতে পারেন আমার দেশবাসী। তাঁরা যদি পূর্ণ সহযোগিতা করেন তো কেন্দ্রটি চালু করতে কতক্ষণ ? তবে, এবারে আলোমোড়াতেই হবে, কি অন্য কোথাও হবে, তা এই মুহূর্তে বলতে পারছি না।

—আর আপনার সময় নষ্ট করব না। প্লেন ছাড়বার সময় হলো। এবার উঠি, নমস্কার।

লণ্ডনের চিঠি

[অভিনয় শিক্ষা যে কত সাধনার বস্তু তা এদেশের সর্বসাধারণ উপলব্ধি না করলেও ইউরোপ আমেরিকার অধিবাসীরা ক'রে থাকেন। লণ্ডনের Royal Academy of Dramatic Arts অভিনয় শিক্ষার একটি প্রধান প্রতিষ্ঠান। সেখানকার অভিনয় শিক্ষা দান ও গ্রহণের পদ্ধতি সম্পর্কে 'চিত্রবাণী'র শুভানুধ্যায়ী পাঠক ধনঞ্জয় কুমার মিত্র আমাদের যে চিঠি লিখেছেন এখানে তা উদ্ধৃত করা হ'লো।—চিত্রবাণী-সম্পাদক]

প্রিয় সম্পাদকমশাই,

বাঙ্গালী তথা ভারতীয় অভিনেতা অভিনেত্রীদের মধ্যে যে অনেক প্রতিভাধর শিল্পী আছেন তা স্বীকার করি। এমনকি এ কথা বলতেও কুণ্ঠিত নই যে, তাঁদের মধ্যে অনেকেই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ অভিনেতা অভিনেত্রীদের আসনে বসবার অধিকারী। কিন্তু সেইসঙ্গে এ কথা বলতেও বাধ্য হচ্ছি যে, উপযুক্ত অভিনয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের অভাবে ভারতের বহু শিল্পীই প্রতিভা বিকাশের পথ খুঁজে পাচ্ছেন না। তাছাড়া, অভিনয়কে শিল্প হিসাবে গ্রহণ ক'রে তার প্রতি যথাযোগ্য আন্তরিকতা প্রদর্শন করতেও অনেকে কুণ্ঠিত। গত চৈত্র সংখ্যার 'চিত্রবাণী'তে 'নাট্যকলা শিক্ষায়তন' শীর্ষক আপনার সম্পাদকীয় প্রবন্ধ পড়ে মনে হয়েছে আমাদের দেশে এখন এ বিষয়ে কিছুটা আন্দোলন হয়তো চলছে।

কিন্তু এদেশে ঠিক তার উল্টো। এখানে যাঁদের মধ্যে এতটুকু সম্ভাবনা আছে, তাঁরাই ছোটেন Royal Academy of Dramatic Arts এ অভিনয়শিক্ষা গ্রহণ করতে। কেউ ছোটেন নেশার তাড়নায়, কেউ ছোটেন পেশার প্রয়োজনে। একথা অবশ্য ঠিক যে যার মধ্যে অভিনয় প্রতিভার বীজ আত্মগোপন করে নেই তাকে হাজার শেখালেও সে উন্নতি করতে পারবে না। কিন্তু যার মধ্যে সম্ভাবনা আছে, তাকে ঠিকপথে চালিয়ে নিতে পারলে সেও একদিন শ্রেষ্ঠ অভিনেতার সম্মান অর্জন করতে সক্ষম হবে। এই কারণে, এদেশে প্রত্যহই দেখি নতুন নতুন অভিনেতা অভিনেত্রীর আবির্ভাব।

Royal Academy of Dramatic Arts-এ ১৯০টি আসন আছে। ভর্তি হবার সময় সে কি হুলুস্থুল কাণ্ড। হাজারে হাজারে দরখাস্ত পড়ছে। দরখাস্তকারীর গুণাগুণ দেখে দরখাস্ত বাছাই করা হচ্ছে। তারপর সাক্ষাৎকার ও পরীক্ষা। সার্টিফিকেটের কোনো জোরই চলেনা এখানে। সবাইকে বাজিয়ে নিয়ে তবে ভর্তি করা হয়।

ভর্তি হবার পর Academy-র প্রতিটি নিয়মকানুন নির্ভুলভাবে মেনে চলতে হয়। একটার পর একটা পরীক্ষা আসে তিন term ধরে। প্রত্যেকটি পরীক্ষায় পাশ করা চাই, নইলে সব চেষ্টাই ব্যর্থ। ছাত্রছাত্রীরা তাই অত্যন্ত মনোযোগী ও কঠোর পরিশ্রমী। একটা বিষয়ে এদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতেই হবে। সেটি হ'লো এদের আন্তরিক চেষ্টা। যে কাজটা এরা হাতে নেবে, তা সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত এরা অন্য দিকে মন দেবে না কিছুতেই। বিদ্যাভাসকে এরা তপস্যা জ্ঞান করে বলেই অন্যান্য বিষয়ের মতো অভিনয়বিদ্যার প্রতি এরা গুরুত্ব আরোপ করে। এইজন্যেই বোধ করি, অভিনয়বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভের ছাড়পত্র হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপ্লোমা লাভের জন্য এরা Academyর term শেষ হবার পরেও আরও বছর কয়েক অনুশীলন করে।

সুদক্ষ অভিনেতার একটি প্রধান গুণ হলো ভাবের অভিব্যক্তি প্রকাশের ক্ষমতা। প্রয়োজন অনুসারে দেহের বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন ভঙ্গিমা প্রকাশ করতে হবে। কুটিল চরিত্রে চোখের ভঙ্গিমা, হাসির চরিত্রে মুখের ভঙ্গিমা, জটিল চরিত্রে সর্বাঙ্গের ভঙ্গিমাই দেখাবার ক্ষমতা রাখা চাই। শিশিরকুমার, অহীন্দ্র চৌধুরী, প্রভা, সরযূ, মলিনা প্রভৃতি অভিনেতা অভিনেত্রীরা এবিষয়ে অত্যন্ত যত্নশীল। তাই তাঁরা আজও তাঁদের অভিনয়ের জন্য দর্শকসাধারণের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা লাভ করছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় অপেক্ষাকৃত

তরুণ অভিনেতা অভিনেত্রীরা সম্পূর্ণ উদাসীন। Royal Academy of Dramatic Arts-এর প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীকে শারীরিক ভঙ্গিমা প্রকাশের জন্য নিয়মিতভাবে movement class-এ যোগ দিতে হয়। রীতিমত ব্যায়াম করতে হয়, muscle control শিখতে হয়। এই সঙ্গেই চলে expression class-এর শিক্ষা।

শারীরিক ভঙ্গিমা ও ভাবের অভিব্যক্তির মতই প্রয়োজন স্বরগ্রামের নিয়ন্ত্রণ। নাটকের দৃশ্য অনুসারে অর্থাৎ দৃশ্যের পারিপার্শ্বিক অবস্থায় ভাবপ্রকাশের তারতম্য অনুসারে স্বরকে উঁচুতে ওঠাতে হবে, আবার নীচুতে নামাতে হবে। এই শিক্ষার জন্য Academyতে আছে voice production-এর class। এছাড়া, নাচ, গান, অসি-চালনা ইত্যাদি সব রকমেরই class আছে; আর সে সব class-এ যোগ দিতে হয় প্রত্যেকটি ছাত্র বা ছাত্রীকেই। মোটকথা, He or she should be an all-round actor or actress.

একটা মজার কথাও বলি এই প্রসঙ্গে। এই Academyর বেশির ভাগ অধ্যাপকই হলেন মেয়ে, আমাদের মা-ঠাকুমার বয়সী। তাঁদের শিক্ষাদানের পদ্ধতি এত মধুর যে, না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। অপরিসীম ধৈর্য ও সহানুভূতির অধিকারিণী এঁরা। প্রাথমিক শিক্ষা শেষ হলে এঁরা ছাত্রছাত্রীদের বাছাই করে নিয়ে stage rehearsal ও dress rehearsal এর ব্যবস্থা করেন। পরে আসে আসল পরীক্ষার দিন অর্থাৎ দর্শকবৃন্দের সামনে আসল অভিনয় অনুষ্ঠান। যাঁরা অভিনয় করেন তাঁরা ছাড়া বাকী আর সবাই তখন দর্শক।

লণ্ডনের এই Royal Academy of Dramatic Arts থেকেই এমন বহু শিল্পী বেরিয়েছেন যাঁরা আধুনিক পাশ্চাত্যজগতের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা অভিনেত্রীর পর্যায়ে পড়েন—এই প্রতিষ্ঠানের ছাপমারা অসংখ্য শিল্পী আজ রঙ্গমঞ্চ ও চিত্রজগতের গৌরব। Academy-র পৃষ্ঠপোষকতায় আছেন রাজপরিবার থেকে শুরু করে বসবেত্তা সাধারণ নাগরিক পর্যন্ত। নাট্যকার ঋষি বার্ণার্ড শ' হলেন এই প্রতিষ্ঠানের বিশেষ পৃষ্ঠপোষক ও শুভানুধ্যায়ী। অর্থ ও নাটক সম্পর্কিত বিভিন্ন বই উপহার দিয়ে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের বিশেষ সহায়তা করেছেন।

বাংলা তথা ভারতবর্ষে কবে এইরকম একটি National Academy of Dramatic Arts প্রতিষ্ঠিত হবে, তাই ভাবছি। এ বিষয়ে জোর আন্দোলন হওয়া উচিত। প্রীতিনমস্কারান্তে, ইতি—

অজয়কুমার মিত্র
হে মার্কেট ষ্ট্রীট্, লণ্ডন

রোমক রঙ্গমঞ্চের উন্মেষ ও ক্রমবিকাশ

~ হেমেন্দ্রনাথ দাস-এম.এস.সি

প্লুটার্চের বিবরণে দেখা যায় রোমানরা Mytilene থেকে প্রথম রঙ্গমঞ্চের অনুকরণ করে। এর থেকে স্পষ্টই প্রমাণিত হয়,—রোমান রঙ্গমঞ্চের মূলে আছে গ্রীক রঙ্গমঞ্চের অনুকৃতি। গ্রীক রঙ্গমঞ্চ ক্রম-বিকাশের পথে বেশ অনেকটা এগিয়ে যাওয়ার পর রোমানরা গ্রীক রঙ্গমঞ্চ অনুকরণ করে। এই জন্যেই রোমান রঙ্গমঞ্চ প্রথম থেকেই বেশ সুবিকশিত।

পম্পিআইয়ের বৃহত্তম রঙ্গমঞ্চ দুটী হেলেনিষ্টিক পিরিয়ডে নির্ম্মিত হয়। উপর্য্যুপরি তিনবার এ রঙ্গমঞ্চ দুটীর সংস্কার হয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই সংস্কারের ভেতর দিয়ে রঙ্গমঞ্চ দুটীর আদি আকার ও আয়তনের নাকি অনেক পরিবর্ত্তন হয়। পম্পিআইয়ে এই দুটী ষ্টেজেই প্রথম "নীচু-মঞ্চের" বা "লো ষ্টেজের" (Low stage) প্রচলন হয়। কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতে রোমে 'লো-ষ্টেজের' প্রচলন নাকি এরও অনেক আগে হয়। কবে যে এখানে 'লো-ষ্টেজের' প্রথম প্রচলন হয় তার কোন সঠিক বিবরণ পাওয়া যায় না। এন্-সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার এক বর্ণনায় দেখা যায়.—খৃষ্টের জন্মের আশি বছর পূর্ব্বে পম্পিআই সহরে প্রথম যে রোমানরা বসতি স্থাপন করে, তাদের দ্বারাই নাকি রোমে 'লো-ষ্টেজের' প্রথম প্রচলন হয়।

আদি রোমান রঙ্গমঞ্চের কথা বলতে গিয়ে প্লিনি (Pliny) লিখেছেন "খৃষ্টের জন্মের আটান্ন বছর পূর্ব্বে ইডাইল্-এম্-য়্যামিলিয়াস্ স্কবাস (Aedile M. Aemilius Scaurus) রোমে একটী বিরাট অস্থায়ী রঙ্গমঞ্চ নির্ম্মাণ করেন। এই রঙ্গমঞ্চে একসঙ্গে আশি হাজার দর্শক আসন গ্রহণ করত। ভাবতেও আশ্চর্য্য লাগে! রোমে এ ছাড়াও আরও দুটী বিরাট রঙ্গমঞ্চ নির্ম্মিত হয়। খৃষ্টের জন্মের পঞ্চাশ বছর পূর্ব্বে এ দুটী সি-কিউরিও (C. Curio) দ্বারা নির্ম্মিত হয়। এ দুটী রঙ্গমঞ্চই আবর্ত্তনশীল (Revolving Stage)। পাশ্চাত্যে ঘূর্ণমান রঙ্গমঞ্চের প্রথম সূচনা হয় এইখান থেকে। কাঠের 'শঙ্কু' বা 'পিভটের' (Pivot) ওপর রঙ্গমঞ্চ দুটীকে ইচ্ছেমত ঘোরান ফেরান যেত। এমন কৌশলে এ মঞ্চ দু'টী নির্ম্মিত হয় যে দুটী মঞ্চকে ঘুরিয়ে এনে একত্রে মিলিয়ে দিলেই দুটী মিলে একটী বিরাট রঙ্গমঞ্চ হয়ে যেত, আবার খুলে ঘুরিয়ে দিলেই সে দুটী পৃথক রঙ্গমঞ্চ হয়ে যেত। প্লিনির বর্ণনায় দেখা যায় এই মঞ্চ দুটীতে সকালবেলা একরকম ও বিকেলবেলা আর একরকম অনুষ্ঠানের আয়োজন হোত। সকালবেলা মঞ্চ দুটীতে পৃথক ভাবে অভিনয় অনুষ্ঠান হোত, বিকেলবেলা মঞ্চ দুটী একত্রে মিলিয়ে দিয়ে বিরাট একটী য়্যাম্ফিথিয়েটারে (Amphitheatre) বা মল্লক্রীড়াক্ষেত্রে পরিণত করা হোত।

প্রাচীন রোমের প্রত্যেক প্রাদেশিক সহরেই একটী করে রঙ্গমঞ্চ থাকত। প্রত্যেক সহরের রঙ্গমঞ্চে কিছু না কিছু নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থাকত। প্রাচীন রোমের রঙ্গমঞ্চের মধ্যে অনেক ধারা ছিল। সেগুলি একটু মনোযোগের সঙ্গে বিশ্লেষণ করে দেখলে রোমক রঙ্গমঞ্চের নির্ম্মাণ কৌশলের আদর্শ ও স্বরূপ বোঝা যায়। প্রাচীন গ্রীসের রঙ্গমঞ্চের মত প্রাচীন রোমের রঙ্গমঞ্চ সব ক্ষেত্রেই একেবারে উন্মুক্ত প্রকৃতির ক্রোড়ে হোত না। প্রাচীন রোমের আদর্শ রঙ্গমঞ্চ হলো একটী বিরাট প্রকোষ্ঠ। এই প্রকোষ্ঠেই Auditorium ও Green Room প্রাচীন গ্রীসের রঙ্গমঞ্চের মত পৃথক না হয়ে একত্রে যুক্ত থাকত। ঐ বিরাট

প্রকোষ্ঠের মধ্যে ঘোড়ার খুরের মত আকারে (Horse-shoe-shaped) সোপান শ্রেণীর মত পর পর দর্শকদের আসন শ্রেণী সজ্জিত থাকত।

গবেষকরা গবেষণার সুবিধার জন্যে রোমের রঙ্গমঞ্চের ধ্বংসাবশেষগুলিকে মোটামুটি ভাবে তিনভাগে ভাগ করেছেন, যথা :—

(১) প্রাক্‌গণতান্ত্রিক যুগের রঙ্গমঞ্চ (Theatre of Pre-republican Period.)

(২) গণতন্ত্রযুগের রঙ্গমঞ্চ (Theatre of Republican Period.)

(৩) নব-জাগরণের যুগের রঙ্গমঞ্চ (Theatre of Renaissance Period.)

প্রাক-গণতান্ত্রিক যুগের রোমে নানা আকারের রঙ্গমঞ্চ ছিল বলে মনে হয়।

প্রাচীন গ্রীসে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বাভাবিক পর্ব্বত গহ্বরে রঙ্গমঞ্চ নির্ম্মিত হোত। গহ্বরের মধ্যে কিম্বা এক পাশে থাকত অভিনয়-মঞ্চ, আর গহ্বরের ক্রম-ঢালু পর্ব্বতগাত্র কেটে কেটে সোপান শ্রেণীর আকারে আসন

১নং চিত্র
আদর্শ গ্রীক রঙ্গমঞ্চ

শ্রেণী নির্ম্মিত হোত। প্রাচীন রোমে এমন রঙ্গমঞ্চ যে আদৌ ছিল না তা নয়, তবে তার সংখ্যা ছিল খুবই অল্প; খুব সম্ভবতঃ গ্রীসের মত স্বাভাবিক পর্ব্বতবেণী না থাকাই এর কারণ। (প্রথম চিত্র দ্রষ্টব্য)

প্রাচীন রোমে প্রথম দু' একটী রঙ্গমঞ্চ গ্রীসের প্রভাবে ও অনুকরণে অবশ্য স্বাভাবিক পর্ব্বত গহ্বরেই নির্ম্মিত হয়; তার দৃষ্টান্ত দু' এক জায়গায় পাওয়া গেছে, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পাথর কাটা কিম্বা পোড়া মাটীর ইট গেঁথে গেঁথে বিরাট একটী চক্রাকার সোপান শ্রেণীর আকারে রঙ্গমঞ্চগুলি নির্ম্মিত হোত। কোথাও বা চক্রের একদিক কাটা থাকলে যেমন দেখায় তেমনি আকারের হোত, কোথাও বা অর্দ্ধ চক্রাকার হোত। (দ্বিতীয় চিত্র দ্রষ্টব্য) এমন অনেক, রঙ্গমঞ্চের ধ্বংসাবশেষ আজ রোমের বিভিন্ন অংশে এবং ব্রিটেনেরও দু' এক জায়গায় আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রাচীন রোমে কাঠের তক্তা দিয়ে তৈরী আর এক রকমের রঙ্গমঞ্চ ছিল। প্রাচীন রোমের মৃৎপাত্রে (Ceramic Vases) এমনি রঙ্গমঞ্চের চিত্র দেখা যায়। বিশেষজ্ঞেরা বলেন, এ গুলি হলো প্রাচীন রঙ্গমঞ্চের একেবারে প্রাথমিক অবস্থা।

রোমের পরবর্ত্তী যুগের অর্থাৎ গণতান্ত্রিক যুগের রঙ্গমঞ্চগুলিতে বেশ সুস্পষ্ট একটী জ্যামিতিক আকার পরিস্ফুট। এ যুগের রঙ্গমঞ্চগুলি এর পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের মত অলঙ্করণের ভারে ভারাক্রান্ত নয়।

নব-জাগরণের যুগের (Renaissance Period) রোমক রঙ্গমঞ্চগুলিতে বেশ একটা ধরাবাঁধা নির্ম্মাণ-কৌশল দেখা যায়। সুসভ্য 'য়্যাকাডেমিসিয়ান'দের (Academician) সুচিন্তিত নক্সার ওপর ভিত্তি করে এই রঙ্গমঞ্চগুলি নির্ম্মিত হয়। এই বিশেষ ধারার নাম হয় 'রেণেঁসাঁ-ষ্টাইল' (Renaissance Style)। এতে 'ক্লাসিক' বা প্রাচীন ও আধুনিক দুই ধারারই প্রভাবের সংমিশ্রণ ঘটেছে। তাই কোন কোন বিশেষজ্ঞ বলেন,—রোমের রেণেঁসাঁ যুগের রঙ্গমঞ্চগুলি দেখলে মনে হয় সুরুচিসম্পন্ন য়্যাকাডেমিসিয়ানদের দ্বারা প্রাচীন রঙ্গমঞ্চগুলি সংস্কৃত হয়ে এক নতুন রূপ পরিগ্রহ করেছে। আধুনিক কালের রঙ্গমঞ্চ-

সোপান শ্রেণী
মঞ্চে প্রবেশের পথ
দৃশ্যপট
প্রসাধনগৃহ
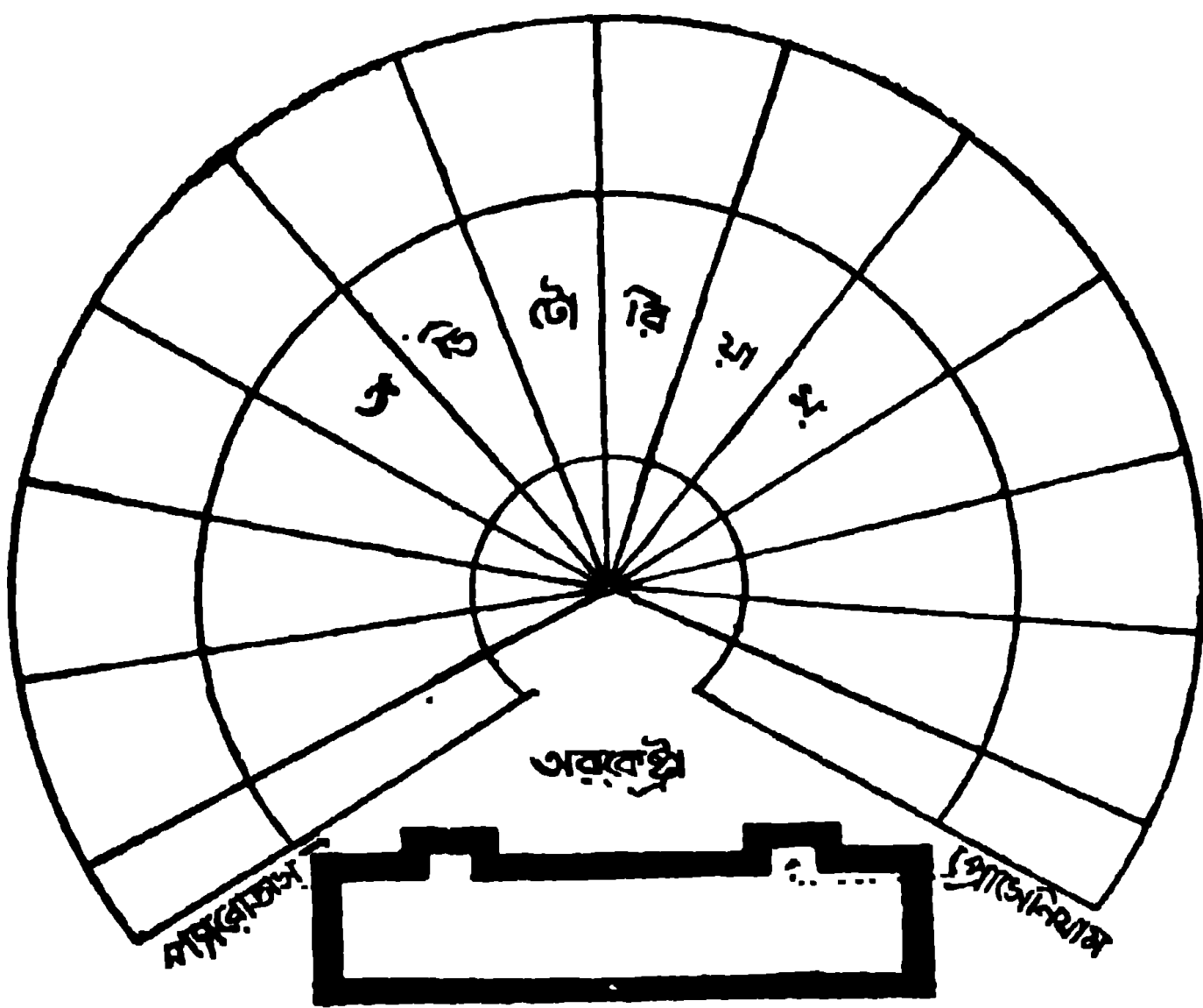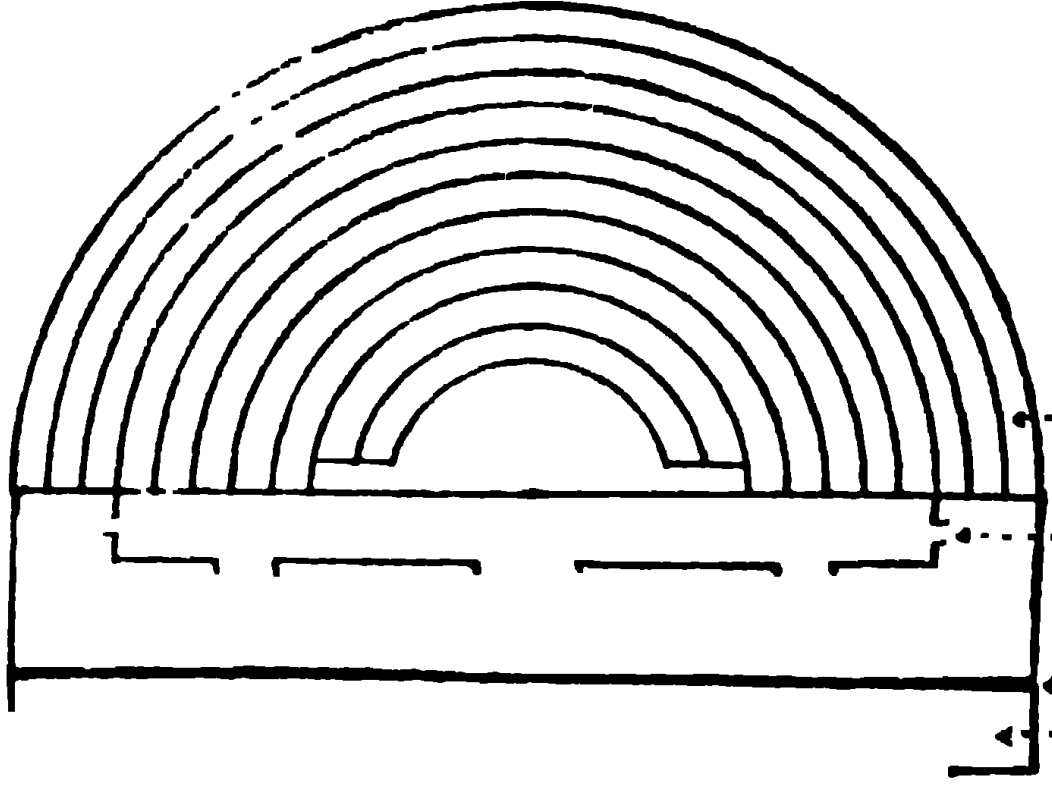
২নং চিত্র

আদর্শ রোমান রঙ্গমঞ্চের নক্সা

শিল্পীরা এই যুগের রোমক রঙ্গমঞ্চের অনেক কিছুই বেছে বেছে নিয়ে নিজেদের কাজে লাগিয়েছেন।

রোমে দু'রকমের রঙ্গমঞ্চ থাকত (১) ইডিয়াম্ বা গীত-বাদ্যের রঙ্গমঞ্চ ও (২) য্যাম্ফিথিয়েটার বা মল্ল-ক্রীড়া ও অভিনয়ের রঙ্গমঞ্চ। গীত-বাদ্যের রঙ্গমঞ্চগুলিতে দৃশ্যপট না থাকলেও অভিনয়ের রঙ্গমঞ্চে দৃশ্যপট থাকত কিন্তু এ দৃশ্যপট আধুনিক কালের রঙ্গমঞ্চের মত বদলান যেত না। এমন কি অনেককাল পরে রোমে যখন ঘূর্ণমান রঙ্গমঞ্চ (Revolving Stage) নির্ম্মিত হয়, তখনও দৃশ্য বদলানোর কোন উপায়ই উদ্ভাবিত হয় নি। একই দৃশ্যপট স্থির রেখে তার সামনেই সমস্ত রকম অভিনয় করে যাওয়া হোত। স্থান, কালের বৈচিত্র্য দেখাবার জন্যে দৃশ্যপট বদলের কেন যে কোন প্রচেষ্টাই হয় নি তা ঠিক বোঝা যায় না।

ইডিয়াম্ বা গীত-বাদ্যের রঙ্গমঞ্চ ছিল একেবারে উন্মুক্ত; য্যাম্ফিথিয়েটারও ছিল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উন্মুক্ত, তবে কোন কোন ক্ষেত্রে ক্রীড়াভূমিটা থাকত উন্মুক্ত আর দর্শকরা আসন গ্রহণ করত বড় বড় থামের ওপর নির্ম্মিত একটা ছাদের আশ্রয়ে বা দালানে। উন্মুক্ত রঙ্গমঞ্চে সব ঋতুতে অভিনয় করা সম্ভব হোত না বলেই খুব সম্ভবতঃ এর পরবর্ত্তী যুগে একেবারে বন্ধ প্রকোষ্ঠে রঙ্গমঞ্চ নির্ম্মিত হয়। ক্রমে ঐ প্রকোষ্ঠে কাঠের পাটা দিয়ে সোপানের আকারে আসন শ্রেণী নির্ম্মিত হয় এবং তারও পরে নট-নটীদের অভিনয় অপেক্ষাকৃত উঁচু একটী মঞ্চের ওপর হলে বেশ স্পষ্ট ভাবে দেখা যায় বলেই বোধ হয় কাঠের তক্তা দিয়ে উঁচু অভিনয় মঞ্চ বা 'High Stage' নির্ম্মিত হয়। তারও পরে ষ্টেজের পেছনে পট ভূমিকা বা 'Skene' সংযোজনা করা হয়। বহুকাল ধরে রোমক রঙ্গমঞ্চ এই অবস্থাতেই থেকে যায়; তারপর একজন বিশেষজ্ঞ আবিষ্কার করলেন, পাশে পার্শ্বদৃশ্য বা 'Paraskenea'-র প্রবর্ত্তন হয়। স্কেন্ ও প্যারাস্কেনিয়া যুক্ত হওয়ার পর স্থির মঞ্চে প্রবেশের জন্যে পাঁচটার কম বা বেশী প্রবেশ পথ থাকবে না। এই পাঁচটি পথ নির্দ্দিষ্ট পাঁচটা দিকে থাকবে (তৃতীয় চিত্র দ্রষ্টব্য)। এ বিষয়ে শিল্প-বিশারদ সেল্ডান্ চিনি লিখেছেন,—"In general the architecture of the stage-wall was the 'scene'. This wall was regularly pierced by five doorways, three at the back and one in each of the paraskenea. The large centre-door was the 'Palace-entrance'.

প্রাচীন রোমের প্রথম রঙ্গমঞ্চ হলো 'লো-ষ্টেজ' বা 'নীচু মঞ্চ'। জনৈক বিশেষজ্ঞের মতে,—প্রাচীনকালে যারা রোমে প্রথম বন কেটে বসতি স্থাপন করে, তারাই পল্লিগ্রাই সহরে প্রথম দুটী 'Low Stage' নির্ম্মাণ করে। একজন বিশেষজ্ঞ বলেন, সুল্লা (Sulla) নামক বিশেষ এক-জন শিল্পামোদীর মস্তিষ্ক হতে প্রথম লো-ষ্টেজের উদ্ভব হয়। অতএব আদি রোমক রঙ্গমঞ্চ রোমের নিজস্ব মৌলিক সৃষ্টি বিশেষ, কিন্তু প্লুটার্চ বলেন, রোমকরা কোন মতেই এ মৌলিক সৃষ্টির গর্ব্ব করতে পারে না। প্রাচীন রোমক রঙ্গমঞ্চগুলি ভালো করে পর্য্যবেক্ষণ করলে তাতে যথেষ্ট পরিমাণে গ্রীক রঙ্গমঞ্চের মুখ্য ও গৌণ প্রভাব দেখা যায়।

এবার আমরা রোমক নাট্যাভিনয় নিয়ে কিছু আলোচনা করছি। রোমক অভিনয়ে গ্রীসের প্রভাব অত্যন্ত প্রকট। মনিষী য্যারিস্টটলের বিবরণে দেখা যায় গ্রীসের সর্ব্ব শ্রেণীর পুরোহিতরা সারা বছর ধরে 'বাক্কাস্' বা সুরা দেবতার উদ্দেশ্যে স্তোত্র রচনা করতেন, আর বাক্কাসের

উৎসবের সময় উন্মত্ত নর-নারীরা মদ্যপান করে অঙ্গভঙ্গী করে সেইসব স্তোত্র আবৃত্তি করত। এর পর তারা মঞ্চের ওপর উঠে অমনি অভিনয় করে। এই হলো গ্রীসের আদি অভিনয়। প্রথম রোমক রঙ্গমঞ্চেও এ অভিনয়ের প্রবর্তন হয়।

প্রাচীন রোমে দু'রকমের অভিনয় ছিল—ধর্মীত্ব ও বাস্তব বা আধ্যাত্মিক ও অনাধ্যাত্মিক (Religious and Secular)। বাকাস উৎসবের পর আসে 'Mystic Play' ও 'Miracle Play' এতে অভিনেতারা সুরা পান করে বাঁশীর সুরের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বিশেষ একরকম গান গাইত ও সেইসঙ্গে গানের কথার অর্থের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অভিনয়ও করে যেত। উক্ত গানের নাম ছিল 'Tragoidea', 'Tragoidea' কথাটি আসছে 'Tragos' থেকে। 'ট্র্যাগস্' হলো অর্দ্ধ অজ ও অর্দ্ধ নররূপী এক রকম পৌরাণিক জীব বিশেষ। এই অভিনয়ের সূচনায় মঞ্চের ওপর একটী ছাগ বলি দেওয়া হোত। এ অভিনয়ের উদ্দেশ্যই হলো দেবতাদের তুষ্ট করা।
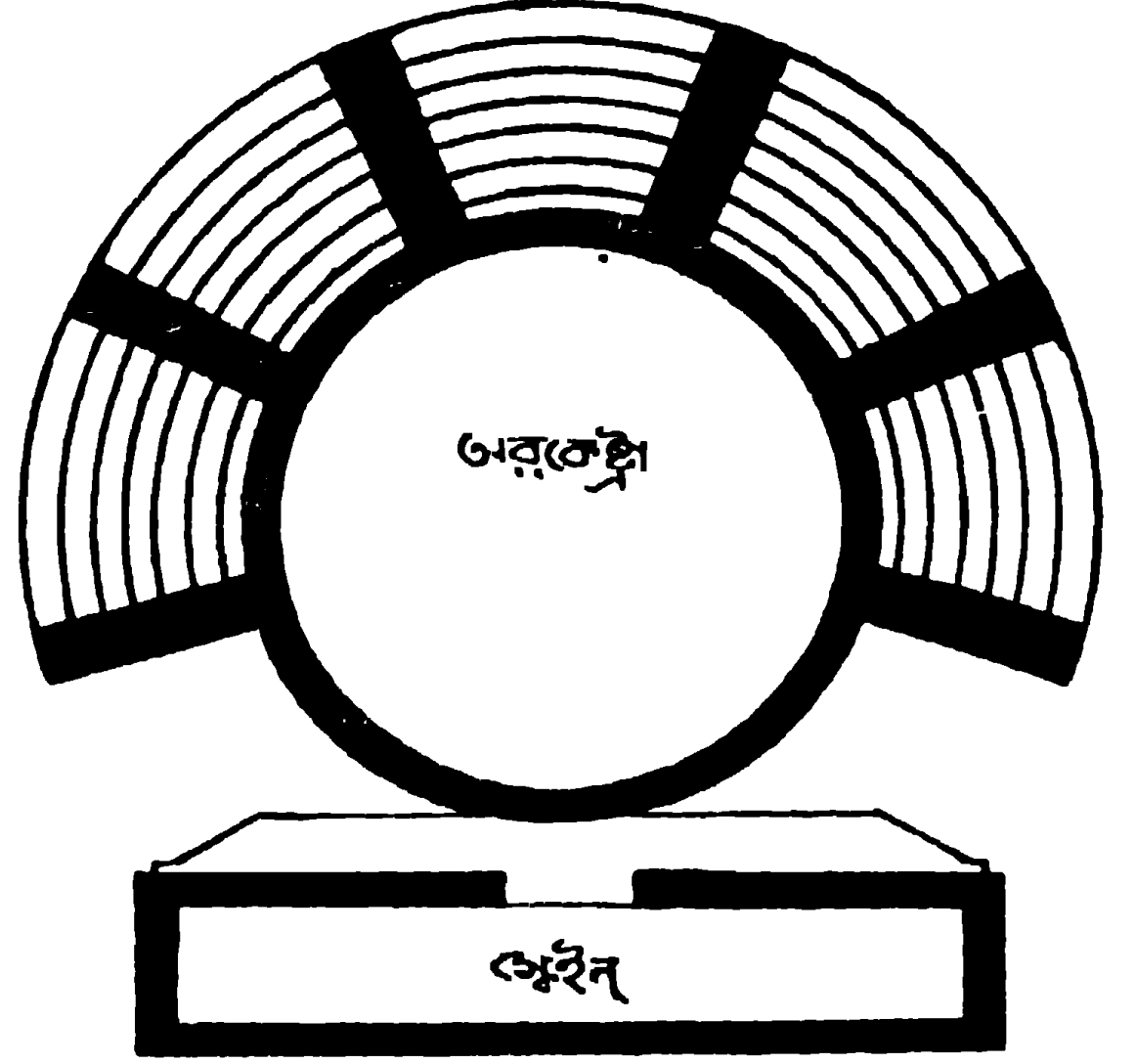
৩নং চিত্র
পারমেস্সসের গ্রীকো-রোমান থিয়েটারের নক্সা

তবে এ অভিনয়কে পাশবিক অভিনয় ছাড়া আর কিছু বলা চলে না

এর পর রোমক রঙ্গমঞ্চে নাট্যকার থেসপিস (Thespis) রচিত নাটক নিয়ে অভিনয় সুরু হয়। থেসপিস হলেন সমগ্র পাশ্চাত্যের নাট্যগুরু। এই কারণেই পাশ্চাত্যে নাট্যকলাকে এখনও অনেক ক্ষেত্রে "থেসপিয় কলা" বা "Thespian Art" বলা হয়, যেমন আমাদের প্রাচীন ভারতে ভারতীয় অভিনেতাদের নাট্যশাস্ত্র-বিশারদ ভরত মুনির নামানুসারে "ভরত পুত্র" বলা হোত। থেসপিয় নাটকে গান থাকত অত্যন্ত বেশী ও নাটক হোত বিয়োগান্ত। তবে থেসপিস রচিত নাটকে আগের যুগের অশ্লীলতা ও লঘুতা বর্জিত হয়। তিনি গুরু গম্ভীর ঐতিহাসিক বিষয়-বস্তুর ওপরেই নাটক রচনা করতেন। তার এই ধরণের প্রথম নাটকের নাম 'য়্যালসেসটিক্' (Alcestic)। অবশ্য থেসপিস ছিলেন গ্রীক নাট্যকার। তাঁর সব নাটকই গ্রীসের রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের জন্যে রচিত হয়। গ্রীস থেকে তাঁর নাটক সারা ইউরোপে তো অভিনীত হয়ই; সুদূর আরব ও পারস্য দেশে পর্য্যন্ত তার অভিনয় হয়।

এর পর সুসারিয়ান (Susarian) থেসপিয় নাটকে গানের সংখ্যাধিক্যের জন্যে বিরূপ প্রতিবাদ সুরু করলেন। তিনিই থেসপিয় নাটকের গানের সংখ্যা কমান ও বিয়োগান্ত

নাটকের স্থানে মিলনান্ত নাটকের প্রথম প্রবর্ত্তন করেন। সুসারিয়ান মিলনান্ত নাটকের প্রবর্ত্তন করলেও তাঁর অবদান তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। থেসপিস মোট সত্তর খানি নাটক রচনা করেন। তাঁর পর ইসকাইলাস সমগ্র পাশ্চাত্যের নাট্যজগতে বিখ্যাত হয়ে ওঠেন।

তারপর ইউরাইপিডেস রোমের নাটক ও নাট্যকলার বিশেষ উন্নতিসাধন করেন। তাঁর নাটকে নিছক কল্পনার মাত্রা থাকত অত্যন্ত বেশি বলেই দর্শকদের কাছে তিনি বিশেষ প্রিয় হয়ে ওঠেন। তাঁর নাটকেই আমরা যুগপৎ অনেক অভিনেতার অভিনয় দেখি। তাঁর আগে খুব অল্প সংখ্যক নট নিয়ে অভিনয় হোত।

রোমান অভিনয়ের সঙ্গে নৃত্য, গীত, ভাঁড়ের ভাঁড়ামি ও মাঝে মাঝে মন্ত্রপাঠ থাকত; নাটক আরম্ভ হওয়ার আগে নাট্যকারকে দর্শকদের সামনে মঞ্চের ওপর দাঁড় করিয়ে তার ওপর পুষ্প বৃষ্টি করা হোত, কিন্তু অভিনেতাদের সামাজিক মর্য্যাদা আদৌ ছিল না। সাধারণ লোক তাঁদের ভালো চোখে দেখত না। এই কারণেই রোমক রঙ্গমঞ্চে স্ত্যাফোকেলসের অনুপ্রেরণায় মঞ্চে যখন অভিনেত্রীর প্রবর্ত্তন প্রচেষ্টা চলে, অভিনেত্রী হবার জন্যে কোন ভদ্রঘরের মেয়ে পাওয়া যায় নি। অগত্যা বার-বনিতা ও হোটবাইদের এনে মঞ্চে নামাতে হয়! বৌদ্ধযুগে ভারতীয় নাট্যাভিনয়ে পতিতারাই নটী হয়ে অভিনয় করত। ভদ্রঘরের কোন মেয়ে মঞ্চে অবতরণ করত না। তাদেরও কোন সামাজিক মূল্যই ছিল না। কাজেই দেখা যাচ্ছে এ অভিশাপটী চিরকালের। আজও নট-নটীরা নিজেদেরকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলেনা চিরদিনই তারা সমাজ বর্জ্জিত, অপাঙক্তেয় জীব হয়েই রইল।

ছায়াছবির জন্যে মৃত্যুকে বরণ!

উত্তর প্রদেশের নাজারবাগে গিরিজাশানকর নামে একটি ষোল বছরের ছেলে নিজের কাপড় দিয়ে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছে। ছেলেটি তার কাকার কাছে থাকতো। সে সিনেমার একনিষ্ঠ ভক্ত এবং ঘন ঘন সিনেমায় যেতো বলে তার কাকা তাকে খুব বকাবকি করেন। ফলে, সে সিনেমার অসম্মান সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করেছে।

ছায়াছবির জন্যে লোকে প্রাণ পর্য্যন্ত দিচ্ছে তবুও প্রযোজকরা বলেন যে সিনেমার ব্যবসায় অত্যন্ত মন্দা পড়েছে।

দৃষ্টিহীন নায়িকা!

টেক্সাসের সুন্দরী তরুণী এ্যানিটা ব্রেয়ার ছবি তৈরী করবে। এ্যানিটা অন্ধ। তার নিত্য সঙ্গী হোলো একটি কুকুর। স্কুলে পড়বার সময় এক মোটর দুর্ঘটনায় সে দৃষ্টি-শক্তি হারায়।

তখন বেঁচে থাকবার কোন আকর্ষণ ছিল না তার। অথচ এখন সে জীবনে সার্থক হ'য়ে বেঁচে থাকার কামনায় অবিচলিত। লেখা পড়া সে শিখেছে, টাইপ শিখেছে, দেশের জনহিতকর প্রতিষ্ঠান সমূহ ঘুরে দেখে এসেছে এবং বিদ্যালয়গুলিতে বক্তৃতাও দিয়েছে—অন্ধ হোলেও মানুষ কি করে সাহসী এবং কর্ম্মঠ হোতে পারে, এই বিষয়ে।

এ্যানিটা যে ছবি করবে ঠিক করেছে—তার কাহিনী এবং সংলাপ রচনা, অভিনয়, রূপসজ্জা এবং ছবির সম্পাদন সে নিজেই করবে। এই ছবির পর এ্যানিটার আরো ছবি করার ইচ্ছা আছে এবং তার আশা আছে যে এতে তার রোজগারও ভাল হবে।

ভারতীয় ছবি চাই!

পাকিস্থান সরকার ভারত এবং পাকিস্থানের মধ্যে চলচ্চিত্র আমদানী এবং রপ্তানীর যে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন তার প্রতিবাদ স্বরূপ গত ১৯শে জুন ঢাকার সমস্ত চিত্রগৃহ হরতাল পালন করেছে। পূর্ব্ব পাকিস্থান চলচ্চিত্র সংঘ ইতিমধ্যে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন—সাম্প্রতিক বাণিজ্য চুক্তি অনুযায়ী ভারত থেকে পাকিস্থানে আসতে পারে এমন অপরিহার্য্য দ্রব্যাদির তালিকা থেকে ছায়াছবিকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু পশ্চিম পাকিস্থানীরা বলে যে তারা ভারতীয় ছবি বাদ দিয়েও চিত্রগৃহগুলিকে চালু রাখতে পারে।

সিঙ্গাপুরে সাবু!

আরো বেশী ডলার রোজগারের আশায় হলিউড সিঙ্গাপুরে সাবুকে দিয়ে বন্য জন্তু-জানোয়ার পরিপূর্ণ জঙ্গলের পটভূমিকায় এক ছবি তুলবে বলে স্থির করেছে। দু'টি ছোট হাতী জোগাড় হোয়েছে। এই হাতী দু'টি, প্রধান দু'টি ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করবে। এ ছাড়া আরও যে সব জন্তু জানোয়ার ছবিতে থাকবে সেগুলি হচ্ছে—মস্ত বড় পাইথন সাপ, গিবন, ভাল্লুক এবং ময়ূর।

হলিউডের ইতিবৃত্ত

হলিউড কি? জানতে চান?

অবশ্য সবই নির্ভর করছে আপনার ব্যক্তিগত রুচির ওপর।

আপনি যদি অন্য কিছু না পড়ে শুধু বিকৃত রুচি সম্পন্ন চলচ্চিত্র সংক্রান্ত পত্রিকার পাঠক হন তবে আপনার এই চিত্র রাজ্যের রাজধানীকে মনে হবে চাঁদ আর কোকিলের কলগীতিতে মুখর চির বসন্তের দেশ। সেখানে আছে মোহময়ী তরুণী আর রূপবান তরুণের দল। তাদের কাজ হোল কেবল ব্যক্তিগত সাঁতার দেওয়ার চৌবাচ্চার আশে পাশে শুয়ে আয়েষ করা আর না হয় কোন বিখ্যাত নৈশ ক্লাবে গিয়ে হৈ চৈ করা।

আপনি যদি রাজনীতির ছাত্র হন তবে কিছুদিন বাদে আপনার সন্দেহ জাগবে যে, হলিউড মোটা আয়ের লেখকে পরিপূর্ণ, যারা হাতুরি কাস্তে এমব্রয়ডারী করা সিল্কের জামা পড়েন এবং ক্রেমলীনের সমস্ত আদেশ প্রতিপালন করেন।

আপনি যদি পরিসংখ্যাবিদ্ হন তাহোলে আপনার খাতাপত্র খুললে হলিউডকে দেখতে পাবেন এমন একটি শিল্পকেন্দ্ররূপে, যেখানকার নিয়োজিত মূলধন হচ্ছে দু'শো সাত কোটি ডলারের ওপর এবং কর্মরত অভিনেতা, লেখক, প্রযোজক, টেকনিসিয়ান এবং আরো একশো পঁচিশটি শিল্প বাণিজ্যের প্রতিনিধির সংখ্যা হচ্ছে দু'লক্ষ একত্রিশ হাজার।

এটি হচ্ছে লস্ এঞ্জেলেস্ নগরীর ক্ষুদ্র একটি অংশ। যেখানকার তৈরী ছবি থেকে সপ্তাহে বাইশ কোটি লোক আনন্দ পায়। পৃথিবীর মধ্যে এইটিই সবচেয়ে বেশী লিখিত এবং কথিত নগরী। পাঁচশত সংবাদদাতা এখানকার সংবাদ সরবরাহ করে জীবন ধারণ করেন।

হলিউড, তার এই সমস্ত এবং আরো অনেক কিছু থাকা সত্ত্বেও সন্তুষ্ট নয়, কারণ সবাই তার পরিচয় পৃথিবীর কাছে বিকৃত ভাবে দেয়। এই শিল্পের মুখপত্র 'দি হলিউড রিপোর্টার' বলেন—'ছোটখাট সামান্য খবর ছাড়া হলিউড সম্বন্ধে সবাই সামান্যই জানে।' এই পত্রিকার খবর

অনুসারে বেশীর ভাগ হলিউডের বাসিন্দার সঙ্গে সাধারণ যে কোন মার্কিণ দেশের নাগরীকের বিশেষ তফাৎ নেই।

দশহাজার লোককে প্রশ্ন করে যে উত্তর পাওয়া গেছে তা এখানে দেওয়া হোল :—

হলিউডের চিত্রশিল্পে কর্ম্মীদের মধ্যে শতকরা ৮৮·৪ জন পুরুষ। শতকরা ১৯ ৯ জনের বয়স চল্লিশ থেকে চুয়াল্লিশের ভেতর। এই শিল্পের যোগদানের পূর্ব্বে শতকরা ৩০·৫ জন আমোদ-প্রমোদ মূলক কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল, যেমন থিয়েটার, কার্নিভ্যাল প্রভৃতি।

একশোজন লোকের মধ্যে উনআশিজন বিবাহিত এবং গড়পড়তা দু'টি করে ছেলেমেয়ে প্রত্যেক সংসারেই আছে বলে ধরা হোয়েছে।

শতকরা সত্তর জন কখনও বিবাহ বিচ্ছেদ করে নি।

শতকরা একষট্টি জন গির্জ্জায় যায়।

গত প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচনে শতকরা চুয়ান্ন জন গণতন্ত্রকে ভোট দিয়েছে। একচল্লিশ জন প্রজাতন্ত্রকে ভোট দিয়েছে।

শতকরা একাত্তর জন ধূমপান করে।

শতকরা আটষট্টিজনের নিজের বাড়ী আছে।

শতকরা তেতাল্লিশজন কমকরেও সপ্তাহে দু'বার সিনেমায় যায়।

শতকরা চল্লিশজন সপ্তাহে পাঁচরাত্রি বাড়ী থাকে।

শতকরা চোদ্দজন বলেছে যে, তারা মাইনে থেকে কিছুই জমাতে পারেনি।

শতকরা উনত্রিশজন তাদের মাইনের শতকরা দশভাগ জমিয়ে রাখে।

সবচেয়ে বেশী প্রিয় খেলাধুলো হোলো সাঁতার।
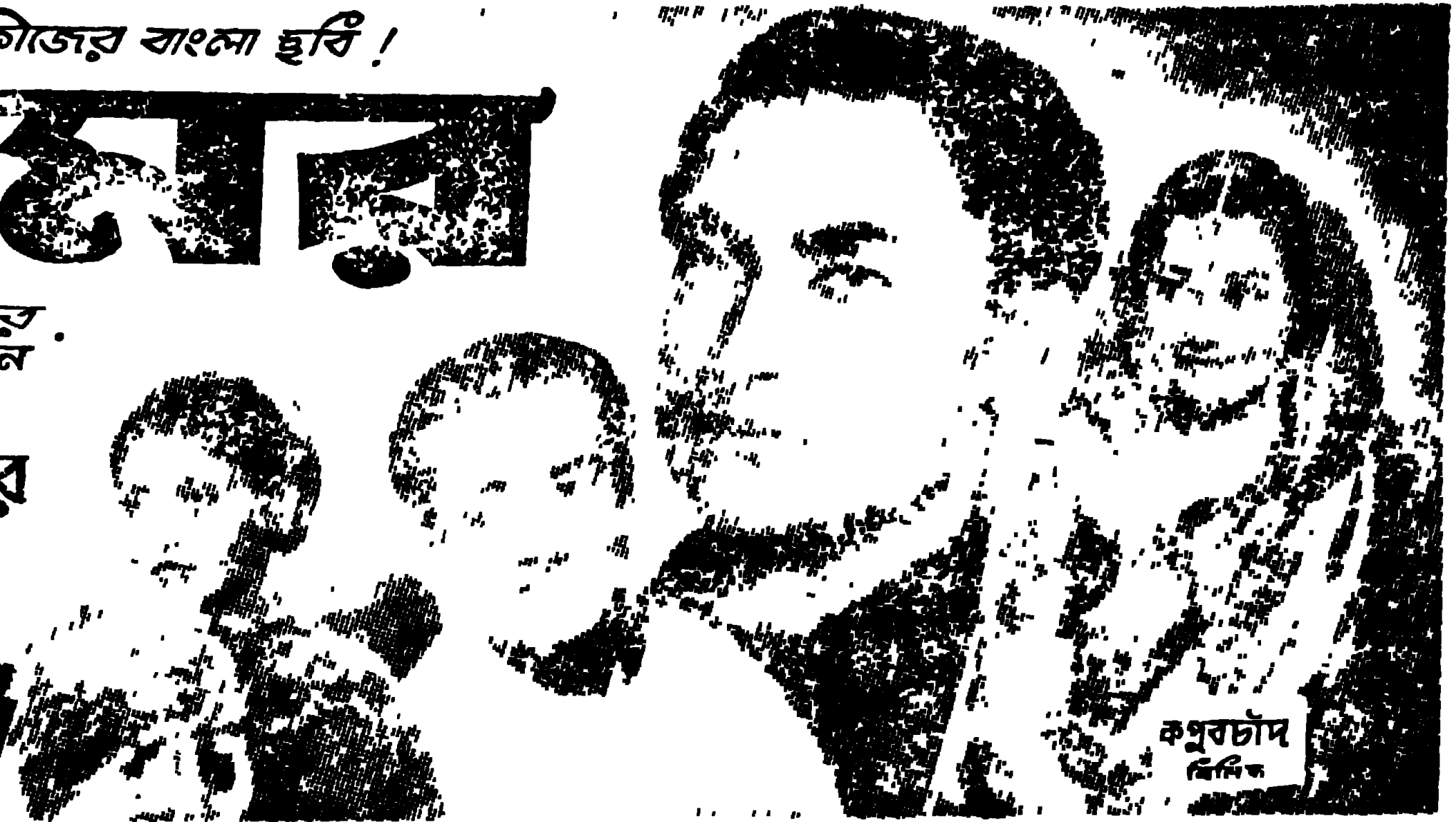
বোম্বাই বনাম বাংলা

কানাই রায় বি, এ

সম্প্রতি কোন একটা কাজ উপলক্ষ্যে আমাকে বোম্বাই যেতে হয়েছিল। সেখানে চিত্রজগতের কয়েকজন বিশিষ্ট কর্ম্মীর সঙ্গে আগে থেকে আলাপ থাকায়, বোম্বাই-এর চিত্র তারকাদের সংস্পর্শে আসার এবং অনেকগুলি ষ্টুডিও ঘুরে ফিরে দেখবার সুযোগ আমার কিছু হয়েছিল। বোম্বাই-এর ষ্টুডিও এবং চিত্রজগত সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই। 'চিত্রবাণী'র পাঠক-পাঠিকাদের সম্বন্ধে আমার ধারণা খুবই উচ্চ, কারণ আমি জানি এই অল্প সময়ে "চিত্রবাণী" যে অসাধ্য সাধন করেছে, তার মূলে "চিত্রবাণী"র উচ্চশিক্ষিত মার্জ্জিত রুচির পাঠক-পাঠিকা আছেন নিশ্চয়ই! সিনেমা সংক্রান্ত পত্রিকা তো আছে অনেক, কিন্তু এরূপ সমাদর সকল পত্রিকা পায়নি, এ কথা বললে অন্যায় হবেনা। কাজেই আপনারা, যাঁদের আমার সঙ্গে মতের মিল হবে না, তাঁদের কাছে আগেই মার্জ্জনা চেয়ে নিচ্ছি এই ব'লে যে এটা সম্পূর্ণ আমার নিজের মত এবং ধারণা।

বোম্বাই-এর ফিল্ম-ষ্টুডিওগুলি অত্যন্ত বিস্তৃত ভাবে ছড়িয়ে রয়েছে সারা "গ্রেটার বম্বে" জুড়ে, কোথায় মহালক্ষ্মী, কোথায় দাদার, আবার কোথায় মালাড্, কাজেই ঘোরাঘুরি আমাকে খুব বেশী করতে হয়েছে। প্রথমেই বলি অভিনেতাদের কথা। তাঁদের মধ্যে যাঁরা জ্যোতিষ্ক বলে খ্যাত যথা দিলীপকুমার, রাজকাপুর, দেবানন্দ্ প্রভৃতি, তাঁরা অভিনেতা হিসাবে নিতান্ত সাধারণ বলে আমার মনে হলো। অভিনয় প্রতিভা যে তাঁদের কারো খুব বেশী, কয়েকটি ছবির সেটে স্যুটিং দেখে এ কথা আমার মনে হলোনা। এই কথাই মনে হলো যে আমাদের ছবি বিশ্বাস বা কানী সরকার তাঁদের চেয়ে তুলনায় অনেক ভাল। অভিনেত্রীদের মধ্যে যিনি সর্ব্ব-উচ্চে অর্থাৎ নার্গিস্—নিতান্ত সাধারণ, সুরাইয়ার কণ্ঠস্বর ও সঙ্গীত পটুতা ছাড়া আর যে বিশেষ কিছু প্রতিভা আছে তা মনে হলোনা। দৈহিক সৌন্দর্য্য

অবশ্য মধুবালা, বিজয়লক্ষ্মী (ইনি বাঙালী) বা মুনাওয়ার সুলতানার আছে, কিন্তু তাছাড়া বিশেষ কিছু নেই, অর্থাৎ অভিনয় ক্ষমতার দিক থেকে উল্লেখযোগ্য কিছু দেখলাম না। বোম্বাই-এ অনেক ষ্টুডিও ঘুরে ফিরে দেখে আমার মনে হলো যে চিত্রশিল্পের সবচেয়ে ক্ষতি করছেন কয়েকজন "পুঁজিপতি" ধনী, যাঁরা ছবি তৈরী করতে গেলে প্রথমেই বলে বসেন যে সঙ্গীত পরিচালক হিসাবে তাঁদের চাই হয় নউসাদ নয় চিতলকারকে; আর প্রথমেই বলে দেন যে ছবিতে ১৯ খানা গান দেওয়া চাইই। তাছাড়া দিলীপ, নার্গিস কি রাজকাপুরকে নিশ্চয়ই চাই। গল্প বা পরিচালকের বেলায় অত আঁটসাঁট নেই, তা যাহোক বা যে কেউ হলেই চলবে। এই সব ব্যাপার শুনে একরকম চমকে গেলাম। পাঠককে বলে রাখি, উপরোক্ত নউসাদ্ যে কোন একটা ছবির সঙ্গীত পরিচালনা করতে নেবেন আশি হাজার টাকা, দিলীপ, নার্গিস বা রাজকাপুর প্রত্যেকে নেবেন একলাখ করে টাকা, তাও আবার মাসে চারদিনের বেশী স্যুটিং-এর দিন দেবেন না। তাজ্জব এই বোম্বাইয়া খেল্! আট নয় লাখ টাকা খরচ করে ছবি তৈরী হয়ে গেলে ডিষ্ট্রিবিউটার minimum guarantee কুড়ি লাখ টাকা দিয়ে ছবি নিলেন, প্রযোজক খুসি! এই ভাবে তাঁরা নিতান্ত সাধারণ অভিনেতা অভিনেত্রীদের বাজার দর অসম্ভব বাড়িয়ে দিচ্ছেন, আর অজুহাত দেখাচ্ছেন যে দর্শক এই চায়। আমি দু'এক জনের কাছে এই নীতির বিরুদ্ধে ক্ষীণ স্বরে কিছু বলতে চেষ্টা করেছিলাম,—কতদিন এইভাবে বুজরুকি চলবে? এক চিত্রপরিচালক, যিনি প্রতি ছবিতে পারিশ্রমিক একলাখ টাকা নিয়ে থাকেন, তিনি কি উত্তর দিলেন জানেন? তিনি বললেন,—"ভাল" ছবি বলতে আমেরিকান্ বা রাশিয়ান্ ছবিতে যে সব জিনিস দেখায়, সে সব বোঝবার ক্ষমতা আমাদের দেশের লোকের নেই! এত বড়ো তাজ্জব কথা শোনবার আশা আমি করি নি, তবু উত্তরে বললাম,—কিন্তু এদেশের দর্শকের দল যদি এতোই নির্বোধ এবং শিল্প-রুচি জ্ঞানহীন, তাহলে তাঁরা "The Pearl" অথবা "How green was my valley" ধরণের ছবিতে দলে দলে ভীড় করে যান ও পয়সা দেন কি ক'রে?

আরো ভালভাবে বুঝিয়ে দেবার জন্য বললাম,—দাদা, গরীব দেশ, পোলাও হয়তো পেতে পাইনা, তাই বলে যে পোলাও খেতে পেলে তারিফ করিনে, এটা ভাববেন না।

তাহলে ভেবে দেখুন, যেখানে লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়ে এরকম ছিনিমিনি খেলা চলছে, অথচ কাহিনী বা পরিচালনা সম্বন্ধে চিন্তাও করেনা, সেখানে চিত্রশিল্প মানে—কোন রকমে একজন ভাল সঙ্গীত পরিচালক, গোটা কুড়ি গান, এবং কয়েকজন "বক্স অফিস্" অভিনেতা অভিনেত্রী জোটানো, নয়-দশ লাখটাকা ফেলতে পারো এই ভাবে তো পাবে বিশ লক্ষ! সব ছবিই বর্ণিত হবে 'hilarious musical' বলে, অর্থাৎ কৌতুকহাস্যরসপূর্ণ ও সঙ্গীত মুখর! ব্যস্, গান রইলো, নাচ রইলো, কমিক রইলো (তা যতই মার্জিতরুচি—বিরোধী হোক্ না কেন)—এই হলো mass-appeal-এর মালমসলা, এর বেশী আবার দর্শক কি চায়? আর এতেই তো প্রযোজক mass-টাকা পাবেন আশা করেন।

ফিরে এলাম বোম্বাই থেকে, এসে দেখলাম "মাইকেল" ছবি। এই যে প্রচেষ্টা চলেছে বাংলা ছবিতে মহাপুরুষদের জীবনী দেখানো, বিবেকানন্দ, মাইকেল, বিদ্যাসাগর, এটা প্রশংসনীয় তো বটেই, তাছাড়া এতে ছবির ধারা কোনদিকে যাচ্ছে সেটা অনুমান করা যায়। তাই বলি, অনেক সময় আপাতঃ দৃষ্টিতে বাংলা দেশের চিত্রশিল্প নেমে যাচ্ছে মনে হলেও, নিশ্চয়ই অদূর ভবিষ্যতে আবার উঠে দাঁড়াবে এটা আশা করা যায়। কিন্তু বোম্বাই-এর চিত্রশিল্প কতদূর "খোপে টিঁকবে" সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। বাংলা দেশে দু'একজন অদূরদর্শী প্রযোজক মনে করেছিলেন যে বোম্বাইয়া ছবির হুবহু অনুকরণে বাংলা ছবি করলেই তাঁরা বাজার মাৎ করতে পারবেন, কিন্তু তা পেরেছিলেন কি? বাংলার দর্শক সমাজ সম্বন্ধে অন্ততঃ এইটুকু বলা যায় যে বোম্বাই-এর চিত্রজগৎ যে মতই পোষণ করুন না কেন, বাংলার দর্শক চিরকালই সত্যিকার ভালো ছবির কদর করে থাকেন এবং করবেনও। বোম্বাই বনাম বাংলা এই দ্বন্দ্বে যে পরিশেষে বাংলাই জয়ী হবে, এ ভরসা ও আশা আমি রাখি।

সম্প্রতি সিনে-টেক্‌নিশিয়ানস্‌ এ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে পশ্চিম বঙ্গ সরকারের শ্রমমন্ত্রী মাননীয় কালিপদ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করেন প্রমথেশ বড়ুয়া, পশুপতি চট্টোপাধ্যায়, সুশীল মজুমদার ও সুধীশ ঘটক। ষ্টুডিয়োতে ফ্যাক্টরী এ্যাক্ট প্রবর্ত্তনের প্রস্তাব নিয়ে তারা আলাপ-আলোচনায় রত।

ভারত জাতীয় চিত্র প্রতিষ্ঠানের 'সে নিল বিদায়' চিত্রে স্মৃতিরেখা বিশ্বাস

শারদীয়া

(ওপরে) 'কুহেলিকা' চিত্রে
অহীন্দ্র চৌধুরী

(ওপরে) 'কুহেলিকা' ছবিতে
মণিকা ঘোষ

'সে নিল বিদায়' চিত্রে রেণুকা রায়

(নীচে) 'সমর' ছবিতে
রুমা দেবী

(নীচে) 'কুহেলিকা' চিত্রে
বন্দনা দেবী

চিত্রবাণী ১৩৫৭

প্রবীণ অভিনেতা তুলসী চক্রবর্ত্তী

তুলসী চক্রবর্ত্তীর নাম বাংলা দেশের চিত্ররসিকমাত্রই জানেন, এবং সকলেই তাঁর অভিনয় দর্শনে মুগ্ধ হোয়েছেন। টাইপ চরিত্র চিত্রণে তিনি অদ্বিতীয়। তাঁর অভিনীত টাইপ চরিত্রগুলি বাংলা ছায়াছবিশিল্পের ইতিহাসে স্মরণীয় হ'য়ে থাকবে।

তুলসীবাবুর বাল্য এবং যৌবনের কিছু অংশ কেটে ছিল জোড়াসাঁকোর চাষাধোপাপাড়া লেনে। এখন কিন্তু এই লেনের অস্তিত্ব নেই। চাষাধোপাপাড়া লেনের ওপর দিয়ে চিত্তরঞ্জন এভিনিউ বেরিয়ে গেছে। তুলসীবাবুদের বাড়ী যেখানে ছিল সেখানে এখন গিরীশ পার্ক। এখানকার বাড়ী ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের হাতে চলে যাওয়ার পর তাঁরা হাওড়ায় চলে যান এবং এখনো সেখানেই বসবাস করছেন। তুলসীবাবুর বাবা রেলে কাজ করতেন এবং সেইজন্যে তাঁকে বাইরে বাইরেই থাকতে হোত বেশী। ছেলে থাকতো ক'লকাতায় জ্যাঠামশায় ৺প্রসাদ চন্দ্র চক্রবর্ত্তীর কাছে। জ্যাঠামশায় ষ্টার থিয়েটারে হারমোনিয়াম বাজাতেন এবং অভিনয়ের দিকে ঝোঁকও খুব ছিল। তাঁর কাছে থাকার দরুন বালক তুলসীর মন অভিনয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়। আট-নয় বছর বয়স থেকেই তিনি সৌখীন সম্প্রদায়ে প্রহ্লাদ, ধ্রুব প্রভৃতির ভূমিকায় অভিনয় করতে শুরু করেন। যখন তাঁর চব্বিশ বছর বয়স তখন তিনি 'কোবাল' নামে এক ভ্রাম্যমান পেশাদার নাট্যসম্প্রদায়ে যোগদান করলেন। তখনকার দিনে এরকম বহু নাট্যদল ছিল, তাঁরা ঘু'রে ঘু'রে এখানে ওখানে অভিনয় করতেন। এইসব সম্প্রদায়ের কোন স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ ছিল না। কোন জায়গা থেকে ডাক এলে এঁরা সেখানে গিয়ে অভিনয় করে আসতেন। এঁদের অভিনীত নাটকের স্ত্রীভূমিকাগুলি মেয়েদের দ্বারাই অভিনীত হোত। এই সময় একদিন প্রসাদবাবু ভাইপোকে ষ্টার থিয়েটারের অধ্যক্ষ অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-এর কাছে নিয়ে গেলেন। তিনি তুলসীবাবুকে নিজের সম্প্রদায়ে নিতে রাজী হোলেন। অপরেশবাবুর সম্প্রদায়ের তখন বাইরে থেকে 'জয়দেব'-এ অভিনয় করবার জন্যে বায়না এসেছিল। অপরেশবাবু তুলসীবাবুকে 'জয়দেব'-এ 'পরাশরে'র ভূমিকা দিলেন। তিনি পরাশরের ভূমিকায় সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেছিলেন। এই ভূমিকায় অভিনয়কালে তাঁকে নাচ এবং গান দুই-ই করতে হোয়েছিল। 'জয়দেব' অভিনয়ের পর দিন থেকেই তুলসীবাবু ষ্টারে যোগদান করলেন। তাঁর মাইনে হোল মাসিক পনেরো টাকা। তখনকার দিনে বড় বড় অভিনেতাদেরও পারিশ্রমিকের হার এই অনুপাতেই ছিল। এখনকার অভিনেতাদের মতো মোটা টাকা নয়। আগেকার অভিনেতা বা অভিনেত্রীদের কাছে টাকাটাই বড় ছিল না, তাঁরা শিল্পকেই (আর্ট) প্রধান স্থান দিতেন। আগেকার অভিনেতাদের কম পারিশ্রমিক নেওয়ার আরও একটা কারণ ছিল যে, বেশীর ভাগ অভিনেতাই চাকরী করতেন। সেইজন্যেই জীবিকার্জ্জন সম্পূর্ণভাবে থিয়েটারের পারিশ্রমিকের ওপর নির্ভর করতো না। তৎকালীন বিখ্যাত অভিনেতা টি, পালিত মহাশয় জি, পি-ও-তে কাজ করতেন। সারাদিন কাজ করে আবার সারারাত্রি অভিনয় করতেন। অবশ্য তখন সপ্তাহে তিন দিন অভিনয় হোত—শনি, রবি এবং বুধবার। 'জয়দেব' নাটকে টি, পালিত—জয়দেবের, কুসুমকুমারী—বিমলার, নীহারবালা—শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকায় অবতীর্ণ হোয়েছিলেন। 'জয়দেব' নাটকে অভিনয় করার দরুন তিনি পারিশ্রমিক পেয়েছিলেন দশ টাকা। 'ষ্টার থিয়েটারে তিনি প্রথম অভিনয় করেন 'রাখীবন্ধন' নাটকে। এর কিছুদিন পরে 'ষ্টার থিয়েটারের' নাম 'আর্ট থিয়েটার' রাখা হোল, অধ্যক্ষ অবশ্য অপরেশবাবুই রইলেন। 'আর্ট থিয়েটারে' প্রথম যে নাটকটি অভিনীত হোল তার নাম 'কর্ণার্জ্জুন'। এই নাটকে তুলসীবাবু অভিনয় করেছিলেন 'কৃপাচার্য্যে'র ভূমিকায় এবং অপরেশবাবু অভিনয় করেছিলেন 'জামদগ্ন মুনি'র ভূমিকায়।

তুলসীবাবু অভিনয় শিক্ষা করেছিলেন অপরেশবাবুর কাছে। এখনকার দিনে বিশেষ কোন রকম শিক্ষা না নিয়েই চিত্রজগতে অথবা রঙ্গমঞ্চে বড় অভিনেতা হওয়া যায়। তখনকার দিনে সে রকম ছিল না। অভিনয় করতে হোলে যথেষ্ট শ্রমসহকারে অভিনয়কলা শিখতে হোত। তুলসীবাবু অপরেশবাবুর কাছে সেই রকম বুনিয়াদি শিক্ষা লাভ করেছিলেন। তখনকার দিনে অভিনয় করবার আগে হ্রস্বকার দীর্ঘকার উচ্চারণে শুদ্ধতা আনতে হোত। গলার স্বরের মডিউলেসন শিখতে হোত, হাঁটা-চলা, দাঁড়ানো, কথা বলা, সব কিছুই নির্ভুলভাবে শিখতে হোত। তার ওপর আছে পার্ট মুখস্থ। কোন রকম ভুলভ্রান্তি হোলে পাঠশালের পড়ুয়াদের মত শাস্তি পেতে হোত—চপেটাঘাত, কর্ণমর্দ্দন প্রভৃতি। 'দুর্গেশনন্দিনী'র অভিনয় হচ্ছে—একটি দৃশ্যে আছে অজ্ঞান অবস্থায় জগৎসিংহ শয্যায় শুয়ে আছে, আয়েষা উৎকণ্ঠিত হয়ে জগৎ সিংহের শিয়রের কাছে বসে আছে। হাকিম সাহেব (তুলসী চক্রবর্ত্তী) প্রবেশ করে জগৎসিংহকে পরীক্ষা করলেন। আয়েষা জিজ্ঞাসা করলে—হাকিম সাহেব, কেমন দেখলেন? হাকিম সাহেবের বলা উচিত ছিল—আর চিন্তা নেই, রক্ষা পেয়েছে। কিন্তু হাকিম সাহেব নার্ভাস হয়ে সংলাপ গোলমাল করে ফেলেছেন। তিনি উত্তর ক'রলেন—আর রক্ষা নেই, চিন্তা পেয়েছে। আর যায় কোথায়, হাকিম সাহেব ষ্টেজ থেকে ভেতরে আসতেই একটি প্রকাণ্ড চপেটাঘাত পুরস্কার পেলেন। এই রকমভাবেই তুলসীবাবুকে অভিনয় শিখতে হয়েছিল, কারণ তখনকার দিনে এই রকম রীতিই ছিল।

'আর্ট থিয়েটারে' তুলসীবাবু 'শকুন্তলা', 'পোষ্যপুত্র' প্রভৃতি আরো অনেক নাটকে অভিনয় করেছিলেন। 'শকুন্তলায়' তিনি 'কাঞ্চুকী'র ভূমিকায় এবং 'পোষ্যপুত্রে' বৈকুণ্ঠ ভট্টাচার্য্যের ভূমিকায় অবতীর্ণ হোয়েছিলেন। এই ভূমিকায় অভিনয় করে তিনি দর্শকসাধারণের অভিনন্দন লাভ করেছিলেন। এই নাটকে বিখ্যাত অভিনেতা দানিবাবু শ্যামাকান্তের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। এরপর তিনি 'নাট্যনিকেতনে' যোগদান করলেন। এখানে 'চক্রব্যূহ', 'মা' এবং আরো অনেক নাটকে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। 'মা'তে তিনি একই সঙ্গে দু'টি ভূমিকায় অভিনয় করতেন—একটি হোল মাদ্রাজী ভিখারীর ভূমিকায় অপরটি হোল মনোরমার বাবার ভূমিকায়। মাদ্রাজী ভিখারী চরিত্রটির সংলাপ তিনিই দিয়েছিলেন এবং তা অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করেছিল। যখন তিনি মঞ্চের ওপর উঠে অভিনয় করতেন, দর্শক মুগ্ধ হোয়ে মঞ্চের ওপর টাকা পয়সা ছুঁড়ে দিতেন, তাঁরা ভুলে যেতেন যে তাঁরা অভিনয় দেখছেন। নাট্যনিকেতন সম্প্রদায়ের সঙ্গে তিনি রেঙ্গুন, ঢাকা, জলপাইগুড়ি, দার্জ্জিলিং প্রভৃতি বহু জায়গায় অভিনয় করেছিলেন। নাট্যনিকেতনের পর তিনি নাট্যভারতী রঙ্গমঞ্চে যোগদান করলেন। এই রঙ্গমঞ্চে অভিনীত সব নাটকেই তিনি বিশিষ্ট টাইপ চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। এবং তাঁর অভিনীত কয়েকটি চরিত্রের সংলাপ নিজেই
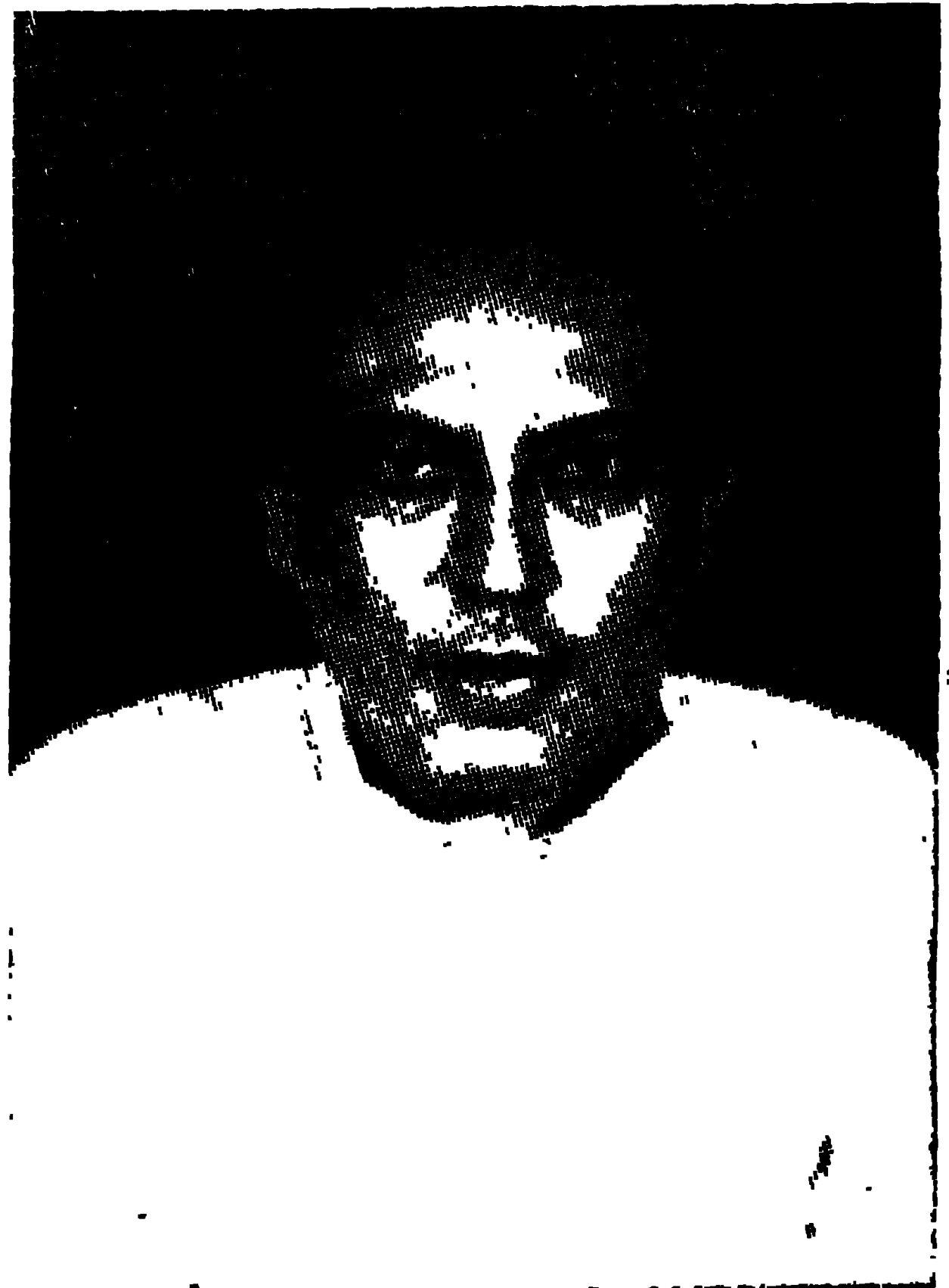
মুক্তির পথে

• দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত দেশবাসীর অন্তরের কথা আজ পর্দায় প্রতিফলিত
• স্বাধীনতার মূলমন্ত্র বন্দেমাতরম্

মুক্তির পথে

নিও স্ক্রীন প্লেজ লিঃ এর প্রথম ছবি
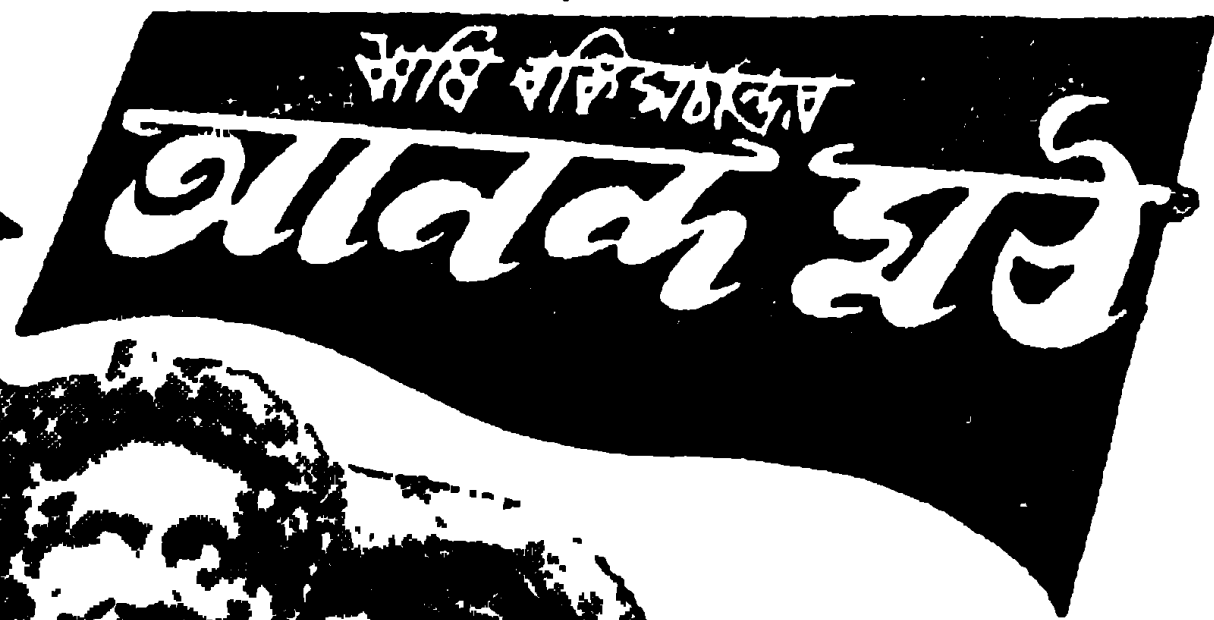
ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের

আনন্দ মঠ

সঙ্গীত
সুবল দাসগুপ্ত
•
দৃশ্যপরিকল্পনা উপদেশক
রথীন ঠাকুর
*

রূপায়নে
অহীন্দ্র, কমল
সুনন্দা, অনুভা
গুরুদাস, বিপিন
তুলসী, জীবন
স্মীতা, নিভাননী
*

পরিচালনা ও চিত্রনাট্য
সতীশ দাশ গুপ্ত

পরিবেশক - প্রাইমা ফিল্মস (১৯৩৮) লিঃ

নিও স্ক্রীন প্লেজ লিঃ এর
দ্বিতীয় নৈবেদ্য

দেহী-বিদেহী

রচনা করেছিলেন। এরপর অভিনেতা শরৎ চট্টোপাধ্যায় তুলসীবাবুকে রঙমহলে নিয়ে যান। এখানে 'ভোলামাষ্টার', 'চরিত্রহীন' এবং অনেক নাটকে টাইপ চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। রঙ্গমঞ্চে অনেক সময় কোন অভিনেতা অনুপস্থিত থাকার দরুন সেই অভিনেতার চরিত্রে অভিনয় করেছেন এবং সে সব চরিত্র তাঁর দ্বারা বেশ সাফল্যের সঙ্গেই অভিনীত হোয়েছে।

'ষ্টার থিয়েটারে' যখন তিনি অভিনয় করছিলেন সেই সময় নিউ থিয়েটার্সের চারু দত্ত তাঁকে চলচ্চিত্রে অভিনয় করবার জন্যে বলেন। তখন নিউ থিয়েটার্সে ডি, এল রায়ের 'পুনর্জ্জন্ম' তোলা হচ্ছিল। এই ছবিতে তুলসীবাবুকে জনতার দৃশ্যে কোরাস গান গাইতে হোয়েছিল। এজন্যে তিনি পারিশ্রমিক পেয়েছিলেন পাঁচ টাকা। অভিনেতা কুমারকৃষ্ণ মিত্রের সঙ্গে তুলসীবাবুর আলাপ থিয়েটারে এবং তা' পরে বন্ধুতায় পরিণত হোয়েছিল। তখন রাধা ফিল্মস ষ্টুডিও খোলা হোল। কুমারকৃষ্ণবাবু তুলসীবাবুকে রাধা ফিল্মসে নিয়ে যান। এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি দীর্ঘ পোনেরো বছর জড়িত ছিলেন। এখানে তাঁর প্রথম মাইনে হয় মাসিক পঞ্চাশ টাকা। রাধা ফিল্মসের প্রথম ছবি 'শ্রীগৌরাঙ্গ'তে তুলসীবাবু অদ্বৈতাচার্যের ভূমিকায় অভিনয় করেন। এই প্রতিষ্ঠানে থাকাকালীন তিনি বহু ছবিতে অভিনয় করেন—'জনকনন্দিনী'তে—জনকরাজা, 'নরনারায়ণ' এ—জহ্নুরাজ, 'প্রভাসমিলন'-এ—নন্দরাজা, 'দক্ষযজ্ঞ'-এ—ব্রহ্মা, 'মানময়ী গার্লস্ স্কুল'-এ—দামোদর, 'কণ্ঠহার'-এ জমিদার নবীনকৃষ্ণ। সব ছবির নাম এখানে দেওয়া গেল না। প্রায় সব বাংলা ছবিতেই তাঁকে দেখতে পাওয়া যায়। তিনি বহু প্রতিষ্ঠানের হোয়ে অসংখ্য ছবি তুলেছেন। হিন্দী ছবিতেও তিনি অভিনয় করেছেন। রাধা ফিল্মসের 'কণ্ঠহীন বিজলী' নামে একটি উর্দ্দু ছবিতে এবং নিউ থিয়েটার্সের 'ছোটা ভাই'তে, 'ইরাণ-কি একরাতে' অভিনয় করেছেন। তুলসীবাবু ভাল হিন্দী এবং উর্দ্দু বলতে পারেন।

তুলসীবাবু যে সঙ্গীত ও নৃত্যে পারদর্শী সে কথা আগেই উল্লেখ করেছি। 'কবি' কথাচিত্রে যে কবিগান তিনি গেয়েছিলেন তার সুর একরকম প্রায় তাঁরই দেওয়া। যখন তিনি পূর্ব্ববঙ্গে গিয়েছিলেন নাট্যনিকেতন সম্প্রদায়ের সঙ্গে, তখন সেখানে অনেক কবি গান শুনেছিলেন এবং গান গাইবার সময় গায়ক যে সমস্ত অঙ্গভঙ্গী করে থাকে সে সমস্ত তিনি ভালোভাবে লক্ষ্য করেছিলেন। পরে তা তিনি 'কবি' চিত্রে সন্নিবেশিত করতে সক্ষম হোয়েছিলেন। 'পঞ্চায়েৎ' ছবিতেও তিনি একটি কবি গান

নীলাকাশের ইসারা আমাদের প্রতিদিন বলেছে, আনন্দধামের মাঝখানে তোমাদের প্রত্যেকের নিমন্ত্রণ। একথা বলেছে, বসন্তের হাওয়ায় বিরহের মরমিয়া কবি। সকালবেলায় প্রভাত-কিরণের দূত এসে ধাক্কা দিল। কী। না নিমন্ত্রণ আছে। উদাস মধ্যাহ্নে মধুকর গুঞ্জিত বনচ্ছায়া দূত হ'য়ে এসে ধাক্কা দিল! কী। না নিমন্ত্রণ আছে। সন্ধ্যা-মেঘে অস্ত-সূর্যচ্ছটায় সে দূত আবার বললে, নিমন্ত্রণ আছে। এই নিমন্ত্রণের উত্তর দিতে হবে না কি। সে উত্তর ঐ আনন্দধামের বাণীতেই যদি না লিখি তা হ'লে কি গ্রাহ্য হবে।

—রবীন্দ্রনাথ

গেয়েছেন। 'স্পর্শমণি' ছবিতে তিনি অনেকটা কবি গানের মত এক নতুন ঢঙে একটা গান গেয়েছেন। শেষোক্ত ছবি দু'টি এখনও মুক্তিলাভ করেনি।

ছোটবেলায় বাবা মারা যাওয়ার দরুন তুলসীবাবুর লেখাপড়া বেশীদূর পর্য্যন্ত হয়নি। অল্প বয়েস থেকেই ওঁকে জীবিকা অর্জন করতে হোয়েছে। প্রথম দিকে ওঁকে চাকরীর চেষ্টা করতে হোয়েছিল এবং একটি প্রেসে চাকরীও করেছিলেন, পরে থিয়েটারে চাকরী পাওয়ায় সে চাকরী ছেড়ে দেন। তিনি যদি চাকরী করতেন তাহলে বাংলা দেশের অগণিত দর্শক তাঁর সুন্দর অভিনয়ের আনন্দ থেকে বঞ্চিত হোতেন। ছবিতে যেমন তিনি রসিক রূপে পরিচিত তেমনি ব্যবহারিক জীবনেও তিনি রসিক। যারা তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন সকলেই তাঁর প্রাণখোলা মিষ্টস্বভাব মধুর আলাপে মুগ্ধ হোয়েছেন, আনন্দ পেয়েছেন। সকলেই তাঁকে ভালোবাসে। রাস্তাঘাটে সকলেই তাঁকে 'দাদু' নামে অভিহিত করে। ট্রামে বাসে আজকাল প্রচণ্ড ভীড়, তাতে ওঠা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু তুলসীবাবুর কাছে তা অসম্ভব নয়। তাঁকে দেখতে পেলেই সকলে স্বেচ্ছায় বসবার জায়গা ছেড়ে দেয়। জনসাধারণের এই সৌজন্যের জন্য তিনি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। আবার অনেক সময় এই অত্যধিক জনপ্রিয়তার দরুন তাঁকে নানান অসুবিধা ভোগ করতেও হয়। এবং এই জন্যে বর্ত্তমানে ছবি দেখা এক রকম তিনি ছেড়ে দিয়েছেন। আর একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে যে তিনি নিজের অভিনীত ছবি দেখেন না। নিজের ছবি দেখতে তার কিরকম একটা ভয় হয়—ভয়টা হচ্ছে দর্শক সাধারণকে নিয়ে। অবশ্য দর্শকের ওপর তাঁর যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে। তাঁদের ভাল জিনিষ দিলেই তাঁরা নেবেন।

তুলসীবাবুকে যে কোন ধরণের ভূমিকা দেওয়া হোক না কেন, প্রাণপাত পরিশ্রম করে তিনি তা সফল করার চেষ্টা করেন। কোন রকম ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা অথবা গাফিলতি করেন না। সেই জন্যেই আজ তিনি বাংলার শ্রেষ্ঠ টাইপ-চরিত্রাভিনেতা। রেকর্ড এবং রেডিও তাঁর প্রতিভার স্পর্শ থেকে বঞ্চিত হয়নি। তুলসীবাবুর রেকর্ডে কয়েকটি গান আছে এবং রেডিওর অভিনয় আসরে অনেক অভিনয় করেছেন। আর একটি কথা বলা হয়তো এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, চলচ্চিত্রশিল্পের এবং রঙ্গমঞ্চের জন্যে যে পরিমাণ অধ্যবসায়, যে পরিমাণ পরিশ্রম তিনি করেছেন অর্থাৎ এই শিল্পকে যতটা দান করেছেন প্রতিদানে তার কাছ থেকে এক চতুর্থাংশও পাননি। তাই এত বড় অভিনয় প্রতিভার অধিকারী হয়েও আজকে তাঁকে দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করতে হচ্ছে। অথচ অনেক অযোগ্য ব্যক্তি এই শিল্পের কল্যাণে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করেছেন। এটা এই শিল্পের একটা দুরপনেয় কলঙ্ক হোয়ে রইলো।

গরবিনী

ভ্যানগার্ড প্রোডাকসন্সের
নিবেদন

ভূমিকায়
দীপ্তি রায় · সুপ্রভা · রেণুকা রায়
কেতকী · অপর্ণা · জহর · ছবি
বিকাশ · শ্যামলাহা · ভূবন চৌধুরী

পরিচালনা
নীরেন লাহিড়ী

সঙ্গীত
সুধীরলাল চক্রবর্ত্তী

কাহিনী
পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়
সংলাপ · নিতাই ভট্টাচার্য্য

প্রাইমা রিলিজ
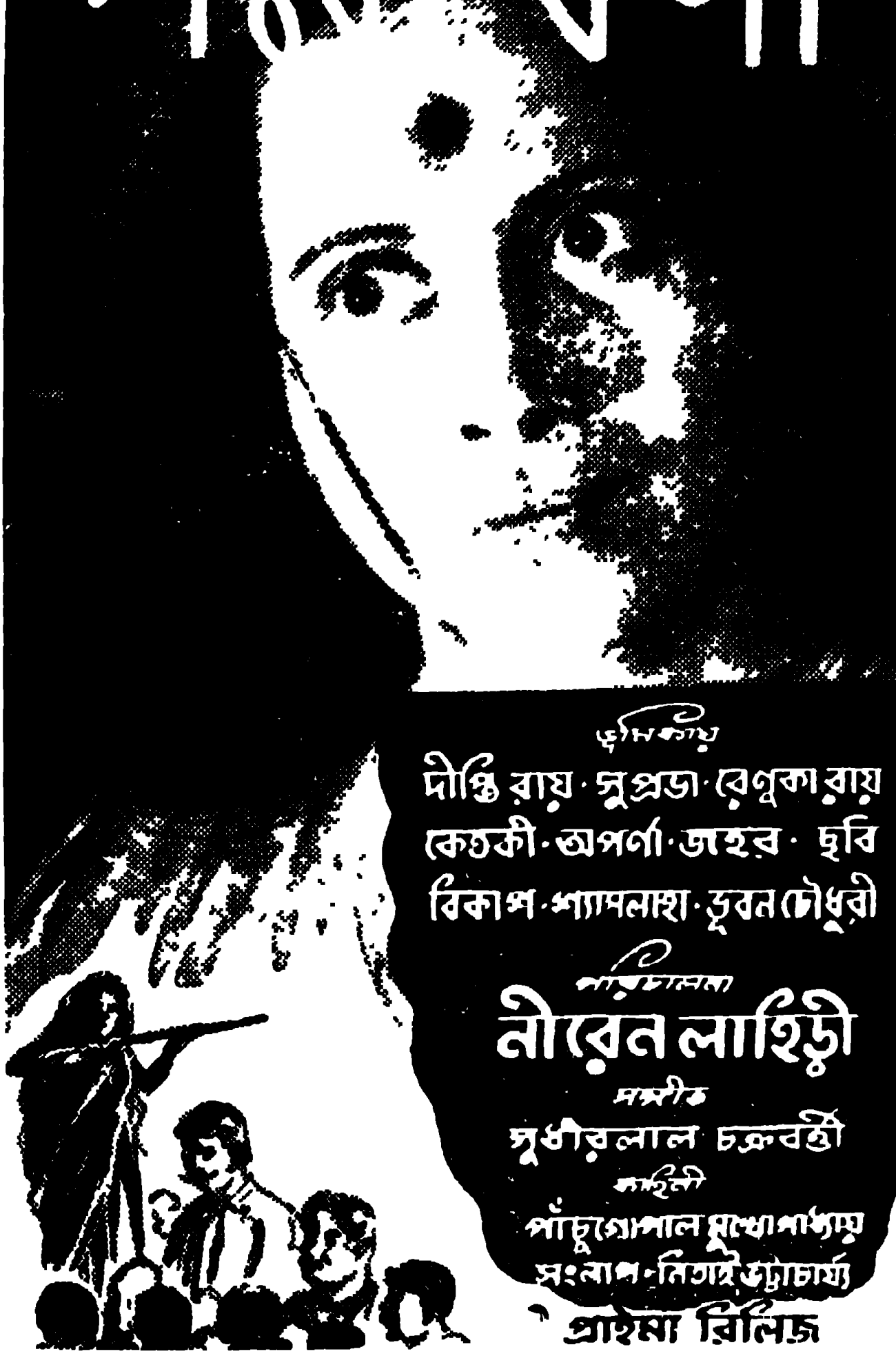
রূপবাণী • ইন্দিরা • অরুণায় আগতপ্রায়

তোমার স্বামী ও শ্বশুবকে লক্ষ্য কবে বন্দুক কে ছুঁড়েছিল—সে কি তুমি? সেইদিন থেকে উন্মাদিনী না হয়েও তোমার জীবন কাটে পাগলা-গারদে। স্বামী-সোহাগিনী হয়েও তুমি স্বামীসান্নিধ্যবঞ্চিতা। বিয়ে করেছেন তিনি দ্বিতীয়বার। তোমার নির্য্যাতিত জীবনেব অগোচবে বিকশিত হয়ে উঠেছে তোমার মেয়ে—ভালবেসেছে একটি ছেলেকে, কিন্তু বিয়ে করবার সাহস নেই তার। মায়ের মস্তিষ্ক-বিকৃতি তার মনে সংশয় এনেছে। অর্দ্ধ-স্মৃতি-ভ্রষ্টের কুয়াশা ভেদ করে একবার তুমি বল, কেন তোমার এই অবস্থা, কে এর জন্য দায়ী? স্বামীগরবিনী তুমি, ফিরে চাও তোমার প্রতীক্ষমান সংসারের দিকে, সার্থক কর তোমার সংশয়াচ্ছন্ন মেয়ের জীবন।

নিউ স্ক্রীন প্রড লিঃ-এর প্রথম ছবি 'আনন্দমঠ'-এ
[illegible] চক্রবর্তী ও অনুভা গুপ্তা

করুণাময়ী পিক্‌চার্সের 'মেঘমুক্তি' চিত্রের নায়িকা চরিত্রে বহুদিন পরে

শ্রীমতী সন্ধ্যারাণীর দেখা পাওয়া যাবে

অভিনেতা দুর্গাদাস

—বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র

বাংলাদেশের আনন্দ জগতের গৌরবের যাঁরাই একটু রাখেন তাঁরা নিশ্চয় অভিনেতা দুর্গাদাস সম্বন্ধে অনেক কথা জানেন এবং কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অভিনয় রস-রসিকরা দুর্গাদাসের অভিনয় দেখতে যে কি পরিমাণে আগ্রহশীল ছিলেন তাও বোধ হয় প্রত্যক্ষ ক'রেছেন।

দুঃখের কথা নটের জীবনাবসানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধে লোকের আগ্রহও কমে যায় এবং ভাবীকালে তাঁর কথা কেউ মনেও রাখেনা। আমার মনে হয়, আমাদের দেশে যেদিন অভিনেতাদের ইতিহাস লিখিত হবে, সেইদিন গতকালের প্রত্যেক শিল্পীর সম্বন্ধে লোকে অনেক তথ্য জেনে, আরও বেশী পরিমাণে তাঁদের প্রতি সুবিচার এবং লক্ষ লক্ষ দর্শককে দিনের পর দিন যাঁরা আনন্দ দিয়ে গেছেন তাঁরা যে আমাদের বিশেষ স্মরণীয় সেটা উপলব্ধি করতে পারবেন।

দুর্গাদাস রঙ্গমঞ্চে, ছায়াচিত্রে, বেতারে, গ্রামোফোন রেকর্ডে বিশ বৎসরের ওপর অভিনয় ক'রে তাঁর খ্যাতিকে পরিব্যাপ্ত করেছিলেন এবং এককালে শিশির কুমার ভাদুড়ীর পর এতখানি জনপ্রিয়তা আর কেউ লাভ করতে পেরেছিলেন কিনা জানিনা। সত্যকথা বলতে কি, সিনেমায় তাঁর চেয়ে জনপ্রিয় শিশিরকুমারও কোনদিন হ'তে পারেন নি—তবে সে জন্য একথা বলিনা যে শিশিরবাবুর চেয়ে তিনি অভিনেতা হিসেবে বড় ছিলেন।

ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে সুমধুর কণ্ঠস্বর ও অপূর্ব্ব দেহ সৌষ্ঠবের তিনি ছিলেন অধিকারী এবং একান্ন বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তরুণ নটের ভূমিকায় অভিনয় ক'রে তাঁর যে বয়স হ'য়েছে সেকথাও তিনি সকলকে ভুলিয়ে দিতেন। দুর্গাদাস পারতপক্ষে তাই বৃদ্ধের ভূমিকায় নামতেনও না।

দীর্ঘ সতেরো আঠারো বছর তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে আমি মিশেছিলুম, তাই দেখতুম বার্দ্ধক্যকে তিনি অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করেন এবং তাঁর এই কামনাই ছিল যে বুড়ো অভিনেতা হ'য়ে রঙ্গমঞ্চে যেন তাঁকে কোনদিন নামতে না হয়—তার পূর্ব্বে যেন তিনি চিরবিদায় নেন। তিনি উপস্থিত থাকতে যুবক হিরোর ভূমিকায় কেউ অবতীর্ণ হবে এ যেমন অপরে ভাবতে পারতো না তেমনি তিনি নিজেও সে কথা ভাবতে পারতেন না। ভগবান তাই এই চির-তরুণ মনের কামনাকে পূর্ণ করবার জন্যই বোধ হয় শেষ পর্য্যন্ত তাঁর দেহকেও তারুণ্যে ভরিয়ে রেখেছিলেন এবং সেই শরীরের ক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে লোকলোচনের অন্তরালে নিয়ে গেলেন।

দুর্গাদাস যে অসম্ভব জনপ্রিয় ছিলেন তা আমরা প্রত্যক্ষভাবে দেখেছি। তিনি যেদিনই রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করতে নামতেন সেইদিন দেখতাম যে তাঁকে দেখবার জন্যে তরুণ তরুণীদের কী আগ্রহ। ভূমিকা ভুল আওড়ে গেলেও লোকের ধারণা ছিল সেটা তাঁর অভিনয় কৌশলের একটা ধাঁচ। সামান্য একটা হাসির কথা তাঁর মুখ দিয়ে বেরুলে লোকের হাসি আর থামতে চাইতো না। দর্শক সমাজের সঙ্গে অভিনেতার একটা মানসিক যোগ থাকার জন্য দুর্গাদাসকে মিষ্টি লাগতো সকলেরই। মিষ্টি ভূমিকায় মিষ্টি চেহারা নিয়ে বারবার অবতীর্ণ হওয়ার ফলে বাংলাদেশের দর্শকমহলে দুর্গাদাসের খতিরই ছিল আলাদা।

রাস্তা দিয়ে দুর্গাদাসকে যেতে দেখলে ভীড় জমে যেত দুধারে এবং সময় সময় তাঁর দু'একটা দোষের জন্যে লোকে ক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠলেও যেই তিনি সংযত হ'য়ে তাদের কাছে গিয়ে দাঁড়াতেন অমনি সবাই তাঁর সব দোষ ভুলে হাসিমুখে দুর্গাদাসকে অভিনন্দন জানাতে কুণ্ঠিত হ'তনা।

একবার রঙ্মহলে দুষ্টুমি করে তিনি প্রথম শোতে হাজির হলেন না—লোকে ক্ষেপে উঠলো, আমরাও অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলাম, দ্বিতীয় শো বন্ধ ক'রে দেওয়ার জল্পনা

চ'লছে, এমন সময় তিনি এসে হাজির। তখন জনতা মার-মুখী হয়ে দাঁড়িয়েছে, হঠাৎ তিনি শান্তভাবে তাদের মধ্যে গিয়ে এমন দুচারটে কথা ব'ললেন যে সকলে নীরবে পুনরায় আসন সংগ্রহ ক'রে আবার তাঁর অভিনয় দেখতে বসে গেল। এরকম ঘটনা একবার নয় দশ পনেরো বার তিনি করেছেন। এই দোষগুলি থাকা সত্ত্বেও তাঁর প্রতি দর্শকদের যে কতখানি প্রীতি ছিল সেই হিসেবে এই একটি ঘটনার উল্লেখ করলুম।

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যে গাম্ভীর্য্য থাকা স্বাভাবিক, ঠিক সে জিনিষটা দুর্গাদাসের মধ্যে ছিলনা, যুবকের চাঞ্চল্য ছিল সব সময়ে। ছুটোছুটি, হৈ চৈ ক'রে তিনি রঙ্গমঞ্চের অন্ত-রালে এমন কাণ্ড করতেন তাতে সকলে অস্থির হয়ে উঠতো। কিন্তু প্রাণ ছিল তাঁর খুবই বড় এবং মহানু-ভবতা ও বন্ধুপ্রীতি ছিল তাঁর খুবই বেশী। সময় সময় তাঁর দুষ্টুমিতে আমাদেরও শঙ্কিত হয়ে উঠতে হয়েছে, আবার পরক্ষণেই এক কৌতুককর অবস্থার সৃষ্টি করে তিনি হাসিয়ে দিয়েছেন সকলকে। শতবার বিরক্ত হয়ে তাঁর

সঙ্গে আমরা কথা-বলা বন্ধ করে দিয়েছি ততবারই কিন্তু ঠিক কয়েকদিন পরে তিনি বাড়ী গিয়ে এমন ভাব জমিয়ে নিয়েছেন যে বলবার নয়।

দুর্গাদাসের চলা, বলা, হাসি প্রত্যেক অঙ্গভঙ্গীর মধ্যে তাঁর শিল্প মনোবৃত্তির এবং ঈশ্বরদত্ত প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যেত সুস্পষ্টভাবে। স্কুলে বা কলেজে পড়ে যে উচ্চশিক্ষা পাওয়া যায় তা তাঁর ছিলনা সত্য, কিন্তু যে বিদ্যার সাহায্যে শিক্ষিত অভিজাত মনের ও আচার ব্যবহারের চিত্র আঁকা যায় সে বিদ্যা দান করে বিধাতা তাঁকে পাঠিয়েছিলেন! তাছাড়া তাঁর সহজাত আভিজাত্য ছিল এমন যা দেখলেই মানুষ এই ব্যক্তিটির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়তো।

এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনা মনে পড়লো। একবার কোন এক রঙ্গমঞ্চে কি একটা অভিনয় হচ্ছিল, সহসা দুর্গাদাস প্রেক্ষাগৃহে একটি সাদা ঝোলা পায়জামা ও পাঞ্জাবী পরে সিগারেট খেতে খেতে সেই অভিনয়ের একটি দৃশ্য বাইরে থেকে কেমন হয় তাই দেখবার জন্যে দাঁড়ালেন। পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহের সমস্ত নরনারীর চক্ষু তখন অভিনয়ের দৃশ্য ছেড়ে দুর্গাদাসের ওপর গিয়ে পড়লো। আমি খুব ভাল করে তখন লক্ষ্য করলুম যে দুর্গাদাসকে সামনে দেখে সকলে যেন আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে—তিনি চলে যেতে লোককে বলাবলি করতে শুনলুম—দেখ দেখি সিগারেটটাও ধরেছে কি কায়দায়!

তাঁর সুন্দর চেহারার বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন—তবু একটি বিশিষ্ট চিত্র প্রতিষ্ঠানের কোন এক বড় ক্যামেরাম্যান তাঁর সম্বন্ধে যে কয়েকটি কথা বলেছিলেন তা আপনাদের কাছে না জানিয়ে পারছি না। তিনি আমায় বলেছিলেন,—দেখুন বাংলাদেশে ও বাংলার বাইরে বহু ছবি আমি তুলেছি এবং বহু নটের সঙ্গে আমার কাজ করার সুযোগ হয়েছে কিন্তু যে কোন দিক থেকে যে কোনভাবেই ভাল ফটো নেওয়া যেতে পারে এমন অভিনেতা আমি মাত্র একজনকেই দেখেছি, তিনি দুর্গাদাস। চেহারা সবদিক দিয়ে সুন্দর উঠবে এ সম্বন্ধে যদি ক্যামেরাম্যানরা নিশ্চিন্ত থাকতে চান তাহ'লে দুর্গাদাসকে ছবির হিরো করুন।

দুর্গাদাসের কণ্ঠস্বর সম্বন্ধেও বলা যায় যে এমন ভরাটি গম্ভীর আওয়াজ খুব কম অভিনেতার মধ্যেই শুনতে পাওয়া যায়। যদিও স্বরের উত্থান-পতন (Modulation) খুব চমৎকার ছিল না কিন্তু অপূর্ব্ব স্বর বিক্ষেপের কৌশল ছিল তাঁর আয়ত্বে এবং বাচনভঙ্গী ও ব্যক্তিত্বকে রঙ্গমঞ্চে বা চিত্রে কি ভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারা যায় তা তিনি জানতেন।

দুর্গাদাস নিজে ছিলেন ভাল ছবি-আঁকিয়ে—আর্ট স্কুলে শিক্ষানবিশী করেছিলেন বহুদিন এবং সেইজন্য অভিনয়-শিল্পের মস্ত বড় অঙ্গ Composition সংগঠন প্রণালীতে জ্ঞান ছিল তাঁর অসাধারণ। কি ভাবে কে কোথায় দাঁড়ালে ভাল দেখায় এবং সমস্ত দৃশ্যটী মধুর হয়ে উঠতে পারে তা তিনি বুঝতেন চমৎকার।

রঙ্গমঞ্চে, সিনেমায় তাঁর ব্যক্তিত্ব এক সময়ে অভিনেতাদের আদর্শ ছিল। দুর্গাদাসের মত ঠিক আর একটি অভিনেতার সাক্ষাৎ আমরা এ যাবৎ পাইনি।

আজ তাঁর কথা বলতে গেলে কত কৌতুককর ঘটনা—কত বন্ধু-বাৎসল্যের স্মৃতি মনে পড়ে। অনেক বিষয়ে তাঁর সংযমের অভাব ছিল সত্য কিন্তু মনটা বড় ছিল বলে দুর্গাদাসকে শুধু আমি কেন রঙ্গমঞ্চ ও সিনেমা সংশ্লিষ্ট কোন লোকই বোধ হয় কোনদিন ভুলে যাবেন না।

কাব্যের উপেক্ষিতা

[রামায়ণ মহাকাব্যের উর্মিলার সঙ্গে চিত্রজগতের প্লে-ব্যাক শিল্পীদের তুলনা করা চলে। যে উর্মিলা নইলে রামায়ণ রচনা সম্ভব হোত না সে নারী রয়ে গেল কাব্যের উপেক্ষিতা আর সীতা হোলেন মহীয়সী। তেমনি এঁরাও চিত্রজগতের নায়িকাকে নিজেদের কণ্ঠ দান ক'রে আজও রয়ে গেলেন অন্তরালে। ছবির গান শুনে চিত্রাভিনেত্রীকে সমাদর জানাবার সময় পর্দ্দার অন্তরালবর্তিনী এইসব নীরব শিল্পীদের কথা কি একবারও মনে পড়ে দর্শকের? এক-বারও কি তাঁদের স্মরণ করেন যাঁদের স্বরমাধুর্য মুখর করে তোলে ছবিকে? উর্মিলার মতই এঁদের অবদান ছবিকে সার্থক ক'রে তোলার পথে সহায়তা করে আসছে, অথচ তার স্বীকৃতি এঁরা পাননা। সে প্রাপ্য প্রশংসা থেকে আজও এঁরা বঞ্চিতা। সেই অপরিচয়ের গণ্ডী থেকে পরিচয়ের আলোকে এঁদের আনতে পারলে হয়তো দর্শক তাঁদের অন্তরের অভিনন্দন জানাবার সুযোগ পাবেন, তাই আমাদের এই প্রচেষ্টা।

নিম্নলিখিত বারোটি প্রশ্ন সাতজন প্লে-ব্যাক শিল্পীর কাছে পাঠানো হয়েছিল। পাঁচজনের কাছ থেকে আমরা উত্তর পেয়েছি, দু'জন নিরুত্তর। **শ্রীমতী ইলা মিত্র (ঘোষ) ও শ্রীমতী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়**-এ প্রচেষ্টায় সহযোগিতা ক'রতে অস্বীকৃতা হয়েছেন। জানিয়েছেন—প্রচারে তাঁদের অরুচি। সেই সঙ্গে অবশ্য নিজেদের রুচির উৎকর্ষ ও আভিজাত্য প্রচারে বিন্দুমাত্র কার্পণ্য কিম্বা কুণ্ঠা প্রকাশ করেননি। সদম্ভ প্রগল্ভতায় আমাদের প্রতিনিধির কাছে মার্জিত রুচি সম্পর্কে এক দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে ভেবেছিলেন নিজেদের সংস্কৃতির দৈন্য ঢাকবেন। কিন্তু পারেননি। পারেননি তার কারণ তাঁদের রুচির কদর্যতার অনুপাতে মস্তিষ্কের স্থূলতা। নিজেদেরই অনবধানতায় নিজেদের অসংস্কৃত মনোভাবকে আরও পঙ্কিল ক'রে তুলেছেন। প্রচার-বাতিক-হীনতার নজির তুলে এমন একটি মহতী প্রচেষ্টার প্রতি অসহযোগ যে রুচিবোধকে বীভৎসরূপে কর্দমাক্ত ক'রে তোলে এ সরল সত্যটি হয়তো শ্রীমতী মিত্র ও শ্রীমতী মুখোপাধ্যায় উপলব্ধি ক'রে উঠতে পারেননি।]

(১) সর্ব্বপ্রথম কোন্ বাংলা ছবিতে কোন্ গান প্লে-ব্যাক্ করেন?

(২) এ পর্য্যন্ত মুক্তি-প্রাপ্ত এবং মুক্তি-প্রতীক্ষিত চিত্র ধ'রে আন্দাজ কতগুলি গান হিন্দী এবং বাংলা মিলিয়ে প্লে-ব্যাকে গেয়েছেন?

(৩) আপনার গাওয়া কোন্ কোন্ গান বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছে?

(৪) যে ছবিগুলিতে গান গেয়েছেন যতদূর সম্ভব তার তালিকা তৈরী ক'রে দিন।

(৫) প্লে-ব্যাক্ গান গাইতে কোনো অসুবিধা হয় কি? গাইবার আগে ছবির সিচুয়েশন আপনাকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে কি? যে ভূমিকাভিনেত্রীর হ'য়ে প্লে-ব্যাক্ ক'রেছেন তাঁর কণ্ঠস্বরের সঙ্গে আপনার কণ্ঠস্বরের সমতা রাখার চেষ্টা হয় কি? সেই ভূমিকাভিনেত্রীর সঙ্গে আপনার চাক্ষুষ দেখাসাক্ষাৎ, আলাপ-পরিচয় হয় কি?

(৬) এ পর্য্যন্ত যত ছবিতে গান গেয়েছেন তার মধ্যে সবচেয়ে বেশী পারিশ্রমিক কোন্ ছবিতে কোন্ গানে পেয়েছিলেন? যদি আপত্তি না থাকে তবে কত পেয়েছেন তা'ও জানাবেন।

(৭) কোন্ ধরণের গান প্লে-ব্যাকে আপনি বেশী তৃপ্তি পান?—করুণ, আনন্দোজ্জ্বল বা খুব বেশী হাল্‌কা?

(৮) ছবির title-এ প্লে-ব্যাক্ শিল্পীর নাম থাকে না—এটা থাকাটা উচিত এবং প্রয়োজন ব'লে মনে করেন কি?

(৯) এ পর্য্যন্ত যত সঙ্গীত-পরিচালকের অধীনে আপনি প্লে-ব্যাক্ করেছেন তার মধ্যে কার

দেওয়া সুর আপনার সবচেয়ে ভালো লেগেছে ?

(১০) এখনও মুক্তি পায়নি এমন যে ছবিগুলিতে আপনি প্লে-ব্যাক্ করেছেন তার তালিকা দিন।

(১১) যতগুলি গান এ পর্য্যন্ত প্লে-ব্যাক্ করেছেন তার সবগুলিই কি রেকর্ড করেছেন ? যদি সবগুলি না হ'য়ে থাকে তবে কতগুলি আন্দাজ হয়েছে ?

(১২) প্লে-ব্যাক্-করা ফিল্মের গানগুলি সাধারণতঃ কতদিনের ব্যবধানে রেকর্ড করেছেন ? এইসব রেকর্ডের দরুণ রয়্যাসটির সঙ্গে ফিল্ম-প্রযোজকের কোনো যোগাযোগ থাকে কি ?

সুপ্রীতি ঘোষ

সুপ্রীতি ঘোষ
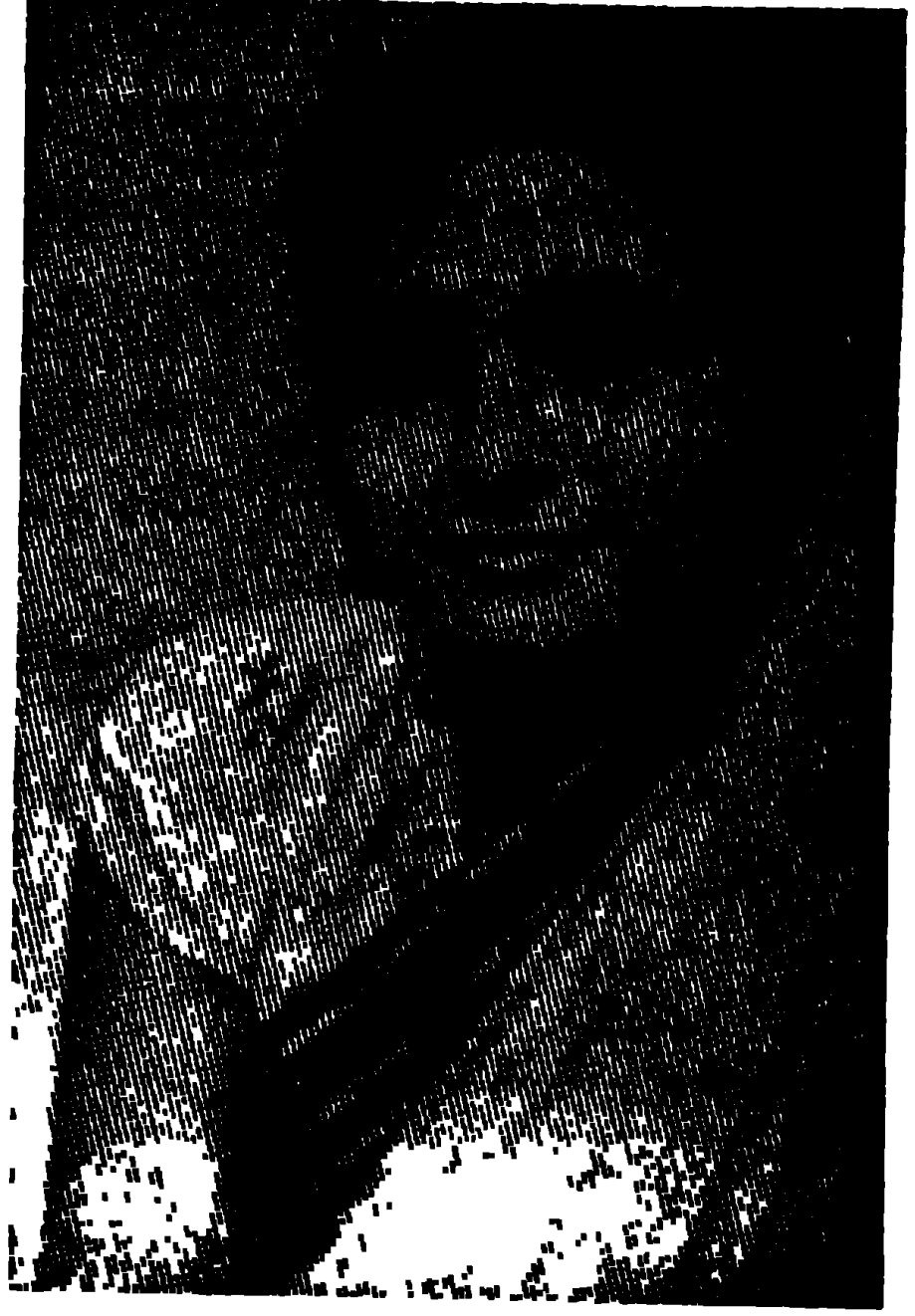
১। "অভয়ের বিয়ে" ছবিতে মায়ার গানগুলি সর্ব্বপ্রথম আমার প্লে-ব্যাক্।

২। হিন্দী ও বাংলা মিলিয়ে এবং মুক্তিপ্রাপ্ত ও মুক্তি-প্রতীক্ষিত ছবিতে গাওয়া গানের আনুমানিক সংখ্যা প্রায় ১২৯ টি।

৩। আমার গাওয়া কোন্ কোন্ গান জনপ্রিয় হোয়েছে তার যথাযোগ্য প্রত্যুত্তর দিতে পারেন শ্রোতৃবৃন্দ, জনসাধারণ এবং সংগীত-সমালোচকবৃন্দ। তবে এই গানগুলি সমধিক জনপ্রিয়—

"দৃষ্টিদান" ছবিতে—জীবনে পরম লগন···

সে কোন বনের হরিণ ··

"ঘরোয়া"—তোমায় নতুন করে পাবো বলে···

"শাঁখা ও সিঁদুর"—সবই যেন মনে হয় ছলনা··

"কঙ্কাল"—তুমি বাঁশীতে যে গান শোনালে ·

"এক আওর্যাৎ"—ও দূর ব্যসে সজ্‌না···

৪। বাংলা ছবি—অভয়ের বিয়ে, স্বামীর ঘর, শেষ রক্ষা, নিবেদিতা, দুঃখে যাদের জীবন গড়া, অলকানন্দা, ঘরোয়া, ঝড়ের পর, দৃষ্টিদান, নন্দরাণীর সংসার, দাসীপুত্র, স্বর্ণসীতা, বিশবছর আগে, কৃষ্ণাকাবেরী, নিশির ডাক, ঘুমিয়ে আছে গ্রাম, হেরফের, নতুন খবর, শাঁখা ও সিঁদুর, মহাকাল, মহাসম্পদ, মহাদান, তিলোত্তমা, আবর্ত্ত, মায়াজাল, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, সন্ধ্যাবেলার রূপকথা, তথাপি, কঙ্কাল, রত্নদীপ, রূপান্তর, বরযাত্রী, মর্য্যাদা, শেষবেশ, সাহসিকা, পঞ্চায়েৎ, কাঁকনতলা লাইট্ রেলওয়ে, বঘুডাকাত, একই গ্রামের ছেলে, যে নদী মরুপথে, অপরাজিতা, রূপকথা, তরুণের স্বপ্ন, দেবী চৌধুরাণী, সুধার প্রেম, গোরা (নতুন সংস্করণ) প্রভৃতি।

হিন্দী ছবি—এক আওর্যাৎ, ডাঃ রমেশ, উচ্‌নীচ, মায়াডোর, রিয়াসাৎ, দো-বাতে, সাদী-কী-বাত্, গৃহলক্ষ্মী, সীতার বনবাস, অস্তিম্ গীত্, রূপকথা, স্বয়ংসিদ্ধা, নাম-না-জানা দু'খানি হিন্দী ছবি, ইত্যাদি।

৫। প্লে-ব্যাক গান গাইতে কখনও কোনও অসুবিধা আমার হয়নি। তবে গাইবার আগে গানের সিচুয়েশন অনেক ক্ষেত্রে বুঝিয়ে দেওয়া হয়না। গান টেকিং করার ঠিক মুহূর্ত্তটীতে সকলে গানের সিচুয়েশন অনুযায়ী ভাব

প্রকাশ ইত্যাদি ব্যাপারে আমাদের ব্যতিব্যস্ত করে তোলেন —যার ফলে গানের ভাব ও রস উধাও হয়ে যায়। মিউজিক ডিরেক্টররা বলেন যে তাঁরা নাকি ছবির ভূমিকাভিনেত্রীর সঙ্গে কণ্ঠস্বরের সমতা রাখার চেষ্টা করে আমাদের গাওয়ান —কিন্তু কতদূর সফল হন জানিনা—বেশীরভাগ ছবিতেই একই গায়িকার কণ্ঠস্বর বিভিন্ন চবিত্রাভিনেত্রীর মুখে শুনতে পাওয়া যায়।

অনেক ভূমিকাভিনেত্রী গান টেকিং-এর দিনে উপস্থিত থেকে আমাদের গাওয়ার ভঙ্গী ও ঢঙ্ অনুকরণ করার চেষ্টা করেন। তখনই তাঁদের সঙ্গে চাক্ষুষ দেখাসাক্ষাৎ ও আলাপ পরিচয়ের সুযোগ হয়। অবশ্য ব্যক্তিগতভাবে প্রায় সকল ভূমিকাভিনেত্রীর সঙ্গে আমার আলাপ আছে।

৬। পারিশ্রমিক সর্ব্বত্রই আমার হার মত পেয়ে থাকি। হিন্দী ছবিতে বাংলা ছবির চেয়ে পারিশ্রমিক বেশী পেয়েছি। আপনার পরের প্রশ্নটির জবাব এড়িয়ে যেতে চাই।

৭। প্রায় সবরকম গানেই অভ্যস্ত হয়ে গেছি—করুণ ও আনন্দোচ্ছ্বাস গানই আমার এর মধ্যে বেশী ভালো লাগে।

৮। ছবির Title এ নাম থাকা উচিত।

৯। এই প্রশ্নের জবাব দেওয়া সমীচীন নয় আমার মতে।

১০। রূপান্তর, বন্দীপ, বরযাত্রী, রূপকথা, শেষবেশ; সাহসিকা, পঞ্চায়েৎ, দো-বাতে, বনিয়াদ, অপরাজিতা, যে নদী মরুপথে, রঘুডাকাত, মর্য্যাদা, অন্তিম্ গীত, ইত্যাদি।

১১। প্রদর্শিত ছবিগুলির মধ্যে—যতদূর মনে পড়ে ৬ খানি ছবির গান রেকর্ড হয়নি। মুক্তি-প্রতীক্ষিত ছবিগুলির মধ্যে ১০ খানি ছবির গান রেকর্ড হয়নি।

১২। ছবির গান taking-এর সঙ্গে সঙ্গেই অনেক প্রযোজক গান রেকর্ড করার জন্যে ব্যস্ত হন—আবার অনেক ছবির গান ছবিরমুক্তি প্রাপ্তির পরেও প্রযোজকদের রেকর্ড করার দিকে লক্ষ্যই থাকে না। ছবির প্রযোজকদের Royalty থাকে রেকর্ডে।

উৎপলা সেন

(১) নিউ থিয়েটার্সের হিন্দী ছবি 'মাই-সিষ্টার'-এ আমি প্রথম play-back করি। সঙ্গীত পরিচালনা করেছিলেন—শ্রীপঙ্কজকুমার মল্লিক। বাংলা ছবির মধ্যে 'পথের দাবী'তে আমি প্রথম গান করি। ওতে সঙ্গীত পরিচালনা করেছিলেন—শ্রীদক্ষিণামোহন ঠাকুর।

(২) মুক্তিপ্রাপ্ত এবং মুক্তি-প্রতীক্ষিত সব ছবি (হিন্দী ও বাংলা) মিলিয়ে আন্দাজ ৩০।৩৫ খানি গান গেয়েছি।

(৩) আমার যে সব গান জনসাধারণের ভালো লেগেছে, তা এই :—

মাই সিষ্টার—(হিন্দী)—"ইন ফুলসন্ ডঁলুরে"।

পথের দাবী—(বাংলা)—"তিমির রজনী পার হয়ে।"

অঞ্জনগড়—(হিন্দী)—"ম্যয় কিস্‌সে কঁহু"।

আভিজাত্য—(বাংলা)—"চঞ্চল চৈত্র দিনে" ইত্যাদি।

(৪) যে সব ছবিতে গান গেয়েছি তা এই :—

মাই সিস্টার—(হিন্দী) আভিজাত্য—(বাংলা)
অঞ্জনগড়—(হিন্দী ও বাংলা) পথের দাবী—(বাংলা)
ওয়াসিয়ৎনামা—(হিন্দী) নিরুদ্দেশ—(বাংলা)
অচ্ছুৎ—(হিন্দী) সংগ্রাম—(বাংলা)
প্রতিবাদ—(বাংলা) বড়-বৌ—(বাংলা)
রূপকথা—(বাংলা) বাস্তব—(বাংলা)
ঝনক্—(হিন্দী) রাত্রি—(বাংলা)
স্পর্শমণি—(বাংলা) ঝুঠি কাশ্মীন—(হিন্দী)
ছোটাভাই—(হিন্দী) ইন্দ্রজাল—(বাংলা)
তুলসীদাস—(বাংলা) অপরাজিতা—(বাংলা)
দিগ্‌ভ্রান্ত—(বাংলা) ইত্যাদি।

(৫) 'Play-backএ গান গাইতে কোন অসুবিধা হয় না। তবে অনেক সময় গাইবার আগে ছবির Situation বুঝিয়ে দেওয়া হয় না। আমি তাই অনেক জায়গায় Situation জিজ্ঞেস করে বুঝে নিই। নাম-ভূমিকায় যে অভিনেত্রী থাকেন তাঁর সঙ্গে বেশীর ভাগ সময়ে আলাপ হয় না। এটা খুব সত্যি কথা যে তাঁরা

উৎপলা সেন

যদি এসে Lip Movements লক্ষ্য করেন, তাহোলে তাঁদের তো সুবিধা হয়ই, উপরন্তু Picturisation এ কোন ত্রুটি থাকে না। অনেক সময় দেখা যায় Picturisation out of sink হয়ে যায়। কণ্ঠস্বরের সমতা রক্ষা বা Balance নির্ভর করে Sound Engineer-এর ওপর। একজনের সঙ্গে আর একজনের গলার মিল থাকেইনা বলতে গেলে। তবে Recordist এখানে কৃতিত্ব অর্জন করতে পারেন। তাছাড়া যে কোন Play-back Artist কণ্ঠস্বরের খুব পার্থক্য না থাকলে যে কোন ভূমিকাভিনেত্রীর Lipএ গাইতে পারেন। এর প্রমাণ বম্বের বহু জনপ্রিয় সুকণ্ঠি গায়িকা লতা মুঙ্গেক্‌র। একই ছবিতে বিভিন্ন অভিনেত্রীর Lipএ তিনি গান গেয়েছেন।

(৬) আমরা যে পারিশ্রমিকে গান গেয়ে থাকি, তা কোথাও বেশী বা কম পাই না। একটা নির্দ্দিষ্ট হারে গেয়ে থাকি।

(৭) ছন্দের গান সাধারণতঃ আমার গাইতে ভালো লাগে। খুব বেশো হাল্কা সুরের গান আমার পছন্দ হয় না সুরের গাম্ভীর্য্য যে গানে আছে সেই ধরণের গানই ভালো লাগে।

(৮) play-back জিনিষটা আজকাল এতো চলু হয়ে গেছে, এবং জনসাধারণ গলা চিনে গেছেন, ছবির পর্দ্দায় নাম থাকলে কোন কোম্পানীর আপত্তি করবার মতো কিছু নেই।

(৯) কার দেওয়া সুরে আমার গান গাইতে ভালো লাগে জানতে চেয়েছেন। দেখুন, এক এক জনের সুর দেবার একটি বিশেষ ঢং আছে। সুতরাং বিশেষ কারু নাম করবার প্রয়োজনীয়তা নেই। তবে সঙ্গীত পরিচালকদের যাঁদের সুর ভালো লাগে, তাঁদের মধ্যে নাম করা যেতে পারে—রবীন চ্যাটার্জ্জি, অনুপম ঘটক, পঙ্কজ মল্লিক বাঁইচাদ বড়াল, গোপেন মল্লিক ইত্যাদির।

(১০) মুক্তি-প্রতীক্ষিত ছবির মধ্যে গান গেয়েছি রূপকথা, ঝলক্‌, স্পর্শমণি, ইন্দ্রজাল, পরিত্রাণ, বাগ্‌দত্তা ইত্যাদিতে।

(১১) এপর্য্যন্ত যতো গান play-back-এ গেয়েছি তার সবই রেকর্ড হয়নি। কিছু হয়েছে।

(১২) বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ছবি বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে রেকর্ড করা হয়ে থাকে। আবার অনেক সময় খুব দেরী করেও করা হয়। আমার মনে হয় ছবি বেরিয়ে গেলে রেকর্ড বেরিয়ে যাওয়া উচিত। লোকের চাহিদা তাতে তাড়াতাড়ি মেটানো যায়। আমরা যে কোম্পানীর আর্টিস্ট সে কোম্পানীর সঙ্গেই Royalty-র যোগাযোগ থাকে।

বেলা মুখোপাধ্যায়

১। সর্ব্ব-প্রথম 'কাশীনাথ' ছবিতে আমি প্লে-ব্যাক সুরু করি। "ও বনের পাখী"র বাংলা ও হিন্দী গান গাইবার জন্য যাই, কিন্তু সে গানটি নেওয়া হয়ে গেলে আবার সুনন্দা দেবীর মুখের যে গান সেগুলিও গাই।

২। তা অনেকগুলি, তবে কতগুলি সঠিক মনে নেই

৩। "কাশীনাথ" এবং "পরিণীতার" গান।

৪। কাশীনাথ, পরিণীতা, দাবী, পূর্ব্বরাগ, সন্দীপন পাঠশালা, পথের দাবী, কৃষ্ণার্জ্জুন যুদ্ধ (বম্বে), অপবাদ, আর হিন্দি গান, ছবির নাম জানতাম না, জিজ্ঞাসাও করিনি—একটি বম্বের ও আর একটি মাদ্রাজের। মাদ্রাজের গানটি অবশ্য এখানেই টেক করা হয়েছিল। কিন্তু "কৃষ্ণার্জ্জুন যুদ্ধ" এই ছবির গান গাইবার জন্য খেমচাঁদ প্রকাশ কলকাতায় এসে বাড়ীতে গান শুনে আমায় বম্বে নিয়ে যান। সেখানে ঐ সময় ২টি হিন্দী ছবির গান করি।

৫। প্লে-ব্যাক গাইতে নিজের যদি গলা খারাপ থাকে তাহলে সব কিছুই অসুবিধা মনে হয়, তবে হ্যাঁ হিন্দী গান গাইতে একটি বড় অসুবিধা আছে সেটি হচ্ছে যখন কোন হিন্দী গানের রিহার্সাল হয় সে সময় ছবির বা বড় বড় হোমরা-চোমড়া কর্ত্তারা দল বেঁধে গান শোনেন এবং গল্প করেন; তখন তাঁদের উচ্চারণ ঠিক করে দেবার প্রয়োজন হয় না। ওঁদের থেকে উচ্চারণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে বলেন "বিল্‌কুল ঠিক আছে" কিন্তু টেকের সময়ে ঐ "বিল্‌কুল ঠিক আছে" উল্টে গিয়ে সব দল বেঁধে আসেন আবার ঠিক করতে-ছবির সিচুয়েশন একমাত্র পঙ্কজবাবুই খুব ভাল বোঝান আর কাউকে তো সিচুয়েশন বোঝাতে দেখিনা। ভূমিকা। অভিনেত্রীর কণ্ঠস্বরের সঙ্গে নিজের কণ্ঠস্বরের সমতা যদি বলি রাখা হয় তা হলে মস্ত বড় মিথ্যে কথা বলা হবে। কারণ সমতা রাখার চেষ্টাই যদি হত তাহলে এক আর্টিষ্ট কি সব ছবিতেই প্রত্যেকের প্লে-ব্যাক করতে পারতেন? তাছাড়া তো আগেই লিখেছি একই ছবিতে ছোট ছেলের প্লে ব্যাক-ও করেছি আবার হিরোইন এর প্লে-ব্যাকও করেছি। হ্যাঁ, কয়েক জনের সঙ্গে আলাপ হয়েছে।

৬। সবচেয়ে বেশী পারিশ্রমিক পেয়েছি "কৃষ্ণার্জ্জুন যুদ্ধ" ছবিতে ও আর একটি হিন্দী ছবিতে। 'কৃষ্ণার্জ্জুন যুদ্ধে' পেয়েছি ৪৫০ টাকা করে এবং নাম-না-জানা হিন্দী বইটিতে পেয়েছি ৫০০ টাকা। এ দুটিই বম্বেতে। কিন্তু ওখানকার রেট্ তখন ২০০ থেকে ২৫০ টাকা এবং কলকাতার ৫০ টাকা। আর আমি গোড়ার দিকে প্লে-ব্যাক করে পেয়ে ছিলাম ২০ টাকা।

বেলা মুখোপাধ্যায়

৭। আনন্দোজ্জ্বল গান।

৮। আমার মনে হয়, থাকা উচিত, কারণ গান যখন প্রফেশন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৯। অপ্রিয় সত্যকথা না বলাই ভাল, কি বলেন?

১০। সে রকম ছবি আর আছে বলে মনে হয় না, তবে দিন ১৮ আগে একটি হিন্দী ছবিতে গেয়েছি।

১১। বেশীর ভাগ।

(১২) ব্যবধানের ঠিক নেই। আর রেকর্ডের দরুণ যে রয়্যালটি তা কোম্পানীর সঙ্গে যোগ থাকে আমাদের সঙ্গে নয়।

কল্যাণী মজুমদার (দাস)

(১) 'মানে-না-মানা' ছায়াছবির "জয় হবে জয় হবে" গানখানি দিয়েই আমি সর্ব্বপ্রথম প্লে-ব্যাক গাইতে আরম্ভ করি। তারপর একই দিনে শিবানী চরিত্রের বিভিন্ন গান-গুলিও প্লে ব্যাক করি।
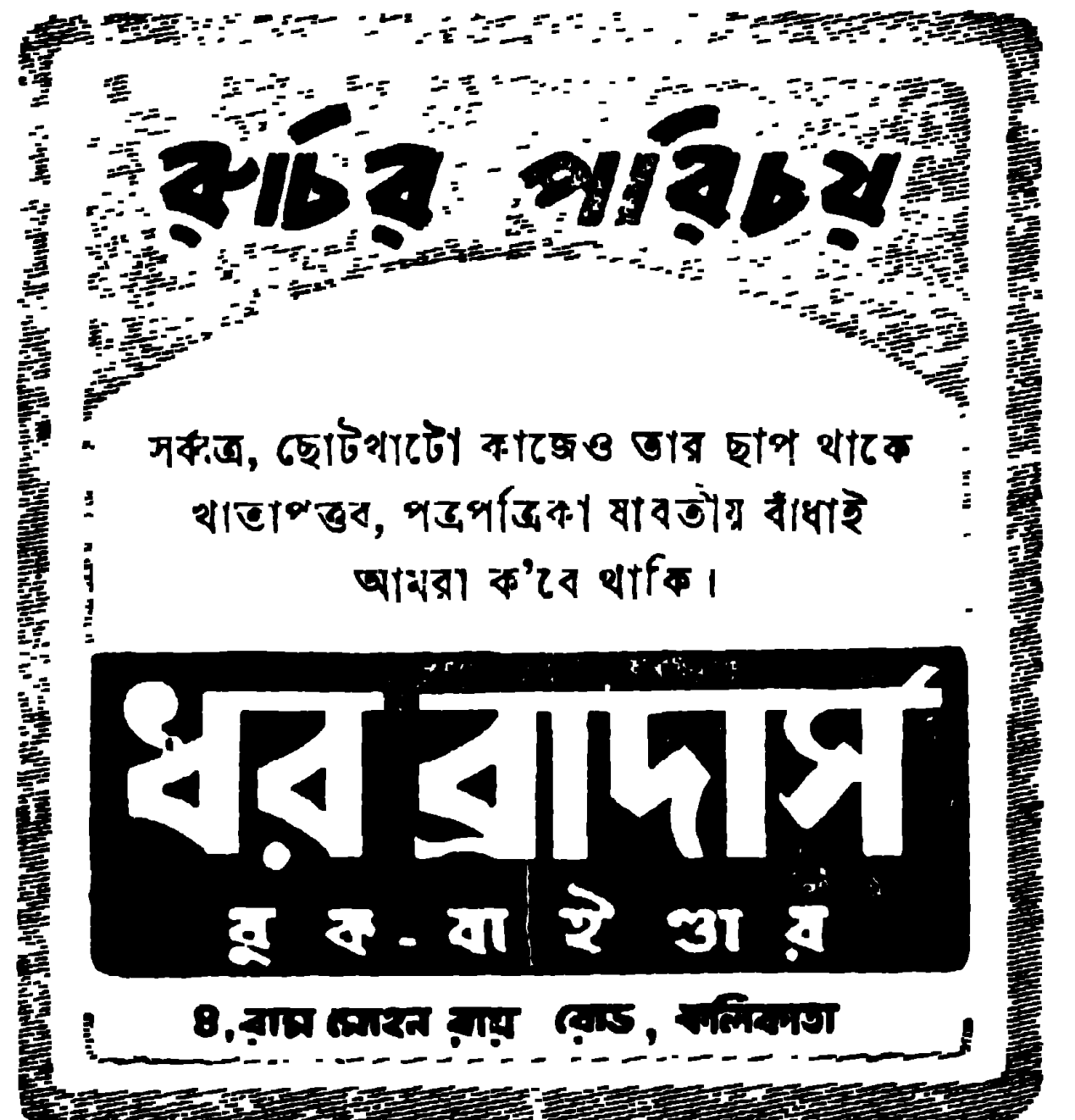
(২) সেই থেকে আজ পর্যান্ত মুক্তিপ্রাপ্ত এবং মুক্তি-প্রতীক্ষিত চিত্রের সব রকম গান নিয়ে প্রায় ১৬৮ খানি গান আমি প্লে ব্যাক করেছি।

(৩) আমার কোন গান বিশেষভাবে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে কিনা বলতে পারি না। তবে কয়েকটি গানের উচ্চ রেকর্ড বিক্রীর হিসাব থেকে মনে হয় এ গানগুলি নিশ্চয়ই সাধারণ শ্রোতৃবৃন্দের পছন্দ হয়েছে। এ গানগুলির ভেতরে রয়েছে,—"মানে না-মানা" ছবির শিবানী চরিত্রের সব কয়টি গান, "চন্দ্রশেখর" (বাংলা) ছবির দলনী বেগমের "কে চলে বনতলে" গানটি, "কবি"র ঠাকুরঝির মুখে "ভালবেসে এই বুঝেছি," "অনুরাধা" চিত্রের "ও কলঙ্কী চাঁদ রে," "দিগ্‌ভ্রান্ত" ছায়াছবির "কিস্‌কি নজরসে তুনে" এবং হিন্দী ছায়াচিত্র "মেঘদূতের" যক্ষপ্রিয়া ভূমিকার প্রত্যেকটি গান, "মানমানি" ছবির নায়িকার (রাগিনী দেবী) মুখের প্রত্যেকটি ও "জমিন আস্‌মান" ছায়াচিত্রের কয়েকটি গান।

(৪) মুক্তিপ্রাপ্ত এই কয়টি বাংলা ছবিতে আমি গান গেয়েছি,—মানে-না-মানা, বঞ্চিতা, শ্রীদুর্গা, নতুন বৌ, মৌচাকে ঢিল, তুমি আর আমি, রায়চৌধুরী, অরক্ষণীয়া, অলকানন্দা, চন্দ্রশেখর, উমার প্রেম, ঘুমিয়ে আছে গ্রাম, জয়যাত্রা, কবি, রাঙ্গামাটি, তিলোত্তমা, প্রতিবোধ, রংবেরং, আশাবরী, পরশ পাথর, নারীর রূপ, বন্ধুর পথ, অনুরাধা, মহাদান, জাগ্রত ভারত, রক্তের টান, মায়াজাল, এবং গ্রামের ছেলে, কাঁচনতলা লাইট রেলওয়ে, ইন্দ্রনাথ, ১০৯ ধারা এবং দিগ্‌ভ্রান্ত। হিন্দী চিত্রগুলির মধ্যে রয়েছে,—কুরুক্ষেত্র, শুকবার্, মেঘদূত, বিন্দিয়া, জমিন আসমান, কৃষ্ণলীলা, তুম অওর হাম্, ইরান কি একরাত, গিরিবালা, মানমানি, চন্দ্রশেখর, ফ্যাশ্‌লা, বিজয়যাত্রা, ম্যারিষ্টোক্রেসী এবং কাশ্মীর হামারা।

(৫) প্লে-ব্যাক করতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রেই সঙ্গীত পরিচালক মহাশয়ের পরিচালনাধীনে এমন ভাবে কাজ হয়, যাতে আমাদের প্লে-ব্যাক্ শিল্পীদের কোন অসুবিধাই হয়না। তারপর এ ব্যাপারের অনেকখানি দায়িত্ব থাকে গ্রামোফোন কোম্পানীর নিজের। তাঁদের নিজস্ব যন্ত্রীদল এবং

ব্যবস্থাপনার গুণে প্রায়ই আমাদের কাজ বেশ সুষ্ঠুভাবে সমাধা হয়ে যায় কিন্তু তবু কোন কোন সময়ে চিত্র জগতে নতুন প্রবেশ করেছেন এরকম প্রযোজকদের কাছ থেকে অথবা চিত্র তৈরীর ব্যাপারে নিজেদের স্বার্থ সম্বন্ধে যারা একটু বেশী সচেতন, তাঁদের কাছ থেকে আমাদের প্রায় প্রত্যেক কাজেই একটু হয়রানি হ'তে হয়। সঙ্গীত শিল্পী নির্বাচন করা থেকে আরম্ভ ক'রে গান গাওয়া পর্য্যন্ত ছবির একটা বিশেষ দিকের সঙ্গে জড়িত থাকেন সঙ্গীত পরিচালক মহাশয়। ছবিতে তাঁর নিজের দায়িত্ব থাকে অনেকখানি। তিনি সব সময়েই চান তাঁর নির্ব্বাচিত শিল্পীদের কাছ থেকে ভাল কাজ। কাজেই অনেক সময় শিল্পীদের কাছ থেকে কাজ পাবার জন্যে তাঁদের সুবিধার দিকে তাঁকেই দৃষ্টি রাখতে হয়। ফলে প্লে-ব্যাক্ শিল্পীদেরও কোন অসুবিধা হয়না।

পূর্ব্বেই বলেছি, সঙ্গীত পরিচালক মহাশয়ের দায়িত্ব ছবির সঙ্গে বিশেষ ভাবে জড়িত থাকে। তাঁর সুনাম হওয়াটা শুধু তাঁর সুরের উপরই নির্ভর করেনা। শিল্পীর কাছ থেকে ভাল কাজ না পেলে, সুরের সুপরিস্ফুটন না হ'লে, তারপর সেই গানের ভূমিকাভিনেত্রীর কণ্ঠস্বরের সঙ্গে শিল্পীর কণ্ঠস্বরের সমতা আছে কিনা, এ সব নানান দিক বিচার না করলে তাঁর ভাল সুরও অনেক সময় বিকৃত রূপ নেয়। কাজেই এ ব্যাপারের অনেক কিছুই তাঁকে ভাবতে হয়। শিল্পী নির্ব্বাচনও তিনিই করেন। শিল্পীকে ছবির সিচুয়েশন সম্বন্ধে একটা ধারণাও তাঁকেই দিতে হয়। কোন গান শিখবার আগে যদি সেই গান কি রকম সিচুয়েশনে ভূমিকাভিনেত্রীকে গাইতে হবে তা' প্লে ব্যাক্ শিল্পীর জানা না থাকে, তবে সে গান শিখে নেবার পর এবং ফিল্ম রেকর্ডিং হয়ে যাবার পর, সিচুয়েশন অনুযায়ী অনেক গরমিল থেকে যায়। আমি ছবির সিচুয়েশান জেনে নেওয়া সম্বন্ধে বরাবরই আগ্রহশীল। প্রত্যেক গান শিখবার আগে ছবির সিচুয়েশন ভালভাবে জেনে নিয়ে সে রকম ভাবেই গাইবার চেষ্টা করি।

একই ভূমিকাভিনেত্রীর গান বিভিন্ন ছবিতে বারবার গাইবার পর সাধারণতঃই তাঁদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হবার যথেষ্ট সুযোগ আসে। অনেক সময় সঙ্গীত পরিচালক মহাশয় শিল্পীদের গান শেখাবার সময় সেই গানের ভূমিকাভিনেত্রীকেও কাছে রাখেন। সে ব্যবস্থা অবশ্য ভূমিকাভিনেত্রীর সুবিধার জন্যই করা হয়। কারণ এতে তিনি নিজের গানখানি তুলে নিতে পারেন। ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে, সে গানের অনুকরণ করবার জন্যে তাঁরও গান শিখে নেবার প্রয়োজন হয়। কখনো কখনো বা সেই সময়ে দৈবাৎ চিত্রশিল্পীর সঙ্গে সঙ্গীতশিল্পীর আলাপ পরিচয় হ'য়ে যায়। আবার এমন দু'একটি ছবিতেও আমি প্লে-ব্যাক্ করেছি যে, যাঁর গান গাইতে হ'বে, সেই ভূমিকাভিনেত্রীর সঙ্গে চাক্ষুষ দেখাসাক্ষাৎ অথবা আলাপ পরিচয় থাকা ত' দূরের কথা, গান খানির ফিল্ম রেকর্ডিংয়ের সময়েও সেই চিত্রশিল্পীর নাম পর্য্যন্ত জানতে পারেনি।

কল্যাণী দাস

(৬) বেশ কিছুদিন আগে বোম্বের সান্ আর্ট পিক্‌চার্সের "বিন্দিয়া" ছবির গান গাইবার সময় পার্টির লোকদের কাছ থেকে জানতে পারি যে আমার এই গানের ভূমিকাভিনেত্রী নাকি এখনো নির্ব্বাচনই করা হয়নি। তখন নতুন নতুন একটু আশ্চর্য্য হয়েছিলাম বৈ

কি ! সেই পার্টিই আমাকে গান পিছু সবচেয়ে বেশী টাকা দিয়েছিলেন। তাঁদের এবং পরে বোম্বের আরো দু'টি পার্টির কাছ থেকে গান পিছু ৫০০ টাকা করে পেয়েছিলাম। প্রত্যেক পার্টিই আমার গান এখানকা'র ষ্টুডিও থেকেই ফিল্ম রেকর্ড ক'রে নিয়ে গিয়েছিলেন।

(৭) আনন্দোজ্জল অথবা হাল্কা সুরে হিন্দী গান গাইতে এবং করুণ সুরে বাংলা গান গাইতে ভালবাসি।

(৮) ছবির title-এ প্লে-ব্যাক শিল্পীর নাম দেওয়া অথবা না দেওয়ার কোনটার ওপরই আমি বেশী গুরুত্ব দিতে পারিনা। হয়তো বা title-এ শিল্পীর নাম দেওয়া থাকলে সে সাধারণের কাছে একটু বেশী পরিচিত হবার সুযোগ পায়, কিন্তু শিল্পীর ডিস্ক রেকর্ড যখন বাজারে বের হয় তখন শিল্পীকে সে সুযোগ দেবার জন্য গ্রামোফোন কোম্পানীই অনেকখানি সাহায্য করেন।

(৯.) চিত্রজগতে প্লে-ব্যাক করছি আজ প্রায় সাত বছর ধরে। এই দীর্ঘ কালের ভেতর একমাত্র শ্রীযুক্ত কমল দাশগুপ্ত মহাশয়ের সুরই আমার সবচেয়ে বেশী ভাল লেগেছে। তাঁর সুর এবং শিক্ষাপ্রণালী অত্যন্ত উন্নত ধরণের ব'লে আমি মনে করি।

(১০) প্লে-ব্যাক্ গাইবার পরও এখন পর্য্যন্ত আমার এই এই ছবিগুলি মুক্তিলাভ করেনি, বাংলা—গাঁয়ের মেয়ে, যুগের দাবী, অগ্রগামী, পঞ্চায়েৎ, শেষবেশ, আদেশ, মানুষ, মর্য্যাদা, স্বপ্নজাল। হিন্দী—পহচান, প্রেম কি- দুনিয়া (পি, ডব্লিউ, ডি,) যাত্রা এবং এক দীওয়ানা।'

(১১) আমার নিজের প্লে-ব্যাক্ করা প্রায় প্রত্যেক ক'টি ছায়াছবির গানই আমি ডিস্ক রেকর্ড করেছি। তবে বের হয়নি এমন দু'একটি ছবির গান এখনো রেকর্ড করা হয়নি।

(১২) প্লে-ব্যাক্ করা হ'য়ে যাবার পর সে ছবির মুক্তি পাওয়ার উপর নির্ভর করে ছবির গানের ডিস্ক রেকর্ড
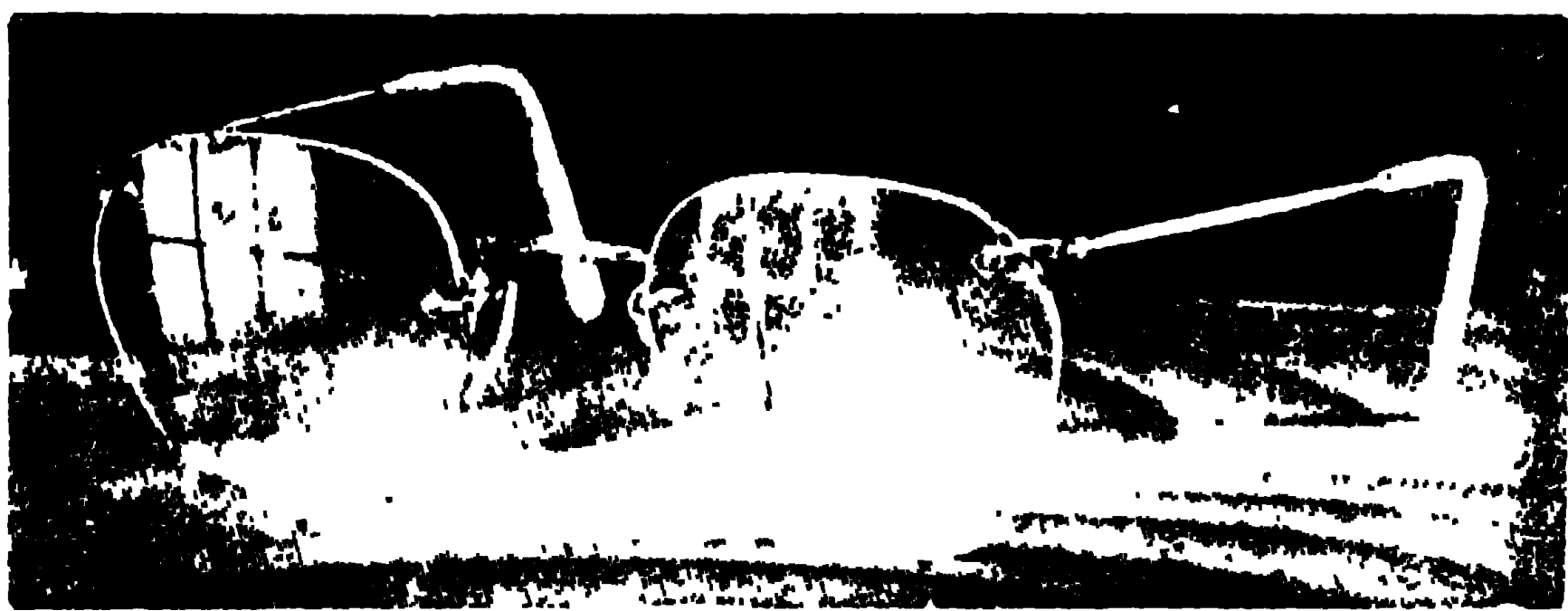
করা। কারণ ছবির সুরুতেই সিচুয়েশন অনুযায়ী গানগুলির প্লে-ব্যাক্ হ'য়ে যায়। তারপর ছবির কাজ আরম্ভ হওয়া থেকে ছবির শেষ পর্য্যন্ত সেই গানের আর রেকর্ডিং করা হ'য়ে ওঠেনা। সবাই ছবির অন্যান্য কাজ নিয়েই তখন ব্যস্ত থাকেন। এই সময়ে সঙ্গীত পরিচালক মহাশয়কেও ছবির title music এবং background music এর কাজে অনেক বেশী খাটতে হয় তাই সাধারণতঃ ছবি মুক্তি পাবার মাত্র কয়েকদিন আগেই যখন সঙ্গীত পরিচালক মহাশয়ের পূর্ণ অবসর থাকে, তখনই ডিস্ক রেকর্ডিং করে নেওয়া হয়। প্লে-ব্যাক্ গাই-বার পর থেকে সে গানের রেকর্ড করা পর্য্যন্ত যে সময়ের দরকার হয়, অবস্থানুযায়ী তা' ছ'মাসও লাগতে পারে, আবার দু'বছরেও হয়ে ওঠে না।

সাধারণতঃ প্রত্যেক চিত্র প্রযোজকই তাঁদের ছবির গান পিছু শতকরা আড়াই টাকা হিসাবে রেকর্ড কোম্পানীর কাছ থেকে পেয়ে থাকেন। শিল্পীদেরও সেই ভাব। ইচ্ছে করলে চিত্র-প্রযোজক ডিস্ক রেকর্ডের জন্য শিল্পীকে এককালীন টাকা দিয়ে শিল্পীর স্বত্ব কিনে নিতে পারেন, অবশ্য শিল্পী যদি এতে রাজী থাকেন।

সুপ্রভা সরকার

সুপ্রভা সরকার

১। নীতিন বাবু পরিচালিত 'দিদি' ছবিতে সর্ব্বপ্রথম এক লাইন গান 'এক আসনে বসবে বাঙ্গা বাণীর চরণ ধরে'.........গেয়েছিলাম। তারপর বড়ুয়া সাহেবের 'মুক্তিতে' গান গাই। তারপর নীতিন বাবু পরিচালিত—'জীবন মরণ' ও 'দুশমন' চিত্রে লীলা দেশাইয়ের হয়ে Play-Back করি। চিত্রজগতে আমাকে পরিচিত করবার জন্যে শ্রীমতী দেশাই খুব সাহায্য করেন। সর্বপ্রথম আমিই Film-এ play-Back করি।

২। আজ পর্য্যন্ত হিন্দী বাংলা মিলিয়ে প্রায় ২০০টি গান গেয়েছি।

৩। 'জীবন মরণ', 'মাই সিষ্টার', 'স্বপ্ন ও সাধনা', 'স্বয়ংসিদ্ধা', 'গরমিল', 'সাধারণ মেয়ে', '৭নং বাড়ী' 'রাজ নর্ত্তকী।'

৪। 'দিদি' চিত্রের পর থেকে আজ পর্য্যন্ত যত ছবিতে গেয়েছি তার তালিকা যতদূর সম্ভব দিচ্ছি—

বাংলা—

মুক্তি, দিদি, জীবণ-মরণ, কপালকুণ্ডলা, চোখের বালি, ব্যবধান, আহুতি, বাংলার মেয়ে, পথের সাথী, শাপমুক্তি গরমিল, রাজনর্ত্তকী, অপরাধ, কবি কালিদাস, জয়দেব, শুকতারা, রাত্রি, নতুন খবর, কতদূর, সাত নম্বর বাড়ী, সাধারণ মেয়ে, স্বপ্ন ও সাধনা, সমর্পণ, সিংহদ্বার, রামের সুমতি, নার্স সিসি, প্রতিবাদ, বিশ বছর আগে, ইন্দিরা, অভিমান, জিপসী মেয়ে, ১০৯ ধারা, রাধারাণী, যার যেথা ঘর, সীমান্তিক, নিরুদ্দেশ, চৌরঙ্গী, বিষের ধোঁয়া, শ্যামলের স্বপ্ন, সাহারা, স্বয়ংসিদ্ধা, প্রিয়তমা।

হিন্দী—

মাই সিষ্টার, ওয়াসিয়ৎনামা, হামরাহি, সমাপ্তি, রাজলক্ষী, বাপ।

৫। Play-Backএ গাইতে কোন অসুবিধা হয়না, কারণ কর্তৃপক্ষরা সে বিষয়ে খুবই যত্ন নেন। অভিনেত্রীদের কণ্ঠস্বরের সমতা প্রথম প্রথম রাখার চেষ্টা করা হত কিন্তু আজকাল তা হয়না। আলাপ অবশ্য হয়না এমন নয়, তবে গানের সময় হয় না।

৬। সবচেয়ে বেশী পারিশ্রমিক এম, পি প্রোডাকসান থেকে পেয়েছি।

৭। বিশেষ কোন ধরণের প্রতি আমার পক্ষপাতিত্ব নেই। সব গানই গাইতে ভাল লাগে। তবে চটুল এবং তালের বাহাদুরী যাতে আছে তেমন গান বেশী ভাল লাগে।

৮। টাইটেলে নাম থাকা উচিত বলে মনে করি।

৯। এ পর্য্যন্ত যত পরিচালকের সংগে কাজ করেছি তাঁদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব ধারা আছে সুতরাং কারো সঙ্গে কারও তুলনা করা যায় না।

১০। মুক্তি পায় নি এমন ছবি আছে অবশ্য অনেক কিন্তু আমি যখন গান গাই তখন চিত্রের নাম কি সেটা জানার চেষ্টা করিনা। সুতরাং এ বিষয়ে ঠিক জানাতে পারলামনা।

১১। প্রায় সবগুলিই করেছি, তবে বাকী যে কত তা জানাতে পারলাম না।

১২ Play-back-এর গান Record করা, সেটা কোম্পানী এবং প্রডিউসার এঁদের উপর নির্ভর করে। তবে Record প্রায়ই চিত্র শেষ হবার সংগে সংগেই হয়। না, কোম্পানীর সংগে প্রডিউসারের সম্পর্ক থাকে।

চিত্র-বাণী রেকর্ড প্রসঙ্গ

এইচ, এম, ভি কোম্পানীর সেপ্টেম্বর মাসের রেকর্ড তালিকাই হোল এঁদের শারদীয়া অর্ঘ্য। এবারের এই রেকর্ডগুলির মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা গেল সেটি হোল প্রতিটি রেকর্ডের দু'দিকে দু'টি ভিন্ন গান গাওয়ানো হোয়েছে দু'জন পৃথক শিল্পীকে দিয়ে। একদিকে রবীন্দ্রসঙ্গীত—'ফাগুন আমার ফুল বনে,' অপরদিকে কথাচিত্রের গান, রঞ্জিত রায় ও সম্প্রদায়ের—'ধর আমাদের গারদখানা'। এই রেকর্ডটির নম্বর হোল N31268—রবীন্দ্র সঙ্গীতটি গেয়েছেন ভারতী বসু। N31269 রেকর্ডে একটি গান হোল 'ঝট পট ঝট পট'—গেয়েছেন ভারতী বসু, অপরটি হোল যশোদাদুলাল মণ্ডলের 'হেদোর পাড়ে হোঁদলখুড়ো।' N31297 রেকর্ডে একদিকে—'আমার রাত পোহালো শারদ প্রাতে' গেয়েছেন পঙ্কজ মল্লিক এবং অপরদিকে—'ওগো শেফালী ওগো'—গেয়েছেন সুধা মুখোপাধ্যায়। দু'টিই রবীন্দ্র সঙ্গীত।

পঙ্কজবাবুর কণ্ঠে রবীন্দ্রসঙ্গীতটি শ্রুতিমধুর হোয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু সায়গলের কণ্ঠে যে গান একবার রেকর্ডে ধরে রাখা হোয়েছে, অপর শিল্পীকে দিয়ে সেই গানের আবার রেকর্ড করানো আমাদের কাছে তেমন যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হোল না। 'ওগো শেফালি ওগো' শিল্পীর কণ্ঠে ভালই লাগলো। N31265 রেকর্ডে একদিকে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় গেয়েছেন 'আজি শরৎ তপনে, প্রভাত স্বপনে.' রবীন্দ্র সঙ্গীতটি এবং অপরদিকে গেয়েছেন সুপ্রীতি ঘোষ—'মেঘের কোলে রোদ হেসেছে বাদল গেছে টুটি'। এটিও রবীন্দ্র সঙ্গীত। উভয় শিল্পীর কণ্ঠে সঙ্গীতের পরিবেশনা নিখুঁত N31266 রেকর্ডে ইলা মিত্রের—'তোমার মোহন রূপে কে রয় ভুলে' এবং সন্তোষ সেনগুপ্তের 'কার বাঁশী নিশিভোরে বাজিল মোর প্রাণে।' এই দু'টি রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পীদ্বয়ের কণ্ঠে ভাব ব্যঞ্জনায় মূর্ত্ত হোয়ে উঠেছে।

N31259 রেকর্ডে সুপ্রীতি ঘোষের কণ্ঠে কীর্ত্তন দু'খানি বেশ তৃপ্তি দেয়। গান দু'খানির কথা ও সুর উভয়ই সুন্দর এবং শিল্পীর কণ্ঠে বেশ আবেগময় হোয়ে উঠেছে। প্রথম গানটি হোল—'চন্দ্রাবলী সাথে যাপি' সারা যামিনী' আর দ্বিতীয়টি হোল—'শুনি তিরস্কার কানু কুঞ্জ ছাড়ি যায়। N31211 রেকর্ডে আছে সুচিত্রা মিত্রের দু'খানি রবীন্দ্র সঙ্গীত। কথা ও সুরের হিন্দোলে কবিগুরুর গানের বৈশিষ্ট্য বেশ ফুটে উঠেছে, একদিকে আছে—'আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্র ছায়ায় লুকোচুরি খেলা,' আর অপরদিকে 'কোন্ ক্ষেপা শ্রাবণ ছুটে এল আশ্বিনেরি আঙিনায়।' আধুনিক সঙ্গীতের ডালি সাজিয়েছেন তিনজন শিল্পী। P11910 রেকর্ডে শচীন দেববর্মণ গেয়েছেন—'খুলিয়া কুসুম সাজ শ্রীমতী যে কাঁদে' ও 'আজও আকাশের পথ বাহি চাঁদ আসে ..,' N31256 রেকর্ডে একদিকে আছে—'তুমি তো জানো না তোমারি নামে যে...' এবং অপরদিকে—'আমার দেশে ফুরিয়ে গেছে ফাগুন...'—দু'খানি গান গেয়েছেন জগন্ময় মিত্র। N31258 রেকর্ডে আছে 'পূজোর ছুটি' শীর্ষক দু'খণ্ডে সমাপ্ত শিল্পী তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গাওয়া দু'খানি আধুনিক গান। প্রথম খণ্ডের গানটির সুরু হোল 'গতবারে শরৎ কালে আমায় তুমি ডাক পাঠালে।'; দ্বিতীয় খণ্ডের সুরু হোয়েছে ঐ একই কথাগুলি দিয়ে, তবে দুটি গানেরই মর্ম্মার্থ ভিন্ন। আধুনিক গানের এই তিনখানি রেকর্ডের শিল্পী স্বীয় বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রেখেছেন—তাঁদের

ভক্তদের গানগুলি ভালই লাগবে। N31262 রেকর্ডে যশোদাদুলাল মণ্ডলের 'ডেলি প্যাসেঞ্জার' এবং 'বৌ একটা চাই'—কৌতুক গান দু'খানি বৈশিষ্ট্যহীন। N31263 ও N31260 রেকর্ড দু'টিতে যথাক্রমে পরিতোষ শীলের 'মঙ্গল' চিত্রের দু'খানি গানের সুরে বেহালা বাজানো এবং রাজেন সাকারের 'বরযাত্রী' চিত্রের গানের সুরে ক্ল্যারিওনেট বাজনা তাঁদের মৌলিক সৃষ্টির গৌরব না বাড়ালেও জনসাধারণের মনোরঞ্জন করবে আশা করি।

কলম্বিয়া রেকর্ড কোম্পানীর সেপ্টেম্বর মাসের গানের তালিকায় আছে বেশীর ভাগই আধুনিক গান, বিভিন্ন শিল্পীর কণ্ঠে GE7766 রেকর্ডে বিমলভূষণের গাওয়া জাতীয়-সংগ্রামূলক ভাব নিয়ে রচিত "৪২ এর একটি পাতা" শীর্ষক গান দু'খানি সকল শ্রোতাকেই সমান আকৃষ্ট করবে। একটির সুরু হোল—'জানি না ভালো লাগবে কিনা এ গানখানি ..' অপরটি—'বাতাসে বাতে আসিল আহ্বান'। GE7765 রেকর্ডে ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের গাওয়া দু'খানি গান—একটি—'তোমারে যে জানায়নি এই মোর অভিমান' অপরটি 'ওগো গুণী বাজাও শুনি আমার বীণাখানি'—গান দু'খানিতে শিল্পী স্বীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছেন। GE7767 রেকর্ডে সন্তোষ রায় গেয়েছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায় কৃত সুরের দু'খানি গান 'শুধু নয়নের জলে সিক্ত হ'লো গো মালা' ও 'দুজনের কূজনে মুখর সেই সে প্রহরগুলি নাই,' সুরকারের বৈশিষ্ট্য শিল্পীর কণ্ঠে ফুটে উঠেছে। GE7768 রেকর্ডে পান্নালাল ভট্টাচার্য্যের কণ্ঠে দু'খানি গানের সুর আমাদের বেশ ভালো লেগেছে 'আমরা দু'জনা ছিলাম একই গাঁয়ে' ও 'আজো ভিজে নয়'—এই দু'টি গান। উত্তরা দেবীর কীর্ত্তন গান দু'খানি 'প্রাণের ঠাকুর লীলা করে' ও '(দেখেছি) রূপ সাগরে মনের মানুষ কাঁচা সোনা (হায়)' GE7771 রেকর্ডে উপভোগ্য হয়েছে। GE7770 রেকর্ডে গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে একদিকে 'মহিষমর্দ্দিনী স্তোত্র' (চণ্ডী) পাঠ এবং অপরদিকে 'বিশ্বরূপ দর্শন (গীতা)' আবৃত্তি বেশ শ্রুতিসুখকর হয়েছে।

অক্টোবর মাসের এইচ, এম্ ভি'র যে রেকর্ড আমাদের হাতে এসেছে তাতে দেখা যাচ্ছে বেশ কয়েকখানি সময়োপযোগী গানের রেকর্ড প্রকাশিত হোয়েছে। সেই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য হোল ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের রেকর্ড নাট্য-রূপ, আটখানি রেকর্ডে সম্পূর্ণ N 31285 থেকে N 31292 পর্য্যন্ত রেকর্ডে ছবি বিশ্বাস, বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্র, সরযূবালা ও অন্যান্য শিল্পীরা অভিনয় করেছেন। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের পরিচালনায় ও গোপেন মল্লিকের সুর সংযোজনায় নাট্যরূপ বেশ ভালই ফুটেছে। শিল্পীরা সকলে নিজ নিজ ভূমিকায় যথাযথ অভিনয় করে চরিত্র-গুলির মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। অন্ধগায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে'র ভক্তিমূলক দু'খানি গান প্রকাশিত হয়েছে N 31277 রেকর্ডে। প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ রূপে প্রকাশিত হোয়েছে, 'আকুল কণ্ঠে ডাকি মা তোমায় আমরা সবে' প্রথম কটি কথা হোল এই গানটির। ভক্তিরসপিপাসুদের এই গানটি খুশী করবে এ বিশ্বাস আমাদের আছে। N 31279 রেকর্ডে লব্ধপ্রতিষ্ঠ কীর্ত্তন-গায়ক কমলা(ঝরিয়া) যে গান দুখানি গেয়েছেন তাঁর কণ্ঠ-মাধুর্য্য তাতে বেশ ফুটে উঠেছে—প্রথম গানটি হোল 'কি করবে সখি, আনন্দ' এবং দ্বিতীয়টি হোল—'শুন শুনহে পরাণ প্রিয়া'। আধুনিক গানের ডালি সাজিয়েছেন এইচ, এম ভি'র বিশিষ্ট শিল্পীবৃন্দ: সন্তোষ সেনগুপ্ত গেয়েছেন N 31278 রেকর্ডে 'জীবনে যে দীপ' ও 'এই পার ভাঙা'—দু'খানি গান, শিল্পীর কণ্ঠমাধুর্য্য ও বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ আছে। N 21280 রেকর্ডে আধুনিক গান গেয়েছেন জগন্ময় মিত্র। একদিকে আছে 'বাসর'। এর সুরু হোল—'আমি যদি তুমি শোন। আকাশের ঐ তারা গোনা। কথা র থ কাছে থাক গো'; আর অপর দিকে আছে 'সমাধি'—এর প্রথম কটি কথা হোল—'এখন রাতের এই নীরব প্রহরে কেউ জেগে নেই।' এই জাতীয় গানে কৃতী শিল্পী হিসাবে তাঁর সম্বন্ধে বেশী কিছু বলার প্রয়োজন করে না। N 31281 রেকর্ডে যূথিকা রায়ের গাওয়া একদিকে 'এমনি বরষা ছিল সেদিন' অপরদিকে আছে 'তুমি মোর হাতে বেঁধেছিলে যে মিলন রাখী'—শিল্পীর পূর্ব্বেকার সমস্ত গানের মতই লাগলো।

N 31282 রেকর্ডে বেচু দত্তের গান দু'খানি—'ফিরে যাও ফিরে যাও ভোরের হাওয়া' এবং 'কথার কুসুমে গাঁথা গানের মালিকা কার' কথার ভাব সুরের দোলায় মন্দ লাগলো না। সত্য চৌধুরীর কণ্ঠে দুখানি গান—'মুখে কেন নাহি বলো আঁখিতে যে কথা কহ। এবং 'প্রণয়ের গান গাহিতে বলোনা মোরে' ভালই লাগলো।' রেকর্ডটির নম্বর হোল N 31283। মীনা কাপুরের গাওয়া দু'খানি গান—'তোমার চরণ পরশ ছলে' এবং 'তুমি চলে যাবে জানি খেলা হ'লে অবসান'। তার কণ্ঠ মাধুর্য্য বেশ নিষ্ঠার সঙ্গেই ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন—N 31284 রেকর্ডে।

বাংলার পরিচালক

নীতিন বসু

আলোকচিত্রশিল্পী থেকে পরিচালক হ'লে যে যে দোষ এবং গুণ ছবিতে দেখা যায় নীতিন বসুর ছবিতে তার প্রত্যেকটি পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। তার কারণ এই যে তিনি ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ আলোকচিত্রশিল্পী বলে তাঁর প্রত্যেকটি ছবিকে পরিচালকের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার না ক'রে আলোক-চিত্রশিল্পীর চোখে দেখেন। তাঁর সাম্প্রতিক মুক্তি-প্রাপ্ত ছবি "সমর" বিচার করলেই তাঁর পরিচালনার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়।

আঙ্গিক বাদ দিয়ে পরিচালকের সবচেয়ে বেশী থাকা দরকার সাহিত্য-রস-বোধ এবং অভিনয় সম্বন্ধে স্পষ্ট জ্ঞান। নীতিনবাবুর ছবিতে এই দুটির অভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। আজ পর্যন্ত তাঁর কোনও ছবিতে তাঁর সম্যক সাহিত্য-বোধের পরিচয় পাওয়া যায় নি। তাঁর প্রথম বাংলা ছবি "ভাগ্যচক্র" একটি ডিটেক্‌টিভ কাহিনী ছাড়া আর কিছুই নয়—কিন্তু তার মধ্যে suspense-এরও যেমন অভাব, অবাস্তব শাখায়িত কাহিনীর অবতারণাও তেমনি পীড়াদায়ক। ছবি যদি বাস্তবতা এনে না দিতে পারে, তবে তা যতই আনন্দদায়ক হোক্ না কেন, সমালোচকের বিচারে তা অপাংক্তেয়ই থেকে যায়। এই কারণেই অমর মল্লিক ও কেষ্ট দাসের লরেল-হার্ডির মত অভিনয় ও এই দুটি চরিত্রাঙ্কন ভাঁড়ে পরিণত হয়েছিল, সামাজিক জীব হয়নি। এই বাস্তবতার অভাব "জীবন-মরণ" ছবিতে রেডিওর ম্যানেজার বা ষ্টেশন ডাইরেক্টার অমর মল্লিকের চরিত্রে আবার পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল। শুধু তাই নয় সমস্ত রেডিওর ব্যাপারই সাজানো এবং কৃত্রিম—এই কৃত্রিমতাই নীতিন বসুর ছবির প্রথম দোষ। এই কৃত্রিমতার জন্যই তাঁর "দেশের মাটী" ছবিটি নূতন ধরণের কাহিনী-সমন্বিত হওয়া সত্ত্বেও রসোত্তীর্ণ ছবির পর্য্যায়ে উঠতে পারেনি। এই কৃত্রিমতার জন্যই "পরিচয়" ব্যর্থ হয়েছে।

এই কৃত্রিমতার জন্য দায়ী তাঁর সাহিত্যরসবোধের অভাব। তারই পরিপূরক হিসাবে হয়ত সুসাহিত্যিক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়কে তাঁর নিতে হয়েছিল। সাহিত্য-বোধ কম থাকায় মূল কাহিনীকে পল্লব বাদ দিয়ে কি ভাবে চূড়ান্ত নাটকে নিয়ে যাওয়া যায়, সে বোধও তাঁর কম। এবং এই নাটকীয় মুহূর্ত্তকে কার্য্যকরী করবার জন্য তাঁর একটা stunt এর প্রয়োজন এসেছিল, যার প্রভাব-মুক্ত আজও তিনি হতে পারেন নি। "ভাগ্যচক্র," "দিদি" এবং "পরিচয়" ছবিতে তাই কাহিনীর মধ্যে নাটক এনে নাটকীয় মুহূর্ত্ত দেখাতে হয়েছিল। "দেশের মাটী"তে ঝড়ের stunt কাহিনীর প্রাণের অভাবে ধূলিসাৎ হয়ে গেল। "দৃষ্টিদান," "নৌকাডুবি" ও "সমর" শুধু ঝরঝরে ছবি হ'ল—মনে দাগ কাটতে পারল না। "বিচার" তাঁর সমস্ত পরিচালনা-নৈপুণ্যকে ব্যঙ্গ করল।

আজ পর্য্যন্ত তাঁর ছবির কাহিনীর দুর্ব্বলতা গেল না। তাঁর প্রথম যুগের ছবিতে দেখা যেত নকল-মানুষের জীবনযাত্রার কথা। তারা হাসায়, গান গায়, এটা করে, সেটা করে—কিন্তু আমি আপনি যা করি, তা করে না। এই কৃত্রিমতা তাঁরই পরিচালিত শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্কিমচন্দ্রের কাহিনীর চিত্ররূপকেও প্রভাবিত করে ফেলেছে। শরৎচন্দ্রের "কাশীনাথ" অভিনন্দিত হলেও শরৎচন্দ্রের কাহিনী নয়। সাহিত্যবোধের নিদর্শন পাওয়া যেত এই কাহিনীর চিত্ররূপে। এই গুণাভাবের জন্যই বোধ হয় তাঁর সজনীকান্ত দাসকে দিয়ে রবীন্দ্রনাথের "দৃষ্টিদান" কাহিনীর চিত্রনাট্য করিয়ে নিতে হয়েছিল। কিন্তু সজনীকান্ত দাস রবীন্দ্রনাথের কাহিনীর এমন এক হাস্যকর সংস্করণ উপহার দিলেন যে তা না হ'ল ছবি, না হ'ল সাহিত্য। নীতিনবাবুও সজনীকান্ত দাসের সাহিত্য-রস-বোধাভাব ধরতে পারেন নি। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তাঁর সাম্প্রতিক চিত্র "সমর"-এ বিজ্ঞাপন দিতে হয়েছে যে বঙ্কিমচন্দ্রের "রজনী" কাহিনীকে যথাযথ চিত্ররূপ দেওয়া যায় না বলে ছবিটির নাম, চরিত্রের নাম ও কাহিনীর আংশিক পরিবর্ত্তন করতে হয়েছে। নীতিনবাবুর এতদিনের অভিজ্ঞতার পর এই ধরণের হাস্যকর বিজ্ঞাপন তাঁর পরিচালনার কৃতিত্ব প্রকাশ করে না। সত্যকার সাহিত্য-

রস-বোদ্ধা ও চিত্রনাট্যকার বঙ্কিমচন্দ্রের "রজনীর" যথাযথ চিত্ররূপ দিতে পারতেন।

নীতিন বসুর ছবির একটি বিশেষত্ব এই যে তাঁর ছবিতে সামান্য বিদেশী ছবির প্রভাব দেখা যায় এবং তা প্রকট হয় "দিদি" ছবিটিতে। পরিচালনার দিক দিয়ে "দিদি" নিঃসন্দেহে তাঁর সবচেয়ে ভাল ছবি—নাটকীয়ভাবে কাহিনীর সুরু ও শেষ; কাহিনীর বাঁধুনি ও সুষ্ঠু পরিচালনা ছবিকে এমন গতি এনে দিয়েছে যে দিদির চরিত্র অবাস্তব হলেও দর্শককে পীড়িত করে না। ছবির শেষে মনে হয় সমস্ত ছবিটি বিদেশী mounting-এ তৈরী—কৃত্রিম কিন্তু আসলের মতই দ্যুতিমান। "কাশীনাথ"এর গল্পের অবতারণায় বিদেশী গন্ধ রয়েছে। এই দুটি ছবির টেকনিকের তফাৎ এই যে "দিদি" শেষ হয়েছে চরম নাটকীয় মুহূর্তে, কিন্তু "কাশীনাথ" শেষ হল নাটকীয় মুহূর্ত পার হয়ে এক "উজ্জ্বল দৃশ্যে।"

পরিচালনার এত দুর্ব্বলতা থাকা সত্বেও নীতিন বসুর ছবির জনপ্রিয়তার কারণ হচ্ছে সরলভাবে কাহিনীটি বলা এবং সাধারণ দর্শকের মনোমত ঘটনা সৃষ্টি করা এবং গানের সুযোগ তৈরি করা। তাঁর ছবিতে যতই হাস্যকর পরিস্থিতি আসুক না কেন দর্শকের বিরক্তি উদ্রেক হয়নি শুধু এই সহজ করে বলার জন্য। তাই "ভাগ্যচক্র" ও "জীবন-মরণ"-এ অমর মল্লিকের অভিনয় ভাঁড়ের মত হলেও ভাল লেগেছিল, "জীবন-মরণ" ছবিতে সায়গল বেডিও ষ্টেশনের মধ্যে মাইকের সামনে অন্য গায়ককে ছেড়ে গেলেও খারাপ লাগেনি—কারণ দর্শকের মনকে সেই দিক দিয়ে তৈরি করা ছিল। তাঁর সাহিত্য-বোধের অভাবকে ঢেকে দিয়েছিলেন আনন্দ পরিবেশনের অদ্ভুত কৃতিত্ব দিয়ে। এই দিক দিয়ে তিনি বাংলার সমস্ত পরিচালকের চেয়ে গুণবান। দেবকীকুমার বসু বা প্রমথেশচন্দ্র বড়ুয়া শ্রেষ্ঠতর প্রতিভাধর পরিচালক হলেও, এইখানে তাঁরা দু'জনেই নীতিন বসুর কাছে পরাজিত হয়েছেন।

নীতিন বসুর পরিচালনার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ asset হচ্ছে আলোকচিত্র শিল্পে তাঁর বিস্ময়কর প্রতিভা। ক্যামেরা দিয়ে একটি অতি সাধারণ ছবিকে অসাধারণ ছবিতে রূপান্তরিত করতে তিনি অদ্বিতীয়। আজ পর্য্যন্ত তাঁর সমস্ত ছবিতে যা সকলকে আশ্চর্য্য করে, যা প্রত্যেক দর্শককে কাহিনীর শেষ পর্য্যন্ত ধরে রাখে তা হচ্ছে তাঁর ক্যামেরার যাদু। দেবকীকুমার বসু তাঁর ছবির কাব্য ফুটিয়ে গেলেন কাব্যিক পরিবেশনায়, প্রমথেশচন্দ্র বড়ুয়া ফুটিয়ে তোলেন পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া ও সামঞ্জস্যে; নীতিন বসুর ছবির কাব্য অনুরণিত হয় mood lighting-এ। এই তিনজন পরিচালকের পরিচালনায় পার্থক্য এইখানে। এই mood lighting-এ ছবির mood দর্শকের সামনে সার্থকভাবে তুলে ধরেছেন তিনি "নৌকাডুবি" ছবিতে। "দিদি" ছবি তাঁর grim কিন্তু সুষ্ঠু পরিচালনার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, "নৌকাডুবির" পরিচালনায় একটি lyric-এর ভাব বর্ত্তমান। Progressive shots through camera বাংলায় একমাত্র তাঁর ছবিতেই চূড়ান্তভাবে দেখা গেছে।

তিনিই সারা ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রথম 'প্লে-ব্যাক' প্রথার প্রচলন করেন তাঁর "ভাগ্যচক্র" ছবিতে—এ কথার উল্লেখ না করলে তাঁর প্রতিভা সমগ্রভাবে উপলব্ধি করা যাবে না।

রূপদক্ষের অঙ্গসজ্জা—যাকে বলে "মেক্-আপ"—তার কথা বলছি না ; বলছি নাট্য-ভবনের অঙ্গসজ্জার কথা।

সারা ভারতের মধ্যে একটি শহরে পাঁচ পাঁচটি (একটি সম্প্রতি বন্ধ) রঙ্গালয়ের গৌরব যে প্রদেশের—সেই বাংলা দেশের থিয়েটারগুলির দীন অঙ্গসজ্জা নিশ্চয়ই আমাদের মুখ উজ্জ্বল করে না !

থিয়েটার যদি জাতির সংস্কৃতির পরিচয় হয় তাহলে কোনও বিদেশী কৌতূহলী বন্ধুকে আমাদের থিয়েটার

রঙ্গালয়ের অঙ্গরাগ

শ্রীচিত্রগুপ্ত

দেখতে নিয়ে গেলে সে বন্ধু প্রথমেই আমাদের কোন্ পরিচয়টি পাবে ? বুকিং অফিসে তাকে পাশে নিয়ে যখন টিকিট কিনবো তখন সেখান থেকেই তো সে বাতাসে ভাসমান শৌচাগারের দুর্গন্ধের মধ্যে দিয়ে আমাদের থিয়েটারের প্রাথমিক পরিচয়টা পেয়ে যাবে !

থিয়েটারের যত দুর্দিনই হোক অভিনয় চলার সময় দুচার বাল্‌তি জল আর একটু ক'রে ফেনাইল পনেরো মিনিট অন্তর বাথরুমে ঢালবার ব্যবস্থা করা যায় না—এমন দুর্দিন আমাদের থিয়েটারগুলির কক্ষনো নয়।

আসল কথা আমাদের স্বভাবই নোংরাটে—আমাদের নাক নেই, আমরা সব নাক-কাটার দল !

নইলে যেকথা মনে করলে বমি পায়—লিখতে ঘেন্না করে, সেই লজ্জাকর "পরিস্থিতি"র প্রতিবিধানকল্পে সামান্য ব্লিচিং পাউডার, কষ্টিক সোডা, নাইট্রিক অ্যাসিড, ফেনাইল আর প্রক্ষালনের খরচ বহন করতে আমাদের এতখানি কার্পণ্য কি স্বাভাবিক ?

নতুন বই খুলতে আমরা ষ্টেজ ডেকরেশনের পেছনে অন্ততঃ চার পাঁচ হাজার টাকা খরচ করি অথচ বাথরুমের খানা-খন্দগুলো বোজাবার জন্যে আর এক ইঞ্চি পুরু হল্‌দে হড়হড়ানিগুলো চেঁছে ফেলাবার জন্যে পাঁচটা টাকা খরচ করতেও আমাদের গা' করকর করে।

শুধু নাক কেন ? চোখই কি আমাদের আছে ? যদি থাকতো তাহলে রঙ চটা, চূণবালিখসা কোণে কোণে পানের পিক ছিট্‌কানো, ড্যাম্পের বড় বড় দাগ লাগা, ঝুলকালি পড়া দেওয়ালগুলোর দীনমূর্ত্তি নিশ্চয়ই আমাদের নজরে ঠেকতো।

লবি ডেকরেশনের বালাই নেই, পোস্টারের "ছিরি" নেই ; "ব্যানার" তো কোনদিন বানানোই হয় না। প্রোগ্রাম বইখানা মাদুলি, কবচ, পুরোনো নীলেমী মালের হ্যাণ্ডবিলেরও অধম। আলোগুলো টিম্‌টিমে, পাখাগুলো নড়্‌বড়ে, সীটগুলো ঝর্‌ঝরে ! আলো একটা জলে তো তিন্‌টের বাল্‌ব্ নেই কিম্বা সুইচ ভাঙা। অচল পাখাগুলোকে ততটা ভয় করিনা ; কিন্তু সচলগুলো তারস্বরে আর্তনাদ করতে করতে এমন দোল খায়, এমন রবার-পোড়া গন্ধ ছড়ায় আর মুহূর্মুহুঃ বিদ্যুতের ঝিলিক্ মেরে সিলিংগুলো চিক্‌চিকিয়ে তোলে যে অনুপস্থিত ডোরম্যানের উদ্দেশে বারবার কাকুতি জানাতে হয়—সেগুলোকে বন্ধ ক'রে দেবার জন্যে।

ভাঙা সীটের নম্বর-দেওয়া টিকিট হাতে ক'রে দর্শক বুকিং অফিসে আপত্তি জানালে তাকে "ব্যাজার"-মুখে পাঁচ সারি পিছনের একটা সীট দেওয়া হয় ; তবু সামনের খোলা মাঠের মত খালি-প'ড়ে-থাকা বেঞ্চীদামের সীটে প্রমোশন দেওয়া হয় না।

দারুণ ড্যাম্প, মেঝে ওপর অবিবেচক-বুদ্ধিতে সাজানো কিউবিক সীটে আড়ষ্টভাবে দীর্ঘকাল বসে থাকবার পর, বিরক্তমুখে বিদেশী বন্ধু যখন নেহাৎ "নেসেসারি ম্যালাইস"-এর তাগিদে ভদ্রভাবে জিজ্ঞাসা করেন "টয়লেট্"টা ('Toilette—অঙ্গরাগ) কোন্‌দিকে, তখন প্রকৃত স্থান থেকে তিরিশ গজ দূর পর্য্যন্ত প্রবহমান ফোয়ারার স্রোতটা তাকে দেখিয়ে দিতে কী রকম মাথা কাটা যায় ? তারপরেই অবশ্য—প্রতি ড্রপের শেষে বাইরে-থেকে-ঘুরে আসা দর্শকদের ভিজে জুতোর ছাপে কেন যে এতক্ষণ মেঝে ভিজে যাচ্ছিলো—তার রহস্য পরিষ্কার হয়ে যায় বিদেশী বন্ধুর মনে।

অতঃপর সখীর দলের নৃত্য নামক বীভৎস বর্বরতা দর্শনের পর অপনোদিতকৌতূহল বিদেশী বন্ধু যখন

প্রেক্ষাগৃহ ত্যাগের সংকল্প সম্পর্কে আমার সমর্থন প্রার্থনা করেন তখন কিন্তু সেই বিদেশী বন্ধুর ওপরই আমার রাগ হয়ে যায়—"কী দরকার ছিলো তোর বাপু, আমাদের এই ঘরের কেলেঙ্কারী দেখতে আসবার ?" এর চেয়ে আমাদের কোনো সিনেমা হলে গেলে ঢের ভালো হোতো—কারণ আমাদের সিনেমার বহিরঙ্গটা অন্ততঃ অনেকটা কম লজ্জাজনক। বেশ তকতকে ঝকঝকে পরিবেশ—সেখানকার টয়লেটটাও ভদ্ররুচি-সম্মত।

গালাগালি দিয়ে হেয় করবার উদ্দেশ্যে এই কথাগুলো বলি নি—বললুম নেহাৎ মনের দুঃখে। কারণ, থিয়েটারকে আমি ভালোবাসি—লজ্জার সঙ্গে স্বীকার করছি যে—এত ত্রুটি সত্বেও এখনো এর ওপরেই আমার সবখানি মন প'ড়ে র'য়েছে। সিনেমার চপল, চটুল, প্রগলভ সাজসজ্জা এখনও আমার মনকে ততখানি কেড়ে নিতে পারে নি—থিয়েটারের উপরিউক্ত দৈন্য সত্বেও। কেননা থিয়েটারের এমন কিছু আছে যা সিনেমার নেই। সিনেমা সিনেমাই; থিয়েটার সে নয়। কিন্তু দুর্দ্দশার স্তরে স্তরে নামতে নামতে আমাদের থিয়েটার যে দশায় এসে ঠেকছে—তাকে এবার তার "মরণ-দশা" বলেই মনে হ'চ্ছে। নিজের বনেদীয়ানার গর্বে অন্ধ হ'য়ে সিনেমাকে "আপ-স্টার্ট" বলে 'নস্যাৎ' করবার ক্ষমতা আর আমাদের থিয়েটারের থাকছে না। জাতে উঁচু আর 'ঘরে' বড় ব'লে দেমাক কতক্ষণ রাখতে পারে বড় ঘরের লক্ষীছাড়া গেঁজেল জুয়াড়ী ছেলে ?

সত্যি, থিয়েটারকে বাঙালী কী ভালোই না বাসে ! এই দারুণ দুর্দিনেও পূজোর বাজারে পাড়ায় পাড়ায়, গাঁয়ে গাঁয়ে, ছেলেরা সখের থিয়েটারের "মাচা" বাঁধছে। বেচারারা বই পায় না; তবু সেই চল্লিশ পঞ্চাশ বছর আগেকার "দেবলাদেবী", "বঙ্গেবর্গী", "চন্দ্রগুপ্ত" আর "শাজাহান" নিয়েই তাদের কী মাতামাতি ! কী উৎসাহ !!

বারোয়ারীর মণ্ডপে তো কৈ সিনেমা শোর বন্দোবস্ত ক'রেই তারা কাজ সারছে না ?

বিদেশী যে-কটি ফুল আমাদের মাটিতে টিঁকে গেছে—থিয়েটার তার মধ্যে একটি। কিন্তু সার দেবো না, জল ঢালবো না, মাটি খুঁড়বো না, আগাছা নিড়োবো না—এ করলে সে ফুলের গাছ বাঁচবে কেন ?

স্থায়ী রঙ্গমঞ্চগুলোই যদি অনাদরে শুকিয়ে যায়, তাহ'লে নাট্য-রসপ্রবাহই মজে যাবে—দেশ থেকে থিয়েটারের চর্চাও উঠে যাবে শেষ পর্যন্ত।

যদিও গোড়ায় যে কথাগুলো বলেছি তা খুবই দরকারী খুবই মনোযোগ দেবার মতো; তবুও শুধু বহিরঙ্গ-চর্চার দ্বারাই থিয়েটার বেঁচে যাবে এমন আশা করাও বাতুলতা।

থিয়েটারকে বাঁচাতে গেলে বহিরঙ্গের প্রসাধনের প্রয়োজন আছে বটে—বিমুখ দর্শকদের আকর্ষণ করবার জন্যে। স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে প্রাণ-পুষ্টির ব্যবস্থা না ক'রে শুধু প্রসাধনে দেহকে কী ক'রে বাঁচানো যাবে ?

থিয়েটারের প্রাণ হোলো সুরচিত নাটক—সে প্রাণ আবার প্রতিষ্ঠা পায় সু-অভিনয়ের সর্ববিধ সুব্যবস্থার ওপর; তারপর তার যৌবনশ্রীকে আবার বহিরঙ্গ-প্রসাধনের সাহায্যে লোভনীয়, আকর্ষণীয়, মনোজ্ঞ ক'রে তুলতে হয়।

বাংলায় আজ সুলেখকের অভাব নেই। কিন্তু থিয়েটার কয়টির কর্তারা এমনই গোঁড়া, সেকেলে, জেদী, অজ্ঞ, নিশ্চেষ্ট আর ব্যবসায়-বুদ্ধি-বিবর্জিত যে তাঁরা কিছুতেই কাউকে দিয়ে কিছু লিখিয়ে নেবার চেষ্টা করবেন না। অথচ নাটের কিছু এদিক ওদিক বয়স সত্বেও শিশিরকুমার, অহীন্দ্র চৌধুরী, নরেশ মিত্র এবং মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য আজও সম্পূর্ণ সক্ষম এবং সক্রিয়। যে শিক্ষা-দীক্ষা আর প্রথম শ্রেণীর শিল্প-নৈপুণ্যের এবং পরিচালন-প্রতিভার এঁরা অধিকারী তাতে অনায়াসে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের দিয়ে শ্রেষ্ঠ নাটক লিখিয়ে নিয়ে এঁরা তাকে মনোজ্ঞভাবে মঞ্চস্থ করাতে সক্ষম।

তবুও কেন হয় না ? এঁদের গা' নেই ব'লে ?—না, মালিকদের জড়তার জন্যে ? যাঁরা দায়ী তাঁরা বুদ্ধির এবং উৎসাহের এই "জাড্য" কি কিছুতেই পরিহার করবেন না ?

লেখকদের কাছে অভিযোগ শোনা যায় যে সেধে দিয়ে-আসা নাটকের পাণ্ডুলিপি থিয়েটারের কর্তৃপক্ষীয়রা নাকি বছরের পর বছর বিনা বিচারে ফেলে রাখেন; তারপর একদিন হয়তো সে পাণ্ডুলিপির আর পাত্তাই পাওয়া

যায় না। কখনও কখনও এমন অভিযোগও শোনা যায় যে, হারিয়ে-যাওয়া পাণ্ডুলিপির নকলে তৈরী কোনও নাটক আবার বহুদিন পরে মঞ্চস্থ হয়; শুধু মূল লেখকই তাঁর পরিশ্রমের মূল্য পান না। থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ এই চ্যালেঞ্জের উত্তরে কী কৈফিয়ৎ দেবেন?

মানলুম, 'দেখে-দিয়ে-আসা' নাটকগুলো না হয় তাঁদের অভিজ্ঞ বিচার-বুদ্ধির কাছে "আপীল" করে না। কিন্তু সিনেমা-কর্তারা অনেকে যেমন লেখকদের দরজায় হাঁটাহাঁটি ক'রে দরকার মত বই লিখিয়ে নেন বলে শোনা যায় তেমনি কোনও থিয়েটার কর্তাকে কোনও শ্রেষ্ঠ গাল্পিক বা ঔপন্যাসিকের কাছে যেতে শোনা যায় না কেন?

উপযুক্ত আর্থিক এবং অন্যবিধ মর্যাদা দিতে রাজী থাকলে শিক্ষিতা এবং সুদর্শনা অভিনেত্রী পাওয়া যায় না এ অজুহাতও আজকের সমাজের আর্থিক দুরবস্থার দিনে সম্পূর্ণ অচল। আমার বিশ্বাস, মর্যাদা দিতে প্রতিশ্রুত হ'লে এবং সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারলে অন্ততঃ অনেক দুঃস্থা মেয়ের কাছে তাঁরা অভিনয়পেশাকে বেশী বাঞ্ছনীয় বলে গ্রহণ করাতে পারেন।

থিয়েটারে ভিড় হয় না ব'লে তাঁরা ক্ষোভ করেন অথচ বিমুখ দর্শকের মন ফেরাবার দিকে তাঁদের কোনও উৎসাহ দেখা যায় না। এটা কেমন-ধারা ব্যবসা-বুদ্ধি?

আসলে **দর্শকরা থিয়েটার দেখতে চান—অথচ না দেখাবার জন্যেই থিয়েটার-কর্তারা বদ্ধ-পরিকর**—আমার এই অভিযোগের উত্তরে কী বলবার আছে তা' বলবার জন্যে আমি থিয়েটার-কর্তৃপক্ষকে চ্যালেঞ্জ করছি।

মন্দিরগাত্রে আলিঙ্গনাবদ্ধ নরনারীর খোদিত মূর্ত্তি

পাষাণ ফলকে ভারতীয় ভাস্কর্যের অন্যতম একটি নিদর্শন

ভারতীয় ভাস্কর্য্যে বামাচারী আদর্শ

সন্তোষ কুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রত্নতাত্ত্বিকেরা বলেন আর্য্য-ব্রাহ্মণ্য আদর্শে যে স্থপতি-ভাস্কর্য্য রচিত হয় এইদেশে সেই গুপ্তযুগ থেকে সুরু ক'রে আজ পর্য্যন্ত তার এক শ্রেষ্ঠ নিদর্শন ভুবনেশ্বর—কোনারকের মন্দিরগুলিতে দেখতে পাওয়া যায়। পুরী আর ভুবনেশ্বর মন্দিরের গঠন কৌশল প্রায় একই রকমের তবে এই দুই মন্দিরের মধ্যে ধর্ম্মাদর্শের যে পার্থক্য বর্ত্তমান তা' দুটি চিহ্নের সাহায্যে দেখান হয়েছে। পুরীর মন্দিরের চূড়ায় যে চক্র শোভা পায়, ভুবনেশ্বরের মন্দিরে সেই চক্র ত্রিশূলে পরিণত হয়েছে। ত্রিশূল শৈব তান্ত্রিকের নিদর্শন। যখন ভুবনেশ্বর-কোনারকের মন্দির নির্ম্মিত হয় তখন তান্ত্রিক আদর্শ উড়িষ্যায় প্রাধান্য লাভ করেছে। বাঙ্গালা তান্ত্রিক-ধর্ম্মের জন্মস্থান বটে কিন্তু এখানকার স্থপতি ভাস্কর্য্যে এই ধর্ম্মের কোন ছাপ বিশেষভাবে বর্ত্তমান নেই কারণ এদেশে তান্ত্রিক ধর্ম্ম সাধনমার্গে যত প্রকাশিত অন্য কোন ভাবে সেরূপ নয়। উড়িষ্যায় এই ধর্ম্ম সাধনমার্গে তত প্রাধান্য লাভ করেনি যত করেছে শিল্পের মাধ্যমে। তাই বাঙ্গালার তান্ত্রিক আদর্শ এসে দাঁড়িয়েছে বামাচারী সৃষ্টি-রহস্যে। জীবাত্মায় পরমাত্মার সন্ধান। বামাচারী সৃষ্টিতত্ত্ব কোন এক সময়ে আসুরীয় ও ব্যাবিলনীয়দের মধ্যে প্রচলিত ছিল। ফণিশীয়েরাও এই তত্ত্বানুসন্ধানে একদা ব্যস্ত থাকতেন। খৃষ্টান সমাজে এই আদর্শের জনপ্রিয়তা না ঘটলেও এর প্রচলন একেবারে ছিল না বলা চলে না। সিরিয় নোশাইরী মুসলমানেরা প্রকৃতির সৃষ্টিরহস্যে বিশ্বাসী। কতকাংশে গ্রীকেরা, মধ্য এশিয়ার কোন কোন জাতি, চীনারা সকলেই প্রকৃতির সৃষ্টি-রহস্যে পরম পুরুষের সন্ধান করে থাকে।

বামাচারী আদর্শের প্রকাশ নানা ভাবে নানা সময়ে ঘটেছে। গ্রীকরা সে আদর্শ গ্রহণ করে নৃত্যামোদের সৃষ্টি করে, আসুরীয় ব্যাবিলনীয়েরা সেই আদর্শে নানা সামাজিক প্রথা তৈরী করে বসে। বাঙ্গালায় সেই একই আদর্শে তান্ত্রিক-সাধনার নানা পথ উন্মুক্ত করে দেয়। আর ভুবনেশ্বর কোনারকে সেই আদর্শ প্রস্তর-খোদিত নানা মানবীয় মূর্ত্তির মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত। খোদিত মূর্ত্তিগুলি কত ভাবের, নরনারীর মূর্ত্তি চোখে মুখে ভাবের ছাপ গ্রহণ ক'রে, হাত পা নেড়ে মনের কত আবেদন, কত কাকুতিই না প্রকাশ করে। মূর্ত্তিগুলির ভাবাবেশ যেমন প্রশংসার যোগ্য তেমনই প্রশংসার যোগ্য তাদের অবয়ব গঠন ও বিক্ষেপ। সাধারণ দর্শক বামাচারী আদর্শে অঙ্কিত মূর্ত্তিগুলি দেখে নানা কথাই মনে করতে পারে কিন্তু বললে কি উড়িষ্যায় বামাচারী শিল্পীর রচনাই ভারতীয় ভাস্কর্য্য শিল্পের পরম উৎকৃষ্ট সংস্করণ।

ভুবনেশ্বর মন্দিরের গায়ে যে সব খোদিত মূর্ত্তি আছে সেইগুলি ছাড়াও নানা স্বয়ংসম্পূর্ণ মূর্ত্তি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হ'য়ে আছে। সকল মূর্ত্তিরই এক বাণী, প্রাকৃতিক শক্তির বিভিন্ন প্রকাশ। মন্দির গাত্রে খোদিত এক নর্ত্তকীর মধ্যে এই শক্তি তার বিভিন্ন অঙ্গ বিক্ষেপ, দৃষ্টি, বেশভূষায় বেশ ফুটে উঠেছে। নারীর মোহিনী মায়া যেন নর্ত্তকীর প্রতিকৃতিতে প্রকাশিত। এই মোহের শেষ দেখা যায় এক কঙ্কাল মূর্ত্তিতে। তারপর, শিব-ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবতাদের দেবশক্তিকে প্রতিমূর্ত্ত করা হয়েছে উন্নত কুচযুগশোভিতা, কমনীয় দর্শনা, লোলাপাঙ্গী নারী মূর্ত্তিতে। দৈব ও মানবীয় জগতে নর ও নারী শক্তির সমবস্থানেই পুরুষ প্রকৃতির লীলা চলেছে।

নরনারীর প্রকৃতিগত কাম চরিতার্থ করার নানা উপায় ও বিধির প্রতি বামাচারী তান্ত্রিক শিল্পীর লক্ষ্য হওয়া অসম্ভব কিম্বা অপ্রাকৃত নয়। তাই ভুবনেশ্বর-কোনারকে ভাস্কর-স্থপতি যে পুরুষ প্রকৃতির নানা লীলা নর ও নারী মূর্ত্তির সাহায্যে প্রকাশ করেছে তাতে বিস্মিত হওয়ার কি আছে? কোনারকের মন্দির গাত্রে যে সব চিত্র খোদিত আছে তাদের মধ্যে "বসন্ত উৎসবই" সর্ব্বোত্তম। নারী বাদিকার মূর্ত্তিটি দেখলে মনে হয় যেন কি অনবদ্য মধুর ধ্বনিই না শোনা যাবে মৃদঙ্গের ওপর বাদিকার অঙ্গুলী

স্পর্শে। অন্যস্থানে এক গাছের গায়ে ভর দিয়ে এক নারী মূর্ত্তি দাঁড়িয়ে আছে; তার দৃষ্টিতে কোন সুদূরাগত নায়কের আগমন বার্ত্তা জানা যায়।

ভুবনেশ্বর কোনারকের নারীমূর্ত্তিতে বামাচারী আদর্শের প্রতিফলন হয়েছে। কেবল ভুবনেশ্বর-কোনারক কেন ভারতের নানা স্থানে যে-নারী মূর্ত্তি ভাস্করের হাতুড়ী বাটালি সৃষ্টি করেছে সেই মূর্ত্তি হয় মাতা না হয় কামিনীরূপে দেখা দিচ্ছে। চিত্রকর, ভাস্কর ও স্থপতির কাজে বাঙ্গালী শিল্পীর দান প্রায় সারা ভারতে ছড়িয়ে আছে। নানা প্রমাণ সে সত্য প্রতিষ্ঠিত করে দেয়। তারপর সেন রাজাদের আমলে, লক্ষ্মণ সেনের রাজত্ব পর্য্যন্ত সময়ে বাঙ্গালার ভাস্কর্য্যে সাহস ও মৌলিকতার ক্রমাবনতি ঘটলেও মূর্ত্তিগুলি এক অপূর্ব্ব মহিমায় মণ্ডিত হোত। সেকালে দাম্পত্য প্রেমের নানা লীলা, যৌনভাবের নান প্রভাব ভাস্কর্য্যশিল্পে স্থায়িত্ব লাভ করবার সুযোগ পায়। দেবমূর্ত্তিতে মানবীয় কমনীয়তা ও সৌকুমার্য্যের ছাপ পড়ে। এতে কিন্তু শিল্পীর সাধনার মূল্য মোটেই কমে যায় না।

লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বকালে ভারতের শিল্পকেন্দ্র বাঙ্গালায় মুসলমান রাজশক্তি দেশের শাসনভার গ্রহণ করে বসে। সেই সুরু হয় ভারতীয় চিত্র-ভাস্কর্য্য-স্থপতি শিল্পের দুর্দ্দিন। দেশের চারিদিকে যেসব শিল্প-স্থপতির নিদর্শন ছিল তাদের লোপ ঘটতে থাকে। শিল্পীরা শহর বন্দর থেকে রোজগার করবার সুযোগ সুবিধা ক্রমেই হারাতে থাকে। তারা নিভৃত পল্লীতে গিয়ে আত্মগোপন করে। সেই থেকে বাঙ্গালার চিত্র-ভাস্কর্য্য-স্থপতির আদর্শ প্রচলন ক্ষীণপ্রাণ হয়ে পড়ে। সামান্য সাধারণ গ্রাম্য চারুকলা নৃত্য-সঙ্গীতে বাঙ্গালার শিল্পগৌরব পর্য্যবসিত হয়।

আজ যদি ভারতীয় ভাস্কর্য্যের পুনর্জীবন দানের প্রচেষ্টা হয় তবে সে প্রচেষ্টা সুরু হওয়া প্রয়োজন বাঙ্গালা থেকে, আবার বামাচারী আদর্শে অনুপ্রাণিত শিল্পকলার সংস্পর্শে। কেবল বামাচারী আদর্শের প্রভাবেই ভারতীয় শিল্প, বিশেষ করে ভাস্কর্য্য এক অনবদ্য সরলতা, কমনীয়তা এবং সেই সঙ্গে পার্থিবতা লাভ করে। পার্থিব শিল্পাদর্শই সর্ব্বসাধারণের কিন্তু সেই পার্থিবতাকে শিল্পীর সাধনা মহিমান্বিত করেছে।

অলৌকিক দৈবশক্তি সম্পন্ন ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তান্ত্রিক ও জ্যোতির্ব্বিদ্

কলিকাতা ১০৫ গ্রে ষ্ট্রীটস্থ ভারতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী হস্তরেখাবিদ্ ও প্রাচ্য, পাশ্চাত্য, জ্যোতিষতন্ত্র ও যোগাদি শাস্ত্রে অসাধারণ শক্তিশালী আন্তর্জ্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন **জ্যোতিষ-সম্রাট, জ্যোতিষ শিরমণি, যোগবিদ্যাবিভূষণ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য জ্যোতিষার্ণব, সামুদ্রিকরত্ন, এম্ আর এ-এস্** (লণ্ডন) ; বিশ্ববিখ্যাত নিখিল ভারত ফলিত ও গণিতপরিষদের সভাপতি এবং কাশীস্থ সর্ব্বজনাবদিত বারাণসী পণ্ডিত মহাসভার স্থায়ী সভাপতি।

এই অলৌকিক প্রতিভাসম্পন্ন যোগী দেখিবামাত্র মানবজীবনের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান নির্ণয়ে সিদ্ধহস্ত। ইঁহার তান্ত্রিক ক্রিয়া ও অসাধারণ জ্যোতিষিক ক্ষমতা দ্বারা ইনি ভারতের জনসাধারণ ও উচ্চপদস্থ রাজ কর্ম্মচারী, স্বাধীন নরপতি এবং দেশীয় নেতৃবৃন্দ ছাড়াও ভারতের বাহিরে যথা—ইংলণ্ড, আমেরিকা, আফ্রিকা, চীন, জাপান, মালয়, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি দেশের মনীষীবৃন্দকে চমৎকৃত করিয়াছেন এই সম্বন্ধে ভূরি ভূরি স্বহস্তলিখিত প্রশংসাকারীদের পত্রাদি হেড অফিসে দেখিতে পাইবেন। ভারতে ইনিই একমাত্র জ্যোতির্ব্বিদ্—যিনি বিগত ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বিশ্বব্যাপী ভয়াবহ যুদ্ধ ঘোষণার প্রথম দিবসেই মাত্র চার ঘণ্টার মধ্যে ব্রিটিশ পক্ষের জয়লাভ ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন এবং তাহা সফল হওয়ায় মহামান্য সম্রাট ষষ্ঠ জর্জ্জ, ভারতের বড়লাট এবং বাঙ্গালার গভর্ণর মহোদয়গণ কর্ত্তৃক উচ্চ প্রশংসিত ও সম্মানিত হইয়াছেন এবং ৯৪৬ সালে ২রা সেপ্টেম্বর ভারতের রাষ্ট্রনেতা পণ্ডিত জওহরলাল কর্ত্তৃক গবর্ণমেণ্ট গঠনের এক ঘণ্টার মধ্যে জ্যোতিষ সম্রাট মহোদয় ইহার ফলাফল সম্বন্ধে যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন তাহাও আশ্চর্য্যজনক ভাবে সফল হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বিগত ১৯৪৭ সালে ১৫ই আগষ্ট বহু ঘোষিত ভারত ও পাকিস্থান রাষ্ট্র ও অন্যান্য ব্যাপারে যে সমস্ত অদ্ভুত ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন তাহাও ক্রমশঃ সফল হইতে চলিল। ইহা ছাড়া ইনি ভারতের আঠারজন বিশিষ্ট স্বাধীন নরপতির জ্যোতিষ পরামর্শদাতা।

কয়েকজন সর্ব্বজনবিদিত দেশ-বিদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তির অভিমত দেওয়া হইল।

হিজ হাইনেস মহারাজা আটগড় বলেন—"পণ্ডিত মহাশয়ের অলৌকিক ক্ষমতায় মুগ্ধ ও বিস্মিত।"

হার হাইনেস মাননীয়া ষষ্ঠমাতা মহারাণী ত্রিপুরা ষ্টেট বলেন—"তান্ত্রিক ক্রিয়া ও কবচাদির প্রত্যক্ষ শক্তিতে চমৎকৃত হইয়াছি। সত্যই তিনি দৈবশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ।" কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মাননীয় স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় কে-টি বলেন—"শ্রীমান রমেশের অলৌকিক গণনাশক্তি ও প্রতিভা কেবলমাত্র স্বনামধন্য পিতার উপযুক্ত পুত্রেতেই সম্ভব।" সন্তোষের মাননীয় মহারাজা বাহাদুর স্যার মন্মথনাথ রায় চৌধুরী কে-টি বলেন—"পণ্ডিতজীর ভবিষ্যৎ-বাণী বর্ণে বর্ণে মিলিয়াছে। ইনি অসাধারণ দৈবশক্তিসম্পন্ন এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।" পাটনা হাইকোর্টের বিচারপতি মাননীয় মিঃ বি, কে, রায় বলেন—"ইনি অলৌকিক দৈবশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি। ইঁহার গণনাশক্তিতে আমি পুনঃ পুনঃ বিস্মিত।" বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের মন্ত্রী রাজা বাহাদুর শ্রীপ্রসন্নদেব রায়কত বলেন—"পণ্ডিতজীর গণনা ও তান্ত্রিকশক্তি পুনঃ পুনঃ প্রত্যক্ষ করিয়া স্তম্ভিত, ইনি দৈবশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ।" কেউনঝর হাইকোর্টের মাননীয় জজ রায় সাহেব মিঃ এস, এম দাস বলেন—"তিনি আমার মৃতপ্রায় পুত্রের জীবন দান করিয়াছেন। জীবনে এইরূপ দৈবশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি নাই।" উড়িষ্যার কংগ্রেসনেত্রী ও এসেম্বলীর মেম্বার মাননীয়া শ্রীযুক্তা সরলা দেবী বলেন—"আমার জীবনে এইরূপ বিদ্বান দৈবশক্তিসম্পন্ন জ্যোতিষী দেখি নাই।"

প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ কয়েকটী অত্যাশ্চর্য্য কবচ, উপকার না হইলে মূল্য ফেরৎ গ্যারাণ্টিপত্র দেওয়া হয়। ধনদা কবচ, ধনপতি কুবের ইহার উপাসক, ধারণে ক্ষুদ্র ব্যক্তিও রাজতুল্য ঐশ্বর্য্য, মান, যশঃ, প্রতিষ্ঠা, সুপুত্র ও শ্রী লাভ করেন। (তন্ত্রোক্ত) মূল্য ৭।৵০ অদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন ও সত্বর ফলপ্রদ কল্পবৃক্ষতুল্য বৃহৎ কবচ ২৯।৵০ প্রত্যেক গৃহী ও ব্যবসায়ীর অবশ্য ধারণ কর্ত্তব্য। বগলামুখী কবচ শত্রুদিগকে বশীভূত ও পরাজয় এবং যে কোন মামলা মোকদ্দমায় সুফল লাভ, আকস্মিক সর্ব্বপ্রকার বিপদ হইতে রক্ষা এবং উপরিস্থ মনিবকে সন্তুষ্ট রাখিয়া কর্ম্মোন্নতিলাভে ব্রহ্মাস্ত্র। মূল্য ৯৵০, শক্তিশালী বৃহৎ ৩৭৵০ (এই কবচে ভাওয়াল সন্ন্যাসী জয়লাভ করিয়াছেন)। সরস্বতী কবচ ছেলেদের পরীক্ষায় কৃতকার্য্য ও স্মৃতিশক্তি দানে প্রত্যক্ষ ৯।৴০, বৃহৎ ৩৮।৴০

অল ইণ্ডিয়া এষ্ট্রোলজিক্যাল এণ্ড এষ্ট্রোনামিক্যাল সোসাইটী লিঃ (রেজিঃ) স্থাপিতাব্দ ১৯০৭ খৃঃ

(ভারতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং নির্ভরশীল জ্যোতিষ ও তান্ত্রিক ক্রিয়াদির প্রতিষ্ঠান)

হেড অফিস :—১০৫ (ম) গ্রে ষ্ট্রীট, "বসন্ত নিবাস" (শ্রীশ্রীনবগ্রহ ও কালী মন্দির) কলিকাতা। ফোন বি, বি, ৩৬৮৫ সাক্ষাতের সময়—প্রাতে ৮॥০টা হইতে ১১॥০টা। ব্রাঞ্চ অফিস—৪৭, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রিট (ওয়েলিংটন স্কোয়ার), কলিকাতা ফোন :-কলি -৫১৪২ সময়-বৈকাল ৫॥ হইতে ৭॥টা। লণ্ডন অফিস-মিঃ এম, এ, কার্টিস, ৭এ ওয়েষ্টওয়ে, রেইনিস পার্ক, লণ্ডন

নতুন ছবি

(৮ পৃষ্ঠার পর)

দুধারা

'দু'ধারা' চিত্রজগতের ধারার সঙ্গে নতুন কিছু যোগ করতে সক্ষম হয়নি। অতি সাধারণ মামুলি ধরণের কাহিনীকে কেন্দ্র করে এই ছবিটি গড়ে উঠেছে, যার ফলে ছবিটি অতি সাধারণ স্তরের হয়েছে। কাহিনীর মধ্যে যাওবা নাটকীয়তা জমে ওঠবার কিছু বস্তু ছিল চিত্রনাট্য রচনার অনিপুণতার ফলে নাটকীয় মুহূর্তগুলি জমে' ওঠেনি। এ কাহিনী হচ্ছে একজন সঙ্গীত শিল্পীর জীবনকে কেন্দ্র করে। শিল্পীর জীবনে শিষ্যারূপে এক তরুণীর আবির্ভাব ঘটে, এবং-সব ছবিতে যা হয় তাই হোল অর্থাৎ শিল্পী মেয়েটির প্রেমে পড়লো। প্রেমের শেষ পরিণতি বিয়েতে এসে ঠেকলো। কিন্তু বিয়ের পর শিল্পীর আভিজাত্য-পূর্ণ ধনীসমাজের সঙ্গে মেয়েটির নিম্নমধ্যবিত্ত আভিজাত্যহীন সমাজের সঙ্ঘর্ষ বাধলো। শেষ পর্যান্ত সঙ্ঘর্ষ বাষ্প হোয়ে উড়ে গিয়ে 'স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মিল হোল। ছবিটির মধ্যে ক্যামেরার কাজ এবং শব্দগ্রহণ ছাড়া উল্লেখযোগ্য আর কিছু নেই। ক্যামেরার কাজের মধ্যে বহিদৃশ্যের চিত্রগ্রহণ প্রশংসার যোগ্য। অভিনয়াংশে কেউ তেমন কোন বিশেষ উল্লেখযোগ্য নৈপুণ্য দেখাতে পারেন নি। ছবিতে ফণী রায়ের এবং স্বাগতার প্রসঙ্গ না আনলেও চলতো। ফণি রায়কে দিয়ে বোধ করি হাসাবার চেষ্টা করা হোয়েছিল। কিন্তু সে দৃশ্যে কোন হাস্যরস জমে ওঠেনি।

—পঞ্চভূত

এই তো সংসার

'অপরাধ'কে হাজার ঘষে মেজে নতুন করে চালাতে গেলে তা লোকসমাজে অপরাধই থেকে যায়, রাতারাতি নিরপরাধ হয়ে যায় না। বাংলার দর্শক যে তৃণভোজী জীব বিশেষ নন, গাঁড়াকল ধরবার মত তীক্ষ্ণতা যে তাঁদের আছে এটুকু বোঝবার মতও শক্তি নেই আলোচ্য চিত্রের প্রযোজক মশায়ের—এমনই বাসন্ত নিদ্রিত তাঁর মস্তিষ্ক। পুরাণো মালকে নতুন বলে চালু করার ধাপ্পাবাজিটা এতদিন চোরাকারবারের নর্দ্দমায় পড়ে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছিল, হঠাৎ দেখছি এই পাকা প্রযোজকমশায় সযত্নে সেই নীতিকে এনে চালিয়ে দিলেন ছবির বাজারে। চিত্র-জগতের ডাইরিতে আটানব্বইটি দুর্নীতির জঞ্জালে ধুরন্ধর প্রযোজকমশায়ের এই নবতম অপদানটি স্মরণীয় থাকবে সন্দেহ নেই। তবে ঘাবড়ে যাচ্ছি এই ভেবে—বর্ত্তমান প্লেগের বাজারে তাঁর মুষিক-সুলভ পূতিগন্ধপ্রীতি বাংলার দর্শক-মার্জ্জারেরা কতখানি বরদাস্ত করবেন! কারণ এর প্রতিকারের জাঁতিকল তো রয়েছে তাঁদেরই হাতে। ভদ্রলোককে একবার তাতে ফেলতে পারলে আশা করি ভবিষ্যতে এই গাঁজলা-ওঠা পুরোনো খেলোকে নয়া লেবেল সেঁটে পরিবেশনের স্পৃহা তাঁর উবে যাবে ইহজীবনের মত।

—ত্রিলোচন

ফ্যান

সন্তোষ কুমার দে

মেঘ না করিয়া ছায়া করে থাকে যদি
তেমনি বিষাদে ছেয়ে আছে নিরবধি
কাজলনয়না চম্পাবতীর মন।
শীতের শান্ত নদীর মতন
নিরালা বসিয়া ভাবিছে কি গৃহকোণে
ভাবিতেও আমি মুরছাই মনে মনে॥

মানে, আমি তারে ভালোবাসি, লাগে ভালো
তার ওই ছোট চিবুকের ঘন কালো
ছোট তিলটুকু—আহা যেন বিধাতাকে
সাধুবাদ দিতে পারি আমি কোন ফাঁকে।
চম্পাবতীকে পাঠালেন সযতনে
প্যাকেটে পুরিয়া আমা হেন এ রতনে॥

চেনেন নি তাঁকে? মন বুঝি তার 'ফ্যান'?
তবে মিছে আর কেন এতে কান ছ্যান্!
কাজলনয়না! ব্লকটি হয়েছে মাটি
কালো তিলে নাকি ব্লকে কালি গেছে সাঁটি!
ফ্রেমে এঁটে দিয়ে পারিনি করিতে পার
চম্পাবতীর মুখের দুখের ভার।

নুসপ্রিন্টে কি ছাপা হয় আর ভালো?
তবু তার ছবি মোর ঘর করে আলো॥

আশ্চর্য্য মলম (রেজি নং ৬৬৭) আবিষ্কারক

কবিরাজ শ্রীযুত কালীপদ দে

—বংশের আদি কথা—

বংশের আদি কথা

হাওড়া জেলার অন্তর্গত কদমতলা বিখ্যাত মার্টিন এণ্ড কোম্পানীর হাওড়া আমতা লাইট রেলওয়ের ষ্টেসন হওয়ায় এই স্থানের নাম পশ্চিম বঙ্গে বিশেষ সুপরিচিত। এই কদমতলা-নিবাসী—বিখ্যাত 'আশ্চর্য্য মলম' আবিষ্কারক, কবিরাজ শ্রীকালীপদ দের পূর্ব্ব পুরুষগণের আদি নিবাস নদীয়া জেলার অন্তর্গত চাঁদ সড়ক কৃষ্ণনগর। ইঁহারা ভরদ্বাজ গোত্র—দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থ। এই বংশের উর্দ্ধতম পুরুষ বীরেশ্বর দের তেজারতি ব্যবসা ছিল। তৎপুত্র তারানাথ দে কোন রাজ এষ্টেটের দেওয়ান ছিলেন। তিনি খাজনা আদায়ে বহির্গত হইয়া আদায়ীকৃত সব খাজনা রাজসরকারে জমা না দিয়া নিজ বাড়ীতেই লইয়া আসিতেন এবং রাজসরকারে খবর দিতেন যে খাজনা আদায় হয় নাই। এরূপে তিনি লক্ষ লক্ষ অর্থ উপার্জ্জন করিয়া নিজে বিপুল অর্থশালী হইয়াছিলেন। পরে তাঁহার এই অসদুপায়ে অর্থার্জ্জনের কথা রাজসরকারে প্রকাশিত হইয়া পড়িলে তিনি চাকুরী হইতে বিতাড়িত হন। পরে তিনি সপরিবারে পাটনায় যাইয়া বসতি করেন ও তথায় নূতন বাটী তৈয়ার করেন। তখন ই, আই, রেলওয়ে সবেমাত্র রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত খুলিয়াছে। বিপুল অর্থশালী তারানাথ পুত্রার্থে পর পর চারিবার বিবাহ করেন। কেবল কনিষ্ঠা পত্নী সৌদামিনীর গর্ভে তাঁহার এক পুত্র ও দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করে—এই জন্য আদর করিয়া তিনি পুত্রের নাম গোপালচন্দ্র রাখেন।

পিতা মাতার কথা

তারানাথের একমাত্র আদুরে পুত্র গোপাল চন্দ্র পাটনায় বিদ্যা শিক্ষা করেন। তিনি বাঙ্গালা, হিন্দী, উর্দ্দু, পারসী ও ইংরাজী এই কয়টি ভাষায় বুৎপত্তি লাভ করেন ও এণ্ট্রান্স পাশ করেন। কিন্তু এত জ্ঞান লাভ করিয়াও তিনি অসৎ সংসর্গে পড়িয়া পিতার বিপুল অর্থ অপব্যয় করিয়া উড়াইতে থাকেন। তিনি বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন, কিন্তু তাঁহার প্রথম পক্ষের স্ত্রী একটি কন্যা প্রসব করিয়াই মৃত্যুমুখে পতিতা হন এবং কন্যাটীও দুই এক দিন পরে মারা যায়। অতঃপর তিনি ই, আই, আর দানাপুর ডিষ্ট্রিক্টের ষ্টেসন মাষ্টার অনাদিনাথ মিত্রের জ্যেষ্ঠা কন্যা বসন্তকুমারীকে বিবাহ করেন। দ্বিতীয় বিবাহের পরও তিনি কুসংসর্গ ছাড়িতে না পারিয়া পিতার বিপুল অর্থ উড়াইতে থাকেন। ইহাতে কয়েক বৎসরের মধ্যে তাঁহার পৈতৃক বিত্ত নিঃশেষিত হইয়া যাওয়ায় এরূপ অবস্থা দাঁড়াইল যে তাঁহাদের দৈনন্দিন সংসার খরচ চালানও দুষ্কর হইয়া উঠে। ভগবানের সংসারে এরূপ নিয়ম যে, অসদুপায়ে অর্জ্জিত অর্থ কখনও স্থায়ী হয় না—"পাপের ধন" প্রায়শ্চিত্তে যায়, তারানাথের পাপার্জ্জিত অর্থ এরূপে কর্পূরের মত উড়িয়া গেল। ক্রমে গোপালচন্দ্রের অবস্থা এরূপ হইল যে, তাঁহার একমাত্র পুত্র কালীপদ দের জন্ম গ্রহণের পর আঁতুড় ঘরের খরচ চালানও তাঁহার পক্ষে দায় হইল। ইহাতে তাঁহার গভীর বৈরাগ্যের সঞ্চার হইল এবং তিনি সংসার পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করতঃ সংসারের ঝঞ্ঝাট হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলেন। তাঁহার স্ত্রী বসন্তকুমারী সংসার অন্ধকার দেখিলেন।

কালীপদর বাল্য কথা

কালীপদ আঁতুড় ঘরে থাকা কালেই তাঁহার জননী বসন্তকুমারী দৈন্য প্রপীড়িতা হইয়া তাঁহাকে লইয়া পিত্রালয়ে চলিয়া যান। লোকে বলে, আঁতুর ঘরের ছেলে কোথাও লইয়া যাইতে নাই। কিন্তু নিতান্ত দরিদ্রতাবশতঃ তাঁহাকে মাতুলালয়ে লইয়া আসা হয় এবং তথায়ই তিনি লালিত পালিত হন। ইহাকেই বলে—"রাখে কৃষ্ণ মারে কে ?"

শিশু কালীপদ মাতুলালয়ে মাতুলদের এঁটো ভাত খাইয়া ও তাঁহাদের জীর্ণবস্ত্র পরিধান করিয়া শৈশব কাটাইতে লাগিলেন। তাঁহার মাতা তাঁহাকে সহ পিত্রালয়ে আসিয়া আশ্রয় লইয়া সাংসারিক ছোট বড় যাবতীয় কাজই করিতে করিতে একমাত্র স্নেহের পুতুলী কালীপদকে মানুষ করিতে লাগিলেন। ইহাতে সারা দিনের পরিশ্রম ও অনিয়ম জন্য তাঁহার স্বাস্থ্যহানি হইতে থাকে। ইহার পরিণাম এই হইল যে, তিনি পিত্রালয় হইতে বিতাড়িত হইলেন। তাঁহার মাতা তাঁহাকে ও দৌহিত্র কালীপদকে লইয়া গ্রহণ উপলক্ষে ৺কাশীধামে যান। তথায় যাইয়া গোপালচন্দ্রের পত্নী তাঁহার মাতাকে বলেন যে, আমার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়াছে—তোমাদের কোন কাজে আসিব না, এখন আমি ও আমার পুত্র এখানে থাকিয়া ভিক্ষা দ্বারা প্রাণ ধারণ করিব—বাবা বিশ্বেশ্বর আমাদিগকে রক্ষা করিবেন। কিন্তু তাঁহার মাতা তাঁহাকে ও দৌহিত্রকে মীরাঘাট উদাসী আশ্রমের মহান্ত মহারাজ বাবা দ্বারিকাদাসের নিকট তাঁহাদিগকে সমর্পণ করিয়া দেন। উক্ত সাধু মহান্ত কালীপদকে দেখিয়াই বলেন যে, "এই বালকের ললাটে বিশেষ শুভ চিহ্ন রহিয়াছে—কালে এ ভাগ্যবান পুরুষ হইবে এবং ইহার দ্বারা জগতের বহু লোকের প্রভূত উপকার সাধন হইবে। এজন্য আমি ইহাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিয়া আশ্রমেই লালন পালন করিব ও শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করিব।" এই বলিয়া মাতা পুত্রকে তিনি মন্ত্র দান করিয়া

কালীপদকে পুত্র নির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। এরূপে তিনি কালীপদের আশ্রয় দাতা মন্ত্র-দাতা গুরু, অন্ন দাতা পিতা ও পথপ্রদর্শকরূপে তাঁহাকে মানুষ করেন।

বিদ্যাশিক্ষা ও কর্ম্মজীবনের সূচনা

গুরু মহান্ত মহারাজ কালীপদকে ৺কাশীধামে—ভারতের রাষ্ট্র জগতে সুপরিচিতা মিসেস্ এনি বেশন্তের হিন্দু স্কুলে (এক্ষনে ইহা হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়রূপে পরিণত) ভর্ত্তি করিয়া দেন। লেখাপড়া শিক্ষার সঙ্গে হিন্দুস্থানী বালকদের সাহচর্য্যে থাকায় কালীপদর শারীরিক কসরৎ ও ব্যায়াম ইত্যাদি শক্তি চর্চ্চাও চলিতে লাগিল। ইহাতে হিন্দুস্থানী বালকের মতই তাহার চেহারা সুদৃশ্য ও হৃষ্টপুষ্ট হইল। সাংসারীক চিন্তাশূন্য কালীপদর বাল্যজীবন আশ্রমে বেশ আমোদ আহ্লাদেই কাটিতে লাগিল। কিন্তু এই সুখও তাহার ভাগ্যে বেশী দিন ঘটিল না। তিনি গুরু মহান্ত মহারাজের অতি প্রিয় পাত্র—পুত্রতুল্য ছিলেন। আশ্রমের সকলেই ইহাতে তাঁহাকে হিংসা করিতে লাগিল—পাছে মহান্ত মহারাজ তাঁহাকেই আশ্রমের এষ্টেটের মালিক ও মহান্তের গদীতে বসাইয়া যান। আশ্রমের সকলেই তাঁহাকে নানারূপে জ্বালাতন—'নর্য্যাতন করিত—সর্ব্বদাই গালিগালাজ ও ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করিত। কেবল গুরু মহারাজই তাঁহাকে স্নেহের চক্ষে দেখিতেন এবং তাঁহাকে উঁহাদের প্রদত্ত কোন ভক্ষ্য দ্রব্যাদি খাইতেও নিষেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু বিনা মেঘে বজ্রঘাতের মতই হঠাৎ একদিন গুরু মহারাজের ৺প্রাপ্ত ঘটিলে মাতৃ-পিতৃহীন অনাথ বালক কালীপদর সুখের স্রোতে একেবারে ভাঁটা পড়িল—তিনি পুনরায় দুঃখ দৈন্যের অতুল সমুদ্রে নিমজ্জমান হইয়া আশ্রমবাসীদের নিত্য কটুক্তি ও জ্বালাতন হইতে উদ্ধার পাইবার সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন। সুযোগও ঘটিয়া উঠিল। সেই সময়ে পাঞ্জাব অঞ্চলে N. W. Ry.এ বিস্তর সিগ্‌নেলারের শিক্ষানবীশ দরকার হইয়াছিল। তাঁহার কোন বাল্য বন্ধুর নিকট হইতে খবর পাইয়া ঐখানে দরখাস্ত করেন এবং কয়েক দিন পরেই চাকুরীতে যাইবার আদেশপত্র আসে। তিনি কোন রূপে পাথেয় স্বরূপ কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া সুদূর পাঞ্জাবে মাত্র ১৬ বৎসর বয়সে চাকুরী করিতে গেলেন। অসাধারণ দক্ষতাবলে তিনি সিগ্‌নেলারের কাজ করিতে করিতে দুই বৎসর পরেই ষ্টেসন মাষ্টারের পদে উন্নীত হন এবং এই পদে ইং ১৯০৭ সাল হইতে ১৯১২ সাল পর্য্যন্ত পাঁচ বৎসর কার্য্য করেন।

বিবাহ ও কর্ম্মত্যাগ

ষ্টেসন মাষ্টারের পদে থাকা কালে কালীপদ পাটনা নিবাসী ৺যদুনাথ ঘোষের কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী ননীবালাকে বিবাহ করেন। অতঃপর তিনি পত্নীর পরামর্শে পাঞ্জাবের কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া গয়া জেলায় E. I. Ry এর বিলভিং ষ্টেসন মাষ্টারের কর্ম্ম গ্রহণ করেন। এইখানে এক বৎসর কার্য্য করার পর তিনি হাজারীবাগে ষ্টেসন মাষ্টার হইয়া বদলী হন। হাজারীবাগে রেলওয়ে কর্ম্মচারী ও রেলওয়ে পুলিশের মধ্যে যাত্রিগণ হইতে নানাপ্রকার ঘুষ লইবার অভ্যাস ছিল। কালীপদ জীবনে কখনও অসৎ উপায়ে অর্থোপার্জ্জন করিবেন না—এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। কিন্তু ষ্টেসনের অপরাপর কর্ম্মচারীরা তাঁহাকে ঘুষ লইবার অসৎ পথে প্ররোচিত করিবার জন্য নানাপ্রকারে প্রলোভন দেখাইতে লাগিল। তাহারা বলিতে লাগল যে, duty শেষে বাড়ী ফিরিবার সময় অন্ততঃপক্ষে দৈনিক ১০.১২ টাকা পকেট ভর্ত্তি করিয়া লইয়া যাইতে পারিবেন। এরূপ প্রলোভনেও রাজী না হইলে অবশেষে সকলেই তাঁহার বিরুদ্ধ ঘোষণা করিল দেখিয়া তিনি অগত্যা রাজী হইলেন। একদিন অতি নিঃস্ব দরিদ্র এক কুলী মাত্র ২৷৹ লইয়া টিকিটের জন্য আসিলে তাহার নিকট হইতেও পাহারওয়ালা পুলিশ জোর করিয়া ঘুষ আদায় করিয়া লয়। সে একেবারে নিঃসম্বল হইয়া ষ্টেসনে বসিয়া কাঁদিতে থাকিলে কালীপদর তাহা নজরে পড়ে এবং তিনি নিজ পকেট হইতে তাহার খাবার খরচ ও কাপড় চোপড় দিয়া তাহাকে ট্রেনে তুলিয়া দেন। এই ঘটনা হইতে তিনি বুঝিলেন যে, রেলওয়ে ষ্টেসনে যত নিঃস্ব দরিদ্র ও অশিক্ষিত লোকেরাই বেশীর ভাগ লাঞ্ছিত হইয়া থাকে এবং সেই হইতে তিনি ঘুষ লইবেন না বলিয়া 'ভীষ্মের মত প্রতিজ্ঞা' করিলে ষ্টেশনের সকল কর্ম্মচারী তাঁহার উপর চটিয়া গেল। তখনও তিনি এই আপদ হইতে রেহাই পাইবার জন্য ইসরী (বর্ত্তমান পরেশনাথ) নামক ছোট ষ্টেশনে বদলী হইয়া গেলেন এবং ইহার কিছুদিন পরেই পরের অধীনে আর কাজ করিবেন না বলিয়া কর্ম্ম ত্যাগ করিলেন।

প্রথমেই তিনি ঝরিয়ার কলিয়ারীতে কাঠের 'অর্ডার সাপ্লাই' আরম্ভ করেন। এক বৎসরেই তিনি এই ব্যবসায়ে এত উন্নতি করিয়াছিলেন যে, নিজে সব দিক সামলাইতে না পারিয়া তাঁহার এক আত্মীয়কে আনাইয়া ঐ ব্যবসা দেখা শুনা করিবার জন্য রাখেন। কিন্তু এই ব্যক্তি নিজের স্বার্থ সিদ্ধ করিতে যাইয়া ব্যবসাটি একেবারে নষ্ট করিয়া দেন। পরে কালীপদ অভ্রের ব্যবসা আরম্ভ করেন, কিন্তু এই ব্যবসাতেও সর্ব্বস্বান্ত হইয়া একেবারে পথের ভিখারী হন। তখনও তিনি পত্নী ও পুত্র কন্যাকে শ্বশুরবাড়ী পাঠাইয়া দিয়া চাকুরীর অন্বেষণে বহির্গত হইলেন। অচিরে তিনি E. B. Ry.এর শিয়ালদহ লাইনের সেণ্ট্রাল ডিষ্ট্রিক্টে মাত্র ৩৬ টাকায় 'রিলিভিং' ষ্টেশন মাষ্টার হইয়া ঢুকিলেন। তাঁহার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া এজেণ্ট সাহেব অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহাকে ৮০ টাকা বেতনে আসামের লালমানরহাট ষ্টেশনে বদলী করেন। সেই সময় অর্থাৎ ১৯১৯ সালে তৃতীয় আফগান যুদ্ধে বিস্তর ষ্টেশন মাষ্টারের দরকার হওয়াতে এবং কালীপদ পূর্ব্বে N. W. R. এর পাঞ্জাব অঞ্চলে কাজ করায় ঐ অঞ্চলের অভিজ্ঞতা থাকায় তাঁহাকে কোয়েটায় পাঠান হয়। সেখানে কিছুদিন থাকার পর তথাকার জলবায়ু সহ্য না হওয়ায় তিনি ঐ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসেন।

ব্যবসা – পুনরায় কর্ম্মগ্রহণ ও ত্যাগ

কর্ম্মত্যাগের পর তিনি মধুপুরে যাইয়া জঙ্গল লীজ লইয়া পুনরায় কাঠের ব্যবসা ও [illegible]

ব্যবসা আরম্ভ করেন। এই ব্যবসায়ে প্রথম প্রথম বেশ উন্নতি লাভ হয়, কিন্তু পরিশেষে লোকসান হওয়ায় সর্ব্বস্বান্ত হন। এই সময় অর্থাৎ ১৯২২ সালে রেলওয়ে কোম্পানীগুলি বড় লাইনের জন্য নিয়ম করিলেন যে, যে সমস্ত কর্মচারী স্বেচ্ছায় কর্ম্মত্যাগ করিয়া প্রভিডেণ্ড ফণ্ডের' টাকা লইয়া গিয়াছে, তৎসমুদয় জমা না দিলে পুনরায় চাকুরী পাইবে না। তখন তিনি বাধ্য হইয়া মার্টিন কোম্পানীর হাওড়া আমতা লাইনে মাত্র ৩০ টাকা বেতনে 'রিলিভিং' ষ্টেশন মাষ্টার পদে ভর্ত্তি হইয়া কদমতলা ষ্টেশনের ভার প্রাপ্ত হন। কদমতলা ষ্টেশন কর্ম্মচারীদের পক্ষে নানা দিক দিয়াই সুবিধাজনক। তাঁহার মত একজন জুনিয়র কর্ম্মচারীকে প্রথমেই ঐ ষ্টেশনের ভার দেওয়ায় ঐ লাইনের সমস্ত ষ্টেশনের সিনিয়র মাষ্টারেরা অনুযোগ করিতে থাকে। ইহাতে কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে সরপ নামক ক্ষুদ্র ষ্টেশনে বদলী করায় তিনি ক্ষুণ্ণ হইয়া নিজের ভবিষ্যতের জন্য কোন প্রকার চিন্তা না করিয়াই নিজের ৩০ বৎসরের গবেষণালব্ধ কবিরাজী ব্যবসায়ের জন্য কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন।

কবিরাজী ব্যবসা ও "আশ্চর্য্য মলমে"র আবিষ্কার কথা

কালীপদ যখন কর্ম্মত্যাগ করেন, তখন তাঁহার সম্পূর্ণ নিঃসম্বল অবস্থা। তদুপরি মাথার উপর তিনটী কন্যা (তন্মধ্যে একটি বিবাহ যোগ্যা), একটি পুত্র ও পত্নীর ভরণ পোষণের ভার রহিয়াছে প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডের টাকা যাহা সামান্য পাওয়া গিয়াছিল তাহা দেনা পরিশোধ করিতেই নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে উপরন্তু মাসে ২৫ টাকা করিয়া তিন মাসের বাড়ী ভাড়া পড়িয়াছে। আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব কাহারও নিকট এক কপর্দ্দকও ধার মিলিল না এরূপ অবস্থায় অন্য লোক হইলে পাগল হইয়া যাইত বা আত্মহত্যা করিত; কিন্তু কালীপদর সততা, পরিশ্রম, আত্ম বিশ্বাস ও ভগবানে ভক্তি—এই চারিটী নীতিগর্ভ শব্দে বিশ্বাস ছিল অগাধ। তিনি যখন কর্ম্মত্যাগ করেন, তখন তাঁহার স্ত্রীর হাতে মাত্র দুগাছা সোনার শাঁখা ছিল। শাঁখা দুগাছা তিনি পাড়ার কোন পরিচিতের নিকট বন্ধক রাখিয়া মাত্র ৬৲ টাকা মূলধন সংগ্রহ করিলেন। এস্থলে বলা উচিত যে, সংসার-সমুদ্রের প্রবল বাত্যাবিক্ষোভে অনেক উত্থান-পতনের ভিতর দিয়াই কালীপদর জীবন-তরণী অগ্রসর হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার যোগ্যা সহধর্ম্মিণী "যোগ্য কর্ণধার" রূপে তাঁহার জীবন তরণী অতলে নিমজ্জিত হইতে না দিয়া বরাবরই রক্ষা করিয়াছেন। এবারও যখন কালীপদ পত্নীর নিকট তাঁহার শাঁখা দুগাছা বন্ধক দিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন, তখন সতী সাধ্বী সহধর্ম্মিণী কিছুমাত্র ম্রিয়মান না হইয়া সহস্তে তাহা খুলিয়া স্বামীর হাতে দিয়া তাঁহাকে নূতন ব্যবসায়ে উৎসাহিত করিলেন। কালীপদও উহা বন্ধক দিয়া মাত্র ৬৲ টাকা মূলধন সংগ্রহ করিয়া তাঁহার জগদ্বিখ্যাত "আশ্চর্য্য মলম" আবিষ্কারে ব্রতী হইলেন। তাঁহার ৩০ বৎসরের সাধনার ধন—স্বপ্নের বস্তু আজ বাস্তব সত্যে পরিণত হইতে চলিল।

"আশ্চর্য্য মলমের" ইতিহাস

কালীপদ যখন বাল্যকালে পবিত্র কাশীধামের মীরঘাট "উদাসীর মঠে" মহাত্মা মহারাজের আশ্রমে ছিলেন, তখন সেই মহাত্মা গুরু মহারাজ তাঁহাকে দীক্ষা দানের পর হইতে নিজ আশ্রমে রাখিয়া শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় গাছ-গাছড়া হইতে কবিরাজী প্রক্রিয়া মতে কতকগুলি প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ ঔষধ প্রস্তুতের প্রক্রিয়া ও শিক্ষা দেন। আশ্চর্য্য মলম সেই উদাসী আশ্রমের মহাত্মা মহাপুরুষেরই প্রথম অবদান। তাঁহার তিরোভাবের পর কালীপদ যখন ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে ত্রিশ বৎসর ধরিয়া ভারতের নানাস্থানে চাকুরী করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইলেন, তখন বহু লোককে এই ঔষধ বিনামূল্যে প্রদান করিয়া ইহার গুণাগুণ পরীক্ষা করেন। তারপর ১৯২৫ সালে শেষ কর্ম্মত্যাগের পর যখন তাঁহার চরম দৈন্যদশা উপনীত হইল তখন তিনি পত্নীর শাঁখা বন্ধকলব্ধ ঐ ৬৲ টাকা মাত্র মূলধনে এই অত্যাশ্চর্য্য প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ ঔষধ পুনরায় প্রস্তুত করিয়া হাওড়া ও কলিকাতার উপকণ্ঠস্থিত গঙ্গাতীরবর্ত্তী মিল অঞ্চলে মিলফেরতা কুলিদের নিকট বক্তৃতা দিয়া বিক্রয় করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ইহাতে তাঁহার বেশ দুপয়সা আসিতে লাগিল—উৎসাহও বাড়িল। ক্রমে তিনি হাওড়া, আমতা লাইনে বি, এ, আর, ই, আই, আর লাইনে চলন্ত গাড়ীতে বক্তৃতা দিয়া ফিরি করিয়া বিক্রি করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার ঔষধের কাটতি এরূপ অসম্ভবরূপে বৃদ্ধি পাইল যে তাঁহাকে বিস্তর ক্যানভাসার নিযুক্ত করিতে হইল। এক্ষনে কেবল তাঁহার ঔষধ বিক্রয়ের আয় হইতেই নানা জাতীয় ৪।৫ শত ক্যানভাসার ও তাহাদের পরিবারবর্গের ভরণপোষণ হইতেছে। হাওড়ার কদমতলায় তিনি বৃহৎ ত্রিতল বাটী নির্ম্মাণ করিয়াছেন এবং প্রত্যেক কন্যার বিবাহের জন্য ৩।৪ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া তিনটি কন্যাকেই উচ্চ কায়স্থ বংশে পাত্রস্থ করিয়াছেন এবং দুই জামাতাই তাঁহার ডিস্পেন্সারীতে কাজ করিতেছেন। এক্ষনে তাঁহার ঔষধালয়ে গুরু মহাত্মা মহারাজের নিকট হইতে শিক্ষালব্ধ কবিরাজী প্রক্রিয়া মতে আরও বহু ঔষধ প্রস্তুত হইয়াছে ও হইতেছে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের নানা প্রকার সংবাদপত্রে মাসে ৪।৫ শত টাকার বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইতেছে। কদমতলার প্রকাশ্য রাস্তায় যাঁহারা বকেয়া বাড়ী ভাড়া পাওনা টাকার জন্য তাঁহাকে অপমানিত করিয়াছিল, তাঁহারাই আজ তাঁহার নিকট উপকৃত।

বর্ত্তমানে কবিরাজ দে মহশয়ের ইচ্ছা যে, তাহার স্বর্গীয় মাতা জীবনে অনেক কষ্ট পাইয়া গিয়াছেন বলিয়া তিনি মাতৃ নামে "আশ্চর্য্য মলম বসন্ত কুমারী হাঁসপাতাল" ও তৎসঙ্গে বঙ্গদেশে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার প্রচার কল্পে একটি আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সংকল্প করিয়াছেন। ভগবান তাঁহার সাধনা সিদ্ধি করিয়া মনস্কামনাপূর্ণ করুন।

৪০।২, লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী লেন, ব্রাঞ্চ :—রুম নং ৫১, ১০।১১ সারকুলার রোড,

শেষ অঙ্ক

সলিল সেনগুপ্ত

অবশেষে শেষ অঙ্কে আসিয়া পৌছিয়াছি আর একটু ধৈর্য্য ধরুন, একেবারে যবনিকা পতন অবধি দেখিয়া যান।

একটু পূর্বাভাষ দিই, নইলে পরিণতিটা বুঝিবেন না।

একটা ব্যাঙ্কের ডেভেলপমেন্ট অফিসার ছিলাম—ব্যাঙ্কের একটাই অফিস—তাহার জন্য ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, এজেন্ট, লেজার কিপার, অ্যাকাউন্ট্যান্ট, ক্যাশিয়ার, পেয়াদা, চাপরাশি আরও কতো কি ছিলো—আর ছিলো ডেভেলপমেন্ট অফিসার, সে আর কেউ নয়, স্বয়ং আমি—বলতে কইতে নাকি আমি বিশেষ দক্ষ। অতএব ম্যানেজিং ডাইরেক্টর অনেকের মধ্যে বাছিয়া আমাকেই নিযুক্ত করিলেন।

আমার কাজ লোকজন ভজাইয়া তাহাদের টাকা আমাদের ব্যাঙ্কে রাখিবার ব্যবস্থা করা—কিছুদিন যাইবার পর বুঝিলাম যাহাদের কাছে আমি যাতায়াত করি তাহারা সকলেই আমা অপেক্ষা বেশী বুদ্ধিমান—নিজেদের টাকা কোথায় জমা রাখিতে হইবে সে সম্বন্ধে আমার উপদেশ শুধু নিষ্প্রয়োজন নয়—অবাঞ্ছনীয়!

এজেন্ট একদিন শুধাইলেন, "আপনার নিজের কিছু নেই?"

অপ্রস্তুত হইয়া বলিলাম—"নিতান্ত যৎসামান্য"

"তাতে কি? তাই এনে জমা দিন—আপনি নিজেই যদি ব্যাঙ্কে টাকা জমা না রাখেন তবে আর পাঁচজনে রাখবে কেন? হজরতের সন্দেশ খাওয়ার গল্প পড়েন নি—?"

পড়িয়াছি। কিন্তু আমার উপর যে ইহার প্রয়োগ হইবে, তখন তো ভাবি নাই!

যাহা কিছু ছিলো আনিয়া জমা দিলাম—এজেন্ট খুব । ভদ্রলোক ব্যাঙ্কটিকে বড় ভালোবাসিতেন। কেউ টাকা জমা দিলে খুশী হইতেন আবার চেক কাটিলে অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে client-এর আপাদ মস্তক দেখিয়া লইতেন।

আমার টাকা জমা পাড়বার কিছুদিন পরে একদিন আফিসে গিয়া দেখি দরজায় তালা, আর কাছাকাছি পুলিশের সিপাইরা বসিয়া খইনি টিপিতেছে। খোঁজ নিয়া জানিলাম সকলেই চেক কাটিয়া টাকা উঠাইয়া লয় বলিয়া এজেন্ট সমস্ত টাকা নিয়া একটু গা ঢাকা দিয়াছেন—সময় হইলে আবার দোর খুলিবেন।

এজেন্টের প্রতি আমার শ্রদ্ধা বাড়িয়া গেল। সত্যিই ব্যাঙ্কটিকে তিনি ভালোবাসিতেন।

ব্যাঙ্কে কাজ করিবার ফলে 'বলতে কইতে' আরও দক্ষ হইলাম—অতএব এক বিজ্ঞাপনের এজেন্সীতে ম্যানেজারী পদ লাভ হইলো। সত্বাধীকারী মহাশয় অমায়িক হাস্যে মুখ উজ্জ্বল করিয়া বলিলেন "আপনার ওপর আমার কোম্পানীর ভবিষ্যত নির্ভর করছে, অবশ্য আমি অনুপযুক্ত লোকের ওপর ভার দিই নি—তবু একটু বলে রাখলুম।"

ভবিষ্যত কতোদূর নির্ভর করিতেছিলো সেদিন বুঝিলাম যেদিন সত্বাধীকারী আমার হস্তে কয়েক দিস্তা বিলকভার দিয়া বলিলেন "বিল কলেক্টরেরা একটা পয়সাও আদায় করতে পারছেন না—আপনি একটু দেখুন তো—?"

ম্যানেজার হইতে বিল-কলেক্টরে রূপান্তর ঘটিলো—টাকা আদায়ে বাহির হইলাম।

যাঁহারা আমাদের কাছে টাকা রাখিতেন তাঁহারা দেখিলাম সবাই সিদ্ধ পুরুষ। আমি কখন যাইব পূর্বাহ্নেই তাহা টের পাইতেন এবং বিশেষ কোন জরুরী কাজে বাহির হইয়া যাইতেন—কখন ফিরিবেন, সেদিন ঠিক আদপেই ফিরিবেন কিনা তাহার কোনো স্থিরতা থাকিত না।

অনেক কষ্টে একজনকে ধরিলাম। মাথার তেলের ব্যবসা। প্রচুর বিজ্ঞাপনের টাকা জমিয়া গিয়াছে।

বলিলাম "এবার কিছু না দিলে তো চলছেনা"।

ভদ্রলোক একটু হাসিলেন—সে হাসির প্রকৃত অর্থ

এম, পি'র সভ্যমুক্ত ছবি "বিদ্যাসাগর" এর একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্যে পাহাড়ী, রেনুকা প্রভৃতি

সুদর্শন নট উত্তমকুমার কোনো চাঞ্চল্যকর কাহিনী সুরু ক'রে ভারতী, অলকা ও কমল মিত্রকে আবিষ্ট করেছেন বোধ হয়।

চিত্র : অগ্রদূত পরিচালিত আগামী 'সহযাত্রী'। এম পি।

আজও বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। ডাকিলেন "নীবু—!" যে ঘরে কথা হইতেছিল সেই ঘরেই তিনি তৈল প্রস্তুত করিতেন। এক কোণে থরে থরে বোতল সাজান আছে। একজন অল্পবয়সী ভদ্রমহিলা আসিয়া প্রবেশ করিলেন। ভদ্রলোক পরিচয় করাইয়া দিলেন—নীবু অর্থাৎ ভদ্রমহিলা তাঁহার স্ত্রী আর আমি অমুক কোম্পানীর ম্যানেজার, টাকার তাগিদে আসিয়াছি। ভদ্রমহিলাও হাসিলেন। তার পর অতর্কিতে আমার সামনে আসিয়া আমার নাকের কাছে মাথাটা নীচু করিয়া ধরিলেন।

বাল্যকালে একবার গরু গুঁতাইয়া দিয়াছিলো। তার পর অদ্যাবধি সেই জীবটিকে তফাৎ রাখিয়া চলি। কিন্তু সেদিন প্রস্তুত ছিলাম না—আতঙ্কে দুই পা পিছাইয়া গেলাম। নীবু দেবী মধুর হাসিয়া বলিলেন "কেমন লাগলো?"

আমি তখনও সামলাইয়া উঠি নাই। তিনি আবার প্রশ্ন করিলেন "ব'ললেননা মাথার তেলের গন্ধটা কেমন লাগলো?"

ঢোক গিলিয়া বলিলাম :—"বেশ লাগলো"

অভিমানে নীবুর কণ্ঠ ভারী হইয়া উঠিলো "তবে কেন আমাদের তৈল কেউ কেনেনা? কিনলেও পয়সা বাকি ফেলে যে?" নীবুর চোখ দুটি সজল হইয়া আসিতেছে দেখিয়া নগদ দাম দিয়া এক শিশি তৈল কিনিয়া নিঃশব্দে সরিয়া পড়িলাম। মনে হইলো পশ্চাতে কেহ খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতেছে। হাসুক তাই বলিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া নীবুর কান্না সওয়া যায়না।

আর একটি ঘটনা মনে পড়ে। এই ভদ্রলোককে কেহ ধরিতে পারিতোনা। তিনি সর্বদাই বাড়ীর বাহিরে।

তখন শীতকাল, ঘড়িতে এলার্ম দিয়া ভোর সাড়ে পাঁচটার সময় ভদ্রলোকের দরজার বাহিরে গিয়া দাঁড়াইলাম। চাঁদ অনেকক্ষণ সরিয়া পড়িয়াছে, অন্ধকারে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া নিজের ভাগ্যকে ধিক্কার দিতেছি।

খুট্ করিয়া দরজা খুলিয়া গেলো। ধীরে ধীরে ভদ্রলোক বাহিরে আসিলেন। আমি একটু আগাইয়া গেলাম। ভদ্রলোক চিৎকার করিয়া উঠিলেন "কে?"

তাঁহার গলায় ঘড়ঘড় আওয়াজ হইতে লাগিল। বুঝিলাম ভদ্রলোক ভয় পাইয়াছেন। আমি আর একটু আগাইয়া গেলাম। বলিলাম, "আমি! চিনতে পারছেন না?"

ভদ্রলোক : ওরে বাবারে মেরে ফেল্লোরে!

আমি আশ্বাস দিয়া ব'লিলাম "ভয় নেই, বিলের তাগিদে এসেছি—"

ভদ্রলোক :—"বিলের তাগিদে? ও! আপনি!"

এবার ভদ্রলোক ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন—"তা বিলের তাগিদে এই অন্ধকারে কেন?"

আমি কুণ্ঠিত হইয়া ব'ললাম "আলোয় যে আপনাকে দেখা যায়না—"

ভদ্রলোকের চেঁচামেচিতে আশে পাশের বাড়ীগুলি হইতে লোকজন আসিয়া জড় হইয়াছিলো। বেশ কিছুক্ষণ আমি বুঝিতে পারিনা কী হইয়াছে—একসময় পা দুটি আপনি দৌড়াইতে লাগিলো। জামা কাপড়ের খানিকটা খানিকটা রহিয়া গেলো।

পরদিন আফিসে গিয়া দেখি স্বত্বাধীকারী ছিপ নিয়া মাছ ধরিতে চলিয়াছেন। সহানুভূতি সূচক শব্দ করিয়া বলিলেন "শুনলুম খুব মেরেছে আপনাকে—আমাদের এক বিল কলেক্টরকেও খুব মেরেছিলো—লোকটা পাকা শয়তান! ওর ফাঁসি হওয়া উচিত—আচ্ছা আমার আবার ট্রেনের সময় হ'য়ে গেলো—"

সছিপ স্বত্বাধীকারী একটু দ্রুত বাহির হইয়া গেলেন।

এখন সিনেমার গল্প লিখি। পত্রিকায় লিখিতাম, তাহারা পয়সা দেয় না তাই, ষ্টুডিও হইতে ষ্টুডিও, প্রযোজকের দোরে দোরে গল্প নিয়া ফিরি করি। সব রকম গল্প আছে, ট্রাজেডি, কমেডি, স্যাটায়ার, এণ্টারটেইনমেণ্ট কিন্তু প্রযোজকরা সবাই নোতুন কিছু করিতে চান। সকলেরই নিজের নিজের আইডিয়া, নিজের নিজের 'থিম্' আছে, সবগুলি ভরে লিখিয়া উঠিতে পারেন না!

এখন এমন একজন প্রযোজককে খুঁজিয়া ফিরিতেছি যাঁহার নোতুন কিছু করিবার শখ্ নাই, যথেষ্ট সময় আছে—তবু লিখিবার কোনো প্রচেষ্টা নাই—সাইকোলোজিটা একটু কম বোঝেন—এবং "ড্রামা Sense এর কোনো বালাই নাই। সর্বোপরি গল্প লিখাইয়া পয়সা দেন। আপনারা কেহ জানেন কি?

স্টিরিওস্কোপি

নিমাই ঘোষ

Stereoscopic বা Three-dimension photographyর principle বা মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে 'চিত্রবাণী'র গত সংখ্যাতেই বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এই বিশেষ ধরণের ছবি দেখবার উপায় হিসেবে কেবল viewer-এর নামই উল্লেখ করা হয়েছিল।

Viewerই কিন্তু Stereoscopic ছবি দেখার একমাত্র উপায় নয়। এই বিশেষ ধরণের ছবি দেখার আরো দু'একটা পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে, যার সাহায্যে Three-dimensional effect ছবির মধ্যে পাওয়া যায়।

Anaglyph method হোল তার একটা এবং এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। এখন কথা হচ্ছে, method বা প্রয়োগ প্রণালী যাই হোক না কেন, মূলতত্ত্বের উপর ভিত্তি করেই তাদের সৃষ্টি করা হয়। কাজেই Anaglyph সম্বন্ধে খুঁটিনাটি আলোচনায় যাবার আগে মূলতত্ত্বের সারাংশের কিছুটা পুনরাবৃত্তি করা প্রয়োজন মনে করি।

Stereoscopic ছবি দুই Lens যুক্ত Cameraতে তোলা হয়। Lens দুটি ২½" ইঞ্চি তফাতে fit করা। একই দৃশ্যের দুটো ছবি ওঠে, ছবি দুটির মধ্যে পার্থক্য থাকে। একটি "ডান চোখো ছবি" অপরটি "বাঁ চোখো", এই পৃথক ছবি দুটি দুই চক্ষুকে পৃথকভাবে দেখানো হয়। যাতে "ডান চোখো" ছবি কেবল ডান চোখই দেখে, বাঁ চোখ না দেখে এবং "বাঁ চোখো" ছবি যেন কেবল বাঁ চোখই দেখে, ডান চোখ দেখতে না পায়। এখন এই সমস্যার সমাধান যে ভাবেই করি না কেন, তার ফলে আমরা ছবির মধ্যে পাবো Stereo-Three-dimensional effect.

দুটি রংয়ের পরস্পরবিরোধিতার সুযোগ Anaglyph পদ্ধতির মধ্যে সুকৌশলে গ্রহণ করা হয়েছে। দুটি রঙিন কাঁচের আলোক বিজ্ঞানসম্মত প্রয়োগ কৌশলের মধ্যেই Anaglyph-এর রহস্য নিহিত, তাই দুটি Colour filter এর সাহায্যে উপরোক্ত সমস্যার সমাধান করা হয়। দুটি রংয়ের ভেতর একটি Blue-green,—নীলাভ-সবুজ ও অন্যটি Red,—লাল। কোন কোন ক্ষেত্রে খাঁটি নীল বা খাঁটি সবুজও ব্যবহার করা যায়।

এখন এই বিশেষ দুটি রংয়ের কাঁচ (filter) ব্যবহার করার মূলে কি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব রয়েছে—যাকে ভিত্তি করে Anaglyph এর সৃষ্টি,—সে সম্বন্ধে একটা মোটামুটি জ্ঞানের এবং ধারণার প্রাঞ্জলতার সৃষ্টি করতে না পারলে—আলোচনা এগিয়ে নিয়ে যাবার কোন সার্থকতাই থাকবে না। কাজেই একটা পরীক্ষার (experiment) কথা এইখানে উল্লেখ করার প্রয়োজন বোধ করছি। যথা :—

একটি সাদা কাগজে যদি পাশাপাশি দুটি আঁচড় কাটি, একটি নীল এবং অন্যটি লাল,—রং দুটি যেন গাঢ় না হয়—হাল্কার ওপরেই থাকে। এইবার একটি "নীল" কাঁচের ভেতর দিয়ে ঐ আঁচড় দুটি দেখলে, দেখবো যে নীল রংয়ের 'দাগ'টি অদৃশ্য হয়ে সাদার সঙ্গে মিশে গেছে কিন্তু লাল দাগটি অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে এবং লালচে ভাব বদলে গিয়ে বেশ "কালচে" দেখাচ্ছে। এইবার নীল কাঁচের বদলে লাল কাঁচের মধ্যে দিয়ে দেখলে, দেখতে পাবো—ব্যাপারটা যেন উল্টে গেলো। অর্থাৎ লাল আঁচড়টি অদৃশ্য কিন্তু নীল দাগটি স্পষ্ট এবং কালো রংয়ের বলে মনে হচ্ছে। কারণ কি? কারণ—চোখের ওপর লাল কাঁচটি ধরার ফলে—সাদা কাগজটি সম্পূর্ণ লাল হয়ে Retinaর ওপর প্রতিফলিত হয়। তারপর লালের মধ্যে দিয়ে লাল রংয়ের অবাধ যাতায়াত হওয়ার দরুণ লাল আঁচড়টিও লাল কাচের পর্দা ভেদ করে লাল Retinaতে পৌছায়। ফল কি হয়? লালের মধ্যে লাল আঁচড় হারিয়ে যায়—ঠিক সাদা দেওয়ালে খড়ির আঁচড় দিলে যে অবস্থা হয়—বা কালো Slateএ কয়লার আঁচড় দিলে যা হয়। কিন্তু নীল রং লাল কাঁচ ভেদ করতে পারে না বলে—নীল আঁচড়টি কাগজের ওপরেই পড়ে থাকে—ফলে Retinaর ওপর তার অনুভূতি একটা কালচে দাগের মত মনে হয়।

লাল ফিল্টার কাঁচ
সাদা কাগজ
রেটিনা
নীল ফিল্টার কাঁচ
লাল আঁচড়
নীল আঁচড়
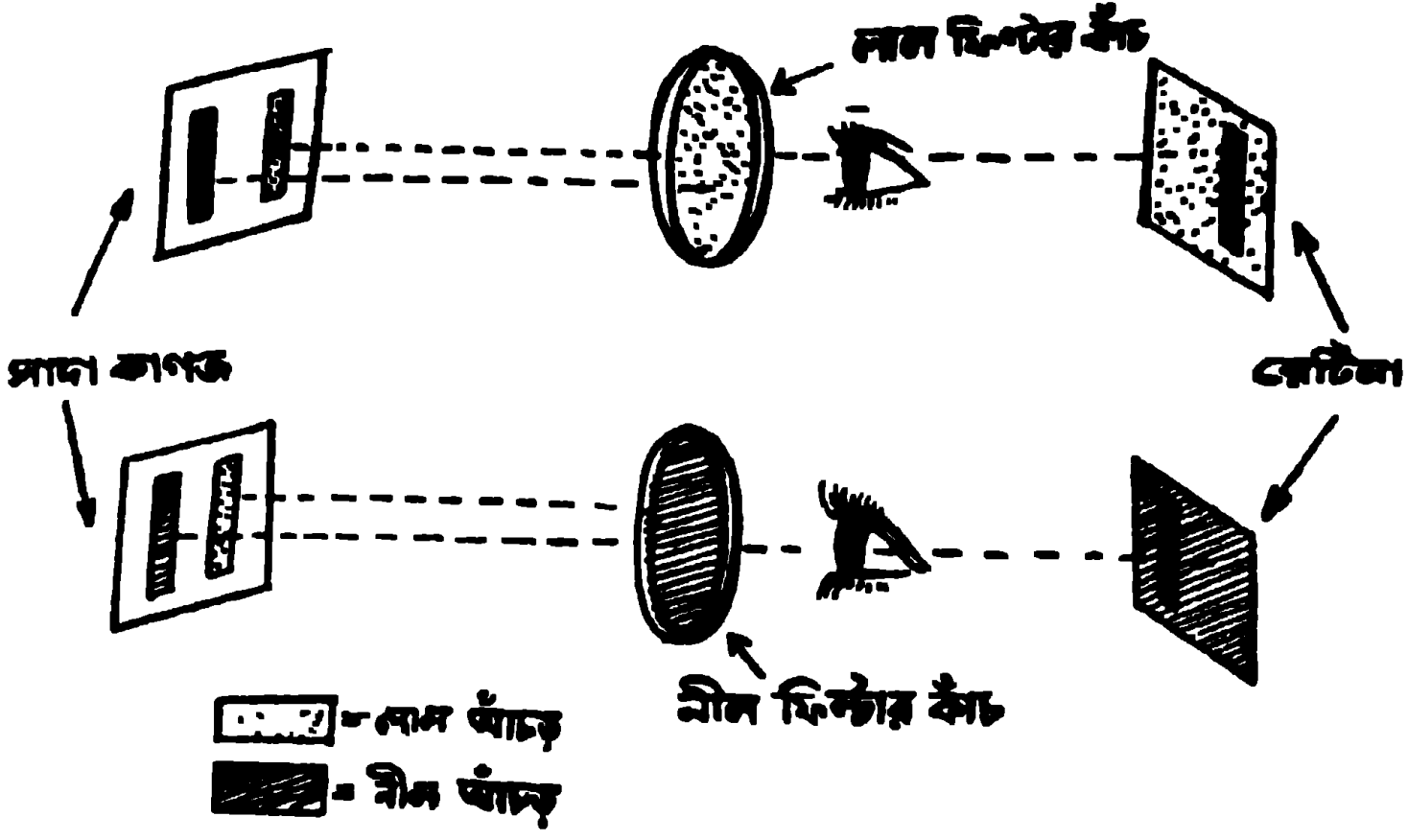
[নীল কাঁচের বেলায় ফলাফল ঠিক বিপরীত হয়—যার দরুণ লাল আঁচড়টি কালচে দেখায়—নীল আঁচড় হারিয়ে যায়। ওপরের নক্সা দেখলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার বোঝা যাবে এখন এই বৈজ্ঞানিক তত্ত্বটি Stereoscopic Photographyতে কি ভাবে ব্যবহার হয়েছে বলা সুরু করার পূর্ব্বে একটা কথা বলে নিই। এরপর থেকে দুই চোখের জন্য তোলা ছবি জোড়াকে—“Stereo pair” বলে উল্লেখ করে যাবো।

Viewer-এর বেলা এই “Stereo-pair” পৃথক কোরে ছাপা হয়, যেমন ডান চোখেরটা ডান দিকে এবং বাঁ চোখেরটা বাঁদিকে। কিন্তু Anaglyph এর বেলায় এর ব্যতিক্রম হচ্ছে যে একই Framing-এর ওপর Stereo-pair-এর দুটী ছবিকেই ছাপা হয়। একটার ঘাড়ে আর একটা। এবং ছাপার মধ্যেও বিশেষত্ব আছে। ছবি দুটী বিভিন্ন এবং পরস্পরবিরোধী রংয়ে ছাপা হয়। যেমন “ডান চোখো” ছবি যদি লাল রংএ ছাপা হয় (মানে Black & white contrast-এর না হয়ে—Red & white Contrast-এর ছবি হয়), তাহলে এরই ওপর যে দ্বিতীয় ছাপটা পড়ে—অর্থাৎ “বাঁ চোখো ছবি” সেটা ছাপা হয় ‘নীল’ রংএ (মানে Blue & white Contrast-এর ছবি) এই ভাবে ছাপালে চলতি ভাষায় বলে Super-impose করা। এই Super-impose করা Stereo-pair এর নামই Anaglyph print. Anaglyph print শুধু চোখে দেখার কোন মজাই নেই, উল্টে মনে হবে যেন ছাপাখানার দোষে কোনো Bi-Colour Block নড়ে গিয়ে দেখার পক্ষে এক অস্বস্তিকর অনুভূতির সৃষ্টি করছে।

এই সংখ্যাতে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের পটভূমিকায় শ্রীমতী ভারতী দেবীর যে ছবি দু'রঙে ছাপা হয়েছে তা সাদা চোখে দেখাচ্ছে যেমন অস্পষ্ট তেমনি মনে হয় ছাপার দোষ ঘটেছে। সঙ্গে যে চশমা দেওয়া হয়েছে সেটা লাগিয়ে দেখলে সবটা পরিষ্কার বোঝা যাবে।]

Stereo pairটিকে আমাদের দুই চক্ষু একই সঙ্গে দেখে ফেল্‌ছে বলে—কোন Stereo-effectও হচ্ছে না। কাজেই Three dimensional effect পেতে হলে এই ছবি দেখার জন্য এক বিশেষ ধরণের চশমা ব্যবহার করতে হয়, যার একটা কাঁচ “নীল” এবংঅন্যটা “লাল” (আজকাল এই চশমার কাঁচের পরিবর্ত্তে রঙিন Gelatine paper ব্যবহার করা হয়)। এখন, কোন্ চোখ কোন্ রংয়ের মধ্য দিয়ে দেখবে, নির্ভর করে Super imposed Stereo-pair-এর রং দুটীর উপর। অর্থাৎ ডান চোখের ছবি যদি লাল কালিতে ছাপা হয়—ডান চোখের কাঁচ হবে তার বিরোধী রংয়ের অর্থাৎ ‘নীল’—সুতরাং বাঁ চোখের ছবি ছাপা থাকবে নীল কালিতে এবং তার কাঁচ হবে—‘লাল’। এইবার পূর্ব্বোক্ত পরীক্ষার কথা স্মরণ করে এবং তার বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য্য সম্বন্ধে একটু তলিয়ে চিন্তা করলেই বোঝা যাবে যে এই চশমার সাহায্যে ডান ও বাঁ চোখ প্রত্যেকে কেবল তারই প্রয়োজনীয় ছবিটী বেছে নিয়ে পৃথক করে দেখবে যার ফলে Anaglyph দৃশ্যের আভ্যন্তরীন বস্তুগুলি মনে হবে কাগজের সমতল পৃষ্ঠ ছেড়ে, পরস্পরের আপেক্ষিক দূরত্ব বজায় রেখে উঠে দাঁড়াল। নিরস Anaglyph Print নিমেষের মধ্যে যেন magic-এর মত সজীব ও সরস হয়ে উঠলো।

Anaglyph পদ্ধতির বহুল ব্যবহার, বহুদিন ধরে বিদেশে বহু জায়গায় হয়ে আস্‌ছে।

এর সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে যে Stereoscopic

ছবি সাধারণের নাগালের মধ্যে এনে দেওয়া তেমন কষ্টসাধ্য বা ব্যয়সাপেক্ষ হয় না। তেমনি সবচেয়ে বড় অসুবিধা হচ্ছে কেবল monochrome বা এক রংঙা ছবিই দেখা যাবে,—বহুবর্ণরঞ্জিত রঙীন ছবি দেখার কোন উপায় এই পদ্ধতির দ্বারা সম্ভব নয়।

বছর ১০।১৫ পূর্ব্বে যুক্তরাষ্ট্র এই পদ্ধতি চলচ্চিত্রে প্রয়োগ করার একটা পরীক্ষামূলক চেষ্টা করেছিলেন। "Audioscopics" নাম দিয়ে Metro কয়েকটা Shorts এখানে দেখিয়ে একটা হুল্লোড়ের সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের সে প্রচেষ্টা মূলতঃ দুটো কারণে সফলতা অর্জ্জন করেনি। প্রথম কারণ অতগুলি দর্শককে চশমা বিলি করা—চশমার দাম আছে তো? যাই হোক পিজবোর্ড এবং রঙীন Gelatine Paper দিয়ে সে সমস্যার সুরাহা যদিও বা হোলো—বাদ সাধলো আসলে সরকারী স্বাস্থ্য বিভাগ। তাঁরা বল্লেন—এই method-এ এক নাগাড়ে ১৫ মিনিটের বেশী চলচ্চিত্র প্রদর্শনের অনুমতি দেওয়া অসম্ভব। কারণ দুই চোখের Retinaতে পৃথক ভাবে দুটো পরস্পরবিরোধী রঙের জোর আলোর দপদপানি ১০।১৫ মিনিটের বেশি হলে, Retinal rivalryর সঙ্কট দেখা দেবে এবং আখেরে চোখের দফা রফা হবে। সুতরাং এ উদ্যোগ ধামা চাপা পড়ে।

চলচ্চিত্রব্যবসায়ীরা নিশ্চয়ই খুব মনক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন—মানে আমাদের Stereoscopic Cinema দেখাতে পারলেন না বলে অবশ্যই নয়। সস্তায় কিস্তি মারায় বাধা পড়লো বলে। কেননা, Soviet পদ্ধতিতে Cinemaয় Three-dimensional ছবি তো তাঁরা আজও চালু করতে পারেন কিন্তু তাতে যে তেমন লাভ থাকে না,—এই তাঁদের বক্তব্য। কিন্তু আমরা জানি শুধু লাভ নয়—বেশ মোটা লাভ থাকবে, এ সম্ভাবনার উপলব্ধি তাঁদের মধ্যে যতদিন না হচ্ছে—আমাদের Three-demension movie দেখা ততদিন স্থগিত রইল।

-চশমা কিভাবে ব্যবহার করবেন-

গোড়ার দিকে যে দু'রঙা ছবিখানা রয়েছে,—এটি হচ্ছে ষ্টিরিওস্কোপিক অর্থাৎ ত্রিতলমাত্রিক ছবি। ছবিটি ভাল করে দেখতে হোলে ডানদিকের পাতায় যে চশমাটি রয়েছে সেটিকে চোখে লাগান। চশমার নীলরঙ থাকবে ডান চোখে আর লাল রঙ থাকবে বাঁদিকে। চশমাটি লাগিয়ে কয়েক সেকেণ্ড ছবিটির দিকে তাকিয়ে থাকলেই দেখতে পাবেন ছবির সমস্ত জিনিষের গভীরতা ফুটে উঠেছে। যাঁরা চশমা ব্যবহার করেন তাঁরা চশমার ওপরেই এই চশমাটি লাগাবেন।

নিতাই চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক চিত্রবাণী কার্যালয় ৫, প্রিয়নাথ লেন থেকে প্রকাশিত এবং
মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রিন্টার্স এ্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড, ৫১বি, বেচু চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট থেকে মুদ্রিত

চিত্রবাণী
নাট্য, চিত্র ও শিল্পকলার
সচিত্র মাসিক পত্রিকা
বার্ষিক গ্রাহক মূল্য—৭৷৷০ (সাধারণ ডাকে): ১১৲ (রেজিষ্টি ডাকে)
চতুর্থ বর্ষ | শারদীয়া, ১৩৫৮ | প্রথম সংখ্যা
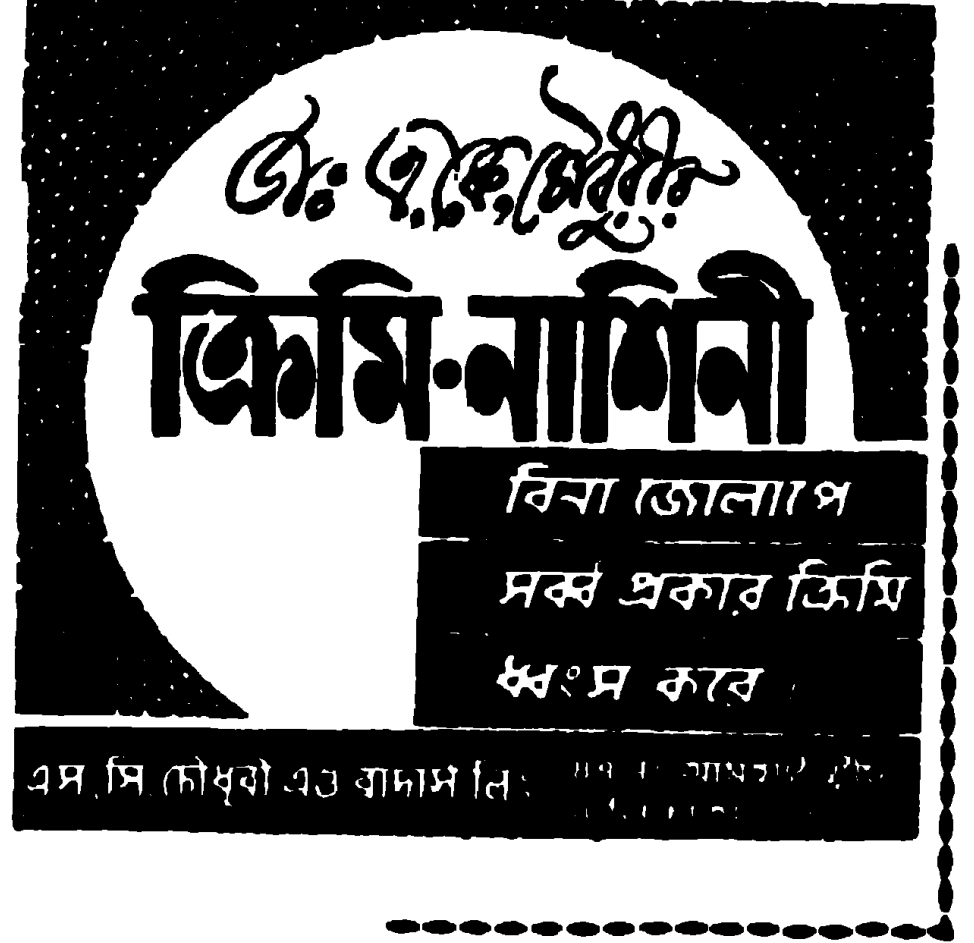
চতুর্থ বর্ষের যাত্রাক্ষণে

ঋতু পরিক্রমার নির্ভুল নিয়মানুবর্তিতায় এলো আরও একটি আলোকোজ্জ্বল শরৎ, এলো দূর বিচিত্র বর্ণালী বিচ্ছুরিত নিঃসীম সরণীর পার বেয়ে—দিগন্ত-বিসারী বনানীর বিস্রস্ত শ্যামাঞ্চল ঘিরে, এলো কোন্ ভবিষ্যের স্বপ্ন আর বাস্তব-সম্ভবা কাশ-শুভ্র মেঘ-লেখার লিপি মাঝে নিয়ে জীবনে জীবনে নবীন আশার অনাগত সম্ভাবনার ইঙ্গিত………

এলো আরও একটি শিশির-সিক্ত সুন্দর শরৎ চিত্র আর বাণীর জগতে, তারই দুটি তীর-ছোঁয়া 'চিত্রবাণী'র কল-মুখরিত উপল-চঞ্চল সার্থকতার তীর্থাভিসারী প্রবাহিনী জীবনে। আর সে শারদ-পরশে বর্ষে বর্ষে উৎসারিত ধারা তার বিস্তৃতির বিবর্তনক্রমে ছুঁয়ে যায় প্রাচ্যের নব নব অঞ্চল, নিয়ে যায় মানুষের মনে মনে রূপ আর রসের, কৃষ্টি আর আদর্শের পরীক্ষিত পরমের বাণীর পসরা। আজও তাই কালের যাত্রায় অমলিন 'চিত্রবাণী' আপন মৌলিকতায়, সমুজ্জ্বল রুচির প্রদীপ্ত প্রভায়, প্রবাহিত ঐতিহ্যের উদ্বেলিত প্রাচুর্যে……

আজ তাই এই চতুর্থ-বর্ষের যাত্রাক্ষণে নতুন এক অনুক্রমের উৎসে পৌঁছে স্মরণ করি সেই অগণিত শুভার্থীবৃন্দকে যাঁদের প্রতি দিবসের উষ্ণ উৎসাহে, প্রতিটি মুহূর্তের উদগ্র ব্যগ্রতায়, প্রতিটি কল্পনার জাগরী আগ্রহে, প্রতিটি চিন্তার অনাবিল শুভকামনায় সিঞ্চিত সার্থক 'চিত্রবাণী'। আজ তাই নির্মেঘ নীলাকাশের জ্যোতি-স্বচ্ছতার আনন্দময় দিনে কৃতজ্ঞতা জানাই কাছের ও দূরের প্রতীক্ষিত প্রতিটি মানুষকে যাঁরা 'চিত্রবাণী'র এই চতুর্থ-বর্ষকে আহ্বান জানান বহুতর শারদীয়ার সফল পুনরাগমনের কামনা নিয়ে।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

পাঠকসাধারণের অবগতির জন্যে আমরা জানাচ্ছি যে 'চিত্রবাণী প্রকাশনী'র উদ্যোগে প্রকাশিত দ্বিতীয় গ্রন্থ 'চিত্রবাণী চিত্রবার্ষিকী ১৯৫১' সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষিত হয়ে গেছে। উপস্থিত আর কেউ এই বইটি নেবার জন্যে টাকা পাঠাবেন না। একটা আশ্বাস আমরা তাঁদের দিতে পারি যে, এবার যাঁরা এই বইটি সংগ্রহ করতে পারলেন না তাঁরা নিরাশ হবেন না। পুজার পরেই পরবর্ত্তী সংস্করণের কাজ আমরা সুরু করবো। আগামী ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসেই তাঁদের আমরা "চিত্রবাণী চিত্রবার্ষিকী ১৯৫২'-কে সম্পুর্ণ নব কলেবরে পুনরায় নিবেদন করতে পারবো ব'লেই আমাদের আশা আছে।

এই সঙ্গে আর একটি কথা আমরা নিবেদন করছি। যেসব অনুগ্রাহক, ক্রেতা ও শুভাকাঙ্ক্ষী এই সঙ্কলন-গ্রন্থটি সম্বন্ধে অজস্র প্রশংসাপত্র ও বাণী পাঠিয়ে আমাদের উৎসাহ দিয়েছেন তাঁদের আমরা অন্তরের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

কর্ম্মাধ্যক্ষ, চিত্রবাণী প্রকাশনী

জাইস আইকনের জয়ন্তী উৎসব

বিশ্ববিশ্রুত জাইস আইকনের চলচ্চিত্রশিল্প সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য আনুষঙ্গিকের কথা আজ আর কারও অবিদিত নেই। বিশেষতঃ এঁদের 'এরনেমান' প্রোজেক্টার-যন্ত্র যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। স্টুটগার্টে ১লা অক্টোবর এঁরা রজত-জয়ন্তী উৎসব উদ্‌যাপন করেছেন। জার্ম্মানীর চারটি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সমবায়ে 'জাইস আইকন এ জি' প্রতিষ্ঠানটি সংগঠিত হয়েছে। স্টুটগার্টের কারখানায় এঁদের নির্ম্মিত 'এরনেমান ২' এবং 'হান ২' প্রদর্শন-যন্ত্রের কথা চিত্রশিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলেই জানেন। পূর্ব্বাপেক্ষা উন্নত ধরণের সবাকচিত্র প্রদর্শন-যন্ত্র 'এরনেমান ৭ বি' এবং 'ডমিনার' মডেলের শব্দযন্ত্রও যন্ত্রনির্ম্মাণে এঁদের নিখুঁত দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে।

জাইস প্রতিষ্ঠান ড্রেসডেনস্থিত কারখানাটি কিয়েভে স্থানান্তরিত ক'রে 'এরনেমান ১০' প্রদর্শনযন্ত্র, 'মাগনাসন ৪' বৈদ্যুতিক বাতি এবং 'ডমিনার' শব্দযন্ত্র তৈরী করছেন এবং বর্ত্তমানে সেগুলি সর্ব্বত্র বিক্রয় করা হচ্ছে। প্রধান দপ্তর এখন স্টুটগার্টে রয়েছে। তাছাড়া সুপার-আইকণ্টা, কন্টেসা এবং কন্‌ট্যাক্স ক্যামেরাও তৈরী হচ্ছে এঁদের কারখানায়।

সুমিত্রা দেবী

গারশাইন ফিল্মসের প্রথম চিত্র 'সুনন্দার বিয়ে'র
কটি গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্যে বিকাশ রায়, অনুভা, ছায়া দেবী,
র রায় প্রভৃতি। ছবিখানি শীঘ্রই মুক্তিলাভ করবে।

শ'-সেক্সপীয়ার সাক্ষাৎকার

(কাল্পনিক)

মুল্‌করাজ আনন্দ্‌

[শ'-এর মৃত্যুর দিনকয়েক পরে স্বর্গে এই সাক্ষাৎকার ঘটে]

সেক্সপীয়ার : ওহে জি, বি, এস্‌ !

শ' : কে হে তুমি ?

সেক্স : চেনোনা ? আমি যে উইলিয়াম সেক্সপীয়ার, বন্ধুরা আমায় সাধারণতঃ উইল্‌ ব'লেই ডাকে।

শ' : ও-হো ! ষ্টিভেনসনের ট্রেজার আইল্যাণ্ডের ক্যাপটেনের সঙ্গে তোমার এমনই মিল যে আমি তোমায় জলদস্যুই ভেবেছিলুম।

সেক্স : আমার বিষয় চিরদিনই তুমি খুব নির্দয়, অতএব আমার রচনার মত আমার দেহাবয়ব সম্পর্কেও যে তোমার বদ্‌ ধারণা থাকবে তাতে আর বিস্মিত হবার কি আছে !

শ' : না, না,……তবে আমি যে তোমার চেয়ে একজন বড় নাট্যকার আমার এই নিশ্চিত উক্তির যদি উল্লেখ ক'রে থাকো তাহোলে সত্যের উল্লেখই ক'রেছো। জানি না কেমন ক'রে আমার এই উক্তিকে ধৃষ্টতা ব'লে ভাবতে পারো, কারণ এর ন্যায়সঙ্গত প্রমাণও আমি দিয়ে এসেছি। আর, তোমার চেহারার কথা যা বলছিলে, আয়নায় দেখলেই টের পাবে, কেমন যেন ধুলো-কাদা-মাখা ব'লে মনে হয়।

সেক্স : দ্যাখো, এখানে আসতে আসতে আমরা সবাই ওরকম একটু-আধটু মলিন হোয়ে পড়ি। তাছাড়া, তোমার চেয়ে আমার সংগ্রাম ছিল কঠিনতর। আর, তুমিও তো হে বাপু দেখতে শুনতে ব্যবহারের অযোগ্য হোয়ে প'ড়েছো।

শ' : ওহে, বয়েসটা আমার নব্বুইয়ের কোঠা ছাড়িয়ে গেছ্‌লো। কেউ-ই আর ও বয়েসে সু-চেহারা রাখতে পারে না। কিন্তু তোমার তো কোন কারণ ছিল না, শুনেছি তুমি নাকি পঞ্চাশ পেরিয়েই মারা গেছ্‌লে।

সেক্স : তাহোলে দেখছি মৃত্যুকালে আমার কত বয়েস হোয়েছিল তাও তুমি জানো না।

শ' : স্বীকার ক'রবে নিশ্চয়—তোমার গোটা জীবনটাই অজস্র অনুমান আর গুজবের সঙ্গে জড়িত। যারা তোমার অস্তিত্বে সন্দিহান তারা বলে তোমার রচনাগুলো নাকি বেকনের লেখা। আমি অবিশ্যি বিশ্বাস করিনা যে তুমি কোনদিন ছিলে না। তোমার সৃষ্ট চরিত্রগুলোর মধ্যে তোমার যাত্রা-ঢঙী অভিনয়ের নির্ভুল প্রমাণ আমি পেয়েছি। আর তাছাড়া, এত বস্তা বস্তা দাঁতভাঙা রচনা তুমি লিখেছো, বেকন নিশ্চয়ই তা' পারতোনা। সুতরাং আমি বিশ্বাস করি যে তুমি সশরীরে ছিলে—ছিলে একজন ষ্ট্র্যাটফোর্ডের লক্কড় অভিনেতা, লণ্ডনে এসে যে খানিকটা সামলে নিয়েছিল ! তবে হ্যাঁ, লড়াই ক'রে লেখক হওয়ার এবং কিছুটা অখ্যাতি অর্জনের হিম্মৎ তোমার আমি প্রশংসা করি তাই ব'লে ভেবোনা যেন আমার সেইসব সমসাময়িকদের মত আমিও সহজে প্রতারিত হবার বান্দা, যাঁরা বেশীর ভাগই তোমার অমিত্রাক্ষর ছন্দ শুনতে না শুনতেই সভয়ে কেমন যেন বিস্ময়াচ্ছন্ন হোয়ে পড়েন।

সেক্স : তোমাকে আর শোধরানো গেলনা ! মনে হয় তোমার কথাবার্তার এই অশিষ্টতা তোমার যুগেরই বৈশিষ্ট্য। তবে, তোমার এ নোংরামীর আমি তোয়াক্কা করি না।

শ' : নোংরা হোতে আমি চাইনা, উইল্‌। যদি আমার

স্পষ্ট কথায় তোমার অসন্তোষের উদ্রেক হোয়ে থাকে, মাপ ক'রো। ব্যাপার কি জানো, তোমার মৃত্যুর পর অনেককাল কেটে গেছে, অনেক কিছুই ঘটে গেছে; আর, বিংশ শতাব্দীর আমরা তোমাদের ঐ পঞ্চদশ শতাব্দীর লোকগুলোকে কতকগুলো 'দেহাতী অনড্ডান' ব'লে মনে করি।

সেক্স : 'দেহাতী অনড্ডান' মানে ?

শ' : ওঃ-হোঃ! আমার এক দেশওয়ালী লোক, ডিন স্যুইফ্‌ট, পৃথিবীর ওপর বীতশ্রদ্ধ হোয়ে গেঁয়ো মূর্খদের ডাকবার জন্যে শব্দটি আবিষ্কার ক'রেছিল।

সেক্স : আমি যদি অমন একটা শব্দ সঞ্চয় ক'রতে পারতাম!

শ' : সেইটাই তো তোমার বিরুদ্ধে আমার প্রধান অভিযোগ। তুমি তো প্রায় সারাজীবন কথার বেসাতিই ক'রে এসেছো—মনোহারী রঙীন কথার তাপ্পি—শুধু প্রচণ্ড শব্দ কিম্বা ছন্দে ভরা, তুলনায় তার অর্থ অতি সামান্যই থাকে। আমি কিন্তু এমন এক যুগের, যে যুগে আমাদের ভাবতে হয়, অনুভব ক'রতে হয়, বিস্তৃত ক'রতে হয় বিবেকবুদ্ধিকে—তোমার মৃত্যুর পর থেকে সাংস্কৃতিক পুনরভ্যুদয়ের ওপর সঞ্চিত যাবতীয় জ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে। সুতরাং তোমার চতুর্থ ও পঞ্চম হেনরীতে তুমি যে ইচ্ছে ক'রে যুদ্ধ-প্রীতির ভাব ঢুকিয়েছো তাতে আমার কিঞ্চিৎ ধৈর্যচ্যুতি ঘটে এবং ধৈর্য হারাই তোমার কল্পনার অস্পষ্টতায়। তেমনি আবার মানব চরিত্রের প্রতি তোমার অন্তর্দৃষ্টির প্রশংসাও করি।

সেক্স : যে অন্তর্দৃষ্টি তোমার আদৌ নেই বললেই চলে, যার ফলে তোমার নাটকের চরিত্রগুলো পুতুল হোয়ে পরে তোমার মতবাদের শ্লোগান আর লম্বা লম্বা বুলি আওড়াবার জন্যে।

শ' : তোমার অভিযোগ কতকাংশে সুপ্রতিষ্ঠিত।

সেক্স : বিস্মিত হোচ্ছি তোমার এই আকস্মিক বিনয়ে।

শ' : না হে, দেখবে—আমি বেশ সরল, এমনকি নিজের সম্বন্ধেও। আমার সাফল্য সম্পর্কে আমার কোন অতিরঞ্জিত ধারণা নেই; যদিও আমিও জোরের সঙ্গেই জাহির ক'রে এসেছি, আজও করি যে, নাট্যকার হিসেবে আমি তোমার চেয়ে অনেক বড়। দ্যাখো হে, তোমার চেয়ে আমার যুগের চাহিদা মেটানো ছিল অনেক ঝামেলার। যাবতীয় বিজ্ঞানের বিস্ময় আর মানব সম্পর্কিত আভিধানিক জ্ঞান গোটাকতক কাব্যিক বচনাংশের ভেতর ঠেসে ঢোকানো যায় না। বিরাট বিরাট সাম্রাজ্যের দানবীয় সংঘর্ষও তেমনি জনকয়েক রাজারাজড়ার দ্বন্দ্বযুদ্ধের মধ্যে সংক্ষিপ্ত করা চলে না। আর, বিপ্লবের বিষয় যদি বল—যে বিপ্লবের আমি ছিলাম উত্তরাধিকারী, তোমার কল্পনাশক্তির সম্ভাব্য সম্প্রসারণেও তার তাৎপর্য তোমার মগজে ঢুকবে না, যদিনা কোন রকমের সর্টহ্যাণ্ড পদ্ধতি অবলম্বন কর।
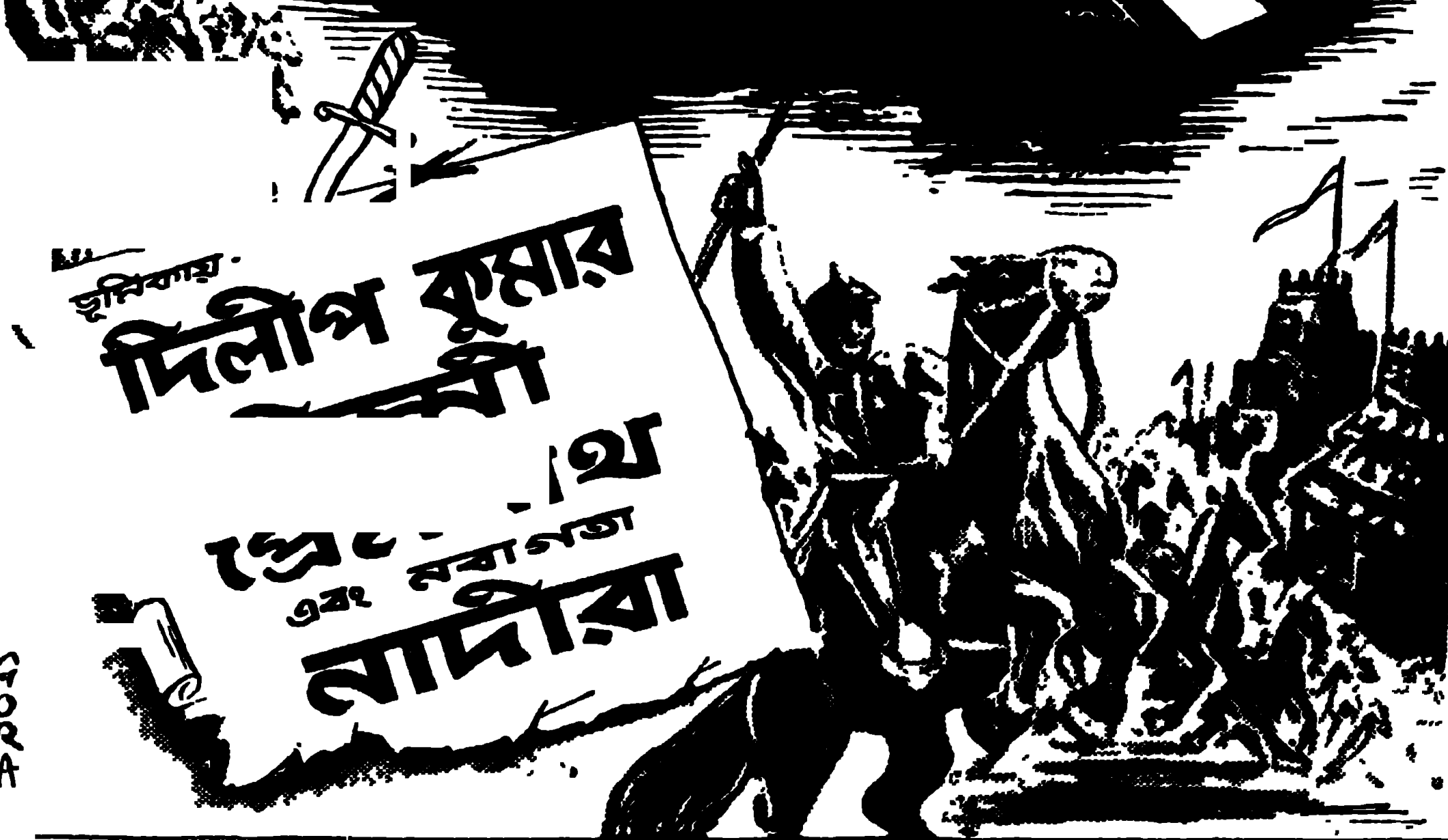
সেক্স : স্বীকার করি তুমি হয়তো তোমার যুগের বহু যুগান্তকারী ঘটনা লক্ষ্য ক'রেছো কিন্তু তাই ব'লে মানব চরিত্রের উন্মার্গগামীতাকে তুমি সমর্থন ক'রতে পার না। শিল্পে ব্যক্তিসত্ত্বার সার্বভৌম আধিপত্য। মানুষ হোল বিশ্বের মাপকাঠি ; ভাব, আবেগ, উচ্ছ্বাস—যা দিয়ে সৃষ্টি মানুষ, তাকে তুমি অস্বীকার করতে পার না। গোটা বিশ্বকেই তুমি গিলতে পার না। তুমি শুধু পার রূপকের সাহায্যে তাকে ব্যাখ্যা ক'রতে—

শ' : এটা বোঝনা কেন যে, গ্রীক ও রোমান সভ্যতার তুলনায় প্রগতিশীল হোলেও তুমি যে যুগে লিখেছিলে সেটা ছিল অল্প-বিস্তর আদিম যুগ। যেমন ধরো, মানুষের অসদ্‌বৃত্তিজনিত স্বাভাবিক বিপদের গুরুত্ব উপলব্ধি ক'রলেও তোমরা ঐ গ্রীকদের ঈশ্বর নামধারী দুজ্ঞেয় ভাগ্যের ওপর তোমাদের বিশ্বাসকে পরিহার ক'রতে পার নি। অথচ দ্যাখো, পঞ্চদশ শতাব্দীর পর ইউরোপে যে বহু বিতর্কের উদ্ভব হোয়েছিল তাতে ঈশ্বর-বিশ্বাস সম্পূর্ণ দেউলে হোয়ে গেছে। খাঁটি আধুনিক হিসেবে আমি তাই আমার রচনা-জগৎ থেকে এ জাতীয় কুসংস্কার মুছে ফেলেই সুরু করেছি। ব্যক্তিসত্ত্বার কথা যা ব'ললে, তোমায় আর কি বোঝাবো, আমি দেখেছি আমারই চোখের সামনে মানুষের স্বভাব গেছে বদলে। সুতরাং তোমার ঐ ব্যক্তিসত্ত্বা নিছক একটা আবেগ ও উচ্ছ্বাসের বোঝা নয়, সে একজন সচেতন বিপ্লবীও হোতে পারে, হোতে পারে এমন একজন যে তার ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটিয়ে নিজেকে গ'ড়ে তুলতে পারে সম্পূর্ণ নতুন মানুষ ক'রে। এটা সত্যি যে এখনও আমার একটা পা রয়ে গেছে ঊনবিংশ শতাব্দীতে, তাই আমাকেও এমন অনেক মানুষ ও চরিত্রের বিষয় ব'লতে হোয়েছে যারা তখনও পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব ক'রতে পারে নি কিম্বা হৃদয়ঙ্গম ক'রতে পারে নি আত্ম-পরিবর্তনে মানুষের ক্ষমতা। তবে, জানোই তো, লেখকের পক্ষপাতিত্ব প্রায়ই এসে পড়ে তার সৃষ্টির মধ্য দিয়ে। তার সৃষ্ট চরিত্রের বেশীর ভাগই হয় তারই আদলে। সুতরাং দেখবে আমার সেইসব চরিত্র যারা বিচারের নিরিখে সাধারণ মানুষ ব'লে মনে হোয়েছে এমন-কি তারা পর্যন্তও প্রায় ত্রুটীশূন্য হোয়ে উঠেছে শুধু একটা আবছা আত্মসচেতনতার বলে যে তারাও পরিবর্তিত হোতে পারে। পরবর্তী নাটকগুলোয় আমি আরও সূক্ষ্ম হবার প্রয়াস পেয়েছি, কারণ, বুঝেছি নিছক অসুস্থ-স্নায়ুর ভিত্তি সত্য বিশ্লেষণে জামিন হোতে পারে না ; আরও দৃঢ়তর ভিত্তি রয়ে গেছে মানুষের মধ্যে—তাদের বক্তব্যকে তাদেরই বলবার ক্ষমতার মধ্যে—বিষয়বস্তুর মূলকে ছিন্নভিন্ন ক'রে।

সেক্স : তাহোলে স্বীকার ক'রছো তোমার চরিত্রগুলো

অল্পবিস্তর স্বপ্ন ও অবাস্তব।

শ' : সার্বজনীনতাকে আমার মঞ্চ-অবদানের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ব'লে মনে করি; এবং বৈঠকী আলাপনকেও আমি শ্যাফ্ট্সবেরী এ্যাভেনিউয়ে এমনভাবে অভিনয় ক'রে তুলেছি যে যারা রঙ্গালয়ে শুধু চকোলেট খেতেই আসে তাদের মত স্বল্প-বুদ্ধিদেরও বিরক্তির উদ্রেক করে না।

সেক্স : ব'লতে চাও কখনও তুমি কা'রও বিরক্তি সৃষ্টি কর নি?

শ' : তুমি ঘণ্টা ক'রেছো। ঘণ্টা নয়, টাইল্।

সেক্স : ছাঃ! ছাঃ!

শ' : ভাখো হে, আমি আমার চরিত্রদের নিপুণভাবে কথা বলিয়েছি। ভারী সোজা এটা। তাদের শুধু নিজেদের সম্পর্কে সত্য কথা বলতে হোয়েছে, যা আমাদের সমাজের নিখুঁত ভদ্ররা অভ্যাসবশে বলেন না। এই সত্যভাষণের ফলেই তারা শ্রোতাদের কাছে মহৎ হোয়ে উঠেছে।

সেক্স : নিজের সম্পর্কে নিশ্চয়ই তোমার খুব উচ্চ ধারণা আছে।

শ' : নিজের সম্পর্কে আমার যে উচ্চ ধারণা সেটা হোল আমার যুগের উচ্চতর সাফল্যেরই প্রতিফলন। যখন বলি যে আমি তোমার চেয়ে বড় তখন এই কথাটাই বোঝাতে চাই যে আমার যুগ ছিল তোমার যুগের চেয়ে বৃহত্তর। যেমন, কোন কূপমণ্ডুক গ্রামবাসী, নিজের ক্ষেতের গণ্ডীর মাঝে আবদ্ধ, সে একটা বোবা-বলদ ছাড়া আর কি হোতে পারে! নিজের চিন্তার চারপাশেই ঘুরপাক খায়, আইনস্টাইনের মত কখনও ভাবিতে পারে না। তেমনি কোন পঞ্চদশ শতাব্দীর অভিনেতাও হয়তো হৃদয়ঙ্গম ক'রতে পারতো না দুটি প্রধান মতবাদের তাৎপর্য—যে দু'টির জন্যে, বহু বিফলতা সত্ত্বেও, আমার যুগ গর্ব ক'রতে পারে তার চরম সাধন হিসেবে। প্রথম মতবাদটি হোল: প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণে মানুষ ইচ্ছামত বিজ্ঞানকে ব্যবহার ক'রতে পারে। আর দ্বিতীয়টি: মানুষ তার আপন ভাগ্যের রূপান্তর সাধন ক'রতে পারে—যেমন রুশ-বিপ্লবের মধ্য দিয়ে……

সেক্স : ও-ও তাই তো! তুমি যে একজন বোলশেভিক! বুঝেছি কি ব'লতে চাও। তবে তোমাদের ঐ দুর্বার নয়া দুনিয়ায় আমার কোন আস্থা নেই।

শ' : নিজেকে কমিউনিষ্ট ব'লে পরিচয় দিতে আমি গর্ব বোধ করি। গেঁয়ো মূর্খ আর তাদের সমশ্রেণীয়রাই শুধু রুশ-বিপ্লবের নামে আঁৎকে ওঠে। আমি অবিশ্যি আশা করিনা, তুমি তোমার রাজা-জমিদারদের প্রতি ভালোবাসা নিয়ে রাশিয়ার বলশেভিকরা যে অপূর্ব পরীক্ষা চালাচ্ছে তার প্রতি সহানুভূতি জানাবে।

সেক্স : বিস্ময়কর সাফল্য সত্ত্বেও ওরা আজও আমার নাটক থেকে আধ্যাত্মিক খোরাক সংগ্রহ ক'রে থাকে। শুনতে পাই রাশিয়ায় ওরা সর্বত্র আমার নাটক অভিনয় করে এবং আমি জেনেছি ওরা ওদের অসভ্য জনসাধারণকে শিক্ষিত ক'রে তোলার পক্ষে আমার নাটকগুলোকে উৎকৃষ্ট মাধ্যম ব'লে মনে করে।

শ' : তোমার নাটকের প্রাধান্য যে সোভিয়েট ইউনিয়ানের মঞ্চ-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা নিঃসন্দেহে দিয়ে থাকেন আমার মতে সেটা হোল তাঁদের বিচক্ষণতার প্রতি শ্রদ্ধার পরিচায়ক। তোমার নাটকে যে আধ্যাত্মিক খোরাক নেই এমন কথা কখনও আমি বলিনা। আসলে, আমি বলি যে চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীর মানুষের ছোট-খাটো দ্বন্দ্বের সাক্ষ্য হিসেবে তোমার নাটকগুলো অতি মূল্যবান। তবে, আমার বিশ্বাস সোভিয়েট যে তোমাকে তাদের ভাঁড়ারের তালিকাভুক্ত ক'রে রেখেছে তার মুখ্য উদ্দেশ্য হোল ইতিহাসের বিবর্তনকে তারা বুঝতে চায়। আর সেই কারণেই সোভিয়েট ইউনিয়ানে আমার নাটকগুলোও তোমার মত জনপ্রিয়।

সেক্স : এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার স্পৃহা আমার নেই। আমি বরং জনকয়েক মানুষ আর ঘটনা, যা আমি জানি এবং যাদের আমি অনুভব ক'রেছি, তাদের এক নগণ্য ভাষ্যকার হোয়েই থাকতে চাই। আমার রাজনৈতিক অনগ্রসরতার দোষ-ক্ষালন প্রসঙ্গে আমায় ব'লতে হোচ্ছে যে প্রথম জীবনে রাজতন্ত্রের অনুকূলে থাকলেও পরে অন্ততঃ আমি অভিজাত শ্রেণীর সততায় আস্থাবান হ'য়ে উঠি। তোমার হয়তো স্মরণ আছে—তত্ত্বজিজ্ঞাসু হ্যামলেট আমার মধ্য জীবনের সৃষ্টি। জানিনা সম্প্রতি তুমি আমার 'টেমপেষ্ট' প'ড়েছো কিনা, তবে সেই শেষ নাটকে বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি এবং ক্যালিব্যানকে রূপায়িত ক'রে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিপ্লব পর্যন্ত সবই আমি ভবিষ্যদ্বাণী ক'রে গেছি।

শ' : উইল! তোমার বিনয় আমাকে আমার রচনা সম্পর্কে সচেতন ক'রে তুলছে। তোমার রচনার ক্রমোন্নতির প্রশংসা করি, তারিফ করি এইজন্যে যে সাহিত্যিক জীবনের শেষের দিকে তুমি তোমার দৃষ্টিকে যথেষ্ট প্রসারিত ক'রতে পেরেছিলে। আমাকেও ক্রমবিকাশের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম ক'রতে হোয়েছিল। যেমন ধর, প্রথমে আমি খানকয়েক বদ্ধ উপন্যাস লিখেছিলুম। তারপর যখন নাটক লিখতে সুরু ক'রলুম তখন প্রথমেই সঙ্কীর্ণ রাজনৈতিক ও সামাজিক আদর্শের দিকে ঝুঁকেছিলুম। তবে, যখন থেকে মানব সমাজকে দেখবার মত একটা কাব্যিক কল্পনার উন্মেষ হোতে লাগলো তখনই শুধু আমার মনের বিভিন্ন অংশগুলো দানা বাঁধলো এবং আমি ভালো লিখতে লাগলুম।

সেক্স : দেখছি, তোমার যা কিছু বক্তব্য সবই হোল মনের ওপর, বুদ্ধির ওপর……

শ' : মানব হৃদয়ের প্রতি কর্ণপাত না করার অভিযোগে এই আমি প্রথম অভিযুক্ত হোচ্ছি না। ... হিসেবে এ অভিযোগ সত্যি। তবে, সব সময়েই আমি অনুভব ক'রেছি যে মানব হৃদয়ের অযৌক্তিকতার মধ্যেও যুক্তি থাকে এবং চেষ্টা ক'রেছি উপনীত হোতে এমন কতকগুলো মনস্তাত্ত্বিক সত্যে যেগুলো ঠিক গতানুগতিক নয়। যেমন ধরো, তুমি এবং অন্যান্য অনেক লেখক যেখানে নারীকে দেখেছো প্রিয়া ও অনুসৃতারূপে, আমি দেখিয়েছি নারী হোল আসলে প্রেমিকা ও অনুসরণকারিনী। তেমনি, উনবিংশ শতাব্দীর চলতি ভণ্ডামীর বহু জিগীরকেও আমি কঠিন আঘাতে ধূলিসাৎ ক'রেছি এবং প্রমাণ ক'রেছি—জীবনী-শক্তির প্রাচুর্যেই শুধু নারী ও পুরুষ অপূর্ব হোয়ে ওঠে।

সেক্স : অবাক কাণ্ড! তুমি দেখ্‌ছি তোমার নাটককে কবি-কল্পনার কাছাকাছি বস্তু ব'লে মনে কর! অথচ তা' আগাগোড়া গাণ্ডিক ব'লে মনে হয়।

শ' : কি ব'লবো, কাব্য সম্পর্কে তোমার ধারণা দেখ্‌ছি সীমাবদ্ধ! মানব সমাজকে আমি দেখেছি আমার কবি-মানসে—আমার বিশ্বাস, জীবনীশক্তিতে উদ্বুদ্ধ মানুষের প্রতিভা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রসাদ—এ দু'য়ের সমন্বয়ে সমাজের রূপান্তর সাধন হবে।

সেক্স : জীবনীশক্তি ব'লতে তুমি কি ব'লছো? ফরাসী দার্শনিক বার্গস যাকে 'জীবন উচ্ছ্বাস' ব'লেছেন? বিজ্ঞান-প্রীতি সত্ত্বেও তোমাকে একজন রহস্যবাদী ব'লে মনে হয়।

শ' : নিশ্চয়ই—বার্গস ছিলেন রহস্যবাদী। জীবনীশক্তি সম্পর্কে আমার নিজস্ব ব্যাখ্যার মূল রয়েছে এমন কতকগুলো মানুষের সজীবতায় বিশ্বাসের মধ্যে যারা স্বেচ্ছায় জ্ঞানের প্রয়োগে বিশ্বের ওপর তাদের জৈবিক ও মানসিক অধিকার বিস্তৃত ক'রতে পারে। আমার বিশ্বাস প্রতি মানুষই অতি-মানব হোতে পারে।

সেক্স : তাহোলে দেখ্‌ছি আমার মত তুমিও একজন মহামানবের পূজারী।

শ' : আলবৎ। মহামানব সম্পর্কে আমি তোমার সঙ্গে সম-বিশ্বাসী। আমি বুঝেছিলুম—পাশ্চাত্য সভ্যতার নীচমানুষগুলো নিজেদের এতটা হীন ক'রে ফেলেছে ঘরে বাইরে যে আমার প্রধান কাজ ছিল নতুন কোন খাঁটি মানুষের অনুসন্ধান করা।

সেক্স : নৃপতি-প্রীতির জন্যে আমাকে তুমি আঘাত কর, অথচ তুমি নিজেও তো হিটলারের মত মানুষকে প্রশংসা ক'রতে ঝুঁকেছিলে।

শ' : এটা কিছু ঠিক নয় যে হিটলারকে আমি সত্যিই প্রশংসা ক'রেছিলুম। তবে, আমি শুধু চেয়েছিলুম হিটলারের কর্ম-প্রণালী দেখিয়ে ইংলণ্ডের তথাকথিত প্রজাতন্ত্রীদের দুয়ো দিতে।

সেক্স : আসলে একখানা শেভিয়্যান প্যাচ্‌!

শ' : ছাখো, মানুষ যখন বোকা হয়, তাকে সস্তা দর্শানোর একমাত্র উপায় হোল সহজ চালু যুক্তিকে উল্টে দেওয়া।

সেক্স : জীবনে অন্ততঃ বুদ্ধ-বিপ্লব দেখা সত্ত্বেও কি তুমি মানব সমাজের কাব্যাদর্শে বিশ্বাসী?

শ' : নিশ্চয়ই। লেনিন যখন আমার ফেবিয়ান থিসিসের ওপর নয়া সমাজ ব্যবস্থার পরীক্ষা-নিরীক্ষা সুরু ক'রলেন, বুঝলুম মানব জীবনের মহাকাব্য বাস্তবে রূপায়িত হোতে চ'লেছে। দু'টো বিশ্বযুদ্ধেই ধরা প'ড়ে গেছে পাশ্চাত্য জগতের প্রচ্ছন্ন পুঁজিপতি-দের অন্যায়, কারণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর প্রায় অর্দ্ধেক পৃথিবীই সমাজতন্ত্রী বনে গেছে—এমনকি তোমার ঐ ক্ষুদে দ্বীপটাও কমিউনিজম্‌ চালাবার চেষ্টা ক'রেছে—অবিশ্যি নির্জীব ব্রিটিশ পদ্ধতিতে, যেটা আমাদের জাতের বৈশিষ্ট্য হোয়ে উঠেছে সেই অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে, যখন থেকে মধ্যবিত্তের হাতে ক্ষমতা আসতে সুরু হ'য়েছে।

সেক্স : তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কায় তোমার আদর্শ যে বানচাল হোতে চ'লেছে সে কথা ভাবছো কি?

শ' : না। নিজে মার্কসিষ্ট ব'লে মূলতঃ আমি একজন আশাবাদী। আমি বিশ্বাস করিনা যে আণবিক বোমা নিয়ে ক্রীড়ারত উন্মাদগুলো কোনদিন এই শোষণহীন সাম্যবাদী সমাজের অনিবার্য আদর্শকে ধ্বংস ক'রতে সক্ষম হবে। তাই ব'লে ভেবোনা যেন—মানুষের আয়ত্তাধীন এই নতুন শক্তি যে

মানব সভ্যতাকে ধূলিসাৎ ক'রতে পারে যদি ঐ উন্মাদগুলো আণবিক যুদ্ধ বাধিয়ে দেয়—এমন কোন আশঙ্কাকে আমি আমল দিচ্ছিনা।

সেক্স : দ্যাখো হে, মানুষের দুষ্টু বুদ্ধি সম্পর্কে তুমি এখনও ছেলে মানুষ, কিঞ্চিৎ অনভিজ্ঞ। এই কিছুক্ষণ আগে তোমার বন্ধু এইচ্. জি, ওয়েল্‌সের সঙ্গে কথা হোচ্ছিল। ব'ললে—পৃথিবী ত্যাগের পূর্বে তার নাকি মোহমুক্তি ঘটেছিল। কিন্তু আমাদের চারপাশের এই বিপর্যয়ের মধ্যেও তুমি তো দেখছি বিল্‌কুল্ অবিচল র'য়েছো।

শ' : হয়তো রয়েছি। অনেক ক'রে মানব হৃদয়ের সেই বিশ্বাসকে খুঁজে পেয়েছি যা পাইনি আমার জীবদ্দশায়। অনুভব করি—অন্তঃকরণ অবিনশ্বর।

সেক্স : শেষটায় তাহোলে আমার মতেই মত দিলে!

শ' : কথাবার্তা শুনে মনে হ'চ্ছে তুমিও এসে হাজির হোলে আমার পথে

সেক্স : যাহোক, মতের আদান-প্রদানটা ভালো জিনি[illegible] চল হে, লাঞ্চে যাই চল! ঘণ্টার আওয়াজ পাচ্ছি

শ' : আজও বোধ হয় তুমি মাংস ছাড়নি? আমি তো [illegible] অন্য টেবিলের খদ্দের—ঐ যে যেখানে [illegible] বুড়োকে দেখতে পাচ্ছি। জানো তো মাট [illegible] হোল আমি একেবারে গোঁড়া নিরামিষ[illegible] সুপ্রভাত তোমায় দেখে খুশী হোলাম [illegible] হোলাম বুঝে—তুমি আমি প্রায় সমান ক[illegible]

['দি প্রেজেণ্ট'—১৯৫১, জি, বি, এস্ স্মৃতি-সংখ্যা [illegible] গৃহীত ও মনোজ সান্যাল কর্তৃক অনূদিত]

Bengal Phototype Co. Amherst Street, Cal.

অনুভা গুপ্তা ● 'কবি'র ঠাকুরঝি ও 'রত্নদীপ'-এ বৌরাণী
যাঁর অভিনয় প্রতিভার বলিষ্ঠ স্বাক্ষর'

আমার অভিজ্ঞতা

রবার্ট ফ্লাহেটি

চিত্রজগতের এক উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক আজ নিষ্প্রভ—রবার্ট ফ্লাহেটি আর ইহজগতে নেই—সম্প্রতি তাঁর মৃত্যু হয়েছে। বিগত অর্দ্ধশতাব্দী ধ'রে তিনি ছিলেন এই নবতম শিল্পের আলোক-দিশারী। ধ্রুবতারার মত, গ'ড়ে তুলেছেন একে আপন সৃষ্টি-প্রতিভার মৌলিকতা দিয়ে। প্রামাণ্য চিত্রের ক্ষেত্রে তিনি প্রথম, প্রধান ও অবিসম্বাদী কর্ণধার।

শিল্পী ফ্লাহেটি কর্ম-জীবনের বাইরে ছিলেন আলাপচারী। তাঁর অনুজ সহকর্মীদের সঙ্গে আলাপের অবকাশে তিনি বিবৃত করে গেছেন তাঁর চিত্রনির্মাণের রমোন্যাসিক কাহিনী। 'চিত্র-বাণী'র রসপিপাসু, কৌতূহলী পাঠক-পাঠিকাদের কাছে আমরা সে-কাহিনীর বাংলা অনুবাদ নিবেদন করলাম।

প্রকাশ

জিজ্ঞাসা ক'রছেন— কি ক'রে আমি ছবির রাজ্যে এলাম? নেহাৎই সেটা কর্মের খাতিরে ক্যামেরা নিয়ে কাজ করার মধ্যে দিয়ে—একবার যখন উত্তর মেরু অভিযানে গিয়েছিলাম। বলা বাহুল্য অভিযানের উদ্দেশ্যটা ছিল খনি অন্বেষণ। তবে আমার নিয়োগকর্তার অভিপ্রায়ে আমাকে একটা মুভি ক্যামেরা নিতে হয়েছিল সঙ্গে। নিজেরও যে খুব ইচ্ছা না ছিল এমন নয়। ভেবেছিলাম খনি আবিষ্কারের জন্যে কাজের ছবি তোলার ফাঁকে ফাঁকে ওদেশের অধিবাসী এস্কিমোদের জীবনযাত্রারও কিছু ছবি তুলে নেবো, আর সেইসঙ্গে সেখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্যেরও।

সেবার প্রায় বছর দেড়েক আমরা (আমি আর আমার স্ত্রী) ছিলাম সেই পৃথিবীর মেরু প্রান্তে। তারপর আমাদের এই তথাকথিত সভ্যতার মধ্যে ফিরে এসে

রবার্ট ফ্লাহের্টি

ভাবলাম, যখন তুলেইছি তখন ছবিগুলোর কিছু একটা গতি করি। তখন আমরা টোরোন্টোয়, নিউ ইয়র্কে পাঠাবার জন্যে ছবিগুলো সব ঠিকঠাক করছি হঠাৎ অসাবধানে একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল। নিজে নেহাৎই আনাড়ী নইলে সেই ফিল্ম-বোঝাই ছোট্ট ঘরে টেবিল থেকে জ্বলন্ত সিগারেটের টুকরো কি কেউ ছুঁড়ে ফেলে! দেখ্‌তে না দেখ্‌তে মুহূর্তের লেলিহান অগ্নি-শিখায় সত্তোর হাজার ফিট নেগেটিভ পুড়ে ছাই হ'য়ে গেল।

যাই হোক ভাগ্যের হয়তো কিঞ্চিৎ প্রসন্নতা ছিল তাই নেগেটিভের একটা 'এডিট'-করা প্রিন্ট আগুনের হাত থেকে কোনরকমে রেহাই পায়। সেটাকে নিয়ে গেলাম নিউ ইয়র্কে, মনে ক্ষীণ আশা ছিল হয়তো 'ডিউপ' ক'রে নিতে পারবো। কিন্তু তখনকার দিনে ডিউপিং প্রায় অসম্ভব ছিল। আমেরিকান জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটিকে ছবিটা দেখালাম, দেখিয়ে তবে বুঝলাম যে সেই ক'তটা খারাপ হয়েছে। ছবি সম্পূর্ণ অযোগ্য—স্রেফ গোটাকতক অসংলগ্ন দৃশ্যের সমষ্টি, না আছে কোন কাহিনীর সূত্র, না বা ধারাবাহিকতা। আমার নিজেরই ভালো লাগ্‌লোনা, অন্য দর্শকদের ভালো লাগবে কি ক'রে!

আমি এবং আমার স্ত্রী এ নিয়ে অনেক চিন্তা ক'রলাম। শেষে বুঝলাম কেন ছবিটা অত খারাপ হয়েছে। মনে হল—হয়তো আবার যদি ফিরে যাই উত্তর মেরুতে, যেখানে দশ বছর কাটিয়েছি, যার অধিবাসীদের আমি অন্তরঙ্গভাবে জানি—তাহোলে এমন একখানা ছবি তুলতে পারি যার চাহিদা অবশ্যম্ভাবী। দু'জনে বলাবলি ক'রলাম—বেশ তো একটা এস্কিমো পরিবারের সারা বছরের জীবনযাত্রার প্রণালী ছবিতে তুলি না কেন। তার চেয়ে বেশী চিত্তাকর্ষক আর কোনও মানুষের জীবনী হতে পারে কি? এস্কিমোর জীবন বৈচিত্র্য অতুলনীয়। পৃথিবীর যে কোন মানুষের চেয়েই তার সম্বল কম। তার মত সহায়হীনভাবে আর কোন জাতি হয়তো বেচে থাকতে পারতোনা। তার জীবন—সে তো অনাহারের বিরুদ্ধে অবিশ্রাম সংগ্রামেরই নামান্তর। কিছুই সেখানে জন্মায় না; যা শিকার করে তার ওপরই তাকে সম্পূর্ণ নির্ভর ক'রতে হয়; আর এ সবই তাকে ক'রতে হয় উত্তর মেরুর ভয়ঙ্কর তীব্র শীতের বিরুদ্ধে। এমন এক রোমাঞ্চকর রমোন্যাসিক কাহিনী চিত্তাকর্ষক না হয়েই পারে না।

কিন্তু বোঝাবো কাকে? এমন কোন ছবিতে টাকা ঢালার মানুষ জোগাড় ক'রতে বেশ কয়েক বছর কেটে গেল, কারণ ছবির রাজ্যের কেউই আমাদের কথা শুনতে চায় না। এস্কিমোদের মত গেঁয়ো জাতের ছবি কে আর দেখতে চায়? যাই হোক শেষটায় প্যারিসের এক নামকরা পশু-লোম প্রতিষ্ঠান রেভিলঁ ফ্রেরে অর্থ দেবেন ব'লে প্রতিশ্রুতি দিলেন। প্রতিষ্ঠানটি তখন সুদূর উত্তর সীমান্তে তাঁদের ব্যবসা পরিচালনা করছিলেন। জানালেন—হাডসন্‌ উপসাগরের পূর্ব উপকূলে

·দের একটা শাখা আছে, সেখানে বছরখানেক থেকে ছবিটা তুলতে পারি।

হাডসন্ উপসাগরের উত্তর-পূর্বকূলে রেভিলঁ ফ্রেরে-র সেই ক্ষুদ্র শাখা পোর্ট হ্যারিসনে পৌছোতে আমার দু'মাস লেগে গেলো। পথ অত্যন্ত অসুবিধাজনক ও বিপদসঙ্কুল, ছোট ছোট সালুতি ও ডিঙ্গী ছাড়া গত্যন্তর নেই। সঙ্গে দু'টো 'এ্যাক্‌লে' মুভি ক্যামেরা নিলাম। তখনকার দিনে 'এ্যাক্‌লে'ই সবচেয়ে ভালো ক্যামেরা ছিল, কারণ তীক্ষ্ণতম শীতের দেশেও তাতে সবচেয়ে কম গ্রীজ্ ও লুবরিকেটিং অয়েল ব্যবহার ক'রতে হ'ত। তাছাড়া এমনভাবে তৈরী যেদিকে খুশি মুখ ঘোরানো যায়, একটুও কাঁপে না কিম্বা ঝাঁকি লাগে না। প্যানিং আর টিলটিংয়ের সুবিধার জন্যে আমি আমার সমস্ত ছবিতেই এই ক্যামেরা ব্যবহার ক'রেছি এবং আজও ক'রে থাকি। এ বিষয়ে হয়তো আমিই অগ্রণী। আমি দেখেছি তখনকার দিনে হলিউডে যদি কোন ক্যামেরাম্যান তাঁর ক্যামেরা প্যান ক'রতেন তাহোলে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সে দৃশ্যটি ছবি থেকে বাদ দিতে হ'ত, কারণ তোলার ঝাঁকির চোটে পর্দায় গিয়ে দৃশ্যটির আর দৃশ্যত্ব ব'লে কোন পদার্থ থাকতো না।

ফিল্ম্ ডেভালাপ করবার প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্যও আমার সঙ্গে নিলাম, তাছাড়া প্রিন্ট ও প্রোজেক্টের সরঞ্জাম তো রাখতে হলই। লাইটিংয়ের যন্ত্রপাতিগুলো যতদূর সম্ভব হাল্‌কা দেখে নিতে হ'ল, কারণ হাডসন উপসাগরে যেতে হ'লে অন্ততঃ শ'দুয়েক মাইল সালুতিতে পাড়ি দিতে হয়। আর জিনিস-পত্তর নেওয়া মানেই বহন করা। বহন করা মানেই বাক্সবন্দী ক'রে নিজের পিঠে চাপানো, নয়তো রেড ইণ্ডিয়ানদের পিঠে—যাদের জলপথে সঙ্গে নিয়েছিলাম। আর সে যা পথ! ভগবানই শুধু জানেন মাল বইবার ঠ্যালা। এক জায়গায় তো স্রেফ্ দু'দিন মাল পিঠে নিয়ে পাড়ি দিতে হ'ল।

কোডাক্ কোম্পানী ডেভালাপের সব সরঞ্জাম ঠিক ক'রে দিয়েছিলেন, এবং ব'লতে কি ফিল্ম্ কি ক'রে ডেভালাপ ক'রতে হয় তাও আমায় শিখিয়ে দিয়েছিলেন। শেখবার জন্যে তাঁদের সঙ্গে কয়েক সপ্তাহ কাটিয়েছিলাম, আর তাঁরাও শেখাতে যত্নের কোন ত্রুটী করেননি।

আমার প্রিন্টিং মেসিনটা ছিল পুরানো ইংলিশ উইলিয়ামসন্ প্রিন্টার। প্রিন্ট ক'রতে গিয়ে দেখি ইলেক্‌ট্রিকের আলোয় কুলোচ্ছেনা, কারণ আমার সেই ছোট্ট জেনারেটার থেকে যে বিদ্যুৎ সৃষ্টি হচ্ছিল তার তেজের ঘনঘন হ্রাসবৃদ্ধি হচ্ছিল। সুতরাং ইলেকট্রিকের আশা ত্যাগ ক'রে দিনের আলোকেই কাজে লাগাতে হ'ল। ছবির ফ্রেম অনুযায়ী আলো যাতে আসে তেমনি ক'রে জানালায় একটা ফুটো করে নিলাম। আর সেই অবারিত দিনের আলোকে প্রয়োজনমত নিয়ন্ত্রণ করতাম প্রিন্টারের এ্যাপারচারে দু'-এক টুক্‌রো মসলিন লাগিয়ে, কিংবা দরকার হ'লে দু'একটা খুলে নিয়ে।

প্রিন্ট কিংবা ডেভালাপ করার তেমন কোন অসুবিধা হ'ল না, কিন্তু সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো ফিল্ম ধোয়া এবং শুকোনো। যে কাঠের কুঁড়ে ঘরখানায় থাকতাম তারই সংলগ্ন একখানা ছোট্ট ঘর তুলে নিলাম ফিল্ম্ শুকোবার জন্যে। আর তাপের আর কোন উপায় না দেখে চমৎকার একটা ব্যবস্থা ক'রে ফেললাম উনুনে নরম কয়লা পুড়িয়ে! নরম কয়লা অর্থে বুঝতেই পারছেন কাঠ ছাড়া আর কি হ'তে পারে? কিন্তু তাতেও বুঝি কুলোয় না! এক রীল না শুকোতেই কাঠ বাড়ন্ত। সুতরাং ছুটতে হয় আমার এস্কিমো বন্ধুদের। সমুদ্রের ধারে খুঁজে স্রোতে ভেসে-আসা কাঠ-কুটো কুড়িয়ে এনে তবে তারা তাপ গতি করে।

কিন্তু চরম ভুগতে হয়েছিল ফিল্ম্ ধোয়ার ব্যাপার নিয়ে। তার জন্যে সারা শীতকাল ছ'ইঞ্চি পুরু বরফের আস্তরণ কুঁদে ও বড় একটা ফুটো রাখতে হয়েছিল আমার এস্কিমোদের। আর সেই ফুটো দিয়ে জল তুলে পিপে ভ'রে কুকুরটানা শ্লেজে ক'রে আমার কুঁড়েতে তারা পৌছে দিতো। তারপর আমরা সবাই মিলে সেই জল থেকে বরফের কুচো বাছতে লেগে যেতাম। পরিষ্কার হবার পর সেই জল ঢালতাম ফিল্মের ওপর। আজও বেশ

মনে আছে এস্কিমোদের জামা থেকে খসে-পড়া হরিণের লোম বরফ কুচোর চেয়েও কম ভোগায়নি !

ছবি তোলার সঙ্গে সঙ্গে 'রাস্-প্রিন্ট' দেখা আমি অত্যন্ত প্রয়োজন মনে করি এবং আমার ছবি নির্মাণের এইটাই একমাত্র উপায়। এ ক্ষেত্রে অবশ্য আরও একটা উদ্দেশ্য ছিল—এস্কিমোদের প্রোজেক্ট ক'রে দেখানো যাতে তারা বুঝতে পারে কি আমি তুলছি, এবং আমার সঙ্গে সহ-যোগিতা করে সমান অংশীদাররূপে।

প্রথম যখন এলাম ওরা অবাক হয়ে গিয়েছিল আমার যন্ত্রপাতি আর সাজ-সরঞ্জাম দেখে। সবিস্ময়ে প্রশ্ন ক'রতো কি আমি ক'রতে এসেছি। যখন ব'ললাম—তাদের মধ্যে বছরখানেক থেকে তাদের ছবি তুল্‌তে এসেছি—যে ছবিতে তারা নড়া-চড়া ক'রবে—ওরা তখন হাসির তোড়ে ফেটে প'ড়লো। ব'লতে কি প্রথম প্রথম ওরা জানতোই না কিভাবে ষ্টিল্ ফটোগ্রাফ দেখতে হয়। পরখ করবার জন্যে আমি প্রথমে ওদের কতকগুলো 'ষ্টিল্' নিলাম। ষ্টিলগুলো যখন প্রিন্ট্ ক'রে ওদের দেখালাম, দেখি ওরা সেগুলো উল্টো ক'রে ধ'রে দেখ্‌ছে। তখন হাত থেকে ছবিগুলো নিয়ে ওদের আমার আস্তানায় এনে বড় আয়নার সামনে দাঁড় করালাম। বললাম আয়নায় নিজেদের মুখ দেখতে, আর আমি ছবি নিয়ে মাথার পাশে ধরলাম। ব্যস্, ওম্নি দেখি একগাল হেসে ফেল্‌লো। উল্টো-সোজার ভুল এতক্ষণে ওরা ধরে ফেলেছে।

বরাত গুণে ছবির প্রথম সটই নিলাম দুরন্ত ওয়াল-রাসের সঙ্গে ওদের লড়ায়ের। ডেভলাপ ক'রে দৃশ্যগুলো তখনই প্রিন্ট ক'রে নিলাম। প্রোজেক্ট করার সময় মনে মনে ভাবলাম—এস্কিমোরা বুঝতে পারবে তো! এই সুদূর হাডসন্ উপসাগরের তীরে আমার ছোট্ট কুঁড়ে ঘরের দেওয়ালে টাঙানো কম্বলের বুকে ওয়ালরাস্ শিকারের এই চঞ্চল চলমান দৃশ্যগুলোর রস কি ওরা গ্রহণ ক'রতে পারবে? শেষটায় যখন বললাম—ছবি দেখাবো, তখন দেখি আমার অপরিসর কুঁড়েখানা মানুষে ভ'রে গেছে, তিলধারণের স্থান নেই, দম প্রায় বন্ধ হয়ে আসে। ঘরের আলো নিভিয়ে ইলেকট্রিক জেনারেটার চালিয়ে দিয়ে প্রোজেক্টারের আলো জ্বালালাম। এক ফালি তীব্র আলো এসে পড়'লো সামনের টাঙানো কম্বলখানার ওপর। ছবি সুরু হ'ল। প্রথমটা আমার দর্শকবৃন্দ বারে বারে পেছন ফিরে প্রোজেক্টারের মুখ দিয়ে কেমন করে আলো আসছে তাই দেখতে লাগলো অসীম কৌতূহলে। বুঝলাম ছবি আমার নির্ঘাৎ মার খাবে। কিন্তু হঠাৎ শুনি কে যেন চেঁচিয়ে উঠ্‌লো, 'ইভিয়াক্!'—অর্থাৎ ওয়ালরাস্! ছবিতে দেখা গেল এক পাল ওয়ালরাস্ সমুদ্রের পাড়ে শুয়ে রোদ পোয়াচ্ছে। সামনের দিকে নানুক তার দলবল নিয়ে হার্পুন হাতে, উপুড় হয়ে পেটের ওপর হামাগুড়ি দিয়ে ওয়াল-রাসের দিকে এগোচ্ছে। মুহূর্তেই ওয়ালরাস্‌গুলো সতর্ক হয়ে ঝুপ্ ঝুপ্ ক'রে জলে ঝাঁপিয়ে প'ড়তে লাগলো। তখন দর্শকদের সে কি ব্যগ্র চীৎকার! আর সে কাকলী স্তিমিত হয়ে এলো আনন্দে যখন নানুক ঝাঁপিয়ে পড়ে হার্পুন চালালো অব্যর্থ লক্ষ্যে। তারপর সুরু হ'ল এক ভীষণ টাগ্-অফ্-ওয়ার! একদিকে নানুক তার অনুচরদের নিয়ে হার্পুনের দড়ি ধরে টানছে, অপর দিকে শরবিদ্ধ ওয়ালরাস্ মরিয়া হয়ে জলের মধ্যে তোলপাড়্ করছে আর সে দৃশ্য দেখে আমার দর্শকরা, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা, অধীর উত্তেজনায় চঞ্চল হয়ে উঠ্‌ছে। মনে হল সেই ঘরে বসেই তারাও যেন লড়ছে ওয়ালরাসের সঙ্গে, নানুকের চেয়ে কিছু কম নয়। আর ঘন ঘন চেঁচাচ্ছে—'ধর্! ধর্!', 'পালালো! পালালো!'

সেদিন থেকে দেখলাম নানুক ও তার সঙ্গীদের কিছুই অকরণীয় নেই আমার জন্যে। নানুকের অবিরাম চিন্তা—ছবিতে কি কি নতুন শিকারের দৃশ্য দেওয়া যায়। বিশেষ ক'রে একটি দৃশ্য নিয়ে ও দিনরাত মাথা ঘামাতো। বললে, সুদূর উত্তর সীমানায় ওর নাকি এক জানা জায়গা আছে সেখানে শীতকালে স্ত্রী-ভাল্লুক সন্তান প্রসবের জন্যে আস্তানা গাড়ে। 'হ্যাঁ, ছবির মত ছবি হবে,' ব'ললে ও। 'স্ত্রী-ভাল্লুকের আস্তানা খুঁজে বের করা এমন কিছু শক্ত হবেনা। বিরাট বিরাট বরফের চাঁইয়ের নীচে ওরা থাকে, আর সেই বরফের দুর্গে একটা ক'রে ফুটো থাকে যেখান দিয়ে ওদের গায়ের উত্তাপ ধোঁয়ার মত

রূপ হোয়ে বেরিয়ে আসে বাইরের ঠাণ্ডা বাতাসে, কুকুররা ঠিক এর গন্ধ পাবে, আর আমি তা' থেকে রাস্তানাটা ঠিক আন্দাজ ক'রে নেবো। তারপর আপনি যখন ক্যামেরা ঠিক ক'রবেন সেই ফাঁকে হার্পুন নিয়ে হামাগুড়ি মেরে আমি সেখানে হাজির হবো, বরফ-কাটা ছুরি দিয়ে বরফ কাটতে সুরু ক'রবো। গর্ত ক'রতে দেখলেই ভাল্লুক রেগে ছুটে আসবে। তখন আমার লোক কুকুরগুলোকে ছেড়ে দেবে, তারা গিয়ে ভাল্লুককে ঘিরে ধ'রবে। আর আপনার ইঙ্গিত পেলেই আমি তাক্ ক'রে হার্পুন ছুঁড়বো। ব্যস্, তুমুল লড়াই সুরু হয়ে যাবে।' উল্লসিত নানুক উৎসাহে উত্তেজিত হয়ে ব'লতে থাকে,—কুকুরগুলো ঝাঁপিয়ে প'ড়বে ভাল্লুকের উপর। এক একবার ভাল্লুক তাদের ধ'রে ছুঁড়ে ফেলবে, আর তারা শূন্যে বারকয়েক পাক খেয়ে বরফের উপর গড়িয়ে প'ড়বে। দৃশ্যটা খুব জমাট হবে ব'লে মনে হয় না আপনার?'—নানুক আমায় জিজ্ঞাসা করে।

যাই হোক, দীর্ঘ কাহিনীকে সংক্ষেপে ব'ললে—সেই ভাল্লুক শিকারে আমাদের লেগেছিল পঞ্চান্ন দিন, কল্পনাতীত দুরন্ত শীতের মধ্যে যাতায়াতে পাড়ি দিতে হ'য়েছিল ছ'শ' মাইল—সমুদ্রের বুকে জমা বরফের বিপদসঙ্কুল পথে। কিন্তু তবু এক ইঞ্চি ফিল্মও তুলতে পারিনি! কারণ তখন বরফের অবস্থা এত শোচনীয় ছিল যে নানুক একটা শীল মাছও শিকার ক'রতে পারেনি। মাঝখান থেকে দুটো কুকুর হারালাম, অনাহারে মারা গেল। তবে শেষটায় যে আমরা প্রাণ নিয়ে ফিরতে পেরেছি, নেহাৎ আমাদের বরাত জোর!

যাই হোক একদিন ছবি শেষ হ'ল। নিউ ইয়র্কে ফিরলাম। ছবিটা এডিট ক'রতে একটা শীতের বেশীর ভাগই লেগে গেল। যখন দেখাবার মত হ'ল নিউ ইয়র্কের ডিষ্ট্রিবিউটারের দোরে দোরে ঘুরলাম, যদি তাঁদের একজনও কেউ দয়া ক'রে ছবিটার পরিবেশনের ভার নেন এই আশায়। খুব স্বাভাবিক যে প্রথমে আমি সবচেয়ে বড় ডিষ্ট্রিবিউটারের কাছেই নিয়ে যাবো। নিয়েও গেলাম তাই—প্যারামাউণ্টের কাছে। প্রোজেক্শান রুম তাঁদের কর্মচারীতে ভ'রে গেল আর ছবি শেষ হবার আগে ঘর ভ'রে উঠলো সিগারেটের নীলচে ধোঁয়ায়। ছবি শেষ হ'লে তাঁরা উদাসীনভাবে উঠে পড়লেন আসন ছেড়ে, তারপর চুপচাপ বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। ম্যানেজার কাছে এসে আমার গলা জড়িয়ে ধ'রে জানালেন—তিনি অত্যন্ত দুঃখিত, এ ছবি সাধারণ দর্শকদের দেখানো চলে না। ব'ললেন—এ ধরণের সাধু প্রচেষ্টা পূর্বে তিনি বহুবার ক'রেছেন কিন্তু বিফল হ'য়েছেন। সেইসঙ্গে উত্তর মেরুর প্রচণ্ড কষ্টবরণে আমায় সহানুভূতি জানালেন এবং দুঃখ করলেন যে আমার এত পরিশ্রম ব্যর্থ হল।

অতএব আমায় দ্বিতীয় বড় প্রতিষ্ঠানের দ্বারস্থ হতে হল। তাঁরা আরও কুলীন, ছবি দেখার পর ফোন মারফৎ আমার উৎকণ্ঠিত অনুসন্ধানের জবাব পর্য্যন্তও দিলেন না। তখন বাধ্য হয়ে যথেষ্ট বিনয়সহকারে আমায় তাঁদের প্রোজেক্শান্ রুমে হাজির হতে হল এবং ফিল্মটা ফিরিয়ে নিয়ে যাবার অনুমতি প্রার্থনা ক'রতে হল।

একদিন প্যাথে ফ্রেরেকে ছবিটা দেখালাম। আজ তেমন না থাকলেও তখনকার দিনে প্রতিষ্ঠানটি খুব বড় চিত্র-পরিবেশক ছিল। রেভিলঁ ফ্রেরের মত প্যাথেও একটি ফরাসী প্রতিষ্ঠান। জলের চেয়েও রক্তের গাঢ়ত্বের প্রবাদ আছে, তাই ভাবলাম, হয়তো বা ওদের দিয়ে কিছু হলেও হ'তে পারে। প্যাথে ছবিটা দেখলেন। তাঁদের মতে ওটা আকর্ষণীয় হলেও গল্পাশ্রয়ী ছবির মত প্রদর্শনীয় নয়—কেটে-কুটে কতকগুলো ধারাবাহিক শিক্ষা-চিত্র হিসাবে দেখানো উচিত। কিন্তু এরপর একদিন আর একবার প্যাথের প্রোজেক্শান রুমে ছবিটা দেখানোর সুযোগ হল। সেদিন উপস্থিত ছিলেন মাদাম ব্রুনেট—কোম্পানীর প্রেসিডেন্টের স্ত্রী, আর ছিলেন আমার একজন পুরনো সাংবাদিক বন্ধু কোম্পানীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। আমার এই বন্ধুটিই প্যাথের কর্মীদের মধ্যে একমাত্র যিনি ছবিটি দ্বিতীয়বার দেখবার আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। যাই হোক দেখে তাঁরা রীতিমত মুগ্ধ হলেন।

আর ধীরে ধীরে প্যাথের আগ্রহও বাড়তে লাগলো, শেষটায় তাঁরা ঠিক ক'রলেন ছবিটা নেবেন এবং কাহিনী-সম্বলিত ছবি হিসাবে বাজারে পরিবেশন ক'রবেন।

এরপর সমস্যা হ'য়ে দাঁড়ালো ভালো ছবিঘর পাওয়া। ব্যাপার হ'ল কি, তখনকার দিনে নিউ ইয়র্কের সবচেয়ে বড় প্রেক্ষাগার ছিল 'ক্যাপিটল'—বৃহত্তম পরিবেশক প্রতিষ্ঠান রক্সির পরিচালনাধীনে। কিন্তু আমরা বেশ জানতাম যে রক্সিকে ছবি দেখানো মানে বিফলতাকে আমন্ত্রণ ক'রে আনা। প্যাথে তাই ব'ললেন,—'ছবির সঙ্গে "মুখরোচক" কিছু ব্যবস্থা ক'রতে হবে।' প্যাথের প্রচার-বিভাগের বড় কর্তার কোন রক্সির অন্তরঙ্গ বন্ধু। তাই সাব্যস্ত হ'ল যে প্রথমে ছবিটা তাঁকে এবং তাঁর জনকয়েক বন্ধুকে দেখানো হবে এবং তাঁদের বলা হবে ছবিটার কোথায় কোথায় তাঁরা বাহবা দেবেন আর হাততালি দিয়ে তারিফ ক'রবেন। তারপর তাঁরা 'ক্যাপিটলে' রক্সির প্রশস্ত প্রোজেকশান রুমে এসে ছবি দেখবেন আর আমাদের নির্দেশমতো কাজ ক'রবেন। আমরা নিষেধ ক'রে দিলাম তাঁরা যেন সোজাসুজি রক্সিকে ছবি সম্পর্কে কিছু না বলেন তার চেয়ে বরং তাঁরই সামনে তাঁকে শুনিয়ে নিজেদের মধ্যে এমনভাবে প্রশংসা সুরু ক'রে দেন যেন রক্সি সেখানে অনুপস্থিত। এ ব্যবস্থায় বেশ সুফল পাওয়া গেল এবং ছবি শেষ হ'তে না হ'তেই দেখা গেল রক্সি তাঁর চুল ছিঁড়তে সুরু ক'রে দিয়েছেন। প্রশংসায় পঞ্চমুখ হ'য়ে তিনি ব'লতে লাগলেন—'চমৎকার'! 'অপূর্ব'! 'এপিক'! 'মাষ্টারপিস্'! ইত্যাদি ইত্যাদি। সঙ্গে সঙ্গে ছবি 'বুক্‌ড্' হ'য়ে গেল। তবু কিন্তু প্যাথে নিশ্চিন্তভাবে বিশ্বাস ক'রতে পারলেন না, তাই চুক্তিটাকে কায়েম ক'রবার জন্যে ওর সঙ্গে জুড়ে দিলেন, 'গ্র্যাণ্ড মাস্ বয়'। হ্যারল্ড লয়েডের প্রথম নামকরা ছবি—যার জন্যে তখন নিউ ইয়র্কের প্রত্যেকটি প্রেক্ষাগার ঝুলোঝুলি ক'রছিল। সর্ত হ'ল: রক্সি 'গ্র্যাণ্ড মাস্ বয়' পেতে পারেন যদি সেই সঙ্গে তিনি 'নানুক'ও নেন।

এর দিনকয়েক পরে 'ক্যাপিটলে'র ম্যানেজিং ডাইরেক্টার মেজর বোয়েস ছবিটা দেখে রেগে একেবারে আগুন হয়ে গেলেন। জানালেন এ ছবি নেওয়া চলবেনা, এবং ভয় দেখালেন যে এছবি নিলে রক্সিকে তিনি ডোবাবেন। ব্যাচারা রক্সি তখন মরিয়া হয়ে উঠলেন সর্তের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে। প্যাথের কিন্তু সেই একই পণ—'নানুক' বিনা ছাড়িবনা 'গ্র্যাণ্ড মাস বয়'।

সুতরাং 'নানুক' মুক্তিলাভ ক'রলো 'ক্যাপিটল থিয়েটারে'। মিশ্রিত বিজ্ঞাপন বেরোলো। এক সমালোচক ছবিকে নিন্দা করলেন মৃদু প্রশংসার মিশেল দিয়ে, তারপর সপ্তাহকয়েক পরে ভালো সমালোচনাও লিখলেন। তবে আমেরিকায় ছবিটি ততদিন সত্যিকার সমাদর পায়নি যতদিন না লণ্ডন, প্যারিস, বার্লিন, রোম প্রভৃতি দেশে তুমুল সাফল্যের ধাক্কা সেখানে এসে লাগে। আর সব দেশে যখন দিনের পর দিন মাসের পর মাস চ'লতে লাগলো তখনই দেখা গেল আমেরিকার দর্শক ছবিটিকে গ্রহণ ক'রলেন। এ শুধু 'নানুক'-এরই নয় আমাদের সব ছবির বেলাতেই ঠিক এমনি হয়। ইউরোপে, বিশেষ ক'রে কন্টিনেন্টেই সেগুলো সমাদৃত হয় বেশী।

জিজ্ঞাসা ক'রছেন—পৃথিবীর দূর দূরান্তের মানুষের সঙ্গে বিরাট দর্শকবৃন্দকে অন্তরঙ্গভাবে পরিচয় করিয়ে দিতে ছবির ক্ষমতা সম্পর্কে আমি কি ভাবি? তার তো জলন্ত নিদর্শন রয়েছে—'নানুক'। উত্তর-মেরু সম্পর্কে লেখা বই হয়তো খুব কম লোকই পড়েছেন, কিন্তু বিগত ছাব্বিশ বছরে 'নানুক' দেখেছেন পৃথিবীর কোটী কোটী লোক। আর তাঁরা দেখেছেন মেকি কিছু নয়, সত্যিকার খাঁটি মানুষ—বিঘ্নসঙ্কুল জীবনের সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত মানুষ, কষ্টের মাঝে থেকেও যে সদা সুখী। দু'বছর আগে নানুক যখন মারা যায় অনাহারে তার মৃত্যু সংবাদ প্রকাশিত হয় পৃথিবীর সর্বত্র, এমনকি সুদূর চীন দেশেও।

মেরুবাসীর জীবনযাত্রার প্রতি আমার স্তুতিময় বিস্ময় ও অন্তরের আকর্ষণই আমার 'নানুক' সৃষ্টির

অনুপ্রেরণা জোগায়। আমি চেয়েছিলাম বিশ্বের সকলের কাছে তাদের কাহিনী শোনাতে। আপনারা অনেক প্রেম-চিত্র দেখেছেন কিন্তু সব ক্ষেত্রেই দেখা যায় স্রষ্টা থাকেন উপরে আপন গর্বে উন্নীত, উঁচু থেকেই দৃষ্টি দেন চিত্রের বিষয়বস্তুর ওপর—শ্রদ্ধা সহকারে নয়। তিনি সেখানে একজন হোমরা-চোমড়া—নিউ ইয়র্ক কিম্বা লণ্ডনের। আমি কিন্তু যাদের ছবি তুলেছি, নির্ভর ক'রেছি সম্পূর্ণ তাদের ওপরেই। একা কাটিয়েছি তাদের সঙ্গে মাসের পর মাস, ঘুরেছি তাদের সঙ্গে, থেকেছি তাদেরই মধ্যে। আমার শীতার্ত পা দু'খানি ঠাণ্ডায় অচল হ'য়ে এলে তারা তা' গভীর অনুরাগে ঢেকে দিয়েছে, হাত যখন অসাড় হ'য়ে এসেছে হিমে তারা আমার সিগারেট জ্বেলে দিয়েছে সযত্নে। দীর্ঘ দশ বছর-ব্যাপী যতবারই অভিযানে বেরিয়েছি তারাই আমার সব ভার গ্রহণ ক'রেছে। আমার সৃষ্টি গ'ড়ে উঠেছে তাদেরই সহযোগিতায়। তাদের ছাড়া কিছুই আমি ক'রতে পারতাম না। আসল কথা, এ হ'ল এক মানবিক সম্পর্কের প্রশ্ন।

'নানুক'-এর সাফল্যে এবার প্যারামাউন্টই প্রথম ছুটে এলেন আমার কাছে—যে প্যারামাউন্ট প্রথম আমার ছবি নাকচ ক'রেছিলেন। এসে জানালেন: আমি যেখানকার খুশি টিকিট কেনবার হুকুম দিতে পারি, যেখানে খুশি যেতে পারি·········পৃথিবী আমার আবাস! মনে মনে গর্ব অনুভব ক'রলাম। তখনই ডেকে পাঠালাম ফ্রেড্রিক ও'ব্রায়েনকে—আমার একজন পুরানো বন্ধু। দক্ষিণ সমুদ্রাঞ্চল নিয়ে ওর লেখা হোয়াইট শ্যাডোজ বইখানা তখন বাজারে খুব কাটছে। ওকে প্যারামাউন্টের প্রস্তাব জানালাম। 'বেশ তো, একটা ভোজের আয়োজন করো, খেতে খেতে আলোচনা করা যাবে'—ব'ললে ও। সেইমতো কফি-হাউস ক্লাবে আমরা মিলিত হ'লাম। ফ্রেড তার অন্যান্য বন্ধুদের মধ্যে জর্জ বিড্ল্‌কেও এনেছিল। জর্জ তখন তাহিতি থেকে সবে শিল্প-সাধনা শেষ ক'রে ফিরেছে। 'দশ বছর উত্তর মেরুতে ছিলে। তবে তো বন্ধু এক-ঘেয়ে
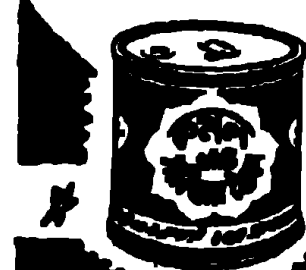
হয়ে গেছে'—ব'ললে ফ্রেড। 'এবার তাহোলে উল্টো দিকে যাওয়া কেন—একেবারে খাস্ দক্ষিণের সমুদ্রকূলে ?' আমার স্ত্রীর চোখ দু'টো চকচকিয়ে উঠলো। 'ছেলেমেয়েদের নিয়ে যাওয়া যাবে তো ?'—সে জিজ্ঞাসা ক'রলো। 'কেন যাবে না ? সে এক স্বর্গরাজ্য !' —জানালে ফ্রেড। আর দু'জনে—ফ্রেড আর জর্জ মিলে, দক্ষিণ দ্বীপপুঞ্জের সৌন্দর্য আর অধিবাসীদের স্তুতি-গানে মুখর হ'য়ে উঠলো। আমরা শুনতে লাগলাম মন্ত্রমুগ্ধের মতো।

স্ত্রী-পুত্র সপরিবারে একদিন আমরা রওনা হলাম দক্ষিণ সমুদ্রের দিকে। হাজির হলাম স্যামোয়ার এক সুদূর দ্বীপান্তর্গত ছোট্ট এক গ্রামে। আর সেখানে সুরু হ'ল আমাদের জীবনের সবচেয়ে অবিস্মরণীয় দু'টি বছর। কিন্তু প্রথমটা সবই যেন অদ্ভুত লাগতো, মনে হ'ত কেমন যেন গোলমেলে। প্রাথমিক পরীক্ষা ছাড়াও সত্যিকার ক্যামেরার কাজ সুরু ক'রতেই বেশ কয়েক মাস কেটে গেল। আমাদের কতকগুলো পূর্ব-পরিকল্পিত ধারণা ছিল, ভাবতাম—ঝড়-ঝঞ্ঝা প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে জীবনসংগ্রামই হল ছবির উৎকৃষ্ট উপাদান। কিন্তু দক্ষিণ সমুদ্রাঞ্চলে এ জাতীয় সংগ্রামের অভাব। সেখানে সম্পূর্ণ এক বিপরীত পরি-বেশ। সবকিছুই সেখানে শান্ত, সবকিছুই সেখানে অনায়াসলব্ধ, মনে হয় যেন নাটকীয় মাল-মশলা সেখানে একান্ত দুর্লভ। এমন সমস্যায় জীবনে কখনো পড়িনি। সেখানকার অধিবাসীরা যেন স্বর্গে বাস করে। ভগবান গাছে গাছে সুপক্ক ফল সৃষ্টি করে রেখেছেন ওদের মুখে টুপ্ ক'রে পড়বার জন্যে। খাদ্য সমস্যার কোন বালাই নেই ওদের। ওদের সমস্যা যেটা (যেন ওরা ওদের বীরত্ব ও জাতীয় চরিত্রের দৃ[illegible]েক টিকি[illegible] রাখার জন্যেই—এমনকি স্বর্গের দেবতাদেরও যা বজায় রাখতে হয়, ওরা একটা সমস্যা উদ্ভাবন ক'রেছে)—সেটা হ'ল উল্কি আঁকার উৎসব। অনুষ্ঠানটি অত্যন্ত বেদনা-দায়ক। মনে হয় সব আদিম জীবন প্রণালীর বনিয়াদ, সব ধর্মেরই ভিত্তি যেন জড়িয়ে আছে এমনি এক একটা কৃচ্ছতার সাধনার সঙ্গে—এ যেন অনেকটা আমাদের ক্রুশে আত্মোৎসর্গের মতো। তবে এক হিসেবে ওদের এ উদ্ভাবন আমাদের সমস্যাকে আরও জটিল ক'রে তুলেছিল। যাই হোক দীর্ঘদিন থাকার ফলে অনেক জিনিসই আমি আবিষ্কার ক'রতে পেরেছিলাম যা একদিন সব জটি-লতাকে দূর ক'রে ছবির কাজ সুরু করার সহায়তা করে।

'নানুক'-এর বেলায় যেমন এবারেও আমি বৈদ্যুতিক আলোর সরঞ্জাম, ডেভালাপিং-এর মালমশলা ও প্রোজেক্টার নিয়েছিলাম। তবে এবারে একটা রঙীন ছবি তোলার ক্যামেরাও সঙ্গে ছিল—সেকেলে প্রিজ্‌মা ক্যামেরা। সেই প্রিজ্‌মা ক্যামেরা, যাতে ভারতবর্ষের দরবারের রঙীন ছবি তোলা হয়েছিল। সে ছবির কথা হয়তো আজও অনেকের মনে আছে।

প্রিজ্‌মা ক্যামেরায় প্যানক্রোম্যাটিক ফিল্ম ব্যবহার করা হয়। তখনকার দিনে প্যানক্রোম্যাটিক ফিল্ম বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া ব্যবহৃত হ'ত না। আমরা পরীক্ষা ক'রে

কে তিনি

বাংলা চিত্রজগতে নবাগতা

রমলা চৌধুরী

শারদীয়া • চিত্রবাণী • ১৩৫৮

...খলাম মুভি ক্যামেরায় সাধারণ অর্থোক্রোম্যাটিক ফিল্মে ...তুললে ওদেশের অধিবাসীদের গায়ের রং কেমন ... কালো দেখায়। সুন্দর শ্যামোয়ানরা পর্দায় ... হ'য়ে পড়ে। তাদের চকচকে ব্রোঞ্জের ... কালো লাগে, মাথার লাল টকটকে ফুলগুলো শ্রীহীন ...চে ব'লে মনে হয়। রঙের পার্থক্য আদৌ চোখে পড়ে না।

তখন আমরা অন্য পথ অবলম্বন ক'রলাম। রঙীন ক্যামেরার জন্যে কিছু প্যানক্রোম্যাটিক ফিল্ম এনেছিলাম, ...ই লাগালাম সাধারণ ক্যামেরায়। চমৎকার ফল ...ওয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে চল্লিশ হাজার ফিট অর্থো-ক্রোম্যাটিক অর্ডার ক্যান্সেল ক'রে ইষ্টম্যান কোডাককে প্যান-ক্রোম্যাটিকের জন্যে কেব্‌ল্‌ ক'রে দিলাম। কিন্তু প্যারামাউণ্টকে জানাতে সাহসে কুললো না। ছবিতে আগাগোড়া আমরা প্যানক্রোম্যাটিক ব্যবহার ক'রেছিলাম। এতে অবশ্য আমরা চলচ্চিত্র আইন লঙ্ঘন করেছিলাম। আমাদের ডেভালাপিং রুম ছিল মাটির নীচে—চোরা কুঠরীতে। যতদূর জানি এইটিই হল সর্ব্ব-প্রথম পূর্ণ-দৈর্ঘ্য প্যানক্রোম্যাটিক ফিল্ম। বলতে গেলে এ থেকেই প্যানক্রোম্যাটিক ফিল্মের রেওয়াজ সুরু হয়।

স্যামোয়ার গ্রামে আমরা ছিলাম দু'টি বছর, ওদের সঙ্গে পরম আত্মীয়তায়। ওরা যেন আমাদেরই পরিবার-ভুক্ত ছিল: ওদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা দিনরাত থাকতো আমাদের সঙ্গে—যেন আমাদের বাড়ী ওদের নিজেদেরই গৃহস্থালী।

আমাদের বাঙ্‌লোর পাশেই ঘন নারকেল বনের নীচে একটা জায়গা পরিষ্কার ক'রে নিয়েছিলাম। তার এক প্রান্তে ছিল বৈদ্যুতিক আলোক সৃষ্টির সরঞ্জাম, আর অপর প্রান্তে—প্রায় চল্লিশ ফিট দূরে টাঙানো একখানা বড় ক্যানভাসের পর্দা। এই হ'ল আমাদের আকাশ আঙ্গিনার ছবিঘর। প্রতি সন্ধ্যায় সূর্য ডুবে গেলে দ্বীপের অধিবাসীরা জড় হ'ত সেখানে ছবি দেখবার জন্যে। আমাদের সঙ্গে প্যারামাউণ্টের খানকতক পুরনো ছবি নিয়েছিলাম। তার মধ্যে একটা ছিল যা স্যামোয়ায় ইতিহাস রচনা ক'রেছে। সেটা ছিল জার্মান ফিল্ম—'দি গোলেম', যান্ত্রিক রবোট দৈত্য কি ক'রে প্রাণ পেয়ে মানুষের মত কাজ করে তারই ছবি। ছবিখানা দেখে দেখে ওরা কোনদিনও ক্লান্তি বোধ করেনি। নিশ্চয় ক'রে ব'লতে পারি আজও কেউ যদি আপনারা স্যামোয়ায় যান, শুনতে পাবেন সে ছবির কাহিনী। আমরা যেখানে থাকতাম সে গ্রামের ধারে-কাছে গেলেও সেখানকার অধিবাসীরা আপনাকে ঠিক দেখাবে কোথায় আমরা থাকতাম, দেখিয়ে ব'লবে—অনেকদিন আগে এইখানে এক লম্বাচওড়া যুবক থাকতো আর তার নাম?—গোলেমমী!

দিনের পর দিন যতই রাস্‌-প্রিণ্ট প্রোজেক্ট ক'রে দেখতাম ততই আমাদের দৃশ্য-নির্বাচন শক্ত হ'য়ে পড়তো। শিব-নৃত্য—হাঁ, মন্দ হয়নি—বলতো ওরা ছবি দেখিয়ে দেখিয়ে। তবে ঐ যে, ঐ দৃশ্যটা, ওটা ওরা ওর চেয়েও ভালো ক'রতে পারে। আর এইভাবেই আমাদের ছবির কাজ এগিয়ে চ'লতো।

দ্বীপের মোড়লদের সহযোগিতা খুবই প্রয়োজন।
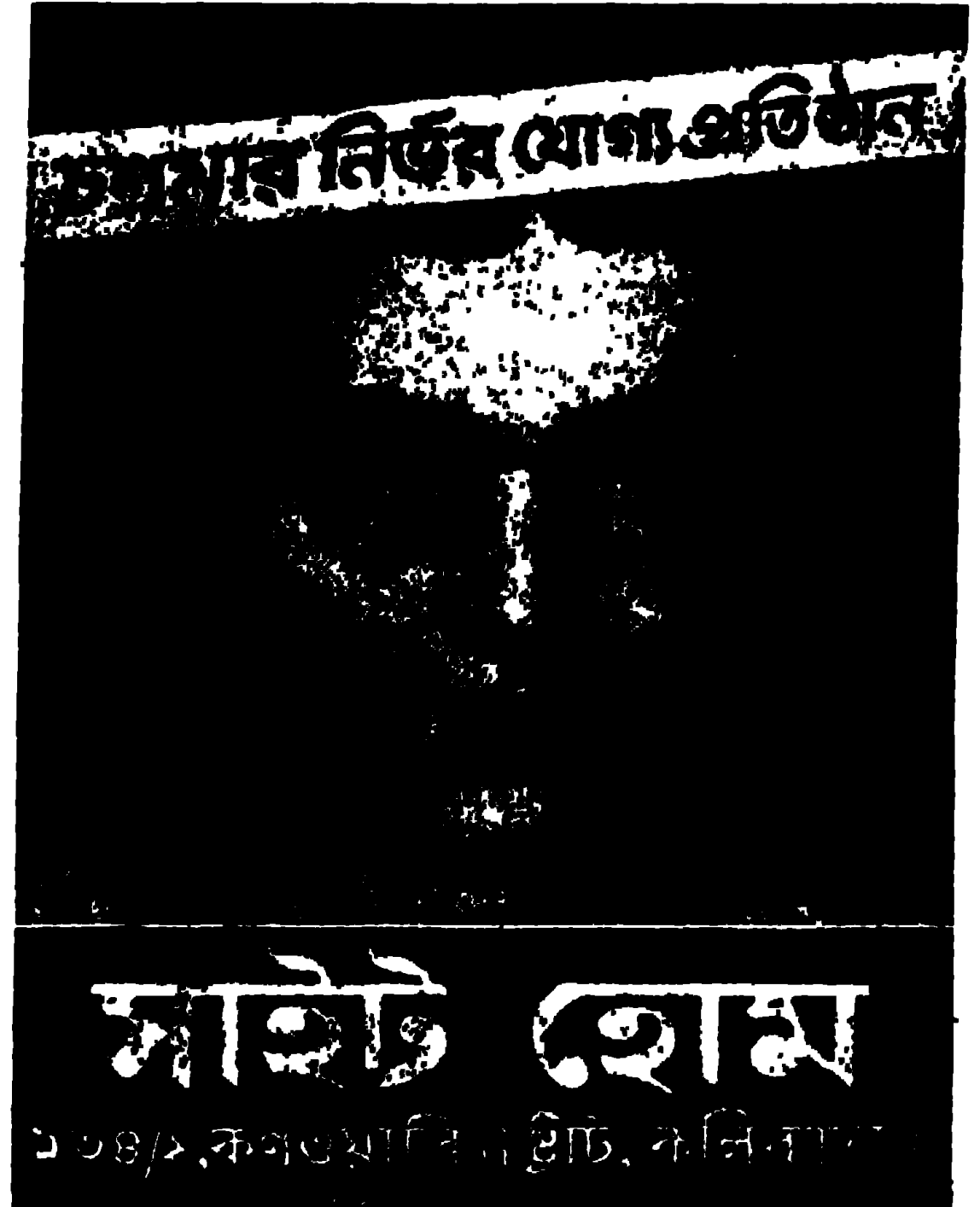
প্রথম প্রথম ওরা আমাদের কাছে আসতো মিশনারীদের ও ব্যবসাদারদের আমদানীকরা বিজাতীয় পোষাকে। কিন্তু যখন বললাম যে ওদের নিজেদের প্রাচীন প্রথা ও পোষাক-পরিচ্ছদের ছবি তুলতেই শুধু আমরা এসেছি তখন দেখলাম ওরা খুব খুশি হ'ল। তখন থেকে সুরু ক'রলে ওদের নানান প্রাচীন কাহিনী শোনাতে। বিস্মৃত পুরনো দিনের অনেক ইতিকথাই ওরা আমাদের ব'লতো। সেই সুদূর সাভাই দ্বীপে যেখানে দু'-একজনের বেশী সাদা মানুষ পদার্পণ ক'রেছে কিনা সন্দেহ, যাওয়ার আমাদের একমাত্র কারণ যে সেখানেই শুধু আজও প্রাচীন পলিনেশীয় সংস্কৃতি বেঁচে আছে। দক্ষিণ সমুদ্রের অন্যান্য পলিনেশীয়ান দ্বীপগুলোয় সে চিহ্ন বহুদিন মুছে গেছে।
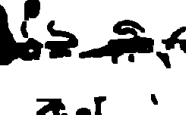
ছবিখানা বারকয়েক মারাত্মক দুর্ঘটনার হাত থেকে অদ্ভুতভাবে বেঁচে যায়। আগেই বলেছি আমাদের ল্যাবরেটরী ছিল মাটির নীচে। সেখানে সহকারী হিসাবে কাজ ক'রতো দু'টি স্যামোয়ান ছেলে। এমনকি তারা নেগেটিভ ডেভালাপ করা থেকে সুরু ক'রে ধোয়া শুকোনো সবই ক'রতো। এ কাজে তারা মনে মনে যথেষ্ট গর্বিত হ'ত সন্দেহ নেই, ল্যাবরেটরীটি শুধু মাটির নীচেই নয় প্রাচীন এক সমাধিক্ষেত্রের ভূগর্ভে। তার ওপর নিবন্ধ অন্ধকারে ঘেরা। অতএব দ্বীপ-বাসীদের বিশ্বাস হওয়াটা অস্বাভাবিক নয় যে সেখানে ভূত আছে। আর ছেলে দু'টিও সে ভয়ের হাত থেকে রেহাই পায়নি। তারা রীতিমত শুয়ে ভয়েই কাজ ক'রতো, আর নিজেদের সাহসকে চাঙ্গা রাখবার জন্যে গান গাইতো কিম্বা চ্যাঁচাতো। কোনরকমে কাজটা শেষ ক'রতে পারলেই তক্ষুনি ফিল্ম্ নিয়ে ছুটে আসতো আমাদের বাঙলোয় এবং পরম শ্রদ্ধাভরে সেটা আমাদের পায়ের কাছে রাখতো—যেন তাদের দ্বীপের প্রধানকে কোন উপঢৌকন দিচ্ছে।

ছবির শেষের দিকে ভীষণ একটা ঘটনা ঘটে। ছেলে দু'টি মহা চিন্তায় ছিল। পাশের গ্রামের এক ছোকরা তাদের একজনের প্রেমিকার কাছে এসে প্রেম নিবেদন করে। যাই হোক সে দীর্ঘ প্রেম-কাহিনীর পরিণতিতে একদিন দেখা যায় ভীন-দেশী ছোকরাটি সমুদ্রের ধারে শুয়ে, বলা বাহুল্য—মৃত অবস্থায়। স্যামোয়ান [illegible] প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ নেওয়া। সবাই [illegible]—প্রতিবেশী গ্রাম কখন বা এর প্রতিশোধ নেয়! আমাদের গ্রাম ওরা ঘেরাও ক'রলো। গ্রামের স্ত্রীলোক শিশুদের সরিয়ে ফেলা হ'ল; পুরুষরা কালো যুদ্ধের সাজ প'রে সারারাত ধ'রে নারকেল বনের ধারে পাহারা দিতে লাগলো। আমরা বাঙলোয় ব'সে রইলাম নিশ্চেষ্ট হ'য়ে। ছবি তখন সমাপ্তপ্রায়। ফিল্ম-বোঝাই চন্দন কাঠের বাক্স বারান্দায় রাখা হ'য়েছে। ছেলে দু'টি পালা ক'রে রাত্তিরে ছবি পাহারা দিচ্ছে বন্দুক নিয়ে।

ছবি সম্পর্কে শেষ ও চরম উদ্বেগপূর্ণ মুহূর্তের স্মৃতি জীবনে কখনও ভুলবো না। সেটা আমাদের বিদায়ের দিন। যে জাহাজে আমরা যাব সেটা সমুদ্রের কোল-ঘেঁষা পাহাড়ের নীচে ঢেউয়ে ঢেউয়ে দুলছে। আমরা সপরিবারে একটি সালতিতে,—ফিল্ম থেকে সুরু ক'রে যাবতীয় জিনিস-পত্তরে বোঝাই। সমুদ্র তখন ফুলছে। পাহাড়ের কোল দিয়ে আমরা নির্বিঘ্নে এগোলাম—অন্য সময় অবশ্য এ পথ অত্যন্ত বিপজ্জনক। জাহাজের কাছে গিয়ে মাল-পত্তর নিয়ে ওঠবার অপেক্ষা করছি হঠাৎ এমনি সময় প্রচণ্ড ঢেউয়ের বেগে জাহাজের কোণা এসে ধাক্কা মারলে আমাদের সালতিকে। মুহূর্তে আমাদের বুক দুর্ দুর্ ক'রে উঠলো—মনে হ'ল নৌকো নির্ঘাৎ ডুববে আর সেই সঙ্গে হারাবো স্ত্রী-ছেলেমেয়ে, ছবি—সব কিছুই। যখন জাহাজে উঠলাম তখনও আমরা কাঁপছি ভয়ে।

নিরাপদে নিউ ইয়র্কে পৌঁছে কোম্পানীকে ছবিখানা দেখালাম। ভাবলাম কর্তাদের মাথা ঘুরিয়ে দেবে দিলও তাই, কিন্তু যতটা আশা করেছিলাম ততটা নয়। কমিটির একজনকে বলতে শুনলাম,—'নাঃ, তেমন জমকালো নয়।' মনে হ'ল হয়তো পুনশ্চ সুরু ক'রতে হবে গোড়া থেকে। 'মোয়ানা' সম্পূর্ণ নতুন ধাঁচের

হ'ব; 'নামুক'কে যা সাকল্যমণ্ডিত ক'রেছিল তেমন কোন উপাদান এতে ছিল না। এর অর্থ হ'ল আবার ঝামেলা, ডিষ্ট্রিবিউসানের জন্মে আবার সেই ...নী—দোরে দোরে ধর্ণা দেওয়া। ছবিখানা পড়ে রইলো অবসন্ন হ'য়ে। শেষে কোম্পানীর পরিবেশন-বিভাগের বড় কর্তার সঙ্গে চূড়ান্ত ফয়সালার দিন তিনি আমায় ব'ললেন,—'দেখুন, আমরা ঠিক ক'রেছি আপনার ছবিখানা একটু যাচাই ক'রে দেখবো। প্রথমে ছ'টি সহরে ছাড়বো, সচরাচর যেমন বিজ্ঞাপন দেই তেমনি দেবো—বেশী নয়, কমও নয়। তবে হাঁ, সহর ছ'টি হবে আমাদের তালিকার সবচেয়ে কড়া সহর। যদি দেখি সেগুলোয় চলে তখন আপনার ছবি বাজারে ছাড়বো।'

সহর ছ'টিকে কাঠিন্যের ক্রমিক মান হিসাবে সাজালে প্রথমেই আসে পাউকিপ্‌সী। নাট্য-জগতে পাউকিপ্‌সী সম্পর্কে একটা প্রচলিত প্রবাদ আছে। লোকে বলে,—'যদি বোঝেন আপনার অভিনয় ভালো, পাউকিপ্‌সীতে চেষ্টা ক'রে দেখতে পারেন!' দ্বিতীয় কড়া সহর হ'ল মধ্য-পশ্চিম নেব্রাস্কা প্রদেশের লিন্‌কোল্‌ন্; তৃতীয়টি সুদূর পশ্চিমে কোলর‍্যাডোর বোল্‌ডার; চতুর্থটি টেক্সাসের অষ্টিন; পঞ্চমটি ফ্লোরিডার দক্ষিণে জ্যাকসনভিলা, আর ষষ্ঠটি হ'ল উত্তর ক্যারোলিনার দক্ষিণে এ্যাসভিলা।

বেশ জানতাম যে যদি এই সহরগুলোয় সাধারণের চেয়ে বেশী প্রচারকার্য্য না চালানো হয় তাহোলে ছবি আমার নিশ্চয়ই মার খাবে। সুতরাং কোম্পানীকে কিছু না জানিয়ে হাজির হ'লাম গিয়ে ন্যাশনাল বোর্ড অব রিভিউয়ের প্রধান উইলটন ব্যারেট এবং হেস্ প্রতিষ্ঠানের কর্বেল জয়েস কাছে। আমার অবস্থাটা তাঁদের বুঝিয়ে বললাম। তাঁরা সহানুভূতি দেখালেন এবং জানালেন যে হয়তো তাঁরা কিছু ক'রতে পারেন। এবার শুনুন তাঁরা কি করেছিলেন আমার ছবির জন্যে: প্রথমে তাঁরা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার গ্রাহকদের নাম ঠিকানা সংগ্রহ করেন। এমন সব পাঠক যাঁরা গতানুগতিক ছবির প্রতি-ক্রিয়াশীল দর্শক নন। যাঁদের সাধারণভাবে 'সুপ্ত' দর্শক বলেও অভিহিত করা চলতে পারে। সকলের ঠিকানা জোগাড় ক'রে ছবির বর্ণনা দিয়ে কার্ড ছাপান। তার মধ্যে বাজারের চলতি প্রচারের বড় বড় গাল-ভরা কোন শব্দ ছিল না। তারপর সেই কার্ডগুলো সকলের কাছে ডাকে পাঠিয়ে দিলেন।

যখন পাউকিপ্‌সীর মত 'কড়া-পাল্লার' সহরে ছবিখানা মুক্তিলাভ ক'রলো, মার খাওয়া তো দূরের কথা, সাধারণ ছবির চেয়ে অনেক ভালোভাবে চ'লতে লা'গলো। বাকি পাঁচটি সহরেও সেই একই হাল। ব্যাপার দেখে কোম্পানী চকচকিয়ে গেলেন। ভাববার অবকাশ না পেয়ে ঠিক ক'রলেন ছবিখানা 'রোড-শো'য় দেবেন,—'রোড-শো' হ'ল বিশেষ ছবির পক্ষে এক ধরণের বিশেষ পরিবেশন পদ্ধতি। যাই হোক দিন-কয়েকের মধ্যেই তাঁরা প্রকৃতিস্থ হ'লেন এবং বুঝলেন যে ছবির বিষয়বস্তু ও দৈর্ঘ্যের দিক থেকে এ পদ্ধতি যুক্তিসঙ্গত নয়। অতএব বিশেষ ব্যবস্থা বাতিল ক'রে ছবিখানিকে সাধারণ ছবির মতো বাজারে ছাড়া হ'ল, এবং তার ফল হিসাবে মারও খেল। পরিবেশন-প্রধানের সঙ্গে এ নিয়ে কথা হ'ল, তিনি এর কারণ জানিয়ে বললেন—যদি ঐ ধরণের আরও অনেক ছবি তাঁদের থাকতো তাহোলে এই বিশেষ ব্যবস্থা চ'লতো, শুধু একখানা ছবির জন্য চলে না।

'নামুক'-এর চেয়ে 'মোয়ানার' রসগ্রহণ করা দর্শকের পক্ষে কিছু শক্ত সব দিক থেকেই। তবে, দর্শকের মধ্যেও রুচির বিভিন্নতা আছে। শুনলে বিস্মিত হবেন ফ্রান্স এবং সুইডেনে 'মোয়ানা' অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করে। কোন কোন সমালোচনা সত্যই বড় অদ্ভুত। একজন ব'ললেন—'মোয়ানা' হ'ল 'দি গোল্ডেন বাউ' কাব্যের একটি পরিচ্ছেদ। তবে আমেরিকায় সাধারণতঃ ছবিখানি প্রচারিত হয় 'দক্ষিণ সমুদ্রাঞ্চলবাসিনী মোহিনী নারীর প্রণয় জীবন' হিসাবে।

যুদ্ধ সুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলের দ্বীপগুলি কর্মচাঞ্চল্যে মুখরিত হ'য়ে উঠলো—স্যামোয়া ও অন্যান্য পলিনেশীয় দ্বীপপুঞ্জ ভ'রে গেল

অসংখ্য সৈন্যে। ক্রমশঃ 'মোয়ানা'র ঐতিহাসিক ও ও পুরাতাত্ত্বিক মূল্য অনুভূত হ'তে লাগলো। স্বীকৃত হ'ল—বিশ্বের এক সুন্দরতম আদিম সংস্কৃতির নিখুঁত প্রমাণ-চিহ্ন হিসাবে।

পাছে 'মোয়ানা'র নেগেটিভটি কোনরকমে হারিয়ে যায় সেই ভয়ে বছরকয়েক আগে প্যারামাউণ্টকে লিখলাম। জানতে চাইলাম—সংরক্ষণের জন্যে সেটিকে কোন মিউজিয়ামে রাখা তাঁদের পক্ষে সম্ভব কিনা। আজও সে পত্রের উত্তর পাইনি। কিছুদিন আগে, লণ্ডন্ আইল্যাণ্ডে কোম্পানীর ল্যাবরেটরীতে 'লুসিয়ানা ষ্টোরি'র প্রিণ্ট নিতে গিয়ে শুনলাম 'মোয়ানা'র নেগেটিভের কোন অস্তিত্বই আর নেই। নতুন ছবির স্থান সঙ্কুলানের জন্যে সেটা নষ্ট ক'রে ফেলা হ'য়েছে, নিঃসন্দেহে।

'নানুক'-এর পর ভেবেছিলাম এই ধরণের প্রাচীন স্বল্প-পরিচিত জাতিগুলির দ্রুত বিলীয়মান সংস্কৃতির ইতিবৃত্ত রেখে যাবো চিত্রে চিত্রে। সেই উদ্দেশ্যেই গিয়েছিলাম স্যামোয়ায়। কারণ, এটা ঠিক যে ফিল্মের চেয়ে আর কোনও মাধ্যমের পক্ষে এ ইতিহাস এর চে[illegible] হৃদয়গ্রাহী ক'রে ও বেশী সংখ্যক মানুষের [illegible] করা সম্ভব নয়। আজকের দিনে বিশ্বের জাতিগুলির মধ্যে পারস্পরিক সানুকম্প মনোভাব ও শুভবুদ্ধির সবচেয়ে প্রয়োজন বেশী। আর এইখানেই রয়েছে চলচ্চিত্রের একটি মূল্যবান ও অপরিহার্য ক্ষেত্র।

আমাদের চিত্র-নির্মাণ কোন পূর্বপরিকল্পিত ছক ধ'রে চলেনা। কারণ, এ জাতীয় ছবিতে কখন যে কোন দৃশ্য এসে জুটবে তা' আগে থেকে ঠিক করা অসম্ভব। এই ধরুন না কেন এ্যারান দ্বীপের যখন ছবি ('ম্যান অব এ্যারান') তুলছিলাম, হঠাৎ অবাক হ'য়ে গেলাম একদল রৌদ্র-সেবী হাঙরকে সেখানে দেখে। তাদের কথা আমরা কোন দিনও শুনিনি, এবং স্থানীয় অধিবাসীদের কথা বাদ দিলেও খুব কম লোকই তাদের কথা জানে। অথচ দেখুন সেই অকল্পিত রৌদ্র-সেবী হাঙরদের দৃশ্যগুলিই ছবির প্রয়োজনীয় দৃশ্য হ'য়ে দাঁড়ালো এবং কাহিনীর ধারাবাহিকতার পক্ষে এক মূল্যবান সূত্র হ'য়ে উঠলো।

'লুসিয়ানা ষ্টোরি' তোলার সময় প্রধান স্থানীয় দৃশ্য হিসাবে আমরা একটি কুমীর-সঙ্কুল পুকুর নির্বাচন ক'রেছিলাম। তিন মাস ধ'রে দিনের পর দিন সেখানে ডিঙীতে ভেসে বেরিয়েছি, তবুও চিত্র-নাট্যে কুমীরের করণীয় কোন দৃশ্যের বিষয় লিখতে পারিনি; যা পেয়েছি তারই ছবি তুলেছি। কুমীরের গল্প অনেক শুনেছি, শুনেছি তারা বাইরে মন্থর হ'লেও জলে যে কোন দ্রুতগামী ষ্টিম লঞ্চকেও হারিয়ে দেয় ক্ষিপ্রতায়। অথচ তার পরিচয় কিছু পেলাম না। তবে একদিন, সৌভাগ্যক্রমে ডিঙীতে দু'টো ক্যামেরা 'রেডি' ছিল, গল্পের সত্যতা প্রমাণিত হ'য়ে গেল চোখের সামনে, আর ধরাও প'ড়ে গেল ছবিতে। এই অভাবনীয় দৃশ্যের ভিত্তিতেই গ'ড়ে ওঠে আমাদের কাহিনীর ধারাবাহিকতা। আর, এমনিভাবেই সৃষ্টি হ'য়েছে আমাদের সমস্ত ছবি।

ধারাবাহিকতার মত কাহিনীও প্রায় তেমনি আকস্মিক

তে পারে। যখনই আমরা কোন দেশে যাই, সেখানকার ইতিহাস পড়ি, ভালো ক'রে বুঝি দেশটাকে। এক্ষেত্রেও তাই ব'লতে হবে, লুসিয়ানায় হঠাৎ একদিন প্রাচীন একখানা পুঁথি পেয়ে গেলাম। তাতে ক্যাজুনান জাতির বৈশিষ্ট্য ছাড়াও তাদের আদিম সংস্কার ও মৎস্য-কন্যার মত কল্পিত জীবে বিশ্বাসের কথা উল্লিখিত ছিল। পরে এই থেকেই আমরা লুসিয়ানা ছবির কাহিনীর একটা সুন্দর হদিস পাই।

এই ভাবে অবশ্য আমরা অনেক ফিল্ম খরচ ক'রেছি: ক'রতে হয়েছেও। অথচ কোন দৃশ্যের প্রথম সুটিংএই ভাল ফল পেয়েছি দ্বিতীয়বার সেটি তোলার চেয়ে। হলিউড কিন্তু একই দৃশ্যের বারবার চিত্রগ্রহণ করেন অভিনয় এবং কার্যক্রমকে নিখুঁত ক'রে তোলবার জন্যে। তবে যারা অভিনেতা নয় এমন লোকদের নিয়ে কাজ ক'রতে গেলে দেখা যায় প্রথম বারই বরং তাদের অভিনয় যথেষ্ট স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বাভাবিক হয়। বেশী মহলা দিতে গেলে তারা তাদের অকৃত্রিমতা হারিয়ে বসে। সাধারণতঃ আমরা তাদের এবং তাদের মোড়লকে যতদূর সম্ভব কম নির্দেশ দিয়ে দৃশ্যের বিষয়বস্তু মোটামুটি বুঝিয়ে দিই। এই ধরুন 'লুসিয়ানা স্টোরি'-তে যেখানে ছেলেটি তার বন্দুক নিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাক্ ক'রছে এমনি-ভাবে যেন সে গুলী ছুঁড়বে। 'এখানে নয়,'-বাপ ব'ললে হাসতে হাসতে বন্দুকটা সরিয়ে দিয়ে,—'বাইরে নিয়ে যাও।' এটা ওর সম্পূর্ণ মৌলিক উদ্ভাবন, আমাদের নির্দেশ নয়। তাছাড়া ওদের তিনজনের মধ্যে যে সংলাপ শুনেছেন তাও সেই মুহূর্তেই ওদের মুখ থেকে স্বাভাবিক-ভাবেই বেরিয়ে গেছে। যেমন ভেবেছে তেমনি ব'লে ফেলেছে।

আমাদের রেকর্ডিং এ্যাপারেটাস ও সাউণ্ড ট্র্যাকেরও কিছু বৈচিত্র্য আছে। 'লুসিয়ানা স্টোরি'র যাবতীয় সংলাপ ও শব্দ ফেয়ারচাইল্ড ডিসক্ রেকর্ডারে গৃহীত। 'ম্যান অব এ্যারান'-এর কাহিনী ক্যামেরাতেই বর্ণিত হয়েছে। পরে অবশ্য কিছু টুকরো সংলাপ সংযোগ ক'রে নিয়েছি প্রাসঙ্গিক শব্দ হিসাবে, কাহিনীকে পরিচালিত ক'রতে নয়। সে সংলাপ দর্শক বুঝুক আর নাই বুঝুক তাতে কিছু যায় আসে না—বস্তুতঃ পক্ষে বেশীরভাগ লোকই তা অনুসরণ ক'রতে পারেনি। সুতরাং এমন ছবিতে সঙ্গীত-রচয়িতারই প্রসারিত ক্ষেত্র থেকে যায়, এবং আমার বিশ্বাস 'ম্যান অব এ্যারান' সংলাপের চেয়ে বেশী সঙ্গীতাশ্রয়ী, কারণ এখানে সঙ্গীতই কাহিনীকে চালনা ক'রেছে, সংলাপ নয়। এ্যারানের পল্লী-গীতিকে ভিত্তি ক'রে এক সঙ্গীত সৃষ্টি ক'রেছেন জন গ্রীণউড এবং তা মূর্ত হয়েছে ম্যাগীর কণ্ঠে -যিনি ছবিতে মা-র ভূমিকায় অবতীর্ণা হয়েছেন।

সঙ্গীত ও চিত্রের সমন্বয়ের দিক থেকে 'লুসিয়ানা স্টোরি' আরও এক ধাপ অগ্রসর হয়েছে। আমার বিশ্বাস এ এক পরমাশ্চর্য শিল্পের সূচনা মাত্র, যে শিল্প একদিন সার্থক হয়ে উঠবে সঙ্গীত ও চিত্র স্রষ্টার মিলিত প্রচেষ্টায়। কারণ, সঙ্গীত ও চিত্রের আছে গতি, আর সংলাপ বরং সে গতিকে মন্থর। শিল্প হিসাবে চিত্রের সার্থকতা নির্ভর করে এই গতির ওপরেই।

ছবির ভবিষ্যৎ আরও কত প্রশস্ত হ'তে পারতো যদি চিত্র-জগতের কর্ণধাররা একবারও অন্ততঃ হৃদয়ঙ্গম ক'রতে পারতেন—চলচ্চিত্র কত শক্তিশালী এক মাধ্যম, একবারও যদি তাঁরা সচেতন হ'তে পারতেন চিত্রের নাটকীয় সম্ভাব্যতা সম্পর্কে। কিন্তু আজ বাজারে যে ছবি চলে তার সবই প্রায় রয়ে গেছে মুষ্টিমেয় একদল মানুষের হাতে—যাঁদের প্রথম ও চরম স্বার্থ অর্থ। তাঁরা ছবিকে বলেন—'পণ্য'। চিত্রের গঠনমূলক উদ্দেশ্যের দিকে তাঁদের লক্ষ্য নয়। তবুও তাঁদের দর্শক সংখ্যায় কোটী কোটী—বলতে কি বিশ্বের প্রায় অর্দ্ধেক মানুষ।

এ আমার নিশ্চিত বিশ্বাস একদিন মহত্তর কিছু বিকাশ লাভ ক'রবেই, ক'রবে এই চলচ্চিত্রই অভিব্যক্তির একমাত্র মাধ্যম যা পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের অন্তর স্পর্শ করে। দর্শন অর্থে অন্তরে গ্রহণ। চোখের ভাষার মত প্রভাবশীল নেই আর কিছুই,—এ আমাদের সাধারণের ভাষা, ভেদ নেই এখানে মানুষে মানুষে।

(মূল ইংরাজী থেকে মনোজ সান্ন্যাল কর্ত্তৃক অনূদিত)

চলচ্চিত্র-পরিক্রমা

বিমলচন্দ্র ঘোষ

স্বাধীন ভারতবর্ষে, বর্ষে বর্ষে অন্নবস্ত্রাভাব
বেড়ে চলে মাত্রাহীন মুক্তির করুণ অভিশাপ
সমস্যার নোনাজলে রাত্রি দিন নাকানি চোবানি
সত্য শিব সুন্দরের সাধনায় ভাঁড়ে মা ভবানী !
ভৌতিক উল্লাসে মত্ত রেডিও সিনেমা নাট্যশালা
ছন্নছাড়া উচ্ছৃঙ্খল চীৎকারে লাগায় কানে তালা
নাচ গান হল্লা আর সিনেমার বেলেল্লাপনায়
মার্কিন-বোম্বাই মার্কা ব্যভিচার আকাশে ঘনায় ।
বিদেহী রবীন্দ্রনাথ স্বর্গ থেকে লারে লাপ্পা গানে
মূর্চ্ছা যান জয়ন্তীর নির্লজ্জ নির্মম অপমানে ।

হায় বজ্র-আঁটুনির ফস্‌কা গেরো সরকারী শুচিতা
হিন্দী ভাষী চলচ্চিত্রে লেলিহান কামনার চিতা
ধু ধু জ্বলে নপুংসক মর্কটের মার্কিনী উল্লাসে
পীনোন্নত অঙ্গভঙ্গী ক্যামেরার উলঙ্গ আভাষে ।
ছায়াচিত্রে পাপপঙ্ক মহোল্লাসে ছড়াতে ছড়াতে
ফেঁপে ফুলে উন্নাসিক শিল্পের চরম অপঘাতে.
স্থূলচর্ম প্রযোজক লক্ষ লক্ষ টাকা লুঠে যান—
'সিটি' মারে দুর্নীতির পঙ্ককুণ্ডে পতিত সন্তান !
তবু আজো উদাসীন শিবচক্ষু নায়কের দল
অন্নের দাবীতে যারা বেসামাল চঞ্চল বিহ্বল,
লালাসিক্ত কামনার অন্নসত্র সিনেমার হলে
দেশজোড়া অজ্ঞতায় কামোল্লাস বেপরোয়া চলে ।

বাংলার সর্বস্ব গেছে, বাংলা আজ দীন ভিক্ষাজীবী
স্বপ্নে যারা চেয়েছিল একদিন নতুন পৃথিবী !

যাদের স্বপ্নের রঙে রক্তরাঙা বিশাল ভারত,
তাদেরই সন্তান আজ হেঁটমুণ্ডে নাকে দেয় খৎ।
হিন্দীর সাম্রাজ্যবাদী ঘৃণ্যতম রিরংসার ফাঁদে
বোম্বায়ের পদাঘাতে হতদর্প 'টলিউড্' কাঁদে।
অতিদর্পে হতালঙ্কা বেহিসাবী ব্যবস্থার ফলে
বাঙালীর চলচ্চিত্র-শিল্পের শ্মশানে ধূনি জ্বলে।
ছায়াপটে সৃষ্টিশীল প্রতিভার দীপ্ত পরিচয়
নিঃশেষে বিলুপ্ত আজ সুরু তাই ঘৃণ্য অপচয়।

ষ্টুডিয়োতে কাহিনীর মর্মভেদী লাসকাটা ঘরে
বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ-শরতের শেষ রক্ত ঝরে!
বাঙালীর গৌরবের সাধনার পুণ্য দীপাবলি
একে একে নিভে যায় চলচ্চিত্রে ছায়ার অঞ্জলি
ঝরে যায় দেবত্বের নরত্বের স্নিগ্ধ পারিজাত
প্রেক্ষাগারে প্রতিভার অন্ধ ক্রূর যবনিকাপাত।

বাঙালীর শিল্পীমন দারিদ্র্যের পক্ষাঘাতে কাঁপে
অতিলুব্ধ ধনিকের স্বেচ্ছাপঙ্গু বাণিজ্যের পাপে,
অলস চিন্তায় আর জাগেনা সরস উদ্দীপনা
কাহিনীর দৈন্য তাই উপন্যাসে নেই সৃষ্টিকণা;
ছন্দহারা সঙ্গীতের সুরের সমাধি শয্যাপরে
ভুষণ্ডী কাকের ডাক শোনা যায় কী উৎকট স্বরে;
অন্ধকার টলিউড্ অন্ধকার চিত্রনাট্যশালা
স্বেচ্ছাপঙ্গু বাণিজ্যের অন্ধকারে কী করুণ জ্বালা,
চলচ্চিত্রশিল্পীদল পলাতক বোম্বায়ের ডাকে
চাঁদির চুক্তির মোহে হিন্দী প্রেম-রাগিণীর পাঁকে।

বাঙালী মরেনি আজো মৃত্যুঞ্জয়ী সাধকের দেশে
বাঙালীর মৃত্যু নেই শ্মশানের দীন হীন বেশে।
এখনো সময় আছে সঙ্ঘবদ্ধ জাতীয় জীবনে
মুক্তির মশাল জ্বেলে দৃপ্তপদে সুকঠোর পণে;
আবার দাঁড়াতে হবে দ্বিখণ্ড বাংলার সর্বনাশে
সৃজনের তপস্যায় আগামী যুগের ইতিহাসে
সুস্থতম চেতনায় উজ্জীবিত শিল্পের সংগ্রাম
সাফল্যের পতাকায় এঁকে দেবে বাঙালীর নাম।

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস অবলম্বনে গৃহীত আই. এন. পিকচার্সের দ্বিভাষী ছবি 'মালঞ্চ' ও 'ফুলবাড়ী' চিে নিউ থিয়েটার্স-খ্যাতা যমুনা দেবী ও নবাগত প্রভাতকুমা

এম পি প্রোডাকসনের নির্ম্মীয়মান চিত্র 'সঞ্চারিণী'তে
উত্তমকুমার ও সন্ধ্যারাণী

সিনেমার দর্শক
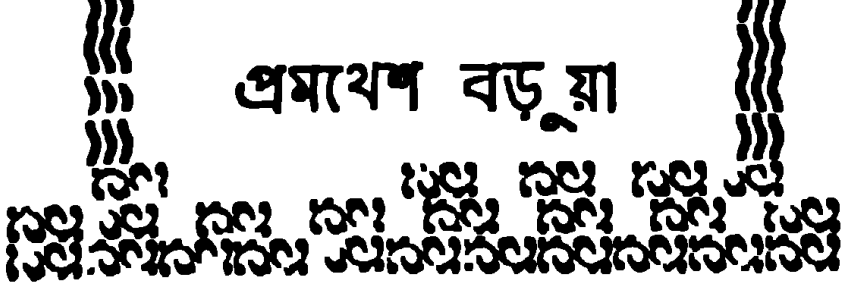
প্রমথেশ বড়ুয়া

[বাংলা চিত্রজগতের দিক্‌পাল প্রমথেশ বড়ুয়া আজ চিত্রজগতে স্তিমিত, হয়ত বিস্মৃতও। সর্ব্বজনপ্রিয় সর্ব্বজনপরিচিত বড়ুয়াসাহেব আজকে বাঙলার দর্শকসমাজের কাছে অতীত গৌরবের বস্তু হ'য়ে আছেন। পরিচালক বড়ুয়া সিনেমার দর্শক সম্বন্ধে কি ভাবতেন তা' আজকের দিনের পরিচালক ও দর্শকসমাজের কাছে বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক হবে ব'লে আমাদের বিশ্বাস। বড়ুয়াসাহেবের এই রচনাটি দীর্ঘ বারো বছর আগের লেখা। বারো বছর পরেও আজ এই রচনার বক্তব্য তাঁদের কাছে বিশেষ হৃদয়গ্রাহী হবে ব'লেই রচনাটি পুনর্মুদ্রিত করা হ'লো—চিত্রবাণী-সম্পাদক]

"এমন একখানা ছবি করুন মশাই, যাতে সবাই বুঝতে পারে—সবাই আনন্দ পায়।......"

হুকুমটা যে কতবার শুনেছি—আর কতবার এই কথাটাই ভাবতে হয়েছে যে, সিনেমার দর্শক কি ও তাঁরা কি চান।

সিনেমার দর্শক নানান ধরণের। এই যেমন "ওহে—কাজকর্ম্ম কিছু নেই, চল একবার কোথাও গিয়ে একখানা ছবি দেখে আসি" শ্রেণীর দর্শক। ফাঁকা মন নিয়ে দৈনিকের পাতা উল্টিয়ে বিজ্ঞাপন দেখে এঁরা ছবি দেখতে আসেন। আর এঁরা আসেন নিছক আনন্দলাভের প্রত্যাশায়। এঁদের কাছে দু'ঘণ্টার জন্যে মনটাকে হাল্কা করে নেওয়ার ওষুধ হচ্ছে সিনেমা। এঁরা ছবিতে নীতি-তত্ত্ব, শিক্ষাবিস্তার এইসব বড় ধরণের বিষয় পয়সা খরচ করে শুনতে চান না। ছবি দেখতে বসে পাশে যদি বড় বড় সমালোচনা শুনতে পান তাহ'লে এঁরা ভয়ানক চটে যান। তাঁদের মতে ছবির প্রেক্ষাগৃহে প্রকাণ্ড সমালোচনার স্থান নেই। এঁরা ছবি দেখে হাসেন, কাঁদেন। হিরোইন বিপদে পড়লে এঁরা চেয়ারের হাতল ধরে অপেক্ষা করেন যে, কখন হিরো এসে নায়িকাকে উদ্ধার করবে। তারপর যখন পালা মিটলো তখন মনের আনন্দে বাইরে এসে এঁরা বন্ধুদের ডেকে বেশী দু'পয়সার পানই হয়ত খাইয়ে দেন। বাড়ীতে যখন গিন্নী সেই দু'পয়সার হিসেব চান তখন তাঁরা বলেন—"যা ছবি দেখে এলুম তাতে দু'পয়সার পান আর কি—সঙ্গে এক পেয়ালা করে চা-ও যে তাদের খাইয়ে দিইনি এই তোমার ভাগ্যি।"

আর এক শ্রেণীর দর্শক আছেন যাঁরা ছবিতে কে কি করলো তাই দেখতে যান। এঁদের কাছে চিত্রজগতের সবাই পরিচিত। প্রত্যেক ছবি দেখবার পরই এঁদের নিজেদের মধ্যে তুমুল তর্কের সৃষ্টি হয়। এঁদের ছবি দেখা চিত্রা বা নিউ সিনেমায় শেষ হয় না। ছবি দেখার দু-তিন দিন পর যখন প্রত্যেক খুঁটিনাটির আলোচনা ক'রে তর্ক-বিতর্কের মাঝখান দিয়ে এঁরা একটা সিদ্ধান্তে এসে উপনীত হন, তখনই হয় এঁদের সেই ছবিখানা দেখার শেষ। এঁদের কাছে ফাঁকি চলে না, কারণ এঁরা একটি ছবি বারবার দেখে থাকেন। গোড়ায় যে শ্রেণীর দর্শকের কথা বলেছি তাঁদের সঙ্গে এঁদের মোটেই বনে না, কারণ ওঁরা বললে—"চুপ করে ছবি দেখুন মশাই"; আর এঁরা বলেন—"দাঁড়ান—কেমন বলেছিলুম না ওর এই এক্‌সপ্রেশনটি ঠিক হয়নি।" ওঁরা এটা বোঝেন না যে, এঁদের ছবির এই খুঁটিনাটি নিয়ে হয়ত বা বন্ধুবিচ্ছেদই হয়ে যেতে পারে। এঁদের কাছে ছবি দেখা একটা ছেলেখেলা নয়।

এই ওঁরা আর এঁরা—এই দুই নিয়েই আমাদের সিনেমার দর্শক প্রধানতঃ তৈরী। তাছাড়া আরও দু'-এক শ্রেণীর দর্শক আছেন—এই ধরুন যাঁরা ধর্ম্ম-ছবি দেখতে ভালবাসেন। তাঁরা ছবির পর্দ্দায় শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হলে একবার কপালে হাত দুটো ঠেকিয়ে নেন। আপনারা শুনলে হয়ত বিশ্বাস করবেন না যে, এমনও আছেন যাঁরা ঠাকুর দেবতার ছবি এলে ছবিঘরের বাইরে জুতো

এইবার ভাবুন—যখন হুকুম হোলো যে, এমন একখানা ছবি করতে হবে যা সর্ব্বসাধারণ ভাল বলবে তখন আমাদের মতন চিত্র-পরিচালকের অবস্থা কি হয় এইবার ভেবে দেখুন।

সত্যিকারের ব্যাপারটা কি তা একটু তলিয়ে দেখলেই বোধ হয় বোঝা যায়।

যখন সিনেমা এদেশে প্রথম আরম্ভ হ'ল তখন ছবি ছিল অল্প। লোকে তখন অত খুঁটিনাটি ধরে ছবি বিচার করতো না। তখন দর্শকরাও বিভিন্নপন্থী হয়ে ওঠেনি। ডানপন্থী বামপন্থী তখন একপন্থীই ছিলেন। তারপর যখন ছায়াছবির অভিনবত্ব ঘুচে গেল—তখন দর্শকরা ছবি বাছতে লাগলেন নিজেদের মনের মত। এই ধরন আমার হয়ত ইতিহাসে আগ্রহ কম। আমি যাই সামাজিক ছবি দেখতে। যাঁদের ধর্ম্মগ্রন্থ ভাল লাগে তাঁরা যাবেন ধর্ম্মবিষয়ক ছবি দেখতে। এই রকম দর্শকরাও আজকাল বদলে গেছেন। পৃথিবীতে এমন কোনও ছবি আজকাল হতে পারে না যা আগেকার মত সবশ্রেণীর দর্শককেই সন্তুষ্ট করতে পারে। আজকালকার দর্শকরা অনেক বেশী ভাবতে শিখেছেন—তাঁদের বিচার করবার ক্ষমতা অনেক বেড়ে গিয়েছে। শুধু ক্ষমতা নয়, বিচার করবার ইচ্ছে—সেটাও খুবই বেড়ে গিয়েছে। তাই সর্ব্বসাধারণের উপযুক্ত ছবি করা খুবই একটা অসম্ভব বিষয়। মানুষের মন আজকাল ইংরিজীতে যাকে বলে—"Specialised"—তাই হয়ে পড়ছে; সঙ্গে সঙ্গে রুচিও Specialised হয়ে পড়ছে।...

এটা ভাববেন না যে, আমি সিনেমার তরফ থেকে ছবির অসাফল্যের কোনও অজুহাত নিয়ে দাঁড়িয়েছি। তবে সিনেমার দর্শকরা কি চান এই প্রশ্ন প্রায়ই শুনতে হয়, তাই একটু কাগজেপত্রে ভেবে দেখলাম।

রেখে ছবি দেখতে ঢোকেন।............সত্যি কথা। আমার নিজের চোখে দেখা। কলকাতায় হয়ত এটা ঘটে না, কিন্তু মফঃস্বলে অনেক দর্শকের কাছে ছবি আর বাস্তব একই। এতে হাসবার কিছু নেই।

আর এক শ্রেণীর দর্শক আছেন যাঁরা শুধু হাসতে চান। "ছবি দেখতে যাবো সেখানেও কান্না? তার চেয়ে বিনি পয়সায় ঘরে বসে কাঁদলেও পারি!" তাঁরা এই বলেন। আবার ঠিক এঁদেরই উল্টো মতের দর্শক আছেন যাঁরা ছবিতে না কাঁদতে পারলে ছবিটা ঠিক জমলো বলে মনে করেন না। এছাড়া টেকনিকভক্ত, সঙ্গীতসেবী, তারকাপন্থী—এইসব নানান শ্রেণীর দর্শকও আছেন।............

নিদারুণ অভিজ্ঞতা

শ্রীবিরূপাক্ষ

নাটকের চটক

সম্প্রতি আমার একটা সর্বনাশের খবর পেয়েছিলেন কি? পাননি! তা পাবেন কি করে, নিজেরটি ছাড়া আর কারুর কোন খোঁজ কখনও রাখেন, না আর কোন লোকের দিকে (অবশ্য স্ত্রীলোক ছাড়া) কখনও মুখ তুলে চান? চাইলে আমার ব্যাপারটা আর চোখ এড়াতো না। কটা দিন আমার খুব ঘটা করে কাটলো কিনা, তাই বলছি। অপর লোক হলে চটা উঠে যেত কিন্তু আমি নেহাৎ ইস্পাতে গড়া বলে ঠিক খোঁটা হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। আপনাদের সেই পাঁচুবাবু আমায় একেবারে পাগল করে মেরেছিলেন।

মশাই, কে জানতো যে পাঁচুবাবু নাটক লেখেন, চিরকালই তো তাঁকে ব্যবসা করতে দেখেছি কিন্তু তিনি যে আবার বে-হিসেবীর মত কোন্ ফাঁকে টক্‌টক্ করে একটা নাটক লিখে ফেললেন তাতো জানি না—সে দিন রাত্তির সাড়ে আটটার পর একটা প্রকাণ্ড জাবদা খাতা নিয়ে বাড়ীর দরজায় ঠক্‌ঠক্ করে আওয়াজ শোনার পর নাচে নেমে সব টের পেলুম।

আমার ওপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস—এ নাটক নাকি আমিই ইচ্ছে করলে ষ্টেজে প্লে করিয়ে দিতে পারি। যেহেতু আমার সঙ্গে থিয়েটারের লোকদের একটু আলাপ পরিচয় আছে সেই হেতু আমি তাঁদের কাছে বইটি পৌঁছে দিলেই নাকি পরের শনি-রবিবার থেকে দেওয়ালে প্ল্যাকার্ড পড়ে যাবে।

যত বলি মশাই, আমার সঙ্গে থিয়েটারের দু-তিনজন কাটা সৈন্য ছাড়া আর কারুর সঙ্গে জান পছান নেই, আপনি নিজে চেষ্টা করে দেখুন—তিনি ছাড়বেন না। সকাল বিকেল অতিষ্ঠ করে মারলেন।

ছুটির দিনে দুপুরে কোথায় একটু আড় হব তার জো নেই তিনি নাটক শোনাতে এলেন। নাটকটিতে গোটা বারো অঙ্ক আছে, তিনদিন এক নাগাড়ে প্লে করা চলে। তাছাড়া বৈচিত্র্যের অন্ত নেই। একুশবার সখীদের নাচ আছে, উনিশটা হত্যাকাণ্ড আছে, চল্লিশবার কামান দাগা আছে, সতেরোটা প্রেমের দৃশ্য আছে, গোটা এগারো সাহেব চরিত্র আছে, দুটো ঝড় বৃষ্টির সিন আছে, বারো জায়গায় সব আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ঐন্দ্রজালিক দৃশ্য পরিবর্ত্তনের সুযোগ আছে—যথা নায়ক আম খেতে গাছে উঠলো সেটায় হাত দিতেই মর্ত্তমান কলায় পরিণত হয়ে গেল, নায়িকাকে জড়িয়ে ধরতে গেল হঠাৎ নায়িকা তার ভাবী গুঁফো শ্বশুরে পরিবর্ত্তিত হয়ে বসে রইলো—যাকে বলে বেলেল্লাবী ব্যাপার আর কি! তাছাড়া ভক্তি, প্রেম, হতাশা, শয়তানি, খেনুখেনানি, টানাটানি কি যে তাতে

নেই তা বলা শক্ত। এটা ঠিক বাংলাদেশের সবাইকে খুশী করবার মত প্লট।

মানে, সেই বৈদিক যুগ থেকে সুরু করে জয় হিন্দ্ পর্য্যন্ত কিছু বাকী নেই। মনে করুন, এক একজনের স্বগতোক্তি বলতে গেলে এ্যাকটারদের কতখানি দম আছে তা ধরা পড়ে যবে। এই ভীষণ, হাস্যকরুণ, লোমহর্ষণ মিশ্রিত নাটকের অভিনয় করা যার তার কর্ম নয়—বেশ বোঝা গেল।

মশাই, তাগাদার চোটে অস্থির হয়ে থিয়েটারের এক বাবুকে ধরলুম, তিনি বছর তিরিশ ধরে দূত সাজছেন, দশ-টাকা মাইনে পান, কামাই নেই কিন্তু যথা সময়ে মাইনে হাতে আসেনা। তিনিও কিছু বলেন না—তাই থিয়েটার প্রোপ্রাইটারদের কাছে খুব সৎলোক বলে খ্যাতি আছে। অগতির গতি তাঁরই ভরসায় দুরু দুরু হৃদয়ে থিয়েটারে গেলাম। জীবনে মনে করুন একটাকার বেশী টিকিট কিনে ছারপোকা মার্কা চেয়ারে বসা ছাড়া থিয়েটারের অন্দর মহলের কিছু দেখিনি—আজ দূত মহাশয়ের কল্যাণে একেবারে খোদ মালিকদের দরবারে গিয়ে উপস্থিত হলুম। সঙ্গে পাচুবাবু তো জাবদা খাতা নিয়ে আছেনই।

দেখলুম থিয়েটারের হয়ে এসেচে—দুদিন পরেই সিনেমা হবে এখানে। প্রোপ্রাইটারবাবুরা গদী-আঁটা চেয়ার ছেড়ে টিক্ উডের ভাড়া-করা চেয়ারে বসে আছেন—কারুর কারুর গালে হাত দিয়ে বসে থাকা দেখেই বুঝলুম বোধ হয় এঁরা হালে পানি পাচ্ছেন না। এমন সময় আমাদের প্রবেশ। একটি ভদ্রলোক কি খাতায় হিসেব লিখছিলেন, তিনি তো আমাদের না দেখেই বলে উঠলেন,—বলে দিয়েচি তো আজ হবে না, আবার কেন ধন্না দিচ্ছেন—রবিবারের আগে দুটো টাকাও দিতে পারবো না—যান্!

বুঝলুম ভদ্রলোক বোধ হয় আমাদের কাটা-সৈন্য-

দলের তাগিদদার ভেবেছেন, তাই গলাটা একটু খাঁকুরি দিয়ে বলে উঠলুম,—আজ্ঞে টাকা, হুঁঃ কি বলছেন মানে ঠিক—
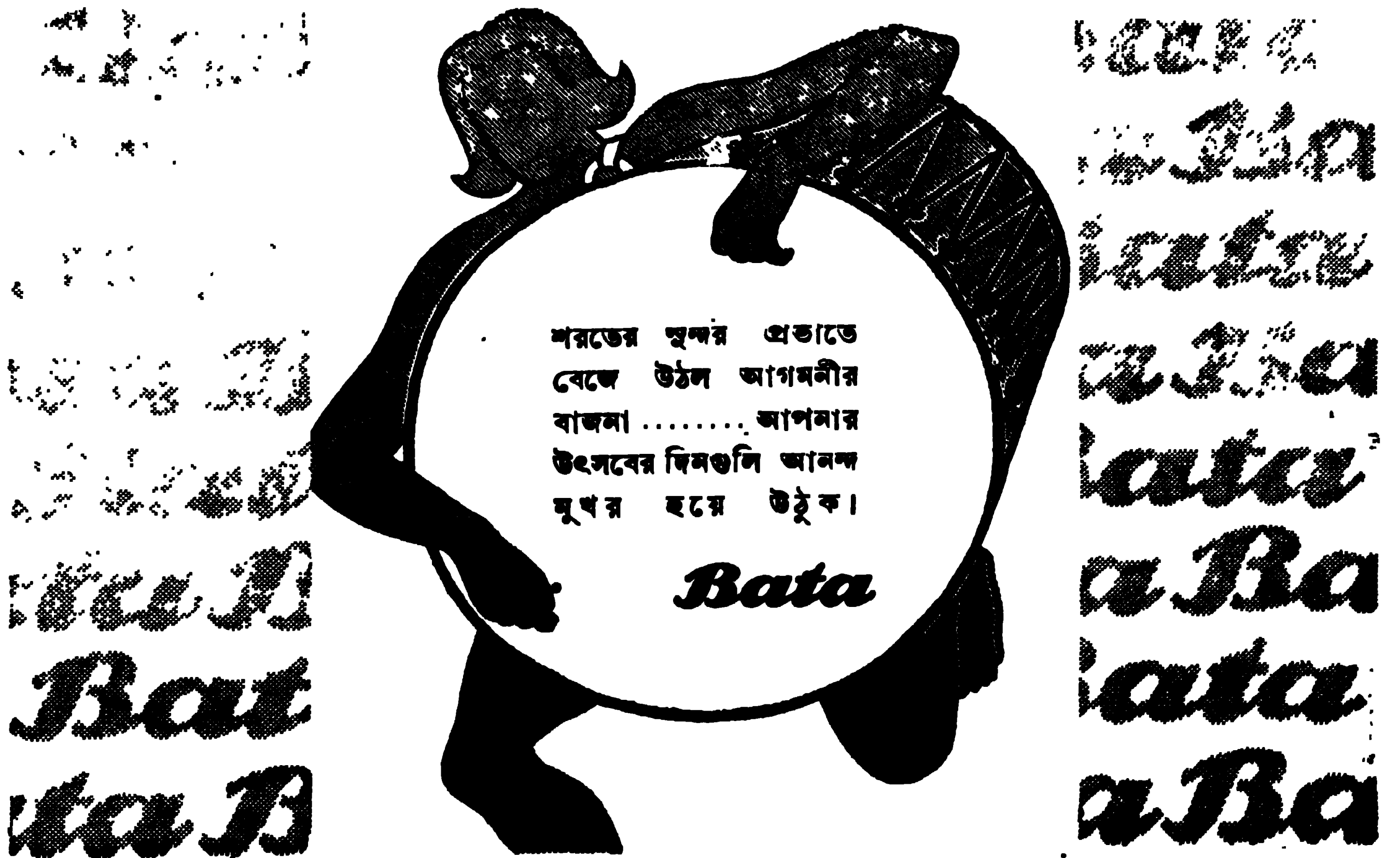
কথা শেষ হবার আগেই তিনি চোখ তুলে ভাগ্যি দেখলেন আমরা অন্যলোক, তাই রক্ষে, না হলে বোধ হয় যাচ্ছেতাই করতেন। দু মিনিট আগে যে সব ভদ্র-সন্তানরা ভারত সাম্রাজ্য শাসন না করুক মেজর জেনারেলের পোষ্টে থেকে ষ্টেজ চ'ষে এল তাদের ওপর তম্বি ক'রে ক'রে বুঝলুম এঁর মুখটা ব'লে গেছে—এখন তাই পরিচিত অপরিচিত—সকলেরই বাপান্ত করে ছাড়ছেন। পরে শুনলুম তিনি ম্যানেজার।

যাই হ'ক দূত মহাশয় নাট্যকার সম্বন্ধে আগে থেকেই অদ্ভুত পরিচয় দিয়ে রাখতে চট্ করে আলাপটা হয়ে গেল। নাট্যকার একটু রেস্তদার লোক হওয়াতে বোঝা গেল অধিকারীরা খুব খুশী, তাছাড়া বই পত্তরও হাতে নেই উপরন্তু পাচুবাবু আবার বইয়ের জন্যে কিছু খরচা দিতে রাজী আছেন শুনে তাঁরা তো তক্ষুনি তিনকাপ চায়ের অর্ডার দিয়ে দিলেন। কী খাতির!

মিনিট দশেক পরেই দোকানের হাতল ভাঙা নীল পাড়-ওয়ালা তিনকাপ সুক্তো একচুমুক খেয়েই বোঝা গেল যে থিয়েটার শুধু জোর চলছে না, এখানকার চায়ের দোকানও সমতালে মার্চ করতে করতে চলেছে। পাচু-বাবুর বইখানি হাতে নিয়ে অধিকারীদের একজন তক্ষুনি বলে ফেললেন,—বইয়ের ওজন দেখেই মনে হচ্ছে, বইখানি ভারে কাটবে।

পাচুবাবুর মুখে কী হাসি! তারপরই নাটকের প্রযো-

জনা বাবদ স্ফূর্তির সঙ্গে পাঁচুবাবু হাজার টাকার আগাম একখানি চেক কেটে বসে রইলেন। যেন আসছে শনিবারই নাটকের উদ্বোধন রজনী ঘোষণা করা হবে। আসল নাটক কিন্তু সুরু হল এরপর থেকেই। ম্যানেজার মশাই একগাল হেসে সেদিনকার চলতি নাটকটা দেখে যাবার জন্য এমন মিনতি জানালেন যে তা উপেক্ষা করা শক্ত হয়ে উঠলো।

আমাদের তখুনি খাতির করে একটি কুশন বক্সে একজন বসিয়ে দিয়ে গেলেন। চিরকাল নীচে কেঠো হাতল ও শিরদাঁড়াবিহীন ছাড়পোকা মার্কা চেয়ারে বসে বসে ভেবেছি যে দোতলার ঐ আসনে উপবিষ্ট লোক-গুলির চেয়ে সুখী বোধ হয় আর পৃথিবীতে কেউ নেই, কিন্তু আজ সেইখানে সীট্ পেয়ে শরীর সিঁটিয়ে উঠলো।

বক্সের গদীতে কাপড় নেই, নারকেল ছোবড়াগুলো ছারপোকার চেয়ে অধিকতর সূক্ষ্মভাবে পশ্চাদ্ভাগ আক্রমণ করতে সুরু করলো। ভাবলুম জুতো শুদ্ধু নয় উবু হয়ে বসে থাকি কিন্তু আমাদের উসখুসু ভাব দেখেই বোধ হয় দয়াপরবশ. হয়ে একজন গার্ড ছ'সাতখানা খবরের কাগজ নিয়ে ছুটে এসে তু-পুরু ক'রে গদীর ওপর বিছিয়ে দিলেন। আমি বললুম—ফ্যানটা খুলে দিন, এবার তিনি তুখানা হাতপাখা দিয়ে গেলেন।

তখন মাথার ওপর চেয়ে দেখি ফ্যান নেই, একেবারে শূন্য। পরে শুনলুম ফ্যান ভাড়া দেনেওয়ালার টাকা বাকী পড়ায় সে আটাশখানা ফ্যান খুলে নিয়ে গেছে। প্রেক্ষাগৃহে শ'খানেক আন্দাজ লোক বসে বসে হাই তুলছে—পেছন প্রায় খালি, সামনে জন পঁচাত্তর লোক বসে আছে—নিশ্চয় পাসে। সাদা আলোগুলো সখীদের পায়ের নাচের ধুলো খেয়ে খেয়ে জনডিসে ভুগছে, ষ্টেজের চতুর্দিকে মাকড়সার জালের ছাউনি। সামনের ড্রপটার দড়ি ঝুলে পড়েছে, এখনও যে একেবারে খুলে পড়ে যায়নি কেন এই পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য্য! তার আর কিছু পদার্থ নেই—নব্বই বছরের বুড়োর চামড়ার মত ঝুলছে। পানবিড়ি সিগারেটরাই আসর জাগিয়ে রেখেছে, নইলে সব চুপ!

কিন্তু প্লে আরম্ভ হবার কথা ৬টায় ওদিকে ৭টা বাজে তবু ড্রপ্ ওঠে না কেন? শুনলুম হিরো সবেমাত্র এসে পৌচেছেন, তাঁর সুটিং ছিল। আরও আধঘণ্টা কেটে গেল, শুনলুম হিরো তৈরী কিন্তু হিরোয়িনের এখনও মেক্-আপ ঠিক হয়নি। তিনি নাকি যতবার রং চাপাচ্ছেন ততবারই তাঁকে দেখতে আরও কুচ্ছিৎ হচ্ছে—থিয়েটারের লোকে বলছে যে বাহার দেখে তাঁদেরই তাঁকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করছে কিন্তু তিনি তাতেও খুশী নন, কেবল ভাবছেন ওরা তো বলবেই। অডিয়েন্স্‌রা ওখান থেকে লাফ্ মেরে তাঁকে ধরতে আসে তবে তো! তাঁর প্রতিজ্ঞা—অপ্সরা না সেজে তিনি আর বেরুবেন না, অথচ তাঁর পার্ট, রাস্তার সর্বহারা এক ভিখারিনীর।

যাক্ মশাই, আটটা আন্দাজ তো ড্রপ উঠলো কিন্তু যে দৃশ্য চোখের সামনে ফুটে উঠলো সে দেখা যায় না। পঁয়ষট্টি থেকে পঁচাত্তর বছর আন্দাজী বয়সের গুটি পনেরো সখী বেরুলেন। এদিকে পোটলা পুঁটলি দিয়ে দেহের বাঁধুনি ঠিক রেখেছেন বটে কিন্তু তোবড়া গাল দিয়ে যখন আলতার লাল ফুটে বেরুচ্ছে দেখলুম—তখনই সর্ব্বাঙ্গ জুড়িয়ে গেল। বুঝলুম পঁচিশ থেকে পঁয়ত্রিশ টাকায় এর চেয়ে ভাল আর কি জুটবে। আর ভাল আনলেও তো নিস্তার নেই, অমনি ভুঁড়িওয়ালাবাবুরা তার পর দিনই ভালবেসে তাঁদের পাঁচশো টাকা দাদন দিয়ে একান্ত আপন করে নেবেন তো—তাই আমাদের দুধের সাধ ঘোলেই মেটাতে হবে বৈকি!

প্রথম অঙ্ক কোনক্রমে শেষ হতে দ্বিতীয় অঙ্ক আরম্ভ হল আরও ঘণ্টাখানেক বাদে। প্লটটা প্রায় ভুলে যাওয়ার সময় বরাবর ঘণ্টা বেজে উঠলো, ওদিকে সাড়ে দশটায় ট্রাম বাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয়ে আর বসে থাকতেও পারলুম না, উঠে গেলুম। পাঁচুবাবুর নাটক এখানে ঠিকই জমবে বলে আমার ধারণা হতে বিলম্ব হল না। সত্যি, নাটকটি মহলাতেও পড়লো।

মহলার সময় কর্ত্তারা বললেন,—দেখুন বইটা বড়, তু'ভাগ করে নিলে হয় না? পাঁচুবাবু বললেন,—আলবৎ!

তিন ভাগ করে দিচ্ছি—একটা অপেরা, একটা ড্রামা হচ্ছবেই, আমি সেইভাবেই লিখেছি কিনা। মহলা চলছে দ্রুত কিন্তু দূত আর প্রহরীরা ছাড়া অন্য কেউ নেই—বড়রা নাকি শেষ মহলায় আসবেন, তাঁদের নানান কাজ বাইরে—ওদিকে পাচুবাবু চেক কেটে চলেছেন।

হিরোয়িনের মহলা দিতে এলে মাথা ধরে তাই প্রোপ্রাইটারবাই তাঁর বাড়িতে গিয়ে মহলা দিয়ে আসেন। অন্যান্য জ্যোতিষ্কদের কথা বলবার উপায় নেই—তাঁরা বেশী পয়সা নেবেন, পরিশ্রম করবেন না, শুধু চোখ রাঙাবেন সবাইকে। প্রোপ্রাইটারও বলি-দানের পাঁঠার মত সামনে থাকবেন, আর আড়ালে তাঁদের বশ্যতা স্বীকার করবেন। আমি তো সব দেখে শুনে নিরুৎসাহ হয়ে পড়লুম কিন্তু নাট্যকার ও প্রোপ্রাইটারদের আশা ও বিশ্বাস অগাধ। তাঁদের ধারণা প্রত্যেক দর্শককে এত যন্ত্রণা দিয়েও যখন কণামাত্র বিচলিত করা যায়নি তখন ভাবনার কিছু নেই—নাটক হলেই ঠিক ঘুরঘুর ক'রে আসবেই।

যাই হ'ক, তারিখ এল খোলবার কিন্তু অভিনয়ের দিনে আর এক ফ্যাসাদ, ড্রপ্ ওঠে না। কারণ, হিরোয়িনের জামা দেহে আঁটছে না, অবিলম্বে পঁচিশ টাকা দিতে হবে, দরজি বসে আছে।

আমি বললুম, সে কি মশাই, আগে যে রিহার্সেলের সময় মাপ নিয়ে গেল দরজি। ম্যানেজার দাঁত খিঁচিয়ে বলে উঠলেন, জীবনে কটা হিরোয়িন দেখেছেন মশাই, রিহার্সেলের সময় যে-মাপ থাকে প্লে-র সময় তাদের সেই মাপ কোন কালে থাকে নাকি?

বুঝলুম তাও ঠিক—সিনেমাতেও ঐ রকম দেখেছি বটে। প্রথম-ছবিতে ক্লোজ আপ নিলেও মনে হত চতুর্দিকে অনেকখানটা জায়গা খালি রয়েছে, কিন্তু তার তিনখানা ছবি বাদেই দেখি লং শটেই স্ক্রীন জুড়ে তিনি একাই জগন্মাতা হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। চুপ করে গেলুম।

ইতিমধ্যে পাঁচুবাবুর পাঁচ হাজার গলে গেছে, এখন হিরোয়িনের জামার হাতা গলছে না বলে কি প্লে আটকে যাবে? তিনি গোটা পঁচিশ টাকা নগদ দিয়ে দিলেন। ঘণ্টাখানেক বাদে ড্রপ্ উঠলো।

অভিনয় সুরু হতে দেখা গেল যে অভিনেতা অভিনেত্রীরা একটা কথাও বলছেন না, নেপথ্য থেকে প্রম্পটার সর্বাগ্রে সব বলে দিয়ে যাচ্ছে—মাঝে উৎসাহের চোটে সে একবার ষ্টেজের ভেতরেই বই হাতে ঢুকে পড়লো। ভাগ্যি সিংহাসনের পাশে এক সেনাপতি দাঁড়িয়েছিলেন, তিনি কোষবদ্ধ তরবারির পেছনটা একটু তুলে কায়দা করে তাঁর পেটে খোঁচা মেরে ষ্টেজের ভেতরে ঢুকিয়ে দিলেন। লোকের তাতে কী হাসি।

ম্যানেজার আমাদের পাশেই বসেছিলেন, একগাল হেসে বলে উঠলেন, ফার্ষ্ট নাইট কিনা, ও রকম তো হবেই, বুঝছেন না? দেখলুম পাঁচুবাবুও ঘামছেন। যাক্ আরও কি দুর্ঘটনা হয় তাই দেখবার জন্যে দুরু-দুরু হৃদয়ে বসে আছি এমন সময় হঠাৎ পেছনে চীৎকার, প্রম্পটার আস্তে!
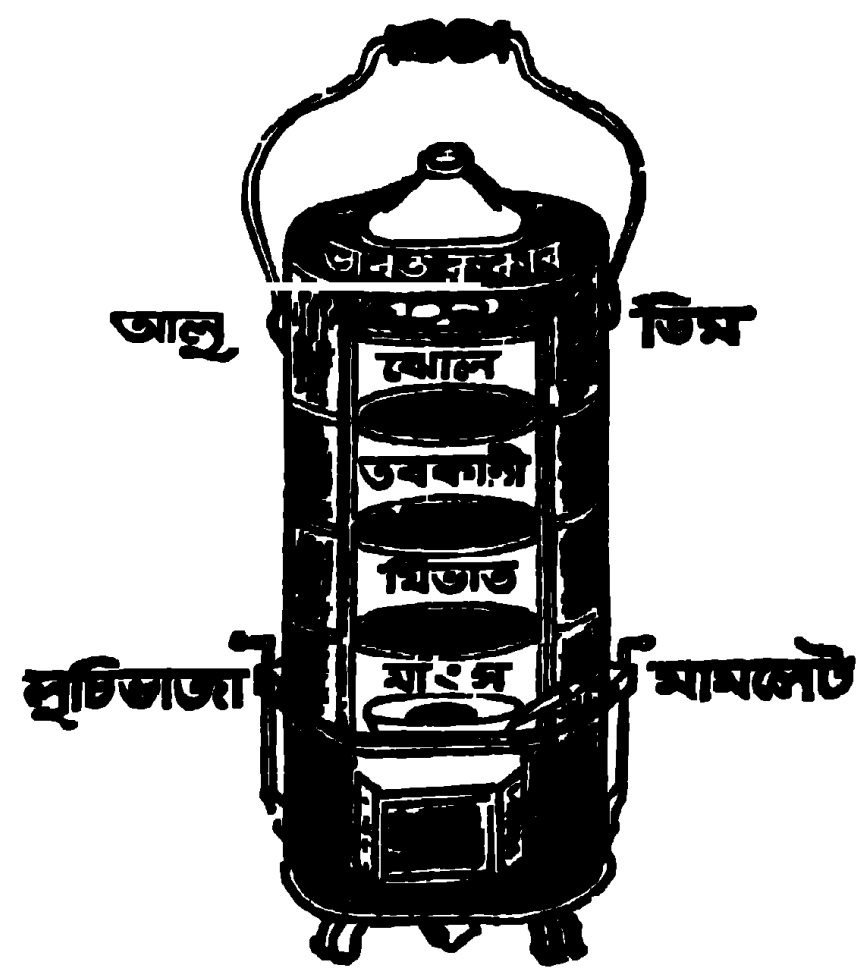
ব্যস! প্রম্পটার একেবারে দমে গিয়ে গলার স্বর যেমনি অভাবিতরূপে নামিয়েছে অমনি সমস্ত অভিনেতারা তোৎলাতে আরম্ভ করলেন, হিরো হিরোয়িনেরই আর্দ্ধেক কথা বলে গেলেন, হিরোয়িন প্রথম দৃশ্যেই দ্বিতীয় অঙ্কের ডায়লগ্ বলে চলে গেলেন—মানে একবর্ণ কারুর মুখস্ত নেই বোঝা গেল।

ম্যানেজার হেসে গড়াগড়ি—ফার্ষ্ট্ নাইট কিনা—বুঝছেন না?

আমরা তখন হাড়ে হাড়ে বুঝছি যে ব্যাপার কি হবে, কিন্তু বিশ্বাস আছে এই যে একুশবার সখীর নাচ আর সাঁইত্রিশবার কামান দাগাতেও যদি নাটক না জমে, তাহলে আর এদেশের নাট্যমঞ্চে করবার কিছু নেই।

ইতিমধ্যে রাজা যখন হিরোয়িনকে বন্দী করবার হুকুম দিচ্ছেন, তখন প্রহরীরা কি করবে ঠিক না করতে পেরে তাঁকেই পাঁজাকোলা করে ষ্টেজের মধ্যে ধরে নিয়ে গেল। তখন কী হাততালি আর চীৎকার! ইনক্লাব জিন্দাবাদ! চতুর্দিকে হৈ হৈ কাণ্ড!

সবাই বল্লে, হ্যাঁ এইবার একটা সাম্যবাদী নাটক সুরু হচ্ছে বটে!

আনন্দের চোটে সাত টাকার চেয়ারে উপবিষ্ট একটি মোটাসোটা ভদ্রলোকের চেয়ারের তলাটাই খুলে পড়ে গেল, ভাগ্যি দুদিকে হাতল ছিল তাই তিনি আটকে গেলেন--নইলে খুনখারাপী হত।

মশাই, আশ্চর্য্য! এই বই দেখতে লোকের কী ভীড়! পাঁচুবাবুও নাটক ঘুরিয়ে দিলেন। ভীড় যত বাড়ে চেয়ারগুলোও তত জখম হয় আর লোকের রকম-সকম দেখে থিয়েটারের চরম অভিজ্ঞতা লাভ করি।

সাগর পারের রঙ্গমঞ্চ

নরেন্দ্র দেব

এডিনবরা ফেষ্টিভ্যাল

বার্থোলোমিউ ফেয়ার

এ সংখ্যার কাগজে যে নাট্যাভিনয়ের কথা বলছি প্রাচীন নাট্যকার বেনজনসনের সেই 'বার্থোলোমিউ ফেয়ার' (Bartholomew Fair) নাটকখানি এবার ২২০ বছর পরে প্রথম পুনরভিনীত হল। গত বছরে সোমবার ২১শে আগষ্ট সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় এডিনবরার এ্যাসেমব্লি হলে ওল্ড ভিক সম্প্রদায় কর্তৃক এই অভিনয়ের আয়োজন হয়েছিল। নাট্যকার বেন জনসন ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে ইংলণ্ডের ওয়েষ্ট মিনিষ্টার শহরে জন্মেছিলেন। বেন জনসন রঙ্গমঞ্চের সম্পর্কে আসেন ১৫৯৭ খৃঃ অব্দে। নাট্যকার ও অভিনেতা হিসাবেই তিনি নাট্যশালায় যোগ দিয়েছিলেন। ১৫৯৮ সালে তাঁর প্রথম নাটক 'Everyman in his humor' এবং ১৫৯৯ সালে এই নাটকেরই বিপরীত দিক হিসাবে লেখা তাঁর 'Everyman out of his humor' নাটকখানি মঞ্চস্থ হয়েছিল। কিন্তু প্রথম নাটকখানি যেরকম সাফল্য অর্জন ক'রেছিল দ্বিতীয়খানি তা পারেনি। কাজেই তাঁকে ওই বছরেই 'The case is altered' নামে আর একখানি নাটক লিখতে হয়েছিল। এরপর প্রায় প্রতি বছরেই তাঁর একখানি নূতন নাটক অভিনীত হয়েছিল। অধিকাংশ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও হাস্যরসাত্মক এবং রাজার আদেশে রচিত। আলোচ্য নাটক 'বার্থোলোমিউ ফেয়ার'খানিও তাই। ১৬১৪ সালে ৩১শে অক্টোবর ব্যাঙ্কসাইডের হোপ থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়েছিল। রাজার ইচ্ছায় এই নাটকের প্রশংসায় আকৃষ্ট হয়ে তদানীন্তন রাজা King James তাঁকে সভাকবি করেছিলেন। তারপর বহুবার এ নাটকখানি নানা রঙ্গালয়ে পুনরভিনীত হয়। কিন্তু ১৭৩০ খৃষ্টাব্দের পর আর কোথাও এ নাটকখানির অভিনয় হয়েছিল বলে শোনা যায় না। গত ১৯৫০ সালে অর্থাৎ ২২০ বছর পরে ওল্ড ভিক্ কোম্পানী বেন জনসনের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-প্রধান হাস্যরসাত্মক নাটকখানির পুনরভিনয় শুরু করেছিলেন এডিনবরার জাতীয় উৎসব উপলক্ষ্যে। ইংরেজরা সাধারণতঃ স্কচম্যানদের বলে থাকেন— ওরা বড় বেরসিক! কিন্তু সমস্ত স্কটল্যাণ্ড ঘুরে আমাদের অভিজ্ঞতা হয়েছে অন্য রূপ। এঁরা বেশ রসিক হয়ে উঠেছেন আজকাল এবং রসিকতা বুঝতেও পারেন এখন, যা নাকি আগে তাঁরা পারতেন না বলে একটা অপবাদ রটিয়েছিলেন তাঁদের ইংরেজ প্রতিবেশীরা।

বেনজনসন ইংরেজ নাট্যকার। ষোড়শ শতাব্দীতে তাঁর তুল্য একজন পণ্ডিত লোক রঙ্গজগতে এবং তদানীন্তন সাহিত্য মহলেও বিরল ছিল। তাঁর নাটকগুলি থেকে জানা যায় তিনি একজন অসামান্য হাস্যরসিক সুধী ছিলেন। ১৭৩৭ খৃঃ অব্দে আগষ্ট মাসে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর আগে রোগে ও অর্থাভাবে বড় কষ্ট পেয়েছিলেন। নাটক ছাড়াও তিনি বহু কবিতা, গাথা, গান ও ছড়া রচনা করে গিয়েছেন। 'বার্থোলোমিউ ফেয়ার' নাটকখানিতে আখ্যানবস্তুর মধ্যে বস্তু তো নেইই এমনকি আখ্যানও কিছু নেই! কতকগুলি এলোমেলো ঘটনা ও মেরুদণ্ডহীন হাল্কা চরিত্রের সাহায্যে নীতিবাগীশদের উপহাস করা হয়েছে। তদানীন্তন ইংলণ্ডের সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে একটু জানা থাকলে নাটকখানি বোঝার একটু সুবিধা হয়। সাহিত্যে দুর্নীতি দমনের একটা আন্দোলন তখন ওদেশের জনসাধারণের মধ্যে শুরু হয়েছিল, নৃপতি জেম্‌স্ ছিলেন এ আন্দোলনের একান্ত

বিরোধী। রুচিবাগীশদের তিনি বিদ্রূপ করতেন। নাট্য-সাহিত্যে সুনীতি প্রচারকদের ব্যঙ্গ করবার জন্যই তিনি বেন জনসনকে তাঁর সভাকবি করেছিলেন। নৃপতি জেম্‌স বরাবরই নাট্যরসিক ও রঙ্গালয়ের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এডিনবরায় তিনি একবার তাঁর অনুগ্রহভাজন এক নাট্য সম্প্রদায়ের দ্বারা কতকগুলি নাটক অভিনয় করাবার জন্য একটি নাট্যশালা খোলবার সময় জন-সাধারণের কাছে থেকে প্রবল বাধা পেয়েছিলেন। ফলে তাঁকে বাধ্য হয়ে সংকল্প ত্যাগ ক'রে লণ্ডন চলে যেতে হয়েছিল। লণ্ডনেও তিনি বেশ বেগ পেয়েছিলেন, তবে তাঁর প্রয়োজনায় অনুষ্ঠিত অভিনয়ে জনসাধারণ

বার্থোলোমিউ ফেয়ারের একটি দৃশ্যে বগচটা ভদ্রলোক হামফ্রেওয়াস্পের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত এ্যালেক্ ক্লুনস, শ্রীমতী 'ওভারডু'র ভূমিকায় অভিনেত্রী উর্সুলা জোনস, নির্বোধ ধনী যুবক বার্থোলোমিউ কোকসের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত রবার্ট এডিসন

সেখানে কোনও বাধা দেয়নি। দেখা যাচ্ছে যে তিনশ বছর আগেও ইংলণ্ডের রাজার যথেচ্ছাচার করবার অধিকার ছিল না। যাই হোক, অভিনয়ে বাধা না আসায় নৃপতি জেম্‌স্ মনের আনন্দে দেশের যত রুচি-বাগীশ আর নীতিনিষ্ঠদের ব্যঙ্গবিদ্রূপ করে নাটক লিখিয়ে এবং সেই নাটক অভিনয় করিয়ে তাঁর মনের ঝাল মেটাতেন। প্রতিভাবান নাট্যকার বেন জনসন তাঁর একাজের প্রধান সহায়ক ছিলেন। 'বার্থোলোমিউ ফেয়ার' নাটকে ধর্মের ভণ্ডামিকে, নীতির নষ্টামিকে মোক্ষম বিদ্রূপ করা হয়েছে। আজ যদি নৃপতি জেম্‌স জীবিত থাকতেন তিনি দেখে নিশ্চয়ই খুশী হ'তেন যে, যে-এডিনবরা একদিন তাঁকে সেখানে নাট্যশালা খুলতে বাধা দিয়েছিল সেই এডিনবরায় তাঁরই সভাকবির রচিত এবং তাঁর নিজের অত্যন্ত প্রিয় সেই বিদ্রূপাত্মক ও হাস্যরসময় নাটক 'বার্থোলোমিউ ফেয়ার' আজ ৩৩০ বছর পর আবার অভিনীত হচ্ছে। কালের প্রভাবে সমাজের রুচি নীতি ও রসবোধ যে কতদূর বদলে গেছে তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ হ'ল এই দু'শো কুড়ি বছর পরে এডিনবরায় ধর্মধ্বজীদের বিদ্রূপ করে লেখা বেন জনসনের এই নাটক অভিনয়ের দ্বারা।

মনে রাখতে হবে যে সভাপরিষদ রাজা ও তাঁর বিশিষ্ট সভাসদবর্গের সামনে এই নাটকের অভিনয় হ'য়েছিল সেদিন। দেশের গণ্যমান্য, শিক্ষিত ও সুরুচিসম্পন্ন এবং সংস্কৃতবান যাঁরা তাঁরাই যে রাজসভা অলঙ্কৃত করতেন একথা বলাই বাহুল্য। তথাপি দেখতে পাই নাট্যকার বেন জনসন তাঁর 'বার্থোলোমিউ ফেয়ার' নাটকের প্রস্তাবনায় বলেছেন যদি কোনও দর্শকের ব্যক্তিগতভাবে এ নাটকের অভিনয়ে কিছু আপত্তিজনক আছে বলে মনে হয়, তবে সেজন্য জবাবদিহি করবেন রাজা নিজে, সেরূপ দর্শকদের তাচ্ছিল্যভরে তিনি বলেছেন :—

We value less what their dislike can bring
If it is so happy be t' have pleas'd the King.
"তাঁদের ভাল না লাগাটার মূল্য দিইনা আমরা তত,
রাজার যদি ভাল লাগে তো আমরা খুশী তাতেই যত।"

এই নাটকে বেন জনসন নির্মমভাবে দেখিয়েছেন তদানীন্তন সমাজের তথাকথিত নীতিবাগীশ ধর্মধ্বজীরা কত বড় ভণ্ড, অনাচারী অসৎ ও চরিত্রহীন। কৈফিয়ৎ স্বরূপ কবি বলেছেন তাঁর নাটকের ভূমিকায়—"It is a merry play, and as full of noise as sport made to delight all and to offend none,

বার্থোলোমিউ ফেয়ারের একটি দৃশ্যে
ওল্ড্ ভিক্ কোম্পানীর পূর্ণ দল

provided they have either the wit or the honesty to think well of themselves." অর্থাৎ, তাঁর মোদ্দা কথাটা হচ্ছে যে এ অভিনয় দেখে সবাই খুশী হবে যদি না তারা নেহাৎ এমন বোকা বা এমন বেজায় ইতর হয় যে নাটকে রূপায়িত ধূর্ত শঠ ও নির্বোধ বেকুব চরিত্রগুলোর মধ্যে নিজেদের স্বরূপ দেখতে পায়!

যে 'বার্থোলোমিউ ফেয়ার' অবলম্বন ক'রে জনসন তাঁর নাটকখানিকে দাঁড় করিয়েছেন সেই 'ফেয়ার' বা মেলা ইংরেজদের দেশের সমস্ত মেলার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। নৃপতি প্রথম হেনরির সময় থেকে এই মেলা চলে আসছে অর্থাৎ ১০৬৮ খৃঃ অব্দ থেকে। এই মেলার মধ্যে তিন চারটি বাজার বসতো, যেমন সাজসজ্জার বাজার, ঘোড়ার বাজার, ফুলের বাজার ইত্যাদি। ব্যায়াম প্রভৃতি দৈহিক শক্তি প্রদর্শন, তীরধনুকের লক্ষ্যভেদ খেলা এবং আরও অন্যান্য খেলা ও প্রতিযোগিতার আয়োজন ছিল। এ ছাড়া প্রচুর আমোদ প্রমোদেরও ব্যবস্থা হ'ত। জনসনের নাটকখানি প্রধানতঃ মেলার এই আমোদপ্রমোদের অংশ অবলম্বন করেই রচিত। সেণ্ট্ বার্থোলোমিউর স্মরণ দিবসে এই মেলা বসতো বলে এর নামও হয়েছিল তাই 'বার্থোলোমিউ ফেয়ার'। ১৮৫৫ খৃঃ অব্দ পর্যন্ত এই মেলা

তিন বন্ধু : নরেন্দ্র দেব, শিশিরকুমার ভাদুড়ী ও প্রেমাঙ্কুর আতর্থী
ফটো : শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায়

চলেছিল, তারপর বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু জনসনের 'বার্থোলোমিউ ফেয়ার' নাটকখানির অভিনয় বন্ধ হয়ে যায় এর একশ পঁচিশ বছর আগেই।

অভিনয় আমাদের ভাল লাগেনি। তার কারণ এ নয় যে রঙ্গমঞ্চে পাত্রপাত্রী যে ব্যঙ্গবিদ্রূপ ও রসিকতা করেছিল আমরা তার অধিকাংশই বুঝতে পারিনি। আমার বক্তব্য হচ্ছে ওল্ড্ ভিক কোম্পানীর অভিনয় যতই সরস ও প্রাণবন্ত হোক, এ নাটক এ যুগে অচল। কেন যে এই বই গত ২২০ বছর আর কোথাও পুনরভিনীত হয়নি তা বেশ বোঝা গেল এই নাটকের কাঠামো দেখে। পূর্বেই বলেছি নাটকখানির মধ্যে নাটকীয় চরিত্র বলতে একজনেরও নাম করা চলে না, অথচ, খুব কম করেও অন্ততঃ তিরিশজন অভিনেতা অভিনেত্রীকে প্রয়োজন হয় এই নাটকখানিকে রূপায়িত ক'রে তুলতে। এই নাটকখানির প্রযোজনা করেছেন জর্জ ডিভাইন। যে চরিত্র যখন কথা বলে তখনই তা হয়ে ওঠে হাস্যরসের গুণে প্রাণবন্ত। নাট্যকার বেন জনসন রসকে মূর্ত করে তুলেছেন বটে, কিন্তু রসিকজনকে তৃপ্ত করতে পারেন নি। এক একটি ভূমিকা যখন কথা বলে আমরা শুনে হেসে উঠি। তাঁদের রসিকতা বিদেশীদের কাছেও সহজেই বোধগম্য হয়, তার কারণ, একই রসিকতার বহুবার পুনরাবৃত্তি আছে এ নাটকের নানা স্থানে। প্রযোজনমত জর্জ ডিভাইন নূতনত্ব করবার ঝোঁকে রঙ্গমঞ্চের ওপরেই কতকগুলি কুটীর নির্মাণ করিয়েছিলেন। অভিনেতৃবর্গ তাঁদের বক্তব্য শেষে তার মধ্যে অদৃশ্য হবেন বলে। অথচ নাটকের মধ্যে মেলার দর্শকরূপ জনতার দৃশ্য না থাকায় 'বার্থোলোমিউ ফেয়ার' বেশির ভাগ সময়েই পরিত্যক্ত ও নির্জন বলে মনে হয়েছে। এতবড় একটা ত্রুটির দিকে প্রযোজকের দৃষ্টি পড়েনি দেখে বিস্মিত হয়েছিলাম। তবে আমরা ছিলাম প্রথম অভিনয় রাত্রির দর্শক। আশা করি এরপর প্রযোজক ডিভাইন সাহেব অভিনয়ের ত্রুটি সংশোধন করে নিয়েছেন।

মুক্তি-প্রতীক্ষিত 'রাত্রির তপস্যা' চিত্রে
আরতি মজুমদার ও প্রণতি ঘোষ

বহু প্রাচীন সেকালের অসভ্য রসিকতা রুচির দিক থেকে ভাল না লাগলেও লোককে হাসাবার ক্ষমতা তার

লুপ্ত হয়নি। ওল্ড ভিক কোম্পানী তাঁদের সুঅভিনয়ের গুণে দর্শকদের হাসিয়েছেন খুব কিন্তু লোক হাসাননি এ কথা জোর করে বলতে পারি। কারণ অভিনয়ে যাঁরা নানা ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন, যেমন শ্রীযুক্ত রোজার লাইভসে এ্যালেক ক্লুনস, উরশুলা জীন্‌স, ডোরোথি টিউটিন, এসমণ্ড নাইট, উলিয়াস ডেভলিন, এ্যান্থনি ভ্যানব্রীজ, ন্যুনা ডেভি, ব্রায়াণ স্মিথ, মার্ক ডিগনাম, রবার্ট এডিসন, ডোরোথি গ্রীণ এঁরা প্রত্যেকেই নাট্য-জগতের সুপরিচিত শিল্পী। 'এ্যাডাম ওভারড়'র ভূমিকায় শ্রীযুক্ত রোজার লাইভসের সুঅভিনয়ে সদাপ্রফুল্ল ও সকলের প্রতি সদয় অথচ সবদা নিদ্রালু বিচারকের রূপটি সুন্দর ফুটে উঠেছিল। উচ্ছ্বসিত হাস্যরসের অন্তরালে যে বেদনার প্রচ্ছন্ন প্রবাহ বয়ে চলেছিল এই নাটকের মধ্যে এর অভিনয় তারই অবকাশে বেশ একটি প্রসন্ন পরিতৃপ্তির

ষ্টুডিওর কাজের ফাঁকে বিশ্রামালাপে রত
কমল মিত্র ও মীরা মিশ্র

চিনতে পারেন এঁকে ?
ইনি হলেন বাংলা ছবির নির্বাক ও সবাক
যুগের জনপ্রিয় ও অতি-পরিচিত
ধীরাজ ভট্টাচার্য্য
(ষোলো বছর বয়সে)

ঔজ্জ্বল্য এনে দিয়েছিল। 'শ্রীমতী ওভারডু'র ভূমিকায় অভিনেত্রী উরশুলা জীনস যতটা সুযোগ পেয়েছেন ভাল অভিনয়ই করেছেন, কারণ, তাঁর মানসিক রোগগ্রস্ত পত্নীর ভূমিকায় কেবল অসুখের ভান করা ছাড়া আর বিশেষ কিছু করবার ছিলনা। 'উইন দি ফাইট লিটল উইট' রূপে শ্রীমতী ডোরোথি টিউটিন দর্শকদের প্রচুর হাসিয়েছেন তাঁর অননুকরণীয় অভিনয়নৈপুণ্যে। 'টম কোয়ার্লাসে'র ভূমিকায় এসমণ্ড নাইট চমৎকার ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে পেরেছিলেন। অবিনয়ী হওয়াটা যে কতটা কলাকৌশলসাপেক্ষ ইনি তা' প্রমাণ করেছেন। উইলিয়াম ডেভলন 'পিস্তল' যে কতখানি ঠাণ্ডা থাকতে পারে তা দেখিয়েছেন। এ্যান্টনি ভ্যানব্রীজ ধর্মযাজকদের বিচার সভার একজন অতি সাধারণ মোক্তার হিসেবে ভালই অভিনয় করেছিলেন। লোভী নোংরা একগুঁয়ে পেটুক মাসীর ভূমিকায় ন্যানা ডেভী বেশ জোর অভিনয় করেছিলেন। এঁরই স্বনা সহকারীরূপে ব্রায়ণ

'ভিন্ দেশের মেয়ে' চিত্রে সিতারা
গোল্ডেন মুভি কর্পোরেশান্ লিমিটেডের পরিবেশনায়
ছবিটি শীঘ্রই মুক্তিলাভ করবে

আজকে যারা বিস্মৃত তাঁদের অন্যতম হলেন
শান্তি গুপ্তা।

স্মিথ তাঁর ভূমিকায় দেখাবার কিছু না থাকলেও দর্শকদের মনের ওপর বেশ একটা ছাপ রেখে যান। জল-অফ-দি-ল্যাণ্ড-বিজী রূপে নীতিবাগীশের ভূমিকায় সকলের বিদ্রূপের পাত্র হয়ে শ্রীযুক্ত মার্ক ডিগনাম তাঁর নাকা সুরে গান গেয়ে দর্শকদের খুব আনন্দ দিয়েছিলেন। নির্বোধ ধনী যুবক বার্থোলোমিউ কোক্‌সের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত রবার্ট এডিসনের অভিনয় অত্যন্ত প্রাণবন্ত ও স্বাভাবিক হয়েছিল। ইনি বোকা অথচ হুঁসিয়ার, কেবলই চেঁচামেচি করেন অথচ বারবার ঠকেন। রগচটা ভদ্রলোক হামফ্রে-ওয়াস্পের ভূমিকায় এ্যালেক ক্লুনস্ আর সুরুচির শুচিতাগ্রস্ত ডেম পিওর ক্র্যাফট রূপে শ্রীমতী ডোরোথি গ্রীন খুব সুন্দর অভিনয় করেছিলেন। মনে হ'ল এঁরা আরও কঠিন ও দুরূহ ভূমিকায় অভিনয়ের যোগ্য। নাট্যকার বেন-জনসনের যা কিছু ত্রুটি এঁদের সুঅভিনয়ের গুণে তা' চাপা পড়েছিল।

বোম্বাই চিত্রজগতের যৌবনময়ী চিত্রতারকা বেগম পারাকে
শীঘ্রই বাংলা ছবিতেও দেখা যাবে

'সমাধি' থেকে 'নৌজোয়ান' যাঁর অভিনয় প্রতিভার নূতন
স্ফুরণের সূচনা করেছে তিনি হলেন মলিনা দেবী জয়ন্ত

হৃতশ্রী বাংলা ছবির পুনরুদ্ধার

মৃগাঙ্ক সেন

(প্রথম পর্বায় 'চিত্রবাণী' বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত)

ইতিমধ্যে একটি চমৎকার ব্যাপার ঘটে গেছে। গেলবারে বাঙলার প্রচারযন্ত্রের বৈধব্যদশার কথা লিখেছিলুম। লেখবার সময়ে একটা দুরন্ত আশঙ্কা ছিল যে ভুলভাবে আমার নির্দেশ গ্রহণ করলে প্রমাদ ঘটা অসম্ভব নয়। আর হোলও তাই। এর মধ্যে চোখে পড়লো কয়েকটি পত্র-পত্রিকা 'বৈধব্যদশা' ঘোচাবার দিকে যথেষ্ট সচেষ্ট হয়ে উঠেছেন। এমন কি এঁদের মধ্যে কেউ কেউ বিবসনা দেশী-সুন্দরীদের ছবি, বিশেষভাবে গৃহীত নিশ্চয়ই, পাঠকসমাজকে উপহার দিয়েছেন। আমার বক্তব্য কিন্তু এতদূর দিগম্বরপ্রসারী ছিল না। বিবসনা সৌন্দর্য অথবা কুশ্রীতা, আর যাদেরই অঙ্গেরভূষণ হয়ে থাক ভারতীয় মেয়েদের নিশ্চয়ই নয়। ভাষার রোমান্টিক ইঙ্গিত ও সুষ্ঠু ছবির উপযুক্ত প্রকাশের দ্বারা আমাদের প্রচারযন্ত্রকে খানিকটা আলতা পরানো, বোধ হয় গেলেও যেতে পারে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এদিকে সজাগ হলে আশা করবার মতো কিছুটা অবসর অবশ্যই রাখবেন। বাঙলার প্রচারবিদ্‌রা তো বটেই।

যাই হোক, শেষবার বলেছি যে, যে-সমস্ত বাঙলা ছবি হিন্দী ভাষায় রূপান্তরিত হয়ে বোম্বাই-এর প্রশংসা ছিনিয়ে আনতে যাচ্ছে তারা বাঙলাদেশের প্রামাণ্য ছবি নয়। কেন?—বাঙলা দেশের প্রামাণ্য ছবিই বা কি জিনিষ?

আজকের আমেরিকার কাছ থেকে, বিশেষতঃ হলিউডের কাছ থেকে, এই প্রামাণ্যতার পাঠ আমাদের নেওয়া উচিত। যাঁরা হলিউডের ছবির সঙ্গে গত ১৯৩৮ সাল থেকে বিশেষভাবে পরিচিত হবার অবকাশ পাচ্ছেন, তাঁরা একথা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে, হলিউড বা বিদেশের কোন বিশেষ বিশেষ জায়গায় না গিয়ে থাকলেও, ভুল হোক সত্যি হোক, সেই সেই জায়গায় আদব-কায়দা ও খানিকটা ভৌগলিক বৃত্তান্তের সঙ্গে তাঁরা পরিচিত হয়ে গেছেন হলিউড ছবির দয়ায়। ভুল হোক, সত্যি হোক বলার অর্থ এই যে, হলিউডের ষ্টুডিয়ো থেকেই প্যারীস জন্ম নেয়, এমনকি সুইজারল্যাণ্ডের বরফাচ্ছাদিত পাহাড়গুলো পর্যন্ত। লণ্ডন, ব্রাসেলস্ অথবা কোপেনহাগেন তো নস্যি! হলিউডের চোখ দিয়ে দেখা এই সব সহর অন্যান্য দেশীয়দের চোখ দিয়ে দেখায় খানিকটা ফরাক্ হয়ে পড়েই। সে কথা যাক্। আসল কথাটা হচ্ছে হলিউডের নায়ককে (অথবা সময় সময় নায়িকাকেও) নিয়ে। এই নায়ক আমেরিকার সভ্যতা ও ডেমোক্র্যাসির পুরো রাজ সংস্করণ, পুরু-নর বললেও অত্যুক্তি হয় না। সমস্ত গল্পকেই হলিউড এতাবৎকাল পর্যন্ত, নায়ক-নায়িকার মারফৎ, 'ফোর ফ্রিডামে'র অগ্রদূত করে রেখেছে। ব্রিটেন ক্রমশঃ এই পাঠ নিতে আরম্ভ করেছে। এ হেন কালে বাঙলার পিছিয়ে থাকাটা নিতান্তই প্রাগৈতিহাসিক কাণ্ড। বোম্বাই-এর কথা ধরি না, কারণ দেবার মতো কিছুই তারা উত্তরাধিকারসূত্রে ভারতবর্ষের কাছ থেকে পায় নি (একমাত্র ছেলে-মেয়েতে একসঙ্গে কিউ দিয়ে বাসে ওঠা ছাড়া,অথবা যানবাহনে লেডীজ সীটের প্রাদুর্ভাবকে বঞ্চিত রাখার···এগুলো নিতান্তই হাল-আমলের, বিদেশীর শ্রীচরণবাহিত 'গেটওয়ের' অমূল্য সম্পদ হলেও জাতীয় সম্পত্তি নিশ্চয়ই নয়)।

বৌদিদি-দেবরের আত্র স্নেহ-ভালোবাসা দেখিয়ে, অথবা মধ্যবিত্ত ঘরের শিক্ষিত যুবকের অনাহারে ক্ষয়-রোগের প্রহার-জর্জরিত অবস্থায় সঙ্গীন অবকাশের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে কাঁদানো, অথবা ক্ষীণজীবি নায়িকার কশ্চিৎ অজ্ঞাতকুলশীল ব্যারিষ্টার বীতংসের প্রতি প্রেমনিবেদনের মর্মান্তিক পরিস্থিতি এঁকে বাঙলার ছবি-

স্বেচ্ছাচারিতার পায়ে বন্দী। সেইজন্ত আমরা আজ পর্যন্ত নিয়মশীলতার অনুবর্তী নই। স্কুলের ছেলেদের অযথা ধূম-পানাভ্যাস থেকে নিবৃত্ত করতে গেলে অধুনা সেটা ব্যক্তিস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এ হেন ক্ষেত্রে, যদি বা কোন ভালমানুষকে, যিনি একটা গল্প নিয়ে স্টুডিয়োর কারাগারে চিত্র-বিদ্যাকে সায়েস্তা করতে চলেছেন, বলা যায়, "হ্যা বাপু, হাজার হাজার ফিট ফিল্ম-পোড়াবার আগে তোমাকে একটি অনু-শীলনী সমিতির সুপারিশ জোগাড় করে আনতে হবে," তাহ'লে ভাল-মানুষ বলবেন, "তোমার খবরদারীর প্রয়োজনটা কি হা? পয়সা আমার, ইচ্ছে আমার!"

সুতরাং বলার কিছু নেই। সমগোত্রীয়দের মাঝেও অনেকেই বলে উঠবেন, "আর্ট-সৃষ্টির ব্যাপারে এ রকম দরবারী হস্তক্ষেপ অসহ্য।" আহা, আর্ট-সৃষ্টি তো অনেকেই দেখা গেল। এখন তো কেবল মাঠ-সৃষ্টি চলেছে। তোমরা কেউ কিছু বলেছো কি, অমনি লোকে বলবে, তোমরা যেন মরুভূমির মাঝখানে সার্থবাহদের যাত্রাপথে বাগড়া দিচ্ছো।

এম. পি প্রোডাকসনের সন্তমুক্ত 'বাবলা' চিত্রে শোভা সেন

বিভার হালে পানি কখনই টেনে আনা যাবে না, যেতে পারে না। এইসব বালখিল্য দুর্বলতা পরিহার করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য হোক্।

এইবার ব্যবসায়িক দিকটা দেখা যাক্—

বাঙলার অন্ধকার কুলুঙ্গীর কোনে দশানন্দহাবিদ্যার আবদ্ধ আসন বলেই আমাদের স্বাধিকার বৃত্তি

বুদ্ধিমান কেউ কেউ ইতিমধ্যে রব তুলেছেন, সরকার যে মামুলী প্রমোদকর নিয়ে যাচ্ছেন, এমন একটা আইন করা যাক যার বলে সরকার সেই বিপ্রলব্ধ করের কিছু অংশ যেন চিত্র-ব্যবসায়ে নিযুক্ত করেন। কথাটা ভালো সন্দেহ নেই। তবে আরও বুদ্ধিমান আছেন, তাঁরা বলবেন "বিনা স্বার্থে 'গভর্ণমেন্ট' কাউকে কখনও কিছু দেয় না। 'গভর্ণমেন্টে'র সাহায্য নেওয়া মানেই সরকারী মাতব্বরদের খানিকটা হুকুম তামিল করা।" কথাটা মিথ্যে নয়। আজ লাঙলভরা বনস্পতিময় গল্প, কাল এ্যাটম বোমাময় তে-ভাগা মার্কা গল্পও হয়তো লিখতে হতে পারে। পেশাদারী গল্প লেখকদের দিকেও তো তাকানো দরকার। তাদের যদি দুনিয়ার সব শিক্ষা আয়ত্ত থাকতো, তাহ'লে তাদের আর মরতে কেন সিনেমার 'দিনেমার-নাবিক' সাজতে আসা!

যেমনই হোক, তদন্ত কমিটির রিপোর্ট না-বেরোলো পর্যন্ত (বেরোবে কি?) নিশ্চয় করে কিছু বলা যাচ্ছে না।

নিশ্চয় করে কিছু বলা না-গেলেও এটা তো বলা যেতে পারে যে,—

ধরুন···

আর বাড়ানো দরকার। অতএব ব্যয়ের দিকটাও নিশ্চয়ই দেখতে হবে। বাঙ্‌লা ছবি তৈরী হয় কি পদ্ধতিতে? প্রযোজক কিছু টাকা এনে ছবি তুলতে লাগলেন। কেউ কেউ শেষ করলেন, কেউ বা আধ-শেষ, কেউ বা হয়তো একেবারেই নিঃশেষ। ছুটতে হলো পরিবেশকের কাছে। তাঁদের যদি হাউস থাকে তবে তো আর কথাই নেই; যদি না থাকে তবে অনেক কেঁদে-ককিয়ে হয়তো কিছু টাকা জোগার করা গেল। বহু কড়া কড়া সর্তে ছবি দেখাবার ব্যবস্থাও হলো। ধার শোধ

করতে করতেই প্রযোজকও আপনা-আপনি শোধ হয়ে গেলেন···পরিবেশকের হাউস থাকলে দু'বার অন্যথায় অন্ততঃ একবার।

আচ্ছা, ব্যবস্থাটা যদি এই হোত—

কেউ আমাদের বললে, 'একটু নিয়মানুবর্তী হোন্, কেমন? প্রথমে কনট্রোল্ড্ হয়ে পরে ডি-কন্ট্রোলড্ হোন।'

—কি করে?

—আপনারা নিজেরা একটা সংঘ (organisation) গড়ুন। নিজেরা মানে প্রযোজকরা।

—সেটার রূপ কি?

—রূপ, ধরুন অনেকটা কো-অপারেটিভ্ ব্যাঙ্কিং-এর মতো।

—সেটা আবার কি? ও রকম কথা তো অনেকেই বলছে।

—শুনুন। অনেকে বলতে পারে, কিন্তু তার আসলরূপ হয়তো কারোরই জানা নেই।

মুক্তি-প্রতীক্ষিত হিন্দী ছবি 'অনমোল সাহারা'র অমিতা দেবী

—ও, আপনি যে সিস্টেম ইংলণ্ডের চিত্র-ব্যবসায় চালু হতে যাচ্ছে, তার কথা বলছেন তো?

—প্রায়।

—তবে বলুন···

একটা অর্গ্যানিজেশন, যার সভ্য হবে "আসল প্রযোজকেরা" মাত্র, বেশী নয়, নিরিখ্-মাফিক।

সভ্য হবার কানুন

কয়েকজন মিলে, যাঁরা বাস্তবিক প্রযোজক হতে চান, এবং যাঁদের রেস্ত আছে, তাঁরা একটা বোর্ড গঠন করলেন ধরুন, তার নাম দেওয়া হলো ন্যাশনাল ফিল্ম-বোর্ড। এই ফিল্ম-বোর্ডের কার্যকরী সমিতি বস্তু ও ব্যক্তি নিরপেক্ষ আদমীদের নিয়ে গড়া। এঁদের সাহায্য করবার জন্যে থাকবেন একদল প্রযোজক, যাঁরা একটা নির্দিষ্ট মূল্য জমা রেখে তারপর প্রযোজক বনতে চান হোন, আপত্তি নেই। ধরা যাক্, নির্দিষ্ট মূল্য পঞ্চাশ হাজার টাকার বেশী নয়। এই প্রযোজকরা বছর বছর আপনাদের
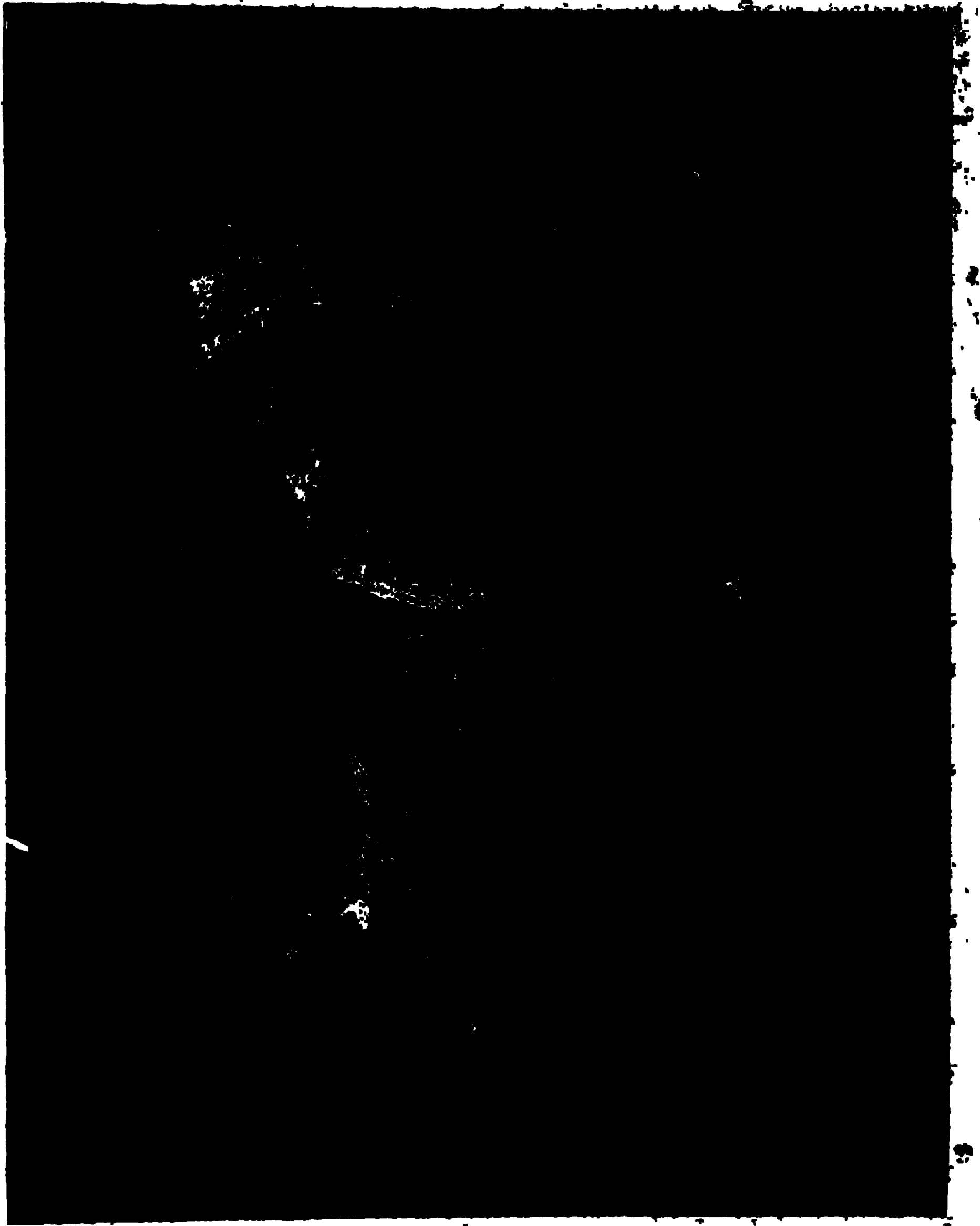
মধ্যে পাল্‌টা-পাল্‌টি করে সাহায্যকারী সমিতি গঠন করে নেবেন। শুধু টাকা জমা রাখলেই প্রযোজক হওয়া যাবে না, বোর্ডের কাছে আপনার সঠিক পরিচয় উপযুক্তভাবে খাড়া করতে হবে, তবে।

ফিল্ম বোর্ড কাদের দিয়ে তৈরী,—ক'জন ?

প্রথমতঃ যাঁরা ফিল্ম সম্পর্কে বোঝেন, আগ্রহশীল এবং উন্নতিপ্রয়াসী। ফিল্ম রাজ্যের বাইরে-ভেতরের লোক।

দ্বিতীয়তঃ যাঁরা বৃহত্তর পরিচয়ে সৎ, দশের কাছে শ্রদ্ধা পাবার যোগ্য।

তৃতীয়তঃ এঁদের মধ্যে বে-সরকারীভাবে সরকারী পদস্থ কর্মচারীও থাকতে পারেন, কেন না তাঁদের মতামত প্রকাশ করবার যোগ্যতা ইতিমধ্যেই প্রমাণিত হয়ে গেছে।

চতুর্থতঃ এই বোর্ডের সভ্যদের মধ্যে আগামী পাঁচ বছরের জন্যে কোন রদবদল হবে না।

পঞ্চমতঃ বোর্ডের সভ্যরা প্রথম বছরের সর্বসাকুল্য আমানত থেকে আগামী পাঁচ বছরের জন্যে মাসিক একটা ন্যূনতম বৃত্তি ঠিক করে নেবেন, নিজেদের জন্যে।

ষষ্ঠতঃ বোর্ডের সভ্য-সংখ্যা ন্যূনপক্ষে দশ, অনূ্যনপক্ষে পনেরো।

কার্যক্রম

বোর্ড গঠন হয়ে গেল। সভ্য-প্রযোকজদের প্যানেলও হলো তৈরী। এখন কি কর্তব্য ? সভ্য-প্রযোজকদের মধ্যে যাঁরা ছবি তুলতে চান, তাঁরা বোর্ডের কাছে তাঁদের গল্প পেশ করলেন। (অবশ্য সভ্যগণ এমন প্রযোজকেরাও নিজেদের সুবিধার জন্যে তাঁদের কার্যক্রম বোর্ডের কাছে পেশ করতে পারেন, বোর্ড তাঁদের মতামত জানাবেন এঁদেরকে, বদলে শুধু একটা দর্শনী দিতে হবে বোর্ডকে)। একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বোর্ড সমস্ত দিক পর্যালোচনা করে সেই বিশেষ গল্পটির কোন সম্ভাবনা আছে কিনা, না থাকলে কি করে সম্ভাবনা ও চাহিদা তৈরী করা যেতে পারে; এমনকি কতদিনের মধ্যে কত টাকার মধ্যে তার আসল রূপ দেখতে পাওয়া যাবে তার একটা চূড়ান্ত খসড়া করে দিলেন (এর আগেই বাঙলার প্রামাণ্য ছবির কথা বলেছি)। খসড়া করে দেবার পর একটা সময় দিয়ে দেওয়া হলো, সেই সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাপের ভেতর ছবি তোলা হলে পর, ছবি শেষ করার ব্যাপারে বাকী টাকার জন্যে দায়ী রইলেন বোর্ড—এমনকি তার পরিবেশনা ও প্রদর্শনের জন্যেও। ছবি-লগ্নীর টাকা প্রদর্শনের পর নির্দিষ্ট হারে বোর্ডকে ফেরৎ দেওয়া যেতে পারে অথবা তোলা হয়ে গেলে বাইরের কোন পরিবেশক অথবা প্রদর্শক মারফৎ ফেরৎ দেবার বন্দোবস্ত করা যেতে পারে। তখন লগ্নীর টাকা উদ্ধার করা ব্যতীত, বোর্ডের ছবির ওপর আর কোন দায়িত্ব থাকবে না—প্রযোজক অথবা নিযুক্ত পরিবেশক-প্রদর্শকের কাছ থেকে। তবে এর জন্যে মাত্র একটা নিয়ম থাকতে পারে যে, প্রযোজক-পরিবেশক প্রদর্শকের কাছ থেকে বোর্ড এই ছবির জন্যে একটা ন্যূনতম অঙ্ক, একটা ন্যূনতম সময়ের মধ্যে, আদায় করিয়ে দেবার কথা লিখিয়ে নিতে পারেন। পরে সে কথা বলছি। "প্র-প-প্র" এই ত্রিচক্রের মধ্যে গাণিতিক কোন দাবী-দাওয়া অথবা প্রতিজ্ঞার কথা সংজ্ঞান্তর না হওয়া পর্যন্ত চিত্র-ব্যবসায় অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়ার নামান্তর হয়েই থাকবে। ঝুঁকি নেবার ভার যদি শুধুমাত্র প্রযোজকেরই থাকে, তবে পরিবেশক ও প্রদর্শক কি আড়ালে দাঁড়িয়ে কেবল মজা দেখবেন ? যা তাঁরা এতাবৎকাল করে আসছেন, তা আর কতদিন চলবে আশা করেন আপনারা ?

এখন বিষয়ান্তরে আসা যাক। প্রযোজকের ছবি যদি আশানুরূপ ফলপ্রসূ না করে, এই হলো প্রথম কথা। পরের কথা হলো আশানুরূপ অথবা তার চাইতে ঢের বেশী যদি ফলপ্রসূ হয় প্রযোজকের ছবি। তখন বোর্ড কি কি উপায়ে লগ্নী উদ্ধার বা উদ্গার করবেন।

যদি না করে

করা বা না করার জন্যে বোর্ডের একটা উপস্বত্ব থাকবে ছবির ওপর। যখন না-করবারই সম্ভাবনা বেশী তখন বোর্ড এমন একটা ব্যবস্থা করতে পারেন

১ থেকে মোটামুটিভাবে টাকাটা উঠে আসে। বোর্ডের দাবী মিটে গেলে উদ্বৃত্ত টাকা অবশ্য প্রযোজক ফিরে পাবেন। কিন্তু সেই টাকা থেকে শতকরা ১ থেকে ২ টাকা কেটে রেখে চিরস্থায়ী মূলধনে জমা রাখতে পারেন বোর্ড।

এই ব্যবস্থাটি হচ্ছে ভাষান্তরিত করবার ক্ষমতা এবং তা থেকে উপলব্ধ লাভ। ভাষান্তরিত করবার যে যে পদ্ধতি অবলম্বনীয় এবং যে যে খাতে খরচার প্রয়োজন বোর্ড অবশ্য তাই করবেন। বিভিন্ন প্রদেশে এর জন্য সুপরিকল্পিত প্রচার, ভাষান্তরণ-পদ্ধতির প্রসারের জনপ্রিয়তা বাড়াবার সমস্ত চেষ্টা ও উপায়-উদ্ভাবন এবং পরিকল্পনা অবশ্য বোর্ড নিজের খরচা থেকেই করবেন। এবং এরই জন্যে সামান্য হারে টাকা কেটে রেখে চিরস্থায়ী মূলধনে জমা দেওয়া।

যদি বেশী করে

তবে, সেই ছবির প্রযোজক অথবা গোষ্ঠীকে অধিকতর সুযোগ-সুবিধা দেবার ব্যবস্থা করা হবে। প্রয়োজন বোধে ভাষান্তরিত করে তার ওপর থেকে একটা মোটা অঙ্ক প্রযোজকের জন্যে বরাদ্দ করে দেওয়া হবে। এই ছবির আয়কে জামীন রেখে উক্ত প্রযোজক অথবা গোষ্ঠীকে তাঁর বা তাঁদের ভবিষ্যৎ ছবির জন্যে সমস্ত সুরাহার বন্দোবস্ত করে দেবেন বোর্ড, যা থেকে নাকি প্রযোজক অথবা গোষ্ঠী অতি অল্প-খরচে ভবিষ্যতের কার্য সমাধা করতে পারেন।

প্রযোজক-সভ্যরা কি চিরস্থায়ী ?

সেটা তাঁদের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করছে। যদি চিরস্থায়ী, অর্থাৎ অন্ততঃ কমপক্ষে পাঁচ বছরের জন্যে, হতে চান তাহ'লে তাঁদের ঐ সময়ের মধ্যে বোর্ডকে ছেড়ে চলে যাওয়া চলবে না। ছবির প্রদর্শন ও পরিবেশনের ভার ও উপার্জনের দায়িত্ব বোর্ডের হাতে ছেড়ে দিতে হবে।

প্রযোজক-সভ্যরা কি চিরস্থায়ী নয় ?

চিরস্থায়ী-সভ্য না হতে চাইলে একটি অনুশাসন মেনে নিতে হবে। ছবি শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশক-প্রদর্শকের কাছ থেকে টাকা এনে বোর্ডের দাবী মিটিয়ে দিতে হবে। বোর্ড অবশ্যই সভ্য-প্রযোজকের আমানত থেকে তাঁদের পরামর্শাদি দেবার জন্যে ও প্রচারাদির জন্যে একটা অঙ্ক কেটে রেখে ছবি ছেড়ে দেবেন।

প্রদর্শন-পরিবেশন-প্রচার

প্রচার অঙ্গাঙ্গীভাবেই বোর্ডের নিজস্ব যন্ত্র।....

তাকে ইচ্ছামতো ছোট বড় করে প্রত্যেক সভ্য-প্রযোজককের নির্মীয়মান ছবির জন্যে যতটুকু সম্ভব কলাও করে প্রচারের ব্যবস্থা করবেন বোর্ড নিজের তহবিল থেকে। ছবি বোর্ড থেকে অন্য পরিবেশকের (প্রযোজকের মনোনীত) কাছে গেলে বিক্রীর উপযুক্ত প্রচারের মূল্য ধরে দিতে হবে। বোর্ড প্রচার শুধু আপন প্রদেশেই সীমাবদ্ধ রাখবেন না, নিজের বার্তা প্রদেশান্তরেও দেবেন ছড়িয়ে। যে সমস্ত পরিবেশক ও প্রদর্শক বোর্ডকে অধিকতর সুযোগ-সুবিধা দিতে রাজী থাকবেন (আশা করা অন্যায় নয়, কারণ, বোর্ড অনুমোদিত ছবি আর যাই হোক 'ছেলেখেলা' হবে না) বোর্ড তাঁদের নামের একটা তালিকা রচনা করবেন এবং চক্রবৃত্তিতে তাঁদের এক একজনের ওপর নিজেদের ছবির প্রদর্শন ও পরিবেশনের ভার ছেড়ে দেবেন। পরিবেশকের কাছ থেকে টাকা সরাসরি প্রযোজকের কাছে চলে যাবে এবং দালালী বাবদ কিছু বোর্ডকে দেওয়া না দেওয়া সম্পূর্ণ নির্ভর করবে প্রযোজকের আপন ইচ্ছার ওপর।

এ সব সত্ত্বেও সবচেয়ে বড় কাজটি হচ্ছে যে, বোর্ড বিভিন্ন প্রদেশের আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়ে সেই সেই রাষ্ট্রের সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন করবেন। এবং যাতে বাঙলা ছবি দেখাবার জন্যে, অথবা বাঙলা দেশে তৈরী ছবির জন্যে, প্রত্যেক স্থানে বাধ্যতামূলকভাবে কিছু সময় বাঁধা থাকে সেদিকে নজর রাখতে সরকারবৃন্দকে অনুরোধ

জানাবেন। সঙ্গে সঙ্গে বাঙলা প্রান্তপ্রান্তী ও অবাঙালী অঞ্চলে নানা উপায়ে বাঙলা ছবিকে জনপ্রিয় করবার জন্যে জনসাধারণের মধ্যে নানান্ উৎসাহ-উদ্দীপনা উদ্রেকের চেষ্টা করবেন। প্রযোজনবোধে সক্ষম স্ত্রী-পুরুষের জন্য বাঙলার চিত্রব্যবসায়ে যে কোন বিভাগে কাজ করবার জন্যে উপযুক্ত ব্যবস্থাও সদাসর্বদা উন্মুক্ত করে রাখবেন।

বোর্ডের সঙ্গে সরাসরি প্রযোজক ও মনোনীত প্রদর্শক-পরিবেশকের যোগাযোগ থাকার ফলে অবাঞ্ছিত যে সব উপায়ে প্রযোজক লোকসান ঘরে ডেকে আনেন সে সমস্ত উন্মুক্ত গবাক্ষের সামনে সুদৃঢ় প্রাচীর তুলে দেওয়া হবে।

মাত্র পাঁচটি বছর দেখা যাক না পরীক্ষা করে কি হয়! বাঙলার চিত্র-ব্যবসায় যদি এতেও না বাঁচে, তবে কিসে বাঁচবে? বাঁচলেই চের!

বিশেষ দ্রষ্টব্য

আমার এই খসড়াটি পেশ করবার আগে আমি বাঙলার চিত্রবিষয়ে শুভানুধ্যায়ী কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ করে এই জানতে পেরেছি যে, তাঁরা বোর্ডের মাধ্যমে, বাঙলাদেশে ছবি তোলার ব্যাপারে, এই ব্যবস্থাকে বাধ্যতামূলক করতে চান। আমি কিন্তু এরকম সার্বভৌম কড়াকড়িতে নারাজ। আমার মডেল সামনে ধরে দিলুম। বিস্তারিত কার্যক্রম—উপায়ও পদ্ধতি—ইচ্ছা থাকলেই করে নেওয়া যেতে পারে। পছন্দ ও অনুশীলন অন্যান্যী।

তাছাড়া অশিষ্টকে শিষ্ট করবার জন্যে কোন্ উপায় অবলম্বনে বোর্ড প্রস্তুত? আমার তো মনে হয়, তার জন্যে আইনের পথ চিরকালই বিলক্ষণ খোলা আছে। অবশ্য এসবের জন্য ল' কাউন্সিল তো থাকবেই বোর্ডকে পরামর্শ দেবার জন্যে। এই কাউন্সিলের অবৈতনিক হিসাবে পাঁচজনের বেশী অথবা তিনজনের কম লোকের দরকার নেই।

প্রশ্ন

মাথায় পাগড়ীওয়ালা জিগ্যেস করছেন আমানতের জন্যে কোন সুদের ব্যবস্থা আছে কিনা। অবশ্যই আছে। তবে সেটা খাতায়-পত্তরে; সভ্য-প্রযোজকদের জন্যে বোর্ড থেকে যে প্রচারের ব্যবস্থা করা হবে তার খরচাপাতির একটা অংশ যোগ-বিয়োগ করে নিতে হবে এই সুদের নামে। তা না হলে সুদের লোভে চিত্রের চত্বরে বহু বন্ধকী-তমসুকিয়ানার আবার ভীড় দেখা যাবে। এটাকে কি আপনি খুব বাঞ্ছিত মনে করছেন নাকি?

আর একটা কথা। সভ্য নন এমন প্রযোজকের জন্যেও বোর্ডের ভেতর থেকে সব রকম সাধারণ সুযোগ-সুবিধা করে দেওয়া হবে এবং বিশেষ গোপন না হলে বোর্ডের অল্প-বিস্তর সব বৈঠকেই এই সব প্রযোজক আগে থেকে জেনে এবং জানিয়ে অংশ গ্রহণ করতে পারবেন।

ফল কথা

ঘণ্টা বাঁধার জন্যে ইতিমধ্যে দৈনিকপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে।

[পাঠকমহলের কাছ থেকে এ সম্পর্কে মতামত আমরা জানতে চাইছি। উপযুক্ত বিবেচনায় সেগুলি প্রকাশ করা যেতে পারে। এ সম্পর্কে পাঠকসাধারণের মতামত যথেষ্ট মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ বলে আমরা মনে করি —চিত্রবাণী-সম্পাদক]

★ আজকে যাঁরা বিস্মৃত ★

উমাশশী

'চণ্ডীঠাকুর!' ব'লে একদিন যাঁর কণ্ঠস্বর 'চণ্ডীদাস' ছবিতে দর্শকচিত্ত উদ্বেলিত করেছিল, তিনি আজ লোক-চক্ষুর অন্তরালে সংসারধর্ম নিয়ে মেতে আছেন। বাংলা ছায়াছবিতে এত বড় finished artist খুব কম এসেছেন। আর, সবচেয়ে বড় কথা শিল্পীর অক্ষুণ্ণ সম্মান নিয়েই তিনি চিত্রজগৎ থেকে বিদায় নিয়েছেন। অভি-ব্যক্তিতে উমাশশীর জুড়ি কেউ ছিলেন না সে-কালে। তিনি প্রথম দেখা দেন 'চণ্ডীদাসে'; তারপর 'কপালকুণ্ডলা', 'ভাগ্যচক্র', 'রূপলেখা' ও 'দেশের মাটি'তে। খুব কম ছবিতে নেমে, তাঁর মতো যশ অর্জন করতে খুব কম অভিনেত্রীই পেরেছেন। 'চণ্ডীদাস' ছবিতে তিনি নিজের কণ্ঠেই গান গেয়েছেন।

উমাশশী

শিশুবালা

'ধ্রুব', 'প্রহ্লাদ' প্রভৃতি বাংলা পৌরাণিক ছবিতে অভিনয় ক'রে শিশুবালা এক সময় নাম করেন। রঙ্গমঞ্চের অভিনেত্রীদের মতোই তিনি গতানুগতিক পন্থায় চলেছিলেন। ফলে তাঁর বেশির ভাগ অভিনয়ই হয়েছিল মঞ্চঘেঁসা। তবু ওরই মধ্যে দক্ষতার পরিচয় দেন 'দেবী ফুল্লরায়'। বহুকাল অভিনয়জগৎ থেকে দূরে ছিলেন তিনি। কিছুদিন আগে তাঁকে '১০৯-ধারা' ছবিতে এক 'বৈষ্ণবী'-র ভূমিকায় দেখা গেলেও তিনি আর ছায়াছবিতে অংশ গ্রহণ করছেন না বলেই ধরা যায়।

দেববালা

বাংলা ছায়াছবির প্রথম দিকে যে-অভিনেত্রীটি মা, পিসীমা বা মাসীমার ভূমিকা গ্রহণ ক'রে বিশেষ নাম করেন, তিনি দেববালা। তাঁর চেহারাও যেমন ছিল সুন্দর, তাঁর বাচনভঙ্গী ও অভিব্যক্তিও ছিল তেমনি মনোহর। নিউ থিয়েটার্সের 'ভাগ্যচক্র', 'দিদি', 'মুক্তি', 'অভিজ্ঞান' 'বিদ্যাপতি', 'মীনাক্ষী' এবং ইষ্টার্ণ টকীজের 'নীলাঙ্গুরীয়' ছবিতে তিনি বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দেন। তাছাড়া 'গোরা', 'আশা', 'রিক্তা', 'বেকারনাশন', 'খনা', 'জনকনন্দিনী' প্রভৃতি ছবিতেও নামেন। আজ প্রায় দশ বছর তাঁকে আর কোনো ছবিতেই দেখা যায় নি। তিনি চিত্রজগৎ ছেড়ে সংসারজগতেই পাকাপাকিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।

শান্তি গুপ্তা

নাট্যজগতের খ্যাতনাম্নী অভিনেত্রী শ্রীমতী শান্তি বাংলা-ছবির গোড়ার দিকে কয়েকখানি ছবিতে অভিনয় করেন। ছায়াছবিতে তাঁর বিশেষ স্মরণীয় কোনো দক্ষতার পরিচয়

পাওয়া না গেলেও, তাঁর অভিনয়-কুশলতা অনস্বীকার্য।' 'কাল-পরিণয়', 'বিষবৃক্ষ', 'ধূমকেতু', 'পণ্ডিত মশাই' প্রভৃতি ছবিতে শ্রীমতী শান্তি উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেন। ছবিতে তাঁর চেহারা কেমন যেন মোটেই ভালো আসতো না, অথচ, নাটমঞ্চে তাঁকে সুশ্রীই বলা যায়। বর্তমানে রঙ্গমঞ্চের সঙ্গেও যেমন এঁর সম্পর্ক নেই, ছায়া-ছবির ক্ষেত্রেও তাই।

জ্যোৎস্না গুপ্তা

'মানময়ী গার্লস স্কুলে'র 'চপলা'কে মনে পড়ে তো? সেই ছোট্ট ভূমিকায় অভিনয় করেই জ্যোৎস্নার প্রতিষ্ঠা। লীলাচঞ্চল - মিষ্টভাষিণী কুমারী জ্যোৎস্না একে একে বহু ছবিতেই অভিনয় করবার সুযোগ পান। তাঁর অভিনীত ছবিগুলির মধ্যে নাম করা যায়—'তরুণী', 'বিদ্রোহী', 'পরশমণি', 'অবতার', 'পথিক', 'ইন্দিরা' (১ম), 'পরপারে', 'শকুন্তলা', 'বর্মার পথে', 'রাজমোহনের বৌ' প্রভৃতি। সংসারজীবনে প্রবেশ ক'রে খান দুই ছবিতেও নেমেছিলেন তিনি। সম্প্রতি এক মামলায় জড়িত হওয়ায় তাঁর জীবনের এক চাঞ্চল্যকর অধ্যায়ের পরিচয় পাওয়া গেছে। বর্তমানে ছায়াছবির সংগে শ্রীমতী জ্যোৎস্নার আর কোনো সম্পর্কই নেই, শুধু অতীতের স্মৃতি ছাড়া।

জ্যোৎস্না গুপ্তা

রাণীবালা

প্রধানতঃ রঙ্গমঞ্চের অভিনেত্রী হলেও শ্রীমতী রাণীবালা একসময় বাংলা ছায়াছবির ক্ষেত্রে বিশেষ স্থান অধিকার করেছিলেন। নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ীর সম্প্রদায়ে বহুকাল অভিনয় ক'রে, অভিনয়-শিল্পের সূক্ষ্ম কলাকৌশলের সংগে তিনি বিশেষভাবে পরিচিত। তাই, তাঁকে একজন finished artist বলা চলে। 'তুলসী দাস', 'কাল-পরিণয়', 'গোরা', 'তরুণী', 'বেকার-নাশন', 'সার্বজনীন বিবাহোৎসব' 'মুক্তি-স্নান 'পরশমণি', 'নর - নারায়ণ', 'প্রফুল্ল' প্রভৃতি অনেক ছবিতে প্রশংসনীয় অভিনয় ক'রে ইনি কিছুদিন চিত্রজগৎ থেকে বিদায় নেন। ছবিতে নায়িকার ভূমিকায় এঁর অভিনয় করার প্রধান প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিল—শরীরের মেদবাহুল্য। পরে 'বন্দিতা', 'দাসীপুত্র', 'ভক্ত রঘুনাথ', প্রভৃতি ছবিতে মায়ের ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করায় তাঁর সে-প্রতিবন্ধকতা আর দেখা দেয় নি। বর্তমানে এই অভিনেত্রী চিত্রজগতের সঙ্গে যেমন সম্পর্ক চুকিয়েছেন—নাট্যজগতের সঙ্গেও তেমনি ধীরে ধীরে সম্বন্ধের সমাপ্তি ঘটাচ্ছেন।

প্রতিমা দাশগুপ্তা

'গোরা' ছবির সেই 'ললিতা'র অভিনয় কি কেউ ভুলতে পারেন? নবাগতা সেই তন্বী একদিন অভিনয়-দীপ্তিতে যেমন ঝলমল ক'রে উঠেছিলেন, আজ ঠিক সেই অনুপাতেই স্তিমিতা। ১৯১৯ সালে কাথিয়াওয়াড়ে তাঁর

জন্ম হয়। ১৯৩৮ সালে 'গোরা' ছবিতেই তাঁর প্রথম আবির্ভাব। তারপর 'শর্মিষ্ঠা', 'পথভুলে', 'ব্যবধান', 'শুকতারা', 'জীবনসঙ্গিনী' প্রভৃতি ছবিতে অভিনয় করেও বিশেষ সুনাম অর্জন করেন। 'রাজনর্তকী' ছবিতে অভিনয় করতে তিনি সেই যে বোম্বাই গেলেন, আর বাংলা দেশের দিকে বড় একটা তাকালেন না। সেই সময় মেজর মনজেরুল হক্‌কে বিয়ে করে নিজেও প্রতিমা হক হলেন। বোম্বাইতে থাকাকালীন তাঁর অভিনীত ছবিগুলি হচ্ছে—'কুঁয়ারা বাপ', 'রাজা', 'সারারাত' ও 'ছামিয়া' প্রভৃতি (নিজের প্রযোজিত)। এর মধ্যে প্রথম দুটিতে তিনি চমৎকার অভিনয় করেন। অনেকদিন পরে ক'লকাতায় ফিরে তিনি 'রাত্রি' ছবিতে দেখা দিয়েছিলেন। কিন্তু কলকাতায় তোলা ছবিতে সেই তাঁর শেষ চিত্রাবতরণ। দীর্ঘদিন তিনি চিত্রজগতের বাইরে আছেন। দোষ-ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও প্রতিমা দাশগুপ্তা একজন গুণী শিল্পী সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

সাবিত্রী

রঙ্গমঞ্চের এই অভিনেত্রীটি বহুদিন চিত্রজগতের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন। অভিনয় দক্ষতার দিক থেকে সাবিত্রী প্রশংসা অর্জন করলেও, চেহারার দিক থেকে ছায়াছবির দর্শকদের কাছে তিনি কোনো সমর্থনই পাননি কোনোদিন। অথচ, এই কুশলী অভিনেত্রীটি যখনই রঙ্গমঞ্চে দাঁড়িয়েছেন, তখনই দৈহিক সৌন্দর্যে ও অভিনয়নৈপুণ্যে দর্শকচিত্ত জয় করেছেন। ক্যামেরাই যত বাধ সেধেছে! ১৯২৭ সালে ক'লকাতায় এঁর জন্ম। 'তটিনীর বিচার' 'অমর গীতি', 'পাপের পথে', 'দম্পতি', 'পোষ্যপুত্র', 'জনক-নন্দিনী', 'কলঙ্কিনী', 'নারী', 'গৃহলক্ষ্মী', 'মানে-না-মানা' 'সাতনম্বর বাড়ী' প্রভৃতি ছবিতে সাবিত্রীর অভিনয় উল্লেখযোগ্য। চিত্রজগতের সঙ্গে সাবিত্রীর আজ আর কোন সম্পর্ক নেই বললেই চলে। হালে, দু'একটি নাটকে অভিনয় করছেন মাত্র।
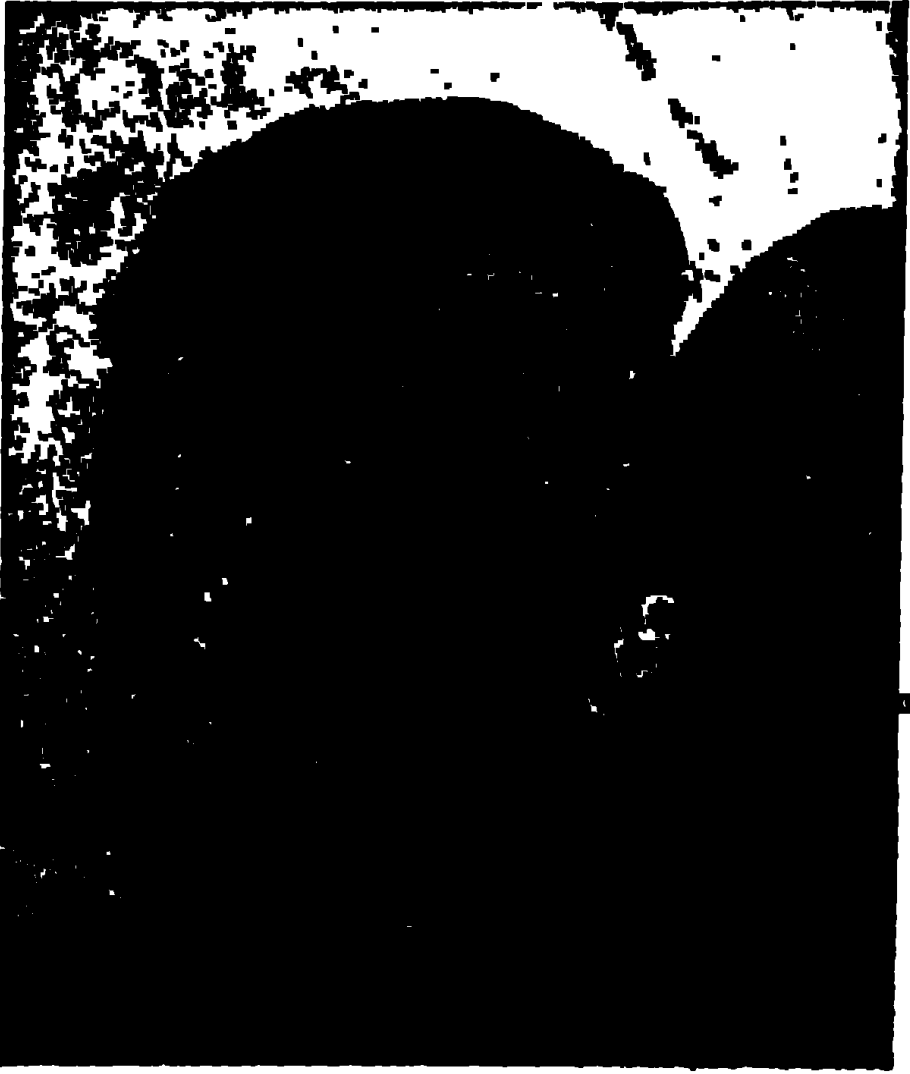
প্রতিমা দাশগুপ্তা

রাণীবালা

রেখা মিত্র

'অভয়ের বিয়ে' ও 'উদয়ের পথে' ছবি যাঁদের দেখা আছে, তাঁরা কোনোদিন রেখা মিত্রের অভিনয় ভুলতে পারবেন না। যে দরদ দিয়ে এই শিল্পীটি ঐ-দুটি ছবির দু'টি প্রধান নারীচরিত্রের রূপ দিয়েছিলেন, তা অভিনয়াম-

শ্রীলেখা

যোগ্য। ১৯২৯ সালে ক'লকাতার এক অভিজাত কায়স্থ পরিবারে রেখার জন্ম। তিনি সর্বপ্রথম 'ব্রাহ্মণ-কন্যা' ছবিতে নামেন; কিন্তু নাম হয় না। 'অভয়ের বিয়ে'-তেই তাঁর অভিনয়-ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া গেল। রেখা দেবী 'দুই পুরুষ' ও 'হামরাহী' ছবিতেও বিশেষ প্রশংসা অর্জন করেন। সুরশিল্পী গোপেন মল্লিকের সঙ্গে বছরকয়েক আগে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়ে রেখা দেবী ছায়াছবি ত্যাগ করেছেন।

চিত্রা দেবী

নৃত্যকুশলা এই অভিনেত্রীটি অনেকগুলি বাংলাছবিতে অভিনয় করবার সুযোগ পান। কয়েকটি ছবিতে তাঁর অভিনয়-কুশলতার পরিচয় পাওয়া যায়। তবে, অভিনয়ের চেয়ে তিনি নৃত্যেই অধিক পারদর্শিনী। তাঁর অভিনীত ছবিগুলির মধ্যে নাম করা যায়—'শুকতারা', 'মিলন', 'দেবর', 'ঠিকাদার', 'কবি জয়দেব' প্রভৃতি ছবির। নায়িকার ভূমিকার অংশ গ্রহণের সুযোগ না পেলেও পার্শ্বচরিত্রেই ইনি বহুবার সুযোগ পেয়েছেন। বাংলা-সরকারের প্রচার-বিভাগের তোলা কয়েকটি ছবিতেও ইনি অভিনয় করেন।

শ্রীলেখা (প্রতিমা মুখোপাধ্যায়)

সুদর্শনা ও অভিজাত বংশের এই তরুণী যেদিন 'অভিনয়' ছবিতে প্রথম দর্শন দিলেন, সেদিন তাঁর অভিনয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠবার কিছু না পেলেও, সম্ভাবনার পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। ক্রমশঃ তিনি জড়তা কাটিয়ে উঠে, একজন নিপুণা অভিনেত্রী হবার সৌভাগ্যও লাভ করে-ছিলেন। তাঁর প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল তীক্ষ্ণ ও স্পষ্ট বাচন-ভঙ্গী। 'অভিনয়', 'প্রতিশ্রুতি', 'আলোছায়া, 'শোধবোধ', 'পাষাণদেবতা', 'নারী' ছবিতে অভিনয় ক'রে শ্রীলেখা তাঁর দক্ষতারই পরিচয় দিয়েছেন। শ্রীমতী শ্রীলেখা আজ আর চিত্রজগতের সঙ্গে জড়িত নন। সংসার-জীবনের মধুময় পরি-বেশে তিনি হয়তো কোনো সুন্দরতর চিত্র অংকণ করছেন।

অরুণা দাস

নৃত্যপটীয়সী এই অভিনেত্রীটি কয়েকখানি বাংলা ছবিতে অভিনয় ক'রে কিছুটা নাম করেন। ১৯১৩ সালে ক'লকাতায় এঁর জন্ম হয়। ১৯৩৬ সালে তিনি সর্বপ্রথম

অরুণা দাস

'সরলা' ছবিতে আত্মপ্রকাশ করেন। ভারতলক্ষ্মী, ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম কোম্পানী ও দেবদত্ত ফিল্মসের কয়েকখানি ছবিতে অভিনয় ক'রে ইনি বোম্বাই যান। সেখানে মহেশ্বরী পিক্‌চার্সের 'পাগলী' ছবিতে বিশেষ অভিনয়-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়ে পুরস্কার লাভ করেন। 'তকরার' ছবিতেও তাঁর অভিনয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য হয়।

ইন্দিরা রায়

অল্প ছবিতে অভিনয় করলেও বাংলার এই বয়স্কা, শিক্ষিতা ও অভিজাত-বংশের মহিলা শিল্পী তাঁর অভিনয়-নৈপুণ্যের বিশেষ পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর প্রথম অভিনীত ছবি 'আলিবাবা'। তারপর, 'আশা', 'চোখের বালি', 'বাংলার মেয়ে' প্রভৃতি ছবিতে অভিনয় ক'রে তিনি বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দেন। সাধনা বসু ও মধু বসুর 'সি-এ-পি' সম্প্রদায়ের সঙ্গেও ইনি বিশেষভাবে জড়িত ছিলেন।

লতিকা বন্দ্যোপাধ্যায়

'কাশীনাথ' ছবিতে যে-ছোট্ট মেয়েটির মুখে একদিন আমরা 'ও বনের পাখী' গানটি শুনেছিলাম, তিনিই লতিকা। প্রচুর সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও এই তরুণী অভিনেত্রী ছায়াছবির সীমানা ত্যাগ করে গেছেন। ১৯৩৩ সালে ক'লকাতায় এঁর জন্ম। 'ওয়াপস্' ছবিতে তিনি একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকায় অভিনয় করেছেন ব'লে বিশেষ প্রচার হলেও, শেষ পর্যন্ত তাঁকে আর সে-ছবিতে দেখা যায়নি। 'উদয়ের পথে'র একটি ছোট্ট ভূমিকায় নামলেও তিনি কোনো কৃতিত্বের পরিচয় দেননি। কিন্তু 'দুইপুরুষ'-এ তাঁর অভিনয় হয়েছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

লীলা দেশাই

নিউ থিয়েটার্স আমাদের যে-ক'জন সুনিপুণা ও সুন্দরী অভিনেত্রীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন লীলা দেশাই তাঁদের অন্যতমা। বাঙালী না হয়েও বাংলা ছবিতে অভিনয় ক'রে তিনি যে সুনাম অর্জন করেছেন, তা খুব কম লোকের ভাগ্যেই ঘটে। ১৯১৭ সালে ইনি সুদূর নিউইয়র্ক শহরে জন্মগ্রহণ করেন। লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আই-এ পাশ করেন। নাচেই এঁর প্রথম সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। লক্ষ্ণৌ-এর 'আইডিয়াল ফিল্ম কোম্পানীর' 'আদর্শ মহিলা' ছবিতে লীলা প্রথম অভিনয় করেন। কিন্তু কোনো কারণে সে-ছবি মুক্তি পায়নি। ১৯৩৭ সালে নিউ থিয়েটার্সে যোগ দিয়ে 'প্রেসিডেন্ট' বা 'দিদি' ছবিতে অভিনয় করেন। সেই ছবিতে তাঁর চটুল অভিনয় ভোলবার নয়। দেবকীবাবু এই অভিনেত্রীটিকে দক্ষতা প্রকাশে বিশেষ সুযোগ দেন। তাঁর 'বিদ্যাপতি' ও 'নর্তকী' ছবিতে লীলা দেশাই সুন্দর অভিনয় করেন। 'জীবন মরণ' বা 'দুশমন' ছবির অভিনয়ও মনে রাখবার মতো। তাঁর অভিনীত অন্যান্য ছবি—'তমান্না', 'ইকার', 'নগদ-নারায়ণ', 'পরায়া ধন', 'সারাফৎ', 'কলিয়াঁ' 'মুজরিম', 'মিস্ দেবী', 'মেঘদূত' ও 'দেবকন্যা'। কিন্তু নিউ-

যমুনা
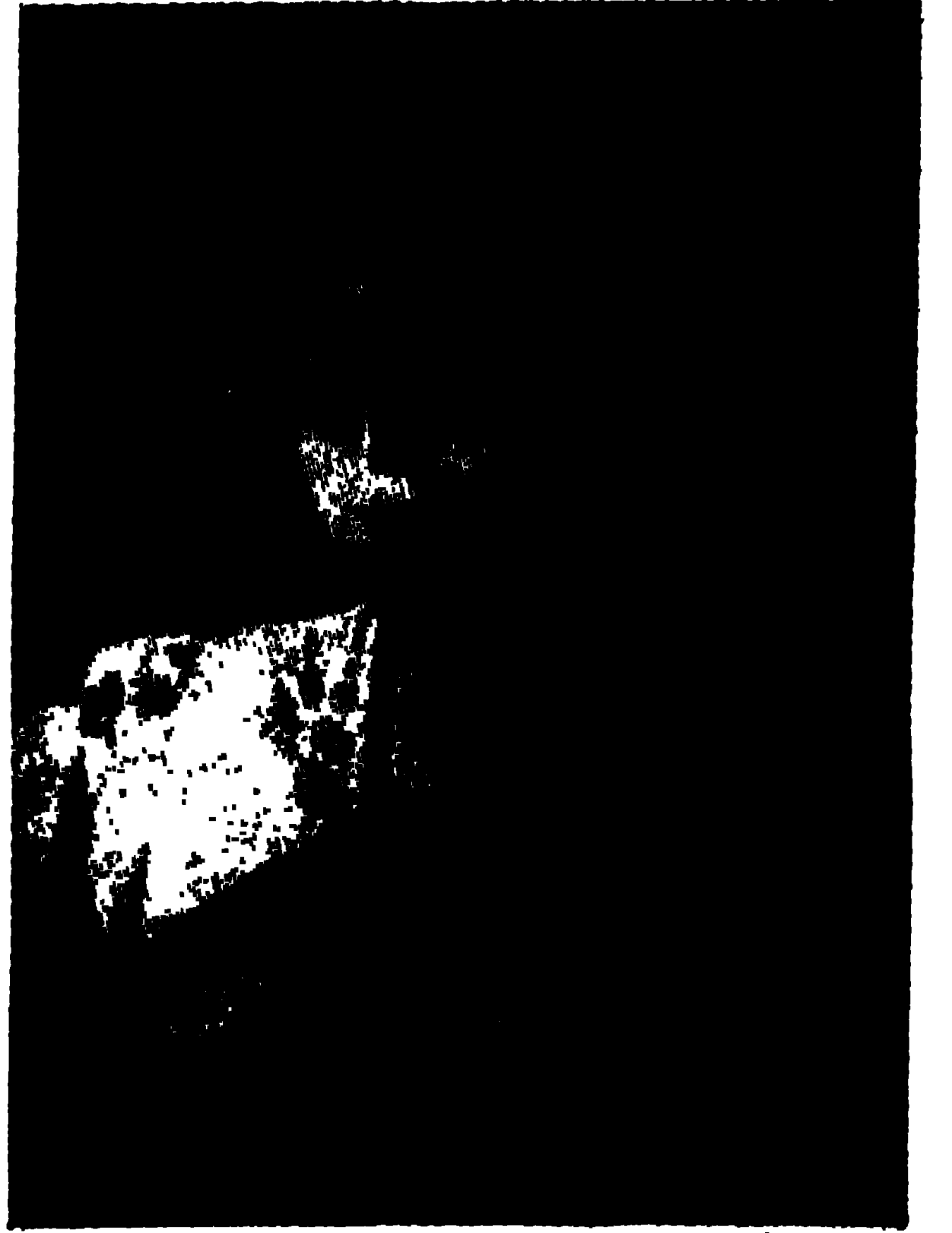
থিয়েটার্সের বাইরে লীলা দেশাই আর তেমন সুবিধা করতে পারেন নি। আজ তো সংসার-জীবনের বাঁধা পথে চলেছেন।

মণিকা গাঙ্গুলী

পরিচালক ডি-জি'র এই মেয়েটি যেদিন 'এপার-ওপার' ছবিতে ছোট্ট একটি মেয়ের ভূমিকায় নেমেছিলেন, সে-দিনই তিনি অভিনয় ক্ষমতার অপূর্ব পরিচয় দেন। ১৯২৯ সালে তাঁর জন্ম। 'দাবী' ছবিতে তাঁর অভিনয় এতই অভিনন্দিত হয় যে, বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্ট এ্যাসোশিয়েশন থেকে তাঁকে বিশেষভাবে পুরস্কৃত করা হয়। 'বন্দিতা', 'শৃঙ্খল' ও 'ঝরাফুল' ছবিতেও মণিকার অভিনয় মনে রাখবার মতো। বিবাহিত জীবনের সঙ্গে সঙ্গে, এই সুদক্ষা অভিনেত্রী চিত্রজগৎ থেকে বিদায় নিয়ে সংসার জগতটিকে মধুময় ক'রে তুলেছেন।

সাধনা বসু

যমুনা

উমাশশীর মুখের 'চণ্ডীঠাকুর', আর যমুনার মুখের 'দেবদা' আজও বাঙালী দর্শকের কাছে স্মরণীয় হয়ে আছে। যমুনাকে আমরা সর্বপ্রথম 'রূপলেখা' চিত্রে দেখলেও, তিনি আমাদের কাছে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিলেন 'পার্বতী'র ভূমিকায় 'দেবদাস' কথাচিত্রে। বিস্ময়ের প্রধান কারণ ছিল অবাঙালী হয়েও যমুনা সেদিন পার্বতীর মতো একটি বাঙালী গ্রাম্য মেয়ের চরিত্রকে জীবন্ত ক'রে তুলেছিলেন। ১৯১৬ সালে বেনারসে তাঁর জন্ম হয়। 'দেবদাস'-এর পর যমুনা একে একে 'গৃহদাহ', 'মায়া', 'অধিকার', 'জিন্দগী', 'শেষ উত্তর', 'রাণী', 'চাঁদের কলঙ্ক', 'উত্তরায়ণ', 'দেবর', 'ঘর', 'আমীরী', 'নীলাঙ্গুরীয়', 'পয়ছান', 'এ্যারেবিয়ান নাইট্‌স্', 'ইরাণ-কি-একরাত' ও 'তকরার' ছবিতে অভিনয় করেন। এর মধ্যে প্রথম চারখানি ছবিতে তাঁর অভিনয় বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। তাঁর অভিনয়ে একটা কঠোর ব্যক্তিত্বের প্রকাশ প্রায় সবক্ষেত্রেই দেখা গেছে। আজ যমুনা চিত্রজগৎ থেকে প্রায় অবসরপ্রাপ্ত। বহুকাল পরে তিনি আবার ছবিতে নামছেন রবীন্দ্রনাথের 'মালঞ্চ'-তে নায়িকার ভূমিকায়।

সাধনা বসু

নৃত্য-পটীয়সী সাধনা বসু একদিন 'অভিনয়' ছবিতে যে-বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিলেন বাঙালী দর্শকসমাজ আজও তা ভোলেননি। নাচ নয়, অভিনয়। সাধনা তাতেও সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। 'আলিবাবা' ছবিতে 'মর্জিনা'র ভূমিকাতেই তাঁর প্রথম আবির্ভাব। আর, প্রথম আবির্ভাবেই তিনি দর্শকমন জয় করেছিলেন। একসঙ্গে নাচে ও অভিনয়ে আর কোন অভিনেত্রী তাঁর মতো দক্ষতা দেখাতে পারেননি। তাঁর অভিনীত অন্যান্য ছবি হ'লো—'কুমকুম্', 'রাজনর্তকী' (বাংলা, হিন্দী ও ইংরাজী), 'মীনাক্ষী', 'শঙ্কর-পার্বতী', 'পয়গম্' ও 'বিষকন্যা'। চিত্র-জগতেরবাইরে 'সি-এ-পি' সম্প্রদায়ে তাঁর নাটকাভিনয়,

সেইসঙ্গে নিজের দল গঠন ক'রে নাচের প্রদর্শনী করাও উল্লেখযোগ্য। আজ সাধনা বসু বিস্মৃতির পথে ; কিন্তু বাংলা ছায়াছবির ইতিহাসে তিনি একটি বিশেষ আসন অধিকার ক'রে থাকবেন। ১৯১৪ সালে কলকাতায় সাধনা বসুর জন্ম হয়। তিনি বিখ্যাত ব্রাহ্মনেতা কেশবচন্দ্র সেনের দৌহিত্রী এবং ক'লকাতার খ্যাতনামা ব্যারিস্টার সরল সেনের কন্যা। স্বামী মধু বসুর সঙ্গে তিনি বিবাহ বিচ্ছেদ ক'রে বর্ত্তমানে এককভাবে জীবন যাপন করছেন।

সরযূবালা

'মঞ্চসম্রাজ্ঞী' ব'লে আজ যিনি সুপরিচিতা, সেই স্বনামধন্যা অভিনেত্রী শ্রীমতী সরযূবালাও কয়েকখানি ছায়াছবিতে অংশ গ্রহণ ক'রে সুনাম অর্জন করেছেন। তবে, ছায়াছবিতে ক্যামেরার কাছে তাঁকে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে বার বার। কিন্তু তাঁর অভিনয়-প্রতিভা প্রকাশের পথ খুঁজে পেয়েছে ছায়াছবির ক্ষেত্রেও। নির্বাক্‌চিত্রের যুগে ক্যামেরার সামনে তিনি

মেনকা

প্রথম দাঁড়ান 'কৃষ্ণকান্তের উইলের' একটি খণ্ড দৃশ্যে কিন্তু 'ঋষির প্রেমে'-ই তিনি প্রথম দর্শন দেন দর্শকসমাজের সামনে। 'মায়ের প্রাণ' ছবিতে সরযূর অভিনয় বিপুলভাবে অভিনন্দিত হয়। তাতে তিনি পুত্রহারা জননীর মনো-ব্যথাকে যেভাবে রূপ দেন, তা সহজেই দর্শকচিত্তকে অভিভূত করে। পরে 'কৃষ্ণকাবেরী' ও 'দাসীপুত্রের' দুটি ভূমিকা থেকেও তাঁর অভিনয়নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু বর্ত্তমানে ছায়াছবি থেকে সরযূ বহু দূরে স'রে আছেন।

বিজয়া দাশ

বিজয়া দাশ

বেথুন কলেজিয়েট স্কুলের এই শিক্ষয়িত্রী যেদিন কথাচিত্রে আত্মপ্রকাশ করলেন, সেদিন বাংলার অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন। সর্বপ্রথম তিনি চিত্রভারতীর 'শেষরক্ষা'-ছবিতে 'ইন্দুমতী'র ভূমিকায় নামেন, পরে অরোরা ফিল্মসের 'সন্ধ্যা'

ছবিতে দেখা দেন। কিন্তু কোনো ছবিতেই তাঁর বিশেষ কোনো দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায় নি। রবীন্দ্রনাথের বহু নাটকে তিনি অভিনয় করেছিলেন এবং তাতেই তাঁর কিছু নৈপুণ্যের পরিচয় মেলে। ১৯১৮ সালে ময়মনসিংহে তাঁর জন্ম হয়। তিনি পাটনার খ্যাতনামা ব্যবহারজীবী স্বর্গতঃ সি, সি, দাশের কন্যা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি-এ পাশ ক'রে তিনি ১৯৪০ সালে বেথুন স্কুলে যোগ দেন। ১৯৪৭ সালে তিনি কিছুদিন সরবরাহ বিভাগেও চাকুরী করেন। কিছুদিন তিনি বোম্বাইতে ছিলেন। সম্প্রতি বোম্বে টকীজের 'সমর' ছবিতে তাঁকে দেখা গেছে।

লীলা দেশাই

মেনকা

দেবকী বসু যেদিন মেনকাকে আবিষ্কার করেছিলেন, সেদিন অনেকেই এই মহিলা শিল্পীর যোগ্যতা সম্পর্কে সন্দিহান ছিলেন। কিন্তু মেনকা তাঁর অভিনয়-দক্ষতা প্রমাণিত করলেন প্রথম ছবিতেই। সে-ছবি 'সোনার সংসার'। তারপর, তাঁর কৃতিত্ব আরও প্রকাশ পেল প্রমথেশ বড়ুয়ার 'মুক্তি', 'অধিকার', 'রজত-জয়ন্তী' ও উত্তরায়ণ' ছবিতে। 'বড়দিদি', 'এপার-ওপার' 'সাপুড়ে', 'অধিকার' ছবিতেও মেনকার অভিনয় দর্শকদের ভালো লেগেছিল। আরও খানকয়েক ছবিতে অভিনয় ক'রে তিনি চিত্রজগৎ থেকে বিদায় নিয়ে এতদিন কাশীতেই বসবাস করছিলেন। সম্প্রতি আবার বোম্বাই থেকে তাঁর নাম কানে আসছে। সেখানে '১৮৫৭' নামক একখানি ছবিতে নাকি তিনি অভিনয় করবেন। মেনকা ১৯১৭ সালে বেনারসেই জন্মগ্রহণ করেন। অভিনয়-জীবনের প্রথমে বোম্বাই-এর দু'একখানা ছবিতে ছোট-খাটো ভূমিকায় নেমেছিলেন।

মায়া মুখোপাধ্যায়

এঁর প্রথম চিত্রাবতরণ কালী ফিল্মসের 'পাতালপুরী' ছবিতে। অভিনয়ক্ষমতা এঁর ছিল খুব সামান্যই। আবেগ ও অভিব্যক্তি প্রকাশের ব্যর্থতা এঁর চাপা পড়ে যেত রূপলাবণ্য বা গ্ল্যামারে। 'কাল পরিণয়' ও 'অন্নপূর্ণার মন্দির' ছবিতে তিনি অংশ গ্রহণ করেন। এর মধ্যে 'অন্নপূর্ণার মন্দির' ছবিতে তবু তিনি কিছুটা কৃতিত্বের পরিচয় দেন। আকস্মিকভাবেই তিনি চিত্রজগৎ ত্যাগ করেন এবং বর্তমানে সংসারজীবন যাপন করছেন বলে জানা যায়।

নবগঠিত গোল্ডেন মুভী কর্পোরেশন লিঃ-এর পরিবেশনায় শীঘ্রই 'ভি
দেশের মেয়ে' শহরে আসছে। প্রমীলা ত্রিবেদী এই চিত্রে নির্য্যাতিত
সহনশীলা এক বাস্তুহারা বধূর অনির্ব্বচনীয় চরিত্রে রূপদান করেছে

সিনার্জন ফিল্ম কর্পোরেশনের হিন্দী ছবি 'জীবন তারা'য়

শ্রীমতী রাজকুমারী

সিনেমা এক্সচেঞ্জ লিমিটেডের পরিবেশনায় ছবিটি শীঘ্র মুক্তিলাভ করবে

নিয়ন্ত্রণ-আইনের আদি কথা

বিপিন বিহারী রায়

বঙ্কিমচন্দ্রের বিখ্যাত উপন্যাস "চন্দ্রশেখর" নাটকাকারে পরিবর্তিত করেন অমৃতলাল বসু, এবং যতদূর জানি, নাটকখানি ১৮৯৬।৯৭ সালে ষ্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়। এটি খুব জনপ্রিয় হয়েছিল, এবং আমি যখন প্রথম এর অভিনয় দেখি (১৯০৪ সালে) তখন এতে "লরেন্স্ ফষ্টার" নামক ইংরাজ সৈনিকের চরিত্রে অভিনয় করেন হীরালাল দত্ত। শুনেছিলাম আগে অমৃতবাবু স্বয়ং এই ভূমিকায় অভিনয় করতেন, তিনি "সাহেব" চরিত্র অভিনয়ে খুব সুদক্ষ ছিলেন। যাই হোক্, তার পরে বহুবার এই নাটকের অভিনয় দেখেছি এবং একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে প্রতি বছরে "এন্ট্রান্স" পরীক্ষা (যার নাম পরে "ম্যাট্রিকুলেশন" পরীক্ষা হয়) শেষ হয়ে গেলে, পরীক্ষাপ্রদত্ত ছাত্রদের জন্যে ষ্টার থিয়েটারে এই নাটকের বিশেষ পুনরভিনয়ের ব্যবস্থা করা হতো। তারপর যখন ১৯০৪।৫ সাল থেকে বোমা ও স্বদেশীর যুগ আরম্ভ হলো, ইংরাজ শাসকগণ নানারকমে নানা দিক থেকে দেশের উন্মেষোন্মুখ "জাতীয়তা" ভাবের দমননীতি প্রয়োগ করতে আরম্ভ করলেন, তখন এক সময়ে জানা গেল যে "চন্দ্রশেখর" নাটকের অভিনয় শাসকপক্ষ বন্ধ করে দিয়েছেন। কারণ খুব সুস্পষ্ট—এই নাটকে লরেন্স্ ফষ্টার নামক ইংরাজ সৈনিক শৈবলিনীকে দৈবাৎ দেখে তার রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে বলপূর্ব্বক হরণ করে নিয়ে যায়—এই ঘটনা আছে। ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষের চোখে ঠেকলো যে এটা শুধুই ইংরাজ চরিত্রকে হেয় প্রতিপন্ন করা। ইংরাজ কখনো রমণী-অপহরণকারী দস্যু হতে পারে? অসম্ভব! আর সেই দৃশ্য বসে বসে নেটিভ বাঙালী দেখবে? অসহ্য! অতএব দাও নাটক বন্ধ করে! সৌভাগ্যক্রমে বন্ধ হয়ে যাবার কয়েক বছর পরে থিয়েটার কর্ত্তৃপক্ষ যুক্তি করে এই নিষেধাজ্ঞা রদ করাবার এক উপায় উদ্ভাবন করলেন, তাঁরা শাসনকর্ত্তাদের জানালেন যে শৈবলিনীকে চুরি ইংরাজ সৈনিক কেন করতে যাবে? যে বদমাইসটা চুরি করেছিল সেটার নাম "গঞ্জালিস" (Gonzales) ও সেটা একটা পর্ত্তুগীজ্ দস্যু! এতে সন্তুষ্ট হয়ে শাসনকর্ত্তারা পরে আবার নাটকখানি অভিনয় করার অনুমতি দেন, এবং 'গঞ্জালিস্'-এর ছদ্মবেশে লুকায়িত ও রূপান্তরিত ফষ্টারকে আবার আমি দেখতে পাই ১৯১৭ সালে মিনার্ভা থিয়েটারে 'চন্দ্রশেখর' নাটকের এক পুনরভিনয়ে। শুধু চন্দ্রশেখর নয়, সে যুগে আরো কয়েকখানি উৎকৃষ্ট নাটকের অভিনয় অনুরূপ কারণে (অর্থাৎ প্রধানতঃ "সাহেব" বা ইংরাজ চরিত্রকে হেয় করে দেখানোর অপরাধে) নিষিদ্ধ হয়ে যায়, যথা গিরীশচন্দ্রের "সিরাজদ্দৌলা," ক্ষীরোদপ্রসাদের "নন্দকুমার" ইত্যাদি। এখানে বলে রাখি, প্রায় ৪০ বছর পরে, ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর, এ দুখানি নাটককে নিষেধাজ্ঞা থেকে মুক্ত করে দেওয়া হয়েছিল, এবং এর মধ্যে একখানি (সিরাজদ্দৌলা) কিছুদিন শিশির ভাদুড়ী সম্প্রদায় দ্বারা অভিনীত হয়েছিল।

নাটকের অভিনয়, বা চলচ্চিত্রের প্রদর্শন, শাসকসম্প্রদায় যেসব কারণে বন্ধ করে দেন, সেগুলিকে প্রধানতঃ দু'ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে, যথা "রাজনৈতিক" এবং "সমাজনৈতিক" বা শুধু "নৈতিক"। উপরোক্ত দৃষ্টান্তগুলিকে "রাজনৈতিক" কারণের পর্য্যায়ে ফেলা যেতে পারে। এ ছাড়া নীতিবিগর্হিত বা দুর্নীতিপূর্ণ অথবা উহার প্ররোচক কোন দৃশ্য বা ঘটনা ইত্যাদি নাটকে (বা চলচ্চিত্রে) থাকলে, হয় সেগুলি বাদ দিয়ে অভিনয় করবার আদেশ দেওয়া হয়, নচেৎ অভিনয় একেবারে বন্ধ করে দেওয়া হয়। এখনকার যুগে নাটকের চেয়েও চলচ্চিত্রের ওপরেই কর্ত্তৃপক্ষের কঠোর ও তীব্র দৃষ্টি বেশী থাকে, তারও অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু আমি আজ কর্ত্তৃপক্ষের এই নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা করবার আইনতঃ অধিকার কখন ও কি করে প্রথম

উদ্ভব হলো, তারই বৃত্তান্ত দিতে চাই, সেজন্য আমাদের প্রায় ৮০ বছর পেছিয়ে যেতে হবে। কলিকাতায় সাধারণ রঙ্গমঞ্চে নাট্যাভিনয় যখন প্রথম সবেমাত্র আরম্ভ হয়েছে সেই সময়েই কয়েকটি ঘটনা পরম্পরায় 'নাট্যাভিনয়-নিয়ন্ত্রণ" আইন (Dramatic performances Control Act) প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়, তার কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী এ যুগের পাঠক-পাঠিকাদের অনেকের অজানা বলেই তার পুনরাবৃত্তি করছি।

১৮৭১ সালের ৭ই ডিসেম্বর তারিখে কলিকাতায় সর্ব্বপ্রথম সাধারণ নাট্যশালা "ন্যাশনাল থিয়েটার" নামে খোলা হয়, এবং সেই রাত্রে দীনবন্ধু মিত্রের "নীলদর্পণ" নাটকখানি অভিনীত হয়। যে ক'জন উৎসাহী যুবকের উদ্যোগে এই কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে নাম করা যেতে পারে এই ক'জনের—অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি, অমৃতলাল বসু, মহেন্দ্রলাল বসু, মতিলাল সুর, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধামাধব কর, রাধাগোবিন্দ কর (যিনি উত্তরকালে ডাক্তার আর জি কর এবং এবং বেলগাছিয়া "কারমাইকেল" হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাতারূপে সুপরিচিত) ইত্যাদি। তার পরবর্ত্তী কয়েক বছরের ইতিহাস এখানে বলা অপ্রাসঙ্গিক, সে সম্বন্ধে অনেক পুস্তকাদি আছে, আমি এখন ১৮৭৫।৭৬ সালের ঘটনার বৃত্তান্ত দেবো। এখন বীডন ষ্ট্রীটে যেখানে মিনার্ভা থিয়েটার আছে, সেখানে তখন "গ্রেট্ ন্যাশনাল থিয়েটার" চলছিল, তার সত্ত্বাধিকারী ছিলেন ভুবনমোহন নিয়োগী, ম্যানেজার অমৃতলাল বসু, আর ডিরেক্টর বা পরিচালক উপেন্দ্রনাথ দাস।

এই ১৮৭৫ সালের শেষ ভাগে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জ্যেষ্ঠ পুত্র যুবরাজ এডওয়ার্ড প্রিন্স অফ ওয়েল্‌স্ (যিনি ১৯০১ সালে ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুর পরে সপ্তম এডওয়ার্ড নামে ইংলণ্ডের রাজা হয়েছিলেন) ভারত ভ্রমণে আসেন। ভারতের ইতিহাসে সেই প্রথম ইংলণ্ডীয় রাজবংশের যুবরাজ এ দেশ ভ্রমণে এলেন, সুতরাং তাঁকে নিয়ে নানা প্রকারের অভ্যর্থনা আনন্দ-উৎসবাদির আয়োজন হয়েছিল, বলাই বাহুল্য। লাট্-বেলাট-আদি প্রদত্ত "দরবার" উৎসবাদি ছাড়াও কলিকাতার নাগরিকবৃন্দ ব্যক্তিগত বা সমবেতভাবে তাঁকে নানারকমে আমন্ত্রিত ও আপ্যায়িত করেন। তার মধ্যে এক উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হয়েছিল, রাজকুমারকে এক বাঙ্গালী গৃহস্থের অন্তঃপুরমধ্যে আমন্ত্রিত করে, তাঁকে অন্তঃপুরচারিণীদের দ্বারা যথারীতি শঙ্খধ্বনি, উলুধ্বনি প্রভৃতি শাস্ত্রীয় (বা লোকাচারসম্মত) অনুষ্ঠানাদিসহ "বরণ" করা হয়। ভবানীপুর নিবাসী উকিল জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে এই ব্যাপার অনুষ্ঠিত হয়। এতে সমস্ত হিন্দুসমাজে তথা কলিকাতা সহরে বিষম চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়, একজন বিদেশী ও বিধর্ম্মীকে—হলেই বা সে রাজকুমার—একেবারে হিন্দু ব্রাহ্মণের অন্দরমহলে নিয়ে যাওয়া! কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই ঘটনা নিয়ে "বাজিমাৎ" নামক তীব্র শ্লেষাত্মক একটি কবিতা রচনা করেন, তার প্রথম দুই লাইন এই:

"সাবাস্ মুখুজ্যের পো, খেল্‌লে ভাল চোটে—
তোমার খেলায় রাং রূপো হয়, গোবরে শালুক ফোটে"।

পাঠক-পাঠিকারা বোধ হয় ভাবছেন, এ সব কথা কেন? ধান ভানতে শীবের গীত? একটু ধৈর্য্য ধ'রে পড়ে গেলেই পাঠক-পাঠিকারা বুঝতে পারবেন এই রাজকুমারের কলিকাতা আগমনের সঙ্গে নাট্যাভিনয়-নিয়ন্ত্রণ আইনের কি সম্বন্ধ সংঘটিত হয়েছিল। কলিকাতা সহরে এত বড় একটা "হুজুক্"—হিন্দু জেনানার অবরোধ খুলে দেওয়া, যা নিয়ে সহর তোলপাড় হয়ে গেল, এমন একটা রসাল ব্যাপারের সুবিধা নিতে থিয়েটার কর্তৃপক্ষ একটুও দেরী করেননি। ১৮৭৬ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে প্রধান নাটক "সরোজিনী"র সঙ্গে তাঁরা "গজদানন্দ" নামক একখানি সদ্য-লেখা প্রহসন জুড়ে দিলেন, প্রেক্ষাগৃহ লোকে লোকারণ্য। আবার ২৩শে ফেব্রুয়ারী তারিখে "সতী-কি-কলঙ্কিনী" নাটকের সঙ্গে অভিনীত হলো সেই "গজদানন্দ"। তখন কয়েকজন ব্যক্তি গভর্ণমেন্টকে জানালেন যে কলিকাতার একজন বিশিষ্ট গণ্যমান্য নাগরিককে সাধারণের চোখের সামনে অত্যন্ত নিন্দিত-

ভাবে এই প্রহসনে অপমানিত করা হচ্ছে, তখন পুলিশের হুকুমে প্রহসনের অভিনয় বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু প্রহসনের আকর্ষণে যেরকম আয় বৃদ্ধি হয়েছিল, তার লোভ থিয়েটার কর্তৃপক্ষ সামলাতে পারলেন না, "গজদানন্দ" নাম বদলে ফেলে 'হনুমান চরিত্র" নাম দিয়ে প্রহসনের অভিনয় করলেন, তার সঙ্গে নাটক ছিল "কর্ণাট কুমার"। এবারে পুলিশ হুকুম-জারী করে "কর্ণাট-কুমার" ও "হনুমান-চরিত্র" উভয়েরই অভিনয় বন্ধ করে দিলেন। তারপর ১লা মার্চ্চ তারিখে উপেন্দ্রনাথ দাসের "বেনিফিট্" উপলক্ষে অভিনীত হলো "সুরেন্দ্র-বিনোদিনী" নাটক আর তার সঙ্গে একখানি নূতন প্রহসন, তার নাম "ভেড়া ও শূয়োর পুলিশ" (Police of pig and sheep) এবং অভিনয় আরম্ভ হবার আগে উপেন্দ্রবাবু রঙ্গমঞ্চে দাড়িয়ে পুলিশের অন্যায় অত্যাচারর বিরুদ্ধে এক গরম বক্তৃতা দিলেন।

গভর্ণমেণ্ট পক্ষ এবারে কোমর বেধে লাগলেন। পুলিশের দ্বারা জব্দ করা গেলনা দেখে, স্বয়ং গভর্ণর-জেনারেল লর্ড নর্থব্রুক এক "অর্ডিনান্স্" বা কঠোর হুকুম-জারী করে "গজদানন্দ", "হনুমান-চরিত্র", "কর্ণাট-কুমার" ও "ভেড়া ও শূয়োর পুলিশ" সব ক'খানিরই অভিনয় বন্ধ করে দিলেন। তারপর থিয়েটার কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করলেন যে ৪ঠা মার্চ্চ "সুরেন্দ্র-বিনোদিনী" নাটক ও তৎসঙ্গে "উভয় সঙ্কট" প্রহসন অভিনীত হবে। "সুরেন্দ্র-বিনোদিনী" নাটকখানি অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট এই অভিযোগে, যেসব ব্যক্তি তার অভিনয়ে যোগ যোগ দিচ্ছে সকলের নামে গ্রেপ্তারী পরওয়ানা জারী হলো। শনিবার ৪ঠা মার্চ্চ যখন অভিনয় চলছে সেই সময়ে পুলিশের ডেপুটি কমিশনার মিঃ ল্যাম্বার্ট সদলবলে থিয়েটারে হানা দিলেন। ম্যানেজার অমৃত বসু, ডিরেক্টার উপেন্দ্র দাস থেকে আরম্ভ করে মায় সঙ্গীত পরিচালক রামতারণ সান্যাল ও অভিনেতা মতিলাল সুর, অমৃতলাল
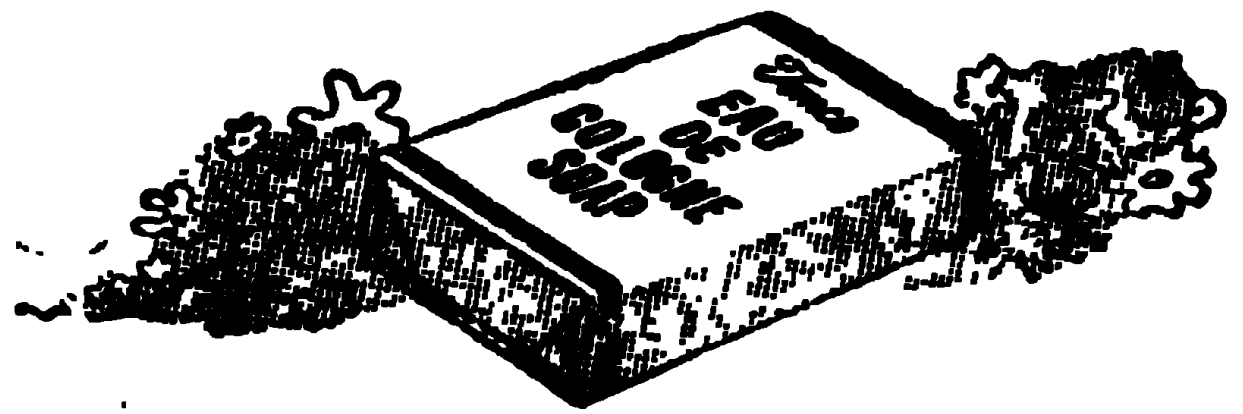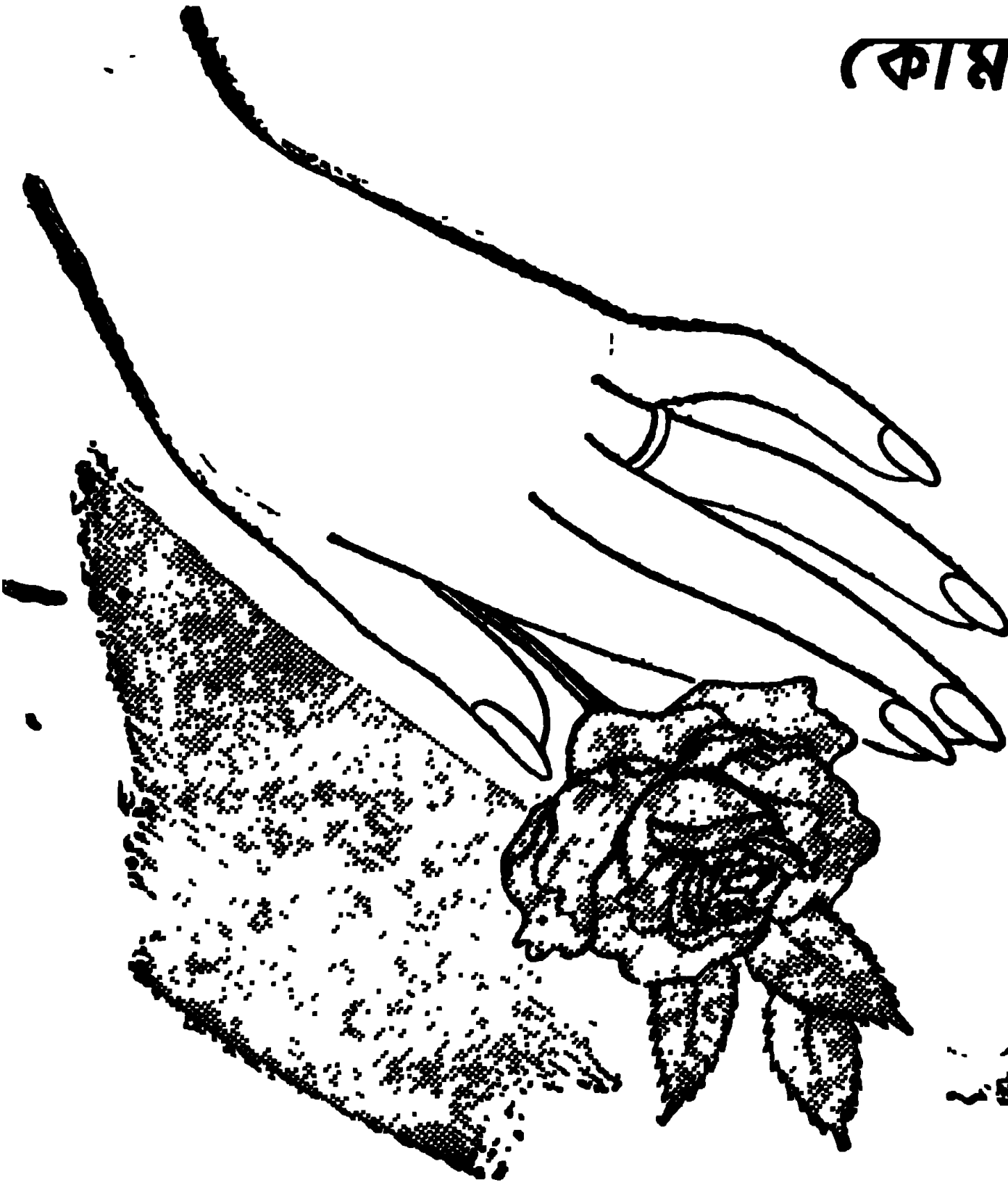
মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি সকলের নামে গ্রেপ্তারী পরওয়ানা তাঁর হাতে। হৈ হৈ হুলস্থুল পড়ে গেল, দর্শকেরা কে কোথায় পালালো। অভিনেত্রীরা এক কোণে জড় হয়ে কান্নাকাটি চীৎকার সুরু করে দিলে। শোনা যায় ষ্টেজ ম্যানেজার ধর্ম্মদাস সুর দৃশ্যপটের ওপড়ে উঠে গিয়ে লুকিয়ে পড়েন, একজন অভিনেতা ঝাঁকা মাথায় নিয়ে কুলী সেজে পালাতে গিয়ে ধরা পড়েন!

পরদিন পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডিকেন্সের কাছে যখন মামলা উপস্থিত হলো, তখন থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী ভুবনবাবু এসে স্বেচ্ছায় ধরা দিলেন, কিন্তু উপেন্দ্রবাবু নিজে সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করাতে, ভুবনবাবু নিষ্কৃতি পেলেন। "সুরেন্দ্র-বিনোদিনী" নাটকে কোনরূপ অশ্লীলতা নেই এই মর্ম্মে বহু গণ্যমান্য ও শিক্ষিত ব্যক্তি সাক্ষ্য দেওয়া সত্ত্বেও, ম্যাজিষ্ট্রেট অমৃতবাবুকে ও উপেন্দ্রবাবুকে এক মাস করে সিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করলেন।

যে দৃশ্য বা ঘটনার জন্য অশ্লীলতার অভিযোগ হয়েছিল সেটি এইরূপ—মিঃ ম্যাক্ ক্রিণ্ডল্ (McCrindle) নামে এক য়ুরোপীয় মফঃস্বল ম্যাজিষ্ট্রেটরূপী অমৃতবাবু একটি দৃশ্যে ওপরের ঘরে 'বিরাজ' নামে একটি যুবতীকে দেখে তাকে টানাটানি করাতে, সে তাঁর হাত ছাড়িয়ে ভয়ে বিহ্বল হয়ে ওপরের বারান্দা (balcony) থেকে নীচে লাফিয়ে পড়ে আহত হয়। পরবর্ত্তী দৃশ্যে দেখা যায় ম্যাজিষ্ট্রেট আহত ও রক্তাক্ত মেয়েটিকে তুলে নিয়ে ওপরে নিয়ে যান ও যা বলেন তার মর্ম্মার্থ এইরূপ "এঃ, বেচারী সুন্দরী, সত্যি ও বারান্দা থেকে লাফিয়ে পড়লো!" ("By Jove, the sweet lady! she had actually jumped down from the balcony!")

অভিযুক্তদের পক্ষ থেকে পরদিনই জামিনে খালাস দেবার আবেদন ও হাইকোর্টে আপীলের ব্যবস্থা হয়। পরদিন দোলের ছুটি থাকা সত্ত্বেও হাইকোর্টের জজ ফিয়ার সাহেব (Phear) শুধু তাঁদের জামিন মঞ্জুর করবার জন্য কোর্টে আসেন। পরে ২০শে মার্চ্চ হাইকোর্টে আপীলের শুনানী দুজন জজের সামনে হয় (Phear, এবং Markby)। পণ্ডিত যোগেন্দ্রনাথ তর্কভূষণ, পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন ইত্যাদি বহু লোক নাটকখানির নির্দ্দোষিতা সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। খৃস্টান সমাজের বরেণ্য রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এই মর্ম্মে এক পত্র দেন, যে "পুস্তকখানি এমন নয় যে বালক-বালিকাদের হাতে দেওয়া যায়, বইটির বিরুদ্ধে বলতে গেলে এই পর্য্যন্তই বলা যায়। নৈতিক দিক থেকে বিচার করলে আমি সার্ ওয়ালটার স্কটের অনেক উপন্যাস সম্বন্ধেও এই মন্তব্য করবো। ম্যাজিষ্ট্রেট ও বিরাজের দৃশ্যটি মনে হয় স্কটের পুস্তক "নাইট্ টেম্পলার" (Knight Templar) ও ইহুদী যুবতীর ঘটনার অনুকরণে লিখিত, তবে বাঙ্গালী লেখক দেখিয়েছেন যে যুবতীটি সত্য সত্যই বারান্দা থেকে লাফিয়ে পড়ে, এবং তারপর আহত ও রক্তাক্ত অবস্থায় তাকে তুলে ওপরে নিয়ে যাওয়া হয়।" হাইকোর্টের জজদ্বয়ের বিচারে নাটকখানি নির্দ্দোষ প্রমাণিত হয় এবং উপেন্দ্রবাবু ও অমৃতবাবু "বেকসুর" মুক্তি পান। তাঁদের পক্ষে এ্যাটর্ণি ছিলেন স্বনামধন্য গণেশচন্দ্র চন্দ্র এবং ব্রনশন, মনোমোহন ঘোষ ও তারক পালিত, এই তিনজন ব্যারিষ্টার তাঁদের পক্ষ সমর্থন করেন।

পুলিশের দ্বারা থিয়েটার কর্ত্তৃপক্ষকে বশে আনতে না পেরে অবশেষে গভর্ণমেন্ট আইন পরিষদে একটি বিল উত্থাপন করেন, তার নাম "নাট্যাভিনয় নিয়ন্ত্রণ বিল" (Dramatic Performances Control Bill) তার উদ্দেশ্য এইভাবে লিখিত ছিল:—

"যখনই গভর্ণমেন্টের মত এইরূপ হইবে যে কোন নাট্যাভিনয় কুৎসা নিন্দাবাদপূর্ণ অথবা তদ্দ্বারা গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ভাবের উদ্রেক করা হইয়াছে, বা ব্যক্তিগতভাবে কোন লোকের মনে কষ্টের কারণ হইয়াছে, অথবা অন্য যে কোন ভাবে জনসাধারণের স্বার্থের প্রতিকূল হইয়াছে, তখনই সেই নাট্যাভিনয় বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে।"

এই বিলের বিরুদ্ধে বহু প্রতিবাদ সভা হয়, তার মধ্যে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য, জজ দ্বারকানাথ মিত্রের বাড়ীতে এবং তাতে সভাপতি ছিলেন বিখ্যাত "রেইস্ ও রায়ৎ" পত্রিকার সম্পাদক শম্ভু চন্দ্র মুখোপাধ্যায়। কিন্তু প্রতিবাদে কোন ফল হয় নি, বিলটি আইনে পরিণত হয়ে ১৮৭৬ সালের ১৮ই ডিসেম্বর গভর্ণর-জেনারেলের সমর্থন লাভ করে, এবং এখনো সেই আইন বলবৎ আছে। চলচ্চিত্র সম্বন্ধীয় আইনগত বিধিনিষেধ যে সকল আছে তারও উৎপত্তি এই আইন থেকেই হয়েছিল।

প্রিয় সম্পাদকভায়া,

সেদিন এক বন্ধু ক'লকাতার থিয়েটারগুলির অলক্ষণের কথা বলছিলেন। আমি তাঁর কথা শুনে শুধু এই কথাই বলেছিলাম—তুমি যাকে অলক্ষণের কথা বলছো, আমি তাকে সুলক্ষণই বলি! এতে থিয়েটারগুলি উঠে যাবে। আমার কথা শুনে বন্ধুবর গলায় কাঁটা ফোটার মতো হাঁ করেছিলেন। কেন বলতে পার?

সিনেমার যুগে থিয়েটার চালাবার প্রহসন যাঁরা করেন, তাঁরা যে শেষ-অবস্থায় দুর্দশায় পড়বেন—এ আর বেশি কথা কি! একটা ফিল্ম দেখতে কমপক্ষে ছ'আনা-দশ আনাতেই চ'লে যায়; কিন্তু থিয়েটারের শেষের হাতলভাঙা, ছোবড়া-ওঠা চেয়ারগুলিতেও এক টাকার কম বসবার যো নেই রে দাদা! ছ'আনা দশ আনা জোগাড় করতেই যাদের বাপ-দাদার পকেট হাতড়ে বেড়াতে হয়, তাদের কাছে থিয়েটার দেখবার বাসনা এক মিনিটেই উবে যায় কোপ্‌পুরের মতো! তারা থিয়েটারে যায় না, থিয়েটার-হলের আশে-পাশে দাঁড়িয়ে থেকে নটনটীর আনাগোনা দেখেই দুধের সাধ ঘোলে মেটায়। যাদের আবার বেশী সখ, তারা থিয়েটারের ম্যানেজারের ভায়রা-ভাইয়ের পিসতুতো শালার মাসতুতো ভাইকে ছিনে-জোঁকের মতো ধ'রে পড়ে একখানা পাশের জন্য। পাশ পেলে, গায়ে আদ্দি চড়িয়ে সামনের সীটে গিয়ে বসে; আর, ঘন ঘন পিছনের দিকে তাকায়—ভাবখানা, তোরা ব্যাটারা, গাঁটের কড়ি খরচ ক'রেই মর্, আমরা কেমন কৌশলে বাজী জিতেছি ত্থাখ্! বেশির ভাগ থিয়েটারে গিয়েই দেখেছি সামনের আসনগুলো যত সব পাশ-কাটানো বাবুর দলেই ভর্তি!

কিছুদিন আগে থিয়েটারের এক নামজাদা এক্টরের সঙ্গে আলাপ হলো। তাঁকে বললাম—টাকাকড়ি পান তো নিয়মিত? একটা পান্তো মুখে পুরে তিনি বললেন—না পেলে প্লেই করি না! চেক হাতে এলে আগে ব্যাঙ্কে ফোন করি। যদি শুনি চেক ক্যাশ করা হয়েছে, তবে মোটর বের করতে বলি; আর উল্টোটা শুনলে আমিও বিছানায় উল্টে পড়ে অসুস্থ হই। খবর পেয়ে থিয়েটারের লোকেরা যদি টাকা নিয়ে বাড়ীতে হানা দেয়, তবেই আমার অসুখ সারে; নইলে অসুখের উপসর্গ আরও বেড়ে যায়!

আমার মুখ দিয়ে আপনা থেকেই বেরিয়ে যায়—ব্রেভো!

ভদ্রলোক চা-পান শেষ করে গায়ে চাদরটা চাপান দিয়ে বলেন—তবে, একটা গল্প বলি শুনুন। একবার রঙ্গনিকেতনে 'সাজাহান' নাটক হবে। আমার 'সাজাহানে'র পার্ট। দস্তরীর টাকাটা আমি আগাম-ই নিয়ে থাকি, সেবার ওঁরা বললেন—এই আদ্ধেকটা নিন, বাকী আদ্ধেকটা থিয়েটারের দিন দিয়ে দেবো। থিয়েটার শুরু হবার তখন কয়েক মিনিট বাকী; তখনও বাকী আদ্ধেকটা এলো না দেখে, আমিও 'সাজাহানে'র আদ্ধেক দাড়ি, আদ্ধেক পাজামা প'রে বসে আছি। লাস্ট বেল বেজে গেল। তবু ড্রপসিন উঠছে না দেখে অডিটোরিয়ামে চেঁচামেচি শুরু হয়েছে। ব্যাপার দেখে ম্যানেজার ছুটে এলেন আমার কাছে। এসেই

বললেন—এ কি! আপনি এখনও তৈরী হননি? আমি নির্লিপ্তভাবে হাতটা তাঁর সামনের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললাম—বাকী আদ্ধেকটা এখনও পাইনি যে দাদা, তাই আদ্ধেক তৈরী হয়ে আছি! ভদ্রলোক তক্ষুনি ছোটেন অফিসে। বাকী আদ্ধেকটা গুণে নিয়ে, এমনকি পাকিস্তানী ছাপ-ওঠানো নোট গছাবার চেষ্টা আছে কিনা তা দেখে নিয়ে তবে আমি বাকী আদ্ধেক দাড়ি-গোঁফ লাগাই, পা-জামায় পা গলাই! বুঝলেন মশাই থিয়েটার-ওয়ালাদের সঙ্গে কখনও বাকীতে কারবার করতে নেই! করেছেন কি মরেছেন!

পরে শুনেছি এই এ্যাক্টর-ভদ্রলোকই থিয়েটার-জগতের একমাত্র লোক, যাকে ঠকাতে গিয়ে সবাই ঠকেছে!

কিন্তু এ-দশা তো আর সবার নয়! থিয়েটার ক'রে নিয়মমতো মাইনে পাওয়া ক'জনের ভাগ্যে হয়? তাই, মেয়ের বিয়ে, ছেলের পৈতে, মায়ের শ্রাদ্ধ—এই সব বায়নাক্কা ধরে তাদের অনেককেই ছুটতে হয় থিয়েটারের মালিকের কাছে—একটা চ্যারিটি শো'র জন্য। চ্যারিটি-শো' যদি বা হয়, তাতে তিন মাসের বাকী মাইনেও বুঝি বা পাওয়া যায় না। তাই থিয়েটারের নট-নটীরা ছোটেন টালিগঞ্জের স্টুডিয়ো মহলে—ছবিতে নামবার জন্য প্রযোজক ও পরিচালকের কাছে 'হত্যে' দেবার উদ্দেশ্য নিয়ে। উদ্দেশ্য সফল হ'লে, কালীঘাটে পাঁচ পয়সার পুজো দিয়ে তাঁরা বাড়ী ফেরেন, পেসাদ বিলোন, গিন্নীর মাথায় মা-কালীর সিঁদুর চাপান। উদ্দেশ্য বিফল হলে, কেউ পুরোনো বইয়ের দোকান খোলেন, কেউ গম-ভাঙার কল বসান, কেউ বা বাড়ী ফিরে গিন্নীকে বাপের বাড়ী পাঠাবার উদ্যোগ করেন। তাছাড়া আর উপায় কি!

তাই, আমি বলি কি, থিয়েটারগুলি উঠেই যাক—তাতে ঐ সব বাড়ীতে উদ্বাস্তুদের বসবাসের জায়গা হবে—লোকেও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচবে! আর, নেহাৎই যদি থিয়েটারের ঐতিহ্য বজায় রাখতে হয়—তবে সবগুলি থিয়েটার এক হয়ে ভালো দেখে একটা যাত্রার দল খুলুক। তাতে বায়নাও জুটবে মায়নাও মিলবে। কিন্তু, আমার কথায় থিয়েটারের মালিকদের কি চেতনা হবে? সকলেই যে অচৈতন্য!

—ধুরন্ধর

পুরানো দিনের স্মৃতি

সংগ্রাহক — তেজেন ওহরায়

নবদ্বীপ হালদার

বর্দ্ধমান থেকে আট মাইল দূরে সোণা-পলাশী নামে একটা গ্রাম আছে। প্রায় চল্লিশ বছর আগে এই গ্রামেরই এক মধ্যবিত্ত ঘরে নবদ্বীপবাবুর জন্ম হয়। তাঁর বাবা ৺গোপীকৃষ্ণ হালদার ছিলেন একজন নামজাদা পুলিশ অফিসার। তাঁর পাঁচ পুত্র ও এক কন্যার মধ্যে নবদ্বীপবাবু চতুর্থ পুত্র। এই চতুর্থ পুত্রের যখন মাত্র দু'বছর বয়স তখন তিনি হাজারীবাগে বদলী হয়ে যান; পুত্রও যায় তাঁর সঙ্গে। নবদ্বীপ নামটা তাঁর দিদিমার দেওয়া, বাড়ীতে অবিশ্যি তাঁকে 'নবু' ব'লে ডাকা হয়। অনেকের ধারণা, নবুর জন্ম খুব সম্ভব নবদ্বীপে হয়েছিল—তাই তাঁর নাম নবদ্বীপ। কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক তা নয়; তাঁর মা একবার নবদ্বীপে তীর্থ করতে যান। সেখান থেকে ফিরে আসার কয়েকদিন পরে তাঁদের গ্রামের বাড়ীতে নবুর জন্ম হয় এবং সেজন্যই তাঁর নাম রাখা হয় নবদ্বীপ।

ছোটবেলা থেকেই তাঁর পড়াশুনা আরম্ভ হয়—কিন্তু হলে হবে কি। মন তার পড়াশুনায় ছিল না। তাই পঞ্চম শ্রেণী পর্য্যন্ত কোন রকমে পৌঁছে বীণাপাণিকে বিদায় দিয়ে দিলেন। পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে এখন কি আর করা যায়। বাড়ীতেই চুপচাপ বসে রইলেন কিছুদিন। এর মধ্যে কিন্তু একটা দুর্ব্বুদ্ধি তাঁর মাথায় এসে গেল। একদিন বাড়ীতে কাউকে কিছু না বলে বর্দ্ধমান সহরের এক পেশাদারী যাত্রা দলে ঢুকে পড়লেন। যাত্রার দলের অধিকারীর এক প্রশ্নের জবাবে জানালেন যে তাঁর বাবা, মা কেউ বেঁচে নেই। যাই হোক তিনি দলের একজন 'সখী' হিসাবে মনোনীত হলেন। কিছুদিন সখীর ভূমিকায় অভিনয় করবার পরে হল এক বিপদ। তাঁর বাবা যেন কিভাবে জানতে পারেন যে তাঁর সুযোগ্য পুত্র বর্দ্ধমানেই আছেন। ব্যস্! যেই না জানতে পারা—অমনি 'সখী'কে ঘাড় ধরে নিয়ে এলেন বাড়ীতে। যাত্রা করা তাঁর মাথায় উঠে গেল।

এরপর কয়েক বছর আবার চুপচাপ। বাড়ীতে বসে থাকেন আর ভাবেন কি করা যায়। কিছুতেই যখন কিছু হয় না—তখন হঠাৎ ইলেকট্রিকের কাজ শেখবার খুব ইচ্ছা হ'ল। ইচ্ছাটা সঙ্গে সঙ্গে বাবাকে জানালেন। বাবা তখন তাঁকে ওয়ালটার লক এণ্ড কোম্পানীর ইণ্ডিয়ান মোটর সাইকেল ওয়ার্কস্-এ ভর্ত্তি করিয়ে দিলেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র ১৮ বছর। এঁদের অফিসটা ছিল ইণ্ডিয়ান মীরর ষ্ট্রীটে। বলতে গেলে সেই তিনি প্রথম কলকাতায় আসেন। মাত্র ১৩ টাকা মাইনেতে সেই চাকুরী গ্রহণ করলেন। বেশ ভালভাবেই কাজ করতে লাগলেন। সেই কোম্পানীর অন্যতম কর্ত্তা তৎকালীন ভালহাউসী ফুটবল ক্লাবের গোল-কীপার চেম্বারলীনের সুনজরে পড়লেন তিনি। তিনি তাঁদের সুযোগ্য ইলেকট্রিশিয়ান ব্যোমকেশ পালের ওপর তাঁকে কাজ শেখাবার ভার দিলেন—যাতে ভালভাবে কাজ শিখতে পারেন। আস্তে আস্তে ৬ ভোল্ট ব্যাটারী থেকে মোটর সাইকেলের লাইটের ওয়্যারিং-এর কাজ শিখে ফেললেন। এর মধ্যে একটা ব্যাপার ঘটে গেল। মাঝে মাঝে গাড়ী ষ্টার্ট দেবার জন্য গাড়ী ঠেলে অনেক দূর পর্য্যন্ত নিয়ে যেতে হ'তো। একদিন হ'ল কি। একটা গাড়ী ঠেলতে ঠেলতে গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেল পর্য্যন্ত নিয়ে আসতে হ'ল। ব্যস্, মেজাজ গেল বিগড়ে। 'কী! কাজ শিখতে এসেছি বলে কি কুলী হয়ে গেছি নাকি? দেবে তো মাত্র তেরো টাকা মাইনে—তাতে আবার গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেল পর্য্যন্ত গাড়ী ঠেলতে হবে? লেখাপড়া শিখিনি বলে কি সম্মানও নেই?'—এই না বলে চাকরী দিলেন ছেড়ে। বাড়ীতে ফিরে গিয়ে বাবার বকুনী খেয়ে আবার চুপচাপ বসে রইলেন কিছুদিন।

এর মধ্যে বাবা তাঁর সুযোগ্য পুত্রের বিয়ে দিয়ে দিলেন, বর্ত্তমানে নবদ্বীপবাবুর দুটি পুত্র ও দুটি কন্যা। হ্যাঁ, যা বলছিলাম। চাকরী তো ছেড়ে দিলেন—এখন কী করা যায়? একটা কিছু তো করতে হবে? সকলের গলা নকল করতে আরম্ভ করলেন। যখন যার যে রকম গলার আওয়াজ শুনতেন—নকল করে ফেলতেন। নবদ্বীপবাবুদের তখন বর্দ্ধমান সহরের ওপর একটা বাড়ী কেনা হয়েছে। একদিন সেই বাড়ীতে বসে আছেন। এমন সময় এক ভিখারী এসে এক অদ্ভুত গলার আওয়াজ ক'রে ভিক্ষে চাইলো। ভিক্ষে দিয়ে দিলেন। কিন্তু ভিখারী চলে যাবার পর তার সেই অদ্ভুত গলার স্বর নকল করার অভ্যেস করতে লাগলেন। খুব ভাল লেগেছে তাঁর ঐ ভিখারীর গলার আওয়াজ। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই অদ্ভুত আওয়াজ আয়ত্ব করে ফেললেন। সেদিন থেকে আজও পর্য্যন্ত তিনি সেই নকল গলার আওয়াজেই পরিচিত। সেই অদ্ভুত আওয়াজই তাঁর পরবর্ত্তী জীবনের পাথেয় হয়েছিল। তাঁর প্রকৃত গলার স্বর স্বাভাবিক আওয়াজের চাইতে সামান্য তফাৎ হলেও তাঁর প্রকৃত আওয়াজ আমাদের মতই স্বাভাবিক। যে গলার আওয়াজে তিনি আমাদের কাছে পরিচিত, তাঁর স্বাভাবিক গলার স্বর একেবারেই তা নয়।

যাই হোক তারপর গলা সাধতে সুরু করলেন। কিন্তু তারপরেও তাঁকে চাকরীই করতে হয়েছিল। তাঁর বাবা আবার তাঁকে ভদ্রেশ্বরে Angurs Engineering Co-তে ভর্ত্তি করে দিলেন। ২৫৲ টাকা মাইনে পেতেন। কিন্তু এখানেওতাঁর মন টিকলো না। আবার চাকরীতে ইস্তফা দিলেন। বাবা তাঁর এই সুযোগ্য পুত্রকে নিয়ে পড়লেন ভীষণ বিভ্রাটে। এর কিছুদিন পরে আবার তাঁর এক চাকরী গ্রহণ করতে হ'ল। চুঁচুড়ার পুলিশ অফিসার টার্জ্জি সাহেবকে ধরে কাশীপুর Power House-এ Switch Board Attender হিসাবে ভর্ত্তি করিয়ে দিলেন। কাজ ছিল তাঁর প্রত্যেক আট ঘণ্টা অন্তর meter থেকে লগ নেওয়া। ৪০৲ টাকা মাইনেতে প্রবেশ করেন। কিন্তু এখন হ'ল আর একটা মুস্কিল।

'পরিবর্ত্তন' থেকে 'বাবলা' ছবি যাঁর অভিনয়-প্রতিভার উৎকর্ষে সমুজ্জ্বল

শোভা সেন

…নেবার পরে শ্লেটের ওপর আট হাত লম্বা অঙ্কের যোগ করে গিয়ে গোল হাত গভীর জলে ডুবে যেতেন। ছাই হোক এর পরে Steam Recorder-এ কালি দিতে হতো। অল্পদিনের মধ্যেই সকলের খুব প্রিয় হয়ে উঠলেন। সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট J. Y. Makershi সাহেব তো অত্যন্ত খুসী। তাঁর নকল ও ভুল ইংরেজী শুনে Makershi সাহেব খুব হাসতেন। কিন্তু চাকরী করা বোধ হয় তাঁর ধাতে নেই। প্রায় এক বছর চাকরী করবার পরে একদিন Switch Board-এর Charge-manকে তাঁর duty-র সময়টা একটু পরিবর্ত্তন করবার জন্য অনুরোধ করেন—কারণটা হচ্ছে ফুটবল খেলা দেখতে যেতে পারতেন না। কিন্তু তিনি সময় কিছুতেই পরিবর্ত্তন করতে চাইলেন না। তিনিও সেদিন থেকে চাকরী থেকে বিদায় নিলেন এবং প্রতিজ্ঞা করলেন এ জীবনে আর কোনদিনও চাকরী করবেন না।

এর কিছুদিন পরে এ্যামেচার ক্লাবে সেই অদ্ভুত গলার আওয়াজ সহযোগে কৌতুক অভিনয় দেখাতে সুরু করলেন। প্রথম প্রথম দক্ষিণা পেতেন তিন টাকা থেকে পাঁচ টাকা পর্য্যন্ত। হুগলী কলেজিয়েট স্কুলের ড্রইং মাষ্টারের ছেলে শচীন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে মফঃস্বলে ঘুরে ঘুরে শো' দেখাতে লাগলেন। শচীনবাবু ভাল ম্যাজিক জানতেন। শচীনবাবুর ম্যাজিক ও নবদ্বীপবাবুর কমিক। যা অর্থোপার্জ্জন হ'ত দুজনে ভাগ করে নিতেন। বর্দ্ধমান জেলার কুলটিতে Bengal Iron and Steel Co.,-তে দিবসে প্রথম শো' দেখান। খুব প্রশংসা পান। এরপর তিনি একা কমিক দেখিয়ে ২৫৲ টাকা পর্য্যন্ত দক্ষিণা পেতে থাকেন। কিছুদিন বাদে শচীনবাবু ও তিনি পৃথক হয়ে যান। আলাদা হয়ে তিনি কালীঘাট ক্লাবে যোগ দেন। কালীঘাট ক্লাবের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক ৺অতুল গুপ্ত ও ফুটবল-ক্যাপ্টেন নির্ম্মল দাশগুপ্তের পরিচালনায় ক্লাব যখন ভারতের অন্যত্র খেলতে যেতেন নবদ্বীপবাবুও তাঁদের সঙ্গে যেতেন তাঁদের আনন্দ বিতরণ করবার জন্য। এই ক্লাবের সঙ্গে সঙ্গে তিনি তালকোত্রা, সিমলা, দিল্লী, লক্ষ্মৌ প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করেন। এর মধ্যে একবার যান সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত দেওঘরে। ক্লাব তখন সেখানে আগাবেগ শীল্ডে খেলতে যায়। সেখানে মন্দিরের রিসিভার সুরেশ চৌধুরীর অনুরোধে তিনি কাশীমবাজার রাজবাড়ীতে একটা শো' দেখান। ভারতের অন্যত্র এক একটা শো' দেখিয়ে প্রায় ছ' সাত শো' টাকা পান।

প্রখ্যাত চিত্র-পরিচালক দেবকীকুমার বসুর শ্বশুরবাড়ী দেওঘরে। তিনি তখন দেওঘরেই ছিলেন। নবদ্বীপবাবু তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। British Dominion Film-এ কাজ করবার জন্য আমন্ত্রিত হলেন। বাণীবাবুও তখন দেওঘরে ছিলেন। তিনি তখন সম্পূর্ণ "সীতা' নাটকটি একাই অভিনয় করে দেখাতেন। নবদ্বীপবাবু তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন এবং উভয়ে নানা দেশ ভ্রমণ করে তাঁদের শো' দেখাতে লাগলেন।

সেখান থেকে ফিরে এসে তিনি ৪০, দমদম রোডে

নবদ্বীপের পুরোনো দিনের ছবি :
'গোঁজামিল' ছবিতে নবদ্বীপ ও রেণুকা ঘোষ

অবস্থিত B, D, F, C-তে যোগ দিলেন। সেখানে তখন পরিচালক প্রমথেশ বড়ুয়া ও ৺দীনেশ দাস ছিলেন। এঁদের দ্বিতীয় চিত্র 'পঞ্চশর'-এ নবদ্বীপবাবু জীবনে প্রথম অভিনয় করেন; এবং এখান থেকেই তিনি প্রথম চিত্রজগতে প্রবেশ করেন। 'পঞ্চশর' পরিচালনা করেন ধীরেন গঙ্গোপাধ্যায়। এক সরাইখানার মালিকের ভুমিকায় অভিনয় করেন নবদ্বীপবাবু এবং সেই চরিত্রের স্ত্রীর ভুমিকায় অভিনয় করেন প্রেমকুমারী নেহেরু (ইনি এখনও জীবিত আছেন। কিছুদিন আগে 'মর্য্যাদা' চিত্রে এক বৃদ্ধার ভুমিকায় অভিনয় করেছিলেন)। নায়িকার ভুমিকায় অভিনয় করেন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের তৎকালীন সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের মেয়ে Miss Dovan

এরপর বিষ্ণুচরণ ঘোষের সঙ্গে আবার বাইরে শো' দেখাতে যান। প্রথমে যান লাহোরে, তারপর পাতিয়ালা, আগ্রা প্রভৃতি স্থানে ঘুরে কলকাতায় ফিরে আসেন। নিউ থিয়েটার্সে' চণ্ডীদাস' ছবির চিত্রগ্রহণ শেষ হয়ে গেছে। দেবকীবাবু তখন 'সোনার সংসার' নিয়ে ব্যস্ত। তিনি দেখা করলেন তাঁর সঙ্গে। মনোনীত হলেন 'সোনার সংসার' সবাকচিত্রের জন্য। তাঁর জীবনে সবাকচিত্রে সেই প্রথম অভিনয়। তাঁর অদ্ভুত গলার স্বরও সেই চিত্রেই প্রথম শোনা যায়। 'সোনার সংসার' শেষ হবার আগেই কিন্তু তিনি ধীরাজ ভট্টাচার্য্য রচিত ও পরিচালিত 'জোয়ার-ভাঁটায়' এক কবির ভুমিকায় অভিনয় করেন এবং এই চিত্রটিই প্রথম মুক্তি পায়। তারপরে 'সোনার সংসার' মুক্তিলাভ করে। 'পঞ্চশর' চিত্র যখন মুক্তি পায় তখন তাঁর জীবনে এক মহাদুর্দ্দিন এসেছিল তাঁর মায়ের পরলোকগমনে। 'পঞ্চশর' মুক্তি পায় 'চাইনীজ থিয়েটারে'। অশৌচ নিয়েই দেখতে যান জীবনের প্রথম চিত্রাবতরণের ছবি।

থিয়েটার জগতের প্রথম সূত্রপাত রঙমহল থেকে। তখন তিনি থাকতেন হাতীবাগানে। রঙমহলের তৎ-কালীন মালিক ছিলেন গদাইবাবু, কে, সি, দে প্রভৃতি। প্রথম অভিনয় করেন 'অভিষেক'-নাটকে কমিক চরিত্র 'জনমেজয়ের' ভুমিকায়। তারপর অভিনয় করেন শরদিন্দু

বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'বন্ধু'তে। 'প্রলয়' ও 'তটিনীর বিচারে' অভিনয় করেই রঙমহল ত্যাগ করেন। এর মধ্যে মধু বসুর সঙ্গে বোম্বাইতে চলে যান তাঁর 'কুমকুম' চিত্রে অভিনয় করবার জন্য। হিন্দী 'কুমকুম'-এ সাংবাদিকের ভূমিকায় অভিনয় করেন এবং বাংলা 'কুমকুম'-এ বাড়ীওয়ালা ও রিপোর্টারের ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করেন। তারপর থেকে চিত্রজগতে অপ্রতিহত গতিতে তাঁর অভিযান চালিয়ে আসছেন। আজ পর্য্যন্ত তিনি প্রায় ৮০।৯০ খানা চিত্রে অভিনয় করেছেন।

এই গেল তাঁর জীবনের একটা দিক। আর একটা দিক হচ্ছে রেকর্ড ও রেডিও জগতে তাঁর অবিস্মরণীয় দান। বিশেষ করে রেকর্ড জগতের মাধ্যমেই নবদ্বীপবাবু সমধিক পরিচিত। কিন্তু এই পরিচয়ের পেছনে কত পরিশ্রম ও অধ্যবসায় ছিল, শুনলে আশ্চর্য্যান্বিত হতে হয়। প্রথম জীবনে বহু রেকর্ডে তাঁর ঐ অদ্ভুত গলা দিয়ে কিছু রেকর্ড করবার চেষ্টা করেন—ঘুরতেও থাকেন বহু রেকর্ড কোম্পানীর দরজায় দরজায়। কিন্তু নিরাশ হয়ে ফিরতে হয় সব জায়গা থেকেই। শেষে 'সোনার সংসার' চিত্রে তাঁর ঐ নকল গলার আওয়াজে প্রীত হয়ে নরেশ চক্রবর্ত্তী তাঁকে ডেকে পাঠান। নরেশবাবু তখন 'সেনোলা' রেকর্ড কোম্পানীর সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তিনি তাঁর 'জীয়ন্ত মানুষ'-এ একটা ছোট্ট ভূমিকায় অভিনয় করবার জন্য নবদ্বীপবাবুকে মনোনীত করেন। তখন সেনোলার ম্যানেজার কার্ত্তিকচন্দ্র চক্রবর্ত্তী তাঁর গান শুনতে চাইলেন এবং রেকর্ডের উপযোগী কোন গান তাঁর জানা আছে কিনা জানতে চাইলেন। নবদ্বীপবাবুর দুখানা কমিক গান জানা ছিল। শোনালেন—সন্তুষ্ট হলেন—গান দু'টি মনোনীত হ'ল। সেই গান দু'খানাই তাঁর প্রথম রেকর্ড। সে রেকর্ড আজও অন্যান্য রেকর্ডের তুলনায় বেশী সমাদৃত ও পরিচিত। সেই রেকর্ডের একদিকে 'আর খেতে পারি না মাগো—ফ্যাস্তা ফ্যাচাং তরকারী' ও অন্যদিকে 'শরীরটা আজ বেজায় খারাপ, বিশেষ কিছুই খাব না'। এই 'ফ্যাস্তা ফ্যাচাং' রেকর্ড এত অল্প সময়ে এত অধিক জনপ্রিয় হয়ে গেল যে 'সেনোলা' তাঁর সঙ্গে এমন এক contract করে বসলেন যে আজও সে contract-এর মেয়াদ শেষ হয়নি। অবিশ্যি তার পরে contract-এ কিছু অদল-বদল করতে হয়েছে। প্রথম রেকর্ডখানির জন্য তিনি মাত্র ৩০৲ টাকা পারিশ্রমিক পেয়েছিলেন। তার পরের প্রথম তিনখানা রেকর্ডের পারিশ্রমিকই ঐ অঙ্কের মধ্যে ছিল। তারপর ক্রমে ৫০৲ টাকা তারপর ৬০৲ টাকা এবং শেষে ৯০৲ টাকা হয়েছিল। এরপর কিছুদিন রেকর্ড করা বন্ধ ছিল। শেষে রচনা, পরিচালনা ও অভিনয়সহ মোট ১৬০৲ টাকা পেতেন। Royalty সম্বন্ধে কোন ধারণা তখন তাঁর ছিল না। Royalty না দেওয়াতে এক বছর রেকর্ড করা বন্ধ করেন। তারপর প্রথম 5% ও শেষে 7% হিসেবে Royalty পান। এইভাবে তিনি আজ পর্য্যন্ত প্রায় ৫০ খানা রেকর্ড ক'রেন।
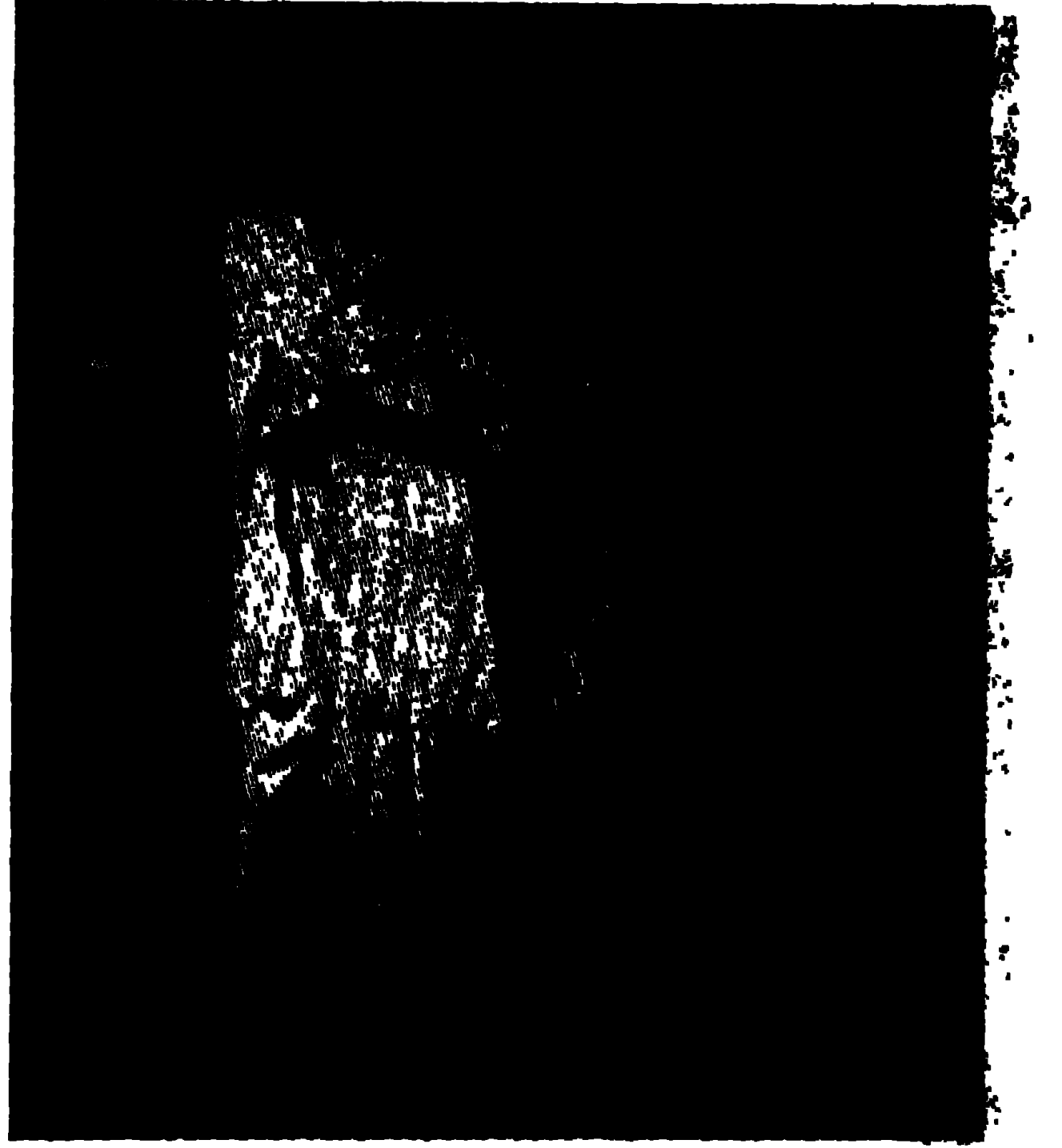
'গোঁজামিল' চিত্রের আর একটি দৃশ্য

'সোনার-সংসার'-এ অভিনয় করবার পরে তিনি রেডিওতে যোগ দেন। প্রথমে দশ মিনিটের একখানা

গানে দশ টাকা পেতেন, Musical sketch রচনা করতেন—তাঁর জন্যও পেতেন ১০৲ টাকা। গল্পদাদুর আসরেও অংশ গ্রহণ করতেন। এখন তিনি পান প্রত্যেক অনুষ্ঠান পিছু ৩৫৲ টাকা, Block Programme-এ ১৫৲ Royalty পান। নিজের staff নিয়ে করলে পান মোট ৯০৲ টাকা। রেকর্ড ও রেডিওর প্রাপ্য টাকার এই অঙ্ক তাঁর নিজের মুখ থেকেই শুনেছি।

এবার তাঁর পুরোনো দিনের ফেলে-আসা কয়েকটা হাস্যরসাত্মক ঘটনার কথা শোনা যাক।

বহুদিন আগেকার কথা। তখন তাঁর বয়স মাত্র বছর তিন-চার। একদিন বড় একটা মজার ব্যাপার ঘটেছিল। হয়েছিল কি জানেন? তাঁর দিদি একটা ছোট্ট বিলাতী ইঁদুর পুষেছিলেন। একদিন সে বিছানায় শুয়ে আছে—এমন সময় বিলাতী ইঁদুরটি এসে চুপটি করে তাঁর মুখের কাছে মুখ রেখে বসে পড়ল। ব্যস্, যেই না বসে পড়া,—'নবু' ভাবল তার মার বুকের স্তন বোধ হয় তার মুখের কাছে এসে পড়েছে। আর যেই না ভাবা—অমনি সঙ্গে সঙ্গে সজোরে কামড়ে ধরলো ইঁদুরটির ছোট্ট মুখখানি। ব্যস্, আর যাবে কোথায়? ইঁদুরও এমন কামড় দিয়ে বসলো তাঁর জিবের ওপর যে ইঁদুরের একটা দাঁতই বসে গেল। তাঁর জিবের ওপর থেকে নীচ পর্য্যন্ত। জিবের সে গর্ত আজও তাঁর আছে।

এবার চলুন গোলদীঘি থেকে ঘুরে আসি। তখন নবদ্বীপবাবু সবেমাত্র চাকরী পেয়েছেন। গোলদীঘিতে খুব বড় একটা সভা হচ্ছে। তিনিও গেছেন বক্তৃতা শুনতে। কিছুক্ষণ সভা চলবার পর হঠাৎ খুব গোলমাল আরম্ভ হয়ে গেল। পুলিশ ভীষণ মারতে আরম্ভ করল এবং সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তারও করতে লাগলো। তিনিও গোলমালের মধ্যে সুর মিলিয়ে বলতে লাগলেন 'বন্দেমাতরম্', 'ইংরেজ তাড়াও', 'পুলিশের মাথা ফাটিয়ে দাও'। কিছুক্ষণ বলার পর পুলিশ তাড়া করাতে পরিত্রাহি ছুটতে আরম্ভ করলেন। শেষ পর্য্যন্ত যখন তাঁকে ধরেই ফেললো তখন তাঁর গলায় অন্য সুর। বেগতিক দেখে দাঁড়িয়ে পড়ে বলতে লাগলেন 'এই সীপাহি, আদব সে বাত করো। ভদ্রলোক সে ভদ্রলোক কা মাফিক ব্যবহার করো। জানোনা হাম কে হ্যায়? হাম তো মিটিং শুনতে আয়া থা—হামকো কিউ ধরা হ্যায়?'

'জোয়ার ভাটা' চিত্রে নবদ্বীপ

'ইসকা জবাব থানামে মিলেগা—চলো।' বলে জোর করে সিপাই তাকে গাড়ীতে উঠিয়ে দিল। গাড়ীতে উঠে চীৎকার করে বলতে আরম্ভ করলেন 'জয়, ভারত মাতা কি জয়! কী অত্যাচার দেখুন সবাই। আমার মতো

একজন নিরীহ দর্শককেও আজ জেলে যেতে হচ্ছে। দেশবাসী এর জন্য তোমরা কেউ দুঃখ কোরো না। আমি আমার দেশের জন্যই আজ এই গাড়ী করে জেলে যাচ্ছি।' গাড়ী ততক্ষণ থানার দরজার পৌঁছে গেছে।

তাঁর সঙ্গে আরও যাঁরা ছিলেন তাঁদের প্রত্যেকের তিন মাস করে জেল হ'ল। তাঁরা জেলের ফটকে ঢুকতে ঢুকতে চীৎকার করে বলতে লাগলেন 'জয় ভারত মাতা।' কিন্তু আফশোষ রয়ে গেল, মাত্র তিন মাস করে জেল হ'ল। 'অনেক আশা করে গোলমালটা বাধিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম কমপক্ষে অন্ততঃ ছ'মাস করে হবে।'

নবদ্বীপবাবুর তো চক্ষু চড়ক গাছ। এরা বলে কি রে! যাই হো'ক তিনি ছাড়া পেলেন। তিনি আলিপুর কোর্ট থেকে বেরিয়ে একটা ট্রামে উঠলেন। টিকিট চাইতেই জেল খাটবার নজির দেখিয়ে কণ্ডাক্টরের সহানুভূতি চেয়ে নিলেন। পাড়ায় গিয়ে একেবারে হুলুস্থুল ব্যাপার করে বসলেন। সকলের প্রশ্নের জবাবেই এক উত্তর—'আরে ভাই সে আরামের কথা আর জিজ্ঞেস করিস্ না। এমন আরাম বোধ হয় শ্বশুরবাড়ীতেও পাওয়া যায় না। সেকি খাবারের আয়োজন! বাপরে বাপ। একেবারে রাজকীয় ব্যাপার! ভাবছি আজ আবার গোলদীঘিতে গিয়ে গোলমাল করব। প্রত্যেক পাড়াতেই তো জানাজানি হয়ে গেছে। সব পাড়ার থেকেই দলে দলে যাচ্ছে গোলমাল করতে। তোরা যদি যেতে চাস তো যেতে পারিস। আমার বলাটা কর্তব্য তাই বলে দিলাম। এখন যাওয়া না যাওয়া তোদের ইচ্ছে। পরে যেন আমাকে কেউ দোষ দিস্-না।'

ব্যস্, যেই না বলা—আর দেখে কে? বিকেলে সব দলে দলে সভায় গিয়ে গোলমাল বাধিয়ে দিল। প্রথমে পুলিশের লাঠির প্রহার খেয়ে এবং পরে ছ'সাত দিন করে জেলের ঘানি টেনে এসে সবাই নবদ্বীপকে কিছুদিন খুঁজে বেড়িয়েছিল কিন্তু তার আগেই তিনি সেখান থেকে পলাতক। জেলে শ্বশুরবাড়ীর মত আরামের খবরটা ততোধিক আরামের সঙ্গে জানাবার ইচ্ছা থাকলেও কেউ আর তাঁকে জানাতে পারে নি।

এবার চলুন তাঁর স্কুলে একবার যাওয়া যাক। স্কুলে পড়ে না আসার জন্য তাঁর খুব সুনাম ছিল।

একদিন ইতিহাসের ক্লাসে বসে আছেন। তিনি সব সময় 'লাস্ট বেঞ্চে' বসাটাই শ্রেয় মনে করতেন। আবার মাষ্টারমশাইরাও 'লাস্ট বেঞ্চে'ই বিশেষ দৃষ্টি দেওয়াটা ততোধিক প্রয়োজন মনে করতেন, বিশেষ করে ইতিহাসের শিক্ষকমশাই। ইতিহাসের শিক্ষকমশাই ক্লাসে ঢুকেই জিজ্ঞেস করে বসলেন—'হ্যারে নবু, 'অন্ধকূপ হত্যা' সম্বন্ধে কি জানিস বল তো।'

'আমাকে জিজ্ঞেস করছেন স্যার?' তাকেই জিজ্ঞেস করা হয়েছে জেনেও প্রশ্ন করলো নবু।

'আর কেউ নবু আছে নাকি এই ক্লাসে?'—প্রশ্ন করলেন মাষ্টারমশাই, 'জানিস না বুঝি?'

'আজ্ঞে স্যার জানবো না কেন? এ কে না জানে? কিন্তু স্যার, সে সাংঘাতিক হত্যার কথা আপনাকে আমি ভাষায় বোঝাতে পারবো না।'

'সে কি রে?'

'হ্যা স্যার, তা ভাষায় বোঝানো যায় না। অন্ধকার কূঁয়োর মধ্যে ফেলে এমন মার মেরেছিল—এমন মার মেরেছিল স্যার, যে তা না দেখলে বিশ্বাস করতে পারবেন না।'

এরপর প্রহারের বেদনায় নবু তিন দিন স্কুলে আসতে পারে নি।

প্রত্যেকদিন মাষ্টারমশাই ডিক্টেশন দেওয়া শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই—কোনদিন বা আগেই—নবু তার ডিকটেশন মাষ্টারমশাইকে দেখাতো। মাষ্টারমশাই ভাবেন একি ব্যাপার! এ ছোকরা এত তাড়াতাড়ি ডিকটেশন লেখে কি করে? একদিন হয়েছে কি! ডিকটেশন তো মাষ্টার-মশাই-এর দেওয়া হয়ে গেছে, কিন্তু সেদিন নবু আর তার ডিকটেশন দেখায় না। ব্যাপার কী? শেষে তিনি জোর করে নবুর খাতা টেনে নিয়ে দেখেন অন্য ডিকটেশন লেখা রয়েছে। তিনি যা লিখতে দিয়েছিলেন—তার এক

বর্ণও লেখা নেই খাতায়। মাষ্টারমশাই যা ভেবেছিলেন ঠিক তাই। 'A' সেকশনের ডিকটেশনটি হুবহু লেখা রয়েছে নবুর খাতায়। তারপর মাষ্টারমশাইদের যা ওষুধ, তাই পড়ল নবুর পিঠে। এখন ব্যাপারটা কি হয়েছিল জানেন? নবু পড়তো 'B' সেকশনে। ডিকটেশনের মাষ্টার-মশাই টিফিনের আগের ঘণ্টায় 'A' সেকশনে যে ডিক-টেশনটা দিয়ে আসতেন—টিফিনের পরের ঘণ্টায় ঠিক সেই ডিকটেশনটাই 'B' সেকশনে দিতেন। নবু করতো কি—টিফিনের সময় 'A' সেকশনে দেওয়া ডিকটেশনটা হুবহু লিখে নিয়ে আসতো এবং পরের ঘণ্টায় সেইটেই মাষ্টারমশাইকে দেখাতো। এখন এ ব্যাপারটা কি ভাবে মাষ্টারমশাই জানতে পেরেছেন। একদিন ইচ্ছা করেই যেন অন্য একটা ডিকটেশন 'B' সেকশনে লিখতে দিয়েছেন। ব্যস্ নবুর তো অবস্থা শোচনীয় এবং তারপরের ঘটনা তো আগেই শুনলেন।

একদিন পাশের ক্লাসে একটা পাখী মরে থাকাতে তাদের ছুটি হয়ে গেল। নবু ভাবলো বেশ মজা তো! একটা পাখী মরেছে বলে ছুটি হয়ে গেল! ক্লাসের বন্ধুরা ধরলো নবুকে একটা কিছু ব্যবস্থা করতেই হবে। নবু আশ্বাস দিয়ে বললো 'ভয় নেই তোদের।—ওদের একদিন ছুটি হয়েছে—তোদের যদি তিনদিন ছুটি দিতে না পেরেছি তো আমাকে নবু বলেই ডাকিস্ না—নবুদা বলে ডাকিস।'

'নবুদা বলে ডাকবো কিরে? ছুটি দিতে পারবি না? '—আবার নবুদা বলে ডাকবো?' প্রশ্ন করলো সকলে। 'ও Sorry, ভুল হয়ে গেছে ভাই। তাড়াতাড়ি মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে। যা খুসী ডাকিস। এখন সব যা, আমাকে ভাবতে দে, কী করা যায়।'

পরদিন ক্লাস আরম্ভ হবার আগে এসে বাইরের পাইপ বেয়ে ওপরে উঠে (আগের দিনই জানালার শিক ভেঙে রাস্তা করে রেখে গিয়েছিল) একটা জানালা দিয়ে গলে ক্লাসের ভেতরে ঢুকে পাখার (তখন হাত টানা পাখা ছিল) ঝালরের ভেতরে একটা মরা ইঁদুর লাগিয়ে রেখে বাড়ীতে চলে এল। কাউকে কিছু বললো না। ঠিক সময়মত ক্লাস
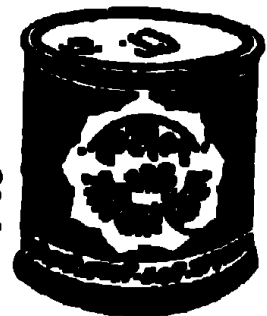
বসলো। প্রথম দিন কিছু হ'ল না—অবিশ্যি অল্প অল্প গন্ধ পাওয়া গেল। দ্বিতীয় দিন ক্লাসে এসে যে পাখা টানে নবু তাকে বলতে লাগলো—'এই জোরে টান। ভীষণ গরম লাগছে। এত গরমে কি ক্লাসে বসা যায়—না পড়াশুনা করা যায়? পাখার জন্য স্কুল পয়সা দেয় না? বিনে পয়সায় হাওয়া খাওয়াচ্ছিস্ না কি? জোরে টান।' ব্যস্, যত পাখা টানতে লাগলো তত গন্ধ বেরোতে লাগলো। হৈ হৈ পড়ে গেল ক্লাসের মধ্যে। মাষ্টারমশাই সকলকে বললেন—'দ্যাখ্ তো কোথা থেকে গন্ধ আসছে।' সবাই দেখতে আরম্ভ করলো আর নবুর দিকে আড়চোখে চাইতে লাগলো। নবুও চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতে লাগলো—'শীগ্‌গির দেখ্ তো সবাই, কোথা থেকে গন্ধ আসছে? এত গন্ধে কি ক্লাস করা যায়?' এই বলে নিজেই বেঞ্চির ওপর দাঁড়িয়ে পাখার ওপর ইঁদুরটা দেখে চেঁচিয়ে উঠল—'এই দেখুন স্যার। তাই তো ভাবি গন্ধ আসছে কোথা থেকে!'

'হ্যাঁরে নবু, ইঁদুরটা পাখার ওপরে গিয়ে মরলো কি করে রে'? গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করলেন মাষ্টারমশাই।

'তাই তো আমিও ভাবছি স্যার। ইঁদুরটা শেষে পাখার ওপরে গিয়ে মরলো কি করে!' পাখার দিকে তাকিয়ে চিন্তিতভাবে উত্তর দিল নবু।

'ভেবে কোন লাভ নেই। ছুটি তোমাদের হবে না। বাইরে আম-গাছতলায় চলো, ওখানে ক্লাস হবে। ঘুঘু দেখেছো............।'

'ফাঁদ দেখো নি।'—মাষ্টার-মশায়ের সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে বললো নবু।

বাইরে গিয়ে সেদিনকার মত তো ক্লাস হ'ল। পরের দিনও বাইরেই ক্লাস বসলো, কারণ মরা ইঁদুরটা তখনও ক্লাস থেকে পরিষ্কার করা হয় নি। ক্লাস তো বসলো। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই চারিদিক থেকে ইট-পাটকেল পড়তে সুরু হ'ল। নবু মনে মনে হাসতে লাগলো আর বলতে লাগলো—কেমন ফাঁদ দেখেছো? এরপর তো বুঝতেই পারছেন। নবুরই জয় হয়েছিল সেদিন।

এর কিছুদিন পরে একদিন ওপরে খেলা করতে করতে নবুর মাথায় এক কুবুদ্ধি এল। ক্লাসে একজন দাম্ভিক ধনীপুত্র ছিল। তাকে কিছু শিক্ষা দেবার ইচ্ছা অনেক-দিন থেকেই নবুর মনের মধ্যে ছিল। সেদিন তা কাজে লাগাবে ঠিক করলো। সকলে দোতলা থেকে লাফ দিয়ে একতলায় পড়তে লাগলো। নবু গিয়ে ধনীপুত্রটিকে বললো—'তুমিও ভাই একবার লাফ মারো না। এ আর কি? তোমার চাইতে ছোট ছোট ছেলেরাও লাফ দিচ্ছে দেখছো না?' ধনীপুত্রও ভাবলো, সত্যিই তো, এ আর কি ব্যাপার? ব্যস্, সেই না লাফ দেওয়া অমনি হাতের অবস্থা শোচনীয়। স্কুলে হৈ-চৈ পড়ে গেল। ধনীপুত্রের হাত ভেঙ্গেছে—সে এক ভীষণ ব্যাপার! তার কথামতো নবুকে খোঁজ করা হ'ল। তাকে আর কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। সে তখন শান্ত ছেলের মত ক্লাসে চুপ করে বসে আছে। হেডমাষ্টারমশাই ডেকে পাঠাতেই আশ্চর্য্য হয়ে প্রশ্ন করল—(যেন কিছুই জানে না) 'কী স্যার? আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন?'

'কেন ডেকে পাঠিয়েছি জান না? এর হাত ভেঙ্গেছে কি করে?'

'ওর হাত কি স্যার আমি ভেঙ্গেছি?'

'হ্যাঁ, তুমিই ভেঙ্গেছো। ওকে লাফ দিতে বলেছিলে কেন?'

'আমি কি স্যার ওকে জোর করে দোতলা থেকে নীচে ফেলে দিয়েছিলুম? বলুক ও। আমরা সবাই তো লাফ দিয়েছিলুম। আমাদের কার হাত ভেঙ্গেছে? ওর ঐ ননীর শরীর নিয়ে লাফ দেবার কি দরকার ছিল? ওকে বলেওছিলুম যে ভয় করে তো লাফ দিস্ না—আমার কথা ত শুনলই না, আবার বলে কিনা, লাফ দেবই। কি সাহস দেখুন তো স্যার?'

'চুপ করো—পাজি, বদমাইস কোথাকার। কালকে পাঁচ টাকা ফাইন এনে দেবে। যাও ক্লাসে যাও।' ধমক খাবার আগেই নবু ক্লাসে পৌঁছে গেছে।

পরদিন চারতলার ওপরে ভীষণ ভীড় হয়েছে। কি যেন একটা ব্যাপার ঘটেছে। সবাই নবুকে ধরে টানাটানি করছে, সে কিছুতেই শুনতে চাইছে না। কি ব্যাপার? নবু চারতলা থেকে লাফ দেবে। কী সর্ব্বনাশ! কেন?

শোনা যাক নবু কি বলে—'এ জীবন আমি আর রাখবো না। যত দোষ নন্দ ঘোষ? আমি আজ এই চারতলা থেকে লাফ দিয়ে আত্মহত্যা করবোই। শীগ্‌গির কেউ হেড মাষ্টারমশাইকে ডেকে আনো। আমার ফাইন মকুব করতে বলো—তা নইলে আজ আমি মরবোই। আমার জন্য কেউ দুঃখ করিস্ না।'—বলে বন্ধুদের (যারা তার কথামতো তাকে ধরে রেখেছিল) আস্তে আস্তে বললো—'এই জোরে ধরে রাখ্, যেন সত্যি সত্যি 'পড়ে না যাই।

এমন সময় হেড-মাষ্টারমশাই এসে গেলেন তারপর বুঝতেই তো পারছেন—সেদিনও নবুরই জয় হয়েছিল।

অমর মল্লিক

আজ থেকে বহু বছর আগে বাংলা ১৩০৬ সালে কলকাতায় এঁর জন্ম হয়। প্রথম জীবনে ভাবতেও পারেন নি যে তিনি কোনদিন চলচ্চিত্র-জগতে প্রবেশ করবেন—অবিশ্যি অভিনয় করবার বা করাবার একটা স্বাভাবিক ক্ষমতা তাঁর মধ্যে ছিল ছোটবেলা থেকেই। প্রথমে যথারীতি লেখাপড়া শেখার পালা শেষ করেন—তারপর চাকুরী গ্রহণ করেন। Civil Engineering Office-এ একটা চাকুরী পান, তারপর শ্রীযুত বীরেন্দ্রনাথ সরকারের অফিসে প্রবেশ করেন। এইভাবে কিছুদিন চলতে থাকে। এরপরই আসে তাঁর জীবনে স্মরণীয় পরিবর্ত্তন। চলচ্চিত্র-জগতে প্রবেশ লাভ। চলচ্চিত্রে যোগদানের পূর্ব্বে অবিশ্যি আরও কয়েকটা জায়গায় চাকুরী করেন। এর মাঝে একদিন স্বর্গতঃ হরেন ঘোষ পরিচালিত 'বুকের বোঝা' নির্ব্বাক ছায়াছবিটি তিনি দেখে আসেন এবং এখান থেকেই তিনি চলচ্চিত্রে যোগদানের প্রেরণা পান।

বীরেন্দ্রনাথ সরকার, তাঁর সহপাঠী স্বর্গতঃ হরেন ঘোষ ও পি, এন রায়ের উৎসাহে International Filmcraft নামে এক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। শ্রীযুক্ত বীরেন সরকারের পরামর্শক্রমে অমরবাবু এই প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেন। তাঁর চলচ্চিত্র-জগতের সঙ্গে পরিচিত হবার সেই হ'ল সূত্রপাত।

নির্ব্বাক ছবির যুগ থেকেই তিনি চিত্রজগতের সঙ্গে জড়িত। সেইসময় তিনি অভিনয় করেন 'চোরকাঁটা', 'চাষার মেয়ে', 'সন্দিগ্ধা' ও আরও কয়েকটি চিত্রে। তারপর সবাকচিত্রের যুগে যে সকল চিত্রে অভিনয় করেছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল—দেনাপাওনা, মহব্বৎ-কা-আঁসু (হিন্দী), পুনর্জ্জন্ম, চিরকুমার সভা, ইহুদী-কী-লেড়কী (হিন্দী), দেবদাস, গৃহদাহ, মুক্তি, ভাগ্যচক্র, দিদি, জীবন-মরণ, মিলিওনেয়ার (হিন্দী), পরাজয়, ডাক্তার, চন্দ্রশেখর, ভাবীকাল, নতুন খবর প্রভৃতি। এর মধ্যে অধিকাংশ চিত্রই নিউ থিয়েটার্সের। নিউ থিয়েটার্সেই অমরবাবুর চিত্রজগতের সবচেয়ে বেশী দান। এখানে Production-এর কাজ নিয়েও তিনি ব্যস্ত থাকতেন। অন্যান্য কাজেও তিনি সাহায্য করতেন। এক কথায় নিউ

তিন সঙ্গী: অমর মল্লিক, জহু বড়াল ও নীতিন বসু

থিয়েটার্স' ছিল অমরবাবুর প্রাণ। পরে অবিশ্যি সেখান থেকে চলে এসে তিনি তাঁর নিজস্ব প্রতিষ্ঠান গঠন করেন—তার নাম 'অমর মল্লিক প্রোডাকসন্স'। এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম চিত্র 'স্বামিজী' তিনিই পরিচালনা করেন। এর আগে নিউ থিয়েটার্সে থাকাকালীন তিনি নিউ থিয়েটার্সেরই দুটি চিত্র পরিচালনা করেন। এই দু'টি চিত্রই তাঁর পরিচালনার খ্যাতিকে বাড়িয়ে তোলে। এই চিত্র দু'টি হচ্ছে 'বড়দিদি' ও 'বিরাজ-বৌ'। এ ছাড়াও তিনি সে সময় আর একখানি চিত্র পরিচালনা করেন—'অভিনেত্রী'। সম্প্রতি তিনি 'দুর্গেশনন্দিনী' পরিচালনা করেন।

'দিদি' চিত্রে দীননাথের ভূমিকায় অমর মল্লিক

এইভাবে অভিনয় ও পরিচালনার জগতে তিনি অপ্রতিহত গতিতে তাঁর অভিযান চালিয়ে আসছেন।

নতুন শিল্পী সৃষ্টি তাঁর এক অপূর্ব্ব ও দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা। বহু শিল্পীকে তিনি এই চিত্রজগতে সুপরিচিত করেছেন। আজকের অতি পুরাতন এমন অনেক শিল্পী আছেন যাঁরা সেদিন একেবারে নতুন হয়েই তাঁর কাছে এসেছিলেন; তাঁর সহযোগিতা ও সাহায্য কামনা করেছিলেন। এর মধ্যে ভারতী দেবীর নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। ভারতী দেবীর আজকের পরিচয়ের পেছনে ছিল অমরবাবুর ঐকান্তিকতা ও আপ্রাণ চেষ্টা যা চিরদিন তাঁর জীবনে লেখা থাকবে।

অতীতের নতুন স্বপ্ন দিয়ে গড়ে তুলেছেন বর্ত্তমান। এই বর্ত্তমানের নতুন স্বপ্ন হবে তাঁর ভবিষ্যতের পাথেয়।

এবার চলুন পুরোনো দিনের ষ্টুডিও-ফ্লোরগুলি থেকে একবার ঘুরে আসি।

প্রথমে চলুন 'মীরাবাঈ'-এর ফ্লোরেই যাওয়া যাক অবিশ্যি যে ঘটনাটা আমরা এখন দেখবো এটা ঘটেছিল

ফ্লোরের বাইরের বাগানে বিশেষভাবে সাজানো একটা দৃশ্যপটে। 'অভিরাম সিংহ' একটা কথা বলে খুব বীরত্বের সঙ্গে ঘোড়ায় উঠে অন্যত্র চলে যাবেন। ব্যস্, শুধু এই দৃশ্যটুকুই তোলা হবে। বুঝতেই তো পারছেন, অভিরাম সিংহ হচ্ছেন আমাদের অমরবাবু। একেই দেহটা একটু স্থূল—তার ওপর তিনি ঘোড়ায় চড়ে যাওয়া তো দূরের কথা কারোর সাহায্যেও তিনি কোনদিন ঘোড়ায় উঠে বসেন নি। এতে কার না করুণা হয় কিন্তু পরিচালক দেবকী-বাবুর এতটুকুও করুণা হ'ল না। আর হবেই বা কি করে? অমরবাবু ঘোড়ায় চড়তে পারেন না বলে তো আর অভিরাম সিংহ বন-জঙ্গলের মধ্য দিয়ে পায়ে হেঁটে যেতে পারেন না। তা কি করে হয়? তাই

মিষ্টার বেগ, পি এন্ রায় ও অমর মল্লিক

শেষ পর্য্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেই অন্ততঃ অভিরাম সিংহের খাতিরেও অমরবাবুকে ঘোড়ায় চড়তে হ'ল।

সব ঠিকঠাক। ক্যামেরা প্রস্তুত। দেবকীবাবু হাঁক দিলেন। ক্যামেরা চললো। অমরবাবু খুব তোড়-

জোড করে নিজের বক্তব্যটুকু বলেই যেই ঘোড়ায় চড়তে যাবেন অমনি ধুলোয় গড়াগড়ি। অবশ্য তাড়াতাড়িতে যাতে ভর দিয়ে ঘোড়ায় উঠবেন সেটা হাত দিয়েই খুঁজতে আরম্ভ করলেন। 'কাট্'। ছুটে এসে প্রশ্ন করলেন দেবকীবাবু 'কী ব্যাপার! কী খুঁজছেন?'

'কিসের ওপর ভর দিয়ে ঘোড়ায় চড়বো—সেইটেই খুঁজছি' লজ্জিত হয়ে উত্তর দিলেন অভিরাম সিংহ।

'তা সেটা ক্যামেরা চলবার পর খুঁজতে আরম্ভ করলেন? আগে খুঁজে রাখতে পারেন নি?'

'কী মুস্কিল! ঘোড়ায় চড়বো ক্যামেরা চলবার পর—আর খুঁজে রাখবো কি ক্যামেরা থেমে থাকার সময়?' —বললেন অমরবাবু।

যাই হোক দেবকীবাবু একটু মুচকি হেসে আবার চিত্রগ্রহণ করতে সুরু করলেন। নীতিনবাবু ক্যামেরা চালালেন, দেবকীবাবু হাঁক দিলেন—'ষ্টার্ট'। এবার অমরবাবু কথা ক'টা কোন রকমে বলে এক লাফে বীরের মত ঘোড়ায় উঠেই ঘোড়া চালিয়ে দিলেন— কিন্তু ঘোড়া আর চলে না। 'একি! ঘোড়ার মাথা কোথায় গেল? এ আমি কিসে চেপেছি? কি সর্ব্বনাশ! ঘোড়ার মাথা ল্যাজ হয়ে গেল কি করে?' এর মুণ্ডু কে নিয়ে গেল? ভীত হয়ে আপ্রাণ চীৎকার করতে লাগলেন অভিরাম সিংহ। ঘোড়াটাও তখন লাফাতে সুরু করেছে। ওদিকে ক্যামেরা থামিয়ে নীতিনবাবু ও দেবকীবাবু হাসতে হাসতে ধুলোয় গড়াগড়ি খাচ্ছেন।

তারপর কোনরকমে আরও কয়েকজন এসে ধরে অভিরাম সিংহকে নামালেন। নেমে অমর-বাবু রাগে ও লজ্জায় গুম্ হয়ে বসে রইলেন। এখন ব্যাপারটা কি হয়েছিল বুঝলেন? একেই অভিরাম সিংহকে খুব বীরত্বের সঙ্গে ঘোড়ায় চড়তে বলা হয়েছে. তার ওপর আবার আগে কয়েকবার পড়ে গেছেন। তাই তখন বীরত্বের সঙ্গে উঠতে গিয়ে ভুলে প্রথমে বাঁ পায়ের পরিবর্ত্তে ডান পা দেওয়াতেই এই বিভ্রাট।
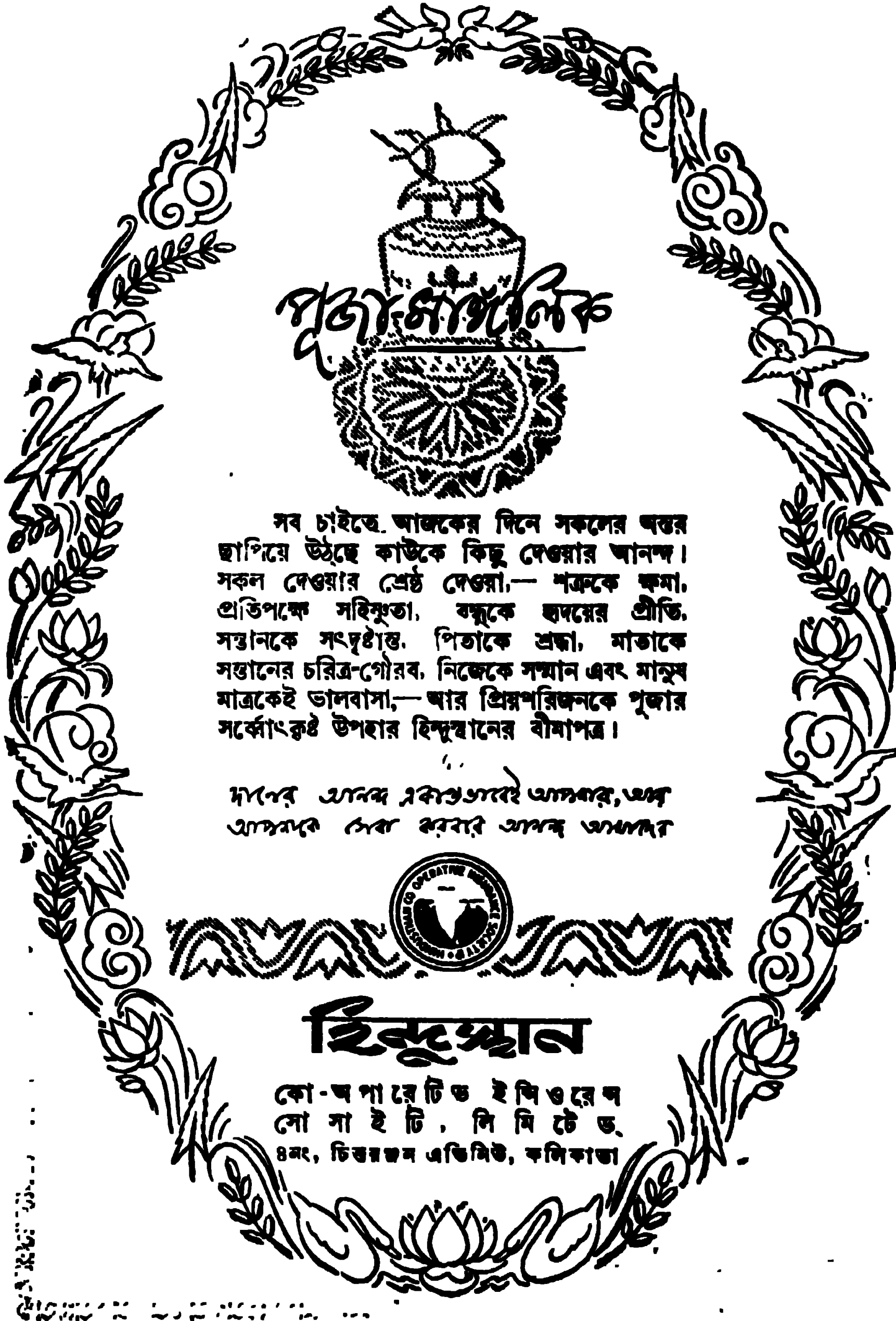
এবার চলুন 'দিদি'র ফ্লোরে যাওয়া যাক। 'দিদি' ছবির যে অংশটায় স্বর্গতঃ সায়গল অমরবাবুর গালে একটা চড় মেরেছিলেন—সেই অংশটুকুর কথাই আমি এখন বলবো। 'দীননাথ'রূপী অমরবাবুর সঙ্গে সায়গলের অনেকদিনের বন্ধুত্ব ছিল। অবিশ্যি 'দিদি'র পক্ষ সমর্থন করেন সায়গল কিন্তু ধর্ম্মঘটীদের পক্ষ সমর্থন করেন অমরবাবু। একদিন দীননাথ সায়গলের কাছে এসে ধর্ম্মঘটীদের পক্ষ নিয়ে কিছু বলতে গেলে সায়গল খুব জোরে দীননাথের গালে একটা চড় মারবেন এবং তারপর দীননাথ কিছু বলে শেষে দুঃখের সঙ্গে 'প্রকাশ, তুই আমায় মারলি?' বলে চলে যাবেন। ব্যস্, এই পর্য্যন্ত সেদিন চিত্রগ্রহণ করা হবে। সব ঠিক হ'ল। সংলাপ মুখস্থ করলেন দুজনে। সায়গলকে একটু আস্তে চড় মারতে অনুরোধ করলেন অমরবাবু। ক্যামেরা চললো—অভিনয় হতে লাগলো। এমন ব্যাপার হয়েছে কি—প্রথম দিকে ঠিক অভিনয় হ'ল কিন্তু সায়গল এমন বোম্বাই চড় একখানা দীননাথের গালে বসালেন যে অমরবাবু চোখে সরষে ফুল দেখতে লাগলেন। যখন চোখের সামনে থেকে সরষে ফুল সরে গেল—তখন বাকী সংলাপগুলিও তাঁর মন থেকে সরে গেছে। শুধু মনে ছিল—'তুই আমায় মারলি',—বলে ফেললেন কথাটা। অবিশ্যি কথার ভাবটা হ'ল এমন যে এত করে তোকে জোরে মারতে বারণ করলাম—তুই ঠিক তাই করলি? অমরবাবুর করুণ ভাব দেখে সায়গলের হাসি পেয়ে গিয়েছিল কিন্তু তা কোনরকমে সংবরণ করে নতুন সংলাপ দু-একটা বসিয়ে এমনভাবে দৃশ্যটা চালিয়ে নিলেন যে—তা শুধু সায়গলের মতো প্রথম শ্রেণীর অভিনেতার পক্ষেই সম্ভব। যাক, তারপর ক্যামেরা থামলো। অমরবাবু নিজের ভুলটা শুধরে নেবার জন্য পরিচালক নীতিনবাবুকে দৃশ্যটা 'রি-টেক' করবার জন্য অনুরোধ করলেন কিন্তু নীতিনবাবু ঐ দৃশ্যটাই রাখলেন। কিছুতেই 'রি-টেক' করলেন না। অমরবাবু তো তখন কিছুই বুঝলেন না। কিন্তু চিত্রটি মুক্তিলাভ

করার পর তিনি বুঝেছিলেন কেন নীতিনবাবু ঐ দৃশ্য-টাই রেখেছিলেন। শুধু অমরবাবু কেন সেদিনকার দর্শক-সাধারণও একবাক্যে স্বীকার করেছিলেন যে এই করুণ অভিব্যক্তিপূর্ণ সংলাপ 'তুই আমায় মারলি'—চিত্রটির কতবড় অমূল্য সম্পদ। এর জন্য সকলের সায়গলের কাছেই কৃতজ্ঞ থাকা উচিত—কারণ তাঁর ঐ চোখে সরষে ফুল দেখানো রামচড় দীননাথের গালে না বসলে 'তুই আমায় মারলি' স্মরণীয় হ'ত না।

চলুন, এখন 'দেবদাসে'র ফ্লোর থেকে ঘুরে আসি। 'চুনীলাল'রূপী অমরবাবু, দেবদাস ও চন্দ্রমুখীকে প্রথম পরিচয় করিয়ে দেবেন। এতদিন উভয়ে উভয়ের নিকট অপরিচিত ছিলেন। এই পরিচয়ের জন্য 'চুনীলালে'র পূর্বনির্দ্দিষ্ট সংলাপ চিত্রটির দৈর্ঘ্য কিছুটা বাড়িয়ে দিচ্ছে বলে পরিচালক বড়ুয়াসাহেব অমরবাবুকে অন্য কোন পন্থা অবলম্বন করে উভয়কে পরিচিত করে দিতে বললেন। অমরবাবুর মাথায় তো বজ্রপাত হ'ল। 'সংলাপ না বলে আবার কি করে পরিচয় করানো যায়? তাহলে

মিউ থিয়েটার্সের 'গৃহদাহ' ছবিতে কেদারবাবুর রূপসজ্জায় অমর মল্লিক

নিউ থিয়েটার্সের অভ্যুদয় ও শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে যাঁরা অন্তরঙ্গভাবে জড়িত ছিলেন : অমর মল্লিক ও যতীন্দ্রনাথ মিত্র

তো চুপচাপ দুজনের দুটো হাত মিলিয়ে দিতে হয়। তাতে কথাও বলতে হয় না আর চিত্রের দৈর্ঘ্যও বেড়ে যায় না। কিন্তু তা কি করে হয়? একজন বারবনিতার সঙ্গে এক ভদ্রলোকের প্রথম আলাপেই হাত মিলিয়ে দেওয়া যায় কি করে? না, না,—সেটা অত্যন্ত অভদ্রও হয়ে যায়।' শেষে অনেক চিন্তা করে অমরবাবু বড়ুয়া-সাহেবকে বললেন, 'দেখুন ঐ পরিচয়টা আপনারা নিজেরাই করে নিন। আমাকে আবার ওর মধ্যে টানছেন কেন? একেবারে কিছু না বলে, ভাবে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেব—তা তো আমি ভেবে পাচ্ছি না। তার চাইতে ওটা আপনারা নিজেরাই সেরে নিন।' বড়ুয়াসাহেব নাছোড়বান্দা—'তা হয় নাকি? যাহোক আপনাকেই একটা কিছু করতে হবে।'

শেষে বাধ্য হয়ে অমরবাবু দুজনের দিকে তাকিয়ে নিজের চোখ দুটোকে ঘুরিয়ে এমন এক উদ্দেশ্যপূর্ণ হাসি হাসলেন যে তাতেই দুজনের পরিচয় হয়ে গেল ভাল-ভাবেই—আর এই দৃশ্যের দৈর্ঘ্যের সমস্যার সমাধানও হয়ে গেল অতি সহজেই।

এবার আসুন 'চন্দ্রশেখরে'র ফ্লোরে একবার যাই। 'চন্দ্রশেখরে' 'রামচরণে'র ভূমিকায় অভিনয় করবার

...য একদিন বাড়ীতে কোন কারণে তাঁর ডান হাতে ...টা ভীষণ আঘাত লাগে। সেই আঘাতপ্রাপ্ত হাত ...য়েই 'চন্দ্রশেখর' ছবিতে অভিনয় করেন। প্রথম কিছুদিন ...তে ব্যাণ্ডেজ করেই অভিনয় করতে হয়। তাই তাঁর ...ঘাতপ্রাপ্ত হাতের সঙ্গে মিল রেখে কোন এক দৃশ্যে রাম-চরণের একটা অতিরিক্ত সংলাপ বসিয়ে দেবার পরিকল্পনা ...কীবাবুর মাথায় এল। একটা দৃশ্যে তাঁর আহত একটা হাত নিয়ে সেপাইকে উদ্দেশ্য করে বলবেন যে "সাবাস ফিরিঙ্গি সেপাই, বন্দুক চালাতেও শিখিস্‌নি? বন্দুক চালাতেই জানিস না—তবে যুদ্ধ করতে এসেছিস কোন্ সাহসে? মারতে গেলি কোথায়—আর মারলি কোথায়? ...ন পর্য্যন্ত মাত্র হাতটাই জখম করলি? এই তোদের ...রত্ব?" দৃশ্যটা তোলাও হ'ল—কিন্তু কোন কারণে ...ষে এই দৃশ্যটা বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

ও, হোঃ! একেবারে ভুলেই গিয়েছিলাম। আমরা অনেকদূর এগিয়ে এসেছি। পেছনে আর একটা ভাল ফ্লোর ছেড়ে এসেছি। আর একবার কিছুক্ষণের জন্য একটু পিছিয়ে চলুন। ফ্লোরটা হচ্ছে নিউ থিয়েটার্সের, চিত্রের নাম 'মিলিওনেয়ার'। ছবির গল্পে একটা জায়গায় দেখানো হবে যে একটা চিত্র প্রতিষ্ঠান তাদের একটা চিত্রগ্রহণের কাজ চালাচ্ছেন পুরোদমে। এই চিত্র প্রতিষ্ঠানের ক্যামেরাম্যান হচ্ছেন অমরবাবু, তাঁর একটি চোখ কাণা। মাত্র একটি চোখ দিয়ে তিনি সব কিছু দেখেন। আর ছবির গল্পে সাউণ্ড রেকর্ডিষ্ট হচ্ছেন স্বর্গতঃ ...দাস বন্দ্যোপাধ্যায়, তিনি আবার ...নে কিছুই শুনতে পান না। ...দিনকার দৃশ্যে চিত্রগ্রহণ করা হবে ...জলক্ষ্মীর (বড়), তিনি হচ্ছেন উক্ত ...ত্রের উপ-নায়িকা। এখন এই ছবির ...য় রাজলক্ষ্মীর চিত্রগ্রহণ করতে প্রস্তুত ...চ্ছেন এক চোখ কাণা ক্যামেরা-...ন অমরবাবু: সাউণ্ড নেবার জন্য ...রী হয়েছেন সাউণ্ড রেকর্ডিষ্ট ...নে-কালা দুর্গাদাসবাবু। আর এই সমস্ত দৃশ্যটার চিত্রগ্রহণ করতে প্রস্তুত হয়েছেন 'মিলিওনেয়ার' চিত্রের পরিচালক হেমচন্দ্র স্বয়ং। সব ঠিক। রাজলক্ষ্মী ও অমরবাবুর সংলাপগুলি আর একবার ঠিক করে দিলেন হেমবাবু। রাজলক্ষ্মী তাঁদের ক্যামেরাম্যান অমরবাবুকে বলবেন যে 'হামকো ভি জ্যারা দেখিয়ে গা'। নায়িকার ছবিই শুধু ভাল করে তোলা হয়, এই তাঁর অভিযোগ। এক চোখ-কানা ক্যামেরাম্যান তখন তাঁর একটা চোখ দেখিয়ে বলবেন, 'হাম, সবকো এক নজরসে দেখতা হায়।'

রাজলক্ষ্মীর সংলাপ ঠিক তৈরী হয়ে গেছে। কিন্তু মুস্কিল হয়েছে ক্যামেরাম্যান অমরবাবুকে নিয়ে। তিনি কিছুতেই 'নজর' কথাটার উচ্চারণ ঠিক করে বলতে পারছেন না। শেষে হেমবাবু বললেন যে এইভাবে বলুন, 'নজর, নজর, বলুন, নজর, Z, জ, নজর।' এই 'জ' য়ের উচ্চারণ নিয়েই হয়েছে যত মুস্কিল। শেষে বহুবার বলতে বলতে তিনি মুখস্থই করে ফেললেন সবটা। সবাই প্রস্তুত, সব ঠিক। হেমবাবু হাঁক দিলেন; ক্যামেরা চললো। অভিনয় সুরু হোলো। 'হামকো ভি জ্যারা দেখিয়ে গা।'

'হাম, সবকো এক নজর সে দেখতা হায়; নজর, নজর বলুন Z জ নজর।'

কাট, কাট। হেমবাবুর চীৎকারে ক্যামেরা থামলো। ফ্লোর শুদ্ধ সকলের হাসতে হাসতে হার্টফেল হবার উপক্রম। অমরবাবু ব্যাপারটা প্রথমে বুঝতে না পারলেও

পরে অবিশ্যি বুঝতে পারবেন। ব্যাপারটা কি হয়েছিল আপনারা বুঝতে পারলেন? উচ্চারণ ঠিক করাবার জন্য চিত্রগ্রহণের আগে যে কথাগুলো তাঁকে বলা হয়েছিল—মুখস্থ করতে করতে চিত্রগ্রহণের সময় তার সবটুকুই বেমালুম বলে দিয়ে গেলেন। 'জ' উচ্চারণের অভূতপূর্ব পরিণতি।

মতী প্রভা

চিত্র ও নাট্যজগতের একচ্ছত্র সম্রাজ্ঞী প্রভা দেবী ১৯০৭ সালের ১২ই আগষ্ট কলকাতায় জন্ম গ্রহণ করেন। এই অপ্রতিদ্বন্দ্বী শিল্পীর শিল্পসাধনা সুরু হয় তাঁর ন' বছর বয়স থেকে। ছোটবেলা থেকেই তিনি নাচে ও গানে বেশ পটু হয়ে ওঠেন, কিন্তু তা বলে, তিনি যে কোনদিন অভিনয়জগতে প্রবেশ করবেন—সেদিন তা ভাবতেও পারেন নি। মাত্র ন' বছর বয়সের সময় তাঁর ডাক এল অভিনেত্রী হবার জন্যে, সাড়াও দিলেন তিনি। যোগ দিলেন নাট্যজগতে, সেদিনের শিল্পীদের মধ্যে শ্রীমতী প্রভা অন্যতমা যিনি সেদিনের নাট্য ও চিত্রজগতের কথা বেশ ভালভাবেই শোনাতে পারেন। তাঁর জীবনের ঘটনা আরও স্মরণীয় হয়ে আছে শুধু এইজন্যই যে এমন বহু স্মরণীয় শিল্পীর সংস্পর্শে সেদিন তিনি এসেছিলেন যাদের মধ্যে অনেকেই শুধু নাট্য বা চিত্রজগৎ কেন এই সংসারজগৎ থেকেও বিদায় নিয়ে চলে গেছেন—আবার এমন অনেকে আছেন যাঁরা সংসারজগৎ থেকে বিদায় না নিলেও নাট্য ও চিত্রজগৎ থেকে বিদায় নিয়েছেন বা বিদায় না নিলেও বিস্মৃতপ্রায় শিল্পীদের পর্য্যায়ে পড়ে রয়েছেন। এ ছাড়া তখনকার দিনের নাট্য ও চিত্রজগতের বহু পুরোনো দৃশ্য তাঁর জীবন সমুদ্রের ঘটনাপ্রবাহে ভেসে ওঠে। একে একে সে সব দৃশ্য আপনাদের সামনে এনে হাজির করছি। তাঁর শিল্পীজীবনের প্রথম সূত্রপাত নাট্যজগৎ থেকেই। তাই প্রথমেই চলুন তাঁর সঙ্গে তাঁর পুরোনো দিনের নাট্যজগতের মধ্যে প্রবেশ করা যাক।

১৯১৩-১৪ সালের কথা—সেই তাঁর প্রথম নাট্যজগতে প্রবেশ। এখন যেখানে বিডন ষ্ট্রীট পোষ্টঅফিস রয়েছে, —সেখানে তখন ছিল একটি নাট্যালয়, নাম 'থেসপিয়েন থিয়েটার'। স্বর্গীয়া তিনকড়িসুন্দরীর প্রচেষ্টায় সেই থেসপিয়েন থিয়েটারেই তিনি প্রথম মঞ্চে আবির্ভূতা হন। তিনি যখন যোগ দেন তখন সেখানে হরিসাধন মুখোপাধ্যায় রচিত 'নূরমহল' নাটকটির অভিনয় চলছিল। থেসপিয়েন থিয়েটারের তৎকালীন ম্যানেজার স্বর্গতঃ ক্ষেত্রমোহন মিত্র ছিলেন এই নাটকের পরিচালক। আজকের দিনের প্রতিভাময়ী প্রভা দেবী কিন্তু সেদিন নর্ত্তকী ও গায়িকা হিসাবেই প্রথম নাট্যজগতে প্রবেশ করেন। এখানে বলে রাখি প্রভা দেবী খুব ভাল গাইতে পারতেন—নাচেও তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিল না। তিনি এই 'নূরমহল' নাটকে অংশ গ্রহণ করেন। তাঁর সময়ে সেখানে নগেন্দ্রবালা, পান্নাসুন্দরী নরীসুন্দরী, [illegible]বালা, হরিমতী, মণীন্দ্রনাথ (মণ্টুবাবু), ধীরেন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি শিল্পীরা ছিলেন। এর মধ্যে সবচেয়ে স্মরণীয় ঘটনা হ'ল যে, স্বর্গতঃ যোগেশ চৌধুরী মহাশয়ও সেই সময় সেই থিয়েটারে যোগ দিয়ে জীবনে প্রথম নাট্যজগতে প্রবেশ করেন। জীবনের প্রথম নাট্যাভিনয়ে অংশ গ্রহণ ক'রে প্রভা দেবী মাত্র ছ'টাকা পারিশ্রমিক পেয়েছিলেন। এইভাবে প্রায় বছর দেড়েক সেখানে ছিলেন।

নাট্যজগতে প্রবেশ করবার অপরাধে তাঁকে লেখাপড়া শেখার বাসনা ত্যাগ করতে হয়েছিল। বাধ্য হলেন বিদ্যালয় ত্যাগ করতে। অধ্যয়ন সুরু হ'ল গৃহাভ্যন্তরে। ৺হরিহর মিত্র নামে এক ভদ্রলোকের সাহায্যে তিনি বাড়ীতে পড়াশোনা করতে আরম্ভ করেন। পড়াশোনার মধ্যে তাঁকে বিশেষভাবে পড়তে হ'ত রামায়ণ, মহাভারত ও দৈনিক সংবাদপত্র। শুধু পড়লেই চলতো না, সঙ্গে

সঙ্গে তার অর্থও বুঝে নিতে হ'ত। এইভাবে পড়তে পড়তে কয়েক বছর পরে তিনি অর্থসহ রামায়ণ মহাভারত প্রায় মুখস্থ করে ফেলেন।

যাই হোক, যা বলছিলাম। প্রায় বছর দেড়েক অভিনয় করবার পর তিনি যান মিনার্ভা থিয়েটারে। ১৯১৫ সালে বংশীবাদক তমুবাবু তাঁকে মিনার্ভায় নিয়ে যান। পারিশ্রমিক ঠিক হয় মাসিক ১৫৲ টাকা। মিনার্ভায় তখন 'সিংহল বিজয়' অভিনীত হচ্ছিল। তাতে অংশ গ্রহণ করলেন এবং পর পর আরও কয়েকটি নাটকে অংশ নিলেন। প্রায় বছর দেড়েক পরে মিনার্ভা মঞ্চও ছেড়ে দিলেন। এখানে থাকতে থাকতে একবার তিনি খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং শুধু সেই কারণেই মিনার্ভা থিয়েটার ত্যাগ করেন।

স্বর্গতঃ অপরেশবাবু কোন কারণে মিনার্ভার সঙ্গে ঝগড়া করে ১৯১৮ সালে ষ্টারে যোগদান করেন। ষ্টারের তৎকালীন মালিক ছিলেন গিরি মল্লিক। প্রভা দেবীও যোগ দেন ষ্টারে। অপরেশবাবু ষ্টারে এসে 'কিন্নরী' নাটক মঞ্চস্থ করলেন। প্রভা দেবীও তাতে অংশ গ্রহণ করলেন। এখানে কিছুদিন অভিনয় করবার পর আর তাঁকে অন্যত্র যেতে হ'ল। মনোমোহন গোস্বামী, প্রবোধ বসু প্রভৃতি আরও কয়েকজনের প্রচেষ্টায় ১৯২১ সালে ম্যাডানের 'বেঙ্গল থিয়েট্রিক্যাল কোং' নামে এক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। এই প্রতিষ্ঠানে প্রভা দেবী ও আরও ২১ জন মেয়ে যোগ দেন। কুসুমকুমারী, বসন্তকুমারী, নীরদাসুন্দরী প্রভৃতিও যোগ দেন এই প্রতিষ্ঠানে। প্রত্যেকের পারিশ্রমিক ঠিক হ'ল মাসিক ৪৫৲ টাকা করে। বেঙ্গল থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানী তখন নাটকের সঙ্গে সঙ্গে ছায়াছবিও তুলতেন। বাংলা নাটক মঞ্চস্থ করলেও চিত্র কিন্তু বাংলা ও হিন্দী উভয় ভাষাতেই গ্রহণ করা হ'তো। প্রভা দেবী এই কোম্পানীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাঁদের নাটকে অভিনয় করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের চিত্রেও অভিনয় করতে সুরু করেন। বর্তমানে যেখানে ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিও গড়ে উঠেছে—তখন সেখানে ঘন জঙ্গল ছাড়া আর কিছুই ছিল না। এই জঙ্গলের মধ্যেই কিছুটা জায়গা একটু পরিষ্কার করে ছটো তাঁবু ফেলে বেঙ্গল থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানীর কাজ সুরু হয়। এর একটা তাঁবুর মধ্যে থাকতো ম্যাডানের নিজস্ব জিনিস-পত্তর ও আর একটার মধ্যে হ'ত অভিনেতা-অভিনেত্রীদের ড্রেস ও মেক-আপ। এই ড্রেস ও মেক-আপ কিন্তু হ'ত ম্যাডানের চিত্রগ্রহণের সময়।

টালিগঞ্জের জঙ্গলের মধ্যে তাঁবু ফেলে থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানীর কাজ সুরু হ'ল। চারিদিকে বনজঙ্গল, সাপে ভর্ত্তি জায়গা—তার মধ্যে থিয়েটার কোম্পানী বুঝুন একবার ব্যাপারটা! এখনকার ইন্দ্রপুরীকে দেখে সেদিনকার শ্বাপদসঙ্কুল ঘন জঙ্গলের দৃশ্য কল্পনাও করতে পারবো না আমরা। যাই হোক, এরই মধ্যে চলতে লাগলো বেঙ্গল থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানীর কাজ পুরোদমে। এইভাবে বেশ কয়েকমাস কেটে যায়। ১৯২২ সালের মাঝামাঝি সময়ে আগা হাসান কাশ্মিরীর তত্ত্বাবধানে এই সম্প্রদায় কর্তৃক তৎকালীন কর্ণওয়ালিস

শ্রীমতী প্রভা (উপবিষ্টা) ও তাঁর ছুই সহোদরা বোন: প্রথম যৌবনের ছবি

থিয়েটারে (বর্ত্তমানের 'শ্রী') কয়েকখানি নাটক অভিনীত হয়। কর্ণওয়ালিস থিয়েটারে এঁদের অভিনীত প্রথম নাটক হচ্ছে 'অপরাধী কে?'এ—ই নাটকটি প্রথম মঞ্চস্থ হয় ১৯২২ সালের ১৪ই মে। হিন্দী ধরণের এই বাংলা নাটকে 'প্রভা' নামের একটি কৌতুক চরিত্রে অভিনয় করেন প্রভা দেবী। প্রথম অবতরণেই তিনি সকলকে খুশী করতে সক্ষম হ'ন। তারপর পণ্ডিত সারদার 'বিষ্ণু-মায়া'তে 'বিষ্ণু'র ভূমিকায় অভিনয় করেন এবং পর পর আরও অনেকগুলি নাটকে অংশ গ্রহণ করেন।

এর কিছুদিন পরে নাট্যাচার্য্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী এই থিয়েটারে যোগদান করেন। এখান থেকেই প্রভা দেবীর জীবনে আসে এক স্মরণীয় পরিবর্ত্তন। প্রকৃতপক্ষে অভিনয়জীবনে শিশিরবাবুই প্রভা দেবীর গুরু ও ভবিষ্যৎ পদপ্রদর্শক। শিশিরবাবু যোগদান করায় বেঙ্গল থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানীর অনেকখানি শক্তি বেড়ে যায়। তিনি যোগদান করেই মঞ্চস্থ করেন ক্ষীরোদপ্রসাদের 'আলমগীর'। কর্ণওয়ালিস থিয়েটারেই ১০ই ডিসেম্বর 'আলমগীর' অভিনীত হয়। 'রূপকুমারী'র ভূমিকায় অভিনয় করেন প্রভা দেবী। তারপর ঐ মঞ্চেই মঞ্চস্থ হয় 'রঘুবীর' ও 'চন্দ্রগুপ্ত'। এই দুটি নাটকে প্রভা দেবীর কোন ভূমিকা ছিল না। কিছুদিন পরে ম্যাডানের সঙ্গে কোন কারণে ঝগড়া হওয়ায় শিশিরবাবু এই কোম্পানীর সংস্রব ত্যাগ করেন।

এরপর আসেন স্বর্গতঃ নির্মলেন্দু লাহিড়ী মশাই। ভাদুড়ীমশাই ছেড়ে দিলেও প্রভা দেবী তখনও এই কোম্পানীর সঙ্গে জড়িত রইলেন। নির্মলেন্দুবাবু যোগদান করবার পর প্রথম 'প্রতাপাদিত্য' নাটক অভিনীত হয়। প্রভা দেবী অংশ গ্রহণ করেন 'কাত্যায়নী'র ভূমিকায়। এরপর আরও কিছুদিন কর্ণওয়ালিস থিয়েটারে থাকবার পর তৎকালীন 'এ্যালফ্রেড 'থিয়েটারে' (পরে যার নাম 'নাট্যভারতী' হয় এবং বর্ত্তমানে যেটি হ'ল 'দীপক' সিনেমা) ম্যাডান কোম্পানী তাঁদের দল নিয়ে চলে আসেন। এখানেও অনেকগুলি নাটকে তিনি অংশ গ্রহণ করেন। এ্যালফ্রেড্ থিয়েটারে যখন তিনি অভিনয় করতে থাকেন তখন তাঁর অভিনয়ের সুখ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তিনিও তখন বুঝতে পারলেন যে দর্শক-সাধারণকে কিছুটা খুশী অন্ততঃ তিনি করতে পেরেছেন। এই সময় একটা ব্যাপার ঘটে গেল।

বাংলা নাটক বা চিত্রে লাভের পরিবর্ত্তে লোকসান হচ্ছে দেখে ম্যাডান শুধু হিন্দী ভাষায় নাটক ও চিত্র করবেন বলে স্থির করলেন। তাঁদের সম্প্রদায়কে এই হিন্দী নাটক বা চিত্রে অংশ গ্রহণ করতে বলা হ'ল। দু-একজন তাতে রাজী হলেও অনেকেই তখন ম্যাডান ছেড়ে দেন—প্রভা দেবীও তাঁদের মধ্যে একজন। ম্যাডানেরও বাংলা নাটক করা বন্ধ হয়ে গেল।

১৯২৩ সালের শেষের দিকে শিশিরবাবু তাঁর সম্প্রদায় নিয়ে ইডেন গার্ডেন একজিবিশনে অভিনয় করবার জন্য আমন্ত্রিত হ'ন। এর আগেই প্রভা দেবী ভাদুড়ী মশাই-এর সম্প্রদায়ে যোগ দিয়েছেন। শ্যামবাজারে একটা ঘর ভাড়া নিয়ে রিহার্সাল দেওয়া হ'ত। এগারো রাত্রি তাঁরা অভিনয় করেন ইডেন গার্ডেনে। এর কিছুদিন পরে প্রভা দেবী টাইফয়েড রোগে আক্রান্তা হ'ন—৬৫ দিন রোগ ভোগের পর তিনি সুস্থ হ'ন। এর মধ্যে শিশিরবাবু তাঁর সম্প্রদায় নিয়ে এ্যালফ্রেড্ থিয়েটারে অভিনয়ের আয়োজন করেছিলেন এবং মনস্থ করেছিলেন যে 'সীতা' নাটক দিয়ে উদ্বোধন করবেন। কিন্তু প্রভা দেবীর অসুস্থতার জন্য 'সীতা' নাটক মঞ্চস্থ করা তখনকার মত বন্ধ রাখতে হয়েছিল। শেষে তিনি ও তাঁর সম্প্রদায় 'বসন্তলীলা' নাটক অভিনয় করেন। এইভাবে এ্যালফ্রেড্ থিয়েটারে পর পর শিশিরবাবু আরও কয়েকখানি নাটক মঞ্চস্থ করেন। ১৯২৪ সালে ভাদুড়ী মশাই-এর সম্প্রদায় মনোমোহন থিয়েটারে যোগ দেন। বিডন ষ্ট্রীট ও সেন্ট্রাল এভিনিউর সংযোগ-স্থলে ছিল মনোমোহন থিয়েটার। এই থিয়েটারের মালিক ছিলেন ৺মনোমোহন পাঁড়ে। যেখানে মনোমোহন থিয়েটার অবস্থিত ছিল—এখন সেখানে তার কোন চিহ্নই নেই, শুধু দাঁড়িয়ে আছে তৎকালীন নাট্যালয়-সংলগ্ন একটি ছোট্ট শিব মন্দির। এই মন্দিরটি ছিল

নিউ থিয়েটার্সের প্রথম যুগের ছবি 'পল্লীসমাজ'-এ শ্রীমতী প্রভা, বিশ্বনাথ ভাদুড়ী ও যোগেশ চৌধুরী

থিয়েটারের বাইরের প্রাঙ্গনে। এর পাশে যে বড় বড় তিনতলা বাড়ীগুলি আছে তার মধ্যে কতকগুলির মালিক ছিলেন মনোমোহনবাবু। এই বাড়ীগুলোতেই ড্রেস ও মেক-আপ-এর কাজ সারা হ'ত। যাক, পুরোদমে অভিনয় চলতে লাগলো। এর কিছুদিন পরে শিশিরবাবুর সঙ্গে নির্মলেন্দুবাবুর কোন কারণে একটু মনোমালিন্য হয়। নির্মলেন্দুবাবু শিশিরবাবুর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন এবং প্রভা দেবীকেও চলে আসতে বললেন। কিন্তু তাঁর মন তখন নাট্যগুরু ভাদুড়ী মহাশয়কে ছেড়ে যেতে রাজী হ'ল না। কোন কারণে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'সীতা' নাটকটি মঞ্চস্থ করতে ভাদুড়ীমশাই বাধাপ্রাপ্ত হলেন। শেষে তিনি 'সীতা' নাটক নতুন করে লিখিয়ে নিলেন স্বর্গতঃ যোগেশ চৌধুরী মশাইকে দিয়ে। এই 'সীতা' নাটকটি মঞ্চস্থ করায় তৎকালীন বহু সংবাদপত্রের বিরূপ সমালোচনা সহ্য করতে হয়েছিল তাঁদের। কিন্তু প্রতিভা কোন বিরূপ সমালোচনাকেই গ্রাহ্য করে না। ভাদুড়ী মশাই ও প্রভা দেবীর নাম ছড়িয়ে পড়লো চারিদিকে। যথেষ্ট সম্মান পেলেন তাঁরা। প্রতিটি 'শো'তে প্রায় তিন-চার হাজার টাকার টিকিট বিক্রী হ'ত। এরপর তাঁরা সেখানে আরও বহু নাটকে অভিনয় করেন। এর মধ্যে 'জনা', 'পাষাণী', 'পুণ্ডরীক', 'ভীষ্ম', 'রঘুবীর', 'চন্দ্রগুপ্ত' প্রভৃতি নাটক তখনকার দিনে নাট্যরস-পিপাসুদের মধ্যে এক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। এখানে 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকে 'ছায়া'র ভূমিকায় প্রভা দেবীর অভিনয় সকলের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে। তখনকার দিনে যিনি একটু গাইতে জানতেন—তাঁকেই 'ছায়া'র ভূমিকায় অভিনয় করতে দেওয়া হ'ত। 'ছায়া'র ভূমিকায় গান ছাড়াও যে আরও অনেক কিছু করবার আছে—এটা তখন কেউ জানতো না। প্রভা দেবীই প্রথম প্রমাণ করেছেন যে ছায়ার ভূমিকায় অভিনয়ের মধ্যেও কিছু দেখাবার ছিল—শুধু গান গেয়েই নয় অভিনয়েও তিনি সেই ভূমিকার মর্য্যাদা বাড়িয়েছিলেন। 'জনা'তে 'মদনমঞ্জরী' ও 'পাষাণী'তে 'অহল্যা'র ভূমিকায়ও তাঁর অভিনয় হৃদয়গ্রাহী হ'য়েছিল। এর মধ্যে আবার একটা ব্যাপার ঘটে গেল। মনোমোহন পাঁড়ের সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়ায় মনোমোহন থিয়েটার তাঁরা ত্যাগ করেন।

শিশির ভাদুড়ী সম্প্রদায়ের সঙ্গে 'সীতা' নাটকাভিনয়ের জন্য
আমেরিকা যাওয়ার পথে শ্রীমতী প্রভা

এরপর শিশিরবাবু তাঁর সম্প্রদায় নিয়ে ভারতের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ফিরে এবং বহু স্থান থেকে বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হয়ে বহু নাটক অভিনয় করেন। প্রভা দেবীও এই সম্প্রদায়ের সঙ্গে দেশ-বিদেশে ঘুরতে থাকেন। এর মধ্যে কাশী ও এলাহাবাদেই তাঁদের বেশীদিন থাকতে হয়। 'শিশির-সম্প্রদায়ের নাম তখন ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। প্রভা দেবীও তাঁর অভিনয়ে সকলকে মুগ্ধ করেন এবং বহু প্রশংসা লাভ করেন।

দেশবিদেশ ভ্রমণ করে কলকাতায় ফিরে এসে ১৯২৬ সালে শিশিরবাবু নিজের সম্প্রদায়ের 'নাট্যমন্দির' নাম দিয়ে সম্পূর্ণ নিজের তত্ত্বাবধানে আবার কর্ণওয়ালিস থিয়েটারে ফিরে এলেন। এখানে তাঁদের প্রথম নাটক অভিনীত হয় 'বিসর্জ্জন' ঐ বছরেই ২৬শে জুন। 'তারপর একের পর অভিনীত হতে থাকে—নরনারায়ণ, ষোড়শী, হাসনুহানা, সাজাহান, শঙ্খধ্বনি, হারানো রতন, রমা, ভ্রমর, প্রফুল্ল, রাধাকৃষ্ণ, শেষরক্ষা প্রভৃতি নাটক। এর মধ্যে প্রতিটি নাটকেই বিশিষ্ট ভূমিকায় অভিনয় করেন প্রভা দেবী। অভিনীত প্রতিটি চরিত্রই তাঁর অভিনয়-নৈপুণ্যে সুন্দরভাবে ফুটে ওঠে। এর মধ্যে 'পল্লীসমাজ' নাটকে 'রমা', 'ভ্রমরে' 'ভ্রমর,' 'রাধাকৃষ্ণ'তে 'কৃষ্ণ', 'শেষরক্ষা'য় 'ইন্দুমতী', প্রফুল্ল'তে 'প্রফুল্ল' প্রভৃতি ভূমিকায় অভিনয় তাঁর অভিনেত্রী-জীবনে সার্থকতা এনে দেয়। পরবর্ত্তীকালে 'প্রফুল্ল'-চিত্রে তিনি 'জ্ঞানদা'র ভূমিকায় অভিনয় করেন, কিন্তু নাটকে তিনি মূল চরিত্র 'প্রফুল্ল'র ভূমিকাতেই অংশ গ্রহণ করেন। এখানে এঁদের শেষ নাটক অভিনীত হয় 'তপতী' ১৯২৯ সালে ২৫ শে ডিসেম্বর। 'তপতী'তে তিনি অভিনয় করেন 'রাণী'র ভূমিকায়।

১৯২৯ সালের শেষের দিকে তাঁরা ষ্টারে যোগ দেন। সেখানে প্রায় এক বছর থেকে এঁরা বহু নাটক অভিনয় করেন। তারপর প্রভা দেবীর জীবনে আসে আর এক স্মরণীয় অধ্যায়।

আমেরিকা থেকে বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হয়ে শিশির-সম্প্রদায় ১৯৩০ সালে পাড়ি দিলেন আমেরিকার পথে, সঙ্গে যান প্রভা দেবী। ১৯৩০ সালে ১০ই অক্টোবর তাঁরা নিউইয়র্ক পৌছন। সেখানেও এঁদের কয়েকটি নাটক অভিনীত হয়। তাঁরা বিশেষভাবে সম্মানিত হন সেখানে। তাঁদের 'সীতা' নাটক সে দেশের নাট্যরসপিপাসুদের মধ্যে এক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। শিশিরবাবু ও প্রভা দেবীর নাম ছড়িয়ে পড়ে দূর পাশ্চাত্যের বহু দেশ বিদেশে। প্রায় আট মাস পরে, ১৯৩১ সালের মাঝামাঝি, তাঁরা ভারতে ফিরে আসেন।

আমেরিকা থেকে ফিরে এসে তাঁরা রঙমহলে যোগ দেন। ৮ই আগষ্ট সেখানে তাঁদের প্রথম নাটক 'বিষ্ণুপ্রিয়া' অভিনীত হয়। 'বিষ্ণুপ্রিয়া'তে 'নিমাই' শিশিরবাবু ও 'বিষ্ণুপ্রিয়া' প্রভা দেবী। তাঁদের সেই প্রাণমাতানো

সাবলীল অভিনয়ে 'নিমাই' ও 'বিষ্ণুপ্রিয়া' চরিত্র এত প্রাণস্পর্শী হয়েছিল যে তাঁদের সেই অভিনয় যাঁরা দেখেছেন তাঁরা বোধ হয় আজও ভুলতে পারেন নি।

সেই বছরেই কোন কারণে তাঁরা রঙমহল ত্যাগ করেন। আবার তাঁরা দেশবিদেশে ভ্রমণ করে নাটক অভিনয় করতে থাকেন। ১৯৩৪ সালে তাঁরা 'নবনাট্য মন্দির' নাম নিয়ে ষ্টার রঙ্গমঞ্চে বিভিন্ন নাটক অভিনয় করতে থাকেন। সেখানে তাঁদের প্রথম নাটক অভিনীত হয় অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বিরাজ বৌ'। ১৯৩৪ সালে ২৮শে জুলাই 'বিরাজ বৌ' প্রথম অভিনীত হয়। তারপর সরমা, দশের দাবী, বিজয়া শ্যামা প্রভৃতি নাটক মঞ্চস্থ হয়। প্রভা দেবী প্রত্যেকটি নাটকেই অংশ গ্রহণ করেছিলেন। 'সরমা'-য় 'সীতা', 'দশের দাবী'তে 'নন্দিনী' ও 'শ্যামা'তে শ্যামার ভূমিকায় তিনি অভিনয় করেন। সেখানে অভিনীত 'রীতিমত নাটকে' 'স্বাগতা'র ভূমিকায় অভিনয় তাঁর আর এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। ষ্টারে এঁদের অভিনীত শেষ নাটক—'যোগাযোগ'। ১৯৩৬ সালের মে মাস পর্য্যন্ত তাঁরা ষ্টার রঙ্গমঞ্চে ছিলেন।

এই হ'ল 'নবনাট্য মন্দিরে'র শেষ অভিনয়। এরপর এই সম্প্রদায় ভেঙ্গে যায় এবং বিভিন্ন শিল্পীরা এক এক-দিকে ছড়িয়ে পড়েন। ১৯৩৯ সালে প্রভা দেবী তৎকালীন নাট্য নিকেতনে (বর্ত্তমানে—'শ্রীরঙ্গম') যোগদান করেন। ১৩ই মে শরৎবাবুর 'পথের দাবী' অভিনীত হয়। তিনি অভিনয় করেন 'সুমিত্রা'র ভূমিকায়। সতু সেন আলোকসম্পাতের ভার নিয়েছিলেন। এখানে বেশ কয়েক বছর ছিলেন। শেষে ১৯৪২ সালে 'নাট্য-ভারতী'তে (তৎকালীন এ্যাল-ফ্রেড্) যোগ দেন। ২৮শে মে 'দুইপুরুষ' অভিনীত হয়। 'বিমলা'র ভূমিকায় প্রভা দেবী অংশ গ্রহণ করেন। ১৯৪৩ সালের ২৮শে জানুয়ারী

তারাশঙ্করের 'পথের ডাক' মঞ্চস্থ হয়; তিনি অভিনয় করেন নিখিলেশের মায়ের ভূমিকায়। ১৯৪৪ সালে শ্রীরঙ্গমে যোগদান করেন। এখানে এই বছরের ২০শে ডিসেম্বর শরৎবাবুর 'বিন্দুর ছেলে' মঞ্চস্থ হয়। 'বিন্দুর ছেলে'তে তিনি 'অন্নপূর্ণা'র ভূমিকায় অভিনয় করেন। এখানে কয়েক বছর থাকবার পর তিনি মিনার্ভায় যোগ দেন। এবং সেখান থেকে এসে ঐ বছরেই রঙমহলে যোগদান করেন। এই হ'ল তাঁর সার্থক নাট্যজীবনের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত। এবার চিত্রজগতের সঙ্গে তাঁর যে যোগাযোগ ছিল সেই কথাই শোনাই, শুনুন।

আগেই বলেছি যে, বেঙ্গল থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানীতে যখন তিনি যোগ দেন প্রকৃতপক্ষে তখন থেকেই তিনি চিত্রজগতে যোগদান করেন। সে সময় চলছিল নির্বাকচিত্রের যুগ। ম্যাডান কোম্পানী যেসব ছবি তুলতেন তাতে নর্ত্তকী হয়েই তিনি প্রথমে অংশ গ্রহণ করতেন। কিভাবে তাঁরা ম্যাডান কোম্পানীতে চাকুরী করতেন সে বিষয়ে চিত্তাকর্ষক এক ঘটনা বলছি শুনুন। সকালবেলা ঘোড়ার গাড়ী করে তাঁদের যার যার বাড়ী থেকে নিয়ে যাওয়া হ'ত। তখন ম্যাডানের কোন গাড়ী ছিল না। পরে অবিশ্যি একটা বড় 'ভ্যান' গাড়ী করা হয়েছিল। তখন এক একটি ঘোড়ার গাড়ীতে চারজন করে বসতেন, এইভাবে সাত আটটা ঘোড়ার গাড়ী সারিবদ্ধ ভাবে চলতো! সকাল সাতটায় তাঁদের এই অভিযান সুরু হ'ত, টালিগঞ্জের তাঁবু-ফেলা ষ্টুডিওতে বেলা ন'টা-দশটায় এসে অভিযান শেষ হ'ত। তারপর চলতো বিরাট খাওয়া-দাওয়ার ধুম। যিনি যা খেতে চাইতেন তাই দেওয়া হ'ত। সে-সময় খাওয়া-দাওয়ার দিকে খুব নজর দেওয়া হ'ত। খাওয়ার পালা শেষ ক'রে সুরু হ'ত মেক-আপ ও সাজ-পোষাক পরা। ড্রেসের তো কোন হাঙ্গামাই ছিল না। যাঁর যা পরিধানে থাকতো—তাই তাঁর ড্রেস—হয়তো দু-একটা বিশেষ কোন কাপড় বা জামা কাউকে দেওয়া হ'ত। আর মেক-আপ? সে আর বলবেন না, সবেদা ও কিছুটা পিউরী মুখে ঘসে দেওয়া হ'ত—ব্যস্, মেক-আপ হয়ে গেল। কালি দিয়ে আঁকা হ'ত ভুরু। এই হ'ল তখনকার দিনের মেক-আপ। তারপর বনে-জঙ্গলে ঘুরে, ফিরে, বসে, কখনও বা দাঁড়িয়ে চিত্রগ্রহণ করা হ'ত। আবার বাড়ী, ঘর বা বারান্দার কোন দৃশ্য তুলতে হলে যাওয়া হ'ত কোন ধনীগৃহে অথবা পরিচিত কোন বড় বাড়ীতে (পূর্ব্বেই তা ঠিক করে রাখা হ'ত)। পুরোদমে চলতো চিত্রগ্রহণের কাজ—অবিশ্যি যতক্ষণ সূর্য্যদেব আলো নিয়ন্ত্রণ করতেন। শেষে সূর্য্যদেবের বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে শেষ হ'ত তাঁদের চিত্রগ্রহণের কাজ। কর্ম্মীরা তাঁবুতে ফিরে এসে তথাকথিত মেক-আপ তুলে একটু বিশ্রাম করে নিতেন—তারপর আবার সুরু হ'ত খাওয়া-দাওয়ার পালা। শেষে সন্ধ্যার পরে আবার সারি বেঁধে ঘোড়ার গাড়ী চলতো তাঁদের ফিরিয়ে দিয়ে আসবার জন্য। এখানেই কিন্তু তাঁদের কাজ শেষ হয়ে যেত না। কোনদিন বা থিয়েটারের রিহার্সাল দিতে হ'ত—নতুবা কোনদিন প্রত্যেককে বায়স্কোপ দেখানো হ'ত। এইভাবে শেষ হ'ত তাঁদের দৈনন্দিন কাজ। এই হ'ল তৎকালীন চিত্র বা নাট্যজগতের একটা দৃশ্য।

প্রভা দেবী জীবনে প্রথম প্রধান ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করেন ম্যাডানের নির্বাক ছবি 'বিষবৃক্ষে' দেবেন্দ্রনাথের স্ত্রীর ভূমিকায়। দেবেন্দ্রনাথের ভূমিকায় অভিনয় করেন নৃত্য ও সুরশিল্পী স্বর্গতঃ কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়। 'বসন্ত-প্রভাতে'ও এক বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেন। তারপর অভিনয় করেন 'পাপের পথে', 'যমজ বোন' প্রভৃতি আরও কয়েকটি চিত্রে। তাঁর সময় চিত্রে আরও যাঁরা অভিনয় করেছিলেন তাঁদের মধ্যে এ্যালফ্রেড্ থিয়েটারের গার্ম্মিকা গহর, পেসেন্স কুপার, মিস বেল ও মিসেস উইলসন প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। তৎকালীন নাট্য বা চিত্র-জগতে তাঁরা প্রত্যেকেই এক একটি বিশেষ স্থান অধিকার করেছিলেন।

শিশিরবাবু যখন বেঙ্গল থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানী ছেড়ে দেন এবং নির্ম্মলেন্দুবাবু যোগদান করেন তখন নির্ম্মলেন্দুবাবু নায়ক ও তিনি নায়িকা হয়ে কয়েকখানি চিত্রে একসঙ্গে অভিনয় করেন। তারপর আবার 'বিষ-

বৃক্ষে'র চিত্রগ্রহণ করা হয়। এবার 'বিষবৃক্ষ' পরিচালনা করেন শ্রীজ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই 'বিষবৃক্ষ' তৎকালীন চিত্রজগতে বেশ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। 'বিষবৃক্ষ'-এর চিত্ররূপ ম্যাডানই দ্বিতীয়বার দিয়েছিলেন। এর ভূমিকালিপিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অহীন্দ্র চৌধুরী 'নগেন দত্ত', প্রভা দেবী কুন্দনন্দিনী, ৺তুলসী বন্দ্যোপাধ্যায় দেবেন দত্ত ও নিভাননী 'সূর্য্যমুখী'র ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করেন। এখানে তিনি আরও বহু চিত্রে অভিনয় করেন। নির্বাক যুগে তিনি প্রায় ১৬।১৭ খানি চিত্রে অভিনয় করেছিলেন। তারপর এল সবাকচিত্রের যুগ। তিনি তখন নিউ থিয়েটার্সে যোগ দিয়েছেন।

নিউ থিয়েটার্সে তাঁর প্রথম চিত্র হচ্ছে 'পল্লীসমাজ' এবং তারপরের চিত্র হচ্ছে শিশির ভাদুড়ী পরিচালিত 'সীতা'। এই দুই চিত্রের মাধ্যমেই তিনি চিত্রজগতে সবিশেষ পরিচিত হলেন, বিশেষ করে 'সীতা' চিত্রে 'ভুঙ্গভদ্রা'র ভূমিকায় অভিনয় তৎকালীন চিত্রজগতে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। তারপর থেকে চিত্রজগতে তিনি আজও অপ্রতিহত গতিতে তাঁর বিজয় অভিযান চালিয়ে আসছেন। 'প্রফুল্ল'তে 'জ্ঞানদা', 'পল্লীসমাজে' 'রমা', 'পণ্ডিত মশাই'তে 'মা', ও 'সরলা'য় 'প্রমদা'র ভূমিকায় অভিনয় করেন। 'সরলা' চিত্রে 'প্রমদা' চরিত্রের অভিনয়ও তাঁর আর একটি অপরূপ সৃষ্টি। যতগুলি ছবিতে তিনি আজ পর্য্যন্ত অভিনয় করেছেন তার প্রতিটি চরিত্রই তিনি নিখুঁত ও সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। সেদিন থেকে আজ পর্য্যন্ত তিনি যেসব ছবিতে অংশ নিয়েছেন তার তালিকা হ'ল—রেশমী রুমাল, অন্নপূর্ণার মন্দির, হারানিধি, পরশমণি, নন্দিনী, শহর থেকে দূরে, মানে না মানা, এই তো জীবন, নতুন বৌ, বামুনের মেয়ে প্রভৃতি আরও বহু চিত্র। তিনি আজ পর্য্যন্ত শতাধিক চিত্রে অভিনয় করেছেন।

এবার শুনুন তাঁর রেডিও ও রেকর্ড জগতে অভিযানের ইতিহাস। কলকাতা বেতার কেন্দ্রের নৃপেন মজুমদার মশাই প্রথমে শিশিরবাবুর সম্প্রদায়ে ছিলেন। তারপরে রেডিওতে যোগ দেন। ১৯২৭ সালের ২৬শে আগষ্ট কলকাতায় যখন প্রথম বেতার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়, তখনই প্রভা দেবী বেতার কেন্দ্রে যোগ দেন। নৃপেনবাবুর প্রচেষ্টায় তিনি রেডিওতে অভিনয় সুরু করেন। প্রথমে কিন্তু তিনি একা গিয়ে রেডিওতে যোগ দেন নি। শিশিরবাবুর সম্প্রদায় যখন রেডিওতে আমন্ত্রিত হয়ে অভিনয় করতেন—তখন তিনি তাঁদের সঙ্গে গিয়ে অভিনয় করতেন। পরবর্ত্তী জীবনে অবিশ্যি তিনি ব্যক্তিগতভাবেই রেডিওতে যোগ দিয়েছিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি রেডিও-জগতেও পরিচিত হয়ে ওঠেন। তখনকার দিনে শিশিরবাবুর মঞ্চে অভিনীত বহু সাফল্যমণ্ডিত নাটক রীলে করে শোনাতেন রেডিওর কর্ত্তৃপক্ষ। এইভাবে তিনি রেডিওতে অভিনীত বহু নাটকে অংশ গ্রহণ করেন।

গ্রামোফোন রেকর্ডের শিল্পী হিসেবে প্রথমে তিনি 'হিজ মাষ্টার্স ভয়েসে' 'মীরাবাঈ' রেকর্ড-নাটকে অভিনয় করেন। তারপর এইচ, এম, ভি প্রতিষ্ঠানের রেকর্ডে গৃহীত আরও অনেক নাটকে অংশ গ্রহণ করেন তিনি। এর মধ্যে 'পাণ্ডব গৌরবে' 'সুভদ্রা', 'বিস্থাপতি'তে 'রাণী লছমী', 'আলমগীর'-এ 'উদিপুরী', 'দুই পুরুষে' 'বিমলা', 'মীর কাশিমে' 'রুণীবেগম', 'ধাত্রীপান্না'য় 'শীতলসেনী' প্রভৃতি ভূমিকার অভিনয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এইচ, এম, ভিতে যখন 'পাণ্ডব গৌরব' নাটকে অংশ গ্রহণ করেন তখন মেগাফোন কোম্পানীতেও যোগ দেন। মেগাফোনে যোগ দিয়ে প্রথমে 'সীতা' রেকর্ডনাট্যে তারপর 'সীতার বনবাস', সীতাহরণ, ফুল্লরা, ষোড়শী, নিমাই সন্ন্যাস, মন্ত্রশক্তি, বিষবৃক্ষ, চন্দ্রগুপ্ত প্রভৃতিতে অভিনয় করেন। এর মধ্যে নিমাই সন্ন্যাসের নিমাই, মন্ত্রশক্তির রাণী, বিষবৃক্ষের কুন্দ ও চন্দ্রগুপ্তের মুরা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তারপর আবার এইচ, এম, ভি-তে এবং পরে হিন্দুস্থান রেকর্ডেও যোগ দেন। হিন্দুস্থানে ভীষ্ম, পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস, প্রভৃতি আরও কয়েকটি নাটকে তাঁকে অভিনয় করতে হয়। ভীষ্মে 'অম্বা' ও 'শিখণ্ডি' এবং 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাসে' 'দ্রৌপদীর' ভূমিকায় অভিনয় করেন। তিনি আজ পর্য্যন্ত প্রায় পঞ্চাশখানা রেকর্ডনাট্যে অংশগ্রহণ করেছেন।

অতীতের এক শুভক্ষণে যে সাধনা তিনি সুরু

পদ্মা দেবী

বাঙলা চিত্রজগতে নবাগতাদের অন্যতমা করবী গুপ্তা

করেছিলেন একান্ত গোপনে—দীর্ঘ দিনের অক্লান্ত পরিশ্রম ও অপরিসীম সহিষ্ণুতার মধ্য দিয়ে তিনি সফল করতে চেষ্টা করেছেন তাঁর সেই স্বপ্ন ও সাধনা! তথাকথিত সুনামের প্রত্যাশা না করেই তিনি নিজেকে বিলীন ক'রে দিয়েছিলেন তাঁর সেই শিল্প-সাধনায়, পরবর্ত্তী জীবনে পেয়েছেন প্রচুর সম্মান—পৌঁচেছেন সার্থকতার চরম শিখরে। স্বপ্নবিজড়িত আশা-আকাঙ্ক্ষার মধ্যে যে শিল্প জন্মলাভ করেছিল একদিন—নাট্য ও চিত্র জগতের ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে তাঁর সেই শিল্প-সাধনার অক্ষয়কীর্ত্তিপূর্ণ সার্থক পরিচয়।

এই গেল তাঁর জীবনের একটি দিক—আর এক দিক হচ্ছে তাঁর সাংসারিক জীবন। আজ তিনি স্বামী, পুত্র, কন্যা, পুত্রবধূ, জামাতা, নাতি, নাতনী নিয়ে তাঁর সুখের সংসার গড়ে তুলেছেন। এর মধ্যে শুধু দুজন তাঁর সুখের নীড় ছেড়ে চিরকালের মত চলে গেছে এই সংসার থেকে। এই দুজন হচ্ছে তাঁর মধ্যমা ও সর্ব্বকনিষ্ঠা কন্যা। তাঁর সন্তানদের মধ্যে কয়েকজন তাঁরই মতো শিল্প সাধনায় অংশ গ্রহণ করতে পেরেছেন। তাঁর প্রথমা কন্যা বহুদিন আগে কয়েকটি নাটক ও চিত্রে অংশ গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু সংসারে প্রবেশ করে তাঁকে শিল্পী জীবন ত্যাগ করতে হয়েছে।

মধ্যমা কন্যা হচ্ছে বুলা। বুলা শুধু চিত্রজগৎ কেন এই সংসার-জগৎ থেকেও চিরদিনের মত বিদায় নিয়ে চলে গেছে। মাত্র সাত বছর বয়সে একদিন অকস্মাৎ তার জীবন-দীপ নিভে যায়। সে আজ অনেকদিনের কথা। মঞ্চ, চিত্র রেকর্ড—সব কিছুতেই বুলা অল্পদিনের মধ্যে খুব দক্ষ হয়ে উঠলো। বুলাকে প্রথম দেখা যায় 'অন্নপূর্ণার মন্দির' ছবিতে। এই চিত্রে সে প্রভা দেবীরই সন্তানরূপে অংশ গ্রহণ করে। তারপর 'সরলা' চিত্রে 'গোপাল' ও 'পণ্ডিতমশাই'তে 'চরণে'র ভূমিকায় অভিনয় করে। এই ভাবে আরও কয়েকটি শিশুচরিত্রে অপূর্ব্ব অভিনয়ে সকলের প্রিয় হয়ে ওঠে। মঞ্চেও বহু নাটকের শিশুচরিত্রে অভিনয় করে। রেকর্ড-নাট্যে

শিশির ভাদুড়ী সম্প্রদায়ে 'সীতা' নাটকাভিনয়ে প্রভা দেবী (সীতা) ও সুশীলাবালা (ঊর্ম্মিলা)

প্রথম অংশ নেয় এইচ, এম, ভি-র 'ধ্রুবচরিত্রে' 'ধ্রুব'র ভূমিকায়।

তখন প্রভা দেবী শিশির সম্প্রদায়ের সঙ্গে অভিনয় করতে গেছেন রংপুরে। সেখানে কয়েকরাত্রি অভিনয় চলবার পর বুলা একদিন ডিপথিরিয়া রোগের কবলে পড়ে। সেখানে তখন 'পণ্ডিতমশাই' চিত্রটি চলছে। মঞ্চে 'রীতিমত নাটকে' 'মধুময়ে'র ভূমিকায় অভিনয়

'রঙমহলে' অভিনীত 'বিষ্ণুপ্রিয়া' নাটকে শিশিরকুমার ও প্রভা

করছিল বুলা। সেখানকার প্রত্যেকটি লোকের মনে 'চরণ' ও 'মধুময়' এক বিশেষ স্থান অধিকার করেছিল। কিন্তু ডিপথিরিয়া তাকে রেহাই দিল না। একদিন 'চরণ' সবাইকে ফেলে রেখে চিরদিনের মত চলে গেল।

বর্ত্তমানে তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা হচ্ছে মঞ্চ ও চিত্রের লীলাচঞ্চলা কেতকী। কেতকীও খুব অল্পদিনেই তার সুন্দর অভিনয়গুণে সকলকে মুগ্ধ করতে পেরেছে। কেতকীও খুব অল্প বয়সে অভিনয় করতে সুরু করে। তার প্রথম মঞ্চাভিনয় হচ্ছে শ্রীরঙ্গমে 'বিন্দুর ছেলে'তে 'অমূল্য'র ভূমিকায়। তখন তার বয়স মাত্র সাত-আট বছর। সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র চপলকুমারও (টুকু) কিছুদিন আগে রঙমহল মঞ্চে 'বামের সুমতি'তে 'গোবিন্দ'র ভূমিকায় সুন্দর অভিনয় করে।

এবার তাঁর ফেলে-আসা দিনের কয়েকটা মজার ঘটনা শোনানো হচ্ছে।

প্রথমে চলুন 'সাজাহান' নাটকের দৃশ্যপটে যাওয়া যাক। প্রভা দেবী 'নাদিরা'র ভূমিকায় অভিনয় করছেন। নাদিরা তার স্বামী পুত্রের হাত ধরে মরুভূমির মধ্য দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে যাবে। তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে—এক ফোঁটা জল নেই। কিন্তু মুস্কিল হ'ল এই দৃশ্যের রিহার্সালের সময় তৃষ্ণায় কাতরা নাদিরার গলা দিয়ে কিছুতেই তৃষ্ণার্ত্তের আওয়াজ বেরোচ্ছে না—স্বাভাবিক আওয়াজ হয়ে যাচ্ছে। বারকয়েক চেষ্টা করার পর যখন কিছুতেই কিছু হয় না তখন শিশিরবাবু কতকটা সোডা এনে বিনা জলে নাদিরার মুখে ঢেলে দিলেন। ব্যস্, সমাধান হয়ে গেল। তখন আওয়াজ না বেরিয়ে যাবে কোথায়? জল না দিয়ে সোডা গিলতে গিলতে আওয়াজ করতে বললেন। ঠিক তৃষ্ণার্ত্তের করুণ আওয়াজ বেরিয়ে এলো 'নাদিরা'র শুষ্ক কণ্ঠ থেকে।

এবার কর্ণওয়ালিস থিয়েটারে একবার যাওয়া যাক। দেখি এখানে কোন মজার ব্যাপার ঘটছে কিনা। 'ভ্রমর' নাটক অভিনীত হচ্ছে। 'ভ্রমরে'র ভূমিকায় প্রভা দেবী, ভ্রমরের দিদি যামিনীর ভূমিকায় সুশীলাবালা, তার পিতারূপে স্বর্গতঃ নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ীর দাদা ৺অমলেন্দু লাহিড়ী ও সরকার মশাই-এর ভূমিকায় শান্তশীল গোস্বামী অভিনয় করছেন। যে দৃশ্যটার কথা বলছি—আগে তার একটু বর্ণনা দিয়ে দিচ্ছি। 'গোবিন্দলালে'র কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। তার চিন্তায় ভ্রমর অসুস্থা হয়ে বিছানায় শায়িতা পাশে উপবিষ্টা দিদি যামিনী ও আর এক পাশে উদ্বিগ্ন-চিত্তে দণ্ডায়মান ভ্রমরের পিতা। দূরে জোড়হাত করে নত-মস্তকে দাঁড়িয়ে আছেন সরকার মশাই। দৃশ্যটার শেষের দিকে আছে যে ভ্রমরের পিতা সরকার মশাইকে বলবেন 'যেখান থেকে পারেন গোবিন্দলালকে

খুঁজে আমুন। যত টাকা লাগে নিয়ে যান।’

‘যে আজ্ঞে’ বলে সরকার মশাই প্রস্থান করবেন। ব্যস্. এই পর্য্যন্ত। তারপর পর্দ্দা পড়ে যাবে। এখন এর মধ্যে একটা ব্যাপার ঘটে গেছে। এই দৃশ্যটার রিহার্সালের দিন শান্তশীলবাবু কোন কারণে অনুপস্থিত ছিলেন, তাই ঠিক কখন প্রস্থান করতে হবে—তা তাঁর জানা ছিল না। এদিকে অভিনয়ের দিন উক্ত দৃশ্যের পর্দ্দা ওঠবার আগে পর্য্যন্ত তাঁর খেয়াল নেই যে প্রস্থানের সময়টা ও সংলাপটা জেনে নেবেন। শেষে অভিনয় করতে সুরু করে তো তাঁর অবস্থা কাহিল। ‘কখন প্রস্থান করব’—এই কথা চিন্তা করতে করতেই তাঁর অন্য সংলাপও ভুল হয়ে গেল। কোন রকমে তা মানিয়ে নিয়ে শেষের দিকে প্রস্থানের সময় কি কাণ্ড করে বসলেন,—তা সরকার মশাই ও ‘প্রম্পটার’-এর কথাবার্ত্তা শুনলেই বুঝতে পারবেন।

………‘যে আজ্ঞে’—বললেন প্রম্পটার।

………‘যে আজ্ঞে’, বললেন সরকার মশাই।

বলে দাঁড়িয়েই আছেন তিনি। সরকার মশাই প্রস্থান করছেন না দেখে প্রম্পটার আবার বললেন—‘আচ্ছা আপনি এখন চলে আসুন—আপনার হয়ে গেছে।’ ‘আচ্ছা আপনি এখন চলে আসুন—আপনার হয়ে গেছে’—মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে বলে গেলেন সরকার মশাই। ভ্রমরের বাবার তো চক্ষু চড়কগাছ! এ বলে কিরে! এদিকে প্রম্পটারেরও মাথা ঘুরতে সুরু করেছে।

‘কি মুস্কিল! আপনি চলে আসুন।’

‘কি মুস্কিল, আপনি চলে আসুন’—বললেন সরকার মশাই।

‘আরে আপনাকে বলছি—আপনার এখন প্রস্থান।’

‘আরে আপনাকে বলছি—আপনার এখন প্রস্থান’—সরকার মশাই বেশ ঘুরে ফিরে বলতে লাগলেন। প্রম্পটার যা প্রম্পট্ করছেন তাই তিনি বলে যাচ্ছেন। এদিকে ভ্রমরের তো অবস্থা কাহিল। অসুস্থতার মধ্যেই নড়াচড়া সুরু হয়ে গেছে—কারণ হাসি আর তখন থামাতে পারছেন না। দিদি যামিনী ভ্রমরের বুকের ওপর মুখ রেখে কাঁদবার অভিনয় করছিলেন। তাঁর পক্ষে হাসবার সুবিধে হয়েছে কারণ দূর থেকে হাসি-কান্না সবই সমান শোনাচ্ছে। প্রেক্ষাগৃহে হাসির রোল শোনা যাচ্ছে কিন্তু সরকার মশাই-এর তখনও খেয়াল হয় নি। শেষে আবার প্রম্পটার রেগে-মেগে চীৎকার করে বলতে লাগলেন ‘কি সর্ব্বনাশ! আরে মশাই আপনাকে আসতে বলছি।’

‘কি সর্ব্বনাশ! আরে মশাই আপনাকে আসতে বলছি’—ততোধিক চীৎকার করে বললেন সরকার মশাই।

শেষে বাধ্য হয়ে প্রম্পটার ভদ্রলোক হাত বাড়িয়ে জামা ধরে টেনে সরকার মশাইকে ভেতরে আনেন। ওদিকে মঞ্চের পর্দ্দাও পড়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে।

কাশীতে গেছেন শিশির সম্প্রদায়। ‘সীতা’ নাটক অভিনীত হচ্ছে। এক রাত্তিরের একটা ঘটনা শুনুন। একটা দৃশ্যে সীতা দেবী প্রাণাধিক প্রিয়তম শ্রীরামচন্দ্রকে ত্যাগ করে চলে যাচ্ছেন। সীতা দেবী শোকে কাতরা হয়ে

কালী ফিল্মসের ‘প্রফুল্ল’ নাটকে করুণ দৃশ্যের রূপায়ণে শ্রীমতী প্রভা

প্রহসনচিত্র 'রেশমী রুমালে' হাল্‌কা ধরণের ভূমিকার রূপসজ্জায় শ্রীমতী প্রভা

পড়েছেন। রামচন্দ্র সীতার বিরহের কথা চিন্তা করে শোকে বিহ্বল হয়ে পড়েছেন। দেবর লক্ষ্মণকে রথ আনতে বললেন সীতা দেবী। 'যথা আজ্ঞা দেবী' বলে লক্ষ্মণরূপী স্বর্গতঃ বিশ্বনাথ ভাদুড়ী রথ আনতে চলে গেলেন। প্রায় পনেরো মিনিট কেটে যায়—রথ আর আসে না। ব্যাপার কি? লক্ষ্মণের আর পাত্তা নেই। এদিকে শ্রীরামচন্দ্ররূপী শিশিরবাবু ঘুরে ফিরে দুঃখ প্রকাশ করছেন আর নতুন

শ্রীমতী প্রভার কন্যা চিত্রজগতে সুপরিচিতা কেতকী
(সাত বছর বয়সে)

দু-একটা সংলাপ বলে সময়টা কাটিয়ে নিচ্ছেন—সীতারূপিণী প্রভা দেবী তাঁর কথায় কোনরকমে সায় দিয়ে ভেতরের দিকে বারে বারে তাকাচ্ছেন—কোথায় তাঁর দেবর লক্ষ্মণ। ওদিকে দেবর মশাই ভুলেই মেরে দিয়েছেন যে তাঁর তখন রথ নিয়ে আসবার কথা। শিশিরবাবুর মেজাজ তখন সপ্তমে উঠেছে। ঘুরে ঘুরে সীতার কাছে

আজকে যাঁরা বিস্মৃত তাঁদের অন্যতমা
মায়া মুখোপাধ্যায়

দুঃখ প্রকাশ করছেন—আর সীতার কানের কাছে এসে আস্তে আস্তে বলছেন, 'বিশেটা গেল কোথায়? সব ডোবালো দেখছি।' শেষে অনেকক্ষণ পরে লক্ষ্মণের খেয়াল হওয়ায় ছুটতে ছুটতে মঞ্চে এসে হাজির, 'রথ প্রস্তুত দেবী।' সীতা দেবী বিদায় নিয়ে চলে গেলেন; পর্দা পড়ে গেল শ্রীরামচন্দ্রের তখন মেজাজ গরম। লক্ষ্মণের ডাক পড়লো দাদা শ্রীরামচন্দ্রের কাছে। লক্ষ্মণ হাজির। দাদা প্রশ্ন করলেন—'রথ আনতে কোন্ রাজত্বে গিয়েছিলি? কোন একটা দায়িত্ব নেই। আজ এই দৃশ্যটা একেবারে নষ্ট করে দিলি তো?'

লক্ষ্মণ উত্তর দিল—'নষ্ট করেছি কি বলছো দাদা? আমি তো উইংস-এর পাশেই দাঁড়িয়েছিলুম। তোমাদের অতিরিক্ত সংলাপসহ অন্য ধরণের এক নতুন অভিনয় দেখছিলুম।'

'সে কি রে! সে তো তোর আসতে দেরী দেখে অন্য কতকগুলো সংলাপ দিয়ে সময়টা কাটাচ্ছিলুম।'

'ও তাই নাকি? আমি আরও ভাবলুম যে আজ বুঝি এই দৃশ্যটার কিছু পরিবর্ত্তন করেছো। আমি তো এখানেই দাঁড়িয়ে—তোমাদের ঐ অভিনয়ের জন্যই তো আমি প্রবেশ করবার সুযোগই পাচ্ছিলুম না।'—বলে তাড়াতাড়ি লক্ষ্মণ সেখান থেকে সরে পড়লেন শিশিরবাবু তখন হাসবেন না রাগবেন বুঝে উঠতে পারছিলেন না

এবার ফিরে আসুন মিনার্ভাতে। এখানে তখন 'প্রতাপাদিত্য' নাটক অভিনীত হচ্ছে। প্রতাপ হচ্ছেন নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী, কল্যাণী প্রভা দেবী। আর শঙ্করের অভিনয় যে ভদ্রলোকের করবার কথা ছিল—তাঁর অনুপস্থিতিতে শঙ্করের অভিনয় করছেন সন্তোষ দাস। দৃশ্যটা হচ্ছে বিদেশী সিপাইরা সকলের ওপর অত্যাচার করতে করতে শেষে কল্যাণীর কাছে আসবে। কল্যাণী তখন খড়্গহস্তে সিপাই-এর বিরুদ্ধে দাঁড়াবেন। ঠিক সেই সময় বাইরে বন্দুক ও কামানের আওয়াজ শোনা যাবে ও বন্দুকহস্তে প্রতাপ ঢুকতে ঢুকতে বলবেন—'মা, মা, ভয় কি? আমি যে সন্তান তোমার।' সেই সঙ্গে সঙ্গেই শঙ্কর প্রবেশ করে চিন্তিত ও সন্ত্রস্ত হ'য়ে কল্যাণীর কুশলপ্রশ্ন করবেন তারপর পর্দ্দা পড়ে যাবে। সব ঠিক। প্রেক্ষাগৃহে তিলধারণের স্থান নেই। উক্ত দৃশ্যের পর্দ্দা উঠলো। অভিনয় চলতে লাগলো ঠিক মতো। কল্যাণীও খড়্গহস্তে দণ্ডায়মানা হলেন। বাইরে বন্দুক ও কামানের শব্দ শোনা গেল। প্রতাপ প্রবেশ করলেন—তাঁর নির্দ্দিষ্ট সংলাপ বলতে যাবেন, এমন সময় শঙ্কর হন্তদন্ত হয়ে ছুটতে ছুটতে এসে বলে ফেললেন—'মা, মা, ভয় কি? আমি যে সন্তান তোমার।' কি সর্ব্বনাশ! সকলের চক্ষুস্থির! প্রেক্ষাগৃহে হাসির রোল উঠে গেছে। কল্যাণী ভাবলো—একি ব্যাপার? কার মাকে কে মা ডাকে!' শঙ্কর কিন্তু তখনও ভাল অভিনয় করেছে ভেবে বুক ফুলিয়ে এদিক ওদিক পায়চারী করছে। আসল কথা কি জানেন? সংলাপ গোলমাল হয়ে যাওয়ায় এই মারাত্মক বিভ্রাট। 'প্রতাপে'র তো চক্ষু চড়কগাছ! একি হ'ল? আমার মাকে ও মা ডাকে কেন? কিন্তু প্রতাপের বোঝবার আগেই মঞ্চের পর্দ্দা পড়ে গেছে।

বাংলার পরিচালক

প্রমথেশচন্দ্র বড়ুয়া

সুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

ভারতীয় চিত্রজগতে যে চারজন পরিচালক শ্রেষ্ঠতম স্বীকৃতি পেয়ে এসেছেন, তার মধ্যে কুমার প্রমথেশচন্দ্র বড়ুয়া অন্যতম। আশ্চর্যের সঙ্গে লক্ষ্য করতে হয় ভারতের প্রথম তিনজন পরিচালকই নিউ থিয়েটার্সের গোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন এবং দেবকীকুমার বসু, প্রমথেশচন্দ্র বড়ুয়া বা নীতিন বসুর পরিচালনার মধ্যে একটি যোগসূত্র লক্ষ্য করা যায় যা বিভিন্নধর্মী দৃষ্টিভঙ্গির জন্য শেষ পর্যন্ত এক সূত্রে গ্রথিত হতে পারে নি।

প্রমথেশচন্দ্র বড়ুয়া বাস্তব জীবনে খেয়ালী বুদ্ধিমান অসমীয়া রাজপুত্র। তাঁর পরিচালক জীবনের ওপর যেভাবে বাস্তব জীবন প্রতিফলিত হয়েছে, তা আর কারও জীবনে এত সাফল্যের সঙ্গে হয়নি। বড়ুয়া সাহেবের পরিচালিত ছবি লক্ষ্য করলে দেখা যায় এক অতি বুদ্ধিমান অথচ খেয়ালী এবং অতিরিক্ত স্মার্ট পরিচালককে যাঁর ছবির বাহ্যিক আভিজাত্য ধারণার পরিচয় দেয়। তাঁর ছবি যদি সফল হয়ে থাকে, তা তাঁর পরিচালন-নৈপুণ্যের চেয়ে স্মার্টনেসের জন্যই বেশী, আর যেখানে ছবি ব্যর্থ হয়েছে, তাও তাঁর পরিচালন-দৈন্যের চেয়ে Smartness-এর কাছেই বেশী দায়ী। তাঁর দোষ গুণ দুই হচ্ছে তাঁর অতি-সপ্রতিভতা বা Smartness। ভাল গল্প পেলে ভাল ঘটনা পেলে তাঁর Commanding Smartness-এর জোরে তাকে চাবুকের মত সতেজ করে তোলেন; আর দুর্বল কাহিনী বা ঘটনায় তিনি ঘটনাকে সতেজ করতে গিয়ে এত বেশী প্রবাদ-সম্মত এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানা স্মার্ট হয়ে ওঠেন, যা দেখলেই মনে হয় বাইরের চাকচিক্যই সার, ভেতরে সবই অসার। রেসের ঘোড়া যতই স্মার্ট বা সতেজ হোক না কেন, বার্দ্ধক্যে তাকে পিছিয়ে পড়তেই হবে। তাই প্রমথেশচন্দ্র বড়ুয়া ভারতের সবচেয়ে জনপ্রিয় ছবি (দেবদাস) দিয়েও শেষ জীবনে এমনভাবে পিছিয়ে পড়লেন যে তিনি নিজেই হয়ত তার জন্য কম বিস্মিত হন নি।

আমাকে ভুল বোঝার সুযোগ হয়ত অনেককে দিচ্ছি। শ্রীযুক্ত বড়ুয়ার পরিচালনার চেয়ে তাঁর Smartness-কে বেশী প্রাধান্য দেওয়াতে অনেকেই হয়ত মনে করবেন পরিচালক হিসাবে প্রমথেশচন্দ্রকে আমি স্বীকার করি না। এ কথা ভুল। আমি বলতে চাই পরিচালক হিসাবে তিনি স্মার্ট অর্থাৎ কোন একটি ঘটনা যদি বেসুরো হয় দেবকীবাবু বা নীতিনবাবুর মত পরিচালকও হয়ত সেই বেসুরো ঘটনাকে কি করে সরিয়ে দিয়ে পছন্দসই অথচ নাট্যধর্মী ঘটনা আনা যায়—তাই চিন্তা করবেন; কিন্তু বড়ুয়া অন্য ঘটনার জন্য চিন্তা না করেই সেই ঘটনাকে কি করে দর্শনযোগ্য করা যায়, সেইটা ভেবেই ক্ষান্ত হন। ঠিক এই কারণেই অনেক ছবি তাঁকে প্রগতিশীল আখ্যা দিয়েছে, অনেকে তাঁকে পলায়নবাদী বলেছেন, অনেকে তাঁকে 'ছি ছি'ও করেছেন।

আমার মনে হয় ১৯৪০ সাল পর্য্যন্ত সবচেয়ে জনপ্রিয় পরিচালক ছিলেন প্রমথেশচন্দ্র বড়ুয়া—তার কারণ, শুধু তাঁর পরিচালন-প্রতিভাই ছিল না। অভিনেতা এবং নায়ক হিসাবে তিনি জনপ্রিয়তার এত শীর্ষে উঠেছিলেন যে সাধারণ দর্শক তাঁর ছবিতে তাঁকে পরিচালক হিসাবে দেখার চেয়ে অভিনেতা হিসাবেই বেশী পছন্দ করতেন। একদিকের জনপ্রিয়তাই অপরদিকে জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করতে তাঁকে সাহায্য করেছে। Finish-এর দিক দিয়ে তিনি দেবকীকুমার বসু বা নীতিন বসুর মত Perfect ন'ন; কিন্তু চিত্রের দিক দিয়ে একজন বামপন্থী ও প্রগতিশীল শিল্পী। তাঁর ছবিতে অতি সুচারু তুলির আঁচড়ে আঁকা তৈলচিত্র দেখা যায় না; দেখা যায় কর্কশ বুরুশের খাপছাড়া আঁচড়ে রূপায়িত উদ্ধত জীবনের ছবি।

আজ একটি কথা শোনা যায়, অমুকে প্রগতিশীল পরিচালক; তার কারণ তিনি প্রগতিশীল কাহিনীর চিত্ররূপ দিয়েছেন। কিন্তু এত অল্পতেই কি একজনকে
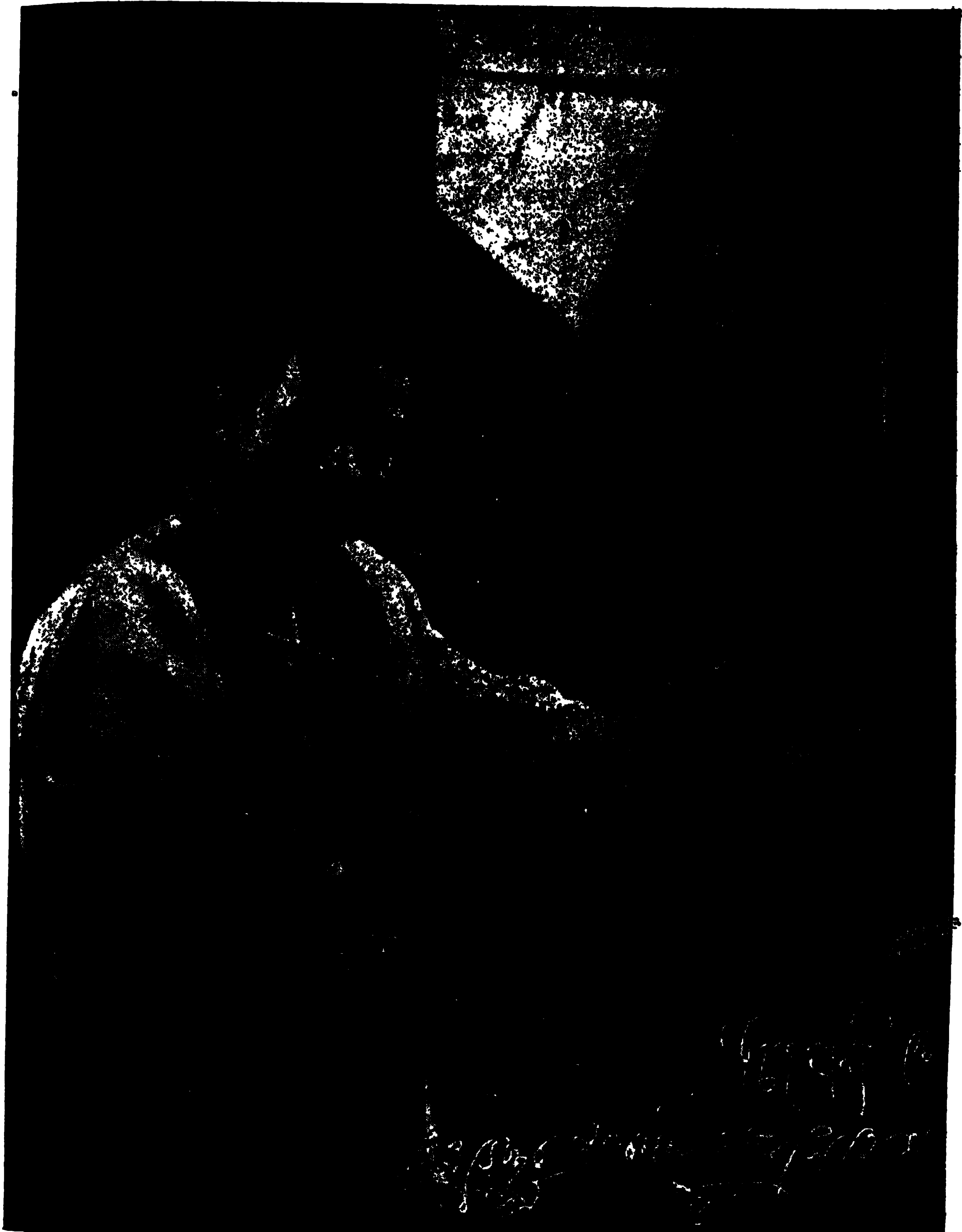
প্রগতিশীল আখ্যা দেওয়া যায় ? তাঁদের চিত্ররূপদানের মধ্যে প্রগতিশীলতার ছাপ পাওয়া যায় কিনা তাই আগে বিচার্য্য। আমার মনে হয়, প্রমথেশ বড়ুয়াই সবচেয়ে সার্থক প্রগতিশীল পরিচালক। আজকের যুগের পরিচালকদের মধ্যে প্রগতিশীলতা নেই বললেই চলে; একটু ভিন্নধর্ম্মী কাহিনী রূপায়িত করেই তাঁরা 'প্রগতিশীল' আখ্যা গ্রহণ করেন। অথচ খুঁটিয়ে দেখলে দেখা যায় তাঁরা কেউই দেবকী-প্রমথেশ-নীতিন প্রদর্শিত পরিচালন-পদ্ধতির বাইরে তো অগ্রসর হতেই পারেন নি, বরং অনেক পিছিয়েই পড়েছেন।

প্রমথেশচন্দ্র বড়ুয়ার অদ্ভুত প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী ছিল; যা তখনকার দিনে অচিন্ত্যনীয় বললেও অত্যুক্তি হয় না। পরিচালনার দিক দিয়ে যে দৃষ্টিভঙ্গী দেখা গেছিল সে যুগের যুগস্রষ্টা রুশীয় পরিচালকদের, তারই সঙ্গে সাদৃশ্য ছিল প্রমথেশ বড়ুয়ার পরিচালন-পদ্ধতির। তাঁর পরিচালনা দেবকী বসুর মত 'বাঙালী' ছিল না, নীতিন বসুর মত 'মুডি' ছিল না; ছিল একেবারে বিদেশী বা foreign। যতদিন অগ্রগামী ছিল তাঁর চিন্তাশক্তি, ততদিন তিনি ছিলেন তুঙ্গ-শিখরে; কিন্তু যদিন তিনি 'direction made easy'র দিকে ঝুঁকলেন, পরীক্ষার্থীর মত টেক্সট বই না পড়ে নোটের ওপরে ভরসা করে, সেই-দিন থেকেই প্রমথেশচন্দ্র বড়ুয়ার পতন সুরু হ'ল। এই পতন রোধ করার কোনও চেষ্টাই তিনি করেন নি; কারণ যে শিল্পী স্রষ্টার মন নিয়ে তিনি ছায়াছবিকে ভাল-বেসেছিলেন, সে মনই আর তাঁর ছিল না। একদা চিন্তাশীলতার ক্ষেত্রের বিপ্লবী শেষযুগে এমন cynic হয়ে পড়েছিলেন যে তাঁর শেষের ছবিগুলি খামখেয়ালীপ্রসূত উদ্ভট কল্পনা ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না।

'বাংলা ১৯৮৩' তাঁর প্রথম বাংলা সবাক ছবি। এ ছবিটি দেখিনি, শুনেছি 'সবাক' লেখা সত্ত্বেও 'অবাক' কাণ্ড ছিল ছবিটি। আরও শুনেছি, ছবির কাহিনী পাগলামী ছাড়া কিছুই ছিল না। কিন্তু তাঁর পরের 'রূপলেখা,' 'দেবদাস', 'গৃহদাহ', 'অধিকার' প্রভৃতি ছবি দেখে আমি বিশ্বাস করিতে পারি না যে ছবিটি একেবারে পাগলামীতে ভরা ছিল। অন্ততঃ 'বাংলা ১৯৮৩' নামটিতেই আমি একটি প্রগতিশীলতার ছাপ খুঁজে পাচ্ছি—১৯৩৩ সালে বাংলায় তোলা ছবি 'পরিচালক আরও পঞ্চাশ বছর এগিয়ে বাংলাকে দেখতে চেয়েছিলেন। হয়ত দৃষ্টিভঙ্গী ছিল ভ্রান্ত, বাড়াবাড়ির প্রশ্রয়ও ছিল হয়ত; কিন্তু তিনি যে নূতন কিছু দেখতে বা দেখাতে গেছিলেন তা অস্বীকার করার উপায় নেই।

কিন্তু তিনি এই প্রগতিশীলতা বজায় রাখতে পেরেছিলেন নিউ থিয়েটার্সে থাকাকালীন সব ক'টি ছবিতে। 'রূপলেখা' ছবিটি ছিল 'অরূপ' ও 'সুলেখা'র প্রণয়-কাহিনী এবং এই ছবি থেকেই তাঁর আশ্চর্য্য পরিচালন-নৈপুণ্য পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। বিদেশী পরিচালকের টেকনিকে ছিল তাঁর ছবিটি উদ্ভাসিত—দেখা গেছে কি সুন্দরভাবে 'ফ্ল্যাশ ব্যাকে' কাহিনী বলা যায়। নাটকীয়তার চূড়ান্ত মুহূর্ত্তে কাহিনীর মোড় ঘুরিয়ে দেবার জন্য হঠাৎ 'ফ্ল্যাশ ব্যাক' প্রবর্ত্তন করা সে সময়ে আশ্চর্য্য-বিস্ময়ে লক্ষ্য করেছি। রুশীয় পরিচালকের মত তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ছিল image-এর ওপর ভিত্তি করে; image দিয়ে দর্শককে বোঝাতে চাইতেন তিনি। তার একটি দৃষ্টান্ত আজও এত বছর পরে আমার স্পষ্ট মনে আছে—কারাগারে অরূপ গভীর রাতে মৃত্যুর প্রহর গুনছে; একটি মোমবাতি মাত্র অরূপের কাছে জ্বলছে—একক অরূপের প্রতীক হয়ে; আর বাতির শিখা থরথর করে কাঁপছে—অরূপের মানসিক অবস্থা বিশ্লেষণের সহায়ক হয়ে। সেই মোমবাতি বড় থেকে ধীরে ধীরে ছোট হয়ে এল, তখন তার শিখা স্থির। আবার পরে, অরূপ আগুনের তাপে ছটফট করছে, আর তারিখ-লেখা দেওয়ালের সামনে সম্রাট অশোক স্থির নিস্পন্দ।

এই image তিনি ব্যবহার করেছেন পরবর্ত্তী ছবিতেও অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে—তবে তখন চিন্তাপ্রগমনের সঙ্গে সঙ্গে রূপকের প্রয়োগও পরিবর্ত্তিত হয়েছে। 'দেবদাস' ছবিতে অন্ধ ভিখারীও একটি image। আজ মনে হয় এই রূপক-ব্যবহার অত্যন্ত crude—কিন্তু সে যুগে এতটা দৃষ্টিকটু ছিল না। দেবদাস কলকাতায় যেতে চায়না,

'তিন দেশের মেয়ে' চিত্রে নটরাজ গোপী-কিষণ ও সিতারা

ছবিখানি শীঘ্রই মুক্তিলাভ করবে নবগঠিত গোল্ডেন মুভী কর্পোরেশন লিমিটেডের পরিবেশনায়

দিক দিয়ে বেদুইন, চিন্তার দিক দিয়ে খেয়ালী ও ষ্টাণ্টের দিক থেকে অগ্রগণ্য। 'ছবির মধ্যে একটা কিছু দেখাতে চাই'—এই ভাবই বেশী প্রকাশ পায়। 'রূপলেখা' ছবিতে একেবারে শেষের দিকে গরুর গাড়ীতে যেতে যেতে অরূপ সুলেখাকে হঠাৎ জরিয়ে ধরতে গেল এবং সুলেখা দর্শকের দিকে আঙুল দেখিয়ে নিরস্ত করলো। কিম্বা 'মুক্তি' ছবির প্রথমেই একটার পর একটা দরজা খুলে নায়কের অগ্রসর হওয়া, কিম্বা 'মায়া' ছবিতে আজুরির সেতারের ওপর নাচ, কিম্বা 'অধিকার' ছবিতে একেবারে শেষে নায়কের নায়িকাকে 'আয় না' বলে ডাকা প্রভৃতি।

আগেই বলেছি, সার্থক প্রগতিশীল পরিচালক ছিলেন প্রমথেশচন্দ্র বড়ুয়া। সিনেমার ব্যাকরণের ওপর ভিত্তি করে, অথচ তাকে নিজের মত করে নিয়ে তিনি কাহিনীর বিন্যাশ করে যেতেন, শট গ্রহণের কৌশলও ছিল তাঁর একান্ত নিজস্ব, ক্ল্যাসিক্যাল ব্যাকরণকে অনেক সময় অবহেলা করতে দেখা গেছে—অথচ অযৌক্তিক বা অবান্তর কোথাও হয়ে ওঠে নি। সিনেমার ব্যাকরণকে তিনি অনেকখানি অগ্রসর করে দিয়ে গেছেন—এতখানি ভারতের আর কোনও পরিচালক পারেন নি।

প্রগতিশীলতার দিক দিয়ে আর একদিকে বাংলা চিত্রশিল্প তাঁর কাছে ঋণী থাকবে। তিনিই প্রথম সামাজিক কাহিনীর গোঁড়ামীতে হস্তক্ষেপ ক'রে তাকে নাড়া দিয়েছিলেন, যার পর সামাজিক চিত্রে কাহিনীর প্রগতিশীলতা দেখা গেছে। মূলতঃ তিনি রোম্যাণ্টিক বামপন্থী ছিলেন, যেমন আধুনিক কবিরা নিজেদের বামপন্থী বলে অভিহিত করেন তথাকথিত রোমান্টিকতা বর্জ্জন করেছেন বলে দাবী করে। কিন্তু কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র 'মাটির কাছাকাছি' থেকে শিখতে পারেন 'যদিও আকাশে শুধুই মেঘ চরাই' বা আরও বামপন্থী কবি দিনেশ দাস 'আকাশের চাঁদ হল এ যুগের কাস্তে' লিখেও অরোমান্টিক বলে দাবী করলেও কবিতার ভাষায় বোঝা যায় তাঁরা কতদূর রোমান্টিক ছিলেন। সেইরকম প্রমথেশচন্দ্র

বড়ুয়াও রোমান্টিক বামপন্থী ছিলেন। তিনি তাঁর চোখে দরিদ্রের সমস্যা দেখেছিলেন 'অধিকার' ছবিতে, আনতে চেয়েছিলেন সামাজিক চিত্র-কাহিনীতে বিপ্লব। বিপ্লব না এলেও সে-ই প্রথম চিত্র-কাহিনীতে প্রগতি-শীলতা দেখা গেল, যারই উন্নত রূপ 'সমাধান' বা 'উদয়ের পথে'। মূলতঃ শেষের দুটি ছবির কাহিনীও সৌখীন প্রগতিশীল। 'অধিকার' সে যুগে চিত্র-জগতে একটা হৈ চৈ সুরু করেছিল—তা' পঙ্কজ মল্লিকের 'দুঃখে যাদের জীবন গড়া', মরণের মুখে রেখে' বা 'এমন দিনে তারে বলা যায়' গানগুলির অদ্ভুত জনপ্রিয়তার জন্য নয়, গোঁড়া দর্শকমনে কাহিনীর প্রগতিশীলতা একটা দোলা দিয়েছিল আর দিয়েছিল সনাতনী শালীনতার মূলদেশে আঘাত দুটি দৃশ্যে—যেখানে প্রমথেশচন্দ্র মেনকাকে জড়িয়ে ধরেছেন ও যেখানে মেনকা যমুনার সামনে প্রমথেশচন্দ্রকে প্রশ্ন করছেন, 'বল, তুমি আমাকে চুমু খাও নি?' আজ মনে পড়ে, একদল পরমবৈষ্ণব দর্শক কিভাবে ছবিটিকে অশ্লীলতাদোষে দুষ্ট বলে অভিহিত করেছিলেন এবং অপরদল এই সাহসিকতায় স্তম্ভিত হয়ে তাঁকে অভিনন্দিত করেছিলেন। আজ হিন্দী বা বাংলা ছবিতে নায়ক ও নায়িকার প্রেম-নিবেদনের দৃশ্যে যে অন্তরঙ্গতা দেখা যায় তারই পুরোধা হয়েছেন প্রমথেশচন্দ্র বড়ুয়া। প্রায় দশ বছর আগে তিনি এতখানি সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন। সাধারণ পরিচালকের চেয়ে কতদূর অগ্রসর বা প্রগতিশীল ছিলেন তা বোঝা যাবে এই ঘটনাতেই—তিনি দশ বছর আগে যা দেখিয়েছিলেন, আজ তা ছবিতে সংক্রামক হয়ে উঠেছে।

সেইসঙ্গে মনে করা যাক্ 'মুক্তি' ছবিতে মডেলের ছবি আঁকার দৃশ্যটি। এই দৃশ্যটিতেও নগ্ন মডেলকে প্রতি-ফলিত করার জন্য তিনি যেভাবে শট গ্রহণ করেছিলেন, তাও সনাতনী রক্ষণশীল মনকে আহত করতে ছাড়ে নি। মনে করা যাক্ 'রজতজয়ন্তী' ছবিটির কথা। আজ ছবিটি ভারতে সবচেয়ে ভাল হাসির ছবি বলেই পরিচিত; কিন্তু

সভ্য ও তথাকথিত এ্যারিষ্টোক্র্যাট মানবজীবনে কত বড় যে 'স্যাটায়ার' বা ব্যঙ্গ-চিত্র তা বোধ হয় কেউ ভেবে দেখেন নি। ফাঁকা এ্যারিষ্টোক্রেসীর মুখোস প'রে মানুষ কিভাবে লোককে ঠকিয়ে বড় হবার চেষ্টা করছে, অথচ নিজের কাছে কত ছোট হয়ে যাচ্ছে—কিন্তু এই এ্যারিষ্টোক্রেসীর ভণ্ডামীও যে ধরা পড়ে যায়—'রজতজয়ন্তী' এই কথাই বলেছে। সেদিক দিয়ে কাহিনীর এতখানি প্রগতিশীলতা আর কোনও ছবিতেই তখন দেখা যায় নি। ব্যঙ্গ-চিত্রের নিয়ম-মাফিক প্রত্যেকটি চরিত্রই সিনিক্, কিন্তু প্রত্যেকটি চরিত্রই স্পষ্ট। একদিকে চটকদাবী পোষাকে সজ্জিত ভণ্ড এ্যারিষ্টোক্র্যাটের প্রতীক বর্ম্মার জমিদার, অপর দিকে বনেদী আভিজাত্যের ছবি গ্রাম্য জমিদার এবং এই দুই দলের মাঝে সুযোগ-সন্ধানী নিষ্কর্ম্মার দল। একদিকে সত্য প্রেম ও অপর দিকে ফ্লার্ট, একদিকে হৃদয় ও অপর-দিকে স্বার্থ—এই ত্রয়ীর দ্বন্দ্ব 'রজতজয়ন্তী'। কাহিনীর অভিনবত্বে ও বিন্যাশের বলিষ্ঠতায় আজ পর্য্যন্ত কোনও কৌতুকচিত্র এর ধারে-কাছে যেতে পারে নি।

শরৎচন্দ্রের 'দেবদাস' ও 'গৃহদাহ' ছবির চিত্ররূপ তিনি দিয়েছেন এবং বলবো যে বেশ সাফল্যের সঙ্গেই তিনি দিয়েছেন। 'দেবদাস' ছবিটির কোথায় কাহিনীটি সুরু করা উচিত, ছেলেবেলার ঘটনা কতটুকু দেখানো উচিত, দেবদাস ও পার্ব্বতীর ভালোবাসা কিভাবে পরিস্ফুট করা যেতে পারে, তা সে যুগে তিনি অপূর্ব্ব কৃতিত্বের সঙ্গে দেখিয়েছেন। দেবদাস মাছ ধরছে, পার্ব্বতী পাশে বসে আছে—ছোট্ট তিনটি ফ্ল্যাশব্যাকে অতিক্রতভাবে দেখিয়ে দেওয়া হল দেবদাসের বাল্যজীবন। অথচ অতি সম্প্রতি শরৎচন্দ্রের 'স্বামী' বা 'মেজদিদি'র চিত্র-রূপায়নে পরিচালক পশুপতি চট্টোপাধ্যায় ও সব্যসাচী প্রথম দিকের ঘটনা অহেতুক টেনে নিয়ে গেছেন। প্রমথেশচন্দ্র বড়ুয়ার দক্ষতা এইটুকুতে স্পষ্ট হবে।

প্রমথেশচন্দ্র বড়ুয়ার চিত্র-পরিচালনাকে দুটি যুগে ভাগ করা যায়—(১) নিউ থিয়েটার্সের যুগ ও (২) পরবর্ত্তী যুগ। নিউ থিয়েটার্সের যুগেই তাঁর পরিচালন-প্রতিভার কিছু দোষগুণ, ভাল-মন্দ দেখা গেছে এবং এই সময়েই তিনি পরিচালনাকাশের শীর্ষে উঠেছিলেন। এই যুগেই তাঁকে বিভিন্নধর্ম্মী পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে দেখা গেছে, দেখা গেছে দিন দিন অগ্রগমনের ঐকান্তিক ইচ্ছা এবং নিজের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত রাখার চেষ্টাও তখন তাঁর ছিল। এই সময়েই তাঁর কাছ থেকে এইসব ছবি পাওয়া যায়—রূপলেখা, দেবদাস, মুক্তি, মায়া, অধিকার, রজতজয়ন্তী এবং হিন্দী দেবদাস, মঞ্জিল, মুক্তি, মায়া, অধিকার ও জিন্দগী। এর প্রত্যেকটি ছবিতে তিনি পরিচালন-নৈপুণ্যের একান্ত নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের ছাপ রেখে গেছেন এবং প্রায় প্রত্যেকটি ছবিই প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করে।

অথচ সেই প্রমথেশচন্দ্র বড়ুয়া নিউ থিয়েটার্সের বাইরে এসে যে ছবি তুললেন তার দু'একটা জনপ্রিয় হলেও একজন বুদ্ধিমান দর্শককে হতবুদ্ধি করে তোলেন যে তাঁর সমস্ত বৈশিষ্ট্য ধুয়ে মুছে তিনি সাধারণ স্তরে নেমে এলেন কি করে? এ যুগের ছবি হয়েছে শাপমুক্তি, মায়ের প্রাণ, উত্তরায়ণ, শেষ উত্তর, জবাব (হি), চাঁদের কলঙ্ক, আমীরী (হি) ও ইরাণ কি এক রাত (হি)। এর মধ্যে শাপমুক্তি ও শেষ উত্তর (হিন্দী জবাব) অপূর্ব্ব জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করলেও আমি এক নিঃস্ব-প্রতিভা পরিচালককে দেখতে পেয়েছি। জানি না, কোনও কারণে চিত্রশিল্পের কাছ থেকে তিনি ব্যথা পেয়েছিলেন কিনা; কারণ, 'মায়ের প্রাণ' ছবিতে চিত্রশিল্পকে তীব্র ব্যঙ্গ করতেও দেখেছি এবং এই শিল্পের ওপর অভিমান করেই তিনি আর ভাল ছবি তোলার দিকে নজর দেন নি কিনা জানি না।

প্রমথেশচন্দ্র বড়ুয়ার ছবির সবচেয়ে ক্রটি এই যে তিনি ঠিকমত নাটক গঠন করে তুলতে পারেন না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চূড়ান্ত নাটকীয়তাকেও মনে হয়েছে কৃত্রিম, সে নাটকীয়তায় যেন প্রাণ নেই। 'দেবদাস' ছবিটি বাদ দিলে অন্যান্য ছবির নাটক-গঠনের কৃত্রিমতা অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাঁর এই দৌর্ব্বল্য সমস্ত চিত্র-যুগ ধরেই বলবৎ ছিল। আর একটি বৈশিষ্ট্য তাঁর ছিল এই যে তাঁর সব ছবিই প্রায় নায়ক-প্রধান, ঠিক যে

বৈশিষ্ট্য দেখা যায় Orson Welles-এর ছবিতে। তার ছবিতে অন্য চরিত্র যেমন ধারে পড়ে থাকে, তেমনি সমস্ত দায়িত্ব এসে পড়ে নায়কের (অর্থাৎ তাঁর) ঘাড়ে। এদিক দিয়ে তিনি দেবকীকুমার বসুর একেবারে বিপরীত, দেবকী বসুর ছবি মূলতঃ নায়িকা-প্রধান। আর তাঁর ছবিতে পাওয়া যায় দৃশ্য পরিকল্পনায় এবং পরিবেশনায় কাল্পনিক অথচ মনোজ্ঞ ব্যবহার, যা অনেক সময় fantastic বলে মনে হয়। বাংলায় প্রথম সার্থক ট্র্যাজেডী 'দেবদাস' তাঁরই কৃতিত্ব এবং দর্শক কেঁদে এত পয়সা আর কোন ছবিতে দেয় নি। ছবিটির অনন্যসাধারণ জনপ্রিয়তা আজও কিছুমাত্রায় কমে নি: তাই দিয়ে বোঝা যায় ছবিটির উৎকর্ষ।

'মুক্তি' ছবিটি বাংলা চিত্রজগতে একটি নতুন যুগ দিয়েছে। রাধা ফিল্মসের হঠাৎ জনপ্রিয়-হওয়া 'মানময়ী গার্লস্ স্কুলের' কাননবালাকে তিনি 'মুক্তি' ছবিতে নামান (কানন দেবী), চেহারায় এবং অভিনীত চরিত্রে যে শুধু গ্ল্যামারই দিলেন তা' নয়, অপূর্ব সুধাকণ্ঠী অভিনেত্রী হিসাবে তাঁকে সবচেয়ে জনপ্রিয়া করে তুলেছিলেন। সেই ছবিতেই তিনি পঙ্কজ মল্লিককে প্রথম সঙ্গীত-পরিচালকের স্বীকৃতিই শুধু দেন নি, ছবিতে নামিয়ে আরও জনপ্রিয় করে তুলেছেন। তিনিই 'মুক্তি' ছবিতে রবীন্দ্র-সঙ্গীত ব্যবহার করেন এবং তার পরেই বাংলা ছবিতে রবীন্দ্র সঙ্গীতের চল হয়।

ভারতের চিত্রশিল্পের অন্যতম স্রষ্টা, প্রতিভাদীপ্ত, যাযাবর হৃদয়বৃত্তিসম্পন্ন প্রমথেশচন্দ্র বড়ুয়া আজ নষ্ট-স্বাস্থ্য। আজ আর তাঁর কাছ থেকে একটিও ছবি আশা করা যায় না এবং শেষ যুগে তিনি যে ধরণের ছবি দিয়েছেন, তাতে তাঁর সুনামকে তিনি ক্ষুণ্ণ করেছেন। তাই মনে হয়, আর কোনও দিনই মধ্য গগনের সূর্যের মত রৌদ্রচ্ছটা তাঁর ছবিতে দেখা সম্ভব নয়। কিন্তু আমি আশ্চর্য হয়ে ভাবি—একই লোকের দুই যুগের চিন্তাশক্তিতে এত আকাশ পাতাল ব্যবধান কেন?

নরাধম-এর

বোম্বাই চিঠি

সম্পাদকর্জী,

'জয় হিন্দ' বলে তো থার্ড ক্লাসে তুলে দিয়ে হাওয়া, আর তারপরের দুর্ভোগ যদি আপনার পোহাতে হ'ত! থার্ড ক্লাসে বিশেষ কোন অসুবিধা হয় নি, 'জয় হিন্দ' অনেক উপকার করেছিল—যাত্রীরা ধরে নিয়েছিল নিশ্চয়ই কংগ্রেসের পাণ্ডা গোছের কেউ হব। তাই আদরযত্ন খুবই পেলাম, কথাও দিতে হল মন্ত্রী হলে তাঁদেরও আদরযত্ন করব।

কিন্তু বোম্বে ষ্টেশনে পৌঁছে দেখলাম—সে এক বিচিত্র ব্যাপার! একেবারে লাইন করে লোক দাঁড়িয়ে আছে আর প্রত্যেক যাত্রীকে জিজ্ঞাসা করছে—কোথা হতে আগমন, কি নাম ঠাকুর? যদি জানতে পারে যে কলকাতা থেকে আসছে এবং সিনেমার লোক, তবে সে কি খাতির! নিজেরাই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে প্রযোজক ধরে নিয়ে এসে চাকরী দিয়ে দেয়। আমারও প্রথম কয়দিন খাতিরের কথা ভুলতে পারবো না; কিন্তু যে মুহূর্ত্তে শুনলো যে আমি ডাইরেক্টারও নই বা হিরোও নই, সেদিন থেকেই আর কাউকে দেখতে পেলাম না।

সে কথা বাদ দিন। বোম্বের সিনেমার অবস্থা বিশেষ ভাল নয় বলেই মনে হচ্ছে। কারণ, যখন দুর্দ্দিন আসে তখনই ইউনিয়ন বা এ্যাসোসিয়েসন খাড়া করার প্রয়োজন হয়ে ওঠে। সম্প্রতি দুটো এ ধরণের ইউনিয়ন গড়ে উঠেছে। একটি প্লেব্যাক গায়ক-গায়িকাদের, অপরটি লেখকদের। প্লেব্যাক আর্টিষ্টদের সমিতির সভাপতি হয়েছেন দুরাণী; সহ-সভাপতি গীতা রায় এবং সম্পাদক শৈলেন মুখোপাধ্যায়। এই সমিতি যে শেষ পর্য্যন্ত কী করবে বলা কঠিন। কারও স্বার্থে আঘাত লাগলে এই সমিতির কী অবস্থা হয়, দেখা যাক্।

আর একটি সমিতি হয়েছে ওখানকার চিত্র-কাহিনী-কারদের নিয়ে। দাদারে প্রোগ্রেসিভ পিকচার্সের অফিসে পণ্ডিত সুদর্শনকে সভাপতি করে প্রথম সভার অধিবেশন সুরু হয় এবং নরেন্দ্র শর্ম্মা, শাকিল বাদায়ুনি, কামার জালালাবাদী, রামায়া, বলরাজ সহানী, পণ্ডিত সুদর্শন বক্তৃতা দেন। শেষ পর্য্যন্ত সমিতির সভাপতি হয়েছেন মাধোক, সহ-সভাপতি হয়েছেন পণ্ডিত সুদর্শন ও মহেশ কাউল, নরেন্দ্র শর্ম্মা ও হসরৎ লক্ষ্ণৌই যুক্ত সম্পাদক এবং শাকিল বাদায়ুনি কোষাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হয়েছেন।

বোম্বের চিত্রকাহিনীকারদের সমিতির কথা শুনে হাসি পেল। বোম্বের কয়টি ছবিতে কাহিনী থাকে বলুন তো? সবই তো এক—গোটা কুড়ি দুলকি চালে দেশী-বিদেশী সুরে চীৎকার বা গান, কোমর দুলিয়ে লাফানো বা নাচও তার সঙ্গে এবং বড়লোকের ছেলে ও গরীবের মেয়ের ন্যাকামি!

মজার কথা শুনুন। প্রায় প্রত্যেকটি বক্তাই হিন্দী ছবির গল্পে বিলিতী গল্পের চোলাই সম্বন্ধে মন্তব্য করেন। একজন বলেন—এ ছাড়া গরীব লেখকের আর কোনও উপায় নেই। প্রযোজকই গল্প বলে দেন আর তাঁদের তাই লিখতে হয়।

এ ধরণের সমিতি, আমার মনে হয়, হওয়া খুব ভাল হয়েছে। তবে তাঁদের এখন এই স্থির করা উচিত যে প্রত্যেক বছর পাঁচজন করে চিত্রকাহিনীকারকে বাংলা দেশে গল্প লেখা শিখতে পাঠানো হবে। তবেই যদি ওখানকার চিত্র-কাহিনীর উন্নতি দেখা যায়।

বোম্বেতে তারকাদের জীবন খুব রোমাঞ্চকর। আজ যার দর দেড় লাখ টাকা কাল হয়তো দেড় পয়সাও নয়। ধরুন না, সুরাইয়া ১৯৪৯-৫০ সালে এক লাখ দেড় লাখ টাকার কমে একটা ছবিতে নামতেনই না, সেই সুরাইয়াকে

লোকে ভুলে গেল। মাঝে নার্গিস মধুবালার যুগ চলেছিল, এখন এসেছে নূতন আর নলিনী জয়ন্তের যুগ। তবে এদের দিনও গেল বলে। এখনকার ছবিতে অভিনয়ের দিক দিয়ে তারকা হয় না আমার ধারণা যৌবন ও নূতনত্বের দিক দিয়েই তারকা জনপ্রিয় হয়। সুরাইয়া যতদিন নূতন ছিলেন এবং প্রথম যৌবনে ছিলেন, ততদিন সুরাইয়া সুরাইয়া। নয় ত আজ নূতনবালাও একজন তারকা হয়!
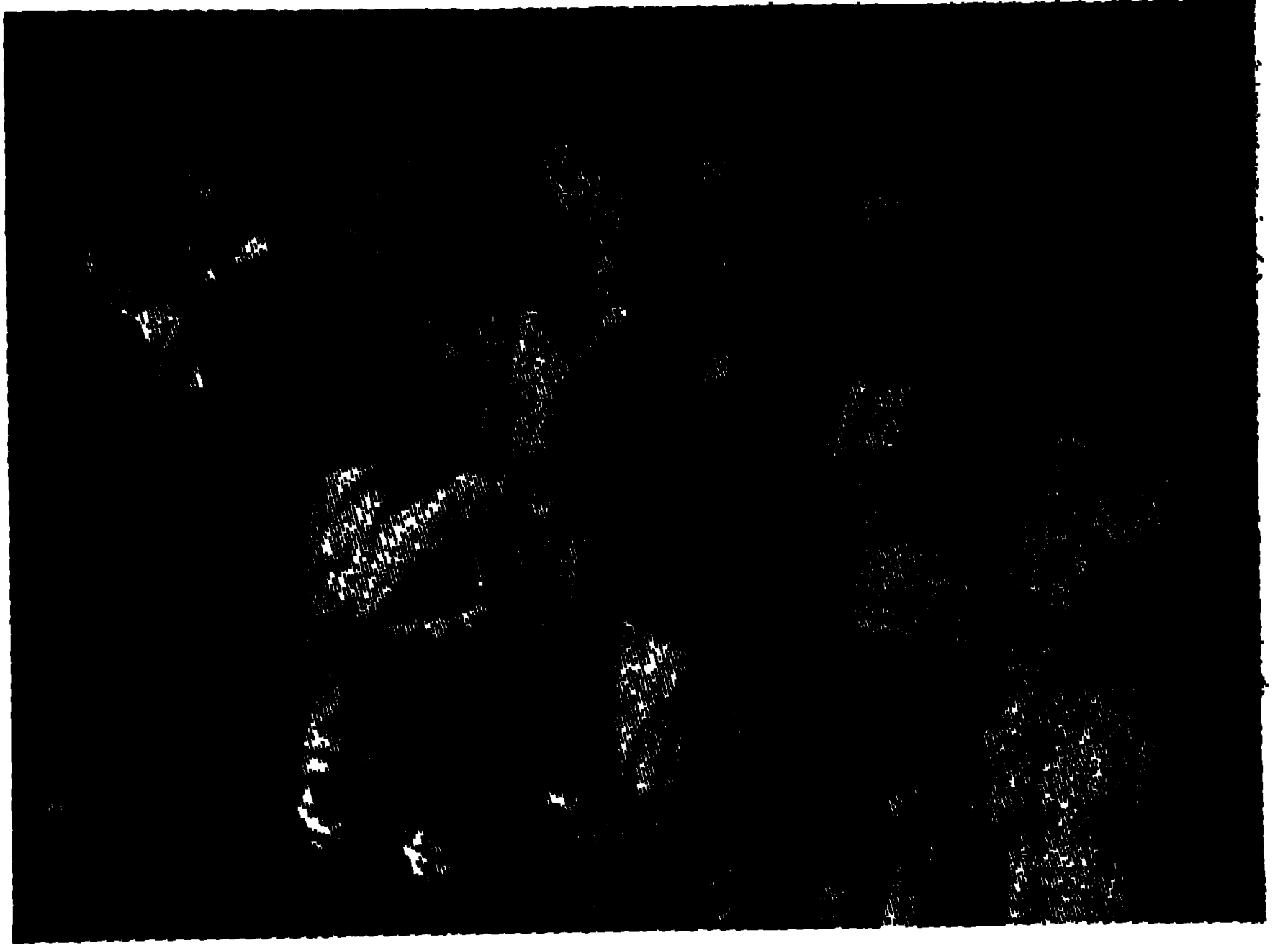
বোম্বাই-এ চিত্র-সাংবাদিক ও চিত্রতারকাবৃন্দের পিকনিক পার্টি: ছবিতে প্রতিমা দাশগুপ্তা, বেগম পারা, প্রেমনাথ, ডেভিড, নূতন সমর্থ প্রভৃতিকে দেখা যাচ্ছে

যৌবন দিয়েই যদি তারকার জনপ্রিয়তা নির্দ্ধারিত হয় তো আমাদের কানন, চন্দ্রা, মলিনার আজ বাণপ্রস্থে যেতে হত। তবেই ভেবে দেখুন আমাদের দর্শকদের সঙ্গে ওদের দর্শকের কতখানি পার্থক্য। একদা আমাদের দর্শক তারকার নাম দেখে ছবি দেখতে যেত, আজ পরিচালকের নাম দেখে ছবি দেখতে যায়। ওদের ওখানে আজ তারকা দেখে ছবি দেখার যুগ চলছে। অন্ততঃ দশ বছর আমাদের থেকে বোম্বে পিছিয়ে।

বোম্বের আরও মজার খবর তারকা-জোড়ের কাহিনী। জোড়ায় না হলে তারকাদের জনপ্রিয়তা থাকে না এবং তারকারা এই জোড়া মেনে চলতে আপ্রাণ চেষ্টা করেন। আর সবচেয়ে মজা এই যে, কোনও এক অভিনেতার সঙ্গে অভিনেত্রীর ঘনিষ্ঠতার সম্বন্ধে যদি সামান্য কানাঘুষোও চলে, তবেই একটি জনপ্রিয় টিম তৈরী হয়ে যায়।

সুরাইয়া ও দেব আনন্দের বিবাহের গুজবের পরে দেব আনন্দের বরাত ফিরে গেল। কামিনী কৌশলও দিলীপকুমারের কেলেঙ্কারী কাণ্ডের জন্যই এঁরা একদার সর্ব্বজনপ্রিয় টিম ছিলেন। আজ অশোককুমার আর নলিনী জয়ন্ত একটি টিম। মজা এই যে এঁদের একজনকে ছবিতে নিলে অপর একজনকে না নেওয়া পর্য্যন্ত তিনি ছবিতে মুখ দেখাবেন না। 'সমাধি' ছবিতে এঁরা একত্রে প্রথম অভিনয় করেছেন, তারপর 'সংগ্রাম', 'সালোনি', 'নাজ', 'নৌ বাহার', 'নাগমা', 'জলপরী', 'কাফিলা' প্রভৃতি গোটা বারো ছবিতে এঁদের একত্রে দেখা যায়।

রাজকাপুর ও নার্গিস 'আগ' ছবিতে একত্রে অবতরণ করেন, তারপর 'বরসাত' ছবিতে সবচেয়ে জনপ্রিয় টিম হল। এখন এঁরা একত্রে নামছেন 'প্যার', 'এম্বার', 'খুন' 'বেওয়াফা', 'আসিয়ানা', 'রাজতিলক' ও 'আওয়ারা'। এঁদের মিলন সম্বন্ধেও একটা জোর গুজব বাজারে চলছে।

এখনকার কাহিনী হয়েছে মধুবালা ও দিলীপকুমারকে নিয়ে। এঁদের দুজনের নাকি বিয়ে হবে। ঠিক তার পরেই দেখা যাচ্ছে এঁদের একত্রে 'তারাণা', [illegible] 'সঙদিল' ও 'গোহর' ছবিতে।

এখানকার তারকাদের কথা বেশী না বলাই ভাল। কয়েকজন এমন কাণ্ড করছেন যে কানে শুনতেও খারাপ লাগে। বিশেষ খ্যাতিসম্পন্না কয়েকজন অভিনেত্রীর স্বামী ব্যতীতও অন্য প্রণয়ী আছে বলে গুজব এবং একথা শোনা যায় যে তাঁদের অবাধ প্রেমের পথ নিষ্কণ্টক করার জন্য তাঁরা তাঁদের স্বামীকে দূরদেশে বেড়াতে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

এখানকার অভিনেত্রীদের মধ্যে মধুবালার দয়াশীলা বলে বিশেষ খ্যাতি আছে দেখলাম। বাংলা ও বোম্বাইয়ে অনেকেই তো প্রচুর উপার্জন করেন; কিন্তু কয়জন মধুবালার মত দানধ্যান করেন জানি না। বাঙলার উদ্বাস্তুদের সাহায্যের জন্য মধুবালার পঞ্চাশ হাজার টাকা দানের কথা বোধ হয় আজও ভোলেন নি। সম্প্রতি তিনি সঁইয়া ছবির শেষ সুটিং দিন শ্রী ষ্টুডিওর নিম্ন কর্ম্মচারীদের পাঁচ হাজার টাকা দান করেন।

বেগম পারাকে নিয়ে যেরকম পায়রা ওড়ানো হলো সে খবর নিশ্চয়ই পেয়েছেন। বেগম পারার একমাস একসপ্তাহ জেল ও পঁচিশ টাকা জরিমানা হয়েছে। গত ৩রা জানুয়ারী রাত্রে মত্তাবস্থায় লাইসেন্সবিহীন অতি বেগে তিনি মোটর চালিয়ে যাচ্ছিলেন এবং রাস্তায় এ পাশ ওপাশ করে টলতে টলতে তিনি চার জন পথিককে চাপা দেন। আর এক ড্রাইভার এক পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর পিছু তাড়া করে সান্তাক্রুজ এরোড্রামের কাছে তাঁকে ধরেন। ম্যাজিষ্ট্রেট বিনা লাইসেন্সে মোটর চালানোর জন্য তাঁকে একমাস জেলের হুকুম দেন; মত্তাবস্থায় মোটর চালানোর জন্য একসপ্তাহ জেল ও পঁচিশ টাকা জরিমানা করেন ও দুর্ঘটনার জন্য আরও একমাস জেলের হুকুম দেন।

বেগম পারাকে আদালত থেকে জেলে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁকে একবার দেখার জন্য আর্থার রোড জেলের সামনে প্রচুর ভিড় হয়। জামিনে খালাস তিনি প্রথম দিন পান না; এক রাত্রি কারাবাসের পর তিনি জামিনে মুক্ত হন এবং তাঁর গুণমুগ্ধবৃন্দ তাঁকে মাল্যভূষিত করে। হাইকোর্টে তাঁর পক্ষে আবেদন করে বিশেষ ফল তো হয়ই না বরং মাননীয় বিচারপতি বলেছেন যে তাঁর শাস্তি আরও বাড়ানো
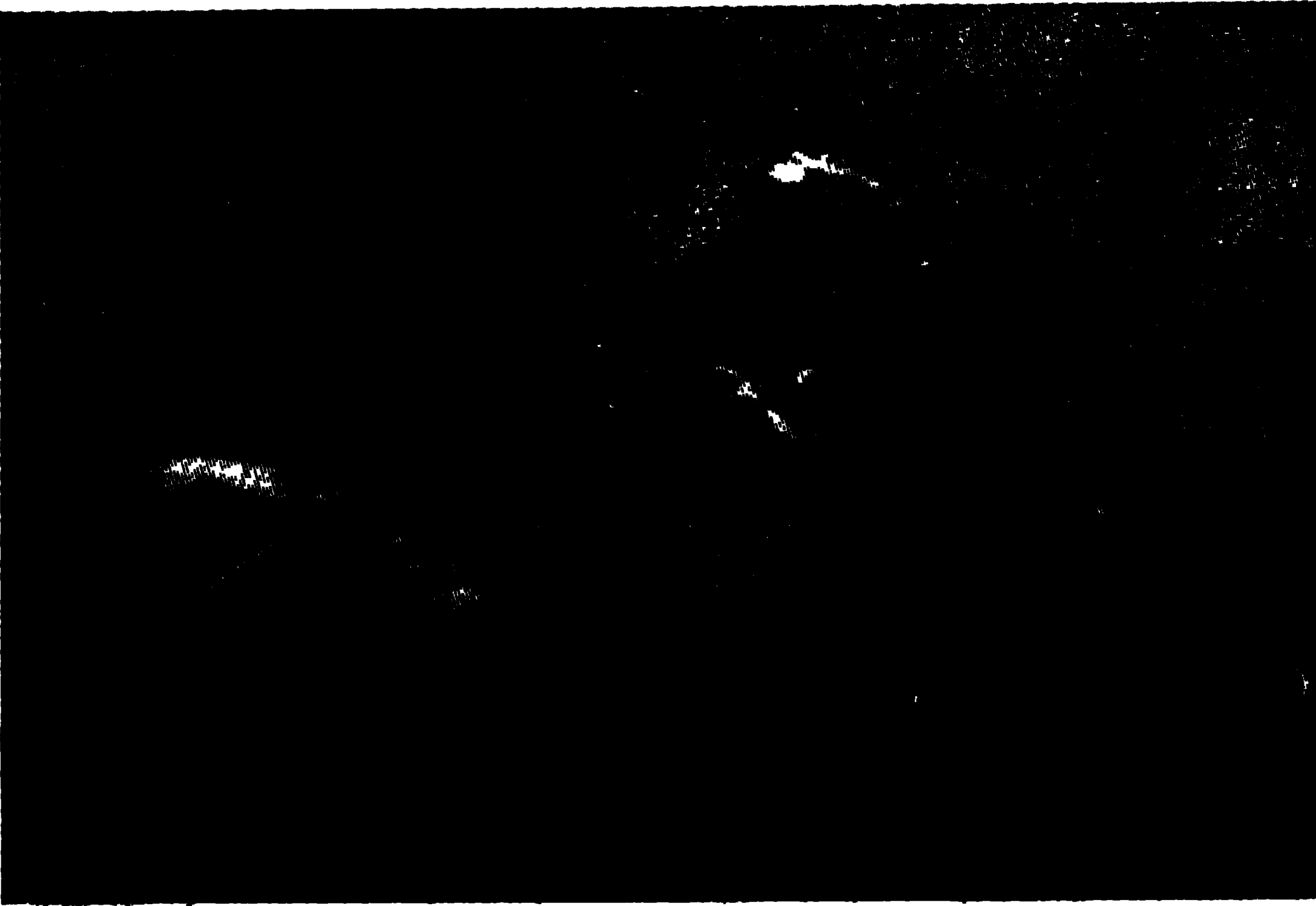
‘জোয়ান অফ আর্ক’ ছবিতে ইনগ্রিড বার্গম্যান বললে ভুল হচ্ছে কী? ছবির বাইরে নবতর রূপসজ্জায় ‘জিঘাংসা’ ছবির জলায় পেত্নী

উচিত কিনা সেটাই চিন্তনীয়। এই গণ্ডগোলের ফলে বাংলা দেশে 'বাগদাদ' ছবির কি অবস্থা হবে?

এবারে যে সংবাদ দেব তাতে কলকাতার চিত্র-ভাবকাদের ঘুম হবে না। ওখানকার জনপ্রিয় অভিনেতা-অভিনেত্রীরা একসঙ্গে ক'টা ছবিতে কাজ করছেন এবং খুব বেশী হলে কত টাকাই বা পান? বোম্বের কয়েক-জন তারকা এখন ক'টি ছবিতে কাজ করছেন আমি তার তালিকা দিচ্ছি। এঁদের সকলেই প্রায় এক লাখ থেকে দু'লাখ টাকা একটি ছবিতে নিয়ে থাকেন বলে প্রকাশ।

মধুবালা—খাজানা, সাজ, সইয়াঁ, তারাণা, সঙ্দিল, বেতাব, সাকী, ভাওয়ান', দাগ ও গোহর।

নূতনবালা—শীশম্, পর্ব্বত, নিরমোহি, হামলোগ, হাঙ্গামা, শিবওয়া।

নার্গিস—বেওয়াফা, রাজতিলক, এম্বার, ধুন, আঙ্গারে, আনহোনি, সাগর, আওয়ারা, আশি-য়ানা, পাপী ও মোহব্বত।

গীতাবলী— আল-বেলা, জলপরী, জল-জলা, ডাকু, আনন্দমঠ, জাল, এক-থা-লেড়কা, সঙ্গম ও তাহেলকা।

নলিনী জয়ন্ত—জল-পরী, সালোনী, নাজ, কাফিলা ও নৌ-বাহার।

কাক্কু--খা জা না, শীশম্, হামলোগ, চমকী, নির্ম্মল।

অশোককুমার—ঢোলা মারু, জলপরী, সালোনী, নাগমা, বেতাব, নাজ, কাফিলা, নৌ-বাহার, শোলে, মোহব্বত, বেওয়াফা, রাগরঙ্, বাগদাদ, চঞ্চল।

দিলীপকুমার—তারাণা, সঙ্দিল, শিকোয়া, দাগ, গোহর।

রাজকাপুর—এম্বার, ধুন, আনহোনি, আশিয়ানা, পাপী, বেওয়াফা, আওয়ারা, রাজতিলক।

গোপ—খাজানা, শীশম্, সাই প্রোডাকসন নং ১, হাঙ্গামা, সাকী।

কিন্তু একদার জনপ্রিয়া অভিনেত্রী সুরাইয়া এখন এক মাত্র 'সাঁওরা' ছবিতে কাজ করছেন। সুমিত্রা দেবী 'বাবা' ছবিতে কাজ করছেন, ছবির কি নাম রে বাবা! কিন্তু মুস্কিলে পড়েছেন মীরা মিশ্র। প্রথমে গিয়ে যে ছবিতে নামলেন, তার নাম হলো 'চোর', আর এখনকার ছবির নাম 'পাপী'। এ ধরণের ঠাট্টা বোধ হয় আর কাউকে করা হয় নি।

বোম্বাই-এর ছবির নাম শুনলে আঁৎকে উঠবেন—'হাঙ্গামা' আর 'ঝামেলা'। তাছাড়া 'সিন্ সিনাকি বুবলা বু' বা 'সাঙে কি সাঙে' তো আছেই। এ ছাড়াও সইয়াঁ, বাঘী, সাকী, বাবা, ঢোলা মারু, ডাকু, পাপী আপনাদের চমকে দিতে পারে। আমার মনে হয়, বাঙলা দেশে 'মার কৈলাস', 'উত্তম মধ্যম', 'ধপ্ ধপ্ ধপাস্', 'উঁহু হুঁ হুঁ হুঁ', 'বাবা', 'হাতীর মতন শুঁড়' মার্কা ক'টা ছবি করলে বাংলা চিত্রশিল্পের যথেষ্ট উন্নতি হবে। দেবকী বোসকে বলুন না যে হিন্দী 'রত্নদীপের' নাম পাল্‌টে 'য্যায়সা ক্যা ত্যায়সা' রাখতে!

শ্যামের ঘোড়া থেকে প'ড়ে মারা যাওয়ার পর থেকে আজকাল আর সহজে কোনও অভিনেতা ঘোড়ায় চড়তে চাইছেন না আর যদি কেউ একবার ঘোড়া থেকে পড়ে যান তো আর কথাই নেই। সেদিন বড় এক মজার কাণ্ড হয়েছে। উল্লাস ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে মনে করলেন যে আর হয়তো বাঁচবেন না। তাই ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠলেন—মা, মর গ্যয়া। সহজে কেউ তাঁকে বিশ্বাস করাতে পারছিলেন না যে তাঁর বিশেষ চোট লাগে নি।

আমি আপনাদের পাল্লায় পড়ে বোম্বে আসার পর মাত্র ছ'টি ছবির মহরতে গেছিলাম। ছবি কটির নাম, জলজলা, জলোয়া, বাঘী, ইলজাম, জিন্দগী ও তিন বন্ধুর ছবি। এর মধ্যে 'জলজলা' ছবির বিজ্ঞাপনে নায়িকা নিম্মির পরে নায়ক দেব আনন্দের নাম ছাপা হওয়ায় দেব আনন্দ রাগ করে মহরতে যোগদান করেন নি।

'শোলে' নামে একটা ছবি হচ্ছে, তার একটা গল্প বলি শুনুন। ছবির গানের প্লেব্যাক করার জন্য বোম্বের নাম-করা গায়ক মুকেশকে সঙ্গীত-পরিচালক নিয়েছিলেন কিন্তু মুকেশের গাওয়া নাকি কারও পছন্দ হয় নি। তাঁকে আবার গাইতে অনুরোধ করা হলে তিনি লিখে জানিয়ে দেন যে দ্বিতীয়বার আর তিনি গাইবেন না। সঙ্গীত-পরিচালক তখন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের শরণাপন্ন হন। হেমন্তবাবু প্রথমে আর এক শিল্পীর গান গাইতে সম্মত

হন না ; কিন্তু যখন জানতে পারলেন যে মুকেশ দ্বিতীয়বার গাইতে রাজী হচ্ছেন না, তখন তিনি গাইতে স্বীকৃত হলেন। তাঁর গানগুলি সকলের খুব ভাল লেগেছে এবং বোম্বাইয়ে এত ভাল পুরুষকণ্ঠ এখন নেই বলেও সকলে সার্টিফিকেট দিয়েছেন। শুনে খুশি হবেন নিশ্চয়ই।

এখানকার তারকাদের মধ্যে 'চিত্রবাণী'র গ্রাহক-গ্রাহিকা করার চেষ্টা করলাম। সকলেই বলছেন, আগে বাঙলা শিখিয়ে দিন, তারপর 'চিত্রবাণী' রাখবো। এঁদের বাঙলা শেখানোর জন্য কি বোম্বাইয়ে থেকে যাব ?

নমস্কার জানবেন। আর কলকাতার কাউকে 'নাগরদোলা'য়. চাপাতে পারলাম না বলে চিত্রশিল্পের যাঁদের আক্ষেপ হচ্ছে, তাঁদের জানাবেন যে আগামী সংখ্যায় নিশ্চয়ই তাঁদের 'নাগরদোলা'য় চাপিয়ে ছাড়বো।

৺বিজয়ার পরে যদি শারদীয়া 'চিত্রবাণী' প্রকাশিত হয় তো আপনারা সকলেই আমার ৺বিজয়ার শুভ আলিঙ্গন নেবেন ; নয়তো প্রয়োজন নেই। ইতি—

বিনয়াপ্পত—নরাধম

অনুভা • স্মৃতি
বিকাশ • রবীন
ছবি • কানু
ছায়া • ভানু
ও বেলা
অভিনীত
এ, কে, ডি,
প্রোডাকসনের

জবানবন্দী
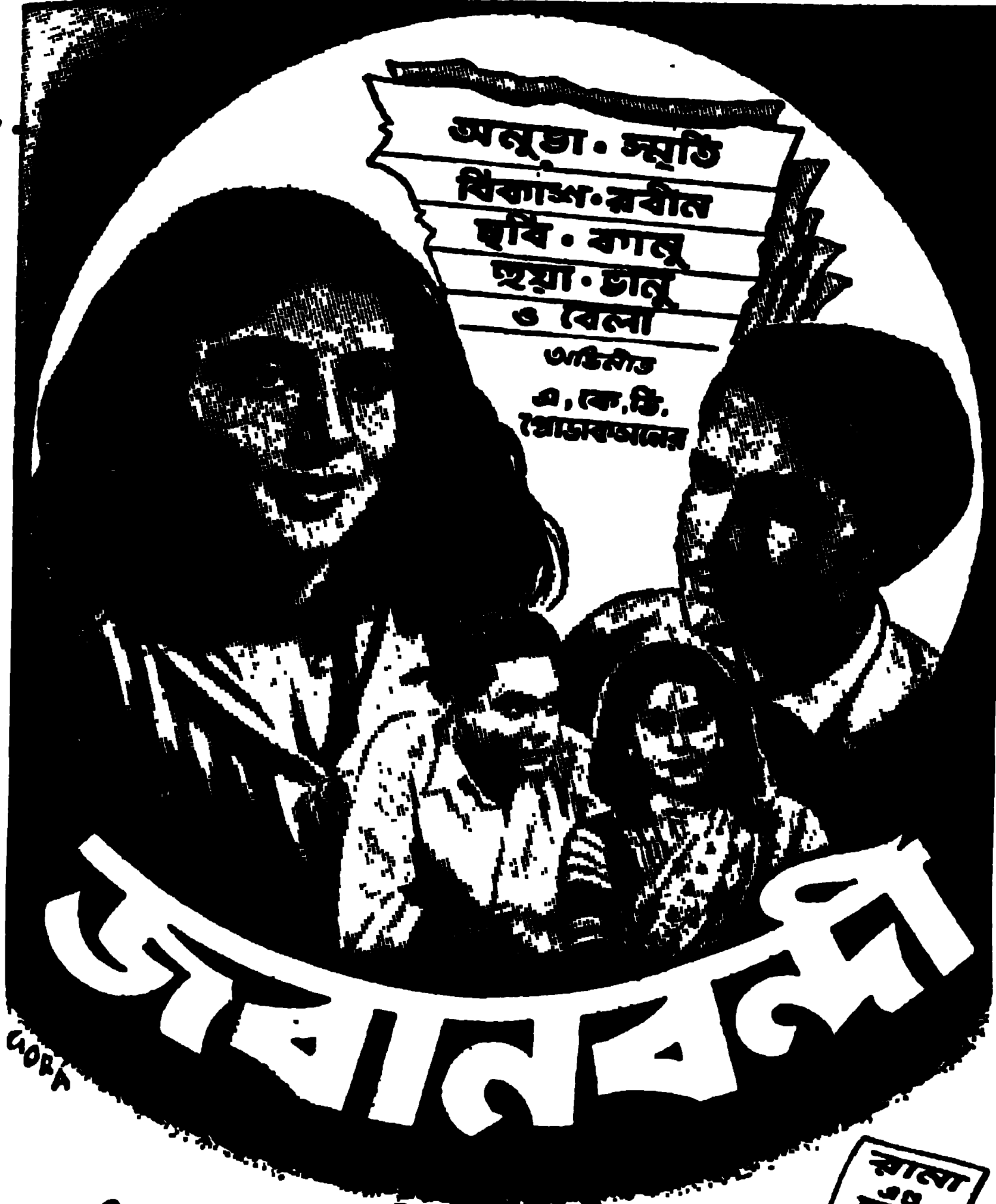
এক নারীর আবেদনে আর এক নারীকে নৃশংসভাবে হত্যা করার পশ্চাতে কি ভাল উদ্দেশ্য থাকতে পারে ?

●
●
●

......নিরঞ্জন চৌধুরী আপনাদের তাহাই জানাবেন এই চিত্রে—

পূজার পরই
মুক্তিলাভ করবে

★

পরিচালনা- অমর দত্ত
সঙ্গীত- গোপেন মল্লিক
কাহিনী- প্রণব রায়

রাণা এণ্ড দত্ত রিলিজ

এ, কে, ডি প্রোডাকসনের পরবর্ত্তী চিত্র নিবেদন ॥

ডাকগাড়ী : চিঠি

পরিচালনা : অজিত দত্ত
কাহিনী : প্রণব রায়
সুর-শিল্পী : জগন্ময় মিত্র

প্রযোজনা ও পরিচালনা : অমর দত্ত
ভূমিকায় : বম্বের ২জন শ্রেষ্ঠ চিত্রতারকা

একমাত্র পরিবেশক : রাণা ও দত্ত : ৩, ম্যাডান ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

বাংলা ছবির শব্দগ্রহণ

বাণী দত্ত

(প্রধান শব্দ-যন্ত্রী : ক্যালকাটা মুভিটোন লিঃ)

অনুমান বিশ বা বাইশ বছর আগে বাংলাদেশে যেদিন নির্ব্বাক চলচ্চিত্র মুখর হ'য়ে চিত্রামোদীদের অভিনন্দন জানালো, সেদিন চলচ্চিত্রজগতে এক বিপুল আনন্দ ও আলোড়নের সৃষ্টি হ'য়েছিল। দর্শকের কৌতূহল এবং নূতনের মোহে চিত্রব্যবসায়ীরা পেতে লাগলেন প্রচুর অর্থ এবং ছবিতে যাঁরা শব্দযোজনা ক'রেছিলেন, সেই শব্দ-যন্ত্রীরা পেলেন প্রচুর সম্মান—চিত্রজগতের প্রযোজক, পরিচালক, শিল্পী ও কর্ম্মীবৃন্দের কাছ থেকে।

তখনকার দিনে কোনও নূতন অভিনেতা বা অভিনেত্রী নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে তাঁদের "voice test" করা হ'ত এবং মাইক্রোফোনের উপযুক্ত স্বর বা বাচন না থাকলে তিনি যত বড়ই অভিনেতা হোন না কেন, তাঁকে নিরাশ হ'তে হ'ত। নির্ব্বাকযুগের অনেক নামকরা নায়ক নায়িকাকে বিদায় নিতে হ'য়েছিল চলচ্চিত্রজগৎ থেকে, কেবলমাত্র মাইক্রোফোনের উপযোগী স্বর না থাকার জন্য। বর্ত্তমানে কোনও অভিনেতা বা অভিনেত্রী নির্ব্বাচনের সময়ে তাঁদের অভিনয় দক্ষতা ও মুখশ্রীর ওপরেই বেশী লক্ষ্য রাখা হয়, যদিনা তাঁদের voice ও articulation খুব খারাপ হয়।

তখনকার দিনে ছবিকে দিয়ে কথা বলাতে পারলেই প্রযোজকেরা সন্তুষ্ট হ'তেন এবং সেই কথার শতকরা ৮০ ভাগ বোঝা গেলে শব্দযন্ত্রী নিজেকে ধন্য মনে করতেন। চিত্রসমালোচক ও দর্শক তাঁকে প্রথম শ্রেণীর শব্দ-যন্ত্রী বলে অভিনন্দন জানাতে কুণ্ঠিত হ'তেন না। অবশ্য শব্দ গ্রহণের অসুবিধা তখন ছিল অনেক।

নীচে প্রথমযুগের প্রধান কতকগুলি অসুবিধার কথা ও সেগুলির বর্ত্তমান উন্নতির বিষয় উল্লেখ করা হ'ল :—

(১) Sound Recording machine :—

বাংলাদেশে সবাকচিত্র তোলবার মাত্র ২।৩ বছর আগে চলচ্চিত্রের জন্মস্থান হলিউডে শব্দযন্ত্রের প্রথম প্রচলন হয়। শব্দযন্ত্র বা শব্দগ্রহণের তখন শৈশবাবস্থা। তখনকার শব্দযন্ত্র এখনকার তুলনায় অনেক অনুন্নত ছিল। আমাদের দেশে যে সমস্ত শব্দযন্ত্র ব্যবহৃত হয় তার বেশীর ভাগই আমেরিবায় প্রস্তুত। আমেরিকানরা প্রগতিশীল জাতি। তারা প্রতি বছরেই নূতন মডেলের উন্নত ধরণের শব্দযন্ত্র বাজারে ছাড়তে লাগলো এবং সেইসব যন্ত্রের কতকগুলি বাংলাদেশেও এসে পৌঁছলো। বাংলা দেশে ছায়াছবিতে শব্দ গ্রহণেও উন্নতি দেখা দিল। এখানে একটা কথা উল্লেখ করা হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, গত তিন বছরের মধ্যে উন্নত ধরণের যেসব শব্দযন্ত্র বা আনুষঙ্গিক (accessories) আবিষ্কৃত হয়েছে, তার একটিও বাংলা দেশের ষ্টুডিওগুলিতে আনানো হয়নি। সম্ভবতঃ আর্থিক অস্বাচ্ছল্য অথবা উচ্চ দৃষ্টিভঙ্গীর অভাববশতঃ। অথচ দেখা যায় বোম্বাই ও দক্ষিণ ভারতের ষ্টুডিওগুলিতে নূতনতম যন্ত্রগুলি ব্যবহৃত হচ্ছে।

(২) Studio Stage accoustic :—

Studio stage (Floor বা মঞ্চ) বাইরে থেকে দেখতে একটা পাটের বা চালের গুদাম ছাড়া আর কিছু নয়। চারিদিকে ৩০।৩৫ ফুট উঁচু দেওয়াল আর একটি অথবা দু'টি লোহার বড় টানা দরজা এবং করোগেটের টিন বা এ্যাস্‌বেস্‌টাসের ছাদ। পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীর শেয়ার বিক্রীর পক্ষে এই জাতীয় Floor বা মঞ্চ যথেষ্ট হ'তে পারে, কিন্তু শব্দগ্রহণের পক্ষে তা' সম্পূর্ণ অচল। সবচেয়ে সেরা শব্দযন্ত্র দিয়ে যে কোনও বিখ্যাত শব্দযন্ত্রীকে এরকম Floor-এর মধ্যে শব্দগ্রহণ করতে দিলে তাঁর সুনাম রক্ষা করা তো দূরের কথা, ভবিষ্যতে তাঁর জীবিকার্জ্জনই কঠিন হ'য়ে পড়বে। Floor accoustic-এর উন্নতিসাধন করতে হবে—Floor-এর echo ও reverberation (শব্দ-প্রতিফলন) দূর করে চারিদিকের দেওয়াল ও ছাদের ভিতর দিকটা নরম জিনিষ যথা তুলার গদি, নারিকেল ছোবড়ার গদি, পাটের কম্বল অথবা মোটা কাপড় কুঁচি দিয়ে ঝোলালে echo ও reverberation অনেক কমে যায়। এ ছাড়া আজকাল নানারকম Sound absorbing slabs বাজারে কিনতে পাওয়া যায়, সেগুলির ব্যবহারেও কিছু সুফল পাওয়া যায়। বাংলা দেশে শব্দগ্রহণের একেবারে প্রথম দিকে এ বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়নি। আজকাল সকল ষ্টুডিও-নির্ম্মাতাই এ বিষয়ে কিছু না কিছু লক্ষ্য রাখেন—যদিও ঠিক যেমনটি হওয়া উচিত তেমনটি কোনও ভারতীয় ষ্টুডিওতে দেখ্‌তে পাওয়া যায় না।

(৩) Set design :—দৃশ্যপটের পরিকল্পনার ওপরেও শব্দগ্রহণের তারতম্য নির্ভর করে। আগেকার দিনের বেশীর ভাগ শিল্প-নির্দ্দেশকই (Art-Director) এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখতেন না।

(৪) Camera Noise :—

আগেকার দিনের চিত্রগ্রহণের Camera থেকে খুব শব্দ হ'ত, সে-জন্য মৃদু ধ্বনি record করা সম্পূর্ণ অসম্ভব ছিল। অভিনেতা-অভিনেত্রীকে জোরে কথা বলতে নির্দ্দেশ দেওয়া হ'ত। প্রেমিক-প্রেমিকার প্রেমালাপ অথবা মুমূর্ষু ব্যক্তির সংলাপও চেঁচিয়ে না বললে Camera-র ঘর্ঘর শব্দে চাপা পড়ে যেত। এ ভাবে অভিনয় যে কতটা অস্বাভাবিক তা সহজেই অনুমেয়। আজকাল উন্নত ধরণের Camera থেকে কোনও শব্দ বেরোয় না। কোনও কোনও ক্ষেত্রে শব্দ-নিবারক Blimp বা আচ্ছাদন ব্যবহৃত হয়। বর্ত্তমানে মৃদু ধ্বনি record করা সহজ-সাধ্য হয়েছে।

(৫) Microphone Boom:—

আগেকার "Mike Boom" (যাতে মাইক্রোফোন ঝোলানো হয়) তা shot-এর মাঝে আগু-পিছু অথবা উঁচু-নীচু করা যেতো না। পরিচালক ও Artist-কে শব্দযন্ত্রী জানিয়ে দিতেন কথা বলতে বলতে চলা-ফেরা করা, মুখ নীচু করে কথা বলা বা মাইক্রোফোনের দিকে পেছন ফিরে কথা বলা চলবে না। কিন্তু এইসব ধরা বাঁধার কুফল দাঁড়ালো যে, সবাকচিত্র আর চলচ্চিত্র রইলো না, হয়ে দাঁড়ালো মঞ্চাভিনয়ের মত আড়ষ্ট। পরিচালকরা এত বাঁধাবাঁধি মানতে রাজী হলেন না। তাঁরা শব্দযন্ত্রী-দের অনুরোধ জানালেন উপায় উদ্ভাবনের জন্য। আজকাল নূতন ধরণের mike boom-এ ছবি তোলবার সময়েই মাইক্রোফোনকে আগু-পিছু বা উঁচু-নীচু করা সম্ভব হয়েছে—বাধা-নিষেধও অনেক দূর হয়েছে।

(৬) Post-synchronisation বা Dubbing :—

এই পদ্ধতিতে যে সমস্ত সংলাপের

শব্দগ্রহণ খারাপ হয় সেগুলিকে বদলে নেওয়া যায়। আগেকার শব্দ-যন্ত্রীরা এ সুযোগ পাননি।

(৭) Play-back system:—

প্রথম যুগে গায়ক বা গায়িকার গান record করার সময়েই তাঁর ছবি তুলতে হ'ত। গানের প্লে-ব্যাক পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হওয়াতে সে অসুবিধা দূরীভূত হয়েছে। ধরুন পাহাড়ের ওপর ঝর্ণার ধারে নায়িকা গান গাইবেন। বিরাট পিয়ানো, অর্গ্যান, সেলো ইত্যাদি বাদ্য-যন্ত্র ও ২০।২৫ জন বাদককে নিয়ে যেতে হবে সেই পাহাড়ের ওপর। গান রেকর্ড করা হচ্ছে এমন সময় হয়তো একটি গরু কিংবা একটা কুকুর চিৎকার করে উঠলো। গানটি নষ্ট হয়ে গেল। প্রচুর অর্থ ও সময় নষ্ট হ'ত মাঠে ঘাটে গান record করতে। ছোট জেলে-ডিঙ্গিতে নদীর বুকে মাঝি গান গাইতে গাইতে চলেছে। Direct taking করা প্রায় অসম্ভব, কিন্তু প্লে-ব্যাক পদ্ধতিতে আজকাল এটা সম্ভব। প্লে-ব্যাক প্রথায় ষ্টুডিওর মধ্যে গান আগে রেকর্ড করা হয় এবং পরে ছবি তোলা হয়। পূর্বে record-করা সেই গানটিকে play-back machine-এর সাহায্যে বাজানো হয় এবং ঐ গান শুনে শিল্পী ঠোঁট নেড়ে ক্যামেরার সামনে ঐ গান গাইতে থাকেন আর তাঁর ছবি তোলা হয়।

প্লে-ব্যাক পদ্ধতিতে গান রেকর্ড করা অনেক কম ব্যয়সাপেক্ষ এবং গানও অনেক সহজে সুন্দরভাবে রেকর্ড করা যায়। এই পদ্ধতির সবচেয়ে বেশী সুবিধা এই যে প্রয়োজন হ'লে একজনের গাওয়া গান অপরের কণ্ঠে দেওয়া যায়। ধরুন, কোনও অভিনেত্রী সুন্দরী, কিন্তু তিনি গাইতে জানেন না আর একজন সুগায়িকা ভগবান যাঁকে সুকণ্ঠ দিয়েছেন কিন্তু কার্পণ্য করেছেন তাঁকে সুরূপা করতে। সুগায়িকার গান তুলে ছবিতে সুরূপাকে দিয়ে গান গাইয়ে দর্শক ও শ্রোতাকে মোহিত করা যায়।

(৮) Re-recording:—

যে কোনও দুটি শব্দ (সংলাপ music) পৃথকভাবে গৃহীত হওয়ার পর দুটিকে Re-recording machine-এর সাহায্যে একত্রীকরণকে re-recording বলে। এতে নাটকের ভাব (mood) উপযুক্ত সুরের সাহায্যে সমৃদ্ধ করা যায়। শব্দগ্রহণের প্রথম যুগে এই প্রথাটি আমাদের জানা ছিল না। এখন প্রায় সব ছবিতেই এর ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। ট্রেনের কম্পার্টমেণ্টের মধ্যে ২ জন কথা বলছেন। সেই সংলাপ পৃথকভাবে গ্রহণ করা হল এবং পরে সুবিধামত রেলগাড়ী চলার শব্দ পৃথকভাবে তোলা হ'ল। এই দু'টি শব্দকে re-recording করে একত্রীভূত করলে মনে হবে চলন্ত গাড়ীর মধ্যে দুজনে কথা বলছেন।

(৯) Processing:—

শব্দগ্রহণ করতে আমরা শব্দ তরঙ্গের Photo

Sound camera বা Recorder-এর সাহায্যে ফিল্ম-এর ওপর তুলে থাকি। ছবির পরিস্ফুটন (Processing) যে রকম প্রয়োজনীয় শব্দের পরিস্ফুটনও সেই রকম প্রয়োজনীয়। সঠিক Density ও Gamma না হ'লে recording ভাল হবে না। প্রথম যুগের শব্দ-পরিস্ফুটন সম্বন্ধে জ্ঞান আমাদের খুব অল্পই ছিল। বর্তমানে এর অনেক উন্নতি হ'লেও এ বিষয়ে আমেরিকার তুলনায় আমরা অনেক পিছিয়ে আছি। প্রেক্ষাগৃহে আমরা যে শব্দ শুনি তার উৎকর্ষ অনেকাংশে নির্ভর করে sound projection ও hall accoustic-এর ওপর। প্রথম যুগে নির্ব্বাকচিত্র-প্রেক্ষাগৃহগুলিতে শব্দ পরিক্ষেপন-যন্ত্র (Sound Projectors) বসিয়ে সবাকচিত্র দেখান হ'ত। তখন Hall accoustic-এর প্রতি লক্ষ্যও বিশেষ কেউ রাখতেন না এবং ঐ বিষয়ে অভিজ্ঞতাও আমাদের খুব অল্প ছিল। পরে যেসব চিত্রগৃহ নির্ম্মিত হয়েছিল সেগুলির accoustic সম্বন্ধে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছিল। আগেকার Sound Projector-গুলির চেয়ে আজকাল-কার Sound Projector অপেক্ষাকৃত ভাল হ'লেও Cinema Hall accoustic ও Sound Projection-এর দিক থেকে এখনও আমাদের দেশের বেশীর ভাগ প্রেক্ষাগৃহগুলি পিছিয়ে আছে।

সকল বিষয় আলোচনা করলে দেখতে পাওয়া যায় প্রথম যুগের শব্দগ্রহণ ও শব্দ-পরিক্ষেপনের তুলনায় আজ-কালকার শব্দগ্রহণ ও শব্দ-পরিক্ষেপন অনেক উন্নততর। উল্লিখিত নানা অসুবিধা সত্ত্বেও উচ্চ দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন প্রযোজক ও কলা-নিপুণ পরিচালকের সাহচর্য্যে বাংলা দেশের শব্দযন্ত্রীরা বর্ত্তমানে সর্ব্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবেন বলেই আমার বিশ্বাস।

জীবন-বিস্ময়

অশোককুমার

ভাগ্য না পুরুষকার—কোন্‌টা বড় বলুন তো? ওঁদের দুটোকেই আমি সমীহ ক'রে চলি, চটাবার সাহস পাই না কাউকে। কে যে শ্রেষ্ঠতর সেটা তর্ক নয়, অভিজ্ঞতা-সাপেক্ষ। যুক্তি দিয়ে প্রমাণ ক'রতে গেলে মুক্তি মেলে না তর্কপ্রহেলিকার বেড়াজাল থেকে—'তাল চিপ্‌ ক'রে পড়ে কি প'ড়ে চিপ্‌ করে'র মতো ঘুরে বেড়াতে হয়। সমাধান হয় তো বা পাওয়াও যায়, স্থিরত্ব থাকে না তার থাকে না নির্দিষ্টতা—জীবন থেকে জীবনে, সময় থেকে সময়ান্তরে উত্তরের বিভিন্নতা দেখা দেয়। ভাগ্য বক্রী হোলে পুরুষকার যেমন খোঁড়া, তেমনি পুরুষকার বেঁকে বসলেও ভাগ্য হন বিড়ম্বিত। এমন এক পরিস্থিতিতে বুদ্ধিমানের কাজ হবে দু'টোকেই সন্তুষ্ট করা। করিও তাই, প্রয়োজনবোধে একই সঙ্গে সর্প ও শার্দূলকে চুম্বনের নীতি অবলম্বন ক'রে।

প্রথম জীবনে ভাগ্যটা আমার ছিল খেয়ালী। সেটা প্রসন্নতারই লক্ষণ, কারণ মন ভরা না থাকলে এলোমেলোমীর মাধুর্যে গা ভাসানো চলে না। তাই বুঝি ক্যাপা-খুশি ভাগ্য পুরুষকারকে কোন-ঠাসা ক'রে নাকে আমার দড়ি দিয়ে ঘুরিয়েছিল জীবন থেকে জীবনান্তরে। ভাববার অবসর পাইনি, পাইনি আঁকড়ে থাকতে মনমতো স্থির কোন লক্ষ্যকে। কেবলই ভেসে বেড়িয়েছি। আর জীবন ভ'রে উঠেছে মুঠো মুঠো বিস্ময়ে।
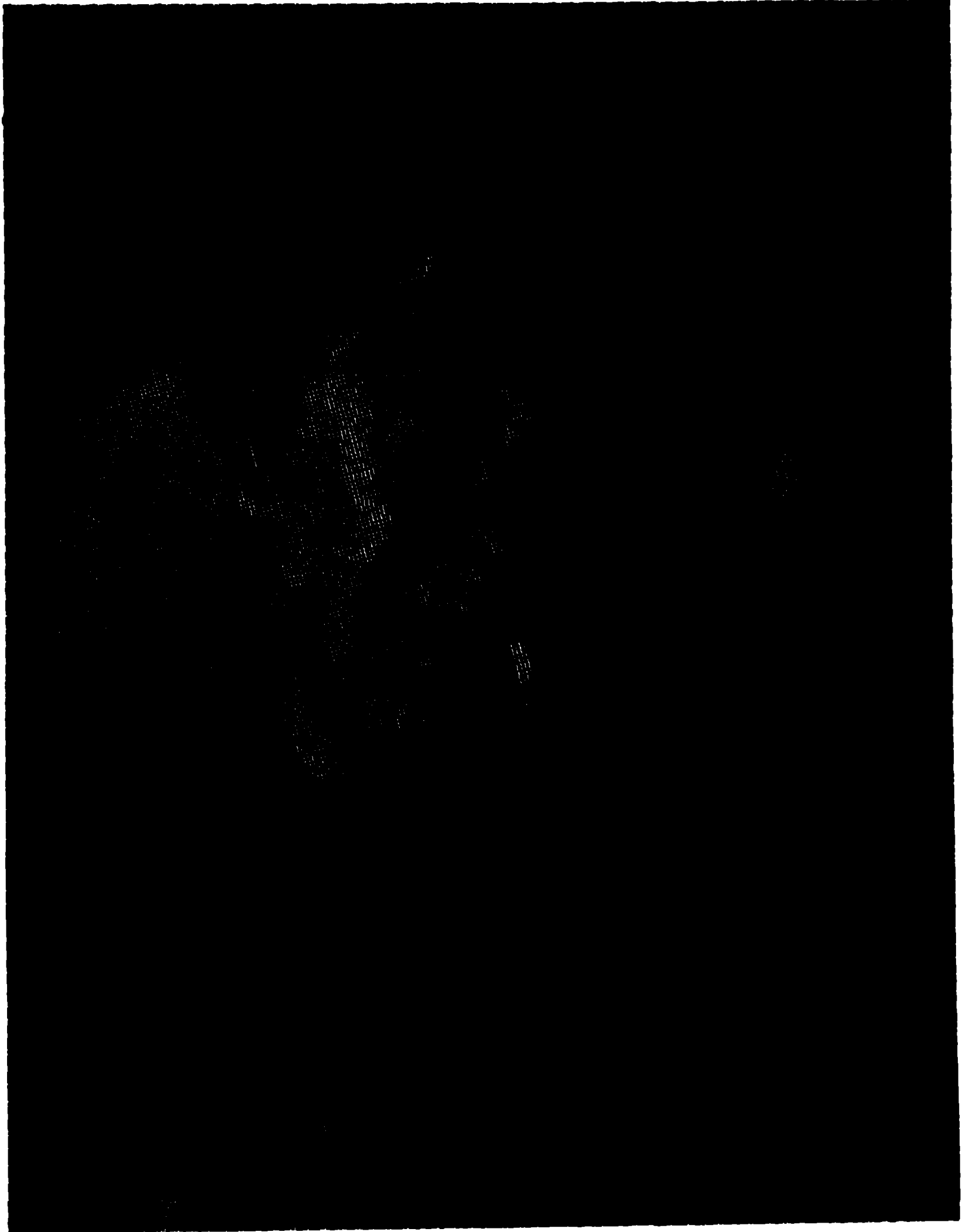
বিচিত্রতর রূপসজ্জায় অশোককুমার

বিস্ময় বৈকি! ভেবেছিলাম বিজ্ঞানী হব, সাধনা ক'রব রসায়নের। ভারী ভালো লাগতো ল্যাবরেটরীর শান্ত পরিবেশটি—যন্ত্রের জটিলতায়, এ্যাসিড আর এ্যারোম্যাটিক্‌সের অম্লমধুর স্বাদে-গন্ধে ভরা—সে যেন এক স্বপ্নপুরী! কিন্তু স্বপ্নের সঙ্গে মাটির সংযোগ খুব অল্পই, ভালো না লাগলেও ভালো-লাগাকে না-লাগার সঙ্গে আপোষ ক'রতেই হয় প্রাত্যহিক জীবনে। এ হোল বাস্তবের নির্মম নিয়ম। তাই যখন বেঁকে গেল জীবনের গতিপথ, অলক্ষ্যের অনুশাসনে ঘুরে গেল চলমান হাল—মানিয়ে নিতে হোল নতুন পরিস্থিতিকে ছিন্ন-কল্পনার ব্যথাতুর মন নিয়েও। তেমনি কোন ক্রুত

কর্মহীন অবকাশে অনুভব ক'রি তার আকর্ষণ। ভাবি কেমিষ্ট্রি যখন হোল না, ফটো-কেমিষ্ট্রিতে হোতে পারে? নিদেন সিনেমাটোগ্রাফী? তাতেও তো যাহোক ল্যাবরেটরীতে নিশ্চিন্ত আশ্রয় মিলবে। স্থির ক'রে ফেললাম বিলেত গিয়ে চলচ্চিত্রের বৈজ্ঞানিক দিকটা নিয়ে গবেষণা আর পড়াশোনা ক'রবো। এ বিষয়ে কিছু পাকা পরামর্শের প্রয়োজন। কিন্তু যাই কার কাছে? মনে প'ড়ে গেল হিমাংশুদা'র কথা। হিমাংশুদা' তখন তাঁর ইউফা'র (জার্মানীর ইউ, এফ, এ) কলাকুশলী ভক্ত-চ্যালাদের নিয়ে ছবির আখড়া খুলেছেন বোম্বাইতে। তবে আর ভাবনা কি! গড়ানে পাথরটায় আবার সঞ্চার হোল গতির। তখনও অবিশ্যি তাতে শ্যাওলা কিছু জমেনি, জমবো জমবো ক'রছে। আইনের বিরুদ্ধে বে-আইনী বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রে পাড়ি জমালাম বোম্বাইয়ে।

বাসনা শুনে উল্লসিত হোলেন হিমাংশুদা'—একই পথের তিনি আমার পথিক-গুরু। তাই চিন্তার ঐক্যে মনের মিল হ'য়ে উঠলো গাঢ়তর। আমায় স্থান দিলেন তাঁর ল্যাবরেটরীতে—বোম্বে টকীজের সবসেরা ক্যামেরা-ম্যান জোসেফ উইরশিং-এর সহকারী হিসেবে। মাসিক দেড়শো' টাকা মাইনে, বার্ষিক পঞ্চাশ টাকা হারে বেতন বৃদ্ধির চুক্তি। এক মুঠো চাঁদ যেন পেয়ে গেলাম হাতে। এর বিনিময়ে হাইকোর্টের জজিয়তী ছাড়তেও প্রস্তুত ছিলাম—সেদিন এমনি অকুণ্ঠ মোহ আমার বিজ্ঞানের পরিবর্ত্তন, হাত নেই যার ওপর মানুষের—তাকে বিস্ময়াকুলই ক'রে তোলে, চিন্তাকুল নয়।

বিস্ময় বৈকি! ল্যাবরেটরী থেকে হঠাৎ ছিটকে প'ড়লাম সুট-কোর্টে—প্রকৃতির শৃঙ্খলা থেকে মানুষের বিবাদ-বিসম্বাদে, অণু-পরমাণুর সূক্ষ্মতা ছেড়ে হিন্দু-আইনের স্থূল দায়ভাগে। আজও ভেবে পাইনি কেমিষ্ট্রির ডিগ্রী নিয়ে কেন সেদিন আইন প'ড়তে গিয়েছিলাম। ভুলেও ভাবিনি শামলা চাপিয়ে সওয়াল-জবাবে বিচারকের কাছ থেকে অনুকূল রায় আদায় করবো কোনদিন।

সেটা উনিশ-শো-পঁচিশের জানুয়ারী। নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনের শেষ বছর। তখনও মনের শ্লেটে মুছে যায়নি ল্যাবরেটরীর আঁকটা, তখনও মাঝে মাঝে

ওপর। সানন্দে কাজে নেমে প'ড়লাম ঝাঁপিয়ে। ল্যাবরেটরীর প্রায়ান্ধকার কোণে ব'সে ডেভালাপিং, প্রোসেসিং, কাটিং আর এডিটিঙের ধাপে ধাপে ছবির আঙ্গিক সজ্জায় সহায়তা ক'রতে লাগলাম। কিন্তু……

তখনও একটা বড় বিস্ময়ের বাকী। অপেক্ষায় ব'সেছিল আমার বিচিত্র প্রথম-জীবনের বক্র-সর্পিল পথ-প্রান্তে। সে যেন একটা জীবন-বিপ্লব! পাহাড়ে নদীর তির্যক প্রবাহ-ধারার আমূল গতি পরিবর্তন। আকাশ-ছোঁয়া অভাবনীয়তায় স্তম্ভিত মন আমার ছিটকে প'ড়লো। ছবিতে নামতে হবে।

ছবির মহরৎ-উৎসবেও পৌরোহিত্য করতে হয় অশোককুমারকে

হ্যাঁ, হিমাংশুদা'র নির্দেশ—'জীবন নইয়া'য় দেবীকা-রাণীর নায়ক হোতে হবে আমায়। আমি ক'রবো অভিনয় ক্যামেরার সামনে! এর চেয়ে সাক্ষীর কাঠ-গড়ায় দাঁড়ানো যে ঢের ভালো, ঢের সহজ জটিল ফৌজদারীর আসামীকে জেরা করা। মুখ-চোরা মন আমার রাঙা হ'য়ে উঠ্‌লো সম্ভাবিত লজ্জায়, সঙ্কুচিত হ'য়ে প'ড়লো বিজ্ঞানের প্রিয় পরিবেশকে হারানোর আশঙ্কায়। কিন্তু উপায় কি?

নিরুপায় মগজে হঠাৎ চাড়া দিয়ে উঠ্‌লো ছোট-বেলাকার সেই দুষ্টু বুদ্ধিটা। স্কুল ফাঁকি দিতে রসুন বগলে রোদে ব'সে জ্বর আমদানী ক'রতাম ছাত্রজীবনে। সেদিন বেহিসেবী ছুটির বন্ধনহীন আনন্দ উপভোগের জন্যে ছলনার আশ্রয় নিতাম, নিতাম তার কারণ পোষা বাঘ শিকারের মতো বাঁধা ছুটির আস্বাদটা কেমন যেন জোলো মনে হোত। আর আজ হয়তো জানিনা নিজেই নিজের কোন্ স্বর্ণময় ভাগ্যকে ফাঁকি দিতে চ'লেছি। ভবিষ্যতের ভাণ্ডারে কি আছে কে ব'লতে পারে। তবুও আমি কৃতসঙ্কল্প। ঠিক ক'রেছি রেহাই পেতেই হবে কোন রকমে হিমাংশুদা'র হাত থেকে।

হুকুম শুনেই তাই হাজামের কাছে গিয়ে চট্ ক'রে কদম-ছাঁটে মাথাটা মুড়িয়ে ফেললাম। ঘোল অবিশ্যি ঢালিনি, সেটা ঢাললেন হিমাংশুদা', খাওয়ালেনও বটে। ভাবলাম ন্যাড়া হোলে হয়তো বা নিস্তার পাবো। কিন্তু পাঁক মাখলেও যম ছাড়ে না। নাছোড়বান্দা হিমাংশুদা' দৃঢ়তায় অটল: নামতেই হবে আমাকে, তার জন্যে ছবি যদি পেছিয়ে যায় সেওভি আচ্ছা।

থেমে রইলো 'জীবন নইয়া'। পুরো দু'টি মাস হিমাংশুদা' ব'সে রইলেন অপেক্ষায়। মাথায় আমার লম্বা লম্বা চুল গজালো। ঘাড় ধ'রে হিড়্ হিড়্ ক'রে জোরে টেনে নিয়ে গেলেন। সে কি আমার কাঁপুনী! একে প্রথম নায়ক হোয়েছি তায় আবার কিনা দেবীকারাণীর! ভয়ের আর অপরাধ, ছি! এর আগে অবিশ্যি একবার
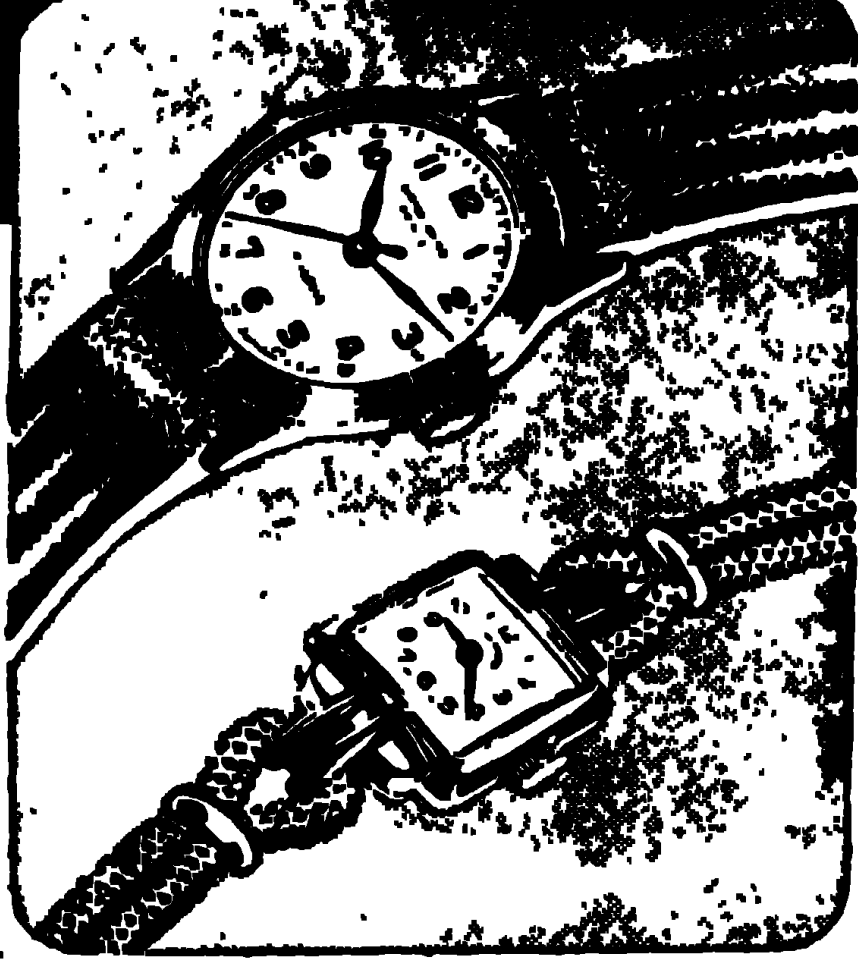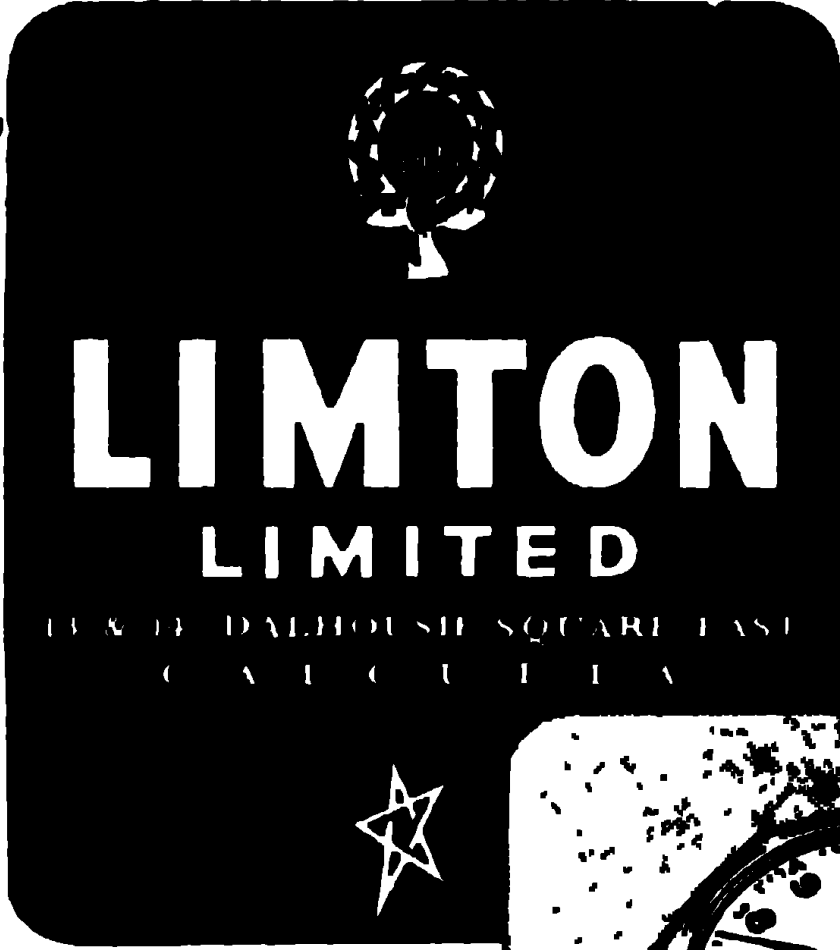
নেমেছিলাম—তা' নেহাৎই একষ্ট্রা হিসেবে। ল্যাবরেট-রীতে কাজ ক'রতে ক'রতে 'জওয়ানী-কি-হাওয়া'য় ছোট্ট একটা ভূমিকায় ঠেকা দিয়েছিলাম। সে যাই হোক সেদিন বলিদানের অসহায় ছাগশিশুর মত কাঁপতে কাঁপতে 'জীবন নইয়া'য় কি অভিনয় ক'রেছিলাম মনে না থাকলেও এটা ভুলিনি যে হিমাংশুদা'কে মনে মনে যৎপরোনাস্তি গাল দিয়েছিলাম। সেদিন বুঝিনি যে এই জহ্লাদরূপী হিমাংশুদা'ই হবেন আমার জীবনের পরম আশীর্বাদ, আর একদিন এই যূপকাষ্ঠেবদ্ধ কম্পমান ছাগের সাধনা হ'য়ে উঠবে অভিনয়-শিল্প।

বিস্ময় বৈকি! ল্যাবরেটরী থেকে ছবির পর্দায়! দাঁতের ডাক্তারকে মুদীখানার দোকান খুলতে শুনলেও তেমন কিছু অবাক হবার থাকে না। কিন্তু এ আমার কি হোল! ভাগ্যের এ কি লীলা-বৈচিত্র্য! জীবনটাকে নিয়ে লোফালুফি খেলতে খেলতে এ কোন্ নতুন খাতে তিনি আমায় গড়িয়ে দিলেন। বরফের গোলার মত জীবন আমার গড়িয়ে চ'ললো চিত্রের পর চিত্রের ক্রমবর্দ্ধমান সার্থকতার গতিবেগে। আমি হোলাম বিজ্ঞানী নয়, অভিনেতা।

এবার সুরু হোল পুরুষকারের পালা। জীবনের পাগলা-ঝোরা খুঁজে নিয়েছে তার নির্দিষ্ট স্থির ধারাটি—শিল্পী-জীবনের উর্মিমুখরতার মাঝে। 'জীবন নইয়া'র পর 'অচ্ছুৎ কন্যা'র অভূতপূর্ব সাফল্যে বিরাট দর্শক-সমাজের প্রতি নিজের দায়িত্বকে আর এড়াতে পারলাম না। জীবন-বিস্ময়ের চরম ধাক্কাটা সামলে নিয়ে ফরমুলার কেতাব ছেড়ে টেনে নিলাম অভিনয় শিক্ষার বই। ফেরবার আর পথ নেই। না বুঝে স্তুতি যখন একবার অর্জন ক'রে ফেলেছি তখন অভিনেতার যোগ্য করে তুলতে হবে নিজেকে। পুডভ্কিনের সব ক'টা বই প'ড়ে ফেললাম, আনিয়ে নিলাম লণ্ডন থেকে ওদের নাট্য-শিল্পের বইগুলো। একটার পর একটা গিলতে লাগলাম ইংরাজী ছবি—আমার প্রিয় তারকাদের, রোনাল্ড কোলম্যান আর স্পেন্সার ট্রেসির।...

তারপর কেটে গেছে অনেক বছর, পেরিয়ে এসেছি অনেক পথ। জানি না আজ কোথায় এসে দাঁড়িয়েছি। সে বিচারের ভার আমার নয়, আপনাদের—যাঁরা আমায় ক'রেছেন স্নেহমুগ্ধ। নিরন্ধ্র কর্মজীবনে ভাবালুতার অবকাশ বড় কম। তবুও অনেক সময় মনে পড়ে হিমাংশুদা'কে—চিত্রজগতের সবচেয়ে সেই বড় মানুষটিকে। মনে হয় আজ যদি তিনি থাকতেন, আমার সমস্ত গৌরবের বোঝা উজাড় ক'রে দিতাম তাঁর পায়ে। ভারমুক্ত হোয়ে হয়তো আর ফিরে আসতাম না ষ্টুডিওর কলকোলাহলে বোম্বাইয়ের নির্জন সমুদ্রসৈকত ছেড়ে, দূরে ফেলে সেক্সপীয়ারের অমর সৃষ্টিকে।

নতুন ছবি

আনন্দমঠ

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের অমর উপন্যাস—'আনন্দমঠ'। ১১৭৬ সালের ভয়াবহ মন্বন্তর, মুসলমান শাসনকর্তাদের শাসনের নামে শোষণ, ইংরেজ বণিকদের অত্যাচার, হিন্দু প্রজাদের জাগরণ—এই কয়েকটি ঐতিহাসিক সত্যকে কেন্দ্র ক'রে 'আনন্দমঠ' রচিত হয়। 'আনন্দমঠে'র সন্তানরা মাতৃ-উপাসক, বৈষ্ণব-মন্ত্রে দীক্ষিত, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনই তাদের আদর্শ। মূলতঃ 'সন্তান'রা দেশভক্ত কর্মীদল। 'বন্দেমাতরম্'-মন্ত্রের সঞ্জীবনী সুধা পান ক'রে তারা শোষক সম্প্রদায়ের হাত থেকে দেশোদ্ধারের সংকল্প গ্রহণ করেছে। প্রায় দু'শো বছর আগেকার এই কর্মীদলের সঙ্গে ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের বামপন্থী কর্মীদের অনেকটা মিলও হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে।

ইতিহাস ছাড়াও 'আনন্দমঠে'র প্রসিদ্ধি বহু কারণে। এই উপন্যাসের কাহিনী, সেই সঙ্গে এর 'বন্দেমাতরম্' গান সম্পর্কে স্বদেশে ও বিদেশে যত আলোচনা হয়েছে, বঙ্কিমচন্দ্রের আর কোনো রচনা নিয়ে তত আলোচনা ও উত্তেজনা দেখা দেয় নি। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত বঙ্কিম-শতবার্ষিক-সংস্করণ 'আনন্দমঠ'-এর ভূমিকায় সম্পাদকদ্বয় এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন—"পরবর্তীকালে বঙ্গদেশে এবং পরে সমগ্র ভারতবর্ষে যে স্বদেশী-আন্দোলনের বন্যা দেশের আপামরসাধারণকে চঞ্চল এবং শাসক-সম্প্রদায়কে ব্যতিব্যস্ত করিয়াছিল, সরকারী এবং বেসরকারী সকল সমালোচক, সন্তান-বিদ্রোহের সহিত তাহার যোগসূত্র খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন ; এই কারণে 'আনন্দমঠ' ও 'বন্দেমাতরমে'র কম দুর্গতি হয় নাই। ক্ষুব্ধ মুসলমান সম্প্রদায় এই পুস্তকে ইসলাম-বিরোধিতা এবং উক্ত সঙ্গীতে পৌত্তলিকতা প্রত্যক্ষ করিয়া বিরুদ্ধ আন্দোলন করিয়াছেন...।"

বহু সমালোচিত সেই 'আনন্দমঠ' আজ চিত্রে রূপায়িত হয়ে দর্শকসাধারণের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে। 'নিউ স্ক্রীন প্লেজ'-এর পক্ষে পরিচালক সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত এই চিত্র-রূপায়নের প্রধান কর্মী। বহু বাধা-বিপত্তি ও অসুবিধার মধ্য দিয়েও তিনি যেভাবে তাঁর কাজ শেষ করেছেন তা প্রশংসার যোগ্য।

কাহিনী ঃ ১১৭৬ সালের দারুণ মন্বন্তরের সম্মুখীন হয়ে পদচিহ্ন গ্রামের বিত্তশালী মহেন্দ্র সিংহ স্ত্রী কল্যাণী ও নাবালিকা কন্যা সুকুমারীকে সঙ্গে নিয়ে পথে বের হলেন। কোনমতে শহরে গিয়ে পৌছতে পারলেও জীবন হয়তো বাঁচতে পারে। কিন্তু পথেই বিপদ ঘটলো। জনশূন্য এক চটী-তে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর স্ত্রী-কন্যাকে রেখে মহেন্দ্র সিংহ গেলেন দুধ ও জল সংগ্রহ করতে। ইতি-মধ্যে একদল ডাকাত এসে কল্যাণী ও সুকুমারীকে ধ'রে নিয়ে গেল গভীর জঙ্গলে। মহেন্দ্র সিংহ চটী-তে ফিরে দেখেন চটীতে কেউ নেই, চারিদিকে শুধু মৃত্যুর নিস্তব্ধতা।

ডাকাত-দলের হাত থেকে কল্যাণী ও সুকুমারীকে রক্ষা করলেন এক সন্ন্যাসী। তিনিই সত্যানন্দ ঠাকুর—'আনন্দমঠ' ও 'সন্তানদলে'র প্রতিষ্ঠাতা। পরে তাঁর শিষ্য ভবানন্দ ও জীবানন্দ মহেন্দ্র সিংহকেও উদ্ধার ক'রে আনলেন কোম্পানীর খাজনা বহনকারী সিপাহীদের হাত থেকে। মহেন্দ্র সিংহও ক্রমশঃ সত্যানন্দ ঠাকুরের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে সন্তান-ধর্মে দীক্ষিত হতে চাইলেন। কিন্তু সমস্যা বাধলো স্ত্রী ও কন্যাকে নিয়ে। সংসারের মায়া না কাটাতে পারলে 'সন্তান' হওয়া যায় না। অগত্যা

বিমর্ষচিত্তে কল্যাণী ও সুকুমারীকে সঙ্গে নিয়ে মহেন্দ্র সিংহ পদচিহ্নে ফিরে চললেন।

পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে যখন স্বামী-স্ত্রীতে আলোচনা করছেন, সেই ফাঁকে সুকুমারী কল্যাণীর বিষের কৌটাটি হাতে পেয়ে তা থেকে একটা বড়ি তুলে নিয়ে মুখে দিল। বিষক্রিয়ায় মেয়েকে অচেতন হ'তে দেখে, কল্যাণীও সঙ্গে সঙ্গে বিষ খেলেন। এমন সময় খাজনা লুণ্ঠনকারী ভবানন্দ ও জীবানন্দের দলকে খুঁজতে ... (the line reads:) ভ কান্তদেব সন্ধানে বেজা খাঁব সিপাহীরা সেখানে এসে পড়ে। সত্যানন্দ ঠাকুরও তখন সেই পথে যাচ্ছিলেন। সিপাহীরা মহেন্দ্র ও সত্যানন্দকে ধ'রে নিয়ে চললো। পিছনে প'ড়ে রইল সংগাহীনা কল্যাণী ও সুকুমারী। যাবার সময় সত্যানন্দ একটি সঙ্কেতসূচক গান গেয়ে বিষক্রিয়ায় অচেতন মহেন্দ্রের স্ত্রী-কন্যার ব্যবস্থা করবার জন্য শিষ্যদের আদেশ দিয়ে গেলেন। এই সঙ্কেত বুঝলেন জীবানন্দ। তিনি এসে দেখলেন সুকুমারী জীবিতা, কিন্তু কল্যাণীর দেহে প্রাণের কোনো স্পন্দন নেই। অগত্যা কল্যাণীকে সেইখানে ফেলে রেখে তিনি সুকুমারীকে নিয়ে চ'লে গেলেন।

ওদিকে ভবানন্দ যখন জানতে পারলেন সিপাহীরা মহেন্দ্র ও সত্যানন্দকে ধ'রে নিয়ে গেছেন, তখন তাঁদের সন্ধানে তিনিও বের হলেন ছদ্মবেশে। পথে অচেতন কল্যাণীকে দেখে, গাছ-গাছড়ার রস খাইয়ে তার চেতনা আনলেন; কিন্তু সেই সঙ্গে আকৃষ্ট হলেন তার সৌন্দর্য্যে। কল্যাণীকে একটি প্রৌঢ়ার আশ্রয়ে রেখে ভবানন্দ গেলেন গুরুকে মুক্ত করতে।

জীবানন্দ সুকুমারীকে নিয়ে গেলেন তাঁর বোনের কাছে। সেখানে স্ত্রী শান্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো বহুকাল পরে। শান্তি সাধারণ মেয়ে নয়—স্বামীর উপযুক্ত সহধর্মিণী। স্বামীকে তাঁর ব্রত পালনের অনুরোধ জানিয়ে শান্তি বিদায় নিল। জীবানন্দ ফিরে এলেন মঠে এবং গুরুকে মুক্ত করবার কাজে সন্তান-বাহিনী গঠন করলেন।

মহেন্দ্র ও সত্যানন্দ মুক্ত হয়ে মঠে এলেন। তারপর, সুরু হলো ইংরেজ-সিপাহী বিনাশের বিরাট প্রস্তুতি। স্ত্রী ও কন্যা মৃতা জেনে মহেন্দ্রও সন্তান-ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ
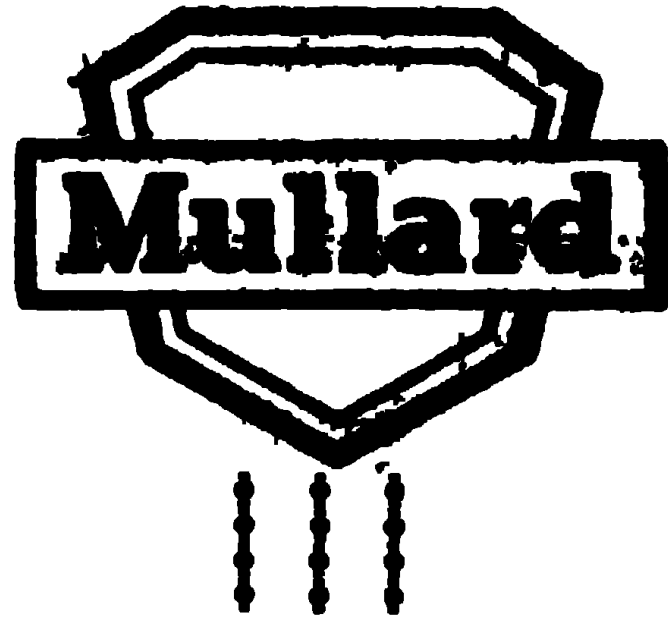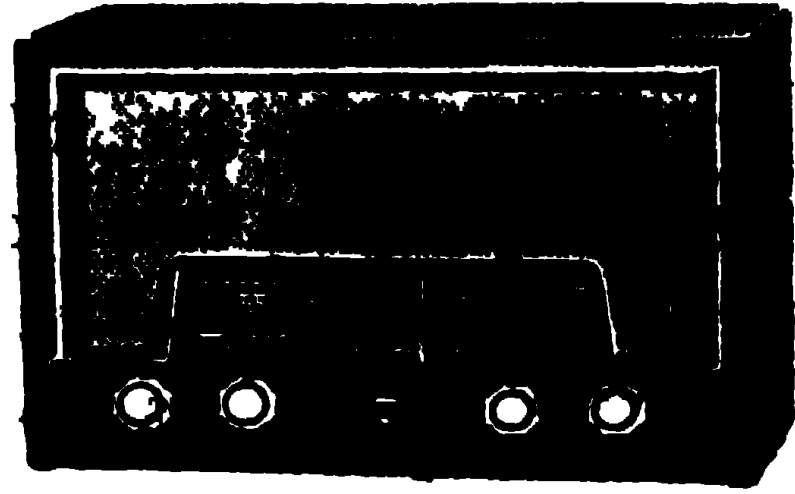
করলেন। একই সময় আর একটি তরুণ দীক্ষা নিল সত্যানন্দের কাছে। সে আর কেউ নয়—পুরুষের ছদ্মবেশধারী জীবানন্দের স্ত্রী শান্তি। সত্যানন্দ তাঁকে পরীক্ষা ক'রে বিস্মিত হলেন। জ্ঞানে, বুদ্ধিতে ও দৈহিক শক্তিতে শান্তি কোনো 'সন্তানে'র চেয়েই কম নয়। শান্তির নূতন নাম হলো—নবীনানন্দ।

মহেন্দ্রের ওপরে ভার পড়লো নিজের বাড়ীতে গিয়ে একটি সুরক্ষিত দুর্গ তৈরী করবার। সত্যানন্দ বের হলেন তীর্থভ্রমণে—অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণের জন্য উপযুক্ত কারিগরের সন্ধানে।

এদিকে কল্যাণীর রূপমুগ্ধ ভবানন্দের মনে শান্তি নেই। কল্যাণীকে প্রলুব্ধ করতে গিয়ে বারবার সে ধিকৃত ও তিরস্কৃত হলো। কল্যাণী বললো—'তোমারই মুখে শুনেছি, সন্তানধর্মের নিয়ম যে, যে ইন্দ্রিয়-পরবশ হয়, তার প্রায়শ্চিত্ত মৃত্যু। এ-কথা কি সত্য?' ভবানন্দ জবাব দিল—'হ্যাঁ, সত্য।' কল্যাণী তাকে সেই মৃত্যু-বরণের আদেশ দিয়ে ভবানন্দকে ব্রতচ্যুত অধর্মী বলে বিদায় দিল। ভবানন্দ প্রায়শ্চিত্তের জন্যই ফিরে গেল মঠে।

ইতিমধ্যে তীর্থ-ভ্রমণ সেরে সত্যানন্দ ফিরেছেন। মহেন্দ্রের বিরাট অট্টালিকায় সন্তানদের দুর্গও তৈরী হয়েছে। এবার অস্ত্রশস্ত্র তৈরী হ'তে লাগলো দিনরাত। ইংরেজ-সিপাহীদের সঙ্গে সন্তানদের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের দিন এলো। অসীম বীরত্বের সঙ্গে দেশভক্ত তরুণদল যুদ্ধ করতে লাগলেন। যুদ্ধে সন্তানদেরই জয় হলো।
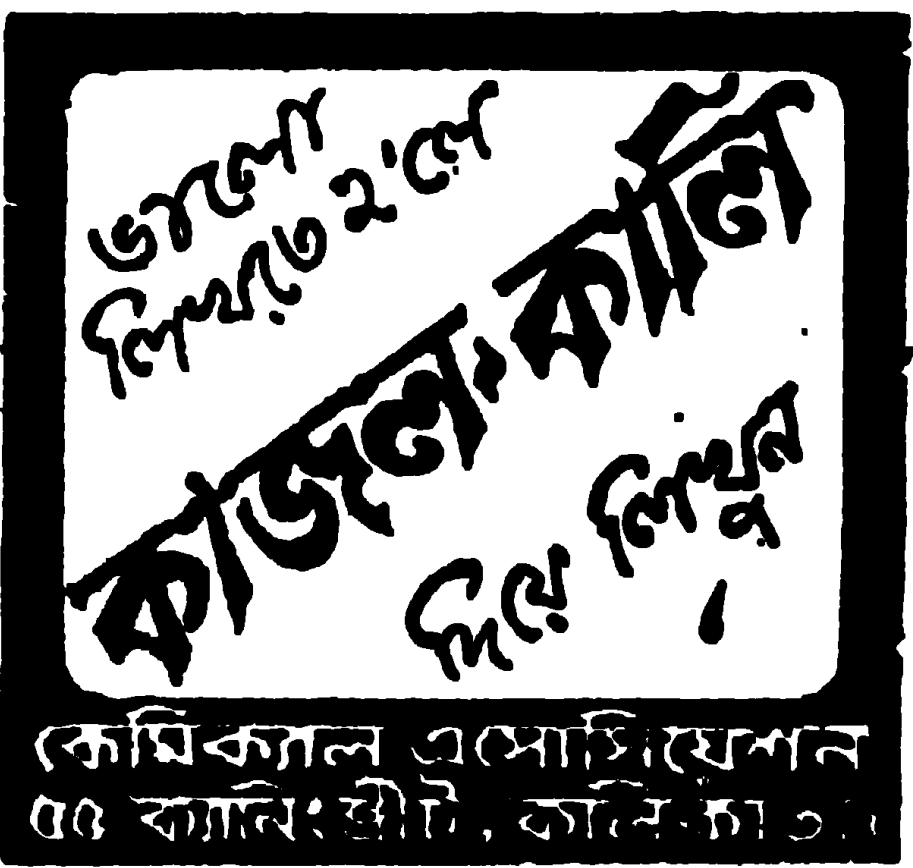
ভবানন্দ তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে মৃত্যুকে বরণ ক'রে নিল সেই যুদ্ধে। ইতিমধ্যে নবীনানন্দরূপী শান্তি দুর্বৃত্তদের হাত থেকে কল্যাণীকে উদ্ধার ক'রে রেখে এল মহেন্দ্রের কাছে। সুকুমারীও ইতিমধ্যে পৌঁছল বাপ-মায়ের কোলে। মহেন্দ্রের সংসার পূর্ণ হয়ে উঠলো।

জীবানন্দও এদিকে প্রায়শ্চিত্তের জন্য প্রস্তুত। সহধর্মিণী শান্তি যতখানি দৃঢ়, সে তত দৃঢ় নয়। তার চিত্তেও দেখা দিয়েছিল সংসার-জীবনের দুর্বলতা—সন্তানধর্মের যা পরিপন্থী। ব্রহ্মচারিণী শান্তি স্বামীকে সন্তানধর্ম-পালনের জন্য বারবার উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিল ব'লেই, তার দুর্বলতা স্থায়ী হ'তে পারেনি। দ্বিতীয় বারের যুদ্ধে জীবানন্দই এগিয়ে গেছে দৃঢ় পদক্ষেপে। অশ্বপৃষ্ঠে উন্মুক্ত তরবারি নিয়ে শান্তিও সংগ্রাম করেছে অমিত তেজে। ইংরেজ-সিপাহীরা সেবারও পরাজিত হয়ে সমগ্র বরেন্দ্রভূমি পরিত্যাগ ক'রে চলে যেতে বাধ্য হয়।

এই যুদ্ধে সাংঘাতিকভাবে আহত হয় জীবানন্দ। তার দেহে প্রাণের কোন স্পন্দন নেই দেখে শান্তির দু'চোখ বেয়ে নামে অশ্রুধারা। কিন্তু, ঠিক সেই সময় আবির্ভাব হয় এক মহাপুরুষের—তিনি সত্যানন্দের গুরু। জীবানন্দের চিকিৎসা করে তাকে সারিয়ে তুলে তিনি বিদায় নেন অতর্কিতে। শান্তি ফিরে পায় সান্ত্বনা; স্ত্রী পায় স্বামীকে।

শেষ দৃশ্যে সত্যানন্দের হাত ধ'রে হিমালয়ের পথে যাত্রা করেন সেই মহাপুরুষ। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায়—'বিসর্জন আসিয়া প্রতিষ্ঠাকে লইয়া গেল।'

চিত্র-রূপায়ণ: 'আনন্দমঠ'-এর এই কাহিনীকে অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গেই পরিচালক সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত সেলুলয়েডের ফিতায় রূপ দিয়েছেন। 'আনন্দমঠ'-এর ভিতরকার দৃশ্যগুলিতে, মহেন্দ্র সিংহের বাড়ীতে দুর্গ-নির্মাণের পরিকল্পনায়, ইংরেজ-সিপাহীদের সঙ্গে সন্তানদের প্রত্যক্ষ-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তাঁর পরিচালনার কৃতিত্ব ফুটে উঠেছে সন্দেহ নেই। কিন্তু সমগ্র ছবিতে একটা রসঘন পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারেনি—হয় তো চিত্রনাট্য রচনায় ত্রুটিতে, সম্পাদনায় দুর্বলতায় ও সাধারণ শ্রেণীর
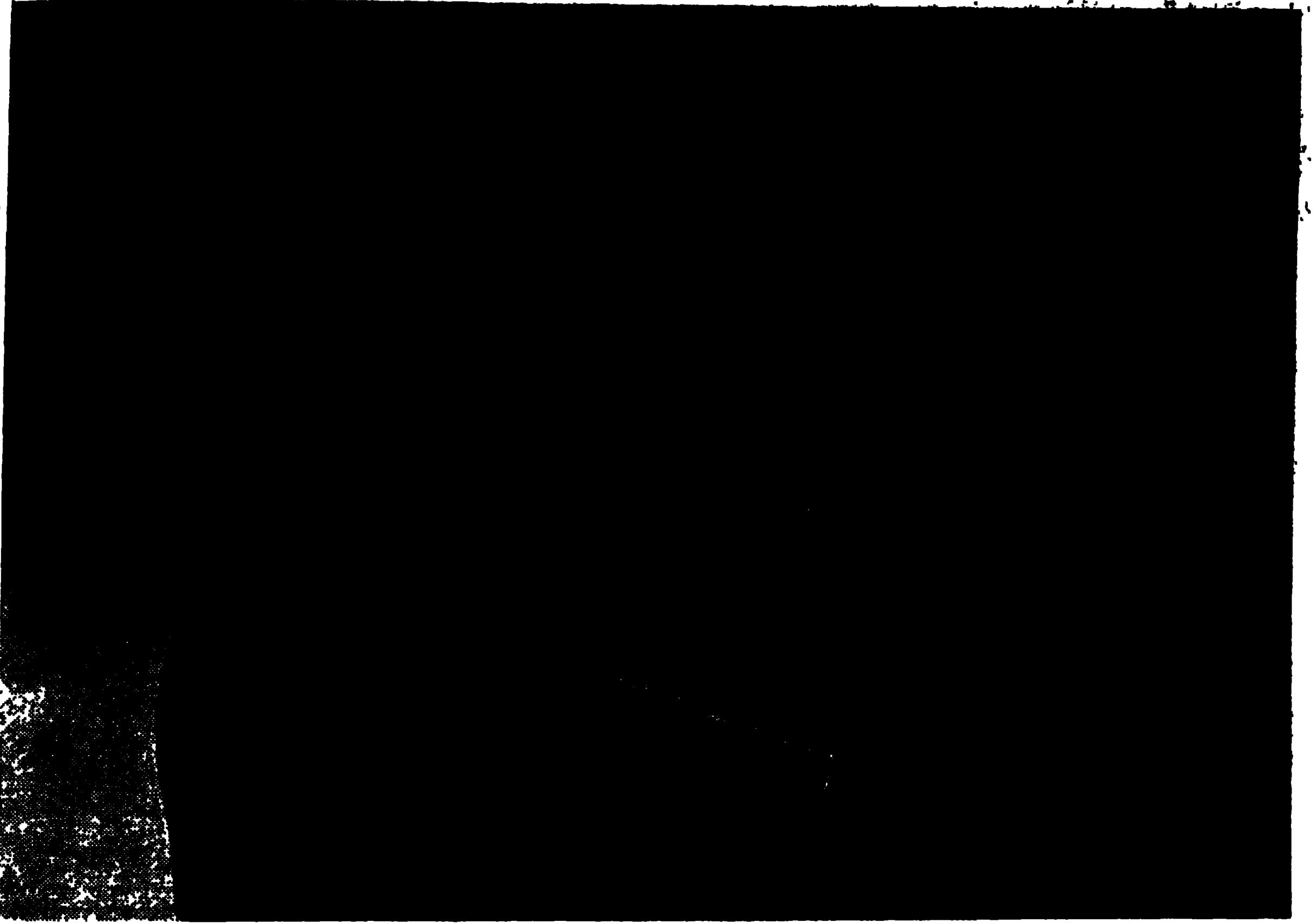
এ কে ডি প্রোডাকসনের আগামী চিত্র 'জবানবন্দী'তে শ্রীমতী স্মৃতিরেখা

অভিনয়ের জন্যই। ছবির গতি মন্থর ও দৃশ্যগুলি রঙ্গমঞ্চ-ঘেঁসা হওয়ার জন্য এই ত্রুটি যেন আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বহির্দৃশ্যের চিত্রগ্রহণে আলোকচিত্রশিল্পী সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশংসাই করতে হয়। কিন্তু শব্দানুলেখনে শিশির চট্টোপাধ্যায় নিরাশ করেছেন। অনেক জায়গায় সংলাপ-হীন অভিনয় হচ্ছে, কিন্তু চলাফেরার কোনো শব্দই নেই। দৃশ্য-পরিকল্পনায় ব্রতীন ঠাকুর তাঁর সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। 'আনন্দমঠ'-এর অন্তর্দৃশ্যের পরিকল্পনায় তাঁর কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। রূপসজ্জার দিক থেকে শৈলেন গাঙ্গুলী অত্যন্ত নিরাশ করেছেন। সকলের রূপসজ্জার সঙ্গতিও তিনি রাখতে পারেন নি। সুকুমারীকে ফ্রক পরানোও বিসদৃশ লেগেছে। সত্যানন্দের দাড়ি ও চুল জায়গায় জায়গায় অত্যন্ত কৃত্রিম বলেই মনে হয়েছে। সুর-সংযোজনায় সুবল দাশগুপ্ত কোনো বিশেষত্বের পরিচয় না দিলেও, তাঁর সুনাম ক্ষুণ্ণ হয় নি। শান্তির মুখে হিন্দী-গান না দিয়ে বাঙলা টপ্পা বা গজল গান দেওয়াই পরিচালকের উচিত ছিল। বোম্বাই-ঢঙের হিন্দী গানটি অত্যন্ত বেখাপ্পা শুনিয়েছে। এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের কথাই উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি লিখেছেন—'কেহ টপ্পা, কেহ গজল, কেহ শ্যামাবিষয়, কেহ কৃষ্ণবিষয় ফরমাস করিয়া শুনিল।' বঙ্কিমচন্দ্র গজল গানের উল্লেখ করেছেন বলেই যে হিন্দী গান দিতে হবে এর কোনো যুক্তি নেই। বাঙালী গৃহস্থ-বধূ শান্তির পক্ষে বাংলা গজল শেখা যত সহজ, হিন্দী গজল জানা ততই কঠিন।

অভিনয়ের দিক থেকে 'আনন্দমঠ'-এর অভিনেতৃবৃন্দের যতখানি দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যাবে আশা করা গিয়েছিল, তা পাওয়া যায়নি এইটেই আশ্চর্যের বিষয়। একমাত্র নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন অজিত

গুপ্তা। শান্তির ভূমিকাটিকে তিনি অপূর্ব অভিনয়ে যেন মূর্ত ক'রে তুলেছেন। তাঁর বাচনভঙ্গিমা যেমন সুন্দর, তাঁর অভিব্যক্তিও তেমনি প্রশংসনীয়। তাঁর পরেই যাঁর নাম করতে হয়—তিনি নিভাননী। ঠানদিদির ছোট্ট ভূমিকাটি তিনি অপূর্ব রূপসজ্জায় ও অভিনয়ে পরম উপভোগ্য ক'রে তুলেছেন। সত্যানন্দের ভূমিকায় অহীন্দ্র চৌধুরী, মহেন্দ্র সিংহের ভূমিকায় কমল মিত্র ও কল্যাণীর ভূমিকায় সুনন্দা দেবী যথাযথ। সবচেয়ে হতাশ করেছেন বিপিন মুখোপাধ্যায়। ভবানন্দের চরিত্রটিকে তিনি হত্যা করেছেন বললেও অত্যুক্তি হয় না। নীতিশ মুখোপাধ্যায়ের রেজা খাঁ মঞ্চাভিনয়ের অনুকৃতি মাত্র!

দোষ-ত্রুটি সত্ত্বেও 'আনন্দমঠ' তার কাহিনীর জন্যই দর্শকচিত্তে রেখাপাত করবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

—সপ্তর্ষি

'টেকনিকলার' ছবি প্রসঙ্গে

বিজন দত্ত
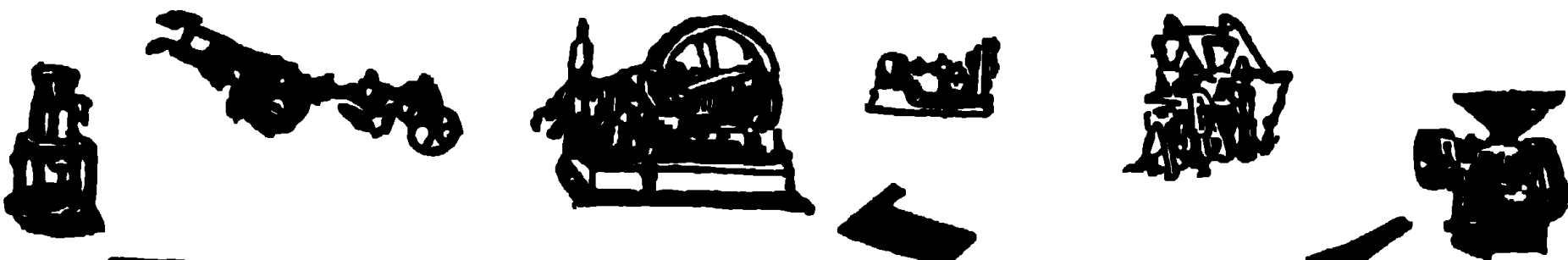
দৈনিক সংবাদপত্রের সিনেমা-বিজ্ঞাপনের পাতায় মাঝে মাঝে কোন ছবির বিজ্ঞাপনে একটা কথা আমাদের নজরে পড়ে—"টেক্নিকালার ছবি।" এবং সেই ছবি দেখতে গিয়ে পর্দার বুকে আমরা দেখতে পাই আর একটি কথা—'Color by Technicolor"। হয়তো এই কথাটি অধিকাংশ দর্শকদেরই নজর এড়িয়ে যায়, অথবা এটা নিয়ে কেউই কখনো মাথা ঘামান না; তার ফলে হয়েছে, যে-কোন রঙীন্ ছবিকেই দর্শকরা 'technicolor' ছবি বলে ধরে নেন। তাঁদের মতে—রঙীন্ ছবির ইংরেজী নাম হলো 'টেক্নিকালার পিক্চার'। দুর্ভাগ্যক্রমে এই ভ্রান্ত ধারণা কেবলমাত্র দর্শকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, ষ্টুডিও-মহলে বেশীর ভাগ 'টেক্নিসিয়ান্'-দের মধ্যেও এটা বেশ দৃঢ়ভাবে শিকড় গেড়ে বসে গেছে। অনেককেই বলতে শুনেছি (এবং প্রতিদিনই শুনি) যে, রাশিয়ান টেক্নিকালার আমেরিকান টেক্নিকালারের চেয়ে ভালো অথবা অন্য একটি রঙীন্ ছবি (হয়তো 'Cinecolor' বা 'Truecolor') সম্বন্ধে, এটার টেক্নিকালার অমুকটার মতো নয়! "টেক্নিকালার" ছবি বলতে ঠিক কি বোঝা যায় সে ধারণা প্রায় শতকরা পচানব্বই জন দর্শক বা ষ্টুডিও-মহলের লোকেদের মধ্যে নেই। 'Technicolor' শব্দটা সম্বন্ধে এই ভ্রান্ত ধারণা দূর করাই এই প্রবন্ধের আসল উদ্দেশ্য।

প্রথম কথা হচ্ছে রঙীন্ ছবি মাত্রই টেক্নিকালার নয়। নানা রকম পদ্ধতিতে রঙীন ছবি তোলা হয়; 'Technicolor' হচ্ছে এই রকম একটি বিশেষ পদ্ধতির নাম। এবং এই বিশেষ পদ্ধতিটি 'টেকনিকালার মোশান পিক্চার করপোরেশান'-এর একেবারে নিজস্ব ব্যাপার—এঁরা ছাড়া আর কেউ-ই এই পদ্ধতিতে রঙীন ছবি তুলতে পারবেন না, পৃথিবীর সমস্ত দেশের জন্যই এইভাবে 'পেটেণ্ট' গ্রহণ আছে। তার ওপর "Technicolor" এই কথাটি এঁদের 'ট্রেড-মার্ক', সুতরাং অপর কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান 'টেক্নিকালার' কথা ব্যবহার করতেও পারেন না।

'টেক্নিকালার' ছাড়াও রঙীন ছবি তোলবার আরও সাত-আট রকম বিভিন্ন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে, কিন্তু এক 'আগ্‌ফা কালার' ছাড়া আর কোনটিই বিশেষ সুবিধাজনক হয়নি। 'সিনেকালার' (Cinecolor), 'ডুফেকালার' (Dufaycolor), 'কোডাক্রোম' (Kodachrome), 'আন্‌স্কোকালার' (Anscocolor), ইউফাকালার প্রভৃতি আরো নানান রকম পদ্ধতিতে রঙীন ছবি তোলা সম্ভব হয়েছে। কোনটাই কিন্তু 'টেক্নিকালার' পদ্ধতির কাছে দাঁড়াতে পারেনা। অবশ্য 'টেক্নিকালার' পদ্ধতিও একেবারে নিখুঁত হতে পারে নি এখনও। হলিউডে, টেক্নিকালার ল্যাবরেটরীতে, টেক্নিকালার পদ্ধতির স্রষ্টা ডাঃ হার্বার্ট কালমাসের (Dr. Herbert Kalmus) অধীনে বাছা বাছা বিজ্ঞানীর দল দিনের পর দিন গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন—টেকনিকালার পদ্ধতিকে সবদিক থেকে নিখুঁত ক'রে তোলবার জন্য। অন্যান্য রঙীন ছবির আবিষ্কারকেরাও চুপ করে বসে নেই তাই ব'লে। এই নিয়ে প্রতিদিনই নতুন নতুন গবেষণা লোকচক্ষুর অন্তরালে বিশেষ সতর্কতার সংগে সাফল্যের পথে এগিয়ে চলেছে।

সাধারণতঃ আমরা যে-সব ছবি দেখি সে-গুলো হচ্ছে

black and white photography, অর্থাৎ এক রঙা ছবি; শাদা এবং কালো দুটো কিন্তু আলাদা রঙ নয়—আলোর তারতম্যের জন্য কোন জায়গা শাদা এবং কোন জায়গা কালো দেখা যায়। কদাচিৎ দু-একখানা ছবিতে কালোর বদলে ঈষৎ বাদামী রঙের ছোপ (sepia tone) দেখতে পাই। এ সবই হচ্ছে মনোক্রোম (monochrome) ফটোগ্রাফী অথবা একরঙা ছবি। সাধারণ ষ্টুডিও ক্যামেরাতে এই ছবি তোলা হয়ে থাকে। ক্যামেরার লেন্সের মধ্য দিয়ে নেগেটিভ্ ফিল্মের ওপর আলো পড়াতে এই রকম ছবি উঠে থাকে; কিন্তু রঙীন ছবি তোলবার পদ্ধতি একেবারে বিভিন্ন। রঙীন ছবি তুলতে হ'লে নীল (Blue), সবুজ (Green) ও লাল (Red) এই তিন রঙের নেগেটিভ প্রয়োজন; সাধারণ ষ্টুডিও ক্যামেরাতে একই ছবি তিনখানা বিভিন্ন রঙের নেগেটিভ করা সম্ভব নয়। সুতরাং রঙীন ছবি তোলার জন্য আলাদা ক্যামেরা তৈরী করা হয়েছে--যেখানে লেন্সের মধ্য দিয়ে আলো ক্যামেরার ভিতরে ঢোকে, দুই বা তিনটি ভাগে বিভক্ত হ'য়ে একই সময়ে বিভিন্ন সমতল ক্ষেত্রে (plane) তিনটি নেগেটিভের উপর পড়তে পারে। কিন্তু তিনটি সমতলক্ষেত্রে আলো প্রতিফলিত করতে গেলে ক্যামেরার মধ্যে দু'খানি আয়না (Mirror) বসানোর প্রয়োজন. তা'তে ক্যামেরা অত্যন্ত বড় এবং ষ্টুডিওর অনুপযোগী হয়ে পড়ে; সেই জন্যে এখন রঙীন ছবির জন্য বাই-প্যাক (bi-pack) ফিল্ম ব্যবহৃত হয়, অর্থাৎ তিনটি বিভিন্ন নেগেটিভ দুতিনটি প্লেনে না থেকে দুটি প্লেনে থাকে। একটি নেগেটিভ থাকে সবুজ রঙের জন্য, অপরটির সংগে নীল ও লাল রঙের উপযোগী দুটি "ইমালশান্" দেওয়া থাকে। উপরেরটি নীল রঙ্ ও নীচেরটি লাল রঙের জন্য। তারপর ছবি তোলা হ'যে গেলে বিভিন্ন রকমের জটিল প্রক্রিয়ার সাহায্যে তিনখানি রঙীন নেগেটিভ তৈরী হয়।

'টেক্নিকালার'-পদ্ধতি আরো জটিল, এবং এমন ভাবে সেই সব গোপন রাখা হয় যে বাইরে থেকে বিশেষ কিছুই জানা সম্ভব নয়। 'টেক্নিকালার' ছবি তোলবার

জন্য ঐ কোম্পানী আলাদা ক্যামেরা তৈরী করেছেন। ক্যামেরা বিক্রী করা হয় না, তবে ছবি তোলবার জন্য ভাড়া দেওয়া হয়—কতগুলো সর্ত্তে যে, ক্যামেরার সংগে ওদের নিজের লোক থাকবে এবং অন্য কাউকে ক্যামেরায় হাত দিতে দেবে না। ফিল্ম নিতে হবে ওদের কাছ থেকেই যদিও ফিল্ম বাইরে কোথাও পাওয়া সম্ভব নয়, কারণ কোডাক্ কোম্পানীর সংগে টেক্নিকালারের কন্ট্রাক্ট আছে—টেক্নিকালারের জন্য বিশেষ পদ্ধতিতে ফিল্ম তৈরী করে দিতে হবে এবং ওই ফিল্ম অন্য কাউকে দিতে পারবে না বা বাজারে বিক্রী করতে পারবে না এবং ল্যাবরেটরীর যাবতীয় কাজও করবে কোম্পানী নিজে।

বর্ত্তমান টেক্নিকালার-ক্যামেরা সব দিক থেকেই অসুবিধাজনক। প্রথম, দাম অত্যন্ত বেশী, আকারে বৃহৎ এবং ভিতরের কল-কব্জাও খুব জটিল। এই সব অসুবিধা দূর করবার জন্য টেক্নিকালার কোম্পানী নতুন ধরণের একরকম ফিল্ম ব্যবহার করছেন, যেটা সাধারণ ষ্টুডিও ক্যামেরাতেও ব্যবহার করা চলবে। এই ফিল্মের ফিতে হচ্ছে একটা—কিন্তু একটা ফিল্ম বেসের মধ্যেই তিন রঙের 'ইমালশান' দেওয়া আছে, যাতে একটা ফিল্মেই তিনটি নেগেটিভ ফিল্মের কাজ হয়। এই ফিল্মের নাম 'ইন্টিগ্রাল ট্রাইপ্যাক্' (Integral Tripack) অথবা 'মনোপ্যাক্' (Monopack)। এ সম্বন্ধে এখনো গবেষণা চলছে—'মনোপ্যাক্' পদ্ধতির সর্বাঙ্গীন সফলতার জন্য। আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে 'মনোপ্যাক' ফিল্মের দ্বারা জটিল 'টেক্নিকালার' ক্যামেরার ব্যবহার হয়তো একেবারে নাকচ হ'য়ে যাবে।

'টেক্নিকালার' পদ্ধতির আবিষ্কারক হচ্ছেন ডাঃ হার্বার্ট টমাস্ কালমাস্ (Dr. Herbert Thomas Kalmus)। প্রথম জীবনে ইনি ছিলেন আমেরিকার ম্যাসাচ্যুসেট্স্ ইন্সটিটিউট্ অব্ টেক্নোলজীর ছাত্র। নিজের শিক্ষায়তনের প্রথম দুটো অক্ষর ("টেক্") থেকে তিনি তাঁর রঙীন ছবির নামকরণ করেন, "টেক্নিকালার"।

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রমের পর ডাঃ কালমাস্ 'টেক্নিকালার পদ্ধতি' প্রায় সাফল্যের পথে নিয়ে আসেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ১৯২৯ সাল থেকেই হয় "টেক্নিকালার" পদ্ধতির জন্ম। সেই বছরে ওয়ার্ণার ব্রাদার্স (Warner Brothers) কুড়ি খানা ছবির জন্য কন্ট্রাক্ট্ করেন; মেট্রো-গোল্ডউইন মেয়ার ও অন্যান্য অনেক ষ্টুডিওই ঐ বছরে ছবির কাজ আরম্ভ করেন।

'টেক্নিকালার' পদ্ধতির সফলতার জন্য আরো দুই জন বিশেষভাবে জড়িত। একজন হচ্ছেন ডাঃ কালমাসের স্ত্রী—মিসেস নাতালী কালমাস; আর একজন হচ্ছেন কার্টুন ছবি ও মিকি মাউসের জন্মদাতা বনামধন্য ওয়াল্ট্ ডিস্নে। কিছুদিন আগে পর্যন্তও আমরা টেক্নিকালার ছবির পরিচয়লিপিতে দেখতে পেতাম—Technicolor Color Direction by Natalie

আজকে যাঁরা বিস্মৃত তাঁদের অন্যতমা মণিকা দেশাই

তুলে (সাধারণতঃ Kodachrome বা Anscocolor) টেক্‌নিকালার কোম্পানীর কাছ থেকে প্রিণ্ট করিয়ে নেওয়া হয়েছে। যতদূর মনে পড়ে, রাশিয়ার "ফেষ্টিভ্যাল্ অব্ ইউথ্ ১৯৪৮ (Festival of Youth, 1948) ছবিখানাও, যেটা ক'লকাতায় গত বছর মার্চ মাসে দেখানো হ'য়েছে, আমেরিকার টেক্‌নিকালার ল্যাবরেটরী থেকে প্রিণ্ট করানো হয়েছিল।

অনেক প্রযোজককে এবং চিত্র-পরিচালককে আমি বহুবার বলেছি ক'লকাতার ষ্টুডিওতে একখানা টেক্‌নিকালার ছবি তুলতে। কিন্তু অত্যন্ত বেশী খরচের অজুহাতে তাঁরা সকলেই কথাটাকে এড়িয়ে গেছেন; অথচ কী পরিমাণ খরচ পড়তে পারে এই রকম একখানা ছবি তুলতে সে সম্বন্ধে এঁদের কারুরই সামান্যতম ধারণাটুকুও নেই! সকলেরই ধারণা যে এক একখানা টেক্‌নিকালার এই ছবি তুলতে ত্রিশ-চল্লিশ লাখ টাকা ব্যয় হয়। অবশ্য হয়; ও-দেশে, আমাদের দেশে নয়। এখানে একখানা সাধারণ বাংলা ছবির বাজেট হচ্ছে মাত্র এক লাখ কুড়ি-পঁচিশ হাজার টাকা।

বাংলা ছবির কর্ণধার এবং সাধারণ দর্শকদের অবগতির জন্য, ১১,০০০' ফুট টেক্‌নিকালার ছবি তুলতে কি রকম খরচ লাগতে পারে তারই একটা আনুমানিক এবং মোটামুটি হিসেবের খসড়া এই সংগে দিয়ে দিলাম; এর থেকে দেখতে পাওয়া যাবে যে যতটা বেশী খরচ হবে বলে

Kalmus কিন্তু এখন কোন কারণে কোম্পানীর সংগে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন হ'য়েছে। তবে তিনি একটা পেন্‌সন গোছের পেয়ে থাকেন কোম্পানী থেকে।

টেক্‌নিকালার কোম্পানীর দুটো ইউনিট বর্তমানে কাজ করছে—একটি হলিউডে, আর একটি হ'চ্ছে ইংল্যাণ্ডে—মিড্‌লসেক্সে। ওই ইউনিট থেকেই এসেছিল ক'লকাতায় River ছবি তুল্‌তে।

অনেক সময় আমরা দেখতে পাই ছবির পরিচয়লিপিতে—'প্রিণ্ট্ বাই টেক্‌নিকালার' (Print by Technicolor)। তা'র মানে হ'চ্ছে যে, ছবিটি 'টেক্‌নিকালার'-ফিল্মে তোলা হয়নি এবং ঐ কোম্পানীও তোলেন নি; তবে অন্য কোন রঙীন পদ্ধতিতে ছবি

ধারণা করা যায় বাস্তবিকই ততটা হয় না।

ক'লকাতার ষ্টুডিওতে টেক্‌নিকালার বাংলা ছবির অনুমানিক খরচের হিসাব

(আড়াই মাস স্যুটিং হিসাবে : ৫ সপ্তাহ ষ্টুডিও-স্যুটিং অর্থাৎ ইনডোর এবং ৫ সপ্তাহ আউট্‌ডোর)

কাট লেংথ্‌ ৮,০০০ ফিট নেগেটিভ রেশিও ১০ : ১

সাপ্তাহিক খরচ : (১ পাউণ্ড = ১৩ টাকা ৮ আনা হিঃ)

টেক্‌নিকালার ক্যামেরা ভাড়া ... ৩৩৭৷০
টেক্‌নিসিয়ান ... ৩৬০৲
সহকারী ... ১২৮৲

৮২৫৷০

১০ সপ্তাহের জন্য ... ৮,২৫৫৲

ফিল্ম, ল্যাবরেটরীর কাজ ইত্যাদি বাবদ

থ্রী-ষ্ট্রীপ নেগেটিভ্‌ : ৮০,000 স্ক্রীন ফিট্‌ ... ৫০,৮২৫৲
ডেভেলাপিং : ৮০,000 স্ক্রীন ফিট্‌ ... ১৫,৫২৫৲
রাস-প্রিণ্ট (black & white) : ৫০,০০০ ফিট ... ৫,৭৬৫৷৶০
৩-সি পাইলট্‌ ও রাস প্রিণ্ট : ৫,০০০' ... ১,৭৭১৸৶০
ডিজল্‌ভ্‌, ওয়াইপ, প্রভৃতি : ২০' ... ৩,২৪০৲
টাইটেল্‌ ফটোগ্রাফী : ৮ ঘণ্টা ... ২১৬৲
নেগেটিভ্‌ কাটিং : ৮ রীল ... ৮৬৪৲
প্রটেক্‌টিভ্‌ মাষ্টার : ৮,০০০' ... ৫,৬০২৲
ট্র্যাক্‌ মাষ্টার : ৮,000' ... ৯১৮৲
ম্যান্‌সার প্রিণ্ট : ৮,০০০' ... ২,৮৩৫৲

মোট : ৮,000' ফিটের জন্য ৮৭,৩৬২৷০
সুতরাং ১১,০০০' ছবির খরচ পড়বে ... ১,২০,১২৩৷৶০

রিলীজ প্রিণ্ট

১ খানা থেকে ৯ খানা প্রিণ্টের জন্য : ।৵০ ফুট হিঃ ১৮
১০খানা ১১০০০' = ১০ × ৪১২৫৲ ... ৪১,২৫০৲

আনুষঙ্গিক ব্যয়

ইংল্যাণ্ড থেকে টেক্‌নিকালার ক্যামেরা আনা ও পাঠানোর খরচ, ইন্‌সিওরেন্স, বাণিজ্য-শুল্ক, টেক্‌নিকালার ইউনিটের কর্মীদের যাতায়াত ও থাকার খরচ ইত্যাদি - বাবদ (আনুমানিক) ... ১,00,000৲

মোট ২,৬৯,৬২৮৷৶০

এখানে ছবি তোলবার খরচ ইত্যাদি বাবদ ১,৫০,০০০৲

৪,১৯,৬২৮৷৶০

এই গেল চার লাখ কুড়ি হাজার টাকা : অন্যান্য খরচ বা রিজার্ভ ফাণ্ড বাবদ আরো ৮০,০০০৲ টাকা ধরা গেলেও পাঁচ লাখের মধ্যে একখানা বাংলা টেক্‌নিকালার ছবি হ'য়ে যাওয়া উচিত।

ওপরে যে আনুমানিক হিসেবটা দিলাম, সেটা পাঠিয়েছেন টেক্‌নিকালার কোম্পানী ইংল্যাণ্ডের অফিস থেকে। গত বছর মার্চ মাসে 'টেক্‌নিকালার কোম্পানী'র তরফ থেকে মিঃ এফ্‌. জর্জ গান ভারতবর্ষে আসেন—ভারতে টেক্‌নিকালার ইউনিট গড়ে তোলা সম্ভব কিনা সেই উদ্দেশ্যে। ভারতবর্ষেও খুব শীঘ্রই 'টেক্‌নিকালার কোম্পানী'র শাখা অফিস খোলবার ইচ্ছা (অবশ্য যদি আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ঠিক থাকে) তাঁদের আছে, সেই শুভ সংবাদটি তিনি জানিয়ে গেছেন। প্রথমে হবে বোম্বাইতে, পরে মাদ্রাজে এবং তারপর বাঙলা দেশেও একটা শাখা করবার ইচ্ছা তাঁদের আছে।

আজও পর্য্যন্ত বাংলা 'টেকনিকালার' ছবি তোলা সম্ভব হ'লো না। অথচ বোম্বাইতে নাকি অবিলম্বে 'টেকনিকালার' ছবি তোলা সুরু হবে বলে খুব হৈ-চৈ পড়ে গেছে, এবং বাঙলা দেশের কাগজে সেই কথা খুব ফলাও করে ছাপানো হ'চ্ছে। কিন্তু লোককে ধাপ্পা দেবার সময় আমরা খুব জোর গলায় বলি, "What Bengal thinks to-day..." ইত্যাদি।

দিলীপকুমার রায়

'সেই বৃন্দাবন নয়নাভিরাম' গানের কথায় ও সুরে যে মায়াজালের সৃষ্টি হয়, তার তুলনা কোথায়? গান শুনতে শুনতে শ্রোতা চ'লে যায় কোন্ ভাবরাজ্যে যেখানে সুন্দরের লীলা, পরম সুন্দরের আরাধনা। সুরের ইন্দ্রধনু রচনা ক'রে মানুষকে ভাবের ইন্দ্রপুরীতে পৌঁছে দেওয়ার এই অপরূপ আর্টের স্রষ্টা সুরসাধক যোগী দিলীপ কুমার রায়।

'সাধক'—এই একটি মাত্র শব্দেই দিলীপকুমারের পূর্ণ-পরিচয়। তিনি সুরসাধক, ভাবসাধক, ধর্মসাধক। সাধনার পথে তাঁর আত্মসমাহিত চেতনা তাঁকে সিদ্ধি-লোকে পৌঁছে দিয়েছে। দিলীপকুমার বাংলার গৌরব।

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে জানুয়ারী দিলীপকুমার জন্ম-গ্রহণ করেন। পিতা দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তখন সাহিত্য-ক্ষেত্রে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মতো বিরাজ করছেন। বাড়িতে গান-বাজনার আসর, তার ওপর বাবা একজন বিখ্যাত গীতিকার ও সংগীতের সমঝদার—কাজেই, দিলীপকুমার তাঁর ছেলেবেলাতেই সঙ্গীতময় পরিবেশের মধ্য দিয়ে বড় হয়ে ওঠ্‌বার সুযোগ পেয়েছিলেন। শিশু হলেও সুরের ঝংকার ও তানের আবেশ তাঁর কানে সুধা বর্ষণ করতো! পাঁচ-ছয় বছর বয়সেই তিনি তাই সংগীতের অনুরাগী হয়ে ওঠেন। এই অনুরাগ বাড়তে থাকে বাবার সংগে থিয়েটারে গিয়ে গিয়ে। থিয়েটার দেখতে ব'সে কিশোর 'মণ্টু'-র কান থাকে গানের দিকে। বাড়ী ফিরে মনের মধ্যে গুন্ গুন্ ক'রে ওঠে গানের বাণী, সুরে ও তালে মিশে অপূর্ব ঝংকারে।

অবশেষে, লেখাপড়ার সংগে সংগে চলতে থাকে নিয়মিত কণ্ঠসাধনা। এই গানের রেওয়াজ তিনি করতেন কৃষ্ণধন বাঁড়ুজ্জের 'গীত-সূত্রসার' থেকে। গলা যখন ঠিক হলো, তখন চল্‌লো আসল গান শেখবার পালা। তেরো-চৌদ্দ বছর বয়সেই তিনি সে-সময়কার
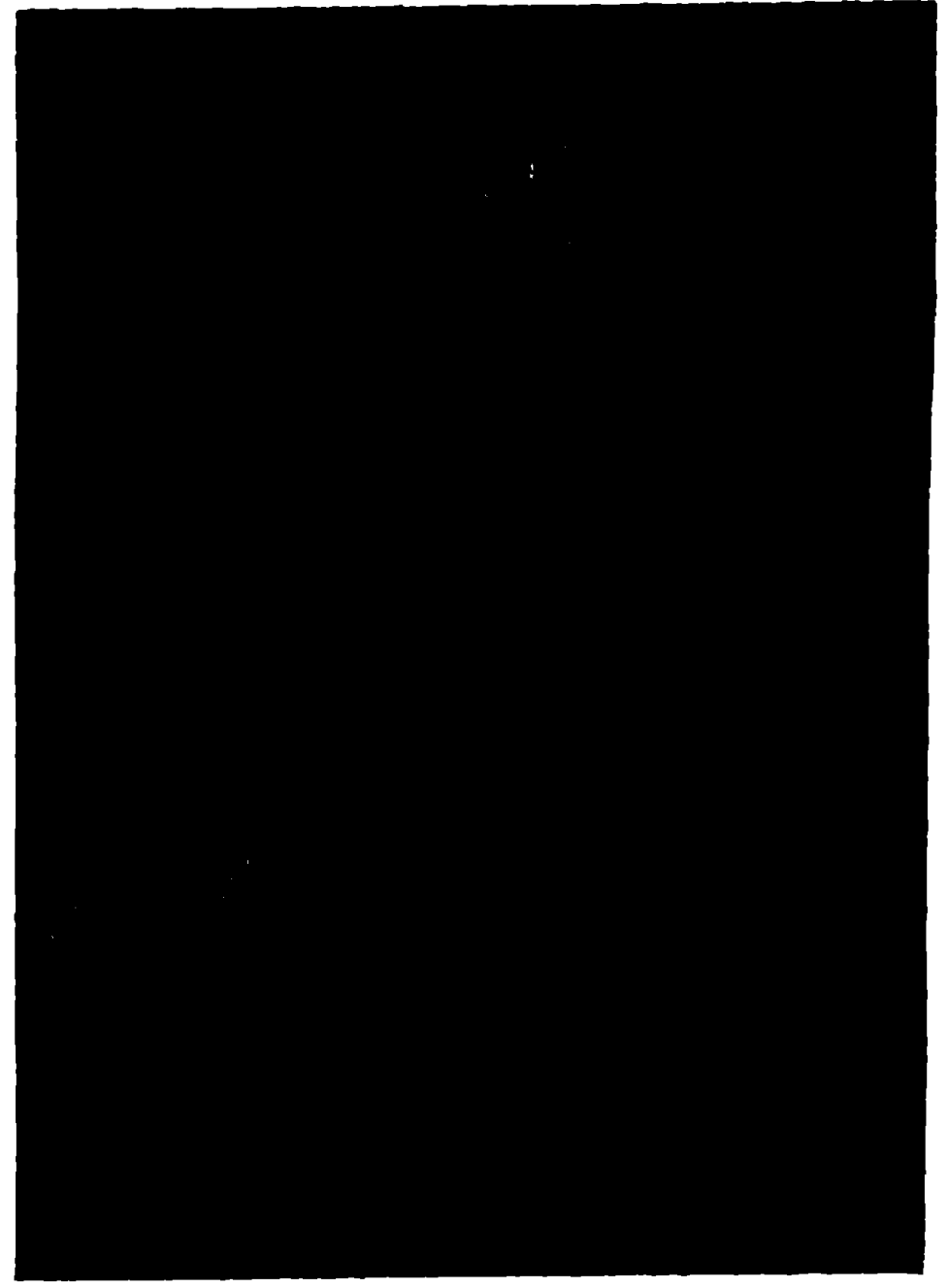
দিলীপকুমার রায়

বিখ্যাত সংগীত-সাধিকা জানকীবাঈ, গহরজান প্রভৃতির গাওয়া-গানগুলি অনায়াসে গলায় তুলতে পারতেন। উচ্চাংগ-সংগীতের সাধনায় মেতে রইলেন দিলীপকুমার।

কলেজে পড়তে পড়তে তাঁর সংগীত-চর্চা চলে নিয়মিতভাবে। সে-সময় তাঁর সংগীত-শিক্ষক ছিলেন শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী। পরে তিনি সুরেন্দ্র নাথ মজুমদা-রের কাছে টপ্পা ও খেয়াল, রাম কথকের কাছে টপ্পা, ওস্তাদ দৌলতরামের কাছে ঠুংরী, রাম মজফ্‌ফর খাঁ, জানকীবাঈ ও মতিবাঈয়ের কাছে খেয়াল শিক্ষা করেন। ভারতীয় সংগীতজগতের বিখ্যাত পণ্ডিত ওস্তাদ আবদুল করিম খাঁর কাছেও কিছুদিন গান শেখেন। ঠুংরী গানের জন্য তিনি মথুরার চন্দন চওবের কাছেও ঋণী।

দিলীপকুমার একাধারে সংগীত-শিল্পী, সুরশিল্পী, সাহিত্যিক ও যোগী। বহুদিন তিনি ইউরোপে কাটিয়েছেন; ঘুরে বেড়িয়েছেন সেখানকার দেশগুলিতে। সেই সময় বিভিন্ন দেশের কলা-শিল্পীদের সংগে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছে—গভীর মনোনিবেশের সংগে তিনি শিক্ষা করেছেন সেদেশের বিভিন্ন সংগীত-পদ্ধতি। জগদ্বিখ্যাত

সুরসাধক মোজার্ট ও বিটোফেনের দেশে গিয়েও তিনি নতুন সুরের সন্ধান পেয়েছেন। পাশ্চাত্য-সংগীতের কারুকার্যগুলি অতি যত্নের সংগেই আয়ত্ত করেছেন তিনি। দেশে ফিরে দিলীপকুমার প্রথমেই চেষ্টা করলেন ভারতীয় ও পাশ্চাত্য সংগীতের মধ্যে একটি সমন্বয় সাধন করতে। এখানে বলে, চেষ্টায় ত্রুটি না থাকলে, কোনো কিছুই করা অসম্ভব নয়। তাই, এদেশের গানের 'মেলোডি'র সঙ্গে ওদেশের গানের 'হার্মনি'র মিলন ঘটাতে পেরেছেন দিলীপ রায়। তাঁর গাওয়া বাংলা ও হিন্দী গানের অনেক ক্ষেত্রেই ইতালীয়-সংগীতের তানের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

কণ্ঠমাধুর্যে এই বাঙালী-শিল্পীর বিশেষত্ব অনস্বীকার্য। চুয়ান্ন বছর বয়সের সীমারেখায় উপস্থিত হয়েও তিনি যে-ভাবে কণ্ঠের কোমলতা, মধুরতা সেইসঙ্গে ... বজায় রেখেছেন, আজকের দিনে তা সত্যিই দুর্লভ। তিনি একদিকে যেমন নারীকণ্ঠের কোমলতা দিয়ে ভক্তিমূলক বা ভাবগীতির রূপ দেন, অন্যদিকে তাঁর ভাবগম্ভীর উদাত্ত কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে ওঠে উদ্দীপনাময় জাতীয় সংগীতের বাণী। মোট কথা, দিলীপকুমারের গান শুনতে বসলে গানের কথা ও সুরে এমনভাবে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে হয় যে, কিছুক্ষণের জন্য কান্না-হাসির দোল-দোলানো পৃথিবীর কথা যেন আর মনে থাকে না।

ভজন-সংগীতের ক্ষেত্রে সারা ভারতবর্ষে আজ দিলীপকুমারের নাম ছড়িয়ে পড়েছে। দক্ষিণভারতের সুধাকণ্ঠী গায়িকা শুভলক্ষ্মী তাঁর কাছে বহুদিন ভজন-গান শিক্ষা করেছেন। 'মীরা'-ছবিতে শুভলক্ষ্মীর কণ্ঠে আমরা যে মীরার ভজনগুলি শুনে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছি, সেগুলি তিনি দিলীপকুমারের কাছেই শিখেছেন। কলকাতায় একবার যখন দিলীপকুমারের জন্মোৎসব পালিত হচ্ছে, তখন দিল্লী থেকে একখানা চার্টার্ড-প্লেনে ক'রে দু'টি সুন্দর মালা এলো সভার গোড়াতেই। উপস্থিত সকলেই ভক্তের অনুরাগে বিস্মিত ও প্রীত হলেন। যাঁর জন্য দু'খানি মালা আকাশ-পথে উড়ে এলো ভক্তের নৈবেদ্যের মতো, তিনিও কম প্রীত হন নি। কারণ, সে-মালা দু'খানি এসেছিল তাঁরই প্রিয়-শিষ্যা শুভলক্ষ্মী ও তাঁর স্বামীর কাছ থেকে।

ভজন-গানের জন্য দিলীপকুমার সবচেয়ে বেশী ঋণী শ্রীবিষ্ণু দিগম্বরের কাছে। তাছাড়া, শ্রীঅরবিন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ ক'রে, আশ্রমজীবনের পরিবেশ ও আধ্যাত্মিক-জীবনের প্রেরণা তাঁকে ভক্তিমূলক ও জাতীয়তামূলক সংগীতে সবচেয়ে বেশী অনুপ্রাণিত করেছে। তাই, তাঁর কণ্ঠে আমরা এই দু'-রকম গানই বেশী শুনতে পাই। তাঁর গাওয়া 'ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা', 'ধাও ধাও সমরক্ষেত্রে', 'বন্দেমাতরম্', 'অরবিন্দ স্তোত্রম্'—বিশেষ ক'রে বিখ্যাত হয়ে আছে তাঁর স্বকীয় সুর-যোজনা ও আখরের মিশ্রণে। গাইতে গাইতে গানের মধ্যে আখরের সন্নিবেশ করায় তাঁর জুড়ি খুব কমই আছে।

দিলীপকুমারের 'ঘুমপাড়ানী গান'-ও আজ সংগীতের ক্ষেত্রে একটা বিশেষ স্থান অধিকার করেছে। জার্মানীর লোক-সংগীতের অনুকরণে বাংলা ঘুমপাড়ানী গানে তাঁর সুরের গ্রন্থন অপূর্ব। কয়েকটি বিখ্যাত জাতীয়-সংগীতের সংস্কৃত ও ইংরেজী রূপ দিয়েও দিলীপকুমার প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন।

দিলীপকুমারের শিষ্যত্ব গ্রহণ ক'রে যাঁরা খ্যাতি লাভ করেছেন, তাঁদের মধ্যে সবার আগে নাম করতে হয় পরলোকগতা সুধাকণ্ঠী উমা বসুর (হাসি)। গুরুর স্বকীয়তা তিনি সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করেছিলেন। দক্ষিণ-ভারতের কান্তি দেবী ও বাংলার মঞ্জু গুপ্তাও দিলীপকুমারের শিষ্যত্ব লাভ ক'রে গৌরবান্বিতা হয়েছেন।

সঙ্গীতশিল্পের ওপরেও দিলীপ রায় কয়েকখানি বই লিখেছেন। সেগুলি নিঃসন্দেহে ভারতীয়-সংগীতবিদ্যার ছাত্রদের বিশেষ সহায়তা করবে। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য—'ভূস্বর্গ চঞ্চল', 'আবার ভ্রাম্যমাণ', 'তীর্থঙ্কর', 'আমার বন্ধু সুভাষ' প্রভৃতি।

কুমার শচীন দেববর্মণ

বাংলা দেশের যে গায়কের কণ্ঠে পূর্ব-বাংলার স্নিগ্ধ-শ্যামল পল্লীছায়ার ও স্বচ্ছ নদীজলের অপূর্ব সুরটি ধরা দিয়েছে তিনি লোকপ্রিয় সঙ্গীতশিল্পী কুমার শচীন দেববর্মণ।

কুমার শচীন দেববর্মণ

পল্লীগীতির মাধুর্যে ও বৈচিত্র্যে বাংলা দেশ যে কত মধুর কত বিচিত্র তার প্রমাণ দিয়েছেন তিনি। 'তুমি যে গিয়াছ বকুল বিছান পথে', 'ও পদ্মার ঢেউরে', 'মলয়া, চল ধীরে ধীরে', 'মধু বৃন্দাবনে দোলে রাধা', 'পিলে পিলে হরি নামকা পেয়ালা', 'তাজমহল' প্রভৃতি গানের মধ্য দিয়ে শচীন দেব সঙ্গীতজগতে অক্ষয় আসন লাভ করেছেন। তাঁর সুরের প্রধান বৈশিষ্ট্যই হলো ভাটিয়ালী সুরের সঙ্গে ক্ল্যাসিক্যাল সুরের সমন্বয় সাধন।

১৯০৫ সালে শচীন দেব জন্মগ্রহণ করেন কুমিল্লায়। তাঁর পিতামহ ঈশ্বরচন্দ্র মাণিক্য ছিলেন ত্রিপুরার রাজা। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা আগরতলার সিংহাসনে বসেন। শচীন দেবের পিতা তখন নাবালক। আইনতঃ সিংহাসনের তিনিই উত্তরাধিকারী। কিন্তু পিতৃব্যের চক্রান্তে সিংহাসনও গেল এবং তিনি সপত্নী রাজধানী ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। কুমিল্লার এক ধর্মপ্রাণ মুসলমান পরিবার তাঁদের আশ্রয় দেন। সেখানেই শচীন দেবের জন্ম।

পড়াশোনার জন্য কুমিল্লা থেকে শচীন দেব আসেন কলকাতায়। পুঁথিগত বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গীতবিদ্যারও অনুশীলন চলতে থাকে। সঙ্গীতের অনুপ্রেরণা তিনি তাঁর পিতার কাছ থেকেই পেয়েছিলেন। ক'লকাতায় থাকার ফলে, গুণী সঙ্গীত-সাধকদের কাছে তাঁর সঙ্গীত-চর্চার আরও সুবিধা হলো। বাদল খাঁ, কৃষ্ণচন্দ্র দে, গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী, রাইচাঁদ বড়াল, প্রভৃতির কাছে তিনি খেয়াল, ঠুংরী ও ধ্রুপদের বিশেষ পাঠ গ্রহণ করেন। এই ভাবে উচ্চাংগ-সঙ্গীতে শচীন দেবের দক্ষতা জন্মে।

কিন্তু তাঁর সঙ্গীত-প্রতিভার বিশেষ প্রকাশ পল্লী-গীতিকায়। সাধারণ গ্রামের গ্রাম্যকথায় তিনি যেন বেশী আনন্দ পেয়েছিলেন। তাই পল্লী-বাংলার লোক-সঙ্গীত সংগ্রহে একদিন তাঁর পরম আগ্রহ দেখা দিয়েছিল। তিনি ভাবলেন এই অনাদৃত গ্রাম্যকথাগুলিকে তিনি যদি সুরের মধ্যে দিয়ে লোকের কানে পৌছে দিতে পারেন, তাহ'লে নতুন জিনিস দিতে পারবেন, তাঁর আকাঙ্ক্ষারও তৃপ্তি হবে। এই জন্যই রাজার ছেলে শচীন দেব দিনের পর দিন ঘুরে বেড়াতে লাগলেন পার্বত্য-ময় বনাকীর্ণ ত্রিপুরার পল্লী-অঞ্চলে; সাধারণ গ্রাম্য লোকের সঙ্গে চলতে লাগলো তাঁর মেলামেশা।

কিন্তু রাজ-সরকারের আভিজাত্যে আঘাত লাগলো। শাসন-কর্তৃপক্ষ তাঁদের ভাবী রাজাকে অনুরোধ জানালেন তাঁর পিতার অধীনে রাজ-দপ্তরের কোনো একটি উচ্চপদ গ্রহণ করতে। কিন্তু ঐশ্বর্য্যের মায়াজাল যাকে কোনো-দিনই বাঁধতে পারেনি, তিনি কেন সে-প্রস্তাব গ্রহণ করবেন। তিনি আগরতলাকে বিদায় জানিয়ে কলকাতায় ফিরে এলেন।

১৯২৩ সাল। ক'লকাতা বেতারকেন্দ্রের সঙ্গীত-আসরে নতুন এক কণ্ঠের পরিচয় পেয়ে সঙ্গীতানুরাগী-মাত্রেই কৌতূহলী হলেন। কে এই দরদী-কণ্ঠের অধিকারী? কিছুদিনের মধ্যেই বেতার-মারফৎ শচীন দেববর্মণ পরিচিত হলেন সবার কাছে।

রাজ-পরিবার থেকে বিদায় নিয়ে চ'লে আসার বহুদিন অর্থকষ্টে তাঁকে কাটাতে হয়েছে—বিশেষ ক'রে তাঁর পিতার মৃত্যুর পর। তবু, তাঁর মনোবল ভাঙেনি,

নিরুৎসাহ হননি ; সঙ্গীতের শিক্ষকতা ক'রে দিন কাটিয়েছেন। গুণীজনের সমাদর হতে সময় লাগে না। তাই, অল্পদিনের মধ্যেই শচীন দেব সঙ্গীত-জগতের কয়েকজন প্রসিদ্ধ-লোকের বন্ধুত্বও লাভ করলেন। তাঁরা হলেন—গীতিকার কবি অজয় ভট্টাচার্য, সুরসাগর হিমাংশু দত্ত, সঙ্গীত-সাধক ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, বিদ্রোহী-কবি কাজী নজরুল ইসলাম আর পল্লীকবি জসিমউদ্দিন। অজয়বাবু গান লেখেন, সুরসাগর সুর দেন আর শচীনদেব তাঁর মরমী-কণ্ঠে সেই গানের বাণী ছড়িয়ে দেন রেকর্ডে, বেতারে ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে। কাজী নজরুল ও জসিমউদ্দিনের কয়েকটি গানও তিনি গেয়েছেন।

শচীন দেবের গান শুনে বিখ্যাত সঙ্গীত-সাধক ওস্তাদ আবদুল করিম খাঁ তাঁকে উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন জানান এলাহাবাদের এক সঙ্গীত-সম্মেলনে।

কুমার শচীন দেব আজ আর ত্রিপুরার রাজ-পরিবারের কেউ নন। তিনি কলকাতার বাসিন্দা ; সাদার্ণ পার্কে তাঁর বাড়ি ; ঢাকার সঙ্গীতশিল্পী শ্রীমতী মীরা (দত্ত রায়) তাঁর সহধর্মিণী।

শচীন দেববর্মণ বর্তমানে বোম্বাই-প্রবাসী। সেখানকার হিন্দী-চিত্রজগতে তিনি একজন শ্রেষ্ঠ সুরশিল্পী ব'লেই পরিচিত। তাঁর সঙ্গীত পরিচালনার কৃতিত্ব অকুণ্ঠ জনসমাদর লাভ করেছে। 'শিকারী', 'দো-ভাই', 'শবনাম', 'মশাল' (সমর), 'মিলন', 'নৌকাডুবি', 'বাজী', 'নওজোয়ান' প্রভৃতি চিত্রে সঙ্গীত-পরিচালনা ক'রে তিনি শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত-পরিচালকের গৌরবে বারবার সম্মানিত হয়েছেন। তিনি 'কাফিলা', 'অঙ্গরাগ' প্রভৃতি কয়েকখানি হিন্দী-ছবিতে সুর-সংযোজনা ও আবহ-সঙ্গীত পরিচালনার কাজ করছেন।

যূথিকা রায়

১৯৩৫ সালের কথা। পথ দিয়ে যেতে যেতে শুনতে পেলাম, একটি গ্রামোফোন-রেকর্ডের দোকানে বাজছে—'আমি ভোরের যূথিকা!' তাকিয়ে দেখলাম দোকানের সামনে বেশ একটা ভিড় জমেছে। সবাই আগ্রহের সঙ্গে শুনছে সেই গান। কৌতূহলী হয়ে আমিও দাঁড়িয়ে গেলাম ভিড়ের মাঝখানে। কোকিল-কণ্ঠের সেই অপূর্ব গান শুনে আশাতিরিক্ত আনন্দ পেলাম। কে এই সুমধুর কণ্ঠের অধিকারিনী? রেকর্ডের ও-পিঠ শুরু হয়ে গেল ইতিমধ্যে—'আমি সন্ধ্যাতারকা!' এ-গানখানিও আগের মতই আনন্দ দিল উপস্থিত সকলকে। সকলেরই এক মত—'হ্যাঁ, গেয়েছে বটে! কি মিষ্টি গলা!'

এই গায়িকাই ভারতের জনপ্রিয়া সঙ্গীত-শিল্পী কুমারী যূথিকা রায়। অতি অল্প সময়ের মধ্যে কণ্ঠস্বরের মাধুর্যে আর কোনো বাঙালী মেয়ে জনসাধারণের কাছে এত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন কিনা সন্দেহ। যূথিকার বয়স যখন মাত্র আট বছর তখন খুলনায় নাটমঞ্চে তিনি সর্বপ্রথম সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'বর্ষামঙ্গল', 'বসন্ত উৎসব' ও 'নটীর পূজায়' কয়েকখানি গান গেয়ে তিনি বিপুলভাবে অভিনন্দিত হন। কিশোরী মেয়ের কণ্ঠে রবীন্দ্র-সঙ্গীত যে কত মধুর হয়ে ধ্বনিত হতে পারে যূথিকা সেদিন তার পরিচয় দিয়েছিলেন। দশ বছর বয়সের সময়, খুলনাবাসীদের কাছে তাঁর জনপ্রিয়তা আরও বৃদ্ধি পায়। ম্যাডান থিয়েটারের
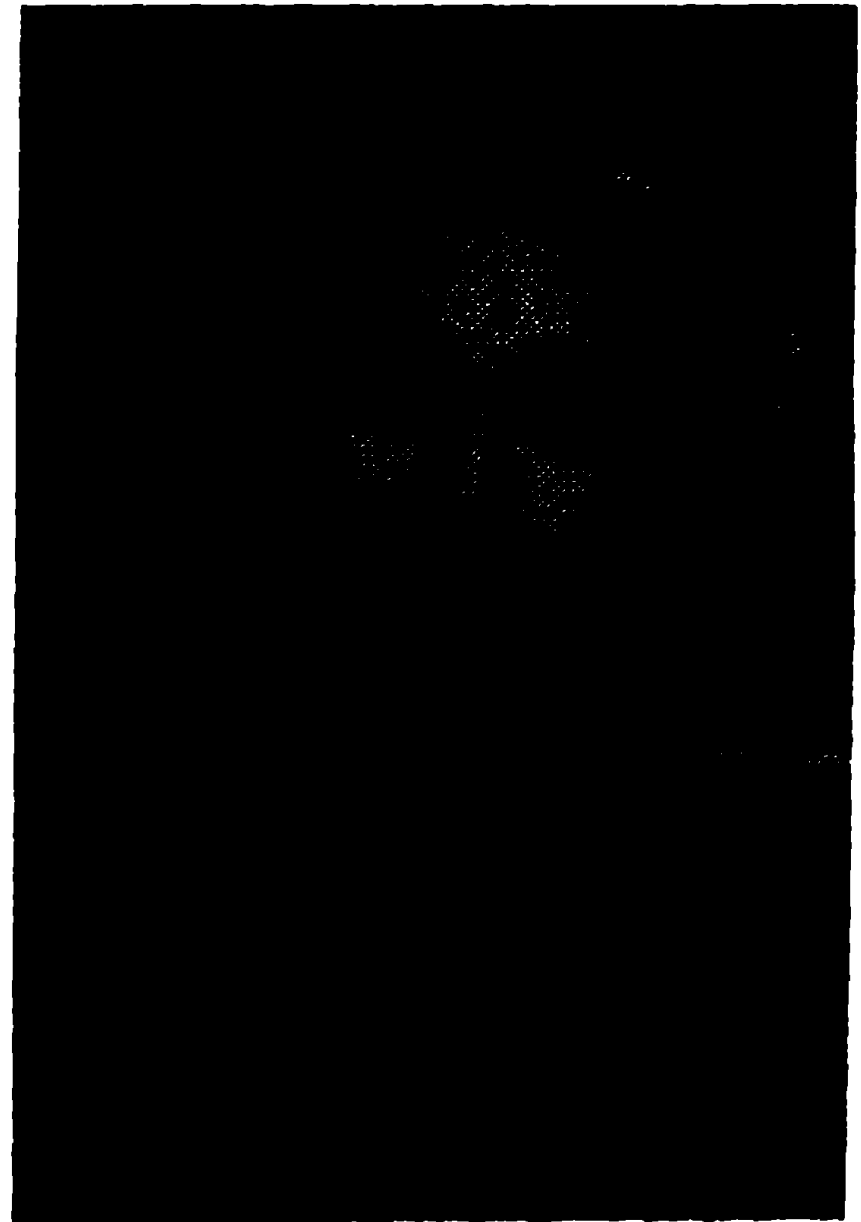
জেমিনীর 'সংসার' চিত্রে পুষ্পবলী

উদ্যোগে যেবার ক'লকাতার রঙ্গমঞ্চে 'নটীর পূজা' অভিনীত হয়, কুমারী যূথিকা সেবার তাতে একটি ভূমিকা গ্রহণ ক'রে একসঙ্গে অভিনয় ও গান করেন। বলা বাহুল্য, সেটি সঙ্গীতপ্রধান ভূমিকাই ছিল। আর যূথিকা তাতে সাফল্যও লাভ করেছিলেন।

এর পর থেকেই সঙ্গীতের আসল পাঠ শুরু হয় যূথিকার। নিয়মিতভাবে উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতের কলা-কৌশলগুলি আয়ত্ত করতে থাকেন। সঙ্গীতবিদ্যায় দক্ষতা না জন্মালে যে, প্রকৃত গায়ক হওয়া যায় না—সেই সত্যকে কিশোর-জীবনে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলেই, অল্প সময়ের মধ্যে যশস্বিনী গায়িকার মর্যাদা লাভের সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল। তাঁর এই সঙ্গীত-সাধনার প্রধান-শিক্ষক ছিলেন বিখ্যাত সুরশিল্পী কমল দাশগুপ্ত।

যূথিকা রায় খুলনা জেলার সেনহাটি গ্রামের এক অভিজাত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা শ্রীসত্যেন্দ্র-নাথ রায় সঙ্গীতশিল্পের একজন পৃষ্ঠপোষক। প্রধানতঃ তাঁর আগ্রহ, উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় যূথিকা সঙ্গীতের প্রতি আকৃষ্ট হন। রায়-পরিবারের প্রায় সকলেই

হিন্দুস্থান ফিল্মসের 'মণিমালা' চিত্রের নাম-ভূমিকায় অনুভা গুপ্তা

অল্প-বিস্তর গান জানেন এবং সঙ্গীতবিদ্যায় পারদর্শী। যূথিকার এক বোন মল্লিকা এক সময় 'হিজ মাস্টা'স ভয়েস'-এর শিল্পী ছিলেন। আর এক বোন নিবেদিতা তিনি ইতিমধ্যেই রেডিওর সঙ্গীত-শিল্পী হিসাবে [illegible] করেছেন। কনিষ্ঠা সহোদরা সবিতাও রেডিওর মাধ্যমে সঙ্গীতানুরাগীদের সমর্থন লাভ করেছেন। 'হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানী'-তে তাঁরও খানকয়েক গান রেকর্ডিত হয়েছে।

যূথিকা রায় মনে-প্রাণে একজন শিল্পী; সঙ্গীত-সাধিকাও বটে। তাঁর ব্যবহারিক জীবনের সহজ মধুর সারল্যের সঙ্গে তার সঙ্গীত-জীবনেরও যেন একটা সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া যায়। তিনি আত্ম-প্রচারের বিরোধী। একবার এক গ্রামোফোন-কোম্পানী এই শিল্পীর প্রচারকার্যের জন্য তাঁর একখানি ফটো তুলতে চেয়েছিলেন। আশ্চর্যের বিষয় সেদিন যূথিকা অতি সহজেই তাঁদের সেই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। বোম্বাইয়ের রেকর্ড বিক্রেতারাও বহু টাকার বিনিময়ে তাঁকে ফটোর জন্য রাজী করাতে পারেন নি।

'হিজ মাস্টা'স ভয়েস'-এ যোগ দিয়ে যূথিকা আজ পর্যন্ত বহু গান রেকর্ড করেছেন। তাঁর প্রথম গান—'আমি ভোরের যূথিকা' রেকর্ড অতি অল্প সময়ের মধ্যে বারো হাজার কপি বিক্রী হয়ে যায়। তার আগে কোনো এক-খানি রেকর্ডের এত কপি বিক্রী হয়নি। পরের রেকর্ডখানিও অভূতপূর্ব জনসমাদর লাভ করে। সেখানি হলো—'চুপকে চুপকে বোলরে মনুয়া।' (হিন্দী)—এই রেকর্ডখানির পঞ্চাশ হাজার কপি খুব কম সময়ের মধ্যে বিক্রী হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে সারা ভারতবর্ষে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। 'ভজন' গানেই যূথিকা সবচেয়ে বেশী কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

যূথিকা রায় আজও সঙ্গীতবিদ্যার অনুশীলন ক'রে চলেছেন নিয়মিতভাবে। বহু সঙ্গীত-সম্মেলনে ওস্তাদ গাইয়েদের শুভাশীর্ব্বাদ লাভ করেছেন তিনি। সুদূর সিংহল থেকেও আমন্ত্রণ এসেছে তাঁর। সিংহলবাসীদের মনে রেখাপাত ক'রে আসতে পেরেছেন তিনি। যূথিকা বোম্বাইয়ে থাকাকালীন কয়েকটি ছায়াছবিতে 'প্লে-ব্যাক'ও করেছেন।

ভারতী দেবী

মঞ্জু দে

বিজন ঘোষ দস্তিদার

উচ্চাংগ-সংগীতের দিক থেকে বাংলা দেশের যে-গায়িকা আজ সারা ভারতবর্ষে স্বীকৃতি লাভ করেছেন, তিনি আর কেউ নন, তিনি বিজনবালা ঘোষ দস্তিদার। ভগবৎ-দত্ত অপূর্ব কণ্ঠমাধুর্যের তিনি অধিকারিনী—সঙ্গীত-শাস্ত্রে তাঁর সুগভীর পাণ্ডিত্য।

পদ্মাপারের দেশে তাঁর জন্ম। ময়মনসিংহের শ্রীধরণী রঞ্জন ঘোষ তাঁর পিতা। ঘোষ-পরিবারে গানের রেওয়াজ ছিল। ধরণীবাবু আর তাঁর ভাই অবনীরঞ্জন দু'জনেই ছিলেন সংগীতের পৃষ্ঠপোষক। অতি শৈশবেই তাঁরা বিজনের গানের গলার পরিচয় পেয়ে তাঁকে উৎসাহিত করেন। তখন ময়মনসিংহে ছিলেন শান্তিনিকেতন-সঙ্গীত-ভবনের অধ্যক্ষ শৈলজারঞ্জন মজুমদার। বিজনকে তিনি স্নেহ করতেন খুবই। তাঁরই কাছে বিজন কয়েকটি জাতীয়তামূলক গান চমৎকারভাবে শিখে নেন। তখন তাঁর বয়স হবে ছয় কি সাত। কিন্তু এই বালিকার কণ্ঠে যখন 'বন্দেমাতরম্' কি 'সোনার বাংলা, তোমায় ভালবাসি' কি 'অয়ি ভুবনমনোমোহিনী' গান ধ্বনিত হয়ে উঠ্‌তো তখন সমবেত শ্রোতা নির্বাক্-বিস্ময়ে চেয়ে থাকতেন তাঁর দিকে।

ময়মনসিংহে একজন নামজাদা কবিরাজ ছিলেন। তাঁর নাম—ললিতমোহন সেন। তিনি একজন বিখ্যাত কবিরাজই ছিলেন না, ওস্তাদ গাইয়ে-ও ছিলেন। ধ্রুপদ, খেয়াল ও টপ্পায় তাঁর মতো দক্ষতা ময়মনসিংহ বা সারা পূর্ববঙ্গের আর কোন গায়কের ছিল না। একদিন বিজনের কাকা বিজনকে সংগে নিয়ে তাঁর কাছে গেলেন। বল্‌লেন—'কালী-কে আপনার গান শেখাতে হবে।'

—'সে কি!' বিস্ময় প্রকাশ করলেন ললিতবাবু। তাঁর বিস্ময়ের যথেষ্ট কারণও ছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, মেয়েদের পক্ষে উচ্চাংগ-সংগীতে পারদর্শিতা লাভ করা সম্ভব নয়। কারণ, সে যে অত্যন্ত সাধনার জিনিস। মেয়েদের সে-নিষ্ঠা কোথায়, সে-আন্তরিকতা কই, সে-ধৈর্যেরও অভাব। প্রথমটা সেইজন্যই তিনি কালী ওরফে

বিজনকে গান শেখাতে রাজী হননি।

কিন্তু, বালিকার মুখের দিকে চেয়ে তাঁর কেমন যেন মায়া হলো। তিনি বিজনকে পরীক্ষা করতে চাইলেন। সেদিন ললিতবাবুর ঘরে ব'সে বিজন যে-ভাবে গলা ছেড়ে গান গাইলেন—তা কোনো এক কিশোরীর পক্ষে সম্ভব কিনা ললিতবাবু বহুক্ষণ তা চিন্তা করেছিলেন। পূর্ণ তৃপ্তির সঙ্গে সন্তুষ্ট হয়ে তিনি সেইদিন বিজনের গান-শেখাবার দায়িত্ব নিলেন। সুদীর্ঘ ছয়টি বছর তিনি তাঁর এই শিষ্যাকে প্রায় সত্তরটি রাগের ভজন, খেয়াল, ধ্রুপদ, চতুরঙ্গ, তারানা প্রভৃতি গান শেখান। সঙ্গীত-সাধিকা বিজনবালার খ্যাতি ও গৌরবের মূলে আছে সেই গুরুর সযত্ন শিক্ষা ও স্নেহাশীর্বাদ।

প্রতিভা কখনও লুকানো থাকে না। ময়মনসিংহের এই বালিকার কথা তখন কলকাতাতেও এসে পৌঁচেছে। কলকাতার বেতার কর্তৃপক্ষ সঙ্গে সঙ্গেই আমন্ত্রণ জানালেন এই কিশোরী-শিল্পীকে। বিজনের বয়স তখন মাত্র ন'বছর। সেই সময় তাঁর গান শুনে 'হিজ-মাস্টার্স-ভয়েস' রেকর্ড কোম্পানী এতই আনন্দিত হন যে, সংগে সংগে তাঁর দু'খানি গান রেকর্ড ক'রে রাখেন। দু'তিন বছর বাদেই আবার তাঁরা এই দ্বাদশী-শিল্পীর গাওয়া ভজন, শ্যামাসংগীত, রাগপ্রধান ও খেয়াল গান রেকর্ড করেন।

উপযুক্ত গুরুর শিক্ষায় ও সহজাত প্রতিভায় বিজন-বালা বছর ষোল বয়সেই একজন ওস্তাদ-শিল্পীতে পরিণত হন। ১৯৩৫ সাল থেকে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত তিনি 'নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলনে' আমন্ত্রিত হয়ে ভারতের নানা জায়গায় বাংলার প্রতিনিধিত্ব করেছেন। তাঁর গানের কারুকার্যে মুগ্ধ হ'য়ে ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ, এনায়েৎ খাঁ, আলাউদ্দীন খাঁ, হাফেজ আলী, পণ্ডিত কৃষ্ণরাও, ভি, এন্, পটওর্ধন, মহম্মদ দবীর খাঁ, গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী প্রভৃতি প্রতিভাধর-শিল্পী তাঁকে উচ্ছ্বসিতভাবে অভিনন্দিত করেছেন। পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুর বিজনের কণ্ঠে একটি কবীরের ভজন শুনে এতই উৎফুল্ল হন যে, তিনি সানন্দে তাঁর শিক্ষকতা করতে রাজী হন।

ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা-পরীক্ষার এক-কাল 'সঙ্গীতবিদ্যা'র যে পাঠ্যতালিকা ছিল, তা রচনা করেছিলেন বিজনবালাই। ১৯৩৯ সাল থেকে ১৯৪২ সাল পর্য্যন্ত তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সঙ্গীতবিদ্যা'র পরীক্ষক ছিলেন। ঐ সময় ক'লকাতা বেতারকেন্দ্র মারফৎ তিনি প্রবেশিকা-পরীক্ষার্থী ছাত্র ছাত্রীদের সংগীত-শিক্ষা দিয়েছেন তাঁর অননুকরণীয় ভঙ্গীতে। বেতার-কেন্দ্রের সংগে তিনি যে-ক'বছর সংশ্লিষ্ট ছিলেন, সে ক'বছরই তিনি নানাভাবে বেতারকে জনপ্রিয় ক'রে তোলবার চেষ্টা করেছেন। বেতারে জাতীয়-সংগীতের বহুল প্রচারের মূলেও তিনি। গানের মধ্য দিয়ে বিখ্যাত সংগীত-সাধকদের জীবনী ও রচনা প্রচারের পরিকল্পনাও তাঁরই।

বিজনবালার কণ্ঠের যে-দু'খানি গান আজ সারা ভারতবর্ষে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে তা হ'লো 'রঘুপতি রাঘব রাজারাম' আর 'বৈষ্ণবজন তো তেনে কহিয়ে'। এ-গান আরও অনেকে গেয়েছেন। কিন্তু বিজনবালার কণ্ঠে এ দু'টি গান যেন সুরে মাধুর্যে, তানে, লয়ে, আখরে অপরূপ হয়ে উঠেছে। মহাত্মা গান্ধীর তিরোধানের পর পনেরো দিন তিনি ক'লকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে এই গান দু'টি প্রচার করেছেন।

বিজনবালা সঙ্গীতবিজ্ঞানের প্রতিটি নিয়ম নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেন। যে-রাগের গান যে সময়ে গাইতে হয়, তিনি তার ব্যতিক্রম করেন না। এক সময়ে অন্য সময়ের রাগের গান গাওয়া অত্যন্ত অসঙ্গত বলেই তিনি বিবেচনা করেন।

১৯৫০ সালে সুরাট সঙ্গীত-নিকেতন বাংলার এই সংগীতশিল্পীকে 'সংগীত বিদ্যালংকার' উপাধিতে ভূষিত করেছেন। শ্রীমতী বিজনবালা বর্তমানে সঙ্গীতবিদ্যার ওপরে কয়েকখানি বই লেখবার কাজে ব্যাপৃত আছেন। সংগীতের ক্ষেত্রে উচ্চাংগ-সংগীত ও লোক সংগীতকেই তিনি সবার ওপরে স্থান দেন।

★

ক্যামেরার চোখে কাহিনী

● অজয় কর ●

ছায়াছবি! এখানে সব হিসাবের মাপকাঠি হ'ল সেকেণ্ডে ২৪ ফ্রেম, এখানে দিন মাস বর্ষ অতিক্রান্ত হয় কালের অমোঘ বিধানে নয়, চিত্রসম্পাদকের বিধান অনুযায়ী ছোট একটি ডিজল্‌ভ্ (Dissolve) বা ওয়াইপ্ (Wipe)-এর মাধ্যমে! এখানকার সবচেয়ে বড় বাহাদুরী হ'ল শিল্পীর রং তুলির সাহায্য না নিয়েই শুধু ছায়ার মায়া সৃষ্টি ক'রে দুই আয়তনের আয়তক্ষেত্রে তিন আয়তনের (Three dimensional effect) বিভ্রম জাগানো। এর প্রকাশভঙ্গী মৌলিক, এর আঙ্গিক-রীতি-পদ্ধতি জটিল। এর কাহিনী বিশেষ সংখ্যক পরিচ্ছেদ বা দৃশ্যাঙ্কে বিভক্ত হয় না। এর কাহিনী গড়ে ওঠে পাঁচশত থেকে হাজার দেড় হাজার দৃশ্যাংশ বা সট্ (Shot) নিয়ে। এই সট্ পরিকল্পনাতেই চিত্রনাট্যকারের মুন্সীয়ানার পরিচয়, পরিচালকের প্রতিভার পরিচয়, চিত্রশিল্পীর শিল্প-দৃষ্টির পরিচয়। ছবির উৎকর্ষ যেখানে যত বেশী, এই সট্ পরিকল্পনার নৈপুণ্যও সেখানে তত বেশী—কারণ কাহিনীর প্রয়োজনে ক্যামেরার বিশিষ্ট দৃষ্টিকোণ থেকে যে দৃশ্যাংশটুকু চিত্রে রূপায়িত হয় তারই নাম হ'ল সট্। এই কাহিনীর প্রয়োজন কথাটি সম্পূর্ণভাবেই আপেক্ষিক—কেননা কাহিনীর প্রতিটি ঘটনা দর্শকচিত্তে আনুমানিক যে প্রতিক্রিয়া ঘটাবে তা আগে থেকেই ধরে নিয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে চিত্রগ্রহণ করা হয়ে থাকে। এই বিচারবোধ রামের যা হবে, শ্যামের নিশ্চয়ই তা হবে না—এবং ঠিক এই কারণেই প্রায় অনুরূপ ঘটনাকেই দুটো ছবিতে দু'রকম ভাবে রূপায়িত হতে দেখা যায়। এই বিভিন্নতাটুকু ছেড়ে দিলে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে দর্শকচিত্তের অনুধাবন থেকেই সটের সৃষ্টি। ক্যামেরা হ'ল দর্শকচিত্তের প্রতিনিধি, ক্যামেরার চোখ হ'ল দর্শকের চোখ। দর্শক যে ঘটনার যতটুকু, যে বিশিষ্ট কোণ থেকে, যত কাছে বা দূর থেকে দেখতে চান ক্যামেরা সেই জিনিষটা ঠিক সেইভাবেই তাঁদের সামনে তুলে ধরে। রঙ্গমঞ্চ থেকে ছায়াছবির আঙ্গিকের যতখানি মৌলিকতা বর্ত্তমান, তার প্রায় সবটাই সম্ভব হয়েছে একান্তভাবে ক্যামেরার দৌলতে।
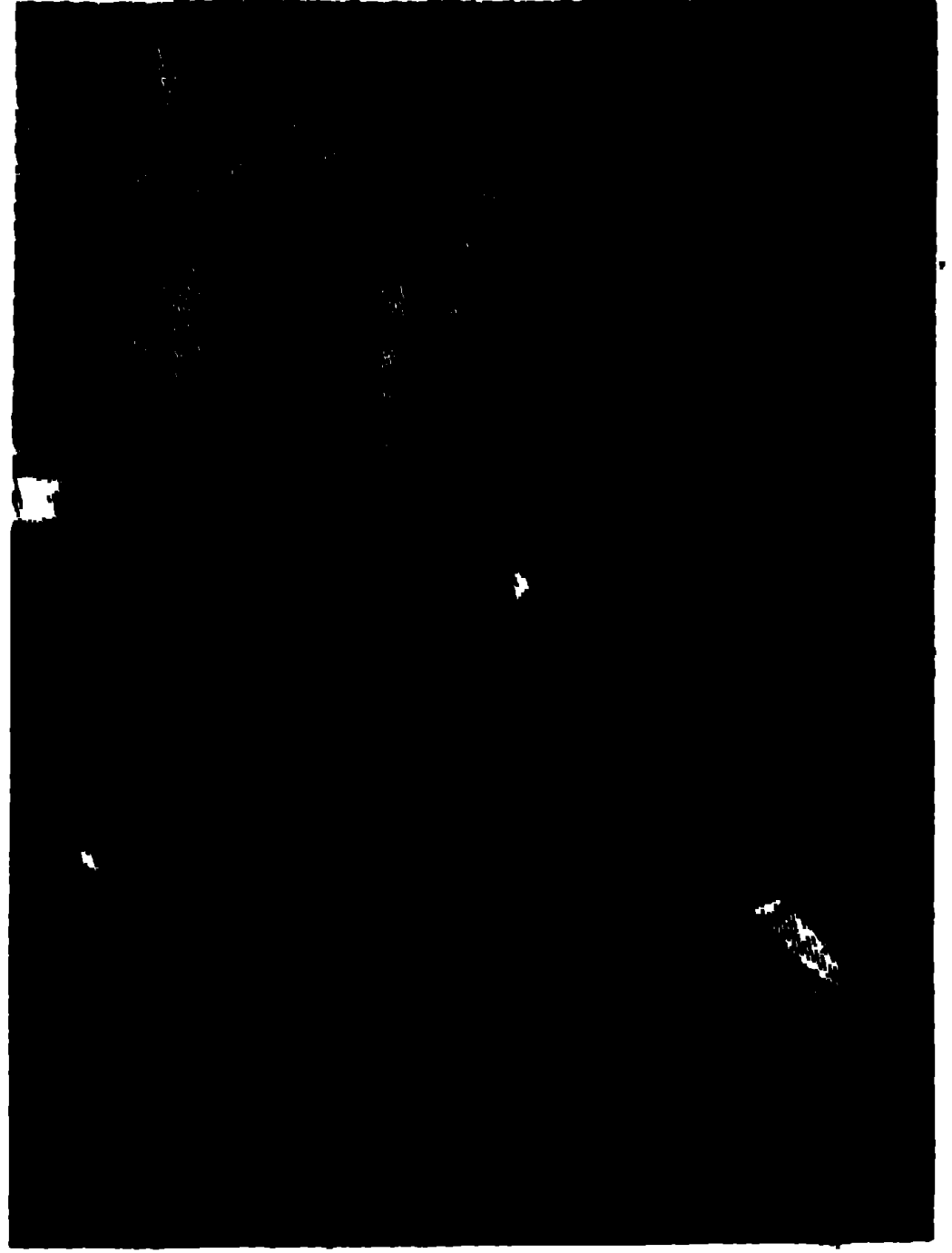
অজয় কর

কিন্তু এই বিশিষ্ট দৃষ্টিকোণ থেকে কাহিনী আলোক-চেতন (light sensitive) ফিল্মে ধরে রাখাতেই ক্যামেরার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ নয়। কাহিনীর যে জগৎ সে তো ঘটনার সমাবেশ মাত্র নয়, তারও আছে পরিবেশ, যে পরিবেশে নবোদিত সূর্য্যের অম্লান হাসিটি প্রতি গৃহকোণ নূতন আলোয়, নূতন আশায় ভরে তোলে, যেখানে গোধূলির ম্লান আভাষে পুঁই মাচা ঘেরা তুলসীতলায় মাটির প্রদীপটি রেখে পল্লীবধূ দেবতার কাছে আকুতি জানায় রুগ্ন স্বামীর হ'য়ে—কম্পিত দীপশিখার ম্লান আলো তার ভিজে চোখের পাতায় চিক্‌চিক্ করে। এখানে ঘটনা গৌণ, পরিবেশ মুখ্য। এই পরিবেশ সৃষ্টি

করতে কাহিনীকার হয়তো পাতার পর পাতা লিখে যেতে পারেন, কিন্তু সেলুলয়েডের ফিতায় একে ধরে রাখতে হ'লে এগিয়ে আসতে হবে চিত্রশিল্পীকেই, ক্যামেরাকেই নিতে হবে মুখ্য অংশ। কিন্তু যে কাহিনীতে কল্পনা আরও বিচিত্র, আরও সুদূরপ্রসারী সেখানে ক্যামেরাকে সর্ব্বাগ্রে আসন নিতেই হবে, কেননা সেখানে পরিবেশসৃষ্টিতেই কাহিনীর অভিনবত্ব, ঘটনার বিন্যাসে নয়। একে চলচ্চিত্রের ভাষায় বলা হয়—ক্যামেরার মাধ্যমে গল্প বলা—আর এ জাতীয় কাহিনীর শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন হ'ল 'এ ম্যাটার অব লাইফ অ্যাণ্ড ডেথ' নামক ছবিখানা। এ ছবির প্রতিটি ঘটনা যেন তৈরী হয়েছে ক্যামেরার জন্যে ভেবে। এখানে ঘটনাপ্রবাহ মর্ত্ত থেকে স্বর্গে চলে যাচ্ছে অনায়াসে—আজগুবি মনে হলেও কোথাও কোন অসঙ্গতি ধরা পড়ছেনা—এটা শুধু সম্ভবপর হয়েছে ক্যামেরার চাতুরীতে। চিত্রসম্পাদকের হাতে গড়া একটি ডিজল্‌ভ্-এর সাহায্যেই হয়ত স্বর্গ থেকে মর্ত্তে আসা যেত—কিন্তু অসীম বিশ্বের কোটি কোটি নক্ষত্রের সঙ্গে পরিচিত হতে হতে পৃথিবীর বুকে ফিরে আসার যে অনুভূতি ও আনন্দ সেটা কি পাওয়া যেত যদি না ক্যামেরা এই বিরাট ব্যোমযাত্রা গ্রহণ করতো? এখানে ক্যামেরা শুধুমাত্র ফটোগ্রাফ নেওয়ার যন্ত্র মাত্র ছিল না। চিত্রনাট্যকার-পরিচালকের কল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করার একমাত্র দায়িত্ব তার ওপরেই ন্যস্ত ছিল।

এই বিশিষ্ট আঙ্গিকেই রচিত হয়েছে বাংলা ছায়াছবি 'জিঘাংসা'র চিত্রনাট্য। রত্নগড়ের প্রাচীন রাজবংশ ঘিরে যে চক্রান্ত রচনা হচ্ছে তার সমাধানই হোল কাহিনীর প্রতিপাদ্য বিষয়। কিন্তু এই চক্রান্তজাত ঘটনাপ্রবাহ হ'ল এখানে গৌণ, মুখ্য হ'ল রহস্য—যে-রহস্য ঘনীভূত কুয়াশার মতো রত্নগড়কে ঘিরে রয়েছে। কেন রাজবংশের ওপর এই অভিশাপ? কার দীর্ঘশ্বাস রাতের অন্ধকারে দিকসীমাহীন জলার বুকে বিলাপের মতো শোনায়? কোন্ সে ছলনাময়ী দিগন্তের বুকে মিশে হাতছানি দিয়ে দিয়ে ডাকে? যুক্তির চশমা চোখে লাগিয়ে বিচার করতে

বললে সন্দেহ জাগতে পারে এ সবই অবাস্তব না সত্যি—কিন্তু তার আগেই বিচারবুদ্ধি যদি রোমান্সের কার্পেটে চড়ে এক নিমেষে চলে গিয়ে থাকে বোগদাদের সরাইখানায়, কি পাতাল-পুরীর মণিকোঠায়, তখন সেই বিচারক ভদ্রলোকটি কোন্ দিকে রায় দেবেন বলুন তো? আসলে চাই পরিবেশ সৃষ্টি—যে পরিবেশে সত্য-মিথ্যার প্রভেদ ঘুচে যায়, মনটা এদিক থেকে ওদিকে অনায়াসেই ডিঙিয়ে যায়।

তাই 'জিঘাংসা' ছবিতে এল কুয়াশা—অন্তহীন পুঞ্জীভূত কুয়াশা—Nujol Spray-র দ্বারা সৃষ্ট কৃত্রিম কুয়াশা—যে কুয়াশা আলোর প্রতি-সরণ হেতু (light refraction) দূরত্বের বা আকৃতির বিভ্রম ঘটায়, পার্থিব সব কিছুকেই মনে হয় মায়াময় অবাস্তব; এল অন্ধকার—পৃথিবীর আদিমতম প্রতিবেশী, মানবের চিরন্তন ভয়ের প্রতীক, যে অন্ধকারেই পৃথিবীর নিষ্ঠুরতম, ঘৃণিততম পাপ কাজ সব অনুষ্ঠিত হয়।

কিন্তু তাতেও বুঝি কাজ এগোয় না। তাই বাকী কাজটুকু নিতে হ'ল ক্যামেরাকেই—তার বিশিষ্ট গতি-ভঙ্গিমা একাত্ম হয়ে গেল কাহিনীর গতিভঙ্গীর সঙ্গে। এই কুয়াশা, এই অন্ধকার, এই ক্যামেরার বিশিষ্ট দৃষ্টিকোণ বা বিশিষ্ট গতিভঙ্গী এরা কেউই এককভাবে সম্পূর্ণ নয়; কিন্তু 'তিনে মিলে এক' এরা সৃষ্টি করল সেই পরিবেশের যা কাহিনীর রহস্যকে, কাহিনীর নাটকীয়তাকে হয়ত কিছুটা বাড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে।

দু'একটা দৃষ্টান্ত দিলে এ জিনিষটা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে। একটি ঘটনা—কুমার সূর্য্যকান্ত আর তাঁর সঙ্গী ডিটেকটিভ বিমল গাঙ্গুলী অন্ধকার রাতে জনহীন রত্নগড় ষ্টেশনে নেমে দেখেন ডাক্তার পালিত তাঁর গাড়ী নিয়ে তাঁদের জন্য অপেক্ষা করছেন। এখানে ঘটনাটা খুবই সামান্য—কিন্তু পরিবেশটাই মুখ্য। প্রথমতঃ এখানে আমরা প্রথম পরিচিত হচ্ছি সেই রত্নগড়ের সঙ্গে—যে রত্নগড় তার রহস্য, তার ভয়াবহতা নিয়ে আমাদের সমস্ত চেতনাকে অতিজাগ্রত করে রেখেছে। তাই রত্নগড় অন্ধকার—জনহীন—কুয়াশায় ঘেরা। ষ্টেশনের আলো যা জ্বলছে তা এই জমাটবাঁধা অন্ধকার আর কুয়াশার চাপে পড়ে একেবারেই স্তিমিত

হয়ে গেছে—আর এই অন্ধকারের বুকে মিশে অন্ধকার শিলাস্তূপের মতোই দাঁড়িয়ে রয়েছেন ডাঃ পালিত—যাঁর হঠাৎ অন্তর্ধান আমাদের মনে জাগিয়ে তুলেছে তাঁর প্রতি সন্দেহ আর অবিশ্বাস। এই দৃশ্যে কুমার বা ডিটেকটিভের রত্নগড় ষ্টেশনে অবতরণের চেয়েও বেশী প্রয়োজনীয় রত্নগড় এবং যারা সেখানে থাকে তাদের সঙ্গে পরিচিত হওয়া। তাই ক্যামেরা প্রথমেই দেখতে পায় রত্নগড ষ্টেশনের স্তিমিত প্রদীপটি আর তার নীচে দাঁড়িয়ে ডাঃ পালিত, যিনি তখনও কলকাতায় আছেন বলেই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। এখানে ক্যামেরা দর্শক-মনের প্রতিনিধি হয়ে কুমার বা ডিটেকটিভকে দেখবার আগেই নিরুদ্দিষ্ট ডাঃ পালিতকে খুঁজে বার করে।

আর একটি দৃশ্য। কুমার সূর্য্যকান্ত প্রাসাদের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন। দূর থেকে গানের সুর ভেসে আসে। একটি ছায়ামূর্ত্তি জলা থেকে কুমারকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। কুমার প্রথমে ইতঃস্তত করেন—পরে জলায় গিয়ে এক অজানা, অচেনা মেয়ের সঙ্গে পরিচিত হন। কেউ কখনো দেখেনি। নিশুতি রাত্রে তার গান শুনে সবাই তাকে জলার পেত্নী মনে করে ভয় পেয়েছে। এই অজানা, অচেনা রহস্যময়ী মেয়েটির সঙ্গে পরিচিত হতে গেলে দর্শককেও যেতে হবে রহস্যের গলিঘুঁজি পথ বেয়ে, তাকে খুঁজে বেড়াতে হবে জলার হোগলা পাতার ফাঁকে ফাঁকে। সে যে চিরছলনাময়ী—সহজে সে তো ধরা-ছোঁওয়ার নাগালে আসেনা। এ দৃশ্যে গানের তালে তালে ক্যামেরা তাই দেখতে পায় তার হাতছানি—দিগন্তের বুকে মিশে আছে সে—বাস্তব-অবাস্তবের সীমানায়। তার পরেই সুরু হয় ক্যামেরার অভিযান—কুয়াশার আবরণ কাটিয়ে—হোগলা ঝোপের পাতার ফাঁকে ফাঁকে, কখনো তাকে এক ঝলকের জন্যে দেখতে পাওয়া যায় দূরে বনের আড়ালে, কখনো বা তার নীলচঞ্চল চোখ উঁকি দিয়ে যায় হোগলা পাতার ফাঁকে ফাঁকে—কলমুখর ঝরণার মতোই সে হাসতে হাসতে চলে এক ঝোপের আড়ালে থেকে আর এক ঝোপের আড়ালে। ছলনাময়ী সে—যদি চাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাকে পাওয়া গেল, তবে কোথায় তার রহস্য, কোথায় তার মায়াবী আকর্ষণ। ছলনাময়ী হয়েই সে দেখা দিক—এই দর্শক চায়। ক্যামেরা শুধু দর্শকচিত্তের বার্ত্তাবহ হয়ে কাজ করে যায়।

কোন্ ষ্টুডিওতে কোন্ ছবি তোলা হচ্ছে

ছবির নাম	প্রযোজক	পরিচালক	নায়ক-নায়িকা
বেঙ্গল ন্যাশনাল ষ্টুডিও			
সিরাজদ্দৌল্লা	নিজস্ব	পার্থসারথি	—
প্রার্থনা	লাইট এ্যাণ্ড শেড	প্রণব রায়	দীপক মুখো:, দীপ্তি রায়
ক্যালকাটা মুভিটোন লি:			
মলঞ্চ, ফুলওয়ারী	আই এন্ এ পিকচার্স	প্রফুল্ল রায়	প্রভাত মুখো:, যমুনা দেবী
আবুহোসেন	উইন পিকচার্স	রতন চট্টোপাধ্যায়	কালী বন্দ্যো:, স্মৃতিরেখা
ইস্টার্ণ টকীজ লি:			
কা-তব-কান্তা	—	বিধায়ক ভট্টাচার্য্য	সন্ধ্যারাণী, বিমান বন্দ্যো:
মাকড়সার জাল	—	পশুপতি কুণ্ডু	অনুভা গুপ্তা, বিকাশ রায়
জন্মতিথি	—	সুশীল মজুমদার	—
ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিও			
রাত্রির তপস্যা	রমা ছায়াচিত্র প্রতিষ্ঠান	সুশীল মজুমদার	বিকাশ রায়, আরতি মজুমদার
বাগদাদ	গোল্ডেন মুভীজ	শ্যাম চক্রবর্ত্তী	বিকাশ রায়, বেগমপারা
আলাদীন ও আশ্চর্য্য প্রদীপ	এস্. বি. পিকচার্স	বিজন সেন	সমীরকুমার, যমুনা সিংহ
নীলদর্পণ	—	বিমল রায় (২নং)	জহর গাঙ্গুলী, সন্ধ্যারাণী
নিরক্ষর	—	গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায়	সন্ধ্যারাণী, সমর রায়
ছানাবাড়ী	মিত্রানি প্রোডাকসন্স	প্রেমেন্দ্র মিত্র	গৌতম মুখো:, প্রণতি ঘোষ
নাগিনী	—	দেবনারায়ণ গুপ্ত	—
সীতারাম	নিও স্ক্রীন প্লেজ	সতীশ দাশগুপ্ত	কমল মিত্র, অনুভা গুপ্তা
ইন্দ্রলোক ষ্টুডিও			
তীর ও তরঙ্গ	—	বিধায়ক ভট্টাচার্য্য	বিমান বন্দ্যো:, অনুভা
ক্ষুদিরাম	—	হিরন্ময় সেন	অমল সর্ব্বাধিকারী, ছায়া দেবী
শেষ কোথায়	—	বীরেশ্বর বসু	—
ন্যাশনাল সাউণ্ড ষ্টুডিও			
সঞ্জীবনী	এম্. পি. প্রোডাকশান	সুকুমার দাশগুপ্ত	উত্তমকুমার, সন্ধ্যারাণী
নিউ থিয়েটার্স লিমিটেড			
মহাপ্রস্থানের পথে	নিজস্ব	কার্ত্তিক চট্টোপাধ্যায়	—
রত্নদীপ (হিন্দী ও তামিল)	দেবকী বসু প্রোডাকসন্স	দেবকীকুমার বসু	অভি ভট্টাচার্য্য, অনুভা
চিত্রাঙ্গদা	নিজস্ব	হেমচন্দ্র চন্দ্র	—
রাধা ফিল্মস্ লিমিটেড			
মন্দির	নিজস্ব	চন্দ্রশেখর বসু	বিকাশ রায়, যমুনা সিংহ
পাশের বাড়ী	—	সুধীর মুখোপাধ্যায়	—
দিগন্তের ডাক	—	বেণু দাস	বিমান বন্দ্যো:, চন্দ্রাবতী

ছবির প্রচার

সুধীরেন্দ্র সান্যাল

যে টেক্‌নিকে সাধারণ শিল্পজাত পণ্যসামগ্রীর প্রচার-কার্য করা হয়—চলচ্চিত্রের বিজ্ঞাপন-পরিচালনায় সে পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় না। কারণ শিল্পজাত দ্রব্যাদি বা consumer's goods-এর বিজ্ঞাপন দেবার মূলে আছে—আশু বিক্রয়ের ক্ষেত্র-রচনার উদ্দেশ্য। সিনেমার ছবির বিজ্ঞাপন মূলতঃ গুণবাচক। ছবির প্রতি ভাবী প্রদর্শক, পরিবেশক ও দর্শকদের আগ্রহ বাড়িয়ে তুলে তাদের আকর্ষণ করার মধ্যেই চিত্র-প্রচারের সার্থকতা।

আধুনিক যুগে কেবল ছাপার অক্ষরে, টাইপের সাহায্যে, বিজ্ঞাপন-পরিচালনা অচল। এই মধ্যযুগীয় আদর্শ থেকে বর্ত্তমান বিজ্ঞাপন-শিল্প সম্পূর্ণ মুক্ত হলেও আমাদের দেশে এখনও তার জের চল্‌ছে।

সচিত্র বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয় না। কারণ তার visual-appeal, emotional-appeal এবং colour-appeal বর্তমান থাকায় পাঠক বা দর্শকের দৃষ্টি ও হৃদয়, দুই যুগপৎ আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়। আধুনিক যুগে পণ্যসামগ্রীর প্রচারের বেলায় শুধু ছাপাখানার টাইপের সাহায্যে বিজ্ঞাপন দেবার যে টেক্‌নিক্ প্রায় বর্জনের সীমা ঘেঁসে এসেছে—চলচ্চিত্রের প্রচার-কার্যে সেই টেক্‌নিক্ শুধু যুক্তিহীন নয়, তা প্রচারের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ করে দিয়ে, বিজ্ঞাপনদাতার পরিশ্রম ও অর্থব্যয় পণ্ড করে।

চলচ্চিত্রের যাঁরা বিজ্ঞাপনদাতা, তাঁরা বিজ্ঞাপন-শিল্প সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ন'ন। যাঁদের এ কার্যে নিয়োগ করেন, তাঁরা অধিকাংশই মা সরস্বতীর স্কুল-পালানো মূর্খ বা অর্দ্ধ-মূর্খ জাতীয় ভুঁইফোড়। এঁরা বিজ্ঞাপনের 'কপি' লেখেন। সে 'কপি' যখন ছাপার অক্ষরে বের হয়, তখন শিক্ষিত লোকের মনে হয়—ধরণী দ্বিধা হও। এ লজ্জার মূলে আছে, ততোধিক গণ্ডমূর্খ বিজ্ঞাপন-দাতাদের লোক-নির্ব্বাচনের ত্রুটি।

প্রত্যেক ব্যবসা-পরিচালনার মূল-কথা Efficiency! একটি ভাল প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেকটি বিভাগ নিপুণভাবে organised না হলে—সমগ্রভাবে ব্যবসা ফল প্রসব করে না। যে কোন পণ্যের প্রচারে Salesmanship অপরিহার্য। বর্তমান যুগে, দ্রুত এবং কঠোর প্রতি-যোগিতার সম্মুখীন হয়ে, জীবন-যুদ্ধে বেঁচে থাক্‌তে হলে, Salesmanship-এর সাহায্য নিতেই হবে। সুপরিকল্পিত ও সুনিয়ন্ত্রিত বিজ্ঞাপনের সাহায্যেই তা সম্ভব।

ছবির বিজ্ঞাপনদাতারা এই কার্যে যাঁদের নিয়োগ করবেন, তাঁদের শিক্ষা-দীক্ষা, অভিজ্ঞতা এবং যোগ্যতা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া প্রয়োজন।

ছবি তৈরী পর্যন্ত অনেকের উৎসাহ থাকে। গঠনাধীন-কালে তার কোন খবরই সাধারণে জানতে পারে না। মুক্তির পূর্বে নির্মীয়মান ছবির প্রচারের দিকে যথেষ্ট দৃষ্টি না দিলে, কেবল মুক্তির সময় বা পরে শুধু কয়েকটি দৈনিক পত্রিকার স্তম্ভে খানিকটা করে বিজ্ঞাপন দিয়ে, সে ছবি সম্বন্ধে দর্শকের আগ্রহ সৃষ্টি করে তার ব্যবসাগত সাফল্য অর্জন করা যায় না।

ছবির প্রচার-কার্যে অর্থব্যয় করা মূর্খতা—এ ধারণা অনেক চিত্রনির্মাতা ও পরিবেশন-কর্তার ছিল, এখনও আছে। বিনা-প্রচার বা স্বল্প-

প্রচার বা অযোগ্যের হাতে অপ-প্রচারের ফলে, লাখ লাখ টাকা খরচ ক'রে তৈরী বহু উপার্জনক্ষম ছবি মার খেয়েছে এবং এখনও খাচ্ছে। এই শ্রেণীর penny-wise pound-foolish প্রযোজক-পরিবেশকদের সাক্ষাৎ শুধু বাঙলা দেশেই বেশী পাওয়া যায়।

দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যাক্—জেমিনীর 'চন্দ্রলেখা'। সারা ভারতে ছবির বাজার থেকে দু'তিন কোটি টাকা লুঠে নিয়ে গেল এই ছবি। তার দৃশ্যপটের সমারোহ, সঙ্গীতের আকর্ষণ এবং অভিনেত্রীর যৌন-আবেদন সবকিছু গুণ থাকা সত্ত্বেও—ভারতের প্রতি প্রদেশে বিরাট, ব্যাপক ও সুষ্ঠু প্রচারের পথ যদি খোলা না থাকৃতো, এই অভূতপূর্ব আর্থিক সাফল্য সে ছবি কখনই লাভ করত না।

ঘোড়ার stamina না থাকলে তাকে দৌড় করিয়ে রেস্ জেতা যায় না—এ কথা ঠিক। কিন্তু তাকে জেতাবার মূলে trainer এবং jockey-র কৃতিত্ব কম নয়। প্রচারের সাহায্যে ছবি চালাবার মূলেও এই সত্য বলবৎ।

যে সব ব্যবসায়ী প্রচারকার্যকে অবহেলা করেন এবং তার পশ্চাতে অর্থব্যয় করাকে 'বাজে খরচা' মনে করেন, তাঁরা আংশিকভাবে ধর্মচ্যুত অব্যবসায়ী এবং আত্মহন্তারক মূর্খ। এর মধ্যে যাঁরা আবার ছিটে-ফোঁটা বিজ্ঞাপন দিয়ে 'পিত্তি রক্ষা'র প্রয়াসী, তাঁদের মনোবৃত্তি সমর্থনযোগ্য নয়।

গত মহাযুদ্ধের পর থেকে, প্রচারের উপকরণাদি বা accessories প্রস্তুতের দাম ভয়াবহরূপে বেড়ে গেছে। ফটোগ্রাফী, চিত্রাঙ্কন, মুদ্রণ এবং ব্লক ইত্যাদির অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধির ফলে প্রচার-কার্য অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রচারের অন্যতম প্রধান অঙ্গ—advertising বা সাময়িক পত্রিকার মাধ্যমে ছবির বিজ্ঞপ্তি। বিশিষ্ট দৈনিক-পত্রিকাগুলিতে বিজ্ঞাপনের জন্য নির্দিষ্ট space-এর দাম অসম্ভবরূপে বেড়ে গেছে। বছর ১৪।১৫ পূর্বে বাঙলার প্রথম শ্রেণীর দৈনিক-পত্রিকায় সিনেমাসংক্রান্ত বিজ্ঞাপনের জন্যে প্রতি কলম ইঞ্চি দশ আনা থেকে বারো আনা দিতে হতো। বর্তমানে তার মূল্য হয়েছে ৯।১০ টাকা। অন্যান্য সাময়িক পত্রিকা বা periodical-এর রেট হয়েছে পাতা পিছু ৫০।৬০৲ টাকা—যার দাম ইতিপূর্বে যৎসামান্য ছিল। সংবাদপত্রের cost of production অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায়, বিশেষ করে ছাপবার কাগজের দাম প্রতিদিন বাড়তে থাকায় ও কাগজ দুষ্প্রাপ্য হওয়ায়, বিজ্ঞাপনের হার সেই অনুপাতে বাড়াতে হয়েছে।

পাবলিশিটি—ছবির মতই creative আর্টের অঙ্গ। তাকে সুন্দর, শোভন ও effective করে তুলতে হ'লে যেমন মুক্তহস্তে অর্থব্যয় করা প্রয়োজন, তেমনি তার সাফল্য প্রচার-সচিবের দীর্ঘ অভিজ্ঞতালব্ধ আর্ট-সাধনার ও কর্ম-যোগ্যতার উপর নির্ভর করে। দুঃখের বিষয় প্রচারের পেছনে যাঁরা ৩০।৩৫ হাজার টাকা ব্যয় করেন তাঁরা প্রচারশিল্পীর brain-এর দাম দু'হাজার টাকা দিতে দুর্ভাবনায় অস্থির হ'ন। মনে করেন, এটা অপব্যয়। আমার মতে ৩৫ হাজার টাকার campaign-এর জন্যে প্রচার-কর্তার পারিশ্রমিক কমপক্ষে পাঁচ হাজার টাকা হওয়া উচিত।

প্রচারের বাহন বা media সীমাহীন। ছবির basic quality অনুযায়ী সেগুলির নির্বাচন হওয়া উচিত। পাঁচলাখ টাকা খরচায় যদি costume picture-তৈরী হয়, তবে তার প্রচার বাবদ অন্ততঃ ৫০ হাজার টাকা বর্তমানে খরচা পড়ে।

হিন্দী ছবির exploitation-এর ক্ষেত্র একটিমাত্র প্রদেশে সীমাবদ্ধ নয়। তাই তার প্রচার-ব্যয় যা হয়, প্রাদেশিক ছবির ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য হ'তে পারে না। বাংলা ছবির production cost যে অনুপাতে বৃদ্ধি পেয়েছে, সেই অনুপাতে return-এর prospect সীমাবদ্ধ। তাই সবদিক বিবেচনা করে প্রচার বাবদ বাজেট্ তৈরী করাই বুদ্ধিমানের কাজ। ৩০ থেকে ৩৫ হাজার টাকা কমে প্রচারের standard রক্ষা করে বর্তমান প্রতিযোগিতার বাজারে সফলকাম হওয়া প্রায় দুঃসাধ্য বললেও চলে।

'টাইপ'-চরিত্রাভিনেতা কানু বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা দেশে যে ক'জন অভিনেতা পার্শ্বচরিত্র অথবা 'টাইপ'-চরিত্রে অভিনয় ক'রে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন কানু বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের একজন। এদেশে পার্শ্ব-চরিত্রে অথবা টাইপ-চরিত্রে জনপ্রিয়তা অর্জন করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। কারণ এই চরিত্রগুলি অবহেলিত হয়ে থাকে, নায়কের চরিত্রই প্রাধান্য পায়, অর্থাৎ দর্শকের চোখের সামনে বেশীক্ষণ থাকে; যার ফলে দর্শকমনে একটা ছাপ থেকে যায়। কিন্তু পার্শ্বচরিত্র খুব অল্প সময়ের জন্যে দেখা দেয় পরে হয়তো আর দেখাই যায় না। সেইজন্যেই শক্তিশালী অভিনেতা ছাড়া টাইপ চরিত্রে জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেন না।

কানু বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রথম ছায়াছবিতে দেখা যায় কৌতুক-অভিনেতা হিসেবে। তখন তিনি ছোট ছোট পার্শ্বচরিত্রে অভিনয় করে হাসির খোরাক জোগাতেন। সর্বপ্রথম যে ছবিতে তিনি অভিনয় করেন সেটি হ'লো 'শুভ ব্রাহ্মস্পর্শ'। ছবিটি হচ্ছে প্রহসন। এই ছবিতে কানুবাবুর অভিনয় করবার সময় এক মজার ব্যাপার ঘটে। মাঝেরআট ষ্টেশনে একটি দৃশ্য তোলা হচ্ছে। দৃশ্যটি হচ্ছে —এক ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রী ও মা ষষ্ঠীর অরুপণ দান নিয়ে ট্রেণে উঠছেন, একটি অতিরিক্ত ডিটেকৃটিভ্-উপন্যাস-পড়ুয়া ছেলে তাঁকে ছেলেধরা মনে করে ধরবার জন্যে ঝাপটে ধরবে। সেই ভদ্রলোক এবং তাঁর স্ত্রীর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন তৎকালীন বিখ্যাত হাস্যরসিক অভিনেতা স্বর্গতঃ চিত্তরঞ্জন গোস্বামী এবং শ্রীমতী ইন্দুবালা। আর অতিরিক্ত ডিকৃটেটিভ-উপন্যাস-পড়ুয়া ছেলের ভূমিকায় অভিনয় করেন কানুবাবু। কানুবাবুর সেই প্রথম অভিনয়; আগ্রহের আতিশয্যে তিনি এমন প্রচণ্ডভাবে চিত্তরঞ্জনবাবুকে জড়িয়ে ধরলেন যার ফলে চিত্তবাবু পড়ে গেলেন এবং তাঁর হাত-পা কেটে গেল। ভদ্রলোক বিরক্ত হ'য়ে কানুবাবুকে অনেক কটু কথা শুনিয়ে দিলেন। এর পর তিনি বহু ছবিতে অভিনয় করেন এবং প্রায় সব ছবিতেই কৌতুক-অভিনেতা হিসেবেই। শেষের দিকে কয়েকখানি ছবিতে গুরুগম্ভীর ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। বিশেষ করে 'দ্বৈরথ' এবং 'জিঘাংসা' ছবি দু'টিতে তিনি অত্যন্ত জটিল দু'টি চরিত্রে অপূর্ব্ব অভিনয় করেছেন। 'সর্ব্বহারা' ছবিতেও তাঁর অভিনয় সুন্দর হয়েছিল। বর্ত্তমানে তিনি যে সমস্ত চরিত্রে অভিনয় করছেন সেগুলি সবই সাধারণ ভূমিকা। এখন তিনি 'পণ্ডিতমশাই', 'রাত্রির তপস্যা', 'জবানবন্দী' এবং 'প্রার্থনা' এই ক'টি ছবিতে অভিনয় করছেন। এর প্রত্যেকটিতেই সিরিয়াস ধরণের চরিত্রে তিনি রূপদান করছেন।

কানু বন্দ্যোপাধ্যায়: তাঁর কোলে শ্রীমতী প্রভার কন্যা বুলা, মাত্র সাত বছর বয়সেই স্বর্গের আনন্দধামে তা'র ডাক পড়ে

বাঙলা চিত্রজগতে নবাগতাদের অন্যতমা
শ্রীমতী কেতকী

কানু বন্দ্যোপাধ্যায় ছায়াছবির মত মঞ্চাভিনয়েও সুনাম অর্জন করেছেন। স্বর্গতঃ নট ও নাট্যকার যোগেশ চৌধুরীর সহায়তায় তিনি মঞ্চে যোগদান করেন। যোগেশবাবু কানুবাবুকে শিশির কুমার ভাদুড়ীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। তিনি কানুবাবুকে প্রথমে "আলমগীর' নাটকে 'বিক্রমশালী'র ভূমিকায় অভিনয় করবার সুযোগ দেন। শিশিরবাবুর এইটেই হচ্ছে'টেস্ট পার্ট'। অর্থাৎ যাঁরা তাঁর কাছে নতুন আসেন তাঁদের তিনি প্রথমে 'বিক্রমশালী'র ভূমিকায় অভিনয় করতে বলেন। তখন থেকেই তিনি শিশিরবাবুর সম্প্রদায়ভুক্ত হলেন এবং তাঁদের অভিনীত বহু নাটকে অভিনয় করে সুনাম অর্জ্জন করলেন। একবার কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এলেন 'যোগাযোগ'-এর অভিনয় দেখতে। কানুবাবুর অভিনয় তাঁর কাছে ভাল লাগলো। তিনি কানুবাবুকে বাড়ীতে ডেকে নিয়ে বলেছিলেন—"তোমার অভিনয় দেখে আমি মুগ্ধ হ'য়ে গিয়েছিলাম।" "যোগাযোগ"-এ কানুবাবু 'নবীনকৃষ্ণের' ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা লাভ করা খুব কম অভিনেতার ভাগ্যেই ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথ আর একবার 'রীতিমত নাটকে' সুহৃৎ ডাক্তারের ভূমিকায় কানুবাবুর অভিনয় দেখেছিলেন। শিশিরবাবুর সম্প্রদায়ে তিনি বহুদিন ছিলেন এবং শেষে এক অপ্রীতিকর পরিস্থিতির ফলে তাঁদের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করলেন। সেখানে থাকাকালীন পারিশ্রমিক পেতেন যৎসামান্য। সেখানে শুধু ছিলেন অভিনয় করবার জন্যে। শেষে সে সুযোগও পেতেন না। যেমন ধরুন কোন একটি ভাল ভূমিকায় কানুবাবু সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করছেন হঠাৎ তাঁকে না জানিয়েই সেই ভূমিকা থেকে তাঁকে বাদ দেওয়া হ'ল। তাঁর চেয়ে কম যোগ্যতাসম্পন্ন অন্য কোন অভিনেতাকে সেখানে নির্ব্বাচিত করা হ'ল। এই ধরণের ব্যাপার বহুবার ঘটেছে। তার ফলে তাঁকে সেখান থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে চলে আসতে হয়েছে। শিশিরবাবুর সম্প্রদায়ের হয়ে কানুবাবু শেষ অভিনয় করেন "দুঃখীর ইমান" নাটকে। বর্ত্তমানে তিনি নবগঠিত নাট্যসঙ্ঘ 'উত্তর সারথী'র সঙ্গে জড়িত আছেন। কিছুদিন হ'ল এঁদের "নতুন ইহুদী" নাটকে অভিনয় করে তিনি সুনাম অর্জ্জন করেছেন।

সারাজীবনে যাহা কিছু পাইয়াছি, যাহা কিছু কিনিয়াছি তাহা মনে কেমন একটা অবিশ্বাস জাগাইয়া তুলিয়াছে, ঠিক নতুন বলিতে যাহা বুঝি, জীবনে তাহা কোনদিনই পাইলাম না। ভাগ্যদোষে সবই আমার কাছে সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড বলিয়া সন্দেহ হয়। অর্থ, প্রেম, দাড়ি কামাইবার ব্লেড, খ্যাতি, ফুটবল-ম্যাচের টিকিট, বাবার গায়ের ছোট-হওয়া গরম জামা সবই সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড পাওয়ার বরাত লইয়া আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছি, একটি জরাজীর্ণ সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড মোটরও আমার আছে—কখনো দয়া করিয়া খুব ভাল চলে আবার চলিতে চলিতে কি যে ভূতে ধরে, অনেক অভিজ্ঞ রোজা আসিয়াও সহজে তাহার রোগ সারাইতে পারে না।

নিতান্ত অবিশ্বস্ত এই মোটর হাঁকাইয়া এক বর্ষাঘন গভীর রাত্রে চৌরঙ্গী হইতে বাড়ী ফিরিতেছিলাম, মেছুয়া-বাজারের কাছে আসিয়া দেখিলাম স্থলপথ একটি জলাশয়ে পরিণত হইয়া গিয়াছে। সেই জলের মুখ অবধি পৌঁছাইয়া আমার রথ আর অগ্রসর হইতে চাহিল না—থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। যন্ত্রদানবের ব্যাধির পরিচর্য্যা করিবার যতরকম কৌশল আমার জানা ছিল সবরকম প্রয়োগ করিয়াও কোন ফল হইল না। রাত্রি তখন পৌনে তিনটা বাজিয়াছে। বর্ষার রাত্রে সুপ্ত নগরীর বুকে আমার গাড়ী ঠেলিয়া বাড়ী অবধি পৌঁছাইয়া দিবার মত কেহ ছিল না। নিতান্ত নিরুপায় হইয়া মোটরের দরজার কাঁচগুলি তুলিয়া দিয়া ভিতর হইতে চাবি দিয়া বাকী রাত্রিটুকু কাটাইয়া দিব স্থির করিলাম।

সন্ধ্যার পর হইতেই চৌরঙ্গী অঞ্চলের বড় বড় হোটেল হইতে কেমন যেন একটি মধুর আমেজ ভাসিয়া আসিয়া হাওয়ায় হাওয়ায় ঘুরিয়া ফেরে। বহুক্ষণ সেই অঞ্চলে থাকার দরুণই হউক বা রাত্রির স্বাভাবিক আকর্ষণের জন্যই হউক, অল্পক্ষণ পরে চোখ ঘুমে জড়াইয়া আসিল।

অকস্মাৎ মনে হইল আমার গাড়ী তীরবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। কিন্তু এ কোন্ পথে চলিয়াছি। এ তো পথ নয়—গাড়ী আমার মেঘাবৃত আকাশ ভেদ করিয়া উড়িয়া চলিয়াছে। এরোপ্লেনের মত দুইপাশে দুইটি পাখা কে যেন জুড়িয়া দিয়াছে। মোটরের সম্মুখের পাখাটি প্রায় এরোপ্লেনের প্রোপেলারের মত দীর্ঘায়তন লাভ করিয়াছে।

মেঘের পাহাড় অতিক্রম করিয়া গ্রহ-নক্ষত্রের গা ঘেঁসিয়া আরও উর্দ্ধে উঠিতে লাগিলাম, তবু গাড়ী থামিবার লক্ষণ দেখা গেলনা। আর কোথায় বা থামিবে, শূন্যপথে একবার থামিলেই তো পপাত ধরণীতলে। হাড়-গোড় একেবারে ছাতু হইয়া যাইবে। চন্দ্রের পাশ দিয়া যাইবার সময় শরীর ঠাণ্ডা হিম হইয়া আসিল, সূর্য্যের পাশে যাইতেই অসহ্য গরম বোধ হইতে লাগিল। ভাগ্যিস গাড়ীটি বর্ষার জলে ভিজিয়াছিল, না হইলে সূর্য্য-কিরণের প্রচণ্ড উত্তাপে আরোহীসমেত জলিয়া-পুড়িয়া ছাই হইয়া পৃথিবীর ধুলার স্তূপে গিয়া জমিতে হইত। এতগুলি জানা-অজানা গ্রহ-নক্ষত্রের পাশ দিয়া উড়িয়া গেলাম কিন্তু সবাই দেখিলাম 'লাইন ক্লিয়ার' অর্থাৎ নীল-সিগ্ন্যাল্ জ্বালাইয়া রাখিয়াছে।

অবশেষে পৌঁছাইলাম। বলিলে বিশ্বাস করিবেন কিনা জানিনা—পারিজাত পুষ্পশোভিত একটি বৃহৎ তোরণের কাছে আসিয়া আমার চৌদ্দ হর্স পাওয়ারের ভগ্নহৃদয় চৌদ্দ হাজার হর্সপাওয়ারের বেগে উড়িয়া আসিয়া থামিল। তোরণের উপর স্বর্ণাক্ষরে লেখা ছিল, 'স্বর্গদ্বার'। 'স্বর্গদ্বারে' সানাই বাজিতেছিল। সানাইয়ের সুর 'লারে লাপ্পা, লারে লাপ্পে—'।

দ্বারের নিকট নামিতেই একটি সবিনীত লোক আসিয়া নমস্কার করিয়' বলিল, এই যে আসুন স্যার। চেনা গলা, ভাল করিয়া চাহিতেই তাঁহাকে চিনিলাম, স্বর্গীয়

আমার স্বর্গারোহণ

— ফণীন্দ্র পাল

এমেচার ফটোগ্রাফী :

এলো শরৎ ফটো : স্নিগ্ধা দেবী

রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়। চেহারা আগেকার মতই আছে শুধু স্বর্গীয় ঔজ্জ্বল্যে আর একটু চকচকে হইয়া উঠিয়াছেন। চলুন স্যার, আপনাকে দেবীর নিকট পৌঁছাইয়া দিয়া আসি।

বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলাম, দেবী! কোন্ দেবী?

উত্তর আসিল, দেবী বীণাপাণি, তিনি-ই আপনাকে স্মরণ করেছেন। তবে স্যার আপনাকে এখানকার একটা নির্দ্দেশ মানতে হবে। দেবীর বাড়ী অবধি যাওয়ার পথে আপনাকে চোখ বুজে থাকতে হবে। স্বর্গে প্রবেশ করবার অধিকার এখনও আপনি লাভ করেননি সুতরাং এখন থেকে এখানকার কিছু দেখবার বা জানবার উপায় নেই আপনার। যদি দেখবার চেষ্টা করেন, সেই মুহূর্ত্তেই আপনাকে নিজ দেহে ফেরৎ পাঠিয়ে দেওয়া হবে। অবশ্য দেবী যদি আপনার জন্য বিশেষ পারমিট সংগ্রহ করে দেন সে কথা আলাদা। তাহলে স্যার এবার—

ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়। হাসিয়া বলিলাম,—এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? এতদিন পরে দেখা-সাক্ষাৎ হ'ল। আসুন একটু গল্প-গুজব করি। কেমন আছেন, এখানকার জীবন কেমন কাটছে! কি কি করতে হয় এখানে আপনাকে?

রতীনবাবু যেমন মাঝে মাঝে তড়বড় করিয়া কথা বলিতেন, সেইভাবে বলিলেন, অত্যন্ত দুঃখিত ফণীবাবু, আপনার কৌতূহল চরিতার্থ করতে পারলাম না বলে। বাইরের লোককে এসব বলা নিষেধ আছে। এখানে বাস ক'রে এখানকার সম্বন্ধে আলোচনা করা নিয়মবিরুদ্ধ। নানাকারণে দেবরাজ্যও এই সব সতর্কতা

অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছেন। তাছাড়া মর্ত্ত্যে সকাল হওয়ার আর বেশী দেরী নেই, আপনার আত্মাকে সকালের আগেই আপনার মর্ত্ত্যদেহে ফিরে যেতে হবে।

হতাশ হইয়া বলিলাম, কিন্তু, 'স্বর্গদ্বার' এভাবে সজ্জিত হওয়ার কারণ কি? সেকথা না জানালে আমি যাব না।

রতীনবাবু একটু এদিক-ওদিক চাহিয়া চাপাকণ্ঠে বলিলেন, পূজার হিড়িক আসছে, পৃথিবীতে এই সময়ে পরপর সবচেয়ে বড় বড় পূজো হয়। দেবদেবীরা এই সময়ে মর্ত্ত্য থেকে খাজনা আদায় করে স্বর্গের তহবিল ভারী করে তোলেন। সেইজন্যে এসময়ে একটু উৎসব আয়োজন করা হয়। মাড়োয়ারী বিয়ে বাড়ীর মত আর কি—বিয়ের একমাস আগে ও পরে তারা যেমন বাড়ী সাজসজ্জায় শোভিত করে রাখে, সেইরকম।

কিন্তু দেবী আমাকে কেন স্মরণ করেছেন জানেন কিছু, জিজ্ঞাসা করিলাম।

উত্তর দিলেন রতীনবাবু, এবৎসরের উৎসব-আয়োজনের মধ্যে ভারতীয় ছবির একটা ফিল্ম-ফেস্টিভ্যাল করবার ব্যবস্থার জন্য দেবদেবীরা শিল্পকলা-অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীকে ধরেছেন। দেবীর সঙ্গে নাকি আপনার মর্ত্ত্যে কয়েকবার দেখা-সাক্ষাৎ ইতিপূর্ব্বে হয়েছে। তিনি আপনার ভক্তিনম্র ব্যবহারে অত্যন্ত পরিতুষ্ট। সেইজন্যে আপনার সঙ্গে এবিষয়ে পরামর্শ করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।

বলিলাম, চলুন তাহলে আর বিলম্ব কেন?

রতীনবাবু আমাকে চোখ বুঁজিয়া থাকিবার বিষয়ে আর একবার স্মরণ করাইয়া দিলেন। আরও বলিলেন মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে, আপনার খুব অসুবিধা হবে না।

চক্ষু বুঁজিবার ছয় সাত সেকেণ্ড পরেই, খুলিবার নির্দ্দেশ পাইলাম। দেখিলাম একটি অত্যন্ত সুসজ্জিত ড্রয়িংরুমের ভিতর আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। রতীনবাবুকে আশে-পাশে কোথাও খুঁজিয়া পাইলাম না। সম্পূর্ণ অভিনব ধরণের আসবাবপত্রে সজ্জিত ড্রয়িংরুমের একটি ধারে চমৎকার একটি গ্লাস-কেসে একটি বীণা শায়িত অবস্থায় আছে। বীণার তার হইতে আপনা আপনি একটি সুর-ঝঙ্কার ঘরের মধ্যে গুঞ্জন করিয়া ফিরিতেছে। ইলেকট্রিক-গীটারের মত কোন প্রকার বৈদ্যুতিক সংযোগের ফলে এই সুরধ্বনি উত্থিত হইতেছে কিনা জানিবার জন্য বীণার দিকে অগ্রসর হইতেই বীণানিন্দিত কণ্ঠস্বরে শুনিতে পাইলাম,—কেমন আছো?

চমকিত হইয়া চাহিলাম, আমার সম্মুখে স্বয়ং দেবী

দৃশ্যপটের অন্তরালে: 'রত্নদীপ' (হিন্দী ও তামিল) চিত্রের সুটিং-এর ফাঁকে নিজেদের ভূমিকা সম্বন্ধে উত্তেজনাময় আলোচনায় রত অভি ভট্টাচার্য্য, অনুভা গুপ্তা ও মঞ্জু দে
ফটো: কে এ রেজা

দৃশ্যপটের অন্তরালে : উত্তেজনা থেকে কৌতুক-পরিহাসে মশগুল অনুভা, মঞ্জু ও তুলসী চক্রবর্তী 'রত্নদীপ' ছবির স্যুটিং-এর ফাঁকে
ফটো: কে, এ, রেজা

'জিয়া বেকরার হায়' গানটা গাইছিলেন সে-গান আপন মনে শোনবার জন্যে দেবদেবীরা কি ভীড়ই না জমিয়েছিল। স্বয়ং ব্রহ্মা পর্য্যন্ত দাড়ি নেড়ে নেড়ে তাল দিচ্ছিলেন। উর্ব্বশী, রম্ভা, মেনকা এরা সবও 'কাকু'-র নাচ নকল করে ফেলেছে।

দীর্ঘনিশ্বাসটুকু চাপিয়া রাখিব বলিয়া মনে করিয়াছিলাম কিন্তু আমার অজ্ঞানিতে তাহা বেশ জোরেই বাহির হইয়া আসিল। জননীর মুখ গম্ভীর হইয়া গেল। তিনি বলিলেন—'তোমরা বাঙালীরা বড় হিংসুটে।

ব্যথিত কণ্ঠে বলিলাম, হিংসা কি আর সাধে করি মা, আজ সকলদিক থেকেই দেখতে পাচ্ছি বাঙালী জাতটাকে মেরে ফেলবার একটা প্রচণ্ড চেষ্টা চলছে। যখন সাহেব রাজা ছিল তখন দেখেছি বাঙালীকে তারা ভয় করতো, সহ্যও করতে পারত না। ভয় করতো আমাদের ভাবপ্রবণতাকে, সহ্য করতে পারত না আমাদের ক্ষুরধার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি। মুসলমান রাজত্বের যুগেও আমাদের কেউ প্রীতির চোখে দেখেনি ঠিক এই কারণেই। তারপর আমাদের স্বাধীন দেশে হিন্দীভাষাভাষী সরকার 'তো' বাঙালী জাতটাকে নিয়ে অত্যন্ত বিপদে পড়ে গেছেন বলে মনে হয়। সিংভুম মানভুমের দিকে অকারণ-পড়ে-থাকা জমির কিছুটা যদি ছেড়ে দিত তাহলে আমরা বেঁচে যেতাম

দেবী হাসিয়া বলিলেন, তুমি কি আজকাল রাষ্ট্রনীতি নিয়ে চর্চ্চা করছো?

বলিলাম,'না জননী, রাষ্ট্রনীতি নিয়ে চর্চ্চা করা শুধু বড়লোকদেরই পোষায়, ও-টা সখের জিনিষ। আমরা সাধারণ মানুষ। তবে মৃত্যুর সম্মুখে দাঁড়িয়ে বাঁচবার সম্ভাব্য পথগুলির দিকে দৃষ্টি আপনা থেকেই খুলে যায়।

বীণাপাণি দাঁড়াইয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছেন। আসবাবপত্রে বোঝাই গালচে-মোড়া ড্রয়িং-রুমে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিবার স্থান ছিল না, সুতরাং অর্দ্ধনমিত হইয়া জননীকে প্রণাম জানাইলাম। দেবী প্রসন্না হইয়া আমাকে উপবেশন করিতে বলিলেন। মায়ের আদেশ পালন করিয়া তাঁহার দিকে ভক্তি-গভীর দৃষ্টিতে চাহিতেই আমার তাক্ লাগিয়া গেল।

কুন্দ ফুলের মত শুভ্র এই অপরূপ তনুকান্তি, রূপ-লাবণ্যে এমনি মহিমময়ী মূর্ত্তি স্বর্গের দেবী ছাড়া আর কোথাও দেখিব সে আশা করি না কিন্তু জননী-অঙ্গে এ কি সাজসজ্জা! তাঁহাকে দেখিয়া মনে হয় যেন বোম্বাই-ছবির একটি অতি-আধুনিকার চরিত্রে পরিচ্ছদভূষিতা মধুবালা।

দেবী হয়তো আমার ইর তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিলেন। একটু লজ্জিত হইয়া বলিলেন, ওদের ছবির costume-গুলো বেশ। আমাদের এখানেও হিন্দী ছবির জয়-জয়কার। হিন্দী ছবির গান এখানে সকলের মুখে মুখে ঘুরছে। সেদিন দেবর্ষি নারদ একতারা বাজিয়ে আপন মনে

আজ বাঙলার জীবন, বাঙালীর ব্যবসা, বাঙলা ছবি সবই রসাতলে যেতে বসেছে।

দেবী যেন কৌতুকভরে বলিলেন, তোমার কি মনে হয় বাঙালী জাত এই চেষ্টার ফলে নিঃশেষ হয়ে যাবে?

অকস্মাৎ কোথা হইতে যেন উত্তেজনার প্রবল স্রোত আসিয়া আমাকে উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিল। ভুলিয়া গেলাম যে আমি অমর্ত্যলোকে সর্ব্বজ্ঞানদায়িনী দেবী সরস্বতীর সম্মুখে বসিয়া আছি। উচ্চৈস্বরে বলিলাম, নিজেরা অমর হয়েছেন বলে মরজগতের জীবদের বিদ্রূপ করা ভদ্রতাসঙ্গত নয়। যে জাত কত যুগ যুগ ধরে কৃষ্টি ও বুদ্ধিবৃত্তির শীর্ষে থেকে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সকলের ঈর্ষাভাজন হয়ে এসেছে, সে-জাত কি এতই তুচ্ছ যে সহজে শেষ হয়ে যাবে! মুসলমানেরা যা পারেনি বিদেশীয়া যা পারলে না এদের পক্ষে তা কি খুব সহজসাধ্য হয়ে উঠবে! অস্বীকার করি না আমাদের জাতের অনেক অধঃপতন ঘটেছে। পরশ্রীকাতরতায়, পরনিন্দুকতায়, আলস্যে, নৈতিক দুর্ব্বলতায় ও সঙ্কীর্ণ মনের পরিচয়ে আমরা নিজেদের সর্বনাশের পথে ক্রমাগতই এগিয়ে নিয়ে চলেছি তবু ভেতরে ভেতরে আগুন এখনও নেভেনি। প্রতিভার আগুন ও সংগ্রামের নেশা কখনও মরে না, শুধু সাময়িকভাবে সুপ্ত থাকে। তুমি হয়তো বলবে এখন ঘরের লোকেই আমাদের মারবার ফন্দী আঁটছে। দেখাই যাক না শেষ অবধি কি দাঁড়ায়। দুঃখ এই যে স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাঙলার ত্যাগ, বাঙালীর মৃত্যুপণ সাধনার কথা এরা এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেল।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলাম,—যাক্ গে এসব অবান্তর কথা, এখন তুমি আমাকে কি জন্যে স্মরণ করেছো?

জননী বলিলেন,—তুমি যে রকম রেগে গেছ দেখছি, তাতে আর বলবার সাহস খুঁজে পাচ্ছি না।

ম্লানভাবে হাসিয়া জানাইলাম,—রাগটাই দেখলে জননী, আমাদের মনোবেদনা কোথায় বুঝলে না। তোমার যে-ছেলেদের হাতে কর্তৃত্ব এসে পড়েছে তাদের সম্বন্ধে অন্ততঃ তোমার পক্ষপাতিত্ব শোভা পায় না। তবে মনোবেদনার কথা জানিয়ে যদি অজ্ঞানে তোমার কাছে কোন অপরাধ ক'রে থাকি, তা নিজগুণে মার্জ্জনা করিও। এখন আমায় কি করতে হবে বলো।

দেবী বলিলেন,—তুমি বোধ হয় ইতিমধ্যে শুনেছো এখানকার সকলে আমায় ধরেছেন যে এবার এখানে ভারতীয় ছবির একটা ফিল্ম ফেস্‌টিভ্যালের ব্যবস্থা করতে হবে। কি কি বাঙলা ছবি দেখানো যায় সে-সম্বন্ধে তোমার পরামর্শ চাই।

একটু ভাবিয়া লইয়া বলিলাম,—আমাদের সাম্প্রতিক ভাল ছবির মধ্যে আছে, মাইকেল মধুসূদন, বিদ্যাসাগর, স্বামিজী, সন্ধ্যা, নিয়তি, জিঘাংসা, তথাপি, ৪২, আনন্দমঠ, পহেলা আদমী······

দেবী বাধা দিয়া বলিলেন,—'ওসব ছবি এখানে কারও সমাদর পাবে না। যাদের জীবনী-ছবি তোমরা তুলেছো, তারা তো অনেকদিন হ'ল স্বর্গেই আস্তানা গেড়ে বসেছেন। তোমাদের নৈতিক দুরবস্থা দেখে তাদের সকলকেই আবার মর্ত্তে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করতে অনুরোধ জানানো হয়েছিল কিন্তু তাঁরা কেউই যেতে স্বীকৃত হননি। তাঁরা বললেন, পৃথিবীর মানুষেরা আজকাল কারো কোন মহিমা, স্বীকার করতে চাইছে না। মাইকেল বলেছেন, কবিতা লিখে মূল্য পাওয়া যায় না সুতরাং গিয়ে কি হবে, বিদ্যাসাগর বলেছেন, দয়া দেখাতে গেলে আজকাল মানুষেরা ভাবে নিশ্চয়ই দয়ার পিছনে কোন গূঢ় অভিসন্ধি আছে। তিনি আসবেন না। স্বামী বিবেকানন্দ বললেন মন্ত্রীরা ভাল ভাল কথার ফোয়ারা ছুটিয়ে অনর্গল বক্তৃতা দিয়ে এবং কাজে ঠিক তার বিপরীত করে জনসাধারণকে এমনই

'রাত্রির তপস্যা' ছবির চিত্রগ্রহণ-প্রাক্কালে পরিচালক সুশীল মজুমদার এই চিত্রের অন্যতমা নায়িকা প্রণতি ঘোষকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ একটি সিচুয়েশনে অভিনয় সম্পর্কে নির্দ্দেশ দিচ্ছেন

ফটো : কে, এ, রেজা

ক্ষেপিয়ে তুলেছে যে আমি বক্তৃতা দিতে গেলে মারের চোটে গুরুর নাম ভুলিয়ে ছাড়বে। সুতরাং ওদের সম্বন্ধে এখানে আর কোনো ঔৎসুক্য নেই। তারপর সঙ্কল্প, নিয়তি, জিঘাংসা, তথাপি-র কাহিনীগুলি তো ইংরেজী। '৪২' আর 'আনন্দমঠে' তো স্বাধীনতা-সংগ্রামের সেই ঘ্যান্-ঘ্যানানি! আর তোমাদের তোলা হিন্দী 'পহেলা আদমী'র চেয়ে বোম্বাইয়ে তোলা হিন্দী 'সমাধি' জনপ্রিয় ছবি। রকমারী গান আছে আর আছে নলিনী জয়ন্ত ও অশোককুমার। দেব-সেনাপতি কার্তিক তো নলিনী জয়ন্তের নামে পাগল।

ক্ষোভে, দুঃখে লজ্জায় ম্রিয়মান হইয়া পড়িলাম। দেবতাদেরই যখন এতখানি অধঃপতন ঘটিয়াছে তখন মানুষের আর কি দোষ! একটু রাগতভাবেই বলিলাম, —তবে আর কি। বাঙলা ছবি দেখাবার দরকার নেই। সবাই হিন্দী-ছবি book করুন। চন্দ্রলেখা, মজলা, মহল, বরসাত, বাজী, খিড়কী, যাদু, হাল্-চাল্, শশিভান—এইসব।

দেবী বলিলেন, রাগ কোরোনা বাছা। দেবদেবীদের এই হিন্দী চিত্র-প্রীতির জন্য দায়ী তোমরা নিজেরাই। তোমাদের পূজামণ্ডপে লাউড স্পীকারে তো রাতদিন 'আয়েগা আয়েগা', 'লারে লাপ্পা, অমুক হিন্দী কথাচিত্রের গান, তমুক হিন্দী কথাচিত্রের গান বাজাতে থাকে। পুরোহিত পুজো করে যাওয়ার পর সারাক্ষণ আমরাই বা করি কি বল! তোমাদের রেকর্ড-বাজানো শুনি বসে বসে। এমনি করেই গানের সুরগুলো কানে বসে যায়। থাক এসব কথা, সত্যি করে বলতে পারো, কি এমন ত্রুটির জন্য বাঙলা ছবির এই দুরবস্থা ঘটছে?

উত্তর দিলাম,—শুধু বাঙলা নয় মা, তোমাদের অতি-প্রিয় হিন্দী ছবির মহলেও আজকাল কান্নাকাটির শব্দ শোনা যেতে সুরু হয়েছে। লাখো লাখো টাকা খরচ করে কতকগুলি জগাখিঁচুড়ি সুরের গান ও নায়িকাদের যৌবন-উচ্ছলতার টোপ ফেলে দর্শকদের চিরকাল ধরে রাখা যায় না। হিন্দী ছবিতে কোন গল্প থাকে না, থাকে বহুলব্যয়ে নির্ম্মিত দৃশ্য ও সাজ-সজ্জার চোখ-ধাঁধানো ধাপ্পা, কিছু অসম্ভব ও অস্বাভাবিক হঠাৎ উড়ে-আসা ঘটনা বিন্যাসের চমক আর মনে সুড়সুরি দেওয়ার জন্যে কিছু Sexy-stunt। কিন্তু ভাল-লাগা ও সত্যিকারের ভালোর মধ্যে যে তফাৎ সুড়সুড়ী ও অনুভূতির মধ্যেও কি ঠিক ততখানি পার্থক্য নেই?

দেবী বলিলেন—তুমি আবার হিন্দী ছবির নিন্দাকাব্য সুরু করলে! আজ যখন তোমাদের ন্যাশনালিজম্ থেকে ইণ্টারন্যাশনালিজমের স্তরে পৌছবার দিন এসেছে তখন তোমরা প্রাদেশিকতার বিদ্বেষে নিজেদের ক্রমশঃই সঙ্কীর্ণ জায়গায় টেনে আনছে।

জননীর অভিযোগে প্রতিবাদ করিয়া বলিলাম—আগে জাতি-ই বাঁচুক মা, তারপর আন্তর্জাতিকতার কথা ভেবে দেখা যাবে। কিন্তু বাংলা চিত্র-প্রযোজকদের বিপথে চালিত বুদ্ধি সম্পর্কেও আমার মনে যথেষ্ট ক্ষোভ আছে।

দেবী হাসিয়া বলিলেন, তোমার সেই পুরাণো অভিযোগ তো? পরিবেশকদের কাছ থেকে পাওয়া ভিক্ষার টাকা না হ'লে প্রযোজকরা ছবি তুলতে পারে না কেন?

বলিলাম,—না জননী। পরিবেশক, প্রদর্শক ও প্রযোজকদের মধ্যে সম্পর্ক-বৈষম্যের আলোচনা আর করতে চাই না আমি বলতে চাই। গল্পের অবমাননার কথা।

এম পি চিত্র 'নষ্টনীড়'-এর চিত্রগ্রহণকালে পরিচালক পশুপতি চট্টোপাধ্যায় 'দোপাট্টা' সহযোগে ছবিতে গ্ল্যামার বিস্তারের আর্ট সম্বন্ধে উপদেশ দিচ্ছেন করবী গুপ্তাকে

দেবী বীণাপাণি বিস্মিতকণ্ঠে বলিলেন—সে আবার কি?

বলিতে সুরু করিলাম—বাঙলা দেশে সত্যকারের গল্প ও কাহিনীকারের অভাব নেই। কিন্তু তবু যখন দেখি ইংরেজী গল্পের বাংলা ছবি তৈরী হচ্ছে তখন লজ্জায় মরে যেতে ইচ্ছে হয়। দিনকতক চললো ডিটেকটিভ ও ভূতের দাপাদাপি। এদেশে দুর্দ্ধর্ষ Criminal জন্মায় না সুতরাং রহস্যঘন গল্প ধার করতে হয় বিদেশী বই থেকে। এখানকার Criminal-রা সব মিট্‌মিটে ডান, খুব জোর ব্ল্যাক-মার্কেটের কারবার করে বড়রাস্তার ওপর বসে, পাহারাওলাদের ঘুষ দিয়ে। এখানকার ভূতেরা সব মেছো ভূত, না হয় গেছো-ভূত, তাদের মধ্যে '-চারটেদু গথ'-ও মাঝে মাঝে দেখতে পাই। এদের নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে গেলেই লোকে বিরক্ত তো হবেই। এসব যখন আর জমলোনা তখন প্রযোজকরা সুরু করলেন মলাটের stunt অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র। এঁদের মধ্যে শরৎচন্দ্র অত্যন্ত দরদ দিয়ে আমাদের মাটির সন্তানদের কাহিনী লিখে গিয়েছেন বলে তাঁর কাহিনীর চিত্ররূপগুলি নানা দোষত্রুটি থাকা সত্ত্বেও জনসমাদর লাভ করেছে। আবার এরই ফাঁকে ফাঁকে আরব্যোপন্যাস, সিরাজোদ্দৌলা, শিবাজী প্রভৃতি fantasy ও ইতিহাস নিয়েও কেউ কেউ ছবি তৈরী করতে লেগে গেছেন। তার আগে সুরু হয়েছিল আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামের 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে'-stunt, পতাকা আর শ্লোগানের হুজুগের সুবিধা নিয়ে অর্থোপার্জ্জন করবার চেষ্টা। কিন্তু সংগ্রামের সত্যকারের চেহারা ছবির মধ্যে খুঁজে পাওয়া গেল না। একটা বিরাট হুজুগের মধ্য দিয়ে হঠাৎ এসেছে আমাদের স্বাধীনতা। সুতরাং সত্যিকারের বিপ্লবের রূপ ছায়াচিত্রে ফুটিয়ে তুলবেই বা কে, বুঝবেই বা কে!

দেবী বলিলেন,—তুমি বড় বেশী অতিরঞ্জিত করে এদের ত্রুটি-বিচ্যুতি খতিয়ে দেখছো।

একটু দম নিয়ে বলিলাম,—না এদের কোনো অপরাধ হচ্ছে সেকথা আমি বলব না, আমি শুধু বলতে চাই, এরা ভুল পথে চলেছে। আজকের দিনে 'দুর্গেশনন্দিনী' বা 'শিবাজী' তুলতে বাজার হিসাবে সাড়ে তিন লক্ষ টাকা খরচ হওয়া উচিত কিন্তু আজ থেকে পাঁচ বছর পরে এই বিষয়গুলি পুরাতন হওয়ার কোনো সম্ভাবনা ছিল না, ব্যয়ও হত কম। আরও পাঁচ বছর মানুষের অবস্থা এইরকম থাকলে কেউ বাঁচবে না, ধনী দরিদ্র কেউই নয়। এই অশান্তির দিনে 'দুর্গেশনন্দিনী' বা 'আনন্দমঠ' যে revenue সংগ্রহ করতে পেরেছে, পাঁচ বছর পরে তার চেয়ে ছবির আয় কমে যাওয়ায় আশঙ্কা আছে বলে মনে করি না। অত্যন্ত অসময়ে পৃথিবীর নিতান্ত অস্থির এই যুগে কি দরকার ছিল বড় ছবির প্রোডিউসার বলে নাম কেনবার লোভে এই সব কাহিনীর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে নষ্ট করবার। ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি মানুষ চেয়ে আছে আগামী এক মহাবিপ্লবের দিকে, যে-বিপ্লব রোধ করবার সাধ্য নেই। সেই আসন্ন সামাজিক বিপ্লবে প্রয়োজন হবে না কোন নেতার। সাধারণ মানুষের সহজ দাবী ভেঙে চুরে নিজেদের জন্যে নতুন পথ তৈরী করে নেবে।

দেবী আমার কথাবার্তা শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন। কম্যিউনিজম্ না সোসিয়ালিজম্ কোন্ পক্ষের হয়ে কথা বলছো ঠিক ধরতে পারছি না।

বলিলাম—কোন ইজ্‌ম্-এর দলে আমি নই। আমি ছায়াছবি নিয়ে পড়ে আছি। মানুষের অসন্তোষের ছায়া দেখে শঙ্কিত হয়ে উঠেছি শুধু। আজকের সাধারণ জীবনের কাছে অতীত কাহিনীর গরিমার কোন মূল্য নেই। শিবাজী, নেপোলিয়ান, গান্ধীবাদ, জহরলাল নেহেরু সবই যেন ক্রমশঃই অবান্তর হয়ে আসছে মানুষই হয়ে উঠছে সব চেয়ে বড়—যারা এতদিন নীরবে সহ্য করেছে, শুনেছে সকলের আদেশ ও উপদেশ, বাধ্যতা দেখিয়ে যারা হয়েছে বঞ্চিত, এদেরই সুখ-দুঃখের জ্বালাময়ী কাহিনীর ছবি তোলা হোক আজ, দেখবেন—দুর্দশার দিন ঘুচে গেছে। উঠুক আজকের জীবনের ছবি।

উত্তেজনার মুখে এতগুলি কথা বলিয়া হাঁফাইতেছিলাম, দেবী জানাইলেন, এবার যে তোমার যাওয়ার সময় হ'ল।

বলিলাম,—আর দু'মিনিট সময় দিন দেবী। এসেছি যখন, তখন আমার আর একটি অভিযোগ জানিয়ে যাই।

দেবী বলিলেন,—তোমার কথা শুনতে বেশ লাগে, কিন্তু যা' বলছো তা যদি সত্যি ঘটে তাহলে আমাদের বরাতে অনেক দুঃখ আছে, বুঝতে পারছি। দেবতার সম্বন্ধে ভয়-ডর এখনকার মানুষের ক্রমশঃই কমে আসছে, অনেকে আমাদের অস্তিত্বই মানে না। আমাদের পুজো-টুজো এখনও ঘটা করে হচ্ছে বটে কিন্তু সে-সব আমাদের প্রতি ভক্তি দেখাবার জন্যে নয়, নিজেদের মধ্যে একটু স্ফূর্তি করবার জন্যেই হচ্ছে। যাই হোক, কি বলবে বলো!

আবার সুরু করিলাম,—দেখেছেন আমাদের বাঙলা ছবির প্রযোজকদের কাণ্ডকারখানা। বোম্বাই থেকে বেগমপারা, কুলদীপ, সিতারা, কাক্কুকে এনে ছবির হিরোইন করা হচ্ছে। আমাদের দেশের নিতান্ত সাধারণ শিল্পীর চেয়ে অভিনেত্রী হিসাবে এরা অনেক অযোগ্য হলেও দেহসৌষ্ঠবের ভঙ্গীমায় এরা অনেক স্মার্ট। যে sex-appeal-এর stunt দেখিয়ে হিন্দীওলারা নিজেদের ব্যবসায়কে বেসামাল অবস্থায় টেনে এনেছেন বাঙলার কয়েকটি প্রযোজক সেই stunt দেখিয়ে বাজীমাৎ করবার কথা ভাবছেন। আমাদের দেশে যেখানে পাঁচ হাজার টাকায় সবচেয়ে কুশলী শিল্পী পাওয়া যেতে পারে সেখানে কুলদীপকে কুড়ি হাজার (এর মধ্যে কতখানি ব্ল্যাকে দিতে হবে জানি না) বড় হোটেলে থাকবার খরচ এবং স্যুটিং পিরিয়ডের মধ্যে বারকয়েক বোম্বাইয়ে উড়ে যাওয়া আসার খরচ জোগাতে হচ্ছে হয়তো। আপনি বলবেন, কেন তোমাদের শিল্পীদেরও তো বোম্বাইওলারা নিতে সুরু করেছে, কিন্তু কেন এই বদান্যতা জানেন কি? দিলীপকুমার একটা ছবিতে নামতে নেয় এক লাখ, তার বদলে যদি অসিতবরণকে কুড়ি

(শেষাংশ ১৬৮ পৃষ্ঠায়)

★ অর্দ্ধপৃষ্ঠা ও অর্দ্ধচন্দ্র ★

★

● ● ● সলীল সেনগুপ্ত ● ● ● ●

বাজার নহে, বামার নহে, চলচ্চিত্র-পত্রিকার বিজ্ঞাপন সংগ্রহের দালাল নিযুক্ত হইয়াছি। পত্রিকাটি একমাত্র প্রগতিবাদী ইত্যাদি।

পত্রিকা-পরিচালক পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন "লেগে থাকুন—সব ঠিক হ'য়ে যাবে—"। লাগিয়া রহিলাম। কিন্তু সে লাগিয়া থাকার ইতিহাস সুদীর্ঘ এবং মর্মন্তুদ। কিছুদিন বাদে টের পাইয়াছিলাম যে, আসলে আমি লাগি নাই—দুর্ভাগ্য আমার পিছনে লাগিয়া আছে। বিলম্বে যদিই বা বুঝিলাম তখন ছাড়াইবার সময় চলিয়া গিয়াছে।

দুর্ভাগ্য আমার পিছনে মিছরীর দোকানের বোলতার মত লাগিয়া রহিল।

মাছ কিনিতে হইলে যে কোনো বাজারের যে অংশ মৎস্য বিক্রেতাদের জন্য নির্দিষ্ট থাকে সেখানে যাইতে হয়, ফলের দোকানে কদলী, কয়লার দোকানে কয়লা, শ্বশুরের দোকানে বধূ ও শ্যালিকা মদের দোকানে মদ, ভারতবর্ষে আদি ও অকৃত্রিম অধ্যাত্মবাদ, আমেরিকার ডলার ও আনুষঙ্গিক ডামাডোল—অর্থাৎ যাহার যে স্থান তাহাকে সেইখানে খোঁজ করিলে পাওয়া যায়।

চলচ্চিত্রের বিজ্ঞাপন কোথা হইতে যে সংগ্রহ করিতে হয় তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতে আমার ঝাড়া তিনটি মাস সময় লাগিয়া গেলো। আপনারা বলিবেন: কেন? যার যার অফিসে গেলেই তো পাওয়া যায়? বিজ্ঞাপন-সচিবও একদিন আমাকে সেই কথাই বলিয়া দিলেন। কিন্তু তিনি যত সহজে সমস্যার সমাধান করিলেন ব্যাপার-টা আসলে তত সহজ নয়।

নীলা ব্যানার্জী প্রোডাকসন কোম্পানীতে একাদিক্রমে পনেরো দিন ধর্ণা দিলাম কিন্তু প্রচার-সচিবের দেখা মিলিল না। সহকারী প্রচার-সচিব উগ্র প্রকৃতির ব্যক্তি। বিজ্ঞাপনের দালাল দেখিলেই ধাওয়া করেন—কখনও শুধু হাতে কখনো ব্লক লইয়া। তাঁহাকে অনেক সিগারেট খাওয়াইয়াছি অনেক স্তুতিবাদ করিয়াছি কিছুতেই বাহির করিতে পারিলাম না—প্রচার-সচিবকে কখন কোথায় পাওয়া যাইবে।

বিমর্ষমনে হতাশচিত্তে সেদিন বাহির হইয়া আসিতে

এমেচার ফটোগ্রাফী :

এক বৃন্তে দু'টি ফুল ... ফটো : প্রবোধকুমার [illegible]

নবাগতাদের মধ্যে যাঁরা অভিনয়ক্ষমতা পরিচয় দিয়েছেন তাঁদের একজন
অসিতা মজুমদার

ছিলাম—পাশাপাশে আমারই আর একজন সমধর্মীর সঙ্গে [illegible]। দুঃখের কথা শুনিয়া তিনি হাসিয়া আর বাঁচেন না! তুমি একটা আস্তগাধা! এঁকে যদি চাও তবে Packed Show-house-এর কসমোফোর্ট রেস্তোঁরায় যাও, ঠিক দেখা পাবে!

রেস্তোঁরায় কেন! ম্যানেজারীও করেন বুঝি!

ম্যানেজারীই বটে, তবে সেই সঙ্গে অন্য অনেক কিছুও ম্যানেজ করেন। এখন সন্ধ্যা ছ'টা সোজা 'কসমোফোর্টে

চলে যাও, পাবে তাঁকে।

তাঁহাকে পাইলাম। আর দেখিলাম তাঁর আরও সাঙ্গপাঙ্গদের। সবাই দুনিয়াটাকে একটু রঙীন চোখে দেখিতেছেন, মিঠি মিঠি হাসি ছড়াইতে ছড়াইতে রসের কথা বলিতেছেন। রসে সব রসময়! রস যেন জীবন-পাত্রে আর ধরে না, উছলিয়া উপছিয়া ফেনাইয়া পড়িতেছে।

প্রচার-সচিব অনেক উঁচু হইতে অর্দ্ধনিমীলিত রসরাগারক্ত নয়নে আমার দিকে চাহিলেন। সে তো চাউনি নয়, যেন দৃষ্টিদান! বলিলেন, আমি তো পদ্মলোচনকে ঢালাও হুকুম দিয়েছি—সবাইকে একপাতা ক'রে বিজ্ঞাপন দিয়ে দিতে। আপনি যান আমার নাম করে বলুন গে।

বুকের বোঝা যেন একটু হাল্কা হইয়া গেলো।

ফিরিয়া পদ্মলোচনের কাছে গেলাম। যাহা শুনিলাম, চমৎকৃত হইয়া গেলাম। তিনি সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার পর লক্ষীবাবুর পচাই শপে বসেন। সেখানে দিশী মতে সেবা চলে এবং সরস আসর বসে প্রতি সন্ধ্যায়।

সেখানে সুরসিক পদ্মলোচনকে যখন খুঁজিয়া বাহির করিলাম তখনও তাঁহার রসে কড়াপাক লাগে নাই।

আমার কথা শুনিয়া পদ্মলোচন তো হাসিয়াই খুন: Slip আনেননি, বিজ্ঞাপন দেবো কী করে?

কুণ্ঠিত হইয়া বলিলাম, Slip? Slip-এর কথাতো জানিনা—উনি যা বলেছেন তা জানালাম আপনাকে। পদ্মলোচন হাসিয়া বলিলেন, ওঁর এখন দরাজ মন। উনি এখন অনেক কিছু দিয়ে দিতে বলবেন, কিন্তু slip ছাড়া আমি তো আর বিজ্ঞাপন দিতে পারিনা—যান Slip নিয়ে আসুন।

পুনরায় কসমোফোর্টে ফিরিয়া আসিলাম। প্রচার-সচিব শুনিয়া তক্ষুনি পদ্মলোচনের শাস্তি বিধান করিলেন 'পদ্মলোচনের পদ্মটি আপনি নিয়ে নিন—আমার জন্ম লোচনটি থাক!

টেবিল ঘিরিয়া হাসির রোল পড়িয়া গেল।

যে বন্ধু মেজোরার সংবাদ দিয়াছিলেন তাঁহাকে দুঃখের কথা জানাইতে তিনি বলিলেন:

তুমি ওখানে সুবিধে করতে পারবেনা—ব্রিগেডিয়ার-এর কাছে যাও।

'ব্রিগেডিয়ার?' বুকের ভেতরটা কেমন ঢিপ্ঢিপ করিতে লাগিল—

আশ্বাস দিয়া বন্ধু বলিলেন হ্যাঁ—এই নাও ঠিকানা।

বাড়ীর সামনে ভদ্রলোকের নামের ফলক। নামের নীচে লেখা আছে— Brigadier of Publicity.

পরে বুঝিলাম ব্রিগেডিয়ার কিন্তু সত্যিই কোনো সামরিক কর্মচারী নন। তিনি চলচ্চিত্রের প্রচার-সচিব। পোষাকে মিলিটারী, চলনে বলনে মিলিটারী। কিন্তু প্রযোজকের সামনে অর্ডিনারী—একেবারে ধুতি-পাঞ্জাবী-পরা বাঙালীবাবু!

প্রথম দিন আমাকে ঝাড়া তিন ঘণ্টা বসাইয়া দীর্ঘ প্রচারক-জীবনের চমকপ্রদ কাহিনী শুনাইলেন। দ্বিতীয় দিনে প্রচার কী তাহা বুঝাইলেন—তৃতীয় দিনে তাঁহার কাশ্মীর-ভ্রমণ সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ আর কয়েকটি ছবি দিয়া বলিলেন: ছবিগুলির ব্লক ক'রে নেবেন—আর প্রুফ আমাকে না দেখিয়ে ছাপবেন না।

ছবিগুলি তাঁর; নানান্ ভাবে, নানান্ বেশে তোলা। সব ক'টি ছবির নীচে ছোট ছোট করে ছবির পরিচয় দেওয়া আছে—কেনোটিতে চিকেন, হ্যাম, মারমালেড ও কফি সহকারে তিনি ব্রেকফাষ্ট সমাধা করছেন, কোনোটিতে অর্দ্ধশায়িত হয়ে পাইপের আশ্রয় নিয়েছেন—কোথাও বা একটি পাহাড়ী শিশুকে একটু আদর ক'রছেন (এই ছবিটি দেখাবার সময় ব'ললেন 'শিশুদের সঙ্গে আমার কী যে একটা নিবিড় যোগাযোগ আছে!) কোথাও বা কাশ্মীর প্রবাসী বাঙালীরা তাঁকে মানপত্র দিচ্ছেন—সে যা একটা 'gatheration' হয়েছিলো আমার তো তিন দিন 'fatiguation!'

বিজ্ঞাপন-সচিবকে ব্যগ্র-হস্তে সেগুলো দিলাম। তিনি নাড়িয়া চাড়িয়া বলিলেন, বিজ্ঞাপন কৈ?

লজ্জিত হইয়া বলিলাম, সেটার কথা 'forgetation' হ'য়ে গেছে। বিজ্ঞের মত পণ করেই তাঁর কাছে

গিয়েছিলাম—কিন্তু এর বেশী আর কপালে জোটে নি।

সচিব-মহোদয় অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন : তাহলে আর কোথাও গিয়ে নিয়ে আসুন।

কোনো দিকে কোনো সুবিধা না করিতে পারিলে বাঙালী পূর্ব্বে হোমিওপ্যাথি ডাক্তার হইতো। ইদানীং হাওয়া বদলাইয়া যাওয়াতে রেওয়াজটাও পাল্টা-ইয়াছে। হোমিওপ্যাথি ডাক্তারেরা—যাহারা এককালে ঘোড়া, বা কুকুর রোগের চিকিৎসক ছিলেন—দলে দলে চিকিৎসার হাতুড়ী ছাড়িয়া চলচ্চিত্র-প্রচারে কলম ধরিয়াছেন।

তবে কেহই চলচ্চিত্রের বড় একটা ধার ধারেন না। যিনি চিকিৎসকের উপর যাদুকর ছিলেন তিনি যাদু-বিদ্যায় আমাকে সম্মোহিত করিয়া তাঁহার যাদুবিদ্যা প্রচারের মালমশলা আমার ঘাড়ে চাপাইলেন। যাঁহার মাদুলী ছিলো তিনি মাদুলী, যাঁহার মাথার তেল ছিলো তিনি মাথার তেল এবং যাঁহার আর কিছুই ছিলো না তিনি গল্প চাপাইয়া কর্ত্তব্য সম্পাদন করিলেন।

'হনুমানজী বুড্ কোম্পানীর' প্রচারবাচস্পতি দুঃসহ সিংহ মহাশয় ভাল মানুষ। সকাল দশটা হইতে বেলা পাঁচটা পর্যন্ত দক্ষিণ হস্তের উল্ট দিক দিয়া সারাটা কপাল ঠুকিয়া কাটাইলেন—কিন্তু ক্যাপশন বাহির হইলো না। ক্যাপশন ছাড়া কি বিজ্ঞাপন দেওয়া যায়—আপনি কাল আসবেন।

কিন্তু আর গেলাম না। ইদানীং একটু বুদ্ধি হইয়াছিল। নিজের মাথা ঠুকিয়া যখন ক্যাপশন বাহির হয় নাই তখন পরদিন আমার মাথাটা ঠুকিয়াও তো দেখিতে পারেন। নিজের মাথা ঠুকিতে ঠুকিতে ক'বার আমার মাথার দিকে যে লুব্ধ দৃষ্টি দিয়াছিলেন তাহা আমার নজর এড়ায় নাই। বিজ্ঞাপন চাই বলিয়া তাঁহাকে আমার মাথায় গাট্টা মারিতে দিব কেন?

অবশেষে 'রুদ্ধদ্বার' ছবিটির প্রযোজকের নিকট হইতে একটা বিজ্ঞাপন মিলিল।

অর্দ্ধপৃষ্ঠা বিজ্ঞাপন!

তবু রক্ষা, অর্দ্ধচন্দ্র খাই নাই! কিন্তু, খবর নিয়া জানিয়াছি, বিজ্ঞাপনের টাকা বারোমাসে উনপঞ্চাশবার তাগাদা দিয়াও পাওয়া যায় নাই বলিয়া বিজ্ঞাপন-সচিব আমার জন্য সেই অর্দ্ধচন্দ্রই ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন!

আমার স্বর্গারোহণ

(১৬৪ পৃষ্ঠার পর)

হাজারে পাওয়া যায় তাহলে কার লাভ বেশী! দেখতে-শুনতে, গানে অভিনয়ে দিলীপকুমারের চেয়ে অসিতবরণ কি কোন অংশে কম? সুরাইয়ার চেয়ে সুমিত্রা রূপে গুণে কোথায় খাটো বলতে পারেন? কিন্তু আর নয় এবার আমায় পোঁছে দিন।

ভোর হইয়া আসিয়াছিল। চোখ চাহিয়া দেখি আমার মোটর ঘিরিয়া ছোট-খাটো একটি জনতার পুরোভাগে দাঁড়াইয়া একজন লাল-পাগড়ী মোটরের সার্সিতে ধাক্কা দিতেছে। তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিয়া গাড়ীটি সচল করিবার কাজে লাগিলাম। গতরাত্রে যে-গাড়ী অনেক কসরৎ করিয়াও চালাইতে পারি নাই, এখন একটিবার হ্যাণ্ডেল মারিতেই ইঞ্জিন গর্জ্জন করিয়া উঠিল!

আমার খেয়ালী সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড মোটরের মত কবে যে খামখেয়ালী এই মৃতপ্রায় জাতি হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়া গন্তব্য পথে ছুটিয়া যাইবে তাহা জানি না, তবে এইটুকু জানি ভিতরে ভিতরে আমরা যেন ক্রমশঃই ষ্টার্ট লইবার জন্য উৎসুক হইয়া আছি, শুধু ঠিকমতো ভাবে একবার হ্যাণ্ডেল দেওয়ার অপেক্ষা।

চিত্রবাণী প্রেস—৫, হাজরা লেন, কলিকাতা : ২৯ (ফোন : সাউথ ১৯১১) হইতে নিতাই চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত এবং চিত্রবাণী কার্য্যালয় হইতে তৎকর্ত্তৃক প্রকাশিত

চিত্রবাণী

নাট্য, চিত্র ও শিল্পকলার সচিত্র মাসিক পত্রিকা

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য—৭৷৷০ (সাধারণ ডাকে): ১১৲ (রেজিষ্ট্রী ডাকে)

চতুর্থ বর্ষ | কার্ত্তিক ১৩৫৮ | দ্বিতীয় সংখ্যা

পরলোকে প্রমথেশ বড়ুয়া

ভারতীয় চিত্রজগতের দিক্‌পাল বাঙলার একনিষ্ঠ চলচ্চিত্রসেবী প্রতিভাধর প্রমথেশ বড়ুয়া ইহলোক ত্যাগ করেছেন। চলচ্চিত্রের গতির মতোই দুর্নিবার দুর্দম গতিবেগশীল অশান্ত চঞ্চল জীবনের অধিকারী প্রমথেশচন্দ্রের আবির্ভাব ছায়াচিত্রাকাশে যেমন ছিল আকস্মিক অথচ বিরাট ব্যাপক সমারোহে উজ্জ্বল তাঁর তিরোভাব তেমনি ঘটেছে সবার অলক্ষ্যে, একান্ত নিঃশব্দে। হয়ত একদা কোনো সুদূর ভবিষ্যতের চলচ্চিত্রানুরাগীদের কাছে তাঁর নাম জেগে থাকবে কিংবদন্তীর আকারে তবু ভারতীয় ছায়াচিত্রজগতে প্রমথেশ বড়ুয়া অমর হয়ে থাকবেন, তাঁর দান ভারতীয় চলচ্চিত্রসেবীর কাছে আশা ও প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। ভারতীয় চিত্রজগৎ নিত্য-নবীন পরখ ও নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে পা ফেলে এসেছে, আজকে ভারতীয় চলচ্চিত্রশিল্প বিশ্বের চলচ্চিত্রশিল্পে দ্বিতীয় স্থান অধিকারের মর্য্যাদা পেয়েছে; সেই শ্রীবৃদ্ধি ও অগ্রগমনের পশ্চাতে যাঁদের অদৃশ্য হস্ত রয়েছে, অক্লান্ত কর্মপ্রচেষ্টা রয়েছে, নব নব প্রয়োগ-কৌশল রয়েছে তাঁদের মধ্যে প্রমথেশ বড়ুয়া অন্যতম। চলচ্চিত্র ছাড়াও তিনি প্রথম যৌবনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছেন রাজনীতিতে। চিত্রজগতেও তিনি জড়িত ছিলেন নির্ব্বাক ও সবাক যুগে সমভাবেই, জড়িত ছিলেন একাধারে পরিচালক, আলোকচিত্রশিল্পী, প্রযোজক এবং অভিনয়-শিল্পী হিসেবে। তিনিই প্রথম বাংলাচিত্রে প্রবর্ত্তন করেছেন রবীন্দ্রসঙ্গীত, তিনিই প্রথম এনেছেন বাংলা ছবিতে যথার্থ সমাজচেতনা, তিনিই দিয়ে গেছেন বাংলা দেশের সর্ব্বজনপ্রিয় সর্ব্বজনঅভিনন্দনধন্য প্রথম ট্রাজেডী-চিত্র 'দেবদাস', বহু বছর অতিক্রম করার পরও আজও যার আবেদন আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা দর্শকের কাছে এতটুকু ম্লান হয়নি। তিনিই দিয়েছেন বাংলা দেশের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি-দীপ্ত হাস্য-রস-উজ্জ্বল প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য কমেডী চিত্র 'রজত-জয়ন্তী', আজও যা সমস্যা-জর্জ্জর দর্শকচিত্তে সঞ্চার করে হাসির জোয়ার। এ ছাড়া তিনিই প্রথম পরিচিত করিয়ে দিয়েছেন রূপালী পর্দায় বহু নতুন অভিনয়শিল্পীকে, সঙ্গীতশিল্পীকে, আলোকচিত্রশিল্পীকে, যাঁরা বাংলা তথা ভারতীয় ছবিকে সমৃদ্ধতর করে তুলেছেন, যাঁরা আজ ভারতজোড়া সুনামের অধিকারী হয়েছেন। নবীনের স্রষ্টা, অনাগতের দিশারী, অফুরন্ত প্রাণ-চাঞ্চল্যের প্রতীক, বাংলা ছায়াচিত্রশিল্পের ভগীরথ, অখ্যাত অপরিচিত প্রতিভার পথ-প্রদর্শক প্রমথেশচন্দ্র বড়ুয়া। আমরা

আগামী সংখ্যায়

সোভিয়েট রাশিয়ায় ভারতীয় চলচ্চিত্র মিশনের সাম্প্রতিক ভ্রমণবৃত্তান্ত সম্বন্ধে সচিত্র বিবরণ লিখছেন অভিজ্ঞ আলোকচিত্রশিল্পী, 'ছিন্নমূল' চিত্রের পরিচালক ও 'চিত্রবাণী'র ষ্টিরিওস্কোপিক চিত্রশিল্পী নিমাই ঘোষ। সোভিয়েটের বর্ত্তমান নাট্যলোক ও চিত্রজগৎ সম্বন্ধে খুঁটিনাটি তথ্য-সঞ্চয়ন ও প্রত্যক্ষ দর্শন ক্রমশঃ-প্রকাশ্য ধারাবাহিকভাবে তিনি লিখবেন 'চিত্রবাণী'র তথ্যসন্ধানী অনুসন্ধিৎসু পাঠক-পাঠিকাদের জন্য। এই ধারাবাহিক বিবরণের সঙ্গে থাকছে অসংখ্য চিত্রাবলী।

আগামী সংখ্যাতেই ভারতীয় চলচ্চিত্রের অন্যতম দিক্‌পাল—একাধারে ক্যামেরাম্যান, পরিচালক, প্রযোজক ও অভিনয়শিল্পী পরলোকগত প্রমথেশচন্দ্র বড়ুয়ার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করছেন বড়ুয়া-সাহেবের সহকর্ম্মী, সমসাময়িক ও সমকর্ম্মী পরিচালক, কলাকুশলী ও অভিনেতা-অভিনেত্রীবৃন্দ।

চিত্রবাণী চিত্রবার্ষিকী, ১৯৫২

চিত্রবাণী প্রকাশনীর যে বইখানি সকলের প্রশংসা অর্জ্জন করেছে, বাংলা চিত্রজগতের বহুতর তথ্যসম্বলিত সেই বইখানি বর্দ্ধিত কলেবরে, বিভিন্ন বিবরণে ও বিচিত্র চিত্রসম্ভারে সজ্জিত হয়ে পুনরায় আত্মপ্রকাশ করবে আগামী বছরের গোড়ার দিকে।

তার জন্য আমাদের সকল প্রকার আয়োজন চলছে। বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পসংশ্লিষ্ট প্রতিজনের কাছে এবারে আবেদন জানাচ্ছি আরও বিরাট ও ব্যাপকতর সহযোগিতার জন্য। আশা করি এবারে তাঁদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতার অভাব হবে না।
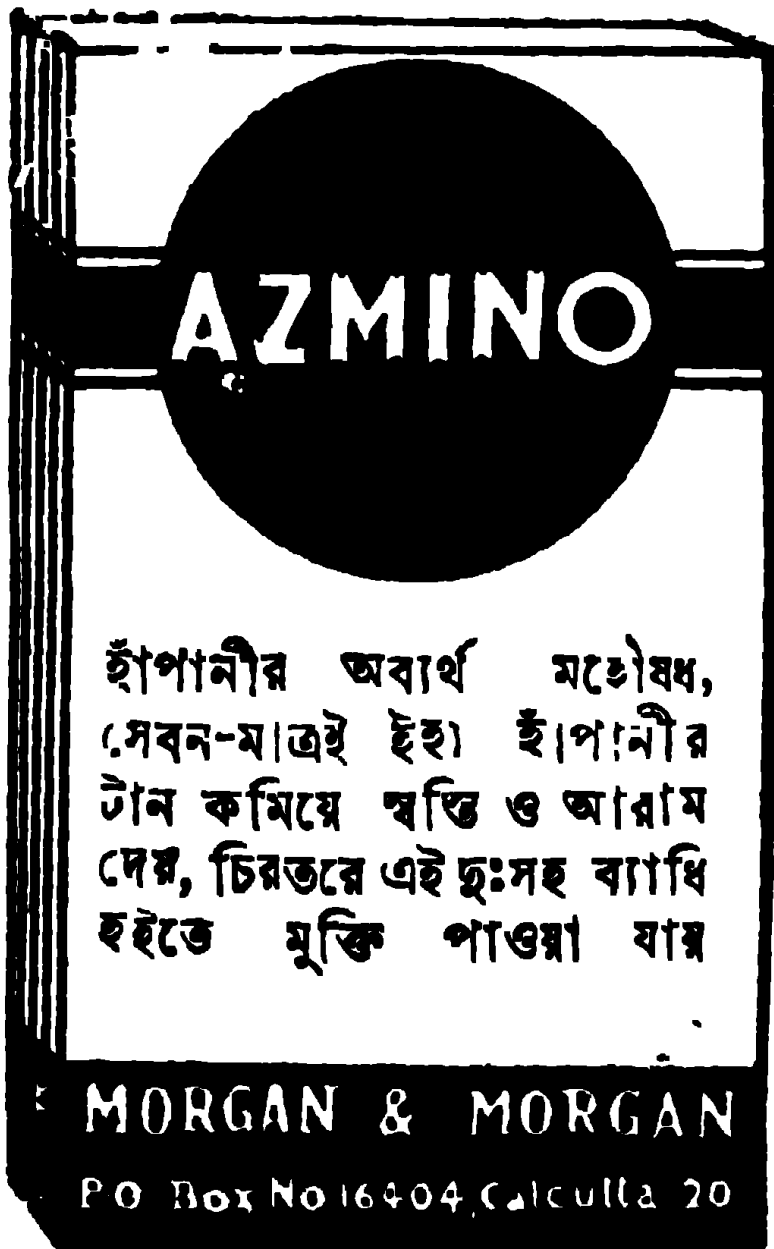
নিখিল ভারত সংবাদ-আলোকচিত্র প্রদর্শনী

আগামী ১৯৫২ সালের জানুয়ারী মাসে কলিকাতায় নিখিল ভারত সংবাদ-আলোকচিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করছেন নিখিল ভারত সংবাদ-আলোকচিত্রশিল্পী সঙ্ঘ। এই প্রদর্শনীতে সংবাদ আলোকচিত্র এবং যাবতীয় প্রদর্শনযোগ্য আলোকচিত্র যা' ১৯৫০—৫১ সালে তোলা হয়েছে তা' পাঠানো চলতে পারে এবং তা' পাঠাবার শেষ তারিখ ১৫ই ডিসেম্বর। পাঠাবার ঠিকানা হচ্ছে প্রেস্ ফটোগ্রাফারস্ এ্যাসোসিয়েশন অফ্ ইণ্ডিয়া, ১নং বর্ম্মন ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

পরলোকে প্রমথেশচন্দ্র বড়ুয়া

ভারতের সর্ব্বজনপ্রিয় অন্যতম শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র শিল্পী প্রমথেশ বড়ুয়া গত বৃহস্পতিবার ২৯শে নভেম্বর বিকাল ৪-৪ মিঃ-এ পরলোকগমন করেছেন। গত চার বছর দীর্ঘ রোগভোগের পর ভগ্নস্বাস্থ্য এই প্রতিভাবান শিল্পীর অবস্থা গত ২৪শে নভেম্বর থেকে সহসা আশঙ্কাজনক হয়ে দাঁড়ায়; মঙ্গলবার রাত্রে তিনি সম্পূর্ণ সংজ্ঞাহীন হন এবং বৃহস্পতিবার বৈকালে বড়ুয়া শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

অন্তিমশয়নে প্রমথেশচন্দ্র ফটো: কে. এ. রেজা

১৯০৩ সালে ২৪শে অক্টোবর আসামের গৌরীপুর রাজপরিবারে তাঁর জন্ম রাজা প্রভাত চন্দ্র বড়ুয়ার জ্যেষ্ঠ সন্তান এই 'রাজপুত্র' বহু বিভিন্ন ধারায় নিজের এই ক্ষুদ্র জীবন নিয়ে পরীক্ষা করেন। ১৯২৪ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি-এস-সি পাশ করার পর তিনি যে জীবন আরম্ভ করেন তা সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিক। ১৯২৮ সালে তিনি আসাম ব্যবস্থাপক সভায় সদস্য মনোনীত হন এবং দু'বছর পরে ঐ সদস্যপদে নির্বাচিত হয়ে আসেন। ১৯৩০ থেকে ১৯৩২ সাল পর্যন্ত দু বছর তিনি আসাম ব্যবস্থাপক সভায় স্বরাজ্য কংগ্রেসদলের চীফ হুইপ ছিলেন এবং ১৯৩০ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্বাচিত হন। এমন কি ১৯২৯ সালে আসামের গভর্ণর তাঁকে মন্ত্রীপদ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেছিলেন। চিত্রজগতে এসে প্রথমে 'একদা' ও 'নিশির ডাক' তোলার পর তিনি 'রূপলেখায়' হাত দেন। ১৯৩৪ সালে তাঁর পরিচালিত 'দেবদাস' বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং এখন পর্যন্ত সে ছবির খ্যাতি অম্লান। এই চিত্রে তাঁর বিশিষ্ট অভিনয় বহুভাবে বাংলার তরুণ-সমাজকে চঞ্চল করে তোলে। সেই সময়ই যমুনা দেবী তাঁর সহচরী হন। তারপর ক্রমে গৃহদাহ, মায়া, মুক্তি, অধিকার, রজত-জয়ন্তী, শাপমুক্তি, মায়ের প্রাণ, উত্তরায়ণ, শেষ উত্তর, জবাব, চাঁদের কলঙ্ক ইত্যাদি এবং সর্ব্বশেষে 'আমিরী' তৈরী করেছিলেন। ১৯২৮ সালে তিনি চলচ্চিত্র জগতে প্রবেশ করেন এবং বৃটিশ ডোমিনিয়ন ফিল্মের ডিরেক্টর বোর্ডের অন্যতম সভ্য ছিলেন। প্রথম দেবকী বসু পরিচালিত 'পঞ্চশরে' তিনি রূপালী পর্দায় একটি ক্ষুদ্র ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করেন এবং ১৯২৯ সালে 'ভাগ্যলক্ষ্মী' চিত্রে তাঁর প্রথম প্রধান চরিত্রাভিনয়।
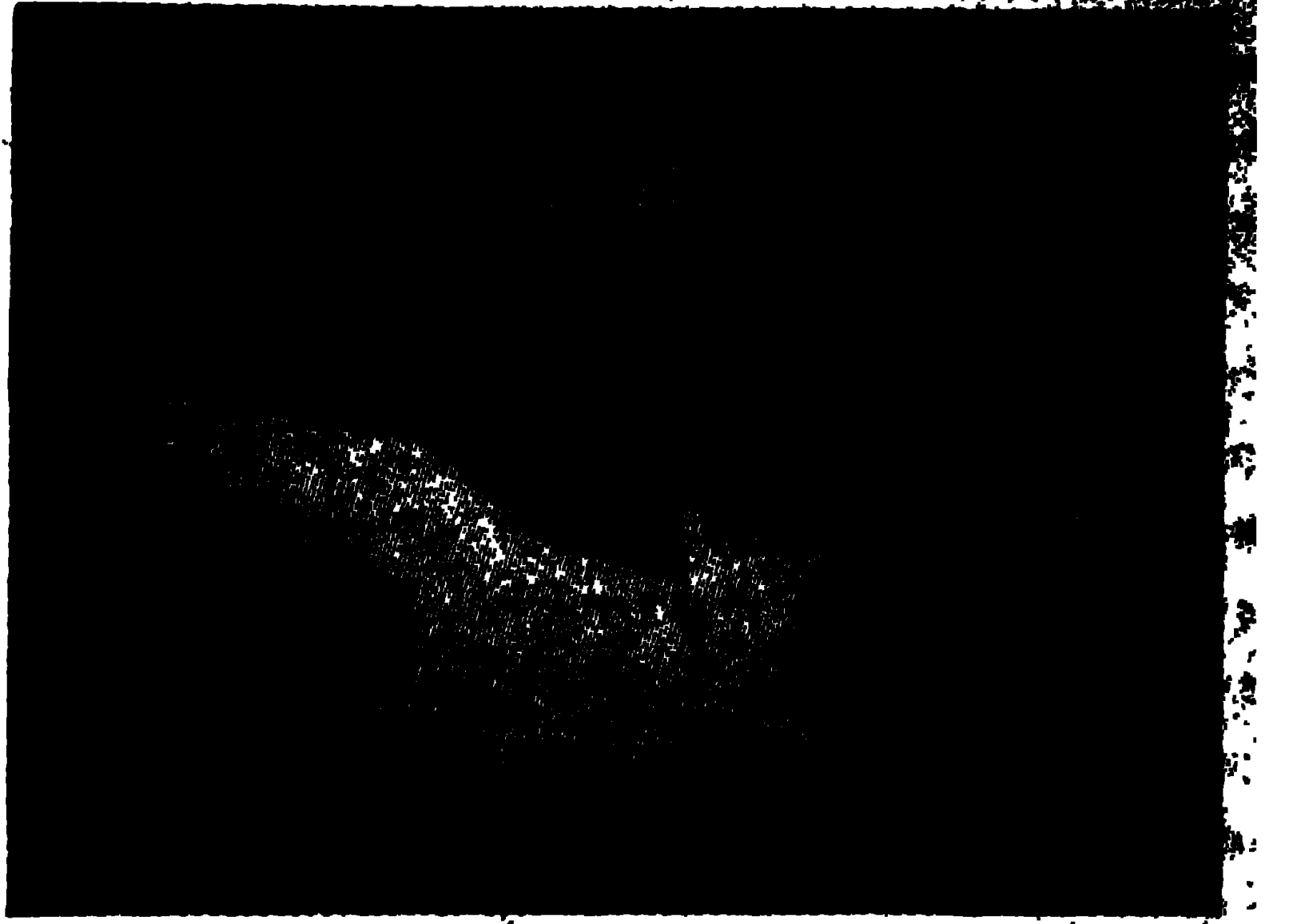
তারপর রবীন্দ্রনাথের পরিচয়পত্র নিয়ে তিনি বিদেশ-যাত্রা করেন এবং প্যারিসে ফক্স ফিল্মসে সহকারী ক্যামেরাম্যান হিসাবে তিনি মঁসিয়ে রোজাসের অধীনে শিক্ষালাভ করেন। ১৯৩০ সালে বিদেশ থেকে ফিরে এসে বড়ুয়া আর্ট পিকচাসের্র প্রতিষ্ঠা করেন এবং 'অপরাধী' চলচ্চিত্রে অংশ গ্রহণ করেন। তাঁর 'বেঙ্গল, ১৯৮৩' প্রথম সবাক চিত্র দিয়ে 'রূপবাণী' চিত্রগৃহের উদ্বোধন হয়। ঐ চিত্রটি দর্শকসমাজ গ্রহণ করেন নি। কিন্তু ঐটিই বিদ্যুতালোকে গৃহীত প্রথম বাংলা চলচ্চিত্র। প্রকৃতপক্ষে ভারতের চলচ্চিত্রে তখন উচ্চশিক্ষিত ও বহুমুখী প্রতিভার ধারক বড়ুয়া একাধারে ক্যামেরাম্যান, প্রযোজক, পরিচালক, অভিনেতা এবং শিল্পী ছিলেন। বড়ুয়া তিন পত্নী—যমুনা দেবী অন্যতম—এবং দুই পুত্র রেখে গেছেন। সর্বশেষে বিবাহিতা যমুনা দেবীর সঙ্গে তাঁর শেষ জীবন বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের বাড়ীতেই কেটেছে। যমুনা দেবী বড়ুয়ার তিনপুত্রের মাতা।

ভারতে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রমেলা

আগামী বছরের গোড়ার দিকে ভারতবর্ষে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রমেলা অনুষ্ঠিত হবে। বোম্বাইতে এই উৎসব হবে ১৯৫২ সালের ২৪শে জানুয়ারী থেকে ৬ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত। মাদ্রাজে ৭ই ফেব্রুয়ারী থেকে ১৩ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত। দিল্লীতে ১৪ই ফেব্রুয়ারী থেকে ২০শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত। কলিকাতায় ২১শে ফেব্রুয়ারী থেকে ২৭শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত। ভারত সরকারের ফিল্মস্ ডিভিসনের উদ্যোগে এটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সারা ভারতবর্ষে পাঁচ সপ্তাহ ধরে এই উৎসব চলবে এবং পৃথিবীর প্রধান প্রধান চলচ্চিত্র উৎপাদন কেন্দ্র থেকে প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গে একটি আঞ্চলিক কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হয়েছে—যাঁরা এই প্রদেশে উৎসব পরিচালনা ব্যাপারে সক্রিয় অংশ নেবেন, তাঁরা হলেন—বীরেন্দ্রনাথ সরকার, মুরলীধর চট্টোপাধ্যায়, ডক্টর আর, এম্, রায়, শ্রী পি, বসু, এবং শ্রীমতী সীতা চৌধুরী। সোভিয়েট রাশিয়া, ফরাসী, ইতালী, চীনা-গণতন্ত্র, ব্রিটেন, আমেরিকা, জাপান · ইত্যাদি সমেত পৃথিবীর ৪২টি দেশকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। এ ছাড়া বিশিষ্ট শিল্পী ও ব্যক্তিবর্গদের মধ্যে এঁদের আমন্ত্রণ করা হয়েছে—চার্লি চ্যাপলিন, স্যার আলেকজাণ্ডার কর্ডা, স্যার লরেন্স অলিভিয়র, ভিভিয়েন লে, ওয়াল্ট ডিস্‌নে, জন গ্রিয়ারসন, রবার্টো রসেলিনি, ইনগ্রিড বার্গম্যান, ভিটোরিও ডিসিকা, এবং সিসিল বি, ডি মিলি।

এশিয়াতে এ-জাতীয় উৎসব এই প্রথম অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সাধারণ পূর্ণদৈর্ঘ্য ছবি ছাড়া ডকুমেণ্টারী এবং শিক্ষামূলক ছবিও দেখানো হবে। পুরস্কার ছাড়াও সার্টিফিকেটও দেওয়া হবে। পুরস্কার যা দেওয়া হবে তার মধ্যে আছে রূপার প্লেটের ওপর বসানো হাতীর দাঁতের তৈরী একটি অশোকস্তম্ভের অনুকৃতি। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ছবি এবং এশিয়ার শ্রেষ্ঠ ছবিকে দুটি পৃথক পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। এ ছাড়া, ফিল্ম ফেডারেশান অব্ ইণ্ডিয়া একটি বিশেষ পুরস্কার দেবেন শ্রেষ্ঠ ভারতীয় ছবিকে। দেশী ও বিদেশী ছবি মিলিয়ে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ছবিকে একটি পুরস্কার দেবেন বেঙ্গল জার্নালিষ্ট এ্যাসোসিয়েশন। বাৎসরিক উৎপাদন ক্ষমতার ওপর নির্ভর করেই পৃথিবীর যে কোন চলচ্চিত্র উৎপাদনকারী দেশকেই ছবি দেখাবার অধিকার দেওয়া হয়েছে। যেসব দেশে বছরে ৩০ থেকে ৬০ খানি ছবি তৈরী হয়, সেসব দেশ দেখাতে পারবেন ২টি সাধারণ পূর্ণদৈর্ঘ্য ছবি এবং ৪টি ডকুমেণ্টারী ; যেসব দেশ ৬০ থেকে ১০০ খানি ছবি তৈরী করেন তাঁরা ৩টি সাধারণ ছবি এবং ৬টি ডকুমেণ্টারী এবং যেসব দেশ একশো'র বেশী ছবি করেন তাঁরা ৪টি কাহিনীমূলক ছবি এবং ৮টি ডকুমেণ্টারী এই উৎসবে যে সমস্ত ছবি দেখানো হবে তা' ১৯৫০ সালের ১লা নভেম্বরের আগের হলে চলবে না।

অন্যান্য প্রদেশে ব্যবস্থাপক সমিতির মধ্যে যাঁরা আছেন তাঁরা হলেন—এস্. কে. পাতিল, এস্. এস্. ভাসন, কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়, ভি. শান্তারাম, কে. এম্. মোদী, জেম্‌স্ ম্যাকফারলেন এবং কেন্দ্রীয় সেন্সর দপ্তরের সভাপতি সি, এম্. আগরওয়ালা হবেন এই সংগঠন সমিতির চেয়ারম্যান ও ফিল্মস্ ডিভিসনের প্রধান প্রয়োগকর্তা এম্. ভাবনানী হবেন সম্পাদক।

বিখ্যাত প্রযোজক আলেকজাণ্ডার কর্ডা ইতিমধ্যেই যোগদানের সম্মতি জানিয়েছেন এবং বিভিন্ন দেশ থেকে ছবিও আসতে সুরু হয়েছে।

আগামী জানুয়ারী মাসে ভারতীয় আন্তর্জ্জাতিক চিত্রমেলায় প্রদর্শনের জন্য ৮ খানি বৃটিশ চিত্র নির্বাচিত হয়েছে। তার মধ্যে তিনখানি ডকুমেণ্টারী চিত্র, দুখানি করে শিক্ষা ও বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় চিত্র ও একখানি কার্টুন চিত্র। ডকুমেণ্টারীগুলির নাম হচ্ছে 'দি ড্যান্সিং ফ্লিস', 'ওয়াটার টাইম', ও 'ফরওয়ার্ড এ সেঞ্চুরী'। শিক্ষামূলক চিত্র হচ্ছে 'হাউ টেলিভিশন ওয়ার্কস,' 'এক্সটারন্যাল রেসপিরেশন'। বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় চিত্র 'ম্যাগনেটিজম' ও 'সায়েন্স ইন দি অর্কেস্ট্রা'। কার্টুনটি দুই ভাগে বিভক্ত, একটির নাম 'স্প্রীং এ্যাণ্ড উইণ্টার', অপরটির নাম 'দি পাইথনেস্'।

হাঙ্গেরী পাঠিয়েছে 'কলোনী আণ্ডারগ্রাউণ্ড'। কানাডা থেকে এসেছে ছোট ছবি 'ক্যানাডাজ এরোকনিং নর্থ' 'রেসকু মিশন,' 'আউট্-ল উইদিন' ও 'অপেরা স্কুল'।

পুরানো দিনের স্মৃতি

সংগ্রাহক — তেজেশ গুহরায়

ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (ডিজি)

১২৯৯ সনের ১২ই চৈত্র, ১৩, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটে ডি, জি জন্মগ্রহণ করেন। দেশ বরিশাল জেলায় হলেও চিরকাল তিনি কলকাতায় বসবাস করছেন। স্বর্গীয় বামনচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের চতুর্থ পুত্র হচ্ছেন ডি, জি। তাঁর মা স্বর্গীয়া বিরজামোহিনী দেবী। তাঁরা পাঁচ ভাই ছিলেন। জ্যেষ্ঠা ভ্রাতুষ্পুত্রী হলেন অরুণা আসফ আলী, আর মধ্যমা ভ্রাতুষ্পুত্রী রবীন্দ্রনাথের একমাত্র নাতনী নন্দিতা কৃপালনী। তাঁর কন্যা মণিকাও কিছুদিন চিত্রজগতে প্রবেশ করে যথেষ্ট সুনাম অর্জ্জন করেন কিন্তু বর্ত্তমানে তিনি সংসার জগতে প্রবেশ করে চিত্রজগৎ থেকে বিদায় নিয়েছেন।

অল্প বয়সেই ডি জি শান্তিনিকেতনে শিক্ষা সুরু করেন। ইতিহাসের শিক্ষক ছিলেন স্বয়ং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁদের ইতিহাস পড়া হ'ত অভিনয় করে—যেমন কেউ সাজাহান হয়ে সিংহাসনে বসে আর একজনকে ডেকে কথা বলছেন—তিনি হয়ত দারা সেজেছেন। দারা অভিনয় করে ঔরঙ্গজেবের কীর্ত্তি সাজাহানের কাছে বলে গেলেন। অভিনয়ের ভিতর দিয়ে শিক্ষালাভ করা হ'ত। সন্ধ্যায় গানের ও অভিনয়ের রিহার্স্যাল হ'ত এবং প্রায় রোজই কোন না কোন নাটক অভিনীত হো'ত। বাল্মীকিপ্রতিভা, ভাস্কর বিসর্জ্জন, রাজারাণী প্রভৃতি নাটকই তাঁরা বেশী অভিনয় করতেন। কবিগুরু স্বয়ং তাঁদের সঙ্গে অভিনয় করতেন। অভিনয়ের দিকে ডি, জি-র বেশী ঝোঁক ছিল। আর একটা অভ্যেস তাঁর ছিল, সেটা হচ্ছে অঙ্কের খাতায় অঙ্কের পরিবর্ত্তে ছবি আঁকা—এর জন্য তাঁকে শাস্তিও ভোগ করতে হয়েছিল যথেষ্ট। যিনি অঙ্কের শিক্ষক ছিলেন, তাঁর কালো কুচকুচে মাঝারী ধরণের দাড়ি, গোল গোল বড় বড় চোখ—তার ওপর আবার নিকেলের চশমা। এ হেন বিশেষ চেহারার ছবি আঁকবার লোভ তিনি প্রায়ই সম্বরণ করতে পারতেন না, অবিশ্যি শাস্তিও তাঁকে পেতে হ'ত সঙ্গে সঙ্গেই। যাই হোক শেষ পর্য্যন্ত শান্তিনিকেতন থেকে পাশ করে Scottishchurch College-এ গিয়ে ভর্ত্তি হলেন কিন্তু কিছুদিন পরে অভিভাবকদের না জানিয়েই Art School-এ ভর্ত্তি হবার জন্য তোড়জোড় করতে লাগলেন। তখন Govt. Art School-এর অধ্যক্ষ ছিলেন শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। অভিভাবকদের বাধা সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলো—কাজেই Govt. Art School-এর আশা তাঁকে ত্যাগ করতে হো'ল। Jubilee Art School নামে একটা ভাল প্রতিষ্ঠান ছিল—অধ্যক্ষ ছিলেন স্বর্গীয় রণদাপ্রসাদ দাশগুপ্ত। অঙ্কনে তাঁর মত পারদর্শী তখনকার দিনে খুব কমই ছিল। Art School-এ ডি, জি-র সমপাঠী ছিলেন ৺হেমেন্দ্র মজুমদার, বসন্ত গাঙ্গুলী, সতীশ সিংহ প্রভৃতি প্রখ্যাত শিল্পীবৃন্দ। এই স্কুলের চার বছর সময়ের মধ্যে সহপাঠী বন্ধুদের নিয়ে রিজিয়া, বিল্বমঙ্গল, সংসার, রঘুবীর প্রভৃতি আরও কয়েকখানি নাটক অভিনয় করেন। একবার 'রিজিয়া' নাটক অভিনয় করবার সময় একটা মজার ঘটনা ঘটেছিল। নাটকের সবই জোগাড় হয়েছে কিন্তু সখীর দল পাওয়া যায় নি। তখনকার দিনে সিন্ ও ড্রেসের মত সখীও ভাড়া পাওয়া যেত। যারা সখী সাজতো তাদের বয়স হোত দশ থেকে পনেরো-ষোলো বছর পর্য্যন্ত। এমনি একটি সখী একটা দৃশ্যে নাচবে এবং তারপরেই ডি, জি 'কে সুন্দরী লয়ে সহচরী কেলি করে বনমাঝে' বলে প্রবেশ করবেন। যখন তিনি প্রবেশ করতে যাবেন এমন সময় সখীর খোঁচা খোঁচা দাড়ি সমন্বিত চেহারা, অদ্ভুত পোষাক ও তদুপরি তার unbalanced বক্ষস্থল দেখে তাঁর সুন্দরীর সঙ্গে প্রেমালাপ করা মাথায় উঠে গেছে। যাই হো'ক শেষ পর্য্যন্ত 'কে সুন্দরী……' প্রভৃতি সংলাপ বাদ দিয়েই তিনি প্রবেশ করেন।

নাটকের অভিনয়ে অধ্যক্ষকে খুস করে তাঁর কাছ থেকে হল-ঘর আদায় করে নিয়েছিলেন। এইভাবে দিন কাটতে থাকে। চার বছর পরে [illegible] পড়বার ঠিক সেই সময় তিনি Govt. [illegible]

[illegible] হলেন। তখন সেখানকার অধ্যক্ষ ছিলেন Sir Percy Brown, সহকারী অধ্যক্ষ ছিলেন শিল্পী যামিনীপ্রসাদ গাঙ্গুলী। সেখানে গিয়ে থিয়েটার করবার জন্য আবার সবাইকে উৎসাহিত করে তুললেন। Life class-এ পড়ার চেয়ে অভিনয় করবার উৎসাহ ছিল বেশী। একবার ছুটির বন্ধের আগে "বেজায় রগড়" অভিনয় করেছিলেন। সে অভিনয়ে তৎকালীন গভর্ণর লর্ড ও লেডী কারমাইকেলও উপস্থিত ছিলেন। অভিনয় কিছুটা হতেই Sir Percy Brown-এর অনুরোধে কিছুক্ষণ নাটকের বিরাম দিতে হয় কারণ তাঁরা হাসতে হাসতে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। সেই থেকে Sir Percy Brown তাঁকে 'হ্যামলেট' বলে ডাকতেন। সেই সময় কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে 'সঙ্গীত সমাজ' নামে একটা উঁচুদরের ক্লাব ছিল। আজকালকার অনেক নামজাদা এ্যাটর্ণির পিতৃদেবেদের অত্যন্ত প্রিয় ছিল এই ক্লাবটি। এখনও অনেক বয়স্ক এ্যাটর্ণি আছেন যাঁরা তখন এই ক্লাবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। দিনের বেলা School-এ Painting শিখতেন আর সন্ধ্যের সময় পুরোদমে রিহার্সাল দিতেন—এই ছিল ডি, জি-র কাজ। তাঁদের রিহার্সাল দেওয়াতেন চোরবাগানের বিশিষ্ট ব্যক্তি নিবারণচন্দ্র দত্ত মশাই। আজও তিনি বেঁচে আছেন। তাঁর নাম এঁরা রেখেছিলেন 'টিকেদার'; ভদ্রলোক অত্যন্ত রসিক ছিলেন। একবার ডি, জি তাঁর এক বন্ধুকে নিয়ে গেছেন রিহার্সাল দেখাতে। তাঁকে দেখে টিকেদার মশাই গড়গড়া টানতে টানতে বললেন 'মশায়ের নাম?' উত্তর হোল, 'অসিতরঞ্জন ভট্টাচার্য্য।'

'থাকা হয় কোথায়?'

'আজ্ঞে, ২১ নম্বর চাষা ধোপাপাড়া লেনে।'

'ব্রাহ্মণ হয়ে চাষা ধোপাদের পাড়ায় থাকা হয় কি রকম?'

বন্ধুটি বড় লজ্জায় পড়ে গেলেন। বন্ধুকে লজ্জা থেকে বাঁচাতে ডি, জি চট করে বলে বসলেন, 'আজ্ঞে স্যার ভদ্র হয়ে চোরবাগানে থাকা হয় কি রকম?'

ভীষণ হাসির রোল উঠে যায় সেখানে।

(ক্রমশঃ)

মুভিল্যাণ্ড কিমলের 'মানদর্পণ' চিত্রে শ্রীমতী পূর্ণিমা

এ ভি এম-এর মুক্তি-প্রতীক্ষিত 'বাহার' চিত্রের একটি নৃত্যগীতময় দৃশ্য
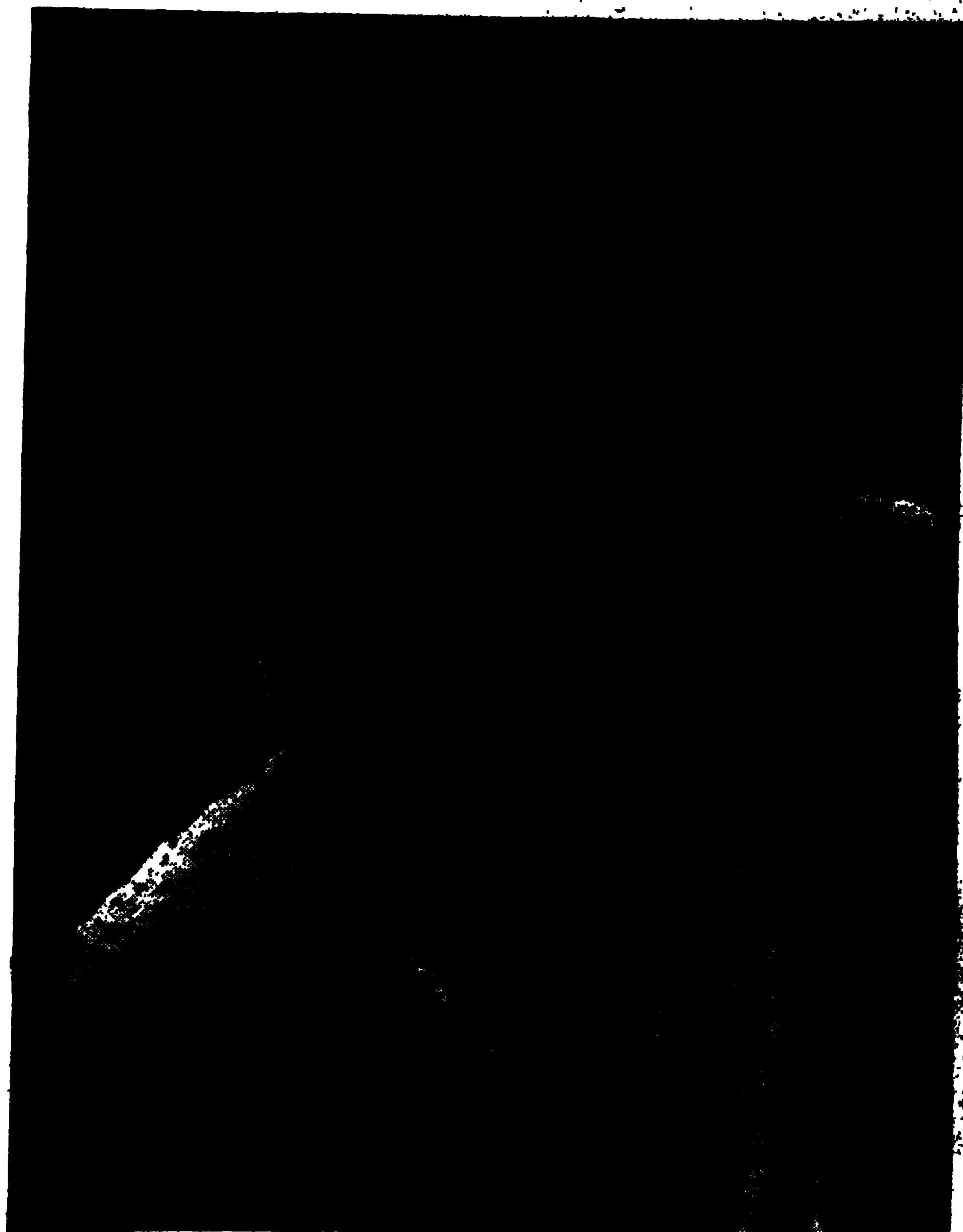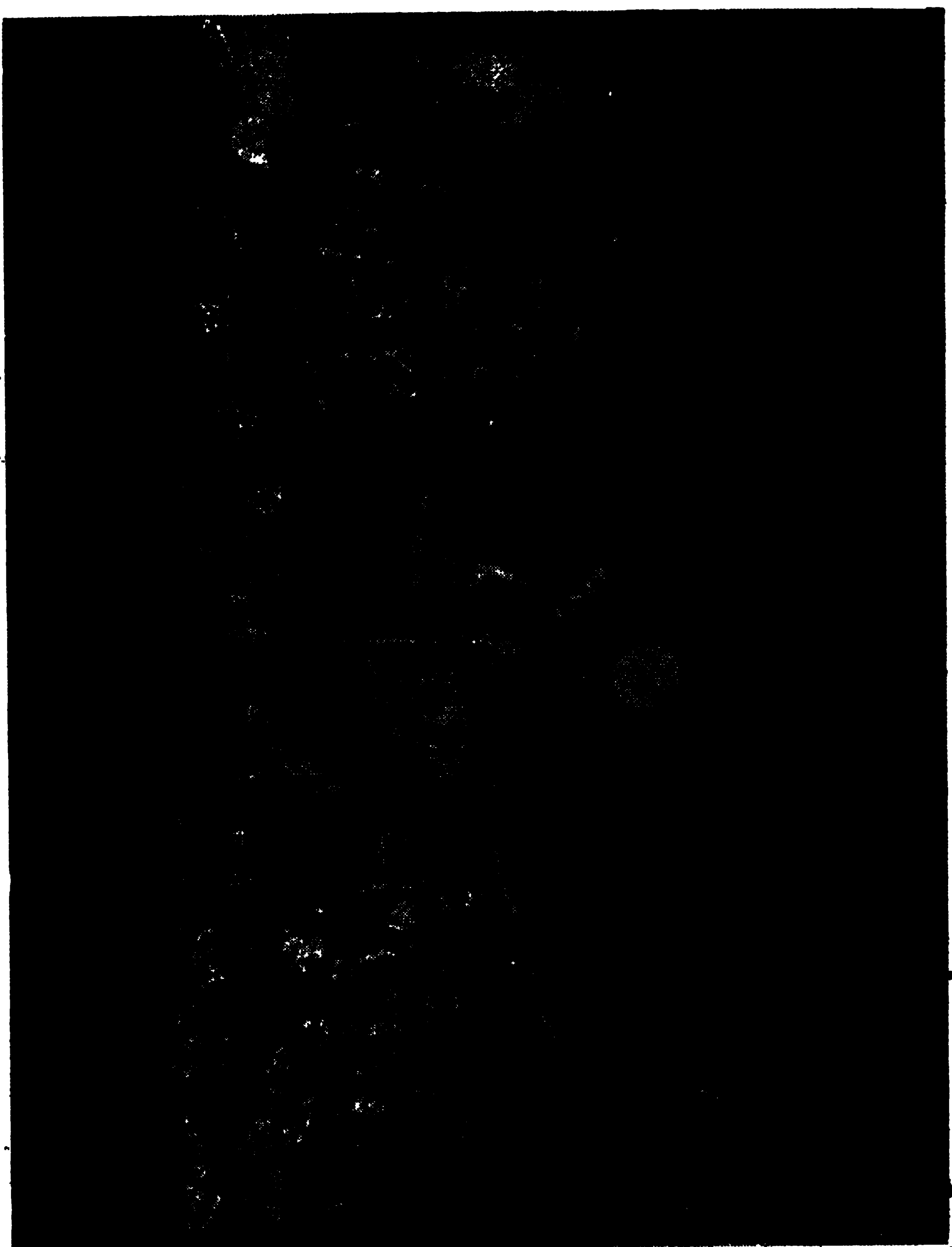
গান্ধীজীর জীবনীচিত্র

মহাত্মা গান্ধীর জীবন-কাহিনী অবলম্বনে গ্যাব্রিয়েল পাস্কালের প্রযোজনায় 'দি লাইফ অব্ গান্ধী' নামে যে ছবিটি তোলা হবে, এখন জানা যাচ্ছে তার আসল চিত্র-গ্রহণ কার্য্য আরম্ভ হবে আগামী বছরের গ্রীষ্মে। এ সংবাদটি জানা গেছে তাঁরই প্রতিনিধি গেজা হারজেগের কাছ থেকে।

ভারতবর্ষে ছ'মাস এবং দক্ষিণ আফ্রিকাতে ছ'মাস স্যুটিং হবে। মহাত্মা গান্ধীর আত্মজীবনী এবং তাঁর আর একখানি বই 'সত্যাগ্রহ ইন সাউথ আফ্রিকা'র ওপর ভিত্তি ক'রেই এই ছবির কাহিনী রচিত হয়েছে। শেষোক্ত পুস্তকটির কপিরাইট শ্রীযুক্ত পাস্কালেরই।

এই ছবির জন্যে ৫০ লক্ষ ডলার খরচ করা হবে। নবজীবন ট্রাষ্টের সঙ্গে লভ্যাংশের ভাগাভাগি ছাড়াও আয়ের অপর মোটামুটি অংশ গান্ধী স্মৃতি ভাণ্ডারেও প্রদত্ত হবে বলে জানা গেছে। যৌবনে গান্ধীজী কিছুকাল দক্ষিণ আফ্রিকায় আইন ব্যবসায় করেছিলেন। প্রকাশ, ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহেরু ছবিখানি সম্পর্কে ব্যক্তিগতভাবে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

ছবিখানির কাহিনী রচনা করছেন গেজা হারজেগ। বর্ত্তমানে তিনি দিল্লীতে আছেন ব'লে 'হেরল্ড ট্রিবিউন' জানিয়েছেন। তাঁর এই কাজে সহায়তা করছেন গান্ধীজীর পুত্র, 'হিন্দুস্থান টাইমসে'র সম্পাদক দেবদাস গান্ধী এবং গান্ধীজীর পুরাতন অন্তরঙ্গ সহকর্মী পিয়ারেলাল।

ছবিখানি তোলবার জন্য আমেরিকান প্রযোজক ও পরিচালক গ্যাব্রিয়েল পাস্কালের শীঘ্র ভারতে আসবার কথা আছে।

সুরাইয়া ও সেন্সর

আজকাল ছবিতে তারকাদের স্বল্প এবং স্বচ্ছ পোষাক-পরিচ্ছদ ব্যবহারের যেন একটা চাহিদা এসেছে। এক সংবাদে জানা গেল, সুরাইয়ার কাছে ঐ রকম যথাসম্ভব স্বল্প পরিমাণ পোষাক ব্যবহারের কথা বলা হয়েছিল, কিন্তু 'জানোয়ার' ছবির চিত্রগ্রহণকালীন এক সেটে সুরাইয়া ঐ রকম নির্দ্দেশ পালনে অসম্মতি জানান। এ দেশের চিত্রতারকারা যদি সুরাইয়ার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেন তাহলে সেন্সর কর্ত্তৃপক্ষের কাজের অনেক ঝামেলা কমে যায়!

নার্গিসের হালচাল

'হালচাল' ছবির ব্যাপারে যে-ঘটনা ঘটেছিল তার পর থেকে নার্গিস আর তাঁর বিপরীত পুরুষ ভূমিকায় দিলীপকুমারের সঙ্গে নামতে রাজী হচ্ছেন না। কে. বি. লালের প্রযোজনায় 'আজরে' নামে ছবিতে নার্গিসের বিপরীত পুরুষ ভূমিকায় দিলীপকুমারকে নেওয়ার কথা হ'লে নার্গিস আপত্তি জানান। শ্রীযুত লাল নতুন নায়ক নিয়েছেন ঐ ছবির জন্যে।

হারজেগের হার

'দি লাইফ অব্ গান্ধী' ছবির কাহিনীকার গেজা হারজেগ ভারতীয় ছায়াছবি এবং প্রযোজকদের সম্বন্ধে কতকগুলি অশোভন উক্তি করায় সম্প্রতি তাঁকে এখানকার সাংবাদিকদের কঠোর সমালোচনা হজম করতে হয়েছে।

আনারকলি ও মধুবালা

কমল আমরোহীর 'আনারকলি' ছবিতে মধুবালাকে নির্ব্বাচিত করা হয়েছিল, কিন্তু পরে মধুবালা নিজের ইচ্ছামতো তাঁর নাম প্রত্যাহার করেন। এরও পূর্ব্বে

মধুবালার পিতা আতাউল্লা খাঁ ও কমল আমরোহীর মধ্যে বচসার ফলে ব্যাপারটি আরও তিক্ত হয়ে উঠেছে।

ভারতে বিদেশী চিত্রনাট্যকার

'লাইফ অব্ এমিল জোলা' ছবির চিত্রনাট্যকার হাঙ্গেরী-প্রবাসী হেরসিমকা মহাত্মা গান্ধীর জীবনী অবলম্বনে যে-ছবি গৃহীত হবে তার চিত্রনাট্য রচনার কাজে ব্যাপৃত আছেন। সোরাব মোদী তাঁর 'ঝাঁসী-কী-রাণী' ছবির ইংরাজী সংস্করণে পণ্ডিত সুদর্শনকে সাহায্য করার জন্যে হেরসিমকীর সঙ্গে এক চুক্তি সম্পাদন করেছেন।

মাদ্রাজের নবতম প্রচেষ্টা

ভারতীয় ছায়াছবির কলাকৌশলের উন্নতি বিধানের জন্যে মাদ্রাজে এ্যাকাডেমী অব্ মোশান পিক-চার্স জাতীয় প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রচেষ্টা চলছে। এটি আমেরিকান মোশান পিকচার এ্যাকাডেমীর অনুকরণে করবার চেষ্টা হয়েছে। দক্ষিণ ভারতের কলাকুশলীদের অষ্টম বার্ষিক সম্মেলনে তাঁরা একটি জিনিষের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন, সেটি হ'ল চলচ্চিত্রের চারুকলা ও কলাকৌশলগত উন্নতি বিধানের জন্য এক পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রস্তুত করা।

'এম্-জি-এম্'-এর রবদল

মেট্রো-গোল্ডউইন-মায়ার ষ্টুডিওর লুই বি মায়ার সম্প্রতি ঐ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্রব ত্যাগ করেছেন। এই সঙ্গে নিউইয়র্কের লোয়েজ ইনকরপোরেটেড প্রতিষ্ঠানের সভাপতি নিকোলাস শেঙ্ক নিম্নলিখিত বিবৃতিটি প্রচার করেছেন; উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানটির কর্তৃত্বাধীনেই মেট্রো-গোল্ড উইন-মায়ার পরিচালিত হয়ে থাকে।

'১৯২৪ সাল থেকে শ্রীযুত মায়ার মেট্রো-গোল্ডউইন-মায়ার ষ্টুডিওর' কার্য্যক্রমের সর্ব্বময় কর্ত্তা হিসাবে কাজ ক'রে আসছিলেন। এই সময়ের মধ্যে যেসব ছবি পৃথিবীর চিত্রশিল্পে অভিনবত্ব সঞ্চার করেছে সেগুলির অধিকাংশ মেট্রো-গোল্ডউইন-মায়ার ষ্টুডিওতে প্রস্তুত হয়েছে। শ্রীযুত মায়ার চিত্রশিল্পে নেতৃত্ব এবং উদ্দীপনার সঞ্চার করেছেন; এখন লোয়েজ প্রতিষ্ঠান থেকে বিদায়-কালে তাঁর ভবিষ্যৎ কার্য্যাবলীর সাফল্য এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য কামনা করি।' এখানে প্রসঙ্গতঃ বলা চলে, যে তিন জন কর্ণধারের নাম-অনুসারে 'এম-জি-এম' নামকরণ হয় তাঁরা তিনজনই আজ এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্রবহীন হলেন।

ভারত ছাড়ো

হিন্দী চিত্রজগতের অন্যতম জনপ্রিয় চিত্রতারকা এবং দিলীপকুমারের ভ্রাতা নাসির খাঁ দেশবিভাগের সময় পাকিস্তানের প্রজা হিসেবে থাকবার জন্য পাকি-স্তানে চলে গিয়েছিলেন এবং তাঁর ভাই-এর প্রযোজিত ছবিগুলির পরিবেশনার স্বত্ব লাভ করে করাচীতে বেশ ব্যবসা চালাচ্ছিলেন। কিন্তু বেশীদিন সেরকম ভালভাবে তাঁর ব্যবসা চললো না। পরে ছ'মাসের এক বিশেষ অনুমতিপত্র নিয়ে ভারতে আসেন। এই সময়টুকুর মধ্যে তিনি আর্থিক সাফল্য অর্জ্জন করেন। বর্ত্তমানে তিনি একসঙ্গে দশখানি ছবিতে কাজ করছেন এবং ছবি পিছু গড়ে পঞ্চাশ হাজার টাকা করে পাচ্ছেন। এখন মুস্কিল হয়েছে তাঁর ভারতে অবস্থান করার সময়ের মেয়াদটি উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে। বোম্বাই-এর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই নাসিরের ভারতে অবস্থানের মেয়াদ বাড়ানোর অক্ষমতা জানিয়েছিলেন। সম্প্রতি অবশ্য ভারত ছাড়ার এই আদেশ প্রত্যাহৃত হয়েছে।

পোষ্টার সেন্সরের পালা

সম্প্রতি দিল্লীর চিত্র-পরিবেশক ও সেন্সর কর্ত্তৃপক্ষের মধ্যে ছবির পোষ্টার ব্যবহার করার ব্যাপার নিয়ে কিছু গোলযোগ হয়। 'হালচাল' ছবির পোষ্টার ব্যবহার নিয়েই এর সূত্রপাত হয়। জানা গেল, দিল্লীর শাসন কর্ত্তৃপক্ষ নির্দ্দেশ দিয়েছেন যে এখন থেকে সকল ছবির প্রচারার্থে সব পোষ্টার ব্যবহার করার আগে সেন্সর করিয়ে নিতে হবে। এই প্রসঙ্গে আরও জানা যায় যে, 'শবনম' এবং 'নও জোয়ান' ছবির পোষ্টারগুলিকে দিল্লীর কর্ত্তৃপক্ষ সেন্সর করে ছাড়েন।

ফিল্ম ফিনান্স

গ্রেট ব্রিটেনের ন্যাশনাল ফিল্ম ফিনান্স কর্পোরেশান তাঁদের বার্ষিক কার্য্যবিবরণীতে প্রকাশ করেছেন যে, তহবিলের ৬০ লক্ষ পাউণ্ডের মধ্যে ৫১ লক্ষ ৩৮ হাজার ৫০ পাউণ্ড ইতিমধ্যে বোর্ড অব্ ট্রেড কর্ত্তৃক অগ্রিম হিসাবে দেওয়া হয়ে গেছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে যে সরকার যদি আরও অর্থ মঞ্জুর না করেন তাহলে আগামী বছরে এক সঙ্কটের সম্মুখীন হতে হবে।

বলা হয়েছে পরিশোধ হিসেবে তাঁরা ফেরৎ পেয়েছেন মাত্র ৪ লক্ষ ৯৮ হাজার ২৮ পাউণ্ড; তাঁদের অর্থসাহায্যে গঠিত, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের তোলা ২৬টির মধ্যে মাত্র ১২ খানি ছবি আর্থিক মনাফা সংগ্রহ করতে সমর্থ হবে।

'প্রভাতে'র পুনর্জ্জন্ম

চিত্র প্রযোজক প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে বোম্বাই-এর প্রভাত ও কলকাতার নিউ থিয়েটার্স সেরা ছবির প্রযোজক হিসেবে সমধিক প্রসিদ্ধ। 'প্রভাত' চিত্র-প্রতিষ্ঠানের দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়ার সংবাদে অনেকেই নিরাশ হয়ে পড়েছিলেন। শ্রীএস্. আর. কুলকারণী তাঁর অংশের ৪ লক্ষ টাকা কিস্তিবন্দীতে নেবার ব্যবস্থা করে তাঁর অংশীদারের স্বত্ব ছেড়ে দিতে রাজী হয়েছেন। নবগঠিত ব্যবস্থাপনার মূলে রয়েছেন শ্রীবাবুরাও পাই এবং তাঁর সহযোগী হয়েছেন শ্রীডামলে এবং শ্রীফতে-লাল। জানা গেছে, ষ্টুডিও ভাড়া দেওয়া ছাড়াও প্রভাত প্রতিষ্ঠান নিজেরাও ছবি তুলবেন।

ওঝার ছবি

ভারতীয় চলচ্চিত্রশিল্পের ইতিহাসে এই দ্বিতীয়বার এক প্রতিষ্ঠান বহির্দৃশ্যগ্রহণের জন্য এরোপ্লেন যোগে বিদেশে গেলেন। এ ব্যাপারে অগ্রগণ্য হলেন প্রযোজক-পরিচালক শ্রীএস্. কে. ওঝা। 'নাজ' ছবিটি তোলা হচ্ছে এবং এটির কাহিনী-অংশ গঠিত হয়েছে কায়রোতে সংঘটিত ঘটনাবলীকে কেন্দ্র করে। লোকেশান স্যুটিং-এর জন্য শ্রীযুত ওঝা তাঁর ছবির প্রধান দু'জন শিল্পী নলিনী জয়ন্ত ও অশোককুমারকে নিয়ে এরোপ্লেনে সেখানে যান। সঙ্গে নিয়ে যান রেকর্ডে গৃহীত গান। সেখানকার ক্যামেরাম্যানদের সাহায্য নিয়ে ঐ নির্দ্দিষ্ট দৃশ্যগুলি তোলা হয়। সেখান থেকে তাঁরা যান লণ্ডনে—লোকেশান স্যুটিং-এর জন্য। বোম্বাই-এর চিত্র-শিল্পের রথীরা তাঁদের বিদায়-সম্ভাষণ জানাবার জন্যে বিমান-ঘাঁটিতে উপস্থিত ছিলেন।

ওয়াশিংটনে 'দি রিভার' চিত্রের প্রথম প্রদর্শনী

গত ৩০শে অক্টোবর মঙ্গলবার রাত্রে বিশেষ জাঁকজমকের সঙ্গে 'রিভার' নামক ছায়াচিত্রখানি শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী ও তাঁর অতিথিবর্গকে প্রদর্শিত হয়। ভারত সম্বন্ধে ভারতে প্রস্তুত ঐ রঙীন ছবি-খানির ওয়াশিংটনে এটিই প্রথম প্রদর্শনী।

মার্কিন প্রযোজকদের তোলা এই ছবিখানি সর্ব-প্রথমে প্রদর্শিত হয় নিউইয়র্কে। নিউইয়র্কের চলচ্চিত্র সমালোচকগণের কাছ থেকে ছবিখানি উচ্চ প্রশংসা লাভ করে—ওয়াশিংটনের সমালোচকগণও এটির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

ওয়াশিংটনে ছবিখানির প্রথম প্রদর্শনীতে সরকারী ও বে-সরকারী মহলের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি আমন্ত্রিত হন।

পৃথিবীর প্রথম ভাসমান বেতারকেন্দ্র

সমুদ্রের ওপর থেকে পাঁচখানি দ্রুতগতিশীল জাহাজের সাহায্যে পৃথিবীর প্রথম ভাসমান বেতার-বার্ত্তা প্রেরণ কেন্দ্রের ব্যবস্থা করেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার। এখান থেকে পৃথিবীর যে-কোন জায়গায় 'ভয়েস্ অব আমেরিকা' নামক অনুষ্ঠান বেতার যোগে পাঠাবার কাজ চলছে। একখানি জাহাজ থেকে এই কাজের জন্য মার্কিন সরকার অনুমতি দিয়েছেন এবং ৯৭০ লক্ষ ডলার ব্যয়ে বাকী চারখানি জাহাজ নির্ম্মাণের জন্য মার্কিন সরকারের অনুমোদন লাভের অপেক্ষায় আছে।

এই বেতার কেন্দ্রের প্রধান উদ্দেশ্য হল 'লৌহ আবরণী'র অন্তরালবর্ত্তী দেশগুলি থেকে যেসব বেতার-

বার্তা প্রেরিত হয় সেগুলিকে বাধা দেওয়া, যাকে এক কথায় বলা হয় 'অপারেশান ভ্যাগাবণ্ড'। এগুলি খুবই শক্তিশালী বেতার-প্রেরক কেন্দ্র, তার ওপর এগুলি যেখানে খুশী সেখানেই যেতে পারে।

নাট্যাভিনয়ের জন্য ষ্টুডিও

ব্রিষ্টল বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্য বিভাগের তত্ত্বাবধানে নাট্যাভিনয় শেখাবার জন্যে সেখানে একটি ষ্টুডিও তৈরী করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের 'গ্রেট হলে'র পাশেই এটি ৫,৮০০ পাউণ্ড খরচ করে তৈরী হোচ্ছে আর এই টাকাটার বেশীর ভাগই রকফেলো প্রতিষ্ঠান থেকে পাওয়া যাচ্ছে।

মাত্র ১৫ মিনিটের মধ্যেই মঞ্চের ওপর পর্দ্দা ইত্যাদি খাটিয়ে একটি ক্লাস-রুমে পরিণত করা যায়। 'এরেনা' জাতীয় মঞ্চ তৈরী হোয়ে যায় এবং তিন দিকে দর্শকরা বসতে পারে। ষ্টুডিওটি লম্বায় ৫৫ ফিট এবং চওড়ায় ৪৫ ফিট এবং এখানে ১২০ জন দর্শকের স্থান হতে পারে। এই বিভাগে ৪৬ জন শিক্ষার্থী আছে, সাধারণ 'আর্টসে'র ডিগ্রী ক্লাসের জন্য যে কোন তিনটি বিষয়ের মধ্যে নাট্যাভিনয় বিষয়টি নিতে পারা যায়। নাটকাভিনয় ছাড়া অন্যান্য প্রমোদানুষ্ঠানের ব্যবস্থাও আছে। দুটি সাজঘর আছে। নাটকাভিনয়াদি যাতে বেতারের সাহায্যে প্রচার করা যায় বা টেলিভিশানের মাধ্যমেও প্রচার করা যায় তারও চেষ্টা চলছে। সাজঘরের নীচে ছায়াছবি দেখাবারও একটি ব্যবস্থা আছে। এই মঞ্চে সাধারণ রঙ্গালয়ের মত জনসাধারণের উদ্দেশ্যে অভিনীত সাধারণ কোন নাটকাদি মঞ্চস্থ করা চলবে না।

বেঙ্গল মোশান পিক্চার প্রডিউসার্স এ্যাসোসিয়েশন

গত ২রা অক্টোবর কলকাতায় ভারত ভবনে চিত্র-প্রযোজক প্রতিষ্ঠানের এক বৈঠক হয়। এই বৈঠকে বাংলা চলচ্চিত্রের বহুমুখী সমস্যার কথা আলোচিত হয় এবং সর্বসম্মতিক্রমে একটি সমিতি গঠনের কথা উল্লেখ করা হয়। তদনুযায়ী ঐ বৈঠকে 'বেঙ্গল মোশান পিকচার প্রডিউসার্স এ্যাসোসিয়েশন' নাম দিয়ে এই সমিতির পত্তন হয়।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ কর্মকর্তা নির্বাচিত হন—প্রেসিডেন্ট : শ্রীদেবকীকুমার বসু; ভাইস-প্রেসিডেন্ট : শ্রীএস আর হেমাদ, শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুশীল মজুমদার; সেক্রেটারী : শ্রীরবিপ্রসাদ গুপ্ত; এ্যাসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারী : শ্রীসুখেন্দু বসু ও শ্রীখগেন রায়; ট্রেজারার : শ্রীএস এল কারনানী; কার্য-নির্বাহক সমিতির সভ্য : শ্রীমতী কানন দেবী, শ্রীমতী সুনন্দা দেবী, শ্রীমণি গুহ, শ্রীসরোজ মুখার্জি, শ্রীসত্যেন বসু, শ্রীএস বি দত্ত, শ্রীছবি বিশ্বাস, শ্রীগোবিন্দ রায়, শ্রীপশুপতি চ্যাটার্জি, শ্রীবি ডি দত্ত, শ্রীনীরেন লাহিড়ী ও শ্রীসতীশ দাসগুপ্ত।

সম্প্রতি এর নাম বদলে হয়েছে 'ইণ্ডিয়ান ফিল্ম প্রোডিউসার্স এ্যাসোসিয়েশান।'

কারদার-টেরেসা-কলিনস প্রতিযোগিতা

কার্দার-কলিনস্ প্রতিযোগিতার ফল সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। এই প্রতিযোগিতায় বোম্বাই থেকে মিস্ পিস কানওয়াল ও কলকাতা থেকে মিঃ সহদেব রাণা প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। বিচারক ছিলেন বোম্বাইয়ের মেয়র শ্রীএস কে, পাতিল; এ, আর, কার্দার ও লী, ক্যামার্ণ। যাঁরা এই প্রতিযোগিতায় ফাইনালে পৌঁছেছিলেন, গত ১২ই অক্টোবর মিঃ লী ক্যামার্ণ তাঁদের বোম্বাইয়ের মেট্রো সিনেমায় উপস্থিত দর্শকদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। ঐ দিন ছিল 'টেরেসা' ছবির মুক্তি-দিবস। প্রতিযোগিতার সর্ত্ত অনুযায়ী প্রথম স্থানাধীকারীরা গত ২৭শে অক্টোবর ইতালীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন এবং দু'সপ্তাহে ইতালীর রোম, ফ্লোরেন্স, পিসা, জেনোয়া, স্যানরেমো, র‍্যাপালো ও ভ্যানিস প্রভৃতি সহর পরিভ্রমণ করে ভারতে ফিরে কার্দার ষ্টুডিওতে কাজে যোগ দেবেন।

এই প্রতিযোগিতায় জয়ীদের মধ্যে মিস্ পিস্ কানওয়াল মেডিকেল ষ্টুডেন্ট, জন্ম লাহোরে, বয়স বিশ বছর। আর মিঃ সহদেব রাণা নেপালের অধিবাসী, বয়স

বাইশ বছর। গত ১৩ বছর থেকে তিনি কলকাতায় আছেন। প্রকাশ, মিঃ রাণা নেপালের রাজার নিকট-আত্মীয়। কলকাতার প্রথম স্থানীয়দের মধ্যে মিস্ অনিতা গুহ ও মিস শীলা কাপুর কার্দারের পরবর্তী চিত্রের জন্য নির্বাচিত হয়েছেন।

এইচ এম ভি-কারুসো শিল্পী নির্বাচন

এইচ এম, ভি এবং 'দি গ্রেট কারুসো'-র নির্মাতা এম জি-এম-এ'র উদ্যোগে সঙ্গীত-শিল্পী নির্বাচনের চূড়ান্ত বিচার ২১শে নভেম্বর সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে। প্রায় ১৪০০ গায়ক-গায়িকা এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করেন এবং ১২ দিন ধরে প্রায় ১২০০ জনের গান শোনা হয় বাঙলা ও হিন্দুস্থানীতে। তাঁদের মধ্যে থেকে যে পাঁচজনকে বিজয়ী বলে ঘোষণা করা হয়, তাঁরা হলেন: শ্রীমতী সাধনা কর, শ্রীনির্মল প্রামাণিক, শ্রীমতী গীতা মুখোপাধ্যায়, গীতশ্রী আরতি বসু ও জনাব জমীল হায়দার। এই প্রতিযোগিতার সর্ত্ত অনুসারে এইচ এম ভি এই পাঁচজনের সঙ্গে গান রেকর্ড করার চুক্তি করেছেন।

গত ২১শে নভেম্বর মেট্রোর বাত্রির প্রদর্শনীতে ম্যানেজার জনাব হাফেসজী বিজয়ী শিল্পীদের সঙ্গে দর্শকদের পরিচয় করিয়ে দেন। শিল্পীরা প্রত্যেকে একখানি করে গান শোনান।

কোরিয়ায় মিঃ ফ্লিন্

জ্যাক বেনী ও এরল ফ্লিন্ কোরিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছেন—কোরিয়ায় ইউ, এন, ও-র সৈনিকদের আমোদ-প্রমোদ বিতরণের জন্য। এঁদের দলে আছেন মোট আটজন অভিনেতা—তাঁদের কেউ এসেছেন মঞ্চ-জগৎ থেকে, কেউ চিত্রজগৎ আর কেউ বা রেডিও জগৎ থেকে।

বিখ্যাত বেতারশিল্পীর তিরোধান

গত ১৭ই নভেম্বর অপরাহ্ণ ৩টার সময় বিখ্যাত সেতারশিল্পী ওস্তাদ ওয়ালিউল্লা খাঁ সাহেব তাঁর মেটিয়াবুরুজস্থ বাসভবনে পরলোকগমন করেছেন। কয়েক বছর থেকেই তিনি ব্লাডপ্রেসার এবং পক্ষাঘাত রোগে ভুগছিলেন। গত তিন মাস থেকে তাঁর অবস্থা মোটেই ভাল যাচ্ছিল না। ইনি বিখ্যাত ওস্তাদ কৌকুভ খাঁর পুত্র এবং ওস্তাদ কেরামতুল্লা খাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র মৃত্যু-কালে তাঁর বয়স ৫৮ বছর হয়েছিল।

ব্রিটেনে ভারতীয় ছবি

মার্চেণ্ট নেভি ওয়েলফেয়ার ক্লাব গ্লাসগোতে ভারতীয় ও পাকিস্থানী নাবিকদের জন্য একটি ক্লাব খুলেছেন। ইতিপূর্বে বার্কেনহেড্, লিভারপুল, এ্যাডন মাউথ, হাল এবং টিলাবারীতে আরও পাঁচটি ক্লাব খোলা হয়েছে। এই সমিতি সাধারণতঃ নাবিকদের ভারতীয় ছবি প্রদর্শন করেন। এই সমিতির সেক্রেটারী বলেন, ৪ খানা হিন্দী ও বাংলা ছবি ভাড়া করার জন্য বোর্ড পনেরো হাজার টাকা আলাদা করে রেখেছেন। তিনি আরও বলেন, নাবিকদের প্রমোদবিধানের জন্য আরও অনেক কিছু করা যেতে পারত যদি ভারতীয় ছবি অল্প পয়সায় পাওয়া যেত। তিনি বলেন, যদি ভারতীয় ছবির নেগেটিভ তাঁরা পান তবে বৃটেনে তাঁরা তা মাত্র ১৩০ টাকায় প্রিণ্ট করিয়ে নিতে পারেন।

বিদেশে ছবি চালু করার জন্য আমাদের যে প্রযোজকরা আগ্রহশীল, এ সংবাদে তাঁরা আশান্বিত হবেন।

গার্বোর পুনরাবির্ভাব

বহুকাল পরে গ্রেটা গার্বোর ছবিতে আবার অবতরণ করার সম্ভাবনা হয়েছে যদি জেরি ওয়াল্ড ও নর্মাণ ক্রস্নার "লাইফ অফ ডিউস" ছবিখানিতে নামতে রাজী হন। ডিউস ফ্রান্সের অমর অভিনেত্রী এবং গার্বোর ওপরে তাঁর প্রভাবও আছে।

এডিনবরা উৎসবে ভারতীয় ডকুমেণ্টারী

এডিনবরায় সম্প্রতি যে পঞ্চম আন্তর্জাতিক সঙ্গীত ও নাটকোৎসব অনুষ্ঠিত হ'য়ে গেল (১২শে আগষ্ট থেকে ৯ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত) তাতে ভারতীয় ডকুমেণ্টারী চিত্রগুলি বিশেষ সমাদর লাভ করেছে।

'লেস্ট আই ফরগেট দী' নামক একখানি অতি সুন্দর ভারতীয় ডকুমেণ্টারী চিত্রকে এ বছরের এডিনবরা উৎসবের প্রধানতম আকর্ষণ বলা যেতে পারে। হিমালয়ের পরপারে অবস্থিত বিচ্ছিন্ন প্রদেশ লাদাককে অবলম্বন করে এই ছবিখানি তোলা হয়েছে। 'কেভ টেম্পলস্ অব ইণ্ডিয়া—বুদ্ধিস্ট' নামক চিত্রটিও সাড়ম্বর

বিশেষ প্রশংসা অর্জন করেছে। 'মেওয়ার' নামক চিত্রে উদয়পুরের বিখ্যাত স্থাপত্য নিদর্শনগুলি দেখানো হয়েছে। 'দি ভাইটাল লিঙ্ক' নামক চিত্রে আসাম রেলপথ নির্মাণের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

বৈদেশিক পরিচালকগণ কর্তৃক ভারতীয় জীবন সম্পর্কে প্রস্তুত কয়েকখানি চিত্রও এডিনবরার উৎসবের অন্যতম আকর্ষণ ছিল। তরুণ সুইডিস্ চিত্র-পরিচালক আর্মে সাকস্‌ডর্ফ কর্তৃক কাশ্মীর সম্পর্কে নির্মিত 'দি উইণ্ড এ্যাণ্ড দি রিভার' নামক চিত্রখানি সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। 'ড্রামস অব ইণ্ডিয়া' নামক অপর একখানি রঙীন চিত্রও বিশেষ চিত্তাকর্ষক। এই চিত্রে ভারতের সনাতন কৃষিপদ্ধতি এবং হিন্দু ও মুসলমান-দের জীবনযাত্রা দেখানো হয়েছে।

অতীতের সমাধি

সম্প্রতি বিখ্যাত হলিউড অভিনেত্রী হেডি ল্যামার চতুর্থ স্বামী বরণের সৌভাগ্য লাভ করেছেন। ইতিপূর্বে তিনি তিন-তিন বার বিবাহ করেন, বিয়ের পরেই তিনি তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তি নীলামে বিক্রয়ে মনোনিবেশ করেন। এই সম্পত্তির মধ্যে তাঁর বিবাহের আংটিগুলিও আছে। মোট সম্পত্তির দাম হবে প্রায় ১,০০০,০০০ ডলার। এই আংটিগুলি বাদে ৪৮০টি পোষাক-পরিচ্ছদ ও ৭৫ জোড়া জুতাও নীলামে বিক্রয় হয়।

মোশান পিকচার এ্যাসোসিয়েশান

গত ১২ই আগষ্ট জেমিনী ষ্টুডিওতে দক্ষিণ ভারতের মোশান পিকচার ষ্টুডিও এ্যাসোসিয়েশনের এক বৈঠক হয়। সহর ও মফঃস্বলের ষ্টুডিও কর্তাগণ এই বৈঠকে যোগদান করেন।

চলচ্চিত্রশিল্প আজ যে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে, সভায় তা আলোচনা করা হয় এবং এই প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারী মিঃ আর, এম, সেসাদ্রী সভায় যে কার্য-বিবরণী উপস্থাপিত করেন তা' অনুমোদিত হয়। তারপর সর্বসম্মতিক্রমে সমিতির প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হন মিঃ এস এস ভাসন এবং ভাইস-প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হন শোভনাচল ষ্টুডিওর রায়বাহাদুর শ্রীরাজা ভি, আর, এ এবং পক্ষীরাজ ষ্টুডিওর মিঃ নাইডু। কমিটির সভ্য নির্বাচিত হন মিঃ মেয়াপ্পা চেটিয়ার, মিঃ শ্যামসুন্দরম্, মিঃ নাগি রেড্ডি এবং মিঃ এ, রামিয়া।

সভায়, ষ্টুডিওতে ফ্যাক্টরী এ্যাক্টের প্রয়োগ এবং পূর্ণাঙ্গ চিত্রের দৈর্ঘ্য সম্পর্কে প্রস্তাবিত বিধিনিষেধ সম্পর্কে সমিতির মতামত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের গোচর করার জন্য প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

খানদানি সখ

ছবিতে কাজের সময় ভাল চরিত্রে অভিনয়ের চাইতে অর্থের প্রতি অভিনেতাদের বেশী লোভ, একথা যাঁরা বলেন, তাঁদের ধারণা বদলে যাবে নীচের এই খবরটি পড়ে:—কিছুদিন পূর্বে সিসিল বি, ডি, মিল তাঁর আগামী চিত্র "দি গ্রেটেষ্ট শো অন আর্থ" ছবিতে একটি 'টাইপ' চরিত্রে অভিনয়ের জন্য একজন অভিনেতার সন্ধানে ছিলেন। এক এজেণ্ট এই খবর পেয়ে মিঃ ডি, মিলের নিকট জেমস্ ষ্টুয়ার্টের নাম প্রস্তাব করেন। প্রস্তাব শুনে মিঃ মিল তাঁর কথা হেসেই উড়িয়ে দেন। কারণ তাঁর ধারণা ছিল এই চরিত্রের জন্য যে পরিমাণ টাকা খরচ করা হবে, অভিনেতা জেমস্-এর পক্ষে তা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। এজেণ্ট মিঃ মিল-এর মনোভাব বুঝতে পেরে সব কথা স্পষ্ট করে জানালেন। তিনি জানালেন যে জেমস্ ষ্টুয়ার্ট এমনি একটি চরিত্রে অভিনয়ের জন্য আজীবন প্রতীক্ষা করে আছেন। ছেলেবেলা থেকে তাঁর সখ, একটি ভাঁড়ের চরিত্রে অভিনয় করার। বর্তমানে চরিত্রটিও একটি ভাঁড়েরই—সুতরাং এই অপূর্ব সুযোগ তিনি একমাত্র টাকার জন্য ছেড়ে দেবেন, তা হতেই পারে না। এজেণ্টের সব কথা শুনে মিঃ মিল জেমস্‌কে ঐ চরিত্রে মনোনীত করেন।

সখের জন্য যারা থিয়েটার করে বেড়ান, এ খবরটা তাঁদের কাছে ভালই লাগবে সন্দেহ নেই।

চিত্র-বাণী

রেকর্ড প্রসঙ্গ

শারদীয়ার আকর্ষণরূপে সম্প্রতি সব ক'টি রেকর্ড প্রতিষ্ঠান থেকে নতুন রেকর্ড প্রচারিত হয়েছে। তারই সমালোচনা করছি এবারে।

হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানীর এইচ্ ১৫১৮ রেকর্ডটিতে শ্রীমতী সুপ্রভা সরকারের কণ্ঠে গীত একদিকে 'মন যায় রে যায় ভেসে যায়' ও অপরদিকে 'হায় আঁখি দুটি ওঠে কেন ছলকি'—দুটি গানই বেশ শ্রুতিসুখকর হয়েছে—গান দুটিতে সুরসংযোজনা করেছেন সুরশিল্পী অনুপম ঘটক ও কথা দিয়েছেন গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। এইচ ১৫১৯ রেকর্ডে 'পাত্র' ও 'পাত্রী' শীর্ষক কৌতুক নক্সা দুটি সুরের মাধ্যমে বেশ উপভোগ্য হয়েছে—কথা ও সুর দুই-ই যুগিয়েছেন শিল্পী মনি দাশগুপ্ত। এইচ ১৫২১ রেকর্ডে পান্নালাল বসুর কণ্ঠে গীত দুখানি বাংলা কাওয়ালী গান বাংলা গান হিসেবে বেশ অভিনব হয়েছে। একটি গানের সুর হলো—'ঋতু বসন্ত এলো, ফিরে এলো মধুমাস' অপরটি—'ভালবেসে যে ভুলেছে'। এইচ ১৫২৩ রেকর্ডে শ্রীমতী সাবিত্রী ঘোষের কণ্ঠে গীত দুখানি আধুনিক গান শিল্পীর কণ্ঠদরদে ও সুরের আবেদনে একান্ত হৃদয়গ্রাহী হয়েছে—একদিকে আছে—'কাঙালের অশ্রুতে যে রক্ত ঝরে দেখেও তুমি দেখনা', অপরদিকে আছে—'যাদের ঐ অনেক আছে তুমি তাদের দাও যে দান'; গান দুটিতে সুরসংযোজনা করেছেন অনুপম ঘটক। এইচ ১৫২৪ রেকর্ডে কুমারী অণিমা ঘোষের কণ্ঠে পদাবলী কীর্ত্তন দুখানি পদাবলী গানের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছে—একদিকে আছে—'বঁধু সকলি আমার দোষ।' ও অপরদিকে —'ওহে শ্যাম তুহুঁ সে সুজন জানি।' এইচ্ ১৫২৫ রেকর্ডে শ্রীমতী উৎপলা সেনের গাওয়া দু'খানি 'ভাবসঙ্গীত' এই জাতীয় সঙ্গীত-শ্রোতাদের আকৃষ্ট করবে—প্রথমটি হলো—'আত্মসমর্পণে করি মৃত্যু-পণ', দ্বিতীয়টি হলো—'আমি করবো তিলপাত্র দিব পিণ্ড মাত্র'।

এইচ এম্ ভি প্রতিষ্ঠান যে ক'খানি রেকর্ড প্রকাশ করেছেন তার মধ্যে এই ক'খানি সবিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। এন ৩১৩৭০ রেকর্ডে শ্রীমতী সুপ্রীতি ঘোষের কণ্ঠে গীত একদিকে 'উপায় কি বল ললিতে, অজ জলে কৃষ্ণ পিরীতে' ও অপরদিকে 'সখি গো, কেমনে ভুলিব প্রাণকান্তে'—দুখানি গানই শিল্পীর সুর-মূর্চ্ছনায় সুখশ্রাব্য হয়েছে। এন ৩১৩৭১ রেকর্ডে শ্রীমতী উৎপলা সেনের গাওয়া 'নতুন বৌ' ও 'ফুলশয্যা' শীর্ষক গান দুখানি কথার অভিনবত্বে ও শিল্পীর মধুর কণ্ঠে শুনে বেশ তৃপ্তি পাওয়া যায়। এন ৩১৩৬৭ রেকর্ডে বেচু দত্তের গাওয়া একদিকে 'প্রথম দেখা' শীর্ষক গান ও অপরদিকে 'শেষ দেখা' শীর্ষক গান দুখানিই ভাল হয়েছে। প্রথম গানটির সুরু হলো—'তোমায় আমায় দেখা হল আজো পড়ে মনে' এবং দ্বিতীয়টির সুরু হলো—'তোমায় আমায় শেষ দেখা সেই আজো মনে পড়ে।' এন ৩১৩৬৯ রেকর্ডে গেয়েছেন তরুণ বন্দ্যো-পাধ্যায় 'দুটী ঝরা মুকুল' ১ম ভাগ ও ২য় ভাগ দুটি ভাগ দুদিকে প্রকাশিত হয়েছে। এ-জাতীয় গানে শিল্পীর কণ্ঠমাধুর্য্যের বৈশিষ্ট্য আপন স্থান করে নিতে পারবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। ১ম ভাগের আরম্ভ হলো—'যে কাহিনী ঝরাপাতার মত, হারিয়ে গেল মহাকালের ঝড়ে।' ২য় ভাগের সুরু হলো—'বুঝি, নিয়তি হায় তাদের কথা শুনে আড়াল থেকে হাসলো নিঠুর হাসি।' এন ৩১৩৭৫ রেকর্ডে প্রকাশিত হয়েছে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা থেকে উদ্ধৃত 'বিশ্বরূপ-দর্শন'-এটি রচনা করেছেন বাণীকুমার এবং অংশ নিয়েছেন শিল্পী [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়; এটির রচনা ও আবৃত্তি বেশ ভালই হয়েছে।

কলম্বিয়া রেকর্ড প্রতিষ্ঠান যে ক'খানি রেকর্ড প্রকাশিত করেছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকখানি রেকর্ডের আলোচনা আমরা করবো। প্রথমেই উল্লেখযোগ্য 'ডাক-হরকরা'র জীবন-কাহিনী অবলম্বনে গৃহীত 'রাণার' শীর্ষক দুখানি গান, গীত হয়েছে দুই খণ্ডে। একদিকে গানটির সুরু হলো—'রাণার ছুটেছে তাই ঝুম্ ঝুম্ ঘণ্টা বাজছে রাতে' অপরদিকের সুরু হলো—'রাণার! এ বোঝা টানার দিন কবে শেষ হবে?' গান দুখানি স্বর্গতঃ কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য্যের রচনা এবং সুর দিয়েছেন সলিল চৌধুরী। গান দুখানি গেয়েছেন স্বনামধন্য এবং জনপ্রিয় শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়—তাঁর সুরেলা ভরাট ভাবগম্ভীর কণ্ঠে ও সুর-মূর্চ্ছনায় গান দুটি অপূর্ব্ব হয়েছে। এই রেকর্ডটির নম্বর হলো—জি, ই, ৭৯৪৭। জি, ই ৭৯২৫ রেকর্ডে গেয়েছেন গৌরীকেদার ভট্টাচার্য্য দুখানি আধুনিক গান—একটি হলো—'যদি পথ চেয়েছিলে গো প্রদীপ আমি কেন ছিনু ঘুমায়ে!' এবং অপরটি হলো—'পরদেশী গো যেওনা ফিরে; কাঁদায়ে তোমার পরদেশীরে।'—

দুখানি গান আধুনিক গানের শ্রোতাদের কাছে শ্রুতি-সুখকর লাগবে। জি, ই ৭৯৩৯ রেকর্ডে ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের গাওয়া একদিকে—'দোষ কী বলো, সত্যি কথা বলতে!' এবং অপরদিকে 'দুটো মিষ্টি কথা শুনতে এলাম বৃষ্টি-ঝরা রাতে'—গান দু'খানিতে শিল্পীর কণ্ঠ-বৈশিষ্ট্য বজায় আছে। শ্রীমতী রাধারাণীর কণ্ঠে গাওয়া জি, ই ৭৯৪০ রেকর্ডে দু'খানি কীর্ত্তন গান বিশেষ তৃপ্তিদায়ক ও মর্ম্মস্পর্শী। প্রথম গানটির সুরু হলো—'তুমি একবার ব্রজে চলো ব্রজেশ্বর দিনেক দুইয়ের মতো' এবং অপরটি—'পরাণ বন্ধু তুমি আমার কালিয়া সোনা সাগরে পেয়েছি কত করে কামনা।' জি, ই ৭৯৪৫ রেকর্ডে রবীন মজুমদারের গাওয়া একদিকে 'এই বনছায়া ঐ বাঁকাপথ এরা শুধু হায় জানে' এবং অপরদিকে 'প্রেম সে তো শুধু রূপকথা হয়ে নিশীথ স্বপ্নে রয়'—দুখানি গানই শিল্পীর কণ্ঠে শ্রুতি-মধুর হ'লেও রবীনবাবুর গলার স্বাভাবিক দরদের অভাব বোধ করলাম। গান দুটিতে সুর-সংযোজনা করেছেন—দুর্গা সেন। জি, ই ৭৯৫১ রেকর্ডে দুখানি গান গেয়েছেন গীতশ্রী কুমারী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়—একদিকে আছে—'শুধু জলে লিখে নাম আমি চলে তো গেলাম' অপরদিকে 'যবে একদিন মোর শেষ হয়ে যাবে জীবনের বাকী দিন, দু'খানি গানই শিল্পীর সুমিষ্ট কণ্ঠে শ্রোতাদের চিত্তহরণ করবার ক্ষমতা রাখে। এ দু'খানি গানেও সুর সংযোজনা করেছেন দুর্গা সেন। জি, ই ৭৯৪৯ রেকর্ডে দুখানি রবীন্দ্র-সঙ্গীত গৃহীত হয়েছে দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে—একদিকে আছে—'লহো লহো, তুলে লহো, নীরব বীণাখানি' এবং অপরদিকে 'কেমন করে গান করো, হে গুণী অবাক হয়ে শুনি কেবল শুনি'—দুখানি গানে শিল্পী রবীন্দ্র-সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছেন। 'থিফ্ অব্ ইরাণ' শীর্ষক কৌতুক-নক্সাটি গৃহীত হয়েছে জি, ই, ৭৯৪৬ রেকর্ডে ক্ষিতীশ বসু সম্প্রদায় কর্ত্তৃক—কৌতুকনক্সা হিসাবে উপভোগ করবার এতে কিছুই নেই। জি, ই ৭৯৩২ থেকে জি, ই, ৭৯৩৮ পর্য্যন্ত কয়েকটি রেকর্ডে প্রকাশিত হয়েছে ধর্ম্মমূলক পালানাটক 'ভক্ত হরিদাস'। রচনা ও পরিচর্য্যায় গতানুগতিক ও মামুলী হলেও ভক্তিরসপিপাসু শ্রোতাদের এই পালানাটকটি তৃপ্তি দিতে পারবে ব'লেই আমাদের বিশ্বাস।

নতুন নাটক

ষ্টারে 'বালাজী রাও'

সম্প্রতি বাংলার মুমূর্ষু মঞ্চে একটা ক্ষীণ প্রাণ-স্পন্দনের অনুভূতির মধ্যে যেন পুনরুজ্জীবনের আশা সঞ্চারিত হোচ্ছে। সহরের মৃতকল্প নাট্যালয়গুলি বহুদিন পরে আবার কিঞ্চিৎ তৎপরতার পরিচয় দিচ্ছেন, সচেষ্ট হোয়ে উঠেছেন প্রগতির পথে পা বাড়াতে। গতানুগতিকতার জীর্ণ চক্রাবর্ত্ত ছেড়ে নতুন খাতের বৈচিত্র্যে এই যে অগ্রগমন এটা দর্শক আকর্ষণ অভিপ্রায়ে কোন ব্যবসায়িক নীতিচালও যদি হয় তবুও এটা যে একটা সুদূরপ্রসারী সুফলের শুভলক্ষণ-দ্যোতক তা' হয়তো অকুণ্ঠ মতৈক্যের দাবী ক'রতে পারে। লক্ষণ মিলিয়ে বিচার করলে এবং সেই সঙ্গে আশাবাদী হোলে এই পরিবর্তন প্রয়াসী প্রাথমিক প্রচেষ্টার মধ্যে বাঙলা নাট্যজগতে রেনেসাঁর স্বপ্ন দেখাও কিছু অবাস্তব দিবাকরী নয়।

এতটা আশান্বিত হবার কারণ অবশ্য এখনও ঘটেনি তবে একযোগে বিভিন্ন রঙ্গালয়ে ঐতিহাসিক, সামাজিক ও রূপক প্রভৃতি বিভিন্ন রসাশ্রয়ী নাটকের মঞ্চস্থকরণ এবং দু'একজন খ্যাতনামা সাহিত্যিকের নাট্যসাহিত্যের অপুষ্ট অঙ্গের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ—ইতিপূর্বে একাধিকবার হোয়েছে ব'লে মনে হয় না। 'কালিন্দী' ও 'দুই পুরুষ'-এর মত সাহিত্য রসাবলম্বী সফল নাটকের রচয়িতা শক্তিশালী লেখক তারাশঙ্করের ঐতিহাসিক নাটক 'বালাজী রাও' মঞ্চস্থ ক'রে 'ষ্টার' রঙ্গমঞ্চ যথেষ্ট মার্জিত রুচির পরিচয় দিয়েছেন। তবে এতটা প্রশংসালাভের গৌরব অর্জন ক'রলেও তাঁরা ব্যথিত হবেন জেনে যে বিচারশীল নাট্যামোদীদের কাছে 'বালাজী রাও' ব্যর্থ ব'লে মনে হোয়েছে। অন্যান্য বহু ত্রুটীর মধ্যে এতবড় বিফলতার মূল কারণ হোল নাটকখানি।

'বালাজী রাও' তারাশঙ্করের ঐতিহাসিক নাটক রচনায় প্রথম প্রয়াস। এখানে উল্লেখ করলে অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে নাটকটি 'যুগবিপ্লব' নামে ধারাবাহিকভাবে 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং পরে হয়তো মঞ্চের মুখ চেয়ে বিশেষ ক'রে জনসাধারণের কাছে নাটকের মর্মকথা ও বক্তব্যের ত্বরিৎ উপস্থাপনের উদ্দেশ্যেই বর্ত্তমান নামকরণ করা হোয়েছে। তবে কোনদিক থেকেই সার্থকনামা হোয়ে উঠতে পারেনি। আগাগোড়া তিনটি অঙ্কে বিবৃত ষোলোটি দৃশ্যের মধ্যে কোথাও যুগবিপ্লবের বাষ্পটুকু নজরে পড়ে না কিম্বা সাক্ষাৎ মেলে না ব্রাহ্মণ্যধর্মে উদ্ধত প্রতিক্রিয়াশীল 'বালাজী রাও'-এর। সামগ্রিক বিচারে নাটকখানি তারাশঙ্করের মুন্সীয়ানাকে অনেকাংশে ক্ষুণ্ণ ক'রেছে বলেই মনে হয়। এর কারণ বিশ্লেষণ যথাস্থানে ক'রবো, তার আগে মূল কাহিনী বিবৃত ক'রলে যুক্তি প্রণিধানের পক্ষে পাঠকের কিছু সুবিধা হবে।

প্রায় দু'শো বছর আগে, পলাশী-যুদ্ধোত্তর ভারতবর্ষ তখন অরাজকতায় ছিন্নভিন্ন, বিধ্বস্ত। দিল্লীর সিংহাসনে বাদশাহ আসীন আছে বটে, তবে নিষ্ক্রিয়। দাক্ষিণাত্যে মারাঠা শক্তি পেশোয়া বালাজী রাও-এর নেতৃত্বে ব্রাহ্মণ্যধর্মে প্রতিষ্ঠিত হিন্দুস্থানের স্বপ্ন দেখছে। এদিকে বাদশাহী শোষণে এবং মারাঠার চৌথ আদায়ের ফলে জাঠচাষীরা দলবদ্ধ হয় সশস্ত্র আত্মরক্ষার উপায় নির্দ্ধারণে। এমন সময় বিরাট আফগান বাহিনী নিয়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন দুর্দান্ত লুণ্ঠনকারী আমেদ শাহ আবদালী। তিনটি দাবী জানান। প্রথমঃ দিল্লী দরবারের সাত-হাজারী মনসবদার কবি আমির কুইলি খাঁর কন্যা নৃত্যগীত-পটিয়সী সুন্দরী গন্না বেগমকে তিনি বাঁদী ক'রবেন। দ্বিতীয়ঃ মৃত সম্রাট মহম্মদ শাহের কন্যা তরুণী নসীবনকে বিবাহ করবেন। তৃতীয় দাবী হোল—পাঞ্জাব এলাকা এবং কোটী কোটী টাকা তাঁকে দিতে হবে।

আবদালীর আবির্ভাবে ও নৃশংস অত্যাচারে দেশে অরাজকতা দেখা দেয়। দিল্লী বিপর্যস্ত, বাদশাহী সৌধ ছত্রভঙ্গ হোয়ে পড়ে। আফগানদের ভয়ে মহম্মদ শাহের

কন্যা নসীবন প্রাসাদ পরিত্যাগ ক'রে। পালানোর পথে জাঠচাষী তরুণ জবাহির নসীবনকে রক্ষা করে এবং বালাজীর নিরাপদ আশ্রয়ে তাকে সমর্পণ করে। বালাজী তখন গোকুল মহাবনে; ব্রজমণ্ডলের রাজধানী মথুরা রক্ষার্থে উত্তর ভারতের রাজেন্দ্রগিরি গোস্বামীর নেতৃত্বে সন্ন্যাসীরা তখন প্রচণ্ড বিক্রমে যুদ্ধ ক'রছে আফগান বাহিনীর সঙ্গে। শেষটায় সন্ন্যাসীর কাছে পরাস্ত হোয়ে আবদালী ফিরে যান। বালাজীও ফিরে যান আপন রাজ্যে। তারপর সুরু হয় মহারাষ্ট্রের ভারত অভিযান। ব্রাহ্মণ্যশক্তিতে বিশ্বাসী প্রতিক্রিয়াশীল মহারাষ্ট্রশক্তি উত্তর ভারত দখল করে। কিন্তু বিরোধ বাধে জাঠচাষীদের সঙ্গে, পেশোয়ার সৈন্যদের অত্যাচারে তারা দলবদ্ধভাবে অসহযোগ চালায়। ফলে মারাঠাশক্তি দুর্বল হোয়ে পড়ে এবং তারই সুযোগ নিয়ে আবদালী তাঁর দ্বিতীয় অভিযানে মারাঠাদের পরাজিত করেন। নিরুপায় নসীবন বাধ্য হোয়ে আবদালীর শিবিরে উপস্থিত হয়। কিন্তু আবদালী তাকে স্পর্শ করবার পূর্বেই সে আত্মহত্যা করে।

এই হোল কাহিনীর চুম্বক। ইতিহাসের এমন একটি অধ্যায় থেকে এটি গৃহীত হোয়েছে যেটি বহু জটিল ঘটনার সমাকীর্ণতায় ও ঘাতসঙ্ঘাতের অন্তর্দ্বন্দ্বে যথেষ্ট আবেদনের অবকাশে সম্ভাবনাময়। অথচ নাটকখানি কোথাও বিশেষ মর্মস্পর্শী হোয়ে ওঠবার ফুরসৎ পায়নি। এর কারণও ওই কাহিনী নির্বাচন। বিরাট বিস্তৃত পটভূমিকায় বিচিত্র ঘটনাজাল সম্বলিত আখ্যানে সুষ্ঠু সংগ্রন্থন না হোলে এ জাতীয় ঐতিহাসিক নাটক রসোত্তীর্ণ হয় না। তাই এমন স্থলে মূল কাহিনীর কিঞ্চিৎ পরিবর্তন অপরিহার্য হোয়ে পড়ে। অথচ দেখা যায় আলোচ্য নাটকে তারাশঙ্কর তার আদৌ চেষ্টা করেননি। যাবতীয় খণ্ড ঘটনা ও পরিস্থিতির শাখাপ্রশাখার সবগুলিকেই গ্রহণ ক'রতে গিয়ে সব কিছুকেই তিনি তালগোল পাকিয়ে ফেলেছেন এবং কোনটিকেই তার যোগ্য ব্যবহারে নিয়োজিত ক'রতে পারেননি। বিভিন্ন দিক থেকে বহু বিচিত্র চরিত্রের আমদানী ক'রেছেন কিন্তু কোনটিই তাঁর কলমে মর্যাদা লাভ ক'রতে পারেনি কিম্বা পারেনি সাহায্য ক'রতে মূল নাটককে মর্মাভিমুখী হোয়ে উঠ্‌তে। মাঝে মাঝে কেন্দ্র-চরিত্রগুলির বাইরের দু' একটিকে প্রাধান্য দিতে দু' একটি অহেতুক দৃশ্য-সংযোজন নাটকীয় সংস্থান জ্ঞানের প্রতিকূল হ'য়ে প'ড়েছে এবং আখ্যানাংশেও যথেষ্ট ধারাবাহিকতা ও চারিত্রিক পারম্পর্য রক্ষিত হয়নি। সামগ্রিকভাবে পর্যবেক্ষণ ক'রলে ব'লতে হয় যে 'বালাজী রাও' বিফল হোয়েছে শুধু বহু ঘটনার শিথিল ও অনিপুণ বিন্যাসের জন্যে।

এর পরের কথা হোল ক্লাইম্যাক্সের। নাটকীয় চরম মুহূর্ত যে কোথা দিয়ে এলো এবং কখন এলো তা বিন্দুমাত্র বোঝা গেল না। এর কারণ, এতে দু'টি নাটকের উপযোগী দু'টি ক্লাইম্যাক্সের উপাদান আছে! একদিকে পেশোয়া বালাজীর হিন্দুরাষ্ট্র পত্তনের অভিযান ও তারই অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ জাঠ প্রজা বিপ্লব, অপর দিকে নসীবনের প্রতি আবদালীর প্রণয়াসক্তি—দু'তরফেই রয়ে গেছে চরম উদ্বেগ সৃষ্টির বীজ। এখন দু'টি পৃথক নাটকের মালমশলা একই আধারে রাখা হোয়েছে। এক্ষেত্রে একটি অস্পষ্ট রেখে অপরটিকে লালন ক'রলে নাটক বলিষ্ঠ হ'য়ে উঠ্‌তো। কিন্তু নাট্যকার দু'টিকেই সমান প্রাধান্য দিতে গিয়ে উভয়কেই হারিয়েছেন। তাই আফগান শিবিরে নসীবনের আত্মহত্যার পর শেষ দৃশ্যে বালাজীর তর্পণ অসংলগ্ন ও অসঙ্গত ব'লে মনে হয় এবং প্রথমোক্ত দৃশ্যে যাওবা কিছু গতিবেগের ক্ষতিসাধন হোয়েছিল শেষের দিকে তাও সম্পূর্ণ নিস্তেজ হোয়ে প'ড়েছে। তারাশঙ্করের মত প্রথিতযশা লেখকের নাট্য আঙ্গিকের প্রতি এই নির্মম ঔদাসীন্য স্বীকার ক'রে নিতে প্রচণ্ড দুঃখ বোধ হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

পরিশেষে নাটকের রচনা শৈলী সমালোচনা প্রসঙ্গে আরও একটি কথার উল্লেখ অপরিহার্য মনে ক'রছি। কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন তারাশঙ্কর নাকি 'বালাজী রাও'-এ ইতিহাস থেকে স্থানে স্থানে বিচ্যুত হোয়ে প'ড়েছেন। এ হোল এক শ্রেণীর গোঁড়া সংস্কারাচ্ছন্ন রক্ষণশীল সমালোচকের মতবাদ। একথা অবশ্যই ভুললে

চলবেনা যে ঐতিহাসিক নাটক ইতিহাস নিয়ে রচিত হোলেও মূলতঃ তা নাটকই ইতিহাস নয় এবং সেখানে ঐতিহাসিক বিশ্বস্ততাই তার মূল্য নির্ধারণের একমাত্র মাপকাঠি হোতে পারে না। নথিপত্তরের বর্ম এঁটে সাল-সন-তারিখের সঙ্গীন উঁচিয়ে তেড়ে এলে বিতর্কে বিজয়ী হওয়া যায় বটে তবে রস পরিবেশন করা চলে না। রসের খাতিরে সার্থক নাটক সৃষ্টির কল্যাণে প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য বিকৃতি ও বিচ্যুতির অবাধ স্বাধীনতা লেখককে আমাদের দিতেই হবে।

এবারে অভিনয়ের আসরে এসে পড়া যাক। অভিনয়াংশে যিনি সবচেয়ে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তিনি হোলেন জবাহির ভূমিকাভিনেতা অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সুস্পষ্ট ও সংযত বাচনভঙ্গী আমাদের মুগ্ধ ক'রেছে। স্বর-বৈচিত্র্যে যেমন তেমনি নিপুণ তাঁর ভাবভঙ্গী। বিশেষ ক'রে বালাজীর দরবার দৃশ্যে তাঁর হৃদয়গ্রাহী অভিনয় এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সূচনা করে। আবদালীরূপী মহেন্দ্র গুপ্তের অভিনয় 'তখৎ-এ-তাউসে' এ শিশিরকুমার ভাদুড়ীর ব্যর্থ অনুকরণ হোয়ে প'ড়েছে! শিশিরকুমারের 'জাহান্দার শাহ'র ভূমিকার সঙ্গে আবদালীর যে চরিত্রগত কোনই মিল নেই একথাটা কি গুপ্ত মহাশয়ের স্মরণ ছিল না? রূপসজ্জার কৃতিত্ব দেখালেও তিনি অসংস্কৃত লুণ্ঠনকারী দস্যু আবদালীর ক্রূরতা ফোটাতে গিয়ে হাস্যকর পাগলামী ও অতি-অভিনয়ের আমদানী ক'রে ফেলেছেন। নসীবনের চরিত্রে শ্রীমতী পূর্ণিমার অভিনয় আশানুরূপ সফল হোতে পারেনি তাঁর মাধুর্যহীন কণ্ঠস্বরের অন্তরায়ে। সন্তোষ সিংহের 'গিরি সন্ন্যাসী' দৃঢ়তার অভাবে মনে কোন রেখাপাত করে না। অন্যান্য ভূমিকাগুলি তেমন কিছু উল্লেখ করবার মত নয়।

দৃশ্যপটের আড়ম্বর ও মনোহারিত্ব নিখুঁত হোয়েছে এবং ঐতিহাসিক জাঁকজমকত্বের মর্যাদা রাখতে পেরেছে। আলোক সৃষ্টি ও সম্পাত নাটকীয় পরিবেশকে সজীব ক'রে তুলতে প্রশংসনীয়ভাবে সক্ষম হোয়েছে। এই দু'টি বিশেষ আকর্ষণ ও সাফল্যের জন্যে বক্সের সংশ্লিষ্ট কর্মীদের অভিনন্দন জানাচ্ছি।

রঙমহলে 'নিষ্কৃতি'

ইদানীংকালে পেশাদারী মঞ্চে যে-নাটকখানি সম্পূর্ণ রসোত্তীর্ণ এবং দর্শকসম্প্রদায়ের হৃদয় জয় করার উপযোগী নাটক বলে পরিগণিত হবার দাবী রাখে তা হলো রঙমহলে অভিনীত কথাসম্রাট শরৎচন্দ্রের 'নিষ্কৃতি'। 'নিষ্কৃতি' উপন্যাসটির নাট্যরূপ দিয়েছেন দেবনারায়ণ গুপ্ত। নিতান্ত সাধারণ এক মধ্যবিত্ত গৃহস্থের সংসারের কয়েকটি চরিত্রকে ঘিরে নাটকটি গড়ে উঠেছে এবং তা বেশ সাফল্যলাভও করেছে শিল্পীদের আন্তরিক অভিনয়নৈপুণ্যে।

কাহিনী সংক্ষেপে হলো এই। গিরিশ ও সিদ্ধেশ্বরী অল্প বয়সে মাতৃহারা খুড়তুতো ভাই রমেশকে মানুষ করে তোলে। শৈলজার যখন দশ বছর বয়স তখন তার সঙ্গে বিয়ে দেয় রমেশের। শৈলজা বড় হয়ে সেই সংসারের গৃহিণী হয় আর গিরিশ ও সিদ্ধেশ্বরীর স্নেহ-ভালবাসা লাভ ক'রে তাদের খুব প্রিয় হয়ে থাকে। এমন সময়ে বিদেশ থেকে ফিরে আসে গিরিশের সহোদর হরিশ ও তার স্ত্রী নয়নতারা তাদের পুত্র অতুলকে সঙ্গে নিয়ে। খুড়তুতো জা শৈলজার কর্তৃত্ব নয়নতারা সহ্য করতে পারে না। শৈলজাদের সেখান থেকে বিদায় করার জন্য চক্রান্ত করতে থাকে। শৈলজার বিরুদ্ধে মিথ্যে করে নানা বিষয়ে অভিযোগ করে সে সিদ্ধেশ্বরীর কাছে। শৈলজা দুঃখিত অন্তঃকরণে স্বামী-পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে চলে যায় দেশের বাড়ীতে। কিন্তু সেখান থেকেও তাদের তাড়াবার জন্য নয়নতারা মামলা রুজু করে। সবশেষে গিরিশ সমস্ত ব্যাপারটি বুঝতে পেরে দেশের বাড়ীর সব সম্পত্তি শৈলজার নামে লিখে দিয়ে ওদের আবার কলকাতায় ফিরিয়ে আনে।

এই কাহিনীকে মোট তিনটি অঙ্ক ও ষোলোটি দৃশ্যে ভাগ ক'রে দেখানো হয়েছে। প্রায় প্রতিটি দৃশ্যের রচনায় ও প্রযোজনায় কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। পৃথক্‌ভাবে কয়েকটি দৃশ্য সম্বন্ধে বলতে গেলে বলতে হয় যে গিরিশদের কলকাতার বাড়ীর ভেতরের ঘরগুলির [illegible]

যে মিল ছিল শৈলজা বাড়ী ছেড়ে চলে যাওয়ার পর ২য় অঙ্কের ৭ম দৃশ্যের বাড়ীর চেহারাটাও আগের বাড়ীর সঙ্গে খাপ খাওয়ানো দরকার ছিল। 'রান্নাবাড়ী'র দৃশ্যটাও ভাল ফুটে ওঠেনি দৃশ্য-সংযোজনার দোষে।

অভিনয়ের কথা উল্লেখ করতে গেলে প্রথমেই মনে পড়ে শ্রীমতী প্রভার অভিনয়। তাঁর জীবনে সমস্ত মঞ্চাভিনয়ের মধ্যে সম্ভবতঃ সিদ্ধেশ্বরীর ভূমিকা তাঁর শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি। যে আন্তরিকতার সঙ্গে অভিনয় ক'রে তিনি এই চরিত্রটি ফুটিয়ে তুলেছেন তা তাঁর মতো শিল্পীর পক্ষেই সম্ভব। জহর গাঙ্গুলীও স্বীয় ভূমিকাটিকে বাহুল্য বর্জ্জন ক'রে সযত্নে ফুটিয়ে তুলেছেন। শৈলজার ভূমিকায় ঝর্ণাকে মানিয়েছেও এবং তাঁর অভিনয়ও সাবলীল হয়েছে। হরিশের ভূমিকা ভানু চট্টোপাধ্যায় এবং নয়নতারার ভূমিকা রাণীবালা যথাযথ ফুটিয়ে তুলেছেন। রমেশের ভূমিকায় অবনী মজুমদারের অভিনয়ে আড়ষ্টতা কাটেনি। আবহ-সঙ্গীতে উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু নেই। গ্রাম্য-সঙ্ বেহারীর ভূমিকায় হরিধনের অভিনয় চলনসই এবং এটিই এ-নাটকের একমাত্র লঘু চরিত্র। নীলার চরিত্রে নবাগতা শেফালী দত্তের অভিনয় মন্দ নয়।

মিনার্ভায় 'তুষারকণা'

কিছুটা অভিনবত্ব এনে উপস্থিত অপর যে-নাটকখানি পেশাদার রঙ্গমঞ্চে জনসমাদর লাভের কৃতিত্ব দাবী করতে পারে সে-নাটকখানি হলো মিনার্ভা মঞ্চে অভিনীত 'তুষারকণা'। নাটকটি রচনা করেছেন শচীন্দ্র সেনগুপ্ত এবং এর গানগুলি রচনা করেছেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। সাধারণতঃ যেসব নাটক মঞ্চে অভিনীত হতে দেখা যায় সেগুলি থেকে এটি একটু পৃথক ধরণের। নাটকটির মূল উপাদান গৃহীত হয়েছে বিদেশী রূপকথার গল্প 'স্নো হোয়াইট এ্যাণ্ড দি সেভেন ডোয়ার্ফস্' থেকে।

সংক্ষেপে কাহিনীটি হলো এই—রাণী হৈমবতী তাঁর রাজ্যে তাঁর চেয়ে অপর কেউ সুন্দরী থাক তা সহ্য করতে পারেন না। রাজাকে তিনি সম্পূর্ণ বশীভূত করে রাখেন। সহচরী কুয়াশার কুমন্ত্রণায় হৈমবতী যা খুশী তাই করে যান। সুয়োরাণী তমসার মেয়ে তুষারকণাকে পাহাড়ের ওপরে নিয়ে গিয়ে কেটে ফেলার হুকুম দেন জল্লাদকে, কারণ তুষারকণা তাঁর চেয়েও সুন্দরী। পথে যেতে যেতে তুষারকণার ওপর জল্লাদের মায়া পড়ে যায়। এক হরিণকে কেটে তার রক্ত নিয়ে দেখায় সে রাণীকে। হৈমবতীর কাছে সে-চাতুরী ধরা পড়ে যায়। যাদুমণির কাছ থেকে যাদুকরী ক্ষমতা-সম্পন্ন ফিতে, চিরুণি আর আপেল নিয়ে তিনি পৌঁছলেন সাতটি বামনের দেশে এবং তুকতাকের সাহায্যে তুষারকণাকে হত্যা করলেন। এতদিনে রাজার চেতনা হলো। হৈমবতীকে তিনি বন্দী করলেন। শেষে যাদুমণিই আবার মন্ত্রবলে তুষারকণার প্রাণসঞ্চার করলেন।

সর্ব্ব বয়সের দর্শক যাতে উপভোগ করতে পারেন সেইভাবেই নাটকটি রচিত হয়েছে। রূপকথার কাহিনী হলেও প্রাপ্তবয়স্করা এ নাটক দেখে উপভোগ করতে পারবেন। মোট আটটি দৃশ্যে নাটকটি রচিত হয়েছে। রচনাও বেশ পরিপুষ্ট এবং সংলাপও বেশ জোরালো। তবে বিদেশী গল্প থেকে নেওয়া রূপকথার কাহিনী-মূলক বাংলা নাটক রচনাকে সমর্থন করা যায় না। এ-দেশীয় বহু রূপকথাকে নাট্যরূপ দেওয়া চলতো। দৃশ্য ও সাজ-পোষাকে অভিনবত্ব লক্ষ্যনীয়—এ-বিষয়ে শিল্প-নির্দ্দেশক চারু রায় কৃতিত্ব দাবী করতে পারেন। গানে সুরে ও নৃত্য-রচনায় রঞ্জিৎ রায় স্বীয় বৈশিষ্ট্য ফোটাতে সক্ষম হয়েছেন।

অভিনয়ে উল্লেখযোগ্য হলেন 'তুষারকণা'র ভূমিকায় মাধুরী। তাঁর বাচন বেশ স্পষ্ট এবং দরদী কণ্ঠে তা সকল দর্শকেরই চিত্ত জয় করে। হৈমবতীর ভূমিকায় সরযূবালা চলনসই। তাঁর সহচরী কুয়াশার ভূমিকায় লীলাবতীর অভিনয় ও নৃত্য বেশ ভাল হয়েছে। তমসার ভূমিকায় অপর্ণাও বেশ আবেগপ্রধান অভিনয় করেছেন। জল্লাদের ছোট্ট ভূমিকায় বিভূতি দাসের অভিনয় মনে বেশ দাগ কাটে। মিহির ভট্টাচার্য্য ও রাণী বন্দ্যোপাধ্যায় অভিনীত যথাক্রমে রাজা ও রাজপুত্র চরিত্রটির মর্য্যাদা কোথাও ক্ষুণ্ণ হয়নি।

এই রকম একখানি সর্ব্বজনউপভোগ্য সর্ব্বরসপুষ্ট নাটক মঞ্চস্থ করার জন্য মিনার্ভা সম্প্রদায় ধন্যবাদ ও ও কৃতিত্ব দাবী করতে পারেন।

অমার্কিন কার্য্যকলাপের অজুহাতে, মার্কিন দেশের প্রগতিবাদীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার তোড়জোড় শোনা যাচ্ছে। চার্লি চ্যাপলিনের মত প্রতিভাবান চিত্রপরিচালককেও মার্কিন রাষ্ট্রনায়কদের লাল আতঙ্কের জন্য, তদন্ত কমিটির সামনে হাজির হতে তলব করা হয়েছে।

সম্প্রতি এক খবরে প্রকাশ, বিখ্যাত ফরাসী গায়ক-অভিনেতা মরিস্ শিভেলিয়রকে এই একই অপরাধে যুক্তরাষ্ট্রে ছাড়পত্র দেওয়া হয় নি। শিভেলিয়র এ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছেন, আণবিক বোমার বিরোধিতা করাটা কিসের অপরাধ তা তিনি জানেন না, যখন বিশেষ করে হাজার হাজার ফরাসী তাতে সই করেছে। তাঁর যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ, যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থের বিরোধী হবে, এই কারণেই নাকি তাঁর ছাড়পত্র নামঞ্জুর করা হয়েছে। অথচ এই শিভেলিয়র শুধু ফরাসী নয়, পাশ্চাত্য জগতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী গায়ক-অভিনেতা হিসাবে দীর্ঘ তেত্রিশ বছর ধরে যে জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করেছেন, তাতে তাঁর ওপর এই নিষেধাজ্ঞা সত্যই নিন্দনীয়। মরিস্ শিভেলিয়র রাজনীতিবিদ্ নন, জীবনে গান তিনি ভালবাসেন, গান গেয়ে তিনি মানুষকে আনন্দ দেন। স্বভাবতঃই যা কিছু মানুষের আনন্দের জগতকে কুৎসিত ক'রে তুলবে বলে তাঁর মনে হয়, তাতেই তিনি বিরোধিতা না করে পারেন না। আজকের দিনে তিনি এ কথা জোর গলায় বলেছেন, 'আমার বক্তব্য শুধু এই, জনকতক লোক এসে যখন আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, আমি আণবিক বোমার বিরোধী কিনা, যে পক্ষই তা ব্যবহার করুক, তখন আমি তাদের বলেছিলাম, আণবিক বোমা কেই বা চায়?' তাই ষ্টকহোলম্ আবেদনে সই করতে তিনি কুণ্ঠিত হন নি। জনপ্রিয় এই গায়ক-অভিনেতার ওপর এই কারণে নিষেধাজ্ঞা মার্কিন রাষ্ট্রকর্ণধারদের স্বরূপই উদ্‌ঘাটন করে দিয়েছে। ফ্রান্সে আজ যেমন মরিস্ শিভেলিয়র জনপ্রিয়, রাস্তা-ঘাটে তাঁর উপস্থিতি শহরবাসীদের মন যেমন আনন্দে ভরিয়ে তোলে, তেমনি বৃটেন, আমেরিকা প্রভৃতি

মরিস্ শিভেলিয়র

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়

দেশেও তাঁর জনপ্রিয়তা সমান।

প্রথমে যখন নিউ ইয়র্কে আসেন, তখন নিজের দেশে মরিসের খ্যাতির জীবন সুরু হয়েছে। প্রথমে নিউ ইয়র্ক শহরে পা দিয়েই চমকে উঠেছিলেন, উঁচু-বাড়ীর ছাদে তাঁর নামের অক্ষরগুলো একের পর এক ফুটে উঠতে দেখে। তিনি আলোর অক্ষরে CHEV দেখে ভেবেছিলেন, নিজের জনপ্রিয়তার কাহিনী এখানে পৌঁছে গেছে। কিন্তু তাঁর সেই আনন্দ হতাশায় পর্য্যবসিত হল, যখন সেই চারটে অক্ষর পরিণত হল CHEVROLET-এ। তিনি ক্ষুণ্ণ হলেন, তাঁর নামের চেয়ে প্রমোদনগরী নিউ ইয়র্কে গাড়ীর খাতির বেশী।

কিন্তু নিউ ইয়র্ক তাঁর সেই হতাশা বেশী দিন থাকতে দেয় নি। হলিউডের ছবিতে মরিশ শিভেলিয়রের পদার্পণে, নিউ ইয়র্কের ছবির দর্শকেরা সাদর অভ্যর্থনা জানালো। তাঁর অভিনীত The play boy of Paris, A bed time story, The similing lieutenant ছবি শুধু আমেরিকায় নয়, আলজিয়ার্স, আর্জেন্টিনা, স্পেনে ছড়িয়ে পড়ল। চীনে আর জাপানে তাঁর অভিনীত ছবি 'রেকর্ড'-সংখ্যক দর্শকের সামনে প্রদর্শিত হয়েছে। একটী ছবির জন্য হলিউডে কয়েকদিনের মধ্যেই আড়াই লক্ষ ডলার পেতে লাগলেন শিভেলিয়র।

ছবি তোলার মাঝামাঝি সময়টা তিনি সঙ্গীতা-নুষ্ঠানের আয়োজন করতেন এবং এই সমস্ত অনুষ্ঠানের জন্য আমেরিকার অধিবাসীরা যে আগ্রহ দেখিয়েছেন,

তা অভূতপূর্ব্ব। তাঁকে শুধু দেখার জন্ত রাস্তায় ভিড় হয়ে গেছে, রেল স্টেশনে স্টেশনে উৎসুক সাধারণ মানুষ অধীর প্রতীক্ষা করেছে।

আমেরিকা থেকে যখন তিনি বিজয়গর্ব্বে ফিরে এলেন প্যারিসে, তখন বিশ হাজার নরনারী তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে ছুটলেন। ভাষাগত ব্যবধান বজায় থাকলেও, এই যাদুকর গায়কের গান শোনবার জন্ম স্পেনে, সুইজারল্যাণ্ডে, ডেনমার্ক, নরওয়ে, দক্ষিণ আমেরিকার সাধারণ শ্রোতারা উৎসুক হয়ে ছুটে এসেছে।

শিভেলিয়র সব রকম দর্শকের কাছেই প্রিয়। দরিদ্রতম দর্শক থেকে, ধনকুবের প্রত্যেকেই তাঁর অনুষ্ঠান শুনতে ভালবাসেন। শিভেলিয়রের এই জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে সমালোচকরা বলে থাকেন, তাঁর গান, তাঁর হাসির মধ্যে দর্শকেরা এমন একটা মধুর পৃথিবীর সন্ধান পান, যে পৃথিবীর স্বপ্নে প্রত্যেক মানুষই বিভোর থাকতে চান কিছুক্ষণের জন্ম হলেও। শিভেলিয়র এই মধুর জগতের মূর্ত্ত ছবি। তিনি যখন ফেল্ট হ্যাটটি মাথায় হেলিয়ে মিষ্টি হাসেন, তখন দর্শকেরা মুগ্ধ না হয়ে পারেন না। শিভেলিয়র বলেন,—'আমি আমার জনপ্রিয়তার কারণ সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ। দেখতে আমি ভালো নই, গলাও আমার এমন কিছু ভালো নয়। খ্যাতিমান অভিনেতাদের মত ভাল অভিনয়ও করতে পারি না। কিসে আমি দর্শকদের অন্তর জয় করি, তা জানি না।'

শিভেলিয়র নিজে না জানলেও, দর্শকেরা জানেন তাঁর সমসাময়িক খ্যাতিমান্ অভিনেতাদের তিনি অন্ততম। দর্শকদের অন্তর তিনি জয় করেছেন তাঁর শিল্প-প্রতিভায়। তিনি জানেন কেমন ভাবে দর্শকদের উপভোগের সুযোগ দিতে হয়। কখনও তাঁর অভিনয়ে দর্শকেরা উত্তেজিত হয়ে আসন ছেড়ে উঠে পড়ে, কখনও বা সহজ অভিনয়ের মাধুর্য্যে গা ভাসিয়ে দেয় অলস স্বপ্ন দেখার মত। তাঁর অভিনয়ের এটাই বৈশিষ্ট্য।

মরিস্ শিভেলিয়রকে এই জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করতে পরিশ্রম করতে হয়েছে। ফ্রান্সের সব জায়গায় তাঁকে ঘুরতে হয়েছে গান গেয়ে গেয়ে।

বারো বছর বয়সে তাঁর শিল্পী-জীবনের সুরু। গান গেয়ে লোক হাসানোর কাজ তিনি সুরু করেন ছেলে বয়সে। আজ সমালোচকরা স্বীকার করেন, এই কাজে তিনি স্বচ্ছন্দভাবে চার্লি চ্যাপলিনের কাছাকাছি হতে পারেন। সামান্ত মুখভঙ্গিমা আর মুক অভিনয়ে যে হাসির ফোয়ারা তিনি দর্শকদের মাঝে বইয়ে দিতে পারেন তা একমাত্র চার্লি চ্যাপলিন ছাড়া আর কেউ পারেন না।

শিভেলিয়রের গান প্রেমের গান। ব্যক্তিগত জীবনেও তিনি প্রেমিক মানুষ। ব্যক্তিগত জীবনে বহু নারীর প্রেম তিনি পেয়েছেন কিন্তু একমাত্র মা ছাড়া কোন মেয়েই তাঁকে খুশী করতে পারে নি। তিনি তাঁর গীতানুষ্ঠানের নৃত্যসঙ্গিনী ঘোভনে ভ্যালেকে বিয়ে করেন কিন্তু সে বিবাহ সুখের হয়নি। হলিউডের সামাজিক জীবনের আবর্ত্তে পড়ে, তাঁর স্ত্রী ঈর্ষাপরায়ণতায় মরিসের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছিল, একথা তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন। মরিস স্বাধীনতা চাইতেন কিন্তু স্ত্রীর এই ঈর্ষা পদে পদে তাঁকে আঘাত দিত। ১৯৩৩ সালে প্যারিসে তাঁদের বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায়।

মাকে তিনি একমাত্র ভালবাসতেন। বাবা যখন সংসার চালাতে অক্ষম, তখন তাঁর মা দিবারাত্র পরিশ্রম করতেন নিজের ছেলেমেয়েদের জন্ম, এ স্মৃতি আজও শিভেলিয়রের চোখ অশ্রুসিক্ত করে তোলে। মায়ের উদ্দেশ্যে তিনি একটা গান তাঁর অনুষ্ঠানে প্রায়ই গেয়ে থাকেন। গানটির নাম prayer।

মা মারা গেলে তিনি বলেছিলেন, 'মা তুমি আমাকে সৎ পরিশ্রমের মূল্য যে কি, তা শিখেয়েছো, তুমি আমাকে লোকের সমালোচনার বিরূপতা সহ্য করে মাথা উঁচু করে চলতে শিখিয়েছো। তুমিই এ জগতে আমার একমাত্র বন্ধু।'

দীর্ঘ একান্ন বছরের শিল্পী-জীবনের কথা বলতে গিয়ে, তিনি ভেবে পান না, কেমন করে তিনি নাট্য-জগতে প্রবেশ করলেন। ১৮৮৮ সালে এক শ্রমিক

পরিবারে তাঁর জন্ম। বাবা মারা যাওয়ার মাত্র এগারো বছর বয়সেই, তাঁকে এই নিষ্ঠুর পৃথিবীতে কাজ করতে হয়েছিল। এ সময়ে ছুতোরের কাজ, পুতুল রঙ করার কাজ করতে হয়েছিল তাঁকে। এরমধ্যে তাঁর মা হঠাৎ একদিন একটা খেলো গানের জলসায় তাঁকে নিয়ে আসে। সেইদিন থেকে তিনি নাটমঞ্চের ভালবাসায় পড়ে গেলেন। শিভেলিয়র সেদিনের স্মৃতি প্রসঙ্গে বলেছেন, 'সেদিন সেই ছোট রঙ্গমঞ্চ ছোট জিনিষ ছিল না, আমার কাছে হয়ে উঠেছিল জগতের আকাঙ্ক্ষিত একটি মনোরম জায়গা।'

সেইদিন থেকে এই ছোট জায়গাটার স্বপ্ন তাঁকে পেয়ে বসল। ফ্যাক্টরীতে কাজ করার ফাঁকে পালিয়ে গিয়ে অন্যত্র পার্ট মুখস্ত করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেলেন ফোরম্যানের কাছে। ফ্যাক্টরীর দরজা বন্ধ হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জন্যে।

বারো বছর বয়সে একটা ছোট কাফের নাটমঞ্চে তিনি বড় ঢাউস একটা ট্রাউজার পরে অদ্ভুত সাজে গান গাইতে এলেন। দর্শকেরা তাঁর গান শুনে হাসল। কাফের কর্ত্তা তাঁকে আবার পরের সপ্তাহে আসতে জানাল। সেখান থেকে Tower ves casino-তে সপ্তাহে তিন ডলার মাইনেতে তিনি কাজ নিলেন। কিন্তু সব জায়গা ছোট নয়, তাই বড় এক জায়গায় গান গাইতে গিয়ে তিনি ব্যর্থ হলেন অভিজাত দর্শকদের কাছে। দর্শকেরা তাঁর সঙ্গীত সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতার জন্য বিশেষ বিরক্ত হন।

তবু এর পরেই প্যারিসের একটা মিউজিক হলে তাঁর আমন্ত্রণ এল। যখন ওঁরা মাইনের কথা জিজ্ঞাসা করলেন কত তিনি মাইনে চান, শিভেলিয়র মনে মনে ভাবলেন রোজ দশ ফ্রাঙ্ক। ওঁরা যখন জানালেন ওঁরা রোজ ন' ফ্রাঙ্ক দেবেন তখন শিভেলিয়র মনে মনে বলছিলেন, ওঁরা যদি রোজ দশ ফ্রাঙ্ক দিতেন তো সারা জীবনের জন্য তিনি চুক্তিবদ্ধ হতেন। কিন্তু শিভেলিয়র জানতেন না সেদিন, সামান্য সরাইখানার নাটমঞ্চের ন' ফ্রাঙ্কের বেতনের গায়ক-অভিনেতা তিনি থাকবেন না। অপ্রতিদ্বন্দ্বী গায়ক-অভিনেতা হিসাবে সারা জগতে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়বে।

বিদূষক হিসাবে নাট্যমঞ্চে প্রবেশ করলেও, শ্রেষ্ঠ গায়ক-অভিনেতা হবার পথে, তাঁর পদক্ষেপ সুরু হল সেই ন' ফ্রাঙ্কের বেতনের ইতিহাস থেকেই। ন' ফ্রাঙ্ক থেকে তিনি চার হাজার ফ্রাঙ্ক উপার্জ্জন করতে লাগলেন। এই সময় তিনি প্রসিদ্ধ নর্ত্তকী মিস্ টিনগুয়েটের নৃত্যসঙ্গী হলেন ১৯১০ সালে, এবং এই সম্মান অর্জ্জন করবার পর জগতের অসংখ্য দর্শকের সামনে এসে দাঁড়ালেন।

১৯১৪ সালে যুদ্ধ বাধলো। সৈনিক জীবন নিয়েই শিভেলিয়র জার্মানদের হাতে বন্দী হলেন। বন্দীজীবনে এক বৃটিশ বন্দীর সঙ্গে বন্ধুত্ব হল তাঁর। দ্রুত ইংরেজী শিখে ফেললেন তিনি। এই ইংরাজী শেখার জন্য ফরাসী দেশে যেতে, যখন আমেরিকায় এসেছিলেন তিনি, তখন আমেরিকান নাট্যমঞ্চে জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করতে তাঁকে বেগ পেতে হয় নি মোটেই। এই সময় বিশেষ করে তাঁর জনপ্রিয়তা অভূতপূর্ব্ব হয়ে ওঠে। এই প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, 'দর্শকদের বাহবা দিয়ে গান পুনরায় শোনানোর অনুরোধ এত অসংখ্য যে গণনা করাও মুস্কিল!'

ঠিক এই সময়ে মেট্রো গোল্ডউইনের আর্ভিং আলবার্গ আর তাঁর স্ত্রী নর্মা শিয়ারার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন। আলবার্গকে তিনি মোটেই চিনতেন না; তাই আলবার্গের ব্যবসায়িক প্রস্তাব তিনি উড়িয়ে দিলেন। তাঁর ম্যানেজার ম্যাকস্রুপ্পার কাছে আলবার্গের পরিচয় পেয়ে তিনি আলবার্গের সঙ্গে আবার কথা বললেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত শিভেলিয়রের প্রস্তাবে রাজী না হওয়ার জন্য, সে চুক্তি সম্পন্ন হয় না, আর সেই সুযোগে প্যারামাউণ্টের প্রতিনিধি জেসিল্যাস্কি তাঁর সঙ্গে চুক্তি করে ফেললেন।

তাঁর প্রথম ছবি Innocent of Paris এ ছবিতে তাঁর কাজ ছিল, একটা ক্রন্দনরত ছেলেকে হেসে গেয়ে নেচে হাসানো। কিন্তু সবচেয়ে আনাড়ী শিভেলিয়র অনেক অসুবিধায় পড়লেন, তাঁর জন্য একটা দৃশ্য বার বার তুলতে

হল। সেই ছবি Innocent of Paris যখন পর্দায় দেখা দিল, তখন তাঁর গান 'Louise' সাধারণের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়লো। দর্শকরা শুধু খুসী নয়, সমালোচকেরা উচ্ছ্বসিত।

১৯৩১ থেকে ১৯৩৪-এর মধ্যে শিভেলিয়র ছবির পর ছবিতে অবতীর্ণ হতে লাগলেন। তাঁর অভিনীত Love Parade, The Big Pond, The Way to Love, A bed time story প্রভৃতি ছবি তাঁকে জনপ্রিয়তার শীর্ষে তুলে দেয়।

এই ধরণের বিদূষকোচিত অভিনয় তাঁর ভাল লাগত না। এই সময় তিনি প্যারামাউন্ট ছেড়ে তিনটী ছবির জন্য প্রত্যেক ছবি পিছু আড়াই লক্ষ ডলারের এক চুক্তিতে মেট্রোর সঙ্গে আবদ্ধ হলেন।

এর পর ১৯৩৯-এ যুদ্ধ বাধল। শিভেলিয়র সৈন্যবাহিনীকে আনন্দ দেবার জন্য আবার যুদ্ধে গেলেন। ১৯৪৩-এ ভিচী গভর্ণমেণ্টের দালাল হিসাবে অপবাদ রটানো হয় তাঁর নামে কিন্তু পরে তা অসত্য বলে প্রমাণিত হয়।

ফ্রান্সের প্রতিটি মানুষ সেই দিন থেকে এই মানুষটীকে ভালবেসে আসছে। রাস্তাঘাটে তাঁর দেখা পেলেই সাধারণ সবাই প্রসন্ন হাস্যে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান।

এত খ্যাতির জীবনেও মরিস ব্যক্তিগতভাবে ঠিক খুসী নন। অতীতের দারিদ্র্যের স্মৃতি এই নতুন জীবনকেও ম্লান করে দেয় তাই শিল্পী অনেক সময় বিষণ্ণ হয়ে পড়েন। তেষট্টী বছর বয়স হ'ল শিভেলিয়রের, আজও তিনি নবীন। আজও তিনি পরিশ্রম করতে ভালবাসেন। আজও খ্যাতির চূড়ায় এসে ঠেকলেও, দর্শকদের তিনি উপেক্ষা করেন না। নিজের লোকোত্তর প্রতিভা দিয়ে দর্শকদের তৃপ্ত করতে আজও সবিশেষ সযত্ন প্রয়াস তাঁর আছে। শিল্পী হিসাবে শিভেলিয়র পুরোমাত্রায় খাঁটী। ব্যক্তিগত জীবনেও তিনি শৃঙ্খলার পক্ষপাতী। দৈনিক ব্যায়াম, সাঁতার কাটা আর নিজের টেনিসকোর্টে টেনিসখেলা নিয়মিতভাবে তিনি মেনে চলেন। লিখতে তিনি ভালবাসেন। তাঁর আত্মজীবনী প্রকাশিত হয়েছে, এখনও তিনি প্রত্যহ লিখে থাকেন।

মরিস শিভেলিয়র শুধু গায়ক-অভিনেতা নন, তিনি আগামী মধুর পৃথিবীর স্বপ্নও দেখেন ও দেখান। তাঁর গানে দর্শকেরা ভুলে যায় এ পৃথিবীর দুঃখ, তাঁর গানের 'মাধ্যমে' তারা উপলব্ধি করতে পারে জীবনের শাশ্বত মাধুর্য্যকে। তাই মরিস শিভেলিয়র শুধু সঙ্গীত-শিল্পী নন, তিনি জীবন-শিল্পীও। এই জনপ্রিয় শিল্পীকে অমার্কিন কার্য্যকলাপে অভিযুক্ত করা মার্কিন রাষ্ট্রনীতির দুর্ব্বলতারই পরিচায়ক। মরিস শিভেলিয়র যুক্তরাষ্ট্রে না গেলে, শিল্পীর কোন ক্ষতি নেই, মার্কিন দেশবাসীরা শিভেলিয়রের আনন্দময় জগতের আনন্দ উপভোগ থেকে বঞ্চিত হলেন, এটাই দুঃখের কথা।

আপনাদের চিঠি

['আপনাদের চিঠি' এই বিভাগে গ্রাহক ও পাঠকবর্গের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়। প্রত্যেক মাসে এত চিঠি আসে য, সকলের সব প্রশ্নের জবাব দেওয়া সম্ভব হয় না। তাই অনুরোধ প্রত্যেকে যেন একটি মাত্র প্রশ্ন করেন। চলচ্চিত্র ও রঙ্গমঞ্চ সম্পর্কিত প্রশ্ন না হলে এবার থেকে তার জবাব দেওয়া হবে না।—চিত্রবাণী-সম্পাদক]

তারাপদ সেনগুপ্ত, মালদহ

দীপ্তি রায় ও মলয়া সরকার কি চিত্রজগৎ থেকে বিদায় নিয়েছেন?

চিত্রজগতে স্থায়ী ছাপ রেখে যাবার মতো এঁরা এমন কোনো অভিনয়-প্রতিভার পরিচয় দেননি, যাতে চিত্রজগৎ বার বার এঁদের স্মরণ করবে! তবে বাংলা চিত্রজগতের নায়িকারা যেভাবে বোম্বাইয়ের দিকে পা বাড়িয়েছেন—তাতে এঁদের পুনরাবির্ভাবও কিছু আশ্চর্য্যের নয়! শোনা যাচ্ছে, বঙ্কিমচন্দ্রের 'মৃণালিনী'-তে মলয়া সরকার অভিনয়ের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। প্রণব রায় পরিচালিত 'প্রার্থনা'-য় দীপ্তি রায়কেও দেখতে পাবেন।

নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, ফণী রায়, রঞ্জিৎ রায়, অজিত চট্টোপাধ্যায় ও নবদ্বীপ হালদারের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হাস্যরসিক কে?

আমরা তো ৺ইন্দু মুখোপাধ্যায়কে শ্রেষ্ঠ হাস্যরসিক ব'লে জানি। বর্ত্তমানে, তুলসী লাহিড়ীর নামও করতে পারেন—যদিও কোনো হাসির ভূমিকায় তিনি আজকাল আর অভিনয় করছেন না।

কাশীনাথ পালিত, নৈহাটি

নিউ থিয়েটার্সের 'চিত্রাঙ্গদা' ছবির সুরকার কে এবং কে কে অভিনয় করছেন?

এই ছবিটি এখনও জল্পনা-কল্পনা-স্তরেই আছে। ছবি যদি ওঠে, তাহলে, রাইচাঁদ বড়াল কিংবা পঙ্কজ মল্লিক—এঁদের একজন কেউ সুর দেবেন নিশ্চয়ই; কারণ নিউ থিয়েটার্সের ছবি। নায়িকার অংশে চিত্রনাট্য-রচয়িত্রী কল্যাণী মুখোপাধ্যায়ের নাম শোনা যাচ্ছে।

জিতেন কুমার, তেজপুর, আসাম

শচীনদেব বর্ম্মণ কি অসমীয়া?

না, বাঙালী। 'শারদীয়া চিত্রবাণী' পড়লেই বুঝতে পারবেন।

মীরা পালিত, হর্ণবি রোড, বোম্বাই

হিন্দী ছবি এত যৌন-আবেদনসর্বস্ব কেন? পোষাক-পরিচ্ছদেও কেন রুচির এত অভাব?

এর জন্য দায়ী তো আপনারাই। আপনারা সঙ্ঘবদ্ধভাবে যদি এর প্রতিবাদ জানান—তাহ'লে কোনো প্রযোজক-পরিচালকেরই সাধ্য নেই রুচি ও শালীনতাকে এইভাবে হত্যা করবার। সরকার-কেও এজন্য চাপ দিতে হবে দর্শক-সমাজ ও সাংবাদিকদের তরফ থেকে। আপনাদের প্রতিবাদ প্রচারের ভার আমরা নিতে রাজী আছি।

মহম্মদ আবদুর রসিদ, পানশীলা, ২৪ পরগণা

চিত্রজগতের প্রত্যেক নরনারী কি অভাবে

মেলামেশা করতে পারেন, না কোনো বাধা আছে ?

না, বাধা আর কোথায় ? অবাধ মেলামেশার এমন জায়গা আর নেই !

গোপালচন্দ্র বসু, রায়গঞ্জ

'চিত্রবাণী' দেরীতে প্রকাশিত হওয়ার কারণ কি ?

আপনি বোধ হয় জানেন না, সিনেমা ও রঙ্গমঞ্চ সম্পর্কিত কাগজগুলির মধ্যে 'চিত্রবাণী'-ই যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি বের হয়।

রমেশচন্দ্র দাস, তেজপুর, আসাম

এ সংসারটা পুরুষের না মেয়েলোকের ?

খাদ্য রেশন আনবার সময় পুরুষের ; আর, বস্ত্র-রেশন আনবার সময় মেয়েলোকের ! আর চিত্রজগতে জেমিনীর

সুনন্দা হাজরা, নিউ দিল্লী

'কারদার-কলিনস-টেরেসা' প্রতিযোগিতায় জয়ী পিস্ কানওয়াল ও সহদেব রাণার যুগল-ফটোর তাৎপর্য কি ?

জয়ের প্রথম উচ্ছ্বাস !

গোপালচন্দ্র রক্ষিত, রাণীগঞ্জ

কিছুদিন আগে সংবাদপত্রে দেখেছিলাম 'ক্ষুদিরাম' বাণীচিত্র ১২-ই আগষ্ট মুক্তিলাভ করবে। ১২ই আগষ্ট তো চলে গেল, মুক্তির কি হলো ?

আপনি বুঝি শোনেন নি 'ক্ষুদিরামের' ফাঁসী হয়ে গেছে ? এখন ফাঁসীর আদেশ মকুব করতে সময় লাগবে বৈকি ?

বাংলা থেকে যে-ভাবে অভিনেতা-অভিনেত্রী বোম্বাই অভিমুখে চলেছেন তাতে বাংলা চিত্র-শিল্পের কোনো ক্ষতি হবে না কি ?

ক্ষতি পূরণের জন্যই তো বাংলা চিত্রজগতে কানু, কুলদীপ কাউর, সিতারা, সুলোচনা চ্যাটার্জী ও বেগম পারার আবির্ভাব !

নিউ থিয়েটার্সের 'মহাপ্রস্থানের' দেরী কত ?

ছিঃ, এইভাবে নিউ থিয়েটার্সের কেউ অমঙ্গল কামনা করে !

জীবেন বসু, হালদারপাড়া রোড, কলিকাতা

আগামী নির্বাচনে বাংলা থেকে কোনো অভিনেতা বা অভিনেত্রী দাঁড়াচ্ছেন না কেন ?

আমাদের 'ধুরন্ধর'-ও বলছিলেন সেই কথা ! বাংলায় কোনো কোনো দলের যা দুরবস্থা, তাতে তারা যদি ভারতী দেবী, মঞ্জু দে, অনুভা গুপ্তা, কানন দেবী, চন্দ্রাবতী, পাহাড়ী সান্যাল, কমল মিত্র, ছবি বিশ্বাস, বিকাশ রায়, জহর গাঙ্গুলী, নবদ্বীপ হালদার—এঁদের দাঁড় করাতেন তাহ'লে জয় একেবারে নির্ঘাৎ ! এ্যাসেম্বলী-তে এম্-এল্-এ-রা তো অভিনয়ই করেন ! সেক্ষেত্রে সত্যিকারের অভিনয়-শিল্পীরাই তো উপযুক্ত ! কি বলেন ?

তৃপ্তি চট্টোপাধ্যায়, শ্যামবাজার, কলিকাতা

ছবি তোলার পর কিভাবে তা বাজারে ছাড়া হয় ?

ডিস্ট্রিবিউটরদের মারফৎ। তাঁদের কাছ থেকে ছবি নেন এক্জিবিটররা। তখনই দর্শকেরা ছবি দেখতে পান তাঁদের ছবিঘরগুলিতে।

ছায়াছবির কোনো শিল্পীকে চিঠি দিতে হ'লে আপনাদের মারফৎ দেওয়া চলে কি ?

চলে। তবে আমরা না প'ড়ে কোনো চিঠি কাউকে দিই না। আপত্তির কিছু থাকলে সঙ্গে সঙ্গেই তা নষ্ট করে ফেলা হয়। চিঠিতে সুস্থ মনের পরিচয় পেলে আমরা তা সানন্দে শিল্পীদের হাতে পৌঁছে দিই।

অতুল সেন, জলপাইগুড়ি

কোন্ দেশে সিনেমা-হল সবচেয়ে বেশি ? সে-তুলনায় ভারতবর্ষেই বা কয়টি ?

আমেরিকায়। তুলনায় ভারতবর্ষের স্থান খুব নীচে নয় !

'৪২'-ছবি থেকে কতটুকু বাদ দেওয়া হয়েছে ?

সামান্যই। যোগ করা হয়েছে বেশি !

মুকুলরাণী রায়, কুণ্ডু লেন, কলিকাতা

'অনমোল সাহারা' ও 'ফুলওয়ারী' ছবিতে কি

গীতা রায় (বোম্বে), সত্য চৌধুরী ও সুপ্রীতি ঘোষ প্লে-ব্যাক করেছেন ?

হ্যাঁ, আপনি ঠিকই শুনেছেন।

শান্তিময় রায়, গৌরীবাড়ী লেন, কলিকাতা

'প্রত্যাবর্ত্তন'-ছবিতে অসিতবরণ একই দৃশ্যে 'শঙ্কর' ও 'স্বপন'-এর ভূমিকায় অভিনয় করলেন কি করে ?

এটা ক্যামেরার কৌশল। 'নিশান'-ছবিতে ঠিক এই ব্যাপারই ঘটেছিল। একজনকে একই দৃশ্যে দ্বৈত ভূমিকায় অভিনয় করানোর জন্য একটি অতি সহজ কৌশলের আশ্রয় নিতে হয়—তাকে স্টুডিয়োর ভাষায় বলে 'মাস্কিং'। ক্যামেরার লেন্সের ঠিক অর্দ্ধেক ঢাকা দেওয়াকেই 'মাস্কিং' বলে। যে-অর্দ্ধেক খোলা থাকে তা দিয়ে প্রথমে ছবি তোলা হয়। তারপর অভিনেতা তাঁর দ্বিতীয় চরিত্রের অভিনয় করেন। তখন লেন্সের ঢাকা-অংশ খুলে সেই অভিনয়ের ছবি তোলা হয়। বাকী অর্দ্ধেক ঢেকে রাখা হয় সেই সময়। বলা বাহুল্য, এই সময় অর্থাৎ দ্বিতীয় 'মাস্কিং'-এর সময় ফিল্মকে বিপরীত দিক থেকে গুটিয়ে ঠিক প্রথম চিত্রগ্রহণের স্থানে আনা হয়। এইভাবেই দ্বৈত-চরিত্রের অভিনয় সম্ভব।

মহম্মদ জ্যাকেরিয়া, কান্দী, মুর্শিদাবাদ

ওপরকার এই জবাবে আপনার প্রশ্নেরও জবাব মিলবে।

ত্রিপুরেশ্বর ভট্টাচার্য্য, আগরতলা

'আষাঢ়'-সংখ্যা 'চিত্রবাণী'-তে এক প্রশ্নের জবাবে আপনি যাঁদের নাম জানিয়েছেন, তাঁরা ছাড়াও আরও অনেক অ-বাঙ্গালী বাংলা-ছবিতে অভিনয় করেছেন। যথা—বিক্রমকাপুর (শেষ-উত্তর), বংশীলাল (অভিযাত্রী), মিসেস এ্যাম্বার (অভিযাত্রী), হ্যান্স গ্লাস (চন্দ্রশেখর), ডোরা স্যামুয়েল (রূপকথা ও পরিত্রাণ), কাকু (ইন্দ্রজাল),

কুলদীপ কাউর (চীনের পুতুল), '৪২ ছবিতে জনৈক ইংরেজের ভূমিকাভিনেতা এবং 'আনন্দ-মঠ' চিত্রেও বিদেশীয় ভূমিকায় কয়েকজন এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

ধন্যবাদ, 'আষাঢ়'-সংখ্যায় যাঁদের নাম করেছি, তাঁরা সকলেই একাধিক ছবিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকায় নেমেছেন। 'আনন্দমঠে' যে-কয়জন এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান নেমেছেন তাঁরা হলেন পিয়ার্সন সুরিটা (অল ইণ্ডিয়া রেডিওর ... বার্তাবিবরণী প্রচার করেন), ব্যাসিল ও জার্ডিন। এছাড়া, 'সম্পদ' ছবিতে রিচার্ড ক্রুক্‌স, 'বাগদাদে' বেগম পারা-র দেখা পাবেন। 'শাপমুক্তি'-ছবিতে নরেন্দ্রদাস ব'লে একটি অবাঙালী কিশোর-অভিনেতার সাক্ষাৎ আমরা পেয়েছি। তেমনি, 'ছোটা ভাই'-ছবির সুরুব-এর নাম করা যায় এই প্রসঙ্গে।

'আষাঢ়'-সংখ্যার 'চিত্রবাণী'-তে যাঁদের নাম করেছেন, তাঁরা ছাড়া আরও কয়েকজন বাঙালী সংগীত-পরিচালক বোম্বেতে আছেন। যথা—কে. দত্ত (বড়ী মা, মেরী কহানী), জ্ঞান দত্ত (সুনহরে দিন), রাম গাঙ্গুলী (সংগম, মওসম্, দীপক), এবং এস্. কে. পাল (সাগর, ভীষ্ম-প্রতিজ্ঞা)।

এবারও ধন্যবাদ জানাই। এই তালিকায় হেমন্ত মুখোপাধ্যায় (হিন্দী আনন্দমঠ') এর নামও যোগ করতে পারেন।

অসীম রায়, সুবার্বন স্কুল রোড, কলিকাতা

'মন্দির'-ছবিতে 'ম্যয় ভুখা হুঁ'গানটি কে গেয়েছেন?

সত্য চৌধুরী।

এস্ মুখার্জী, হালদারপাড়া রোড, কলিকাতা

কানন দেবী এখন যে উপাধি ধারণ ক'রে আছেন, তা থেকে আবার কবে বদলী হবেন?

কানন দেবীর 'উপাধি' তো 'অভিনেত্রী'। তা থেকে তাঁর 'বদলী' (!) হবার কোনো আশঙ্কাই নেই।

হিল্লোল ভট্টাচার্য, কামারপাড়া, চুঁচুড়া

বাংলা ভাষায় চিত্রকলা ও আনুষঙ্গিক বিষয়ে যে-কয়খানি পত্রিকা আছে তার মধ্যে আমার মতে 'চিত্রবাণী' সর্বশ্রেষ্ঠ।

আপনার এই অভিনন্দনের জন্য ধন্যবাদ।

নবকুমার সন্ন্যাসী, কলিকাতা

অশোককুমার একসঙ্গে বাইশখানা ছবির টাকা কি করবেন?

প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড আর পেনসনের জন্য মজুত রাখবেন।

নৃত্য-শিল্পী হিসাবে প্রভা, রাজলক্ষ্মী ও মনো-রমার স্থান কোথায়?

অভিনয়-শিল্পী হিসাবে কাকু, সিতারা ও আজুরীর স্থান যেখানে।

বাঙালী অভিনেতাদের মধ্যে সুদর্শন কে?

অতীতে—দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও জ্যোতিঃপ্রকাশ। বর্তমানে—ছবি বিশ্বাস।

যোগেন্দ্রনারায়ণ রায়, জলপাইগুড়ি

দেবিকারাণী কি টাঙ্গাইলের কোনো জমি-দারের মেয়ে?

সে রকম কিছু শুনিনি।

তারক চট্টোপাধ্যায়, নৈহাটি

'রত্নদীপ' নাকি তামিলভাষায় তোলা হচ্ছে?

শুধু তামিল নয় হিন্দীতেও। তবে, বিকাশ রায়ের জায়গায় অভি ভট্টাচার্য আর, একটি বিশিষ্ট চরিত্রে পাহাড়ী সান্যালকে দেখতে পাবেন। তাছাড়া, মলিনা দেবী এবং এমন আরও কয়েকজন অভিনেতা-অভিনেত্রী এই দু'টি সংস্করণে অভিনয় করবেন যাঁরা বাংলা ছবিটিতে ছিলেন না।

দিলীপকুমার মিত্র, বক্সীবাজার, কটক

শুনলাম শান্তারাম-এর 'অমর ভুপালী' ছবি বাংলায় 'ডাব্' করা হচ্ছে। কে করছেন এবং কোন্ কোন্ বাঙালী শিল্পী এতে কণ্ঠস্বর প্রয়োগ করবেন?

নীতিন বসু 'ডাবিং'-এর দায়িত্ব নিয়েছেন। কণ্ঠস্বর প্রয়োগের জন্ত কিছুদিন আগে কলকাতা থেকে নীলিমা সান্যাল (রেডিও) ও গৌতম মুখোপাধ্যায় বোম্বাই গেছেন। তাছাড়া এ-ছবিতে মণি চট্টোপাধ্যায় ও সমর চট্টোপাধ্যায়ও ('সমর'-খ্যাত) তাঁদের কণ্ঠস্বর দেবেন। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার এ-ছবির বাংলা গান লিখছেন। কে কে প্লে-ব্যাক করবেন তা এখনও ঠিক হয়নি।

মহম্মদ ইয়াসিন, রায়গঞ্জ

রবীন মজুমদার কি চিত্রজগৎ থেকে বিদায় নিলেন ?

না। 'অবানবন্দী'-তেই তাঁকে দেখতে পাবেন।

ভগবান মানুষ সৃষ্টি করেছেন না মানুষ ভগবান সৃষ্টি করেছেন ?

ছুটোই সত্য। ইলেকট্রিসিটির পজিটিভ্ ও নেগেটিভ্ তারের মত আর কি! ছুটো না হলে আলোই হয় না!

স্বদেশরঞ্জন দে, ডিব্রুগড়, আসাম

'শবিস্তান' ছবিতে কোন্ স্থানে শ্যামবাবু মারা যান ? এর আগে অন্য কেউ কাজ করতে করতে মারা গিয়েছেন কি ?

মৃত্যু-রহস্য সম্পর্কে আপনার কৌতূহল তারিফ করবার মতো!

'মহল' ছবিতে যে মহলটি দেখানো হয়েছে সেটি নাকি অশোককুমারের মহল ?

অশোককুমার এত বোকা নন যে ঐ রকম ভুতুড়ে-বাড়ীতে বাস করবেন!

তপনকুমার সেন, সৃষ্টিধর দত্ত লেন, কলিকাতা; মঞ্জু রায় ও অসীম রায়, ল্যান্সডাউন রোড্, কলিকাতা; হাসিরাণী ঘোষ, অন্নদা ব্যানার্জি লেন, কলিকাতা

আপনারা যে-সব গায়ক-গায়িকার জীবনী প্রকাশের জন্ত লিখেছেন আমরা তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করছি। ছু'এক মাস পর থেকেই আপনাদের এই কৌতূহল মেটাতে পারবো ব'লে আশা রাখি।

প্রীতিভূষণ পাল, ধুবড়ী, আসাম

'কালীঘাটা'র বীণা রায় কি বাঙালী ?

না, পাঞ্জাবী।

যাত্রা, থিয়েটার ও সিনেমার অভিনয়ে মূলগত পার্থক্য আছে কি ?

আছে বৈকি! যাত্রা, থিয়েটার ও সিনেমার অভিনয় যথাক্রমে তানপ্রধান, ধ্বনিপ্রধান ও স্বরাঘাত-প্রধান ছন্দের মতো!

জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য, কর্মপুর, মানভূম

মঞ্চ-অভিনয়ের যোগ্যতাই কি পর্দায় অভিনয়ের যোগ্যতা ?

কে বললে? পর্দাভিনেতাদের অনেকেই তো মঞ্চে একবারও পদধূলি দেননি!

সুনিপুণ সরখেল, হাজারিবাগ

বাংলার কয়েকজন উল্লেখযোগ্য নবাগত অভিনেতা-অভিনেত্রীর নাম করুন।

নবাগতদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কিশোর-অভিনেতা নীরেন ভট্টাচার্য (বাবলা)। তাছাড়া, বীরেন চট্টোপাধ্যায় (জিঘাংসা), মায়া গাঙ্গুলী (বন্দীপ), রমলা চৌধুরী (সম্পদ), সমীরকুমার (সম্পদ) এঁদেরও নাম করা যায়। কিছুদিনের মধ্যে প্রভাত মুখোপাধ্যায় (মালঞ্চ) ও অনুশ্রী দেবী এবং বসন্ত চৌধুরীকে ('মহাপ্রস্থানের পথে') দেখতে পারেন।

আভা বাগচি, আসাম

পরিচালক শান্তারামের স্ত্রী কি বাঙালী ? তাঁর নাম কি শান্তা মজুমদার।

অবাঙালী বলেই তো জানি। তাঁর নাম জয়শ্রী দেবী।

'মেজদিদি'তে 'পাঁচুগোপালে'র ভূমিকায় কে নেমেছিল ?

শ্রীমান নিরঞ্জন কর্মকার (লেতো)

বৃন্দাবনচন্দ্র নন্দী, বৈদ্যবাটি, হুগলী

জয়রাজের শিক্ষাগত গুণাবলী কি ?

তিনি হায়দ্রাবাদের নিজাম-কলেজ থেকে আই-এস্‌-সি পাশ করেন।

বিখ্যাত গায়ক মুকেশ ও সুরাইয়া একত্রে কোন্ ছবিতে নেমেছেন ?

মুকেশ ও সুরাইয়া একত্রে কোনো ছবিতে নামেন নি। তবে, সম্প্রতি মুকেশ এককভাবে 'মল্লার' নামক হিন্দী ছবিতে নেমেছেন।

কাঞ্চন মুখোপাধ্যায়, নারায়ণ নগর, বেনারস

বাংলাচিত্রের পতনের জন্য দায়ী কে ?

কতকগুলি ভুঁইফোড় পরিচালক, অনভিজ্ঞ ও অপরিণামদর্শী প্রযোজক যৌনতাসর্বস্ব-হিন্দীচিত্রের প্রভাবে প্রভাবান্বিত রুচিবিকারগ্রস্ত এক শ্রেণীর দর্শক

বাংলার অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা যে একে একে বম্বে যাত্রা করছেন তার শেষ পরিণতি কি ?

ভালোই। কয়েকজন বাঙালী শিল্পীর পকেটে কিছু টাকা আসবে। কিন্তু, এটা কি জানেন বাংলাদেশে যারা ক্ষমতাশালী অভিনেতৃগোষ্ঠীর মধ্যে পড়েন সেই প্রভা, ছায়া দেবী, কানন দেবী চন্দ্রাবতী মলিনা, অহীন্দ্র চৌধুরী, নরেশ মিত্র ছবি বিশ্বাস, জহর গাঙ্গুলী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, কমল মিত্র, শম্ভু মিত্র, সুভা গুপ্ত মঞ্জু দে, সন্ধ্যারাণী, ধীরাজ মজুমদার, বিকাশ রায়, রেণুকা রায়, কানু বন্দ্যোপাধ্যায় তুলসী চক্রবর্তী, তুলসী লাহিড়ী শোভা সেন প্রভৃতি এখনও কলকাতায় আছেন এবং থাকবেনও।

শম্ভুনাথ রায়, আসনপুর, হুগলী

পার্থসারথির পরিচালনায় 'সিরাজদ্দৌল্লা'র ছবির নাম ভূমিকায় কে আছেন ?

স্বর্গতঃ নির্মলেন্দু লাহিড়ীর পুত্র নবগোপাল লাহিড়ী। পর্দায় তাঁর নামকরণ করা হয়েছে অরুণেন্দু লাহিড়ী।

মন্টু সন্ন্যাসী, মলয়পুর, হুগলী

জলপ্রপাত ছাড়া আর অন্যভাবে কি 'মন্তাজ' দেখানো যায় না ?

আপনি সত্যিই বেশ রসিক! 'মন্তাজ'-অভিজ্ঞ-ই বলতে হবে আপনাকে!

মিনতি গুপ্তা, বাঁকীপুর, পাটনা

নিরুপা রায় ও ওম্ প্রকাশ কি পাঞ্জাবী ? তাঁরা প্রথম কোন্ কোন্ ছবিতে নামেন ?

নিরুপা রায় গুজরাটী মহিলা। ১৯৩১ সালে বালসারে তাঁর জন্ম। তাঁর সাংসারিক নাম—কোকিলা। ভি. এম. ব্যাস প্রযোজিত 'রণক দেবী' ছবিতে সর্বপ্রথম দেখা দেন। ওম্ প্রকাশ—কাশ্মীরের এক সম্পন্ন গৃহস্থের পুত্র। ১৯১৯-সালে লাহোরে তাঁর জন্ম হয়। হীরেন বসু পরিচালিত দাসী' ছবিতে প্রথম অবতীর্ণ হন।

জয়ন্তী রায়, চারু এ্যাভিনিউ, কলিকাতা

সুমিত্রা দেবী এখন কোন্ কোন্ ছবিতে অভিনয় করছেন ?

হিন্দী 'মা-কা-দিল' ও 'ঘুংরু' ছবিতে।

ইন্দ্রজিৎ চট্টোপাধ্যায়, লক্ষ্ণৌ

কুলদীপ কাউর কি উত্তরপ্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন ? তাঁর প্রথম ছবি কি

না। ১৯২৫-সালে তিনি লুধিয়ানায় এক শিখ-পরিবারে জন্ম নেন। তাঁর অভিনীত প্রথম ছবি—'জিদ্দি' (বোম্বে টকীজ)

প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায়, ঝরিয়া

অমুভা গুপ্তার প্রথম বই কি ?

'সমর্পণ' (ডি-লুক্স পিক্‌চার্স)। ১৯৪৬-সালে এ-ছবি তোলা হয়, কিন্তু মুক্তি পায় অনেক পরে। চিত্রশিল্পে তিনি প্রথম যোগ দেন প্লে-ব্যাক গায়িকা হিসাবে। 'সন্ধি', 'বর্ণ র্জ্জুন' ও 'সম্রাট অশোক' ছবিতে গান করেন।

সুস্মিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, আপার সর্কুলার রোড, কলিকাতা

গীতা রায় ও লতা মুঙ্গেশকরের পরিচয় কি ?

খ্যাতনামা প্লে-ব্যাক গায়িকা। গীতা রায় ১৯৩১ সালে ফরিদপুর জেলায় এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সর্বপ্রথম বোম্বাইয়ের বিষ্ণু সিনেটোনের 'ভক্ত প্রহ্লাদ' ছবিতে একটি কোরাস গানের একটি লাইন একক কণ্ঠে গান। এ পর্যন্ত তিনি প্রায় দেড়শ' ছবিতে প্লে-ব্যাকে গেয়েছেন। তিনি হিন্দী ছাড়া মারাঠি, গুজরাটী ও পাঞ্জাবী ভাষায় গানও গান। সম্প্রতি কয়েকটি বাংলাছবিতেও চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। লতা মুঙ্গেশকর গোয়ার এক সম্ভ্রান্ত মহারাষ্ট্রীয় বংশে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম দিকে তিনি কয়েকটি হিন্দী ছবিতে অভিনয় করেন। আজ তিনি হিন্দী চিত্রজগতের সর্বশ্রেষ্ঠ প্লে-ব্যাক গায়িকা।

চিত্রে বাস্তবতা

বিপিনবিহারী রায়, এম, এ

শ্রীবিরোচন শর্ম্মা * ওরফে আমাদের বিরুদা সেদিন যখন আমাদের আড্ডায় এসে উপস্থিত হলেন, আমরা যে ক'জন সেখানে ছিলাম তাঁর সঙ্গে তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হবার জন্যে মনে মনে কোমর বাঁধলাম। কারণ বিরুদা'র স্বভাব, তিনি ছবি দেখতেও যেমন পটু, ছবিকে ছিঁড়ে খুঁড়ে টুকরো টুকরো করে বিশ্লেষণ করতেও তেমনি পটু। তাঁর মতামত আমরা অগ্রাহ্য করতে পারি না, প্রধান কারণ তিনি বয়সে প্রবীণ, আর এ দেশে ছবি তৈরীর সেই প্রথম নির্ব্বাক যুগ থেকে আরম্ভ করে আজো পর্য্যন্ত প্রায় কোন বাংলা ছবি দেখতে বাকী রাখেন নি। তাঁকে যথারীতি আপ্যায়িত করার পর তিনি বললেন—

আমি যদি বলি আমি আগ্রা গেছিলাম, কাল ফিরেছি, তোমরা তাহলে আমাকে প্রথম কি প্রশ্ন করবে?

নরেন বললে, তাজমহল কেমন লাগলো, এই প্রশ্ন নিশ্চয়।

'দাদা বললেন, ঠিক। আর আমি যদি তার উত্তরে সংক্ষেপে বলি "কী আর এমন দেখতে," তাহলে?

সুধীর বললে, ও বাবা, তাহলে ত লোকে আপনাকে মারতে যাবে। জগতের শ্রেষ্ঠ চিত্রকর, স্থপতিবিৎ, কবি থেকে আরম্ভ করে অতি সাধারণ লোক পর্য্যন্ত যার প্রশংসায় শতমুখ, সেই তাজমহলকে আপনি যদি "এমন আর কি" বলে উড়িয়ে দেন,—

বাধা দিয়ে বিরুদা বললেন, এই কথাই চাইছিলাম। আজ আমি একখানি ছবির আলোচনা করতে চাই, যে ছবি বহুরাজ্য দেশ ঘুরে, এক বছর সেন্সর বোর্ড কর্ত্তৃক বাধা প্রাপ্ত হওয়ার পর পশ্চিম বাংলায় প্রদর্শিত হবার অনুমতি পায়, যার প্রশংসায় কাগজওলারা শতমুখ, সেই ছবি দেখে এসে যদি আমি আজ তোমাদের কাছে বলি "এমন কিছু না" তাহলে নিশ্চয় তোমরাও সেটা তাজমহলের নিন্দার মতোই মনে করবে?

নরেন বললে, দাদা, আপনি ত "বিয়াল্লিশ" ছবির কথা বলছেন, ওতে কিরকম সাংঘাতিক রিয়ালিজ্‌ম্ (realism) দিয়ে পুলিশের নির্ম্মম অত্যাচার ফুটিয়ে তুলেছে, আগে কোন ছবিতে ওরকম দেখেছেন কি?

বিরুদা একটু হেসে মৃদু মৃদু ঘাড় নেড়ে বললেন, হুঁ হুঁ, ওই রিয়ালিজম্—বাস্তবতা—কথাটার এতো আজকাল অপপ্রয়োগ হচ্ছে, ওই কথাটিই তোমাদের মুখ থেকে শুনতে চাইছিলাম। এবারে আমার যা বক্তব্য বলবার সুবিধে হলো। আমি দেখলাম যে বেশীরভাগ কাগজেই '৪২" ছবির রিয়ালিজ্‌ম্ রিয়ালিজ্‌ম্ বলে উচ্চ প্রশংসা চললো, আমি কিন্তু বলবো ওই ছবিখানাতেই বিশেষ করে এমন "অবাস্তব" ঘটনা বা অবস্থার ছড়াছড়ি রয়েছে সেরকম খুব কম ছবিতেই দেখেছি। মনে কোরো না আমার ওই ছবি বা অন্য কোন ছবির ওপর কোন বিদ্বেষ আছে। আমি যা বলছি, তোমাদের কাছে সেটা আমার আক্ষেপেরই প্রকাশ।

কী যে বলেন বিরুদা, সুধীর বললে, মিলিটারী বা পুলিশের নির্ম্মম ও লোমহর্ষণ অত্যাচারের অমন বাস্তব দৃশ্য আর কোথাও—

আবার বাধা দিয়ে বিরুদা বললেন, ঠিক কথা, ওই ছবিখানি বিয়াল্লিশ সালের বিপ্লবের ছবিও নয়, সে দিকটা মোটে ফোটানো হয়নি, কেবলই পুলিশের অত্যাচার বিপ্লবীদের ওপর, নিরীহ গ্রামবাসীর ওপর, সেটাই খুব জলন্তভাবে ফোটাবার চেষ্টা হয়েছে। শ্রাবণ সংখ্যা "চিত্রবাণীতে" ছবিটির সমালোচনা করতে গিয়ে তোমাদেরও এ কথা স্বীকার করতে হয়েছে।

* শ্রীবিরোচনের লিখিত প্রবন্ধ "চিত্রে অসঙ্গতি" ১৩৫৭ সালের কার্ত্তিক সংখ্যা "চিত্রবাণী"তে

সম্প্রমুক্ত 'জীবন-তারা' চিত্রের একটি দৃশ্য

হাতের গোড়ায় পেয়েছি এখন ঐ বাস্তবতা আর অবাস্তবতা সম্বন্ধে বলতে চাই।

প্রথমেই ধরো ছোট একটি পয়েন্ট, তোমাদের চোখ হয়ত এড়িয়ে গেছে। দাশু কামারের অত্যাচার-প্রপীড়িত মেয়ের মৃত্যুর পর, সে তার কারখানায় ছোরা তৈরী করতে লেগে গেল। সব গ্রামবাসীকে, বিশেষ করে মেয়েদের, অত্যাচারের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্যে বিতরণ করতে লাগলো। দেখেছ ত? ছোরাগুলির চেহারা মনে আছে? এক ফুটের বেশী লম্বা,

বলে টেবিলের ওপর থেকে বিরুদা "চিত্রবাণী"খানা তুলে নিয়ে পড়ে দিলেন—

"আগষ্ট আন্দোলনের বিস্তৃত ঘটনাবলী নিয়ে "৪২" এর কাহিনী রচিত হয়নি। এই আন্দোলনে পুলিশ ও সামরিক ব্যক্তিরা অত্যাচারের যে তাণ্ডবলীলা দেখিয়েছিল, আলোচ্য ছবিতে তাই প্রধান হয়ে উঠেছে"ইত্যাদি।

সুধীর বললে, হ্যাঁ, ওকথাটা অবশ্য স্বীকার করতেই হবে, যে বিপ্লবীদের ক্রীয়াকলাপ বা তৎপরতার দিক্‌টা—

বিরুদা বলে উঠলেন, যাক্ ও কথা। প্রথমেই আমি মেনে নিচ্ছি যে পুলিশের অত্যাচারের দিকটা খুব ভাল করে ফুটে উঠেছে, সে বিষয়ে তোমাদের সঙ্গে আমি একমত। দাশু কামারের ওপরে অত্যাচার ও শেষে তাকে লরীর পেছনে বেঁধে টেনে নিয়ে যাওয়ার দৃশ্যটা অদ্ভুত ও লোমহর্ষকভাবে ফুটে উঠেছে। কিন্তু ঐ যে "বাস্তবতা"র ধুয়ো উঠেছে অথচ আমি বলবো এমন কতকগুলো অবাস্তব ও অসম্ভব দৃশ্যের সমাবেশ আছে ছবিটাতে,—তাদের কথাই আলোচনা করতে চাই। মনে রেখো, '৪২ ছবির ওপর আমার কোন বিদ্বেষ নেই, ওটাকেই

চওড়াতেও কম নয়। সেই প্রকাণ্ড ছোরা মেয়েরা কাপড়ের মধ্যে লুকিয়ে নিয়ে ঘুরে বেড়াবে? আচ্ছা, তা না হয় বেড়ালো। তারপর মনে করো যে দৃশ্যে বীণাকে ধরে মেজর ত্রিবেদীর কাছে হাজির করা হয়েছে। "মহাভারত পড়েছো? দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের কথা মনে আছে?" বলেন ত্রিবেদী। তারপর এক অফিসারকে—তার নামটা সেন না কি—হুকুম দেন বীণাকে বিবস্ত্রা করতে। চললো বীণাতে সেনেতে টানাটানি ধ্বস্তাধ্বস্তি খানিকক্ষণ, শেষ যখন সেন বীণাকে ঘরের কোণে ঠেসে ধরেছে, বীণা ছোরা বের করে তার বুকে বসিয়ে দিল, সেন পড়ে গেল। মনে পড়ছে ত? কী ভয়াবহ রোমাঞ্চকর দৃশ্য, নয়? কিন্তু ভায়া একবার পরীক্ষা করে দেখো ত, দাশু কামারের সেই প্রকাণ্ড ছোরা একটি মেয়ে কাপড়ের মধ্যে লুকিয়ে রেখে ওই রকম ধ্বস্তাধ্বস্তি করলে, মেয়েটি নিজেই কেটে কুটে খুন হয়ে যেতো। এখানে বলা প্রয়োজন যে আমরা (দর্শকরা) শুধু রাশি রাশি ছোরাই দেখেছি, তার কোন রকম খাপ, চামড়ার হোক কাঠের হোক, দেখিনি। সুতরাং ধরে নিতে হবে যে সকলেই নগ্ন ছোরা নিয়েই

বেড়াতো। কাজেই বলতে বাধ্য হচ্ছি যে একটি মেয়ের ওরকম ছোরা কাপড়ের মধ্যে রেখে টানাটানি হেঁচড়া হেঁচড়ি একজন পুরুষের সঙ্গে করা মোটেই "বাস্তব" নয়। আরো মনে করো, একজন অপরাধীকে মেজরের সামনে আনা হলো, তার আগে তাকে কোন-রকম সার্চ্চ্ বা তল্লাসী করা হলো না, এটাও বাস্তবের সঙ্গে খাপ খায় না। কাজেই এখানে ধরে নিতে হবে যে বোকা পুলিশ কোনরকম সার্চ্চ্ না করেই বীণাকে মেজরের সামনে এনেছিল ও সেনকে হত্যা করবার সুযোগ দিয়েছিল।

তারপর যা ঘটলো সেটাও কতদূর বাস্তব তোমরা বিবেচনা করো। সেন তো ছোরা খেয়ে পড়লো, বীণা কোণ ঠেসে দাঁড়িয়ে রইলো, ত্রিবেদীও হতভম্ব হয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল! বেশ কিছুক্ষণ পরে সে এগিয়ে এসে লোকজন ডাকলো সেনের দেহ তুলে নিয়ে যেতে, তারপর নিজেই আবার বীণাকে ধরতে গেল, ইতি শেষঃ! পরবর্ত্তী দৃশ্যে আমরা সেই ঘরের বহির্দৃশ্য দেখতে পাই ও বীণার চীৎকার শুনতে পাই। কিন্তু লজিক এবং মনস্তত্ত্ব দুদিক থেকেই বিচার করলে, ত্রিবেদীর কঠোর ও নির্ম্মম চরিত্র পর্য্যালোচনা করলে, এই সেনকে হত্যা করার কি পরিণতি হওয়া উচিত ছিল বলো ত? হয়, বীণার উচিত ছিল সেই ছোরা নিজের বুকে বসিয়ে মরা, অথবা ত্রিবেদীর উচিত ছিল তৎক্ষণাৎ তাকে গুলি করে মারা। আমি বলবো শেষেরটাই বেশী খাপ খায়, কারণ মেয়েদের পক্ষে ছুরিছোরা দিয়ে আত্মহত্যা করাটা প্রায় অসম্ভব, তারা গলায় দড়ি, বিষ বা কেরোসিনই বেশী পছন্দ করে। ত্রিবেদী অত বড়ো অফিসার, তার সামনে তার এক অফিসারকে হত্যা করলে, আর সে চুপ করে দাঁড়িয়ে তাই দেখলো?

এখানে নরেন বলে উঠলো, তা যদি বলো দাদা, পট্ করে গুলি করে মেরে দেওয়া কি সহজ? ত্রিবেদীকেও ত কৈফিয়ৎ দিতে হতে পারতো, কেন গুলি করে মারলো—

বিলক্ষণ, বললেন বিরূদা, ত্রিবেদীর কার্যকলাপ যে রকম দেখানো হয়েছে তাতে একটা তুচ্ছ গ্রাম্য মেয়েকে গুলি করে মারা তার পক্ষে কিছুই নয়। ঘরে আগুন দিয়ে শিশুকে পুড়িয়ে মারতে পারে, আর যে মেয়ে তার সামনে তার অফিসারের বুকে ছোরা বসালো, তাকে গুলি করতে পারে না? যাক্ ও কথা থাক, তারপরে বলি শোন।

তারপর গ্রামের লোক দল বেঁধে পুলিশের ঘাঁটির বিরুদ্ধে (নিরস্ত্র) অভিযান করলো, সামনে চললেন ঠাকুরমা কংগ্রেস পতাকা নিয়ে। পুলিশ চালালো গুলি, ঠাকুরমা নিহত হলেন, আরো অনেকে হতাহত হলো। এইখানে যদি ছবিটি শেষ হতো তাহলে মন্দ হতোনা, কিন্তু তারপরেও কাহিনীকে টেনে নিয়ে গিয়ে যে রকম অসম্ভব ও অসম্ভাব্য ঘটনার ও পরিবেশের অবতারণা করা হলো, তার মধ্যে কতটা বাস্তবতা আছে সেটা তোমরাই

মুক্তি-প্রতীক্ষিত 'বেবস্' চিত্রে ভারতভূষণ ও পূর্ণিমা

বিচার করো। সংক্ষেপে বলছি, বীণার পাগল হয়ে যাওয়া, তার আঁচল ভিজিয়ে আহত বিপ্লবীদের মুখে জল দেওয়া, আহত হীরোর পুনর্জ্জীবন লাভ করা ও কংগ্রেস পতাকা টানতে টানতে বুকে হেঁটে পুলিশের ঘাঁটির সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে ওঠা এবং অনুগামী জনতাকে নিয়ে ঘাঁটি দখল করা, এই সঙ্গে বীণারও পাগলামী সেরে গেল, সেও দলের সঙ্গে গেলো, সব পুলিশ অফিসার পালিয়ে গেলো (কেন? জনতা নিরস্ত্র আর তারা সশস্ত্র, তবে ও রকম ভয়ার্ত্তভাবে পেছনের দরজা দিয়ে, বেড়া ভেঙ্গে লাফিয়ে মোটরে উঠে পালালো কেন? এ "কেন"র কোন সদুত্তর হয়না, এক বলতে পারো কাহিনীলেখক বা পরিচালকের খেয়াল)—কিন্তু দুর্দ্ধর্ষ অফিসার ত্রিবেদী একা পালালো না, তার রিভলবার চালালো, শেষে মাটিতে পড়ে গেলো, তার ওপর দিয়ে মাড়িয়ে জনতা নাচতে নাচতে কংগ্রেসের জয়গান করতে করতে পুলিশী দুর্গের ভেতর ঢুকে পড়লো। এসব ঘটনাকে যারা রিয়ালিষ্টিক—বাস্তব, —বলে বলুক আমি বলবো, কল্পনাবিলাসীর খেয়াল—অথবা গাঁজাখোরের স্বপ্ন।

হ্যাঁ, অবশ্য আপনি বলতে পারেন, বললে সুধীর।

থামো ভায়া, বাধা দিয়ে বিরুদা বলে চললেন আবার, পিছনে ফিরে যাওয়া যাক্। বুদ্ধিমান পরিচালক অগ্রগামী জনতার ওপরে পুলিশের গুলিবর্ষণের দৃশ্যটি বেশ কৌশলে দেখিয়েছেন অর্থাৎ গুলি লেগে ধপাধপ্ লোক পড়ে যাচ্ছে—তা না দেখিয়ে, দেখিয়েছেন, একবার জনতার এগোনো, একবার পুলিশের প্রস্তুতি, অফিসার এসে জনতাকে সাবধান করে দিলেন যে পুলের সীমানা পার হলেই তিনি গুলি করবার হুকুম দেবেন। জনতা সীমানা পার হলো, গুলি ছোঁড়ার হুকুম তিনি দিলেন, তার পরেই দেখা গেল হতাহত অবস্থায় কয়েকজন বিপ্লবী ছড়িয়ে পড়ে আছে, জল জল করে কাতর আর্ত্তনাদ করছে। অর্থাৎ গায়ে গুলি লেগে পড়ে যাওয়াটুকু পরিচালক এড়িয়ে গেছেন। বুদ্ধিমানের কাজই করেছেন, কারণ একটিমাত্র লোকের গুলিবিদ্ধ হয়ে পড়ার যে দৃশ্য তিনি দেখিয়েছেন, সেটি একবারে রিডিকুলাস্—হাস্যাস্পদ হয়েছে। আমি বলছি "ঠাকুরমার" কথা, যিনি সর্ব্বাগ্রে চলছিলেন, পতাকা হাতে নিয়ে, তিনি গুলিবিদ্ধ হয়ে ধুপুস্ করে পড়ে গেলেন, কিন্তু তারপরেও তিনি তাঁর নাতনীকে ডেকে পতাকা তার হাতে দিয়ে এগিয়ে যেতে বলে তবে মারা গেলেন। ঘটনাটি সুবিখ্যাত "মাতঙ্গিনী হাজরার" মৃত্যুর অনুকরণে করা হয়েছে, তবে আমি যতদূর জানি, পুলিশের গুলিতে মাতঙ্গিনীর তৎক্ষণাৎ মৃত্যু ঘটেছিল, সুতরাং এক্ষেত্রে ঠাকুরমার পতাকা হস্তান্তরের ব্যাপারটা পরিচালক (বা কাহিনী লেখকের) মস্তিষ্কপ্রসূত। সে যাই হোক, পর পর কয়েকটি "সটে" (Shot) আমরা দেখতে পেলাম, ঠাকুরমা দিব্যি সটান পাশ ফিরে শুয়ে পড়ে আছেন, কাপড়চোপড় বেশ সুবিন্যস্ত, তাঁর গালে ও হাতের পিঠে খানিকটা চৌকোভাবে রং লাগানো। অতো কাছ থেকে রাইফেলের গুলিতে আহত হয়ে পড়লে যে ওরকম সুবিন্যস্তভাবে পড়া সম্ভব নয় এবং গুলিবিদ্ধ ব্যক্তির রক্ত যে গড়িয়ে পড়ে, চারচৌকো হয়ে গায়ে লেগে থাকে না একথা কাকে বোঝাবো? সম্প্রতি কয়েক বছর যাবৎ কলিকাতার রাস্তাতেই বহুবার গুলি গোলা চলেছে এবং বহুলোক সে দৃশ্য স্বচক্ষে দেখেছে। তাতেও যদি এ বিষয়ে কোন অভিজ্ঞতা না এসে থাকে, তাহলে আমি পরিচালককে কোরিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে দেখে আসতে অনুরোধ করি—ভয় নেই, আমি যুদ্ধের মধ্যে তাঁকে যেতে বলছিনা, সেখানে যে ভারতীয় অ্যাম্বুল্যান্স দল সুখ্যাতির সঙ্গে কাজ করেছেন, তাঁদের কাউকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারবেন রাইফেলের গুলি বিদ্ধ হয়ে লোকে কি রকম করে পড়ে।

এবারে নরেন বলে উঠলো, অবশ্য দাদা আপনি যা বলছেন সেকথা খুব ঠিক, কিন্তু ভেবে দেখুন, ওরকম গুলিবিদ্ধ হয়ে ছিট্‌কে পড়ার "বাস্তব" দৃশ্য দর্শকের পক্ষে বড় বীভৎস হবে না? আর হয়তো দৃশ্যের বীভৎসতার জন্যেই সেন্সর বোর্ড সেটা কেটে বাদ দেবেন—

উত্তর দিলেন বিরুদা, ৷থা যদি বলো ত আমার আর বলবার কিছু নেই। তাহলে তোমরা পুতুলখেলা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকো, কিন্তু দোহাই তোমাদের, "রিয়ালিজ্‌ম্‌" "রিয়ালিজ্‌ম্‌" বলে চেঁচিও না। বাস্তবের ধার দিয়েও যাবেনা অথচ বাস্তব বাস্তব বলে একেবারে চমৎকৃত হয়ে যাবে, এ আমার ধাতে সয় না। যখন তোমরা বিদেশী ছবিতে গ্যাঙ্গষ্টার (Gangster) ও পুলিশের লড়াই ছাখো, অথবা ওয়েষ্টার্ণ (Western) ছবিতে গুলি গোলার বৃষ্টি ও রকমারী বীভৎস মৃত্যু ছাখো, তার বেলায় কি, বলো ত? গুলি করে মারবে, আবার তাকে আদর করে বিছানা পেতে শুইয়ে দেবে, তা তো হয়না।

চললুম আজ, অনেক বক্‌বক্‌ করেছি। জানি এসব আমার অরণ্যে রোদন, এই সব খুঁটিনাটি ব্যাপারের দিকে কোন পরিচালকই দৃষ্টি দেবেন না, ছবি যাতে perfect—নিখুঁত—হয় তা দেখবেন না, দেখবেন শুধু কিসে সস্তায় হাততালি পাবেন। এ ভাবে চললে বাংলা ছবির উন্নতি কতদিনে হবে? আচ্ছা আর এক দিন, এ বিষয়ে, ছবিতে "বাস্তবতার" কথা, আরো কিছু বলবার আছে, আজ আর নয়। যেটুকু তোমাদের বলে গেলুম তাই এখন হজম করো।
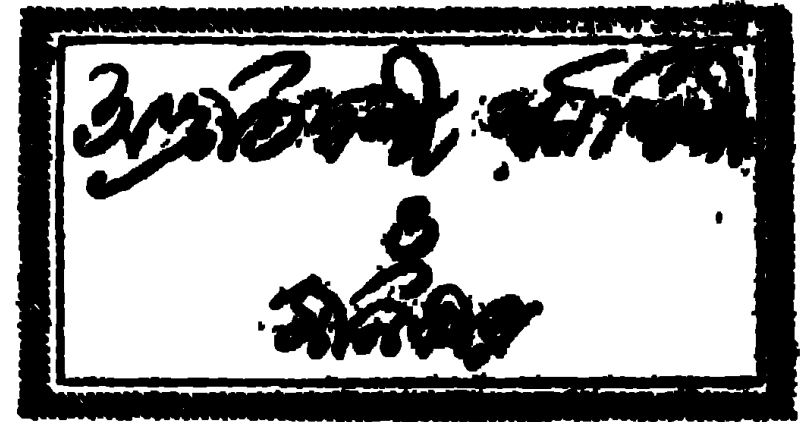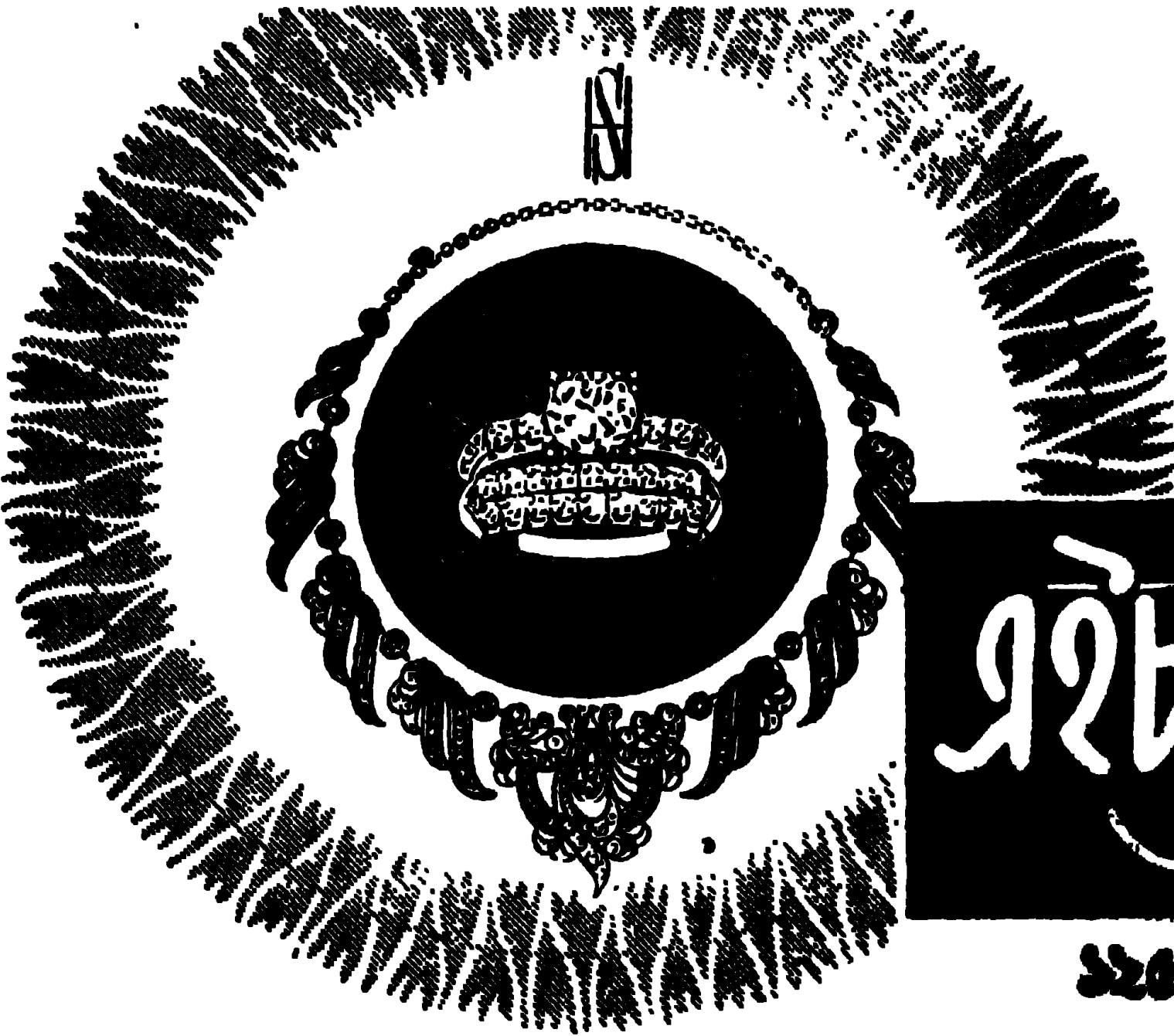
হৃতশ্রী বাঙ্‌লা ছবির পুনরুদ্ধার

মৃগাংক সেন

(দ্বিতীয় পর্যায় 'শারদীয়া চিত্রবাণী'তে দ্রষ্টব্য)

হৃতশ্রী-হতচ্ছাড়া বাঙ্‌লা ছবিকে বাঁচাবার পথ বাৎলাতে গিয়ে আমরা ইতিমধ্যে আসল প্রশ্নটির স্বরূপ ও মুমূর্ষু অবস্থা থেকে রক্ষা পাবার একটা মডেল-দাবাই দেখেছি।

কিন্তু এ সবের পরেও আরও একটা কথা থেকে যাচ্ছে, সাংবাদিকদের পক্ষ থেকে। বড় ছোট যাই হোক না কেন, চিত্র-সাংবাদিকদের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না এমন দু'একজন গৃহপালিত জীব থাকলেও থাকতে পারেন, বৃহত্তর ক্ষেত্রে এঁদের 'হাঁ-না'র মূল্য রসগোল্লা। অতএব চিত্র-সাংবাদিকদের একটা মত আছে, এবং সে মতের কিছু মূল্য আছে।—আপনি মানছেন তো?

অবশ্য, এখানকার চিত্র-নির্মাতারা চিত্র-সাংবাদিকদের খোলা-চোখে এখনো দেখতে শেখেন নি। ব্যক্তি-বিশেষের যে একটা পৃথক মত থাকতে পারে, এবং সেটা যে নিরংকুশ স্তুতিবাদ না হতেও পারে, এটা ভেবে দেখবার মতো বয়স অভিজ্ঞতা বাঙ্‌লা চিত্রনির্মাতাদের অনেকেই হারিয়ে বসে আছেন। দুঃখের কথা!

অপ্রাসঙ্গিক হ'লেও একটা কথা অবতারণা না করে এখানে পারছি না। ব্যক্তিবিশেষ অথবা বিশেষ কোন প্রতিষ্ঠানের প্রতি কটাক্ষপাত বলে আমার বক্তব্যকে ভুল বুঝবেন না যেন! আমাদের চিত্র-নির্মাতাদের দেখেছি অনেকেই মনে করেন কলকাতা থেকে প্রকাশিত দু'একটা বড় দৈনিক কাগজে ভাল সমালোচনা লেখাতে পারলে বোধ হয় ছবির খুব কাট্‌তি বাড়বে। ব্যবসায়িক দিক থেকে এ ধারণাটা যে কতো ফাঁপা তা বোধ হয় না বললেও চলে। আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে বল্‌তে পারি, কলকাতার আশ-পাশের মফঃস্বলে আমি বহুস্থানে ঘুরে-ফিরে দেখেছি যে, এসব স্থানের লোকেরা বেশীরভাগ কলকাতার অভিজাত-কুলপরিত্যক্ত একখানা বিশেষ দৈনিকপত্র নিয়মিত বাড়ীর জন্যে নিয়ে থাকেন আর অন্য-পত্র-পত্রিকার মধ্যে যারা মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে এমন কয়েকখানা সিনেমা সম্পর্কিত সাপ্তাহিক ও মাসিকের 'খদ্দের' আর কেউ না হোন্, এঁরাই। (চিত্রবাণী-সম্পাদক যেন তোষামোদ বলে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে ফুঁ দেবেন না—সেই সব কাগজ-পত্তরের মধ্যে বেশীরভাগ স্থানেই আপনার কাগজকে নিয়ে দস্তুর মতো 'ট্রোজান-ওয়ার' হতেও দেখেছি)। কলকাতার অভিজাত দু'একটা দৈনিক কি বললে-আর-না-বললে তাতে এঁদের কিছু এসে যায় না। যদি বা দু'এক টুকরো এঁর দেখতে পান, এঁদের মতের সঙ্গে অমিল হলে, আন্দাজে

সত্যযুগ 'জীবন-তারা' চিত্রে রাজকুমারী

ঢিল ছোঁড়ার মতো টপাস করে এঁরা চিত্র-সমালোচককে প্রযোজক পরিকল্পিত কোনো হোটেলের কোণে অথবা ধাবমান ট্যাক্সীর অন্তর্লোকে, সমালোচনা লেখার পূর্ব-মুহূর্তের অবস্থায় আবিষ্কার করে বসেন। এঁদের যে খুব দোষ আছে তা আমি বলতে পারি না। দৈনিক পত্রের চিত্র-সমালোচকরা মাঝে মাঝে, সত্যি বলতে কি, একটু হতাশ আমাদেরও করে থাকেন বৈকি!

কথা হচ্ছে

চিত্র-নির্মাতাদের উপরোধে পড়ে বামাল ছবিকে কামাল করে দেবার ব্যবস্থাপত্র দিয়ে যে-ঢেঁকিকে পাঠকসাধারণের চোখ-কাণ বেয়ে নামিয়ে দেবার চেষ্টা করলেই যে সে-ঢেঁকি কুড়ুৎ করে আপনার রাস্তা করে নেবে এমন কথা বললে ধোপার গাধাও ঢেঁকির সে-ভার বইতে গররাজী হবে, বলবে,—'আজ গাধা বলে যা বোঝাচ্ছ বুঝছি, কাল ঘোড়ার সঙ্গে মিতালী করে যে জিনিষ প্রসব করবো তার ঠেলা সামলাতে পারবে তো?—বিজ্ঞাপন-ছাপ মেরে রাস্তায় ঘুরবো পয়সা দেবেনা, দিলেও বালর বাদ দিয়ে, পা'য়ের চটিকে আমসত্ত বানিয়ে (যদিও আজকাল আর চটি পায়ে দিচ্ছি না)—তার ওপর বলতে হবে, কামাল করেছ। ছেলে কাণা বলে আমি তাকে পদ্ম-লোচন বলতে পারি, লোকে তাকে যে বংশলোচনও বলবে না। আর আমি জোর করে বংশকে পদ্ম বানাতে গেলে সেই শ্রীহীন বংশ দিয়ে আমার তোমার দু'জনার বংশই লোপাট হয়ে যাবে।'

উইন পিকচার্সের নির্মীয়মান বাংলা ছবি 'আবুহোসেনে'র নাম ভূমিকায় কালী বন্দ্যোপাধ্যায়

উপায়-উদ্ভাবন

তাহ'লে উপায় কি?—

উপায় আবিষ্কার করা মানে ছবির অপ্রত্যক্ষ [illegible] বাড়ানো। ছবি অর্থে ছাবা নয়—ছবিই। [illegible]

ফিল্ম-বোর্ড (প্রস্তাবিত) যে ছবি প্রযোজনা করবার অবকাশ দেবেন, অথবা ঐ ধরণের বিত্ত-মণ্ডলীর কাছ থেকে যে-ছবি বেরিয়ে আসবে বাজারে সেই-ছবির কথাই বলছি।

এখন, আমার মনে হয়, চিত্র-সাংবাদিকতা প্রধানতঃ দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে আছে। একভাগ চাইছেন বাঙ্‌লা ছবির বিরূপ সমালোচনা করলে যদি বাঙ্‌লা ছবির প্রতি দর্শককুলকে কিছু আকৃষ্ট করানো যায়—ছবির প্রযোজক-দের মগজে কিছু বুদ্ধি প্রবেশ করিয়ে দেওয়া যায়। আর এক দল কিছুটা রক্ষণশীল। তাঁরা চাইছেন বিরূপ সমালোচনা না করে শুধু ভালো দিকটা দেখিয়ে যদি বাঙ্‌লা ছবিকে বাঁচানো যায়। এগুলো অবশ্য আমার নিতান্তই অনুমান। আর অনুমান বলেই মনে হয়, এ দুটি প্রচেষ্টা একেবারেই বিপরীতমুখী ও পরীক্ষামূলক। তবে একথা বারবার আমার মনে হয়েছে যে দোষকে ঢেকে কখনও দোষ-ক্ষালণ সম্ভব নয়। যাই হোক, সেটাও আমার নিজস্ব মত। তর্ক উঠতে পারে বলেই সাফাই গাওয়া আর কি। আমার মনে হয়, বাঙ্‌লার অক্লান্তকর্মী চিত্র-সাংবাদিকসমাজ বাঙ্‌লার প্রযোজক-মণ্ডলীর কাছে এই বলে দাবী জানান যে তাঁদের যেন উপযুক্তভাবে ছবির সমালোচনা করবার অবকাশ দেওয়া হয়। অর্থাৎ এইভাবে যেন ছবি তোলা হতে থাকে যার ওপর উপযুক্ত সমালোচনা করা যেতে পারে; দোষ-দর্শনের ঊর্দ্ধে যেন এমন-কিছু থাকে যা প্রচার করলে পাঠক-সমাজ সমালোচকের চোখ দিয়ে ছবি দেখে তৃপ্তি অনুভব করেন। সব সমালোচকই যে ঠিক চোখ দিয়ে দেখে ঠিক কথা লিখবেন এমন কথা বলা শক্ত (পৃথিবীতে পাইকারী হারে দিগ্‌গজ জন্মায় না) তবে তাঁদের প্রত্যেকেরই কোন-না-কোন দৃষ্টিকোণ থাকা অসম্ভব নয়—এমন মনে না-করার কোন কারণ তো নেই।

সম্ভব—বোর্ড অফ ক্রিটিক্‌স্

শুনেছি, বাঙ্‌লা দেশে বেঙ্গল ফিল্ম জার্ণালিষ্ট্‌স্ এ্যাসোসিয়েশন নামে এখানকার চিত্র-সাংবাদিকদের একটা জবর সংহতি আছে। তা'হলে আর ভাবনা কোথায়?

ধরুন, ছবির প্রযোজক ছবি শেষ করে একটা 'রাশ-প্রিণ্ট' তৈরী করলেন উপযুক্ত সম্পাদনার পর। সঙ্গে সঙ্গে খবর দিলেন এ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তাকে। এ্যাসো-সিয়েশনের কর্মকর্তা চক্রবৃত্তিতে তিনজন বা পাঁচজনের একটা প্যানেল তৈরী করে সভ্যদের খবর পাঠালেন। সভ্যরা ছবি দেখে এলেন এবং সেন্সরের আগে প্রযোজকের ক্ষমতানুযায়ী গ্রহণ-বিসর্জন-মার্জনা সম্পর্কে পরামর্শ দিয়ে এলেন। প্রযোজক সেই নিরিখে ছবি খাড়া করে সেন্সরের কাছে পেশ করলেন। আমার মনে হয় এতে প্রযোজকের হয়তো লাভই হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে বহু আনুষঙ্গিক বৃথা-অর্থ অপচয়ের সুযোগও কমে যাবে।

তারপর ছবি যখন বাজারে ছাড়া হবে তার ওপর সমালোচকরা নিজের নিজের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়ে আপন-আপন সমালোচনা, গঠনমূলক তো বটেই, তৈরী করে পাঠকসমাজকে উপহার দেবেন। পরীক্ষামূলকভাবে এরকম একটা চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কি? আশু ফল পাবার সম্ভাবনা না থাকলেও অদূরে এর কার্যকারিতা বোঝা যাবেই। সে বিশ্বাস আমার আছে। বাঙ্‌লার চিত্র-সাংবাদিকদের যে সম্ভাবনার পরিচয় এই অল্প সময়ের মধ্যে পাওয়া গেছে তা পৃথিবীর অন্য কোন দেশ থেকেই কম নয়। আফ্‌শোসের বিষয় এই যে, আমাদের চিত্র-প্রযোজকেরা বোধ হয় ছবিসমেত লাইফ্‌ ছাপানোকেই জীবনের বৃত্তিনিচয়ের অন্যতম প্রধান অংশ বলে মেনে নিয়েছেন—আর কিছু?—মোটেই না।

[ইতিমধ্যে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় ফিল্ম এনকোয়ারী কমিটির সুপারিশ প্রকাশিত হয়েছে। লেখক প্রদর্শিত ও প্রস্তাবিত পরিকল্পনা অতি আশ্চর্যজনকভাবে সরকারী পরিকল্পনার সঙ্গে মিলে গেছে স্থানে স্থানে। তবু এই শেষ পর্য্যায় দিয়ে লেখক আত্মসচেতন ও স্বাতন্ত্র্যবিশ্বাসী বাঙ্‌লার বিশিষ্ট ও স্বধর্মী প্রযোজককুলকে বোঝাতে চাইছেন সরকার-নিরপেক্ষ হয়েও কিভাবে হৃতশ্রী বাঙ্‌লা ছবির পুনর্জাগরণ সম্ভব। আশা করি লেখকের অভীপ্সিত বিষয় সংশ্লিষ্ট মহলে যথাবিহিত আন্দোলনের সূচনা করবে —চিত্রবাণী-সম্পাদক]

চলচ্চিত্র তদন্ত কমিটির রিপোর্ট

শিল্পের অবনতির কারণ বিশ্লেষণ ও প্রতিকারের উপায় নির্দেশ

শ্রী এস কে পাতিলের সভাপতিত্বে চলচ্চিত্র তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছিল। প্রযোজনা, পরিবেশন, প্রদর্শন এবং ভারতীয় চলচ্চিত্রশিল্পের সমস্ত কারিগরি দিকে তদন্ত করে কমিটি ১ লক্ষ ২০ হাজার শব্দ সমন্বিত এক রিপোর্ট পেশ করেছেন। ১৯৪৯ সালে সেপ্টেম্বর মাস থেকে প্রায় দেড় বৎসরকাল ধরে কমিটি কাজ করেছেন। ভারতীয় চিত্রশিল্পের উৎপত্তি ও সংগঠন সম্পর্কে তদন্ত করে জাতীয় সংস্কৃতি ও শিক্ষাবিস্তারের এবং নির্দোষ চিত্তবিনোদনের মাধ্যম হিসাবে এর উন্নয়ন করতে হলে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার তা সুপারিশ করবার ভার কমিটির ওপর অর্পণ করা হয়েছিল। ভারতে কাঁচা ফিল্ম ও চলচ্চিত্রের যন্ত্রপাতি নির্মাণের সম্ভাবনা সম্পর্কেও কমিটিকে তদন্ত করতে হয়েছে।

তদন্ত কমিটির সদস্য ছিলেন সংসদের সত্যনারায়ণ, প্রযোজক শ্রী ভি শান্তারাম ও শ্রী বি এন সরকার। সগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার ডাঃ আর পি ত্রিপাঠি এবং প্রচার ও তথ্য দপ্তরের প্রতিনিধি শ্রী ভি শঙ্কর। কমিটি দেশের বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করেন। তাঁরা দশটি কেন্দ্রে চলচ্চিত্রশিল্পের ৩৩৯ জনের বেশী প্রতিনিধির সাক্ষ্য গ্রহণ করেন। চলচ্চিত্রশিল্প সম্পর্কে যে প্রশ্নাবলী প্রচার করা হয়েছিল ২৩৮টি প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবিশেষের কাছ থেকে তার উত্তর পাওয়া গেছে। ২২৫ জন সাংবাদিক, আইন সভার সদস্য, সরকারী কর্ম্মচারী, শিক্ষাবিদ ও বিজ্ঞানী 'চলচ্চিত্র ও জনসাধারণ' শীর্ষক দ্বিতীয় প্রশ্নাবলীর উত্তর দিয়েছেন। বিশেষ বিশেষ বিষয়ে কমিটি বিশেষজ্ঞগণের সঙ্গে পরামর্শ করেছেন। ১৯৫০ সালে বিশ্ব-পরিভ্রমণকালে শ্রী পাতিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, পশ্চিম ইউরোপ ও পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির চলচ্চিত্রশিল্প সম্বন্ধে মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করেন।

শিল্পের অবস্থা

তদন্তের পর কমিটি জানতে পেরেছেন যে ভারতে ৩২৫০টি চিত্রগৃহ ও ৬০টি ষ্টুডিও আছে; বৎসরে ২৭৫টি চিত্র নির্মাণ করা হয়। এই শিল্পে মূলধন বিনিয়োগের পরিমাণ ৩২ কোটি টাকা এবং কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ ৯ কোটি টাকা। বৎসরে চলচ্চিত্র শিল্পে ২০ কোটি টাকা আয় হয়ে থাকে এবং ভারতে প্রতি বৎসর ৬০ কোটি লোক চিত্র দেখে থাকে। পাকিস্থান, মালয়, ইন্দোচীন, শ্যাম, ব্রহ্ম, পূর্ব আফ্রিকা, দক্ষিণ আফ্রিকা ও সিংহলে ভারতীয় চলচ্চিত্রশিল্পের ভাল বাজার রয়েছে। এর দরুন বৈদেশিক আয় হিসাবে বেশ কিছু অর্থ জাতীয় কোষাগারে সঞ্চিত হয়। বর্তমানে যেরূপ আয় হয় তাতে বৎসরে দুইশতটি চিত্র নির্মাণ করা চলতে পারে। কিন্তু প্রযোজকদের মধ্যে প্রতিযোগিতার ফলে চিত্রের মান পড়ে যাচ্ছে এবং আয় কমে যাচ্ছে।

ফিল্ম পরিষদ

প্রস্তাবিত ফিল্ম পরিষদ চলচ্চিত্রশিল্পের বন্ধু, উপদেষ্টা ও পথপ্রদর্শক হিসাবে কাজ করবে। শিল্পের সমস্ত বিষয় যাতে উন্নয়ন ও গঠনমূলক পথে পরিচালিত হয় তার প্রেরণা জোগাবে এই প্রতিষ্ঠান। চলচ্চিত্রশিল্পের বিভিন্ন ক্ষেত্র এমন কি গবেষণা এবং কাঁচামাল নির্মাণ ও সরবরাহ সম্পর্কিত বিষয়ের কার্য্যাবলী পরিচালনার জন্য পরিষদ কতকগুলি প্যানেল গঠন করবে। আইন অনুসারে গঠিত হওয়ায় শিল্পের বিভিন্ন শাখার মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হলে পরিষদ তাতে কার্যকরীভাবে হস্তক্ষেপ করতে পারবে। তবে চিত্রের মান সম্পর্কে পরিষদকে প্রযোজনা বিধি সংস্কার মাধ্যমে কাজ করতে হবে। ভবিষ্যতে পরিষদ প্রযোজনা

বিধি সংস্থা ও সেন্সর বোর্ডের কাজ স্বহস্তে গ্রহণ করতে পারবে বলেই কমিটি বিশ্বাস করেন।

ফিল্ম পরিষদে ১৮ জন সদস্য থাকবে। এর মধ্যে প্রযোজক, পরিচালক, চিত্রপ্রদর্শক, শিল্পী, কারিগর, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের প্রতিনিধি ও শ্রমিক প্রতিনিধি থাকা চাই। বিচার বিভাগীয় উচ্চ মর্য্যদা-সম্পন্ন কোন ব্যক্তিকে কেন্দ্রীয় সরকার বোর্ডের সভাপতি নিযুক্ত করবেন।

বিদেশ থেকে আমদানী করা বা দেশের প্রস্তুত কাঁচা ফিল্মের ওপর এক্সপোজ করা আমদানীকৃত ফিল্মের ওপর সেস বা কর ধার্য করে এবং প্রমোদ কর হিসাবে সংগৃহীত অর্থের শতকরা দশ ভাগ নিয়ে পরিষদের জন্য তহবিল গঠন করতে হবে। সেস হিসাবে সংগৃহীত অর্থ গবেষণা ও শিল্পের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য ব্যয় করা হবে। চিত্রশিল্পী ও কারিগরদের শিক্ষা দেবার জন্য পরিষদ কতকগুলি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করবে। মান উন্নয়নে উৎসাহ দেবার উদ্দেশ্যে পরিষদ শ্রেষ্ঠ কাহিনী, শ্রেষ্ঠ পরিচালনা, শ্রেষ্ঠ সমালোচনা ও শ্রেষ্ঠ চিত্রের জন্য পুরস্কার দেবার ব্যবস্থা করবে। শিক্ষামূলক এবং শিশুদের উপযোগী চিত্র নির্মাণে উৎসাহ দেবার ভার পরিষদ এক শিক্ষা প্যানেলের ওপর অর্পণ করবে।

প্রযোজনা বিধি সংস্থা

ফিল্ম পরিষদের পরিপূরক হিসাবে কমিটি এক প্রযোজনা বিধি সংস্থা গঠনের সুপারিশ করেছেন। কয়েকজন বিশেষজ্ঞ নিয়ে গঠিত একটি প্যানেল প্রতিটি স্ক্রীপ্ট পরীক্ষা করে দেখবে এবং চিত্র প্রযোজনাও নিয়ন্ত্রণ করবে। এই সংস্থা অনুমোদন করলে তবে সেই চিত্র বিদেশে রপ্তানী করা চলবে। বোম্বাই, কলকাতা, দিল্লী ও মাদ্রাজে এর শাখা থাকবে এবং প্রথমাবস্থায় সরকারই এটি পরিচালনা করবেন।

ফিন্যান্স কর্পোরেশন

কমিটি যে ফিল্ম ফিন্যান্স কর্পোরেশন গঠনের সুপারিশ করেছেন তার প্রাথমিক মূলধন হবে এক কোটি টাকা। রাজ্য সরকার, চলচ্চিত্রশিল্প ও জনসাধারণ ঐ মূলধন জোগাবে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অনুমতি নিয়ে কর্পোরেশন আরও এক কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ করতে পারবে। কমিটি বলেছেন, চলচ্চিত্রশিল্পের পুনঃসংস্থাপন কাম্য হলে ফিল্ম ফিন্যান্স প্রতিষ্ঠানের মারফৎ চিত্র-প্রযোজকদের নিয়ন্ত্রিতভাবে অর্থ সাহায্য না দিয়ে উপায় নেই।

বিভিন্ন কর

চলচ্চিত্রশিল্পকে সাহায্য করবার মোট মূল্যের ওপর শতকরা ২০ ভাগ প্রমোদ কর হিসাবে আদায় করবার ওপর কমিটি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। দেশের সর্বত্র একই হার প্রযোজ্য হবে। চিত্রগৃহ পরিচালনার লাইসেন্স ফি ও ফিল্ম মজুদের ফি প্রভৃতি সম্পর্কেও কমিটী বিবেচনা করেছেন। বৎসরে ২৪ কোটি ফুট পর্যন্ত কাঁচা ফিল্ম আমদানীকে কমিটি অবাধ সাধারণ লাইসেন্সের অন্তর্ভুক্ত করবার পরামর্শ দিয়েছেন। ফিল্ম প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে পরিবেশনের কাজ সম্পন্ন করা হবে। বৎসরে ৪৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত মূল্যের ষ্টুডিওর সাজসরঞ্জাম এবং মেরামতের ও সম্প্রসারণের জন্য প্রদর্শনের যন্ত্রপাতি আমদানীর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। কমিটি দেশী রাসায়নিক, কাঁচা ফিল্ম ও নাট্যের সাজসরঞ্জামাদির উৎপাদন বৃদ্ধি করবার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন।

বিদেশের বাজার

কমিটি বিশ্বাস করেন যে, ভারতীয় চিত্রের বর্তমান বৈদেশিক বাজার সম্প্রসারণের চেষ্টা করা ছাড়াও ইংরাজী-ভাষী অঞ্চলে প্রবেশ করাও সম্ভব হতে পারে। এই দিকটা বিবেচনা করে দেখবার জন্য এক রপ্তানী কর্পোরেশনের ওপর ভার অর্পণ করা হয়েছে। প্রযোজনা বিধি সংস্থার বিনানুমতিতে অসম্পূর্ণ কোন চিত্র বিদেশে যেতে দেওয়া হবে না।

সংবাদ-চিত্র

এ-দেশে প্রযোজকগণ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে অনুমোদিত চিত্র নির্মাণ করবে এবং প্রদর্শকগণ তা প্রদর্শন করবে এমন সম্ভাবনা খুব কম। কমিটি মনে করেন যে, বর্তমানে সরকার যেমন সংবাদ-চিত্র, দলিল-চিত্র প্রভৃতি নির্মাণ করে পরিবেশনের ব্যবস্থা করে থাকেন ভবিষ্যতেও সেই ব্যবস্থাই চালু রাখতে হবে। কারণ এইরূপ চিত্রের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

ষ্টুডিও সংবাদ

আবুহোসেন

আরব্যরজনীর কাহিনী অবলম্বনে গিরিশচন্দ্রের অমর গীতিনাট্য "আবুহোসেন"-এর চিত্রগ্রহণ এগিয়ে যাচ্ছে ক্যালকাটা মুভীটোন ষ্টুডিওতে। ছবিখানির উপভোগ্য নাটকীয় উপাদান ছাড়া মোট ১২টি গান ও ৬টি নৃত্য সন্নিবেশিত হয়েছে। সঙ্গীতাংশ পরিচালনা করছেন দক্ষিণামোহন ঠাকুর এবং কলকাতার নামকরা সমস্ত প্লে-ব্যাক গায়ক-গায়িকাই গানে অংশ গ্রহণ করেছেন। তাছাড়া অভিনয় শিল্পীদের মধ্যেও রয়েছেন চন্দ্রাবতী, মলিনা, স্মৃতিরেখা, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, মহেন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতি। চিত্রনাট্য ও অতিরিক্ত সংলাপ মহেন্দ্র গুপ্ত রচনা করেছেন এবং ছবিখানি পরিচালনা করছেন রতন চট্টোপাধ্যায়। শিল্প-নির্দেশ, শব্দগ্রহণ ও আলোক-চিত্র গ্রহণে যথাক্রমে আছেন বীরেন নাগ, বাণী দত্ত ও বিশু চক্রবর্তী।

জীবন-তারা

মুক্তিপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ছবিগুলির মধ্যে সিটাডেল ফিল্ম কর্পোরেশন লিমিটেডের 'জীবন-তারা' অন্যতম। রাজপুত বীরত্ব ও অতীত ভারতের ঐতিহ্যের পটভূমিকায় গৃহীত 'জীবন-তারা'য় একাধারে জাঁকজমকপূর্ণ দৃশ্যসজ্জা, আবেগপ্রধান কাহিনী ও অপূর্ব্ব অভিনয়ের বিস্ময়কর সমাবেশ ঘটেছে। বহু অর্থব্যয়ে যুদ্ধের যে সব দৃশ্য এর মধ্যে সংযোজিত হয়েছে, ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে তাদের বোধ হয় জুড়ি নেই। প্রতিভাময়ী সুন্দরী চিত্র-তারকা টি আর রাজকুমারী 'জীবন-তারা'য় একটি প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। তাঁর বিপরীতে নায়কের ভূমিকায় আছেন সৌন্দর্যবান ও পৌরুষোদ্দীপ্ত ব্যক্তিত্বের অধিকারী মহালিঙ্গমকে। পার্শ্বচরিত্রগুলিতে আছেন বীরাপ্পা ও হাস্যরসের অদ্বিতীয় অভিনেতা শারঙ্গপাণি। ভিলেনের ভূমিকায় এম ডি চক্রপাণির অদ্ভুত অভিনয় সকলকে বিস্ময়াভিভূত করবে। দক্ষিণ ভারতের সর্বজনপ্রিয় নৃত্যপটিয়সী ললিতা ও পদ্মিনীর বিভিন্ন ভঙ্গীর নৃত্য এই ছবির একটি বড় আকর্ষণ। এই ছবির জাঁকজমকপূর্ণ সেট ও দৃশ্যসজ্জা ভারতীয় চিত্রজগতে একটা নূতন বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে ব'লে জানা যায়।

নিরক্ষর

সুপ্রভাত ফিল্মস চরণদাস ঘোষের রচনা অবলম্বনে "নিরক্ষর" ছবিখানি মুক্তির জন্যে প্রস্তুত করে ফেলেছেন। ছবিখানি পরিবেশন করবেন মতিমহল থিয়েটার্স। "নিরক্ষর" প্রযোজনা ও পরিচালনা করেছেন যথাক্রমে কালীকিঙ্কর বিশ্বাস ও গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায়। বিভিন্ন চরিত্রাভিনয়ে নামকরা শিল্পীদের মধ্যে আছেন—ধীরাজ ভট্টাচার্য্য, ছবি বিশ্বাস, ফণী রায়, সমর রায়, সন্ধ্যারাণী, স্মৃতিরেখা, অপর্ণা প্রভৃতি।

নতুন পাঠশালা

বুনিয়াদী শিক্ষার পটভূমিকায় বীরেন দাস রচিত "নতুন পাঠশালা"র চিত্ররূপ অনতিকালমধ্যেই কলকাতায় মুক্তিলাভ করবে বলে ঘোষিত হয়েছে। ছবিখানি লেখক নিজেই পরিচালনা করেছেন। এর বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেছেন নরেশ মিত্র, মনোরঞ্জন, অজিত ভট্টাচার্য, শোভা সেন, পুতুল, হাসি, কনক, সূর্য, লেডো, রূপ, রবি, মঞ্জু, রেণু প্রভৃতি।

সঞ্জীবনী

প্রণয়ের এক কল্যাণকর দিক নিয়ে গঠিত কাহিনী অবলম্বনে সুকুমার দাশগুপ্তের পরিচালনায় এম পি প্রডাকসন্সের পরবর্তী ছবি "সঞ্জীবনী"র চিত্রগ্রহণ শেষ হয়েছে। দীর্ঘ বিরামের পর নায়িকার ভূমিকায় সন্ধ্যারাণী অভিনয় করছেন; অন্য ভূমিকায় তাঁর সঙ্গে রয়েছেন উত্তমকুমার, প্রীতিধারা, জহর, পদ্মা, প্রভা, গুরুদাস, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়। সুরযোজনা করছেন অনুপম ঘটক।

মৃণালিনী

চিত্রশিল্পী লিমিটেডের পক্ষ থেকে শ্রীনীরোদবরণ সাহা পোদ্দারের প্রযোজনায়, কাঞ্চনতলার জমিদার

শ্রীধীরেন্দ্র রায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় ও শ্রীরতীশ বসুর তত্ত্বাবধানে তাঁদের দ্বিতীয় চিত্র 'মৃণালিনী'র চিত্রগ্রহণ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। ছবিখানি পরিচালনা করছেন খগেন রায়। সঙ্গীত কালোবরণ, শিল্পনির্দেশ সুনীল সরকার, চিত্রশিল্পে দিব্যেন্দু ঘোষ, শব্দযন্ত্রে পরিতোষ বসু, সম্পাদনায় বৈদ্যনাথ ব্যানার্জী, প্রধান ব্যবস্থাপনায় রাজু বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করবেন মলয়া সরকার, মায়া গাঙ্গুলী, শ্যামলী চক্রবর্তী, আরতি দাস, কুমারী অঞ্জলী, বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, ধীরেন মুখার্জ্জী, কমল মিত্র, প্রবোধ চৌধুরী, মিহির ভট্টাচার্য, কাছু বন্দ্যোঃ, শিবু গাঙ্গুলী, ফণি রায়, নরেন চক্রবর্তী, শতঞ্জীব চট্টোঃ, হরিধন, গৌরমোহন, রবীন, সুপ্রভাত, বোধিসত্ত্ব এবং আরও অনেক নবাগত ও নবগতার দল। ছবিখানির ঐতিহাসিক ঘটনাবলী যথাযথভাবে রক্ষা ক'রে যাতে বাংলায় একখানি সর্বাঙ্গসুন্দর কথাচিত্র তৈরী হয়, তার জন্য প্রযোজক ও পরিচালক আপ্রাণ চেষ্টা করছেন।

সত্বমুক্ত 'জীবন-তারা'র একটি দৃশ্যে রাজকুমারী ও মহালিঙ্গম্

নীলদর্পণ

মুভিল্যাণ্ড-এর প্রযোজনায় ও শ্রীবিমল রায়ের পরিচালনায় স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্রের অমর কাহিনী "নীলদর্পণের" চিত্রগ্রহণ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ছবিখানি গোল্ডেন পিকচার্সের পরিবেশনায় আগামী বড়দিনে কলকাতা ও শহরতলীর কয়েকটি চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করবে। আলোকশিল্পী সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়, শব্দযন্ত্রী গৌর দাস, শিল্প-নির্দেশক সুনীল সরকার, সম্পাদক অজিত দাস ও প্রধান ব্যবস্থাপক রাজু ব্যানার্জি। বিভিন্ন ভূমিকায় রূপদান করেছেন: সন্ধ্যারাণী, পদ্মা, রেণুকা, শান্তি সান্যাল, পূর্ণিমা, রাণীবালা, লীলাবতী, জহর, গুরুদাস, হরিধন, মাঃ বিভু, সন্তোষ সিংহ, ক্ষিতীশ, ম্যালকম, আশু বোস, পশুপতি, শ্যামল ঘোষ, বিজন কুমার ও 'রোগ'-চরিত্রে নবাগত রাজকুমার।

সবুজ পাহাড়

প্রাকৃতিক শোভার মধ্যে দর্শকমনকে অভিভূত করে তোলার উদ্দেশ্যে দেবীপ্রসাদ কর রচিত কাহিনী অবলম্বনে বিশ্ববাণী প্রডাকসন্সের ছবি "সবুজ পাহাড়"-এর চিত্রগ্রহণ হচ্ছে। ছবিখানির নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে হচ্ছে রাজা নামে কুকুর ও মেরী নামে ঘোটকীর ভূমিকালিপিতে অন্তর্ভুক্তি। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করছেন মলয়া সরকার, রেণুকা রায়, অমিতা বসু, তারা ভাদুড়ী, অজিতপ্রকাশ, ছবি বিশ্বাস, শরৎ চট্টোপাধ্যায়, গোকুল মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। দেবকীকুমার বসু চিত্রনাট্যটি দেখে দিয়েছেন এবং ছবিখানি পরিচালনা করছেন অপূর্ব মিত্র। সঙ্গীত ও নৃত্য পরিকল্পনায় আছেন যথাক্রমে দক্ষিণামোহন ঠাকুর ও পিটার গোমেস।

প্রয়াগতীর্থ

চিত্রশিল্পী লিমিটেড-এর পক্ষ থেকে শ্রীনীরদবরণ সাহা পোদ্দার প্রযোজিত তাঁদের তৃতীয় ছবির শুভ মহরৎ উৎসব প্রধান পরিচালক সতীশ দাশগুপ্তের পৌরোহিত্যে গত ৮ই অক্টোবর ইষ্টার্ণ টকিজ ষ্টুডিওতে সুসম্পন্ন হয়েছে। কাহিনী রচনা করেছেন শ্রীনগেন্দ্রনাথ পাল। সঙ্গীত পরিচালনা করবেন কালোবরণ,

চিত্রশিল্পে দিব্যেন্দু ঘোষ, শিল্প-নির্দেশ—সুনীল সরকার শব্দযন্ত্রে—পরিতোষ বসু, সম্পাদনায়—বৈদ্যনাথ বন্দ্যোঃ, প্রধান ব্যবস্থাপক—রাজু ব্যানার্জি। সংগঠন তত্ত্বাবধান করবেন রতিশ বসু। অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করবেন—মলয়া সরকার, ইন্দিরা রায়, মীরা সরকার, রমলা চৌধুরী, শোভা সেন, পূর্ণিমা, মনোরমা, করালী, রাজলক্ষ্মী (বড়), ছবি বিশ্বাস, বীরেন চ্যাটার্জি, সন্তোষ সিংহ, গৌরমোহন, বারীন প্রভৃতি।

জলজলা

রবীন্দ্রনাথের "চার অধ্যায়"-এর হিন্দী চিত্ররূপ "জলজলা"-র গানগুলি পঙ্কজ মল্লিকের পরিচালনায় সম্প্রতি গৃহীত হয়েছে। গত সপ্তাহ থেকে বম্বেতে পল্ জিলসের পরিচালনায় চিত্রগ্রহণও পূর্ণোদ্যমে এগিয়ে চলেছে।

হানাবাড়ী

প্রেমেন্দ্র মিত্র পরিচালিত "হানাবাড়ী"-র একটি দৃশ্যগ্রহণকালে এমন একটি দুর্ঘটনা ঘটে যাতে প্রধান অভিনেতা ধীরাজ ভট্টাচার্য গোড়ালীর হাড় ভেঙ্গে শয্যাশায়ী হয়েছেন। দৃশ্যটি ছিল মারপিটের এবং ধীরাজ ভট্টাচার্য পালাবার সময়ে উঁচু ধাপ থেকে বেমক্কায় পড়ে গিয়ে আহত হন। এখনও তাঁর পক্ষে কাজে যোগ দেওয়া সম্ভব হয়নি। ছবিখানির আর মাত্র কয়েকটি দিনের চিত্রগ্রহণ বাকী এবং প্রায় সমুদয় অংশই ধীরাজ ভট্টাচার্যকে নিয়ে।

রবীন্দ্র জীবনীর চিত্ররূপ

নবগঠিত নবরত্ন প্রডিউসর্স রবীন্দ্রনাথের বাল্যজীবনী অবলম্বনে "পচিশে বৈশাখ" নাম দিয়ে যে ছবিখানি তোলায় ব্রতী হয়েছেন তার চিত্রনাট্যটি রচনা শেষ হয়েছে এবং পরিচালকমণ্ডলীর একটি বিশেষ সভায় তা পাঠ করাও হয়েছে। কর্তৃপক্ষ বর্তমানে বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয়ের জন্যে নতুন শিল্পীর সন্ধান করছেন।

'জীবন-তারা' চিত্রে শ্রীমতী পদ্মিনী

রঘুডাকাত

কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া থিয়েটার্সের পরিবেশনে বহু-প্রতীক্ষিত "রঘুডাকাত" ছবিখানি কলকাতায় মুক্তিলাভ করবে।

রঘুডাকাতের অভিযান-কাহিনী বাঙলায় সুবিদিত। সতীশ দাশগুপ্তের তত্ত্বাবধানে ছবিখানি পরিচালনা করেছেন গিরীন চৌধুরী; সুরযোজনা করেছেন সুবল দাশগুপ্ত এবং বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেছেন চন্দ্রাবতী, মীরা সরকার, নীতীশ, দীপক, জীবেন, প্রীতি মজুমদার, ফণী রায় প্রভৃতি।

হীরাবাঈ

অজন্তা শৈল শিখরে একদিন যে বিস্ময়কর ও মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছিলো তাকে কেন্দ্র করে কথাশিল্পী শ্রীবিভূতি সেনগুপ্ত রচনা করেছেন "হীরাবাঈ" কাহিনী। এই কাহিনীটি চিত্রে প্রযোজনা করবার

'পাগলে' চিত্রে আগা ও বেগম পারা

দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন বি এম এস চিত্র প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্ণধার শ্রীমণি রায় চৌধুরী এবং পরিচালনার ভার গ্রহণ করেছেন চিত্রপরিচালক শ্রীশান্তি ভট্টাচার্য ও কাহিনীকার স্বয়ং। চিত্রটি সর্বতোভাবে সাফল্য-মণ্ডিত করবার জন্য শ্রীরায়চৌধুরী বিশেষভাবে তৎপর হয়েছেন।

পথনির্দ্দেশ

এসোসিয়েটেড প্রোডাকসনের দ্বিতীয় চিত্র 'পথ-নির্দ্দেশ'-এর স্যুটিং শীঘ্রই আরম্ভ হবে। 'পথনির্দ্দেশ' শরৎচন্দ্রের কাহিনী। চিত্রের প্রাথমিক কাজ সমাপ্তপ্রায়। বিশদ বিবরণ যথাসময়ে প্রকাশিত হবে। পরিবেশনের ভার নিয়েছেন সোমনাথ ডিষ্ট্রিবিউটার্স।

বাগদাদ

ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে শ্রীরূপলাল ধরের প্রযোজনায় ও শ্রীশ্যাম চক্রবর্তীর পরিচালনায় গোল্ডেন পিকচার্সের চিত্র 'বাগদাদ' দ্রুত সমাপ্তির পথে। এই চিত্রের নায়িকা বোম্বের খ্যাতনাম্নী অভিনেত্রী বেগম পারার স্যুটিং সম্প্রতি শেষ হয়ে গিয়েছে।

আরব্য উপন্যাসের এক শ্রেষ্ঠ ও অপূর্ব গল্প অবলম্বনে বহু অর্থ ব্যয়িত, জাঁক-জমকপূর্ণ ও বিপুল তারকা সমন্বিত চিত্র 'বাগদাদ' বাংলা চিত্রজগতে এক নতুন অধ্যায় সৃষ্টি করবে বলে প্রকাশ।

আলাদীন ও আশ্চর্য প্রদীপ

শ্রীসুখেন্দু দত্ত প্রযোজিত এস, বি, পিকচার্সের আগামী চিত্র-নিবেদন—সর্বপ্রথম বাংলা সর্বাঙ্গীন রঙীন চিত্র "আলাদিন ও আশ্চর্য প্রদীপ" ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে সমাপ্তির পথে।

আরব্য উপন্যাসের কাহিনীর ওপর ভিত্তি করেই এই চিত্রখানি গড়ে উঠেছে।

ছবিটি পরিচালনা করেছেন বিজন সেন; চিত্রনাট্য রচনা করেছেন বিপ্রদাস ঠাকুর; চিত্রগ্রহণে আছেন বিদ্যাপতি ঘোষ এবং শিল্প-নির্দেশনায় বটু সেন।

ছবিটির আর একটি বৈশিষ্ট্য হল যে, তিমিরবরণ ও তাঁর সম্প্রদায় এতে সুরের মায়াজাল বুনেছেন।

ভূমিকাভিনয়ে রয়েছেন চন্দ্রাবতী, ছবি বিশ্বাস, কমল মিত্র, যমুনা সিংহ, সমীরকুমার, কানু বন্দ্যো, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি।

পণ্ডিত মশাই

শরৎচন্দ্রের "পণ্ডিত মশাই" অবলম্বনে এমার প্রডাকসন্সের ছবিখানির চিত্রগ্রহণ শেষ হয়েছে। ছবিখানি কল্পনা মুভীজের পরিবেশনে অচিরেই চিত্রা, প্রাচী ও পূর্ণতে মুক্তিলাভ করবে। "পণ্ডিত মশাই" পরিচালনা করেছেন নরেশ মিত্র, সুর দিয়েছেন কালী সেন এবং ভূমিকায় আছেন সুনন্দা, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, কানু, সন্ধ্যারাণী, অর্পণা, প্রভা, নরেশ মিত্র, তুলসী চক্রবর্তী প্রভৃতি।

জবানবন্দী

এ, কে, ডি, প্রডাকসনের আগামী চিত্র "জবানবন্দী"

শীঘ্রই শহরের কয়েকটী চিত্রগৃহে একযোগে মুক্তিলাভ করবে। এক ইমপ্রেসারিও'র বিপর্য্যস্ত জীবনকে কেন্দ্র করেই এর কাহিনী রচনা করেছেন প্রণব রায়। সুরশিল্পী গোপেন মল্লিক সুর দিয়েছেন। অনুভা, স্মৃতি, বেলা বসু, বিকাশ রায়, রবীন মজুমদার, ছবি বিশ্বাস, শ্যাম লাহা, কানু, ভানু প্রভৃতি কুশলী শিল্পীরা বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন। পরিবেশনার ভার নিয়েছেন রাণা ও দত্ত পরিবেশক-প্রতিষ্ঠান।

ডাকগাড়ী

এ, কে, ডি প্রডাকসনের পরবর্ত্তী চিত্র 'ডাকগাড়ী'র পরিচালনার ভার নিয়েছেন অজিত দত্ত। কাহিনীকার প্রণব রায়ের 'ডাক-গাড়ী'তে এক ষ্টেশন মাষ্টারের স্ত্রীর ২৪ ঘণ্টার ঘটনাই হ'বে এর কাহিনী। চিত্র-খানির সুর সংযোজনার ভার দেওয়া হ'য়েছে সুর সাগর জগন্ময় মিত্রকে। কয়েকজন নাম করা অভিনেতা ও অভিনেত্রীর সঙ্গে কয়েকজন নতুন শিল্পীকেও দেখতে পাওয়া যাবে।

চিঠি

'ডাকগাড়ী'র কাজ আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই এ, কে ডি, প্রডাকসন আর একখানি নতুন ধরণের কাহিনী 'চিঠি'র চিত্ররূপ দিচ্ছেন। এই চিত্রের মূল বিষয় বস্তু হ'চ্ছে এক অভিজাতবংশীয়া নারীকে তাঁর বংশ মর্য্যাদা রক্ষার জন্য কিরূপ ত্যাগ স্বীকার করতে হ'য়েছিল—তারই হৃদয়স্পর্শী চিত্ররূপ।

অনমোল সাহারা

মিঃ কে, কে, নন্দা প্রযোজিত ফিল্ম ক্যাইকান-সিয়ারের প্রথম হিন্দী ছবি 'অনমোল সাহারা' অমর দত্তের পরিচালনায় প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এক নারীর ভাগ্য বিড়ম্বনার কাহিনীকে নিয়েই গড়ে উঠেছে "অনমোল

'জীবন-তারা' চিত্রে ললিতা

সাহারা"। সঙ্গীত এই চিত্রের একটা বিশেষ আকর্ষণ হবে। বোম্বাই-এর শ্রেষ্ঠ প্লে-ব্যাক গায়িকা গীতা রায় এই চিত্রের অনেকগুলি গান এখানে এসে গেয়ে গেছেন। সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন সঙ্গীত পরিচালক সন্তোষ। একটি বিশিষ্ট নারী চরিত্রে অভিনয় করেছেন অমিতা দেবী। অন্যান্য ভূমিকায় গীতা, নীলিমা, রাজলক্ষ্মী (এন, টি), কৃষ্ণকুমার, রাজকুমার (এন, টি), মুস্তাল কাশ্মিরী, (এন টি), বি, এম, শর্ম্মা, নন্দা প্রভৃতি।

রাত্রির তপস্যা

রমা ছায়াচিত্র লিমিটেডের নবতম অবদান 'রাত্রির তপস্যা' ছবিটি পরিচালনা করবেন সুশীল মজুমদার। একজন শিক্ষাব্রতীর জীবন উৎসর্গই কাহিনীর প্রতিপাদ্য বিষয়। অজ্ঞতা আর অকল্যাণের দুর্ভেদ্য অন্ধকারের বিরুদ্ধে যার দুর্জয় অভিযান, এই দুর্জয় অভিযানের নায়ক ভূপেন এবং তাকে কেন্দ্র করেই নায়িকা সন্ধ্যা পেলো দেহোত্তীর্ণ প্রেমের সর্ব্বত্যাগী দীক্ষা। সে দীক্ষা নিয়ে সন্ধ্যা, যেন সাবিত্রীর মতই যমের হাত থেকে জীবনের সত্যকে কেড়ে আনলো। এই দু'টি মহৎ চরিত্রকে রূপায়িত করেছেন বিকাশ রায় এবং আরতি মজুমদার। অন্যান্য ভূমিকায় আছেন ছবি বিশ্বাস, কানু বন্দ্যোঃ, মিহির ভট্টাঃ, গৌরীশঙ্কর, প্রভা, প্রণতি, স্বাগতা, শান্তা, ইন্দ্রাণী রায়, তুলসী লাহিড়ী,' তুলসী চক্রবর্ত্তী, শীতল বন্দ্যোঃ, হরিধন, আশু বসু, নৃপতি, শিবকালী চট্টোঃ, ফণী মজুমদার, ভানু বন্দ্যোঃ, চিত্রা, শ্যামল, গিরীন চক্রবর্ত্তী, উমা মুখার্জি, লেডো প্রভৃতি।

ছবিটির শিল্প নির্দেশনা করেছেন বীরেন নাগ, আলোক চিত্রগ্রহণ করেছেন বিশু চক্রবর্ত্তী এবং সম্পাদনা করেছেন অর্দ্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায়।

ছবিটি পরিবেশনা করছেন গোল্ডেন মুভী কর্পো-রেশন।

তাইতো

গত ৯ই সেপ্টেম্বর দক্ষিণ কলিকাতার সিটি কলেজ বাণিজ্য বিভাগের বাৎসরিক উপলক্ষ্যে শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য্য লিখিত হাস্যরসাত্মক নাটক "তাইতো" অভিনীত হয়। 'দীননাথে'র ভূমিকায় চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র কৃষ্ণবিনোদ বন্দ্যোপাধ্যায় অপূর্ব্ব অভিনয় দক্ষতার পরিচয় দিয়ে উপস্থিত সকলের ভূয়সী প্রশংসা অর্জ্জন করেন।

বিরূপাক্ষ বটব্যালের ভূমিকায় দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র কল্যাণ দাসগুপ্তও সুঅভিনয় করেন।

অমরেশ চরিত

বিগত মহাষ্টমীর পুণ্যলগ্নে পরিচালক বিধায়ক ভট্টাচার্য তাঁরই লেখা কিশোর কাহিনী "অমরেশ চরিত" এর মহরৎ সম্পন্ন করেছেন ইষ্টার্ণ টকীজ ষ্টুডিওতে। ছবিখানি প্রযোজনা করবেন শ্রীমতী মৃণাল ভট্টাচার্য চিত্রকরের তরফ থেকে।

বাপবেটি

পরিচালক বিমল রায় বম্বেতে তাঁর দ্বিতীয় প্রচেষ্টার মহরৎ সুসম্পন্ন করেছেন এস এণ্ড টি ষ্টুডিওতে গত মহানবমীর দিন। ছবিখানি হচ্ছে মুন্সী প্রডাকসন্সের "বাপ বেটি", যার সংলাপ রচনা করেছেন মোহনলাল বাজপেয়ী এবং গান লিখেছেন প্রদীপ। মুখ্য ভূমিকায় রয়েছেন রঞ্জন ও বেবী তবাসাম।

পল্লীসমাজ

এস বি প্রডাকসন্সের চতুর্থ অবদান শরৎচন্দ্রের 'পল্লীসমাজ'-এর চিত্ররূপদানের মহরৎ কার্য গত কালী-পূজার দিন ইষ্ট ইণ্ডিয়া ষ্টুডিওতে সুসম্পন্ন হয়েছে। দীর্ঘ দিন বন্ধ থাকার পর এই দিন থেকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া ষ্টুডিওটিও পুনরুদ্বোধিত হলো।

মহরৎ দৃশ্যে অভিনেত্রী ছিলেন শ্রীমতী মলিনা জ্যাঠাই-মার ভূমিকায়; দৃশ্য ঘোষণা করেন প্রখ্যাত পরিচালক প্রফুল্ল রায়। ছবিখানি পরিচালনা করবেন নীরেন লাহিড়ী এবং আলোকচিত্র ও শব্দগ্রহণ করবেন যতীন দাস ও শচীন চক্রবর্তি।

স্মরণ থাকতে পারে যে, ইতিপূর্বে শিশিরকুমার তাঁর সম্প্রদায় নিয়ে নিউ থিয়েটার্সের প্রযোজনায় এর একটি সবাক সংস্করণ তুলেছিলেন।

ক্ষুধিত পাষাণ

ইতিপূর্বে মহরৎ করা বাংলা কলা মন্দিরের "ক্ষুধিত পাষাণ" ছবিখানির চিত্রগ্রহণ আনুষ্ঠানিকভাবে গত ৭ই নভেম্বর ক্যালকাটা মুভিটোন ষ্টুডিওতে আরম্ভ হয়েছে। পরিচালক নীরেন লাহিড়ী এবং বিধায়ক ভট্টাচার্য অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হন এবং চন্দ্রাবতী প্রথম শটটি গ্রহণে শুভসঙ্কেত দেন। ছবিখানি পরিচালনা করছেন পুষ্পিতানাথ চট্টোপাধ্যায়।

বসু পরিবার

সুকুমার দাশগুপ্তের পরিচালনায় 'সঞ্জীবনী'র চিত্রগ্রহণ শেষ পর্যায়ে পৌছবার সংবাদের সঙ্গে কর্মব্যস্ত এম, পি, প্রতিষ্ঠান তাঁদের পরবর্তী উক্ত ছবিখানির কার্যারম্ভের কথা জানাচ্ছেন। 'বসু পরিবার' নবতর দৃষ্টিভঙ্গীতে রচিত এক বলিষ্ঠ সমাজ-চিত্র হবে বলে প্রকাশ।

সম্প্রতি তাঁদের ন্যাশনাল সাউণ্ড ষ্টুডিওতে 'বসু পরিবার'-এর মহরৎ-পর্ব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। জহর গাঙ্গুলী 'ক্ল্যাপষ্টিক' ধরলে অগ্রদূতবৃন্দের অন্যতম বিভূতি লাহা নায়ক উত্তমকুমার অভিনীত একটি দৃশ্যের চিত্রগ্রহণ করে কর্মারম্ভের সূচনা করেন। ভূমিকালিপিতে বিশিষ্টদের মধ্যে পাহাড়ী সান্যালের উপস্থিতি জানা গেলো। পরিচালনা করছেন নির্ম্মল দে।

'ঋণং কৃত্বা' ও 'কচি সংসদ' নাটকাভিনয়

সম্প্রতি জগদ্ধাত্রী পূজা উপলক্ষে সারপেনটাইন লেনের তরুণ ও কিশোরবৃন্দ পূজা মণ্ডপে প্রমথ বিশীর 'ঋণং কৃত্বা' ও পরশুরাম রচিত 'কচি সংসদ' বিপুল সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেন। 'কচি সংসদ'-এর নাট্যরূপ দেন বিমল বসু। 'ঋণং কৃত্বা' নাটকে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন প্রভাত ঘোষ, সুধাংশু বসু, হীরেন চট্টোপাধ্যায় ও রবি বসু। 'কচি সংসদ' অভিনয় জমেছিল সবচেয়ে বেশী। এই নাটকের রূপাভিনয়ে সবচেয়ে আগে নাম করতে হয় সুধাংশু বসু, পরিতোষ মিত্র, তারক মিত্র, ভূপাল ঘোষ-এর। 'কচি সংসদ'-এর সদস্যরূপে প্রতাপ ঘোষ, কমল বসু মল্লিক, কল্যাণ ধর, সুধাকর বসু (বলাই) কমলাকান্ত দে এবং কামাখ্যা বসু মল্লিক 'কচি সংসদ'কে একেবারে মূর্ত্ত করে তুলেছিলেন। সুহাস দত্তের অভিনয় মন্দ নয়। সঙ্গীত রূপারোপে এবং নাট্যপরিচালনায় বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন যথাক্রমে বেতার-শিল্পী প্রভাস মৈত্র ও বীরেন মিত্র।

শ্রীরঙ্গমে 'মুখোস' নাটকাভিনয়

আগামী ১৭ই ডিসেম্বর সোমবার 'শ্রীরঙ্গম' নাট্যদেউলে সুরুচি সেনগুপ্তা রচিত 'মুখোস' নাটকটি মঞ্চস্থ হবে মলিনা দেবীর ব্যবস্থাপনায়। বিভিন্ন ভূমিকায় যাঁরা অভিনয় করবেন তাঁদের মধ্যে আছেন শ্রীমতী প্রভা, মঞ্জু দে, অভি ভট্টাচার্য। প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করবেন দেবকীকুমার বসু।

শ্রী নরাধম চালিত

জয়তু সুনন্দা দেবী

ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠা চিত্রাভিনেত্রী সুনন্দা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জয় হোক্! শুভ বিজয়ায় এই শুভকামনা 'নরাধম' করছে। গত বৈশাখ মাসের 'চিত্রবাণী'তে "বর্ষফল"-এর আলোচনায় আমি এই চির-যৌবনা ও চির-নায়িকা সুনন্দা দেবীর সম্বন্ধে বলেছিলাম : 'প্রযোজিকা হিসাবে 'সিংহদ্বার' ছবিটির সমস্ত গ্লানি মুছে দেবে তাঁর নবতম ছবি "দত্তা"।......"নষ্টনীড়" ছবিতে বৃদ্ধার ভূমিকায় অভিনয় করার পর থেকে তাঁকে শুধুমাত্র বৃদ্ধার ভূমিকাতেই দেখা যাবে।' আমার এই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয়েছে, তার জন্য আমি নিজেই নিজেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ছবি বিক্রীর দিক থেকে 'দত্তা' 'সিংহদ্বার'-এর সমস্ত গ্লানি মুছে দিয়েছে এবং 'নষ্টনীড়'-এর পর 'দত্তা' ছবিতে তাঁকে প্রৌঢ়া বিজয়ার ভূমিকায় অভিনয় করতে দেখে আমি আমার ভবিষ্যদ্বাণী সম্বন্ধে অত্যন্ত খুশি হয়ে উঠেছিলাম। এতে অনেকে হয়তো ক্ষুব্ধ হয়েছেন; তাঁরা শরৎচন্দ্রের বিজয়াকে তরুণী হিসাবে আজও কল্পনা করেন কিন্তু আমি মূর্খদের কি করে বোঝাবো যে শরৎচন্দ্র বিজয়া চরিত্রটি যখন সৃষ্টি করেছিলেন, তারপর আজ এত বছর কেটে গেছে যে তরুণী বিজয়া আজ প্রৌঢ়া বিজয়া ছাড়া আর কিছুই হতে পারেন না। এই সূক্ষ্ম রসবোধ সুনন্দা দেবীর আছে জানতে পেরে আমি খুশি হয়েছি।

সুনন্দা দেবী এবারে 'পল্লীসমাজ' ছবিতে রমার ভূমিকায় নামবেন। আমার নিজের ধারণায় রমার ভূমিকায় অভিনেত্রী হিসাবে দু'জন আছেন—এক রাজলক্ষ্মী ও আর একজন সুনন্দা দেবী স্বয়ং। অবশ্য বোম্বের দিকে নজর দিলে গোপকে দিয়েও হয়তো কোনও রকমে কাজ চালানো যায়। তবে বোম্বে পর্য্যন্ত যাওয়া উচিত নয়। 'দত্তা' ছবিটি দেখার পর আমার মনে হচ্ছে যে সুনন্দা দেবীই রমার ভূমিকাটি সবচেয়ে হাস্যকর করে তুলবেন। বাংলা দেশে হাসির ছবির চাহিদা আজ নেই, কিন্তু তার বড় প্রয়োজন। সুনন্দা দেবীর প্রযোজনায় ও অভিনয়ে শরৎচন্দ্রের 'পল্লীসমাজ' একটি প্রথম শ্রেণীর হাস্যকর ছবি হবে বলে আমার পূর্ণ বিশ্বাস এবং এঁদের সঙ্গে যখন সজনীকান্ত দাস নামে কে একজন চিত্রনাট্য রচনায় যোগ দিয়েছেন, তখন শরৎচন্দ্রের প্রেতাত্মা নিশ্চিন্ত মনে শিউরে উঠতে পারেন।

বোধ হয় এই সজনীকান্ত দাসই তারাশঙ্করের লেজুড় হয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রশেখর' ছবির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন এবং শেষ পর্য্যন্ত রবীন্দ্রনাথের 'দৃষ্টিদান' কাহিনীকে ছবির জন্য মনের আনন্দে হত্যা করেছিলেন। এই সজনীকান্ত দাসই বোধ হয় বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাধারাণী' ছবির চিত্রনাট্য রচনা ক'রে ফ্রাঙ্ক কাপরাকে লজ্জায় অধোবদন করিয়েছিলেন এবং এই সজনীকান্ত দাসই বোধ হয় বঙ্কিমচন্দ্রের 'রজনী' উপন্যাসটির অর্থ বুঝতে না পেরে 'সমর' নাম দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের কাহিনীর আদ্যশ্রাদ্ধ করেছিলেন এবং এই সজনীকান্ত দাসই বোধ হয় সেন্সর বোর্ডের এক সভ্য, যে সেন্সর বোর্ড একবার ফতোয়া জারী করেছিলেন যে 'ক্লাসিক'-এর বিকৃত চিত্ররূপ তাঁরা সহ্য করবেন না। সেই সেন্সর বোর্ডের সভ্য সজনীকান্ত দাসেরও জয় হোক্!

আহা শরৎচন্দ্রের ভাই প্রকাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'দত্তা' ছবির মুক্তিলাভ করার পরই নবমী পূজার দিন মারা গেছেন। তিনি 'দত্তা' ছবিটি দেখেছিলেন ব'লে কেউ দোষ দেয় না। আমার সবচেয়ে দুঃখ এই যে তিনি সুনন্দা দেবীর অভিনীত 'পল্লীসমাজ' দেখতে পেলেন না, কিংবা

এ-ও কি সম্ভব যে তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে জানতে পেরেছিলেন যে সুনন্দা দেবী রমার ভূমিকায় অভিনয় করবেন? জানো আর নাই জানো, হে প্রকাশচন্দ্র, এই কথাটি আজ তুমি বিশ্বাস করো যে রমেশের ভূমিকায় সুনন্দা দেবীর মেসোমশাই পূর্ণেন্দু মুখোপাধ্যায় আর দেখা দিচ্ছে না। তার জন্য লোক খোঁজা হচ্ছে এবং এই অনুসন্ধান সমিতিতে আছেন শশধর দত্ত প্রমুখ লেখকের অগ্রণী সজনীকান্ত দাস। এন, কে, জি ও চন্দ্রশেখর (এঁরা কারা কে জানে!) ও পরিচালক নীরেন লাহিড়ী। সুনন্দা দেবী এই অনুসন্ধান সমিতিতে নেই—চণ্ডীঠাকুর, এ কি সত্য?

যিনি রমেশের ভূমিকায় নামবেন তাঁর পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চি লম্বা হওয়া দরকার, লাঠি খেলা এঁদের কাছে শিখতে হবে, আর অভিনয় দক্ষতা থাকা দরকার! কিন্তু অভিনয় দক্ষতা কি শুধু রমেশের বেলাতেই থাকা দরকার, না এ ব্যাপারটা রমার বেলাতেও প্রযোজ্য! রমেশের জন্য এত খোঁজাখুঁজি না করে নবদ্বীপ হালদার বা নৃপতি চাটুজ্যেকে নিলেও চলতো। এঁরা দুজনেই পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চি লম্বা, অভিনয় করতে পারেন বলে খ্যাতি আছে এবং দুজনেই লাঠি খেলা শিখে নিতে পারবেন। অনুসন্ধান সমিতি এ দিকে দৃষ্টি দিলে খুশি হব।

'পল্লীসমাজ' ছবিটির পরিচালনা করছেন স্বনামধন্য ব্যর্থ পরিচালক নীরেন লাহিড়ী, যিনি 'সাধারণ মেয়ে', 'জয়যাত্রা', 'সিংহদ্বার' ও 'গরবিনী' প্রমুখ হতাশাব্যঞ্জক ছবির পরিচালনা ক'রে অর্দ্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়ের সমশ্রেণীর পরিচালকগোষ্ঠীতে সসম্মানে আশ্রয় লাভ করেছেন। নীরেন লাহিড়ী সুনন্দা দেবীর ছবির পরিচালনা করছেন, এতে আমি যত না খুশি হয়েছি, তার চেয়েও বেশী খুশি হয়েছে ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওর ইঁট-পাথর, গাছ-পালা প্রভৃতি। 'সিংহদ্বার' ছবিটির পর সুনন্দা দেবীর মুখে নীরেন লাহিড়ীর সম্পদ প্রশস্তি আজও ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিও ভুলতে পারে নি। জয় হোক্ সুনন্দা দেবীর!

প্রগতিশীলা সুনন্দা দেবী

জয় হোক্ প্রগতিশীলা সুনন্দা দেবীর। 'পল্লীসমাজ' ছবিটির মহরৎ সুসম্পন্ন হয়েছে ইষ্ট ইণ্ডিয়া ষ্টুডিওতে। খুশি হলাম মহরতে নিমন্ত্রিতদের মধ্যে পরিচালক পশুপতি চট্টোপাধ্যায় ও অগ্রদূতদের দেখে। এঁদের 'দস্যু' ছবির 'ট্রেড-শো'র দিন দেখি নি। হয়তো এঁদেরও নিমন্ত্রণ-পত্র আর একজন চিত্র-সাংবাদিকের নিমন্ত্রণ পত্রের মত পোষ্ট অফিস থেকে হাওয়া হয়ে গেছে—অবশ্য প্রচার-অধিকর্ত্তা তাই-ই বলেন। ভারত স্বাধীন হওয়ার এই লাভ। পরাধীন ভারতে এই অভিযোগ বিদেশী সরকার সহ্য করতেন কিনা জানি না!

কিন্তু বলছিলাম প্রগতিশীলা সুনন্দা দেবীর কথা। বোধ হয় পৃথিবীর সমস্ত অভিনেত্রীর মধ্যে তিনিই সবচেয়ে প্রগতিশীলা। পুরাতনকে আঁকড়ে ধরা তিনি পছন্দ করেন না। তাই প্রথম ছবি তৈরী হলো এ্যাসোসিয়েটেড প্রোডিউসার্স ষ্টুডিওতে, পরিচালনা করলেন নীতিন বসু, নায়ক সাজলেন অসিতবরণ, ক্যামেরার কাজ করলেন রাধিকা কর্ম্মকার; দ্বিতীয় ছবিটি তৈরী হলো অন্য জায়গায়, অন্য লোক নিয়ে—ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে, পরিচালক নীরেন লাহিড়ী, নায়ক অসীমকুমার দা ও ক্যামেরা-ম্যান অনিল গুপ্ত; তৃতীয় ছবিতে আবার সব বদল—এবার ষ্টুডিও হলো ক্যালকাটা মুভিটোন, পরিচালক সৌমেন মুখোপাধ্যায়, নায়ক পূর্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়, ক্যামেরাম্যান বিদ্যাপতি ঘোষ এবং এই ছবিটিতে আবার সব বদল: ষ্টুডিয়ো—ইষ্ট ইণ্ডিয়া, পরিচালক—নীরেন লাহিড়ী, নায়ক—খোঁজা হচ্ছে, ক্যামেরাম্যান যতীন দাস।

জয় হোক্ প্রগতিশীলা সুনন্দা দেবীর।

পুঃ—এও কি সম্ভব যে যতীন দাস যদিও মহরতের সময় চিত্রগ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু এখন তাঁকে বদলে দেওজীভাইকে নেওয়ার কথা হচ্ছে?

ষ্টুডিও মহলে যদিও অনেকে বলাবলি করছেন 'রমেশ'-এর ভূমিকায় মাষ্টার বিভুকে দেখা যেতে পারে, আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হয়েছি যে এই গুজব সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন

আকাশবাণী
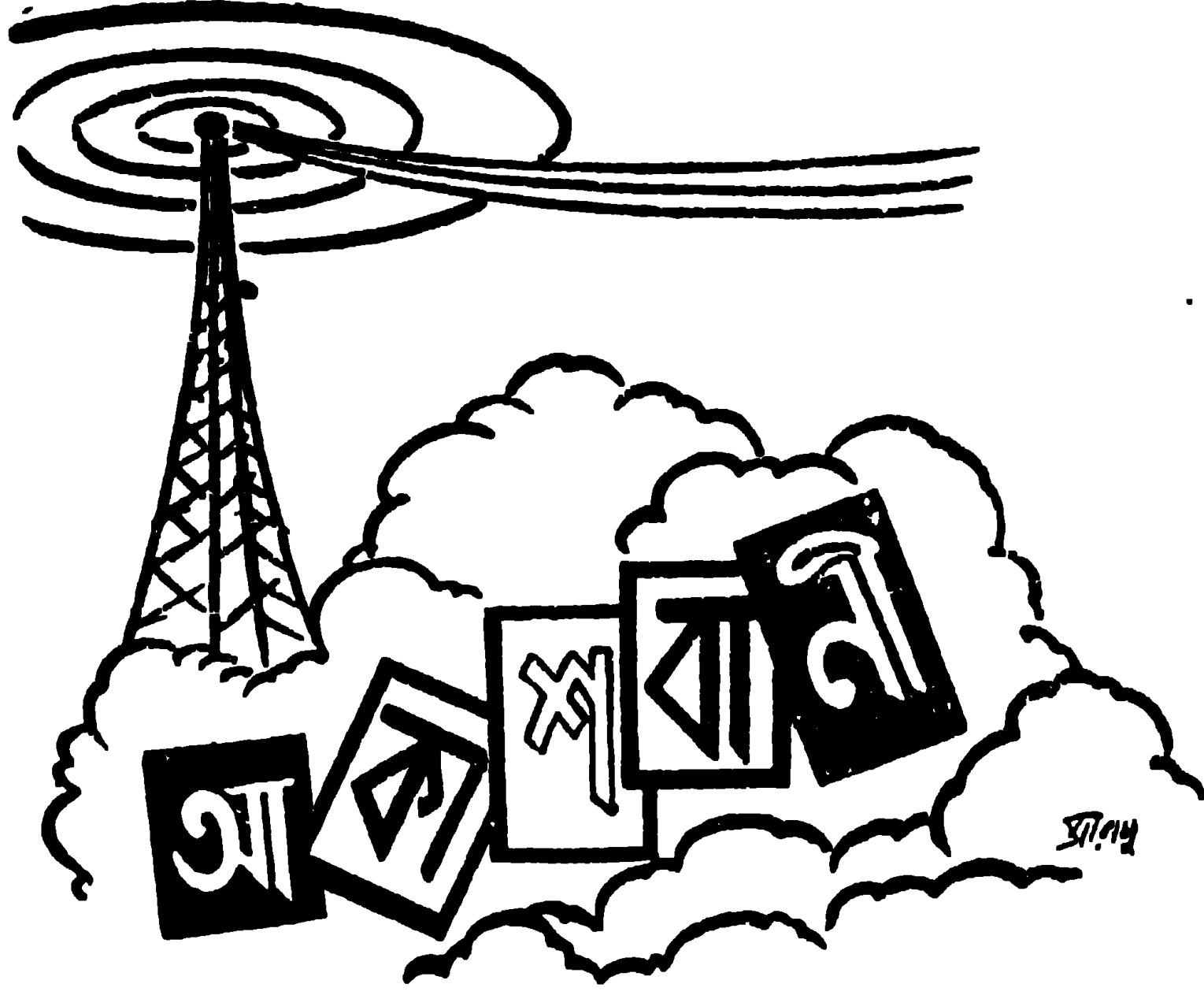
বেতারবন্ধু

সমালোচনা

কলিকাতা বেতার কেন্দ্র নিয়েই আমরা আলোচনা করে থাকি। আলোচনা একটি বিশেষ ক্ষেত্রেই আবদ্ধ আমরা রাখতে চাই কেননা পশ্চিম বাংলার সবে-ধন নীলমণি শিবরাত্তিরের সল্‌তে বলতে এই বেতার কেন্দ্র। বাংলা ও বাঙালীর শিক্ষা-সংস্কৃতির ধারক ও বাহক বলে একে অভিহিত করা হয়। বিদেশী শাসন-অন্তে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর শ্রোতাদের, শিল্পীদের এবং জনসাধারণের আস্থা ও আগ্রহ এই প্রতিষ্ঠানের ওপর যে পরিমাণে বর্দ্ধিত হওয়া উচিত ছিল তার বিন্দুমাত্রও হয় নি। হয় নি তার বহুবিধ ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য—যে ত্রুটি-বিচ্যুতি বহুপল্লবিত হয়ে বিভিন্ন-ভাবে রূপে ও আকারে কলিকাতা বেতারে আত্মগোপন করে আছে। আমাদের সমালোচনার একমাত্র লক্ষ্য হলো কলিকাতার বেতারকে সর্ব্বপাপ ও সর্ব্বদোষ মুক্ত করা। অন্যায়, অবিচার, পোষ্যপোষণ, কলিকাতা বেতারে বহুভাবে বর্ত্তমান। এগুলিকে বেতার থেকে বিদূরিত করা উচিত। বেতার সমালোচনার মাধ্যমে আমরা জাতীয় সরকারের বেতার বিভাগের কর্ম্মকর্ত্তা-দের এবং শ্রোতাদের ও শিল্পীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে পঙ্কমগ্ন কলিকাতা বেতারকে উদ্ধার করবার প্রয়াস পাচ্ছি। জানি এ কাজের গুরুত্ব, অনুভব করি আমাদের সীমাবদ্ধ শক্তি তবু আশা রাখি আমাদের কর্ত্তব্য সমাপনের, প্রার্থনা করি বেতার-দেবতাদের 'হৃদয় পরিবর্ত্তন'-এর। আগামী মাস থেকে আমরা বেতারের প্রত্যেক বিভাগ ধরে ধরে আলোচনা করবো। এই আলোচনার মধ্যে অনেক ইঙ্গিত ও তথ্য আমরা বেতার কর্ত্তাদের এবং আমাদের শ্রোতাদের সামনে উপস্থাপিত করতে পারবো। আজকে বেতার আলোচনার প্রারম্ভে তারই খানিক আভাস দিয়ে গেলাম।

বেতার-বাজেট

জাতীয় সরকারের বেতার বিভাগীয় কর্ত্তারা বিভিন্ন বেতার কেন্দ্রের জন্য সারা বছরে বিভিন্ন খাতে খরচের জন্য এক থোকে 'নির্দ্দিষ্ট অর্থ' ব্যয় মঞ্জুর করে থাকেন। অন্য বেতার কেন্দ্রের কথা আমার জানা নেই কিন্তু কলিকাতা বেতারে দেখছি যে বৎসর শেষ হওয়ার আগেই তহবিল খালি হয়ে যায়—টানাটানির বাজার সুরু হয়। বিভাগীয় কর্ত্তারা মুখ ভারী করে বসে থাকেন, শিল্পীরা এলে গলা কাঁপিয়ে গভীর দুঃখে ও অবসাদে ভেঙ্গে পড়ে বলেন: 'বাজেটে টাকা নেই, আমরা কি করবো বলুন!' আগেভাগে সব খরচ করে ফেলে কোন রকমে দায় সারবার জন্যে রেকর্ড

বাজানো সুরু হয়—শিল্পীদের ঘাড়ের ওপরে কোপ পড়ে সবচেয়ে বেশী এবং সবার চেয়ে আগে। নিরুপায় শিল্পীদের হাহুতাশ করা ছাড়া উপায় থাকে না। আর কেবল আশা করেন সামনের বছরে হয়তো ভাগ্য ফিরতে পারে।

বেতার-বাজেটের অর্থ আগেভাগে ফুরিয়ে গেলেই কেন **কেবলমাত্র শিল্পীরাই** দুঃখ ভোগ করবেন? বেতার বিভাগের যে সব কর্ত্তারা 'বেহিসাবী'ভাবে খরচ করেন তাঁদের কেন দোষী সাব্যস্ত করা হবে না? 'কেবলমাত্র শিল্পীরাই দুঃখভোগ করবেন'—এটা যেন স্বাভাবিক হয়ে এসেছে—আমার প্রতিবাদ সেখানেই। 'আর্টিষ্ট এন্টারটেনমেণ্ট ফাণ্ড'-এ যে টাকাটা প্রতি বছর খরচ না হলেই পড়ে থাকে 'সৎব্যয়' কর্তৃপক্ষ যেভাবে করেন তা আমাদের জানা আছে। বিভিন্ন সংবাদপত্র মালিকদের ও সম্পাদকদের 'চা-চক্রে' আহ্বান করে আপ্যায়িত করার খরচ যে 'আর্টিষ্ট এন্টারটেনমেণ্ট ফাণ্ড' থেকেই হয়ে থাকে তা কি বেতার-প্রধান অস্বীকার করতে পারেন? যাদের জন্য বা যে বিষয়ে অর্থ বরাদ্দ হয়ে থাকে—তাদের জন্য বা সে বিষয়ে অর্থ ব্যয় করা হয় না!

বেতার বাজেটের টাকা কম পড়লেই শিল্পীরা ভুগবেন কেন? বেতার কর্ত্তারা নিজেদের খুশি খেয়ালে এমন অনেক ব্যক্তিকে বেতারে 'ষ্টাফ্ আর্টিষ্ট' করে রেখে মোটা মাহিনা দিচ্ছেন যাদের দিয়ে বিশেষ কোন কাজ পাওয়া যায় না। এই ধরণের অপ্রয়োজনীয় ব্যক্তিদের একটি তালিকা কিছুকাল আগে আমরা প্রকাশ করেছিলাম। আজকে প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করতে পারি শ্রীযুক্ত ভিক্টর দে-র কথা। ইনি ইংরাজী অনুষ্ঠানের ঘোষক এবং ইংরাজী অনুষ্ঠানের রেকর্ড নির্ব্বাচন করে থাকেন। এই রেকর্ড নির্ব্বাচনের কাজটা আগে করানো হতো বেতারের প্রাক্তন কর্ম্মী শ্রীযুক্ত পূর্ণ ঘোষের দ্বারা। শ্রীযুক্ত দে ছাড়াও একজন মহিলা ইংরাজীতে ঘোষণা করে থাকেন। তাছাড়াও আছেন ছোটদের 'আন্টি' তারা। বর্ত্তমানে ইংরাজী অনুষ্ঠানের সময় অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। শ্রীযুক্ত দে এই অতি সাধারণ কাজের জন্য মাসে ৪৫০৲ টাকা মাহিনা পান! কাজের দিক দিয়ে বাংলা ঘোষকদের দায়িত্ব এবং সময় কাল অনেক বেশী হওয়া সত্ত্বেও বাংলা ঘোষকদের কেউ এখনও ২০০৲ টাকায় উঠতে পারেন নি। ইংরেজ চলে গেলেও 'সাদা' 'কালোয়' তফাৎটা এখনও পুরোমাত্রায় আছে যদিও জাতীয় সরকার দেশের শাসনভার গ্রহণ করেছেন। শ্রীযুক্ত দে-র কাজটা যে কোন লোককে দিয়ে করানো যায়—কলিকাতা বেতারে এই 'শ্বেতহস্তী' পোষার সখ যে কেন এবং কি জন্য তা আমাদের জানা নেই। ভিক্টর দে-র ওপর আমাদের কোন বিদ্বেষ নেই, তবু জাতীয় স্বার্থ এবং শিল্পীদের মুখের দিকে তাকিয়ে আমরা জোর গলায় বলতে পারি এভাবে বেতার বাজেটের অর্থের অপব্যয় আমরা কোন মতেই সমর্থন করি না। ভিক্টর দে-র মতো আরো অনেক 'কালো ভল্লুক' বেতারে বেশ আরামে আছেন। টাকার যদি একান্তই অভাব ঘটে থাকে নিরীহ শিল্পীদের না মেরে যারা অকারণে বেতারে অবস্থান করছেন বা নামমাত্র কাজ করে 'মোটা টাকা' লুটে নিয়ে যাচ্ছেন—তাঁদের বেতার থেকে আগে বিদায় করা উচিত। শ্রীযুক্ত অশোক সেন 'প্রথম বাঙালী' বেতার অধিনায়ক। এ হিসাবে আমরা গর্ব্বিত হলেও তাঁর 'রাজত্বকালে' বাংলা দেশের বেতার কেন্দ্রে 'বাঙালী শিল্পীরা' সবচেয়ে বেশী নির্য্যাতিত, শোষিত ও বঞ্চিত হচ্ছে—একথাই ভবিষ্যৎ বেতার ইতিহাসে লেখা থাকবে! বাঙালী বেতার-প্রধান হিসাবে শ্রীযুক্ত সেনের কি তাই কাম্য? শ্রীযুক্ত সেন যদি নিজে 'ষ্টাফ শিল্পী'দের কাজের হিসাব নেন 'অকারণ' অবস্থানকারীদের বিদায় করে দেন তাহলে অর্থের অভাবে শিল্পীদের প্রোগ্রাম না পাওয়ার জন্য হাহুতাশ করতে হয় না এবং বিভাগীয় কর্ত্তাদের মুখ কাঁচুমাচু করে চেয়ার আঁকড়ে বসে থেকে শিল্পীদের কাছে গলা কাঁপিয়ে কিছু নিবেদন করতে হয় না!

'বাঙালী' শিল্পীদের রক্ষার জন্য 'বাঙালী' বেতার-প্রধান কি এগিয়ে আসবেন?

বিশ্বাস করুন আর নাই……

কলিকাতা বেতারে একটি অতি-পরিচিত কণ্ঠ অনেক দিন শুনতে না পেয়ে শ্রোতারা খুব উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছেন। কেউ কেউ আমাদের পত্রাঘাতও করেছেন। সাধারণ শ্রোতাদের অবগতির জন্য আমরা জানাচ্ছি 'অতিপরিচিতকণ্ঠী' শ্রীমতী নীলিমা সান্যাল শান্তারামের 'অমর ভূপালী' ছবিতে 'কণ্ঠদান' করবার জন্যে বর্ত্তমানে বোম্বাইয়ে আছেন। এই কণ্ঠদানের জন্য শ্রীমতী সান্যাল **দশ হাজার টাকা** পারিশ্রমিক পাচ্ছেন! কথাটা সত্যি—বিশ্বাস করুন আর নাই……

* * * *

শ্রীমতী নীলিমা সান্যালকে বোম্বাই যাত্রা করতে দেখে আর একজনের 'যাত্রা' করার সাধ হয়েছে। এঁকে ছাড়া কলকাতা বেতারকে ভাবা যায় না। ইনি সদাচঞ্চল শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। 'বোম্বাই যাত্রা' নয় বোম্বাই জাহাজ ঘাট থেকে সাত সমুদ্দুর তেরো নদীর পারে লণ্ডন যাত্রা করার প্রাথমিক উদ্যোগ-আয়োজন নিয়ে শ্রীযুক্ত ভদ্র বর্ত্তমানে অত্যন্ত ব্যস্ত আছেন! শ্রীমতী সান্যালের মতো 'বাক্ দান' নয় 'প্রচার কাজ' বি-বি-সি-কলমে শেখার জন্য নাকি যাচ্ছেন। শ্রীযুক্ত ভদ্রের মতো 'অভিজ্ঞ প্রচার-বিদ্' আবার কিসের প্রচার কাজ শিখতে যাচ্ছেন? লণ্ডন-যাত্রার সংবাদটি শ্রীযুক্ত ভদ্রের প্রচার কিনা আমি বলতে পারি না!

* * *

লণ্ডনের শ্রীকমল বোসকে কলিকাতা বেতারের শ্রোতাদের মনে আছে নিশ্চয়! বি-বি-সি-র বাংলা অনুষ্ঠান 'বিচিত্রা'র মাধ্যমে ভারতের সকল বাঙালী শ্রোতাদের কাছে তিনি সুপরিচিত। 'বিচিত্রা'র অভূতপূর্ব্ব সাফল্যে শঙ্কিত হয়ে কলিকাতা বেতার কেন্দ্র 'বিচিত্রা' পুনঃপ্রচার করা বাজে অজুহাতে বন্ধ করে দেন। ফলে স্থানীয় শ্রোতাদের অনেকেই 'বিচিত্রা' শুনতে না পেয়ে বন্ধ হয়ে গেছে বলে মনে করেছিলেন। 'অল ওয়েভ সেটে' 'বিচিত্রা' অনেকেই শুনে থাকেন। স্থানীয় শ্রোতাদের জন্য 'বিচিত্রা' পুনঃপ্রচার নিয়ে এদেশের পত্র-পত্রিকায় কম লেখালেখি হয় নি। যাহোক 'বিচিত্রা' শ্রোতারা শুনে খুশী হবেন শ্রীযুক্ত বসু মাত্র তিন মাসের জন্য দেশে ফিরে আসছেন। দিল্লীতে তিনি ১৫-১৬ই ডিসেম্বরে 'বিচিত্রা' শ্রোতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় করবেন। ১৮ই ডিসেম্বর কলিকাতা ফিরে তিনি স্থানীয় 'বিচিত্রা' শ্রোতাদের সঙ্গে মিলিত হবেন। তারপর সমগ্র পশ্চিম বাংলায় পরিভ্রমণ করে তিনি 'বিচিত্রা' শ্রোতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় করবেন। এদেশের আর ওদেশের বেতারের কর্ম্মকর্ত্তাদের দিকে তাকালেই বোঝা যায়! 'সত্যি সেলুকাস, কি বিচিত্র এই দেশ!'

বাবলা
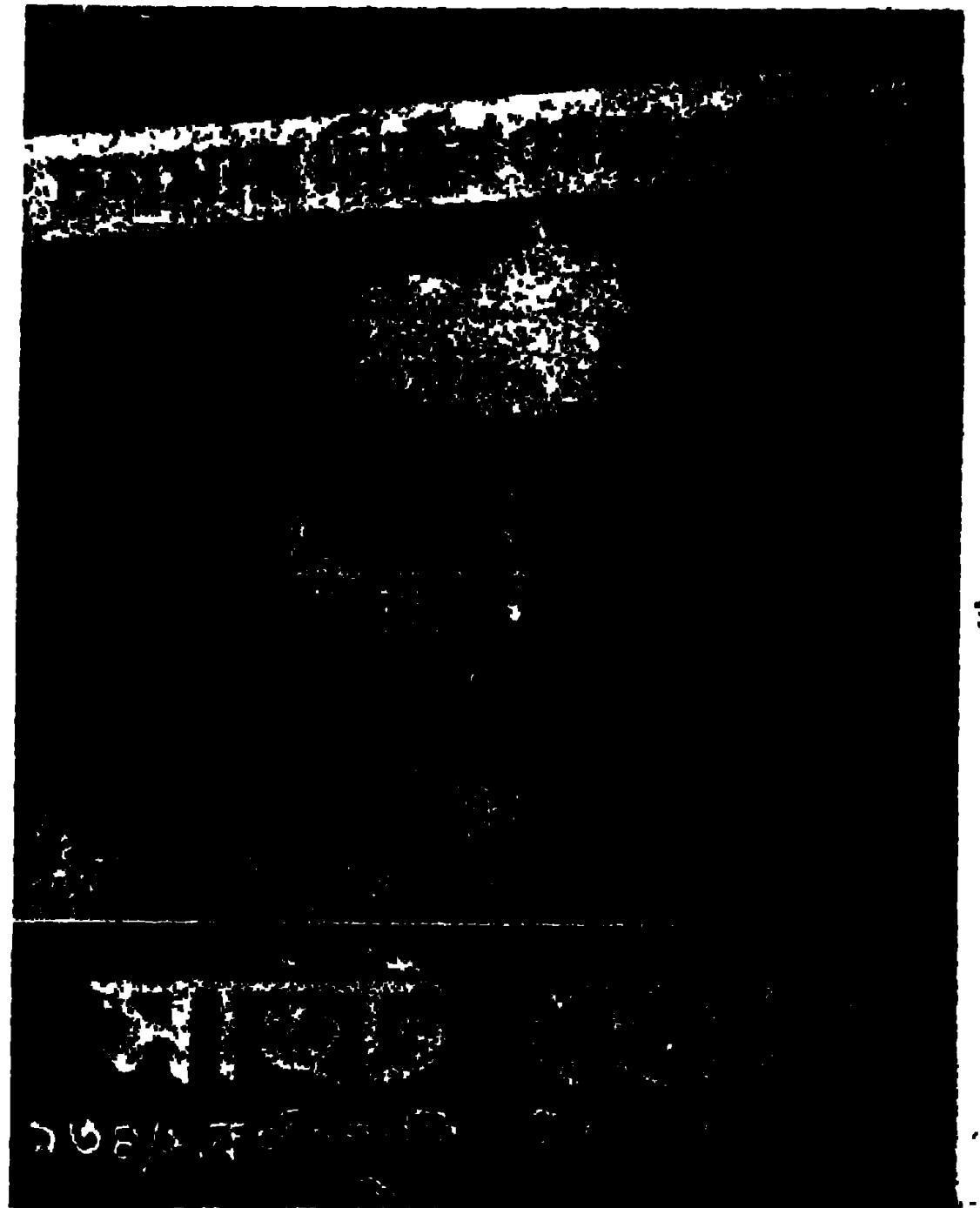
এম্ পি প্রোডাকসন্সের 'বাবলা' বাংলা চিত্র-জগতের সাংস্কৃতিক ও মননশীল গভীরত্বের ঐতিহ্যকে আরও খানিকটা সমুজ্জ্বল ক'রেছে, প্রমাণিত ক'রেছে ভাব-সম্পদের মর্মাভিমুখিতায় বাংলার শ্রেষ্ঠত্ব। যখন সঞ্চিত বিত্তকে বিপুলতর করার প্রলোভনে অপ্রবুদ্ধ উৎসাহে জনকয়েক বিকৃতি-স্নায়ু প্রযোজক বোম্বাইয়ের রুচিহীন অন্ধবৃত্তিকে মারাত্মকভাবে আশ্রয় ক'রেছেন তখন এম্ পি'র এই বলিষ্ঠ অভিজাত রুচি অবিসম্বাদী অভিনন্দনের দাবী রাখে। চিত্র প্রতিষ্ঠান হিসাবে তাঁদের এ গৌরবার্জন অবশ্য প্রথম নয় ইতিপূর্বে একাধিক সার্থক ছবির নির্মাতারূপে বাঙলার বিচার-নিষ্ঠ চিত্রামোদীর অন্তরে তাঁদের শ্রদ্ধার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত। সেদিক থেকে 'বাবলা' তাঁদের সার্থকতার তালিকায় এক নবতম সংযোগ।

'বাবলা' চিত্রে শৈল ও বাবলার ভূমিকায় শোভা সেন ও মাষ্টার নীরেন

আলোচ্য-চিত্রের বক্তব্য সমালোচনা প্রসঙ্গে প্রথমেই ব'লতে হয় আখ্যাংশের কথা। দর্শককে চমক্ লাগিয়ে বিভ্রান্ত করার মত কোন অবাস্তব কাহিনীকে গ্রহণ না ক'রেও যে সর্বজন সমাদৃত সফল ছবির সৃষ্টি সম্ভব তা 'বাবলা' আমাদের আবার নতুন ক'রে সন্ধান দিয়েছে—এমন কথা ব'ললে আশা করি অত্যুক্তির অপরাধ হবে না। কিছুদিন আগে হোলে প্রয়োজন হোত না, কিন্তু বর্তমানে কাহিনীর দৈন্য এতই প্রকট ও পীড়াদায়ক হোয়ে উঠেছে যে এ বিষয়ে যথেষ্ট সচেষ্ট ও অবহিত না হোলে অচিরেই শিল্পের গুরুতর ক্ষতির সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে, বিশেষ ক'রে বোম্বাইয়ের পঙ্কিল বন্যার ঢেউ যখন বাঙলার তীরকে শঙ্কিত ক'রে তুলেছে। আখ্যানই ছবির প্রাণ, অথচ আজকের দিনে সুস্থ কাহিনী অমিল হোয়ে প'ড়েছে। অর্থলোলুপতার দুর্ভেদ্য প্রাচীরে প্রযোজকের দৃষ্টি প্রতিহত, দুর্নীতির মুখোস খুলে সাদা চোখে তাকানো তাঁদের পক্ষে আজ প্রায় অসম্ভব! তাই দেখা যায় দিনের পর দিন কবন্ধ কাহিনীর কাঠামোয় শিশ্নোদর রসের পূতিগন্ধ ও অবচেতন যৌনতার বিকৃতি পরিবেশন ক'রে দেশের সামাজিক জীবনকে উদ্‌ভ্রান্ত করার উদ্দাম প্রয়াস। এমন এক পরিস্থিতিতে প্রশংসনীয় এম পি'র কাহিনী নির্বাচন। প্রত্যক্ষানুগামী

বাস্তব সংসারের সুখদুঃখ, আশানিরাশার সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলির এক সুষ্ঠু চিত্ররূপ 'বাবলা'।

জীবনসংগ্রামে পর্য্যুদস্ত নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের স্তর থেকে এসেছে পূর্ণ। নব্বুই টাকা মাইনের কম্পোজিটরের কাজ করে। উপরি খেটে বেশী টাকা রোজগার করে তার স্বপ্নকে সফল করার আশায়। বহুদিনের সাধ তার, শৈলকে ও ছোট্ট বাবলাকে দেশ থেকে কলকাতায় এনে সংসার পাতবে, বাবলাকে মস্তবড় বিদ্বান ক'রে তুলবে। একদিন শৈলকে আনার আয়োজন পূর্ণ হোল, কিন্তু অপূর্ণ রয়ে গেল পূর্ণর স্বপ্ন ইহজীবনের মত। শৈলর সঙ্গে তার আর দেখা হোলনা, কোলে নিতে পারলো না তার আদরের বাবলাকে। ষ্টেশনে তাদের আনতে যাওয়ার পথে পূর্ণ মারা গেল মোটর এ্যাক্সিডেণ্টে। বাবলাকে নিয়ে শৈল উঠলো লালুর পিসিমার আশ্রয়ে, যেখানে পূর্ণ থাকতো একান্ত আপনার জনের মত। কোন রকমে দুঃখকষ্টে সংসার নির্বাহ হয়। লালুর পিসী আর শৈল দু'জনে ঠোঙা তৈরী ক'রে আর সুপারী কেটে খরচ চালান। এদিকে বাবলা বড় হয়েছে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় কৃতিত্ব দেখিয়েছে। তাকে এখন বড় স্কুলে ভর্তি করা প্রয়োজন। কিন্তু অর্থ নেই ব'লে কেউ তাকে নিতে চায় না। অনেক চেষ্টার পর শেষটায় বাবলাকে হাফ-ফ্রিতে ভর্তি করা সম্ভব হোল। প্রথম বছরেই তার প্রতিভার পরিচয় পাওয়া গেল। সর্ববিষয়ে সর্বোচ্চ স্থান সে অধিকার ক'রেছে। শৈলর আনন্দ আর ধরে না! পূর্ণর স্বপ্ন বুঝি এতদিনে সার্থক হ'তে চ'লেছে।

কিন্তু দারিদ্র্যের লাঞ্ছনা অপরিসীম। বাবলার পড়ায় প্রতিবন্ধক দেখা দিল। অতি পরিশ্রমে শৈলর যক্ষ্মা দেখা দিয়েছে। গরীবের ব্যাধি, প্রতিকার ধনীরই সম্ভব। কার্পণ্য ক'রলেন না লালুর পিসী—অনাত্মীয়া হোলেও শৈল যে তাঁরই পুত্রবধূ তুল্য। তবুও একদিন তাঁর সব সম্বল ফুরিয়ে এলো। সর্বস্বান্ত হোলেন তিনি। বাবলা এসে দাঁড়ালো জীবন-সংগ্রামের প্রত্যক্ষতার মাঝে। মাকে তার বাঁচাতেই হবে। নিরুপায় বাবলা অর্থ রোজগারের
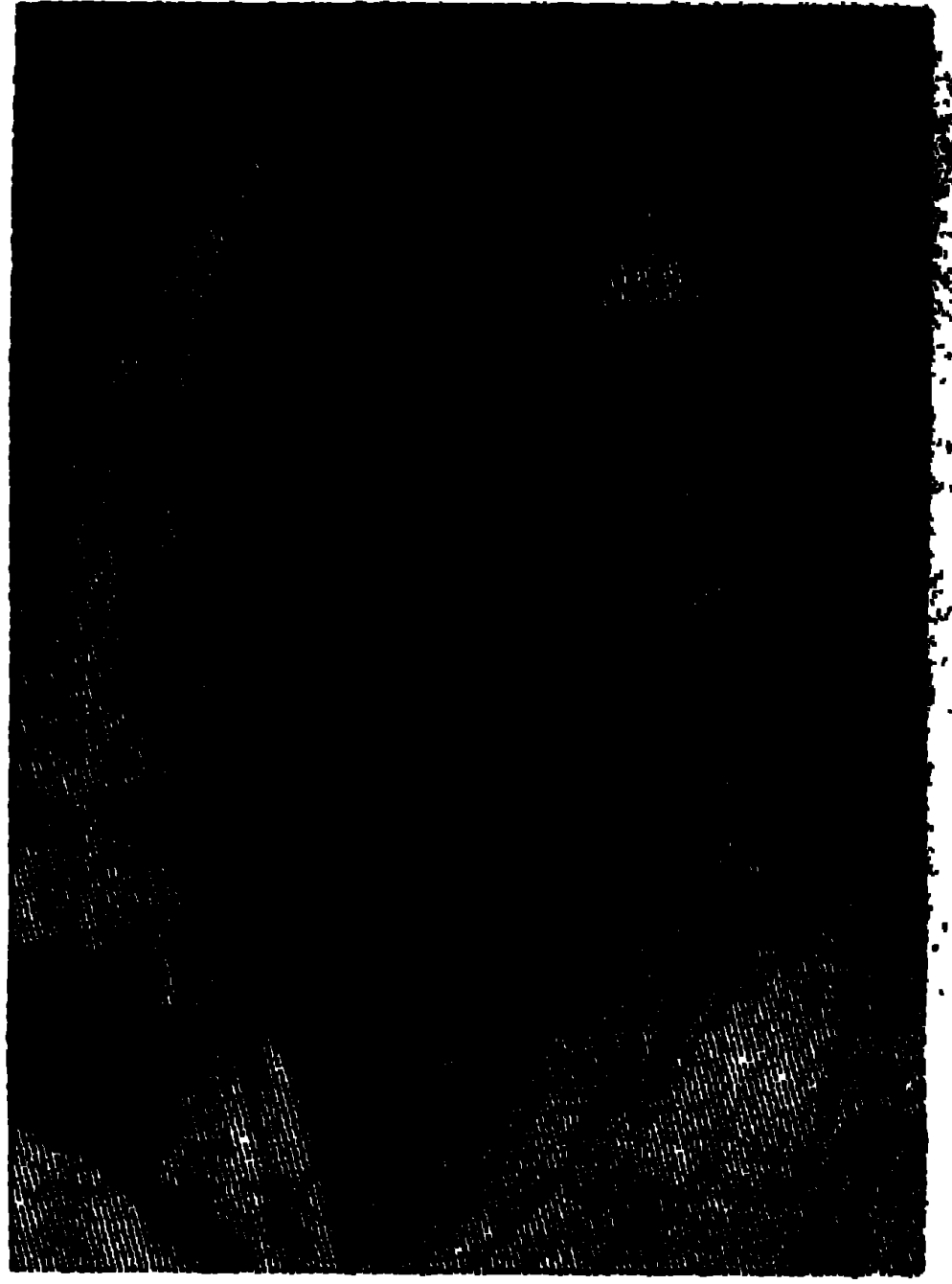
'বাবলা' চিত্রে ভগবতীরূপে শ্রীমতী প্রভা

চেষ্টায় খবরের কাগজ বিক্রী সুরু করলো। একদিন রাস্তায় খবরের কাগজ ফেরী ক'রতে গিয়ে একটা মানিব্যাগ কুড়িয়ে পেলো। ঠিকানা সংগ্রহ ক'রে বাবলা সেই ব্যাগ তার মালিক তরুণ ব্যারিষ্টার প্রমোদের বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে এলো। প্রমোদ মুগ্ধ হোল বাবলার সততায় ও চরিত্রের দৃঢ়তায়। সাহায্য ক'রতে চাইলো। বাবলা তা' নিতে নারাজ। দু'জনের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠলো। প্রমোদ ভাবলো বাবলার সাধুতার পুরস্কার সে দেবে তার মা-র চিকিৎসার ব্যবস্থা ক'রে। কিন্তু সে সুযোগ তার আর হোলনা, বাবলার কাছে তার ঋণ আরও বেড়েই গেল। সেদিন শৈলর শেষ অবস্থা, বাবলা চলেছে প্রমোদের কাছে। পথে হঠাৎ নজরে প'ড়লো প্রমোদের ভাবী পত্নী বিভার গাড়ী আটক ক'রে গুণ্ডারা তাকে হরণ ক'রে নিয়ে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে বাবলা গুণ্ডার মোটরের পিছু নিয়ে তাদের আড্ডার খোঁজ ক'রে এসে প্রমোদকে জানালো। পুলিশ নিয়ে প্রমোদ তখনই ঘটনাস্থলে উপস্থিত হোল। বিভাও উদ্ধার হোল, কিন্তু ফেরানো গেলনা মৃত্যুপথযাত্রী

'বাবলা' ছবিতে কৈলাসমামারূপে জহর গাঙ্গুলী

বাবলার মাকে। শৈল মারা গেল। সুরু হোল বাবলার জীবনে এক মর্মান্তিক ট্র্যাজেডী।

নিছক একটি করুণরসসিক্ত কাহিনী, সুসাহিত্যিক সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় রচিত, দুঃস্থ নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের অসংখ্য বেদনাবিধুর জীবনযাত্রার সঙ্কীর্ণ পটভূমিকার ওপর একটি সকরুণ ছবি। এর মধ্যে নেই মস্তিষ্ক পরিচালনার খোরাক, নেই কোন বুদ্ধির দীপ্তি, আছে শুধু স্বচ্ছ হৃদয়াবেগ, আবেদনের প্রধানতম উপাদান। তাই এর চিত্ররূপে বিশেষ পরিশ্রম ক'রতে হয়নি পরিচালক 'অগ্রদূত'-গোষ্ঠীকে।

সহজ এবং স্বাভাবিক বিন্যাসের ওপর আশ্রয় ক'রেই কাহিনীকে তাঁরা পর্দায় উপস্থিত ক'রেছেন। চিত্রনাট্য রচনায় অহেতুক পালিশের মোহ পরিত্যাগ করা হয়েছে বলেই বোধ হয় 'বাবলা' অত বেশী ক'রে দর্শকের অন্তর স্পর্শ করতে পেরেছে। তাছাড়া কোন রকম বিশেষ আঙ্গিক কৌশলের সহায়তাও এতে নেওয়া হয়নি বরং আগাগোড়া এই প্রত্যক্ষানুগামী কাহিনীকে সরলভাবে সোজা ছবিতে বলার চেষ্টা করা হয়েছে। এ জাতীয় নিরাভরণ অনাড়ম্বর আখ্যাংশের ভেতর পরিচালকের কৃতিত্ব দেখাবার অবকাশ যেমন কম তেমনি বেশী অপযশ লাভের আশঙ্কাও কম—তবু যে এরা মানুষের মন ছুঁয়ে যায় তা শুধু সহজাত সারল্যের জোরে আর অভিনয়ের গুণে।

পূর্বখ্যাতি ক্ষুণ্ণ না করলেও 'অগ্রদূত'-গোষ্ঠীকে একটি দায় থেকে সম্পূর্ণ অব্যাহতি দেওয়া যায় না। দুটি বিষয়ে আমাদের চোখে কিছু অসঙ্গতি ধরা প'ড়েছে। ছবির মাঝামাঝি প্রমোদ-প্রসঙ্গটা অপ্রাসঙ্গিক ব'লে মনে হয়েছে। বাবলার জীবনে অপর কোন চরিত্রের আবির্ভাব যে হবেনা এমন নয়, তবে এক্ষেত্রে যেন প্রমোদ-বিভার প্রণয় ও বিভা অপহরণের খণ্ড ঘটনা মূলের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে মিশতে পারেনি। বিশেষ ক'রে বিভা-হরণের অনুক্রমে এসে দর্শকের মন অকস্মাৎ একটা হোঁচট খেয়ে পড়ে এবং সেইসঙ্গে মূল রসধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হোয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে এ ঘটনাটি ও নাটকীয়তার সুযোগ না নিলে হয়তো বাবলার সততা ও জীবনের ট্র্যাজেডীটি ফুটিয়ে তোলা চ'লতো। শেষের গানখানি অত্যন্ত মামুলী ও প্রক্ষিপ্ত এবং চিত্রের বেদনাবিহ্বল পরিবেশের সহায়ক না হয়ে বরং ক্ষতিকারক হয়ে উঠেছে।

সুর-সংযোজনা, শব্দগ্রহণ, চিত্রগ্রহণ প্রভৃতি অন্যান্য কলাকৌশলের দিকগুলি সাধারণ ভাল ছবির পর্যায় অতিক্রম ক'রতে পারেনি। অবশ্য তাদের ভেতর বিশেষ কোন ত্রুটী দর্শানোর ফাঁক না থাকলেও আরও উৎকর্ষের অবসর যে ছিলনা এমন নয়।

অভিনয়াংশে সবচেয়ে কৃতিত্ব দেখিয়েছে নামভূমিকায় মাষ্টার নীরেন ভট্টাচার্য। এই নবাবিষ্কৃত কিশোর অভিনেতাটি যে বিস্ময়কর অভিনয়-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছে তা' সত্যই অনন্যসাধারণ। নীরেনের স্বতঃস্ফূর্ত ভাবাভিব্যক্তির অপূর্ব ব্যঞ্জনায় যে কাতরতা ফুটে উঠেছে তার দুর্নিবার আকর্ষণে মন আর্দ্র হয়ে ওঠে, প্রতিটি মন সজল হয়ে ওঠে, প্রতিটি চোখও। সামগ্রিক বিচারে বাবলার সাফল্য নীরেনের নৈপুণ্যের ওপরেই প্রতিষ্ঠিত। এমন শৈল্পিক প্রতিভা

এদেশে দুর্লভ ব'ললেও অত্যুক্তি হয়না, 'অলিভার টুইষ্ট'-এর কিশোর অভিনেতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আমরা নীরেনকে আমাদের অন্তরের অভিনন্দন জানাই, কামনা করি তার আরও উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের —সম্ভাবনার গর্ভে যা রয়েছে কালের প্রতীক্ষায়। নীরেনের পর মনে রাখবার মত অভিনয় ক'রেছেন শোভা সেন ও প্রভা যথাক্রমে শৈল ও লালুর পিসীর চরিত্রে। হৃদয়াবেগে উচ্ছল, আবেদনে প্রাণবন্ত এঁদের চরিত্ররূপায়ণ পূর্ব গৌরবকে আরও বেশী মহীয়ান করে তুলেছে। জহর গাঙ্গুলীর ভূমিকাটি সু-অভিনীত সন্দেহ নেই, তবে স্থানে স্থানে অতি-নাটুকেপনা-বর্জিত হোলে আরো উন্নত হোত। অন্যান্য শিল্পীর দক্ষতা যথাযথ, উল্লেখের দাবী করেনা।

সম্পদ

কাহিনী—আসামের এক চা-বাগান। মালিক প্রকাশ দত্ত। তাঁর ডানহাত সুপারভাইজার জ্যাকসন সাহেব, শয়তানের প্রতিমূর্তি। কুলি-সর্দার বল বাহাদুরের মেয়ে লছমীর নারীত্বের চরম অবমাননা করা তার কাছে ছেলেখেলা। কিন্তু প্রতিবাদ জানাতে লছমীর হাত ধ'রে এসে দাঁড়ায়, চা-বাগানের এক নেটিভ ক্রীশ্চান পরিবারের ছেলে জয়ন্ত। তার বাবা বুড়ো ম্যাকার্টনি, মা পাহাড়ী-কন্যা অন্ধ দেবী আর পালিতা বোন সোনালী। জয়ন্তের প্রতিবাদে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে জ্যাকসন। জয়ন্ত আর জ্যাকসনের হাতাহাতি শুরু হয়ে যায়। এমন সময় এসে পড়েন—চা-বাগানের মালিক। অনধিকার প্রবেশের অজুহাতে তিনি জয়ন্তকে স্থানত্যাগ করতে হুকুম দেন; আর, জ্যাকসনকে করেন তিরস্কার। অভিমান-বিক্ষুব্ধ চিত্তে জয়ন্ত ফিরে যায়।

অন্ধ দেবী আর ম্যাকার্টনি সাহেবের মধ্যে জয়ন্তকে নিয়ে আলোচনা চলে। জয়ন্তের বুনো-স্বভাবে আর চা-বাগানের প্রতি আকর্ষণে ম্যাকার্টনি সাহেব চিন্তিত হন। অজানা আশঙ্কায় মাতৃ-হৃদয় দুলে ওঠে, অশ্রুর বন্যায় তা প্রকাশ পায়। সোনালী এঁদের ভাবান্তরে ভাবনার জালে জড়িয়ে পড়ে। কিন্তু যাকে ঘিরে এত কাণ্ড সেই জয়ন্তের কোনো পরিবর্তন নেই—পাহাড়ী-ছেলের উদ্দামতায় সে সদা-চঞ্চল। চা-বাগানের কুলিরা তাকে বলে--'পাগ্‌লা-সাহেব'।

চা-বাগানে নতুন মানুষ আসে। প্রকাশ দত্তের ভাইপো অজয় আর ভাইঝি নমিতা। অরণ্যপথে ভালুকের আক্রমণে যখন বুড়ো ম্যাকার্টনি-সাহেব প্রাণ দিলেন, তখন সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে দত্ত পরিবারের সঙ্গে জয়ন্তের একটা নতুন সম্পর্ক গ'ড়ে ওঠে। সভ্য জগতের শিক্ষিতা তরুণী নমিতার সংস্পর্শে পাহাড়ী জগতের অশিক্ষিত তরুণ জয়ন্তের ভাবান্তর দেখা দেয়। জয়ন্ত যেন ক্রমশঃ বদলে যায়। অন্ধ দেবী শিউরে ওঠেন; সোনালীর মনে জাগে হিংসা।

বুড়ো ম্যাকার্টনি সাহেব মরবার আগে সোনালীর কাছে জয়ন্তের সত্য পরিচয় দিয়ে যান। ব'লে যান, বাইশ বছর আগে জয়ন্তকে তিনি কুড়িয়ে পেয়েছিলেন —পাহাড়ী পথে। তার মা-বাবাকে কারা যেন গাড়ী-চাপা দিয়েছিল। শিশু জয়ন্ত পথে প'ড়ে কাঁদছিল অবিশ্রান্তভাবে। পাশে পড়ে ছিল একটা সুটকেশ। সুটকেশের গায়ে লেখা ছিল, জয়ন্তের বাবার নাম —অভয় বসু। সুটকেশের ভিতরে ছিল একটা নীলখাতা, যার পাতায় পাতায় ছিল অভয় বসু ও তাঁর পরিবারের সমস্ত ইতিহাস। তা থেকেই ম্যাকার্টনি জেনেছিলেন—অভয়পুর চা-বাগানের মালিক প্রকাশ দত্ত নয়, সে-মালিক মৃত অভয় বসুর পুত্র জয়ন্ত। এই সত্য জানতেন দেবী; তাঁর কাছেই যক্ষের ধনের মতো সঞ্চিত ছিল সেই নীল খাতা। কিন্তু পাছে জয়ন্ত তার আত্ম-পরিচয় জানতে পেরে তাঁদের ফেলে চ'লে যায় সেই আশঙ্কায় তিনি জয়ন্তের দৃষ্টির আড়ালে রেখেছিলেন সেই ডায়েরী। বাইশ বছর ধ'রে তিনি যাকে মাতৃ-স্নেহে মানুষ করে তুলেছেন প্রাণাধিক সেই জয়ন্তকে ছেড়ে দেবেন কেমন ক'রে!...

এদিকে নমিতা ও জয়ন্তের যখন একটা প্রীতির সম্বন্ধ গ'ড়ে উঠেছে—সেই সময় চা-বাগানে এক দুর্ঘটনা ঘটলো। জ্যাকসন সাহেবের অত্যাচার ও অবিচারে বিক্ষুব্ধ হয়ে বল বাহাদুরের নেতৃত্বে চা-বাগানের সমস্ত কুলি অসহযোগ ঘোষণা করল। প্রকাশ দত্ত বিবেচনা-বুদ্ধি হারিয়ে বল বাহাদুরকে ঠেলে ফেলে দিলেন নীচে। বল বাহাদুর প্রাণ হারালো। জনতা ক্ষেপে উঠ্‌লো একসঙ্গে। হত্যা, না দুর্ঘটনা? সাক্ষী একমাত্র জয়ন্ত। সোনালী প্রশ্ন করলো—বলো, জয়ন্তদা কি হয়েছে? সত্যকে প্রকাশ করো সবার সামনে। দুর্বল মুহূর্তে, নমিতার কথা চিন্তা করে, সত্যকে করলো গোপন। বললো—বল বাহাদুর পা ফসকে নীচে প'ড়ে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছে। আর সকলে 'পাগলা-সাহেবে'র সে-কথা বিশ্বাস করলেও সোনালী বিশ্বাস করলো না।

তারপর, নানা ঘটনা-সংঘাতের মধ্য দিয়ে কাহিনীর পরিসমাপ্তি। 'নীল-খাতা'র কথা জানতে পারলেন—প্রকাশ দত্ত। এক নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে তিনি একদিন যে বিপুল সম্পত্তি লাভ করেছিলেন আজ তা হারাতে ব'সে ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে উঠ্‌লেন। ম্যাকার্টনি-পরিবারের গৃহে আগুন লাগালেন, সোনালীকে করলেন বন্দী। কিন্তু অজয় ও নমিতার সাহায্যে সোনালী মুক্তি পেল; আর, আগুনের মধ্য থেকে অচৈতন্য দেবীকে নিয়ে এলো জয়ন্ত। সোনালী জয়ন্তকে দিল 'নীল খাতা'। নমিতা জয়ন্তকে বল্‌লো—তার নিজের সম্পদকে অধিকার ক'রে নিতে। কিন্তু জয়ন্তের মনের দুর্বলতা কেটে গেছে দেবীর মৃত্যুতে। মা-কে হারিয়ে সে চায় না চা-বাগানের বিরাট সম্পত্তি—মাতৃসম্পদ হারিয়ে তার কাছে কোনো সম্পদেরই আর মূল্য নেই।

সমালোচনা—সাহিত্যশিল্পী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের এই সংঘাতময় কাহিনীকে চিত্রে রূপায়িত করেছেন পরিচালক অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়। মুল্‌করাজ আনন্দের 'দুটি পাতা ও একটি কুঁড়ি' উপন্যাসের প্রভাব এড়াতে পারেননি কাহিনীকার। বাংলা সাহিত্যে যশস্বী কথা-শিল্পীর পক্ষে এটা শ্লাঘার কথা নয়। কাহিনীতে সংঘাত আছে সত্য; কিন্তু বড়ই কৃত্রিম। স্বাভাবিকভাবে ঘটনার সন্নিবেশ না হয়ে আকস্মিকভাবে একটার পর একটা ঘটনা এসেছে। কাহিনীর মধ্যে সবচেয়ে বড় ত্রুটি দেবী-কে অন্ধ সাজানো। অন্ধ হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু অন্ধের অভিনয় করাটা শুধু অস্বাভাবিক-ই নয়, হাস্যকর। নেহাৎ, জয়ন্তের প্রাণ রক্ষার খাতিরেই একদিন দেবী চোখ খুললেন আর বন্দুক নিয়ে ছুটলেন—অথচ, দীর্ঘ দশ বছর তিনি অন্ধের অভিনয় ক'রে এসেছেন। ভাবতে পারেন? সংলাপের ত্রুটিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নারায়ণবাবু আসামের কুলীদের মুখে যে সংলাপ বসিয়েছেন, তা কয়লার খনির (তাও আসানসোল-ঝরিয়া অঞ্চলের) কুলীদের কথ্য-ভাষা—আসামের চা-বাগানের কুলীরা ও ভাষায় কথা বলে না।

পরিচালনার দিক থেকে অর্ধেন্দুবাবু তাঁর নিজস্ব ভঙ্গীতে অনেক 'স্টান্টে'র বাণ নিক্ষেপ করেছেন। কিন্তু, স্টান্ট স্টান্টই—সাময়িক উত্তেজনার সৃষ্টি করলেও দর্শকচিত্তে তা রেখাপাত করে না। ফলে, উদ্দেশ্যই হয় ব্যর্থ। স্টুডিয়োর ভেতরে তোলা অরণ্য জগতের সঙ্গে সত্যিকারের-তোলা-অরণ্যভূমি বেখাপ্পা দেখিয়েছে। বিদেশী ছবির 'স্টক-সট্' থেকে অরণ্য-জন্তুর প্রদর্শন মূল ছবির সঙ্গে খাপ খায়নি মোটেই। তাছাড়া, নিবিড় অরণ্যভূমির অন্তরালে জন্তু-জগতের যে বিভীষিকা আছে তা কোথাও স্পষ্ট হয়নি। একটি ভালুক, একটি বাঘ, গোটাকয়েক বানর, একটি সাপ নিয়ে কি আর অরণ্যের বিভীষিকা রচনা করা চলে? শিকারের দৃশ্যগুলিতে আবহ-সঙ্গীতের মধ্যে যখন বিজাতীয় অর্কেস্ট্রার সুর বেজে ওঠে, তখন ফাঁকি আপনা থেকেই ধরা প'ড়ে যায়। অর্ধেন্দুবাবুর পরিচালনার কৃতিত্ব তো এইখানেই! জয় হোক অর্ধেন্দু মুখার্জী-র!

'সম্পদ'-ছবির কয়েকটি দৃশ্য চিত্রশিল্পীর কৃতিত্বের পরিচয় দেয়। বিশেষ ক'রে চা-বাগানের মালিকের বাংলোর, কুলীদের চা-পাতা সংগ্রহের এবং ম্যাকার্টনি সাহেবের কুটিরের আভ্যন্তরীণ দৃশ্যগুলি। শব্দগ্রহণ

শিল্পনির্দ্দেশনা ও সম্পাদনায় উল্লেখযোগ্য কোনো কৃতিত্ব ধরা না পড়লেও নির্দিষ্ট কলাকুশলীদের আন্তরিকতার পরিচয় মেলে। গানগুলির রচনা ও সুর মন্দ নয়। রূপসজ্জার দিক থেকে নীতীশবাবু ও জীবন গাঙ্গুলীকে বড় বেখাপ্পা লেগেছে। সে-তুলনায় শোভা সেন, প্রণতি ঘোষ ও লছমীর ভূমিকাভিনেত্রীর রূপসজ্জা সুন্দর।

'সম্পদ'-ছবিতে বিশেষ উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন দেবী-র ভূমিকায় শোভা সেন। মাতৃহৃদয়ের ব্যাকুলতাকে যেভাবে তিনি দরদ দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন—তাতে তাঁর অভিনয়-দক্ষতারই পরিচয় পাওয়া যায়। এর পর নাম করা যায় বল বাহাদুরের ভূমিকায় পঞ্চানন ভট্টাচার্য, সোনালীর ভূমিকায় প্রণতি ঘোষ, জ্যাকসনের ভূমিকায় রিচার্ড ক্রকৃস্ আর ম্যাকাটনির ভূমিকায় জীবন গাঙ্গুলীর। জীবেন বসু তাঁর স্বভাবসিদ্ধ অভিনয়ে অজয়ের ভূমিকাটি-কে রসবন্ত ক'রে তুলেছেন। সবচেয়ে হতাশ করেছেন পুরাতন দলের নীতীশ মুখোপাধ্যায় আর নতুন দলের রমলা চৌধুরী। নীতীশবাবুর অভিনয় মঞ্চ-ঘেঁসা আর রমলা চৌধুরী অত্যন্ত আড়ষ্ট। নবাগত সমীরকুমার বলিষ্ঠ চেহারার অধিকারী হলেও, তাঁর বাচনভঙ্গিমা ও চলাফেরা মোটেই প্রশংসার যোগ্য নয়।

ভ্যালেন্টিনো

চলচ্চিত্রের নির্ব্বাকযুগের যে প্রিয়দর্শন নট একদা বহু নারীহৃদয় আন্দোলিত করার গৌরব অর্জ্জন করে-ছিলেন সেই রুডলফ্ ভ্যালেন্টিনোর জীবন-কাহিনী নিয়ে গৃহীত এই চিত্র-নাটক 'ভ্যালেন্টিনো'। ভ্যালেন্টিনোর ভূমিকায় অভিনয় করেছেন এ্যান্থনী ডেক্সটার নামক এক সুদর্শন যুবক। ভ্যালেন্টিনোর সঙ্গে তাঁর অদ্ভুত আকৃতিগত সাদৃশ্য পাওয়া যায়।

নেপলস্ থেকে নিউ ইয়র্কগামী এক জাহাজে রুডলফ্ ভ্যালেন্টিনো নামক এক অখ্যাত সৌম্যদর্শন নর্ত্তকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় জোয়ান নাম্নী এক তন্বীর। সেই যুবতী এক চিত্রতারকা, কিন্তু তিনি তাঁর পরিচয় গোপন রাখেন। ভ্যালেন্টিনোর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতেই এই তন্বী তাঁর রূপ দেখে মুগ্ধ হন। যুবকও যুবতীর প্রেমে পড়েন। কিন্তু পরিচয়ের সুযোগ হয় না। সেই সুযোগ একদিন অপ্রত্যাশিতভাবেই আসে। লেখক-বন্ধু লুনী ভ্যালেন্টিনোকে কিছু টাকা-কড়ি দিলেন ভাল পোষাক কেনার জন্য। এই পোষাকে এক নাইট ক্লাবে ভ্যালে-ন্টিনোর সঙ্গে জোয়ানের হয় প্রথম পরিচয়। আর পরিচয় হয় প্রযোজক কিং-এর সঙ্গে। ভ্যালেন্টিনোর রূপ দেখে কিং তাঁকে ছবির কাজের জন্য পরীক্ষা করতে চান। যুবক কৃতিত্বের সঙ্গে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, অনতিকালমধ্যে প্রসিদ্ধ চিত্রনটরূপে সর্বত্র খ্যাতি অর্জ্জন করেন এবং সারা দুনিয়ার চিত্রামোদীদের সম্মোহিত করে তুলতে সক্ষম হন। কিন্তু জোয়ান তাঁর এই খ্যাতি-তেও আস্থা স্থাপন করতে না পেরে কিংকে বিবাহ করেন। কালক্রমে 'দি শেখ' নামক চিত্রে জোয়ান ও ভ্যালেন্টিনো নায়ক-নায়িকারূপে অবতীর্ণ হন। এরপর উভয়ের প্রতি উভয়ের আকর্ষণ এতই বেড়ে যায় যে তাঁরা গোপনে পালিয়ে যাওয়ার সঙ্কল্প করেন কিন্তু ধরা পড়েন। কোন অপ্রীতিকর অবস্থা সৃষ্টি হবার আগেই ভ্যালেন্টিনো মিথ্যা করে বলেন যে, নিউ ইয়র্কের এক নর্ত্তকীর সঙ্গে তিনি বিবাহসূত্রে আবদ্ধ। দুর্ভাগ্যক্রমে এর কিছুদিন পরেই এ্যাপেণ্ডিসাইটিস রোগে তাঁর মৃত্যু ঘটে। সংক্ষেপে এই হলো ছবির কাহিনী।

এই ছবিতে ভ্যালেন্টিনোর বহু প্রেমিকার মধ্যে যিনি তাঁর জীবনের অনেকখানি জুড়ে ছিলেন তিনি সেই সুন্দরী চিত্রতারকা। জোয়ানের ভূমিকায় রূপদান করেছেন এলেনর পার্কার। ইউনিভার্সাল-ইন্টার-ন্যাশনালের এই ছবিখানি পরিচালনা করেছেন লুই এ্যালেন। ছবিখানি টেকনিকলারে রঙীন।

প্রতিধ্বনি

ব্যর্থ বাংলা ছবির তালিকার সংখ্যা যতই বাড়ছে নিত্য-নূতন প্রযোজক এসে সেই তালিকার কলেবর হ্রাস করার পরিবর্ত্তে নাম জাহির করার উদ্দেশ্যে কি

কোন্ উদ্দেশ্যে জানি না ছবি তুলবেনই। যে-জাতীয় ছবি তুলে বাংলার চলচ্চিত্রশিল্প দুর্নাম অর্জ্জন করছে, সেগুলি সম্বন্ধে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাদিতে বিরুদ্ধ সমালোচনা হওয়া সত্ত্বেও কেন যে এইসব প্রযোজক শিক্ষালাভ করেন না বা এই অর্থ-সঙ্কটের দিনে অকারণে নিয়োজিত মূলধনটুকুও ফিরে না পেয়ে সজ্ঞানে লোকসানের বোঝা মাথায় নিয়ে ফিরে আসেন তা যে কোন সাধারণ বিচার-বিবেচনা-সম্পন্ন ব্যক্তি বুঝলেও এইসব প্রযোজক বোঝেন না।

এইরকম একখানি ব্যর্থ ছবি হলো কে. পি. জি পিক-চার্সের 'প্রতিধ্বনি'। ছবির কাহিনী হলো এই :—শঙ্করের খুব ছোট বয়সে তার কাকা তার বাবাকে প্রতারণা করে সর্ব্বস্বান্ত করে এবং শেষে খুনের দায়ে তাঁকে জেলে পাঠায়। শঙ্করকে তার মায়ের সঙ্গে সেখান থেকে পালিয়ে যেতে হয়। যেখানেই যায় সেখানেই তাদের ওপর অত্যাচার চলে। শঙ্করের মা আত্মহত্যা করে। পরে শঙ্কর সাক্ষাৎ পায় তার বাবার। বাবা তাকে এইসব অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতে বলে। মণিশঙ্কর নাম নিয়ে সে যখন একের পর এক হত্যা করতে সুরু করে যে যে তার ওপর অত্যাচার চালিয়েছিল। অবশেষে পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করে।

কি অভিনয় কি বিভিন্ন কলাকুশলীর কাজ কোনটাই এ ছবিতে উল্লেখ করার মত হয় নি।

সংসার

রাজা-রাজড়া ও ঐশ্বর্য্য-গরিমার চিত্ররূপায়ণে সারা ভারতে খ্যাতিসম্পন্ন মাদ্রাজের জেমিনী চিত্র প্রতিষ্ঠানের চতুর্থ হিন্দী-চিত্র-নিবেদন 'সংসার' দেখতে বসে প্রথমটা যতটা আশান্বিত হয়েছিলাম শেষ পর্য্যন্ত সেই পরিমাণে হতাশ হয়েছি। আশান্বিত হয়েছিলাম এই অনুমান করে যে, এত সঙ্গতিসম্পন্ন একটি চিত্র প্রতিষ্ঠান এতদিন

পরে কল্পলোকের আইভরী-টাওয়ার থেকে মাটির সংসারে পা ফেলেছেন দেখে। কিন্তু সেখানেও দেখছি সংসারটা জেমিনী তাঁদের একটা বিশেষ ফরমুলা ও দৃষ্টিভঙ্গীর মাধ্যমে দেখিয়েছেন কাহিনী এবং তার ট্রিটমেন্ট হয়েছে বিশেষ মোটা দানার, হাস্য-রস ও যৌন-আবেদন সৃষ্টির প্রয়াসটা হয়েছে বোম্বাই প্যাঁচে আর এ-জাতীয় ছবির মধ্যে অসংলগ্নভাবে মঞ্চের ওপরে রাজকীয় ঐশ্বর্য্য ও আড়ম্বর আমদানীর লোভ সম্বরণ করতে না পারার মূলে রয়েছে জেমিনী-মাহাত্ম্য। কাহিনী গতানুগতিক এবং পুরাতন আমলের ঘরোয়া ট্র্যাজেডীকে কেন্দ্র করে রচিত হলেও তার মধ্যে যে উপাদান ও সম্ভাবনা ছিল পরিচালক এস্. এস্. ভাসন নিজেই অঙ্কুরে বিনষ্ট করেছেন তাঁর শিল্পজ্ঞানোচিত রস-চেতনার অভাবে ও অনুভূতির সূক্ষ্মতার দৈন্যে।

স্ত্রী, পুত্র ও কন্যা নিয়ে কেরাণী নারায়ণ সুখেই বোম্বাই সহরে বাস করেছিল। গ্রাম থেকে মা ছেলের সুখের সংসার জেনে মেয়েকে নিয়ে চলে আসে সহরে নারায়ণের কাছে। তখন থেকেই সুরু হয় সংসারের যাবতীয় অশান্তি। গরীব কেরাণীর পক্ষে সংসার চালানো হলো মুস্কিল। হাতের সামান্য পুঁজি শেষ হয়ে ঋণ বাড়তে থাকে, আর বাড়তে থাকে দৈনন্দিন কলহ। শাশুরী ননদ একজোট হয়ে বৌয়ের ওপর চালায় নির্য্যাতন। ক্রমে নারায়ণের চাকরীটাও গেল। বিপদের অকুল সমুদ্রে পড়ে নারায়ণ। স্ত্রী তখন হাসপাতালে, দিশেহারা নারায়ণ পালিয়ে গেল ঘর ছেড়ে। ভাল হয়ে শিশু সন্তান দু'টিকে নিয়ে নারায়ণের স্ত্রী বেরিয়ে পড়লো নারায়ণের সন্ধানে। নারায়ণের ভাই মদন থাকতো গ্রামেই। মা বোনকে গ্রামে নিয়ে এসে নারায়ণের সংসারকে রক্ষা করার চেষ্টা সে বহুবার করেছে। কিন্তু নিষ্ফল হয়েছে বারবার। নারায়ণকে সংসারে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করে নি। ধনীর কন্যা কমলার প্রেম পর্য্যন্ত সে প্রত্যাখ্যান করলো ঐ কারণে।

কালের স্রোতে ওদের সংসার বিচ্ছিন্ন হয়ে ছড়িয়ে পড়ল। একটা কারখানায় কাজ নিলো নারায়ণ। ঐ
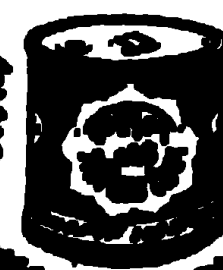
কারখানায় কাজ করতো তার ছোট ভাই আর নারায়ণের ছেলে। নিয়তির পরিহাসে পিতা ছেলেকে চেনেনা, ছেলে চেনেনা পিতাকে। কিন্তু বিধাতার অভিপ্রায় ছিল অন্তরকম। নারায়ণ কারখানায় অসুস্থ হয়ে পড়ল। ছেলেটি সাগ্রহে তাকে সাহায্য করতে গেল। এই সূত্রে হলো পিতা-পুত্রের পরিচয়, পিতা-পুত্রের মিলন। রুগ্ন স্বামীর পথ্য ও ডাক্তারের খরচ চালানো শক্ত হয়ে পড়লো নারায়ণের স্ত্রীর পক্ষে। কারখানার মালিকের দয়ার উদ্রেক করতে না পেরে নারায়ণের স্ত্রী চুরি করতে বাধ্য হয়। মিলের মালিককে জখম করার অপরাধে প্রমাণাভাবে মদন ধরা পড়লো। বিচারালয়ে মদন এবং মদনের ভ্রাতৃবধূ একে অপরকে রক্ষা করার জন্য উভয়েই নিজেকে অপরাধী বলে স্বীকার করল। অবস্থা দেখে মিল-মালিক মামলা প্রত্যাহার করে বিভিন্ন সংসারে এনে দেয় মিলনের সন্ধান।

ক্রমে নারায়ণের বোন ও তার স্বামী বুঝতে পারে অতীতের ভুল। সংসারে আসে নূতন আশার আলো।

খণ্ড ও বিচ্ছিন্ন একাধিক চরিত্র ও ঘটনার ভিড়ে মাত্রাতিরিক্ত নিম্নশ্রেণীর স্থূল রসিকতায় এই ট্র্যাজেডীর অন্তর্নিহিত মান-অভিমান, আবেগ, অনুভূতি ভুল বোঝা-বুঝি আগাগোড়া একটা বিরাট প্রহসন হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা আশা করি ভবিষ্যতে এই জাতীয় ছবি করার আগে ভাসন যেন একটি কথা মনে রাখেন যে ট্র্যাজেডী যেখানে ঘটনা-প্রধান সেখানে তার রসোত্তীর্ণতা নির্ভর করে ঘটনা সংস্থাপন ও বিন্যাসের ওপর। অবান্তর ঘটনার যেমন কোন স্থান নেই সেখানে তেমনি মূল ঘটনা-নিরপেক্ষ হয়ে চলার মতো স্বাধীনতাও কোন চরিত্রের থাকার উপায় নেই। এই সংযম ও রসবোধের অভাবেই 'সংসার' চিত্রের দৈর্ঘ্য অনাবশ্যকভাবে দাঁড়িয়েছে পনেরো হাজার ফিটে—ট্র্যাজেডীকে বিরক্তিকর করে তোলার পক্ষে তাই যথেষ্ট।

দৃশ্য-সজ্জা ও কলাকৌশল জেমিনীর খ্যাতিকে অক্ষুণ্ণ রেখেছে। আলোকচিত্র গ্রহণে যেন ততটা উৎকর্ষের পরিচয় পাওয়া গেলনা। সঙ্গীতের দিকটা প্রশংসনীয় বিশেষ করে তার মধ্যে ভারতীয় ক্ল্যাসিকেল সঙ্গীতের রূপটি মন মাতিয়ে রাখে। 'আম্মা রোটী দে বাবা রোটী দে' গানখানি বিশেষ মর্মস্পর্শী এবং পরিবেশসৃষ্টি ও করুণ রস-সঞ্চারে বিশেষ সহায়ক হয়েছে। অভিনয়ে লক্ষ্মীর ভূমিকায় পুষ্প বল্লী ও নারায়ণের ভূমিকায় এম্, ভি, রাধা সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য। কমলার ভূমিকায় নবাগতা বনজা এবং মদনের ভূমিকায় স্বরাজের অভিনয় নৈরাশ্য-জনক। অন্যান্য ভূমিকায় বিশেষ উল্লেখের মতো কিছু নেই।

মিনতি

ছবির তৈরীর ক্ষেত্রে কাহিনী-উপাদান, উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ এবং মস্তিষ্ক-চালনা কতখানি প্রয়োজন 'মিনতি' চিত্রখানি তারই নির্দেশ দিচ্ছে। কারণ, এই তিনের অভাবটাই এই ছবির মধ্যে সবচেয়ে বেশী প্রকট এবং সেইটাই বোধ হয় এই চিত্রে বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য। কাহিনীর নামে একটি বস্তু এতে চালাবার চেষ্টা করা হয়েছে। সেই কাহিনীর অন্তে কিছু নীতি-বাক্যও প্রচারিত হয়েছে। সেই নীতি-বাক্যটি হলো আর্থিক নিগ্রহ ও লাঞ্ছনার মধ্যে পড়েও সহস্র দুর্বলতা ও পরাজয় স্বীকারের উর্দ্ধে নারী যেন তার সতীত্বকে নিষ্কলঙ্ক করে ধরে রাখে। এই নীতি প্রচারের অস্ত্র হয়েছে একটি ভিলেন চরিত্র যে সমাজব্যবস্থা পারিপার্শ্বিক অবস্থা উদ্দেশ্য ইত্যাদি নিরপেক্ষ হয়ে কাহিনীকার ও পরিচালকের মুখ চেয়ে শুধু ভিলেনী করে যায়। এই চরিত্রটির নাম শেখর—রেখার অফিসের মালিক। মায়ের প্রাণ বাঁচাতে এঁরই কাছে সতীত্ব জলাঞ্জলি দিতে হয় রেখার কাহিনীর ক্লাইম্যাক্সের দিকে নজর রেখে শেখর আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করে অবিশ্রান্তভাবে নারীত্বহানি করে বেড়ায়। ওদিকে মিনতিরও সেই অবস্থা। তার মা ও ভাই বাবলুকে ডাকাতে ধরে নিয়ে যাবার পর তার ওপরেও তাদের দৃষ্টি এড়ায় না। কিন্তু মিনতির উপস্থিত-বুদ্ধি ভাল। সে বুড়ো বাপকে নিয়ে অন্য গ্রামে গিয়ে এক পোড়ো বাড়ীতে আশ্রয় নেয়। ডাকাতের ভয় তখনও

তার কাটে নি, পুরুষমাত্রই তার কাছে তখন বোধ হয় এক একটি ডাকাতবিশেষ। তাই সে পুরুষের ছদ্মবেশে 'সাধন' নাম নিয়ে বাজারে ফুল বিক্রী করতে বেরিয়ে পড়ে কারণ সে-দেশের লোকের আর সব কিছুর চেয়ে ফুল কেনার ঝোঁক বেশী—তারা প্রায় লাইন দিয়ে ফুল কেনে আর মিনতি ওরফে সাধনের পকেটে পয়সা ঝমাঝম্ বাজতে থাকে। অর্থ ছাড়া আরও একটি বস্তুর সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হয়, সে হলো চানাচুরওয়ালা রতন। অল্পকালের মধ্যেই রতনের কাছে ফাঁস হয়ে যায় সাধনের ছদ্মবেশ। যে পথে ফুল আর চানাচুর বিক্রী করতে আসা-যাওয়ার ফাঁকে দুজনে প্রেমে পড়ে সেই পথেই ঘোরাঘুরি করে শেখর মেয়ে খুঁজতে। তাদের প্রেম যখন পরিণয়ে নিবিড় হবার সিদ্ধান্তে পৌঁছলো তখনই শেখর মিনতিকে নিয়ে উধাও হলো। রেখা সাহায্য করলো রতনকে, মিনতিকে উদ্ধার করে নিয়ে পালাতে কিন্তু শেখর বন-বাদাড় টপকে ছুটলো ওদের পিছু পিছু রেখার গুলীতে প্রাণ হারাবার লোভ সম্বরণ করতে না পেরে।

কাহিনী, ঘটনা-যোজনা, সংলাপ-রচনা, সেট-নির্ম্মাণ এবং সর্ব্বোপরি পরিচালনা একে অপরের সঙ্গে কঠিন প্রতিযোগিতায় নেমেছে অপকর্ষের নিম্নতম ধাপে নামার জন্য। অভিনয়ে সাধন ওরফে মিনতির ভূমিকায় স্মৃতিরেখাই একমাত্র উল্লেখযোগ্য। ফেরীওয়ালার রূপ-সজ্জায় পরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়কে মানিয়েছে ভাল। অভিনয়ে না পারলেও দৈহিক বিপুলতার দিক দিয়ে সুলোচনা চ্যাটার্জ্জী সবিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ছায়া দেবী, কমল মিত্র, হরিধন মুখোপাধ্যায় ও আশু বসুকে নামানো হয়েছে কিন্তু তাঁদের অভিনয়-ক্ষমতাকে কাজে লাগবার কোন অবকাশ দেওয়া হয়নি।

দত্তা

সমগ্র শরৎসাহিত্যের মধ্যে 'দত্তা' উপন্যাসখানি সহজ, নির্দোষ প্রেমের একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর চিত্র—এর মধ্যে নেই কোনো জটিল বিশ্লেষণ, নেই কোনো আবিলতার স্পর্শ, নেই কোনো সমস্যার গুরুভার। নরেন-বিজয়ার প্রেম অতি স্বাভাবিক ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে একদিকে সরল হাস্য-কৌতুক ও অন্যদিকে শিশুসুলভ ক্রোধ-অভিমান-বিস্ময়বিমূঢ়তার অন্তরালে ধীরে ধীরে স্ফুরিত হ'য়ে উঠেছে। স্বতঃস্ফূর্ত্ত অপ্রতিরোধনীয় প্রেম ও অঙ্গীকারবদ্ধ কর্ত্তব্যপালন বা প্রতিজ্ঞতিরক্ষার পার্থক্য-প্রদর্শনই এই কাহিনীর মূলকথা। সেই কাহিনী নিয়ে সর্ব্বরসোত্তীর্ণ ছবি হওয়াটা খুব শক্ত কথা নয়—সেই কাহিনী নিয়ে ছবি তৈরীর আকর্ষণ তাই খুবই স্বাভাবিক। এস্ বি প্রোডাকসন্সের 'সিংহদ্বার'-উত্তর এই তৃতীয় চিত্র দেখে আমাদের শুধু একটি কথাই মনে হয়, যে ছবি একদা নিউ থিয়েটার্স সবাক সংস্করণেই তুলে-ছিলেন সেই ছবিতে হাত দেওয়ার আগে সবদিক থেকে তৈরী হ'য়ে নামাই উচিত ছিল। অতি সুন্দর চমৎকার আলোকচিত্র, সুকণ্ঠে গাওয়া তিনখানি রবীন্দ্রসঙ্গীত এবং দয়াল-নলিনী-পরেশ চরিত্রের অভিনয়কুশলতা ছাড়া ছবির আর কিছুমাত্র আকর্ষণ নেই, অবশ্য সংলাপ ও কাহিনীর আকর্ষণ বাদ দিয়েই বলছি।

তিন বন্ধু—জগদীশ, বনমালী ও রাসবিহারী। জগদীশ সর্ব্বস্ব খুইয়ে মদ খেয়ে উন্মত্ত অবস্থায় মারা যায়। বনমালী

মায়া যায় জগদীশের আত্মার ডাকে। এ অবস্থায় বনমালীর কন্যা বিজয়ার ওপর অভিভাবকত্ব ও তার জমিদারী দেখার ভার গিয়ে পড়ে তৃতীয় বন্ধু রাসবিহারীর ওপর। রাসবিহারী তাঁর গোঁয়ার ছেলে বিলাসকে সঙ্গে করে বিজয়াকে নিয়ে তার দেশে গিয়ে উঠলেন। রাস-বিহারীর অভিলাষ বিজয়া বিলাসকে বিয়ে করে। জগদীশের ছেলে নরেন বিলেতে ডাক্তারী পড়তে গিয়েছিলো এবং সম্প্রতি সে ফিরে এসেছে। রাসবিহারী গ্রামে গিয়ে দুর্গাপূজা বন্ধ করে দেন। পূর্ণ গাঙ্গুলীর ভাগনে মাত্র এইটুকু পরিচয় দিয়ে নরেন গ্রামবাসীর হয়ে বিজয়ার কাছে পূজা অনুষ্ঠানের আবেদন নিয়ে দেখা করে। পরে বিজয়ার সঙ্গে নরেনের আরও কয়েকবার দেখা হয়। বিজয়া নরেন সম্পর্কে ঔৎসুক্য প্রকাশ করে। রাসবিহারী ও বিলাস জগদীশের দেনার দায়ে নরেনের বাড়ী দখল ক'রে সেখানে উপাসনা মন্দির স্থাপন করে। মন্দিরের আচার্য হয়ে আসেন দয়ালবাবু এবং তাঁর সঙ্গে তাঁর ভাগনী নলিনী। নরেন গ্রাম ছেড়ে যাবার আগে বিজয়া তাকে চিনতে পারে এবং মনে মনে তাকেই ভালোবাসে। কলকাতায় চাকরী করলেও নরেন দয়ালবাবুদের সঙ্গে দেখা করার জন্য রোজই আসতে থাকে। বিজয়ার সন্দেহ হলো নরেন আসে নলিনীর টানে। এই সময় পুরানো চিঠি থেকে জানা গেলো নরেনকে বিলেত পাঠিয়েছিলো বনমালী এবং বিজয়া নরেনের কাছেই দত্তা। নরেন পরিহাসচ্ছলে বিজয়াকে একথা জানালে, কিন্তু নরেন নলিনীর প্রতিই আসক্ত মনে করে নিয়ে অভিমানভরে বিজয়া বিলাসকেই বিবাহ করার সঙ্কল্প করে। দয়ালবাবু স্ত্রী ও নলিনীর সঙ্গে আলোচনায় বিজয়া ও নরেনের পরস্পরের আসল মনের পরিচয় পান এবং গোপনে ওদের দুজনের বিবাহ দিয়ে দেন।

চিত্রনাট্যরচনার দোষে উপন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ও সংলাপগুলির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া কোথাও পরিস্ফুট হয়নি। দয়াল ও নলিনীর ভূমিকাদুটি সম্পূর্ণ অবহেলিত এবং ছবির ঘটনাস্রোতের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ কিংবা বিজয়ার মানসিক ভাবান্তরের ওপর তাঁদের কোনো প্রভাবই ছবিতে নেই। মূল রচনাকে উপেক্ষা ক'রে ছবিতে আগাগোড়া সমস্ত প্রাধান্যটাই দেওয়া হয়েছে বিজয়ার ওপর অথচ বিজয়ারূপিনী বিগতযৌবনা সুনন্দা দেবী সেই প্রাধান্যটাকে প্রতি দৃশ্যেই তাঁর প্রাণহীন উপলব্ধিহীন অভিনয়ব্যর্থতায় হাস্যাস্পদ ক'রে তুলেছেন। শরৎচন্দ্রের এমন একটি রসসম্পদে অতুলনীয় প্রণয়-কাহিনীর কতখানি হতাশাব্যঞ্জক অনুভূতি ও অন্তর্দ্বন্দ্ব-বর্জ্জিত চিত্ররূপ হতে পারে তা' 'দত্তা' দেখার আগে বিশ্বাস করাই শক্ত ছিল। নলিনীর ভূমিকায় অনুভা, পরেশের ভূমিকায় মাষ্টার সুখেন ও দয়ালরূপে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য না থাকলে ছবির যে কি শোচনীয় অবস্থা হোত সেটা ছবি দেখতে দেখতে বারবারই মনে হয়। নায়কের ভূমিকায় পূর্ণেন্দু মুখোপাধ্যায় ও নায়িকারূপে সুনন্দা দেবী 'টিম' হিসেবে যতখানি বেমানান ঠিক তত-খানিই বেমানান তাঁদের অভিনীত ভূমিকায়। অভিনীত ভূমিকাদুটির আবেগ-অনুভূতি ও মানসিক ঘাত-প্রতিঘাত হৃদয়ঙ্গম করার শক্তিও তাঁদের নেই। অহীন্দ্র চৌধুরীর 'রাসবিহারী' 'তটিনীর বিচার' ছবির ক্রিমিনাল 'ডক্টর ভোস'কে স্মরণ করিয়ে দেয়। বিলাসবিহারীর ভূমিকায় জহর গাঙ্গুলীর অভিনয় চলনসই হলেও আকৃতিতে

নিতান্ত বেমানান।

ছবির আকর্ষণ বাড়িয়েছে রবীন্দ্রনাথের গান তিনখানি। অভিনয়ে যে পরিবেশ সৃষ্ট হয়নি একমাত্র গানে তা' সম্ভব হয়েছে। আবহসঙ্গীত কোথাও প্রশংসা করার মত হয়নি।

চীনের পুতুল

ডিটেকটিভ গল্প, তার রহস্যরোমাঞ্চ এবং কৌতূহল বজায় রেখে, গল্পের গতি এবং ঘটনার গ্রন্থির পাক ধীরে ধীরে খোলার যে বিদ্যা, বুদ্ধি ও কৌশল প্রয়োজন হয় এই জাতীয় কাহিনীর জন্য, এ ছবিতে তার অভাব সর্বত্র। ঘটনা ও চরিত্রের আসা-যাওয়া, চলাফেরা, পারস্পরিক সম্বন্ধ এবং মূল হত্যারহস্যের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ ছবিতে কোথাও পরিস্ফুট এবং পরিষ্কার নয়। এর জন্যে মূলতঃ দায়ী চিত্রনাট্যরচনার ব্যর্থতা এবং যা হোক ক'রে দায় সারার মোহ।

গভীর রাতে আবার এক খুন—এই নিয়েই ছবির কাহিনী আরম্ভ। এবারেও খুন হয় পুলিশের লোক। আততায়ী ফেরার। পুলিশ-অফিসার সত্যেন ঘোষাল চিন্তিত হয়ে পড়েন। সহরের বুকে রহস্যজনকভাবে একের পর এক খুন হয়ে চলেছে আর প্রতিবারই খুনী গা-ঢাকা দিয়ে যাচ্ছে। কে এই নরঘাতক? কেনই বা সে খুন করে? সন্দেহজনক সমস্ত প্রতিষ্ঠানের ওপর পুলিশ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে। সহরে বিখ্যাত নাইট ক্লাব 'কাফে হাওয়াইনে'র ম্যানেজার এবং সেখানকার সুন্দরী নর্ত্তকী মিস্ মার্গারেট সত্যেনবাবুর বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আরও একটি প্রতিষ্ঠানের ওপর পুলিশের করা নজর পড়ে সেটি হচ্ছে একটি চীনা নাচের দল। সম্প্রতি সহরে তাঁবু ফেলে তারা দর্শকমণ্ডলীর দৃষ্টি ও প্রশংসা আকর্ষণ করেছে, চটুল নাচগানের ফোয়ারা ছুটিয়ে। সত্যেন-বাবুর বন্ধু ইন্দ্রনাথ ঐ দলের ওপর নজর রাখবার ভার গ্রহণ করে। এই দলের কর্ত্তা চাং-সা—কোনদিকে সে দৃষ্টিপাত করে না। ভাণ করে ধর্ম্মভীরু সাজার। চীনা সুন্দরী মিংচু আর অবিবাহিত যুবক ইন্দ্রনাথ এদের মধ্যে গড়ে ওঠে একটা নৈকট্যের সম্পর্ক। মিংচু চাং-সার কে হয় তা ঠিক জানা না গেলেও মিংচু একদিন অলক্ষ্যে অসতর্ক মুহূর্ত্তে সে-পরিচয় মুক্ত করে ফেলে যায়। চাংসার সহকারী ডাক্তার জেন অতি নিষ্ঠুর এবং ভয়ঙ্কর। ইন্দ্রনাথ চেষ্টা করে এদের ছদ্মবেশ ভেদ ক'রে আফিং চালান দেওয়ার গোপন রহস্যজাল ভেদ করতে। সাগর-তীরে চীনাদলের পিকনিক্ হয়, সেখানে দেখা যায় ইন্দ্রনাথকে। কাফে হাওয়াইনে মার্গারেটের নাচের মজলিশ চলে—চীনাদের ষ্টীমার-পার্টি—সর্ব্বত্রই দেখা যায় ইন্দ্রনাথকে। একদিকে দুর্বৃত্তরা ষড়যন্ত্র করে, অন্যদিকে সত্যেন ঘোষাল ব্যস্ত হয়ে ওঠেন এবং ইন্দ্রনাথ তৎপর হয়ে ওঠে। শেষ পর্য্যন্ত ইন্দ্রনাথেরই চেষ্টায় খুন আর চোরা-কারবারের মধ্যে যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায় এবং দুর্বৃত্ত চাংসা নিহত হয়।

ছবিতে চরিত্রগুলির কোনটাই ফোটেনি। চাং-সাই যে আসল দুর্বৃত্ত এবং মিংচুর সঙ্গে তার আসল সম্পর্ক কোথাও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। পরিণতি দৃশ্যে আকস্মিকভাবে গুলী মেরে চাংসাকে নিহত করানোয় ছবির ফাঁক ও ফাঁকি বিশেষভাবে প্রকট হয়ে পড়েছে। চাং-সা যদি আসল ভিলেন হয় তবে ডাঃ জেনের ভূমিকাটির

প্রয়োজনই বা কি, সার্থকতাই বা কি ? এই জাতীয় বহু 'কেন'রই উত্তর নেই—ছবিতে-বলা কাহিনীতে।

আলোকচিত্রগ্রহণ ছবির পরিবেশকে ফুটিয়ে তোলায় সাহায্য করেছে। শব্দগ্রহণে বিভিন্ন দৃশ্য বা ঘটনার বৈচিত্র্য এবং পার্থক্য পরিস্ফুট হয়নি। এ ছবিতে আমাদের সবচেয়ে বেশী অবাক করেছেন মিং-চুর ভূমিকায় স্মৃতিরেখা। রূপসজ্জায় হাবে-ভাবে-ভঙ্গীতে এবং বিশেষ ক'রে 'সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি' আবৃত্তির দৃশ্যে তিনি নিখুঁত রূপ দিয়েছেন। মার্গারেটের ভূমিকায় কুলদীপ কাউরের কোনো প্রয়োজনীয়তা বোঝা গেল না। এ ভূমিকাটি বাংলা দেশের যে কোন অভিনেত্রীও তাঁর চেয়ে ভালভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারতেন। চাংসা রূপে ধীরাজ ভট্টাচার্য্য এবং সত্যেন ঘোষাল চরিত্রে গৌতম মুখার্জী উৎরে গেছেন। ধীরাজবাবুর সংলাপ বলার ভঙ্গীটা ইদানীং বড় বেশী একঘেয়ে হয়ে উঠেছে, তার ফলে চাংসার সংলাপ এবং তাঁর অন্যান্য ছবির সংলাপ বলার মধ্যে যে কিছু পার্থক্য থাকা সম্ভব, মনে হয় সে-বিষয়ে তিনি অবহিত ছিলেন না। গানের ভাষা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অর্থহীন, বোম্বাই-মার্কা হিন্দী ছবির মতো। সুরযোজনায় কোনো বৈশিষ্ট্য নেই। নাচের মধ্যেও অধিকাংশই নিম্নশ্রেণীর এবং পরিচালকবৃন্দের সেক্স-পার-ভারসানের পরিচয় দেয়।

হাতিবাগান এ্যাথলেটিক ক্লাবের প্রীতি-সম্মেলন

গত ২৬শে নভেম্বর সোমবার হাতিবাগান এ্যাথলেটিক ক্লাবের উদ্যোগে 'শ্রীরঙ্গম' রঙ্গমঞ্চে পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে এঁদের দ্বিতীয় বার্ষিক প্রীতি-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীসুবোধ গুহ ও শ্রীসুধীর রায়চৌধুরী যথাক্রমে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে ক্লাবের সভ্যবৃন্দ কর্ত্তৃক ৺ভূপেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত বিখ্যাত 'বাঙালী' নাটক মঞ্চস্থ হয়। প্রায় প্রত্যেকের অভিনয়ই খুব হৃদয়গ্রাহী হয়। পুরুষ চরিত্রাভিনয়ে মোহন দত্ত, সনৎ মিত্র, শঙ্কর মিত্র, অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারক গুপ্ত, শ্যামল সেন, অজিত বসু, অমিয়ময় দে, সন্তোষ ঘোষ, চণ্ডীমুখার্জ্জী (রঙমহল) ও সলিল মুখোপাধ্যায় উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেন। স্ত্রীচরিত্রে বিজন সরকার, গুরুদেব চক্রবর্ত্তী ও ক্ষেত্রদাস বটব্যালের অভিনয় সুন্দর হয়।

শ্রীমহিমারঞ্জন মিত্র, শ্রীমতী প্রভা, শ্রীমতী কেতকী, শ্রীমতী করবী গুপ্তা, তেজেন গুহ রায় প্রভৃতি ব্যক্তিরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

চিত্র-সাংবাদিক সম্বর্দ্ধিত

গত ২৭শে অক্টোবর 'রূপমঞ্চ' অফিসে বঙ্গীয় চলচ্চিত্র সাংবাদিক সমিতির বাৎসরিক শারদীয়া সম্মেলনের অনুষ্ঠান হয়। পশ্চিমবঙ্গ আঞ্চলিক সেন্সর বোর্ডের সদস্য মনোনীত হওয়ার জন্য চিত্র-সাংবাদিক এন কে জি ও 'চন্দ্রশেখর'কে এই অনুষ্ঠানে অভিনন্দন জানানো হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রী এস, এম বাগচী। সাংবাদিকদ্বয়কে অভিনন্দন জানিয়ে এ[illegible] ছোট্ট ভাষণে সভাপতি বলেন যে, বহুদিন থেকে সরকা[illegible] সরকা[illegible] বোর্ডে চিত্র-সাংবাদিক গ্রহণের জন্য বিভিন্ন [illegible] মারফৎ দাবী জানানো হচ্ছে। এতদিন বিদেশী [illegible] আমাদের কথায় কর্ণপাত করেন নি। এখন জাতী[illegible] সরকার শ্রীনির্ম্মলকুমার ঘোষ ও শ্রীমনুজেন্দ্র ভঞ্জকে পশ্চিমবঙ্গ আঞ্চলিক সেন্সর বোর্ডের সদস্য মনোনীত ক'রে আমাদের দাবী পূর্ণ করেছেন। বিলম্বে হলেও আনন্দের কথা সন্দেহ নেই। তিনি আরও বলেন যে, এই মনোনয়নে সমিতি সরকারের স্বীকৃতি লাভ ক'রে গৌরবান্বিত বোধ করছে। সদস্যদ্বয়কে উদ্দেশ ক'রে তিনি বলেন, তাঁরা যে তাঁদের নূতন দায়িত্ব সম্মানের সঙ্গে পালন ক'রে চিত্র-সাংবাদিকের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখবেন, সে সম্বন্ধেও তিনি নিঃসন্দেহ।

তারপর, উভয় সদস্যই উপস্থিত সহকর্মীবৃন্দকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন; এবং আঞ্চলিক সেন্সর বোর্ডে তাঁদের যেসব সুবিধা ও অসুবিধার সম্মুখীন হ'তে হচ্ছে তা সমবেত সাংবাদিকদের কাছে বিশদভাবে বর্ণনা করেন।

আপনি কি বলেন?

বাবলা

ভাগ্যবিড়ম্বিত এক কিশোরের মর্ম্মন্তুদ জীবনের ইতিবৃত্ত। খ্যাতনামা লেখক সৌরীন্দ্র মুখার্জ্জি যে বেদনাময় ইতিহাসকে একদা লেখনী-প্রভাবে লিপিবদ্ধ করেছিলেন, এম, পি,-র সুযোগ্য তত্ত্বাবধানে সেই বর্ণ-সঞ্জীবিত উপন্যাসকে ছায়াচিত্রে রূপায়িত করেছেন চিত্র[illegible] নামী শিল্পী-গোষ্ঠী—'অগ্রদূত'। মানুষের বড় অভা[illegible] প্রকৃতশিক্ষা ও উপযুক্ত পারিপার্শ্বিকতার স্ব[illegible]ন অনস্বীকার্য্য। কিন্তু শৈশব হতেই এ দু'য়ের চা[illegible]ব আমাদের দেশের শত শত জীবনে তারুণ্যের প্রদি[illegible] অকালে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে নিঃশেষে বিলীন হয়ে যায়। 'বাবলা'ও এমনই একটি চরিত্র যা' বাস্তবে নিতান্তই স্বাভাবিক, তবু, পরিবেশের চাপে এ ধরণের কাহিনীকে অবাস্তব ঘটনার করুণ চিত্র মনে করে চোখের জল ফেলতে হয়। যে দুঃখী সেও আপন দুঃখ ভুলে যায়, ভুলে যায় নিজের মর্ম্মবেদনার ইতিহাস। মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে 'বাবলা' তার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের চিন্তা করে, বাবা মা যখন 'স্বপ্নে মুখর' তখনও পার্থিব আব-হাওয়ায় সে সম্পূর্ণ হতে পারেনি। কিন্তু যেদিন পৃথিবীর আলো তার 'ক্ষুদ্র জীবনের' জ্ঞান বৃক্ষে দ্যুতি বিকীরণ ক'রলো সেদিন সে বুঝতে পারলো জগতে বেঁচে থাকাটা এক প্রকার সমস্যা তবু, বেঁচে থাকাটাই মানুষের কাছে সবচেয়ে বেশী মূল্যবান—অন্যান্য পাঁচজনের মত তারও তিক্ততাই জীবনের সাথী বলে মনে হ'ল। অনাথিনী মায়ের- অশ্রু বন্যার মধ্য দিয়ে তা'রও জীবনে জোয়ার এসেছিল কিন্তু এই ক্ষণিক-আনন্দ-উচ্ছ্বাস মসীলিপ্ত হয়ে গেল দুর্ভাগ্যের আক্রমণে। ব[illegible] খুবই সহজ ও সরল তবু, রচনানৈপুণ্যে ও চি[illegible] রচনার গুণে ছবিটি দর্শক-মনে গভীর রেখাপাতে হয়েছে। চিত্রনাট্য ভাল হ'লেও কৈলাসের অনর্থক সংলাপের বাড়াবাড়ি বাদ দেওয়াই উচিত যদিও মনে হওয়া আশ্চর্য্য নয় যে, এ'ধরণের [illegible] ছবির মানকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে তোলে কিন্তু সা[illegible] মাপ-কাঠিতে বিচার ক'রলে এই ধরণের সং[illegible] অর্থহীন কপচানী ছাড়া কিছুই বলা চলে না। 'অগ্র[illegible] পরিচালনা ক্রমশঃই উন্নতির পথে এগিয়ে চ[illegible] বিশেষতঃ চিত্রগ্রহণের উৎকর্ষ প্রশংসা পাবার [illegible] আমরা এই শিল্পীগোষ্ঠীর কর্ম্ম-প্রতিভার সাফল্য [illegible] করি। ছবিতে যে ক'খানি গান আছে তা' বাদ বিশেষ কোন ক্ষতি হ'ত বলে মনে হয় না। নাম-ভূ[illegible] অভিনয় করেছে নবাগত কিশোর-অভিনেতা [illegible] ভট্টাচার্য্য। তার সাবলীল ও মর্ম্মস্পর্শী ভাবব্যঞ্জনা হৃদ[illegible] হয়েছে তবু বলি, কিশোরশিল্পীর ভবিষ্যতের কথা রেখে অহেতুক প্রচারকার্য্য বন্ধ রাখাই ভালো। ভূমিকার মধ্যে প্রভা দেবী, জহর গাঙ্গুলী, শোভা অভিনয় সার্থক হয়েছে। শুভেন মুখার্জ্জি নিজের অনেকটা কাটিয়ে উঠেছেন কিন্তু গৌরীশঙ্কর ও সিংহের অভিনয় সম্পূর্ণ সাফল্যলাভ ক'রতে পা[illegible] বাংলা ছবির দুঃসময়ে ও জাতির নৈতিক অধঃ[illegible] কথা চিন্তা ক'রে এম, পি,-র এই অবদান স্মর[illegible] সময়োচিত হয়েছে বলা চলে। কিন্তু চিত্রোপ[illegible] কাহিনী নির্ব্বাচনে এম, পি,-র কর্ত্তৃপক্ষের রীতি পরিব[illegible] সময় হয়েছে। দীর্ঘদিন ধ'রে প্রায় একই ধরণের দেখে দেখে দর্শকরাও ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন সুতরাং রীতি পরিবর্ত্তন না করলে এন, টি,'র মত এম, হয়ত দর্শক-সহানুভূতি লাভে বঞ্চিত হ'বেন। ইতি[illegible]

অশোককুমার ঘো[illegible]
বিদ্যাসাগর ষ্ট্রীট, কলিকা[illegible]